অনুবাদ: **সমর সেন**

বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৫৫

সূচিপত্র

পাঠকদের প্রতি নিবেদন*

ইউরোপের অর্ধাংশেরও বেশি এলাকা জুড়ে রক্তক্ষয়কারী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের কাছে, সোভিয়েত জনগণের কাছে ছিল পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ। আমরা, সোভিয়েত মানুষেরা কখনও ভুলব না সেই দিনটি, ১৯৪১ সালের ২২ জুন, যখন সামরিক তালিম পাওয়া প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত দু'শ তিরিশটি ডিভিশনের সমস্ত শক্তি নিয়ে হিটলার অতর্কিতে হানা দেয় আমাদের দেশের ওপর। সেই সময়টা ছিল নাৎসী শক্তির পূর্ণ বিকাশের কাল। পশ্চিম ইউরোপে অনায়াস বিজয় লাভের পর হিটলারের বাহিনী তখন মদমত্ত। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ফ্যাশিস্ট ডিভিশনের আঘাতে এমন সমস্ত রাষ্ট্রের পতন ঘটল যেগুলি ইউরোপীয় পরাক্রমের কেল্লা রূপে গণ্য হত। কোন কোন রাষ্ট্র লড়াইয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে বিধ্বস্ত হল, কোন কোনটি বা তাদের কাপুরুষ শাসকবর্গের অনুগামী হয়ে বিনা যুদ্ধে ও বিনা প্রতিরোধে বিজয়ীর কৃপাপ্রার্থী হল। এহেন দিগ্বিজয়ে হিটলারী সেনাবাহিনীর শক্তি কেবলই বৃদ্ধি পেতে থাকে: তাকে সজ্জিতকরণের জন্য সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের কলকারখানা কাজ করে চলে।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণের জন্য বছরের যে দীর্ঘতম দিনটি বেছে নিয়েছিল প্রতীকের অনুরাগী হিটলার, ঠিক সেখান থেকেই সূচনা হল তার সামরিক ভাগ্যবিপর্যয়ের। সোভিয়েত ভূমির অভ্যন্তরের প্রথম কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই, সীমান্তরক্ষিবাহিনীর ইউনিট এবং সীমান্তবর্তী গ্যারিসনগুলির সঙ্গে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সেরা সেরা বাছাই ডিভিশন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত হানার যে পরিকল্পনা ফ্যাশিস্ট সেনানায়কবর্গ রচনা করেছিল তাতে বাধা পড়ল, সোভিয়েত ভূমির উপর দিয়ে শত্রু যত অগ্রসর হতে লাগল ততই আঙ্কিক গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলল তার ক্ষয়ক্ষতি; খোদ জার্মান জেনারেলদের ভাষায়, সোভিয়েত সীমান্তেই বিদ্যুৎগতি অভিযানের গোটা পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

আমাদের কাছে ঐ মাসগুলি ছিল যুদ্ধের ট্র্যাজিক মাস। যুদ্ধে শত্রু তার শক্তি হারাতে থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূখণ্ডের একটা বড় অংশ সে দখল করে ফেলে, লেনিনগ্রাদ অবরোধ করা এবং প্রতিরোধ ভেদ করে মস্কোর দিকে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়। সোভিয়েত বাহিনী একা সেই সময় কেবল জার্মানির নিজস্ব

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেই নয়, হিটলারী আক্রমণের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে অগ্রসরমান পাঁচটি তাঁবেদার রাষ্ট্রের ডিভিশনের বিরুদ্ধেও বিপুল বিক্রমে লড়াই করে চলে। আমাদের পক্ষে সুকঠিন এই যুদ্ধের সময়ই আমাদের শত্রুরা এবং মিত্ররাও জানতে পারল কাকে বলে সোভিয়েত মানুষ, সেই মানুষ, যে তার সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি রক্ষার জন্য, নিজের ভাবধারা রক্ষার জন্য রুখে দাঁড়াতে পারে। পিতৃভূমির যুদ্ধের প্রতিটি দিন সোভিয়েত জনগণের অতুলনীয় বীরত্বের জন্য বিশিষ্ট হয়ে আছে।

যে বইটি এখন আপনাদের হাতে পড়েছে সেটি ঐ ধরনেরই একজন মানুষকে নিয়ে লেখা। আমার দেশের অধিকাংশ মানুষের মতো ঐ সময় আমারও গায়ে ছিল সামরিক গ্রেটকোট, আর ঐ সময়ই, পরবর্তীকালের ইতিহাসে কুর্স্কের লড়াই নামে পরিচিত, প্রবল যুদ্ধ যখন চলছিল তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা ও পরিচয়। পা-ছাড়া বৈমানিক! নিছক বৈমানিক নন, সর্বজনস্বীকৃত জঙ্গী বৈমানিক। জঙ্গী বৈমানিক হিশেবে জার্মানদের দক্ষতা কম নয়, অথচ ইনি তাদের বিরুদ্ধেও একাধিকবার জয় লাভ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে, এই আলেক্সেই মারেসিয়েভ সম্পর্কে রণাঙ্গনের সর্বত্র কথা শোনা যায়। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, এই জনশ্রুতিতে প্রথমে আমি বিশ্বাস করতে পারি নি, তাই আমি স্থির করলাম যেখান থেকে উনি বিমান নিয়ে আকাশে ওড়েন সেই সামরিক বিমানঘাঁটিটা পরিদর্শন করব। তাঁর সঙ্গে যখন আমার আলাপ হল, তখন আকাশপথে নিয়মিত পর্যায়ের দ্বৈরথ সমর শেষ করার পর ঘাঁটিতে অবতীর্ণ বিমান থেকে সম্পূর্ণ অবসন্ন অবস্থায় তিনি বেরিয়ে আসছেন।

তাঁর সহযোদ্ধাদের এবং তাঁর নিজের কথা থেকে আমি এই মানুষটির দুরূহ জয়যাত্রার যে বিশদ বর্ণনা আমি নোট করে রাখি, অতঃপর, যুদ্ধের পর তারই ভিত্তিতে রচনা করি এই গ্রন্থটি। যুদ্ধের শেষ দিকে দেখা যায় সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আলেক্সেই মারেসিয়েভ আটটি বিমান-যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন; তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাবের নিদর্শনস্বরূপ স্বর্ণতারকার অধিকারী হন। এই গ্রন্থটি আমাদের দেশে প্রকাশিত হওয়ার পর যখন চল্লিশটিরও বেশি দেশে ছাপানো হয় তখন আমাকে, বিশেষত পশ্চিমে আমার সমজীবীদের সঙ্গে কথাবার্তার সময়, শুনতে হয় বর্ণিত বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ। জনৈক বিখ্যাত মার্কিন বৈমানিক — ইনিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একজন অংশগ্রহণকারী — আমাকে বলেন: 'এ হতে পারে না, পা-ছাড়া ওড়া সম্ভব নয়, পরন্তু লড়াই করা, তার চেয়েও বড় কথা, বিমান-যুদ্ধে জয়লাভ করা ত নয়ই।' এই কথাবার্তা হচ্ছিল নিউ-ইয়র্কে, যেখানে আমি এসেছিলাম অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে আমার গ্রন্থের নায়কও ছিলেন, ফলে মার্কিন বৈমানিকটির বিশ্বাস না করে আর উপায় রইল না।

আমি সমুদ্র-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিমানচালক ক্যাপ্টেন সকলোভের সঙ্গে পরিচিত হই। তিনিও জঙ্গী বৈমানিক, আর তিনিও লড়াই করেন কাটা পা নিয়ে।

জানা যায় যে আক্রমণ-বাহিনীর কোন এক সেনাপতি, জনৈক জেনারেলও অপারেশনে একটা পা বাদ চলে যাবার পর নিজের পুরো স্কোয়াড্রন নিয়ে শত্রুপক্ষের ওপর আক্রমণ চালান এবং বিমান-যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন।

আমার কাছে কিন্তু আমার বন্ধু আলেক্সেই মারেসিয়েভ চিরকালের জন্য হয়ে আছেন আদর্শ সোভিয়েত মানুষ, আমাদের জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মূর্ত প্রতীক।

যাঁরা এই গ্রন্থ পাঠ করবেন সেই পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমি যোগ করতে পারি যে তার নায়ক জীবিত আছেন, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছেন, যুদ্ধের পর তিনি দুটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শেষ করেন, আর বর্তমানে সারা ইউনিয়ন যুদ্ধাভিজ্ঞ সৈনিক কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। আজও তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ আছে প্রায়ই শান্তি আন্দোলনকারীদের বিভিন্ন ফোরামে একসঙ্গে সভা করি, যেহেতু বিগত যুদ্ধে যাঁরা কঠোর সামরিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই আজ শান্তি আন্দোলনে প্রবল উৎসাহী। এই কথাটিই আমি পাঠকবর্গকে নিবেদন করতে চাই, তাঁদের জানাতে চাই প্রবীণ রুশ সৈনিক ও লেখকের শুভেচ্ছা।

গ্রন্থকার প্রসঙ্গে*

সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর
আলেক্সেই মারেসিয়েভ

বরিস পলেভয়েব সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে। সেই সময় কুর্স্ক অঞ্চলে প্রচণ্ড লড়াই চলছিল, আর তাতে সবচেয়ে সক্রিয় অংশ ছিল আমাদের রেজিমেণ্টের। প্রতিদিন কয়েক বার করে আমাদের উড়তে হত আকাশে। এই রকম নিয়মিত পর্যায়ের ওড়ার পর একবাব সন্ধ্যাবেলায় আমি যখন ঘাঁটিতে নামলাম তখন আমি ক্লান্ত, দারুণ খিদে পেয়েছে আমার, ক্যাণ্টিন ছাড়া আর কোন চিন্তা তখন মনে ঠাঁই পাচ্ছে না। এমন সময় বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেখি বৈমানিকদের দলের মধ্যে এক অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন আর বৈমানিকবা সকলে নির্দেশ করছেন আমার দিকে।

'বোঝ কাণ্ড, আবার সংবাদদাতা!' এই ভেবে আমার দুঃখ হল। আমি যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ক্যাণ্টিনের দিকে ছুটলাম।

অচেনা লোকটি আমার নাগাল ধরে ফেলে নিজের পরিচয় দিলেন: 'বরিস পলেভয়, 'প্রাভদার' সামরিক সংবাদদাতা।' পলেভয়... আমার মনে হল যেন 'প্রাভদার' পৃষ্ঠায় এই পদবীটা দেখেছি, কিন্তু তিনি কেমন লেখেন, কী লেখেন, ভগবানের দোহাই, আমার জানা ছিল না। কিন্তু তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আমার ভালো লেগে গিয়েছিল: চটপটে আবেগচঞ্চল, সরল আর হাসিখুশি মানুষটি। আমি তাঁকে ট্রেঞ্চের ঘরে আমন্ত্রণ জানালাম, আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য বসলাম। পলেভয় নোট লিখে লিখে একাধিক নোটবই ত শেষ করলেনই পরন্তু আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন। আমার কাছ থেকে যখন বিদায় নিলেন তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। যাবার সময় তিনি বললেন: 'লিখব, আলেক্সেই, অবশ্যই লিখব। কী লিখব জানি না, কিন্তু লিখব।'

সকালে আবার যুদ্ধের জায়গায়। তার পর আবার এবং আবার। মোট কথা, যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে 'প্রাভদার' সংবাদদাতাটির কথা আমি ভুলেই গেলাম। অর্থাৎ আমি আগের মতোই পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাঁর পদবীর সাক্ষাৎ পেতাম। যে-সব মানুষ সম্পর্কে

তিনি লিখতেন তাঁদের বড় ভালো লাগত আমার। কিন্তু ঐ সমস্ত সাক্ষাৎকার ছিল কেবলই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়।

১৯৪৭ সালে, আমার এখন আর মনে নেই ঠিক কোন্ দিন, রেডিও খুলতে আমি শুনতে পাই ঘোষক নিয়মিত পর্যায়ের ঘোষণার শেষে বলছেন: 'বরিস পলেভয়ের 'মানুষের মতো মানুষ' উপন্যাসের পরবর্তী অংশ প্রচারিত হবে আগামীকাল সকাল নয়টায়।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কালো চুলের সেই সাংবাদিকটিকে, যিনি ট্রেঞ্চের ঘরে আমার সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলেন। পরের দিন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই রেডিও খুললাম সকাল নয়টার সময়, নিজের কানকে আমি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতে পারলাম না। পলেভয় লিখেছেন আমার সম্পর্কে।

সন্ধ্যাবেলায় আমি তাঁর বাড়িতে এসে হাজির। লেখক তখন আমাকে বললেন যে যুদ্ধের সময় তিনি আমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার সন্ধান পান নি। বিজয়ের দিকে আমাদের যাত্রাপথ ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

সত্যি বলতে গেলে কি, ঠিক ঐ সন্ধ্যাবেলা থেকেই বরিস পলেভয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ, তাও আবার বিভিন্ন সম্মেলনে ও অধিবেশনে, খুব কম সময়ই বাড়িতে।

প্রথম খণ্ড

১

তীক্ষ্ম ঠাণ্ডা আলোয় তখনো তারারা ভাস্বর, কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্বাকাশ সকালের ক্ষীণ আভায় উদ্ভাসিত। ঝাপসা আলোয় গাছপালা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হঠাৎ দমকা তাজা হাওয়ায় গাছের মাথাগুলো নড়ে উঠল, সমস্ত বন ভরে গেল উচ্চকিত, প্রতিধ্বনিমুখর শব্দে। বহু প্রাচীন পাইনগাছগুলি উৎকণ্ঠিত মৃদুস্বরে ফিসফিস করে পরস্পরকে ডাকল, বিচলিত শাখা থেকে শুকনো গুঁড়োগুঁড়ো বরফ ঝরে পড়ল ঝরঝর করে।

হঠাৎ-আসা হাওয়া হঠাৎ থেমে গেল। গাছগুলো আবার ঘনীভূত জড়তায় আচ্ছন্ন। আর তারপরেই ভোরের সূচনা করে বনের নানা শব্দ ভেঙ্গে পড়ল: কাছের খোলা জায়গায় নেকড়ের ক্ষুধিত গর্জন, শেয়ালের সতর্ক ডাক, আর সদ্য-জাগ্রত কাঠঠোকরার প্রথম অনিশ্চিত ঠকঠক, নিস্তব্ধ বনে এত সুরেলা সে শব্দ যে মনে হয় পাখিটা বেহালায় টোকা দিচ্ছে, গাছের গুঁড়িতে নয়।

আবার ভারী ভারী পাইনের মাথায় দমকা হাওয়া। ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আকাশে শেষ তারা কটি আস্তে আস্তে নিভে গেল; মনে হল আকাশ ছোট আর ঘন হয়ে এসেছে। রাত্রের বিষণ্ণ অন্ধকারের রেশ ঝেড়ে ফেলে সজীব সবুজ মহিমায় সমস্ত বন জাগ্রত। পাইনের কোঁকড়া মাথায়, ফারের ঋজু পাতলা শাখায় গোলাপী রং থেকে বোঝা যায় সূর্য উঠেছে আর দিনটি হবে উজ্জ্বল, ঝরঝরে আর হিমশীতল।

বেশ আলো হয়ে এল। রাত্রের শিকার ধীরেসুস্থে হজম করার জন্য নেকড়েগুলো বনের গভীরে চলে গিয়েছে, খোলা জায়গায় শেয়ালগুলোও

আর নেই, বরফে তাদের পায়ের আঁকাবাঁকা ধূর্ত ছাপ। প্রাচীন বনটি সমান অবিরাম শব্দে মুখরিত। সেই বিষণ্ণ, উৎকণ্ঠিত একটানা শব্দের পাতলা ঢেউ'এ কিছুটা বৈচিত্র্য আনছে শুধু পাখিদের অকারণ ব্যস্ততা, কাঠঠোকরার ঠকঠক, এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে যাওয়া হলুদ টমটিটগুলোর খুসির কিচির মিচির আর কাকগুলোর খরখরে লোভী ডাক।

অল্ডারগাছে বসে একটা হাঁড়িচাঁচা ছুঁচলো কালো ঠোঁট ডালে ঘষে সাফ করছিল, হঠাৎ মাথা খাড়া করে কী যেন শুনল, উড়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে ডালে বুক দিয়ে বসল। শুকনো ডালগুলো উৎকণ্ঠায় মড়মড় করে উঠল। নিচের ঝোপঝাপ ঠেলে যাচ্ছে লম্বা চওড়া কী একটা। সরসর করছে ঝোপগুলো, অস্থিরভাবে দুলছে বাচ্চা পাইনগুলির মাথা, শোনা গেল খরখরে বরফ ভাঙ্গার আওয়াজ। তীক্ষ্ন স্বরে ডেকে হাঁড়িচাঁচাটা উড়ে গেল, লেজটা ঠিকরে রইল তীরের মত।

বরফে-ঢাকা পাইনগুলো ভেদ করে বেরিয়ে এল একটা লম্বা বাদামী মুখ, ভারী প্যাঁচালো শিং জানোয়ারটার মাথায়। ভীত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল বিরাট ফাঁকা জায়গাটি। লাল, মখমলের মত ওর নাসারন্ধ্র কেঁপে কেঁপে উঠল আক্ষেপে, গরম ভাপের নিঃশ্বাস ফোঁস ফোঁস করে পড়তে লাগল।

পাইনের মধ্যে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল বুড়ো হরিণটা। শুধু পিঠের লোমশ চামড়া অস্থির থরথর করে কাঁপছে। কানদুটো ভয়ে খাড়া, প্রত্যেকটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, এত প্রখর ওর শ্রবণশক্তি যে একটা বড়ো গুবরে পোকা পাইনগাছের গা ফুটো করছে, সে আওয়াজটা পর্যন্ত কানে এল। তবু এমন কি তার সূক্ষ্ম কানেও বনের কোন অস্বাভাবিক ধ্বনি ধরা পড়ল না, শুধু পাখির কিচির মিচির, কাঠঠোকরার ঠকঠক আর পাইনের মাথায় একটানা সরসর শব্দ।

শুনে আশ্বস্ত হল বটে হরিণটা, কিন্তু ওর ঘ্রাণশক্তি বিপদের কথা জানাল। গলন্ত বরফের তাজা গন্ধের সঙ্গে মিশছে এই গভীর বনের অনাত্মীয় নানা কটু অপ্রীতিকর অশুভ গন্ধ। হরিণটার কালো বিষণ্ণ চোখে ধরা পড়ল চোখ-ঝলসানো শাদা বরফের শক্ত আবরণে কালো কী সব পড়ে আছে। হরিণটা নড়ল না বটে, তবে শরীরের সমস্ত পেশী সঙ্কুচিত করে ঝোপঝাড়ে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু বরফের উপরে নিশ্চল পড়ে রইল মূর্তিগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি করে, তালগোল পাকিয়ে। সংখ্যায় অনেক তারা,

কিন্তু কেউ নড়ছে না, আদিম স্তব্ধতা ভাঙছে না কেউ। ওদের কাছাকাছি বরফের পুঞ্জে উদ্যত অদ্ভুত নানা দৈত্য; ওইখান থেকেই আসছে কটু অশুভ সব গন্ধ।

ফাঁকা জায়গার প্রান্তে দাঁড়িয়ে হরিণটা সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে আছে, ভেবে পাচ্ছে না কী ঘটেছে এই নিশ্চল আপাত নিরীহ মানুষের দলটির।

হঠাৎ একটি শব্দে চমকে উঠল হরিণটা। পিঠের চামড়া আবার কেঁপে উঠল থরথর করে, পিছনের পাদুটোর সমস্ত পেশী আরো সংকুচিত হয়ে এল।

কিন্তু দেখা গেল ভয়ের কোন কারণ নেই। অংকুরিত কোন বার্চগাছের পাতা ঘিরে উড়ছে গুবরে পোকা, তার অস্ফুট গুনগুনের মত আওয়াজটা। তার সঙ্গে মাঝেমাঝে মিশছে সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ন ঘনঘনে কর্কশ একটা শব্দ, সন্ধ্যাবেলায় জলায় সারসের ডাকের মত।

তারপর গুবরে পোকাগুলোকে দেখা গেল, জ্বলজ্বলে পাথায় নীল ঠাণ্ডা আকাশে নাচছে। উঁচুতে বারবার শোনা যাচ্ছে সারসটার ডাক। একটা গুবরে পোকা পাখা ছড়িয়ে ঠুকরে মাটিতে পড়ল, বাকিগুলো নেচেই চলল। হরিণটার পেশীর টান-টান ভাব চলে গেল, ফাঁকা জায়গায় এসে, আকাশের দিকে সতর্কভাবে তাকিয়ে মুড়মুড়ে বরফ চাটল একবার। হঠাৎ আর একটা গুবরে পোকা নাচিয়েদের দল ছেড়ে সটান নেমে এল খোলা জায়গাটায়, পিছনে রেখে এল লোমশ পুচ্ছ। যত নিচে আসছে তত বড়ো হচ্ছে পোকাটা, এত তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল যে হরিণটা লাফিয়ে বনে ঢোকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট, আর হেমন্ত-ঝড়ের হঠাৎ ফেটে পড়ার চেয়েও ভয়াবহ কিছু একটা লাগল গাছের মাথায়, তারপর ঠিকরে পড়ল মাটিতে, ঝনঝন শব্দে সমস্ত বন উচ্চকিত হয়ে উঠল। শব্দটা শোনাল গোঙানির মত, আর তার প্রতিধ্বনি গাছপালায় ধেয়ে চলল, বনের গভীরে দ্রুত ধাবমান হরিণটাকে পেরিয়ে গেল সে শব্দ।

বনের নীল গভীরে প্রতিধ্বনি থিতিয়ে এল। পড়ন্ত বিমানে বিক্ষিপ্ত গুঁড়োগুঁড়ো বরফ গাছের মাথা থেকে ঝিকঝিক করে পড়ছে। আবার সমস্ত কিছু চাপা দিয়ে ভারী স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতায় স্পষ্ট শোনা গেল একজন গোঙাচ্ছে, আর একটা ভালুকের থাবার চাপে বরফ মড়মড় করে উঠল, অস্বাভাবিক নানা আওয়াজ শুনে বনের গভীর থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে জানোয়ারটা।

ভালুকটা বুড়ো, বিরাট আর লোমশ। ওর দুটো ঢুকে-যাওয়া পাঁজর থেকে এবড়োখেবড়ো লোম খোঁচা খোঁচা বাদামী গোছায় বেরিয়ে আছে, শীর্ণ পাছা থেকেও লোম গোছায় গোছায় ঝুলছে। হেমন্ত থেকে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে এ সব অঞ্চলে, পশ্চিমের এই ঘন বন যেখানে আগে শুধু বনরক্ষী আর শিকারীরা আসত, তাও বেশী নয়, যুদ্ধের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। হেমন্তে যখন শীতের ঘুমের জন্য তৈরী হচ্ছিল ভালুকটা ঠিক সে সময় যুদ্ধের রোল কাছাকাছি এসে পড়ে তাকে আস্তানা ছাড়া করেছে, আর এখন পেটের জ্বালায় রাগে অস্থিরভাবে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

ফাঁকা জায়গার ধারে একটু আগেই হরিণটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে ভালুকটা থামল। মাটিতে নাক দিয়ে হরিণটার পায়ের ছাপের তাজা রসালো গন্ধ শুঁকে লোভে গভীর নিশ্বাসে ওর শীর্ণ পাঁজর কেঁপে উঠল, কান পেতে শুনতে লাগল। হরিণটা চলে গিয়েছে, কিন্তু তার জায়গায় জীবন্ত এবং খুব সম্ভব দুর্বল কিছু একটা থেকে আওয়াজ আসছে। ভালুকটার গলার লোম খাড়া হয়ে উঠল। নাক বাড়িয়ে দিল ও। আবার খোলা জায়গার প্রান্ত থেকে এল অনুচ্চ করুণ ধ্বনি।

আস্তে আস্তে নরম থাবা ফেলে এগিয়ে গেল ভালুকটা, বরফে আধো-ঢাকা মানুষটা যেখানে নিশ্চল পড়ে আছে সেই দিকে; সতর্ক থাবার চাপে শুকনো কঠিন বরফের কর্কশ বিলাপ।

২

পাইলট আলেক্সেই মেরেসিয়েভ দুজোড়া "সাঁড়াশীর" প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিল। বিমানযুদ্ধে এর চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। গোলাগুলি সমস্ত ফুরিয়ে গিয়েছে, এমন সময় চারটি জার্মান বিমান তাকে ঘেরাও করে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে, এড়িয়ে যাবার কিম্বা দিক বদলাবার কোন সুযোগ তার ছিল না...

ব্যাপারটা ঘটে এভাবে। কয়েকটা "ইলিউশিন" শত্রুপক্ষের একটি বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাচ্ছে, লেফ্‌টেনান্ট মেরেসিয়েভের অধীনে একদল জঙ্গী বিমান রক্ষী হিসেবে সঙ্গে গেল। দুঃসাহসী আক্রমণ সফল হল। পদাতিকরা যাদের "উড়ন্ত ট্যাঙ্ক" বলত, সেই স্তরমোভিকগুলো প্রায় পাইনগাছের মাথা ছুঁয়ে অলক্ষিতে বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছল. সেখানে

যানবাহনের কয়েকটি বড়ো "ইয়ুনকারস" সারি সারি সাজানো, তারপর হঠাৎ ধূসর-নীল পাইন বনের পিছন থেকে ছোঁ মেরে গেল ঘাঁটিটায়, গম্ভীর শব্দে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে, ভারী "ইয়ুনকারস"গুলোর উপর মেসিনগান আর কামানের গুলি বর্ষণ করতে করতে। চারটে বিমান নিয়ে মেরেসিয়েভ আক্রমণ স্থলে পাহারা রাখছিল, পরিষ্কার দেখল ঘাঁটিতে কালো কালো নানা মূর্তির যত্রতত্র ছোটাছুটি, যানবাহনের বিমানগুলো কঠিন বরফের উপরে আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে, বারবার আক্রমণ চালাচ্ছে স্তরমোভিকগুলো, তারপর "ইয়ুনকারসের" লোকগুলো গোলাগুলির বৃষ্টির মধ্যে বিমানগুলোকে রানওয়েতে জোরে চালিয়ে উপরে তুলল।

ঠিক এই সময়ে আলেক্সেই মারাত্মক ভুল করে। আক্রমণ স্থলে কড়া নজর না রেখে সে, বৈমানিকদের ভাষায়, "সহজ শিকারের লোভে" ধরা দিল। একটা ভারী, মন্থর "ইয়ুনকারস" সবেমাত্র জমি ছেড়ে উঠেছে, মেরেসিয়েভ নিজের বিমানকে তীরের মত নামিয়ে একখণ্ড পাথরের মত টুপ করে এল তার উপরে, মহানন্দে ওটার বহুরঙী, সমকোণ কুণ্ঠিত ডুরালুমিনে গড়া শরীব মেসিনগানের গুলির দীর্ঘ দমকে রেখাঙ্কিত করল। এত আত্মপ্রত্যয় তাব যে শত্রুপক্ষের বিমানটা মাটিতে পড়ে গিয়েছে কি না সেটা দেখবার তোয়াক্কা পর্যন্ত করল না। ঘাঁটির ওদিকে আর একটা "ইয়ুনকারস" আকাশে উঠল। তার পিছন ধাওয়া করল আলেক্সেই। আক্রমণ করল, কিন্তু সফল হল না। আস্তে আস্তে উঠছে শত্রু বিমানটা, তার উপর দিয়ে ওর ট্রেসারগুলির ধারা চলে গেল। এক ঝটকায় ঘুরে আবার আক্রমণ করল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল দ্বিতীয় বার, আবার কাছে এসে পড়ে ওটার চওড়া সিগার-আকৃতি শরীরে অধীরভাবে দমকা গুলি বর্ষণ করে বনের ওধারে নামিয়ে দিল। "ইয়ুনকারস" নামিয়ে, সীমাহীন অরণ্যের আন্দোলিত সবুজ সমুদ্রে যেখানে কালো ধোঁয়ার থাম উঠছে তার উপরে বিজয়গর্বে দুবার চক্রাকারে ঘুরে বিমান-ঘাঁটির দিকে আবার চলল মেরেসিয়েভ।

কিন্তু সেখানে মেরেসিয়েভের আর পৌঁছন হল না। দলের আর তিনটি বিমানকে নটা "মেসার" আক্রমণ করছে ও দেখল, স্তরমোভিকদের হটিয়ে দেবার জন্য জার্মান বিমান-ঘাঁটির নায়ক সেগুলোকে তলব করেছে নিশ্চয়ই। জার্মান বিমানগুলো সংখ্যায় তিনগুণ হলেও অসম সাহসে তিনটি বিমান ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্তরমোভিকগুলো যাতে শত্রুদের হাত থেকে

বেঁচে যায় তার চেষ্টায়। দূরে, ক্রমশ দূরে শত্রু বিমানগুলোকে ওরা নিয়ে গেল, বিলমোরগেরা যেমন জখম হবার ভান করে নিজেদের বাচ্চার কাছ থেকে শিকারীদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

সহজ শিকারের লোভে ধরা দিয়েছে বলে আলেক্সেই এত লজ্জিত যে হেলমেটের নিচে গালদুটো গরম হয়ে উঠেছে টের পেল। একটা বিমান বেছে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। যেটাকে বাছল সেটা একটা "মেসার", নিজের দল থেকে একটু দূরে সরে সেটাও কোন শিকারের সন্ধানে আছে, বোঝা গেল। যতখানি বেগে সম্ভব ততখানি বেগে বিমান চালিয়ে আলেক্সেই শত্রুকে পাশ থেকে আক্রমণ করল। যুদ্ধ বিজ্ঞানের সমস্ত রীতি অনুসারেই আক্রমণ করল জার্মানটিকে। আড়কাঁষির জালের মত দৃষ্টিপথে শত্রু বিমানটার ধূসর শরীর স্পষ্ট পড়েছে, ঘোড়া টিপল ও, কিন্তু অক্ষতদেহে ওটা চট করে পেরিয়ে গেল। আলেক্সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে না, কাছেই ছিল বিমানটি, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। "গোলাগুলি খতম!" আঁচ করে আলেক্সেই'র মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। কামানগুলো পরীক্ষা করার জন্য আবার ঘোড়া টিপল, কিন্তু পেল না সেই স্পন্দন, গুলি চালিয়ে সমস্ত শরীরে যে স্পন্দন বৈমানিকরা অনুভব করে। বারুদ খতম, "ইয়ুনকারসগুলোকে" তাড়াতে গিয়ে গোলাগুলি নিঃশেষ।

কিন্তু শত্রুরা জানে না সেটা! ওদের সংখ্যাধিক্য কমাবার জন্য অন্তত যুদ্ধে যোগ দিতে ঠিক করল আলেক্সেই। কিন্তু ভুল ভেবেছিল সে। যে জঙ্গী বিমানকে আক্রমণ করেও সে কিছু করতে পারেনি, তার চালক অভিজ্ঞ ও সেয়ানা। প্রতিযোগীর গোলাবারুদ ফুরিয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে সহকর্মীদের নির্দেশ দিল। চারটি "মেসার" দলছাড়া হয়ে ঘেরাও করল আলেক্সেইকে, উপরে একটি, নিচে একটি, আর দুটি দুপাশে। ট্রেসারগুলির দমকে পরিষ্কার নীল আকাশে স্পষ্ট রেখা কেটে তার গতিপথ নির্দেশ করে ওরা ওকে দুজোড়া "সাঁড়াশীর" প্যাঁচে ফেলল।

কিছুদিন আগে আলেক্সেই শুনেছিল যে জার্মানদের প্রখ্যাত "রিখথোফেন" বিমান ডিভিশন পশ্চিম থেকে ও অঞ্চলে, স্তারায়া রুসাতে এসেছে। এ দলের মুরুব্বী হেরিং নিজে, এতে আছে ফ্যাশিস্ট রাইখের সেরা বৈমানিকরা। আলেক্সেই বুঝতে পারল যে এইসব আকাশ নেকড়েদের খপ্পরে পড়েছে সে, আর ওকে নিজেদের বিমান-ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে বন্দী করতে ওরা চাইছে। এ ধরনের ঘটনা আগে ঘটেছে। ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু,

সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাবপ্রাপ্ত আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কোর চালনায় জঙ্গী বিমানের দল একটি জার্মান পর্যবেক্ষককে নিজেদের ঘাঁটিতে নামাতে কী করে বাধ্য করে তা ত আলেক্সেই নিজে দেখেছে।

ওর চোখের সামনে ভেসে এল বন্দী জার্মানটির লম্বাটে, ছাই'এর মত বিবর্ণ মুখ আর এলোমেলো পদক্ষেপ। "বন্দী করবে? কখনো নয়! ওসব চালাকি চলবে না!" দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল আলেক্সেই।

কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ওদের এড়িয়ে যাওয়া গেল না। যে দিকে ওকে জার্মানরা চালাচ্ছে সে দিক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেই মেসিনগানের গুলিতে পথ আটকে যাচ্ছে। আবার ওর মানসপটে এল বন্দী জার্মানটির বিকৃত মুখ, থরথর করে চোয়াল কাঁপছে। হীন পশুসুলভ ভয়ের স্পষ্ট ছাপ সে মুখে।

আবার দাঁতে দাঁত চেপে আলেক্সেই যতখানি পারে ততখানি ইঞ্জিনের থ্রটল খুলল, আর যে জার্মান বিমানটা তাকে মাটির দিকে ঘেঁষে নিয়ে যাচ্ছে, লম্বালম্বিভাবে তার নিচে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করল। তার নিচে থেকে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু ঠিক সময়ে জার্মান বৈমানিক ঘোড়া টিপল। গতিছন্দ হারাল আলেক্সেই'র বিমান, তাল কাটতে লাগল একবার, দুবার, যেন মারাত্মক জ্বরের ঘোরে সমস্ত বিমানটি থরথর করে কাঁপছে।

বিমানটা জখম হয়েছে। ঘোলাটে শাদা একটি মেঘের পুঞ্জে বিমানটিকে ঝট করে নামিয়ে নিয়ে যেতে আলেক্সেই পারল, পিছু তাড়া যারা করছিল তারা খেই হারাল। কিন্তু অতঃ কিম? আহত বিমানটির স্পন্দনে ওর সমস্ত শরীর ধকধক করছে, যেন যন্ত্রটির মৃত্যু যন্ত্রণায় নয়, নিজের শরীরের জ্বরেই সে কম্পমান।

বিমানটির কোথায় চোট লেগেছে? কতক্ষণ উড়তে পারবে সেটা? তেলের ট্যাঙ্কগুলো কি ফাটবে? প্রশ্নগুলি আলেক্সেই ঠিক যে করল তা নয়, অনুভব করল। ঠাস ডিনামাইটের উপরে বসে আছে, পলতেতে ইতিমধ্যেই আগুন দেওয়া হয়েছে, এই মনোভাবে বিমানটিকে ঘুরিয়ে নিজের ঘাঁটির দিকে চলল। মরতেই যদি হয়, তাহলে যেন স্বজনেই কবর দেয়।

চরম মুহূর্তটি এল আচম্বিতে। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বিমানটা গড়িয়ে নামতে লাগল, যেন খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াচ্ছে। নিচে বনটা আন্দোলিত,

অনন্ত সমুদ্রের ধূসর-সবুজ ঢেউ'এর মত... "যাই হোক, আমাকে ত ওরা বন্দী করতে পারবে না?" কথাটা ওর মনে ঝলকিয়ে উঠল, তখন সবচেয়ে কাছের গাছগুলো সমান সারিতে মিলে গিয়ে বিমানের পাখাদুটোর নিচে ধাবমান। বুনো জন্তুর মত বনটি যখন ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন কিছু না ভেবেই থ্রটল বন্ধ করে দিল আলেক্সেই। বিকট আওয়াজ একটা, মুহূর্তে সবকিছু মিলিয়ে গেল, মনে হল কালো, ঘন জলের বিস্তারে আলেক্সেই ও বিমানটা ঝপ করে পড়েছে।

পড়বার সময় পাইনের মাথায় ধাক্কা খাওয়াতে পতন বেগ কমে যায়। কয়েকটা গাছ ভেঙ্গে বিমানটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কিন্তু ঠিক তার আগে ককপিট থেকে ঝটকে আলেক্সেই পড়ল শাখা প্রশাখায় আচ্ছন্ন বহু পুরাতন একটা ফারগাছে, ডালপালায় গড়িয়ে নেমে এল হাওয়ায় গাছের নিচে জমাট বাঁধা বরফের স্তূপে। তাতে প্রাণে বেঁচে গেল...

কতক্ষণ যে নিসাড় অজ্ঞান অবস্থায় সেখানে পড়ে ছিল আলেক্সেই'র মনে নেই। ভাসা-ভাসা মানুষের ছায়া, বাড়িঘর দোরের রেখা আর অবিশ্বাস্য নানা যন্ত্র নিমেষে নিমেষে ওকে পেরিয়ে যাচ্ছে, এত উদ্দাম বেগে, ঘূর্ণীবায়ুর মত ভেসে যাচ্ছে যে সমস্ত শরীর চাপা ব্যথায় কনকন করছে। তারপর সে বিশৃঙ্খলা থেকে বেরিয়ে এল বৃহৎ উষ্ণ অনির্দিষ্ট আকারের কিছু একটা, ওর মুখে ফেলল গরম আবিল নিশ্বাস। ওটার কাছ থেকে গড়িয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু বরফে শরীর গেঁথে গিয়েছে মনে হল। আশেপাশে সঞ্চারিত সেই অজানা বিভীষিকার তাড়নায় হঠাৎ একটা চেষ্টা করল আলেক্সেই, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া বুকে ঢুকল, গালে লাগল ঠাণ্ডা বরফ, আর অনুভব করল তীব্র যন্ত্রণা, এবার সমস্ত শরীরে নয়, শুধু পায়ে।

"বেঁচে আছি তাহলে!" চকিতে মনে হল। ওঠবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু কানে এল কার পায়ের চাপে বরফ ভাঙ্গছে, সজোরে কর্কশ নিশ্বাস কে যেন ফেলছে কাছে! "জার্মানগুলো!" তক্ষুণি ভাবল সে, চোখ খুলে লাফিয়ে উঠে আত্মরক্ষা করার ঝোঁক দাবাল কোনক্রমে। "বন্দী তাহলে, শেষ পর্যন্ত তাহলে বন্দী করবে! কী করি?"

মনে পড়ল, পিস্তলের খাপের পটি ছিঁড়ে গিয়েছিল, আগের দিন ওর মিস্ত্রী সবজান্তা ইউরা সেটা ঠিক করে দেবে বলে, কিন্তু তা না করাতে বিমানি পোশাকের নিচের পকেটে পিস্তলটা নিতে হয়। ওটা বের করতে হলে পাশ ফিরতে হবে, কিন্তু শত্রুদের নজর এড়িয়ে সেটা করতে পারবে

না, এখন ত উপড়ু হয়ে শুয়ে আছে। উরুতে পিস্তলটার সূক্ষ্ম রেখা অনুভব করলেও নিশ্চল পড়ে রইল আলেক্সেই; মরে গিয়েছে ভেবে হয়ত শত্রুরা চলে যাবে।

জার্মানটা কাছে ঘুরল, অদ্ভুতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কাছে এল, বরফ ভাঙ্গার শব্দ। মুখে আবার ওর দুর্গন্ধি নিশ্বাস অনুভব করল আল্লেক্সেই। এবারে বুঝতে পারল একটাই মাত্র জার্মান, পরিত্রাণের সুযোগ তাহলে আছে; নজর রেখে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে, ও বন্দুকে হাত দেবার আগেই যদি ওর টুঁটি চিপে ধরতে পারে... কিন্তু সেটা করতে হবে সাবধানে, একটুও ভুল না করে।

না নড়েচড়ে আস্তে আস্তে চোখ খুলল আলেক্সেই, আনত চোখের পাতায় নজরে যেটা এল সেটা জার্মান নয়, বাদামী লোমশ একটা কিছু। চোখ আরো খুলে তৎক্ষণাৎ বুজে ফেলল একেবারে: সামনে থাবা গেড়ে বসে আছে বড়ো, হ্যাংলা, লোমশ ভালুক একটা।

৩

নিঃশব্দে বসে আছে ভালুকটা, শুধু বুনো জন্তুরাই ওরকম চুপচাপ থাকতে পারে। কাছে অনড় মানুষের দেহ, সূর্যের আলোয় ঝকঝকে নীলচে বরফে তার প্রায় সমস্তটা ঢাকা।

জন্তুটার নোংরা নাসারন্ধ্র আস্তে আস্তে কুঁচকে গেল। মুখটা অর্ধেক খোলা, বুড়ো, হলদে কিন্তু ধারালো দাঁত দেখা যাচ্ছে, পুরু লালার সরু ফালি হাওয়ায় দুলছে।

শীতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে যুদ্ধ, ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ ও। কিন্তু মড়ার মাংস ভালুকে খায় না। নিসাড় শরীরটা শুঁকেছে একবার, পেট্রলের তীব্র গন্ধ তাতে, তারপর আস্তে আস্তে ফাঁকা জায়গায় ঘুরেছে ভালুকটা, আরো অনেক মানুষের শরীর সেখানে খরখর বরফে জমে পড়ে আছে; কিন্তু একটা কাতরোক্তি আর খসখস আওয়াজ হওয়াতে ও আবার আলেক্সেই'র কাছে ফিরে এসেছে।

আর তাই আলেক্সেই'র পাশে থাবা পেতে বসে আছে ও। ক্ষুধার তাড়না মড়ার মাংসের প্রতি বিতৃষ্ণা দূর করার চেষ্টা করছে। ক্ষুধার জয় হতে চলেছে। নিশ্বাস ফেলে ভালুকটা উঠল, থাবা দিয়ে শরীরটাকে উল্টে ফেলে বিমানি পোশাকটায় নখ বসাল। পোশাকটা ছিঁড়ল না। নিচু গলায় গরগর করে

উঠল ভালুকটা। সেই মুহূর্তে আলেক্সেই'র ইচ্ছে হল চোখ খুলে পাশ ফিরে চেঁচিয়ে বুকের উপরে লাফিয়ে-পড়া ওই ভারী দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, কিন্তু অনেক কষ্টে ইচ্ছেটা সে দমন করল। প্রাণপণে, বেপরোয়াভাবে আত্মরক্ষা করার জন্য ওর সমস্ত সত্তা ওকে উত্তেজিত করছে, কিন্তু সে ইচ্ছে দাবিয়ে, আস্তে আস্তে, অলক্ষিতে পকেটে হাত চালিয়ে দিল, পিস্তলের বাঁটটা হাতড়ে খুঁজে সাবধানে ঘোড়াটা বসাল যাতে শব্দ না হয়, তারপর সেটা অলক্ষিতে বের করল।

বিমানি পোশাকটা ভালুকটা তখন আরো আক্রোশে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। শক্ত চামড়া ফেটে গেল বটে কিন্তু ছিঁড়ল না। উন্মত্ত ক্রোধে গর্জিয়ে উঠল ভালুকটা, মুখ দিয়ে পোশাকটা চেপে ফার আর ভিতরের তুলো ভেদ করে দাঁত চালাল। প্রাণপণ চেষ্টায় আর্তনাদ চাপল আলেক্সেই আর যে মুহূর্তে ভালুকটা এক ঝটকায় বরফের স্তূপ থেকে ওকে তুলল ঠিক সে মুহূর্তে পিস্তল তুলে ঘোড়া টিপল।

পিস্তলের তীক্ষ্ম আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল চারিদিকে।

পাখা ঝটপটিয়ে হাঁড়িচাঁচাটা দ্রুত উড়ে গেল। ডালপালা নড়ে ওঠাতে শুকনো বরফ আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ছে। আস্তে আস্তে শিকার ছেড়ে দিল ভালুকটা। বরফে পড়ে গেল আলেক্সেই — ভালুকটার উপরে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। থাবা গেড়ে বসে আছে জানোয়ারটা, কালো পুঁযে-ভরা চোখে হতচকিত ভাব। সূচীমুখ দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পুরু ফ্যাকাশে রক্ত চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বরফে পড়ছে। কর্কশ ভয়াবহ গর্জন করে পিছনের পাদুটোতে ভর দিয়ে কষ্টে দাঁড়িয়ে উঠল ওটা, আলেক্সেই আবার গুলি চালাবার আগেই পড়ে গেল। নীলচে বরফ আস্তে আস্তে ঘোর লাল হয়ে উঠল আর গলে যাবার সময়ে ওর মাথার কাছে দেখা গেল পাতলা বাস্পের রেশ। মরে গিয়েছে।

যে একাগ্র টান-টান ভাব এতক্ষণ আলেক্সেইকে আচ্ছন্ন করেছিল, হঠাৎ আলগা হয়ে গেল সেটা। পায়ের সেই তীক্ষ্ম দারুণ ব্যথা ফিরে এল আবার। বরফে পড়ে আবার অচেতন হয়ে গেল আলেক্সেই।

জ্ঞান যখন ফিরে এল সূর্য তখন অনেক উঁচুতে। ঘন পাইনগুলোর মাথা ভেদ করে সূর্যের আলো পড়েছে নিচে, সেই আলোয় বরফের ঝিলিক। ছায়ায় বরফের রং গভীর নীল, পাতলা নীল রং আর নেই।

জ্ঞান ফিরে আসাতে প্রথমে আলেক্সেই'র মনে হল, "ভালুকটা কী স্বপ্ন তাহলে?"

কাছে নীল বরফে পড়ে আছে বাদামী, লোমশ বিকৃতদর্শন লাশটা। বন থেকে নানা মুখর শব্দ উঠছে। কাঠঠোকরাটা সশব্দে গাছ ঠোকরাচ্ছে, এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে যেতে যেতে হলুদ-বুক ক্ষিপ্র টমটিটগুলো খুসিতে কিচির মিচির করছে।

"বেঁচে আছি আমি, বেঁচে আছি, বেঁচে আছি!" বারবার আলেক্সেই নিজেকে বলল। মারাত্মক বিপদ কাটিয়ে ওঠার পর বেঁচে থাকার যে উদ্দাম রহস্যময় মাতাল-করা অনুভূতি প্রত্যেককে আচ্ছন্ন করে সেই ঘোরে ওর সমস্ত সত্তা, ওর সমস্ত শরীর উল্লসিত হয়ে উঠল।

সেই উদ্দাম অনুভূতির তাড়নায় লাফিয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল আলেক্সেই, কিন্তু তক্ষুণি কাতরে উঠে পড়ে গেল ভালুকটার লাশের উপরে। পায়ের ব্যথায় সমস্ত শরীর টনটন করে উঠল। ভারী ঘরঘর শব্দে ওর মাথা ভরে গেল, যেন একজোড়া পুরোনো কর্কশ শান-পাথর ঘুরছে আর ঘষছে, ওর মাথা ভরিয়ে দিচ্ছে তাদের ঘরঘরে। চোখদুটো টাটাচ্ছে, যেন কার আঙুলের চাপ তাদের উপরে। একবার আশেপাশের সমস্ত কিছু সূর্যের ঠাণ্ডা হলুদ আলোয় প্লাবিত হয়ে স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখাচ্ছে; পর মুহূর্তে সমস্ত কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ধূসর চিকচিকে পর্দার আড়ালে।

'ব্যাপার বেগতিক মনে হচ্ছে। পড়বার সময় মাথায় চোট লেগেছিল নিশ্চয়ই। তাছাড়া পায়ে কিছু গড়বড় হয়েছে,' আলেক্সেই ভাবল।

কনুই'এ ভর দিয়ে উঠে আলেক্সেই বিস্ময়ে দেখল বনের প্রান্তের ওপারে চওড়া মাঠ, দূর বনের ধূসর অর্ধবৃত্ত দিগন্তে তার সীমারেখা রচনা করেছে।

স্পষ্টতই হেমন্তে, কিম্বা সম্ভবত শীতের প্রথম দিকে সোভিয়েত বাহিনীর কোন দল বনের প্রান্তে ঘাঁটি বাঁধে, বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি হয়ত, কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ ছিল অদম্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। তুলোর পাঁজার মত বরফের স্তরে জায়গাটির ক্ষতচিহ্ন তুষার-ঝড়ে ঢাকা পড়েছে; কিন্তু সে স্তরের নিচেও চোখে পড়ে ট্রেঞ্চের সারির রেখা, মেসিনগান বসানোর ভাঙ্গা জায়গার সব অনুচ্চ ঢিবি, গোলায় কাটা অগণন ছোট বড়ো গর্ত গিয়েছে বনের ধারে বিকলাঙ্গ চূড়াহীন দগ্ধ গাছগুলো পর্যন্ত। ক্ষতবিক্ষত মাঠের এদিকে ওদিকে পড়ে আছে কয়েকটা ট্যাঙ্ক, পাইক-মাছের আঁশের নানা রঙে রঙ করা। বরফে জমে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো, অদ্ভুত জানোয়ারের লাশের মত চেহারা প্রত্যেকের, বিশেষ করে একেবারে শেষের দিকের ট্যাংকটার, হাত-

বোমায় কিম্বা মাইনে একপাশে হেলে পড়ে গিয়েছে নিশ্চয় ওটা, বেরিয়ে-আসা জিভের মত ওর কামানের লম্বা নলটা মাটিতে ঠেকানো। আর সারা মাঠে, অপরিসর ট্রেঞ্চের ধারে ধারে, ট্যাঙ্কগুলোর কাছে, বনের ধারে পড়ে আছে সোভিয়েত ও জার্মান সৈনিকের মৃতদেহ, এত অসংখ্য যে জায়গায় জায়গায় একটির উপরে আর একটি গাদা করা; তারা জমে পড়ে আছে ঠিক সেই ভঙ্গীতে যে ভঙ্গীতে মাত্র কয়েকমাস আগে শীতের প্রান্তে যুদ্ধের সময় মারা যায়।

দেখে বুঝতে পারল আলেক্সেই কী ভীষণ অদম্য যুদ্ধ চলেছিল এখানে, বুঝল তার সহচরেরা এখানে লড়াই করেছে, শত্রুকে আটকাতে হবে, এগিয়ে যেতে দেবে না, এছাড়া আর কোন চিন্তা তাদের মাথায় ছিল না। আর একটু দূরে বনের ধারে একটা মোটা পাইন, গোলায় মাথাটা উড়ে গিয়েছে, দীর্ঘ বিক্ষত গুঁড়ি থেকে হলুদ স্বচ্ছ রস চুঁইয়ে পড়ছে, পাইনটার তলায় পড়ে আছে জার্মান সৈনিকদের মৃতদেহ, খুলি ফাটা, মুখ ক্ষতে বিকৃত। মাঝখানে একটি জার্মানের মৃতদেহের উপরে আড়াআড়িভাবে হুমড়ি খেয়ে আছে চওড়া-মাথা একটি যুবক, পরনে তার আর্মিকোট নেই, শুধু কোমরবন্ধ ছাড়া টিউনিক, কলার ছেঁড়া; পাশে রাইফেল একটা, সঙ্গীনটা ভাঙ্গা, ক্ষতবিক্ষত বাঁটে রক্তের দাগ।

আর একটু এগিয়ে, যে রাস্তাটা বনের দিকে গিয়েছে, সেখানে বালুতে আচ্ছন্ন একটি নবীন ফারগাছের নিচে গোলার গর্ত থেকে অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে ময়লা রঙের উজবেক একজন, লম্বাটে মুখটা মনে হয় পুরোনো হাতির দাঁত খুদে তৈরী করা। পিছনে ফারগাছের ডালপালার নিচে স্তূপ করে হাত-বোমা সাজানো; উজবেকটির মৃত, উত্তোলিত হাতে একটা হাত-বোমা, যেন ওটা ছোঁড়বার আগে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল একবার, আর সেই ভঙ্গীতেই পাথর হয়ে গিয়েছে।

আরো আগে, বনের রাস্তায় দাগওয়ালা ট্যাঙ্কের পাশে, বড়ো বড়ো গোলা-গর্তের ধারে, ছোট ছোট ট্রেঞ্চে পুরোনো গাছের গুঁড়ির কাছে ছড়ানো মৃতদেহ, পরনে তুলো-ভর্তি জ্যাকেট আর পাৎলুন, অন্যদের টিউনিকের রঙ ধূসর-সবুজ; শিঙওয়ালা টুপি কান পর্যন্ত টানা; দোমড়ানো হাঁটু, ওপরে তোলা চিবুক, শেয়ালে চেবানো, হাঁড়িচাঁচা আর দাঁড়কাকে ঠোকরানো মোমের মত শাদা সব মুখ বরফের স্তূপ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আছে।

ফাঁকা জায়গার উপরে কয়েকটা দাঁড়কাক মন্থরভাবে চক্কর দিয়ে ঘুরছিল,

হঠাৎ আলেক্সেই'র মনে পড়ল মহৎ রুশ শিল্পীর আঁকা "ইগরের যুদ্ধ" নামের বিষণ্ণ উদাত্ত পরাক্রান্ত ছবিটির কথা, স্কুলের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে ছবিটা সে দেখেছিল।

"ওদের মত আমিও এখানে পড়ে থাকতাম হয়ত," মেরেসিয়েভ ভাবল, আবার বেঁচে থাকার অনুভূতি ওর সমস্ত সত্তাকে ভরিয়ে দিল। নিজেকে ঝাঁকুনি দিল আলেক্সেই। কর্কশ শান-পাথরদুটো তখনো মন্থরভাবে ওর মাথায় ঘুরছে, পায়ের জ্বালা আর যন্ত্রণা আরো বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু ও উঠে ভালুকটার লাশের উপরে বসল, শুকনো বরফের গুঁড়োয় সেটা এখন ঠাণ্ডা আর রুপালী, ভাবতে শুরু করল কী করা উচিত, কোথায় যাবে, কী করে পৌঁছবে নিজের লাইনে।

বিমান থেকে ঝটকে পড়ে যাবার সময় মানচিত্রের কেসটা হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন পথে যেতে হবে খুব স্পষ্টভাবে সেটা আলেক্সেই কল্পনা করতে পারল। যে জার্মান বিমান-ঘাঁটিটাকে স্তরমোভিকগুলো আক্রমণ করে সেটা ফ্রণ্ট লাইনের প্রায় ষাট কিলোমিটার পশ্চিমে। আকাশ-যুদ্ধের সময় ওর সহচরেরা শত্রুদের বিমান-ঘাঁটি থেকে পূব দিকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আর জোড়া "সাঁড়াশীর" খপ্পর থেকে বেরিয়ে ও নিজে পূবমুখো আর কিছু দূরে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। তাহলে ও যেখানে পড়েছে সেটা নিশ্চয়ই ফ্রণ্ট লাইন থেকে প্রায় পয়ঁত্রিশ কিলোমিটার দূরে হবে, এগিয়ে-যাওয়া জার্মান দলের অনেক পিছনে, "কৃষ্ণ অরণ্য" নামের বিরাট বিস্তৃত বনভূমির এলাকার কোন একটা জায়গায় সে এখন। ফ্রণ্ট লাইনের কাছাকাছি জার্মান ঘাঁটিতে সংক্ষিপ্ত হামলার সময়ে বোমারু আর স্তরমোভিকের রক্ষী হিসেবে একাধিক বার এই বনের উপরে দিয়ে সে গিয়েছে। উপর থেকে বনটাকে হামেশাই সীমাহীন সবুজ সমুদ্রের মত তার কাছে ঠেকেছে। পরিষ্কার দিনে পাইনগাছের দোদুল্যমান চূড়োয় বনটা বিক্ষুব্ধ হত; কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হলে পাতলা ধূসর কুয়াশার আচ্ছাদনে ওটাকে দেখাতে ছোট ছোট ঢেউ-তোলা মসৃণ নিরানন্দ জলরাশির মত।

বিরাট বনের মাঝামাঝি জায়গায় যে সে পড়েছে তার ভালোমন্দ দুটো দিক আছে। ভালোর দিকটা হল এই — কোন জার্মানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা কম, কারণ জার্মানরা সাধারণত রাস্তা আর সহর ধরে চলে। খারাপ দিকটা — ওর যাত্রাপথ দীর্ঘ না হলেও কঠিন হবে: ঘনগভীর ঝোপঝাড় ঠেলে যেতে হবে ওকে, মানুষের সাহায্য মিলবে না হয়ত, হয়ত মিলবে না

কোন আশ্রয়, রুটির টুকরো একটা, গরম পানীয় কিছু। আর পাদুটো... ওর বোঝা কি সইতে পারবে! হাঁটতে কি পারবে ও? ..

ভালুকটার লাশ ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠল আলেক্সেই। আবার পায়ের সেই তীব্র যন্ত্রণা, নিচে থেকে শুরু করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে আবার বসে পড়ল ও। ফারবুট খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু একটুও নড়ল না সেগুলো; এক একবার টানছে আর কাতরাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ একেবারে বন্ধ করে দুহাতে একটা বুট ধরে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল — আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল। জ্ঞান ফিরে এলে সাবধানে পায়ের কাপড়ের পট্টি খুলল। পাটা ফুলে গিয়েছে, সমস্তটা জুড়ে কালশিটের মত দেখাচ্ছে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা আর জ্বালা। বরফের উপরে পাটা কিছুক্ষণ রাখাতে যন্ত্রণার উপশম হল কিছুটা। আবার আগেকার মত মরীয়াভাবে, হ্যাঁচকা টানে, যেন নিজের দাঁত ওপড়াচ্ছে, অন্য বুটটাও খুলে ফেলল।

দুটো পা-ই গিয়েছে। বিমানের ককপিট থেকে যখন এক ঝটকায় পড়ে যায় তখন নিশ্চয়ই কিছু একটায় পাদুটো আটকে গিয়েছিল, তাতে পাতার ওপর দিকটা আর আঙুলের হাড় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অন্য কোনো সময়ে পাদুটোর এই ভয়াবহ অবস্থায় উঠে দাঁড়াবার কল্পনা পর্যন্ত আলেক্সেই করত না। কিন্তু এখন আদিম অরণ্যের গভীরে সে একা শত্রুদের পিছনে পড়ে আছে, এখানে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হবার মানে মৃত্যু, পরিত্রাণ নয়। তাই বনের মধ্য দিয়ে কোনক্রমে পূব বরাবর যাওয়া মনস্থ করল সে, সুবিধাজনক রাস্তা কিম্বা লোকের বসতি এড়িয়ে চলতে হবে; যে কোন প্রকারে এগিয়ে যেতে হবে।

ভালুকটার লাশ ছেড়ে দৃঢ়চিত্তে দাঁড়াল আলেক্সেই, দাঁড়াতেই দম বন্ধ হয়ে এল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রথম পা ফেলল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে অন্য পাটাও বরফ থেকে অতিকষ্টে তুলে আর এক পা বাড়াল। মাথায় নানা শব্দের ভিড়, বন আর খোলা জায়গাটা দুলে ভেসে যাচ্ছে।

প্রয়াসে আর যন্ত্রণায় নিজেকে আরো দুর্বল লাগছে। ঠোঁট কামড়ে এগিয়ে চলল ও, এল একটা বনের রাস্তায়, ভাঙ্গা ট্যাঙ্ক পেরিয়ে, হাত-বোমা যার হাতে সেই মৃত উজবেকটিকে পেরিয়ে বনের গভীরে পূবমুখো রাস্তাটা চলে গিয়েছে। নরম বরফে খুঁড়িয়ে হাঁটা অতটা খারাপ নয়, কিন্তু হাওয়ায় কঠিন, বরফে-ঢাকা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পা পড়তেই যন্ত্রণাটা এত দুর্বিষহ হল যে আর পা বাড়াবার সাহস হল না আলেক্সেই'র, থামল সে। দাঁড়িয়ে

রইল, দ্বটো পা বিচ্ছিরিভাবে ফাঁক করে, শরীরটা দ্বলছে, যেন হাওয়ায় নড়ছে। হঠাৎ ঝাপসা কুয়াশা চোখের সামনে দেখল। রাস্তা, পাইন আর পাইনগ্বলোর ধ্বসর মাথা আর তাদের মাঝখানের আকাশের নীল আয়ত টুকরোটা মিলিয়ে গেল... নিজের বিমান-ঘাঁটিতে প্রত্যাগত সে, দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গী বিমানের পাশে, নিজের বিমানটার পাশে, তার পাশে ওর মিস্ত্রী ঢেঙ্গা ইউরা, ওর দাড়িগোঁফ না-কামানো, সদা-চটুল ম্বখে দাঁত আর চোখ আগেকার মতই চিকচিক করছে, ইসারা করে আলেক্সেইকে ডাকছে ককপিটে, যেন বলছে, "ওটা তৈয়ার, রওনা হও এবার!" বিমানটার দিকে এক পা বাড়াল আলেক্সেই, কিন্তু মাটি দ্বলে উঠল, পাদ্বটো জ্বলছে, যেন গনগনে গরম ধাতুর পাতে পা পড়েছে। জ্বলন্ত মাটির টুকরোটার উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি বিমানটার পাখার দিকে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ঠাণ্ডা কাঠামোটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। অবাক হয়ে দেখল কাঠামোর পাশটা মস্ৃণ ঝকঝকে নয়, কর্কশ, যেন পাইনের ছাল দিয়ে তৈরী... কিন্তু কোন জঙ্গী বিমান নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতড়াচ্ছে একটা গাছের গ্বঁড়ি।

"বিকারের ঘোরের স্বপ্ন! মাথায় চোট লাগাতে পাগল হয়ে যাচ্ছি!" ভাবল আলেক্সেই। "এ রাস্তা ধরে গেলে দ্বর্দশার শেষ থাকবে না। রাস্তাটা ছেড়ে দেব না কি? কিন্তু তাহলে অনেক সময় লাগবে..." বরফের উপরে বসে পড়ে আগেকার মত সজোরে, হ্যাঁচকা টানে ফারব্বটদ্বটো খ্বলে, দাঁত আর নখ দিয়ে ওপর দিকটা ছিঁড়ল, যাতে ভাঙ্গা পায়ে চলা সহজ হয়, আঙ্গোরা পশমের বড়ো নরম গলাবন্ধটা খ্বলে ছিঁড়ে ফালি করে পায়ে জড়িয়ে আবার ব্বট পরল।

আগেকার চেয়ে সহজে হাঁটা যায় এখন। সেটাকে হাঁটা বলা কিন্তু ঠিক হবে না: হাঁটা নয়, সামনে এগিয়ে যাওয়া, সাবধানে এগিয়ে যাওয়া, গোড়ালির উপরে ভর দিয়ে, পায়ের পাতা অনেকখানি তুলে, কাদার উপরে লোকে যেমন করে হাঁটে। দ্ব'এক পা ফেললেই যন্ত্রণায় আর পরিশ্রমে মাথা ঘ্বরছে। থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছে আলেক্সেই, চোখ ব্বজে কোন গাছের গ্বঁড়িতে হেলান দিচ্ছে কিম্বা কোন বরফের ঢিবিতে বসে পড়ছে, শিরায় শিরায় রক্তের দপদপানির অন্বভূতি।

কয়েক ঘণ্টা এইভাবে চলল আলেক্সেই। কিন্তু ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল বনের ধারে সেই রোদে-ভরা রাস্তাটি, সেখানে মৃত উজবেকটি বরফে ছোট একটা কালো দাগের মত পড়ে আছে। ভয়ানক হতাশ লাগল ওর। হতাশ, কিন্তু ভীত নয়। ঠিক করল গতি আরো বাড়াতে হবে। বরফের ঢিবি

থেকে উঠে পড়ে, দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে চলল, কাছাকাছি সব জিনিস ওর লক্ষ্যবস্তু, সমস্ত মন তাতে নিবদ্ধ—একটা পাইন থেকে অন্য পাইনে, গাছের গুঁড়ি থেকে অন্য গুঁড়িতে, একটা বরফের ঢিবি থেকে অন্য ঢিবিতে। এগিয়ে যাচ্ছে ও, পিছনে জনহীন বনের রাস্তায় বরফের উপরে পড়ছে আঁকাবাঁকা অসমান পদচিহ্ন, আহত জন্তুর খুরের দাগের মত।

৪

সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলল। পিছনে কোথাও সূর্য অস্ত গেল, ঠাণ্ডা লাল আভা গাছের মাথায়, বনে ধূসর ছায়া ক্রমশ ঘন হচ্ছে, আলেক্সেই এসে পড়ল একটা জুনিপারকীর্ণ জায়গায়, সেখানে যা দেখল তাতে মনে হল শিরদাঁড়ায় কেউ ঠাণ্ডা ভিজে তোয়ালে বোলাচ্ছে, হেলমেটের নিচে চুল খাড়া হয়ে উঠল।

বোঝা গেল বনের ফাঁকা জায়গায় যখন যুদ্ধ চলেছিল তখন চিকিৎসা কর্মীদের একটা দলকে এখানে মোতায়েন করা হয়। আহতদের এখানে এনে শোয়ানো হয় পাইন-কাঁটার বিছানায়। ঝোপঝাড়ের আড়ালে তারা এখনো পড়ে আছে, বরফে কয়েক জনের শরীর অর্ধেক ঢাকা, আর অন্যরা একেবারে বরফের নিচে। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় জখম হয়ে ওরা মারা যায়নি। কেউ সুকৌশলে ছুরির ঘায়ে ওদের গলা কেটেছে, ওরা একইভাবে পড়ে আছে, মাথাগুলো পিছনে হেলিয়ে, যেন পিছনে কী হচ্ছে দেখবার চেষ্টা করছে। আর ভয়াবহ ঘটনাটির টীকাও সেখানে। পাইনগাছের নিচে, বরফাবৃত একটি সোভিয়েত সৈনিকের দেহের পাশে, সৈন্যটির মাথা কোলে নিয়ে, কোমর পর্যন্ত বরফে ঢাকা বসে আছে একটি নার্স, ছোট পাতলা চেহারা, মাথায় ফারের টুপি, টুপির কানদুটো ফিতে দিয়ে চিবুকের নিচে বাঁধা। কাঁধের হাড় থেকে বেরিয়ে আছে ছোরার চকচকে বাঁট। কাছে পড়ে আছে ঝঞ্ঝা বাহিনীর কালো পোশাক-পরা একটা ফ্যাশিস্ট আর মাথায় রক্তাক্ত পট্টি জড়ানো একটি সোভিয়েত সৈনিকের মৃতদেহ। মরণ আলিঙ্গনে দুজনে দুজনের টুঁটি চেপে ধরেছে। আলেক্সেই তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে কালো পোশাক-পরা সৈনিকটি আহতদের হত্যা করে, নার্সকে ছুরিকাঘাত করার সময় তখনো জীবিত সোভিয়েত সৈনিকটি ছুটে এসে নিভন্ত জীবনে যতটুকু শক্তি আছে তাতে হত্যাকারীর টুঁটি চেপে ধরে।

আর তুষার-ঝড়ে সবাই আবৃত — মাথায় ফারের টুপি ক্ষীণদেহ মেয়েটি শরীর দিয়ে আহত সৈনিকটিকে বাঁচাচ্ছে, যে হত্যা করেছে আর যে প্রতিহিংসা নিয়েছে দুজনে পরস্পরের টুঁটি চেপে মেয়েটির পায়ের নিচে পড়ে আছে মেয়েটির পায়ে বাহিনীর চওড়া পুরোনো বড়ো বুট।

পাথরের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল আলেক্সেই, তারপর খুঁড়িয়ে নার্সটির কাছে গিয়ে পিঠ থেকে ছোরাটা টেনে বের করল। ঝঞ্ঝা বাহিনীর ছোরা, প্রাচীন জার্মান তলোয়ারের ধাঁচে গড়া, মেহগনির বাঁটে ঝঞ্ঝা বাহিনীর রূপালী প্রতিচিহ্ন। মরচে-পড়া ফলকে "Alles für Deutschland" তখনো পড়া যায়। জার্মান সৈনিকের দেহ থেকে ছোরার চামড়ার খাপটা আলেক্সেই সরিয়ে নিল, যাত্রায় কাজে লাগবে ওটা। বরফের নিচে থেকে জমে-যাওয়া কঠিন বর্ষাতিটা বের করে সযত্নে নার্সকে চাপা দিল, উপরে বসাল পাইনের কয়েকটা ডাল...

তখন প্রদোষ হয়ে এসেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা মিলিয়ে গেল। নিচু জায়গাটিতে নেমে এসেছে কনকনে ঘন অন্ধকার। জায়গাটি স্তব্ধ, শুধু পাইনের মাথায় সন্ধ্যার হাওয়ার ঝাপটা আর বনের গান। কখনো কোমল ঘুম-পাড়ানো গান, কখনো বা উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের সুর। পাতলা শুকনো বরফ আর চোখে পড়ছে না বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে ঝরছে, মুখে চিমটি কাটছে, উড়ে এসে পড়ছে নিচু জায়গাটিতে।

ভলগা স্তেপের কামিশিনে আলেক্সেই'র জন্ম, সহরবাসী ও, বন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাই বনে রাত কাটাবার কিম্বা আগুন জ্বালাবার কোন বন্দোবস্ত করেনি। সূচীভেদ্য অন্ধকারে অভিভূত আলেক্সেই, ক্লান্ত ভাঙ্গা পায়ে দুর্বিষহ যন্ত্রণা, জ্বালানী কাঠ জোগাড় করার শক্তি নেই; একটি নবীন পাইনের গভীর ঝোপঝাড়ে গুড়ি মেরে গিয়ে গুটিগুটি হয়ে গাছটার তলায় বসল সে, হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতে মাথা রাখল, নিজের নিশ্বাসের উত্তাপে নিজেকে গরম করে চুপ করে বসে রইল, স্তব্ধতা আর বিরতি ভালো লাগছে।

পিস্তলের ঘোড়া ঠিক করে রাখল আলেক্সেই, কিন্তু বনে প্রথম রাত্রে সেটা ব্যবহার করতে পারত কি না সন্দেহ। এক ঘুমে রাত কেটে গেল, ওকে ঘনিষ্ঠভাবে ঘিরেছে গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার, সে অন্ধকার বনের নানা শব্দে চঞ্চল — পাইনের অবিরাম মর্মর, রাস্তার কাছে কোথাও পেঁচার ডাক, দূরে নেকড়ের চীৎকার — কিছুই কানে গেল না।

ভোরের প্রথম আলোয় হিম বিষণ্ণতায় গাছগুলোর ঝাপসা কালো কালো চেহারার আভাস দেখা যাচ্ছে, ধড়মড় করে জেগে উঠল আলেক্সেই, যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিয়েছে। জেগে উঠেই মনে পড়ল তার কী হয়েছিল, আর এখন কোথায় আছে, আর এত অনবধানতায় বনে রাত কাটিয়েছে ভেবে ভয় পেল। অসহ্য ঠাণ্ডা, ফার-দেওয়া বিমানি পোশাক ফুঁড়ে ঢুকছে, হাড় পর্যন্ত বিঁধছে। ঠকঠক করে কেঁপে উঠল আলেক্সেই, যেন কাঁপুনি দিয়ে পালাজ্বর এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে পাদুটো; নড়াচড়া না করলেও আগের চেয়ে যন্ত্রণা অনেক বেড়ে গিয়েছে। দাঁড়াতে হবে ভাবলেই আতঙ্ক। তবু দৃঢ়চিত্তে উঠল আলেক্সেই, এক ঝটকায়, যেমন করে আগের দিন পা থেকে বুটদুটো খুলে নিয়েছিল। সময় নষ্ট করা চলবে না।

আর সমস্ত যন্ত্রণার সঙ্গে শুরু হল ক্ষুধার যাতনা। আগের দিন নার্সের দেহটি বর্ষাতিতে ঢাকার সময় পাশে রেড ক্রশের একটা ছোট ক্যাম্বিশের থলি আলেক্সেই দেখে। কোন ছোট জন্তুর নজরে সেটা ইতিমধ্যেই পড়াতে দাঁত দিয়ে ফুটো করেছিল সেটা, খাবারের টুকরো ইতস্তত ছড়ানো। তখন বলতে গেলে নজরই দেয়নি আলেক্সেই, কিন্তু এখন থলিটা তুলে দেখল ভিতরে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ কয়েকটা, মাংসের বড়ো টিন, একগোছা চিঠি, ছোট্ট আয়না আর আয়নাটার পিছনে একটি শীর্ণমুখ বয়স্কা স্ত্রীলোকের ছবি। থলিতে কিছু রুটিও ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু পাখিতে কিম্বা কোন জন্তুতে সেগুলো সাবাড় করেছে। টিনটা আর ব্যাণ্ডেজগুলো বিমানি পোশাকের পকেটে রাখতে রাখতে আলেক্সেই বলল, "অনেক অনেক ধন্যবাদ," হাওয়ায় মেয়েটির পায়ের উপর থেকে বর্ষাতিটা সরে গিয়েছিল, সেটা ঠিক করে দিয়ে আস্তে আস্তে চলল পূব দিকে, ডালপালার পিছনে সেখানে আকাশ ইতিমধ্যেই কমলা রঙের আগুনে উদ্ভাসিত।

হাতে এখন এক কিলোগ্রাম মাংস মজুত, আলেক্সেই ঠিক করল দিনে একবার, দুপুরবেলায় খাবে।

৫

প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণা, তাই অন্যদিকে মন ঘোরাবার জন্য আলেক্সেই রাস্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। হিসেব করে দেখল যে দিনে দশ থেকে বারো কিলোমিটার গেলে তিন দিনে, বড়োজোর চার দিনে গন্তব্যে পৌঁছবে।

"ঠিক আছে! দশ-বারো কিলোমিটার যাওয়ার মানেটা কী? এক কিলোমিটার মানে দুহাজার বার পা ফেলতে হবে; তাহলে দশ কিলোমিটার মানে কুড়ি হাজার পা, কিন্তু সেটা ত বেশ খানিকটা, বিশেষ করে পাঁচ-ছশ পা অন্তর আমাকে থেমে বিশ্রাম করতে হবে..."

আগের দিন হাঁটার কষ্ট লাঘব করার জন্য আলেক্সেই কয়েকটা জিনিস নির্দিষ্ট করে: পাইনগাছ একটা, গাছের গুঁড়ি, কিম্বা রাস্তায় ওই গর্তটা, আর প্রত্যেকটায় যাবার চেষ্টা করে, পৌঁছিয়ে থামতে পারে যেন। এখন সমস্ত কিছু সংখ্যা হিসেবে দেখল -- ক'বার পা ফেলতে হবে তার হিসেবে। একবারে এক হাজার পা হাঁটবে ঠিক করল, তার মানে আধ কিলোমিটার, আর ঘড়ি ধরে জিরোবে, পাঁচ মিনিটের বেশী নয়। হিসেব করে দেখল কষ্ট করে সারা দিনে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দশ কিলোমিটার যেতে পারবে।

কিন্তু প্রথম এক হাজার পা কী দুঃসাধ্যই না ছিল! যন্ত্রণাটা ভুলতে পারার জন্য প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গুণে চলার চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু পাঁচশ পর্যন্ত গুণে খেই হারিয়ে গেল, তারপর শুধু দপ্‌দপে যন্ত্রণার জ্বালা, আর কিছু ভাবার নেই। তবু প্রথম এক হাজার পা সে গেল। বসবার শক্তি নেই, হুমড়ি খেয়ে সটান বরফের উপরে পড়ে গেল, দারুণ তৃষ্ণায় বরফ চাটল, কপাল আর দপ্‌দপে রগ বরফে চেপে ধরল, বরফের হিম স্পর্শে পেল অবর্ণনীয় পরিতৃপ্তি।

শিউরে উঠে আলেক্সেই ঘড়ি দেখল। সেকেন্ডের কাঁটাটি বরাদ্দ পাঁচ মিনিটের শেষ মুহূর্তকটি টিকটিক করে কমিয়ে দিচ্ছে। চলন্ত কাঁটাটির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রইল আলেক্সেই, যেন ঘুরে আসার শেষে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটবে; কিন্তু কাঁটাটা ষাটে পৌঁছল যেই, কাতরে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে, এগিয়ে চলল।

বারোটা বাজল, সূর্যের আলোর পাতলা রেখা পাইনের ঘন ডালপালা ভেদ করে পড়াতে আধো-অন্ধকার বন চিকচিক করছে, সমস্ত বন ভরে গিয়েছে আলকাতরা আর গলন্ত বরফের তীব্র গন্ধে, তখন পর্যন্ত মাত্র চার হাজার পা এগিয়েছে আলেক্সেই। শেষ এক হাজার পা চলার পর বরফের উপরে পড়ে গেল, প্রায় হাতের নাগালে একটা বড়ো বার্চগাছের গুঁড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। অনেকক্ষণ বসে রইল সে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, কিছু ভাবছে না, কিছু দেখছে না, শুনছে না, এমন কি ক্ষিধের জ্বালার সাড়াও নেই।

গভীর নিশ্বাস নিয়ে কয়েক চিমটি বরফ মুখে দিল আলেক্সেই, শরীরের ঘোর অবসাদ কাটিয়ে পকেট থেকে মাংসের টিনটা বের করে জার্মান ছোরাটা দিয়ে খুলল। এক টুকরো জমা স্বাদহীন চর্বি মুখে দিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করল, কিন্তু চর্বিটা গলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন দারুণ ক্ষিধেয় অভিভূত হল আলেক্সেই যে অতি কষ্টে মাংসের টিনটা সরিয়ে রাখতে পারল, বরফ খেতে লাগল ও, যা হোক কিছু একটা গিলতে হবে।

চলা শুরু করার আগে একটা জুনিপারগাছ থেকে একজোড়া হাঁটবার ছড়ি তৈরী করে নিল। সেদুটোয় ভর দিয়ে আলেক্সেই চলল বটে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

৬

...গভীর অরণ্যে ক্লিষ্ট যাত্রার তৃতীয় দিনে—তখন পর্যন্ত কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন চোখে পড়েনি — অপ্রত্যাশিত একটি জিনিস ঘটল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সেই জেগে উঠল, শীতে ও জ্বরে শরীর কাঁপছে। বিমানি পোশাকের একটা পকেটে সিগারেট ধরাবার একটা লাইটার পেল, রাইফেলের ফাঁকা টোটা দিয়ে বানিয়ে স্মারক-চিহ্ন হিসেবে ওটা আলেক্সেইকে তার মিস্ত্রী দিয়েছিল। ওটার কথা, আর আগুন জ্বালাতে যে পারে এবং জ্বালানো যে উচিত সমস্ত ভুলে গিয়েছিল ও। যে ফারগাছের নিচে ঘুমিয়েছিল সেটার কয়েকটা শুকনো নরম ডাল ভেঙ্গে পাইনের কাঁটার গোছায় ঢেকে আলেক্সেই আগুন লাগাল। ধূসর ধোঁয়া থেকে আচম্বিত উঠল চড়চড়ে হলুদ অগ্নিশিখা। শুকনো রজনাক্ত কাঠ চটপট জ্বলছে। আগুনের শিখা পাইনের কাঁটায় পৌছতে হাওয়া লেগে হিসহিস চড়চড় শব্দে ঝলসে উঠল সেগুলো।

হিসহিস চড়চড় করে আগুন জ্বলছে, ছড়াচ্ছে শুকনো, আরামী উত্তাপ। আরামের মৌতাতে আচ্ছন্ন হয়ে এল আলেক্সেই। বিমানি পোশাকের জিপার টেনে টিউনিকের পকেট থেকে কয়েকটা ছেঁড়াখোঁড়া চিঠি বের করল, একই হাতে সব কটি লেখা। তার একটাতে পেল সেলোফেনে মোড়া পাতলা একটি মেয়ের ছবি, পরনে ফুল-তোলা ফ্রক, পা গুটিয়ে ঘাসে বসে আছে। কিছুক্ষণ

ছবিটার দিকে তাকিয়ে তারপর সেলোফেনে আবার মুড়ে খামে পুরল আর এক মুহূর্ত ভেবে সেটাকে ধরে রেখে পকেটে রাখল।

"কিছু ভেবো না, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আবার," নিজেকে না মেয়েটিকে বলল, সেটা বলা কঠিন। চিন্তান্বিতভাবে আবার বলল, "কিছু না..."

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে এবারে ফারবুটদুটো ঝট করে খুলে ফেলে, পশমের গলাবন্ধের ফালি সরিয়ে, পাদুটো ভালো করে দেখল সে। আরো ফুলে গিয়েছে, আঙুলগুলো ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে: রবারের ফাঁপানো থলির মত দেখাচ্ছে পাদুটোকে, আগের দিনের চেয়ে কালো তাদের রং।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নিভে-আসা আগুনের দিকে বিদায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলেক্সেই আবার কোনক্রমে চলল। ছড়ির চাপে শক্ত বরফের শব্দ। ঠোঁট কামড়ে এগিয়ে চলল সে, মাঝেমাঝে প্রায় বেঘোরের মত। বনের নানা সাধারণ শব্দে সে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে বলতে গেলে প্রায় শুনতেই পেত না, সে সব শব্দ হঠাৎ ভেদ করে এল মোটর ইঞ্জিনের দূর ধকধক আওয়াজ। প্রথমে মনে হল সেটা ক্লান্তিজনিত বিকার মাত্র, কিন্তু বেড়েই চলল শব্দটা, প্রথম গিয়ারে দেওয়াতে কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে। নিশ্চয়ই ওরা জার্মান, আর ও যে দিকে যাচ্ছে সেই দিকেই ওরা অগ্রসর। পেটের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এল আলেক্সেই'র।

ভয় ওকে জোগাল শক্তি। ক্লান্তি আর পায়ের যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে একটা ফারের ঝোপের দিকে গেল সে। একেবারে ভিতরে ঢুকে ধপ করে শুয়ে পড়ল বরফের উপরে। রাস্তা থেকে ওকে দেখা কঠিন অবশ্য, কিন্তু রাস্তাটা স্পষ্টভাবে ও দেখতে পারছে দুপুরের আলোয়, মধ্যদিনের সূর্য তখন ফারগাছের মাথার দাঁতওয়ালা বেড়ার অনেক উঁচুতে।

শব্দ আরো কাছে এল। আলেক্সেই'র মনে পড়ে গেল যে রাস্তা ছেড়ে চলে এসেছে তাতে ওর পায়ের একলা দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ে, কিন্তু এখন আরো সরে যাবার চেষ্টা করার সময় নেই, সামনের গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ খুব কাছে এসে পড়েছে। বরফে আরো ঘেঁষে শুল ও। ডালপালার মধ্যে দিয়ে দেখল একটা চেপটা, গোঁজের আকারের শাদা রঙের সাঁজোয়া গাড়ি। আলেক্সেই'র পায়ের দাগ যেখানে রাস্তা ছেড়ে এসেছে তার খুব কাছে দুলতে দুলতে শেকল ঝনঝনিয়ে গাড়িটা এল। নিশ্বাস চেপে রইল আলেক্সেই। সাঁজোয়া গাড়িটা এগিয়ে গেল। পিছনে এল একটা মোটরগাড়ি। চালকের

পাশে বসে আছে একজন, উ'চু টুপি মাথায়, বাদামী ফারের কলারে নাকের সবটা ঢাকা, আর তার পিছনে কয়েকজন সাব-মেসিনগানার, পরনে শীতকালীন সবজে ধূসর বড়ো ফৌজী কোট, মাথায় ইস্পাতের হেলমেট, উ'চু বেঞ্চিতে বসে আছে সবাই, গাড়ির গতির তালে এপাশ ওপাশ দুলছে। আরো বড়ো একটা সাঁজোয়া গাড়ি সবচেয়ে পিছনে, ইঞ্জিনটা গর্জাচ্ছে. শেকলগুলো ঝনঝন করে উঠছে। প্রায় পনেরো জন জার্মান তাতে সার বে'ধে বসে।

বরফে আরো চিপটে শুল আলেক্সেই। গাড়িগুলো এত কাছে এল যে চোঙের গ্যাসের ধোঁয়া মুখে চোখে লাগছে। আলেক্সেই'র ঘাড়ের লোম সব খাড়া হয়ে উঠল, পেশীগুলো সংকুচিত হয়ে যেন আঁটোসাঁটো বলের মত হয়ে গেল। কিন্তু গাড়িগুলো সবেগে চলে গেল, গ্যাসের ধোঁয়াও গেল মিলিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিনের শব্দ প্রায় আর শোনা যায় না।

সব শব্দ মিলিয়ে গেলে আবার রাস্তায় গেল আলেক্সেই, গাড়ির চাকার দাগ স্পষ্টভাবে পড়েছে সেখানে, সেই দাগ ধরে চলল পুবমুখো। আগেকার মত মেপে জুকে এগোচ্ছে, বিশ্রাম করছে, আগেকার মতই খাচ্ছে, বরাদ্দ যাত্রার অর্ধেকটা কেটে গেল। কিন্তু এবারে চলেছে বুনো জানোয়ারের মত, অতি সন্তর্পণে। সতর্ক কানে আসছে সামান্য খসখস শব্দটুকু, এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে, যেন সে হুশিয়ার যে কোন বড়ো হিংস্র জন্তু কাছাকাছি কোথাও ওঁৎ পেতে বসে আছে।

আলেক্সেই বৈমানিক, আকাশ-যুদ্ধেই অভ্যস্ত, এই প্রথম অক্ষত জীবিত শত্রুকে দেখল জমির উপরে। এখন ওদের চিহ্নরেখা ধরে চলতে চলতে আক্রোশের হাসি হাসল আলেক্সেই! সময় ওদের ভালো কাটছে না, যে জায়গা ওরা দখল করেছে সেখানে কোন আরাম, আতিথেয়তা মিলছে না। এমন কি এই গভীর বনেও, যেখানে তিন দিনের মধ্যে কোন মানুষের চিহ্ন ও দেখেনি, ওদের অফিসারকে এত পাহারাদার নিয়ে যেতে হয়।

"ভেবো না কিছু, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে!" নিজেকে খোশ করার জন্য আলেক্সেই বলে এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে, ভোলবার চেষ্টা করল যে পায়ের যন্ত্রণাটা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে, নিজের শক্তিও স্পষ্ট কমে আসছে। নবীন ফারগাছের ছাল সে চিবিয়ে চিবিয়ে গিলছে. বার্চের তেতো কুঁড়ি আর নবীন লিণ্ডেনের নরম চটচটে ছাল চিয়ুং-গামের মত মুখে রয়েছে, কিন্তু ক্ষিধে তাতে আর বশ মানছে না।

অন্ধকার যখন হয়ে এল তখন কোনক্রমে যাত্রার পাঁচটি পর্যায় কেটেছে। রাত্রে পাইনের অনেক ডাল আর শুকনো জ্বালানী কাঠ জড়ো করে একটা মাটিতে-পড়া বড়ো আধো-পচা বার্চের গুঁড়ির চারিধারে বড়ো করে আগুন জ্বালাল আলেক্সেই। লাল আভায় গুঁড়িটা পুড়ছে. উত্তাপটা বেশ আরামের. গা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমল সে সঞ্জীবনী উত্তাপ অনুভব করে। মাঝেমাঝে এপাশ ওপাশ ফিরে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে গুঁড়ির পাশে অলসভাবে জ্বলন্ত আগুনে জ্বালানী কাঠ দিল কয়েকবার।

মাঝরাতে তুষার-ঝড় শুরু হল। মাথার উপরে পাইনগুলো দুলে দুলে উঠে সরসর আর কিচকিচ নানা আওয়াজে উৎকণ্ঠায় গোঙাতে লাগল। ক্ষুরধার বরফের কুচি সব মাটি ঘেঁষে ছুটে চলেছে। চড়চড়ে চকচকে আগুনের চারিধারে ঘুরছে শব্দমুখর অন্ধকার। তুষার-ঝড়ে কিন্তু আলেক্সেই'র বিশ্রাম ব্যাহত হল না, আগুনের উত্তাপে গভীর নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন।

বনের পশুরাও কাছে এল না আগুনের ভয়ে। আর জার্মানরা — এরকম রাত্রে ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। তুষার-ঝড়ে বনের গভীরে আসার সাহস ওদের নেই। যাই হোক না কেন, ধুমন্ত উত্তাপে ক্লান্ত শরীর আরামে এলিয়ে দিলেও আলেক্সেই'র কানে সবকিছু শব্দ আসছে, সে কান বনের জীবজন্তুর সতর্কতা এরিমধ্যে আয়ত্ত করেছে। ভোরের ঠিক আগে তুষার-ঝড়ের প্রকোপ তখন কমে গিয়েছে, ঘন শাদা কুয়াশা নিস্তব্ধ বনে নামল, আলেক্সেই'র মনে হল যে দোদুল্যমান পাইনের সরসর আওয়াজ আর পড়ন্ত বরফের নরম ঝুরঝুর শব্দ ভেদ করে সে শুনতে পারছে যুদ্ধের দূরাগত নানা শব্দ, বিস্ফোরণের আওয়াজ, মেসিনগানের দমক আর রাইফেলের ডাক।

"যুদ্ধের লাইন এত কাছে হতে পারে? এত শীগগির?"

৭

কিন্তু সকালে কুয়াশা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল; রাত্রে বনে এসেছিল রূপালী রঙ, এখন সূর্যের আলোয় বনটি বরফে চিকচিক করে উঠছে, আর যেন এই হঠাৎ রূপান্তরে খুসি হয়ে পাখিরা কিচকিচ কিচির মিচির শুরু করল, গান গেয়ে উঠল আসন্ন বসন্তের আগমনীতে। একাগ্রে কান পেতেও

যুদ্ধের কোন আওয়াজ আলেক্সেই আর শুনতে পেল না, না রাইফেলের ডাক না কামানের গুরু গুরু গর্জন।

আলোয় বরফের কণা স্ফটিকের মত উজ্জ্বল, গাছ থেকে শাদা ধোঁয়াটে স্রোতে গড়িয়ে পড়ছে। এখানে সেখানে ভারী ফোঁটা বরফে পড়ছে পাতলা টপটপ শব্দে। বসন্ত! এই প্রথম এত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বসন্ত তার আগমন বার্তা ঘোষণা করল।

টিনের মাংসের সামান্য বাকিটুকু সকালে খাবে ঠিক করল আলেক্সেই -- সুস্বাদু চর্বিতে ঢাকা মাংসের ফেঁসো মাত্র — না খেলে ওঠবার শক্তি হবে না বলে ওর মনে হল। তর্জনী দিয়ে সারা টিনটা চেঁচে পুঁছে সাফ করল, টিনটার এবড়োখেবড়ো ধারে লেগে হাতটা কয়েক জায়গায় কেটে গেল বটে, কিন্তু ওর মনে হল এখনো চর্বির কিছু টুকরো বাকি আছে। বরফে টিনটা ভরে, নিভন্ত আগুন থেকে পাঁশুটে ছাই চেঁচে সরিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে ওটাকে বসাল সে। পরে পরম তৃপ্তিতে গরম জলটা খেল, তাতে মাংসের অল্প আস্বাদ। তারপরে পকেটে রাখল টিনটা, চা বানাতে কাজ দেবে। গরম চা! আবিষ্কারটা প্রীতিকর, ওটার কথা ভেবে আবার যাত্রা শুরু করার সময় মেজাজটা একটু ভালো হল।

কিন্তু পথে নেমেই বিরাট হতাশার মুখোমুখি হল আলেক্সেই। তুষার-ঝড়ে রাস্তাটা একেবারে মুছে গিয়েছে, ঢালু ধারালো মাথার মত দেখতে বরফের স্তূপে পথ বন্ধ। একঘেয়ে নীলচে তীব্র আলোয় চোখে ধাঁধা লাগে। নরম বরফে পা বসে যাচ্ছে, বহু কষ্টে টেনে তুলতে পারছে আলেক্সেই। ছড়িদুটোয় বলতে গেলে কোন কাজই দিচ্ছে না, বরফে অনেকখানি ডুবে যাচ্ছে।

দুপুর হল, গাছের নিচের ছায়া কালো হয়ে এল, গাছের উপর থেকে সূর্যের আলো পড়েছে বনের মধ্যে, ততক্ষণে মাত্র পনেরো শ পা এগিয়েছে আলেক্সেই, এত ক্লান্ত যে প্রত্যেকটি পা ফেলার জন্য সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করতে হচ্ছে। মাথা ঘুরছে। পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে। প্রায়ই পড়ে যাচ্ছে সে, কোন বরফের স্তূপের উপরে এক মুহূর্ত নিশ্চল শুয়ে থেকে খরখরে বরফে মাথা গুঁজে, আবার উঠে কয়েক পা যাচ্ছে। অদম্য আগ্রহ হচ্ছে ঘুমোবার, শুয়ে পড়ার, সবকিছু ভুলে যাবার, একেবারে নড়াচড়া না করার। যা ঘটবার ঘটুক! থেমে গেল আলেক্সেই, দাঁড়িয়ে রইল অসাড় হয়ে, এপাশ ওপাশ দুলছে, তারপরই এত জোরে ঠোঁট কামড়াল যে ব্যথা

হল, আবার নিজেকে সামলে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল, কোনক্রমে পাদুটো ঘষড়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত তার মনে হল আর হাঁটতে পারবে না, কোন কিছুতে তাকে একচুল নড়াতে পারবে না এখান থেকে, একবার যদি বসে পড়ে তাহলে উঠতে পারবে না আর। চারিদিকে ব্যগ্রভাবে তাকাল আলেক্সেই। রাস্তার ধারে একটা নবীন বাঁকা পাইনগাছ। শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে একটু এগিয়ে গাছের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলেক্সেই। ডালের সন্ধিস্থানে চিবুকের ভর রাখল। তাতে ভাঙ্গা পায়ের ভার কিছুটা কমে যাওয়াতে একটু আরাম লাগল। টান-টান ডালে ভর দিয়ে বিশ্রাম করতে বেশ লাগছে। আরো যাতে আরাম পায় তার জন্য প্রথমে এক পা টেনে নিল, তারপরে অন্য পাটা, ডালের সন্ধিস্থানে তখনো চিবুক লাগানো, শরীরের ভারমুক্ত পাদুটো সহজেই বরফের স্তূপ থেকে উঠে এল। আলেক্সেই'র মাথায় হঠাৎ চমৎকার একটি ফন্দি জাগল।

"সত্যি ত! গাছটাকে সহজেই কেটে, সব ছেঁটে ডালের শুধু ফেঁকড়াটা রেখে তাতে চিবুক দিয়ে শরীরের ভার রেখে পা ফেলা যাবে, ঠিক এখন যা করছি। তাহলে সহজে হাঁটা যাবে। তাড়াতাড়ি যেতে পারব না বটে, কিন্তু এত ক্লান্ত লাগবে না, আর বরফের স্তূপ কখন বসে যাবে আর শক্ত হবে তার অপেক্ষা না করেই এগিয়ে যেতে পারব।"

হাঁটু গেড়ে বসে সে ছোরা দিয়ে নবীন গাছটাকে কাটল, ডালপালা ছিঁড়ে ফেলে পকেটের রুমাল আর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঠেকনোটাকে জড়িয়ে তক্ষুণি রওনা দিল। ঠেকনোটাকে এগিয়ে দিয়ে ডালের ফেঁকড়ায় চিবুক আর হাতদুটোর ভর দিয়ে এক পা ফেলছে, তারপর অন্যটা, আবার ঠেকনোটা এগিয়ে দিচ্ছে, দু পা এগোচ্ছে। এইভাবে চলল সে, পা গুণে গুণে, যাবার গতির নতুন একটা মাত্রা ঠিক করে।

গভীর বনে একজন এরকম অদ্ভুতভাবে চলেছে, ঘন বরফ স্তূপের উপরে মন্থর গতিতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হেঁটে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এগোল, কেউ দেখলে নিশ্চয় অবাক হত। কিন্তু এই বিচিত্র যাত্রা শুধু দেখল হাঁড়িচাঁচাগুলো; আর এই অদ্ভুত, তিনঠেঙ্গো বেঢপ জীবটি যে তাদের কোন ক্ষতি করবে না সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা ও কাছে এলে উড়ে গেল না মোটেই, শুধু লাফিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পথ ছেড়ে

দিল, মাথা হেলিয়ে কালো কৌতূহলী গুটি গুটি চোখ মেলে ঠাট্টার ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

৮

দুদিন ধরে বরফ-ঢাকা রাস্তায় এইভাবে নেংচিয়ে চলল আলেক্সেই, ঠেকনোটা এগিয়ে দিয়ে, তাতে ভর করে, পাদুটো টেনে নিয়ে। এতক্ষণে পাতাদুটো একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছে, কোন বোধ নেই, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে শরীরটা যন্ত্রণায় শিটিয়ে উঠছে। ক্ষিধের জ্বালা আর নেই। পেটের খিচুনি আর তীক্ষ্ম যন্ত্রণা একটানা ভারী একটা ব্যথার অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে, যেন খালি পেটটা খামচি দিয়ে দুপাশে চাপ দিচ্ছে।

আলেক্সেই'র আহার্য শুধু বিশ্রামের সময়ে ছোরা দিয়ে গাছ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া কচি পাইনের ছাল, বার্চ আর লাইমের কুঁড়ি, আর নরম সবুজ শ্যাওলা, বরফের নিচ থেকে খুঁড়ে বের করে গরম জলে ফুটিয়ে সেটা সে খায় রাত্রে। মাঝেমাঝে বরফ যেখানে গলে গিয়েছে সেখান থেকে বিলবেরির চকচকে পাতা জড়ো করে তা থেকে "চা" বানিয়ে খাওয়াটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার ওর কাছে। উষ্ণ পানীয়তে সমস্ত শরীর গরম হয়ে যায়, এমন কি চরম পরিতৃপ্তির মত একটা অনুভূতি হয়। উষ্ণ পানীয়তে পাতা আর ধোঁয়ার গন্ধ, আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে আরাম লাগে ওর, যাত্রাটা আর এত দীর্ঘ ও ভয়াবহ মনে হয় না।

যাত্রার ষষ্ঠ রাত্রিতে বিশ্রামের সময় আলেক্সেই আবার একটি বড়ো ফারগাছের সবুজ তাঁবুর নিচে শুল, একটা বুড়ো রজনাক্ত গাছের গুঁড়ি ঘিরে আগুন জ্বালাল, ওর হিসেবে ওটা সারা রাত জ্বলবে আর তাপ দেবে। তখনো অন্ধকার হয়নি। উপরে গাছের মাথায় অদৃশ্য একটি কাঠবিড়ালী খুব ব্যস্ত, ফারের মোচা কুড়ে কুড়ে খোসাগুলো মাটিতে ফেলছে। আলেক্সেই'র মাথায় তখন খালি খাবারের চিন্তা, ভাবল ফারের মোচায় কাঠবিড়ালীটা কী পাচ্ছে। একটা দানা তুলে আঁশ ছাড়িয়ে দেখল যোয়ারের দানার মত ছোট একটা বীজ। দেখতে দেবদারুর ছোট্ট বাদামের মত। বীজটা মুখে দিয়ে দাঁত দিয়ে ভাঙ্গল, তাতে দেবদারু তেলের সুগন্ধ।

এদিক এদিকে ছড়ানো কয়েকটা ফার ফল তুলে আলেক্সেই আগুনের কাছে সেগুলোকে রাখল, একমুঠো জ্বালানী কাঠ দেওয়াতে উত্তাপে

মোচাগুলোর মুখ ফাঁক হয়ে গেল, সেগুলোকে ঝেড়ে বীজগুলো হাতে ঘসে খোসাগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বাদামগুলো মুখে দিল।

বনের চাপা গুনগুনানি। রজনাক্ত গাছের গুঁড়িটা আস্তে আস্তে জ্বলছে, তার নরম সুগন্ধি ধোঁয়া আলেক্সেইকে ধূপের কথা মনে করিয়ে দিল। ক্ষীণ শিখাগুলো কাঁপছে, দপ করে জ্বলে উঠে ঢিমিয়ে যাচ্ছে, তাতে আলোর বৃত্তে সোনালী পাইন আর রুপালী বার্চগুলোর গুঁড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠে আবার গুঞ্জরিত অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আগুনে আরো কিছু জ্বালানী কাঠ ফেলে, আরো কয়েকটা ফার-ফল আলেক্সেই ভাঙ্গল। দেবদারু তেলের গন্ধে শৈশবের বহুদিন-বিস্মৃত একটি দৃশ্য মনে পড়ল... ছোট একটা ঘর, পরিচিত জিনিসে ঠাসা। ছাত থেকে ঝুলছে আলো, তার নিচে টেবিল। উৎসবের পোশাক পরনে ওর মা সন্ধ্যার প্রার্থনা থেকে সবেমাত্র ফিরে সিন্দুক থেকে গম্ভীরভাবে কাগজের থলে বের করে দেবদারুর বাদাম বাটিতে ঢালছেন। টেবিল ঘিরে বসেছে বাড়ির সবাই — মা, ঠাকুমা, ওর দুজন ভাই, ও নিজে, সবচেয়ে ছোট ও — খুব আড়ম্বরে শুরু হচ্ছে দেবদারুর বাদাম ভাঙ্গা -- উৎসবের অঙ্গ সেটা। কথা বলছে না কেউ। ঠাকুমা চুলের কাঁটা দিয়ে শাঁস দেখছেন, মাও তাই করছেন একটা কাঁটা দিয়ে। দাঁত দিয়ে সুকৌশলে মা খোলাগুলো ভেঙ্গে শাঁস বের করে টেবিলে জড়ো করছেন; যখন বেশ একটা স্তূপ হল তখন এক নিমেষে হাতের মুঠোয় সেটাকে নিয়ে সবটা একটি ছেলের খোলা মুখে দিয়ে দিলেন, কপাল ভালো সে ছেলেটির, মা'র হাতের ছোঁয়াচ ঠোঁটে লাগল; হাতটা কর্কশ, পরিশ্রমে জীর্ণ, কিন্তু উৎসবের দিন বলে সুগন্ধী সাবানের সুরভি তাতে।

কামিশিন!.. ছেলেবেলা! সহরের উপকণ্ঠে ছোট্ট বাড়িটাতে দিন কাটত আরামে!

কিন্তু এখানে, বনের গুনগুনানির মধ্যে মুখ জ্বলছে, পিঠে লাগছে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। অন্ধকারে পেঁচার ডাক; শেয়ালের আওয়াজ কানে এল। আগুনের কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসে, নিভন্ত কম্পমান শিখার দিকে চিন্তান্বিতভাবে তাকিয়ে আছে ক্ষুধার্ত, আহত, চরম ক্লান্ত একটি মানুষ, গভীর বিরাট এই বনে একাকী, সামনে অন্ধকারে পড়ে আছে অপ্রত্যাশিত বিপদ বিঘ্নসঙ্কুল অজানা পথ।

"ভেবো না কিছু, সব ঠিক হয়ে যাবে!" হঠাৎ বলল মানুষটি, আর

আগুনের শেষ, লাল কম্পমান শিখার আলোয় ওর ফাটা ঠোঁট কী একটা সুদূর ভাবনার হাসিতে ফাঁক হয়ে গেল।

৯

তুষার-ঝড়ের রাত্রে কোন খান থেকে দূরের যুদ্ধের আওয়াজ এসেছিল, সপ্তম দিনে আলেক্সেই সেটা বুঝতে পারল।

শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, প্রতি মুহূর্তে বিশ্রামের জন্য থেমে আলেক্সেই বনের রাস্তা ধরে কায়ক্লেশে চলেছে, বরফ গলতে শুরু করেছে রাস্তায়। বসন্তের দূরের হাতছানি আর নয়, আদিম অরণ্যে বসন্ত এখন অভ্যাগত। উষ্ণ দমকা হাওয়া বইছে, সূর্যের উজ্জ্বল আলো ডালপালা ভেদ করে ছোট পাহাড় আর ঢিপি থেকে বরফ ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিচ্ছে, সন্ধ্যাবেলায় বড়ো বড়ো কাকের বিষণ্ণ ডাক, রাস্তার বুক এখন বাদামী, তার উপরে মন্থর ধীর দাঁড়কাকেরা বসে, মৌমাছির চাকের মত সচ্ছিদ্র ভিজে বরফ এখন, গলন্ত বরফের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট চিকচিকে ডোবা, আর সেই বলিষ্ঠ মাদক গন্ধ, যে গন্ধ সমস্ত জীবকে আনন্দে অধীর করে দেয়।

বছরের এই সময়টা আশৈশব আলেক্সেই'র প্রিয়, আর এখনো ভিজে থলথলে ফারবুট-পরা ক্লিষ্ট পায়ে জল ঠেলে যেতে যেতে যদিও ক্ষিধেয় আর যন্ত্রণায় আর ক্লান্তিতে চেতনা লোপ পাচ্ছে, জলের ডোবা, তলতলে বরফ আর কাদাকে শাপান্ত করছে, তবুও এই সোঁদা, মাতাল-করা সুগন্ধি হাওয়া প্রাণ ভরে ঘ্রাণ করছে ও। জলের ডোবায় পথ বেছে আর চলছে না আলেক্সেই, হোঁচট খেয়ে পড়ছে, উঠে ঠেকনোতে জোরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে আর শক্তি সঞ্চয় করে ঠেকনোটা আবার যতখানি পারে এগিয়ে দিয়ে পূবমুখো চলেছে মন্থরভাবে।

বনের রাস্তাটা একটা জায়গায় হঠাৎ বামে ঘুরেছে, সেখানে গিয়ে আচম্বিতে আলেক্সেই থেমে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। একটু এগিয়ে পথটা ভয়ানক অপরিসর, দুধার থেকে পাইনের ঘন নবীন ঝাড় যেন চেপে ধরেছে, সেখানে ও দেখল জার্মান গাড়িগুলো, যেগুলো কিছুদিন আগে ওকে পেরিয়ে চলে এসেছিল। ওদের রাস্তা আটকেছে দুটো প্রকাণ্ড পাইন। গাছদুটোর সামনে দাঁড়িয়ে গোঁজের মত চেহারার সাঁজোয়া গাড়িটা, রেডিয়েটরটা দুটো গাছের মধ্যে আটকানো, রংটা আর যেমন-তেমন গোছের শাদা দাগওয়ালা নয়, মরচে লাল; টায়ার-বিহীন চাকার উপরে নিচু হয়ে

গাড়িটা দাঁড়িয়ে, টায়ারগুলো পুড়ে গিয়েছে। বরফের উপরে গাছের নিচে গাড়ির বুরুজটা পড়ে আছে অতিকায় ব্যাঙের ছাতার মত। কাছে তিনটি লাশ -- গাড়ির চালকরা — খাটো কালো তৈলাক্ত টিউনিক পরনে, মাথায় কাপড়ের হেলমেট।

মোটর গাড়িদুটো, তাদের রংও মরচে লাল আর পোড়াটে, সাঁজোয়া গাড়ির পিছনে গলন্ত বরফের উপরে দাঁড়িয়ে; ধোঁয়ায়, ছাই'এ আর পোড়া কাঠে বরফ কালো হয়ে গিয়েছে। চারিধারে, রাস্তার পাশে, ঝোপঝাড়ের নিচে, গর্তে গর্তে জার্মান সৈনিকদের মৃতদেহ। বোঝা গেল দারুণ আতঙ্কে ছুটোছুটি করেছিল ওরা, প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি ঝোপ তখন তুষার-ঝড়ের বরফে আচ্ছাদিত, তার পিছন থেকে মৃত্যু হানা দিয়েছে, কী ঘটছে ঠিক বোঝার আগেই ওরা নিহত হয়েছে। অফিসারটির পাৎলুনবিহীন দেহ গাছের সঙ্গে বাঁধা। ওর কালো কলারওয়ালা সবুজ টিউনিকে এক টুকরো কাগজ পিন দিয়ে লাগানো, তাতে লেখা: "যা চেয়েছিলে তাই মিলেছে", আর তার নিচে অন্য হাতে পাকা পেন্সিলে লেখা - "কুত্তা"।

কিছু খাবার মেলে কিনা এই যুদ্ধভূমিতে আলেক্সেই তার খোঁজ করল। পেল শুধু এক টুকরো ছাতা-পড়া বাসি রুটি, বরফে পায়ের চাপে পেষা, পাখিতে ঠুকরে খেয়েছে। তৎক্ষণাৎ মুখে দিল সেটা আলেক্সেই, আর দারুণ লোভে গমের রুটির টকটক গন্ধ শুঁকল। ইচ্ছে করছিল সবটা মুখে পুরে সুগন্ধি তলতলে রুটিটা চিবিয়েই চলে, কিন্তু ইচ্ছেটা দাবিয়ে রুটিটাকে তিন টুকরো করল, নিচের পকেটে দু টুকরো গুঁজে রেখে তৃতীয়টি গুঁড়ো করে প্রতিটি গুঁড়ো চুষতে শুরু করল, যেন মিঠাই একটা, চুষে যতক্ষণ আনন্দ পাওয়া যায় তাই ভালো।

আর একবার যুদ্ধদৃশ্যটি দেখল আলেক্সেই, আর হঠাৎ মনে হল: "কাছাকাছি নিশ্চয়ই পার্টিজানেরা আছে! ওদের পায়ের চাপেই ঝোপঝাড়ে আর গাছের চারিদিকে বরফ তলতলে হয়ে গিয়েছে! হয়ত ইতিমধ্যেই ওকে মৃতদেহের মধ্যে ঘুরতে দেখেছে ওরা, আর ফারগাছের মাথায় বসে কিম্বা কোন ঝোপের পিছন থেকে কোন পার্টিজান চর হয়ত ওকে লক্ষ্য করছে?" মুখের কাছে দুটো হাত জোড় করে প্রাণপণে চেঁচাল আলেক্সেই, 'হো, পার্টিজান, পার্টিজান!'

নিজের ক্ষীণ আর দুর্বল কণ্ঠস্বরে আলেক্সেই বিস্মিত হল। বনের

গভীর থেকে প্রতিধ্বনি এল, গাছের গুঁড়িতে লেগে আবার প্রতিধ্বনি উঠল, এমন কি সেটাও তার কণ্ঠস্বরের চেয়ে জোরালো।

'পার্টিজান, হো, পার্টিজান!' শত্রুদের মূক মৃতদেহের মধ্যে কালো চটচটে বরফে বসে বারবার চেঁচাল সে।

কান পেতে রইল উত্তরের প্রত্যাশায়। ওর গলা কর্কশ, ভেঙ্গে গিয়েছে, ও বুঝতে পারল যে নিজেদের কাজ সেরে, যা নেবার তা নিয়ে পার্টিজানেরা অনেক দিন চলে গিয়েছে — সত্যি ত এই পরিত্যক্ত শূন্য জায়গায় থেকে যাবার কোন অর্থ নেই — কিন্তু ডেকেই চলল আলেক্সেই, অলৌকিক কিছু ঘটবে সেই প্রত্যাশায়, ওর আশা এই যে, দাড়িওয়ালা যে লোকদের এত গল্প সে শুনেছে তারা হঠাৎ ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে ওকে তুলে এমন কোথাও নিয়ে যাবে যেখানে সারাদিন না হোক অন্তত একঘণ্টা কিছু না ভেবে, কোথাও যাবার চেষ্টা না করে জিরোতে পারবে ও।

বন থেকে কেঁপে কেঁপে ফিরে এল প্রতিধ্বনি। কিন্তু হঠাৎ পাইনের গভীর সুরেলা গুনগুন ছাপিয়ে ও শুনল, অন্তত মনে হল যে শুনেছে — এমন একাগ্রভাবে কান পেতে ছিল ও — ভারী দ্রুত ধপ ধপ শব্দ, কখনো বেশ স্পষ্ট, কখনো বা ক্ষীণ, তালগোল পাকানো। চমকে উঠল আলেক্সেই, যেন দূর থেকে কোন বন্ধুর ডাক এই শূন্যতায় তার কাছে পৌঁছিয়েছে। নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, গলা বাড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ একাগ্রভাবে শুনল।

না, ভুল হয়নি ওর। পূব থেকে বওয়া আর্দ্র হাওয়া তার কাছে আনল কামানের দূর গর্জন; আর শব্দটা অন্যরকম, দুটো বিপক্ষ দল ট্রেঞ্চ বানিয়ে আত্মরক্ষার দৃঢ় ব্যূহ রচনা করে পরস্পরকে উত্ত্যক্ত করার জন্য একটানা গুলির বিনিময় করছে, গত কয়েক মাস ধরে শোনা সে রকম শব্দের মত ঢিমে আর খাপছাড়া নয়। শব্দটা দ্রুত আর সুতীব্র, মনে হচ্ছে কে যেন ভারী পাথর গড়িয়ে ফেলছে, কিম্বা উল্টোনো ওকের পিপের তলায় ঘুষি মারছে।

সত্যিই ত! ঘোর কামান যুদ্ধ চলেছে। শব্দের ধরনে মনে হয় যুদ্ধের সীমান্ত দশ কিলোমিটারের মধ্যেই হবে, গুরুতর কিছু একটা ঘটছে ওখানে, কারা আক্রমণ চালিয়েছে আর কারা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করছে। আনন্দে আলেক্সেই'র গাল বেয়ে নামল চোখের জল।

পূব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল আলেক্সেই। এটা সত্যি যে ও যেখানে এখন দাঁড়িয়ে সেখানে পথটা হঠাৎ ঘুরে উল্টো দিকে গিয়েছে, সামনে

বরফের আস্তরণ; কিন্তু পূব দিক থেকেই শব্দের আমন্ত্রণ আসছে: ওই দিকেই গিয়েছে পার্টিজানদের পায়ের কালো কালো দাগ: ওখানেই কোথাও থাকে বনের বীরেরা।

আর আলেক্সেই বিড়বিড় করে বলল, "ভেবো না কিছু, সব ঠিক, দোস্ত, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" সজোরে ঠেকনোটা ফেলে চিবুক রেখে শরীরের সমস্ত ভার তাতে দিয়ে, বরফের উপরে একটা পা রাখল, তারপর আর একটা, আর রাস্তা ছেড়ে বেশ কষ্টে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলল।

১০

সে দিন বরফের উপরে এমন কি দেড় শ পাও এগোতে পারল না আলেক্সেই। অন্ধকার হওয়াতে থেমে যেতে হল। আবার পুরোনো একটা গাছের গুঁড়ি বেছে, চারদিকে জ্বালানী কাঠ বসিয়ে, টোটায় তৈরী সিগারেট লাইটারটা বের করে ছোট ইস্পাতের চাকাটা ঘোরাল, আর একবার ঘোরাল — তারপর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল; তেল নেই লাইটারে। ওটাকে ঝাঁকিয়ে ভিতরে ফুঁ দিল যাতে বাকি গ্যাসটুকু জ্বলে ওঠে, কিন্তু কিছু হল না। রাত্রি এল। বিদ্যুতের ক্ষণচ্ছটার মত চকমকির পাথর থেকে ছিটকে বেরিয়ে-আসা ফুলকিতে নিমেষের জন্য মুখের কাছের অন্ধকার হটে গেল। বারবার চাকাটায় ঝটকা দিচ্ছে আলেক্সেই, অবশেষে চকমকির পাথরটা একেবারে ক্ষয়ে গেল, আগুন জ্বালানো গেল না।

হাতড়ে কচি পাইনগাছের একটা ঝাড়ে গেল ও, সেখানে গুটিগুটি হয়ে বসে, হাঁটুতে চিবুক রেখে হাঁটুদুটো জড়িয়ে চুপচাপ বসে রইল, বনের শনশন শব্দ কানে আসছে। সে রাত্রে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারত আলেক্সেই, কিন্তু ঘুমন্ত বনে কামানের ডাক আরো স্পষ্টভাবে কানে এল, আর ওর মনে হল যে গোলা ফাটার গুমগুম আওয়াজের মধ্যে রাইফেলের খরখর শব্দ আলাদা করে শোনা যাচ্ছে।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল উৎকণ্ঠা আর বিষাদের একটা অজানিত অনুভূতিতে। তক্ষুণি সে জিজ্ঞেস করল নিজেকে, "কারণটা কী? কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছি?" মনে পড়ল — সিগারেট লাইটারটা। কিন্তু সূর্যের দয়ালু তাপে গরম লাগছে, চারিদিকে সমস্ত কিছু — গলা বরফ, গাছের গুঁড়ি, এমন কি পাইনের কাঁটাগুলো পর্যন্ত — উজ্জ্বল, চিকচিকে, সবকিছু

মিলে দুর্ভাগ্যের গুরুত্বটা কমিয়ে দিল। কিন্তু আরো খারাপ একটা জিনিস ঘটল। অসাড় হাত হাঁটু থেকে খুলে দেখল উঠতে পারছে না। কয়েকবার ওঠার চেষ্টা করাতে ঠেকনোটা ভেঙ্গে গেল, আর ও মাটিতে পড়ে গেল গড়িয়ে বোরার মত। গড়িয়ে চিৎ হয়ে শুল, যাতে ফুলে-ওঠা শরীরটা জিরোতে পারে। পাইনের ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অসীম নীল আকাশ, সোনালী আর বাঁকা পাড় শাদা পালকের মত মেঘ তড়তড় করে চলেছে, তাকিয়ে রইল সে দিকে। ওর শরীর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে এল, কিন্তু পাদুটোয় কিছু একটা ঘটেছে। সে দুটোতে এক মুহূর্তও ভর দিতে পারছে না। পাইনগাছ ধরে আর একবার ওঠবার চেষ্টা করল আলেক্সেই, এবারে সফল হল, কিন্তু গাছের কাছে পাদুটো আনার চেষ্টা করাতেই দুর্বলতায় আর পায়ের পাতায় নতুন শিরশিরে অসম্ভব একটা ব্যথার জন্য পড়ে গেল।

শেষ তা হলে? এখানেই মরতে হবে, পাইনগাছের নিচে, হয়ত কেউ দেখতে পাবে না ওকে, হাড়গুলো মাটি চাপা দেবে না, বনের জন্তু সব সেগুলো চেঁচে পুঁছে ঝকঝকে করবে? নিদারুণ দুর্বলতা মাটিতে চিপটে রেখেছে ওকে। কিন্তু দূরে তখনো কামানের গুমগুম আওয়াজ। যুদ্ধ চলেছে ওখানে, আপন জন সবাই ওখানে। শেষের আট-দশ কিলোমিটার যাবার শক্তিটুকু কি সঞ্চয় করতে পারবে না?

কামানের গর্জন নতুন সাহস যোগাল আলেক্সেইকে, ওকে ডাকছে সে আওয়াজ, সে ডাকে সাড়া দিল ও। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে জন্তুর মত চলল, প্রথমে কিছু না ভেবে, দূর যুদ্ধের আওয়াজে মন্ত্রমুগ্ধের মত, কিন্তু পরে সচেতনভাবে, মন ঠিক করে, কেননা ও বুঝতে পারল যে ঠেকনো না থাকলে এই ভাবেই বন ধরে যাওয়া আরো সহজ। পায়ে কোন চাপ না পড়াতে ব্যথাটা কম, হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারল আলেক্সেই। আবার তীব্র আনন্দে তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল। এরকম অবিশ্বাস্য অদ্ভুতভাবে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় আস্থা হারিয়ে কেউ হতাশ হয়ে পড়েছে, তাকে উৎসাহ দিচ্ছে যেন এমনভাবে উচ্চকণ্ঠে ও বলল:

"ভেবো না কিছু, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে!"

যাত্রার এক কদমের শেষে আলেক্সেই ঠান্ডায় জমে-যাওয়া হাতদুটো বগলের নিচে রেখে গরম করল, তারপর একটা নবীন ফারগাছে গেল গুঁড়ি মেরে, চৌকো করে দু টুকরো ছাল কাটতে গিয়ে নখ ভেঙে গেল, তারপর বার্চের গুঁড়ি থেকে ছালের কয়েকটা লম্বা ফালি ছিঁড়ে নিল। ফারবুট থেকে

পশমের গলাবন্ধের ফালিগুলো খুলে দুহাতে জড়াল; আঙুলের গাঁটে ছালের টুকরোগুলো রেখে বার্চের ছালের ফালি দিয়ে আটকিয়ে সমস্তটা একটা ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে ফেলল। ডান হাতে এভাবে হল বড়ো আর বেশ সুবিধাজনক একটা দস্তানা। কিন্তু দাঁত দিয়ে বাঁধতে হয়েছিল বলে বাঁ হাতের জন্য এরকম সুবিধে করে উঠতে পারল না; যাই হোক, হাত জোড়ায় "জুতো" পরানো হয়েছে ত, আলেক্সেই এগিয়ে চলল, আগের চেয়ে সহজ মনে হল চলনটা। পরে যেখানে থামল সেখানে হাঁটুতেও পাইনের ছাল লাগিয়ে নিল।

দুপুর হল, বেশ গরম হয়ে এসেছে, ততক্ষণে আলেক্সেই হাতে ভর দিয়ে বেশ কয়েক "পা" এগিয়েছে। যেখান থেকে কামানের আওয়াজ আসছে তার কাছাকাছি এসে পড়েছে বলেই হোক, কিম্বা কোন শব্দবিভ্রমের জন্যই হোক, আওয়াজগুলো প্রখর লাগছে। এত গরম লাগছে যে আলেক্সেই বিমানি পোশাকের জিপার খুলে ফেলল।

শ্যাওলায়-ভরা তলতলে এক টুকরো জলা, সেখানে গলন্ত বরফ থেকে উঁকি মারছে সবুজ পাতা, জলাটায় হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে আলেক্সেই, হঠাৎ ওর প্রতি অদৃষ্ট সদয় হল: পাঁশুটে নরম স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলায় ও দেখল একটা গাছের সূক্ষ্ম ডাঁটা, পাতাগুলো বিরল সূচীমুখ চকচকে, তার মধ্যে ঢিবির ঠিক উপরে পড়ে আছে টকটকে লাল, অল্প থেঁতলানো, কিন্তু রসে টইটুম্বুর ক্র্যানবেরি। উষ্ণ, মখমলের মত শ্যাওলা, জলার স্যাঁতসেঁতে গন্ধ তাতে, মাথা নিচু করে আলেক্সেই ঠোঁট দিয়ে একটার পর একটা বেরি ছিঁড়ে নিতে লাগল।

গত কয়েক দিনের মধ্যে এই প্রথম সত্যিকার খাবার পেল আলেক্সেই, কিন্তু খাসা টকটক-মিষ্টি ক্র্যানবেরিগুলোর সুস্বাদে ওর পেট মোচড় দিয়ে উঠল। সেটা কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার মানসিক শক্তি ছিল না ওর, এক গোছা থেকে অন্য গোছায় গেল শরীর মুচড়িয়ে, আর ভালুকের মত জিভ আর ঠোঁট দিয়ে টকটক-মিষ্টি বেরিগুলো ছিঁড়ে নিতে লাগল। এইভাবে কয়েক গোছা সাবাড় করল, থলথলে বুটে বসন্তের জল ঢুকছে, ব্যথায় পা জ্বলছে, আর ক্লান্তি, কিছুরই হুঁশ নেই ওর, শুধু মুখে মিষ্টি ঝাঁঝালো স্বাদ, আর পেটে প্রীতিকর ভারী একটা অনুভূতি।

বমি করল আলেক্সেই, কিন্তু তবুও লোভ চাপতে না পেরে আবার বেরিগুলো ছিঁড়ে যেতে লাগল। নিজের তৈরী "জুতো" হাত থেকে খুলে মাংসের পুরোনো টিনটা বেরিতে ভরে নিল; হেলমেটটাও ভরে নিল, বেল্টে

সেটা ফিতে দিয়ে বেঁধে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল, সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করা অবসাদ অতিকষ্টে চেপে।

সেই রাত্রে পুরোনো একটা ফারগাছের নিচে আশ্রয় নিয়ে বেরিগুলো খেল আলেক্সেই, আর গাছের ছাল আর ফার ফলের বীচি চিবোল। তারপর পাশ ফিরে শুল। ঘুমটা কিন্তু হল উৎকণ্ঠিত পাহারাদারের মত। কয়েকবার মনে হল অন্ধকারে কে যেন গুড়ি মেরে নিঃশব্দে ওর দিকে আসছে, চোখ খুলে আলেক্সেই এত একাগ্রভাবে শুনতে লাগল যে কানদুটো ঝিম ঝিম করে উঠল, পিস্তলটা বের করে নিঃসাড় বসে রইল; ফারের ফল পড়ছে, রাত্রে জমে-যাওয়া বরফের কড়কড়, বরফের নিচে ক্ষুদে ক্ষুদে জলের স্রোতের অস্ফুট কুলকুল, প্রত্যেকটি শব্দে সে চমকে উঠল।

ভোরের আগে ঘুম এল। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বেশ আলো হয়ে গিয়েছে, যে গাছের নিচে ঘুমিয়েছে তার চারদিকে ও দেখল শেয়ালের পায়ের আঁকাবাঁকা দাগ, আর তার মধ্যিখানে টেনে নিয়ে যাওয়া লেজের লম্বা ছাপ।

"এই জন্যই তাহলে ভালো ঘুম হয়নি!" পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল যে শেয়ালটা চারিদিকে ঘুরেছে, থাবা গেড়ে বসেছে, আবার ঘুরেছে। হঠাৎ আলেক্সেই'র দুশ্চিন্তা হল। শিকারীদের মতে ধূর্ত শেয়াল মানুষ মরছে আঁচ পেয়ে অনুসরণ করে তাকে। তারি পূর্ব আভাসেই কি ভীরু জানোয়ারটা ওর কাছে এসেছিল।

"বাজে কথা! একেবারে বাজে কথা! সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে," নিজেকে সান্ত্বনা দিল আলেক্সেই, আর হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়েই চলল, এই ভয়াবহ জায়গাটা যত সম্ভব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবার চেষ্টা তার।

সেদিন আবার কপাল খুলল আলেক্সেই'র। একটা সুগন্ধি জুনিপারের ঝোপ থেকে ফ্যাকাশে ধূসর বেরি ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ছে, ঝরা পাতার অদ্ভুত একটা স্তূপ চোখে পড়ল। হাত দিয়ে স্তূপটা ছুঁল, কিন্তু ভেঙ্গে গেল না সেটা। পাতাগুলো টেনে সরিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ আঙুলে কীসের খোঁচা লাগল। শজারু একটা, তৎক্ষণাৎ আঁচ করল আলেক্সেই। বড়ো বুড়োটে একটা শজারু শীত কাটাবার জন্য ঝোপে ঢুকেছিল, নিজেকে গরম রাখার জন্য হেমন্তের ঝরা পাতায় শরীরটা জড়িয়েছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে গেল আলেক্সেই। ক্লিষ্ট যাত্রার সময়ে জন্তু কি পাখি একটা মারার স্বপ্ন ও দেখেছে। কতবার না পিস্তল বের করে হাঁড়িচাঁচা একটা, বড়ো কাক কিম্বা কোন

খরগোসের দিকে নিশানা করেছে, আর প্রত্যেক বার অতিকষ্টে গুলি ছোঁড়ার ইচ্ছে দমন করেছে; মাত্র তিনটে গুলি বাকি আছে — দরকার হলে দুটো শত্রুর জন্য আর একটা নিজের জন্য। জোর করে পিস্তল সরিয়ে রেখেছে ও; ঝুঁকি নিলে চলবে না।

আর এখানে এক টুকরো মাংস সটান ওর হাতে এসে পড়েছে। সাধারণের মতে শজারু নোংরা জীব, সেটা ভেবেচিন্তে না দেখেই তাড়াতাড়ি শেষের পাতাকটি সরিয়ে ফেলল। শজারুটার ঘুম ভাঙ্গল না, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, কাঁটাওয়ালা বড়ো মটরের মত হাস্যকর চেহারা। ছোরা দিয়ে ওটাকে মেরে সোজা করল আলেক্সেই, আনাড়িভাবে ওর কাঁটার বর্মটা আর পেটের নিচের হলদে চামড়াটা টেনে ছিঁড়ে, শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে, দারুণ লোভে হাড়ে শক্ত করে লাগা গরম ধূসর পেশল মাংস দাঁতে ছিঁড়তে লাগল। কিছু বাকি পড়ে রইল না জানোয়ারটার। ছোট ছোট হাড়গুলো চিবিয়ে গিলল আলেক্সেই, আর শুধু তখনি মাংসটার কটু, কুকুরের মত আস্বাদটা টের পেল। কিন্তু কী এসে যায় গন্ধতে? পেট ত ভরেছে, সমস্ত শরীরে জাগছে পরিতৃপ্তির, উষ্ণতার আর অবসাদের একটা অনুভূতি!

আবার দেখে শুনে প্রত্যেকটি হাড় চুষল আলেক্সেই, তারপর বরফে শুয়ে পড়ল, বেশ গরম আর আরাম লাগছে। হয়ত ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে একটা শেয়াল সতর্কভাবে ডাকাতে ঘোর কেটে গেল। কান খাড়া করে শুনল আলেক্সেই, পূব থেকে বরাবর আসা দূরাগত কামানের গর্জনের মধ্যে হঠাৎ মেসিনগানের খরখরে আওয়াজ।

সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে, শেয়ালটার আর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে গিয়ে, আবার বনের গভীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল আলেক্সেই।

১১

যে জলাটা পেরিয়ে এসেছে তার ওধারে খোলা জায়গা একটা, রোদেবৃষ্টিতে জীর্ণ খোঁটার দুটো সারির একটা বেড়া সেখান হয়ে চলে গিয়েছে, খোঁটাগুলো গাছের ছাল আর উইলো ডাল দিয়ে খুঁটিতে বাঁধা, খুঁটিগুলো মাটিতে পোঁতা।

খোঁটাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, এখানে সেখানে বরফের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত অচলা পথের রেখা উ'কি মারছে। কাছাকাছি নিশ্চয়ই বসতি আছে তাহলে! আলেক্সেই'র হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে এল। এত দূর জায়গায় জার্মানদের আসার কোনই সম্ভাবনা নেই বলতে গেলে; আর যদিও ওরা এসে থাকে, আশেপাশে আপনার লোকজনও থাকবে, আর তারা অবশ্যই আহত আলেক্সেইকে আশ্রয় দেবে, সমস্ত রকম সাহায্য করবে।

যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে আঁচ করে প্রাণপণ শক্তিতে এগিয়ে চলল আলেক্সেই, বিশ্রামের জন্য থামল না। হামাগুড়ি দিয়ে চলল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বরফে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে, পরিশ্রমে জ্ঞান হারাচ্ছে; একটা ঢিবির উপরে পেশছবার জন্য তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিচ্ছে আলেক্সেই, ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওটাতে উঠলেই যে গ্রামটা ওকে আশ্রয়ের স্বর্গ জোটাবে সেটা নজরে আসবে। বসতিতে পেশছবার একাগ্র চেষ্টায় ও দেখতে পেল না যে, বেড়াটা আর গলন্ত বরফে ক্রমশ স্পষ্টতর রাস্তার চিহ্নটা ছাড়া আর কিছু নেই যেটা কাছাকাছি লোকালয়ের ইঙ্গিতসূচক।

অবশেষে ঢিবির উপরে পেশছল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আলেক্সেই চোখ তুলে তাকাল — আর তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিল — সামনের দৃশ্যটি এত ভয়াবহ।

সন্দেহ নেই যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে বনের মধ্যে ছোট্ট একটা গ্রাম ছিল। পোড়া বাড়িগুলোর বরফে-ঢাকা ভগ্নস্তূপের উপরে চিমনীর দুটো উদ্যত অসমান সারিতে গ্রামটার রেখা সহজে ধরা যায়। এখন শুধু চোখে পড়ছে কয়েকটা ফুল-বাগান, কঞ্চির বেড়া আর জায়গায় জায়গায় জানলার পাশে রোয়ানগাছের ঝাড়। আর এখন বরফের মধ্য থেকে খুঁচিয়ে বেরিয়ে আছে ওগুলো, মরা, আগুনে-ঝলসানো। বরফে-ঢাকা ফাঁকা ক্ষেতের উপরে চিমনীগুলো বেরিয়ে আছে, বনের ফাঁকা জায়গায় গাছের গুঁড়ির মত, আর মাঝখানে উঠেছে কুয়োর জল তোলার যন্ত্র, একেবারে বেমানান দেখাচ্ছে সেটাকে, তা থেকে ঝুলছে পুরোনো, লোহায় বাঁধানো কাঠের বালতি একটা, মরচে-পড়া শেকলে আস্তে আস্তে হাওয়ায় দুলছে সেটা। গ্রামের প্রবেশপথে, সবুজ বেড়ায় ঘেরা বাগানের কাছে সুন্দর একটা ছাতওয়ালা খিলান, তার নিচে মরচে-পড়া কব্জায় কি'চকি'চ করে দরজাটা আস্তে আস্তে নড়ছে।

জনপ্রাণী নেই, শব্দ নেই, ধোঁয়ার রেশ মাত্র নেই... মরুভূমি। জন মানুষের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। আলেক্সেই আসাতে ভয় পেয়ে একটা

খরগোস ছুটে সোজা গ্রামটির দিকে গেল, পিছনের পাদুটো হাস্যকরভাবে ছুঁড়ে। কণ্ডির গেটে থেমে গিয়ে বসল ওটা, সামনের পাদুটো তুলে, কানটা একটু হেলিয়ে; বড়ো অদ্ভুত জীবটা তখনো হামাগুড়ি দিয়ে আসছে দেখে ওটা ঝলসে-যাওয়া পরিত্যক্ত বাগানের ধার ঘেঁষে আবার লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

যন্ত্রবৎ এগিয়ে চলল আলেক্সেই। দাড়ি-না-কামানো গাল বেয়ে চোখের জলের বড়ো বড়ো ফোঁটা টপটপ করে বরফে পড়ছে। কণ্ডির গেটটায় থামল ও, এক মুহূর্ত আগে খরগোসটা সেখানে ছিল। গেটের উপরে ভাঙ্গাচোরা বোর্ডে লেখা: "কিণ্ডা..." সহজেই আঁচ করা যায় যে এই সবুজ বেড়ার পিছনে ছিল একটি কিণ্ডারগার্টেনের পরিচ্ছন্ন বাড়িঘরদোর। এমন কি নিচু কয়েকটা বেঞ্চও পড়ে আছে, গ্রামের ছুতোর সেগুলো বানিয়েছিল, আর বাচ্চাদের ভালোবাসত বলে কাচ দিয়ে চেঁচে সেগুলোকে সমান আর মসৃণ করেছিল। গেট ঠেলে ঢুকে একটা বেঞ্চের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে গেল আলেক্সেই, বসার ইচ্ছে তার, কিন্তু ওর শরীরটা আড়াআড়ি অবস্থায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। শেষে যখন বসল তখন সমস্ত শিরদাঁড়াটা কনকন করতে লাগল। জিরিয়ে নেবার জন্য বরফের উপরে শুয়ে পড়ল ও, কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্লান্ত জানোয়ারেরা যেমন করে শোয়।

ওর বুক বিষাদে ভারী।

বেঞ্চের চারিধারে বরফ গলছে, দেখা যাচ্ছে কালো মাটি, সেখান থেকে উষ্ণ ভাপ উঠে চোখের সামনে বেঁকে যাচ্ছে আর কাঁপছে। উষ্ণ গলন্ত মাটি এক মুঠো খুঁড়ে নিল আলেক্সেই: চর্বির মত আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চুঁইয়ে পড়ল সেটা, ভিজে ভিজে গোবরের গন্ধ তাতে, গোয়ালের আর বাড়ির গন্ধ।

বসতি ছিল এখানে... অনেক, অনেক দিন আগে কোন সময় লোকেরা "কৃষ্ণ অরণ্যের" কাছ থেকে জমির এই টুকরোটা জয় করে, লাঙল চালায় এর উপরে, কাঠের বিদেমই দেয়, সার দেয়, দেখাশুনো করে। কঠিন জীবন সেটা, বনের আর জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামের জীবন, পরের ফসল তোলার আগে কী করে সংসার চলবে তার অবিরাম দুশ্চিন্তার জীবন। সোভিয়েত শাসনে একটা যৌথখামার গড়া হয়, আর সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে লোকেরা; কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি এল, তাদের সঙ্গে এল প্রাচুর্য। কিণ্ডারগার্টেন বানাল গ্রামের ছুতোররা, আর সন্ধ্যাবেলায় টুকটুকে বাচ্চারা এই বাগানে হুড়োহুড়ি করছে দেখতে দেখতে গ্রামের লোকেরা

নিশ্চয়ই ভাবত যে এবারে একটা ক্লাব আর পড়বার ঘর তৈরী করার সময় হয়েছে, বাইরে যখন তুষার-ঝড় তখন ক্লাবের ঘরে উষ্ণ আরামে শীতের সন্ধ্যা কাটানো যাবে; বনের গভীরে বৈদ্যুতিক আলোর স্বপ্নও তারা নিশ্চয়ই দেখেছিল। আর এখন শুধু মরুভূমি, বনের অনন্ত অটল স্তব্ধতা...

যত ভাবছে গ্রামটির কথা আলেক্সেই তত ওর মন নাড়া দিয়ে উঠছে। চোখের সামনে এল কামিশিনের ছবি, সমতল শুকনো স্তেপে ভলগাপারের ধুলো-ভরা একটা ছোট সহর। গ্রীষ্মে আর হেমন্তে স্তেপের ধারালো হাওয়া সহরে বইত, ধুলো আর বালি চোখে মুখে ছুঁচের মত লাগত, জোরে ঢুকত বাড়িঘরদোরে, বন্ধ জানলা দিয়ে চোরাভাবে আসত, চোখ অন্ধ করে দিয়ে দাঁতে লাগত। স্তেপের এই কিড়কিড়ে বালির মেঘকে "কামিশিন বৃষ্টি" বলা হত, অনেক অনেক বছর ধরে এই বালি আটকাবার, পরিষ্কার টাটকা হাওয়া প্রাণভরে নেবার স্বপ্ন লোকে দেখেছিল। কিন্তু স্বপ্নটা সত্য হল শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশে। সলাপরামর্শ করে লোকেরা হাওয়া আর বালির বিরুদ্ধে লড়াই চালাল। প্রতি শনিবার গাঁতি শাবল আর কুঠার নিয়ে সমস্ত লোক বেরিয়ে আসত, আর কালক্রমে সহরটির আগেকার ফাঁকা চকে একটা বাগান হল, অপরিসর রাস্তার দুধারে উঠল নবীন পাতলা পপলারগাছ। গাছে সযত্নে জল দিত লোকে, সময়ে ছাঁটত, যেন নিজেদের জানলার কার্নিশের ফুল। আলেক্সেই'র মনে পড়ল বসন্তে যখন গাছগুলোর পাতলা নগ্ন শাখা অঙ্কুরিত হয়ে সবুজ রং ধরত তখন ছেলে বুড়ো সবাই কী ভাবে আনন্দিত হত... হঠাৎ ও কল্পনা করল ওর নিজের কামিশিনের রাস্তায় ফ্যাশিস্টরা ঘুরছে। অসীম যত্নে লালিত গাছগুলো ওরা কেটে ফেলছে আগুন জ্বালাবার জন্য। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে ওর নিজের সহর। ওর বাড়ি যেখানে ছিল, যেখানে ও বড়ো হয়েছে, ওর মা যেখানে ছিলেন, সেখানে উঠেছে একটা নগ্ন, ঝুল-মাখা বিকট চিমনী, এখানকার চিমনীর মত।

ব্যথায় আর যন্ত্রণায় ওর বুক চিরে গেল।

"ওদের আর এক চুল এগোনো চলবে না! রুখতেই হবে ওদের, শরীরে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ, যেমন করে রুখেছিল ওই রুশ সৈনিকটি, শত্রুদের দেহের গাদার ওপরে বনের ফাঁকা জায়গায় যে পড়ে আছে।"

গাছের ধূসর মাথায় সূর্যের আলো ইতিমধ্যেই পড়েছে।

এক কালে যেটা গ্রামের রাস্তা ছিল সেটা ধরে আলেক্সেই হামাগুড়ি দিয়ে চলল। ছাই'এর গাদা থেকে মড়ার গন্ধ আসছে। গ্রামের চেহারাটা বনের

চেয়েও পরিত্যক্ত। হঠাৎ একটি বিচিত্র শব্দে ও হঁুশিয়ার হল। রাস্তার একেবারে শেষে ছাই'এর গাদার পাশে একটা কুকুর। ঝোলা-কান লোমশ পোষা কুকুর একটা, সাধারণ "ববিক" কিম্বা "ঝুচকা"। নিচু গলায় গরগর করে, থাবাতে এক টুকরো মেদল মাংস ধরে নাড়াচাড়া করছে। আলেক্সেইকে দেখে কুকুরটা হঠাৎ ফুঁসে উঠে দাঁত দেখাল — লোকে বলে কুকুরের মত নরম মেজাজের জীব আর নেই, গিন্নীদের যত বকুনীর লক্ষ্যবস্তু ওরা, আর বাচ্চাদের প্রিয়। কুকুরটার চোখদুটো এত হিংস্রভাবে জ্বলছে যে আলেক্সেই'র শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। "দস্তানা" জোড়া চট করে খুলে পিস্তলটা নিল সে। কয়েক মুহূর্ত মানুষ আর কুকুর — সেটা এখন বুনো জন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে — পরস্পরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ কুকুরটার পুরোনো স্মৃতি ফিরে এল নিশ্চয়ই, কেননা মুখ নিচু করে, যেন দোষ করে ফেলেছে এমন ভাবে লেজ নাড়িয়ে মাংসের টুকরোটা চট করে তুলে নিয়ে ছাই'এর গাদার পিছনে দৌড়িয়ে চলে গেল লেজ গুটিয়ে।

চলে যেতে হবে, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে! আলোর শেষ কটি রেখার সুযোগ নিয়ে, কোন রাস্তা না বেছে, বরফের উপর আড়াআড়িভাবে আলেক্সেই হামাগুড়ি দিয়ে বনে ঢুকল, কিছু না ভেবেই যেদিক থেকে কামানের শব্দ এখন স্পষ্টভাবে আসছে সে দিকে চলল। শব্দটা ওকে টানছে চুম্বকের মত, যত কাছে যাচ্ছে তত বাড়ছে ওটার আকর্ষণী শক্তি।

১২

আর এইভাবে আরো দুতিন দিন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল আলেক্সেই... সময়ের হিসেব ওর নেই, সমস্ত কিছু যন্ত্রচালিত প্রয়াসের একটানা পরম্পরায় পরিণত। কখনো কখনো ঘুম, বিস্মরণ হয়ত বা ওকে আচ্ছন্ন করছে। হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ছে সে, কিন্তু যে শক্তি তাকে পূর্বদিকে নিয়ে যাচ্ছে এত প্রখর তার আকর্ষণ যে বিস্মরণের অবস্থাতেও আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে কোন গাছ কিম্বা ঝোপের সঙ্গে ধাক্কা লাগা বা হাত পিছলে মুখ থুবড়ে গলন্ত বরফের উপরে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি, ভাসা-ভাসা সব চিন্তা একটি কেন্দ্রে, আলোর বিন্দুর মত একটি কেন্দ্রে আবদ্ধ: হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, যেমন করে পারো এগিয়ে চলো।

যেতে যেতে প্রত্যেকটা ঝোপ খংজে দেখছে সে, যদি আর একটা শজারু মেলে। বরফের নিচে পাওয়া বেরি আর শ্যাওলা ওর আহার্য এখন। একবার একটা বিরাট পিঁপড়ের ঢিবির কাছে এল, বৃষ্টিতে ভেজা মসৃণ খড়ের গাদার মত ঢিবিটা খাড়া। পিঁপড়েগুলো তখনো ঘুমোচ্ছে, মনে হচ্ছে ঢিবিতে কিছু নেই। নরম ঢিবির ভিতরে ঝপ করে হাত ঢুকিয়ে আলেক্সেই বের করে নিল, পিঁপড়েগুলো চামড়ায় নাছোড়বান্দার মত লেপটে আছে। অসীম তৃপ্তিতে পিঁপড়েগুলো খেতে শুরু করল সে, শুকনো ফাটা জিভে লাগছে পিঁপড়ের ঝাঁঝালো টক রস। বারবার ঢিবির মধ্যে হাত ঢোকাল, শেষ পর্যন্ত এই অপ্রত্যাশিত হামলায় সমস্ত পিঁপড়ে জেগে উঠল।

হিংস্রভাবে আত্মরক্ষা শুরু করল ক্ষুদে পোকাগুলো; আলেক্সেই'র হাত, ঠোঁট, জিভ কামড়াচ্ছে, বিমানি পোশাকের ভিতরে ঢুকে শরীর পর্যন্ত পেঁছিল ওরা। কিন্তু আর কিছু না হোক, ওদের কামড়ের জ্বালা ভালোই লাগছে, ওদের ঝাঁঝালো রস যেন বলকারক ওষুধ। তেষ্টা পেল আলেক্সেই'র। ঝোপঝাড়ের মধ্যে বনের ঘোলাটে জলের একটা ডোবা, ও মুখ বাড়াল পানের জন্য, কিন্তু তক্ষুণি পিছিয়ে এল — ঘোলাটে জল, আকাশের নীল ছায়া তাতে পড়েছে, তার পটভূমিতে একটা অদ্ভুত ভয়াবহ মুখ ওর দিকে উঁকি মারছে। কঙ্কালের মুখ সেটা, চামড়াটা কালো, অপরিচ্ছন্ন খোঁচা খোঁচা শক্ত লোমে ইতিমধ্যেই কণ্টকিত। গভীর কোটর থেকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বড়ো, গোলগোল, বন্য উজ্জ্বল একজোড়া চোখ, আলুথালু চুল কপালে নেমেছে এলোমেলো গোছায়।

"আমার ছায়া ওটা?" ভাবল আলেক্সেই, আর তাকাবার সাহস হল না ওর, জল না খেয়ে মুখে কিছু বরফ গংজে পুবমুখো হামাগুড়ি দিয়ে চলল সেই জোরালো চুম্বকটার আকর্ষণে।

সে রাত্রে বিশ্রামের জন্য একটা বড়ো বোমা-গর্ত বেছে নিল আলেক্সেই, গর্তটার চারিধারে হলুদ বালিতে ঘেরা, বিস্ফোরণের চাপে উপরে ছিটকে এসেছে। গর্তের ভিতরটায় শুয়ে বেশ আরাম লাগছে। হাওয়া আসছে না সেখানে, শুধু উপরের বালি ঝুরঝুর করে পড়ছে হাওয়ার চাপে। উপরে তাকাল আলেক্সেই, তারাগুলোকে বেজায় বড়ো ঠেকছে, মনে হচ্ছে ওরা খুব নিচে নেমে এসেছে। পাইনগাছের একটা মোটা ডাল তারার নিচে এদিক ওদিক দুলছে, মনে হচ্ছে ছেঁড়া নেকড়ার টুকরো হাতে সেটা জ্বলজ্বলে আলোগুলোকে মুছে চকচকে করছে। ভোরের আগে ঠাণ্ডা পড়ল। বনের

উপরে কনকনে কুয়াশা। হাওয়ার গতি বদলে গেল। উত্তর থেকে বইছে সেটা, কুয়াশাটা জমে যাচ্ছে। ধূসর, বিলম্বিত আলো যখন ডালপালা ভেদ করে এল তখন ঘন কুয়াশা নেমে আস্তে আস্তে গলে গেল, পেছল গুঁড়ো গুঁড়ো বরফে সবকিছু ঢাকা পড়েছে। উপরের ডালটাকে আর নেকড়াওয়ালা হাতের মত দেখাচ্ছে না, মনে হচ্ছে অদ্ভুত, স্ফটিক ঝালর একটা, তা থেকে ঝোলানো ছোট ছোট ত্রিশির কাচের কলম হাওয়ায় আস্তে আস্তে ঠুনঠুন করছে।

আলেক্সেই জেগে উঠল, এত দুর্বল তার আগে কখনো লাগেনি। বিমানি পোশাকের বুকপকেটে মজুত রাখা পাইনগাছের ছাল পর্যন্ত চিবল না ও। অনেক কষ্টে মাটি ছেড়ে উঠল, যেন রাত্রে শরীরটা মাটির সঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে গিয়েছে। পোশাক আর দাড়ি গোঁফ থেকে বরফ ঝেড়ে না ফেলে, গর্তটার গা ধরে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু রাত্রে জমে-যাওয়া বালিতে হাত গেল পিছলে। বারবার বেরোবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবার পিছলে পড়ে গেল। ওঠবার উদ্যম ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে এল। শেষে গভীর আতঙ্কে আলেক্সেই বুঝতে পারল যে কেউ সাহায্য না করলে সে বেরোতে পারবে না। সেটা ভেবে আর একবার গর্তটার পেছল গা বেয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে পারল না, কিন্তু অল্প একটু ওঠার পরেই আবার পিছলে পড়ে গেল, একেবারে ক্লান্ত আর অসহায়।

"শেষ তাহলে! কিছুই আর করার নেই!"

গর্তে কুঁকড়িয়ে শুল আলেক্সেই, বিশ্রামের একটা ভয়াবহ ঘোর সমস্ত শরীরে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে ইচ্ছাশক্তিকে চুম্বকের টান থেকে মুক্ত করে অসাড় করে দিচ্ছে, বুঝতে পারল ও। ছিন্ন পত্রগুলো অস্থিরভাবে টিউনিকের পকেট থেকে বের করে নিল, কিন্তু পড়বার শক্তি আর নেই। সেলোফেনের মোড়ক থেকে মেয়েটির ছবি বের করল, মাঠের ঘাসে ছাপা ফ্রক পরে বসে আছে। বিষণ্ণভাবে হেসে জিজ্ঞেস করল তাকে·

"সত্যিই তাহলে বিদায়?" আর হঠাৎ চমকে উঠল আলেক্সেই, ছবি হাতে পাথরের মত বসে রইল। বনের অনেক উপরে ঠাণ্ডা হিম হাওয়ায় পরিচিত একটা শব্দ শুনেছে মনে হল।

অবসাদ তক্ষুণি ঝেড়ে ফেলল আলেক্সেই। শব্দটা অসাধারণ কিছু নয়। এত ক্ষীণ যে বনের কোন জন্তুর সূক্ষ্ম কানেও বরফে-ঢাকা গাছের মাথার একঘেয়ে খসখস শব্দের মধ্যে ওটা আলাদাভাবে ধরা পড়বে না। কিন্তু

বিশেষ একটা শিসের মত ধ্বনিতে আলেক্সেই নির্ভুলভাবে আঁচ করল যে ওটা আসছে "ই-১৬" থেকে, যে ধরনের বিমান ও চালাত সে ধরনের বিমান থেকে।

ইঞ্জিনের গম্ভীর শব্দ আরো কাছে এল, মাত্রায় বাড়ল, কখনো বা শিসের মত বাজছে, আর বিমানটি ঘোরার সময় গোঙানোর শব্দ। শেষে, ধূসর আকাশে অনেক উঁচুতে ছোট মন্থরগতি একটা ক্রুশ আলেক্সেই দেখল, কুয়াশাচ্ছন্ন ধূসর মেঘে কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটা, আবার বেরিয়ে আসছে। পাখাদুটোয় লাল তারার চিহ্ন আলেক্সেই'র চোখে পড়ল, ওর ঠিক মাথার উপরে বিমানটি তীরবেগে নেমে আবার বৃত্তাকারে উপরে উঠে গেল সূর্যের আলোয় ঝকঝকিয়ে, তারপর একটা পাশ উঁচু করে উড়ে চলে গেল। ইঞ্জিনের শব্দ গেল থেমে, সে শব্দ ছাপিয়ে এল হাওয়ায় দোলা, বরফে-ঢাকা ডালপালার মৃদুকর্কশ ধ্বনি, কিন্তু পরে অনেকক্ষণ ধরে আলেক্সেই'র মনে হল সেই সূক্ষ্ম শিসের ধ্বনি তখনো কানে আসছে।

ককপিটে বসে আছে নিজে, ও কল্পনা করল। এক নিমেষে, এমন কি একটা সিগারেটে টান দিতে না দিতে, বনে নিজের বিমান-ঘাঁটিতে ফিরে যেতে পারে ও। বৈমানিকটি কে? হয়ত আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো, সকালের টহলে বেরিয়েছে। ও টহল দেবার সময় অনেক উঁচুতে উঠত, শত্রু বিমানের দেখা পাবার গোপন আশায়... দেগতিয়ারেঙ্কো... বিমানটা .. বন্ধু বৈমানিকেরা...

নতুন উদ্যমের আবেগে গর্তটার জমে-যাওয়া গায়ের দিকে তাকাল আলেক্সেই। "এভাবে কখনোই বেরোতে পারব না," মনে মনে বলল। "কিন্তু এখানে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা চলবে না।" খাপ থেকে ছোরা বের করে অস্থির, দুর্বল খোঁচায় গর্তটার গায়ে পা রাখবার জায়গা তৈরী করতে লাগল আলেক্সেই, নখ দিয়ে আঁচড়ে জমে-যাওয়া বালি সরাল। আঁচড়াতে আঁচড়াতে নখ ফেটে গেল, আঙুল থেকে রক্ত গড়িয়ে এল, কিন্তু একটুও ঢিলে না দিয়ে কুপিয়ে চলল ও। তারপর খাঁজগুলোর উপরে হাত রেখে, হাঁটুতে ভর করে গর্তটার গা বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে পাঁচিলটার কাছে পৌঁছল। ওটাতে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়া, তারপর গড়িয়ে যাওয়া — ব্যস, তাহলেই বেঁচে যাবে, কিন্তু পা পিছলে সে আবার পড়ে গেল, বরফে মুখটা জোরে ঠুকে গেল। খুব চোট লেগেছে, কিন্তু তখনো কানে বিমানটির গম্ভীর শব্দ বেজে চলেছে। আবার গর্তটার গা বেয়ে উপরে উঠল, পিছলে পড়ে গেল আবার। তারপর নিজের হাতে-কাটা

খাঁজগুলো খুঁটিয়ে দেখে সেগুলোকে আরো গভীর করতে শুরু করল, উপরের খাঁজগুলোর পাশ আরো ধারালো করল; সেটা করা শেষ হলে উপরে উঠতে লাগল আবার, খুব সাবধানে, ক্ষীণ শক্তি যাতে নিঃশেষ না হয়ে যায়।

বালির পাঁচিলে অসহ্য কষ্টে আড়াআড়িভাবে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে অসহায়ভাবে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল আলেক্সেই। বিমানটি যে দিকে উড়ে গিয়েছে সেদিকে হামাগুড়ি দিয়ে চলল, সেদিকে বনের উপরে সূর্য উঠেছে, বরফ-খেগো কুয়াশা মিলিয়ে যেতে সূর্যের আলোয় গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ স্ফটিকের মত চকচক করছে।

১৩

কিন্তু হামাগুড়ি দিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে আলেক্সেই'র। হাতদুটো কেঁপে অবশ হয়ে আসছে, শরীরের ভার রাখতে পারছে না। কয়েকবার গলন্ত বরফে মুখ ঠুকে গেল। মনে হচ্ছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে, সেটার টান রোখা অসম্ভব। ভয়ানক ইচ্ছে করছে শুয়ে অন্তত আধ-ঘণ্টা জিরিয়ে নিতে, কিন্তু এগিয়ে চলার সংকল্প আজ ক্ষিপ্ততায় পরিণত, আর তাই অবসাদ কাটিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েই চলল আলেক্সেই, পড়ে যাচ্ছে, উঠছে, আবার হামাগুড়ি দিচ্ছে, ব্যথা কিম্বা ক্ষিধের কোন হুঁশ নেই, কিছু দেখতে পারছে না, কামান আর মেসিনগানের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না।

যখন শরীরের ভার হাত আর নিতে পারছে না তখন কনুই'এ ভর দিয়ে এগোবার চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু সেটা বিশেষ অসুবিধাজনক, তাই শুয়ে পড়ে কনুই'এর সাহায্যে গড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। দেখল সেরকম ভাবে এগোতে পারবে। হামাগুড়ি দেবার চেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া সহজতর, খুব পরিশ্রম করতে হয় না তাতে। কিন্তু গড়িয়ে যাওয়াতে মাথা ঘুরছে, মাঝেমাঝে চেতনা লোপ পাচ্ছে। প্রায়ই থেমে উঠে বসে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ওকে, যতক্ষণ পৃথিবী, বন আর আকাশের চর্কিপাক বন্ধ না হয়।

গাছের সারি পাতলা হয়ে এল, এখানে সেখানে ফাঁকা জায়গা, গাছ কাটা হয়েছে সেখানে। শীতের রাস্তার ফালি দেখা যাচ্ছে। নিজের লোকজনদের কাছে পৌঁছতে পারবে কিনা, সেটা আর ভাবছে না আলেক্সেই, যতক্ষণ নড়বার শক্তি আছে ততক্ষণ গড়িয়ে গড়িয়ে যাবে, এই তার দৃঢ় সংকল্প।

দুর্বল পেশীতে নিদারুণ শ্রমের চাপে জ্ঞান হারাচ্ছে যখন, তখনো হাতদুটো আর সারা শরীর আপনা থেকেই জটিল ক্রিয়া করে চলেছে, আর বরফের উপরে গড়িয়ে চলেছে ও পূর্বদিকে, কামানের শব্দের দিকে।

সে রাত্রি কী ভাবে কাটল, পরের দিন সকালে খুব বেশী এগোতে পেরেছে কি না, কিছু মনে নেই আলেক্সেই'র। আধো-বিস্মরণের অন্ধকারে সমস্ত কিছু চাপা পড়েছে। রাস্তায় নানা বাধার শুধু অস্পষ্ট স্মৃতি: একটা কেটে-ফেলা পাইনের সোনালী গুঁড়ি, হলুদ রঙের রজন চুঁইয়ে পড়ছে তা থেকে, কাঠের কুঁদোর একটা স্তূপ, করাতের গুঁড়ো আর কুচি চারিদিকে ইতস্তত ছড়ানো, একটা গাছের গুঁড়ি, আড়াআড়িভাবে যেখানে কাটা হয়েছে সেখানে বাৎসরিক আংটাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে...

একটা অস্বাভাবিক শব্দে ওর আধো-বিস্মরণের ঘোর কেটে গেল, জ্ঞান ফিরে আসাতে উঠে বসে চারিদিকে তাকাল সে। বনের একটা বড়ো পরিষ্কার জায়গায় এসে পড়েছে, সূর্যালোকে প্লাবিত জায়গাটা, কাটা গাছে আর কাঠের কুঁদোতে ভর্তি, সেগুলো তখনো ছাঁটা হয়নি। জ্বালানী কাঠের সাজানো স্তূপ ছাড়া ছাড়া দাঁড়িয়ে। দুপুরের সূর্য অনেক উঁচুতে, রজনের, তপ্ত সূচীমুখ ফারের আর স্যাঁতসেঁতে বরফের তীব্র গন্ধ হাওয়ায়, মাটি এখনো গলেনি, অনেক উঁচুতে একটা লার্ক গাইছে সহজ সুরে প্রাণ ঢেলে দিয়ে।

অজানা বিপদের অনুভূতিতে চকিত হয়ে আলেক্সেই ফাঁকা জায়গাটা ভালো করে দেখল। পরিষ্কার জায়গাটা, পরিত্যক্ত গোছের চেহারা নয়। গাছগুলো হালে কাটা হয়েছে, ছাল-না-ছাড়ানো গাছের ডালপালা তখনো টাটকা আর সবুজ, মধুর মত রজন চুঁইয়ে পড়ছে, আর চারিদিকে ছড়ানো গাছের কুচি আর কাঁচা ছাল থেকে তাজা গন্ধ আসছে। তাই ফাঁকা জায়গাটাতে জীবনের সাড়া। হয়ত পরিখা আর ডাগ-আউটের জন্য জার্মানরা এখানে কাঠের কুঁদো ঠিক করছে? তা যদি হয়, পত্রপাঠ এখান থেকে সরে পড়া ভালো, কেননা যে কোন মুহূর্তে কাঠুরিয়ারা এসে পড়তে পারে। কিন্তু শরীরটা তীব্র যন্ত্রণায় বিবশ হয়ে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে, নড়বার শক্তি নেই আলেক্সেই'র।

হামাগুড়ি দিয়ে কি এগিয়ে যাবে? বনে কয়েক দিন কাটিয়ে যে সহজাত বোধ গড়ে উঠেছে সেটা ওকে হুঁশিয়ার করল। নজরে পড়ছে না বটে, কিন্তু বোধ হচ্ছে কে যেন ওকে জানোয়ারের মত একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছে। কে?

বনটা শান্ত, ফাঁকা জায়গার উপরে লার্কের গান, একটা কাঠঠোকরার ফাঁপা ঠকঠক আওয়াজ, কাটা গাছের আনত ডালপালায় লাফিয়ে লাফিয়ে টমটিটগুলো রাগে কিচির মিচির করে পরস্পরকে ডাকছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কে যেন ওকে দেখছে, সমস্ত শরীর দিয়ে আলেক্সেই বুঝতে পারল।

গাছের ডাল ভাঙ্গার শব্দ। চারিদিকে তাকাল আলেক্সেই, নবীন পাইনগাছের ধূসর ঝাড়, ওদের কোঁকড়ান মাথাগুলো হাওয়ায় দুলছে, তার মধ্যে ও দেখল কয়েকটা ডালপালা যেন আলাদাভাবে নড়ছে, অন্যদের সঙ্গে তাল রাখছে না। আর মনে হল ওখান থেকে উত্তেজিত ফিসফিসানি ওর কানে আসছে, মানুষের গলার শব্দ। আবার ওর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল, কুকুরটাকে দেখে যেমন হয়েছিল।

বিমানি পোশাকের বুকপকেট থেকে তাড়াতাড়ি পিস্তলটা বের করে নিল আলেক্সেই। পিস্তলটায় ইতিমধ্যেই মরচে ধরেছে, দুহাতে ঘোড়া ঠিক করতে হল। ঘোড়া বসাবার শব্দে পাইনগুলোর পিছনে লুকনো কে যেন চমকে উঠল। গাছের কয়েকটা মাথা জোরে নড়ে উঠল. যেন কেউ তাদের ধাক্কা দিয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার সবকিছু চুপচাপ।

"কী ওটা, মানুষ না জন্তু?" নিজেকে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই, আর মনে হল গাছের ঝাড়েও কেউ যেন জিজ্ঞেস করছে: "ওটা মানুষ না কি?" কল্পনা, না সত্যিসত্যি গাছের ঝাড়ে রুশ ভাষায় কারো কথা কানে এল? হ্যাঁ, সত্যিই ত রুশ ভাষায়। আর রুশ ভাষা বলেই আলেক্সেই হঠাৎ আনন্দে এত অধীর হয়ে পড়ল যে শত্রু মিত্র কিছু না ভেবেই বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে যেখানে কণ্ঠস্বর শুনেছে সেদিকে দৌড়িয়ে ধপাস করে পড়ে গেল যেন কার ধাক্কায়, বরফে ছিটকে পড়ল পিস্তলটা।

১৪

ওঠবার নিষ্ফল চেষ্টা করে আবার পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল আলেক্সেই, কিন্তু আসন্ন বিপদের বোধে তৎক্ষণাৎ হুঁশ ফিরে এল। পাইনগুলোর পিছনে লুকিয়ে আছে লোকে, কোন সন্দেহ নেই তাতে, ওকে দেখছে তারা, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে।

হাতে ভর দিয়ে উঠে, বরফ থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে মাটি ঘেঁষে দৃষ্টির বাইরে রাখল সেটাকে আলেক্সেই, আবার দেখতে লাগল চারিদিকে। বিপদের

আশঙ্কায় বিস্মরণের ঘোর একেবারে কেটে গিয়েছে। সঠিকভাবে কাজ করছে ওর বিচারশক্তি। কারা ওরা? কাঠুরিয়াগুলো হয়ত, জ্বালানী কাঠ ঠিক করার জন্য এখানে আসতে ওদের জার্মানরা বাধ্য করেছে? হয়ত রুশ ওরা, ঘেরাও হয়েছে ওর মত, আর জার্মান লাইন ভেঙ্গে নিজেদের লোকজনের কাছে যাবার চেষ্টা করছে? কিম্বা আশেপাশের চাষীরা হয়ত? যাই হোক না, ও ত স্পষ্ট শুনেছে কে একজন বলল, "মানুষ একটা!"

হামাগুড়ি দিয়ে হাত অসাড়, পিস্তলটা কাঁপছে; কিন্তু লড়তে প্রস্তুত ও, গুলি তিনটের সদ্ব্যবহার করবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের ঝাড় থেকে উত্তেজিত শিশুসুলভ গলায় কে একজন হাঁকল:

'কে তুমি? জার্মান? ফ্রিটজ্?'

অচেনা কথায় আলেক্সেই হুঁশিয়ার হল, কিন্তু যে ডাকছে সে রুশ কোন সন্দেহ নেই তাতে, আর ওটা যে শিশু সেটাও নিঃসন্দেহ।

শিশুর গলায় আর একজন জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কী করছ এখানে?'

'আর তোমরা কারা?' জানতে চাইল আলেক্সেই, কথা বলেই থেমে গেল, নিজের ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে।

ওর প্রশ্নে গাছগুলোর মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল নিশ্চয়ই, ওখানে যারাই থাকুক না তারা চুপিচুপি অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করল, উত্তেজিতভাবে হাত পা নেড়ে, কেননা ডালপালাগুলো অধীরভাবে নড়ে নড়ে উঠল।

'ধোঁকা আর মেরো না, আমাদের ধাপ্পা দেওয়া অত সহজ নয়! মাইল খানেক দূর থেকে জার্মান দেখলেও চিনতে পারি। তুমি জার্মান?'

'তোমরা কারা?'

'সেটা জানার কী দরকার তোমার? নিখত্ ফেরস্টেইন...'*

'আমি রুশ।'

'মিথ্যে কথা... সত্যি হলে চোখজোড়া উপড়ে ফেলব। ফ্যাশিস্ট তুমি!'

'রুশ আমি, রুশ! আমি বৈমানিক। জার্মানরা আমার বিমানটা পেড়ে ফেলে।'

* বুঝতে পারছি না। (জার্মান ভাষায়)

সাবধানতার কোন বালাই আর রাখল না আলেক্সেই। ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে নিজেদের লোকজনই গাছগুলোর পিছনে, রুশ, সোভিয়েত লোকজন। ওকে বিশ্বাস করছে না ওরা। সেটা স্বাভাবিক। যুদ্ধে লোককে সাবধান করে। আর যাত্রা শুরু করার পর এই প্রথম ওর মনে হল যে শরীরে শক্তির লেশমাত্র নেই, হাতে পায়ে, হাঁটতে পারবে না আর, নড়ার ক্ষমতা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই। গালের গভীর খাঁজ বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

'দেখো, ও কাঁদছে!' গাছের পিছন থেকে একজন বলল। 'এই, কাঁদছ কেন?'

'আমি রুশ, তোমাদের মতই একজন, আমি বৈমানিক...'

'কোন বিমান-ঘাঁটির লোক?'

'কিন্তু তোমরা কারা?'

'সেটা জানতে চাইছ কেন? আমাদের কথার জবাব দাও!'

'মনচালভ বিমান-ঘাঁটির লোক। আমাকে সাহায্য করছ না কেন তোমরা? বেরিয়ে এসো! ওখানে কী ছাই...'

গাছগুলোর পিছনে আবার আরো উত্তেজিত চুপিচুপি পরামর্শ চলল। কথাগুলো আলেক্সেই'র কানে স্পষ্ট এল:

'শুনছিস কী বলছে? বলছে মনচালভ বিমান-ঘাঁটি থেকে এসেছে... হয়ত সত্যি কথা বলছে... আর ও কাঁদছে...' তারপর একজন হাঁকল, 'শোনো, বৈমানিক, পিস্তলটা ফেলে দাও ত! ফেলে দাও বলছি, নইলে আমরা এখান থেকে বেরোব না, পালিয়ে যাব!'

পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল আলেক্সেই। ডালপালাগুলো ফাঁক হয়ে গেল, আর দুটি ছেলে, খুব হুঁশিয়ার, একজোড়া কৌতূহলী টমটিটের মত ঝট করে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, হাত ধরাধরি করে সাবধানে ওর দিকে এল। ওদের মধ্যে যে বড়ো সে ক্ষীণদেহ, চোখ তার নীল, হলদেটে চুল, হাতে একটা কুঠার। অন্যটি ক্ষুদে, লাল চুল, মুখে ফুট ফুট দাগ, চোখজোড়া অদম্য কৌতূহলে জ্বলছে, প্রথমটির পিছনে পায়ে পায়ে আসতে আসতে ফিসফিস করে বলল:

'ও কাঁদছে, সত্যি কাঁদছে! আর হাড় জিরজির করছে। কী অসম্ভব রোগা দেখো!'

তখনো হাতে কুঠার, বড়োটি কাছে এসে প্রকাণ্ড ফেল্টের বুট দিয়ে পিস্তলটাকে আরো সরিয়ে দিল, বুটজোড়া খুব সম্ভব ওর বাবার, তারপর বলল:

'তুমি বলছ তুমি বৈমানিক। কোন দলিলপত্র আছে? দেখাও ত সেগ্‌লো!'

'এখানে কারা, আমাদের লোক না জার্মানরা?' অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই, আর হাসি চাপতে পারল না ও।

'বনের মধ্যে থাকি, কী করে বলব? আমাদের ত কেউ খবর দেয় না,' বড়োটি কূটনীতিজ্ঞের মত জবাব দিল।

গত্যন্তর নেই, টিউনিকের পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করতে হল আলেক্সেইকে। অফিসারের লাল কার্ড, উপরে তারার চিহ্ন, সেটা ছোকরাদের উপরে মন্ত্রের মত কাজ কবল। ওদের শৈশব জার্মান অধিকারের সময় বিল্‌প্ত হয়েছে, আপনার জন এই সোভিয়েত বৈমানিকের আবির্ভাবে হঠাৎ যেন ফিরে এল সেটা।

'হ্যাঁ, আমাদের লোকেরা এখানে। তিন দিন ধরে এখানে আছে!'

'তোমার এরকম হাড় বেরিয়ে গেছে কেন?'

'...আমাদের লোকে ওদের কী শিক্ষাটাই না দিয়েছে! দার্‌ণ পিটিয়েছে ওদের, পিটোয়নি আর! ভয়ঙ্কর লড়াই চলে এখানে, জব্বর লড়াই! ওদের অনেক লোক মারা গিয়েছে, বিস্তর লোক! সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

'আর লেজ গ্‌টিয়ে পালাল ওরা! ওদের দেখে হাসি পাচ্ছিল। ওদের একজন কাপড়-কাচার একটা টবে ঘোড়া য্‌তে কেটে পড়ল। আর জখম দ্‌জন একটা ঘোড়ার লেজ আঁকড়ে ধরল, ঘোড়াটার পিঠে আর একজন চাপল, যেন নবাব। যদি দেখতে ওদের!... কোথায় তোমাকে ওরা নামাল?'

কিছ্‌ক্ষণ বকবক করে ছোকরারা কাজে লাগল। বসতি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দ্‌রে ওরা থাকে, সেটা জানাল আলেক্সেইকে। আলেক্সেই এত দ্‌র্বল যে ফিরে চিৎ হয়ে আর একটু ভালো করে শোবার ক্ষমতাও নেই। ছোকরাদের সঙ্গে একটা স্লেজ, "জার্মান কাঠের গ্‌দাম" থেকে — ফাঁকা জায়গাটাকে ওরা এই বলে ডাকে — জ্‌বালানী কাঠ নেবার জন্য ওরা ওটা এনেছিল, কিন্তু সেটা এত ছোট যে আলেক্সেইকে তাতে নেওয়া চলে না। আর তাছাড়া গভীর বরফের উপর দিয়ে ওর ভার টেনে নিয়ে যেতেও ওরা পারত না। বড়ো ছেলেটির নাম সেরিওন্‌কা, ছোট ভাই ফেদকাকে সে বলল যত শীগগির পারে গ্রামে গিয়ে লোক ডেকে আনতে, আর ও নিজে রয়ে গেল, জার্মানদের হাতে আলেক্সেই যাতে না পড়ে, উদ্দেশ্যটা ব্‌ঝিয়ে সেরিওন্‌কা বলল বটে, কিন্তু আসলে আলেক্সেইকে তখনো ও ঠিক বিশ্বাস করেনি। মনে মনে ভাবল, "কিছ্‌ই বলা যায় না। ফ্যাশিস্টগ্‌লো ভয়ানক

সেয়ানা, মরবার ভান ওরা করতে পারে, আর সোভিয়েত বাহিনীর কাগজপত্তরও জোগাড় করতে পারে..." ক্রমশ কিন্তু তার সন্দেহ ঘুচে গেল, তখন সহজভাবে কথা বলতে শুরু করল সে।

পাইন-কাঁটার বিছানায় শুয়ে আলেক্সেই ঝিমোচ্ছে, চোখদুটো আধো-বোজা, অন্যমনস্কভাবে সেরিওন্‌কার বকবকানি শুনছে। বিশ্রামের অবসাদে সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন, তার ঘোরে টুকরো টুকরো কয়েকটা মাত্র কথা তার মনে পৌঁছচ্ছে; আর যদিও কথাগুলোর অর্থ সে ধরতে পারছে না, তবুও মাতৃভাষার শব্দ পরম প্রীতি জোগাচ্ছে ওকে। প্লাভনি গ্রামের লোকেদের উপরে যে দুর্যোগ হঠাৎ ফেটে পড়ে তার কথা পরে সে শোনে।

অক্টোবরের মধ্যেই জার্মানরা এই বনে আর হ্রদ অঞ্চলে এসে পড়ে, তখন বার্চগুলোর পাতায় পাতায় হলদে আভা আর এ্যাসপেনগুলোতে যেন ভয়াবহ লাল আগুন লেগেছে। প্লাভনির ঠিক কাছাকাছি লড়াই চলেনি। গ্রাম থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পশ্চিমে কয়েকটি জার্মান বাহিনী আসে, সবায়ের আগে ট্যাঙ্কের অগ্রগামী মজবুত একটা দল, সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর ছোট একটা দল তাড়াতাড়িতে প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করেছিল, সে দলটিকে নিঃশেষ করে জার্মানরা প্লাভনিতে না ঢুকে পূর্বদিকে এগিয়ে যায়, রাস্তা ছাড়িয়ে একটা বন-হ্রদের আড়ালে গ্রামটা ঢাকা ছিল। বলগয়ে নামের বড়ো রেলওয়ে কেন্দ্রে পৌঁছিয়ে সেটা দখলে আনার তাড়া ছিল জার্মানদের, যাতে পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে, সহর থেকে অনেক দূরে, সারা গ্রীষ্ম আর হেমন্ত ধরে কালিনিন এলাকার লোকেরা, আবালবৃদ্ধবনিতা, নানা বৃত্তি ও পেশার লোকেরা, সহরবাসী আর চাষীরা, দিনরাত কাজ করে যায়, বৃষ্টিতে আর গরমে, মশার কামড়ে, জলার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়, পানীয় জলের অভাব সয়ে, মাটি খুঁড়ে পরিখা আর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। কয়েকশ কিলোমিটার ধরে চলে পরিখার সারি, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, বন আর জলাভূমি হয়ে, হ্রদের পাশ ঘুরে, ছোট ছোট নদী আর স্রোতস্বিনীর তীর ঘেঁষে।

অনেক কষ্ট পেয়েছিল নির্মাতারা, কিন্তু তাদের পরিশ্রম সফল হল। গতির বেগে জার্মানরা কয়েকটা লাইন ভাঙ্গল বটে, কিন্তু শেষটায় এসে তাদের থেমে যেতে হল। এক জায়গায় আবদ্ধ থেকে যুদ্ধ চলল। ব্যূহ ভেঙ্গে জার্মানরা বলগয়েতে পৌঁছতে পারল না; আক্রমণের চাপে আরো দক্ষিণে সরে যেতে হল তাদের, এ এলাকায় তাদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাতে হল।

প্লাভনির বালুকাময় চটচটে জমিতে সাধারণত বেশী ফসল ফলত না, যা ফলত সেটা আর বনের হ্রদে ধরা মাছ দিয়ে চাষীরা চালিয়ে নিত। গ্রামে লড়াই হয়নি বলে ওরা খুসি। জার্মানদের হুকুম মেনে ওরা ওদের যৌথখামারের সভাপতির নাম বদলে গ্রামের মোড়ল করল, কিন্তু যৌথখামার হিসেবেই কাজ করে চলল, ওদের আশা, ফ্যাশিস্টরা চিরকাল ত সোভিয়েত ভূমিতে গেড়ে বসে থাকবে না, ঝড়ঝঞ্ঝা কেটে যাওয়া না পর্যন্ত নিজেদের দূর নিরাপদ স্থানে শান্তিতে ওরা থাকতে পারবে। কিন্তু সৈনিকদের ধূসর পোশাক-পরা জার্মানদের পিছু পিছু এল অন্যরা, কালো পোশাক গায়ে, টুপিতে খুলি আর হাড়ের আড়াআড়ি চিহ্ন। প্লাভনির অধিবাসীদের হুকুম করা হল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জার্মানীতে স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য পনেরো জন স্বেচ্ছাকর্মী যোগাতে হবে, আদেশ অমান্য করলে দারুণ সাজা মিলবে। স্বেচ্ছাকর্মীদের জমায়েৎ হতে হবে গ্রামের প্রান্তে একটি বাড়িতে, সেটা যৌথখামারের অফিস আর মাছের গুদামও বটে, প্রত্যেককে অন্তর্বাস, একটা করে চামচ, ছুরি আর কাঁটা আর দশ দিনের খাবার নিয়ে হাজির হতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কেউ হাজির হল না। এটা বলা অবশ্য দরকার যে ঠেকে-শেখা কৃষ্ণবাস জার্মানরা খুব আশা করেনি যে কেউ হাজির হবে। গ্রামবাসীদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য জার্মানরা যৌথখামারের সভাপতি, অর্থাৎ গ্রামের মোড়ল, আর কিণ্ডারগার্টেনের প্রৌঢ়া তত্ত্বাবধায়িকা ভেরনিকা গ্রিগরিয়েভনা, যৌথখামার দলের দুটি পাণ্ডা আর হাতের কাছে-পাওয়া আরো দশজন চাষীকে ধরে গুলি করে মারল। হুকুম করল, ওরা পড়ে থাকবে, কবর দেওয়া হবে না, আর বলল যে পরের দিন নির্দিষ্ট জায়গায় স্বেচ্ছাকর্মীরা না এলে গ্রামের সমস্ত লোকেরই একই দশা হবে।

কেউ এল না। পরের দিন সকালে ঝঞ্ঝা বাহিনীর সণ্ডারকমাণ্ডোর হিটলারীরা গ্রামে ঘুরল, কিন্তু কোন বাড়িতে লোক নেই। জনপ্রাণী নেই, বুড়ো কিম্বা জোয়ান, কেউ নয়। ভিটেমাটি, বহু বছরের পরিশ্রমে সঞ্চিত জিনিসপত্র সব আর গরুবাছুরের অধিকাংশ ছেড়ে দিয়ে লোকেরা এই অঞ্চল-সুলভ রাত্রির ঘন কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, চিহ্নমাত্র রেখে যায়নি। গ্রামের সবাই, কেউ বাদ পড়েনি, আঠারো কিলোমিটার দূরে বনের গভীরে একটি খোলা জায়গায় গেল। থাকবার জন্য পরিখার মত খোঁদল খুঁড়ে, পুরুষেরা পার্টিজানদের দলে যোগ দিতে চলে গেল, মেয়েরা আর শিশুরা বসন্ত পর্যন্ত কোনক্রমে কাটানোর জন্য রয়ে গেল। সণ্ডারকমাণ্ডো

বিদ্রোহী গ্রামটিকে পন্ড়িয়ে দিল, এ জেলার অধিকাংশ গ্রামেরই একই দশা হয়েছিল, জার্মানরা জেলাটাকে মরা এলাকা বলে ডাকত।

'...আমার বাবা ছিলেন যৌথখামারের সভাপতি, ওরা ওকে গ্রামের মোড়ল বলে ডাকত,' বলল সেরিওন্‌কা, কথাগন্লো আলেক্সেই'র কাছে পেঁছল যেন দেয়ালের ওপাশ থেকে। 'বাবাকে মেরে ফেলল ওরা। আমার বড়ো ভাইকেও মেরে ফেলল। সে পঙ্গন্ ছিল, একটা মাত্র হাত ছিল। হাতটা খামারের ঢেঁকিতে ভেঙ্গে যাওয়াতে কেটে ফেলতে হয়। ষোলোজনকে ওরা খন্ন করে... নিজের চোখে দেখেছি। জার্মানরা আমাদের সবাইকে বেরিয়ে এসে দেখতে বাধ্য করে। বাবা চেঁচিয়ে ওদের গালাগালি দেন, "এর সাজা তোদের মিলবে, বদমায়েস কোথাকার! মন্খে রক্ত উঠে মরবি তোরা!"

বিষন্ন শ্রান্ত বড়ো বড়ো চোখ আর সোনালী চুল ছেলেটির কথা শন্নতে শন্নতে আলেক্সেই'র মন অদ্ভুত একটা অনন্ভূতিতে ভরে গেল। মনে হল জমাট কুয়াশায় ভেসে চলেছে। অমানন্ষিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে কয়েক দিন, অসীম ক্লান্তিতে শরীর আচ্ছন্ন। একটা আঙন্ল পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না আলেক্সেই, আর নিজেরি বিশ্বাস হচ্ছে না যে মাত্র দন্ঘণ্টা আগে পর্যন্ত সে চলেছিল।

'তাহলে তোমরা বনে থাক?' প্রায় শোনা যায় না এমন ক্ষীণকণ্ঠে ও বলল, ঘন্মের ঘোর কষ্টে কাটিয়ে উঠে।

'থাকিই ত! আমরা তিনজন এখন — ফেদকা, মা আর আমি। আমার একটি বোন ছিল, নিউশ্‌কা নাম। শীতকালে মারা যায়। সমস্ত শরীর ফুলে ওঠে, তারপর মারা যায়। আমার ছোট্ট ভাইটা, সেও মারা যায়। আর এখন আমরা তিনজন... জার্মানরা আর ফিরে আসছে না, কী বলো? কী মনে হয় তোমার? দাদামশাই, তিনি এখন আমাদের সভাপতি, তিনি বলেন যে ওরা আর ফিরবে না; তিনি বলেন, "কবর থেকে মড়ারা আর ফিরে আসবে না।" কিন্তু মা, বড্ড ভয় মা'র। পালিয়ে যেতে চান তিনি। বলেন, ওরা ফিরে আসতে পারে... ওই দেখো! দাদন্ আর ফেদকা আসছে।'

ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তে লাল-চুল ফেদকা দাঁড়িয়ে আলেক্সেইকে দেখাচ্ছে; ওর সঙ্গে একজন কাঁধ-বসা দীর্ঘাকৃতি চওড়া বন্ড়ো, পরনে বাড়িতে-বোনা ছেঁড়াখোঁড়া, পাতলা বাদামী রঙের কোট, দড়ি দিয়ে সেটা কোমরে বাঁধা, মাথায় জার্মান অফিসারের উঁচু টুপি।

মিখাইল দাদন্, ছেলেরা এই নামেই তাঁকে ডাকে। গ্রামের অনাড়ম্বর

আইকনে আঁকা সেণ্ট নিকলাসের মত দয়ালু মুখ, চোখদুটো স্বচ্ছ উজ্জ্বল, শিশুর মত, নরম পাতলা লম্বা দাড়ি শাদা হয়ে গিয়েছে। আলেক্সেইকে নানা রঙের তাপ্পি দেওয়া ভেড়ার চামড়ার একটা পুরোনো কোটে তিনি জড়ালেন, তার হালকা ক্ষীণ দেহ তুলতে তুলতে সরল বিস্ময়ে বারবার বললেন:

'আহা বেচারা! তুমি ত শুকিয়ে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছ! একেবারে কঙ্কালসার! যুদ্ধে লোকের কী না হচ্ছে! দুঃসময় পড়েছে।'

যেন সদ্যজাত শিশুকে নাড়াচাড়া করছেন এমন ভাবে সাবধানে শ্লেজে শোয়ালেন আলেক্সেইকে, দড়ি দিয়ে বাঁধলেন তাকে, এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিজের কোট খুলে পাট করে ওর মাথার নিচে রাখলেন। তারপর শ্লেজের সামনে গিয়ে মোটা কাপড়ে তৈরী ছোট একটা কলারে নিজেকে যুতে, দুটো দড়ি দুটো ছেলেকে দিয়ে তিনি বললেন, 'ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!' তিনজনে গলন্ত বরফের উপর দিয়ে শ্লেজটাকে টেনে নিয়ে চলল, বরফ আটকে ধরছে পা, কিরকির করছে, পায়ের চাপে বসে যাচ্ছে।

১৫

পরের দু তিনদিন আলেক্সেই'র মনে হল যেন জমাট উষ্ণ কুয়াশায় আবৃত সে, সেটা ভেদ করে চারিদিকে কী হচ্ছে তার শুধু ভাসা-ভাসা ছবি তার সামনে আসছে। বাস্তব মিশে গেল বিকারগ্রস্ত কল্পনায়, বেশ কিছু দিন না কাটার আগে প্রকৃত ঘটনাগুলোকে পূর্বাপরভাবে সাজাতে সে পারল না।

বনের গভীরে ফেরারীরা থাকে। মাটিতে খোঁড়া থাকবার জায়গাগুলো পাইনের ডালপালা দিয়ে ছাওয়া, বরফে এখনো ঢাকা, প্রায় চোখে পড়ে না। ধোঁয়া যখন ওঠে তখন মনে হয় সটান মাটি থেকে উঠছে। যেদিন ওখানে পেৌঁছল আলেক্সেই সেদিন হাওয়া বন্ধ, কনকনে ঠাণ্ডা, শ্যাওলায় ধোঁয়া লেগে আছে, গাছে গাছে এঁকেবেঁকে চলেছে ধোঁয়া, তাতে ওর মনে হল যে নিভন্ত দাবাগ্নিতে সমস্ত জায়গাটা ঘেরা।

যখন খবর গেল যে একজন সোভিয়েত বৈমানিক কেমন করে কেউ জানে না এখানে এসে পড়েছে, মিখাইল তাকে নিয়ে আসছে, আর ফেদকার ভাষায়, তাকে দেখতে ঠিক কঙ্কালের মত, তখন ওখানকার বাসিন্দারা সবাই দলে দলে বেরিয়ে এল; বেশীর ভাগই মেয়ে আর বাচ্চা, কয়েকজন মাত্র বুড়ো। গাছের মাঝখান দিয়ে দেখা গেল "ত্রয়কা"টা আসছে, মেয়েরা দৌড়িয়ে

গেল সেদিকে, দঙ্গল-করা বাচ্চাদের হটিয়ে দিয়ে চারদিক থেকে স্লেজটাকে ঘিরে ফেলল, কাঁদতে কাঁদতে সেটাকে নিয়ে চলল নিজেদের খোঁদলে। সবায়ের জামাকাপড় ছেঁড়াখোঁড়া, সবাই সমানভাবে বুড়িয়ে গিয়েছে মনে হয়। খোঁদলের চুল্লীর ধোঁয়া আর ঝুলে মুখগুলো সব কালো, কালো চামড়ায় কারো কারো চোখ আর দাঁত ঝকঝকে শাদা দেখাচ্ছে, শুধু তাই থেকে আঁচ করা সম্ভব যে তাদের বয়স কম।

'মেয়েদের নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল! তোমরা এখানে ভিড় করছ কেন? তামাশা পেয়েছ না কি?' কলারটা জোরে টেনে মিখাইল দাদু রেগে বললেন। 'দয়া করে পথ ছেড়ে দাও ত! হায় ভগবান, এরা সবাই একেবারে ভেড়ার মত! বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে!'

আলেক্সেই'র কানে গেল মেয়েদের ভিড়ে কারা যেন বলছে:

'কী অসম্ভব রোগা! সত্যি সত্যি কঙ্কালের মত দেখতে! নড়াচড়া করছে না একেবারে। বেঁচে আছে ত?'

'ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে... কী হয়েছে ওর? কী রোগা, কী অসম্ভব রোগা!'

তারপর বিস্ময়সূচক উক্তি সব থেমে গেল। অজানা কিন্তু ভয়াবহ কত অভিজ্ঞতা বৈমানিকটিকে নিশ্চয়ই ভুগতে হয়েছে, তার কথা ভেবে মেয়েরা বিশেষভাবে বিচলিত হল। বনের ধার দিয়ে স্লেজটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পাতাল গ্রামটি কাছে এসে পড়েছে যখন তখন কোন খোঁদলে আলেক্সেইকে রাখা হবে সেই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হল।

'আমার খোঁদলটা খটখটে, বালিতে ভরা, বেশ হাওয়া আসে... তাছাড়া একটা চুল্লীও আছে,' ছোটখাটো, গোলমুখ একটি মেয়ে বলল, চোখদুটো চটুল, চোখের শাদা ভাগটা তরুণ নিগ্রোর চোখের মত চিকচিকে।

'চুল্লী ত আছে কিন্তু তোমরা কজন একসঙ্গে থাক, বলো ত! গন্ধে ভূত পালায়!.. মিখাইল, ওকে আমার ঘরে নিয়ে চলো। আমার তিনটি ছেলে সোভিয়েত ফৌজে, আর আমার কিছু ময়দাও আছে। ওকে চাপাটি বানিয়ে দেব!'

'না, না, ওকে আমার ঘরে রাখো! অনেক জায়গা আছে। আমরা মাত্র দুজন, অনেক জায়গা আছে। চাপাটিগুলো পাঠিয়ে দিও, যেখানে হোক খেলেই হল। কুসিউশা আর আমি ওকে দেখাশোনা করব, তুমি নিশ্চিত

থাকতে পার। আমাদের কিছু জমা নোনা মাছ আর ব্যাঙের ছাতা আছে... ওকে মাছ রান্না করে দেব আর ব্যাঙের ছাতার ঝোল...'

'ও ত মরতে বসেছে, মাছ খেয়ে কী লাভ হবে? ওকে আমাদের আস্তানায় রাখো, দাদু, আমাদের একটা গরু আছে, দুধ খেতে পারবে ও!'

কিন্তু মিখাইল শ্লেজ টেনে নিজের আস্তানায় নিয়ে গেল, পাতাল গ্রামটির মাঝামাঝি জায়গায় সেটা।

...আলেক্সেই'র মনে আছে মাটির নিচে ছোট, ময়লা একটি খোঁদলে তক্তার পাটাতনে সে শুয়েছিল, দেয়ালে-লাগানো ধোঁয়ায় মলিন কাঠির আগুন ফটফট করে জ্বলছে আর আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরিয়ে আসছে। তার আলোয় দেখা যাচ্ছে পোঁতা খুঁটিতে ভর দিয়ে বসানো জার্মান মাইনের বাক্স দিয়ে তৈরী একটা টেবিল, তার চারধারে কাঠের কুঁদো কয়েকটা টুলের কাজ দিচ্ছে; কালো রুমাল মাথায়, পরনে পুরোনো জামাকাপড়, পাতলা চেহারার একটি মেয়ে টেবিলের উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে — মেয়েটি হল ভারভারা, মিখাইল দাদুর কনিষ্ঠা পুত্রবধূ -- আর স্বয়ং দাদুটির পাতলা পক্ককেশ মাথা।

খড়ের ডোরা-কাটা তোষকে আলেক্সেই শুয়ে, ওর গায়ে তখনো তাপ্পি-মারা ভেড়ার চামড়ার কোটটা জড়ানো, তা থেকে টক টক, প্রীতিকর ঘরোয়া গন্ধ বেরোচ্ছে। আর যদিও সমস্ত শরীরে লাঠিপেটার মত ব্যথা, আর পাদুটো এমন জ্বলছে যেন গনগনে ইটের উপরে রাখা হয়েছে, তবুও এভাবে নড়াচড়া না করে শুয়ে থাকতে বেশ লাগছে; ও জানে ভয়ের আর কোন কারণ নেই, চলতে কি ভাবতে হবে না, হামেশা হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে না।

খোঁদলের কোণায় চুল্লী, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে ধূসর সজীব পাকে পাকে; আলেক্সেই'র মনে হল শুধু ধোঁয়া নয়, টেবিলটা, সব সময় কিছু না কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত মিখাইল দাদুর পাকা মাথাটি আর ভারভারার পাতলা শরীরও ভাসছে, দুলছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজল আলেক্সেই। চট-দেওয়া দরজা থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আসাতে জেগে উঠে আবার চোখ খুলল। টেবিলের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। টেবিলে একটি ব্যাগ রেখে তার উপরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, যেন ভাবছে ওটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কিনা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি ভারভারাকে বলল:

'যুদ্ধের আগে থেকেই কিছু ফোরিনা আমার কাছে আছে। কসতিউন্‌কার জন্যে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু ওর ত আর কিছুরই দরকার নেই

এখন। এটা নাও, তোমার অতিথিকে রান্না করে দিও। বাচ্চাদের খাবার এটা, ঠিক এরকম জিনিস ওর এখন খাওয়া উচিত।'

ফিরে চলে গেল মেয়েটি, খোঁদলের সবাই ওর শোকে শোকার্ত। আর একজন কিছু জমা নোনা মাছ নিয়ে এল, আর কেউ আনল চুল্লীতে সে'কা চাপাটি, সদ্য-সে'কা রুটির উষ্ণ টক গন্ধে খোঁদল ভরে গেল।

সেরিওন্কা আর ফেদকা এল। চাষীসুলভ গাম্ভীর্যে ফৌজী টুপি সরিয়ে সেরিওন্কা বলল, 'সুপ্রভাত,' টেবিলে তামাকের গ‍ুঁড়ো আর ভূষি-লাগা চিনির দুটো ডেলা রাখল।

'চিনিটা মা পাঠিয়েছেন। আপনার পক্ষে চিনি ভালো, এটা খাবেন,' সেরিওন্কা বলল। তারপর মিখাইলের দিকে ঘুরে কাজের কথা বলার সুরে জানাল, 'সে-জায়গাটায় আবার গিয়েছিলাম। একটা লোহার ঘটি, প্রায় আস্ত দুটো শাবল, আর কুঠারের গোড়া একটা পেয়েছি। ওগুলো কাজে লাগতে পারে।'

ভাইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে ফেদকা লোভী দৃষ্টিতে চিনির দিকে তাকিয়ে আছে, বেশ শব্দ করেই জিভ চাটল সে, নাল গড়িয়ে পড়ছে।

পরে এসব কথা ভাবার সময় আলেক্সেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিল গ্রামে তার জন্য আনা টুকিটাকি জিনিসগুলোর মূল্য কতখানি, গ্রামের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী সেই শীতে অনাহারে মারা যায়, এমন কোন ঘর ছিল না যেটি একটি, এমন কি দুটি প্রিয়জনের জন্য শোকার্ত নয়।

'সত্যি, মেয়েদের মত লোক হয় না! কী বলছি শুনছ আলিওশা, আমি বলছি যে রুশী মেয়েদের তুলনা হয় না। ওদের হৃদয় নাড়া দিলেই সর্বস্ব দিয়ে দেবে, দরকার হলে জানও দেবে। আমাদের মেয়েরা এইরকম। ঠিক বলছি না?' মেয়েরা আলেক্সেইর জন্য জিনিস আনলে সেগুলো নিতে নিতে মিখাইল দাদু বলতেন, তারপর হাতের কাজে আবার মন দিতেন, কাজ সব সময় লেগে আছে — ঘোড়ার সাজ কিম্বা একজোড়া ক্ষয়ে-যাওয়া ফেল্টের জুতো সারাচ্ছেন। 'তাছাড়া কাজেও আমাদের মেয়েরা ছেলেদের সমান! সত্যি কথা বলতে ওরা দুএকটা জিনিসে তালিম দিতে পারে আমাদের! শুধু ওদের উগ্র বচন আমার ভালো লাগে না, ওরা আমাকে নাজেহাল করে ছাড়বে, এই মেয়েগুলো আমাকে নাজেহাল করে মারবে, সত্যি বলছি! যখন আমার আনিসিয়া মারা গেল তখন, আমি পাপী, মনে মনে ভাবলাম, "ভগবানকে ধন্যবাদ, একটু শান্তিতে থাকতে পারব এখন!"

কিন্তু জানো, সেটা ভাবার জন্য ভগবান আমাকে সাজা দিলেন। আমাদের সব মরদ, ফৌজে যাদের নেওয়া হয়নি, জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য পার্টিজানদের দলে গেল তারা, আর আমি কৃতকর্মের জন্য পড়ে রইলাম মেয়েদের পাণ্ডা হিসেবে, ভেড়ার দলে ছাগ-সর্দারের মত!.. আমার কপাল খারাপ, সত্যি বলছি!'

এই বনের বসতিতে অনেক কিছু দেখে আলেক্সেই অত্যন্ত অবাক হল। প্লাভনির অধিবাসীদের সবকিছু, বহু পুরুষের শ্রমে অর্জিত সবকিছু জার্মানরা কেড়ে নিয়েছে — বাড়িঘরদোর, জিনিসপত্র, চাষের সরঞ্জাম, গরুবাছুর, হাঁড়িকুঁড়ি, জামাকাপড়, আর এখন তারা বহুকষ্টে বনে সময় কাটাচ্ছে, ফ্যাশিস্টরা ওদের দেখে ফেলবে তার ভয় হামেশা রয়েছে। অনাহারে ওরা দিন কাটাচ্ছে, শীতে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু যৌথখামার ভেঙ্গেচুরে যায়নি; বরঞ্চ যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা ওদের আরো সংহত করেছে। এমন কি খোঁদলগুলো পর্যন্ত ওরা যেমন-তেমন ভাবে করেনি, খামারের দল অনুযায়ী যৌথভাবে তৈরী করে সেগুলোতে প্রবেশ করে। জামাইকে জার্মানরা হত্যা করার পর যৌথখামারের সভাপতির কাজের ভার নেবার পর মিখাইল দাদু বনেও যৌথখামারের সমস্ত রীতিনীতি পুরোপুরি মেনে চলেন। এখন তাঁর পরিচালনায় আদিম অরণ্যের গভীরে এই গুহা-গ্রামের অধিবাসীরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে বসন্তের জন্য তৈরী হচ্ছে।

গ্রাম থেকে পালিয়ে আসার সময় যতটুকু শস্য বাঁচাতে পেরেছিল সবটুকু, খুদকুঁড়ো পর্যন্ত কিষাণীরা অনাহার সত্ত্বেও সাধারণ খোঁদলে জমা করে। জার্মানদের হাত থেকে কয়েকটি গরু বাঁচানো গিয়েছিল, তাদের বাছুর হলে অতি যত্নে তাদের রাখা হয়। উপবাস করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু যৌথ সম্পত্তি এই গরুবাছুরগুলোকে ওরা হত্যা করেনি। মৃত্যুর পরোয়া না করে ছেলেরা পুরোনো, ভস্মীভূত গ্রামে গিয়ে ছাই'এর গাদায় হাতড়ে খুঁজে আগুনের আঁচে নীল কয়েকটা লাঙলের ফলা পায়। পাতাল গ্রামে নিয়ে এসে যেগুলো ব্যবহারযোগ্য সেগুলোতে কাঠের বাঁট লাগিয়ে নেয়। বসন্তে গরু যুতে লাঙল দেবার জন্য মেয়েরা চট থেকে জোয়াল বানায়। পালা করে হ্রদে মেয়েরা মাছ ধরে, এইভাবে শীতকালে সারা গ্রামের আহার্য জোগাড় করে তারা।

মেয়েদের উদ্দেশ্যে মিখাইল দাদু গজগজ, গরগর করতেন; যৌথখামারের কোন বিষয় নিয়ে ওরা ওঁর খোঁদলে অনেকক্ষণ ধরে রেগেমেগে ঝগড়া করছে,

বিষয়টির তাৎপর্য কি সেটা আলেক্সেই'র অজানা; কানে আঙ্গুল দিতেন মিখাইল দাদু, ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলে তীক্ষ্ম জিল গলায় চীৎকার করে মেয়েদের বকতেন বটে, কিন্তু ওদের গুণের তারিফ করতে ছাড়তেন না, নির্বাক শ্রোতাটির নিরীহতার সুযোগ নিয়ে "নারীজাতিকে" প্রশংসা করে আকাশে তুলতেন তিনি।

'কিন্তু ব্যাপারটি কী বলো ত, আলিওশা ভায়া,' বলতেন মিখাইল। 'মেয়েরা সব সময়ে যে-কোন জিনিস দুটো হাত দিয়ে আঁকড়ে থাকে। ঠিক বলছি না? কেন ওরকম করে? কিপটে বলে? একেবারেই নয়। জিনিসটা তাদের দরকার বলে ওরকম করে। বাচ্চাদের ওরাই ত খাওয়ায়, যাই বলো না কেন, সংসার ত ওরাই চালায়। এখানে কী ঘটেছিল শোনো এবার। কেমন ভাবে আমরা থাকি দেখছ ত, প্রত্যেকটি খুদ হিসেব করে চলি। আমরা না খেয়ে সময় কাটাচ্ছি, সত্যি কথা। ব্যাপারটা জানুয়ারী মাসে ঘটে। একদল পার্টিজান হঠাৎ হাজির। আমাদের গ্রামের লোক নয়, তারা ত ওলেনিনের কাছে কোথায় লড়ছে শুনেছিলাম। এরা আমাদের অজানা, রেলওয়ে থেকে এসেছিল। হঠাৎ এসে পড়ে আমাদের বলে, "ক্ষিধেয় আমরা মরে যাচ্ছি।" কী হল বলো ত? পরের দিন মেয়েরা ওদের ঝোলা খাবারে বোঝাই করে দিল, যদিও নিজেদের বাচ্চারা না খেতে পেয়ে ফুলে উঠেছে, হাঁটবার ক্ষমতাও তাদের নেই। কী মনে হয়? ঠিক বলছি?.. মনে ত হয় ঠিক বলছি। যদি বড়ো গোছের জেনারেল হতাম, জার্মানদের ভাগিয়ে দেবার পর আমাদের সেরা সৈনিকদের জড়ো করে, সার বেঁধে মেয়েদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতাম ওদের সেলাম করে মার্চ করে যাও। ঠিক তাই করতাম!..'

বুড়োর বকবকানি ঘুম-পাড়ানো ছড়ার মত কাজ করত, তিনি কথা বলে চলেছেন, আলেক্সেই মাঝেমাঝে ঘুমিয়ে নিত। মাঝেমাঝে অবশ্য ওর আগ্রহ হত পকেট থেকে চিঠিপত্তর আর মেয়েটির ছবি বের করে মিখাইলকে দেখায়, কিন্তু নড়বার শক্তি ছিল না ওর। কিন্তু মিখাইল দাদু মেয়েদের প্রশংসা শুরু করলে আলেক্সেই'র মনে হত টিউনিকের কাপড় ভেদ করে চিঠিগুলোর উত্তাপ অনুভব করতে পারছে।

টেবিলের ধারে বসে থাকত মিখাইল দাদুর নির্বাক পুত্রবধূ, সব সময়ে কিছু না কিছু সে করছে। প্রথম প্রথম ওকে বৃদ্ধা ভেবেছিল আলেক্সেই, দাদুর স্ত্রী বুঝি, কিন্তু পরে দেখল যে ওর বয়স বিশ-বাইশের বেশী হতে পারে না। মেয়েটি লঘুগতি, সুঠাম সুন্দর; আলেক্সেই লক্ষ্য করল যে যখনি

মেয়েটি তার দিকে তাকায় তখনি ভীত উৎকণ্ঠিত একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ওর বুক কেঁপে ওঠে, ঢোক গেলার মত। রাত্রে মাঝেমাঝে, ঘাসের পলতেটা নিভে গিয়েছে, আর খোঁদলের ধোঁয়াটে অন্ধকারে ডাকছে ঝিঁঝিঁপোকাটা — ভস্মীভূত গ্রামে ওটাকে পেয়ে মিখাইল দাদু আস্তিনে করে নিয়ে আসেন, সঙ্গে আনেন কয়েকটা পোড়া বাসন যাতে জায়গাটা আপনার মনে হয় ওটার — তখন আলেক্সেই'র মনে হত অন্য কাঠের পাটাতনে কে যেন চাপা গলায় কাঁদছে আর বালিশ কামড়ে কান্নার শব্দ চাপার চেষ্টা করছে।

১৬

মিখাইল দাদুর ওখানে থাকার তৃতীয় দিন সকালে বৃদ্ধ বেশ জোর দিয়ে আলেক্সেইকে বললেন:

'উকুনে ভরে গিয়েছ তুমি, আলিওশা, সত্যি বলছি! গোবর-পোকার মত। আর গা চুলকানো ত তোমার পক্ষে মুশকিল। কী করব শোনো, তোমাকে স্নান করিয়ে দেব। কী বলো?.. ভাপে নাইয়ে দেব। তাহলে চমৎকার লাগবে। তোমাকে ধুয়ে হাড়গুলোতে একটু সেঁক দিতে হবে। যা ভোগান্তি তোমার গিয়েছে, স্নান করলে ভালোই হবে। কী বলো? ঠিক বলছি না?'

স্নানের বন্দোবস্ত করতে শুরু করলেন মিখাইল দাদু। কোণের চুল্লীর আগুন এত গনগনে করে তুললেন যে চুল্লীর পাথরগুলো চড়চড় করতে লাগল। খোঁদলের বাইরে বড়ো করে আগুন জ্বালানো হল, আলেক্সেই শুনল সেখানে একটা বড়ো গোছের পাথর গরম করা হচ্ছে। পুরোনো একটা কাঠের টব জলে ভর্তি করল ভারিয়া। মেঝেতে বিছোনো হল সোনালী খড়। তারপর মিখাইল দাদু খালি গায়ে, শুধু আণ্ডারউইয়ার পরে, কিছু ক্ষারের জিনিস একটা ছোট কাঠের বালতিতে তাড়াতাড়ি গুলে নিলেন, গাছের ভিতরের ছাল দিয়ে তৈরী তোষকের এক টুকরো কেটে স্নানের সাজ বানানো হল। খোঁদলটা এত তেতে উঠল যে ছাত থেকে টপটপ করে ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা পড়তে লাগল, তখন বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে লোহার পাতে করে গনগনে লাল পাথরটা নিয়ে এলেন। টবে ফেললেন পাথরটা। ছাত পর্যন্ত ঝট করে উঠল বাষ্পের পুঞ্জ, ছড়িয়ে পড়ল তার নিচে, তারপর

বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেড়ার কুঞ্চিত লোমের মত হয়ে গেল। কিছু দেখা যাচ্ছে না বাষ্পের কুয়াশায়, কিন্তু আলেক্সেই বুঝল যে সুদক্ষ হাতে বৃদ্ধ তার জামাকাপড় খুলে নিচ্ছেন।

শ্বশুরকে সাহায্য করছে ভারিয়া। এত গরম যে সে তুলো-ভরা কোট আর মাথার রুমাল খুলে ফেলল। ছেঁড়াখোঁড়া রুমালের নিচে যার অস্তিত্বের কথা প্রায় ভাবা যেত না সেই চুলের ভারী গোছা ছড়িয়ে পড়ল তার পিঠে; পাতলা চেহারা, লঘু পা, বড়ো বড়ো চোখ তার, হঠাৎ ধর্মভীরু একটি বৃদ্ধা থেকে যুবতীতে রূপান্তরিত হল ভারিয়া। এত অপ্রত্যাশিত এই রূপান্তর যে আলেক্সেই নিজের নগ্নতায় লজ্জিত বোধ করল, এতদিন সে ভালো করে ভারিয়াকে দেখেনি একবার।

'কিছু ভেবো না, আলিওশা! কিছু ভেবো না,' মিখাইল দাদু আশ্বাস দিয়ে বললেন। 'নিরুপায়, তোমার এ কাজটা করতেই হবে আমাদের! শুনেছি ফিনল্যান্ডে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে স্নান করে। কী? সত্যি নয় সেটা? হয়ত আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু ভারিয়া, এখন ত ও হাসপাতালের নার্সের মত একজন, আহতকে দেখাশোনা করছে, লজ্জা পাবার কিছু নেই। ওকে ধর ত ভারিয়া, সার্টটা খুলে নিই। হায় ভগবান, সার্টটা যে একেবারে পচে গিয়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে!'

তরুণীটির বড়ো কালো চোখে বিভীষিকার ছাপ আলেক্সেই দেখল। ভাপের নড়ন্ত পর্দা ভেদ করে নজরে পড়ল নিজের শরীর, তার বিপর্যয়ের পর এই প্রথম। সোনালী খড়ে শোয়া একটা মানুষ, চর্মসার কঙ্কাল, হাঁটুর গোছ বেরিয়ে আছে, সঙ্কীর্ণ কুক্ষি, পেট একেবারে বসে গিয়েছে, পাঁজরার হাড় ফুটে উঠেছে।

বৃদ্ধ বালতিতে ক্ষারের জল ঘুলিয়ে, গাছের ছালের স্পঞ্জ পাঁশুটে তেলা জলে ডুবিয়ে আলেক্সেই'র শরীরের উপরে সেটা তুলে ধরলেন। উষ্ণ বাষ্পের মধ্যে চোখে পড়ল খড়ের উপরে শায়িত তার ক্ষীণদেহ, আর স্পঞ্জশুদ্ধ হাত আর নামাতে পারলেন না।

'হায় ভগবান,' তিনি বলে উঠলেন। 'তোমার দারুণ দুর্দশা দেখছি, আলিওশা! তোমার অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়! কী? জার্মানদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছ বটে, কিন্তু তুমি কি...' ভারিয়া পিছন থেকে আলেক্সেইকে ধরে রেখেছিল, হঠাৎ তার দিকে সক্রোধে ঘুরে বৃদ্ধ বললেন, 'উলঙ্গ একটা মানুষের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছো কেন, সরম নেই

নাকি! ঠোঁট কামড়াচ্ছ কেন? তোমরা মেয়েরা সবাই সমান! আর আলেক্সেই, কিছু ভেবো না তুমি, মাথা ঘামাবার কিছু নেই! যমকে কাছ ঘেঁষতেই দেব না আমরা, কিছুতেই দেব না! তোমাকে সারিয়ে তুলবই. একেবারে চাঙ্গা করে দেব, বিশ্বাস করো আমার কথা!'

সযত্নে, বেশ দক্ষভাবে, যেন শিশুকে স্নান করাচ্ছেন এমন ভাবে আলেক্সেইকে ক্ষারজল দিয়ে ধোয়ালেন তিনি, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে জল ঢেলে দিলেন, এত জোরে গা দলাই-মলাই করলেন যে খোঁচা খোঁচা পাঁজরার হাড়ের উপরে পিছলিয়ে হাতদুটো সত্যি সত্যি মড়মড় করে উঠল।

নিঃশব্দে ভারিয়া তাঁকে সাহায্য করে গেল।

ওকে বকবার কোন কারণ ছিল না বৃদ্ধের। হাতে ভর-দেওয়া অসহায়, ভয়াবহ জীর্ণ দেহটির দিকে তাকায়নি সে। চেষ্টা করছিল না তাকাতে, কিন্তু বাম্পের মধ্য দিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখনি আলেক্সেই'র পা কিম্বা হাত চোখে পড়ছিল তখনি দৃষ্টিতে আসছিল বিভীষিকার আভাস। ভারিয়া কল্পনা করতে শুরু করল যে বৈমানিকটি হঠাৎ এসে-পড়া আগন্তুক নয়, ওর মিশা সে; ফ্যাশিস্ট পশুরা যাকে এই অবস্থায় পরিণত করেছে সে অপ্রত্যাশিত কোন অতিথি নয়, তার নিজের স্বামী সে, একটি বসন্ত যার সঙ্গে কাটিয়েছিল, চওড়া-পিঠ জোয়ান একজন, মুখে চকচকে ফুটফুট দাগ, এত পাতলা ভুরু যে মনে হত ভুরু নেই, হাতদুটো বিরাট আর বলিষ্ঠ। হাতে ধরে আছে নিজের মিশার মৃতপ্রায় দেহ, কল্পনা করল ভারিয়া। আর বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে, মাথা ঘুরতে লাগল, শুধু ঠোঁট কামড়ে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল।

...পরে পাতলা, ডোরা-কাটা তোষকে শোয়ানো হল আলেক্সেইকে, গায়ে দেওয়া হল মিখাইল দাদুর লম্বা, অনেক জোড়াতালি-দেওয়া কিন্তু পরিষ্কার আর নরম সার্ট একটা; সমস্ত শরীরে এল বেশ তাজা আর বলিষ্ঠ একটা অনুভূতি। স্নানের পর চুল্লীর উপরে ছাতের ফুটো দিয়ে বাস্প সব বেরিয়ে গিয়েছে, ভারিয়া ওকে বিলবেরির গরম ধোঁয়াটে চা দিল। চিনির ছোট ছোট টুকরোর সঙ্গে আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে চা খেল আলেক্সেই, চিনির ডেলাদুটো ছেলেরা এনেছিল, ডেলাদুটো ভেঙ্গে বার্চের শাদা ছালের ফালিতে রেখে ভারিয়া ওকে দিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল আলেক্সেই, বিপর্যয়ের পর এই প্রথম নিটোল স্বপ্নহীন ঘুম।

উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তার শব্দে ওর ঘুম ভাঙ্গল। খোঁদলে প্রায় ঘুটঘুটে অন্ধকার, কাঠির আগুনটা কোনোক্রমে টিমটিম করে জ্বলছে। ধোঁয়াটে অন্ধকারে মিখাইল দাদুর তীক্ষ্ম ভাঙ্গা গলা শুনতে পেল আলেক্সেই:

'মেয়েলী বুদ্ধি আর কাকে বলে! তোমার কোন কান্ডজ্ঞান নেই! লোকটা এগারো দিন জোয়ারের বীচি পর্যন্ত মুখে দিতে পারেনি, আর তুমি ওগুলোকে সেদ্ধ করে শক্ত করে ফেলেছ... এই শক্ত সেদ্ধ ডিমগুলো খেলে আর ওকে বাঁচতে হবে না!'.. তারপর অনুনয়ের সুরে মিখাইল দাদু বললেন, 'ওর ডিমের দরকার এখন নেই। কীসে ওর ভালো হবে জানো, ভাসিলিসা? মুরগীর খাসা সুরুয়া! ব্যস, আর কিছু নয়! তাতে ও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। যদি "পার্টিজান্‌কা" কিছু আনতে পার — বুঝলে...'

একটি বৃদ্ধার আতঙ্কিত খরখরে কণ্ঠস্বর মিখাইল দাদুকে বাধা দিল:

'পারব না আনতে! কিছুতেই আনব না! বুড়ো শয়তান কোথাকার, আমার কাছে চেয়ে কোন লাভ হবে না! "পার্টিজানকা"... মুরগীর সুরুয়া!.. দেখো দিকি, ওরা কত কিছু এরি মধ্যে এনেছে। একটা বিয়ের ভোজ ওতে চলে! এর পরে আর কি চাইবে তুমি শুনি।'

বৃদ্ধের ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'এভাবে মেয়েলী কথা বলার জন্যে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, ভাসিলিসা। তোমার দুটো ছেলে রণাঙ্গনে লড়ছে, আর তুমি কিনা বোকার মত বকবক করছ! এই লোকটা, বলা যায়, আমাদের জন্যে নিজেকে পঙ্গু করেছে, নিজের রক্ত দিয়েছে...'

'ওর রক্ত চাই না আমি। আমার ছেলেরা আমার জন্যে নিজেদের রক্তপাত করছে। আমার কাছে চেয়ে কোন লাভ হবে না। বলেছি ত দেব না, ব্যস, দেব না আমি!'

দরজার কাছে দ্রুতবেগে চলে গেল প্রাচীনার ছায়া, দরজাটা খোলাতে বসন্তের আলোর রেখা খোঁদলে এক ঝলকে এল, এত উজ্জ্বল সে আলো যে চোখ একেবারে বুজে কাতরে উঠল আলেক্সেই। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি কাছে এলেন:

'তুমি জেগেছিলে না কি, আলিওশা? আমাদের কথাবার্তা কানে গিয়েছে? গিয়েছে বুঝি? কিন্তু ওকে খারাপ ভেবো না, আলিওশা, যা বলেছে তার জন্যে নিন্দে কোরো না। কথা ত শুধু খোসা, ওর শাঁসটা কিন্তু ভালো। মুরগী দিতে নারাজ মনে হচ্ছে? একেবারেই না, আলিওশা! জার্মানরা ওর পরিবারের সমস্ত লোককে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, আর পরিবারটা

নেহাৎ ছোট ছিল না, দশজন লোক ছিল। ওর সবচেয়ে বড়ো ছেলে কর্ণেল। জার্মানরা সেটা জানতে পেরে কর্ণেলের পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে গুলি করে মারে, শুধু ভাসিলিসাকে ছেড়ে দেয়। ওদের বাড়িঘরদোর পুড়িয়ে দেয়। আত্মীয় বলতে ওর কেউ নেই। বুঝতেই পারছ ওর মত বয়সে পরিবারবর্গহীন হয়ে থাকার মানে কী! থাকবার মধ্যে আছে একটা মুরগী। আর মুরগীটা বেশ সেয়ানা, সত্যি বলছি, আলিওশা! প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই জার্মানরা সবকটা মুরগী আর হাঁস সাবাড় করে দেয়। বেটারা মুরগী আর হাঁসের যম, সব সময় মুখে লেগে আছে – "মুরগী আর মুরগী"। কিন্তু এই মুরগীটা ওদের হাত এড়িয়ে যায়। যেমন-তেমন মুরগী নয়, সত্যি বলছি! সার্কাসের যুগ্যি ওটা। উঠোনে কোন ফ্যাশিস্ট এলে চিলেকুঠিতে চেপে চুপচাপ বসে থাকে, যেন কেউ নেই ওখানে। কিন্তু আমাদের লোক উঠোনে এলে মোটেই বিচলিত হয় না। ভগবান জানেন তফাৎটা কী করে বোঝে! আর তাই সারা গ্রামে এখন একটা মাত্র মুরগী রয়ে গিয়েছে। ওর সেয়ানা বুদ্ধির জন্যে আমরা ওকে পার্টিজান্‌কা নাম দিয়েছি।'

মেরেসিয়েভ চোখ খুলে ঝিমোচ্ছে; বনে থাকবার সময় ওটা ওর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। ওর স্তব্ধতায় মিখাইল দাদু নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। খোঁদলের এদিকে ওদিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে, টেবিলে কী একটা করতে করতে, যে কথাটি বলছিলেন সেটা আবার শুরু করলেন:

'বুড়ীটাকে খারাপ ভেবো না, আলিওশা! ওকে বুঝতে চেষ্টা করো, দোস্ত! আগে ও ছিল বিরাট বনে প্রাচীন বার্চগাছের মত, হাওয়ার উৎপাত সহ্য করতে হত না। আর এখন খোলা জায়গায় পচা গাছের গুঁড়ির মত ও, মুরগীটা একমাত্র সান্ত্বনা। কিছু বলছ না কেন? ঘুমিয়ে পড়েছ না কি? আচ্ছা, ঘুমোও, ঘুমোও।'

ঘুমিয়ে পড়লেও ঠিক ঘুমোয়নি আলেক্সেই। ভেড়ার চামড়ার কোটের নিচে শুয়ে আছে, তাতে রুটির টকটক গন্ধ, প্রাচীন কোন কৃষাণ বসতির গন্ধ; কানে আসছে ঝিঁঝিঁটার মিঠে ডাক, আঙুল নড়াতেও ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে শরীরে কোন হাড় নেই, গরম তুলোতে শরীরটা ভরা, আর তার মধ্যে ধুকধুক করে ধমনীতে রক্ত বয়ে চলেছে। ভাঙ্গা ফোলা পাদুটো দুর্বিষহ যন্ত্রণায় জ্বলছে, দপদপ করছে, কিন্তু পাশ ফিরে শোবার, এমন কি নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই।

আধো-বেহুঁশ সেই অবস্থায় চারিদিকের জীবন টুকরো টুকরো ভাবে তার

চেতনায় পেঁাছচ্ছে, যেন আসল জীবন নয়, সিনেমার পর্দায় অস্থির প্রভায় দেখা অদ্ভুত বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলী।

বসন্ত এসেছে। ফেরারী গ্রামের আর কষ্টের সীমা নেই। মাটিতে যেসব খাবার-দাবার কোনক্রমে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, আর পরে ভস্মীভূত গ্রামে রাত্রে গিয়ে গোপনে যা উদ্ধার করে বনে আনা হয়, তা প্রায় শেষ হতে চলেছে। বরফ গলছে। তাড়াতাড়িতে তৈরী করা খোঁদলগুলো "কাঁদছে", দেয়াল আর ছাত থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। পাতাল গ্রামের পশ্চিমে, ওলেনিন অরণ্যে যারা পার্টিজান যুদ্ধ চালাচ্ছিল তারা আগে এক একজন করে রাত্রে আসত, কিন্তু এখন রণাঙ্গনের লাইনের ওপারে তারা রয়ে গেছে। তাদের কোন খবর আর আসে না। তাতে মেয়েদের দুর্ভোগ আরো বেড়েছে। আর বসন্ত এসে পড়েছে, বরফ গলছে, শস্য বোনার আর সব্জিক্ষেত তৈরী করবার কথা ত ভাবতে হবে।

মেয়েরা কাজ করে চলেছে, দুশ্চিন্তায় শ্রান্ত তারা, মেজাজ খিটখিটে। মিখাইল দাদুর খোঁদলে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি শুরু হত, চলত পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, সে সময় মেয়েরা তাদের পুরোনো আর নতুন, বাস্তব আর কল্পিত, যত কিছু অভাব অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি দিত। মাঝেমাঝে হট্টগোল ছাড়া আর কিছু শোনা যেত না, কিন্তু নারীকণ্ঠের এই ক্রুদ্ধ সোরগোলের মধ্যে ধূর্ত বৃদ্ধটি যৌথখামারের ব্যাপার নিয়ে কোন কার্যকরী প্রস্তাব করলেই বাগবিতণ্ডা এক মুহূর্তে থেমে যেত — যেমন "পুরোনো গ্রামে গিয়ে বরফ গলে গিয়েছে কিনা সেটা দেখার সময় হয়নি কি?" কিম্বা "বেশ হাওয়া দিচ্ছে। বীজগুলোকে এখন বাইরে রাখা হয়ত উচিত। মাটির নিচে গোলাঘরের ভেজা জমিতে ওগুলো স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে।"

একদিন মিখাইল দাদু খোঁদলে ঢুকলেন, মুখে খুসির ছাপ, তবুও চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। হাতে ঘাসের সবুজ শীষ। জামড়ো-পড়া তেলোয় সেটা আস্তে রেখে আলেক্সেইকে দেখালেন তিনি। বললেন:

'দেখছ? খেত দেখে এইমাত্র এলাম। বরফ গলছে, আর ভগবানকে ধন্যবাদ, শীতের ফসল দেখা দিয়েছে। অনেক বরফ পড়েছিল এবার। বসন্তের ফসল না পেলেও শীতের ফসলে রুটি জুটবে আমাদের। মেয়েদের ডেকে আনি, শুনলে ওরা খুসি হবে, আহা বেচারারা!'

খোঁদলের বাইরে মেয়েরা এক ঝাঁক দাঁড়কাকের মত কিচির মিচির করছে;

মাঠ থেকে আনা ঘাসের সবুজ শীষটা নতুন আশা জুগিয়েছে ওদের। সন্ধ্যাবেলায় হাত ঘষতে ঘষতে মিখাইল দাদু এসে বললেন:

'আমার দীর্ঘকেশী মন্ত্রীরা কী ঠিক করেছে জানো, আলিওশা? সিদ্ধান্তটা খারাপ নয়, সত্যি বলছি। একটা দল নিচের জায়গায় জমির ফালিটা চাষ করবে, ওখানে চাষ করা শক্ত। গরুগুলোকে হালে জুতবে ওরা। অবশ্য গরুগুলোকে দিয়ে বিশেষ কিছু করা যাবে না, গোটা পালের মাত্র ছটা এখন রয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দলটা ওপরের জমিটার ভার নেবে, ওটা বেশী শুকনো। ওরা শাবল আর খন্তা দিয়ে কাজ চালাবে। সব্জিক্ষেত ত আমরা এইভাবে খুঁড়ি, তাই না? তৃতীয় দলটা যাবে উঁচু ক্ষেতে। ওখানকার জমি বালুতে ভরা; আলুর চাষ করা হবে ওখানে। সেটা করা শক্ত নয়, বাচ্চাদের আর কমজোরি মেয়েদের লাগিয়ে দেব। আর হয়ত সরকারের সাহায্য এসে পড়বে। সেটা না এলেও চালিয়ে নেব আমরা। নিজেরাই সব করব, জমির সিকিটুকু পড়ে থাকতে দেব না। ফ্যাশিস্টদের ঝাঁটা মেরে দূর করে দিয়েছিল যারা তাদের ধন্যবাদ; বেঁচে থাকতে এখন পারব। শক্তহাড় জাত আমরা, সবকিছু সইতে পারি, যতই কঠিন হোক না কেন!'

অনেকক্ষণ ঘুম এল না দাদুর। খড়ের বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করলেন তিনি, বেঁকে শুলেন, চুলকালেন নিজেকে আর গোঙালেন, "ভগবান, হে ভগবান!" কয়েকবার উঠে জলের বালতির হাতায় খটখট শব্দ করে, ঢকঢক করে বড়ো বড়ো ঢোকে আকণ্ঠ জল খেলেন, ক্লান্ত ঘোড়ার মত। শেষে আর থাকতে পারলেন না। উঠে কাঠির আগুনটা ধরিয়ে আলেক্সেই'র গায়ে হাত দিলেন, আলেক্সেই চোখ খুলে আধো-অচেতন অবস্থায় শুয়ে ছিল, বললেন তাকে:

'ঘুমিয়ে পড়েছ না কি, আলিওশা? আমি শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবছি, শুয়ে আছি আর ভাবছি। ওখানের পুরোনো গ্রামটার চকে একটা ওকগাছ এখনো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে... প্রায় তিরিশ বছর আগে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে, নিকলাস তখন সিংহাসনে, বাজ পড়ে ওটার মাথাটা পুড়ে যায়। কিন্তু গাছটা বেশ শক্ত ছিল, জোরালো শেকড় আর অনেক রস। ওপরে যাবার উপায় ছিল না রসের, তাই পাশ থেকে নতুন নতুন ছোট একটা পল্লব গজাল, কী সুন্দর সেটার কোঁকড়ানো নতুন মাথাটা, যদি দেখতে... আমাদের প্লাভনিও ঠিক সে রকম... যদি রোদ থাকে আর জমিতে ফসল ফলে, তাহলে আমাদের সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে পাঁচ বছরের মধ্যে সবকিছু আমরা

ঠিক করে ফেলব, ভাই আলিওশা। আমরা যে টি'কে থাকতে পারি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু লড়াইটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়! ওদের ছারখার করে দিয়ে আবার কাজে লাগব, সবাই মিলে! কী মনে হয় তোমার?'

সে রাত্রে আলেক্সেই'র অবস্থা আরো খারাপ হল।

মিখাইল দাদুর স্নান করিয়ে দেওয়াটা ওর উপরে তেজী ওষুধের কাজ করে, জড়তার ঘোর কেটে গেল। অসীম অবসাদ, অমানুষিক ক্লান্তি আর পায়ের যন্ত্রণার বোধ এর আগে এত প্রখর কখনো হয়নি। জ্বরের ঘোরে বিছানায় গড়াচ্ছে সে, কাতরাচ্ছে, দাঁতে দাঁত ঘষছে, কাকে ডাকছে, কাউকে বা বকছে আর কিছু না কিছু দিতে বলছে।

সমস্ত রাত ওর সঙ্গে জেগে রইল ভারভারা, পা মুড়ে হাঁটুতে চিবুক রেখে, বিষণ্ন বড়ো চোখ এক ভাবে সামনের দিকে মেলে। প্রায়ই আলেক্সেই'র মাথায় কিম্বা বুকে একটুকরো ঠাণ্ডা ভিজে ন্যাকড়া চাপা দিচ্ছে, অথবা ভেড়ার চামড়াটা ঠিক করে দিচ্ছে, চামড়াটা বারবার আলেক্সেই সরিয়ে দিচ্ছিল, আর সব সময়ে নিজের স্বামীর কথা ভাবছে, সে এখন বহুদূরে, যুদ্ধের হাওয়ায় তাকে এদিকে ওদিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

ভোরের প্রথম আলোয় বৃদ্ধ জেগে উঠে আলেক্সেই'র দিকে তাকালেন, ও তখন চুপচাপ ঝিমোচ্ছে। ভারিয়াকে চুপিচুপি কী একটা বলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। ফেল্ট বুট-পরা পাদুটো ঢোকালেন গালোশে, গাড়ির টায়ার থেকে যেটা বানিয়েছিলেন তিনি, কোটটা গাছের ছালের একটা ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন আর হাতে নিলেন জুনিপারের ছড়ি, ঘষেমেজে চকচকে করেছিলেন সেটাকে, দূর যাত্রার সময় ছড়িটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

আলেক্সেইকে একটি কথা না বলে রওনা হলেন মিখাইল দাদু।

১৭

মেরেসিয়েভের যা অবস্থা তাতে গৃহকর্তার যাওয়াটা চোখে পড়ল না। পরের সারাটা দিন তার চেতনা ছিল না, তৃতীয় দিনে যখন জ্ঞান হল সূর্য তখন অনেক উ'চুতে, আলোর ঝকঝকে বলিষ্ঠ একটা রেখা চুল্লীর ধূসর জমাট ধোঁয়া ভেদ করে সমস্ত খোঁদলে ছড়িয়ে পড়েছে, স্কাইলাইট থেকে আলেক্সেই'র পা পর্যন্ত, তাতে অন্ধকার ঘোচার চেয়ে ঘন হয়েছে বেশী।

খোঁদলে কেউ নেই। দরজা দিয়ে আসছে ভারিয়ার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলা।

বোঝা গেল কাজ করতে করতে এই বনের অঞ্চলে প্রিয় পুরোনো একটা গান গাইছে। নিঃসঙ্গ একটি অ্যাসগাছের গান, কিছু দূরে তারি মত নিঃসঙ্গ একটি ওকের কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ অ্যাসগাছটি।

এর আগে একাধিকবার গানটি শুনেছে আলেক্সেই; বিমান-ঘাঁটির জমি পিটিয়ে সমান আর সাফ করার জন্য আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা ফুর্তিতে উচ্ছল মেয়েদের দল গানটি গাইত, মন্থর বিষণ্ন সুরটি ভালো লাগত আলেক্সেই'র। এর আগে কিন্তু কথাগুলোতে মন দেয়নি ও, সৈন্যবাহিনী জীবনের ব্যস্ততায় কথাগুলো মিলিয়ে যেত, মনে কোন ছাপ রাখেনি। কিন্তু এখন কথাগুলো আসছে অল্পবয়স্কা, বিশালাক্ষী, কোমল অনুভূতিতে ভরাট এই মেয়েটির মুখ থেকে, আর তাতে শুধু কাব্যিক নয়, নারীসুলভ আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার ছাপ এত স্পষ্ট যে সুরটির গভীরতা সম্পূর্ণভাবে আলেক্সেই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করল, বুঝতে পারল নিজের ওকের জন্য অ্যাসগাছের মত ভারিয়ার ব্যাকুলতা কতো তীব্র।

...নিঃসঙ্গ ওকের পাশে যাওয়া
অ্যাসগাছটির কপালে নেই।
বেচারীকে বুঝি চিরকাল
দুলতে হবে একা একা...

গাইল ভারিয়া, সত্যিকার চোখের জলের তিক্ত স্বাদ ওর গলায়। গান থেমে গেল, আলেক্সেই কল্পনা করল বসন্তের আলোয় প্লাবিত গাছগুলোর নিচে বসে আছে ও, ওর বড়ো বড়ো ব্যাকুল চোখ জলে ভরে গিয়েছে। নিজের গলা কেমন ধরে এল আলেক্সেই'র, অদম্য ইচ্ছে হল টিউনিকের পকেটের পুরোনো চিঠিগুলো দেখে, পড়বে না, দেখবে শুধু, চিঠিতে কী লেখা সেটা ত ওর মুখস্থ, দেখবে খোলা মাঠে বসা পাতলা মেয়েটির ফটো। টিউনিকে হাত দেবার চেষ্টা করাতে তোষকে অসহায়ভাবে হাতটা ঢলে পড়ল। আবার সবকিছু সেই রামধনু রঙের চাকা-কাটা ধূসর অন্ধকারে ভাসছে। পরে অন্ধকারে ধারালো অদ্ভুত নানা শব্দের খসখসানিতে দুজনের গলা আলেক্সেই'র কানে এল, ভারিয়ার আর একটি বৃদ্ধার পরিচিত গলা। চুপিচুপি কথা বলছে তারা:

'কিছু খায় না ও?'

'না, কিছু খেতে পারে না!.. কাল এক টুকরো চাপাটি চিবিয়েছিল,

ছোট্ট একটা টুকরো কিন্তু বমি হয়ে গেল। চাপাটি ওর খাওয়া উচিত নয়। অল্প দুধ খেতে পারে, তাই আমরা দিই।'

'শোনো, আমি কিছু সুরুয়া এনেছি। বেচারার হয়ত ভালো লাগবে।'

'ভাসিলিসা দিদিমা!' ভারিয়া বলে উঠল। 'সত্যি সত্যি আপনি...'

'হ্যাঁ, মুরগীর সুরুয়া। তাতে অবাক হবার কী আছে? অসাধারণ কিছু নয় এটা। ওকে জাগিয়ে দাও, হয়ত অল্প খাবে।'

ওদের কথাবার্তা আলেক্সেই'র কানে গিয়েছে, কিন্তু ও চোখ খোলার আগেই ভারিয়া খুব জোরে, শিষ্টাচারের বালাই না রেখে, ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে বলল:

'আলেক্সেই পেত্রভিচ, আলেক্সেই পেত্রভিচ! উঠে পড়ুন!.. ভাসিলিসা দিদিমা আপনার জন্য কিছু মুরগীর সুরুয়া এনেছেন, উঠে পড়ুন বলছি!'

দরজার কাছের দেয়ালে ঘাসের পলতেটা চড়চড় করে সজোরে জ্বলে উঠল। ধোঁয়াটে কম্পমান আলোয় একটি ছোটখাটো বক্রদেহ বৃদ্ধাকে আলেক্সেই দেখল, নাক বাঁকা, কুঁদুলে মুখ বলিকুঞ্চিত। টেবিলে মোড়ক থেকে বড়ো কিছু একটা খুলতে ব্যস্ত বৃদ্ধাটি; প্রথমে একটুকরো চট সরাল, তারপর মেয়েদের পুরোনো একটা কোট, তারপর এক খণ্ড কাগজ, অবশেষে দেখা গেল লোহার ছোট একটি বাটি, মুরগীর ঘন সুরুয়ার গন্ধে খোঁদলটা গেল ভরে, গন্ধটা এত খাসা যে আলেক্সেই'র পেট মোচড় দিয়ে উঠল।

ভাসিলিসা দিদিমার কুঞ্চিত মুখ থেকে তখনো কঠোর রাগী ভাবটা মুছে যায়নি।

'দেখো, তোমার জন্যে এনেছি এটা,' বৃদ্ধা বলল। 'খেতে নারাজ হোয়ো না, যেন খেয়ে ভালো হয়ে ওঠ। এটা খেলে ভগবানের কৃপায় হয়ত তোমার ভালো হবে।'

আর আলেক্সেই'র মনে পড়ল বৃদ্ধাটির পরিবারের করুণ কাহিনী, পার্টিজান্কা নামের সেই মুরগীটির কথা, আর সবকিছু — বৃদ্ধাটি, ভারিয়া, টেবিলের উপরে রাখা খাসা গন্ধ ছড়ানো লোহার ধূমায়িত পাত্রটি — সবকিছু চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল. সেই ঝাপসা পর্দা ভেদ করে চোখে পড়ছে শুধু বৃদ্ধাটির কঠোর চোখজোড়া, অসীম করুণায় তার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

বৃদ্ধাটি চলে যাচ্ছে, 'ধন্যবাদ, দিদিমা,' এর বেশী আর কিছু বলতে পারল না আলেক্সেই।

দরজায় পেঁাছিয়ে বৃদ্ধা বলল.

'ধন্যবাদ আর দিও না! ধন্যবাদ দেবার কী আছে? আমার ছেলেরাও ত লড়াই করছে। ওদেরও হয়ত কেউ সুরুয়া দেবে। তুমি এটা খাও, তোমার ভালো হোক। সেরে ওঠ।'

'দিদিমা!' আলেক্সেই উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারিয়া বাধা দিয়ে আস্তে আস্তে ওকে বিছানায় ঠেলে শুইয়ে দিল।

'শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন ত! কিছুটা সুরুয়া খান!' জার্মান সৈনিকের এ্যালুমিনিয়ামের কৌটোর ঢাকনা ওকে দিল ভারিয়া, সুগন্ধি ভাপ থেকে মাথা ঘুরিয়ে নিল, চোখে জল এসে পড়েছে কখন, সেটা ঢাকবার জন্য 'কিছুটা খান!' বলল আবার।

'মিখাইল দাদু কোথায়?'

'তিনি বেরিয়ে গেছেন, কাজে গিয়েছেন। জেলা কমিটি কোথায় খোঁজ করতে গিয়েছেন। ফিরতে অনেক দিন লাগবে। কিন্তু সুরুয়াটা খান, খেয়ে নিন।'

মুখের কাছে আলেক্সেই দেখল কাঠের একটা চামচে, এত পুরোনো যে কালো হয়ে গিয়েছে, রজন রঙের সুরুয়াতে ভরা।

প্রথম কয়েক চামচ সুরুয়া পেটে যেতেই নেকড়ের মত ক্ষিধে পেল আলেক্সেই'র, এত ক্ষুধার্ত লাগল যে ব্যথায় পেট মোচড় দিয়ে উঠল; কিন্তু দশ চামচের বেশী সুরুয়া আর মুরগীর নরম শাদা মাংসের কয়েকটা ফেঁসো ছাড়া খেল না ও। যদিও পেট প্রবলভাবে আরো, আরো বেশী চাইছে, তবুও দৃঢ়ভাবে খাবারটা সরিয়ে রাখল আলেক্সেই, ও জানে যে ওর বর্তমান অবস্থায় আর এক চামচ খেলে বিষের মত হতে পারে।

দিদিমার সুরুয়া আশ্চর্য কাজ দিল! ঘুমিয়ে পড়ল আলেক্সেই, মূর্চ্ছার ঘোর সেটা নয়, সত্যিকারের নিটোল স্বাস্থ্যকর ঘুম। একেকবার জেগে উঠে অল্পকিছু খেয়ে আবার ঘুম, চুল্লীর ধোঁয়ায়, মেয়েদের কথাবার্তায় কিম্বা ভারিয়ার স্পর্শে সে-ঘুম ভাঙ্গল না; ভারিয়ার ভয় হচ্ছিল ও মরে গিয়েছে, তাই প্রায়ই ঝুঁকে পড়ে ওর বুকে হাত দিয়ে দেখছিল বেঁচে আছে কিনা।

বেঁচে আছে, সমানে, গভীরভাবে বুক ওঠাপড়া করছে। বাকি দিনটা আলেক্সেই ঘুমল, সারা রাতটাও, এমন ভাবে ঘুমিয়ে রইল যেন পৃথিবীর কোন কিছু ওকে জাগাতে পারবে না।

পরের দিন প্রত্যুষে বনের নানা শব্দের মত অস্পষ্টভাবে কানে এল দূরে, একটানা, ঘরঘর আওয়াজ। চমকে উঠে আলেক্সেই বালিশ থেকে মাথা তুলল, কান পেতে রইল।

অদম্য উদ্দাম আনন্দে ওর সমস্ত শরীর ভরে গেল। না নড়েচড়ে শুয়ে রইল ও, উত্তেজনায় চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। কানে আসছে চুল্লীর উপরে ঠান্ডা হয়ে আসা পাথরের জোরালো চড়চড় শব্দ, রাত্রির ডাকের পর ক্লান্ত ঝিঁঝিঁটার ক্ষীণ আওয়াজ, খোঁদলের উপরে দোদুল্যমান পাইন-গাছগুলোর প্রশান্ত সমান মর্মরধ্বনি, এমন কি বসন্তের গলন্ত বরফের বড়ো বড়ো ফোঁটা দরজার বাইরে টপটপ করে পড়ছে, তারো শব্দ। কিন্তু সমস্ত শব্দ ভেদ করে স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে সেই সমান ঘরঘর আওয়াজটা। আলেক্সেই আঁচ করল ওটা কোন "পলিকার্পভ-২" বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ। শব্দটা কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে, কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে না। নিশ্বাস চেপে রইল আলেক্সেই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বিমানটা কাছাকাছি কোথাও কোনো লক্ষ্য নিয়ে বনের উপরে চক্কর দিচ্ছে, কিম্বা নামার জায়গা খুঁজছে।

'ভারিয়া, ভারিয়া!' কনুই'এ ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে আলেক্সেই ডাকল।

কিন্তু ভারিয়া খোঁদলে নেই। বাইরে মেয়েদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আর দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। কিছু একটা ঘটছে ওখানে।

মুহূর্তের জন্য খোঁদলের দরজাটা খুলে গেল, দেখা গেল ফুটফুট দাগওয়ালা ফেদকার মুখ।

'ভারিয়া পিসী, ভারিয়া পিসী!' হাঁকল ফেদকা, তারপর উত্তেজিতভাবে বলল, 'বিমানটা, আমাদের বনের ওপরে চক্কর খাচ্ছে বিমানটা!' আর আলেক্সেই কিছু বলার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

চেষ্টা করে আলেক্সেই উঠে বসল। বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠল, রগ দপদপ করছে, আহত পাদুটোর ব্যথায় সমস্ত শরীর কাঁপছে। বিমানটি বৃত্তাকারে ঘুরছে ক'বার গুণল — এক, দুই, তিন — তারপর উত্তেজনায় বিবশ হয়ে বিছানায় পড়ে গেল, আবার সেই অদম্য, নিটোল স্বাস্থ্যকর ঘুমের ঘোর সত্বর আচ্ছন্ন করে দিল তাকে।

কার গমগমে ভারী তাজা কণ্ঠস্বরে আলেক্সেই'র ঘুম ভাঙল। দল বেঁধে অনেকে গান গাইলেও সে-গলা চিনতে পারত আলেক্সেই। জঙ্গী বিমানের

দলে মাত্র একজনের ওরকম গলা ছিল — সে হচ্ছে স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো।

চোখ খুলল আলেক্সেই কিন্তু মনে হল এখনো ঘুমিয়ে আছে। স্বপ্নে দেখছে বন্ধুটিকে, চওড়া, চোয়াল-উঁচু, কর্কশভাবে-গড়া সহৃদয় মুখ তার, কপালে কালশিটের দাগ, চোখদুটো হালকা রঙের, ভোমাও তেমনি হালকা, আন্দ্রেই'র শত্রুদের ভাষায়, "শুয়োরের ভোমার" মত বর্ণহীন। ধোঁয়াটে আধো-অন্ধকারে খোঁজার ভঙ্গীতে উঁকি দিচ্ছে একজোড়া হালকা-নীল চোখ।

'আচ্ছা দাদু, এবার তোমার যুদ্ধে-জেতা চিজটিকে দেখাও ত!' গমগম করে উঠল দেগতিয়ারেঙ্কোর গলা, উক্রেনীয় উচ্চারণের স্পষ্ট ছাপ তার কথায়।

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল না। লোকটি সত্যিই তাহলে দেগতিয়ারেঙ্কো, যদিও এই বনের গভীরে পাতাল গ্রামে সে হাজির হয়েছে সেটা বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব মনে হয়। ও দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, লম্বা-চওড়া লোক, টিউনিকের কলার যথারীতি খোলা। হাতে হেলমেট, তা থেকে রেডিওফোনের তারগুলো ঝুলছে, আর কয়েকটা মোড়ক আর পুঁটলি। কাঠির আগুনটা পিছনে জ্বলছে, ওর ছোট করে ছাঁটা খোঁচা খোঁচা সোনালী চুলে আলোর প্রভা।

দেগতিয়ারেঙ্কোর পিছন থেকে মিখাইল দাদুর পাণ্ডুর ক্লান্ত মুখ উঁকি মারছে, উত্তেজনায় ওঁর চোখদুটো বিস্ফারিত; তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তারণী। ওটি হল খাঁদা-নাক, বেহায়া লেনচ্কা, অত্যন্ত কৌতূহলে অন্ধকারে চেয়ে আছে সে। ওর বগলের নিচে রেডক্রসের ক্যাম্বিসের একটা থলে, কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার ফুল বুকে চেপে রয়েছে ও।

সবাই কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। বিব্রতভাবে দেগতিয়ারেঙ্কো চারিদিকে তাকাচ্ছে, অন্ধকারে কিছু দেখতে পারছে না বোঝা গেল। দুএকবার আলেক্সেই'র মুখে ওর দৃষ্টি অনবধানে পড়ল; আর আলেক্সেই'রও বিশ্বাস হচ্ছে না যে ওর বন্ধু হঠাৎ এখানে এসে পড়েছে, হয়ত শেষ পর্যন্ত সমস্তটা জ্বরবিকারের স্বপ্নে দাঁড়াবে এই ভয়ে সে কাঁপছে।

'এই ত উনি শুয়ে আছেন,' ভেড়ার চামড়াটা সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে ভারিয়া বলল।

আলেক্সেই'র মুখের দিকে আবার হতবুদ্ধিভাবে দেগতিয়ারেঙ্কো তাকাল।

'আন্দ্রেই!' কনুই'এ ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে করতে ক্ষীণকণ্ঠে আলেক্সেই ডাকল।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল আন্দ্রেই, ভয় পেয়েছে যে সেটা বোঝা গেল।

'আন্দ্রেই! আমাকে চিনতে পারছ না?' ক্ষীণকণ্ঠে বলল মেরেসিয়েভ, সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে মনে হল।

আর এক মুহূর্ত জীবন্ত কঙ্কালটির দিকে তাকিয়ে রইল আন্দ্রেই, কালো, প্রায় ঝলসানো চামড়ায় কঙ্কালটি ঢাকা, ওর বন্ধুর হাসিখুসি চেহারার তলাশ করার চেষ্টা করল আন্দ্রেই, আর শুধু বিশাল, প্রায় গোল চোখদুটোতে খোলাখুলি, বলিষ্ঠ সেই চেনা ছাপ দেখল যেটি বিশেষ করে মেরেসিয়েভের। মাটিতে পড়ে গেল আন্দ্রেই'র হেলমেট, মোড়ক আর পুঁটলিও, সেগুলো খুলে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল আপেল কমলালেবু আর বিস্কুট।

'লিওশ্‌কা! তুমি!' আবেগে ওর গলা ভেঙ্গে গেল, ওর দীর্ঘ বর্ণহীন ভোমা এল নেমে। 'লিওশ্‌কা, লিওশ্‌কা!' আবার ডাকল ও। বিছানা থেকে হালকাভাবে ক্ষীণ দেহটি তুলে নিল, যেন শিশুর দেহ, আর বুকে চেপে বারবার বলতে লাগল, 'লিওশ্‌কা, লিওশ্‌কা!'

হাতে এক মুহূর্ত আলেক্সেইকে রেখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে আন্দ্রেই, যেন নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছে যে ও সত্যিই তার সেই বন্ধুটি, তারপর আবার বুকে চেপে ধরল:

'হ্যাঁ, তুমিই! লিওশ্‌কা! লিওশ্‌কা বেটা!'

ওর বলিষ্ঠ, ভালুকের মত মুঠি থেকে আলেক্সেই'র ক্ষীণ দেহ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল ভারিয়া আর ডাক্তারণী।

'ভগবানের দোহাই, ওঁকে ছেড়ে দিন, ওঁর দেহে বলতে গেলে প্রাণ নেই!' ক্রুদ্ধভাবে ভারিয়া বলল।

'কোন উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ভালো নয়! শুইয়ে দিন ওঁকে!' ডাক্তারণী তাড়াতাড়ি বলল।

এতক্ষণে আন্দ্রেই'র বিশ্বাস হয়েছে যে এই কালো, শুকিয়ে-যাওয়া, পালকের মত হালকা শরীরটা সত্যি সত্যি ওর সহচর, ওর বন্ধু, আলেক্সেই মেরেসিয়েভের, যার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল; আলেক্সেইকে শুইয়ে দিয়ে, নিজের মাথা আঁকড়ে, দুর্বার বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আন্দ্রেই,

তারপর আলেক্সেই'র কাঁধদুটো চেপে ধরে ওর কোটরগ্রস্ত, আনন্দোজ্জ্বল চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'বেঁচে আছে! কুমারী মেরি! বেঁচে আছে! গোল্লায় যাও তুমি, এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে? কী হয়েছিল?'

ডাক্তারণীটি বেঁটেখাটো, গোলগাল, নাক খাঁদা, ওর লেফ্‌টেনাণ্ট পদ অগ্রাহ্য করে বিমানদলের সবাই ওকে হয় লেনচ্‌কা নয় "চিকিৎসাশাস্ত্র পরিষেবিকা" বলে ডাকত, কেননা ওই নামেই উপরওয়ালার কাছে, পরে কী ঘটবে না ভেবে, নিজের পরিচয় ও দিয়েছিল; হামেশাই হাস্যমুখর আর সঙ্গীতপ্রিয় লেনচ্‌কা সবকটি লেফ্‌টেনাণ্টের সঙ্গে একই সময়ে প্রেমে পড়ত। কিন্তু এবারে সেই লেনচ্‌কাই দৃঢ়ভাবে উত্তেজিত আন্দ্রেইকে বিছানার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে কঠোরস্বরে বলল:

'কমরেড ক্যাপ্টেন! রোগীর কাছ থেকে সরে আসুন!'

আগের দিন যে ফুলগুলোর জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রে লেনচ্‌কা গিয়েছিল বিমানে এখন কোন কাজে লাগল না সেগুলো, ফুলের গোছাটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে, রেডক্রসের ক্যাম্বিসের থলে খুলে কাজের লোকের মত রোগীকে পরীক্ষা করতে শুরু করল। খাটো আঙুলে দক্ষভাবে পাদুটোতে টোকা মেরে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেইকে:

'লাগছে? এখানে? আর এখানটায়?'

এই প্রথম ভালো করে নিজের পাদুটো দেখল আলেক্সেই। সাঙ্ঘাতিক ফুলে গিয়েছে পায়ের পাতাদুটোই, প্রায় কালো দেখাচ্ছে। একটু ছুঁলেই সমস্ত শরীর ব্যথিয়ে ওঠে। বিজলীতে হাত লাগলে যেমন হয়। আঙুলের ডগাগুলোর চেহারা দেখে লেনচ্‌কা সবচেয়ে চিন্তিত হল। একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে সেগুলো, বোধশক্তি আর নেই।

টেবিলের পাশে রইলেন মিখাইল দাদু আর দেগ্‌তিয়ারেঙ্কো। এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করার জন্য বৈমানিকের বোতলটিতে চুপিচুপি এক চুমুক দেবার পর উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা চলল। ভাঙ্গা খনখনে বুড়োটে গলায় মিখাইল দাদু বলতে শুরু করলেন স্পষ্টতই প্রথম বার নয় কী করে আলেক্সেইকে পাওয়া যায়।

'বনের ফাঁকা জায়গাটাতে ছোকরারা ওকে দেখে। নিজেদের ডাগ-আউটের জন্যে জার্মানরা গাছ কেটেছিল ওখানে, আর ছোকরাদুটোর মা, মানে আমার মেয়ে, কাঠের জন্যে ওদের ওখানে পাঠিয়েছিল। তাইতে ওকে দেখতে পায়।

"ওখানে অদ্ভুত গোছের ওটা কী?" প্রথম ওরা ভাবল কোন ভাল্লুক চোট খেয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর চম্পট দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের বশে ওরা গেল ফিরে। "কী রকম ভাল্লুক ওটা? গড়াগড়ি দিচ্ছে কেন? ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে!" ওরা ফিরে গিয়ে দেখল ও গড়াচ্ছে আর গোঙাচ্ছে...'

'গড়াচ্ছিল, তার মানে কী?' দাদুকে সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিয়ে দেগতিয়ারেঙ্কো খটকার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ধূমপান করেন?'

কেস থেকে একটা সিগারেট নিলেন দাদু, পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজের টুকরো বের করে এক ফালি ছিঁড়ে ফেলে সিগারেটের তামাক তাতে ঢেলে, জড়িয়ে ধরালেন সেটা, খুব আমেজে টান দিলেন।

'ধূমপান? নিশ্চয়ই,' আর একটা টান দিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু জার্মানরা আসার পর তামাকের নামগন্ধ পাইনি। শেওলা আর স্পার্জের শুকনো পাতা টানি!.. আর কী করে ও গড়াচ্ছিল, সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করো। আমি ত দেখিনি। ছোকরারা বলল চিৎ-উপুড়, উপুড়-চিৎ হয়ে ও গড়াচ্ছিল। হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতা ওর ছিল না, বুঝলে না! এই ধরনের লোক ও!'

প্রায়ই তড়াক করে উঠে দেগতিয়ারেঙ্কো বন্ধুর দিকে তাকাচ্ছে, ডাক্তারণীর আনা ছাই রঙের ফৌজী কম্বলে মেয়েরা ওকে তখন জড়াচ্ছিল।

'স্থির হয়ে বোসো, বাপু, স্থির হয়ে বসে থাকো। কাপড়-চোপড় পরানো বেটাছেলের কাজ নয়,' বললেন দাদু। 'কী বলছি শোনো। আর কথাটা তোমাদের উপরওয়ালাদের বলতে ভুলো না খুব বড়ো কাজ করেছে আলেক্সেই! ওর এখনকার অবস্থাটা দেখছই ত। আমরা সবাই, যৌথখামারের সবাই এক হপ্তা ধরে ওকে দেখাশোনা করেছি, কিন্তু তবুও নড়াচড়া করতে পারছে না ও। কিন্তু বন আর জলায় হামাগুড়ি দিয়ে আসার শক্তি ও ধরেছিল। খুব বেশী লোকে সেটা পারে না! এমন কি আমাদের পুণ্যাত্মা ঋষিরা পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের সময়ে এরকম কিছু করেননি। খুঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকাটা এমন কী আর? ঠিক বলছি না? মনে হচ্ছে ঠিক বলছি। কিন্তু শোনো, বাছা, শোনো!..'

দেগতিয়ারেঙ্কোর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ, ওঁর নরম, পেঁজা তুলোর মত দাড়ির সুড়সুড়ি দিয়ে দেগতিয়ারেঙ্কোকে প্রায় ফিসফিস করে বললেন:

'আমার মনে হয় ও বাঁচবে না। তোমার কী মনে হয়? জার্মানদের এড়াতে পেরেছে ও, কিন্তু যমের হাত থেকে কী রেহাই পাবে? একেবারে হাড্ডিসার, কী করে হামাগুড়ি দিয়েছিল ভাবতেই পারি না। নিজের লোকেদের কাছে আসার ইচ্ছেটা খুব প্রবল হয়েছিল, কী বলো? যতক্ষণ অজ্ঞান ছিল ততক্ষণ শুধু বলেছে, "বিমান-ঘাঁটি, বিমান-ঘাঁটি।" আরো অন্য সব কথা, তাছাড়া ওলগার নাম করেছে। ও নামের কোন মেয়ে তোমাদের ওখানে আছে না কি? হয়ত ওর বউ। শুনছ, কী বলছি শুনছ? ওহে বৈমানিক!'

কিন্তু দেগতিয়ারেঙ্কো ওঁর কথা শুনছিল না। এই মানুষটি, ওর দোস্ত যে, যাকে মনে হত নেহাৎ সাধারণ লোক, ভাঙ্গা, হয়ত জমে-যাওয়া অসাড় পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে গলন্ত বরফের উপর দিয়ে, বন আর জলা ভেদ করে হামাগুড়ি দিচ্ছে, গড়িয়ে এগোচ্ছে, শত্রুকে এড়িয়ে যাবার জন্য, স্বজনের কাছে আসার জন্য, সে-ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে দেগতিয়ারেঙ্কো। জঙ্গী বিমান চালিয়ে বিপদ সম্বন্ধে তার খেয়াল আর নেই। লড়াই'এ যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন মৃত্যুর কথা মনে হয় না দেগতিয়ারেঙ্কোর, বরঞ্চ আনন্দের রোমাঞ্চ বোধ করে। কিন্তু বনে একেবারে একা কোন মানুষে যে এমন করতে পারে...

'কখন ওকে দেখতে পায়?'

'কখন?' বৃদ্ধ ঠোঁট নাড়ালেন, খোলা কেস থেকে আর একটা সিগারেট নিলেন। 'কখন, ঠিক কখন? তাই ত, ঠিক এক হপ্তা আগে।'

তারিখগুলোর কথা তাড়াতাড়ি ভেবে দেগতিয়ারেঙ্কো হিসেব করল যে মেরেসিয়েভ আঠারো দিন হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরেছে। একে আহত, তার উপর বিনা আহারে এতদিন হামাগুড়ি দেওয়াটা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, দাদু!' বৃদ্ধকে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন করে বুকে চেপে ধরে বৈমানিক বলল। 'ধন্যবাদ আপনাকে, দোস্ত!'

'ধন্যবাদ আর দিও না। ধন্যবাদ দেবার কী আছে? আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ, আমি কী? আমি কি কোন আগন্তুক না বিদেশী?' পুত্রবধূ হাতে চিবুক রেখে অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে কী ভাবছিল, ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে তাকে বৃদ্ধ বললেন, 'খাবারগুলো মেঝে থেকে কুড়িয়ে নাও না! দামী জিনিসগুলো ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে, ভাবো ত একবার! আবার বলছে "ধন্যবাদ!"'

ইতিমধ্যে মেরেসিয়েভকে যাত্রার জন্য ঠিকঠাক করে ফেলেছে লেনচকা।

'সব ঠিক, সব ঠিক, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' তড়বড় করে বলল লেনচ্‌কা, কথাগ্‌লো থলে থেকে পড়ন্ত মটরের মত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছে। 'মস্কোতে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আপনাকে ওরা সারিয়ে দেবে। মস্কো বিরাট সহর, নয় কি? আপনার চেয়ে খারাপ কেস ওখানে সারিয়ে দেয়!'

ওর অতি-উৎসাহ, আর মেরেসিয়েভ একনিমেষে সেরে উঠবে সেটা বারবার বলার ধরন থেকে দেগতিয়ারেঙ্কো আঁচ করল রোগী দেখার পর লেনচ্‌কা ব্‌ঝতে পেরেছে যে খারাপ কেস এটা, মেরেসিয়েভের অবস্থা সঙ্কটজনক। "হাঁড়িচাঁচার মত কিচির মিচির করছে," গরগর করে নিজেকে বলল দেগতিয়ারেঙ্কো, "চিকিৎসাশাস্ত্র পরিষেবিকাটির" দিকে ভ্র্‌কুটি করে তাকাল। হঠাৎ ওর মনে হল বিমানদলের কেউ লেনচ্‌কাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না, ঠাট্টা করে সবাই বলে যে একমাত্র জিনিস যেটা ও সারাতে পারে সেটা হল প্রেম — কথাটা ভেবে দেগতিয়ারেঙ্কো কিছ্‌টা আশ্বস্ত বোধ করল।

কম্বলে জড়ানো হয়েছে আলেক্সেইকে। শ্‌ধ্‌ মাথাটা দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ইতিহাসের বইতে স্কুলে-দেখা ফারাও'র মমির কথা দেগতিয়ারেঙ্কোর মনে পড়ল। বন্ধ্‌র গালে চওড়া হাতটা একবার বোলাল, খোঁচা খোঁচা শক্ত লাল দাড়িতে সেটা ভরা।

'সব ঠিক, লিওশকা! সেরে উঠবে ঠিক! মস্কোতে তোমাকে আজই ভালো হাসপাতালে পাঠাবার আদেশ এসেছে, সেখানে সবাই নামকরা চিকিৎসক! আর নার্সের কথা ছেড়ে দাও,' একবার চুকচুক শব্দ করে, লেনচ্‌কার দিকে চোখ ঠেরে দেগতিয়ারেঙ্কো বলল, 'ওদের সেবায় মড়ারা পর্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে। তুমি আর আমি আবার আকাশে উড়ব!' হঠাৎ ও ব্‌ঝতে পারল ঠিক লেনচ্‌কার মত জোর-করা, প্রাণহীন আমোদের স্‌রে কথা বলছে। বন্ধ্‌র গালে টোকা দিতে দিতে হঠাৎ হাতের তলাটা ভিজে লাগল। 'স্ট্রেচারটা কোথায়?' চটে উঠে জানতে চাইল দেগতিয়ারেঙ্কো। 'ওকে নিয়ে যাওয়া যাক এবার! মিছিমিছি সময় নষ্ট করে কী হবে?'

কম্বলে-জড়ানো আলেক্সেইকে ওরা আস্তে আস্তে স্ট্রেচারে শোয়াল, ব্‌দ্ধ সাহায্য করলেন। আলেক্সেই'র জিনিসপত্র জড়ো করে একটা পোঁটলায় বাঁধল ভারিয়া।

ঝঞ্ঝা বাহিনীর ছোরাটা পোঁটলাতে ঢোকাচ্ছে ভারিয়া, তাকে থামিয়ে আলেক্সেই বলল, 'দাদ্‌! এটা আপনি রাখ্‌ন স্ম্‌তিচিহ্ন হিসেবে।' মিতব্যয়ী

মিখাইল দাদু প্রায়ই সকৌতূহলে ছোরাটা দেখতেন, সেটাকে পরিষ্কার আর ধারালো করে বুড়ো-আঙুলের উপরে রেখে পরখ করতেন।

'ধন্যবাদ, আলিওশা, ধন্যবাদ! খাসা ইস্পাতের জিনিস এটা। আর দেখো, এটার ওপরে কী একটা লেখা আছে, বিদেশী ভাষায়,' দেগতিয়ারেঙ্কোকে ছোরাটা দেখাতে দেখাতে বৃদ্ধ বললেন।

দেগতিয়ারেঙ্কো লেখাটা পড়ে অনুবাদ করে দিল:

'Alles für Deutschland — সবকিছু জার্মানির জন্য।'

'সবকিছু জার্মানির জন্য,' পুনরুক্তি করল আলেক্সেই, কী করে ছোরাটা পেয়েছিল সেটা মনে করে।

'আচ্ছা, এবার ওকে তুলুন ত,' স্ট্রেচারের একটা দিক ধরে দেগতিয়ারেঙ্কো তাড়া দিল।

দোলন্ত স্ট্রেচারটা খোঁদলের অপরিসর দরজা দিয়ে কষ্টে বের করা হল। ধাক্কা লেগে দেয়ালের মাটি খসে পড়ল।

খোঁদলে ভিড়-করে-দাঁড়ানো সবাই ছুটে বেরিয়ে এল কুড়িয়ে-পাওয়া লোকটিকে বিদায় জানাবার জন্য। শুধু ভারিয়া রয়ে গেল। তাড়াহুড়ো না করে ঘাসের পলতেটা সে ঠিক করল, তারপর ডোরা-কাটা গদিটার কাছে গেল, সেখানে এতদিন শোয়া মানুষটির ছাপ এখনো আছে, গদিটাতে হাত দিল ভারিয়া। তাড়াহুড়োয় ফুলের গোছাটার কথা কারো মনে ছিল না, সেটা নজরে পড়ল ভারিয়ার। কাঁচের ঘর থেকে আনা কয়েকটা লাইলাক, রং-ঝরা, শুকনো, এই ফেরারী গ্রামটির অধিবাসীদের মত, যারা ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে খোঁদলে শীতটা কাটিয়েছে। ফুলগুলো তুলে নিল মেয়েটি, ঘ্রাণ করল বসন্তের নরম আভাস, এত ক্ষীণ সে-গন্ধ যে ধোঁয়া আর ঝুলের মধ্যে প্রায় পাওয়া যায় না, তারপর কাঠের পাটাতনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিক্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ভারিয়া।

১৮

অপ্রত্যাশিত অতিথিকে বিদায় জানাবার জন্য প্লাভনি গ্রামে উপস্থিত সবাই বেরিয়ে এল। বনের পিছনে একটি লম্বাগোছের ছোট হ্রদে বিমানটি নেমেছিল, ধারে ধারে বরফ গলতে শুরু করলেও এখনো জমাট আর শক্ত হ্রদটি। ওখানে যাবার কোন রাস্তা নেই। পায়ে চলা একটা পথ আছে, এক ঘণ্টা আগে পায়ের চাপে বসে-যাওয়া নরম বরফের উপর দিয়ে এসেছিলেন

মিখাইল দাদ্, দেগতিয়ারেঙ্কো আর লেনচ্কা। পথ ধরে ভিড় করে হ্রদের দিকে লোকেরা যাচ্ছে, গ্রামের ছেলেরা সামনে, ধীরস্থির সেরিওন্কা আর ফেদকা একেবারে আগে আগে, উৎসাহে টগবগ করছে ফেদকা। বৈমানিককে বনে প্রথম দেখেছিল সেরিওন্কা, ওর প্রোনো দোস্ত সে, সেই অধিকারে স্ট্রেচারের সামনে গম্ভীরভাবে যাচ্ছে সেরিওন্কা, ওর মরা বাপের বিরাট ফেল্টব্ট পরা পা অনেক কষ্টে বরফ থেকে টেনে তুলছে, আর শাদা দাঁত, ক্লিষ্টম্খ, ছেঁড়াখোঁড়া নানা অদ্ভুত জামাকাপড়-পরা অন্যান্য ছেলেদের কঠোরভাবে ধমকাচ্ছে। দেগতিয়ারেঙ্কো আর মিখাইল দাদ্ স্ট্রেচারটা পা মিলিয়ে বহন করছেন, পাশে নরম পলকা বরফের উপরে হাঁটতে হাঁটতে লেনচ্কা কখনো আলেক্সেই'র কম্বল ঠিক করে দিচ্ছে কখনো বা নিজের র্মাল ওর মাথায় জড়িয়ে দিচ্ছে। ওর পিছনে বকবক করতে করতে আসছে প্রবীণা, নবীনা আর ব্ড়োরা।

প্রথম প্রথম বরফে ঠিকরনো উজ্জ্বল আলোয় চোখ ঝলসে গেল আলেক্সেই'র। বসন্তের স্ন্দর দিনটি এত জোরে চোখে লাগছে যে চোখ বন্ধ করতে হল ওকে, প্রায় বেহ্ঁশ হয়ে গেল। চোখের পাতা অল্প খ্লে আলোটা সইয়ে নিয়ে চারিদিকে তাকাল সে। পাতাল গ্রামটির ছবি চোখের সামনে এল ভেসে।

যেদিকে তাকাও না কেন, প্রোনো বনটি পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে। গাছের মাথাগ্লো প্রায় এক জোট, নিচেটা তাই আধো-অন্ধকারে ভরা। নানা রকমের গাছ বনটিতে। বার্চগ্লো এখনো পত্রহীন, চ্ড়োগ্লো হাওয়ায় জমে-যাওয়া ধোঁয়ার মত দেখাচ্ছে, শাদা গ্ঁড়িগ্লো পাইনগাছের সোনালী গ্ঁড়িগ্লোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, আর তাদের মধ্যে এখানে সেখানে ফারগাছের ধারালো কালো মাথা দেখা যাচ্ছে।

গাছের নিচে একটা জায়গায় বরফ বহ্ লোকের পায়ে অনেক দিন দলিত, সেখানে খোঁদলগ্লো, গাছের আড়ালে বলে উপর কিম্বা নিচ থেকে শত্র্দের চোখে পড়ে না। বহ্ প্রাচীন ফারগাছের শাখায় শাখায় বাচ্চাদের জামাকাপড় শ্কোচ্ছে, আলো হাওয়া লাগাবার জন্য হাঁড়িক্ঁড়ি বসানো পাইনের ডালপালায়, একটা প্রোনো ফারগাছের গ্ঁড়ি থেকে ঝ্লছে শেওলার সর্ সর্ ফালি আর তার মোটা শেকড়ের মাঝখানেতে পেন্সিল দিয়ে আঁকা সরল, চেপটা ম্খ একটা চটচটে ন্যাকড়ার প্তুল পড়ে আছে; সেখানটায় কোন হিংস্র জানোয়ার শ্য়ে থাকলেই স্বাভাবিক লাগত।

স্ট্রেচারটি চলেছে আগে আগে, আর দলিত শেওলার আস্তরণে ঢাকা "রাস্তা" ধরে পিছু পিছু ভিড় করে আসছে লোকেরা।

খোলা হাওয়ায় এসে প্রথমে সহজাত বন্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে আলেক্সেই ভরে গেল, কিন্তু তারপরে এল মধুর নিঃশব্দ বিষণ্ণতার অনুভূতি।

ছোট একটা পকেট-রুমালে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল লেনচ্কা, চোখের জলের কারণ নিজের মত করে বুঝে স্ট্রেচার-বাহকদের আরো আস্তে আস্তে যেতে বলল।

'না, না, আরো জোরে, আরো জোরে চলুন!' তাগাদা দিয়ে মেরেসিয়েভ বলল।

ওর মনে হচ্ছিল ওরা ভয়ানক ধীরেসুস্থে চলেছে। ভয় করছে যে এখান থেকে চলে যেতে পারবে না ও, মস্কো থেকে আসা বিমানটি তার জন্য অপেক্ষা না করেই চলে যাবে, ক্লিনিকে পেঁছিতে ও আর পারবে না। স্ট্রেচার-বাহকেরা কদম বাড়িয়ে দেওয়াতে কষ্ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে গোঙাচ্ছে ও, কিন্তু তবু বারবার বলতে লাগল, "তাড়াতাড়ি, দয়া করে, আরো তাড়াতাড়ি চলুন!" মিখাইল দাদু হাঁপাচ্ছেন শুনল, দেখল যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন তিনি, তবু আরো তাড়াতাড়ি যেতে ওদের বলল। বৃদ্ধের জায়গায় স্ট্রেচারে দুজন স্ত্রীলোক হাত লাগাল; লেনচ্কার উল্টোদিকে স্ট্রেচারের পাশাপাশি বৃদ্ধ চললেন কষ্ট করে। নিজের ফৌজী টুপিতে ঘর্মাক্ত টেকো মাথা, লাল-হয়ে-ওঠা মুখ আর কুঞ্চিত ঘাড় মুছতে মুছতে প্রশান্তভাবে বিড়বিড় করে বৃদ্ধ বললেন:

'আমাদের ছোটাচ্ছ, বুঝি! খুব তাড়া দেখছি!.. ঠিক করেছ, আলিওশা, একদম ঠিক করছ, খুব তাড়া দাও ওদের! মানুষের তাড়া থাকলে বোঝা যায় শরীরে প্রাণ আছে, বেশ জোরে ধকধক করছে সেটা। ঠিক বলছি না, কুড়িয়ে পাওয়া আমাদের পেয়ারের ছেলে?.. হাসপাতাল থেকে চিঠি দিও আমাদের। ঠিকানাটা মনে রেখো: কালিনিন অঞ্চল, বলগয়ে জেলা, ভাবী প্লাভনি গ্রাম। কী? ভাবী গ্রাম বলছি। ভাববার কিছু নেই, চিঠিটা ঠিক পেঁছিবে। ভুলো না যেন। ঠিকানায় কোনো গড়বড় নেই!'

স্ট্রেচারটি যখন বিমানে তোলা হল আর বিমান পেট্রলের ঝাঁঝালো গন্ধ ঝট করে নাকে এল, তখন আবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল আলেক্সেই। সেলুলয়েডের ঢাকনাটা মাথার উপর দেওয়া হয়েছে। ওকে বিদায় জানাতে এসে যারা হাত নাড়ছে তাদের আর দেখা যাচ্ছে না; ছাই রঙের রুমাল মাথায় রুষ্ট দাঁড়কাকের মত চেহারা ছোটখাটো সেই বক্রনাসা বৃদ্ধাটি বিমানের

প্রপেলারের ঝাপটা হাওয়া আর ভয় কাটিয়ে দেগতিয়ারেঙ্কোর কাছে ঠেলে এসে মুরগীর বাকি অংশটুকুর মোড়কটা দিল তার হাতে, সেটা দেখতে পেল না আলেক্সেই; তার চোখে পড়ল না মিখাইল দাদু বিমানটির চারপাশে কেমন ব্যস্তসমস্তভাবে ঘুরছেন, মেয়েদের বকছেন আর বাচ্চাদের ভাগিয়ে দিচ্ছেন; চোখে পড়ল না, হাওয়ায় ওঁর টুপিটা উড়ে গিয়ে বরফে গড়িয়ে চলেছে, খোলা মাথায় উনি দাঁড়িয়ে, টাকটা চকচক করছে, পাতলা রুপালী চুল, গ্রামের অনাড়ম্বর আইকনে আঁকা সেণ্ট নিকলাসের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। বিদায়োন্মুখ বিমানটির দিকে হাত নাড়ছেন মিখাইল দাদু, মেয়েদের দঙ্গলে একমাত্র পুরুষ।

হ্রদের জমাট বরফ থেকে এক চাকায় উঠিয়ে বিমানটিকে লোকজনের মাথার উপর দিয়ে নিয়ে গেল দেগতিয়ারেঙ্কো, রানারগুলো বরফে প্রায় লাগে লাগে, উঁচু, খাড়া তীরের নিচে হ্রদ ঘেঁষে সাবধানে চলে একটি বনাকীর্ণ দ্বীপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল বিমানটি। জঙ্গী বিমান বাহিনীর এই অসমসাহসিক লোকটি একাধিকবার ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে বেপরোয়াভাবে বিমান চালানোর জন্য বকুনি খেয়েছে, কিন্তু এখন খুব সাবধানে চলেছে সে, উড়ছে না, গুঁড়ি মেরে, প্রায় মাটি ঘেঁষে, ছোট ছোট নদীর রেখায় পথ চিনে, নানা হ্রদের তীরের আড়ালে থেকে এগোচ্ছে। আলেক্সেই দেখল না কিছু, কিছু এল না তার কানে। পেট্রল আর অন্য তেলের চেনা গন্ধে, ওড়বার অনুভূতির উল্লাসে জ্ঞান হারাল সে। জ্ঞান হল যখন বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে স্ট্রেচারটা নামানো হচ্ছে, মস্কো থেকে ইতিমধ্যে আগত রেডক্রসের একটি জরুরী বিমানে তাকে তোলা হবে।

১৯

নিজের বিমান-ঘাঁটিতে যখন পৌঁছল তখন কাজের চাপ সবচেয়ে বেশী। পুরোদমে কাজ চলেছে, সেই কর্মমুখর বসন্তে কোনদিন নিশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকত না।

ইঞ্জিনের গর্জন ক্রমাগত কানে আসছে। পেট্রল ভরার জন্য কোন স্কোয়াড্রন নামলেই তার জায়গায় অন্য একটা স্কোয়াড্রন উড়ছে, আবার একটা আসছে। বৈমানিক থেকে আরম্ভ করে পেট্রলট্যাঙ্কের চালক আর পেট্রলগুদাম-রক্ষক পর্যন্ত আপ্রাণ কাজ করে চলেছে। চিফ অব স্টাফের গলা ভেঙ্গে গিয়েছে, কোন রকমে ফিসফিস করে কথা বলছেন তিনি।

কিন্তু নিদারুণ কর্মব্যস্ততা আর সাধারণ উত্তেজনা সত্ত্বেও সবাই সাগ্রহে মেরেসিয়েভের পৌঁছনোর অপেক্ষায় ছিল।

নেমে ঢাকা জায়গায় বিমানগুলোকে নিয়ে যাবার আগেই বৈমানিকেরা ইঞ্জিনের গর্জনের মধ্যে চেঁচিয়ে মিস্ত্রীদের জিজ্ঞেস করছে, 'এখনো আসেনি ও?'

'ওর কোন খবর এসেছে?' গুদামে পেট্রল-ট্যাঙ্কগুলোকে নিয়ে আসতে না আসতেই সেখানকার "পেট্রল-চাঁই"রা খোঁজ করছে।

বনের উপর থেকে পরিচিত রেডক্রস বিমানটি কখন আসবে তার শব্দ শোনার জন্য প্রত্যেকে কান পেতে আছে...

জ্ঞান হয়ে আলেক্সেই দেখল একটি দুলন্ত স্ট্রেচারে শুয়ে আছে, চারিদিকে চেনাশোনা মুখের ঘনিষ্ঠ ভিড়। চোখ খুলল ও। আনন্দের ধ্বনি উঠল ভিড় থেকে। স্ট্রেচারের ঠিক পাশে আলেক্সেই দেখল উইং কম্যান্ডারের নবীন, অনড় মুখ আর সংযত হাসি। তার পাশে চিফ অব স্টাফের লাল, ঘর্মাক্ত মুখ, আর বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়ন যার অধীনে তার গোল ভরাট পাণ্ডুর মুখ, লোকটিকে তার কিপ্‌টেমি আর আমলাতান্ত্রিকতার জন্য আলেক্সেই দুচক্ষে দেখতে পারত না। কত চেনা মুখ! স্ট্রেচার-বাহকদের সামনেরটি হল ঢেঙ্গা ইউরা, ফিরে ফিরে আলেক্সেইকে দেখছে আর হোঁচট খাচ্ছে। ওর পাশে তাড়াতাড়ি হাঁটছে লাল-চুল, ছোটখাটো একটি মেয়ে, আবহাওয়া কেন্দ্রের সার্জেন্ট। আগে আলেক্সেই'র মনে হত কোন কারণে মেয়েটি তাকে পছন্দ করে না, তার চোখের আড়ালে থাকার চেষ্টা করত মেয়েটি, লুকিয়ে তাকাত ওর দিকে, সে দৃষ্টিতে বিচিত্র কী একটা ভাব। ঠাট্টা করে আলেক্সেই ওকে "আবহাওয়া সার্জেন্ট" বলে ডাকত। মেয়েটির কাছাকাছি কুকুশকিন তাড়াতাড়ি হাঁটছে, ছোটখাটো মানুষ, মুখে কেমন যেন অপ্রীতিকর হলদে ভাব, ওর খিটখিটে মেজাজের জন্য স্কোয়াড্রনের লোকেরা ওকে পছন্দ করত না। কুকুশকিনও হাসছে, চেষ্টা করছে ইউরার বিরাট পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে। মেরেসিয়েভের মনে পড়ল শেষবার ওড়বার আগে, ধার শোধ করেনি বলে অনেকের সামনে ওকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল আর ভেবেছিল এই প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকটি সে-কথা কখনো ভুলবে না। কিন্তু এখন স্ট্রেচারের পাশে দৌড়চ্ছে সে, সাবধানে ওটাকে ধরছে আর যাতে কেউ ধাক্কা না দেয় তার জন্য কনুই দিয়ে হটাচ্ছে লোকজনকে।

এত বন্ধু যে তার আলেক্সেই কখনো ভাবেনি। লোকেদের সত্যিকারের

চেহারা তাহলে এরকম! যে "আবহাওয়া সার্জেণ্টটি" কোন কারণে তাকে ভয় করে তার জন্য দুঃখ হল আলেক্সেই'র; বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডারকে দেখে লজ্জা হল তার, ওর কিপটেমি নিয়ে কত না ইয়ার্কি আর টিপ্পনী বিমান ডিভিশনে ছড়িয়েছে! আর কুকুশকিনের কাছে মাপ চাইতে ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল অন্যদের বলে যে লোকটা শেষ পর্যন্ত সত্যিই অতটা অপ্রীতিকর আর একরোখা নয়। আলেক্সেই'র মনে হল অনেক যন্ত্রণা আর দুর্ভোগের পর অবশেষে আপন ঘরে ফিরেছে, ওর প্রত্যাবর্তনে সবাই আনন্দিত।

মাঠ হয়ে সাবধানে ওকে রুপালী রেডক্রস বিমানটির কাছে নিয়ে যাওয়া হল, পত্রহীন একটি বার্চবনের ধারে প্রচ্ছন্নভাবে রাখা হয়েছিল বিমানটিকে। মিস্ত্রীরা ইতিমধ্যেই এঞ্জিন চালাতে শুরু করেছে।

'কমরেড মেজর ...' উইং কম্যাণ্ডারকে মেরেসিয়েভ হঠাৎ ডাকল, যতখানি সম্ভব জোরে আর দৃঢ়ভাবে কথা বলার চেষ্টা করল ও।

স্বভাবসিদ্ধ শান্ত, হেঁয়ালি-ভরা হাসি মুখে, কম্যাণ্ডার আলেক্সেই'র কাছে ঝুঁকলেন।

'কমরেড মেজর... মস্কোতে আমাকে পাঠাবেন না, আমাকে এখানে, আপনাদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দিন...'

কম্যাণ্ডার শুনতে পেলেন না বলে হেলমেটটি খুলে ফেললেন।

'মস্কোতে যেতে আমি চাই না। এখানে, চিকিৎসা-কর্মীদের দলে থাকতে চাই!'

ফারের দস্তানা খুলে, কম্বলের নিচে হাতড়ে আলেক্সেই'র হাতে চাপ দিয়ে মেজর বললেন:

'মজার লোক আপনি! আপনার বিশেষ চিকিৎসার দরকার।'

মাথা নাড়ল আলেক্সেই। এখানে এত ভালো আর আরাম লাগছে। যে-সব দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে সেগুলো আর ভয়াবহ মনে হচ্ছে না এখন, পায়ের ব্যথাটাও নয়।

'ও কী বলছে?' চিফ অব স্টাফ ভাঙ্গা গলায় জানতে চাইলেন। 'আমাদের সঙ্গে এখানে থাকতে চায়,' হেসে উত্তর দিলেন কম্যাণ্ডার। আর এখন, এই মুহূর্তে হাসিটা অন্য সময়ের মত হেঁয়ালি-ভরা নয়, বন্ধুত্বসূচক আর বিষণ্ণ হাসি।

'বোকা, রোমাণ্টিক! "পিওনেরস্কায়া প্রাভদার" জন্য দৃষ্টান্ত একটা,'

বললেন চিফ অব স্টাফ। 'স্বয়ং সেনানায়কের আদেশে মস্কো থেকে ওর জন্য বিমান পাঠিয়ে দিয়ে ওকে সম্মান দেখিয়েছে ওরা, আর ও, কেমন লোক বলো ত?..'

মেরেসিয়েভ জবাবে বলতে চাইল যে সে রোমাণ্টিক নয়, শুধু ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে এখানে চিকিৎসা-ঘাঁটির তাঁবুতে চেনা পরিবেশে আরো অনেক তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে, এখানে একবার ত কয়েকদিন কাটিয়েছিল, বিমান জখম হবার পরে অসফল অবতরণের ফলে হাঁটুর গাঁট মচকে যায় তখন; মস্কো ক্লিনিকের অজানা সুযোগ-সুবিধের মধ্যে অত তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে না। চিফ অব স্টাফকে মুখের মত জবাব কী ভাষায় দেবে সেটা ঠিক করে ফেলেছে, কিন্তু মুখ খোলার আগেই সাইরেনের বিষণ্ন আওয়াজ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের মুখে এল গম্ভীর কর্মব্যস্ততার ভাব। মেজর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আদেশ দিলেন আর পিঁপড়ের মত ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই; বনের প্রান্তে গোপনে দাঁড়ানো বিমানটির কাছে কয়েকজন দৌড়িয়ে গেল, কয়েকজন গেল পরিচালনা-ঘাঁটিতে, মাঠের ধারে একটা ছোট ঢিবি থেকে পরিচালনা-ঘাঁটিটা চেনা যায়, আর বনের মধ্যে লুকোনো গাড়িগুলোর দিকে গেল কয়েকজনে। আকাশে ধোঁয়ার একটা স্পষ্ট দীর্ঘ রেশ আলেক্সেই দেখল, একটা বহু-পুচ্ছ হাউইর রেখা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী সে বুঝতে পারল: "হুঁশিয়ারির" সঙ্কেত।

ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করল, নাসারন্ধ্র কাঁপছে, মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল, বিপদের মুহূর্তে হামেশাই তার এরকম হত।

বিপৎসূচক ধ্বনি যখন বাজল তখন বিমান-ঘাঁটির অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততায় লেনচ্‌কা, মিস্ত্রী ইউরা আর "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" বিশেষ কিছু করার ছিল না, তারা স্ট্রেচারটা চট করে তুলে নিয়ে বনের ধারের সবচেয়ে কাছাকাছি জায়গায় দৌড়ল, তিনজনেই দৌড়চ্ছে, মিলিয়ে পা ফেলার চেষ্টা সবাই করছে, কিন্তু উত্তেজনায় সেটা হয়ে উঠছে না।

আলেক্সেই কাতরে ওঠাতে হাঁটবার কদমে তারা চলল। দূরে ইতিমধ্যেই স্বয়ংক্রিয় বিমানধ্বংসী কামানের অস্থির খরখর আওয়াজ শুরু হয়েছে। একটার পর একটা বিমান গুড়ি মেরে রানওয়েতে পেঁছিয়ে ঝট করে উপরে উঠছে। ইঞ্জিনের চেনা শব্দ ছাপিয়ে একটু পরেই বন থেকে আলেক্সেই'র কানে এল অসমান, মৃদু মুখর ঘড় ঘড় আওয়াজ, আর তাতে তার পেশীগুলো

সঙ্কুচিত হয়ে এল, টান-টান তারের মত; স্ট্রেচারে বাঁধা মানুষটি কল্পনা করল জঙ্গী বিমানের ককপিটে বসে আছে সে, শত্রুর সঙ্গে মোলাকাতে দ্রুতগতিতে যাচ্ছে।

অপরিসর লম্বা গর্তে স্ট্রেচারটা ঢোকান গেল না। ইউরা আর মেয়েরা ওকে কোলে করে নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু বাধা দিয়ে আলেক্সেই বলল যে বনের ধারে একটা বড়ো, বলিষ্ঠ বার্চগাছের নিচে স্ট্রেচারটাকে রাখা হোক। সেখানে শুয়ে যা সব ঘটল তা দেখল আলেক্সেই, দুঃস্বপ্নে যেমন তেমন দ্রুত ঘটনাগুলির পরম্পরা। মাটি থেকে আকাশ-যুদ্ধ দেখার সুযোগ বৈমানিকদের কালেভদ্রে হয়। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই মেরেসিয়েভ বিমান বাহিনীতে, কিন্তু এ পর্যন্ত মাটি থেকে আকাশ-যুদ্ধ কখনো দেখেনি। আকাশ-যুদ্ধের বিদ্যুৎগতিতে অভ্যস্ত সে, আর এখন অবাক হয়ে দেখল মাটি থেকে আকাশ-যুদ্ধটা কত নিরীহ মনে হয়, খাঁদা-নাক পুরোনো জঙ্গী বিমানগুলোর চলাফেরা কী রকম শ্লথ, আকাশে ওদের মেসিনগানগুলোর খরখর আওয়াজও কেমন সাদাসিধে — ঘরোয়া নানা শব্দের কথা মনে হয় — সেলাই কলের ঘড়ঘড় কিম্বা সুতী সাদা কাপড় ছেঁড়ার শব্দ।

বারোটা জার্মান বোমারু বিমান, ইংরাজী ভি-র আকারে দল বেঁধে বিমান-ঘাঁটিটাকে এড়িয়ে উজ্জ্বল আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেল, সূর্য এখন অনেক উঁচুতে। মেঘের ধারে ধারে এত ঝকঝকে আলো যে সেদিকে তাকাতে কষ্ট হয়, মেঘের আড়াল থেকে এল ওদের ইঞ্জিনের নিচু ঘড়ঘড় আওয়াজ, গুবরে পোকার ডাকের মত।

বনের বিমানধ্বংসী কামানগুলোর গর্জন আর গরগর চরমে পেঁছিল। ওদের ফাটন্ত গোলার ধোঁয়া ডানডেলিয়নের রোঁয়াওয়ালা বীচির মত আকাশে ভাসছে। জঙ্গী বিমানের ডানার ক্বচিৎ ঝলক, আর কিছু চোখে পড়ে না।

ক্রমশ গুবরে পোকারা গুনগুনে বাধা দিচ্ছে সুতী কাপড় ছেঁড়ার খ্যাস খ্যাস শব্দ। চোখ-ঝলসানো আলোয় যুদ্ধ চলেছে, কিন্তু আকাশ-যুদ্ধ করার সময় বৈমানিকেরা যা দেখে সেটা আর নিচে থেকে দেখা এটার চেহারা এত আলাদা, এটা এত অর্থহীন আর সাধারণ মনে হচ্ছে যে আলেক্সেই দেখে চলল বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র উত্তেজনা হল না।

ক্রমশ বেড়ে-ওঠা তীক্ষ্ন কর্ণভেদী আওয়াজে এক সারি বোমা ঝড়ের গতিতে আয়তনে বড়ো 'হয়ে উঠে নিচে সবেগে নেমে আসছে, ঝোপ থেকে

ঝাড়া কালো জলের ফোঁটার মত; এমন কি তখনো ভয় হল না আলেক্সেই'র, মাথা একটু তুলে দেখল বোমাগুলো কোথায় পড়বে।

ঠিক সেই মুহূর্তে "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" ব্যবহারে আলেক্সেই অবাক হয়ে গেল। কোমর পর্যন্ত গর্তে মেয়েটি দাঁড়িয়ে যথারীতি আড়চোখে তাকে দেখছিল; বোমাগুলোর কর্ণভেদী চীৎকার চরমে পেঁছিয়েছে, হঠাৎ এক লাফে বেরিয়ে ছুটে স্ট্রেচারটার কাছে গেল মেয়েটি, সটান শুয়ে পড়ে নিজের শরীর দিয়ে আলেক্সেইকে ঢাকল, ভয়ে আর উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে।

নিমেষের জন্য নিজের চোখের খুব কাছে আলেক্সেই দেখল রোদে-পোড়া, শিশুসুলভ একটি মুখ, ভরাট ঠোঁট, খাঁদা নাক। বনের কোথা থেকে এল বিস্ফোরণের গভীর আওয়াজ, পরমুহূর্তেই আর একটি, সেটি অনেক কাছে, তারপর আরো দুটি বিস্ফোরণ। পঞ্চম বিস্ফোরণটি এত প্রচণ্ড যে মাটি কেঁপে দুলে উঠল। যে গাছটির নিচে আলেক্সেই শুয়ে তার মাথাটা বিস্ফোরণের একটা টুকরোয় ভেঙ্গে গিয়ে সশব্দে মাটিতে পড়ল। আবার আলেক্সেই দেখল মেয়েটির বিবর্ণ ভয়ার্ত মুখ, নিজের গালে ওর গালের ঠাণ্ডা ছোঁয়াচ লাগল। দুটো বিস্ফোরণের মাঝের মুহূর্তটিতে ভয়ার্ত মেয়েটি ফিসফিস করে বলল:

'লক্ষ্মী আমার!.. সোনা আমার!'

বিকট আওয়াজে আর এক সারি বোমা ফেটে পড়ল, মাটি উঠল কেঁপে, মনে হল গাছগুলো আমূল বিমান-ঘাঁটির উপরে আকাশে ছিটকে গিয়েছে, ওদের মাথা খুলে গেল, আর জমাট মাটির বিরাট ডেলা বাজের গুরুগুরু ধ্বনিতে মাটিতে পড়ল, আকাশে রেখে গেল তামাটে ঝাঁঝালো ধোঁয়ার রেশ, রসুনের মত গন্ধ তাতে।

ধোঁয়া মিলিয়ে গেল, চারিদিক চুপচাপ। বনের পিছনে আকাশ-যুদ্ধের আওয়াজ প্রায় শোনা যাচ্ছে না। মেয়েটি ইতিমধ্যে ঝট করে দাঁড়িয়ে উঠেছে, ওর গালদুটো আর পাণ্ডুর নেই, লাল হয়ে উঠেছে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ, প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা, আলেক্সেই'র দিকে না তাকিয়ে অপরাধীর মত গলায় বলল:

'আপনার লাগেনি ত! কী বোকা, হে ভগবান, কী দারুণ বোকা আমি! বিশেষ দুঃখিত আমি!'

'এখন মাপ চেয়ে আর কী হবে,' গরগর করে ইউরা বলল, ও লজ্জিত যে আবহাওয়া কেন্দ্রের মেয়েটি তার বন্ধুকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল, ও নিজে যায়নি।

গরগর করতে করতে ওভারঅল থেকে বালি ঝাড়ল ইউরা, মাথার পেছনটা চুলকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কবন্ধ বার্চগাছটির এবড়োখেবড়ো গোড়ার দিকে, সেটির গঁুড়ি থেকে স্বচ্ছ রস অঝোর ধারায় চুঁইয়ে পড়ছে। আহত গাছটির রস আলোয় ঝিকঝিক করে শেওলাচ্ছন্ন ছাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়ছে, পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখের জলের মত।

'দেখো, গাছটা কাঁদছে!' বলল লেনচ্কা, বিপদের মধ্যেও ওর বেহায়া কৌতূহলের ভাবটা যায়নি।

'তুমিও কাঁদতে ওরকম করে!' বিষণ্ণভাবে ইউরা বলল। 'যাক, তামাশা শেষ। এবার যাওয়া যাক! আশা করি এ্যামবুলান্স-বিমানটি জখম হয়নি।'

'বসন্ত শুরু হয়েছে এখানে!' বিকলাঙ্গ গাছের গঁুড়ি, চিকচিকে স্বচ্ছ রস টপটপ করে মাটিতে পড়ছে, খাঁদা-নাক "আবহাওয়া সার্জেণ্ট", যার আর্মিকোটটা বেজায় বড়ো, যার নামটা পর্যন্ত অজানা, সবকিছুর দিকে তাকিয়ে আলেক্সেই বলল।

ওরা তিনজন — ইউরা সামনে, মেয়েদুটি পিছনে, ওকে নিয়ে চলল বিমানটির দিকে; বোমার বিস্ফোরণে কয়েক জায়গায় হাঁ হয়ে যাওয়া মাটি থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে, গলন্ত বরফের জল তাতে চুঁইয়ে পড়ছে, গর্তগুলো এড়িয়ে আঁকাবাঁকা পথে ওরা চলল; আর্মিকোটের মোটা আস্তিন থেকে যে ছোট বলিষ্ঠ হাতটা দৃঢ়ভাবে স্ট্রেচারের একটা বাঁট চেপে আছে তার দিকে সকৌতূহলে আড়চোখে তাকাল আলেক্সেই। কী হয়েছে মেয়েটির! কিম্বা হয়ত ভয়ের মুহূর্তে কথাগুলো শুনেছে কল্পনা করেছিল নিজে?

তার পক্ষে ভবিতব্যতায় ভারী সেই দিনটিতে আর একটি ঘটনা দেখল মেরেসিয়েভ। রুপালী রেডক্রস বিমানটি আর ফ্লাইট মিস্ত্রীটি ইতিমধ্যেই দৃষ্টিপথে এসেছে, মিস্ত্রীটি মাথা নেড়ে বিমানটির চারিদিকে ঘুরে দেখছে বিস্ফোরণের ঝটকায় কিম্বা কোন টুকরোয় ওটা জখম হয়েছে কিনা, এমন সময় জঙ্গী বিমানগুলো ফিরে এসে নামতে শুরু করল। বনের উপর দিয়ে সোঁ করে এসে যথারীতি বৃত্তাকারে না ঘুরেই নামল আর বেগ না কমিয়ে গেল বনের ধারে মাটির দেয়াল-ঘেরা জায়গায়।

আকাশে আর কোন হৈচৈ নেই। বিমান-ঘাঁটি সাফ করা হয়েছে, বনে ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ থেমে গেল। কিন্তু পরিচালনা-ঘাঁটিতে লোকজন তখনো দাঁড়িয়ে, রোদ বাঁচাবার জন্য চোখের সামনে হাতের আড়াল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ন নম্বর ফেরেনি! কুকুশকিন কোথাও আটকা পড়েছে,' ইউরা বলল।

কুকুশকিনের ছোট গোমড়া মুখের কথা আলেক্সেই ভাবল, তাতে হামেশাই অসন্তোষের ছাপ লেগে থাকত, মনে পড়ল সকালে কী যত্নে ওর স্ট্রেচারে হাত রেখে কুকুশকিন চলেছিল। ও কী তাহলে... ভাবনাটা কর্মমুখর দিনে অন্য কোন বৈমানিকের পক্ষে অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু আলেক্সেই ত এখন বিমান-ঘাঁটির জীবনের বাইরে, ও শিউড়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ।

আনন্দে লাফিয়ে ইউরা চেঁচিয়ে উঠল.

'ওই আসছে কুকুশকিন!'

পরিচালনা-ঘাঁটির লোকজনের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কিছু একটা ঘটেছে। "ন নম্বর" নামল না, বিমান-ঘাঁটির চারিদিকে বড়ো বৃত্তে ঘুরছে, আলেক্সেই'র উপর দিয়ে যখন গেল তখন ও দেখল যে ডানাটার একটা অংশ গুলিতে উড়ে গিয়েছে, আর, আরো অনেক খারাপ ব্যাপার সেটা, কাঠামোর নিচে একটা মাত্র "পা" দেখা যাচ্ছে। দুটো লাল হাউই একটার পর একটা আকাশে ছোঁড়া হল। বিমান-ঘাঁটির উপরে আবার উড়ে এল কুকুশকিন। ওর বিমানটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা পাখি নষ্ট নীড়ের উপরে ঘুরছে, কোথায় নামবে জানে না। তৃতীয় বার বৃত্তাকারে বিমানটি চলল।

'ও এক্ষুণি পারাস্যুটে নামবে, পেট্রল শেষ হতে চলেছে, শেষ কয়েকটা ফোঁটায় ওটা উড়ছে,' ফিসফিস করে বলল ইউরা, ওর চোখ ঘড়ির কাঁটায় আটকিয়ে গিয়েছে।

এরকম অবস্থায়, নামা যখন অসম্ভব, তখন বৈমানিকেরা কিছু উঁচুতে উঠে পারাস্যুট করে নামতে পারে। খুব সম্ভব এ মর্মের নির্দেশ "ন নম্বর"কে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একগুঁয়ের মত বিমানটি বৃত্তাকারে ঘুরেই চলল।

ইউরা একবার বিমানটির দিকে তাকাচ্ছে আর একবার ঘড়ির দিকে। বিমানের গতিবেগ মন্থর হয়ে আসছে যখন মনে হচ্ছে তখন উবু হয়ে বসে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে ও। "ও কি বিমানটাকে বাঁচাবার কথা ভাবছে?" উপস্থিত সবায়ের মনে এক চিন্তা: "লাফাও, লাফাও এবার!"

লেজে "১" আঁকা একটি জঙ্গী বিমান তীরের মত আকাশে উড়ে প্রথম চক্কর নিয়েই সুকৌশলে আহত "ন নম্বরের" পাশে এসে পড়ল। যে রকম

কৌশলে আর অবিচলিতভাবে বিমানটি চালানো হচ্ছে তা থেকে আলেক্সেই আঁচ করল যে চালক উইং কম্যাণ্ডার স্বয়ং। তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন যে কুকুশকিনের রেডিও বেকার; কিম্বা তার মাথা গ্নলিয়ে গিয়েছে, তাই তাকে সাহায্য করতে অচিরাৎ এসেছেন। বিমানের ডানা দ্নলিয়ে সংকেত করলেন, "আমি যা করছি, ঠিক সেইরকম করো," আর একপাশে হেলে উপরে উঠলেন। কুকুশকিনকে তিনি আদেশ দিলেন পাশে উড়ে গিয়ে বিমান ছেড়ে লাফাতে। কিন্তু ঠিক সেই ম্নহ্নর্তে গ্যাস কমিয়ে দিয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হল কুকুশকিন। ডানা-ভাঙ্গা বিমানটি আলেক্সেই'র ঠিক মাথার উপর দিয়ে সবেগে উড়ে মাটির কাছাকাছি এসে পড়ল। হঠাৎ বাঁ দিকে হেলে, যে "পার্টি" অক্ষত তাতে ভর করে নামল, এক চাকায় কিছ্নটা এগিয়ে গতিবেগ কমিয়ে বিমানটি ডান দিকে হেলে পড়ল, অক্ষত ডানাটি মাটিতে লাগাতে বরফের ঝড় তুলে সবেগে ঘ্নরপাক খেল।

বরফের ঘ্নর্ণি কমে গেলে দেখা গেল কালো কী একটা পঙ্গ্ন বিমানটার কাছে পড়ে আছে। কালো জিনিসটির দিকে লোকজনেরা দৌড়িয়ে গেল, সাইরেন বাজিয়ে এ্যাম্ব্নলান্সের গাড়ি ছ্নটল সেদিকে।

"বিমানটিকে বাঁচিয়েছে ও! কুকুশকিন তাহলে এ ধরনের মান্নষ! এরকম কাজ করতে কবে শিখল ও?" স্ট্রেচারে শ্নয়ে মেরেসিয়েভ ভাবছে, কুকুশকিনের উপর হিংসে হচ্ছে তার।

ওর আগ্রহ হল প্রাণপণ শক্তিতে ছ্নটে যায় সেখানে যেখানে শ্নয়ে আছে ছোটখাটো, সবায়ের অপ্রিয় মান্নষটি, যে মান্নষটি নিজেকে সাহসী আর স্নদক্ষ বৈমানিক বলে প্রমাণ করেছে। কিন্তু স্ট্রেচারে বাঁধা আলেক্সেই, তাকে ঘিরেছে যন্ত্রণার নাগপাশ, স্নায়বিক উত্তেজনা থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে যন্ত্রণায় আবার সে অভিভূত।

সবকিছ্ন ঘটতে এক ঘণ্টারও বেশী লাগেনি, কিন্তু ঘটনাগ্নলি সংখ্যায় এত বেশী, এত তাড়াতাড়ি ঘটে যে সেগ্নলোকে বিশ্লেষণ করতে আলেক্সেই তৎক্ষণাৎ পারেনি। রেডক্রস বিমানের বিশেষ খোলে স্ট্রেচারটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে; আবার তার চোখে পড়ল "আবহাওয়া সার্জেণ্টটি" একদ্নষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে, শ্নধ্ন তখনি বোমাব্নষ্টির সময়ে মেয়েটির বিবর্ণ ম্নখ দিয়ে যে কথাগ্নলো ফসকে বেরিয়ে এসেছিল তাদের আসল অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারল আলেক্সেই। এই চমৎকার, আত্মত্যাগী মেয়েটির নাম পর্যন্ত জানে না বলে ওর লজ্জা হল।

'কমরেড সার্জেণ্ট,' নিচু গলায় ও ডাকল, কৃতজ্ঞভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে।

ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়ের মধ্যে মেয়েটি শ‍ুনল কিনা সন্দেহ, কিন্তু এগিয়ে একটা প্যাকেট ওর সামনে ধরে সে বলল:

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, এগ‍ুলো আপনার চিঠি। চিঠিগ‍ুলো রেখে দিয়েছিলাম, কেননা আমি জানতাম আপনি বে'চে আছেন, আবার ফিরে আসবেন। জানতাম সেটা, মনে প্রাণে জানতাম...'

চিঠির ছোট গোছাটা আলেক্সেই'র ব‍ুকের উপরে রাখল মেয়েটি। ও দেখল কয়েকটি চিঠি এসেছে মায়ের কাছ থেকে, তিনকোণা করে ভাঁজ করা, ঠিকানাগ‍ুলো বয়স্কার টেরাবাঁকা হাতে লেখা। আর কয়েকটার খাম পরিচিত, সেরকম খাম ও সব সময়ে টিউনিকের পকেটে রাখত। সেগ‍ুলো দেখে ওর ম‍ুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কম্বলের নিচে থেকে হাত বের করার চেষ্টা করল আলেক্সেই।

'কোন মেয়ে লিখেছে ব‍ুঝি?' "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞেস করল, আবার ওর ম‍ুখ লাল হয়ে উঠল, চোখে জল আসাতে ওর দীর্ঘ তামাটে চোখের পাতা ভিজে জ‍ুড়ে গেল।

আলেক্সেই ব‍ুঝতে পারল যে বিস্ফোরণের সময়ের সে কথাগ‍ুলো তাহলে কল্পিত নয়; ব‍ুঝতে পেরে সত্যি কথা বলার সাহস হল না তার।

'আমার বোনের চিঠি, সে বিবাহিত। ওর পদবী অন্য এখন,' বলে আলেক্সেই আত্মগ্লানি বোধ করল।

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে অন্যদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। পাশের দরজা খ‍ুলে গেল, একজন অচেনা চিকিৎসক বিমানে উঠলেন, তাঁর আর্মিকোটের উপরে শাদা ওভারঅল চাপানো।

'রোগীদের একজন তাহলে ইতিমধ্যেই এখানে? বেশ, বেশ,' মেরেসিয়েভের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন। 'অন্যটিকেও নিয়ে এসো। আমরা এক্ষ‍ুণি ছাড়ব। আর আপনি এখানে কী করছেন, মহাশয়া?' বাষ্পে-ঝাপসা চশমার মধ্যে দিয়ে "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, মেয়েটি ইউরার আড়ালে থাকার চেষ্টা করছিল। 'আপনি যান, দয়া করে, আমরা এক্ষ‍ুণি ছাড়ব। ওহে, স্ট্রেচারটি ঢোকাও!'

'চিঠি দেবেন, ভগবানের দোহাই, চিঠি দেবেন, আমি অপেক্ষায় থাকব!' আলেক্সেই শ‍ুনল মেয়েটি ফিসফিস করে বলছে।

ইউরার সহায়তায় চিকিৎসকটি একটি স্ট্রেচার বিমানের মধ্যে তুলে নিলেন, তার উপরে শুয়ে কে যেন গোঙাচ্ছে। খোলে বসানোর সময় ঢাকা-দেওয়া চাদরটা স্ট্রেচার থেকে খসে পড়াতে আলেক্সেই'র চোখে পড়ল যন্ত্রণায় বিকৃত কুকুশকিনের মুখ। ডাক্তার হাতে হাত ঘষে কামরার চারিদিকে তাকিয়ে মেরেসিয়েভের পেট চাপড়িয়ে বললেন:

'খাসা, চমৎকার! একজন সহযাত্রী আপনার সঙ্গে দেব। কী বলুন? আর এখন অন্য সবাই বেরিয়ে যাও। সার্জেণ্টের চিহ্নওয়ালা লরেলি তাহলে চলে গিয়েছে? বেশ! এবার রওনা হওয়া যাক!'

ইউরার চলে যেতে দেরী হল। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক তাকে ঠেলে বের করে দিলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বিমানটি কে'পে উঠল, চলতে শুরু করল, তারপর উপরে উঠে ধীর মসৃণভাবে তার নিজের জগতে ভেসে গেল, ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় সমানে বেজে চলেছে। দেয়াল ধরে ধরে চিকিৎসক মেরেসিয়েভের কাছে গেলেন।

'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'নাড়ীটা দেখি!' জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে মেরেসিয়েভের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আচ্ছা। মনের জোর আছে!' তারপর মেরেসিয়েভকে বললেন, 'আপনার বন্ধুদের কাছে আপনার দুঃসাহসিক কাজের কথা শুনেছি, প্রায় অবিশ্বাস্য গল্পগুলো, অনেকটা জ্যাক লণ্ডনের গল্পের মত।'

ধপাস করে বসে আরামে গা ছড়ালেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে পড়ে ঝিমোতে শুরু করলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল এই বিগতযৌবন, বিবর্ণমুখ লোকটি অসীম ক্লান্ত।

"জ্যাক লণ্ডনের গল্পের মত।" ভাবল মেরেসিয়েভ, আর সুন্দর শৈশবের স্মৃতি আবার ফিরে এল: একটি লোক, ঠাণ্ডায় তার পা অসাড় হয়ে গিয়েছে, মরুভূমিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে, পিছু পিছু আসছে রুগ্ন ক্ষুধিত একটি নেকড়ে, তার গল্প। ইঞ্জিনের সমান ঘড়ঘড় আওয়াজে ঘুম পাচ্ছে, সবকিছু ভাসছে, অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে ধূসর অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে যে অদ্ভুত কথাটি তার মনে হল সেটি হচ্ছে যে যুদ্ধ থেমে গেছে, বোমা আর পড়ছে না, পায়ের সেই অবিরত দবদবে যন্ত্রণা আর নেই, মস্কো অভিমুখে খরবেগে চলছে না বিমানটা, এসব কিছু কামিশিন সহরে তার ছেলেবেলায় পড়া কোন আশ্চর্য বই থেকে নেওয়া।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

রাজধানীর যে হাসপাতালে মেরেসিয়েভ ও লেফ্‌টেনাণ্ট কনস্তান্তিন কুকুশকিনকে রাখা হল সেটি সত্যিই চমৎকার, বন্ধুর কাছে সেটির বর্ণনা করার সময় আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো আর লেনচ্‌কা মোটেই অত্যুক্তি করেনি।

যুদ্ধের আগে একটি ইনস্টিটিউটের ক্লিনিক ছিল সেটি, ব্যাধি কিম্বা আঘাতের পরে লোকেরা কী করে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারে তার নতুন নানা উপায় নিয়ে একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সোভিয়েত বিজ্ঞানী গবেষণা করতেন সেখানে। ইনস্টিটিউটটি নানা ঐতিহ্যে গরীয়ান, পৃথিবী জুড়ে তার খ্যাতি।

যুদ্ধ বাধার পর ক্লিনিকটিকে বাহিনীর আহত অফিসারদের হাসপাতালে পরিণত করেন বিজ্ঞানীটি। আধুনিক বিজ্ঞানের জানা যত কিছু পদ্ধতিতে রোগীদের চিকিৎসা চলে। মস্কোর অনতিদূরে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে, ফলে আহতদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে আগেকার তুলনায় খাটের সংখ্যা চারগুণ বাড়াতে হল। অন্যান্য সমস্ত ঘর — আগন্তুকদের বসবার ঘর, পড়ার আর বিশ্রামের ঘর, কর্মচারীবৃন্দের ঘর আর খাবার ঘর — ওয়ার্ডে পরিণত করা হল। এমন কি গবেষণাগারের পাশে নিজের পড়বার ঘরটি পর্যন্ত বিজ্ঞানী ছেড়ে দিয়ে বইটই নিয়ে ছোট্ট একটি ঘরে গেলেন, সেটিতে আগে কাজের সময় নার্সরা থাকত। তা সত্ত্বেও করিডরে মাঝেমাঝে খাট পাততে হত।

ঝকঝকে শাদা দেয়ালগুলো দেখে মনে হত চিকিৎসা মন্দিরের উপযুক্ত গম্ভীর স্তব্ধতার জন্যই বিশেষ করে ওদের বানানো হয়েছে, দেয়ালের ওধার থেকে আসছে ঘুমন্ত রোগীদের গোঙানি আর নাক ডাকার শব্দ, বিকারগ্রস্তদের প্রলাপ। যুদ্ধের নানা গুমোট ভারী গন্ধে জায়গাটি আচ্ছন্ন, রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ,

দগদগে ঘা আর জীবন্ত মানুষের পচা মাংসের গন্ধ, সে গন্ধ কিছুতেই তাড়ানো যায় না। বিজ্ঞানীর নিজের নক্সায় তৈরী আরামি খাটগুলোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর ভাঁজ-করা খাট। বাসনপত্র কম পড়ে গিয়েছিল। ক্লিনিকের সুন্দর সুন্দর চীনামাটির বাসন ছাড়াও এ্যালুমিনিয়ামের টোল-খাওয়া বাটি ব্যবহার করা হত। কাছাকাছি ফাটা বোমার ঝটকায় বিরাট ইতালীয় জানলাগুলোর কাচ ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, জানলাগুলো পিজবোর্ড দিয়ে ঢাকা। এমন কি জলের অভাবও ছিল, প্রায়ই গ্যাস বন্ধ করে দেওয়া হত, পুরোনো অপ্রচলিত স্পিরিট-স্টোভে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ করে নেওয়া হত। কিন্তু আহতদের ভিড় কমছে না। ক্রমাগত তাদের আনা হচ্ছে — বিমানে, গাড়িতে আর ট্রেনে — সংখ্যা তাদের বেড়েই চলেছে। আমাদের আক্রমণের জোর যত বাড়ছে সেই অনুপাতে বাড়ছে আহতদের সংখ্যাও।

কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও হাসপাতালের সবাই — সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্য, মাননীয় বিজ্ঞানী যিনি সেই অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে, ওয়ার্ডের মেয়েরা, ক্লোকরুমের পরিচারিকা আর মেয়ে পোর্টাররা পর্যন্ত সবাই ইনস্টিটিউটটির প্রচলিত সমস্ত প্রথার একচুল এদিক ওদিক হতে দেয় না, যদিও তারা ক্লান্ত, মাঝেমাঝে আধ-পেটা থাকতে হয়, পুরো রাত্রির বিশ্রাম কাকে বলে ভুলে গিয়েছে তারা। ওয়ার্ডের মেয়েরা মাঝেমাঝে বিশ্রাম না করে একটানা দু'তিন পালা কাজ করে যায়, এতটুকু অবসর মিললেই ধোয়ামোছা শুরু করে, এক মুহূর্ত নষ্ট হতে দেয় না। নার্সরা শীর্ণ, বুড়িয়ে গিয়েছে তারা, অবসাদে ঠিকমত পা পড়ে না, আগেকার মতই ধবধবে শাদা ওভারঅলে কাজে আসে, ডাক্তারদের সব নির্দেশ আগেকার মতই একচুল এদিক ওদিক না করে কার্যকরী করে। হাউস সার্জনরা রোগীদের বিছানায় দাগটুকু দেখলেই যথারীতি কঠোর মন্তব্য করে, রুমাল দিয়ে দেয়াল, সিঁড়ির থাম্বার রেল আর দরজার হাতল ঘষে দেখে যে কোন ময়লা আছে কিনা। দিনে দুবার, নির্ধারিত সময়ে অধ্যক্ষ নিজে যুদ্ধের আগে যেমন তেমন ওয়ার্ডে রোঁদ দিতে আসেন, পিছু পিছু শাদা ওভারঅল পরনে হাউস সার্জন আর সহকারীর রীতিমত একটা দল: দীর্ঘাকৃতি, টকটকে লাল মুখ বৃদ্ধ অধ্যক্ষটি দারুণ নিয়ম মেনে চলেন, তাঁর প্রশস্ত কপালের উপরে ঘন চুলে পাক ধরেছে, গোঁফজোড়া কালো, জমকালো দাড়িতে শাদার ছিট, নতুন রোগীদের কার্ড পর্যবেক্ষণ করে, অবস্থা যাদের খারাপ তাদের বিষয়ে নির্দেশ দেন।

বিক্ষুব্ধ সেই সব দিনগুলোতে হাসপাতালের বাইরেও তাঁকে অসম্ভব কাজ করতে হত, কিন্তু ঘুম আর অবসরের বালাই না করে নিজের গড়া ইনস্টিটিউটটির দেখাশোনা করার সময় তিনি করে নিতেন। হাসপাতালের কর্মচারীকে কোন ত্রুটির জন্য যখন বকতেন — আর "অকুস্থলেই" বরাবর বকাবকিটা তিনি উচ্চকণ্ঠে গভীর আবেগের সঙ্গে করতেন — তখন হামেশাই জোর দিয়ে বলতেন যে এমনি কি যুদ্ধকালীন, নিষ্প্রদীপ, হুঁশিয়ারি মস্কো সহরেও ইনস্টিটিউটটিকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করে যেতে হবে, সেটাই হবে হিটলার আর হেরিং গুষ্ঠির মুখের মত জবাব। যুদ্ধকালীন অসুবিধার কোন ছুতোয় তিনি কান দিতেন না, বলতেন কুঁড়ে আর অলস যারা তারা এখান থেকে বিদায় নিয়ে জাহান্নমে যেতে পারে, সময় এখন বেগতিক বলেই ইনস্টিটিউটের সব নিয়ম বিশেষ কড়াভাবে চালু রাখতে হবে। তিনি নিজে রোঁদে আসতেন ঘড়ির কাঁটা ধরে, ওয়ার্ডের মেয়েরা আগেকার মতই তাঁকে দেখে দেয়াল-ঘড়ি মেলাত। বিমান আক্রমণের সময়েও মানুষটির সময়ের কোন নড়চড় হত না। তাঁরি প্রেরণায় অবিশ্বাস্য নানা অসুবিধা সত্ত্বেও হাসপাতালের কর্মচারীরা কামাল করত, যুদ্ধের আগেকার সব বন্দোবস্ত চালু রাখতে পেরেছিল তারা।

সকালের রোঁদে ঘোরার সময় একদিন অধ্যক্ষটি — আমরা ওঁকে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বলে ডাকব — দোতলার সিঁড়ির সামনে পাশাপাশি পাতা দুটো খাটের কাছে এলেন।

'এই তামাসার মানে কী?' গরগর করে উঠে তিনি ঝাঁকড়া ভুরুজোড়া কুঁচকিয়ে হাউস সার্জনের দিকে এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করলেন যে সেই চওড়া-কাঁধ, মধ্যবয়স্ক, গম্ভীর চেহারার লোকটি পাঠশালার ছাত্রের মত সম্মানে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল:

'মাত্র কাল রাত্রে এসেছে... বৈমানিক ওরা। এটির উরু আর ডান হাত ভেঙ্গে গিয়েছে। অবস্থা স্বাভাবিক। কিন্তু ওটির,' চোখ বুজে, অনড়ভাবে শুয়ে আছে অতিশীর্ণ লোকটি, বয়স কত বোঝা যাচ্ছে না, তার দিকে দেখিয়ে হাউস সার্জন বলল, 'অবস্থা খুব খারাপ। পায়ের পাতার ওপরদিকটা ভেঙ্গে গেছে, দুটো পায়ে গাংগ্রীন, কিন্তু প্রধানত, শরীরে আর শক্তি নেই। ওদের যে চিকিৎসক এখানে আনেন তিনি বলেন, কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি অবশ্য, যে যার পা ভাঙ্গা সে জার্মান লাইনের ওদিক থেকে আঠারো দিন হামাগুড়ি দিয়ে এসেছে। এটা, অবশ্যই, অতিরঞ্জিত...'

হাউস সার্জনের কথায় কান না দিয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কম্বলটা তুললেন। বুকের উপরে হাত জোড় করে মেরেসিয়েভ শুয়ে আছে। নতুন ফরসা সার্ট আর চাদরগুলোর পটভূমিতে কালো চামড়ায় মোড়া হাতদুটো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তা থেকে মানুষের অস্থি সংস্থানের বিষয়ে লোকে জেনে নিতে পারে। আস্তে আস্তে কম্বলটা নামিয়ে রেখে, হাউস সার্জনকে বাধা দিয়ে অধ্যাপক গরগর করে বললেন:

'ওদের এখানে রাখা হয়েছে কেন!'

'করিডরে আর জায়গা নেই। আপনি নিজেই ত...'

'আমি নিজে! আমি নিজে! ৪২ নং ঘরটার কী হল?'

'ওটা কর্ণেলের ওয়ার্ড।'

'বটে!' চেঁচিয়ে উঠলেন অধ্যাপক। 'কর্ণেলের ওয়ার্ড। কোন নির্বোধের আবিষ্কার এটা!'

'আমাদের কিন্তু বলা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরদের জন্যে একটা কামরা আলাদা করে রাখতে!'

'বীর, বীর বটে! এই যুদ্ধে সবাই বীর! কিন্তু আমাকে কী শেখাবার চেষ্টা করছ? হাসপাতালটার ভার কার হাতে? এদের দুজনকে এক্ষুণি ৪২ নং ঘরে নিয়ে যাও। "কর্ণেলের ওয়ার্ড!" যতো সব বাজে কথা!'

এগিয়ে গেলেন অধ্যাপক, পিছু পিছু এখন বিনীতভাবে যাচ্ছে অনুচরবর্গ, কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে মেরেসিয়েভের বিছানায় ঝুঁকে পড়ে ওর কাঁধে নিজের ফোলা-ফোলা হাত রাখলেন তিনি, নানা রকমের ডিস্ইনফেকটান্টের ঝাঁঝে হাতের চামড়া উঠে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করলেন:

'জার্মান লাইনের ওধারে দু হপ্তার বেশী তুমি হামাগুড়ি দিয়েছিলে, কথাটা কী সত্যি?'

প্রত্যুত্তরে ক্ষীণকণ্ঠে মেরেসিয়েভ জিজ্ঞেস করল, 'আমার কী গাংগ্রীন হয়েছে?'

দরজার কাছে অনুচরবর্গ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে অধ্যাপক বৈমানিকের দুঃখ আর উৎকণ্ঠায় ভরা বড়ো কালো চোখে চোখ রেখে কোন ভণিতা না করে বললেন:

'তোমার মত লোককে ধাপ্পা দেওয়া পাপ। হ্যাঁ, গাংগ্রীন হয়েছে। কিন্তু মুষড়ে পড়ো না। এমন কোন রোগ নেই যা সারানো যায় না, ঠিক যেমন এমন কোন অবস্থা নেই যা বদলানো যায় না। মনে রেখো! ব্যস।'

আর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন দীর্ঘাকৃতি চটপটে মানুষটি। একটু পরেই করিডরের কাচের দরজা দিয়ে তাঁর গরগরানির দূর আওয়াজ এল।

'মজার লোক বটে!' ভারী চোখে পশ্চাদপসারণী মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে মেরেসিয়েভ বলল।

'লোকটার মাথা খারাপ। কী বলল শুনলে ত? আমাদের দেখিয়ে রোয়াব নিচ্ছে। এ সব ভিজে বেড়ালদের খুব চিনি,' নিজের বিছানা থেকে বাঁকা হাসি হেসে কুকুশকিন সাড়া দিল, 'তাহলে কর্ণেলের ওয়ার্ডে আমাদের রেখে কৃতার্থ করে দেবে!'

'গাংগ্রীন,' অস্ফুট স্বরে বলল মেরেসিয়েভ, বিষণ্ণভাবে পুনরুক্তি করল, 'গাংগ্রীন ...'

২

তথাকথিত "কর্ণেলের ওয়ার্ডটি" দোতলার করিডরের এক প্রান্তে। দক্ষিণ আর পুবমুখো জানলাগুলো, ফলে সব সময়ে সূর্যের আলো পাওয়া যায়, এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় আস্তে আস্তে আলোর রেখা সরে সরে যায়। ওয়ার্ডটা বড় নয়। কাঠের মেঝেতে কালো কালো দাগ থেকে বোঝা যায় আগে দুটি মাত্র খাট, খাটের ধারে দুটো আলমারি আর মাঝখানে একটা গোল টেবিল ছিল। সে জায়গায় এখন চারটে খাট। একটাতে শুয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি আহত লোক, কাপড়ে-জড়ানো নবজাত শিশুর মত দেখাচ্ছে তাকে। চিৎ হয়ে শুয়ে ব্যাণ্ডেজের ফাঁকে শূন্য অনড় দৃষ্টিতে ঘরের ছাতের দিকে তাকিয়ে আছে। আলেক্সেই'র পাশের বিছানায় শুয়ে আর একজন, কুঞ্চিত দাগদুষ্ট সৈনিকসুলভ মুখ, পাতলা বিবর্ণ গোঁফ, লোকটি খুব উপকারপরায়ণ, গপ্পে আর চটপটে।

হাসপাতালে তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সন্ধ্যা হতে না হতে আলেক্সেই জানতে পারল গুটি-মুখ লোকটি সাইবেরিয়ান, যৌথখামারের সভাপতি সে আর শিকারী, সৈন্যবাহিনীতে স্নাইপার ছিল, কাজটা বেশ ভালোই করত। ইয়েল্নিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধগুলির সময়ে ও, ওর দুই ছেলে আর জামাই সাইবেরিয়ান বাহিনীতে লড়াই'এ নামে, সে-সময় থেকে শুরু করে সত্তরটি ফ্যাশিস্টকে, ওর ভাষায়, "একে একে সাবাড় করেছে" সে। সোভিয়েত

ইউনিয়নের বীর খেতাব পেয়েছে, নিজের নাম বলাতে সকৌতূহলে আলেক্সেই এই ঘরোয়া চেহারার মানুষটির দিকে তাকাল। সৈন্যবাহিনীতে নামটা বেশ চেনা সে-সময়ে, বড়ো বড়ো খবরের কাগজগুলো ওর বিষয়ে এমন কি সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখেছিল। হাসপাতালের সবাই — নার্সরা, হাউস সার্জনটি, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ নিজে সম্মান দেখিয়ে ওকে স্তেপান ইভানভিচ বলে ডাকত।

ওয়ার্ডের চতুর্থ বাসিন্দেটি, যার আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, সারা দিন নিজের সম্বন্ধে একটি কথা বলেনি; সত্যি বলতে, কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরোয়নি। কিন্তু পৃথিবীর সবকিছু বিষয়ে স্তেপান ইভানভিচ ওয়াকিবহাল, সে মেরেসিয়েভকে আস্তে আস্তে ওর কাহিনীটা শোনায়। ওর নাম গ্রিগরি গভজ্‌দেভ, ট্যাংক-বাহিনীর লেফ্‌টেনাণ্ট, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব ও-ও পেয়েছে। ট্যাঙ্ক স্কুল থেকে পাস করে শুরু থেকেই লড়াই'এ ছিল। ব্রেস্ত-লিতভ্‌স্কের দুর্গের কাছাকাছি কোথায়, সীমান্তে যুদ্ধের প্রথম স্বাদ ও পায়। বেলস্তকের কাছে বিখ্যাত ট্যাংক-যুদ্ধে ওর ট্যাংকটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু অন্য একটা ট্যাংকে, যার কম্যাণ্ডার নিহত হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ চেপে ট্যাংক ডিভিশনের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে মিনস্কের দিকে যে-সব সৈন্যবা হটে যাচ্ছিল তাদের আগলে ও নিয়ে যায়। বুগের যুদ্ধে ও আহত হয়, দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটিও নষ্ট হয়। আবার অন্য একটা ট্যাংকে, তারো কম্যাণ্ডার মারা গিয়েছিল, ও চলে যায়, আর একটি ট্যাংক কম্পানির ভার নেয়। পরে ও দেখল শত্রুপক্ষের একেবারে পিছনে পড়ে আছে, তখন তিনটে ট্যাংক নিয়ে একটা ভ্রাম্যমাণ দল গড়ে প্রায় এক মাস জার্মান লাইনের অনেক পিছনে থাকে, যানবাহন আর জার্মান সৈন্যদের খুব ভোগায়। যুদ্ধ যেখানে হয়ে গিয়েছে সেই সব জায়গা থেকে পেট্রল, গোলাগুলি আর যন্ত্রপাতি জোগাড় করে ওরা চালায়। রাস্তার ধারে ধারে সবুজ নিচু জায়গায়, বনে আর জলায় সব রকমের ভাঙ্গা যন্ত্রের কোন অভাব ছিল না।

দরগবুজের কাছাকাছি একটা জায়গায় তার জন্ম। ট্যাংকের লোকেরা নিয়মিতভাবে রেডিও-সেটে সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহার পেত, তা থেকে গ্রিগরি যখন জানতে পেল যে যুদ্ধের গতি ওর জন্মস্থানের কাছে এসে পড়েছে তখন আর নিজেকে সামলাতে পারেনি, তিনটে ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়ে ও নিজে আর আটজন উত্তরজীবী বনের মধ্যে দিয়ে চলল নিজেদের বাহিনীতে আবার যোগ দেবার জন্য।

যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে, বিস্তৃত মাঠে এঁকেবেঁকে প্রবহমান ছোট একটি নদীর ধারে তার ছোট গ্রামটিতে এসে গভজ্‌দেভ ছিল ছুটির সময়। ওর মা, গ্রামের স্কুলে পড়াতেন তিনি, বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়াতে বাড়ি আসার জন্য ওর বাবা ওকে তার করেন। ওর বাবা পুরোনো কৃষিবিদ আর শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের আঞ্চলিক সোভিয়েতের সদস্য।

গভজ্‌দেভের মনে পড়ে গেল স্কুলের কাছে কাঠের নিচু ঘরটা, ছোটখাটো শীর্ণদেহ ওর মা অসহায়ভাবে পুরোনো সোফায় শুয়ে আছেন, পুরোনো ধরনের সানটুঙ্গ কোট পরনে ওর বাবা মার শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কাশছেন আর পাকা ছোট দাড়িতে উৎকণ্ঠায় টান দিচ্ছেন; ওর ছোট্ট তিনটি বোন, কালো চুল তাদের, মায়ের চেহারার সঙ্গে তাদের খুব আদল আছে। আর মনে পড়ল পাতলা, নীল-চোখ জেনিয়ার কথা, গ্রামের ডাক্তার সে, ঘোড়ার গাড়িতে রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ওর সঙ্গে এসেছিল বিদায় জানাতে। প্রত্যেক দিন ওকে চিঠি দেবে কথা দিয়েছিল গভজ্‌দেভ। বেলরুশিয়ার পদদলিত মাঠেঘাটে আর পোড়া জনহীন গ্রামে বন্য জন্তুর মত লুকিয়ে, সহর আর বড়ো রাস্তা এড়িয়ে যাচ্ছে সে, ব্যথায় বুক টনটন করে উঠছে, চেষ্টা করছে আঁচ করতে নিজের গ্রামে ফিরে কী দেখবে, ভাবছে নিজের লোকজন চলে যেতে পেরেছে কিনা, না পেরে থাকলে তাদের কপালে কী জুটেছে।

গ্রামে পৌঁছিয়ে যা দেখল তা তার অশুভতম ধারণারও বাইরে। ভিটে নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, জেনিয়া নেই, গ্রামটি পর্যন্ত নেই। আধো-পাগলী একটা বুড়ী নাচার ভঙ্গীতে পা দুলিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে ঝলসানো জিনিসের মধ্যে স্টোভে কী একটা রান্না করছিল, তার কাছে গভজ্‌দেভ শুনল যে ফ্যাশিস্টরা যখন কাছাকাছি এসে পড়ে তখন ওর মা এত অসুস্থ যে কৃষিবিদ আর মেয়েরা ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বা ছেড়ে চলে যেতে সাহস করেনি। ফ্যাশিস্টরা জানতে পারল যে শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের আঞ্চলিক সোভিয়েতের একজন সদস্য আর তার পরিবার গ্রামে থেকে গিয়েছে। তারা সবাইকে ধরে সেই রাত্রেই বাড়ির সামনের বার্চগাছটিতে লটকে দেয়, বাড়িটা দেয় পুড়িয়ে। বুড়ীর কাছে এও শুনল যে গভজ্‌দেভ পরিবারের হয়ে মিনতি জানাতে জেনিয়া গিয়েছিল উর্ধ্বস্তন অফিসারের কাছে, অফিসারটি নাকি ওকে ভোগ করতে চায়, ওকে নাকি অনেকক্ষণ উৎপীড়ন করে তারা। ঠিক কী হয়েছিল বুড়ী সেটা জানে না, কিন্তু যে বাড়িতে অফিসারটি আস্তানা গেড়েছিল তার পরের দিন সে বাড়ি থেকে

জেনিয়ার মৃতদেহ বের করে আনা হয়, নদীর ধারে দুদিন দেহটি পড়ে ছিল। পরে যৌথখামারের আস্তাবলে রাখা তাদের পেট্রলের ট্যাংক কেউ আগুন লাগিয়ে দেওয়াতে জার্মানরা সমস্ত গ্রামটা পুড়িয়ে দেয়। এটা ঘটে মাত্র পাঁচ দিন আগে।

গভজ্‌দেভকে বুড়ী নিয়ে গেল ওর বাড়ির ভস্মাবশেষের কাছে, বার্চগাছটা দেখাল। শৈশবে গাছটার একটা মোটা ডালে ওর দোলনাটা ঝুলত। ডালটা শুকিয়ে গেছে, পোড়া ডাল থেকে ঝুলে হাওয়ায় দুলছে পাঁচটা দড়ির গোড়ার দিকটা। হেলেদুলে, বিড়বিড় করে কী একটা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে বুড়ী নদীতে নিয়ে গেল গভজ্‌দেভকে, রোজ যাকে চিঠি লেখার কথা দিয়ে লেখবার সময় পায়নি সেই মেয়েটির দেহ কোথায় পড়ে ছিল দেখাল বুড়ী। নলখাগড়ার খসখস শব্দ। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে গভজ্‌দেভ বনে ফিরে গেল, ওর লোকেরা সেখানে তার অপেক্ষায় ছিল। একটিও কথা বলেনি সে, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি।

জুনের শেষে, জেনারেল কনেভ তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালিয়েছেন, গ্রিগরি গভজ্‌দেভ আর ওর লোকেরা জার্মান লাইন ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে। অগস্টে ওকে নতুন একটা ট্যাঙ্ক, "টি-৩৪" দেওয়া হল আর শীতের আগেই ব্যাটেলিয়নের সবাই ওকে "কোন কিছুর পরোয়া করে না" বলে চিনল। ওর সম্বন্ধে নানা গল্প মুখে মুখে চলত, ছাপাও হত, গল্পগুলো অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। একটি রাত্রে পর্যবেক্ষণে গিয়ে ও জার্মান লাইন তীব্র গতিতে ভেঙ্গে ওদের বসানো মাইন এড়িয়ে ট্যাঙ্কের কামান চালায়, ভয়ে বিহ্বল শত্রুদের পেরিয়ে একটি ছোট সহরে পেশছয়, সেই সহরটির অর্ধেক সোভিয়েত বাহিনী ঘেরাও করেছিল, ওধারে গিয়ে নিজেদের দলে আবার যোগ দেয় গভজ্‌দেভ, শত্রুপক্ষের বিড়ম্বনা নেহাৎ কম হয়নি। আর একবার জার্মান লাইনের পিছনে একটি সচল দলের সঙ্গে থাকার সময়ে গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে একটি জার্মান পরিবহন দলকে হঠাৎ আক্রমণ করে ওদের ঘোড়া আর গাড়ি গুঁড়িয়ে দেয় ট্যাঙ্কের চাকায়।

শীতকালে ট্যাঙ্কের একটি ছোট দলের পুরোভাগে থেকে ও রুজেভের কাছে গড়বন্দী একটি গ্রামের রক্ষী সেনাদলকে আক্রমণ করে, গ্রামটিতে যুদ্ধ চালনার জন্য শত্রুপক্ষের ছোট একটি হেডকোয়ার্টার ছিল। গ্রামের উপকণ্ঠে ট্যাঙ্কগুলো প্রতিরোধ এলাকা পার হচ্ছে, এমন সময়ে দাহ্য তরল জিনিসের একটা বোতল ওর ট্যাঙ্কে লাগে। ধোঁয়াটে, দমবন্ধ করা অগ্নিশিখায় ট্যাঙ্কটি

আচ্ছন্ন কিন্তু ভেতরের লোকেরা কাজ চালিয়ে গেল। বিরাট একটা মশালের মত গ্রামটির মধ্য দিয়ে ছুটে চলল ট্যাঙ্কটা, সব কটা কামান চালিয়ে এদিকে বেঁকছে, ওদিকে ঘুরছে, পলাতক জার্মান সৈন্যদের ধাওয়া করে পিষে দিচ্ছে। যারা একদা ওর সঙ্গে শত্রুপক্ষের পিছনে ছিল তাদের থেকে বাছাই করে লোক নিয়েছিল গভজ্‌দেভ, ওরা সবাই জানে যে কোন মুহূর্তে তেল কিম্বা গোলাবারুদের বিস্ফোরণে ট্যাঙ্কটা উড়ে যেতে পারে। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে ওদের, গনগনে লাল লৌহাবরণে শরীর পুড়ে যাচ্ছে, কাপড়-চোপড়ে ইতিমধ্যেই আগুন লেগে ধিক ধিক করছে, কিন্তু লড়াই করে চলল ওরা। ভারী একটা গোলা চাকার নিচে ফাটল, উল্টে গেল ট্যাঙ্কটা, বিস্ফোরণের ঝটকায়, কিম্বা তার ফলে ধুলো আর বরফের ঘূর্ণিতে, যে কারণেই হোক আগুন গেল নিভে। গভজ্‌দেভকে ট্যাঙ্ক থেকে বের করা হল, ভয়াবহভাবে পুড়ে গিয়েছে ওর শরীর। বুরুজে মৃত কামানচালকের পাশে বসে ও কামান চালাচ্ছিল ...

জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দুমাস পড়ে আছে গভজ্‌দেভ, সেরে ওঠার ব্যাপারে বীতস্পৃহ, কোন কিছুতে আগ্রহ নেই, মাঝেমাঝে বেশ কিছুদিন একেবারে কথা বলে না।

সাঙ্ঘাতিক চোট লাগে যাদের তাদের পৃথিবী হাসপাতাল ওয়ার্ডের চারটে দেয়ালের মধ্যে সাধারণত সীমাবদ্ধ। দেয়ালগুলোর বাইরের পৃথিবীতে কোথাও যুদ্ধ চলেছে, অনেক কিছু ঘটছে যার গুরুত্ব বেশী কিম্বা কম, আবেগ চরমে পেঁছিচ্ছে, আর প্রতিটি দিন প্রত্যেক মানুষের অন্তরে নতুন ছাপ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু যে ওয়ার্ডে ভীষণ আহত লোকেরা থাকে সে ওয়ার্ডে বাইরের জীবনের প্রবেশ নিষেধ, হাসপাতালের বাইরে যে ঝড় অবিরত বইছে তার টুকরো টুকরো চাপা শব্দ মাত্র সেখানে পেঁছিয়। ওয়ার্ডের জীবন নিজস্ব ছোটখাটো ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। রোদে তপ্ত জানলার শার্সিতে অলস, ধুলো-ভরা কোন মাছি বসল, সেটা একটা ঘটনা। ওয়ার্ডের ভার যার হাতে সেই ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা সন্ধ্যেবেলায় হাসপাতাল থেকে সোজা থিয়েটারে যাবে ঠিক করেছে বলে নতুন উঁচু-গোড়ালি জুতো পরেছে, সেটা একটা খবর। খোবানীর টকে সবায়ের ঘেন্না ধরে গিয়েছে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের তৃতীয় পদে তার বদলে বদরীর সরবৎ পরিবেশন করা হল, আলাপ আলোচনার বিষয় সেটা।

কিন্তু ভীষণ আহত লোকের উৎকণ্ঠ দীর্ঘ, হাসপাতাল দিনগুলি যেটা

ভরিয়ে রাখে, তার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্র যেটা সেটা হল তার নিজের ক্ষতস্থান, এই ক্ষতই ত সৈন্যদের সারি থেকে, যুদ্ধের কঠোর জীবন থেকে তাকে ছিটকে বের করে মোলায়েম আর আয়েসী বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, শোওয়াবার মুহূর্ত থেকে বিছানাটার প্রতি তার বিদ্বেষ। ক্ষতস্থানের কথা, স্ফীতি কিম্বা হাড় ভাঙার কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমোয়, স্বপ্ন দেখে সে বিষয়ে, ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায় স্ফীতিটা কম কিনা, আঙ্গিক প্রদাহ মিলিয়ে গিয়েছে কিনা, জ্বর বেড়েছে কি কমেছে। রাত্রে জাগ্রত কানে সামান্য খসখস শব্দটুকু যেমন মাত্রাতিরক্তভাবে বেশী শোনায়, তেমন এখানেও নিজের ব্যাধির বিষয়ে অবিরত একাগ্র চিন্তা ক্ষতের যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তোলে, অধ্যাপকের গলায় সামান্য স্বরবিভেদটুকু ধরার আর তাঁর মুখের ভাব থেকে ব্যাধির গতি আঁচ করার জন্য সভয়ে, কম্পিত হৃদয়ে ব্যগ্র হয়ে থাকে এমন কি তারাও যাদের চারিত্র্যবল আর সহিষ্ণুতা অসামান্য, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা মৃত্যুর পরোয়া করেনি।

হামেশাই অভিযোগ করে কুকুশকিন, গজগজ করে! ওর মনে হয় যেখানে চোট লেগেছে সেখানটা ভালো করে বাঁধা হয়নি, বন্ধফলক খুব কষে বাঁধা হয়েছে, ফলে হাড়গুলো ঠিকমত জোড়া লাগবে না, আবার তাদের নতুন করে বসাতে হবে। গ্রিশা গভজ্‌দেভ বিষণ্ণ আধো-ঘোরে আচ্ছন্ন, কোন কথা বলে না সে। কিন্তু ব্যাণ্ডেজ বদলাবার সময়ে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা যখন ওর ক্ষতস্থানে প্রচুর পরিমাণে ভ্যাসেলিন ছড়াত তখন কী ব্যগ্র অসহিষ্ণুভাবে ও নিজের স্ফীত শরীর আর ছিন্নভিন্ন চামড়ার দিকে তাকিয়ে দেখত, ডাক্তারদের সলাপরামর্শ কী আগ্রহে শুনত, সেটা কারো নজর এড়াত না। ওয়ার্ডে একমাত্র স্তেপান ইভানভিচই চলাফেরা করতে পারে, অবশ্য প্রায় একেবারে কুঁজো হয়ে; খাটের শিক আঁকড়ে যেতে যেতে শাপান্ত করত তার সর্বনাশের কারণ সেই "নচ্ছার বোমাটাকে" আর চোট লাগার ফলে আসা "ঘৃণ্য সায়েটিকাকে"।

নিজের ভাব গোপন করার চেষ্টা করত মেরেসিয়েভ, এমন ভাব দেখাত যে ডাক্তাররা পরস্পরকে কী বলছে তা শোনার কোন আগ্রহ তার নেই। কিন্তু যতবার তড়িৎ চিকিৎসার জন্য পায়ের ব্যাণ্ডেজ খোলা হত আর ওর নজরে আসত যে ভয়াবহ স্ফীতিটা আস্তে আস্তে, কিন্তু সমানে, পায়ের পাতার উপর হয়ে আসছে ততবার আতঙ্কে বিস্ফারিত হত ওর চোখ।

অস্থির বিষণ্ণ হয়ে পড়ল মেরেসিয়েভ। ঘরে কোন রোগী বেফাঁস ঠাট্টা

করল হয়ত, বিছানার চাদরে একটা ভাঁজ পড়েছে, ওয়ার্ডের বৃদ্ধা পরিচারিকার হাত থেকে ঝাঁটা খসে পড়েছে, রাগে অধীর হয়ে পড়ত সে, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করত। এটা সত্যি অবশ্য যে হাসপাতালের বাঁধাধরা আর ক্রমশ বাড়ানো খাবারে ওর শক্তি ফিরে এল, ব্যাণ্ডেজ বদলাবার কিম্বা তড়িৎ চিকিৎসার সময়ে ওর উৎকট দেহ দেখে ডাক্তারী ছাত্রীরা আর ভয়ে চমকে উঠত না। কিন্তু শরীরে শক্তি যত বাড়ছে তত খারাপ হচ্ছে পাদুটো। পায়ের পাতার উপর দিকটা ফুলে আর দেখা যায় না, পায়ের গাঁট বেয়ে প্রদাহটা ছড়াচ্ছে। পায়ের আঙুলগুলো একেবারে অসাড়, ডাক্তার ছুঁচ দিয়ে খোঁচা দিতেন, অনেকখানি ফুঁড়তেন, কিন্তু আলেক্সেই'র একেবারে লাগত না। নতুন একটা পদ্ধতিতে — বিচিত্র তার নাম "অবরোধ" — স্ফীতিটা আটকাতে ডাক্তারেরা সমর্থ হল, কিন্তু পায়ের যন্ত্রণা বেড়েই গেল। প্রায় অসহ্য সে যন্ত্রণা। দিনের বেলায় বালিশে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকত আলেক্সেই। রাত্রে ওকে মরফিয়া দিত ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা।

ডাক্তারদের সলাপরামর্শের সময় "অঙ্গচ্ছেদ" — এই ভয়াবহ শব্দটি ক্রমশ বেশী শোনা যেতে লাগল। মাঝেমাঝে আলেক্সেই'র বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ জিজ্ঞেস করতেন:

'হামাগুড়িতে ওস্তাদ লোকটি আজ কেমন আছে? পাদুটো হয়ত কেটে ফেলব, কী বলো? কচাৎ করে একটা টান, ব্যস, ওদুটো আর থাকবে না!'

আলেক্সেই শিরশির করে উঠত। দাঁতে দাঁত চেপে ধরত যাতে চেঁচিয়ে না ওঠে, মাথা নাড়াত শুধু, আর অধ্যাপক গরগর করে বলতেন:

'তাহলে সয়ে যাও, সয়ে যাও, তোমার ব্যাপার এটা। দেখা যাক এতে কী হয়।' চিকিৎসার নতুন একটা নির্দেশ দিতেন তিনি।

অধ্যাপক চলে যেতেন, দরজা বন্ধ হয়ে গেল, করিডরে ওঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। তখনো চোখ বুজে শুয়ে থাকত মেরেসিয়েভ। "পাদুটো, আমার পাদুটো!" ওদুটো কি বাদ দিতে হবে, নিজের কামিশিনের খেয়াঘাটের পঙ্গু মাঝি বুড়ো আর্কাশার মত কাঠের পা লাগিয়ে চলতে হবে? ওই বুড়োটার মত স্নান করার সময় পাদুটো খুলে ঘাটে রেখে, হামাগুড়ি দিয়ে বাঁদরের মত জলে নামতে হবে?

আরো একটি ঘটনায় ওর তিক্ত দুর্ভাবনা সব বেড়ে গেল। হাসপাতালে পেঁছিয়ে প্রথম দিনেই কামিশিন থেকে আসা চিঠিগুলো ও পড়েছিল। তিনকোণায় ভাঁজ-করা মায়ের ছোট চিঠিগুলো যথারীতি সংক্ষিপ্ত, তাদের

অর্ধেকটা আত্মীয়দের সাদর সম্ভাষণে ভরা, ঈশ্বরের কৃপায় সবাই ভালো আছে জানানো হয়েছে, মা'র বিষয়ে ওর ভাবার কোন কারণ নেই, আর অর্ধেকটায় অনুনয় করা হয়েছে যেন নিজের যত্ন ও নেয়, ঠাণ্ডা না লাগায়, পা না ভেজায়, ঝট করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে যেন না পড়ে, ধূর্ত জার্মানদের বিষয়ে যেন সাবধান থাকে, ওদের ধূর্ততার কথা প্রতিবেশীদের কাছে অনেক শুনেছেন তিনি। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু সব সমান, তফাৎটা শুধু এই একটাতে তিনি জানিয়েছেন যে একজন প্রতিবেশিনীকে তিনি আলেক্সেই'র জন্য গির্জায় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তিনি নিজে ধর্মবিশ্বাসী নন বটে, কিন্তু যদি আমাদের মাথার উপরে সত্যি সত্যি কেউ থেকে থাকেন? আর একটি চিঠিতে বলেছেন যে তাঁর বড়ো ছেলেদের জন্য তিনি দুশ্চিন্তায় আছেন, ওরা দক্ষিণে কোথাও যুদ্ধ করছে, অনেক দিন ওদের চিঠি আসেনি; আর শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছেন একটি স্বপ্নের কথা—ভলগায় বসন্ত প্লাবনের সময় তাঁর সব ছেলে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে; মাছ ধরার সফল অভিযান থেকে তারা ফিরে এসেছে, সঙ্গে ওদের বিগত বাবাও ফিরেছেন। আর ওদের জন্য ওদের প্রিয় পিঠে — ভিয়াজিগা পিঠে* — বানিয়েছেন তিনি। প্রতিবেশীরা ব্যাখ্যা করে বলেছে স্বপ্নটির মানে হল এই যে ওঁর একটি ছেলে রণাঙ্গন থেকে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। সেজন্য তিনি আলেক্সেইকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন যেন উপরওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে যে অন্তত একদিনের জন্য বাড়ি ফিরতে পারে কিনা।

নীল খামগুলো, স্কুলের মেয়ের বড়ো বড়ো স্পষ্ট হাতে ঠিকানা লেখা, চিঠিগুলো লিখেছে কারখানার শিক্ষানবিশি স্কুলে ওর সহপাঠী একটি মেয়ে। নাম তার ওলগা। কামিশিন করাত-কারখানায় সে এখন টেকনিশিয়ান, একই কারখানায় আলেক্সেই টার্নারের কাজ আগে করত। বাল্যবন্ধু ছাড়াও মেয়েটি আরো কিছু, ওর চিঠিগুলো গতানুগতিক নয়। অবাক হবার কিছু নেই যে এক একটা চিঠি আলেক্সেই কয়েক বার পড়েছে, বারবার তুলে নিয়ে সামান্য কথাগুলো মন দিয়ে দেখেছে, যাতে তাদের মধ্যে অন্য কোন আনন্দমুখর, গোপন অর্থ উদ্ধার করতে পারে, যদিও চিঠিগুলোতে ঠিক কী যে চায় ও সেটা ওর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

মেয়েটি লিখেছে যে কাজে ডুবে আছে, এমন কি রাত্রেও বাড়ি ফেরে

* স্টার্জন মাছের শিরদাঁড়ার পুর দিয়ে তৈরী পিঠে।

না, অফিসেই ঘুমোয়, যাতে যাতায়াতে সময় নষ্ট না হয়; করাত-কারখানাটা এখন দেখলে হয়ত আলেক্সেই চিনতেই পারবে না, অবাক হয়ে যাবে, আনন্দে অধীর হয়ে যাবে যদি কারখানায় এখন কী তৈরী হচ্ছে সেটা জানতে পারে। প্রসঙ্গত লিখেছে, ছুটির বিরল দিনে, মাসে একদিনের বেশী ছুটি নেই, ও আলেক্সেই'র মা'কে দেখতে যায়, বৃদ্ধা ছেলেদের কোন খবর না পাওয়াতে দুশ্চিন্তায় আছেন, ওঁর সময় খারাপ যাচ্ছে, হালে শরীর খারাপ হয়েছে। মেয়েটি বিশেষ অনুরোধ করেছে যেন আলেক্সেই আরো বেশী, আর আরো বড়ো করে চিঠি দেয় ওঁকে, নিজের বিষয়ে কোন দুঃসংবাদ দিয়ে ওঁকে যেন বিচলিত না করে, কারণ, খুব সম্ভব, আলেক্সেই'ই ওঁর একমাত্র ভরসা এখন।

ওলগার চিঠি বারবার পড়ে আলেক্সেই ধরতে পারল ওকে স্বপ্নের কথাটি বলার পিছনে মায়ের সরল ফন্দিটি কী। বুঝতে পারল ওকে দেখার জন্য মা ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, ওঁর ভরসা এখন সে; এটাও বুঝতে পারল যে ওঁকে আর ওলগাকে নিজের পায়ের কথা লিখলে কী ভীষণ আঘাত পাবে তারা। কী করা উচিত অনেকক্ষণ ভাবল আলেক্সেই, কিন্তু সত্যি কথা লেখার সাহস হল না। ঠিক করল কথাটা কিছু দিন চেপে যাবে, ওদের দুজনকেই লিখবে ও ভালো আছে, যুদ্ধ চলছে না এমন একটা জায়গায় ওকে বদলি করা হয়েছে; ঠিকানা বদল হয়েছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য লিখল যে পিছনের একটি দলের সঙ্গে বিশেষ কাজ করতে দেওয়া হয়েছে ওকে, সেখানে অনেক দিন থাকতে হবে।

আর এখন বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে পরামর্শের সময়ে ডাক্তাররা যখন "অঙ্গচ্ছেদের" কথা প্রায়ই বলতে আরম্ভ করল তখন বিভীষিকায় অভিভূত হয়ে যেত আলেক্সেই। পঙ্গু হয়ে কী করে বাড়ি ফিরবে কামিশিনে? কাঠের পাদুটো কী করে দেখাবে ওলগাকে? কী সাঙ্ঘাতিক আঘাতই না মা পাবেন, অন্য ছেলেদের কোনও খবর নেই, তার জন্য, একমাত্র ছেলের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তিনি। ওয়ার্ডের গুমোট বিষণ্ণ স্তব্ধতায় শুয়ে শুয়ে এই সব কথা ভাবত আলেক্সেই. কানে আসত কুকুশকিনের ছটফটে শরীরের চাপে ওর গদির স্প্রিংগুলোর ক্রুদ্ধ কি'চ কি'চ আওয়াজ, নির্বাক ট্যাঙ্ক-অফিসারের দীর্ঘশ্বাস; আর জানলায় দাঁড়িয়ে শার্সিতে আঙুল দিয়ে শব্দ করছে প্রায় নুয়ে-পড়া স্তেপান ইভানভিচ, দিনের বেশীর ভাগ জানলার কাছে কাটায় সে।

"পাদুটো কাটা হবে? না, সেটা ছাড়া আর যাকিছু হোক! তার চেয়ে মরা অনেক ভালো... "অঙ্গচ্ছেদ" — কী ভয়াবহ, অমানুষিক শব্দটা। যেন

কেউ ছোরা মারছে, তার মত। অঙ্গচ্ছেদ? কখনোই নয়, কখনোই হতে দেব না সেটা!" আলেক্সেই ভাবত। স্বপ্নে এই ভয়াবহ কথাটি এল প্রকাণ্ড একটা ধাতব মাকড়সার আকারে, ধারালো বাঁকা নখরে তার মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে সেটা।

৩

৪২ নং ঘরে মাত্র চারজন রোগী, একসপ্তাহ কাটল। কিন্তু তারপরে একদিন ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা এল, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে, সঙ্গে দুজন আর্দালী, রোগীদের বলল একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে জায়গা করে দিতে হবে। স্তেপান ইভানভিচের খাটটা একেবারে জানলার কাছে নিয়ে যাওয়া হল, বেজায় খুসি তাতে সে। তার খাটের পাশে একটা কোণে রাখা হল কুকুশকিনের খাট, খালি জায়গাটায় বসানো হল একটি সুন্দর, নিচু, স্প্রিং-দেওয়া নরম গদির খাট।

ভয়ানক চটে উঠল কুকুশকিন। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, বিছানার পাশের তাকে ঘুঁষি মেরে, তীক্ষ্ম কর্কশ কণ্ঠে নার্সকে, হাসপাতালকে, এমন কি ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে গালিগালাজ করল, ভয় দেখাল যে কাউকে না কাউকে নালিশ করবে, আর রাগে এমন দিশে হারাল যে আলেক্সেই বেদে চোখে অগ্নিবান হেনে এক ঝটকায় ওকে বাধা না দিলে আর একটু হলে বেচারী ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে বাটি ছুঁড়ে মেরে বসত।

ঠিক সেই মুহূর্তে পঞ্চম রোগীটিকে ঘরে আনা হল।

খুব ভারী লোক নিশ্চয়ই, কেননা স্ট্রেচার-বাহকদের পা ফেলার তালে তালে স্ট্রেচারটা নুয়ে পড়ে কিঁচ কিঁচ করছে। বালিশে অসহায়ভাবে এদিকে ওদিকে হেলে পড়ছে একটা গোল, কামানো মাথা। চওড়া, হলদে, মোমের মত মুখটা প্রাণহীন মনে হচ্ছে। ভরাট, বিবর্ণ ঠোঁটে যন্ত্রণার অনড় ছাপ আঁকা।

মনে হল নতুন রোগীটির জ্ঞান নেই। কিন্তু স্ট্রেচারটা মেঝেতে রাখার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলল সে, কনুই'এ ভর দিয়ে উঠে সকৌতূহলে ওয়ার্ডের চারিদিকে তাকিয়ে কেন জানি না স্তেপান ইভানভিচকে চোখ ঠারল, যেন বলতে চায়: "কেমন সময় কাটছে, খুব খারাপ নয় মনে হচ্ছে?" তারপর জোরে কেশে উঠল সে। বোঝা গেল ওর ভারী শরীরটা ভয়ানক বিপর্যস্ত হয়েছে, দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছে সে। প্রথম দৃষ্টিতে ওর বিরাট স্ফীত দেহটার চেহারা ভালো লাগল না আলেক্সেই'র কী কারণে যেন, বেজারভাবে দেখল

দুজন আর্দালী, দুজন ওয়ার্ডের পরিচারিকা আর নার্সটি, সবাই মিলে স্ট্রেচার থেকে তাকে তুলে বিছানায় শোয়াল। দেখল ওর শক্ত, কাঠের কুঁদোর মত একটা পা'কে বেকায়দায় ওরা ঝটকা দেওয়াতে ও হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে ঘেমে উঠল, ঠোঁটদুটো যে যন্ত্রণায় থর থর করে কেঁপে উঠল সেটাও চোখে পড়ল। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না রোগীটির, শুধু দাঁতে দাঁত চেপে রইল।

বিছানায় শুয়েই কম্বলের চাদরটার পাড় ঠিক করে নিল সে, সঙ্গে-আনা বই আর খাতাপত্র বিছানার পাশের তাকটাতে ঠিক করে গুছিয়ে রাখল, টুথ-পেস্ট আর বুরুশ, ও-ডি-কলোন, দাড়ি কামাবার জিনিস আর সাবানের বাক্স নিচের তাকটাতে সাজিয়ে রেখে বিচক্ষণ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে হাতের কাজ সব দেখল একবার, তারপর, চটপট যেন ঘরোয়া লাগছে এমন ভাবে, গভীর গমগমে গলায় বলল:

'বেশ, এবার আমাদের আলাপ পরিচয় হোক। রেজিমেণ্টাল কমিসার সেমিওন ভরোবিওভ। চুপচাপ লোক। ধূমপান করি না। অনুগ্রহ করে আপনাদের দলে আমাকে যোগ দিতে দিন।'

ওয়ার্ডের অন্যান্যদের দিকে ধীরে আগ্রহে তাকাল সে, তার তীক্ষ্ন সংকীর্ণ সোনালী চোখের ধারালো বিচক্ষণ দৃষ্টি মেরেসিয়েভের নজরে পড়ল।

'বেশী দিন আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আপনারা কী করবেন জানি না, কিন্তু এখানে বেশী দিন শুয়ে থাকার সময় আমার নেই। ঘোড়সওয়াররা আমার অপেক্ষায় আছে। বরফ চলে গেলে, রাস্তাঘাট শুকিয়ে গেলেই কেটে পড়ব। "আমরা হচ্ছি লাল ফৌজের অশ্বারোহী দল, আর আমাদের কথা নিয়ে..."' বকবক করে চলল ও, ওর প্রফুল্ল, গভীর খাদের কণ্ঠস্বরে ওয়ার্ড গেল ভরে।

'আমাদের কেউই বেশী দিন এখানে নেই। বরফ গলতে শুরু করলেই সবাই আমরা কেটে পড়ব, পা বাড়িয়ে একেবারে ৫০ নং ওয়ার্ডে চলে যাব, খিটখিটিয়ে বলে উঠে কুকুশকিন, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল।

হাসপাতালে ৫০ নং ওয়ার্ড ছিল না। লাশঘরের নাম ওটা, রোগীদের দেওয়া। এর মধ্যে কমিসার সেটা জেনেছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু ইয়ার্কিটার অশুভ অর্থ তৎক্ষণাৎ তার কাছে ধরা পড়ল। যাই হোক, কিছু মনে সে করল না, শুধু বিস্ময়ে কুকুশকিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আর আপনার বয়স কত, বন্ধু? ওহে দাড়িওয়ালা! অকালে বুড়িয়ে গেছেন মনে হচ্ছে!'

৪

৪২ নং'এ নতুন রোগীটির আবির্ভাবে — ওকে ওরা নিজেদের মধ্যে কমিসার বলে ডাকত — ওয়ার্ডের জীবনযাত্রা আমূল বদলে গেল। আসবার দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই এই বিশেষ আহত, ভারী লোকটি সবায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিল, স্তেপান ইভানভিচের ভাষায়, প্রত্যেকেরই মনে নাড়া দেবার মত কলকাঠি ও জোগাড় করে ফেলেছে।

স্তেপান ইভানভিচের সঙ্গে ও প্রাণ খুলে ঘোড়া আর শিকারের গল্প করত, বিষয়দুটি দুজনেরই প্রিয়, দুজনেই ওয়াকিবহাল। মেরেসিয়েভ যুদ্ধের বিষয়ে তত্ত্বমূলক আলোচনা চালাতে ভালোবাসে, তার সঙ্গে বিমান, ট্যাঙ্ক আর অশ্বারোহী বাহিনী প্রয়োগের হালের সমস্ত পদ্ধতি নিয়ে তুমুল তর্ক চলত। কমিসার একটু উত্তেজিতভাবেই প্রমাণ করার চেষ্টা করত যে বিমান আর ট্যাঙ্ক অত্যন্ত কাজের জিনিস হলেও ঘোড়া একেবারে সেকেলে হয়ে যায়নি, ওর মূল্য সবাই আবার টের পাবে। অশ্বারোহী বাহিনীকে যদি ভালো ঘোড়া আবার জোগানো হয়, যদি ট্যাঙ্ক আর কামানের সাহায্য পায়, আর যদি বহুসংখ্যক সাহসী আর বুদ্ধিমান যুবক অফিসারকে ঘোড়েল সেনানায়কদের সাহায্য করতে শেখানো হয়, তাহলে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী আবার সারা দুনিয়াকে চমক লাগিয়ে দেবে। এমন কি নির্বাক ট্যাঙ্ক-অফিসারের সঙ্গেও কথাবার্তা চালাবার বিষয় কমিসার বের করল। জানা গেল যে বাহিনীতে সে কমিসার হিসেবে ছিল সেটা ইয়ার্ৎসেভোতে লড়াই করে, পরে দুখোভশ্চিনায় জেনারেল কনেভের প্রতি-আক্রমণেও যোগ দেয়, দুখোভশ্চিনাতেই ট্যাঙ্ক-অফিসার ও তার দল জার্মান লাইন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। অসীম আগ্রহে কমিসার দুজনের চেনা গ্রামগুলির নাম করে, কী করে এবং কোথায় জার্মানদের অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছিল তার গল্প করে। ট্যাঙ্ক-অফিসার যথারীতি চুপ করে থাকত বটে, কিন্তু কেউ কথা বললে আগেকার মত আর মুখ ঘুরিয়ে নিত না। ব্যান্ডেজে-ঢাকা মুখ দেখা যেত না, কিন্তু মাথা নেড়ে কথায় সায় দিত। কমিসার দাবা খেলার আমন্ত্রণ করাতেই কুকুশকিনের রাগ পড়ে গিয়ে মেজাজ খোশ হয়ে উঠল। দাবার ছক কুকুশকিনের বিছানায় রাখা হল আর নিজের বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে কমিসার "চোখ বেঁধে" খেলল। গজগজে লেফ্টেনান্ট খেলায় বেকসুর হেরে গেল, তাতে কমিসারের মূল্য ওর কাছে গেল অনেক বেড়ে।

ওয়ার্ডে কমিসারের আবির্ভাবটা মস্কোর প্রথম বসন্তের তাজা জোলো হাওয়ার মত কাজ করল, সকালে পরিচারিকারা জানলাগুলো খুললে যে হাওয়া ঝটকায় ঘরে আসে, রাস্তার উচ্ছল কোলাহলে রোগীর ঘরের গুমোট স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। সজীবতা আনতে কমিসারকে মোটেই বেগ পেতে হত না। সে শুধু বাঁচত, টগবগে জীবনের স্বাদ সতৃষ্ণভাবে গ্রহণ করে যন্ত্রণার জ্বালা ভুলে যেত, কিম্বা ভুলে যেতে বাধ্য করত নিজেকে।

সকালে জেগে উঠে বিছানায় বসে "ব্যায়াম" চলত — হাতদুটো মাথার উপরে তুলে, আর পাশে নামিয়ে শরীরটা একবার এদিকে, একবার অন্যদিকে ঝুঁকিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামাত আর ঘোরাত সমান তালে। মুখ ধোবার জল আনলে বলত যতটা সম্ভব ততটা ঠাণ্ডা জল ওকে দেওয়া হোক; অনেকক্ষণ ধরে চলত হাতমুখ ধোওয়া আর নানারকম আওয়াজ বের করা, তারপর তোয়ালে দিয়ে এত জোর রগড়ানো যে ফুলে-ওঠা শরীরটা লাল হয়ে উঠত; আর ওকে দেখে সেরকম করার দারুণ ইচ্ছে হত অন্যান্য রোগীদের। খবরের কাগজ এলেই নার্সের হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিত কমিসার, সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহার তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলে ধীরেসুস্থে পড়ত যুদ্ধক্ষেত্রের নানা ফ্রণ্ট থেকে পাঠানো যুদ্ধ সংবাদদাতাদের বিবরণ। পড়বার একটা নিজস্ব ভঙ্গী ছিল ওর, সেটাকে "সক্রিয় পঠন" বলা যায়। কোন বিবরণের একটা অংশ মনের মত হয়েছে, কখনো সেটা ফিসফিস করে আবার পড়ে বিড়বিড় করে উঠত, "ঠিক কথা," আর সে-অংশটায় দাগ দিয়ে রাখত; কিম্বা হঠাৎ বলে উঠত, "মিথ্যে কথা বলছে বেটা, জায়গাটার কাছে কক্ষণো ও ছিল না, বিয়ারের বোতলের বদলে জান কবুল করে বলতে পারি! বেটা বদমায়েস! তবুও লেখা চাই!" অতিশয় কল্পনাপ্রবণ একটি যুদ্ধ সংবাদদাতার কী একটা বিবরণীতে একদিন ও এতো চটে গেল যে তৎক্ষণাৎ খবরের কাগজটিতে পোস্ট-কার্ড লেখা হয়ে গেল, বেশ রুষ্টভাবে তাতে জানাল যে এ ধরনের ব্যাপার যুদ্ধে ঘটে না, ঘটতে পারে না, এই "নির্লজ্জ মিথ্যাবাদীর" কলমে রাশ দেওয়া উচিত। অন্য সময়ে কোন বিবরণী পড়ে ভাবতে শুরু করত, বালিশে হেলান দিয়ে খোলা চোখে চিন্তায় ডুবে যেত, কিম্বা অশ্বারোহী বাহিনীর নিজের দলটার কোন গল্প করত, ওর কথা মত দলটার প্রত্যেকেই বীরপুরুষ, প্রত্যেকেই "অসমসাহসী ছোকরা"। তারপর আবার খবরের কাগজ পড়া চলত। আর, বিচিত্র সেটা, ওর এইসব মন্তব্যে, ভাবমুখর নানা অপ্রাসঙ্গিক কথায় শ্রোতাদের মনোযোগে

কোন ছেদ পড়ত না, বরঞ্চ যা ও পড়ছে সেটা আরো ভালো করে বুঝতে তাদের সাহায্য হত।

মধ্যাহ্ন-ভোজন আর চিকিৎসাপর্বের মধ্যে প্রতিদিন দু'ঘণ্টা জার্মান পড়ত ও, কথাগুলো মুখস্থ করত, রচনা করত পূর্ণ বাক্য, আর কখনো কখনো বিজাতীয় কথাগুলোর শব্দে হঠাৎ বিস্মিত হয়ে বলে উঠত:

'ওহে ছোকরারা "মুরগীছানার" জার্মান কী জানেন? "কুহেলহেন"। শুনতে খাসা কথাটা! শুনলেই পালক-ভরা নরম ক্ষুদে কিছু একটা জিনিসের কথা মনে হয়। "ছোট ঘণ্টার" জার্মান কী জানেন? "গ্লকলিং"। ঠুনঠুন একটা ভাব আছে কথাটাতে, তাই না?'

একদিন আর চুপ করে থাকতে না পেরে স্তেপান ইভানভিচ জিজ্ঞেস করল:

'কমরেড কমিসার, কেন আপনি জার্মান শিখতে চান? মিছিমিছি ধকল সহ্য করছেন, তার চেয়ে শরীরের শক্তি বাঁচিয়ে রাখলে কাজ দেবে ...'

বৃদ্ধ সৈনিকের দিকে সেয়ানাভাবে তাকিয়ে কমিসার বলল:

'তাই নাকি? ওহে দাড়িওয়ালা! রুশদের জন্যে এটা কী জীবনের মত জীবন? বার্লিনে যখন হাজির হব তখন কী ভাষায় জার্মান ছুঁড়িদের সঙ্গে কথা বলব, ভাঙ্গা রুশে?'

কমিসারের বিছানার ধারে বসে যেটা স্তেপান ইভানভিচ বলতে চাইল সেটা যুক্তিসঙ্গত; মনে মনে ভাবল এখন অবধি ত যুদ্ধের সীমান্ত মস্কো থেকে খুব বেশী দূরে নয়, জার্মান ছুঁড়িদের কাছে পেঁছতে এখনো অনেক দিন, কিন্তু কমিসারের গলায় দৃঢ় বিশ্বাসের এমন স্বচ্ছন্দ ছাপ যে স্তেপান ইভানভিচ গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল:

'না, ভাঙ্গা রুশে নয় অবশ্য। কিন্তু তবু, কমরেড কমিসার, নিজের যত্ন নেওয়া আপনার উচিত, যা ভোগান্তি গিয়েছে আপনার!'

'যে ঘোড়াকে তোয়াজে রাখা হয় সেই আগেভাগে ধপাস করে পড়ে। এ কথাটা আগে শোনেননি? আপনার উপদেশ মোটেই সুবিধের নয়, দাড়িওয়ালা!'

ওয়ার্ডে কারো দাড়ি ছিল না, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, কমিসার সবাইকে "দাড়িওয়ালা" বলে ডাকত, আর তার বলার ভঙ্গীতে অসন্তোষজনক কিছু ছিল না, বরঞ্চ ছিল সহৃদয় ঠাট্টার একটা ছাপ, রোগীদের মন তাতে জুড়িয়ে যেত।

দিনের পর দিন কমিসারকে দেখল আলেক্সেই, ওর অফুরন্ত ফুর্তির উৎসটা কী তা বের করার চেষ্টা করত। ও যে ভয়াবহ যন্ত্রণায় ভুগছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘুমিয়ে পড়লে নিজের উপরে আর দখল থাকত না, তখন শুরু হত গোঙানি আর ছটফটানি, দাঁতে দাঁত চেপে ধরা, মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যেত। অবস্থাটার কথা নিজেও জানত সে, তাই দিনের বেলায় জেগে থাকার চেষ্টা করত, কিছু না কিছু একটা করার অভাব হত না। জাগ্রত অবস্থায় সে শান্ত, ভাববিকার হয় না, যেন কোন যন্ত্রণা নেই। ডাক্তারদের সঙ্গে ধীরেসুস্থে আলাপ চালাত, শরীরের আহত স্থানগুলো ওরা ঠুকে ঠুকে দেখার সময়ে ইয়ার্কি করতে ছাড়ত না, শুধু বিছানার চাদর যেভাবে মুচড়ে ধরত আর নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম থেকে আঁচ করা যেত নিজেকে সামলে রাখা ওর পক্ষে কী কঠিন ব্যাপার। অসম্ভব যন্ত্রণা চেপে লোকটা কী করে এরকম উদ্যম, প্রফুল্লতা আর সজীবতা দখলে আনতে পারে বৈমানিক বুঝতে পারত না। হেঁয়ালিটার সমাধানের জন্য আলেক্সেই খুব উদগ্রীব, কারণ ঘুমের ওষুধের মাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও রাত্রে তার ঘুম আসত না, কখনো কখনো সারা রাত চোখ না বুজে শুয়ে থাকে, কম্বল কামড়ে চেষ্টা করত যাতে গোঙানির আওয়াজ কেউ না শোনে।

শরীর পরীক্ষার সময় ডাক্তারদের মুখে ক্রমশ বেশী করে সেই ভয়াবহ কথাটা — "অঙ্গচ্ছেদ" — আসতে লাগল। ভয়াবহ দিনটা এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে আলেক্সেই ঠিক করল পা বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই।

৫

আর সেই দিনটা এসে পড়ল। রোঁদে এসে একদিন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ অনেকক্ষণ ধরে আলেক্সেই'র কালশিটে-নীল আর সম্পূর্ণ অসাড় পায়ে টোকা দিলেন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'দুটোকে কাটতেই হবে!' মড়ার মত শাদা হয়ে গেল বৈমানিকের মুখ, কিন্তু ও একটি কথা বলার আগেই অধ্যাপক কঠোরভাবে আবার বললেন, 'কাটতেই হবে। আর কোন কথা শুনব না, বুঝলে? না কাটলে জাহান্নমে যাবে! বুঝতে পারছ?'

নিজের অনুচরবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ওয়ার্ডে গুমোট স্তব্ধতা। পাথরের মত মুখে

মেরেসিয়েভ খোলা চোখে শুয়ে আছে। যেন কুয়াশায় ওর চোখের সামনে ভাসছে বুড়ো মাঝির কালো কদাকার কাঠের পাদুটো, আবার ও দেখল বুড়োটা ভেজা বালুর উপরে হামাগুড়ি দিয়ে বাঁদরের মত জলে নামছে।

'আলিওশা,' কমিসার আস্তে আস্তে ডাকল।

'কী?' সুদূর, অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দিল আলেক্সেই।

'এটা দরকার, ভায়া!'

ঠিক সেই মুহূর্তে আলেক্সেই'র মনে হল মাঝিটা নয়, ও নিজেই কাঠের পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে, আর ওর বান্ধবী, ওর ওলিয়া, বালুময় নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছে, পরনের উজ্জ্বল রঙীন ফ্রক হাওয়ায় উড়ছে, পাতলা দীপ্ত সুন্দর মেয়েটি একাগ্রভাবে ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াবে এরকম! নিঃশব্দ কান্নার দমকে ভেঙ্গে পড়ে সে মুখ গুঁজল বালিশে। ওয়ার্ডের সবাই অত্যন্ত বিচলিত। স্তেপান ইভানভিচ বিছানা ছেড়ে উঠে গোঙাতে গোঙাতে পোষাক চড়িয়ে, চটি-পরা পা টেনে টেনে, খাটের শিক ধরে খুঁড়িয়ে চলল আলেক্সেই'র খাটের দিকে, কিন্তু কমিসার ওকে অঙ্গুলি নির্দেশে বারণ করল, যেন বলতে চায়: "বাধা দিও না, প্রাণভরে কাঁদতে দাও ওকে।"

আর সত্যিই, কেঁদে হালকা লাগল আলেক্সেই'র। অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে এল, এমন কি মনে সেই স্বস্তির ভাব এল, বহুদিন বিড়ম্বনা-দেওয়া কোন সমস্যার হেস্তনেস্ত অবশেষে হয়ে গেলে যে স্বস্তি মানুষের মনে আসে। অস্ত্রোপচারাগারে নিয়ে যাবার জন্য সন্ধ্যেবেলায় আর্দালিরা এল, ততক্ষণ একটিও কথা বলল না সে। ঝকঝকে শাদা ঘরটায় গিয়েও একটিও কথা বেরোল না ওর মুখ থেকে। এমন কি যখন বলা হল যে ওর হৃৎপিণ্ডের যা অবস্থা তাতে ওকে অজ্ঞান করা চলবে না, স্থানীয় এ্যানেস্থেটিক দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হবে, তখনো শুধু মাথা নাড়ল আলেক্সেই। অস্ত্রোপচারের সময়ে গোঙাল না, কাতরোক্তি পর্যন্ত করল না। সহজ অস্ত্রোপচারটি করলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ স্বয়ং; যথারীতি নার্স আর সহকারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্রুদ্ধ গরগরানি চলছে, যে সহকারীটি আলেক্সেই'র নাড়ী দেখছে তার দিকে কয়েকবার উৎকণ্ঠিতভাবে তাকালেন তিনি।

হাড়গুলো কাটা হল, তখনকার যন্ত্রণা ভয়াবহ; কিন্তু যন্ত্রণায় আলেক্সেই এখন অভ্যস্ত, শাদা পোষাক, গজের মুখোস-পরা লোকগুলো ওর পায়ের কাছে কী করছে বুঝতেও পারল না সেটা।

ওয়ার্ডে পৌঁছিয়ে জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমেই দেখল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার দরদে-ভরা মুখ। আশ্চর্যের বিষয়, কিছু মনে ছিল না ওর, এমন কি অবাক হয়ে ভাবল কেন এই সোনালী-চুল, সহৃদয় সুশ্রী মেয়েটি উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ খুলেছে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ, কম্বলের নিচে ওর হাতে আস্তে চাপ দিল।

'অবাক করে দিয়েছেন আপনি!' বলে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা তক্ষুণি ওর হাত ধরে নাড়ী দেখতে লাগল।

"কী বলছে ও?" ভাবল আলেক্সেই। আর তখনি পায়ে যন্ত্রণার বোধ ফিরে এল, আগেকার মত নিচুতে নয়, উপরে, আর যন্ত্রণাটা আগেকার মত তীক্ষ্ণ তীব্র দবদবে নয়, চাপা ব্যথা, যেন হাঁটুর নিচে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ বিছানার ভাঁজ দেখে ও উপলব্ধি করল যে আগেকার তুলনায় শরীরটা ছোট হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু মনে ফিরে এল: চোখ-ঝলসানো শাদা ঘরটা, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের ক্রুদ্ধ গরগরানি, এনামেলের বাটিতে জিনিস রাখার ভারী শব্দ। "হয়ে গিয়েছে তা হলে?" স্বল্প অস্থিরতায় ভেবে আলেক্সেই জোর করে হেসে বলল নার্সকে:

'মনে হচ্ছে ছোট হয়ে গিয়েছি।'

অশুভ হাসি সেটা, মুখবিকৃতির মত। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা বলল:

'ঠিক আছে, এবার আপনার সহজ লাগবে।'

'হ্যাঁ। দেহের বোঝাটা কমে গিয়েছে।'

'ওটা বলবেন না! কিন্তু সত্যি আপনি অবাক করে দিয়েছেন! অনেকে চেঁচায়, অনেককে এমন কি বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু আপনি টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি... ওঃ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ!'

গোধূলির আলোয় কমিসারের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'এবার প্যানপ্যানানি থামান! এই চিঠিগুলো দিন, নার্স। কয়েকজনের কপাল ভালো, হিংসে হয় আমার। ভেবে দেখো ত, এতগুলো চিঠি একসঙ্গে পাচ্ছে!'

একগোছা চিঠি কমিসার মেরেসিয়েভকে দিল। আলেক্সেই'র বিমান-রেজিমেণ্ট থেকে এসেছে, ভিন্ন ভিন্ন তারিখে, কিন্তু যেমন করেই হোক একসঙ্গে এসেছে। আর এখন, পাদুটো নেই, শুয়ে শুয়ে দোস্তির চিঠিগুলো

পড়ল আলেক্সেই, কঠিন পরিশ্রমে ভরা বিপদবাধাসঙ্কুল সুদূর জীবনের কথা সেগুলোতে, সেই জীবন ওকে টানছে চুম্বকের মত, কিন্তু সেখানে ফেরার আর কোন উপায় নেই তার। ওর দল থেকে আসা নানা বড়ো আর ছোট খবর সাগ্রহে পড়ল ও: কোর হেডকোয়ার্টার্সের রাজনৈতিক অফিসার আভাস দিয়েছে যে বিমান-রেজিমেণ্টটাকে লাল পতাকা খেতাব দেবার সুপারিশ করা হয়েছে; ইভানচুক দুটো পুরস্কার পেয়েছে একসঙ্গে; ইয়াশিন শিকারে গিয়ে একটা শেয়াল মেরেছে, যে কোন কারণেই হোক সেটা লেজবিহীন; আর স্তিওপা রস্তভের দাঁতের কড়া হয়েছে, সেজন্য লেনচ্‌কার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারটা ভেস্তে গিয়েছে — সব খবরে আলেক্সেই'র সমান আগ্রহ। মুহূর্তের জন্য তার মন চলে গেল বনে গুপ্ত সেই বিমান-ঘাঁটিটাতে, চোরা মাটির জন্য যেটিকে বৈমানিকেরা বাপান্ত করত; এখন তার মনে হল পৃথিবীতে ওরকম জায়গা আর নেই।

চিঠিগুলোতে বর্ণিত সব ঘটনা এত মনোযোগ দিয়ে পড়ছে যে বিভিন্ন তারিখগুলো ওর চোখে পড়ল না, দেখল না যে নার্সকে চোখ ঠেরে কমিসার ওর দিকে দেখিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলছে, 'আমার দাওয়াইটা তোমাদের সমস্ত ঘুমের ওষুধের চেয়ে ভালো।' এরকম অবস্থার উদ্ভব হতে পারে ভেবে কমিসার কয়েকটা চিঠি চেপে রেখেছিল, যাতে ওর প্রিয় বিমান-ঘাঁটির খবর আর সাদর সম্ভাষণে ওর সাংঘাতিক ক্লেশের কিছুটা লাঘব হয়, সে কথাটা আলেক্সেই কখনো জানতে পারেনি। ঝানু সৈনিক কমিসার। তাড়াতাড়ি, যেমন-তেমনভাবে লেখা কাগজের টুকরোগুলোর মূল্য কতটা, যুদ্ধক্ষেত্রে ওষুধ কিম্বা খাবারের চেয়ে অনেক সময় ওদের দাম যে বেশী, সেটা জানা ছিল তার।

আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কোর চিঠিটা তার মতই সহজ আর অনাড়ম্বর, সঙ্গে একটা চিরকুট, ছোট, বাঁকা হাতের লেখা, বিস্ময়ের চিহ্নে কণ্টকিত। চিঠিটা হল:

"কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট! কথা রাখেননি, এটা ভালো নয়!!! এখানের বাহিনীতে আপনার কথা প্রায়ই হয়; মিথ্যে বলছি না, ওরা হামেশাই আপনার কথা বলে। কিছুক্ষণ আগে উইং কম্যাণ্ডার খাবার ঘরে বললেন: 'আলেক্সেই মেরেসিয়েভ, মানুষের মত মানুষ ও !!!' আপনি ত জানেন যে শুধু সেরা লোকদের বিষয়েই উনি এভাবে কথা বলেন। শীগগির ফিরে আসুন, সবাই আপনার প্রতীক্ষায় আছে!!! খাবার ঘরের মোটা

লিওলিয়া লিখতে বলছে যে আপনার সঙ্গে আর তর্কাতর্কি করবে না, মধ্যাহ্ন-ভোজনের দ্বিতীয় পদ আপনাকে বারবার তিনবার দেবে, তাতে যদি চাকরীও যায় তাও সই, কিন্তু আপনি কথা রাখেন না, খুব খারাপ কিন্তু সেটা!!! অন্যদের চিঠি দিয়েছেন, আমাকে লেখেননি কিন্তু। তাতে আমার ভয়ানক খারাপ লাগছে, আর সেইজন্যই আলাদা করে চিঠি আপনাকে লিখছি না। কিন্তু দয়া করে আমাকে চিঠি দেবেন — আলাদা খামে — কেমন আছেন, কী করছেন, সবকিছু জানাবেন!..”

মজার চিরকুটটির তলায় সই করা হয়েছে: “আবহাওয়া সার্জেণ্ট”। হাসল মেরেসিয়েভ, কিন্তু ওর চোখে আবার পড়ল নিচে দাগ-দেওয়া সেই কথাগুলো “শীগগির ফিরে আসুন, সবাই আপনার প্রতীক্ষায় আছে!!!” বিছানায় উঠে বসে, পাদুটো যেখানে ছিল সেখানটায় অস্থিরভাবে হাতড়াল, পকেট খুঁজে দেখা গেল জরুরী দলিল একটা হারিয়ে গেছে এমন ভাবে। জায়গাটা ফাঁকা।

শুধু তখনি ওর লোকসানের গুরুত্বটা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করল আলেক্সেই। আর কখনো নিজের রেজিমেণ্টে, বিমান বাহিনীতে, লড়াই'এ ফিরে যেতে পারবে না ও। বিমানে উঠে আকাশ-যুদ্ধে আর কখনো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না, কখনো নয়! পঙ্গু এখন, প্রিয় কাজে আর হাত দিতে পারবে না, এক জায়গায় জড়ের মত থাকতে হবে, বাড়িতে বোঝার মত, পৃথিবী আর ওকে চায় না। আর এরকম চলবে আমরণ।

৬

অস্ত্রোপচারের পরে এ অবস্থায় সবচেয়ে খারাপ যেটা হতে পারে মেরেসিয়েভের তাই হল। ও নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল। কোন অভিযোগ নেই, কাঁদল না, কখনো খিটখিটে হল না, শুধু নির্বাক হয়ে রইল।

দিনের পর দিন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে মেরেসিয়েভ, ঘরের ছাতের টেরাবাঁকা চিড়ে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ওয়ার্ডের সাথীরা কথা বললে শুধু “হ্যাঁ” কিম্বা “না” বলে, ঠিক জবাব সেটা হত না প্রায়ই, আবার চুপ করে পলস্তারার কালো একটা চিড়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, দুর্বোধ্য সঙ্কেতচিহ্ন যেন ওটা, ওটার পাঠোদ্ধার যেন ওর মোক্ষ। ডাক্তারের সমস্ত নির্দেশ ও বিনা বাধায় মেনে

চলত, যা ওষুধ খেতে বলা হত তাই খেত, খাবারে রুচি নেই, অবসন্নভাবে ভোজন সেরে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ত।

'ওহে দাড়িওয়ালা!' কমিসার ডাকত। 'কী ভাবা হচ্ছে?'

মুখ ঘুরিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে কমিসারের দিকে তাকাত আলেক্সেই, যেন ওকে দেখতে পায়নি।

'জিজ্ঞেস করছি, কী ভাবছ?'

'কিছু না।'

একদিন ওয়ার্ডে এসে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ তাঁর স্বভাবসুলভ কর্কশ খোলাখুলিভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলেন:

'কী হে, হামাগুড়ি-ওস্তাদ, বেঁচে আছ তাহলে? কেমন সময় কাটছে? বীরপুঙ্গব তুমি, সত্যি বলছি! মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয়নি তোমার। এখন বিশ্বাস করি যে জার্মানদের ওখানে থেকে চলে আসার জন্য আঠারো দিন স্রেফ হামাগুড়ি দিয়েছিলে। তোমার বয়সে যত আলু খেয়েছ তার চেয়ে বেশী লোককে কাটাছেঁড়া আমি করেছি কিন্তু তোমার মত আদমী আজ পর্যন্ত আমার হাতে আসেনি।' হাতে হাত ঘষলেন অধ্যাপক, হাতদুটো লাল, চামড়া উঠে আসছে, নখগুলো কালচে হয়ে গিয়েছে। 'মুখ বেঁকাচ্ছ কেন? প্রশংসা করছি আর লোকটা মুখ বেঁকাচ্ছে! চিকিৎসা-বাহিনীতে লেফ্‌টেনান্ট-জেনারেল আমি, তোমাকে হাসতে হুকুম করছি!'

কষ্টে ঠোঁট ফাঁক করে ফাঁপা রবারের মত হাসি মুখে আনল আলেক্সেই, আর ভাবল, "পরিণতিটা এরকম হবে জানলে কষ্ট করে আর হামাগুড়ি দিতাম না। পিস্তলে তিনটে গুলি ত পড়ে ছিল।"

খবরের কাগজে কোন সংবাদদাতা একটি চিত্তাকর্ষক যুদ্ধের বর্ণনা করেছে, সেটা পড়ে শোনাল কমিসার। আমাদের ছ'টা জঙ্গী বিমান বাইশটা জার্মান বিমানের সঙ্গে লড়াই চালায়, ওদের আটটা প্লেন নামায়, আমাদের মাত্র একটা নষ্ট হয়। এত উৎসাহে গল্পটি পড়ে শোনাল কমিসার যে মনে হল ওর অপরিচিত বৈমানিকেরা নয়, নিজের দলের ঘোড়সওয়াররাই এরকমভাবে নাম কিনেছে। পরে যে আলোচনা শুরু হল তাতে এমন কি কুকুশকিনও খুব উৎসাহ দেখাল, কী করে যুদ্ধটা চলেছিল সেই নিয়ে মতভেদ আর আলোচনা। শুধু শুয়ে শুয়ে আলেক্সেই ভাবল, "কপাল ভালো ওদের, আকাশে উড়ছে আর লড়াই করছে ওরা, কিন্তু আমি ত আর কখনো উড়তে পারব না।"

সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহারগুলো ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে এল।

লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে জার্মানদের আবার ঘা দেবার জন্য সোভিয়েত বাহিনীর পিছনে কোথাও বিরাট শক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। কোথায় ঘাটা দেওয়া হবে, জার্মানদের উপরে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তাই নিয়ে গম্ভীর আলাপ আলোচনা চালাত কমিসার আর স্তেপান ইভানভিচ। কিছু দিন আগে পর্যন্ত এ ধরনের আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে আলেক্সেই, কিন্তু এখন তাতে কান না দেবার চেষ্টা করত সে। বিরাট কিছু একটা, প্রচণ্ড এবং হয়ত, চূড়ান্ত যুদ্ধ আসন্ন, সেটা আলেক্সেই'ও আঁচ করেছে। কিন্তু ওর বন্ধুরা, এমন কি হয়ত কুকুশকিন পর্যন্ত, তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে সে, এই সব যুদ্ধে যোগ দেবে, আর ও পিছনে পড়ে থেকে পচবে, কিছু করার উপায় নেই তার, ব্যাপারটা ওর কাছে মর্মান্তিক; তাই কমিসার খবরের কাগজ পড়ে শোনালে কিম্বা যুদ্ধের বিষয়ে কোন আলোচনা শুরু হলে ও কম্বলে মাথা চেপে বালিশে গাল ঘষত, যাতে চোখে কিছু না পড়ে, কানে কিছু না আসে। আর কোন কারণে মাক্সিম গোর্কির সেই পরিচিত "বাজপাখির গান" এর লাইনটা বারবার মনে আসত: "গুড়ি মেরে যেতে জন্মেছে যারা উড়তে পারে না তারা"।

কয়েকটা নরম উইলো ডাল নিয়ে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা— যুদ্ধকালীন, অবরোধ প্রাচীরে কীর্ণ, কঠোর মস্কো সহরে কী করে সেগুলো এল ভগবান জানেন — প্রত্যেকের বিছানার পাশে গেলাসে এক একটা শাখা রাখল। লালচে শাখায় আর তুলোর পেঁজার মত নরম শুঁটিতে তাজা গন্ধ, মনে হল ৪২ নং ওয়ার্ডে মূর্তিমান বসন্ত এসেছে। সেদিন প্রত্যেকের মনে আনন্দ আর চঞ্চলতা। এমন কি নির্বাক ট্যাঙ্ক-অফিসারটি পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজের মধ্য দিয়ে বিড়বিড় করে কী একটা বলল।

শুয়ে শুয়ে আলেক্সেই ভাবছে: কামিশিনে, ছোট ছোট ঘোলাটে জলের ধারা কর্দমাক্ত অলিগলি বেয়ে চিক্চিকে বড়ো পাথর দিয়ে তৈরী রাস্তায় এসে পড়ছে, তপ্ত মাটির আর গোবরের গন্ধ, তাজা স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ। এমন একটি দিনে ভলগার খাড়া পাড়ে দাঁড়িয়েছিল ওলগা আর সে, নদীর সীমাহীন বিস্তারে মসৃণ গতিতে বরফ ভেসে গিয়েছে ওদের পেরিয়ে, চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা, শুধু লার্কগুলোর ঘণ্টার মত রূপালী ডাকে সে স্তব্ধতা ভাঙ্গছে। আর মনে হয়েছিল যে স্রোতে বরফ নয়, সে আর ওলগা নিঃশব্দে ভেসে চলেছে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কোন নদীর দিকে। কোন কথা না বলে দাঁড়িয়েছিল দুজনে, আগামী সুখের দিনের রঙীন স্বপ্নে এত বিভোর যে

বিশাল বিস্তৃত ভলগার উপরের সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে, বসন্তের চঞ্চল এলোমেলো হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে এসেছিল ওদের। সে-সব স্বপ্ন আর সত্যি হবে না এখন। ওর কাছে ওলগা আর আসবে না। আর আসেও যদি, ওর আত্মত্যাগ কী করে মেনে নেবে ও? নিজে ত কাঠের পায়ে নেংচিয়ে চলবে, কী করে দীপ্ত সুঠাম সুন্দর ওলগাকে নিজের পাশে হাঁটতে দেবে?.. বসন্তের সেই সাদাসিধে অগ্রদূতটিকে বিছানার পাশ থেকে সরিয়ে নিতে আলেক্সেই মিনতি করল নার্সকে।

উইলোর শাখাটি সরানো হল বটে, কিন্তু মন থেকে তিক্ত ভাবনা সব সহজে সরিয়ে দিতে পারল না আলেক্সেই। পাদুটো গিয়েছে শুনলে কী বলবে ওলগা ? ওকে ছেড়ে চলে যাবে, নিজের জীবন থেকে একেবারে মুছে দেবে? আলেক্সেই'র সমস্ত সত্তা এটাতে আপত্তি জানাল। না, এরকম লোক ওলগা নয়! ওকে ছেড়ে চলে যাবে না, মুখ ঘুরিয়ে নেবে না সে। কিন্তু সেটা যদি না করে তাহলে আরো খারাপ। মহৎ অন্তরের আবেগের ঝোঁকে সে ওকে বিয়ে করছে কল্পনা করল আলেক্সেই. বিয়ে করল পঙ্গুকে, তার খাতিরে ইঞ্জিনিয়ারিঙ শিক্ষার স্বপ্ন ছেড়ে দিল, অফিসের গতানুগতিক কাজ নিল যাতে নিজের, পঙ্গু স্বামীর, আর কে বলতে পারে, হয়ত ছেলেপুলের সংসার চলে।

এ ধরনের আত্মত্যাগ ওকে করতে দেওয়ার কী অধিকার আছে তার? দুজনের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোন বন্ধন নেই, বাগদান মাত্র হয়েছে, এখনো স্বামী স্ত্রী হয়নি। ওলগাকে ভালোবাসে, অসম্ভব ভালোবাসে, আর তাই ও ঠিক করল ও ধরনের কোন অধিকার নেই ওর, দুজনের যোগসূত্র নিজেকেই ছিন্ন করতে হবে, বিনা বিলম্বে, এক কথায়, তাতে ভবিষ্যতের দুরূহ বোঝা ওলগাকে বইতে হবে না, আর বর্তমান সমস্যার যন্ত্রণা থেকেও রেহাই পাবে ও।

কিন্তু কামিশিনের ডাকঘরের ছাপ দেওয়া কয়েকটি চিঠি আসাতে আলেক্সেই'র সমস্ত সিদ্ধান্ত ওলটপালট হয়ে গেল। ওলিয়ার চিঠির প্রতি লাইনে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোচ্ছে। সর্বনাশের পূর্বাভাসে যেন পীড়িত এমনভাবে সে লিখেছে যে আলেক্সেই'র যা কিছু ঘটুক না কেন, চিরকাল ওর সঙ্গে থাকবে ও, ওর জন্যই সে বেঁচে আছে, সময় পেলেই ওর কথা ভাবে, আর ওর চিন্তাই যুদ্ধকালীন সমস্ত কষ্ট, কারখানায় বিনিদ্র রাত্রি, পরিখা, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী নালা খোঁড়া, আর লুকিয়ে কী হবে, আধ-পেটা খেয়ে থাকা, সমস্ত কিছু সওয়াতে সাহায্য করে ওকে। "তোমার সেই শেষ

ছবিটা, গাছের গঁড়িতে একটা কুকুর নিয়ে বসে আছ, মুখে হাসি লেগে আছে, সেটা কখনো হাতছাড়া করি না। মা'র লকেটে সেটা রেখে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। মন খারাপ লাগলে সেটা খুলে ছবিটা দেখি... আমার বিশ্বাস, আমাদের ভালোবাসা যতদিন অটুট থাকবে ততদিন ভয় করার কিছু নেই।" আরো লিখেছে যে হালে আলেক্সেই'র মা ছেলের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত, তাঁকে আরো বেশী চিঠি লেখা ওর উচিত, কিন্তু কোন দুঃসংবাদ দিয়ে যেন তাঁকে উদ্বিগ্ন না করা হয়। বাড়ির চিঠি পেলে আগে সব সময়েই বিশেষ ভালো লাগত, যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্বিপাক-ভরা জীবনে সেগুলো ছিল আনন্দের উৎস। কিন্তু এখন, চিঠি পেয়ে এই প্রথম তার কোন আনন্দ হল না। চিঠিগুলোতে তার মন আরো ভারী হয়ে উঠল, আর একটা ভুল সে করল, যে ভুলের জন্য পরে অনেক ভুগতে হয়েছিল: পাদুটো কাটা হয়েছে—এ খবরটা বাড়িতে জানাবার সাহস তার হল না।

নিজের দুর্ভাগ্যের আর নিরানন্দ ভাবনাচিন্তার কথা খুঁটিয়ে লিখল শুধু একজনকে, আবহাওয়া কেন্দ্রের সেই মেয়েটিকে। দুজনের আলাপ পরিচয় নেই বললেও চলে, সেজন্য এসব ব্যাপার তাকে জানানো আরো সহজ। মেয়েটির নাম অজানা, ওর ঠিকানা তাই লিখল: "ফিল্ড পোস্ট অফিস, অমুক-অমুক আবহাওয়া কেন্দ্র "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" জন্য।" যুদ্ধক্ষেত্রে চিঠিপত্রের উপরে বিশেষ মূল্যারোপ করা হয় সেটা জানত আলেক্সেই, তাই ওর আশা যে ঠিকানাটা অদ্ভুত হলেও কোন না কোন সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছবে। আর না পৌঁছলেও কিছু এসে যাবে না, নিজের মনের ভাবকে ভাষায় রূপ দিতে ও শুধু চেয়েছিল।

তিক্ত ভাবনা চিন্তায় হাসপাতালে একঘেয়ে দিনগুলো কাটছে আলেক্সেই মেরেসিয়েভের। অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল সুপটুভাবে, ওর লোহার মত শক্ত শরীর সেটা সইয়ে নিল; ক্ষতগুলো তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দিনে দিনে ও দুর্বল হয়ে যেতে লাগল, সেটা রোধ করার নানা চেষ্টা সত্ত্বেও ও দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে সবায়ের চোখের সামনে।

৭

বাইরে ইতিমধ্যেই বসন্তের উদ্দাম জোয়ার।

দুর্বার বসন্ত ঢুকল ৪২ নং ওয়ার্ডে, আইওডোফর্মের গন্ধে ঝাঁঝালো ঘরটায়। জানলা দিয়ে এল সেটা, সঙ্গে আনল গলন্ত বরফের ঠাণ্ডা ভিজে

গন্ধ, চড়ুই'এর অস্থির কিচির মিচির, মোড়-ঘোরা ট্রামগুলোর প্রফুল্ল মুখর ঝনঝনানি, বরফ-মুক্ত এ্যাসফল্টের রাস্তায় পায়ের জোরালো শব্দ আর সন্ধ্যেবেলায় একটা একর্ডিয়নের নিচু একটানা সুর। পাশের জানলা দিয়ে বসন্ত উঁকি মারল, জানলাটা দিয়ে চোখে পড়ে পপলারগাছের রৌদ্রোজ্জ্বল একটা শাখা, তার উপরে হলদে রসে-ভরা বড়ো গোছের কুঁড়ি ফেঁপে উঠছে। ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার পাণ্ডুর মমতাময় মুখের সোনালী ফুট ফুট দাগের আকারে বসন্ত এল ওয়ার্ডে, নানা রকমের পাউডার মেখেও দাগগুলো যায়নি বলে নার্সটির বিরক্তির সীমা নেই। জানলার বাইরের টিনে-ঢাকা কার্নিশে বড়ো বড়ো বিন্দু ফুর্তিতে টপটপ করে পড়ছে, তাতে বসন্তের কথা খালি মনে পড়ে।

আগেকার মত এবারেও মানুষের অন্তরে কোমলতা আনল বসন্ত, জাগাল নানা স্বপ্ন।

প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষায় কমিসার বলল: 'বনের ফাঁকা জায়গায় বন্দুক হাতে এ সময়ে থাকাটা খাসা ব্যাপার, তাই না, স্তেপান ইভানভিচ? চালায় ওৎ পেতে শিকারের জন্য ভোরবেলায় বসে থাকা... চমৎকার কিন্তু!.. গোলাপী ভোর, ঝরঝরে বরফের একটু ঘন আমেজ তাতে, আর চালায় চুপ করে বসে থাকা। হঠাৎ পাখির ডাক, ডানার ঝটপট, উড়ে মাথার ওপরে বসল পাখিটা — পাখার মত লেজ ছড়িয়ে, তারপর আর একটা এল, আরো একটা...'

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্তেপান ইভানভিচ চকাৎ আওয়াজ একটা করল, যেন মুখে জল এসে গিয়েছে, কিন্তু কমিসার তার স্বপ্নবিলাস থামাল না:

'তারপর আগুন জ্বালানো হল, বর্ষাতি বিছোনো হল, সুগন্ধি খাসা চা বানানো হল, ধোঁয়ার আস্বাদ তাতে, আর এক চুমুক ভদকা, ব্যস, সমস্ত শরীর গরম হয়ে উঠল, তাই না? খাটুনির পরে...'

'এবার থামুন, কমরেড কমিসার, আমাদের অঞ্চলে বছরের এ সময়ে কী ধরনের শিকার পাওয়া যায়, জানেন? পাইক-মাছ! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, কিন্তু কথাটা সত্যি। আগে শোনেননি কথাটা? বেশ মজার ব্যাপার এটা, আর কিছু রোজগারও করা যায় অবশ্য। হ্রদে বরফ গলতে আর নদীর জল ছাপিয়ে উঠতে শুরু করলেই মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে যায় পাড়ে, ঘাসে আর বসন্তের জলে ঢাকা শেওলায় গিয়ে ওঠে। ঘাসে গিয়ে ডিম পাড়ে। নদীর

তীর ঘেঁষে যাচ্ছে, জলে-ডোবা কাঠের কেঁদোর মত জিনিস চোখে পড়বে, কিন্তু আসলে ওগুলো মাছ! বন্দুক চালান, মাঝেমাঝে এতগুলো একসঙ্গে পাবেন যে থলেতে আঁটতে পারবে না। সত্যি কথা বলছি!..'

তারপর শিকারীদের স্মৃতিবিনিময় চলে। সকলের অজান্তে যুদ্ধের কথা এসে পড়ে, ডিভিশনে কিম্বা দলে এখন কী হচ্ছে ভাবে ওরা, ভাবে শীতকালে খোঁড়া ডাগ-আউটগুলিতে জল চুঁইয়ে পড়ছে কি না, গড়খাইগুলোর অবস্থাই বা কী, ফ্যাশিস্টদের হাল কেমন, পশ্চিমে ওরা ত এ্যাসফল্টের রাস্তায় অভ্যস্ত।

মধ্যাহ্ন-ভোজন হয়ে গেলে চড়ুইগুলোকে খাওয়ায় ওরা। বেশ মজার ব্যাপার এটা, স্তেপান ইভানভিচের আবিষ্কার। চুপ করে বসে থাকতে সে কখনো পারে না, ক্ষীণ অস্থির হাতে কিছু না কিছু সব সময়ে করছে। একদিন ও বলল যে খাবারের পর গুঁড়োগুলো জানলার বাইরের কার্নিশে ছড়িয়ে দেওয়া হোক পাখিগুলোর জন্য। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল এটা, শুধু উচ্ছিষ্ট গুঁড়ো নয়, রুটির টুকরো ইচ্ছে করে ফেলে রাখত ওরা, সেগুলো গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হত, ফলে এক ঝাঁক চড়ুইকে, স্তেপান ইভানভিচের ভাষায়, "রসদের বরাদ্দ তালিকায় রাখা হল," ক্ষুদে, সরব প্রাণীগুলো বড়ো একটা টুকরো ঠোকরাচ্ছে, কিচির মিচির ঝগড়া চলেছে, ঝনকাঠে খুদটুকু আর পড়ে নেই, পপলারের ডালে বসে ঠোঁট দিয়ে নিজেদের গা সাফ করা চলল, তারপর ফরফর করে নিজেদের বিশেষ বিশেষ কাজে উড়ে চলে গেল, দৃশ্যটা দেখে ওয়ার্ডের লোকেদের আনন্দের অন্ত থাকত না। চড়ুইদের খাওয়ানো ওদের বিশেষ প্রিয় আমোদে দাঁড়াল। কয়েকটা চড়ুইকে আলাদা করে চিনল রোগীরা, নামকরণও হল তাদের। ওদের বিশেষ প্রিয় ছিল একটা বেঁড়ে বেয়াড়া খুরখুরে ক্ষুদে চড়ুই, ঝগড়ুটে স্বভাবের জন্যই লেজটা সে হারিয়েছিল খুব সম্ভব। স্তেপান ইভানভিচ ওর নাম রাখল "সাব-মেসিনগানার"।

এটা মজার ব্যাপার যে ক্ষুদে সরব চড়ুইগুলোকে নিয়ে আমোদ প্রমোদের ফলেই ট্যাঙ্ক-অফিসারের বিমর্ষ ভাবটা কেটে গেল। প্রায় একেবারে কুঁজো স্তেপান ইভানভিচ লাঠিতে ভর দিয়ে রেডিয়েটরে ওঠবার চেষ্টা করছে, যাতে হাওয়া চলাচলের খোলা জানলাটা হাতের নাগালে আসে, দৃশ্যটা অবসন্ন নিরুৎসাহ ট্যাঙ্ক-অফিসার দেখল। কিন্তু পরের দিন চড়ুইগুলো উড়ে এল জানলাটায়, আর ব্যস্তসমস্ত ক্ষুদে প্রাণীগুলোকে ভালো করে দেখবার জন্য

ব্যথায় শিঁটিয়ে ওঠা সত্ত্বেও এমন কি বিছানায় উঠে বসল সে। তার পরের দিন মধ্যাহ্নের খাবার থেকে পিঠের বড়ো একটা টুকরো বাঁচিয়ে রাখল, তার বিশ্বাস হাসপাতালের এই উপাদেয় খাবারের টুকরোটা উচ্চকণ্ঠ ভিখিরীগুলোর বিশেষ পছন্দ হবে। একদিন "সাব-মেসিনগানারের" কোন পাত্তা নেই, কুকুশকিনের অনুমান যে ওটাকে বেড়ালে খেয়েছে, সে বলল উচিত শাস্তি পেয়েছে ওটা। বিরস ট্যাঙ্ক-অফিসারের মেজাজ গেল চড়ে, বলল কুকুশকিন বেজায় "বদমেজাজী" লোক! তার পরের দিন বেঁড়ে চড়ুইটা যখন আবার এসে জানলার ঝনকাঠে বসে, মাথা একদিকে হেলিয়ে, গোলগোল বেয়াড়া জ্বলজ্বলে চোখে কিচির মিচির করে ঝগড়া শুরু করল তখন সশব্দে হেসে উঠল ট্যাঙ্ক-অফিসার, অনেক মাস পরে এই প্রথম হাসল সে।

কিছুদিনের মধ্যেই গভজ্‌দেভের মেজাজ একেবারে হালকা হয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখল যে ও বেশ ফুর্তিবাজ, গপ্পে লোক, ওর সঙ্গে সহজেই মেশা যায়। পরিবর্তনের জন্য দায়ী কমিসার অবশ্যই, স্তেপান ইভানভিচের ভাষায়, কাকে কী ভাবে নাড়া দিতে হয় তার চাবিকাঠি ওর ওস্তাদ হাতে। আর সেটা সে করল এই ভাবে।

৪২ নং ওয়ার্ডের সবচেয়ে সুখের সময় হল যখন রহস্যময় হাসিমুখে, হাত পেছন করে দরজায় এসে দাঁড়ায় ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, সবায়ের দিকে দীপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে:

'কে কে নাচবেন আজ?'

তার অর্থ হল ডাক এসেছে। যাদের চিঠি এসেছে, চিঠি হাতে পাবার আগে সেই সব সৌভাগ্যবানদের ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার কথামত অন্তত অল্পক্ষণের জন্য বিছানায় নাচের অনুকরণে নড়াচড়া করতে হত। বেশীর ভাগ সেটা করতে হত কমিসারকে, কেননা মাঝেমাঝে এক সঙ্গে দশ-বারোটা চিঠি তার কাছে আসে। চিঠিগুলো আসে ডিভিশন থেকে, যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পিছন থেকেও, সেগুলো লিখত ওর বন্ধু অফিসাররা, সাধারণ সৈনিকেরা আর বন্ধু অফিসারদের স্ত্রীরা; পুরোনো দিনের খাতিরে হয়ত তারা লিখত, কিম্বা অনুরোধ জানাত যেন বিগড়ে-যাওয়া স্বামীদের সে কড়কে দেয়; যুদ্ধে নিহত বন্ধু অফিসারদের স্ত্রীরাও নিজেদের ব্যাপার কী করে গুছিয়ে নিতে হবে তার পরামর্শ কিম্বা সাহায্য চেয়ে লিখত। যুদ্ধে নিহত রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের একটি মেয়ে, কাজাখস্তানের পাইওনিয়র দলের সদস্যা, তার নামটা পর্যন্ত মনে নেই, এমন কি সে-ও চিঠি লেখে।

প্রত্যেকটি চিঠি অসীম আগ্রহে পড়ত কমিসার, নিয়ম করে জবাব দিত; অমুক কম্যান্ডারের স্ত্রীকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানাত সেখানকার কর্তৃপক্ষকে, বিগড়ে-যাওয়া স্বামীটিকে চিঠিতে ধমকাল, কোন গৃহ-ব্যবস্থাপককে ভয় দেখাল যে যদি অমুক কম্যান্ডারের পরিবারের ঘরে সে স্টোভ না বসায় তাহলে নিজে গিয়ে তার "মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবে"। চিঠি লিখল কাজাখস্তানের সেই মেয়েটিকে যার বিদঘুটে নামটা কিছুতেই মনে থাকে না, শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় ভাগে রুশ ভাষায় খারাপ নম্বর পাওয়ার জন্য ধমকাল তাকে।

যুদ্ধক্ষেত্র আর যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনের জায়গার সঙ্গে স্তেপান ইভানভিচেরও বেশ পত্রালাপ চলত। চিঠি লিখত ওর ছেলেরা, তারাও বাহিনীতে, স্নাইপার তারা, কাজে বেশ দক্ষ, লিখত ওর মেয়ে, যৌথখামারের একটি দলের নেতা সে, চিঠিগুলোতে থাকত অসংখ্য আত্মীয়স্বজন আর জানাশোনাদের কুশলকামনা, খবর থাকত যে যদিও যৌথখামারের আরো বেশী লোককে নির্মাণের কাজে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে তবুও অমুক-অমুক পরিকল্পনার অতিপূরণ হয়েছে কয়েকভাগ। চিঠিগুলো পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো পড়ে শোনাত স্তেপান ইভানভিচ, ওর ঘরোয়া ব্যাপারের বিষয়ে নিয়মিতভাবে ওয়াকিবহাল থাকত সারা ওয়ার্ড, ওয়ার্ডের সমস্ত মেয়েরা, নার্সরা, এমন কি নিরস বদমেজাজী হাউস সার্জনটি পর্যন্ত।

এমন কি কুকুশকিন, মোটেই মিশুকে যে নয়, সারা দুনিয়ার সঙ্গে যার ঝগড়া লেগে আছে মনে হয়, তারো কাছে মায়ের চিঠি আসে, তিনি বার্নাউলের কোথায় একটা জায়গায় থাকেন। নার্সের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিত কুকুশকিন, ওয়ার্ডের সবাই ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর সেটা পড়ত, কথাগুলো চুপিচুপি উচ্চারণ করে। তখন ওর উগ্র চেহারা নরম দেখাত, মুখে আসত কোমল গম্ভীর একটি ভাব, যেটা একেবারে ওর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বুড়ী মা গ্রামের চিকিৎসক, তাঁকে ভয়ানক ভালোবাসে কুকুশকিন, কিন্তু কোন কারণে ভালোবাসাটার বিষয়ে লজ্জিত সে, সেটা ঢাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

খুসিতে ওয়ার্ডে খবরের বিনিময় চলছে, একমাত্র ট্যাংক-অফিসার এসব আনন্দের অংশীদার হত না, আরো বিষণ্ণ মুখে দেয়ালের দিকে ফিরে কম্বলে মাথা ঢাকা দিত। ওকে চিঠি লেখবার কেউ নেই। যত চিঠি ওয়ার্ডে আসে তত তীব্র ঠেকে নিজের নিঃসঙ্গতা। কিন্তু একদিন দোরগোড়ায় দেখা গেল

ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে, অন্য দিনের তুলনায় ওর মুখ আরো বেশী উত্তেজিত দেখাচ্ছে। কমিসারের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বলল ও:

'আজকে নাচের পালা কার?'

ট্যাঙ্ক-অফিসারের খাটের দিকে তাকিয়ে ওর মুখ সহৃদয় হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সবাই বুঝল অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে। প্রত্যাশায় সচকিত হয়ে উঠল ওয়ার্ডটি।

'লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভ, আজ আপনার নাচবার পালা। নাচুন তাহলে।'

মেরেসিয়েভ দেখল চমকে উঠে গভজ্‌দেভ হঠাৎ ঘুরে তাকাল, ব্যাণ্ডেজের ফাঁকে ওর চোখ ঝলসে উঠল, সেটাও নজরে পড়ল। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিল কিন্তু গভজ্‌দেভ, গলা কেঁপে উঠলেও নির্লিপ্ত ভাব আনার চেষ্টা করে বলল:

'ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। পাশের ওয়ার্ডে অন্য কোন গভজ্‌দেভ নিশ্চয়ই হাজির।' কিন্তু ওর ব্যগ্র চোখদুটো লোভীর মত তিনটি চিঠিতে নিবদ্ধ, উঁচুতে ধরে আছে সেগুলো নার্স, যেন পতাকা।

'না, কোন ভুল হয়নি,' বলল নার্স। 'কী লেখা আছে দেখুন! লেফ্‌টেনাণ্ট গ. ম. গভজ্‌দেভ, আর ওয়ার্ডের নম্বরটা পর্যন্ত আছে — ৪২। তাহলে?'

কম্বলের নিচে থেকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটা হাত ঝট করে বেরিয়ে এল। লেফ্‌টেনাণ্ট দাঁত দিয়ে অস্থিরভাবে একটা খাম খুলে ফেলল, হাতটা থরথর করে কাঁপছে, চোখ জ্বলছে উত্তেজনায়, আশ্চর্য ব্যাপার! একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠি তিনটি মেয়ে, বান্ধবী তিনজন, ভিন্ন হাতের লেখায় ভিন্ন ভাষায় প্রায় একই কথা লিখেছে। বীর ট্যাঙ্ক-অফিসার লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভ আহত অবস্থায় মস্কোতে আছে খবর পেয়ে তার সঙ্গে পত্রবিনিময় করবে ঠিক করেছে তারা। যদি ওদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিরক্ত না হয় তাহলে কেমন আছে সেটা কি লিখে জানাবে? ওদের মধ্যে একজন, আনিউতা বলে সে সই করেছে, জিজ্ঞেস করেছে কোনভাবে ওকে সাহায্য করতে পারে কিনা, ওর ভালো বই চাই কিনা, যদি কিছুর দরকার থাকে তাহলে ইতস্তত না করে যেন জানায়।

সারা দিন লেফ্‌টেনাণ্ট চিঠিগুলো নাড়ল চাড়ল, ঠিকানাগুলো ভালো করে দেখল, হাতের লেখাও খুঁটিয়ে দেখা হল। এ ধরনের পত্রবিনিময় চলে, সেটা ওর জানা ছিল অবশ্য, একজন অজানা পত্রলেখিকার সঙ্গে তার

এরকমের পত্রবিনিময় চলেছিল একবার, উৎসবে উপহার হিসেবে পাওয়া একজোড়া পশমের দস্তানায় ছোট্ট একটি চিঠি পাবার পর বিনিময়টা শুরু হয়। পত্রলেখিকা একবার ঠাট্টা করে লেখার সঙ্গে নিজের ফটো পাঠায়, চার ছেলের মা একটি প্রবীণার ছবি — তারপর আপনা থেকেই চিঠি লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আজকের চিঠিগুলো অনেকটা আলাদা। অবাক আর খটকা লাগছে, অপ্রত্যাশিত চিঠিগুলো একসঙ্গে এসে পড়ল কী করে শুধু সেটা ভেবে। আর একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না: যুদ্ধে ও কী করেছে সেটার খবর এই ডাক্তারী ছাত্রীদের কাছে পেঁছিল কী করে? সমস্ত ওয়ার্ড এ-বিষয়ে মাথা ঘামাল, বিশেষ করে কমিসার। কিন্তু স্তেপান ইভানভিচের সঙ্গে ওর ইসারায় দৃষ্টিবিনিময় মেরেসিয়েভের চোখে পড়াতে বুঝতে পারল যে ব্যাপারটার মূলে আছে কমিসার।

যাই হোক না কেন, পরের দিন সকালে গভজ্‌দেভ চিঠির কাগজ কমিসারের কাছে চেয়ে নিল, আর কারোর অনুমতির অপেক্ষা না করে ডান হাতের ব্যাণ্ডেজটা খুলে সন্ধ্যা পর্যন্ত লিখে চলল, কাটাকুটি অনেক হল, একটা চিঠি দুমড়ে মুচড়ে আবার নতুন করে লিখল, অবশেষে অপরিচিত পত্রলেখিকাদের চিঠির জবাব তৈরী হল।

দুটি মেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই আপনা থেকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল, কিন্তু সহৃদয়া আনিউতা তিনজনের হয়ে লিখত। গভজ্‌দেভ আলাপপ্রিয় লোক. বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় কোর্সে কী হচ্ছে না হচ্ছে সারা ওয়ার্ডটি এখন সে খবর রাখে; জীববিদ্যা রোমাঞ্চকর বিষয়, জৈব রসায়নশাস্ত্র বড়ো নীরস জিনিস, অধ্যাপকটির গলা খাসা, চমৎকার পড়ান তিনি, অমুক উপাধ্যায়টি বড়োই বিরক্তিকর, স্বেচ্ছামূলক-সাহায্য করে আগের রবিবারে ছাত্রেরা কতটা জ্বালানী কাঠ মালের ট্রলিতে বোঝাই করেছে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের কাজ করা কত কঠিন, ও মেয়েটা কেমন তোতাপাখির মত, মোটেই সুবিধের লোক নয় সে -- সমস্ত খবর ওয়ার্ডের জানতে বাকি রইল না।

শুধু যে কথা বলতে শুরু করল গভজ্‌দেভ তা নয়, মনে হল ও নতুন জীবন পেয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগল।

কুকুশকিনের বন্ধফলকগুলো খুলে ফেলা হল। লাঠিতে ভর না দিয়ে চলতে শিখছে স্তেপান ইভানভিচ, ইতিমধ্যেই অনেকটা সোজা হয়ে হাঁটতে পারে। এখন সারা দিন জানলার ধারে কাটায় সে, "বিরাট পৃথিবীতে" কী

ঘটছে দেখে। দিনে দিনে শুধু কমিসার আর মেরেসিয়েভের অবস্থা সমানে খারাপের দিকে চলেছে, বিশেষ করে কমিসারের। সকালের ব্যায়াম করা ছেড়ে দিয়েছে সে। শরীরে এসেছে ভীতিকর, হলদেটে, প্রায় স্বচ্ছ একটা ফাঁপা ভাব। হাতদুটো মুড়তে কষ্ট হয়, পেন্সিল কি চামচ আর ধরতে পারে না কমিসার।

সকালে ওয়ার্ডের পরিচারিকা তাকে ধুইয়ে খাইয়ে দেয়। এটা বোঝা যায় যে যন্ত্রণার জন্য নয়, নিজের অসহায়তায় বিষণ্ণ ও ব্যথিত বোধ করছে সে। কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল না কমিসার। ওর ভারী গলা আগেকার মতই ফূর্তিতে গমগম করে ওঠে, সমান আগ্রহে খবরের কাগজ পড়া চলে, জার্মান শেখাটাও বাদ পড়েনি; কিন্তু পড়বার সময় বইগুলো ধরতে পারে না আর, তাই তার দিয়ে বই ঠেস দিয়ে রাখবার একটা স্ট্যান্ড বানিয়েছে স্তেপান ইভানভিচ, ওর বিছানার পাশে বসে বইগুলোর পাতা উল্টিয়ে দেয় সে। সকালে, খবরের কাগজ তখনো আসেনি, কমিসার ব্যগ্রভাবে নার্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষ ইস্তাহারে কী বলেছে, রেডিওর খবর কী, আবহাওয়া কেমন, মস্কোতে কী গুজব।

মনে হয় শরীর যতই দুর্বল হচ্ছে ততই বাড়ছে ওর মনোবল। আগেকার মত সমান আগ্রহে অগুন্তি চিঠিপত্র পড়ে কমিসার, উত্তর দেয়, কুকুশকিন আর গভজ্‌দেভ পালা করে ওর কথামত চিঠি লেখে। একদিন চিকিৎসার পর মেরেসিয়েভ ঝিমোচ্ছে, কমিসারের বজ্রকঠোর গলায় জেগে উঠল।

বিছানার উপরে তারের তৈরী বই-স্ট্যান্ডে ডিভিশনের একটা খবরের কাগজের ছাই-রঙা পাতা পড়ে আছে। তার উপরে ছাপ দেওয়া: "স্থানান্তর নিষিদ্ধ", কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়মিতভাবে কাগজটা কমিসারের কাছে এক বন্ধু পাঠায়।

'প্রতিরোধ ব্যূহে বসে বসে ওদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে না কি?' কমিসার হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল। 'ক্রাভৎসভ আমলাতান্ত্রিক লোক, তাই বুঝি? বাহিনীর সেরা পশু-চিকিৎসক ও, আর ও কিনা আমলাতান্ত্রিক লোক। এক্ষুণি যা বলছি লেখো ত!'

কমিসার বলে গেল, লিখল গভজ্‌দেভ। বাহিনীর সামরিক পরিষদের একটি সভ্যকে কড়া চিঠি লেখা হল, তাকে অনুরোধ করা হল যে "কলমবাজদের" যেন রাশ টেনে রাখা হয়, একটি খাঁটি সৎকর্মীর উপরে অন্যায় দোষারোপ করেছে তারা। ডাকে দেবার জন্য চিঠিটা নার্সের হাতে দেওয়া হল, তখনো "কলমবাজগুলো" বকুনির হাত থেকে রেহাই পেল না;

যে মানুষটি বালিশে মাথা পর্যন্ত নড়াতে পারে না, কী আবেগে সে কথা বলছে শুনলে অবাক লাগে।

আরো উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা সে-দিন সন্ধ্যাবেলায় ঘটল। সব চুপচাপ, তখনো আলো জ্বালা হয়নি, ঘরের আনাচে-কানাচে ছায়া ঘন হচ্ছে, জানলার ধারে বসে স্তেপান ইভানভিচ চিন্তাকুলভাবে বাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্যাম্বিসের এপ্রন গায়ে নদীতে বরফ ভাঙ্গছে কয়েকটি মেয়ে। গাঢ় চৌকো একটা বরফগর্তের ধার থেকে লম্বা লম্বা চাঁই শাবল দিয়ে ভেঙে, শাবলের দুএক ঘায়ে সেগুলোকে সরু টুকরো করে নৌকোর আঁকড়া দিয়ে জল থেকে টেনে তুলছে কাঠের পাটাতন বেয়ে। সারি সারি বরফের চাঁই পড়ে আছে, নিচের দিকটা সবুজ আর স্বচ্ছ, উপর দিকটা হলদে। বরফ যেখানে কাটা হচ্ছে সেদিকে নদীর ধার হয়ে আস্তে আস্তে আসছে স্লেজের দীর্ঘ সারি, একটার সঙ্গে অন্যটা আটকানো। বরফ পড়ে আছে যেখানে সেখানে একটার পর একটা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে একটি বুড়ো, কান-ঢাকা টুপি মাথায়, পরনে তুলো-ভরা প্যান্ট আর কোট, কটিবন্ধে কুঠার গোঁজা, আর মেয়েরা বরফের চাঁইগুলো স্লেজে চাপাচ্ছে।

স্তেপান ইভানভিচের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল যৌথখামারের কোন দল কাজটা করছে, কিন্তু বন্দোবস্তটা মোটেই সুবিধের নয়। কাজে লাগানো হয়েছে বড্ড বেশী লোককে, ফলে এ-ওর বাধার সৃষ্টি করছে। পরিচালনার একটি পরিকল্পনা ওর ঝানু মাথায় এল। মনে মনে তিনজনের এক একটা দলে ওদের ভাগ করে ফেলল — জল থেকে বিনা ক্লেশে বরফ তোলার জন্য তিন জনের দলই যথেষ্ট। বিভিন্ন জায়গার জন্য নির্দিষ্ট করল দলগুলোকে, মোটমাট টাকা দেওয়া হবে উপস্থিত সমস্ত লোক হিসেবে নয়, চাঁই কটা তোলা হল হিসেব করে দলগুলোকে আলাদা করে। ওদেব মধ্যে একজনকে, গোলগাল মুখ, গোলাপী গাল বেশ সমর্থ একটি মেয়েকে নিজেদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা শুরু করতে বলার কথা ভাবল স্তেপান ইভানভিচ... চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছে, একটা ঘোড়া এসে পড়ল বরফের গর্তের ধারে, পিছনের পাদুটো পিছলে জলে পড়ে গেল, সেটার হুঁশ নেই। স্লেজের ভার ঘোড়াটাকে ভাসিয়ে রেখেছে বটে, কিন্তু খরস্রোতে ক্রমাগত নিচে টানছে। কুঠার হাতে বুড়োটা অসহায়ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, একবার স্লেজের শিকে টান মারছে, একবার টানছে লাগামটা।

স্তেপান ইভানভিচের হাঁফ ধরে এল, তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে:

'ঘোড়াটা ডুবে যাচ্ছে যে!'

অনেক কষ্টে কনুই'এর ভর দিয়ে উঠল কমিসার. যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে গিয়েছে. জানলার ঝনকাঠে বুকের ভর দিয়ে বাইরে তাকাল, তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠল:

'বেটা গবেট! মাথায় ঢুকছে না কিছু? গলার দড়িগুলো... দড়িগুলো কেটে ফেল... ঘোড়াটা তাহলে নিজেই বেরিয়ে আসবে! না, ঘোড়াটাকে মেরে ফেলবে দেখছি!'

জানলার ঝনকাঠে কোনক্রমে উঠল স্তেপান ইভানভিচ। ঘোড়াটা ডুবে যাচ্ছে। ঘোলা জলে প্রায় পিঠ পর্যন্ত আমগ্ন, উঠে আসার চেষ্টা প্রাণপণে করছে, পায়ের বরফে লোহার নাল-দেওয়া সামনের পাদুটো মাঝেমাঝে জোরে বসাচ্ছে।

'দড়িগুলো কেটে ফেল!' চেঁচাল কমিসার. যেন নদীর ওখানে বুড়োটা ওর গলা শুনতে পারবে।

হাতদুটো মুখের সামনে মেগাফোনের মত করে ধরে স্তেপান ইভানভিচ কমিসারের নির্দেশটা চেঁচিয়ে জানাল:

'ওহে বুড়ো, শুনছ! লাগামের দড়িগুলো কেটে ফেল! বেল্টের কুঠারটা দিয়ে ওগুলো কেটে ফেলো, জলদি কেটে ফেল!'

বুড়োর কানে গেল কথাটা, মনে হল নির্দেশটা আকাশ-বাণীর মত। এক ঝটকায় বেল্ট থেকে কুঠারটা খুলে নিয়ে দুএক ঘায়ে দড়িগুলো কেটে ফেলল। লাগাম থেকে ছাড়া পেয়ে, ধড়মড় করে বরফের উপরে উঠল ঘোড়াটা. গর্তের পাড় এড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গা ঝাড়তে লাগল কুকুরের মত।

'কী হচ্ছে এখানে?' ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন জানতে চাইল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, ওভারঅলের বোতামগুলো খোলা, সাধারণত যে শাদা টুপিটা পরেন মাথায় নেই সেটা। দারুণ রেগে গিয়ে মেঝেতে পা ঠুকে তিনি জানালেন কারো কোন কথায় কান দেবেন না। সমস্ত ওয়ার্ডটা বিলকুল পাগল হয়ে গিয়েছে, সবাইকে এখান থেকে জাহান্নমে বিদায় করবেন তিনি, ঠিক কী হয়েছে সেটা জানবার চেষ্টা না করেই প্রত্যেককে ধমকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তারপরেই এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, চোখের জলের দাগ মুখে, অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে তাকে। এক্ষুণি তাকে ভীষণ বকেছেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। কমিসারের

দিকে তাকিয়ে দেখল ওর মুখ ছাই'এর মত শাদা আর প্রাণহীন হয়ে গিয়েছে, চোখ বুজে অনড়ভাবে পড়ে আছে সে, তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল তার দিকে।

সন্ধ্যার দিকে কমিসারের অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়াল। কর্পূরের ইনজেকশন দেওয়া হল, তারপরে অক্সিজেন, কিন্তু অনেকক্ষণ জ্ঞান ফিরে এল না। জ্ঞান ফিরে এলেই কিন্তু ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল কমিসার, অক্সিজেন ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

'কিচ্ছু ভেবো না, নার্স। নরক থেকেও আলবৎ ফিরে আসব আমি, শয়তানের বাচ্চারা যে জিনিসে মুখের ফুট-ফুট দাগ তাড়ায় তোমার জন্যে নিয়ে আসব সেটা।'

দুর্বলতার সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে যুঝে দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে বিরাট বলিষ্ঠ লোকটা, দেখলে দারুণ খারাপ লাগে।

৮

প্রতিদিন মেরেসিয়েভও দুর্বল হয়ে পড়ছে। একমাত্র "আবহাওয়া সার্জেণ্টকেই" সে এখন নিজের দুঃখের কথা জানায়, পরের চিঠিতে তাকে এমন কি এটা পর্যন্ত লিখল যে হাসপাতাল থেকে খুব সম্ভব আর বেঁচে ফিরবে না, আর না বাঁচাই ভালো: পাবিহীন বৈমানিক ডানাবিহীন পাখির মত, খুদকুড়ো ঠুকরে খেয়ে বেঁচে থাকে পাখি কিন্তু উড়তে পারে না কখনো। ডানাবিহীন পাখি হতে চায় না সে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, যত শীগগির মরে তত ভালো। এরকমভাবে লেখাটা নিষ্ঠুর, কেননা চিঠিপত্রের বিনিময়ে এক সময়ে মেয়েটি স্বীকার করেছিল যে "কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের" প্রতি অনুরাগ তার অনেক দিনের, মেরেসিয়েভ ভীষণ আঘাত না পেলে গোপন কথাটা সে প্রকাশ করত না কখনো।

'বিয়ে করতে চায় মেয়েটা। ছেলেদের দাম এখন বেশ চড়া। লোকটার পা আছে কি না আছে তাতে কী এসে যায় ওর, মোটা ভাতা পেলেই হল,' মন্তব্য করল কুকুশকিন, ওর বদমেজাজ বদলায়নি।

মাথার উপরে মৃত্যু গজরাচ্ছে, সেই মুহূর্তে নিজের মুখে রাখা মেয়েটির ফ্যাকাশে মুখটির কথা মনে পড়ল মেরেসিয়েভের, কুকুশকিন যা বলছে সেটা ঠিক নয়, সে জানে। ওর বিষণ্ণ নানা স্বীকারোক্তিতে মেয়েটির বুক যে

ব্যথায় মুচড়িয়ে ওঠে, সেটাও জানে। "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" নামটি পর্যন্ত জানা নেই, তবু তাকে নিজের নিরানন্দ ভাবনা চিন্তার কথা লিখে চলল মেরেসিয়েভ।

প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করার চাবিকাঠি বের করতে কমিসার পারে, কিন্তু এখন পর্যন্ত মেরেসিয়েভকে সাড়া দেওয়াতে পারেনি সে। ওর অস্ত্রোপচারের পরের দিন ওস্ত্রভস্কির "ইস্পাত" বইটা ওয়ার্ডে এল। চেঁচিয়ে পড়া হল বইটা। পড়াটা ওকে উদ্দেশ্য করে বুঝতে পারল আলেক্সেই, কিন্তু গল্পটি বিশেষ কোন সান্ত্বনা জোগাল না। পাভেল করচাগিন ওর ছেলেবেলার বীরেদের একজন। "কিন্তু করচাগিন ত বৈমানিক ছিল না, 'আকাশের জন্য আকুলিবিকুলির' মানে কি সে জানত?" ভাবল আলেক্সেই। "দেশের সমস্ত পুরুষ আর মেয়েদের অনেকে লড়াই করছে, এমন কি শিকনী-নাকে বাচ্চারা পর্যন্ত কুঁদযন্ত্র নাগালে আনবার জন্য বাক্সের উপরে চেপে গুলিগোলা তৈরী করছে, এমন একটা সময়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওস্ত্রভস্কি ত নিজের বইগুলো লেখেননি।"

সংক্ষেপে, এবারে বইটা কাজ দিল না। পাশ থেকে এগোতে হবে এবার, ঠিক করল কমিসার। প্রসঙ্গত, একটি লোকের বিষয়ে গল্প শুরু করল, লোকটির দুটো পা পক্ষাঘাতে অসাড়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বড়ো একটা চাকরী সে করত। পৃথিবীর সবকিছুতে স্তেপান ইভানভিচের আগ্রহ, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে। তারপর মনে পড়ে গেল যে তার এলাকায় একজন ডাক্তার ছিল, একটা মাত্র হাত থাকা সত্ত্বেও জেলার সেরা ডাক্তার সে, ঘোড়ায় চাপত, ভালোবাসত শিকারে যেতে আর বন্দুক চালাত এমন যে টিপ করে কাঠবিড়ালীর চোখে গুলি করতে পারত; এরপর কমিসার বিগত আকাদেমিশ্যান ভিলিয়ামসের কথা স্মরণ করল, ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল তাঁর সঙ্গে। শরীরের অর্ধেকটা তাঁর পক্ষাঘাতে অসাড়, একটা মাত্র হাত চালু ছিল, তবুও কৃষি ইনস্টিটিউটের পরিচালনা তিনি করতেন, ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজ চালাতেন।

শুনতে শুনতে মেরেসিয়েভ হাসল। ভাবা, কথা বলা, লেখা, আদেশ দেওয়া, লোকজনকে সারানো, এমন কি শিকারে যাওয়া বিনা পায়ে সম্ভব, কিন্তু ও বৈমানিক, জন্ম থেকে বৈমানিক; ফাটল-ধরা জমিতে, পাতার মধ্যে পড়ে আছে সারা ভলগা এলাকায় বিখ্যাত বিরাট, ডোরা-কাটা সব তরমুজ, ছেলেবেলায় একদিন তরমুজক্ষেত পাহারা দিচ্ছে সে, হঠাৎ কানে এল

আওয়াজ, তারপর দেখল ছোট রূপালী একটা "ড্রাগন-ফ্লাই", ডানাজোড়া সূর্যের আলোয় ঝলকিয়ে ধূলিধূসর স্তেপের উপর দিয়ে স্তালিনগ্রাদের দিকে কোথাও উড়ে চলেছে মন্থরভাবে।

সেই মূহূর্ত থেকে বৈমানিক হবার স্বপ্ন ওকে কখনো রেহাই দেয়নি। স্কুলে পড়ছে, পরে কুঁদযন্ত্র চালাচ্ছে কারখানায়, সব সময়ে মন ভরিয়ে রাখত সেই স্বপ্ন। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, ও আর বিখ্যাত বৈমানিক লিয়াপিদেভ্স্কি "চেলিউস্কিন" অভিযাত্রীদের হদিশ পেয়ে উদ্ধার করল তাদের, ভদাপিয়ানভের সঙ্গে ভারী বিমান নামাল উত্তর মেরুর বরফে আর চ্কালভের সঙ্গে মেরু হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার অনাবিষ্কৃত আকাশ-পথের সূচনা করল।

কমিউনিস্ট যুব সংঘ সুদূর প্রাচ্যে পাঠায় আলেক্সেইকে, তাইগায় তরুণদের সেই সহর — আমুরতীরের কমসমলস্ক — গঠন করতে সাহায্য করে সে, কিন্তু সেই সুদূর স্থানেও বৈমানিক হবার স্বপ্নটা রয়ে গেল। নির্মাতাদের মধ্যে তার মত তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে আলাপ হল, বৈমানিক হবার স্বপ্ন দেখে তারাও, আর বিশ্বাস করা কঠিন যে নিজেদের হাতে সত্যি সত্যি তারা সেই সহরে নিজেদের জন্য একটা বিমান-ক্লাব তৈরী করল, তখন পর্যন্ত সহরটা শুধু ত নক্সার আকারে বেঁচে ছিল। সন্ধ্যায় বিরাট নির্মাণস্থানটি কুয়াশায় ভরে যেত। ব্যারাকে ফিরে যেত নির্মাতারা, জানলা বন্ধ করে দিত, ঝাঁক ঝাঁক মশা আর ডাঁশের তীক্ষ্ন বিকট গুনগুনানি হাওয়ায়. ওগুলো তাড়াবার জন্য ভিজে ডালের ধূমায়িত আগুন জ্বালানো হত দরজার বাইরে। সারা দিনের খাটুনির পরে আর সবাই বিশ্রাম করছে, বিমান-ক্লাবের সদস্যরা আলেক্সেই'র পরিচালনায় যেত তাইগাতে। ওদের গায়ে কেরসিন মাখানো, তাতে নাকি মশা আর ডাঁশেরা পালায়, হাতে কুঠার, গাঁতি, করাত, শাবল আর ডিনামাইট। সেখানে গাছ কাটত ওরা, বিস্ফোরণে গাছের গুঁড়ি-শিকড় উড়িয়ে জমি সমান করা হত — তাইগাতে একটা বিমান-ঘাঁটি তৈরী হবে, জায়গা করা হচ্ছে তারই। আর নিজের হাতে আদিম অরণ্যের কয়েক কিলোমিটার জমি ছিনিয়ে নিয়ে জায়গাটি করে নিল ওরা।

সেই বিমান-ঘাঁটি থেকেই তালিমি বিমানে চেপে প্রথম আকাশে ওঠে আলেক্সেই, ছেলেবেলার স্বপ্ন সত্যি হয় অবশেষে।

পরে বাহিনীর একটি বিমান স্কুলে পড়ে নিজে শিক্ষাদাতা হল আলেক্সেই। যুদ্ধ যখন লাগল তখন স্কুলে ছিল সে। স্কুলের কর্তৃপক্ষরা

আপত্তি করলেও চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে বিমান বাহিনীতে সে যোগ দিল। বিমান চালানোর সঙ্গে জড়িত ছিল ওর সমস্ত উৎকণ্ঠা আর আনন্দ, ভবিষ্যৎ চিন্তা, ওর সমস্ত সাফল্য।

তবুও উইলিয়াম্‌সের কথা ওরা ওকে শোনাচ্ছে!

'উইলিয়াম্‌স ত আর বৈমানিক ছিল না,' বলে আলেক্সেই দেয়ালের দিকে ফিরে শুল।

কিন্তু ওকে সাড়া দেওয়াবার চেষ্টা ছাড়ল না কমিসার। একদিন ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আলেক্সেই শুয়ে আছে, সাধারণত যেমন ও থাকত, কমিসারের ভারি গলা কানে এল:

'লিওশা, এটা পড়ো ত। তোমাকে নিয়ে লেখা।'

ইতিমধ্যেই মেরেসিয়েভের কাছে পত্রিকাটি নিয়ে আসছিল স্তেপান ইভানভিচ। ছোট একটি প্রবন্ধ, পেন্সিলে দাগ দেওয়া। তাড়াতাড়ি পাতাটাতে চোখ বোলাল আলেক্সেই কিন্তু নিজের নাম দেখতে পেল না। প্রথম মহা যুদ্ধের সময়কার রুশ বৈমানিকদের নিয়ে প্রবন্ধটি লেখা। পত্রিকার পাতা থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে নবীন একটি অফিসারের অপরিচিত মুখ, ছুঁচলো ছোট গোঁফ, মাথায় ফৌজী টুপি, তাতে শাদা একটা ব্যাজ, টুপিটা একপাশে কান পর্যন্ত নেমেছে।

'পড়ো, পড়ো, তোমার জন্য ওটা লেখা হয়েছে,' তাড়া দিয়ে বলল কমিসার।

প্রবন্ধটি পড়ল মেরেসিয়েভ। রুশ বিমান বাহিনীর একজন লেফ্‌টেনাণ্টকে নিয়ে লেখা, নাম তার ভালেরিয়ান কারপভিচ, শত্রুপক্ষের লাইনের উপরে ওড়বার সময়ে জার্মানদের দমদম গুলি পায়ে লাগে। পা ভেঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও "ফার্মানটিকে" ওদের লাইন পেরিয়ে এনে নিজের ঘাঁটিতে নামায়। একটা পায়ের পাতা কেটে ফেলতে হল, কিন্তু নবীন অফিসারটি চাইল বাহিনীতে থেকে যেতে। নিজে নক্‌সা বানিয়ে তার অনুযায়ী কৃত্রিম একটা পা তৈরী করাল সে। অনেক দিন ধরে অসীম ধৈর্যে ব্যায়াম করে সেটা ব্যবহার করতে শিখল, ফলে যুদ্ধের শেষের দিকে আবার ফিরে গেল বাহিনীতে। বাহিনীর একটি বিমান স্কুলের ইনস্পেক্টর করা হয় তাকে; প্রবন্ধটিতে লেখা হয়েছে: "মাঝেমাঝে নিজের বিমানে চেপে ওড়বার ঝুঁকিও সে নিত।" অফিসারদের সেণ্ট জর্জ ক্রুশ তাকে দেওয়া হয়, সফলভাবে বিমান বাহিনীতে কাজ চালিয়ে সে গেল, পরে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

একবার, দুবার, তিনবার প্রবন্ধটি পড়ল মেরেসিয়েভ। ক্ষীণদেহ নবীন লেফ্‌টেনাণ্টটি ক্লান্ত অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, মুখে মোটামুটি নির্ভীক হাসি, ক্লেশের স্বল্প আভাস তাতে। এদিকে সারা ওয়ার্ড একাগ্র দৃষ্টিতে মেরেসিয়েভকে লক্ষ্য করছে। চুলে তাড়াতাড়ি একবার হাত বোলাল ও; পত্রিকা থেকে চোখ নড়ছে না, বিছানার পাশের তাকে হাতড়ে একটা পেন্সিল নিয়ে প্রবন্ধটির চারিদিকে চৌকো করে বলিষ্ঠ কয়েকটা টান দিল।

'পড়েছ?' জানতে চাইল কমিসার, চোখে সেয়ানা দৃষ্টি। চুপ করে রইল আলেক্সেই, তখনো প্রবন্ধের লাইনগুলোতে চোখ বোলাচ্ছে। 'কী মনে হয় তোমার?'

'ওর কিন্তু একটা মাত্র পায়ের পাতা গিয়েছিল।'

'কিন্তু তুমি ত সোভিয়েত মানুষ।'

'ও "ফার্মান" চালাত। ওটা আবার বিমান না কি? বই'এর তাক বলা চলে। ওটা চালানো আর কি। কোন কৌশল বা দ্রুততা দরকার হত না।'

'কিন্তু সোভিয়েত মানুষ তুমি!' জোর দিয়ে আবার কমিসার বলল।

'সোভিয়েত মানুষ,' যন্ত্রের মত পুনরুক্তি করল আলেক্সেই, তখনো প্রবন্ধে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তারপর অন্তরের কী একটা আলোয় মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, একে একে সহচর রোগীদের প্রত্যেকের দিকে আনন্দ আর বিস্ময়ে ভরা চোখে ও তাকাল।

সে রাত্রে পত্রিকাটি বালিশের নিচে রেখে শুল আলেক্সেই; মনে পড়ল শৈশবে পুরোনো নরম কাপড় দিয়ে ওর জন্য একটা কুৎসিৎ ছোট ভালুক পুতুল তৈরী করে দিয়েছিলেন মা, রাত্রে ভাইদের সঙ্গে শুতে গিয়ে ও ঠিক এমনি করেই লুকিয়ে রাখত সেটাকে। কথাটা মনে পড়াতে বেশ জোরে হেসে উঠল আলেক্সেই।

সে রাত্রে এক ফোঁটা ঘুম এল না চোখে। গভীর ঘুমে মগ্ন ওয়ার্ডটি। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে গভজ্‌দেভ, গদির স্প্রিংগুলো ঝনঝন করে উঠছে। শিসের মত আওয়াজ করে স্তেপান ইভানভিচের নাক ডাকছে, যেন ওর নাড়িভুঁড়ি ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এক একবার পাশ ফিরছে কমিসার, দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কাতরোক্তি করছে। কিন্তু আলেক্সেই কিছুই শুনছে না। কিছুক্ষণ পর পর বালিশের নিচে থেকে পত্রিকাটি বের করে, প্রদীপের আলোয় লেফ্‌টেনাণ্টটির স্মিত মুখ দেখছে ও। "কঠিন কাজ ছিল তোমার,

কিন্তু করেছিলে সেটা," আলেক্সেই ভাবল। "আমার কাজ দশগুণে দুরূহ, কিন্তু আমিও পারব, দেখো তুমি!"

মধ্যরাত্রে কমিসারের নড়নচড়ন হঠাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কনুই'এ ভর দিয়ে উঠে আলেক্সেই দেখল ও বিবর্ণ ও প্রশান্তভাবে শুয়ে আছে, মনে হচ্ছে নিশ্বাস পড়ছে না। পাগলের মত ঘণ্টা বাজাল আলেক্সেই। খালি মাথায়, ঘুমন্ত চোখে, চুলের গোছা পিঠে ঝুলে পড়েছে, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা দৌড়িয়ে এল ওয়ার্ডে। কয়েক মুহূর্ত পরে হাউস সার্জনকে ডাকা হল। কমিসারের নাড়ী দেখে সে কর্পূরের ইনজেকশন দিল, অক্সিজেন ব্যাগের নল লাগাল মুখে। সার্জন আর নার্স ঘণ্টাখানেক ধরে কমিসারকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল, মনে হল কোন ফল পাচ্ছে না। অবশেষে চোখ খুলল কমিসার, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার দিকে চেয়ে ক্ষীণ হেসে, হাসিটা প্রায় দেখাই যায় না, আস্তে আস্তে বলল:

'মিছিমিছি তোমাদের এত কষ্ট দিলাম, সেজন্য দুঃখিত। নরক পর্যন্ত যেতে পারিনি, তাই তোমার মুখের দাগের ওষুধটাও আর আনা গেল না। আরো কিছুদিন তোমাকে দাগগুলো বইতে হবে দেখছি। কী করব, নিরুপায়।'

ঠাট্টাটি শুনে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওকের মত শক্ত মানুষটি, হয়ত তার মত প্রবল ঝড়ও সইতে পারবে। হাউস সার্জন বিদায় নিল, বারান্দায় তার জুতোর কিচকিচ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল; ওয়ার্ডের পরিচারিকারাও চলে গেল, শুধু থেকে গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা। কমিসারের খাটের ধারে একপাশ হয়ে বসল সে। রোগীরা ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, শুধু মেরেসিয়েভ চোখ বুজে পড়ে আছে; বিমানের পা-দানে, ফেট্টি দিয়েও হোক, নকল পাদুটো লাগানো যেতে পারবে, সে দুটোর কথা ভাবছে ও। মনে পড়ল বিমান-ক্লাবের ইনস্পেক্টরের কাছে শোনা গৃহযুদ্ধের সময়কার একটি বৈমানিকের গল্প, পাদুটো ছোট বলে বিমানের পা-দানিতে ছোট ছোট কাঠের খণ্ড লাগিয়ে নিয়েছিল সে, যাতে পায়ের নাগাল পায়।

"তোমার মতই খাসা কাজ চালাব, বৎস," কারপভিচকে ভরসা দিল আলেক্সেই। আবার উড়তে পারার কথাটায় আনন্দে বিভোর হয়ে যাচ্ছে মন, ঘুম আসছে না চোখে। চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে আছে। দেখলে মনে হয় গভীর ঘুমে মগ্ন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে একটি বাক্যালাপ কানে এল, পরে দুরূহ মুহূর্তগুলিতে একাধিকবার সেটির কথা তার মনে পড়েছে।

'কিন্তু আপনি এরকম ব্যবহার করেন কেন? যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছেন, সে সময়ে হাসি ঠাট্টা করাটা ভয়াবহ ব্যাপার মনে হয় আমার। যে কষ্টটা পাচ্ছেন সেটার কথা ভাবলে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। আলাদা ওয়ার্ডে যেতে আপনার কী আপত্তি?'

বলার ধরনে মনে হয় সুশ্রী সহৃদয় কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আবেগহীন ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা কথা বলছে না, বলছে অন্য কোন মেয়ে, আবেগে প্রতিবাদ করে, গলায় বিষাদের ছাপ, হয়ত অন্য কিছুরও। চোখ খুলল মেরেসিয়েভ। রুমাল দিয়ে ঢাকা বালবের আলোয় দেখল কমিসারের বালিশে-রাখা বিবর্ণ স্ফীত মুখ, স্নিগ্ধ দীপ্ত চোখ আর নার্সটির নরম মেয়েলী মুখের রেখা। ওর মাথার পিছনে আলো পড়াতে কোমল সোনালী চুল জ্বলছে; ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না মেরেসিয়েভ, তাকিয়ে থাকাটা ঠিক নয় সেটা জানা সত্ত্বেও।

'আহা, কেঁদো না, লক্ষ্মীটি... কিছু ব্রোমাইড দেব নাকি তোমাকে?' কমিসার বলল, যেন কোন বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কথা চলেছে।

'আবার ঠাট্টা করছেন! কী অদ্ভুত লোক আপনি! যে সময় কাঁদা উচিত সে সময়ে হাসাটা ভয়ঙ্কর, যন্ত্রণায় নিজের শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে, সে সময়ে অন্যদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ভয়ঙ্কর সেটা। আপনাকে এত ভালো লাগে! এরকম ভাবে ব্যবহার আর কক্ষণো করবেন না বলছি...'

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল নার্স। তার ক্ষীণ, শাদা কাপড়-ঢাকা কাঁধ কান্নায় থরথর করে কাঁপছে, বিষণ্ণ মমতায় সেদিকে তাকিয়ে রইল কমিসার।

'অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে,' কমিসার বলল। 'নিজের ব্যাপারে বরাবরই আমি লজ্জাকর ভাবে পিছিয়ে থাকি। অন্য সব জিনিস নিয়ে বরাবর বড্ড বেশী মাথা ঘামিয়েছি। আর এখন, মনে হয়, একেবারে দেরী হয়ে গেছে আমার।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কমিসার। মাথা তুলে নার্স তাকাল তার দিকে, চোখে জল আর ব্যাকুল প্রত্যাশা। কমিসার হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আবার, স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয় ঠাট্টার ভঙ্গীতে বলে চলল:

'গল্পটা শুনুন, লক্ষ্মী মেয়ে! গল্পটা এক্ষুণি মনে পড়ল। ওটা ঘটেছিল অনেক দিন আগে, গৃহযুদ্ধের সময়ে, তুর্কিস্তানে। অশ্বারোহী বাহিনীর একটি স্কোয়াড্রন বাসমাচের পিছু এমন তাড়া করেছিল যে হঠাৎ মরুভূমিতে

এসে পড়ল, এমন সে মরুভূমি যে ঘোড়াগুলো একে একে মরতে শুরু করল। রুশ ঘোড়া সেগুলো, মরুভূমির বালিতে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং অশ্বারোহী বাহিনী থেকে আমরা পরিণত হলাম পদাতিক বাহিনীতে। স্কোয়াড্রনের নেতা ঠিক করল যে মালপত্তর সমস্ত ফেলে, শুধু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সবচেয়ে কাছের বড়ো সহরের দিকে যাব আমরা। সহরটা একশ ষাট কিলোমিটার দূরে, বন্ধ্যা বালুর উপর দিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভাবতে পারেন, লক্ষ্মীটি! একদিন, দুদিন, তিনদিন আমাদের যাত্রা চলল। রোদে গা পুড়ে যাচ্ছে। জল নেই। মুখ এত শুকিয়ে গিয়েছে যে চামড়া ফাটছে। হাওয়ায় শুধু বালি, পায়ের নিচে কচকচে বালি, দাঁতে লাগছে বালি, খোঁচা দিচ্ছে চোখে, মুখের মধ্যে ঢুকছে। ভয়াবহ অবস্থা, সত্যি বলছি! হোঁচট খেয়ে কেউ পড়ে গেলে বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, ওঠবার ক্ষমতা নেই। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি কমিসার, তার নাম ইয়াকভ পাভলভিচ ভলাদিন, থসথসে বুদ্ধিজীবীর মত চেহারা, লোকটা ইতিহাসবিদ... কিন্তু পাকা বলশেভিক ছিল সে। দেখে মনে হত প্রথমেই ও পড়ে যাবে, কিন্তু চলতেই লাগল, অন্যদের উৎসাহ দিত। 'বেশী দূর আর যেতে হবে না, শীগগিরই ওখানে পেঁছব,' বারবার বলত। আর কেউ শুয়ে পড়লে তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বলত, 'উঠে পড়ো, নইলে গুলি করব...'

'চতুর্থ দিনে, সহর থেকে তখন আমরা প্রায় পোনেরো কিলোমিটার মাত্র দূরে, আমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। টলতে টলতে মাতালের মত এগোচ্ছি, আহত জন্তুর মত আঁকাবাঁকা পায়ের দাগ পিছনে রেখে। হঠাৎ কমিসার একটা গান ধরল। ক্ষীণ কুৎসিত গলা, গানটাও এমন কিছু নয়, পুরোনো বাহিনীতে মার্চ করে যাবার সময়ে ওটা গাইত লোকে, কিন্তু আমরা সবাই সুর মিলিয়ে গাইতে শুরু করলাম। হুকুম করলাম আমি, 'সার বেঁধে চল,' আর সেভাবে চলল ওরা। তুমি বিশ্বাস করবে না হয়ত, কিন্তু চলাটা আগের চেয়ে সহজ হল।

'ও গানটার পরে আরো একটা, তারপর আর একটা গান গাইলাম আমরা। ব্যাপারটা ভেবে দেখো! শুকনো চড়চড়ে মুখে আমরা গাইলাম, রোদের সে কী অসম্ভব ঝাঁজ। যতগুলো গান জানা ছিল সব কটা গাইলাম, শেষে সহরে পেঁছলাম আমরা. মরুভূমিতে একটিও লোক পড়ে রইল না... কী মনে নয়?'

'কমিসারের কী হল?'

'কী হল? বেঁচে আছে এখনো, বেশ ভালোই আছে। প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ও। প্রাগৈতিহাসিক বসতি সব খুঁড়ে বের করে। সত্যি, মরুভূমিতে যাত্রার ফলে গলাটি গিয়েছে ওর। ভাঙ্গা গলায় কথা বলে। কিন্তু গলার কী দরকার ওর? আচ্ছা, আর গল্প নয়। এবার আপনি যান, অশ্বারোহী বাহিনীর লোক আমি, কথা দিচ্ছি আজ রাত্রে আর মারা যাব না।'

শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল আলেক্সেই, আর স্বপ্নে দেখল একটি অদ্ভুত মরুভূমি, রক্তাক্ত ফেটে-যাওয়া মুখে গানের খেই, আর কমিসার ভর্লোদিন, স্বপ্নে কোন কারণে তাকে কমিসার ভরোবিওভের মত দেখাচ্ছে।

আলেক্সেই'র ঘুম ভাঙ্গল বেলায়। ওয়ার্ডের মাঝখানে রোদ এসে পড়েছে, তার মানে মধ্যাহ্ন, অন্তরে আনন্দের একটি অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভাঙ্গল ওর। স্বপ্ন দেখেছে? কী স্বপ্ন?.. চোখে পড়ল পত্রিকাটি, ঘুমের সময়ে শক্ত করে হাতে ধরে রেখেছিল সেটাকে। দোমড়ানো পাতায় লেফ্‌টেনাণ্ট কারপভিচের মুখে তখনো সেই ঈষৎ ক্লিষ্ট, নির্ভীক হাসি। পত্রিকাটি সযত্নে মসৃণ করে লেফ্‌টেনাণ্টকে চোখ ঠারল মেরেসিয়েভ।

কমিসারের হাতমুখ ধোওয়া আর চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছে, হাসিমুখে মেরেসিয়েভকে লক্ষ্য করছে সে।

'ওকে চোখ ঠারছ কেন?' খুসিতে জিজ্ঞেস করল কমিসার।

'আবার বিমান চালাব আমি,' জবাবে বলল আলেক্সেই।

'কেমন করে? ওর ত একটা পা ছিল, তোমার ত দুটোই গিয়েছে।'

'আমি যে সোভিয়েত, রুশ!' সাড়া দিল আলেক্সেই।

কথা বলার ঢঙে একটা দৃঢ় আস্থার ভাব ছিল যে লেফ্‌টেনাণ্ট কারপভিচকেও ছাড়িয়ে যাবে সে, আবার উড়বে।

সেদিন প্রাতরাশের সময়ে পরিচারিকার আনা সবকিছু খাবার খেল আলেক্সেই, খালি প্লেটগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আরো খেতে চাইল। ছটফটে উত্তেজিত ভাব ওর, গান গাইছে, চেষ্টা করছে শিস দেবার, নিজের সঙ্গে জোরে তর্ক চলছে। অধ্যাপক রোঁদে এলেন, ওর প্রতি তাঁর বিশেষ নেকনজরের সুযোগ নিয়ে আলেক্সেই নানা প্রশ্নে তাঁকে উত্যক্ত করে তুলল, তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে গেলে কী কী অবশ্য কর্তব্য, প্রশ্নগুলো সে বিষয়ে। অধ্যাপক বললেন আরো বেশী খাওয়া আর ঘুমোনো দরকার তার। তারপরে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে দ্বিতীয় পদের খাবার দুবার চেয়ে নিল আলেক্সেই,

জোর করে চারটে কাটলেট খেল। খাবার পর প্রায় দেড় ঘণ্টা চোখ বুজে রইল শুয়ে, কিন্তু চট করে ঘুম এল না।

সুখে লোকের আত্মানুরাগ বাড়ে। অধ্যাপককে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার সময়ে সারা ওয়ার্ডের দৃষ্টি কীসে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল সেটা লক্ষ্য করেনি আলেক্সেই। মেঝের পার্কেটের একটা টুকরো উধাও, সূর্যের আলো ওয়ার্ডের সারা মেঝে আস্তে আস্তে অতিক্রম করে ঠিক সে জায়গাটাতে এসে পড়েছে, অধ্যাপক ঘরে এলেন, যথারীতি সঠিক সময়ে। আগেকার মতই অবাহিত তিনি, কিন্তু সবাই লক্ষ্য করল ওঁর মুখে একটা অভূতপূর্ব অন্যমনস্কতার ছাপ। অন্য দিনের মত বকাবকি করলেন না তিনি, ফোলা চোখের কোণে শিরগুলো দবদব করছে ক্রমাগত। সন্ধ্যাবেলায় রোঁদে যখন এলেন তখন মনে হল শুকনো দেখাল তাঁকে, মনে হল বেশ বুড়িয়ে গিয়েছেন। দরজার হাতলে ঝাড়ন ফেলে রাখার জন্য পরিচারিকাকে নিচু গলায় ধমকালেন, দেখলেন কমিসারের জ্বরের চার্ট, তার জন্য কী একটা ওষুধের নির্দেশ করে নিঃশব্দে গেলেন বেরিয়ে, পিছু পিছু অনুচরবর্গ, তারাও চুপচাপ, বিচলিত দেখাচ্ছে তাদের। দোরগোড়ায় হোঁচট খেয়ে অধ্যাপক আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিলেন, একজন ওঁর কনুই ধরে সামলাল। লম্বা-চওড়া, ভগ্নকণ্ঠ, দুর্দান্ত, নিয়মনিষ্ঠ এই মানুষটিকে চুপচাপ আর অমায়িক হওয়াটা মানাত না। বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি, ৪২ নং ওয়ার্ডের রোগীরা বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। চওড়া, দিলদরাজ মানুষটিকে সবাই তারা ভালোবাসত, ওঁর পরিবর্তনে সবাই উদ্বিগ্ন।

পরিবর্তনের কারণটি কী পরদিন সকালে জানা গেল। পশ্চিম রণাঙ্গনে মারা গিয়েছে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের একমাত্র সন্তান, তারো নাম ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, সেও ছিল ডাক্তার, উদীয়মান বিজ্ঞানী, বাপের গর্ব আর আনন্দের উৎস। নির্দিষ্ট সময়ে সারা হাসপাতাল রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে, অধ্যাপক তাঁর নিয়মিত রোঁদে আসবেন কিনা। ৪২ নং ওয়ার্ডে সবাই একাগ্রভাবে তাকিয়ে আছে মেঝের উপরে আলোর টুকরোটার মন্থর, প্রায় অগোচর গতির দিকে। অবশেষে সেটা এসে পড়ল সেই জায়গাটিতে যেখানে পার্কেটের টুকরোটা নেই, আর সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, ভাবটা এই যে অধ্যাপক তাহলে আর আসছেন না। কিন্তু সেই মুহূর্তে শোনা গেল করিডরে পরিচিত ভারী পায়ের শব্দ, সঙ্গে আসছে বহুসংখ্যক অনুচরবর্গ। অধ্যাপককে এমন কি আগের চেয়ে একটু ভালো দেখাচ্ছে। অবশ্য চোখগুলো লাল,

চোখের পাতা আর নাক ফোলা ফোলা, খুব সর্দি হলে যেমন হয়; টেবিল থেকে কমিসারের জ্বরের চার্ট তুলে নেবার সময়ে ওঁর মোটা খসখসে হাতটা বেশ কেঁপে উঠল, কিন্তু আগেকার মতই কর্মতৎপর আর উদ্যমী তিনি। গোলমেলে ভাব আর ধমকানির ঝোঁকটা, যা হোক, আর নেই।

সর্বসম্মতিক্রমে যেন সেদিন আহতরা এবং অন্যান্য রোগীরা অধ্যাপককে খুসি করার জন্য পাল্লা দিয়ে যথাসাধ্য করল। প্রত্যেকে তাঁকে বলল যে ভালো আছে, এমন কি যাদের অবস্থা বেশ খারাপ তাদেরো অভিযোগ নেই কোন, বরঞ্চ তারা জানাল যে আরোগ্যের পথে তারা। হাসপাতালের ব্যবস্থার গুণগান সমস্বরে করল সবাই, নানা চিকিৎসা প্রথা যে অলৌকিক ফলাফল দিচ্ছে সেটা ত স্পষ্ট। হাসপাতালটি সেদিন বিপুল ও সমান শোকে ব্যথিত ঘনিষ্ঠ একটি পরিবার।

আজকের সকালের এই অসামান্য সাফল্যের কারণ কী, ওয়ার্ড ঘুরতে ঘুরতে অবাক হয়ে ভাবছিলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

সত্যি কি অবাক হয়েছিলেন? নিঃশব্দ, অকপট ষড়যন্ত্রটি হয়ত তাঁর কাছে ধরা পড়ে, ধরা পড়াতে হয়ত নিজের গভীর অনারোগ্য ব্যথা বহন করা সহজতর হয় তাঁর।

৯

পুবমুখো জানলাটার বাইরে পপলারগাছের শাখাটায় ইতিমধ্যেই কচি কচি পাতলা-হলুদ চটচটে পাতা গজিয়েছে, পাতার নিচে লাল, পেঁজা তুলোর মত নরম ফুলের ছড়ি, দেখতে মোটা শুঁয়াপোকার মত। সকালে সূর্যের আলোয় পাতাগুলো চিক চিক করে, মনে হয় অয়েল-পেপারে তৈরী। নোনতা তাজা ভাবের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বায়ুচলাচলের খোলা ছোট জানলাটা ভেদ করে আসে, ওয়ার্ড থেকে হাসপাতালের সব গন্ধ দেয় ছাপিয়ে।

স্তেপান ইভানভিচের বদান্যতায় হৃষ্টপুষ্ট চড়ুইগুলোর বেয়াড়াপনা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে আজকাল। "সাব-মেসিনগানারের" নতুন লেজ গজিয়েছে একটা, তার হৈহৈ আর কোঁদলপ্রিয়তা আরো বেড়ে গিয়েছে। সকালে জানলার বাইরের ঝনকাঠে ওদের সভা বসে, এত কিচির মিচির চলে যে ওয়ার্ড পরিষ্কার করতে এসে পরিচারিকা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, গজগজ করতে করতে জানলায় উঠে ঝাড়ন দিয়ে তাড়ায় ওদের।

মস্কো নদীতে বরফ নেই আর। উন্দামতায় কাটল কয়েকদিন, তারপর শান্ত হয়ে এল নদীটি, ফিরে এল পাড়ে, চওড়া বুক বাধ্যভাবে মেলে দিল জাহাজ, বজরা আর স্টীমারের চলাচলের জন্য; মোটরযানের সংখ্যা দুর্দিনে মহানগরীতে অনেক কমে গিয়েছিল, নদীর যানবাহন সে অভাব মেটাতে সাহায্য করত। কুকুশকিনের ভয়াল ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, ৪২ নং ওয়ার্ডের কেউই বসন্তের বন্যায় "ভেসে গেল" না। কমিসার ছাড়া প্রত্যেকেরই অবস্থা ভালোর দিকে, কখন হাসপাতাল ছাড়বে, বেশীর ভাগ সময়েই কথাবার্তা চলত তা নিয়ে।

ওয়ার্ড ছেড়ে প্রথমে গেল স্তেপান ইভানভিচ। যাবার আগের দিন উৎকণ্ঠায়, আনন্দে আর উত্তেজনায় হাসপাতালে ঘুরে বেড়াল সে। একদণ্ড স্থির হয়ে আর থাকতে পারছে না। করিডরে কয়েকজন রোগীর সঙ্গে কথা বলে ওয়ার্ডে ফিরে আসতে আসতে জানলার ধারে বসে ছুরি দিয়ে কিছু একটা বানাতে শুরু করে, তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে বাইরে চলে গেল। সন্ধ্যেবেলায় শুধু, প্রদোষ হয়ে এসেছে, জানলার ঝনকাঠে উঠে বসে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল স্তেপান ইভানভিচ। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। রোগীদের নানা চিকিৎসার সময় এটা, ওয়ার্ডে মাত্র দুজন অন্য রোগী তখন— কমিসার, স্তেপান ইভানভিচকে নিঃশব্দে দেখছে সে, আর মেরেসিয়েভ, প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করছে সে।

সব চুপচাপ। হঠাৎ কমিসার স্তেপান ইভানভিচের দিকে মুখ ঘোরাল, সূর্যাস্তের শেষ আলোয় ওর ছায়া স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে - - অনুচ্চকণ্ঠে বলল:

'গাঁয়ে গোধূলি এখন, সব শান্ত, কী শান্ত আহা! গলন্ত মাটি, স্যাঁতসেঁতে সার আর ধোঁয়ার গন্ধ। গোয়ালে গরুটা খড়ের গাদায় পা ঠুকছে, ছটফট করছে, বাছুর হবার সময় এসে পড়েছে। বসন্ত... ক্ষেতে মেয়েরা সার দিতে পেরেছে কিনা কে জানে! আর বীজ আর ঘোড়ার সাজ? তোমার কি মনে হয় সব ঠিক চলছে?'

মেরেসিয়েভের মনে হল কমিসারের স্মিত মুখের দিকে বিস্ময়ে নয়, সভয়ে তাকিয়ে স্তেপান ইভানভিচ জবাব দিল:

'অন্যেরা কী ভাবছে সেটা যাদুকরের মত আপনি ধরে ফেলেন দেখছি, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার!.. হ্যাঁ, মেয়েদের ব্যবহারিক বুদ্ধি বেশ প্রখর, সেটা সত্যি বটে, কিন্তু আমাদের ছাড়া ওরা কী করে চালাচ্ছে সেটা শুধু শয়তান জানে... সত্যি এটা।'

আবার সবাই চুপচাপ। নদীতে একটি জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল, তার ধ্বনি প্রতিধ্বনি জলের উপরে গড়িয়ে গ্রানিটের পাড়ে পাড়ে মুখর হয়ে উঠল।

'যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি থেমে যাবে তোমার মনে হয়?' কী কারণে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল স্তেপান ইভানভিচ। 'শরৎকালের আগেই কী থেমে যাবে?'

জবাবে কমিসার বলল:

'তাতে তোমার কী? তোমার বয়সের লোকদের বাহিনীতে ডাকা হয়নি। তুমি ত স্বেচ্ছাসৈনিক। যুদ্ধে তোমার যা করবার ছিল তা করেছ। দরখাস্ত করলেই তোমাকে ওরা ছেড়ে দেবে, তখন মেয়েদের পরিচালনার ভার নিতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনেও অভিজ্ঞ লোকেদের দরকার, নয় কি? কী বল তুমি, দাড়িওয়ালা?'

কথাগুলো বলবার সময়ে এমন সহৃদয়ভাবে তাকাল কমিসার যে বুড়ো সৈনিকটি জানলার ঝনকাঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল অস্থির উত্তেজনায়।

'বাহিনী ছেড়ে দিতে বলছ, বটে!' বলে উঠল সে। 'আমিও ভাবছিলাম তাই। মনে মনে বলছিলাম: কমিশনে দরখাস্ত করলে কী হয়? তিনটে যুদ্ধে ত এপর্যন্ত যোগ দিয়েছি — সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, আর এই যুদ্ধের কিছুটা। হয়ত সেটাই যথেষ্ট, কী বলো? আমার কী করা উচিত বলো ত, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার?'

'দরখাস্তে বলো যে যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে মেয়েদের সঙ্গে কাজ করার জন্যে বাহিনী থেকে ছাড়া পেতে তুমি চাও। জার্মানদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে অন্য লোক ত আছে!' নিজেকে সামলাতে না পেরে বিছানা থেকে চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ।

অপরাধীর মত তার দিকে তাকাল স্তেপান ইভানভিচ। রাগতভাবে ভুরু কুঁচকিয়ে কমিসার বলল:

'তোমাকে কী বাতলাব জানি না, স্তেপান ইভানভিচ। তোমার অন্তর কী চায় ভেবে দেখো। রুশ অন্তর ত তোমার। উচিত পরামর্শ দেবে সেটা।'

পরের দিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল স্তেপান ইভানভিচ। সামরিক পোশাকে সবাইকে বিদায় জানাতে ওয়ার্ডে এল সে। বেঁটেখাটো মানুষ, ধুয়ে ধুয়ে পুরোনো টিউনিকের রং চটে শাদা হয়ে গিয়েছে, কোমরে আঁটো করে বেল্ট জড়ানো, এত টেনে সেটা পরেছে যে সামনে টিউনিকে একটুও ভাঁজ পড়েনি, বয়সের তুলনায় অন্তত পোনেরো বছর কম দেখাচ্ছে ওকে। বুকে

ঝকঝকে পালিশ-করা "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" স্বর্ণপদক, "অর্ডার অব লেনিন" আর "সাহসের জন্য" প্রাপ্ত পদক। হাসপাতালের ওভারঅল বর্ষাতির মত কাঁধে ঝোলানো। ওর আপাদমস্তক, বাহিনীর পুরোনো উঁচু বুটের কোণ থেকে শুরু করে বিশেষ কায়দায় ছুঁচলো-করা গোঁফজোড়ার কোণগুলো পর্যন্ত মনে করিয়ে দেয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার ক্রিসমাস কার্ডে ছাপানো চটপটে রুশ সৈনিকদের কথা।

ওয়ার্ডের সহচরদের প্রত্যেকের কাছে এগিয়ে এসে বিদায় নিল সে, সামরিক পদ হিসেবে প্রত্যেককে সম্বোধন করে এত সুষ্ঠুভাবে পা ঠুকে বিদায় নিল যে ওকে দেখলে খুসিতে মন ভরে যায়।

'বিদায় নিতে দিন, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার।' কোণের বিছানাটার কাছে এসে বিশেষ খুসির সুরে বলল স্তেপান ইভানভিচ।

'বিদায়, স্তিওপা, শুভ যাত্রা কামনা করি,' উত্তর দিল কমিসার, কষ্ট হলেও পাশ ফিরে সৈনিকটির দিকে তাকাল সে।

হাঁটু গেড়ে বসে কমিসারের বড়ো বড়ো হাত নিজের হাতে নিল সে; আর প্রাচীন রুশ কায়দায় ওরা পরস্পরকে চুম্বন করল তিনবার।

'সেরে ওঠ, সেমিওন ভাসিলিয়েভিচ! ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ আর দীর্ঘজীবী করুন। সোনার মত খাঁটি তোমার অন্তঃকরণ! আমাদের সবায়ের কাছে বাপের চেয়েও বেশী তুমি ছিলে। আমরণ তোমাকে মনে থাকবে...' গভীর আবেগে অনুচ্চকণ্ঠে বলল সৈনিকটি।

'এবারে আপনি যান, স্তেপান ইভানভিচ! উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ভালো নয়,' সৈনিকের আস্তিনে টান দিয়ে বলল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা।

'আর আপনাকে আদরযত্নের জন্যে ধন্যবাদ জানাই, নার্স,' গভীর আন্তরিকতায় বলল স্তেপান ইভানভিচ, বিশেষ শ্রদ্ধায় অভিবাদন জানাল তাকে। 'সোভিয়েত দেবী আপনি, সত্যি বলছি...'

আর কী বলবে ভেবে না পেয়ে এবারে বিব্রতভাবে দরজার দিকে হটে গেল স্তেপান ইভানভিচ।

'কী ঠিকানায় তোমাকে চিঠি লিখব, সাইবেরিয়ায়?' হেসে জিজ্ঞেস করল কমিসার।

'কী বলব, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার? কর্মরত সৈনিককে কোন ঠিকানায় লিখতে হয়ে সেটা ত জানেন,' বিব্রতভাবে জবাব দিল স্তেপান

ইভানভিচ, আবার সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে দরজার ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়ার্ডে স্তব্ধতা নেমে এল, মনে হল সেখানে কেউ নেই। কিছুক্ষণ পরে আবার নিজেদের রেজিমেণ্ট, বন্ধুবান্ধব আর যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব বড়ো অভিযানের সম্মুখীন ওরা হবে, সে বিষয়ে কথাবার্তা চলল। সবাই ত এখন সেরে উঠছে, সুতরাং ওগুলো আর স্বপ্ন নয়, কাজের আলোচনা। ইতিমধ্যেই কুকুশকিন করিডরে হেঁটে বেড়াতে পারে, সেখানে গিয়ে নার্সদের খুঁত ধরে, অন্য রোগীদের জ্বালায়, তাদের মধ্যে অনেকেরই সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। ট্যাঙ্ক-অফিসারও আর শয্যাশায়ী নয়, করিডরের আয়নাটার সামনে প্রায়ই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মুখ, গলা আর ঘাড় খুঁটিয়ে দেখে, ব্যাণ্ডেজ আর নেই, ঘাগুলো শুকিয়ে আসছে। আনিউতার সঙ্গে পত্রবিনিময় যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ব্যাপারের বিষয়ে জ্ঞান যত বাড়ছে ততই বেড়ে যাচ্ছে নিজের ঝলসে-যাওয়া বিকৃত মুখটাকে খুঁটিয়ে দেখাটা। গোধূলির সময়ে বা স্বল্পালোকিত ওয়ার্ডে নেহাৎ মন্দ দেখায় না মুখটা, বরঞ্চ ভালোই লাগে: পরিষ্কার গড়ন, প্রশস্ত কপাল, নাকটা ছোট আর একটু বাঁকা, ছোট, কালো গোঁফ, হাসপাতালে থাকার সময়ে রেখেছে সেটা, আর তাজা তেজী যোয়ান ঠোঁট। কিন্তু উজ্জ্বল আলোয় চোখে পড়ে ওর মুখ ক্ষতচিহ্নে কীর্ণ, সেগুলোর চারপাশে চামড়া কুঁচকিয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। উত্তেজিত হলে, অথবা স্নান-চিকিৎসার পরে মুখে রক্তাভা নিয়ে ফিরে আসার সময় ক্ষতচিহ্নগুলোয় এত বীভৎস দেখায় ওকে যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে কান্না পেয়ে আসে ওর। ওকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াসে মেরেসিয়েভ বলল:

'মুখ গোমড়া করে আছ কেন? সিনেমায় অভিনয় করার মৎলব ত নেই তোমার, আছে কি? তোমার সেই মেয়েটি সাচ্চা হলে এতে তার কিছু এসে যাবে না। আর যদি এসে যায় তাহলে বুঝতে হবে ও গবেট। তখন ওকে বোলো গোল্লায় যেতে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে তুমি। খাঁটি আর কাউকে পাবে।'

'সব মেয়েই সমান,' বলে উঠল কুকুশকিন।

'আর আপনার মা?' জিজ্ঞেস করল কমিসার, ওয়ার্ডে একমাত্র কুকুশকিনকেই "আপনি" বলে সম্বোধন করে সে।

শান্ত প্রশ্নটিতে লেফ্‌টেনাণ্টের যে প্রতিক্রিয়া হল সেটা বর্ণনা করা

কঠিন। বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসল সে, চোখ দারুণ জ্বলে উঠল, মুখ কাগজের চেয়ে শাদা।

'এই দেখুন, এই দেখুন! তাহলে দেখছেন ত দুনিয়াতে ভালো মেয়েও আছে,' আপোস করার সুরে বলল কমিসার। 'গ্রিশার কপাল খুলবে না, কেন সেটা আপনার মনে হয়? জীবনে সব সময়েই ঘটে এটা: যারা চায় তারা পায়।'

সংক্ষেপে, সমস্ত ওয়ার্ডে আবার প্রাণচঞ্চলতা ফিরে এল। একমাত্র কমিসারের অবস্থা সমানে খারাপের দিকে চলেছে। মরফিয়া আর কর্পূর দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তার ফলে মাঝেমাঝে দিনের পর দিন ওষুধের ঘোরে আধো-আচ্ছন্ন অবস্থায় বিছানায় ছটফট করে সে। স্তেপান ইভানভিচ চলে যাবার পর আরো তাড়াতাড়ি কাহিল হয়ে পড়ছে কমিসার। মেরেসিয়েভ অনুরোধ করল ওর খাটটা যেন কমিসারের খাটের আরো কাছে রাখা হয়, দরকার হলে যাতে সাহায্য করতে পারে। যত দিন যাচ্ছে কমিসারের প্রতি তত আকৃষ্ট হচ্ছে মেরেসিয়েভ।

আলেক্সেই জানত যে পা নেই বলে অন্যদের তুলনায় ওর জীবনযাত্রা অনেক কঠিন আর জটিল হবে, সেজন্য টান তার কমিসারের দিকে; কী করে সত্যি সত্যি বাঁচতে হয় সেটি জানে মানুষটি, নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যদের টানে চুম্বকের মত। আজকাল কমিসারের আধো-আচ্ছন্ন অবস্থা কদাচিৎ কাটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এলে ঠিক আগেকার মতই ব্যবহার করে সে।

একদিন, সন্ধ্যা ঘন হয়েছে, হাসপাতালের সাড়াশব্দ গিয়েছে মিলিয়ে, স্তব্ধতা ভাঙ্গছে শুধু ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রোগীদের অস্ফুট ক্ষীণ নাকডাকার শব্দ, কাতরোক্তি আর বিকারের প্রলাপে, এমন সময়ে করিডরে শোনা গেল পরিচিত পায়ের ভারী জোরালো শব্দ। দরজার কাচ দিয়ে মেরেসিয়েভের চোখে পড়ে স্বল্পালোকিত করিডরের সবটা, একেবারে ওধারে টেবিলের কাছে বসে একটি নার্স সোয়েটার বুনে চলেছে বিনা ছেদে। করিডরের শেষে দেখা গেল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের দীর্ঘ দেহ, হাতদুটো পিছনে মুড়ে আস্তে আস্তে হাঁটছেন। লাফিয়ে উঠল নার্সটি, কিন্তু বিরক্তির ভঙ্গীতে হাতের ইশারায় তাকে সরিয়ে দিলেন তিনি। ঢিলে কোটটা খোলা, খালিমাথা, কপালে নেমে এসেছে ভারী পাকা চুলের গোছা।

'ভাসিয়া আসছে,' ফিসফিসিয়ে মেরেসিয়েভ বলল কমিসারকে,

তাকে এতক্ষণ বিশেষ ধরনের কৃত্রিম পায়ের নিজস্ব নক্‌সা একটা বোঝাচ্ছিল সে।

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ থমকে দাঁড়ালেন, যেন কোন বাধা পেয়েছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে সামলালেন নিজেকে, কী যেন বললেন বিড়বিড় করে, তারপর দেয়াল ছেড়ে দিয়ে ৪২ নং ওয়ার্ডে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কপালটা রগড়াতে লাগলেন, যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন। মুখে মদের গন্ধ।

'একটু বসুন, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, গল্পগুজব করা যাক,' বলল কমিসার।

পা টেনে টেনে খাটের কাছে গিয়ে অধ্যাপক খাটে ধপাস করে বসলেন, স্প্রিংগুলো কিঁচকিঁচ করে উঠল, তারপর রগ ঘষতে লাগলেন তিনি। এর আগে রোঁদের সময়ে কমিসারের খাটের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি প্রায় যুদ্ধ কী ভাবে চলছে সে বিষয়ে কথা বলতেন। এটা সবাই জানত যে রোগীদের মধ্যে কমিসারকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি, তাই সন্ধ্যা ঘন হয়ে গেলে তাঁর আসাটা বিচিত্র ছিল না মোটেই। কিন্তু মেরেসিয়েভের মনে হল এদের দুজনের কোন গোপন কথা আছে, তাই সে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল।

'আজ ২৯শে এপ্রিল... ওর জন্মদিন। ওর বয়স এখন — না, বেঁচে থাকলে ওর বয়স হত... ছত্রিশ,' অনুচ্চকণ্ঠে বললেন অধ্যাপক।

অনেক কষ্টে নিজের বড়ো ফোলা হাত কম্বলের নিচ থেকে বের করে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের হাতে রাখল কমিসার। অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার ঘটল: কেঁদে ফেললেন অধ্যাপক। লম্বা-চওড়া মানুষটি কাঁদছে, সেটা দেখাটাও কষ্টকর। স্বতই ঘাড় গুঁজে, কম্বলে মাথা চাপা দিল আলেক্সেই।

'ফ্রন্টে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল,' অধ্যাপক বলে চললেন। 'আমাকে বলল যে জনগণের স্বেচ্ছা সেনাদলে যোগ দিয়েছে, ওর কাজের ভার অন্য কাউকে দেবার অনুরোধ করল আমাকে। এখানে আমার সঙ্গে ও কাজ করত। এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে চেঁচামেচি করেছিলাম। কিছুতেই মাথায় ঢোকেনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্ডিডেট পদবী প্রাপ্ত একজন, প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী একজন, কেন রাইফেল ঘাড়ে নেবে। কিন্তু ও বলল — প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে — ও বলল, "বাবা, মাঝেমাঝে এমন সময় আসে যখন চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্ডিডেটও রাইফেল না ধরে পারে না।" কথাটা বলে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আমার জায়গায় কে আসবে?"

আমি যদি একবার শুধু টেলিফোন করতাম তাহলে কিছুই ঘটত না, বুঝতে পারছেন, কিছুই ঘটত না? সামরিক হাসপাতালের একটা বিভাগের ভার ত ওর ওপরে ছিল... ঠিক বলছি না?'

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ থামলেন, নিশ্বাস পড়ছে কষ্টে, গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন:

'...ওটা করবেন না। হাতটা সরিয়ে নিন। নড়াচড়া করলে আপনার কষ্ট যে কী রকম বাড়ে জানি... হ্যাঁ, সারা রাত বসে রইলাম, কী করা উচিত ভাবলাম। আর একজনের কথা আমার জানা ছিল — কার কথা বলছি আপনি জানেন ত — তার একটি ছেলে ছিল, ছেলেটি অফিসার, যুদ্ধের প্রথমেই মারা যায়। ওর বাবা কী করল জানেন? দ্বিতীয় ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাল, জঙ্গী বিমানচালক হিসেবে পাঠাল, যুদ্ধের সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল পেশা এটা... সেই লোকটির কথা তখন মনে পড়ে গেল, আর যা ভাবছিলাম তার জন্যে লজ্জিত লাগল, তাই টেলিফোন আর করা হল না...'

'সেজন্যে আপনি কি এখন দুঃখিত?'

'না। এটাকে কি দুঃখিত হওয়া বলা চলে? আমি নিজেকে খালি জিজ্ঞেস করি: আমার একমাত্র সন্তানকে তাহলে কি আমিই খুন করেছি? আমার সঙ্গে এখানে এখনো থাকতে পারত ও, আমরা দুজনে দেশের জন্যে বিশেষ জরুরী কাজ করতে পারতাম। সত্যিকারের প্রতিভা ছিল ওর — বলিষ্ঠ, দুঃসাহসী, উজ্জ্বল প্রতিভা। সোভিয়েত চিকিৎসা বিভাগের গর্ব করবার মত লোক হতে পারত ও — যদি সে সময়ে একবার শুধু টেলিফোন করতাম!'

'টেলিফোন করেননি বলে আপনি কি দুঃখিত?'

'কী বলতে চাইছেন?... আমি জানি না। জানি না আমি।'

'আচ্ছা ধরুন, সে-রকম সময় ফিরে এলে কি টেলিফোন করবেন?'

কোন কথাবার্তা নেই। রোগীদের নিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। সমানভাবে খাটটা কিঁচকিঁচ করছে, বোঝা গেল গভীর চিন্তায় আমগ্ন অধ্যাপক এপাশ ওপাশ দুলছেন, আর ঘর গরম রাখার নলগুলোর মধ্যেকার আওয়াজ।

'কী মনে হয়?' বোধে ও সমবেদনায় গভীর সুরে আবার জিজ্ঞেস করল কমিসার।

'জানি না... কী জবাব দেব জানি না। জানি না আমি। কিন্তু মনে হয় সবকিছু যদি আবার একই ভাবে ঘটে তাহলে আগে যা করেছিলাম তাই

করব। অন্যান্য বাপেদের মতই ত আমি, দোষেগুণে তাদেরি মত... যুদ্ধ কী ভয়াবহ ব্যাপার...'

'আর বিশ্বাস করুন, দারুণ দুঃসংবাদ সহ্য করাটা অন্যান্য বাপেদের পক্ষে আপনার চেয়ে সহজ নয়। মোটেই সহজ নয়।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। কী ভাবছেন তিনি, মন্থর মুহূর্তগুলিতে তাঁর প্রশস্ত বলিকীর্ণ কপালের পিছনে জোট পাকাচ্ছে কী সব ভাবনা?

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন,' অবশেষে বললেন তিনি। 'ওর পক্ষে সহজতর ছিল না, তবু মেজ ছেলেকে ত যুদ্ধে পাঠিয়েছিল... ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ, বন্ধু! সত্যি ত, করবার কিছু নেই এ ব্যাপারে...'

খাট থেকে উঠে, আস্তে আস্তে কমিসারের হাত কম্বলের নিচে রেখে, কম্বলটা ভালো করে গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

গভীর রাত্রে কমিসারের অবস্থা আবার বিশেষ খারাপ হল। জ্ঞান নেই, দাঁতে দাঁত চেপে বিছানায় ছটফটানি, বেশ জোরে গোঙানি। তারপর চুপ করে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে টান হয়ে শুয়ে থাকাতে সবাই ভাবল সব শেষ। ছেলের মৃত্যুর পরে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ নিজের ফাঁকা বড়ো ফ্ল্যাট ছেড়ে হাসপাতালে তাঁর ছোট অফিস-ঘরে চলে এসেছিলেন, সেখানে অয়েলক্লথ-দেওয়া একটা সোফায় শুতেন; কমিসারের অবস্থা এত খারাপ হল যে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ ওর বিছানাকে পর্দা দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন, সবাই জানে সেটার মানে হল রোগীকে হয়ত "৫০ নং ওয়ার্ডে" নিয়ে যাওয়া হবে।

কর্পূর আর অক্সিজেন দেওয়ার ফলে কমিসারের নাড়ী ফিরে এল আবার; রাত্রের সার্জন ও ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ চলে গেলেন যতটুকু পারেন ঘুমোতে, ভোর হতে বিশেষ আর দেরী নেই। পর্দার আড়ালে রোগীর বিছানার পাশে বসে রইল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, অশ্রুসিক্ত উৎকণ্ঠিত মুখে। ঘুম এল না মেরেসিয়েভের। আতঙ্কে খালি ভাবল সে, "তাহলে সত্যিই কি ও মারা যাবে?" স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কমিসার তখনো পর্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর। বিকারের ঘোরে সে বকছে, বারবার বলছে একটি কথা, মেরেসিয়েভের মনে হল ও বলছে:

'জল দাও আমাকে জল দাও...'

ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার মনে হল কমিসার জল খেতে চাইছে, পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কম্পিত হাতে গেলাসে জল ঢেলে নিল সে।

কিন্তু জল খেতে রোগী চায়নি। দাঁতে লেগে গেলাসটা শব্দ করে উঠল আর জল ছপাৎ করে বালিশে পড়ল। তখনো ও বলে চলল "দাও" গোছের কথাটা, কখনো আদেশের, কখনো অনুনয়ের সুরে। হঠাৎ মেরেসিয়েভ বুঝতে পারল কথাটা "দাও" নয়, "বাঁচতে দাও", বুঝতে পারল শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বিরাট মানুষটি লড়াই করছে মৃত্যুর সঙ্গে।

একটু পরে শান্ত হয়ে এল কমিসার, চোখ খুলল।

'ভগবানকে ধন্যবাদ,' অনুচ্চকণ্ঠে বলে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা স্বস্তিতে পর্দাটা ভাঁজ করতে শুরু করল।

'ওটা থাক, দোহাই তোমার!' বাধা দিয়ে কমিসার বলে উঠল। 'ওটা নিয়ে যেও না, লক্ষ্মীটি। ওটা থাকলে বেশী আরাম লাগে। আর কাঁদবেন না, এমনিতে পৃথিবীতে অনেক যন্ত্রণা আছে... কেন কাঁদছেন, সোভিয়েত দেবী!.. শুধু শুধু ওই জায়গাটার দোরগোড়ায় দেবীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, কী আফসোসের ব্যাপার সেটা।'

১০

নতুন একটি অনুভূতি আলেক্সেই'র মনে, এরকম অনুভূতি আগে তার কখনো হয়নি।

যে মুহূর্ত থেকে সে বিশ্বাস করতে শুরু করল যে পায়ের পাতা না থাকলেও চেষ্টা করে আবার বিমান চালানো সম্ভব, আবার বৈমানিক হতে পারে সে, সে মুহূর্ত থেকে সক্রিয় জীবনের অদম্য স্পৃহায় ও আচ্ছন্ন।

জীবনে ওর একমাত্র লক্ষ্য এখন জঙ্গীবিমান আবার চালানো। পার্টিজানদের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে পৌছবার সময়ে যে অসম্ভব দৃঢ়তা সে দেখিয়েছিল, ঠিক সেরকম দৃঢ়তায় এখন লক্ষ্যবস্তুর দিকে আবার এগোচ্ছে সে। কৈশোর থেকে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে চলা ওর অভ্যাস, এখন প্রথমেই সুনিশ্চিতভাবে ঠিক করে নিল যে সিদ্ধির জন্য কী সাধনা করা তার অবশ্যকর্তব্য, সময় নষ্ট না করে। আর তাই ঠিক করল যে প্রথমে দরকার তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা, অনাহারের জন্য শক্তিহ্রাস হয়েছিল, দরকার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া, আর সেজন্য বেশী খেতে হবে, ঘুমোতে হবে বেশী। দ্বিতীয়ত,

বৈমানিকের জঙ্গী গুণ ফিরে পেতে হবে, শয্যাশায়ী রোগীর পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা ব্যায়াম করতে হবে তাকে, যাতে শরীর গড়ে ওঠে আবার। তৃতীয়ত, সবচেয়ে জরুরী আর দুঃসাধ্য এটা, পাদুটোর যতটুকু আছে ততটুকু দিয়ে তালিম নিতে হবে, যাতে তাদের শক্তি আর সক্রিয়তা বজায় থাকে; পরে নকল পা পেলে সেদুটো পরে বিমান চালানো শিখতে হবে।

পায়ের পাতা না থাকলে এমন কি হাঁটাও সহজ নয়। মেরেসিয়েভ কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে বিমান চালাবে, যেমন-তেমন বিমান নয়, জঙ্গী বিমান। আকাশ-যুদ্ধে বিশেষ করে সবকিছুর হিসেব মুহূর্তের ভগ্নাংশে মাপাজোকা, স্বভাবসিদ্ধ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতই স্বতঃস্ফূর্ত হতে হয় প্রতিটি নড়নচড়ন, হাতে যেমন কাজ করা যায় তেমন পাদুটোকেও নির্ভুল নিপুণভাবে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ঠিক তেমন দ্রুতবেগে চালাতে হয়। এমন ভাবে নিজেকে তৈরী করতে হবে যাতে পায়ে লাগানো চামড়া আর কাঠের টুকরোগুলো শরীরের জীবন্ত অংশগুলির মতই জটিল কাজ সব করতে পারে।

যারা বিমানচালনা প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত তাদের কাছে অসম্ভব মনে হবে এটা, কিন্তু আলেক্সেই'র দৃঢ় বিশ্বাস এটা সম্ভব, আর তাই সিদ্ধিলাভ করবেই সে। সংকল্পকে কার্যে পরিণত করার জন্য কাজ করে চলল সে। চিকিৎসা-পদ্ধতি ও ওষুধ যা কিছু নির্দেশ করা হত, প্রত্যেকটি এত কঠোর নিষ্ঠায় মেনে চলত যে নিজেরি অবাক লাগত তার। প্রচুর খেত ও, ক্ষিধে বিশেষ না থাকলেও হামেশাই দ্বিতীয়বার চেয়ে খেত। অবস্থা যাই হোক না কেন, যতক্ষণ ঘুমোনো উচিত বলা হয়েছে জোর করে ততক্ষণ ঘুমোত, এমন কি মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে অল্প একটু ঘুমিয়ে নেওয়াও অভ্যাস করে নিল ও, যদিও সেটা ওর সক্রিয় সজীব প্রকৃতির বিরোধী।

জোর করে খাওয়া, ঘুমোনো, ওষুধ খাওয়া কঠিন ছিল না ওর পক্ষে। ব্যায়ামটা কিন্তু আলাদা ব্যাপার। আগে সাধারণ যে সব ব্যায়াম নিয়মিতভাবে ও করত সেগুলো শয্যাশায়ী, পায়ের পাতাবিহীন লোকের করা সম্ভব নয়। তাই নতুন কয়েকটি ব্যায়াম রীতির উদ্ভাবন করল আলেক্সেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমরে হাত রেখে শরীরটা সামনে পিছনে পাশে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে নোয়াত, এত উৎসাহে আর জোরে এদিক ওদিক মাথা ঘোরাত যে শিরদাঁড়া চড়চড় করে উঠত। ওয়ার্ডের সহবাসীরা ব্যায়াম নিয়ে ওকে হালকা ঠাট্টা করত, সপরিহাসে অভিনন্দন জানিয়ে কুকুশকিন ওকে

জ্নামেনস্কি ভাইদের একজন, কিম্বা লাদ্মেগ অথবা অন্য কোন বিখ্যাত দৌড়িয়েদের নাম ধরে ডাকত। এ ধরনের ব্যায়াম দ্চক্ষে দেখতে পারত না কুকুশকিন, ব্যায়ামের ব্যাপারটা হাসপাতালের আর একটা আজগ্বী খেয়াল মাত্র ওর কাছে। আলেক্সেই ব্যায়াম শ্র্ করলেই গজগজ করতে করতে তাড়াতাড়ি করিডরে চলে যেত সে।

পা থেকে ব্যান্ডেজ খোলা হল, বিছানায় আরো স্বচ্ছন্দভাবে নড়াচড়া করতে পারে আলেক্সেই, তখন আর একটি ব্যায়াম রীতি চাল্ করল। পাদ্টোকে বিছানার নিচের শিকের মধ্যে দিয়ে কোমরে হাত রেখে যতখানি পারে শরীরটাকে আস্তে আস্তে নোয়াত, তারপর আবার পিছন দিকে হেলত। নোয়ানোর বেগ প্রতিদিন কমিয়ে আনছে, বাড়াচ্ছে সটান হবার সংখ্যা। তারপর পাদ্টোকে খাটাবার জন্য কয়েকটি কায়দা চাল্ করল সে। চিৎ হয়ে শ্রয়ে পালা করে দ্টো পা'কে নোয়াত, হাঁটু ব্কের দিকে টেনে এনে তারপর দিত পাদ্টো ছড়িয়ে। প্রথম এটা করার সময়ে ও উপলব্ধি করল কী ভীষণ এবং হয়ত অনতিক্রম্য বাধার ম্খোম্খি হতে হবে ওকে। গোছ থেকে পাদ্টো কাটা, সে দ্টো ছড়াতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। গতি হয় ইতস্তত অনিয়মিত। ঠিকমত পা ছড়ানো, ডানা কিম্বা পিছনের অংশ গিয়েছে এমন একটি বিমান চালানোর মত কঠিন ব্যাপার। মনে মনে বিমানের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে আলেক্সেই ব্ঝল যে মান্ষের শরীরের আদর্শ স্সমঞ্জস গঠনের যতিপাত ঘটেছে তার ক্ষেত্রে, ওর শরীর যদিও সবল ও বলিষ্ঠ তব্ আশৈশব অভ্যস্ত বিভিন্ন অঙ্গের ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়া আর কখনো ফিরে পাবে না সে।

পায়ের ব্যায়ামে অসম্ভব কষ্ট পেত মেরেসিয়েভ, কিন্তু প্রতিদিন সময়ের মাত্রা এক মিনিট করে বাড়িয়ে চলল। কখনো কখনো ভয়াবহ যন্ত্রণায় চোখ জলে ভরে যেত, কাতরোক্তি চাপার জন্য এত জোরে ঠোঁট কামড়াত যে রক্ত পড়ত। কিন্তু তব্ জোর করে ব্যায়াম চালিয়ে গেল সে, প্রথমে দিনে একবার করে, পরে দ্বার। প্রতিদিন ব্যায়ামের সময় বেড়ে চলল। ব্যায়াম করার পর প্রতিবার অসহায়ভাবে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ভাবত আর করতে পারবে কি না। কিন্তু সময় এলে আবার ব্যায়াম শ্র্ হত। সন্ধ্যেবেলায় উর্ আর পায়ের ডিম টিপে দেখত আর আনন্দে লক্ষ্য করত ব্যায়াম শ্র্ করার গোড়াকার দিকের সেই থলথলে মাংস আর চর্বির জায়গায় এসেছে আগেকার দ্ঢ় পেশীবদ্ধতা।

পাদ্‌টোর কথায় মেরেসিয়েভের সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন। মাঝেমাঝে চিন্তায় মগ্ন সে, পায়ের নিচের দিকটা ব্যথিয়ে উঠল, তখন অন্যভাবে পাদ্‌টো রাখার সময়েই শুধু মনে পড়ত পায়ের পাতা তার নেই। অনেক দিন কোন স্নায়বিক অসঙ্গতির জন্য কাটা পায়ের পাতাদ্‌টো শরীরের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে রইল। হঠাৎ শিরশির করে উঠত সেদ্‌টো, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় উঠত ব্যথিয়ে, মাঝেমাঝে এমনকি যন্ত্রণাও হত। পাদ্‌টোর কথায় এত বিভোর আলেক্সেই যে মাঝেমাঝে স্বপ্ন দেখত যে সবেগে ও চলাফেরা করছে। হুঁশিয়ারি বাঁশি বেজেছে, দৌড়িয়ে গেল বিমানে, ডানায় লাফিয়ে উঠে ককপিটে বসল, পা দিয়ে পা-দানিটা দেখছে, ওদিকে ইঞ্জিন থেকে ঢাকনা সরিয়ে নিচ্ছে ইউরা। আবার কখনো ও আর ওলিয়া খালি পায়ে, হাত ধরাধরি করে ফুল ফোটা স্তেপে দৌড়চ্ছে, উষ্ণ ভিজে মাটির নরম স্পর্শ বেশ লাগছে দ্‌জনের। ভারী ভালো লাগছে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে যখন দেখত পায়ের পাতা নেই তখন কী হতাশ না লাগত আলেক্সেই'র!

এ ধরনের স্বপ্ন দেখার পরে মাঝেমাঝে হতাশ্বাস হয়ে যেত আলেক্সেই। মনে হত বৃথায় নিজের শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে, আর কখনো বিমান চালাতে পারবে না সে, যেমন আর কখনো খালি পায়ে স্তেপে আর দৌড়তে পারবে না সেই কমনীয় মেয়েটির সঙ্গে। ওর কাছ থেকে দ্‌রে যত দিন কাটছে ততই চাইছে ওকে, ততই প্রিয় হয়ে উঠছে মেয়েটি।

ওলিয়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্কে আনন্দ পায় না আলেক্সেই। প্রায় প্রতি সপ্তাহে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা ওকে "নাচায়," অর্থাৎ বিছানায় ঝটকা দিতে হয়, দিতে হয় হাততালি, তার পরে মেলে চিঠি, স্কুলের মেয়ের গোলগোল পরিচ্ছন্ন হাতে লেখা ঠিকানাটা। ক্রমশ দীর্ঘতর আর অন্তরঙ্গ হচ্ছে চিঠিগ্‌লো, যেন যুদ্ধে ব্যাহত মেয়েটির নবীন প্রেম দিনে দিনে দানা বাঁধছে। চিঠিগ্‌লো আলেক্সেই পড়ে আকাঙ্ক্ষায় আর উৎকণ্ঠায়, জানে যে প্রতিদান দেবার কোন অধিকার নেই তার।

স্কুলে সহপাঠী ছিল তারা, করাত-কলের শিক্ষানবিশি স্কুলে একসঙ্গে পড়েছে, দ্‌জনের মনের ভরাট রোমান্টিক আবেগকে বড়োদের অন্‌করণে প্রেম বলে ডেকেছিল তারা। পরে ছ-সাত বছরের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়। প্রথমে মেয়েটি-কারিগরি স্কুলে পড়তে চলে যায়। মেকানিক হয়ে যখন করাত-কলে ফিরল তখন সহরে ছিল না আলেক্সেই, সে তখন বিমান স্কুলে। যুদ্ধের ঠিক আগে আবার দ্‌জনের দেখা হয়। দেখাসাক্ষাৎ করতে তারা চায়নি, হয়ত

পরস্পরকে ভুলে গিয়েছিল ওরা — বিচ্ছেদের পরে অনেক জল ত গড়িয়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মায়ের সঙ্গে আলেক্সেই কোথায় যাচ্ছে, একটি মেয়ে ওদের পেরিয়ে গেল। মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকায়নি পর্যন্ত আলেক্সেই, শুধু লক্ষ্য করেছিল ওর পাদুটোর গড়ন বেশ।

'ওকে ডাকলে না কেন? ও ত ওলিয়া!' মেয়েটির পদবীটি উল্লেখ করে বকে উঠলেন মা।

পিছনে তাকাল আলেক্সেই। মেয়েটিও দেখার জন্য ফিরে তাকিয়েছে। দৃষ্টিবিনিময় হল ওদের, আর আলেক্সেই'র হৃৎস্পন্দন হল দ্রুততর। মাকে ছেড়ে ও দৌড়িয়ে গেল মেয়েটির কাছে, ফুটপাথে পত্রহীন একটি পপলার গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল ও।

'তুমি?' বিস্ময়ে বলে উঠল আলেক্সেই, এমন ভাবে ওর দিকে চাইল যেন কোন সুন্দরী, অসামান্য বিদেশিনী এই বসন্ত সন্ধ্যায় কর্দমাক্ত প্রশান্ত রাস্তায় দৈবক্রমে এসে পড়েছে।

'আলিওশা?' ঠিক ওর মত বিস্মিত অবিশ্বাসী সুরে বলল মেয়েটি।

ছ-সাত বছর বিচ্ছেদের পর এই প্রথম দেখা। আলেক্সেই'র সামনে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো একটি মেয়ে, পেলব নরম গঠন, সুন্দর গোলগাল কিশোরের মত মুখ, নাকের ডগায় কয়েকটি সোনালী ফুট ফুট দাগ। পাতলা, কোণের দিকে একটু ঘন ভুরুজোড়া অল্প তুলে বড়ো বড়ো কটা চকচকে চোখে মেয়েটি তাকাল ওর দিকে। শিক্ষানবিশি স্কুলে শেষ দেখা যখন ওদের হয়েছিল তখন ওর চেহারাটা ছিল শক্তসমর্থ — গোলগাল মুখ, গোলাপী গাল, কর্কশ গোছের একটি কিশোরী, বাপের তেল-চটচটে কোট আস্তিন গুটিয়ে পরে বেশ গর্বিতভাবে চলাফেরা করত — তার সঙ্গে আজকের এই সজীব কমনীয় মেয়েটির আদল খুব কম।

মা'র কথা ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে তারিফ করল আলেক্সেই। মনে হল এ ক' বছরে কখনো ভোলেনি ওকে, আজকের সাক্ষাতের স্বপ্ন দেখেছে বরাবর।

'তাহলে এরকম দেখতে হয়েছ তুমি!' অবশেষে বলল আলেক্সেই।

'কী রকম?' ভরাট মুখর গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটি, স্কুলে একসঙ্গে পড়ার সময়কার মত গলাটা নয় মোটেই।

রাস্তার কোণ থেকে দমকা হাওয়া এসে পত্রহীন পপলারগাছের শাখাগুলোর মধ্য দিয়ে শিস দিয়ে গেল। সুঠাম পাদুটোর উপরে মেয়েটির

ফ্রক ফরফর করে উঠল। খিলখিল করে হেসে, হে'ট হয়ে ফ্রকটা চেপে ধরল ও সহজ সুন্দরভাবে।

'এরকম!' উত্তর দিল আলেক্সেই, সে যে মুগ্ধ সেটা চাপতে পারল না আর।

'কেমন বলো ত?' হেসে উঠে আবার জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

এক মুহূর্ত তরুণ তরুণীর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে হেসে চলে গেলেন আলেক্সেই'র মা। ওরা রয়ে গেল, পরস্পরকে তারিফ করলে, উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা চলল, কথার মাঝখানে বাধা দিলে পরস্পরকে, নানারকম বিস্ময়ের উক্তি করলে, যেমন "তোমার মনে পড়ে?" "জানো এটা?" "কোথায়?.." "ওর কী হল?.."

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প চলল, অবশেষে ওলিয়া আঙুল দিয়ে কাছের বাড়িগুলোর জানলাগুলো দেখাল। ফারের শাখা আর জেরানিয়ামের ফুলদানির আড়ালে সেখানে কৌতূহলী মুখ সব দেখা যাচ্ছে।

'তোমার সময় থাকলে চলো নদীর ধারে যাই,' প্রস্তাব করল ওলিয়া। হাত ধরাধরি করে, এমন কি শৈশবে সেটা কখনো করেনি তারা, সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ওরা গেল নদীর উ'চু পাড়ে, খাড়াভাবে নদীতে নেমেছে সেটা, সেখান থেকে অদ্ভুত ভালোভাবে দেখা যায় ভলগার চওড়া বিস্তার আর বন্যার জলে বরফের চাঁই'এর গম্ভীর শোভাযাত্রা।

সে সময় থেকে আদরের ছেলেকে কদাচিৎ বাড়িতে দেখতে পেতেন মা। জামাকাপড়ের বিষয়ে সাধারণত ও মাথা ঘামাত না, কিন্তু এখন রোজ প্যাণ্ট ইস্ত্রি করা হয়, ইউনিফর্মের বোতামগুলো খড়ি দিয়ে পালিশ করে, বিমান বাহিনীর ব্যাজ দেওয়া শাদা-চূড়ো টুপিটা চড়ায় মাথায়, খরখরে চিবুক কামানো হয় প্রত্যহ, আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখে ও যায় করাত-কলের গেটে ওলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। দিনের বেলাতেও প্রায় উধাও হয়ে যায় আলেক্সেই, একটা অন্যমনস্ক ভাব, প্রশ্নের সঠিক জবাব পারে না দিতে। মায়ের সহজাত বোধে ধরা পড়ল ওর কী হয়েছে; সেটা বুঝে ওকে মাপ করলেন তিনি, সেই প্রবাদবাক্যটি সান্ত্বনা যোগাল তাঁকে: বুড়োরা দিনে দিনে বুড়ো হয়, নবীনদের বাড়া অবশ্যকর্তব্য।

ভালোবাসার কথা একবারও বলেনি দুজনে। বিকেলের সূর্যের আলোয় ঝিক ঝিক করে মন্থর স্রোতে বইছে ভলগা, তার খাড়া পাড়ে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরেছে, কিম্বা হয়ত সহরের বাইরে তরমুজ ক্ষেত ধরে গিয়েছে, সেখানে

ঘন আর আলকাতরার মত কালো আঙুরের গোছা ইতিমধ্যেই ঘন সবুজ আর জলচর পাখির পায়ের মত পাতায় দেখা দিয়েছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে ভাবত ছুটির দিন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে ত আসছে, ওলিয়াকে এবার হৃদয়ের কথা সব খুলে বলা যাক। সন্ধ্যা আসত আবার। কলের গেটে দেখা হত ওলিয়ার সঙ্গে, যেত ছোট দোতলা কাঠের বাড়িটিতে, সেখানে বিমানের কামরার মত ঝকঝকে, তকতকে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে ওলিয়া। আলমারীর খোলা পাটের আড়ালে সে জামাকাপড় বদলাত আর ধৈর্য ধরে বসে থাকত আলেক্সেই, পাটের আড়াল থেকে নগ্ন কনুই, ঘাড় আর পা উঁকি মারছে, চেষ্টা করত সেদিকে না তাকাতে। হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসত ও, বেশ ঝরঝরে চেহারা, গাল গোলাপী, ভিজে চুল, পরনে সাদা সিল্কের ব্লাউজ, শনি রবিবার বাদ দিয়ে যেটা সব সময়ে পরত ও।

তারপর দুজনে যেত সিনেমায়, সার্কাসে কিম্বা পার্কে। কোথায় যাওয়া হল তাতে কিছু এসে যেত না আলেক্সেই'র। সিনেমার পর্দা, সার্কাসের মঞ্চ, পার্কের ভিড় কিছুই দেখত না সে; ওর চোখ ভরে থাকত শুধু ওলিয়া, ওকে দেখতে দেখতে ভাবত, "আজ রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়ে পথে বিয়ের কথা বলব, নিশ্চয়ই বলব!" কিন্তু পথ যেত ফুরিয়ে, বলায় সাহস হত না ওর।

রবিবার সকালে একদিন ভলগার ওপারের মাঠে বেড়াতে গেল দুজন। ওলিয়ার খাতিরে সবচেয়ে ভালো সাদা ট্রাউজার চাপিয়েছে আলেক্সেই, খোলা-কলার একটা সার্ট গায়ে, মা বলতেন ওটা ওর তামাটে চওড়া মুখের পক্ষে চমৎকার মানানসই। ওলিয়া তৈরী হয়েই ছিল। ন্যাপকিনে জড়ানো একটা পার্সেল ওর হাতে দিল ওলিয়া, তারপর দুজনে নদীতে গেল। বুড়ো খেয়ামাঝিটা প্রথম মহাযুদ্ধে পঙ্গু হয়, আশেপাশের বাচ্চাদের বিশেষ প্রিয় সে, চড়ার কাছে গাজন-মাছ ধরতে আলেক্সেইকে শিখিয়েছিল ছেলেবেলায়। কাঠের পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে ভারী নৌকোটাকে জলে ঠেলে দাঁড়ের ছোট ছোট ঘায়ে চালাতে শুরু করল। স্রোতে কোণাকুণিভাবে এগিয়ে, দাঁড়ের সংক্ষিপ্ত ঘায়ে নদী পার হয়ে নৌকোটা ওপারের নিচু উজ্জ্বল সবুজ তীরে পৌঁছল। মেয়েটি পিছনের গলুইতে বসে আছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন, হাতটা নিচে নামানো নৌকোর গায়ে, আঙুলের মধ্য দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে।

'আরকাশা খুড়ো, আমাদের চিনতে পারছ না?' আলেক্সেই জিজ্ঞেস করল।

দুজনের নবীন মুখের দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে মাঝি বলল, 'না।'

'কেন, আমার নাম আলিওশ্‌কা মেরেসিয়েভ। কাঁটা দিয়ে চড়ায় গাজন ধরতে তুমিই ত আমাকে শিখিয়েছিলে।'

'শিখিয়েছিলাম হয়ত। তোমার মত নাছোরবান্দা অনেকেই ত খেলত এখানে। সবাইকে মনে নেই।'

একটা পোত পেরিয়ে গেল নৌকোটা, নোঙর ফেলেছে একটা চওড়া-গলুই ছোট স্টীমার, গলুইটা জায়গায় জায়গায় রঙচটা, তার উপরে বিখ্যাত নাম "অরোরা" লেখা, সেটা ছাড়িয়ে নৌকোটা বালুময় তীরে খরখর শব্দ করে ঢুকল।

'আমার কাজ আজকাল এখানে, মিউনিসিপ্যালিটির জন্যে আর খাটি না। নিজের কাজ করি, মানেটা বুঝলে ত—ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর কি,' জলে নেমে নৌকোটাকে তীরে আরো উ'চুতে ঠেলতে ঠেলতে বুঝিয়ে বলল আরকাশা। কিন্তু কাঠের পাদুটো বালিতে গেল ডুবে, নৌকোটা ভারী বলে সরাতে পারল না সেটাকে। "লাফিয়ে নামতে হবে তোমাদের," উদাসীনভাবে বলল আরকাশা।

'কতো দিতে হবে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই।

'তোমার যা খুসি; বেশ খুসি দেখাচ্ছে তোমাদের, সেজন্য একটু বেশী দেওয়া উচিত। কিন্তু তোমাকে চিনতে পারছি না, সত্যি পারছি না।'

লাফিয়ে নামতে গিয়ে ওদের পা ভিজে গেল, জুতো খুলে নিতে বলল ওলিয়া। জুতো খুলে ফেলল দুজনে, নদীর ভিজে তপ্ত বালিতে খোলা পা লাগাতে এত ভালো আর স্বচ্ছন্দ লাগল ওদের যে ঘাসে বাচ্ছাদের মত দৌড়ঝাঁপ করার ইচ্ছে হল।

'ধরো দিকি আমাকে!' চড়া দিয়ে নিচু মরকত-সবুজ মাঠের দিকে তীরের মত ছুটো যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল ওলিয়া, তার বলিষ্ঠ তামাটে পাদুটো ঝলসিয়ে উঠল।

পিছনে দৌড়োল আলেক্সেই, ওর পাতলা উজ্জ্বল ফ্রকটার বহুরঙা ছোপ ছাড়া চোখে আর কিছু পড়ছে না। দৌড়চ্ছে, আর মেঠো ফুল আর সরেলের শিষ খালি পায়ে বেশ বি'ধে যাচ্ছে, পায়ের নিচে বসে যাচ্ছে নরম ভিজেভিজে রৌদ্রতপ্ত মাটি। ওলিয়াকে ধরে ফেলাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে হল তার কাছে, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করছে সেটার উপরে; মনে হল এখানে, ফুল-ভরা মাঠে, মাতাল-করা গন্ধে এত দিন ওকে যা বলার সাহস হয়নি সেটা বলা সহজ হবে। কিন্তু যতবার ওর কাছে এসে

পড়ে ধরতে হাত বাড়ায় আলেক্সেই ততবার হঠাৎ ঘুরে ওর নাগাল পেরিয়ে বেড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে অন্যদিকে পালিয়ে যায় ওলিয়া, আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠে।

ধরা দেবে না দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওলিয়া, ওকে ধরতে পারল না আলেক্সেই। ওলিয়া নিজেই মাঠ ছেড়ে নদীতীরে গিয়ে তপ্ত সোনালী বালিতে ছুঁড়ে দিল নিজেকে, টকটকে লাল মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে, স্পন্দমান বুকে গভীর আগ্রহে নিশ্বাস নিচ্ছে সে আর হাসছে। পরে ফুল-ভরা মাঠে, শাদা চুমকি-বসানো ডেইজির মধ্যে দাঁড় করিয়ে ওর ছবি তুলল আলেক্সেই। নদীতে স্নান করল দুজনে তারপর; নাইবার পোশাক নিঙড়ে জামাকাপড় যখন পরল ওলিয়া, ও বাধ্য ছেলের মত ঝোপের আড়ালে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

ওলিয়া ডাকতে কাছে গেল। রোদে-পোড়া পাদুটো মুড়ে বালিতে বসে আছে ও, পরনে হালকা পাতলা ফ্রক, মাথায় তোয়ালে। পরিষ্কার শাদা ন্যাপকিনটা ঘাসের উপরে বিছিয়ে কোণে কোণে পাথরের টুকরো দিয়ে চাপা দিল ওলিয়া, পার্সেল থেকে খাবারগুলো বের করে রাখল, তাতে স্যালাড, অয়েল-পেপারে সযত্নে মোড়া ঠাণ্ডা মাছ, বাড়িতে তৈরী বিস্কুট; লাঞ্চ খাওয়া হল। এমন কি নুন আর সরষে আনতে ভোলেনি ওলিয়া, প্রসাধনের কৌটোয় সেগুলো এনেছে। গৃহকর্ত্রীর মত গম্ভীর আর নিপুণভাবে কাজ করেছে একরত্তি মেয়েটি, ওর ধরনে মধুর আর মর্মস্পর্শী কিছু একটা আছে। নিজেকে বলল আলেক্সেই, "গয়ং-গচ্ছ আর নয়। সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় বিয়ের প্রস্তাব করব। ওকে বোঝাব, বুঝিয়ে বলব যে আমাকে বিয়ে করতেই হবে।"

বালির উপরে বসে রোদ পোয়াল দুজন, আর একবার স্নান করা হল; ঠিক হল যে ওলিয়ার ঘরে সন্ধ্যেবেলায় আবার দেখা হবে। তারপরে মন্থরভাবে খেয়া-ঘাটে গেল ওরা, ক্লান্ত এবং সুখী। কী একটা কারণে স্টীমার কিম্বা খেয়া-নৌকো কোনটাই সেখানে নেই। অনেকক্ষণ ধরে আরকাশা খুড়োকে চেঁচিয়ে ডাকল ওরা, ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙ্গে গেল। স্তেপে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের দীপ্ত আলোহিত রেখা নদীর উঁচু ওপার ছুঁয়ে নামছে, সহরের আপাতত নিশ্চল ধূলিধূসর গাছগুলোর মাথা আর বাড়ির ছাত সোনালী হয়ে উঠছে সে আভায়। জানলাগুলো টকটকে লাল। গ্রীষ্মের তপ্ত শান্ত সন্ধ্যা। কিন্তু সহরে কিছু একটা ঘটেছে নির্ঘাত। এ সময়ে রাস্তায়

সাধারণত লোকজন থাকে না, আজ কিন্তু অসংখ্য লোক। লোকবোঝাই দুটো লরি চলে গেল; ছোট একটা দল সামরিক কায়দায় মার্চ করে চলেছে।

'আরকাশা খুড়ো নিশ্চয়ই খুব নেশা করেছে,' বলল আলেক্সেই। 'এখানে যদি রাত কাটাতে হয়?'

'তুমি সঙ্গে থাকলে আমার কোন ভয় হয় না,' বড়ো বড়ো চকচকে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল ওলিয়া।

ওলিয়াকে জড়িয়ে আলেক্সেই চুম্বন করল, প্রথম ও শেষ চুম্বন। দাঁড়ের আওয়াজ এল নদী থেকে; ওধার থেকে লোকবোঝাই খেয়া-নৌকোটা আসছে। নৌকোটাকে দেখে এবার ভয়ানক বিরক্ত লাগল দুজনের, তবু বাধ্যভাবে এগিয়ে গেল সেদিকে, যেন ওটা যা বয়ে আনছিল তার পূর্বসূচনা টেনে নিয়ে গেল তাদের।

কোন কথা না বলে নৌকো থেকে লাফিয়ে নামল যাত্রীরা। সবাই ছুটির পোশাকে, সবাইকে বিচলিত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কিন্তু। পুরুষেরা গম্ভীর, বিশেষ তাড়া আছে যেন, আর কেঁদে কেঁদে মেয়েদের চোখ লাল হয়ে গিয়েছে; একটি কথা না বলে তারা ওদের পেরিয়ে গেল। কী ঘটেছে দুজনে জানে না, নৌকোয় লাফিয়ে উঠল। ওদের সুখোজ্জ্বল মুখের দিকে না তাকিয়েই আরকাশা খুড়ো বলল:

'যুদ্ধ বেধেছে... আজ সকালে পররাষ্ট্র জন কমিসার রেডিওতে বলেছেন।'

'যুদ্ধ?.. কার সঙ্গে?' প্রায় লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই।

'ওই নচ্ছার ফ্যাশিস্টগুলোর সঙ্গে, আর কার সঙ্গে আবার?' সক্রোধে দাঁড় টানতে টানতে গরগর করে বলল আরকাশা খুড়ো। 'ছেলেরা ত এরি মধ্যে জেলা সামরিক কমিসারিয়াতে চলে গিয়েছে... সৈন্যদলে ঢোকা শুরু হয়েছে।'

বাড়ি না ফিরে আলেক্সেই সটান গেল সামরিক কমিসারিয়াতে; সে রাত্রেই বারোটা চল্লিশের ট্রেনে চেপে রওনা হল যে বিমান দলে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেদিকে। সুটকেসটা আনার জন্য কোনক্রমে বাড়িতে যেতে পেরেছিল একবার, ওলিয়াকে বিদায় পর্যন্ত জানাতে পারেনি।

চিঠিপত্র খুব কম লেখে ওরা: তার কারণ এই নয় যে পরস্পরের প্রতি দুজনের মনের ভাব মিইয়ে গিয়েছে কিম্বা পরস্পরকে ভুলে যাচ্ছে ওরা। কারণটা তা নয়। গোলগোল স্কুলের মেয়ের হাতে লেখা চিঠিগুলোর জন্য অধৈর্যভাবে প্রতীক্ষা করে থাকত আলেক্সেই, পকেটে রাখত সেগুলো, যখন

একলা তখন বারবার পড়ত। বনে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে এই চিঠিগুলোই বুকে চেপে ধরত ও, চেয়ে থাকত তাদের দিকে। কিন্তু দুজনের বয়স কম, ওদের সম্পর্ক আচমকা ব্যাহত ও ছিন্ন হয়ে যায় যখন তখনো সম্পর্কটা পাকাপাকি হয়নি। তাই পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত পত্রালাপ করত ওরা। শেষ পর্যন্ত অনুচ্চারিত সেই বৃহত্তর জিনিসটির বিষয়ে লিখতে সাহস হত না ওদের।

আর এখন হাসপাতালে শুয়ে, ওলিয়ার চিঠি পেয়ে বিব্রত লাগে আলেক্সেই'র, বিব্রত ভাবটা বেড়ে যায় প্রতি চিঠিতে, কেননা ও দেখছে ওলিয়া নিজে হঠাৎ যেন এগিয়ে এসেছে তার দিকে। এখনকার চিঠিগুলোতে একেবারে খোলাখুলিভাবে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা লেখে ও; সেই সন্ধ্যায় বিশেষ সেই মুহূর্তটিতে ওদের নিতে আরকাশা খুড়ো এসে পড়েছিল বলে তার দুঃখ। আলেক্সেইকে আশ্বাস জানায় যা কিছু ঘটুক না তার, পৃথিবীতে একজনের উপরে সে সব সময়ে নির্ভর করতে পারে; অনুরোধ জানায় যে ঘর ছেড়ে বিভুঁইয়ে ঘোরার সময়ে আলেক্সেই যেন মনে রাখে আপন বলতে পারে এমন একটা ঠাঁই আছে তার, যুদ্ধশেষে যেখানে ফিরে সে আসতে পারে। আলেক্সেই'র মনে হত যে চিঠিগুলো অন্য কোন ওলিয়ার লেখা। ওর ফটোটা দেখলেই আলেক্সেই'র মনে হয় হাওয়া বইলেই ফুল-তোলা ফ্রক পরনে মেয়েটি ভেসে যাবে, পাকা ডানডেলিওয়নের উড়ন্ত বীজের মত। কিন্তু চিঠিগুলো আসছে একটি নারীর কাছ থেকে — অন্তঃকরণ যার ভালো, ভালোবাসে যে, প্রিয়র ফিরে আসার অপেক্ষায়, আকাঙ্ক্ষায় দিন কাটছে যার। তাতে একসঙ্গে খুসি আর বিষণ্ণ লাগে আলেক্সেই'র; অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুসি লাগে, বিষণ্ণ লাগে কেননা ওর ধারণা ওলিয়ার প্রেমে তার কোন অধিকার নেই। সত্যি, এখন ত ওলিয়ার চেনা সেই রোদে-তামাটে বলিষ্ঠ যুবক আর সে নয়, আরকাশা খুড়োর মত পঙ্গু সে, সেটা ওকে লিখে জানাবার সাহস পর্যন্ত তার নেই। সত্যি কথা লিখলে রুগ্না মা মারা যাবেন সেই ভয়ে লেখেনি, তাই ওলিয়াকেও ঠকাতে বাধ্য হচ্ছে সে, আর যত দিন যাচ্ছে ততই প্রতি চিঠিতে মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়ছে।

তাই কামিশিন থেকে চিঠি এলে পরস্পরবিরোধী অনুভূতি জাগে তার মনে — আনন্দ আর বিষাদ, আশা আর উৎকণ্ঠা — চিঠিগুলো তাকে একই সঙ্গে খুসি করে আর যন্ত্রণা দেয়। মিথ্যে কথা বলেছে একবার, এখন নতুন নতুন মিথ্যে কথা তাই বানাতে হয়, কিন্তু এ ধরনের উদ্ভাবনে

পারদর্শিতা নেই তার। সেইজন্য ওলিয়াকে লেখা তার চিঠিগুলো হয় সংক্ষিপ্ত নীরস।

"আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" লেখা আরো সহজ মনে হয় আলেক্সেই'র। মেয়েটি সহজ সরল আর আত্মত্যাগী। অস্ত্রোপচারের পরে হতাশাচ্ছন্ন একটি মুহূর্তে কাউকে নিজের দুঃখ জানাবার তাগিদ বোধ করে আলেক্সেই, মেয়েটিকে লেখে একটি দীর্ঘ বিষণ্ণ চিঠি। বেশী দিন যেতে না যেতেই উত্তর এল, লেখার খাতা থেকে ছেঁড়া একটা পাতা, তাড়াতাড়িতে লেখা চিঠি, পঙক্তিগুলো বিস্ময়ের চিহ্নে কীর্ণ, যেন বিস্কুটের উপরে যোয়ানের বীজ ছড়ানো, তার উপর সমস্ত চিঠিটা অশ্রু জলের দাগে অলংকৃত। মেয়েটি লিখেছে সামরিক আইনকানুনের বাধা না থাকলে সমস্ত কিছু এক্ষুণি ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে চলে আসত, দেখাশুনো করত ওকে, ওর দুঃখের ভাগীদার হত। বেশী করে চিঠি লিখতে অনুনয় করেছে। এলোমেলো চিঠিটাতে সরল শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসের আতিশয্য, পড়ে বিষণ্ণ লাগল আলেক্সেই'র; ওলিয়ার চিঠিগুলো মেয়েটি ওকে দেবার সময় ওলিয়া তার বিবাহিতা বোন বলেছিল বলে নিজেকে গালি দিল সে। ওরকম মেয়েকে ঠকানো কখনো উচিত নয়। তাই খুলে লিখল যে কামিশিনে একটি মেয়ে আছে, তাকে ও ভালোবাসে, তাকে কিম্বা মা'কে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানাবার সাহস তার হয়নি।

"আবহাওয়া সার্জেণ্টের" উত্তর এল খুব তাড়াতাড়ি, যুদ্ধের সময়ে এত তাড়াতাড়ি চিঠি আসাটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সে লিখেছে যে চিঠিটা পাঠাচ্ছে একটি মেজরের হাতে, যুদ্ধ-সাংবাদিক সে, ওদের বিমান-ঘাঁটিতে গিয়েছিল। মেজরটি চেষ্টা করে ওর মন পাবার, লোকটি হাসিখুসি খাসা, কিন্তু তাকে পাত্তা দেয়নি সে। চিঠির সুরে বোঝা যায় মেয়েটি হতাশ হয়েছে, চটেছেও, নিজের মনোভাব ঢাকার চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য করেনি, চেষ্টাটা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। সেবার সত্যি কথা না জানানোর জন্য ধমকে বলেছে যে ওকে যেন এবার বন্ধুভাবে গণ্য করে আলেক্সেই। চিঠিতে পুনশ্চ একটি, কালিতে নয়, পেন্সিলে, তাতে আশ্বাস দিয়েছে যে সে "কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের" বিশ্বস্ত বন্ধু; যদি "কামিশিনের সেই মেয়েটি" ওকে ছেড়ে দেয় (যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনের জায়গায় মেয়েদের হালচাল কী সেটা জানতে ওর বাকি নেই), কিম্বা ওকে আর না ভালোবাসে, অথবা ওর পঙ্গুতায় বিরূপ হয়, তাহলে আলেক্সেই যেন "আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" না ভোলে; যে হোক সব সময়ে ওকে সত্যি কথা জানানো চাই। পত্রবাহকটির সঙ্গে গুছিয়ে মোড়া একটি পার্সেল, তাতে

রয়েছে পারাস্যুট সিল্কের তৈরী, আলেক্সেই'র নামের আদ্যাক্ষর দেওয়া কয়েকটি কাজ-করা রুমাল, বিমানের ছবি আঁকা তামাকের থলে একটা, একটা চিরুণী, এক বোতল "ম্যাগনোলিয়া" ও-ডি-কলোন, একটুকরো স্নানের সাবান। এই দুঃসময়ে বাহিনীতে কার্যরত মেয়েদের কাছে জিনিসগুলোর দাম যে কত আলেক্সেই'র জানা। ও জানত যে উপহার হিসেবে পাওয়া এক টুকরো সাবান কিম্বা ও-ডি-কলোনের একটা বোতল ওরা মহাযত্নে রাখে রক্ষাকবচের মত, যুদ্ধের আগেকার দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় জিনিসগুলো। জিনিসগুলোর মূল্য সে জানে বলে বিছানার ধারের তাকে সেগুলো সাজিয়ে রাখার সময়ে যুগপৎ আনন্দিত ও লজ্জিত বোধ করল আলেক্সেই।

এখন স্বভাবসিদ্ধ উদ্যমে নিজের পঙ্গু পাদুটোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে আলেক্সেই, আবার আকাশে উড়ে লড়াই করার স্বপ্ন দেখছে বলে পরস্পরবিরোধী মনোভাবে সে পীড়িত। ওলিয়ার প্রতি ওর অনুরাগ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে কিন্তু চিঠিতে সত্যি কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে অর্ধ-সত্য, আর এদিকে খোলাখুলি সব কথা জানাচ্ছে প্রায় অচেনা একটি মেয়েকে। ব্যাপারটায় তার বিবেক ভারাক্রান্ত।

কিন্তু দৃঢ় শপথ করেছে আলেক্সেই যে স্বপ্ন বাস্তব হবার আগে, লড়বার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে আবার বাহিনীতে যোগ দেওয়া না পর্যন্ত প্রেমের কথা লিখবে না ওলিয়াকে। এটা তার লক্ষ্যে পৌঁছবার দুর্মর উৎসাহকে আরো শক্তি জোগাল।

১১

মে মাসের প্রথম দিনে মারা গেল কমিসার।

কী ভাবে অন্তিম মুহূর্তটি এল কেউ জানে না। সকালে মুখহাত ধোওয়া আর চুল আঁচড়ানোর পর যে মেয়েটি তার দাড়ি কামাচ্ছিল তাকে কমিসার জিজ্ঞেস করল আবহাওয়া কেমন, উৎসবের এই দিনে কেমন চেহারা মস্কোর। রাস্তা থেকে ব্যারিকেড সরানো হচ্ছে শুনে খুসি হল কমিসার, বসন্তের এই অদ্ভুত দিনটিতে কোন সমাবেশ বা শোভাযাত্রা হবে না বলে দুঃখ করল, উৎসবের দিনে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা মুখের ফুটফুট দাগগুলো ঢাকার দারুণ একটা চেষ্টা করেছে বলে তার পেছনে লাগল। আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে কমিসারকে, সবায়ের আশা যে সঙ্কট কাটিয়ে উঠে হয়ত এখন আরোগ্যের পথে চলেছে সে।

খবরের কাগজ আর পড়তে পারত না বলে কয়েক দিন হল কমিসারের বিছানার পাশে একটি ইয়ার-ফোন লাগানো বেতার যন্ত্র রাখা হয়েছিল। বেতার টেকনিকের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল গভজ্‌দেভ কিছু একটা করাতে এখন সারা ওয়ার্ডটাই বেতারে গান আর কথাবার্তা শুনতে পায়। নটা বাজল, ঘোষণাকারীটি — সে-সব দিনে সারা পৃথিবী তার গলা চিনত আর তার বার্তা শুনত — দেশরক্ষামন্ত্রীর অর্ডার পড়তে শুরু করল। দেয়ালে ঝোলানো কালো ডিস্কদুটোর দিকে গলা বাড়িয়ে সবাই নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে, পাছে কোন কথা হারিয়ে যায়। এমন কি "মহান লেনিনের অজেয় পতাকার তলে সবাই অগ্রসর হও জয়লাভের দিকে" — কথাগুলি উচ্চারিত হবার পরেও ওয়ার্ডে গভীর স্তব্ধতা।

'কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার, এটা দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে দিন ত...' কুকুশকিন বলল; তারপর হঠাৎ বিভীষিকায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কমরেড কমিসার!'

ফিরে তাকাল সবাই। আড়ষ্ট কঠিন টান হয়ে শুয়ে আছে কমিসার, ঘরের ছাতের একটি জায়গাতে অনড় চোখদুটো নিবদ্ধ। বিবর্ণ শীর্ণ মুখে প্রশান্ত গম্ভীর মহিমাময় ছাপ।

'মরে গিয়েছে!' তার বিছানার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে চেঁচিয়ে বলল কুকুশকিন। 'মরে গিয়েছে!'

ওয়ার্ডের ভীতিবিহ্বল পরিচারিকাদের দৌড়োদৌড়ি, নার্সের এদিক ওদিক ছুটোছুটি। ঝড়ের মতন এলেন হাউস সার্জন, ওভারঅলটার বোতাম তখনো আঁটা হয়নি। বদরাগী অমিশুক লেফ্‌টেনাণ্ট কনস্তান্তিন কুকুশকিন মৃত কমিসারের দেহের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, কারো কথায় কান দিচ্ছে না, কম্বলে মুখ গোঁজা শিশুর মত ফোঁপানি আর কান্নার প্রবল আক্ষেপে তার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে...

সেই দিন সন্ধ্যায় নতুন একটি রোগীকে আনা হল প্রায় অর্ধেক-খালি ৪২নং ওয়ার্ডে। সে হল মেজর পাভেল ইভানভিচ স্ত্রুচকভ, মস্কো রক্ষা-বাহিনীর জঙ্গী বিমান ডিভিশনের লোক। উৎসবের দিনে ফ্যাশিস্টরা মস্কোতে বড়ো গোছের বিমান হামলা চালানোর সঙ্কল্প করে, কিন্তু সমান্তরাল কয়েকটি দলে অগ্রসর ওদের বোমারু বিমানগুলোকে বাধা দিয়ে ভীষণ যুদ্ধের পর পদসল্‌নেচ্‌নায়া অঞ্চলের কোথাও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। শুধু একটা "ইয়ুনকারস" বেরিয়ে এসে অনেক উঁচুতে থেকে মস্কোর দিকে

এগোয়। যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেটাকে যে কোন প্রকারে করতে স্পষ্টত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিমানের লোকগুলো, ওদের উদ্দেশ্য উৎসব আনন্দে বাদ সাধা। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে হঠাৎ স্ত্রুচকভ দেখল বিমানটা সরে পড়ছে, তৎক্ষণাৎ সেটাকে ধাওয়া করে সে। স্ত্রুচকভের হাতে চমৎকার একটি সোভিয়েত বিমান, সে সময়ে জঙ্গী বিমানবাহিনীতে ওধরনের বিমান দেওয়া হচ্ছিল। অনেক উঁচুতে, মাটি থেকে প্রায় ছ কিলোমিটার উপরে, মস্কোর উপকণ্ঠ যখন এসে পড়েছে, জার্মান বিমানটির কাছে এসে পড়ে সে। নিপুণ ফিকিরে বিমানটির পিছনে গিয়ে দৃষ্টিপথে ওটা পরিষ্কার আসাতে কামানের ঘোড়া টিপল। টিপল বটে, কিন্তু সেই পরিচিত খরখর আওয়াজ কানে না আসাতে অবাক হয়ে গেল। ঘোড়াটা কাজ করছে না।

জার্মান বিমানটি একটু আগে। পিছনে লেগে রইল সে, এমন ভাবে যাতে বিমানটার পিছনদিককার জোড়া মেসিনগানের গুলি নিজের বিমানে না লাগে। মে'র দীপ্ত সকালের পরিষ্কার আলোয় দিগন্তে মস্কোর আভাস, কুয়াশায় আচ্ছন্ন ধূসর পুঞ্জ। দুঃসাহসী একটি জিনিস করার সংকল্প করল স্ত্রুচকভ। বুকপেটি খুলে ফেলে, ককপিটের ছাদটা তুলে দিয়ে, যেন লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন ভাবে টান করল নিজের শরীরকে। বোমারুটার সঙ্গে সমান লাইনে নিয়ে এল নিজের বিমানকে; নিমেষের জন্য একটার পিছনে একটা এমন ভাবে উড়ল যে মনে হল দুটো কোন অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা। "ইয়ুনকারসটার" ককপিটের স্বচ্ছ ছাদ দিয়ে স্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে বুরুজের জার্মান মেশিনগানারের চোখদুটো ওর প্রতিটি ফিকির লক্ষ্য করছে, নিরাপদ জায়গা থেকে ওর বিমানের ডানাটা একটু বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় আছে সে। স্ত্রুচকভ দেখল উত্তেজনায় নিজের হেলমেট খুলে ফেলল জার্মানটা, এমন কি কপালের উপরে গোছায় ঝুলে পড়া তার লম্বা কটা চুল পর্যন্ত তার চোখে পড়ল। ওর দিকে ঘোরানো, বড়ো মেসিনগানের কালো নাকদুটো জীবন্ত জিনিসের মত নড়ছে; সুযোগের অপেক্ষায় নিরস্ত্র লোকের দিকে পিস্তলের নিশানা করেছে কোন ডাকাত, হঠাৎ সেরকম লোকের মত নিজেকে মনে হল স্ত্রুচকভের, আর এই অবস্থায় নিরস্ত্র সাহসী লোকে যা করে ঠিক তাই করল সে — ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপরে। জমিতে হাতাহাতি লড়াই চলে, সেরকম ভাবে নয় অবশ্য; শত্রু বিমানটির পিছনের দিকে নিজের বিমানের ঝকঝকে প্রপেলারের বৃত্তটি লাগাবার জন্য ঝটকায় এগিয়ে গেল সে।

সংঘাতের শব্দ তার কানে আসেনি। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ধাক্কায় উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মনে হল আকাশ ডিগবাজি খাচ্ছে। মাথার উপরে ঝলকে চলে গেল মাটি, গেল থেমে, তারপর তীরবেগে এগিয়ে এল ওর দিকে, উজ্জ্বল সবুজ আর ঝকঝকে মাটি। পারাস্যুট খুলে ফেলল স্ত্রুচকভ, দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে জ্ঞান হারাবার আগে চোখের কোণে পড়ল "ইয়ুনকারসটার" চুরোট-আকৃতি দেহ, লেজটা নেই, হেমন্ত হাওয়ায় ছিন্ন ম্যাপেল পাতার মত ঘুরতে ঘুরতে সেটা সবেগে পেরিয়ে গেল তাকে। পারাস্যুটের দড়িতে অসহায়ভাবে ঝুলতে ঝুলতে, বাড়ির ছাতে জোর ধাক্কা লেগে, মস্কোর উপকণ্ঠে উৎসবমুখর একটি রাস্তায় অচেতন অবস্থায় পড়ল স্ত্রুচকভ। ওখানকার লোকেরা নিচে থেকে দেখেছিল কী অদ্ভুতভাবে জার্মান বিমানটিকে ধাক্কা দিয়ে সে ফেলে দেয়। ওকে তুলে নিয়ে সবচেয়ে কাছের বাড়িতে নিয়ে যায় ওরা। আশেপাশের রাস্তা ভিড়ে ভিড়াক্রান্ত হয়ে গেল, যে ডাক্তারকে ডাকা হয় তিনি অতিকষ্টে গন্তব্যস্থানে পেঁাছলেন। ছাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ফলে ওর হাঁটুর হাড়ে চোট লেগেছে।

"শেষ খবর" এর বিশেষ ঘোষণায় মেজর স্ত্রুচকভের অসমসাহসিকতার কথা বলা হল বেতারে। সহরের সেরা হাসপাতালে ওকে নিয়ে যেতে মস্কো সোভিয়েতের সভাপতি নিজে এলেন। যখন স্ত্রুচকভ ওয়ার্ডে পেঁাছল তখন ওর পিছনে পিছনে আর্দালিরা নিয়ে এল ফুল ফল আর চকোলেট — মস্কোর কৃতজ্ঞ অধিবাসীদের উপহার।

দেখা গেল স্ত্রুচকভ বেশ হাসিখুসি মিশুকে লোক। ওয়ার্ডের দোরগোড়া পেরোতে না পেরোতে রোগীদের কাছে খোঁজখবর নেওয়া হয়ে গেল, এখানকার ভক্ষণ কী রকম, বিধিগুলো কড়া কিনা, ফুটফুটে চেহারার নার্স আছে কিনা। আর যখন হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছে তখন বাহিনীর ক্যানটিন সম্বন্ধে একটি মজার গল্প বলল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে, ভালো চেহারার জন্য তাকে অসঙ্কোচে তারিফ করল। নার্স চলে গেলে তার দিকে চোখ ঠেরে স্ত্রুচকভ বলল:

'খাসা মেয়েটি! কড়া বুঝি? ধর্মভয় জাগিয়ে দেয়? কুছ পরোয়া নেই। যুদ্ধ কৌশলের কথা কিছু ত জানা আছে তোমাদের? যে কোন দুর্গ জয় করা যায়, মেয়েরা ত কোন ছার!' কথাটা বলে বেশ জোরে হেসে উঠল স্ত্রুচকভ।

পুরোনো রোগীর মত ওর হাবভাব, যেন হাসপাতালে বছর খানেক কাটিয়েছে। প্রত্যেককে প্রথম থেকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করল সে। নাক

ঝাড়বার ইচ্ছে হওয়াতে বিনা লৌকিকতায় মেরেসিয়েভের পারাস্যুট সিল্কের রুমালের একটা তুলে নিল, যে রুমালগুলো সযত্নে বানিয়েছিল "আবহাওয়া সার্জেণ্ট"।

'প্রেয়সীর পাঠানো বুঝি?' চোখ ঠেরে আলেক্সেইকে জিজ্ঞেস করে বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখল রুমালটা। 'অনেক রুমাল তোমার, যদি অনেক নাও হয়, তোমার প্রেয়সী খুব খুসির সঙ্গে আর একটা বানিয়ে দেবে তোমার জন্য।'

রোদে-তামাটে গালে গোলাপী আভাস ফেটে বেরোচ্ছে, তবুও আর নবীন মনে হয় না তাকে। চোখের কোণ থেকে শুরু করে গভীর বলিরেখা রগ পর্যন্ত আগাছার মত বিস্তৃত, ওকে দেখলেই মনে হয় ঝানু সৈনিকের কথা — যেখানেই কিট-ব্যাগ, মুখ ধোবার জায়গার উপরের তাকে যেখানটায় সাবানের বাক্স আর টুথব্রাস রাখা হয় সেখানটাই নিজের বাড়িঘরদোর ভাবতে অভ্যস্ত সে। ওয়ার্ডে সে আনল বেশ হৈচৈ আর ফুর্তির ভাব, আর যে-ভাবে আনল তাতে চটল না কেউ, বরঞ্চ সবায়ের মনে হল ও যেন কতকালের চেনা লোক। নবাগতকে সবায়ের বেশ পছন্দ, শুধু মেয়েদের প্রতি ওর স্পষ্ট দুর্বলতা মেরেসিয়েভের কেমন যেন খারাপ লাগল। প্রসঙ্গত, সে-দুর্বলতা গোপন করার কোন চেষ্টা স্যুচকভ করেনি, যে কোন ছুতো পেলেই মেয়েদের আলোচনা শুরু করত সে।

পরের দিন কমিসারের সমাধি।

জানলার তাকে বসে মেরেসিয়েভ, কুকুশকিন আর গভজ্‌দেভ প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে আছে। গোলন্দাজ বাহিনীর এক দল ঘোড়া কামান-গাড়িটাকে টেনে নিয়ে এল, বাদকেরা দাঁড়াল সার বেঁধে, রোদে চকচক করছে বাদ্যযন্ত্রগুলি, একদল সৈনিক মার্চ করে এল। ওয়ার্ডে এসে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা জানলা থেকে সরে আসতে রোগীদের আদেশ দিল। যথারীতি শান্ত আর তৎপর দেখাচ্ছে ওকে, কিন্তু কথা বলার সময়ে ওর গলা যে কেঁপে উঠল সেটা মেরেসিয়েভের কাছে গোপন রইল না। নতুন রোগীটির জ্বর দেখতে এসেছে ও, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে শবযাত্রার একটি সুর বাজাতে শুরু করল বাদকেরা। ফ্যাকাশে হয়ে গেল নার্সের মুখ, হাত থেকে পড়ে গেল থার্মোমিটার, পারার ছোট ছোট চকচকে বিন্দু পার্কেটের মেঝেতে পড়ল ছড়িয়ে। দুহাতে মুখ ঢেকে ওয়ার্ড ছেড়ে ছুটে চলে গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা।

'কী ব্যাপার? ওর মনের মানুষ ছিল বুঝি লোকটা?' বিষণ্ণ সঙ্গীতের সুর জানলা থেকে ভেসে আসছে সে দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল স্ত্রচকভ।

উত্তর দিল না কেউ।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওরা, কামান-গাড়ির উপরে খোলা লাল শবাধার গেট পেরিয়ে রাস্তায় পেঁছিল। ফুল আর ফুলের মালার স্তূপের মাঝখানে শোয়ানো কমিসারের দেহ। কুশনে আঁটা তার সম্মান-চিহ্নগুলো কামান-গাড়ির পিছনে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে লোকজন — একটা, দুটো, পাঁচটা, আটটা সম্মান-চিহ্ন। মাথা নিচু করে পিছু পিছু যাচ্ছে জেনারেলরা। তাদের মধ্যে আছেন জেনারেলের আর্মিকোট পরনে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, কিন্তু কেন জানি খোলা মাথায়। তারপর, অন্যদের থেকে একটু দূরে, মন্থরগতি সৈনিকদের সামনে খোলা মাথায় ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, পরনে শাদা ওভারঅল, প্রায়ই হোঁচট খাচ্ছে, বোঝা গেল সামনের কিছু তার চোখে পড়ছে না। গেটে কে যেন তার কাঁধে একটা কোট চাপিয়ে দিয়েছিল কিন্তু হাঁটবার সময়ে কোটটা মাটিতে পড়ে গেল, কোটটা যাতে পদদলিত না হয় সে জন্য ওর পিছনে অগ্রসর সৈনিকরা সারি ভাঙ্গল।

'কে ও, দোস্ত?' মেজর জানতে চাইল।

উঠে জানলা দিয়ে দেখতে সে-ও চায়, কিন্তু পাদুটো বক্ষফলক দিয়ে বাঁধা।

চোখের বাইরে চলে গেল দলটা। নদীর কাছ থেকে আসছে গম্ভীর সঙ্গীতের বিষণ্ণ কলি, চাপা আর দূর ধ্বনি, বাড়ির দেয়ালে লেগে অস্ফুট প্রতিধ্বনি উঠছে। খোঁড়া দৌবারিকা লোহার গেট বন্ধ করে দিতে ইতিমধ্যেই এসেছে, কিন্তু ৪২ নং ওয়ার্ডের সহবাসীরা তখনো জানলায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে কমিসারকে তার অন্তিম যাত্রায়।

'লোকটা কে বলছ না কেন? তোমরা সবাই পাথর বনে গিয়েছ মনে হচ্ছে!' অধৈর্যভাবে মেজর বলল, তখনো উঠে জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সে।

অবশেষে শুকনো চিড়-খাওয়া গলায় জবাব দিল কুকুশকিন:

'মানুষের মত একজন মানুষের... একজনের বলশেভিকের অন্ত্যেষ্টি।'

"মানুষের মত মানুষ" উক্তিটা গভীর দাগ কাটল মেরেসিয়েভের মনে।

এর চেয়ে ভালো বর্ণনা কল্পনা করা যায় না। ওরও প্রবল বাসনা হল মানুষের মত মানুষ হবার, অন্তিম যাত্রায় যাকে এইমাত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মত হবার।

১২

কমিসারের মৃত্যুর পরে ৪২ নং ওয়ার্ডের আবহাওয়া একেবারে বদলে গেল।

হাসপাতাল ওয়ার্ডে মাঝেমাঝে বিষণ্ণ স্তব্ধতা নামে, বিরস চিন্তায় সবাই হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, বুক ভারী হয়ে ওঠে; ছোট্ট দরদী কথায় সে স্তব্ধতা দূর করার লোক আর নেই। গভজ্‌দেভের নৈরাশ্য হালকা ঠাট্টায় ভাঙ্গার কেউ নেই, মেরেসিয়েভ উপদেষ্টাহীন, কুকুশকিন গজগজ করেই চলে, না চটিয়ে হালকা কথায় তাকে দাবাবার কেউ নেই। যে চুম্বক এতদিন বিভিন্ন স্বভাবের লোককে আকর্ষণ করে একত্র করত সে চুম্বক অদৃশ্য।

কিন্তু সেটার প্রয়োজনও এখন ততটা নেই। চিকিৎসা আর সময় কাজ দিয়েছে। সবাই তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে, হাসপাতাল ছাড়ার সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই কমে যাচ্ছে রোগ নিয়ে আলোচনা। হাসপাতালের বাইরে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে, নিজের নিজের সামরিক দল কী ভাবে তাদের অভ্যর্থনা করবে, কী কাজ করতে হবে, সেই ভাবনায় সবাই বিভোর। অভ্যস্ত সামরিক জীবনে ফিরে যেতে সবায়ের আকাঙ্ক্ষা, হাসপাতাল ছেড়ে গিয়ে সময়মত নতুন আক্রমণে যোগ দেবার ব্যাকুল আগ্রহে প্রত্যেকের হাত যেন সুড়সুড় করছে। আক্রমণ যে শুরু হবে, আকাশে আসন্ন ঝড়ের মত তার আভাস, রণাঙ্গনে হঠাৎ নামা স্তব্ধতা থেকেও আঁচ করা যায় সেটা।

হাসপাতাল থেকে বাহিনীতে কাজে ফিরে যাওয়া সৈনিকের পক্ষে অসাধারণ কিছু ব্যাপার নয়। মেরেসিয়েভের পক্ষে কিন্তু সেটা একটা সমস্যা। পায়ের পাতা নেই, দক্ষতা আর শিক্ষা তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে কি? জঙ্গী বিমানের ককপিটে সে কি আবার চড়তে পারবে? লক্ষ্যে পেঁছবার উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ আগ্রহে আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কাজ করে যাচ্ছে সে। ব্যায়ামের সময় আস্তে আস্তে বাড়িয়েছে, পাদুটোকে খাটায়, তালিমি ব্যায়াম, সাধারণ সব ব্যায়াম রীতির চর্চা করে সে সকাল আর সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা ধরে। তবুও যথেষ্ট মনে হয় না তার। বিকেলেও ব্যায়াম শুরু করল আলেক্সেই। ওর দিকে অপাঙ্গে তাকাত স্ত্রুচকভ, চোখে চটুল ইয়ার্কির ঝিলিক, আর ঘোষণা করত অধিকারীর মত:

'আর এখন, সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই প্রহেলিকাটি, ওঝা-পণ্ডিত, সাইবেরিয়ার জঙ্গলে অতুলনীয় আলেক্সেই মেরেসিয়েভ নানা খেলা এখন দেখাবেন!'

দারুণ উৎসাহে ব্যায়াম চালাত আলেক্সেই, তার ব্যায়াম রীতিতে সত্যি সত্যি এমন কিছু ছিল যাতে ওকে দেখাত ওঝার মত। শরীরটা যেভাবে অবিরাম নোয়াত আর সোজা করত, ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাত, ঘাড় আর হাতের ব্যায়াম পেণ্ডুলামের মত নিয়মিতভাবে আর দৃঢ়চিত্তে করে যেত সেটা দেখলে কষ্ট হত, সে সময়ে ওয়ার্ডের সহবাসীরা যারা হাঁটাচলা করতে পারে বেরিয়ে যেত করিডরে; আর শয্যাশায়ী স্ত্রুচকভ কম্বলে মাথা ঢেকে চেষ্টা করত ঘুমোবার। ওয়ার্ডের কেউ অবশ্য বিশ্বাস করত না যে পায়ের পাতা নেই যার তার পক্ষে ওড়া কখনো সম্ভব, কিন্তু অধ্যবসায়ের জন্য সহবাসীকে খাতির করত তারা, ভক্তিও হয়ত, আর সেটা ইয়ার্কি-তামাশায় গোপন রাখত।

প্রথমে যা মনে হয়েছিল তার চেয়ে গুরুতর দাঁড়াল স্ত্রুচকভের হাঁটুর গাঁট ভাঙ্গা। খুব আস্তে আস্তে সারছে সে, পাদুটো বন্ধফলকে আটকানো, আর যদিও ওর সেরে ওঠায় কোন সন্দেহ নেই তবুও "হতচ্ছাড়া গাঁটের হাড়গুলোকে" বাপান্ত করার বিরাম নেই, ওগুলো ভয়ানক জ্বালাচ্ছে ওকে। মেজরের গজগজানি গরগরানি বেড়ে পরিণত হত ক্রোধে। তুচ্ছ কোন বিষয় নিয়ে রাগে প্রায় পাগল হয়ে যেত সে, গালিগালাজ করত সবাইকে, সমস্ত কিছুকে। তখন মনে হত কেউ বোঝাবার চেষ্টা করলেই ওর হাতে মার খাবে। সর্বসম্মতিক্রমে এরকম আক্ষেপের সময়ে ওয়ার্ডের রোগীরা ওকে একলা ছেড়ে দিত, ওদের ভাষায়, "গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিক গে লোকটা"। যুদ্ধে স্নায়বিক বৈকল্য ঘটেছে তার, সেটা কাটিয়ে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরে না আসা পর্যন্ত চুপচাপ থাকত সহবাসীরা।

অধৈর্য ভাবটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ, স্ত্রুচকভের নিজের মতে, ও বাইরে গিয়ে শৌচাগারে সিগারেট খেতে পারে না; করিডরে গিয়ে দেখতে পায় না অস্ত্রোপচারাগারের সেই লাল-চুল নার্সকে, পায়ে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ পরাবার সময়ে মেয়েটির সঙ্গে নাকি তার আড়চোখের বিনিময় হয়েছিল। কথাটা কিছু সত্যি হয়ত। কিন্তু মেরেসিয়েভ লক্ষ্য করল যে ওর খিটখিট ভাবটা ফিরে আসে তখনি যখন হাসপাতালের উপর দিয়ে কোন বিমান উড়ে যায়, কিম্বা কোন অভিনব আকাশ-যুদ্ধের কথা অথবা পরিচিত কোন বৈমানিকের বিক্রমের বর্ণনা রেডিও ও খবরের কাগজে প্রচারিত হয়।

মেরেসিয়েভেরও এরকম সময়ে খিটখিটে অধৈর্য লাগে, কিন্তু সে প্রকাশ করে না সেটা, আর স্ত্রুচকভের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে অন্তরে জয়োল্লাসের একটা অনুভূতি হয় তার। মনে হয়, "মানুষের মত মানুষ"এর যে আদর্শ সে খাড়া করেছে তার একটু কাছে অন্তত আসতে পেরেছে।

নিজের স্বভাব মত আছে মেজর স্ত্রুচকভ। প্রচুর খায়, দিলভরা হাসি, মেয়েদের গল্প করতে ভালোবাসে, মনে হয় যে সে একই সঙ্গে ভালোবাসে আর ঘৃণা করে মেয়েদের। ফ্রন্টের পশ্চাদ্ভাগে যে সব মেয়েরা, কোন কারণে বিশেষ তীব্র নিন্দে করে তাদের।

স্ত্রুচকভের গালগল্প অত্যন্ত ঘৃণা করে মেরেসিয়েভ। ওর কথা শোনার সময়ে মেরেসিয়েভের চোখের সামনে সর্বদাই আসে ওলিয়ার কিম্বা আবহাওয়া কেন্দ্রের সেই মেয়েটির ছবি যার সম্বন্ধে রেজিমেণ্টে একটি গল্প চালু ছিল: ব্যাটেলিয়নের একটি অতি-উৎসাহী সার্জেণ্ট-মেজরকে সে একবার তার গুমটি থেকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে খুঁচিয়ে ভাগায়, উত্তেজনায় আর একটু হলে তাকে গুলি করে বসত। আলেক্সেই'র মনে হত এ ধরনের মেয়েদেরই নিন্দে করছে স্ত্রুচকভ। একদিন মেজর স্ত্রুচকভ একটি গল্প বলে এইভাবে শেষ করল সেটা — "ওরা সবাই সমান," "চক্ষের নিমেষে" ওদের যে কোন কাউকে বাগানো যায়। সক্রোধে গল্পটা শুনল মেরেসিয়েভ, নিজেকে সামলাতে না পেরে, দাঁতে দাঁত চেপে পাণ্ডুর মুখে জিজ্ঞেস করল:

'যে কোন কাউকে?'

'হ্যাঁ, যে কোন কেউ,' নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল মেজর।

ঠিক সে সময়ে ওয়ার্ডে ঢুকল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, রোগীদের মুখে উত্তেজনার ভাব দেখে বিস্মিত বোধ করল।

'ব্যাপার কী?' মাথার রুমালের নিচে এক গোছা চুল কিছু না ভেবে ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করল সে।

'জীবন নিয়ে আলোচনা চলেছে, নার্স! আমাদের ব্যাপার ত এখন বুড়োদের মত কথা বলা ছাড়া আর কিছু করার নেই,' মধুর হেসে জবাব দিল মেজর।

'আর এই মেয়েটি?' নার্স চলে গেলে ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ।

'তোমার কি মনে হয় ও আলাদা মালমশলায় তৈরী?'

'ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার কথা তুলো না!' কঠোর স্বরে বলল গভজ্দেভ। 'আমাদের সঙ্গে থাকত একজন, সে ওকে সোভিয়েত দেবী বলে ডাকত।'

'বাজী রাখবে কেউ?'

'বাজী?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ, ওর কালো চোখ ঝলসে উঠল। 'কী বাজী রাখবে?'

'ধরো পিস্তলের গুলি একটা, আগেকার দিনে অফিসাররা যা করত: তুমি জিতলে আমাকে নিশানা করে ছুঁড়তে পারো, যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমার চাঁদমারি হবে,' হাসতে হাসতে বলল স্ত্রুচকভ, সমস্ত ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চায় ও।

'বাজী? ও রকম বাজী? মনে হচ্ছে ভুলে যাচ্ছ সোভিয়েত অফিসার তুমি। তোমার কথা ঠিক হলে আমার মুখে থুথু দিতে পার,' মেরেসিয়েভের দৃষ্টি ভ্রূকুটিকুটিল। 'কিন্তু দেখো যেন, তোমার মুখে আমাকে থুথু না দিতে হয়।'

'না চাইলে বাজী রাখার কোন দরকার নেই। তোমাদের সবাইকে আমি এমনিতেই দেখিয়ে দেব যে ওকে নিয়ে ঝগড়া করার কোন কারণ নেই।'

সেদিন থেকে স্ত্রুচকভ অত্যন্ত আগ্রহে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার মন কাড়ার চেষ্টা শুরু করল। মজার মজার গল্প বলে হাসাত ওকে, এধরনের গল্প বলায় সে ওস্তাদ। যুদ্ধে অভিজ্ঞতার কথা কোন অচেনা লোককে অসংযতভাবে বলা বৈমানিকের পক্ষে নিয়মবিরুদ্ধ, অলিখিত এই নিয়মটি না মেনে স্ত্রুচকভ নার্সটিকে নিজের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলল, ঘটনাবলী সত্যি সত্যিই বিরাট আর চমৎকার। এমন কি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের পারিবারিক জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা ইঙ্গিতে জানাত, নিজের তিক্ত নিঃসঙ্গতা নিয়ে হা-হুতাশ করত। ওয়ার্ডের সবায়ের অবশ্য জানা ছিল যে ও অবিবাহিত, বিশেষ কোন পারিবারিক দুর্ভোগ ওর নেই।

এটা ঠিক যে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা অন্যদের তুলনায় একটু বেশী মনোযোগ দিত ওকে। মাঝেমাঝে খাটের ধারে বসে শুনত ওর নানা অসমসাহসিকতার কথা। আর স্ত্রুচকভ, নিজের অজ্ঞাতসারে যেন, হাত ধরলে সরিয়ে নিত না সেটা। রাগ জমে উঠছে মেরেসিয়েভের মনে, সমস্ত ওয়ার্ড স্ত্রুচকভের প্রতি ক্ষিপ্ত, ও এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সহবাসীদের কাছে প্রমাণ করবেই যে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা অন্য মেয়েদের মতন। অনুচিৎ কাজটা থামাতে ওকে বিশেষভাবে সাবধান করা হল, হস্তক্ষেপ করাতে ওয়ার্ডের

লোকেরা দৃঢ় সংকল্প হয়েছে, এমন সময় সমস্ত ব্যাপারটি একেবারে অভাবনীয় মোড় নিল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় কাজের সময়ের ফাঁকে ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, কোন রোগীকে দেখতে নয়, এমনি গল্প করতে — এর জন্যই রোগীরা ওকে বিশেষ পছন্দ করত। গল্প বলতে শুরু করল মেজর, ওর বিছানার পাশে বসল নার্স। কী করে ঘটল সেটা কারো নজরে পড়েনি, কিন্তু হঠাৎ ও এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে উঠল। ফিরে তাকাল সবাই। ভ্রূকুটিকুটিল মুখে, গাল টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, সক্রোধে মেজর স্ত্রুচকভের দিকে তাকিয়ে — মেজরকে লজ্জিত এমন কি সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে — নার্স বলল:

'কমরেড মেজর, আপনি রোগী আর আমি নার্স, তা না হলে আপনার গালে চড় মারতাম!'

'শুনুন, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, শপথ করে বলছি কিছু মনে না করেই আমি ওটা করেছি... তাছাড়া, কী এসে যায় ওতে!..'

'তাই নাকি? কী এসে যায় ওতে?' এবারে সক্রোধে নয়, অবজ্ঞায় ওর দিকে তাকাল নার্স। 'বেশ। আর কিছু বলার নেই। শুনতে পাচ্ছেন কথাটা? আর আপনাকে আমি বলছি, আপনার বন্ধুদের সামনেই বলছি, চিকিৎসার দরকার না হলে আমার সঙ্গে আর কখনো কথা বলবেন না। শুভ রাত্রি কমরেডরা!'

ঘর ছেড়ে চলে গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, ভারী পদক্ষেপে, ওর পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক; বোঝা গেল নিজেকে অবিচলিত দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করছে।

মুহূর্তের জন্য সবাই চুপচাপ। তারপর শোনা গেল মেরেসিয়েভের ক্রুদ্ধ উল্লসিত হাসি, আর সবাই একজোটে মেজরকে নিয়ে পড়ল:

'উচিত শিক্ষা মিলেছে তা হলে!'

দীপ্ত চোখে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ: 'আপনার মুখে এখন থুথু দেব না পরে, কী চান আপনি?'

স্ত্রুচকভকে অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করল না সে। সে বলল, দৃঢ় প্রত্যয়ে যে নয়, তা ঠিক:

'হ্যাঁ। আক্রমণ করে হটে আসতে হয়েছে। কিছু এসে যায় না, আবার চেষ্টা করা যাবে।'

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চুপ করে শুয়ে রইল সে, শিস দিচ্ছে কখনো আর যেন নিজের নানা ভাবনার জবাবে মাঝেমাঝে বলে উঠছে "হ্যাঁ"।

ঘটনাটির কয়েকদিন পরে কনস্তান্তিন কুকুশকিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। যাবার সময়ে কোন আবেগ দেখাল না সে, ওয়ার্ডের সহবাসীদের কাছে বিদায় নিতে নিতে শুধু বলল যে হাসপাতালের জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে তার। একটু হেলায় সবাইকে বিদায় জানাল, শুধু মেরেসিয়েভ আর নার্সটিকে অনুরোধ করল যে ওর মায়ের কোন চিঠি এলে সেটা নিয়ে তার রেজিমেণ্টে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

'ওখানে কেমন চলেছে, তোমার বন্ধুরাই বা কী ভাবে তোমাকে অভ্যর্থনা করল, চিঠি লিখে জানিও আমাদের,' বিদায়ের সময়ে বলল মেরেসিয়েভ।

'তোমাকে চিঠি লিখব কেন! আমার কী পরোয়া কর তুমি? লিখব না আমি, মিছিমিছি কাগজ নষ্ট করে কী হবে, আর লিখলেও তুমি ত জবাব দেবে না।'

'যা খুসি তোমার।'

বোঝা গেল শেষ উক্তিটি কানে যায়নি কুকুশকিনের। ফিরে না তাকিয়ে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল সে। হাসপাতালের গেট ছেড়ে বেরিয়ে গেল, বাঁধ ধরে এগিয়ে মোড় ঘুরল, পিছনে একবারও না তাকিয়ে, যদিও ও ভালো করেই জানত যে প্রথা মত ওয়ার্ডে ওর সহবাসীরা সবাই জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে।

যা হোক, আলেক্সেইকে চিঠি লিখল কুকুশকিন, একটু শীগগিরই বলতে হবে। কোন আবেগ নেই, নীরস ঢঙে লেখা। নিজের কথা শুধু লিখেছে যে উইঙের লোকেরা ওকে ফিরে পেয়ে খুসি মনে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা জানিয়ে দিয়েছে যে হালের যুদ্ধে অনেক লোক হতাহত হয়েছে, সেজন্য অভিজ্ঞ যে কোন কাউকে ফিরে পেলে ওরা অবশ্যই খুসি হয়। হতাহতের একটি ফিরিস্তি দিয়েছে কুকুশকিন, লিখেছে যে বিমান-ঘাঁটিতে এখনো মেরেসিয়েভের কথা বলে। আর উইং-কম্যান্ডার, পদোন্নতির ফলে যিনি এখন লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেল, মেরেসিয়েভের ব্যায়াম বিদ্যা আর বিমান বাহিনীতে ফিরে আসার সংকল্পের কথা শুনে বলেছেন, "মেরেসিয়েভ ফিরে আসবে নিশ্চয়ই। কোন গোঁ ধরলে সেটা ছাড়ে না, ও এধরনের লোক।" সেটা শুনে চিফ অব্ স্টাফ বলেন, অসম্ভব যেটা সেটা কেউ করতে পারে না। জবাব দেন উইং-কম্যান্ডার যে মেরেসিয়েভের মত লোকের কাছে অসম্ভব বলে কিছু

নেই। বিস্মিত হয়ে আলেক্সেই দেখল যে এমন কি "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" বিষয়েও কুকুশকিন কয়েক ছত্র লিখেছে। লিখেছে যে প্রশ্নবাণে সার্জেণ্টটি তাকে এমন .জর্জরিত করে যে বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হয়, "এবাউট টার্ণ, মার্চ!" উপসংহারে কুকুশকিন লিখেছে যে ইউনিটে ফিরে গিয়ে প্রথম দিনেই দুবার বিমান চালায় ও, পাদুটো একেবারে সেরে গিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা নতুন বিমান পাবে—'লাভচ্‌কিন-৫,' শীগগিরই এসে পড়বে সেগুলো। সেগুলোকে চালিয়ে দেখেছিল আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো, ওর মতে এগুলোর তুলনায় জার্মানদের সব বিমান বস্তাপচা মাল।

১৩

তাড়াতাড়ি গ্রীষ্ম শুরু হল। সেই পপলারগাছটার শাখা থেকেই উঁকি মারল ৪২ নং ওয়ার্ডে, গাছের পাতাগুলো এখন কঠিন আর উজ্জ্বল। যেন ফিসফিসানি চলেছে নিজেদের মধ্যে এমন অধীরভাবে পাতাগুলো নড়ে। সন্ধ্যার দিকে রাস্তার ধুলোর দরুন তাদের জৌলুষ মিলিয়ে যায়। লাল ফুলের ছড়িগুলো অনেকদিন হল ঝকঝকে সবুজ ঝাড়ে পরিণত হয়েছে, ফেটে গিয়েছে ঝাড়গুলো, হালকা ফেঁসো রোঁয়া পড়ছে তা থেকে। মধ্যাহ্নে, দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে উষ্ণ পপলার রোঁয়া মস্কোর চারিদিকে উড়ে বেড়ায়, খোলা জানলা দিয়ে ঢোকে হাসপাতালে, গরম হাওয়ায় উড়ে দরজায় আর কোণে কোণে লালচে গোছায় জমা হয়।

গ্রীষ্মের একটি শীতল উজ্জ্বল সোনালী সকালে খুব গম্ভীর মুখে ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা; সঙ্গে প্রবীণ ব্যক্তি একজন, স্টিলের চশমা তার দিয়ে বাঁধা, পরনে নতুন, শক্ত করে মাড়-দেওয়া শাদা ওভারঅল, তা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে যে ও পুরোনো কারিগর। শাদা কাপড়ে-মোড়া কী একটা জিনিস ওর হাতে। মেরেসিয়েভের বিছানার পাশে মেঝেতে বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে গম্ভীরভাবে যাদুকরের মত ওটাকে খুলতে শুরু করল লোকটি। চামড়ার মচমচ আওয়াজ শোনা গেল, চামড়ার প্রীতিকর তীক্ষ্ম ঝাঁঝালো গন্ধে ওয়ার্ড ভরপুর।

বাণ্ডিলটা খোলা হল, দেখা গেল একজোড়া নতুন হলদে কচকচে কৃত্রিম অঙ্গ, নিপুণভাবে মাপসই তৈরী করা। কৃত্রিম অঙ্গদুটোর উপরে রয়েছে

বাহিনীর নতুন বাদামী একজোড়া বুট; বুটজোড়া এত মাপসই যে দেখলে মনে হয় অঙ্গদুটো বুট-পরা জীবন্ত দুটো পা।

'আর একজোড়া গ্যালশ শুধু আপনার দরকার, সেটা পেলেই, ব্যস, আপনি পরে বিয়ে করতে যেতে পারবেন,' চশমার মধ্য দিয়ে নিজের হাতের কাজের তারিফ করতে করতে বলল কারিগর। 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ নিজে ফরমায়েস করেছিলেন। তিনি বলেন, "জুয়েভ, আসল পায়ের চেয়েও ভালো একজোড়া পা বানাও ত," আর দেখুন, জোড়াটা সামনেই রয়েছে! জুয়েভের তৈরী জিনিস। রাজার যুগ্যি!'

নকল পাদুটো দেখে মেরেসিয়েভের অন্তর সংকুচিত হয়ে গেল, কুঁকড়ে জমে গেল; কিন্তু সে ভাবটা বেশীক্ষণ রইল না; ও-দুটো পরে দেখার আর হাঁটার, নিজে নিজে হাঁটার আগ্রহ জয়লাভ করল। কম্বলের তলা থেকে পাদুটো ঝট করে বের করে কৃত্রিম অঙ্গদুটোকে তাড়াতাড়ি পরিয়ে দিতে বলল কারিগরকে। কিন্তু বুড়ো তাড়াহুড়ো পছন্দ করে না; ও যে-সে লোক নয়, জানাল যে বিপ্লবের অনেক আগে "বড়ো একজন ডিউক" এর জন্য কৃত্রিম পা বানিয়ে দিয়েছিল, ঘোড়দৌড়ের মাঠে ডিউকের পাটি ভেঙ্গে যায়। নিজের কাজে বিশেষ জাঁক তার, ক্রেতাকে জিনিসটা রসিয়ে দিতে চায়।

আস্তিন দিয়ে অঙ্গদুটোকে মুছে ছোট একটা দাগ নখ দিয়ে ঘষে তুলে ফুঁ দিল সে জায়গাটায়, ধবধবে শাদা ওভারঅলে ঝকঝকে করা হল জায়গাটা, তারপর অঙ্গদুটোকে মেঝেতে রেখে নেকড়াটা ধীরেসুস্থে ভাঁজ করে পকেটে রাখল কারিগর।

'চটপট করো, দাদু, পরে দেখা যাক ওদুটোকে,' বিছানার ধারে বসে অধৈর্যভাবে বলল মেরেসিয়েভ।

কাটা, খোলা পাদুটোর দিকে এবার অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকাল মেরেসিয়েভ, ভালোই লাগল দেখে। শক্ত আর পেশল দেখাচ্ছে পাদুটোকে, বাধ্য হয়ে নড়াচড়া বন্ধ করলে যে ধরনের চর্বি সাধারণত জমে ওঠে, সেরকম নয়, কালো চামড়ার নিচে শক্ত পেশী উচ্ছল, কাটা অঙ্গের পেশী যেন নয়, খুব তাড়াতাড়ি চলায় অভ্যস্ত কারোর সুস্থ অঙ্গের পেশীর মত!

'"চটপট করো, চটপট করো," বলার মানেটা কী? বলাটা যত সহজ করাটা তত নয়,' গজগজ করল বুড়ো। 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আমাকে বলেন, "জুয়েভ, তোমার সারা জীবনের সেরা একটা জোড়া বানাও ত। লেফটেনাণ্টটি" তিনি বলেন, "পায়ের পাতা না থাকা সত্ত্বেও বিমান চালাতে

চায়।" আর তাই বানিয়েছি আমি! দেখো দুটোকে! ওদুটো পরে শুধু হাঁটা নয়, এমন কি বাইক চড়তে আর মেয়েদের সঙ্গে পোলকা নাচতেও পারবে... খাসা জিনিস, সত্যি বলছি!'

কৃত্রিম অঙ্গটির নরম পশমী খাপে আলেক্সেই'র ডান পাটা ঢুকিয়ে দিল সে, ফিতে দিয়ে শক্ত করে সেটাকে বেঁধে, এক পা হটে, তারিফ করে চুকচুক শব্দ করল।

'খাসা বুট! পায়ে ঠিক হয়েছে ত? কোন জায়গায় বিঁধছে না, বিঁধছে কি? মনে ত হয় বিঁধছে না! সারা মস্কোতে জুয়েভের চেয়ে ভালো কারিগর কোথাও পাবে না!'

নিপুণ হাতে কারিগর অন্যটি পরিয়ে দিল মেরেসিয়েভের পায়ে, কিন্তু ফেট্রি বেঁধে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ ঝটকায় বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে মেঝেতে পা রাখল মেরেসিয়েভ। ভারী, ধপাস একটা শব্দ। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে মেরেসিয়েভ বিছানার ধারে মেঝেতে সটান পড়ে গেল।

এত অবাক হয়ে গেল বুড়ো কারিগর যে চশমাজোড়া কপালে উঠল। ওর খরিদ্দার যে এত চপল হবে আশা করেনি সে। মেঝেতে অসহায় অসাড়ভাবে শুয়ে আছে মেরেসিয়েভ, বুট-পরা কৃত্রিম পাদুটো ফাঁক করে ছড়ানো। হতবুদ্ধি ব্যথিত ভীত ভাব মুখে। সত্যিই কি নিজেকে ঠকাতে চেয়েছিল সে?

বিস্ময়ে দুটো হাত জুড়ে ছুটে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, ধরাধরি করে কারিগর আর সে আলেক্সেইকে তুলে বসিয়ে দিল বিছানায়। আলেক্সেই বসে রইল অবশ বিরসভাবে, মূর্তিমান হতাশার মত।

'ওহে বাপু, এরকম কক্ষণো কোরো না আর!' সমঝিয়ে বলল কারিগর। 'লাফের মত লাফ বটে, যেন পাদুটো সত্যিকারের! তাহলেও বাপু, মুষড়ে পড়া তোমার চলবে না। কী করে হাঁটতে হয় আবার শিখতে হবে, গোড়া থেকে শুরু করে। তুমি যে সৈনিক সেটা বেমালুম ভুলে যাও। নেহাৎ বাচ্চা তুমি, হাঁটাচলা শিখতে হবে, ধীরে ধীরে প্রথমে ক্রাচ ধরে, তারপর দেয়াল ধরে, আর শেষে লাঠি। ঝট করে সব একসঙ্গে করা চলবে না, আস্তে আস্তে করতে হবে। পাদুটো ভালো, কিন্তু তোমার আসল পা ত নয়। তোমার মা-বাপ যে দুটো ঠ্যাং তোমাকে দিয়েছিল তার জোড়া আর কোথায় মিলবে!'

বেয়াড়া লাফটার পরে পাদুটোয় বেশ ব্যথা, তাহলেও তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম অঙ্গদুটো আবার পরে দেখবার আগ্রহ আলেক্সেই'র। ওরা এ্যালুমিনিয়ামের দুটো হালকা ক্রাচ নিয়ে এল। ডগাটা মেঝেতে চেপে, প্যাডদুটো বগলের

নিচে দিয়ে ধীরে ধীরে আর সাবধানে বিছানা থেকে নেমে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল আলেক্সেই। আর বাস্তবিকই সে পা ফেলল শিশুর মত, যে সবেমাত্র হাঁটতে শিখছে, সহজাতভাবে জানে যে হাঁটতে পারে, কিন্তু দেয়ালটা ছেড়ে দেবার ভরসা নেই। শিশুর বুকে তোয়ালে জড়িয়ে মা কিম্বা ঠাকুমা প্রথম পা ফেলতে শেখাচ্ছে, ঠিক সেরকমভাবে আলেক্সেইকে দুধার থেকে সাবধানে ধরল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা আর বুড়ো কারিগর। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে, কৃত্রিম অঙ্গদুটো আর পায়ের সন্ধিস্থলে অসম্ভব ব্যথা। তারপর ইতস্তত করে একটা ক্রাচ এগিয়ে দিল, তারপর পরেরটা, শরীরের ভার তাদের উপরে দিয়ে, একটার পর একটা পা ফেলল। চামড়ার মচমচ আওয়াজ, মেঝেতে দুটো জোর ঠকঠক শব্দ।

'শুভ যাত্রা, শুভ যাত্রা!' নিশ্বাস চেপে বলল বুড়ো কারিগর।

সাবধানে আরো কয়েক পা এগুল মেরেসিয়েভ। কিন্তু কৃত্রিম পায়ের পাতায় প্রথম কয়েক পা হেঁটে ভয়ানক পরিশ্রম হল, দরজা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে বিছানায় ফিরে এসে মনে হল যেন এক বস্তা চাল ঘাড়ে করে সিঁড়ি ভেঙ্গে চারতলায় নিয়ে গিয়েছে। হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, দরদর ঘাম, চিৎ হয়ে শোবার ক্ষমতা নেই।

'কেমন লাগল ওদুটো, বলো ত? জুয়েভের মত আদমী দুনিয়ায় আছে. সেজন্য ভগবানকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত,' ফিতে খুলে আলেক্সেই'র পাদুটো ছাড়াতে ছাড়াতে দেমাকে বকবক করে চলল বুড়ো। অনভ্যস্ত চাপে পাদুটো একটু ফুলে গিয়েছে। 'মামুলি ওড়া কেন, ওদুটো পরে একদম ভগবানের কাছে উড়ে চলে যেতে পারবে। খাসা হয়েছে, সত্যি বলছি!'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দাদু! খাসা হয়েছে, সত্যি। সেটা ত চোখেই দেখতে পাচ্ছি,' কোনক্রমে বলল আলেক্সেই।

কিছুক্ষণ বুড়ো দাঁড়িয়ে রইল, যেন কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য অস্থির, কিন্তু সাহস হচ্ছে না, অথবা ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা হবে, তার প্রতীক্ষায় আছে। অবশেষে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আস্তে আস্তে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল:

'বিদায় তাহলে। আশা করি ওদুটো তোমার পছন্দসই।' দরজার কাছে তখনো পেঁছয়নি, স্ত্রুচকভ ওকে ডেকে বলল:

'ওহে, বুড়ো! এটা নাও, রাজার যোগ্য পা বানিয়েছ, তার জন্যে ফুর্তি করে পান করা ত চাই!' বুড়োকে কয়েকটা নোট দিল স্ত্রুচকভ।

'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে! পান করার মত ব্যাপার এটা নিশ্চয়ই!' বলল বুড়ো, ওভারঅলের পাড়টা তুলে, যেন কারিগরের এপ্রণ ওটা, টাকাটা পিছনের পকেটে রাখল উচিত গাম্ভীর্যে। 'ধন্যবাদ। এক পাত্র খাব নিশ্চয়ই। আর পাদুটো, সত্যি বলছি, ওদুটো বানাতে প্রাণ দিয়ে খেটেছি। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বলেছিলেন, "জুয়েভ, এটা মামুলি ফরমায়েস নয়। সবচেয়ে ভালো করে করা চাই," কিন্তু জুয়েভ কি কখনো গা ঢিলে দিয়ে কাজ করেছে? ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন আমার কাজে আপনারা খুসি হয়েছেন।'

সেলাম জানিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বুড়ো চলে গেল। খাটের পাশে নতুন পাদুটো, যত তাদের দেখছে মেরেসিয়েভের তত ভালো লাগছে ওদুটোর নিপুণ নক্সা, চমৎকার পালিশ আর লঘুভার। "বাইক চড়ো, পোলকা নাচো, বিমানে ওড়ো, স্বয়ং ভগবানের কাছে উড়ে চলে যাও! করব তাই, সবকিছু করব!" ভাবল আলেক্সেই।

সেদিন ওলিয়াকে একটা লম্বা আর খোশমেজাজী চিঠি লিখল সে। জানাল যে নতুন বিমান নেবার কাজ শেষ হয়ে আসছে, আশা করছে যে হেমন্তে, বড়ো জোর শীতে, বড়ো কর্তারা ফ্রন্টের পিছনে এই বিরস কাজ থেকে মুক্তি দেবে ওকে, কাজটা মোটেই ভালো লাগছে না; তারপর ওরা ওকে ফ্রন্টে, নিজের রেজিমেন্টে পাঠাবে, সেখানে বন্ধুরা এখনো ওকে মনে রেখেছে, ওর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় আছে। বিপর্যয়ের পর এই প্রথম খোশমেজাজী চিঠি আলেক্সেইর, এই প্রথম সে প্রেয়সীকে জানাল যে সব সময় তার কথা ভাবে, বিরহে কাতর সে; আর একটু সঙ্কোচে জানাল তার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার কথা, যুদ্ধের শেষে দেখা হবে আবার, তখন দুজনে ঘর বাঁধবে, অবশ্য ওর মন যদি বদলে না যায়। চিঠিটা কয়েকবার পড়ল আলেক্সেই, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষের কটা লাইন সাবধানে কেটে দিল।

সেদিন "আবহাওয়া সার্জেন্টকে" লেখা তার চিঠিটাতে ফুর্তি আর আমোদের ভাব যেন উপচিয়ে পড়ছে, অতি-উল্লেখযোগ্য দিনটির সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হল। কৃত্রিম পাদুটো— ওরকম জোড়া কোন লাট কখনো পরেনি — তাদের একটা বর্ণনা দিল আলেক্সেই, কী করে প্রথম কয়েক পা হেঁটেছে বলল, জানাল বকবকে বুড়ো কারিগরটা কেমন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছে সে যে আলেক্সেই বাইক চড়তে পারবে, পোলকা নাচবে আর সটান বেহেস্ত পর্যন্ত উড়ে যেতে পারবে। তাহলে রেজিমেন্টে আমি যাচ্ছি, আমাকে ভুলে যেও

না, কম্যাণ্ডাণ্টকে বলে নতুন ঘাঁটিতে আমার জন্য একটা ঘর ঠিক করে রাখতে লিখল আলেক্সেই, মেঝের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে। খাটের নিচে থেকে বেরিয়ে আছে পায়ের চেটোদুটো, যেন কেউ লুকিয়ে রয়েছে। চারদিক চেয়ে আলেক্সেই দেখে নিল কেউ তাকে দেখছে কিনা, তারপর ঝুঁকে ঠাণ্ডা চকচকে চামড়াটায় আদর করে টোকা মারল।

আর একটা জায়গায় ৪২ নং ওয়ার্ডে "রাজার যুগ্যি" একজোড়া কৃত্রিম পাএর আবির্ভাবের কথা নিয়ে ব্যগ্র আলোচনা চলল: জায়গাটা হল সেখানে যেখানে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠক্রমের তৃতীয় কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে। সেখানকার সমস্ত মেয়েরা--সে সময়ে তারাই সবচেয়ে দলে ভারী--৪২ নং ওয়ার্ডের সমস্ত কিছু বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল পাকাপোক্তভাবে। পত্রলেখককে নিয়ে আনিউতার গর্বের সীমা ছিল না; লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভের চিঠিপত্র সবাইয়ের জন্য লেখা না হলেও সবটা কিম্বা খানিকটা চেঁচিয়ে পড়ে শোনাত আনিউতা, অন্তরঙ্গ কথাগুলো অবশ্য বাদ দিয়ে। প্রসঙ্গত, চিঠিপত্র চলতে চলতে অন্তরঙ্গ অংশগুলোর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

পাঠক্রমের তৃতীয় কোর্সের সবাই বীর গ্রিশা গভজ্‌দেভকে ভালোবাসে, বদমেজাজী কুকুশকিনকে পছন্দ নয় তাদের, অদম্য সংকল্পের জন্য সম্ভ্রম করে তারা মেরেসিয়েভকে। কমিসারের মৃত্যু স্বজনবিয়োগের মত লেগেছিল তাদের, গভজ্‌দেভের উচ্ছ্বসিত বর্ণনার ফলে সবাই কমিসারকে বুঝতে পেরেছিল আর ভালোবেসেছিল। যখন খবর এল যে বিরাট প্রাণমুখর মানুষটি আর নেই, তখন চোখের জল সামলাতে পারেনি অনেকে।

হাসপাতাল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় ক্রমশ বেড়ে চলল। সাধারণ ডাকে সন্তুষ্ট নয় ওরা, সে সময়ে সাধারণ ডাকে চিঠিপত্র আসতে বেশ দেরী হত। একটা চিঠিতে গভজ্‌দেভ লিখল, কমিসার বলেছে যে আজকাল চিঠিপত্র গন্তব্যে পৌঁছয় সুদূর তারার আলোর মত। মানুষের জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার চিঠিপত্র ঢিমে তালে চলে অবশেষে যাকে লেখা তার কাছে পৌঁছিয়ে বহুদিন মৃত পত্রলেখকের কথা জানাবে তাকে। বেশ উদ্যোগী আর চটপটে মেয়ে আনিউতা, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান আরো তাড়াতাড়ি কী করে হতে পারে খোঁজখবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত বের করল একটি বয়স্কা নার্সকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক আর ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের হাসপাতাল, দুটো জায়গাতেই কাজ করে সে।

সেদিন থেকে ৪২ নং ওয়ার্ডে কী ঘটছে তার খবর দ্বিতীয়, বড়ো জোর, তৃতীয় দিনেই পেঁাছত বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাড়াও পড়ে যেত চটপট। "রাজার যুগ্যি" কৃত্রিম পাদুটো নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হল, প্রতিপাদ্য বিষয়টা হল মেরেসিয়েভ বিমান চালাতে পারবে কি না। যৌবনসুলভ আগ্রহে চলল তর্ক; দুপক্ষেরই সহানুভূতি মেরেসিয়েভের দিকে। জঙ্গী বিমান চালানো জটিল কাজ, সেটা ভেবে নৈরাশ্যবাদীরা বলল মেরেসিয়েভ পারবে না। আর আশাবাদীরা জবাবে বলল যে মানুষ শত্রুকে এড়াবার জন্য গভীর বনে দুসপ্তাহ হামাগুড়ি দেয়, ভগবান জানেন ক কিলোমিটার, তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। নিজেদের যুক্তির সমর্থনে তারা ইতিহাস এবং উপন্যাস থেকে অনেক নজির বের করল।

তর্কে যোগ দিল না আনিউতা। অজানা বৈমানিকের কৃত্রিম পায়ে বিশেষ উৎসাহ নেই তার। বিরল অবসর মুহূর্তগুলিতে ও ভাবত গভজ্‌দেভের বিষয়ে নিজের মনোভাবের কথা, ওর মনে হচ্ছে যে সম্পর্কটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। বিশেষ মর্মান্তিক এই বীর অফিসারটির জীবন, প্রথমে তার কথা শুনে ওর দুঃখ কিছুটা লাঘব করার নিঃস্বার্থ আবেগে চিঠি লেখে আনিউতা। কিন্তু চিঠিপত্রের মারফৎ পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল, তখন দেশপ্রেমিক যুদ্ধের এই বিমূর্ত বীরটির জায়গায় ওর মনে এল আসল জীবন্ত একটি যুবকের ছবি, আর তার বিষয়ে আগ্রহ বেড়ে চলল ক্রমশ। দেখল চিঠিপত্র না এলে উৎকণ্ঠিত বিষণ্ণ লাগে। অনুভূতিটা নতুন কিছু, তাতে খুসি হল আর ভয় পেল। এটা কি ভালোবাসা? যাকে কখনো দেখেনি, যার গলা পর্যন্ত শোনেনি, যার সঙ্গে চেনা শুধু চিঠির মাধ্যমে, তাকে ভালোবাসা কি সম্ভব? ট্যাঙ্ক-অফিসারের চিঠিপত্রে ক্রমশ এমন সব কথা এসে পড়ত যেগুলো বন্ধুবান্ধবকে শোনাতে পারত না আনিউতা। একটা চিঠিতে গভজ্‌দেভ স্বীকার করল "চিঠিপত্রের আদানপ্রদানে প্রেমে পড়েছে" সে, সেটা পড়ে আনিউতা উপলব্ধি করল সে নিজেও প্রেমে পড়েছে, স্কুলের মেয়ের সে-প্রেম নয়, সত্যিকারের ভালোবাসা। চিঠির প্রতীক্ষায় অধৈর্যভাবে থাকত সে, বুঝতে পারল যে চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেলে জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে যাবে।

দেখাসাক্ষাৎ না হলেও নিজেদের প্রেমের কথা এইভাবে স্বীকার করল দুজনে, কিন্তু তার পরেই গভজ্‌দেভের অদ্ভুত কিছু একটা ঘটল নিশ্চয়ই। অস্থির অস্বস্তিতে ভরা অস্পষ্ট ওর চিঠিগুলো। পরে সাহসে বুক বেঁধে

আনিউতাকে লিখে পাঠাল যে দেখাসাক্ষাৎ হবার আগেই প্রেমের কথা বলা দুজনেরি ভুল হয়েছে: ওর নিজের মুখ কি ভয়াবহভাবে বিকৃত সেটা ধারণা করতে পারবে না আনিউতা, যে পুরোনো ফটোটা পাঠিয়েছে তার সঙ্গে এখনকার চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই। আনিউতাকে ঠকাতে চায় না সে, যাকে ভালোবাসে তাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত আনিউতা যেন আর নিজের মনোভাবের কথা না লেখে, অনুরোধ করল গভজ্‌দেভ।

চিঠিটা পড়ে প্রথমে রাগ হল আনিউতার, তারপর ভয়। পকেট থেকে ফটোটা বের করল। রোগাটে যুবাসুলভ মুখাবয়ব, দৃঢ় গঠন, সোজা খাড়া নাক, ছোট গোঁফ, আর সুগঠিত মুখ চেয়ে আছে তার দিকে। "আর এখন? কেমন চেহারা হয়েছে তোমার, লক্ষ্মী বেচারি" ফটোটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল আনিউতা। ডাক্তারি ছাত্রী হিসেবে ও জানত যে পোড়ার ঘা সহজে সারে না, গভীর চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়। কোন কারণে মনে পড়ল অ্যানাটমিক্যাল মিউজিয়ামে দেখা লুপুস রোগীর মুখের প্রতিকৃতির কথা: নীলচে বলিরেখায় আর ছোট ছোট ফুস্কুড়িতে মুখটা ক্ষতবিক্ষত, ক্ষয়ে-যাওয়া, এবড়োখেবড়ো ঠোঁট, গোছা গোছা ভুরু, চোখের পাতা লাল, ভোমা নেই। ওর চেহারাও যদি এরকম হয়? কথাটা মনে আসাতেই আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল আনিউতা কিন্তু তক্ষুণি মনে মনে নিজেকে বকল ও... বেশ, যদি তাই হয়? জ্বলন্ত ট্যাঙ্কে বসে আমাদের শত্রুর সঙ্গে লড়েছে ও, আনিউতার স্বাধীনতা, শিক্ষাধিকার, সম্মান আর জীবন রক্ষা করেছে। গভজ্‌দেভ বীর। কতবার না নিজের জীবন সংশয় করেছে, এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে প্রাণের পরোয়া না করে আবার লড়াই করার জন্য উন্মুখ ও। আর যুদ্ধে সে নিজে কী করেছে? পরিখা খুঁড়েছে, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছে, আর এখন বেজ-হাসপাতালে কাজ করছে। কিই বা ও করেছে তার তুলনায় এদের মূল্য কতখানি? "সন্দেহ করা মানে ওর যোগ্য আমি নই," নিজেকে ধমকাল আনিউতা, চোখের সামনে আসা সেই বিকৃত মুখটির ভয়াবহ ছবিটাকে দূর করে দেবার চেষ্টা করল। গভজ্‌দেভকে চিঠি লিখল একটা আনিউতা, পত্র বিনিময় শুরু হবার পর দীর্ঘতম আর কোমলতম চিঠি। ওর নানা সন্দেহের কথা স্বভাবতই গভজ্‌দেভ কিছু জানতে পারল না। নিজের উৎকণ্ঠিত চিঠির জবাবে পাওয়া চমৎকার চিঠিটা বারবার পড়ল সে। এমন কি স্তুচকভকেও জানানো হল ওটার কথা; সে একটু অনুকম্পার ভাবে গল্পটা শুনে বলল:

'কুছ পরোয়া নেই, বন্ধু। কথাটা শুনেছ ত: "সুন্দর মুখ, পাষাণ হৃদয়; সাদাসিধে মুখ, সোনার বুক।" এখন আরো বেশী করে সত্যি এটা, বেটাছেলে এত বিরল আজকাল।'

স্বভাবতই খোলাখুলি কথায় আশ্বাস পেল না গভজ্‌দেভ। হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার দিন এগিয়ে আসছে যত তত ঘন ঘন আয়নায় নিজের মুখ দেখে, কখনো দূর থেকে, তাড়াতাড়ি করে, চকিত দৃষ্টিতে, আবার কখনো বা প্রায় আয়নার কাচে লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজের ক্ষতবিক্ষত, ঝলসে-যাওয়া মুখে হাত বোলায়।

তার অনুরোধে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা কিছু পাউডার আর ক্রিম এনে দিল, কিন্তু শীগগিরই সে বুঝতে পারল দাগগুলো কোন প্রসাধনেই ঢাকবে না। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ও চুপিচুপি বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাগগুলো ঘষত, পাউডার লাগিয়ে আবার ঘষত, তারপর প্রত্যাশায় তাকাত আয়নার দিকে। দূর থেকে দারুণ ভালো দেখায় ওকে: শক্ত চেহারা, চওড়া কাঁধ, অপ্রশস্ত কোমর পেশল পায়ের উপরে সুন্দর বসানো। কিন্তু কাছে থেকে! গালে আর চিবুকে লাল লাল ক্ষতচিহ্ন, টানা কোঁচকানো চামড়া, দেখে হতাশায় তার মন ভরে যায়। "চেহারাটা দেখে কী ভাববে ও?" মনে মনে জিজ্ঞেস করত গভজ্‌দেভ। আতঙ্কিত হবে আনিউতা। একবার তাকিয়ে ঘুরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে যাবে ও। কিম্বা সেটা আরো বিশ্রী হবে — ভদ্রতার খাতিরে হয়ত ঘণ্টাখানেক গভজ্‌দেভের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবে, তারপর সৌজন্য করে কিছু একটা বলে বিদায় জানাবে। রাগে ফ্যাকাশে হয়ে গেল গভজ্‌দেভ, যেন ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছে।

তারপর গাউনের পকেট থেকে একটা ফটো বের করে গভজ্‌দেভ চেহারাটি দেখত খুঁটিয়ে: গোলগাল মুখ, হালকা পাতলা কিন্তু ফাঁপানো চুল প্রশস্ত কপালের উপরে টান করে আঁচড়ানো, বোঁচা, উপর দিকে তোলা খাস রুশ নাক, আর নরম শিশুসুলভ ঠোঁট। উপরের ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা তিল। সরল মিষ্টি মুখ থেকে একজোড়া কটা, কিম্বা নীল আর একটু বেরিয়ে-আসা চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে সহজ ও খোলাখুলিভাবে।

"কেমন ধরনের লোক তুমি, বলো ত? ভয়ে কি আঁতকে উঠবে তুমি? ছুটে পালাবে? তোমার মন কি এত দরাজ যে রাক্ষসের চেহারাটা চোখ এড়িয়ে যাবে?" একাগ্রভাবে ফটোটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে গভজ্‌দেভ।

আর এদিকে ক্রাচের ঠকঠক শব্দে, চামড়ার মচমচ আওয়াজে সিনিয়র

লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ করিডরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অক্লান্তভাবে ওকে পেরিয়ে যায় আর আসে একবার, দ্বার, দশবার, বিশবার। নিজের জন্য কর্মসূচী একটা ঠিক করেছে মেরেসিয়েভ, প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে হাঁটে, প্রতিদিন ব্যায়ামের মাত্রা বাড়াচ্ছে।

"খাসা লোক!" মনে মনে ওর সাধুবাদ করল গভজ্‌দেভ। "লেগে থাকতে পারে বটে। লোকটার মনোবলের সীমা নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে শিখে ফেলল! অনেকের ত কয়েক মাস লেগে যায়। কাল স্ট্রেচারে যেতে রাজী হল না, চিকিৎসার জন্য হেঁটে সিঁড়ি ভেঙ্গে গেল নিচে, হেঁটে ফিরে এল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু হাল ছেড়ে দিল না, এমন কি সাহায্য করতে চেয়েছিল বলে আর্দালিটাকে কী ধমকই না লাগাল! আর নিজে নিজে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে পৌঁছবার পর ওর হাসিটা যদি দেখতে! মাউণ্ট এলব্রুজের চূড়োয় পৌঁছেছে যেন!'

আয়না থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গভজ্‌দেভ দেখল মেরেসিয়েভ ক্রাচের সাহায্যে বেশ তাড়াতাড়ি চলেছে। "দেখো একবার! সত্যি সত্যি দৌড়চ্ছে। আর লোকটার কি মিষ্টি সুন্দর চেহারা! ভুরুর ওপরে ছোট্ট একটা কাটার দাগ, কিন্তু তাতে একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না, বরঞ্চ ভালোই দেখাচ্ছে।" যদি গভজ্‌দেভের মুখটা ওর মত হত! পা'তে কী এসে যায়? পা ত আর দেখার জিনিস নয়। আর ও ত হাঁটতে শিখবে নিশ্চয়ই, বিমানও চালাবে। কিন্তু তোমার নিজের মুখটা? এ প্রেতমূর্তি ত আর গোপন করার মত নয়, দেখে মনে হয় মাতাল ভূতেরা রাত্রে ওটার উপরে মটর ভেঙ্গেছে।

...করিডরে বৈকালিক ব্যায়ামের ত্রয়োবিংশ চক্করে পৌঁছিয়েছে আলেক্সেই তখন। স্ফীত উরুর জ্বালা আর ক্রাচের প্যাডের ঠেলায় কাঁধের যন্ত্রণার বোধ তার সমস্ত ক্লান্ত শরীরে। খুঁড়িয়ে যেতে যেতে আয়নার সামনে দণ্ডায়মান ট্যাঙ্ক-অফিসারের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকাল আলেক্সেই। "মজার লোক বটে!" মনে মনে বলল সে। "মুখ নিয়ে এত চিন্তা করার কী আছে। অবশ্য সিনেমার তারকা হতে পারবে না আর, সেটা সত্যি। কিন্তু ট্যাঙ্কচালক হতে পারে ত। কে আটকাচ্ছে ওকে। মুখে কী এসে যায় ওর, যতক্ষণ ওর মগজ আছে, হাত আর পা আছে? হ্যাঁ, পা, সত্যিকারের পা আছে, আমার মত চামড়ার টুকরো নয়, টনটন করছে আর জ্বলছে যেগুলো, যেন চামড়ার নয়, গনগনে গরম লোহার জিনিস।"

ঠক, ঠক, মচ, মচ। ঠক, ঠক, মচ, মচ...

অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে জল এসে পড়ছে, ঠোঁট কামড়ে সেটা চাপার চেষ্টা করতে করতে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ কষ্টে করিডরে তার উনত্রিংশ চক্কর শেষ করল, সমাপ্ত হল সে দিনের ব্যায়াম।

১৪

জ়ুনের মাঝামাঝি গ্রিগরি গভজ্‌দেভ হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেল।

যাবার দু একদিন আগে আলেক্সেই'র সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। সমব্যথী দুজনে, দুজনের ব্যক্তিগত জীবন সমান জটিল, সেজন্য ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল; আর এরকম ক্ষেত্রে যা হয়, পরস্পরের কাছে নিজেদের সব ব্যাপার ওরা খোলাখুলিভাবে বলল, গোপন করল না আগামী দিনের বিষয়ে নিজেদের নানা উৎকণ্ঠার কথা; নিজেদের সমস্যা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করা গর্বে বাধত বলে অনেক কিছু দ্বিগুণ দুর্বহ হয়ে উঠেছিল ওদের, সেগুলোর বিষয়ে কথাবার্তা হল। পরস্পরকে দেখাল মেয়ে দুটির ছবি।

ওলিয়ার ছবিটা পুরোনো, ঝাপসা হয়ে এসেছে। জুনের সেই পরিষ্কার দীপ্ত দিনে ভলগার ওপারে ফুলে-ভরা স্তেপে খালি পায়ে দৌড়াবার সময়ে ছবিটা তোলে আলেক্সেই। খাসা ছাপা-ফ্রক পরনে দোহারা চেহারার একটি মেয়ে পা মুড়ে বসে আছে, কোলে ফুল। ডেইজির মধ্যে ওলিয়াকেও দেখাচ্ছে শাদা আর নিষ্কলঙ্ক, সকালের শিশিরে ভেজা ডেইজির মত। ফুলগুলো সাজাবার সময়ে চিন্তান্বিতভাবে মাথা একটু হেলানো, চোখদুটি বিস্ফারিত আর বিহ্বল, যেন পৃথিবীটার সৌজন্য জীবনে এই প্রথম নজরে পড়েছে তার।

ফটোটা দেখে ট্যাঙ্ক-অফিসার বলল এ ধরনের মেয়ে বিপদের সময়ে বন্ধুকে ছেড়ে কখনো চলে যায় না; আর যায় যদি--তাহলে গোল্লায় যাক ও, তাতে শুধু প্রমাণ হয় চেহারা খোলস মাত্র, আর সে ক্ষেত্রে ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো, কেননা মেয়েটা অপদার্থ, ওধরনের অপদার্থ লোকের সঙ্গে বরাবর থাকার কোন মানে হয় না, হয় কি?

আনিউতার চেহারা ভালো লাগল আলেক্সেই'র, আর নিজের অলক্ষিতে, ঠিক গভজ্‌দেভ যা বলেছে ওকে এইমাত্র, তাই বলল নিজের মত করে। আলোচনাটায় গভীর কিছু ছিল না, ওদের নানা সমস্যা মেটাতে সেটা সাহায্য

করল না একবিন্দু, কিন্তু কথাবার্তার পরে দুজনেরই আগের চেয়ে ভালো লাগল, যেন অনেব দিনের একটা বিষফোঁড়া ফেটে গিয়েছে!

ওরা ঠিক করল যে হাসপাতাল থেকে চলে যাবার পরে গভজ্‌দেভ আর আনিউতা — আনিউতা টেলিফোন করে কথা দিয়েছিল যে এসে ওর সঙ্গে দেখা করবে — ওয়ার্ডের জানলার পাশ দিয়ে যাবে; পরে আলেক্সেই লিখে জানাবে মেয়েটিকে দেখে তার কী মনে হয়েছে। আর গভজদেভ কথা দিল যে আলেক্সেইকে চিঠিতে জানাবে আনিউতা কী ভাবে ওর সঙ্গে দেখা করল, ওর বিকৃত মুখ দেখে তার প্রতিক্রিয়া কী রকম, কেমন চলছে তাদের। আলেক্সেই স্থির করল যে গ্রিশার ব্যাপার যদি ভালোয় ভালোয় চলে তাহলে অবিলম্বে ওলিয়াকে চিঠি লিখে নিজের সমস্ত কথা জানাবে, কিন্তু বলে দেবে যেন মা'কে না বলা হয়, মা তখনো অসুস্থ, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না প্রায়।

অস্থিরভাবে দুজনেই সেজন্য গভজ্‌দেভের হাসপাতাল ছাড়ার প্রতীক্ষায় ছিল। এত উদ্বিগ্ন দুজন যে ঘুম এল না, রাত্রে চুপিচুপি তারা গেল করিডরে — গভজ্‌দেভের উদ্দেশ্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষতচিহ্নগুলো আর একবার রগড়াবে, আর মেরেসিয়েভ চায় বরাদ্দের বেশী হাঁটবে, শব্দ যাতে না হয় সেজন্য ক্রাচের পায়ে নেকড়া লাগিয়ে নিল।

দশটার সময়ে ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, চতুর হাসি মুখে, জানাল গভজ্‌দেভের সঙ্গে কে যেন দেখা করতে এসেছে। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠল গভজ্‌দেভ, যেন দমকা হাওয়ায় তাকে উৎক্ষিপ্ত করেছে। মুখ টকটকে লাল, তাতে ক্ষতচিহ্নগুলো আরো প্রকট হয়ে উঠল, তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল সে।

'খাসা মেয়েটি, চেহারাটা গম্ভীর প্রকৃতির,' ব্যস্তসমস্তভাবে বিদায়ের আয়োজনরত গভজ্‌দেভের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল নার্স।

খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ।

'সত্যি বলছ? ভালো লেগেছে ওকে? মেয়েটি বেশ, নয়?' জিজ্ঞেস করল গভজ্‌দেভ, আর উত্তেজনায় বিদায়সম্ভাষণ জানাতে ভুলে গিয়ে দৌড়িয়ে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে।

'রামপাঁঠা! চট করে ফাঁদে পা দেয় সেই গোছের লোক!' গরগর করে বলল মেজর স্ত্রুচকভ।

গত কয়েক দিনে এই উচ্ছৃঙ্খল লোকটির মন্দ কিছু একটা ঘটেছে। বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে, বিনা কারণে ভয়ানক চটে ওঠে মাঝেমাঝে, বিছানায় উঠে

বসতে পারে বলে বসে বসে সারাদিন জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে হাতে চিবুক রেখে, কেউ কথা বললে জবাব দেয় না।

ওয়ার্ডের সবাই — বিমর্ষ মেজর, মেরেসিয়েভ আর নতুন দুটি রোগী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে, কখন তাদের পূর্বতন সহবাসীকে রাস্তায় দেখা যাবে। দিনটা গরম। নরম, ঢেউ-খেলানো মেঘ দীপ্ত সোনালী পাড়ে দ্রুতগতিতে ভেসে যাচ্ছে, চেহারা তাদের বদলাচ্ছে। ঠিক সে মুহূর্তে ছোট ধূসর ফাঁপা বৃষ্টি-ঝরা মেঘ একটা তড়তড় করে গেল নদীর উপর দিয়ে, বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা সূর্যের আলোয় চিকচিক করে ছড়িয়ে পড়ল। বাঁধের গ্রানিট দেয়ালগুলো ঝকঝকে, যেন পালিশ করা হয়েছে; এ্যাসফল্টের রাস্তাটা কালো কালো গোল দাগে ভরে গেল, এমন সূক্ষ্ম, ভেজা ভাপ তা থেকে উঠল যে ইচ্ছে করে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে সুন্দর বৃষ্টিবিন্দুলোকে ধরে ফেলি।

'ও আসছে!' ফিসফিস করে বলল মেরেসিয়েভ।

প্রবেশদ্বারের ভারী ওকের পাল্লাদুটো আস্তে আস্তে খুলে গেল, দেখা গেল দুজনকে: মোটাসোটা গোছের একটি তরুণী, খালি মাথা, কপাল থেকে টান করে পিছনে চুল আঁচড়ানো, পরনে শাদা ব্লাউজ, কালো স্কার্ট; আর তরুণ সৈনিক একজন, সে যে ট্যাঙ্ক-অফিসার সেটা এমন কি আলেক্সেই-ও চট করে ঠাহর করতে পারল না। এক হাতে সুটকেশ, অন্য হাতে আর্মিকোট; এমন বলিষ্ঠ তার হাঁটার কায়দা যে দেখলেও ভালো লাগে। বোঝা গেল নিজের শক্তি পরীক্ষা করছে ও, স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটাচলা করতে পারে দেখে এত খুসি যে মনে হয় সিঁড়ি দিয়ে দৌড়িয়ে নামছে না, ভেসে নামছে। সঙ্গিনীর হাত ধরে বাঁধের পাশ দিয়ে ও চলল ওয়ার্ডের জানলার দিকে — ভারী সোনালী বৃষ্টিবিন্দু লেগে আছে ওদের শরীরে।

ওদের দেখে দেখে আনন্দে বুক ভরে গেল আলেক্সেই'র। তাহলে নির্বিঘ্নে সবকিছু হয়েছে! মেয়েটির মুখ যে এত অকপট, মিষ্টি আর সরল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওর মত মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে না। না, ওর মত মেয়েরা বিপাকগ্রস্ত মানুষকে ফেলে চলে যায় না।

জানলার কাছে এসে ওরা থামল, তাকাল উপরের দিকে। বাঁধের বৃষ্টি-ধোওয়া পারাপেটের কাছে তরুণ-তরুণীটি দাঁড়িয়ে, তাদের পিছনে শ্লথ বৃষ্টি ঝকঝকে আড়াআড়ি রেখায় পটভূমি এঁকে চলেছে। আর আলেক্সেই লক্ষ্য করল যে ট্যাঙ্ক-অফিসারকে বিব্রত উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে, আর

আনিউতা — ফটোতে যেমন সত্যি তেমন মিষ্টি চেহারা তার — তাকেও বিব্রত উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছে। হাতটা ট্যাঙ্ক-অফিসারের হাতে শিথিলভাবে পড়ে আছে, সব মিলিয়ে তাকে দেখাচ্ছে অস্থিরচিত্ত আর উত্তেজিত, যেন হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে এক্ষুণি পালিয়ে যাবে।

হাত নাড়ল দুজনে, কষ্টকৃত হাসি হেসে, বাঁধ হয়ে আরো এগিয়ে মোড়ের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। কোন কথা না বলে রোগীরা যে যার বিছানায় ফিরল।

'বেচারা গভজ্‌দেভ সফল হয়নি,' মন্তব্য করল মেজর। করিডরে শোনা গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার জুতোর শব্দ, চমকে উঠে মেজর হঠাৎ জানলার দিকে মুখ ফেরাল।

সারাটা দিন অস্বস্তিতে কাটল আলেক্সেই'র। এমন কি সন্ধ্যাকালীন হাঁটার ব্যায়ামটাও বাদ পড়ল সেদিন, সবায়ের আগে শুয়ে পড়ল সে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর খাটের স্প্রিঙের কিঁচকিঁচ আওয়াজ বন্ধ হল না।

পরদিন সকালে নার্স ঘরে আসতে না আসতে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করল তার কোন চিঠি এসেছে কিনা। কোন চিঠি আসেনি। হাতমুখ ধুয়ে ও প্রাতরাশ খেল বিনা আগ্রহে, কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় হাঁটবার ব্যায়ামটা বাড়িয়ে দিল সেদিন। আগের সন্ধ্যায় যে দুর্বলতা দেখিয়েছে তার জন্য নিজেকে সাজা দেবার জন্য আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে পোনেরো চক্কর বেশী ঘুরল আলেক্সেই। নিজের এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেল মন থেকে। ও দেখিয়েছে যে ক্রাচ নিয়ে সহজে চলাফেরা করতে পারে, খুব ক্লান্ত না হয়ে। করিডরের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ মিটার। পঁয়তাল্লিশ বার করিডরটা ঘুরেছে সে, পঁয়তাল্লিশ দিয়ে পঞ্চাশকে গুণ করলে হয় দু হাজার দুশ পঞ্চাশ মিটার, অর্থাৎ সওয়া দুই কিলোমিটার, অফিসারদের মেস থেকে বিমান-ঘাঁটি যতটা, ততটা। মনে মনে পরিচিত সেই পথ ধরে আবার গেল আলেক্সেই, পথটা গিয়েছে গ্রামের পুরোনো গির্জার ধ্বংসাবশেষ আর দগ্ধ স্কুলের ইঁটের স্তূপ ছাড়িয়ে; শার্সিহীন জানলার ফাঁকা কোটর থেকে রাস্তার দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছে স্কুলটি; বনের মধ্য দিয়ে, সেখানে ফারের শাখায় পেট্রলের ট্রাকগুলো ঢাকা, আর -- কম্যাণ্ডারের ডাগ-আউট পেরিয়ে গিয়েছে পথটি, পেরিয়ে গিয়েছে সেই ছোট কাঠের কুটিরটি যেখানে মানচিত্র

আর চার্টে ঝুঁকে পড়ে "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" তার নানা অনুষ্ঠান চালায়। অনেকখানি পথ, অনেকখানি পথ সত্যি!

মেরেসিয়েভ ঠিক করল যে দৈনন্দিন চক্কর বাড়িয়ে ছেচল্লিশ করবে, সকালে তেইশ আর বিকেলে তেইশ, আর পরের দিন সকালে, রাত্রির বিশ্রামের পর শরীর যখন ঝরঝর থাকে, বিনা ক্রাচে হাঁটবার চেষ্টা করবে। সিদ্ধান্তটা তৎক্ষণাৎ ওর মন ঘুরিয়ে দিল বিষণ্ণ দুর্ভাবনা থেকে, উৎসাহিত আর কাজের মানুষের মত লাগল নিজেকে। সন্ধ্যেবেলায় এত আগ্রহে ব্যায়াম শুরু করল যে দেখতে না দেখতে তিরিশের বেশী চক্কর করে ফেলল। আর ঠিক তখনি ব্যায়ামে বাধা পড়ল, ক্লোকরুমের পরিচারিকা এসে হাজির, হাতে একটি চিঠি। চিঠিটা তার নামে। ছোট খামের উপরে লেখা: "সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ। ব্যক্তিগত।" "ব্যক্তিগতটার" নিচে দাগ দেওয়া, সেটা মোটেই ভালো লাগল না আলেক্সেই'র। চিঠিটার কোণেও লেখা "ব্যক্তিগত", দাগ দেওয়া তাতেও।

জানলার তাকে হেলান দিয়ে চিঠিটা খুলল আলেক্সেই। গত রাত্রে রেলওয়ে স্টেশন থেকে লিখেছে গভজ্‌দেভ, দীর্ঘ চিঠিটা যত পড়ছে তত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আলেক্সেই'র মুখ। গভজ্‌দেভ লিখেছে আনিউতার চেহারা যেরকম তারা কল্পনা করেছিল ঠিক সেরকম, খুব সম্ভব মস্কোর সবচেয়ে মিষ্টি-চেহারার মেয়ে সে, বোনের মত তার সঙ্গে দেখা করে আনিউতা, আগের চেয়ে অনেক ভালো লেগেছে তাকে গভজ্‌দেভের।

"...কিন্তু যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা দাঁড়াল ঠিক আমরা যেরকম ভেবেছিলাম সেভাবে। মেয়েটি ভালো। কোন কথা বলল না আমাকে, কোন কিছুর ইঙ্গিত পর্যন্ত করল না। সবকিছু ভালো। কিন্তু অন্ধ নই আমি। দেখলাম আমার ঝলসানো কুৎসিৎ মুখ দেখে ও ভয় পেয়েছে। সবকিছু ঠিক মনে হচ্ছে, হঠাৎ আবার দেখছি ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ও লজ্জিত ভীত কিম্বা দুঃখিত আমার জন্য — ঠিক কি জানি না... বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেল আমাকে। না গেলেই ভালো হত। মেয়েরা ভিড় করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে... বিশ্বাস করবে কি? আমাদের সবাইকে ওরা চেনে! আনিউতা আমাদের সব কথা ওদের বলেছে... বুঝতে পারলাম একটু লজ্জিতভাবে ও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ভয়াবহ জিনিসটা ওখানে নিয়ে যাবার জন্য মাপ চাইছে। কিন্তু আসল কথাটা শোনো আলিওশা, নিজের মনোভাব গোপন করার চেষ্টা করছিল ও:

আমার সঙ্গে বেশ ভালো আর সহৃদয় ব্যবহার করল, কথা বলছে ত বলছেই, যেন কথা থামাতে ওর ভয়। তারপর ওর বাড়িতে গেলাম। একলা থাকে আনিউতা। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে চলে গিয়েছে ওর বাপ-মা। স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওরা ভালো ঘরের লোক। চা খাওয়াল আমাকে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে নিকেলের কেটলিতে আমার ছায়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গল্প বাড়িয়ে লাভ নেই। সংক্ষেপে, মনে মনে ভাবলাম যে এরকম করে চলবে না। সোজাসুজি ওকে বললাম, 'বুঝতে পারছি আমার চেহারাটা আপনার পছন্দ হয়নি। তাতে আপনার দোষ নেই, সেটা আমি বুঝি। অপমানিত লাগছে না নিজেকে।' কেঁদে ফেলল ও, কিন্তু আমি বললাম, 'কাঁদবেন না। লক্ষ্মী মেয়ে আপনি। আপনার সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে। নিজের জীবন নষ্ট করবেন কেন!' আবার বললাম, 'দেখছেন ত, কী অপরূপ চেহারা আমার! ভেবে দেখুন। বাহিনীতে ফিরে যাচ্ছি, সেখানকার ঠিকানা জানাব আপনাকে। যদি আপনার সংকল্প ঠিক থাকে, তাহলে আমাকে জানাবেন।' আরো বললাম, 'যা করতে চান না তা জোর করে করবেন না। আজ আমি এখানে, কাল সেখানে — যুদ্ধ চলেছে।' ও অবশ্য বলল, 'না, না, না!' কান্না থামছে না। আর ঠিক সে সময়ে হতভাগা সাইরেনটা চেঁচাতে শুরু করল। বাইরে গেল ও, আর হৈচৈ'এর সুযোগ নিয়ে চলে এলাম আমি, সোজা গেলাম অফিসারদের রেজিমেণ্টে, তক্ষুণি ওরা কাজ দিল আমাকে। এখন সব ঠিক। রেলের টিকিট পেয়েছি, রওনা হলাম। কিন্তু এটা তোমাকে বলা দরকার, আলিওশা, ওকে আগের চেয়ে ঢের বেশী ভালোবাসি এখন, ওকে ছেড়ে কী করে থাকব জানি না।"

বন্ধুর চিঠি পড়তে পড়তে আলেক্সেই'র মনে হল নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কোন সন্দেহ নেই, তারো কপালে ঠিক এরকম ঘটবে। চলে যেতে বলবে না তাকে ওলিয়া, নেবে না মুখ ঘুরিয়ে, তার জন্য ঠিক এরকম মহৎ আত্মত্যাগ করতে চাইবে সে, মমতায় কথা বলবে, চোখের জলে হাসবে আর চেষ্টা করবে বিতৃষ্ণা চাপার।

'না, না, সেটা চাই না!' বলে উঠল আলেক্সেই।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে গেল ওয়ার্ডে, টেবিলের পাশে বসে ওলিয়াকে চিঠি লিখল, ছোট নিষ্প্রাণ নীরস চিঠি। সত্যি কথা বলার সাহস হল না। বলবেই বা কেন? মা অসুস্থ, তাঁর দুঃখ বাড়াবে কেন? লিখল যে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে তার জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকাটা

ওলিয়ার পক্ষে নিশ্চয়ই কষ্টকর। কেউ জানে না কতদিন যুদ্ধ চলবে কিন্তু সময় আর যৌবন ত বসে থাকে না। যুদ্ধ এমন একটা জিনিস যে প্রতীক্ষা করার কোন মানে হয় না। মারা যেতে পারে আলেক্সেই. তাহলে স্ত্রী না হয়েও বিধবা হবে ওলিয়া; কিম্বা, সেটা আরো খারাপ ব্যাপার, তার অঙ্গহানি হতে পারে, তাহলে পঙ্গুকে বিয়ে করতে হবে ওলিয়াকে। তাতে কী ভালোটা হবে? নিজের যৌবন নষ্ট করা উচিত নয় ওর, যত শীগগির পারে আলেক্সেইকে ভুলে যাক। চিঠিটার জবাব না দিলেও চলবে, না দিলে কিছু মনে করবে না সে। ওর অবস্থা বুঝতে পারে আলেক্সেই, যদিও সেটা স্বীকার করা তার পক্ষে কঠিন। কিন্তু যা বলছে সেটা করাই ভালো।

মনে হল চিঠিটায় হাত পুড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বার না পড়ে, খামে চিঠিটা ভরে, তাড়াতাড়ি খোঁড়াতে খোঁড়াতে জল গরম করার যন্ত্রটির পিছনে করিডরে টাঙানো নীল ডাক বাক্সটার কাছে গেল আলেক্সেই।

ওয়ার্ডে ফিরে এল, আবার বসল টেবিলের পাশে। কার সঙ্গে মনের কথা বলবে? মা'র সঙ্গে নয়। গভজ্‌দেভ? সে বুঝবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন কোথায় সে? কত রাস্তার গোলক-ধাঁধা গিয়েছে ফ্রণ্টে, কোথায় খুঁজে পাবে তাকে? ওর রেজিমেণ্টে লিখবে? কিন্তু যুদ্ধকালীন নানা কাজে ব্যস্ত থাকার সৌভাগ্য যাদের, তারা কি মাথা ঘামাবে আলেক্সেইকে নিয়ে? "আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" লিখবে? হ্যাঁ, ওকেই লেখা যায়। তক্ষুণি লিখতে শুরু করল আলেক্সেই, কথাগুলো আসছে অবলীলাক্রমে, বন্ধুর আলিঙ্গনে বদ্ধ হলে চোখের জল যেমন অঝোরে পড়ে। একটি পঙ্‌ক্তি শেষ হয়নি, হঠাৎ লেখা বন্ধ করল আলেক্সেই, এক মুহূর্ত কী ভেবে চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলল।

"লেখকের যন্ত্রণার চেয়ে গভীরতর যন্ত্রণা আর কিছু নেই," স্বভাবসুলভ ঠাট্টার সুরে আবৃত্তি করল স্ত্রুচকভ।

বিছানায় বসে সে গভজ্‌দেভের চিঠিটা পড়ছে, আলেক্সেই'র বিছানার পাশের তাক থেকে তুলে নিয়েছিল সেটা।

'আজ কী হল সবায়ের?.. গভজ্‌দেভও! রামপাঁঠা বটে। একটা মেয়ে নাক শিঁটকিয়েছে, তাই চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। মনের রোগের বিশ্লেষণ শুরু হল। চিঠিটা পড়ার জন্য চটনি ত? আমরা সবাই সৈনিক, আমাদের মধ্যে গোপন কথা কী থাকতে পারে?'

চটেনি আলেক্সেই। সে ভাবছিল, "হয়ত পিওন কাল আসা না পর্যন্ত

অপেক্ষা করা আমার উচিত, বাক্স থেকে চিঠি নেবার সময়ে চিঠিটা ফেরৎ নিয়ে নেব?”

সে রাত্রে ভালো ঘুম হল না আলেক্সেই'র। প্রথমে স্বপ্ন দেখল বরফে-ঢাকা বিমান-ঘাঁটিতে গিয়েছে সে, সেখানে অদ্ভুত চেহারার একটা বিমান "লাভচ্কিন-৫” নামবার গিয়ারের জায়গায় পাখির পা লাগানো। ইউরা মিস্ত্রী ককপিটে ঢুকে বলল আলেক্সেই'র বিমান চালানোর দিন আর নেই, এবার ওর চালানোর পালা। তারপর স্বপ্ন দেখল খড়ের উপর নিজে শুয়ে আছে, আর মিখাইল দাদু, তাঁর পরনে সাদা সার্ট আর ভিজে প্যাণ্ট, বাষ্পস্নান করাচ্ছেন তাকে, হাসতে হাসতে বলছেন, “বিয়ের আগে ঠিক এটাই তোমার দরকার।” ঠিক ভোরের আগে ওলিয়াকে স্বপ্নে দেখল আলেক্সেই, একটা উল্টে-যাওয়া নৌকোর উপরে বসে আছে ওলিয়া, পাতলা দোহারা দীপ্ত চেহারা, রোদে-তামাটে বলিষ্ঠ পাদুটো জলে দিয়ে এক হাতে চোখ ঢেকে রোদের আড়াল করছে, আর হাসি মুখে অন্য হাতের ইসারায় ডাকছে তাকে। সাঁতরে যাচ্ছে তার দিকে আলেক্সেই, কিন্তু খর উদ্দাম স্রোত তীর আর মেয়েটির কাছ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। হাত পা, শরীরের সমস্ত পেশীর জোর ক্রমাগত খাটিয়ে ক্রমশ ওলিয়ার কাছে এসে পড়ল, আরো কাছে, চোখে পড়ছে হাওয়ায় ঝটপটে ওর চুল, রোদে-তামাটে পায়ের উপরে চিকচিকে জলের ফোঁটা...

ঘুম ভেঙ্গে গেল আলেক্সেই'র, বেশ ফুর্তি আর খুসি লাগছে। চোখ বুজে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল, যাতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, যাতে মধুর স্বপ্নটা ফিরে আসে আবার, তার আশায়। কিন্তু এরকম ঘটে শুধু শৈশবে। স্বপ্নে দেখা মেয়েটির সেই পাতলা, রোদে-তামাটে প্রতিচ্ছবিতে সমস্ত কিছু দীপ্ত হয়ে উঠেছে মনে হল। উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই আলেক্সেই'র, মন খারাপ করার দরকার নেই, শুধু সাঁতরাতে হবে ওলিয়ার দিকে, সাঁতরাতে হবে উজানে, যা কিছু ঘটুক না, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাঁতরাতে হবে, পেঁাছতে হবে তার কাছে। কিন্তু চিঠিটার কী হবে? ডাক বাক্সের কাছে গিয়ে পিওনের জন্য অপেক্ষা করার ইচ্ছে হল তার, কিন্তু মত বদলাল আলেক্সেই; হাত নাড়িয়ে বলল নিজেকে: “যাক ওটা। ওটাতে সত্যিকারের প্রেম ত আর কেটে যাবে না।” আর ওর এখন বিশ্বাস হল যে সত্যিকারের প্রেম, দুঃখে সুখে, সুস্থ কিম্বা অসুস্থ যে অবস্থায়ই থাকুক না সে নিজে, প্রেম তার প্রতীক্ষায় আছে। বিশ্বাসটা নতুন শক্তি যোগাল তাকে।

সেদিন সকালে বিনা ক্রাচে হাঁটবার চেষ্টা করল আলেক্সেই। সাবধানে খাট ছেড়ে উঠে পা ফাঁক করে দাঁড়াল, হাত সামনে এগিয়ে দিয়ে অসহায়ভাবে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করল। দেয়াল ধরে পা ফেলল আলেক্সেই। কৃত্রিম পায়ের চামড়া মচমচ করছে। দুলে উঠল শরীরটা, কিন্তু হাত দিয়ে ভারসাম্য রাখল ও। দেয়াল ধরে আবার পা ফেলল। কখনো কল্পনা করেনি হাঁটাটা এত কঠিন ব্যাপার। বাল্যকালে রণপা দিয়ে হাঁটতে শিখেছিল আলেক্সেই। দেয়ালে হেলান দিয়ে রণপায়ে ভর দিয়ে উঠে দেয়াল ছেড়ে এক পা ফেলত, তারপর আর একটা পা, আবার একটা... কিন্তু দুলে উঠত শরীরটা, লাফিয়ে নেমে পড়ত ও, উপকণ্ঠের রাস্তার ঘাসে পড়ে থাকত রণপাদুটো। রণপায়ে হাঁটতে শেখাটা, যাই হোক, অতটা খারাপ ছিল না, কেননা তা থেকে লাফিয়ে নামা যায়, কিন্তু কৃত্রিম পা ছেড়ে দিয়ে লাফান ত চলে না। আর তৃতীয় বার পা ফেলার চেষ্টা করাতে ওর শরীর দুলে উঠল, পায়ে শক্তি নেই, উপুড় হয়ে পড়ল মেঝেতে।

অন্যান্য রোগীরা নানা চিকিৎসা নিতে চলে গিয়েছে, ওয়ার্ডে কেউ নেই, ব্যায়ামের জন্য সে সময়টা বেছে নিয়েছিল আলেক্সেই। সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকল না। হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে আস্তে উঠে দাঁড়াল, পড়ে যাওয়াতে পাশে চোট লেগেছে, ঘষল সে জায়গাটা, কনুইটা ছড়ে কালসিটে পড়তে শুরু করেছে, সেটা দেখে দাঁতে দাঁত চেপে আবার পা ফেলল, দেয়াল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে। মনে হল কারসাজিটা এবার আয়ত্তে এসেছে। আসল আর নকল পায়ের পাতার তফাৎটা হল শেষোক্তটির স্থিতিস্থাপকতার অভাব। তাদের স্বকীয় ধর্ম এখনো তার জানা নেই, কয়েকটি অভ্যেস, প্রায় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত, আয়ত্তে আনতে হবে তাকে, যেমন হাঁটবার সময়ে পায়ের পাতার স্থান সঙ্গে সঙ্গে বদলানো. পা ফেলার সময়ে শরীরের ভার গোড়ালি থেকে পদাঙ্গুলিতে দেওয়া, আবার পা ফেলার সময়ে ভারটা গোড়ালি থেকে পদাঙ্গুলিতে আনা। সমান্তরালভাবে পা ফেললে চলবে না, ফেলতে হবে আড়ভাবে, পায়ের ডগা ছাড়াছাড়া রেখে, তাতে হাঁটবার সময়ে শরীরে আরো বেশী স্থিতি আসে।

মায়ের তদারকে ছোটখাটো পায়ে প্রথম বিসদৃশ পা ফেলার সময়ে এসব সবাই শেখে শৈশবে। অভ্যেসগুলো সারা জীবন টি'কে থাকে, পরিণত হয় সহজাত ঝোঁকে। কিন্তু কৃত্রিম অঙ্গ পরতে বাধ্য হলে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক সঙ্গতির বিচ্যুতি ঘটে, শৈশবে অধিকৃত ঝোঁক সাহায্য করা দূরের

কথা, বাধা দেয় তার গতিকে। নতুন অভ্যেস সব আয়ত্তে আনার সময়ে পুরোনো ঝোঁকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। এমন অনেকে আছে যারা অঙ্গহানির পরে মনোবলের অভাবে হাঁটার বিদ্যা আর আয়ত্তে আনতে পারে না, যে বিদ্যাটা অত সহজে শৈশবে আমরা শিখে ফেলি।

নিজের জন্য লক্ষ্যবস্তু ঠিক করেছে মেরেসিয়েভ, গন্তব্যে পেঁছবে ও, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার। প্রথম উদ্যমে যে ভুল করেছিল, সেটা হৃদয়ঙ্গম করে আবার চেষ্টা করল ও। এবারে কৃত্রিম পায়ের ডগা এগিয়ে গোড়ালিতে ভর দিয়ে শরীরের ভার ছাড়ল ডগাগুলোর উপরে। জোরে মচমচ করে উঠল চামড়াটা। শরীরের ভার পদাঙ্গুলিতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সেই অন্য পাটি তুলে এগিয়ে দিল। মেঝেতে লাগল গোড়ালিটা। দেয়াল ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইল ও, হাত বাড়িয়ে শরীরের ভারসাম্য রাখছে, আবার পা ফেলার সাহস হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে রইল ও, শরীরটা দুলছে, পড়ে না যায় চেষ্টা করছে তার, অনুভব করছে নাকের ডগা ঘেমে উঠছে।

এরকম একটা অবস্থায় ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আবিষ্কার করলেন ওকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন, তারপরে এগিয়ে এসে বগলের নিচে হাত দিয়ে ভার রক্ষা করে বললেন:

'বেশ চলেছে! একেবারে একলা যে, কোন নার্স আর আর্দালি দেখছি না ত: দেমাকের ব্যাপার মনে হচ্ছে... যা হোক, কিছু এসে যায় না। যে কোন কাজে যেমন, প্রথম পদক্ষেপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর সবচেয়ে কঠিন অংশটা ত তুমি কাটিয়ে উঠেছ।'

এর অল্প কিছুদিন আগে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। কাজটি খুব বড়ো, অনেক সময় লাগত সেটা করতে। হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন তিনি, কিন্তু ঝানু যোদ্ধাটি এখনো পরামর্শদাতার কাজ করতেন; অন্য লোকের হাতে হাসপাতালের পরিচালনার ভার থাকলেও প্রত্যহ এখানে আসতেন, সময় থাকলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সন্তানের মৃত্যুর পরে বদলে গিয়েছে মানুষটি। পুরোনো প্রখর ফুর্তির ভাব আর নেই; আর চেঁচিয়ে বকাবকি করেন না; যারা তাকে ভালোভাবে চেনে তারা এটাকে আসন্ন বার্ধক্যের লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছে।

'আচ্ছা, মেরেসিয়েভ, একসঙ্গে শেখার চেষ্টা করি আমরা...' প্রস্তাব করলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। অনুচরবর্গের দিকে ঘুরে বললেন, 'তোমরা

কেটে পড়ো ত বাপু, সার্কাস নয় এটা, হাঁ করে দেখার কিছু নেই। আমাকে বাদ দিয়ে রোঁদ শেষ করো।' তারপর বললেন মেরেসিয়েভকে:

'তাহলে, বাপু... এক! ধরে থাকো, আমাকে ধরে থাকো, লজ্জা পাবার কিছু নেই! আমি জেনারেল, আমার কথা শুনতে বাধ্য তুমি। আচ্ছা, দুই! ঠিক হয়েছে ওটা। এবার ডান পাটা। বেশ, বেশ! বাঁয়ে! চমৎকার!'

মহানন্দে বিখ্যাত সার্জন হাতে হাত ঘষলেন, যেন একটি লোককে হাঁটতে শিখিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান, ভগবান জানেন কত মূল্যবান, কোন পরীক্ষামূলক গবেষণা করছেন। কিন্তু ওঁর স্বভাবই এ ধরনের, যা কিছু করেন সোৎসাহে করেন, বিরাট উদ্যমী প্রাণের সবটা ঢেলে দিয়ে। সারা ওয়ার্ডটা হাঁটতে মেরেসিয়েভকে বাধ্য করলেন তিনি, আর যখন আলেক্সেই ক্লান্তিতে সারা হয়ে ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারে, তখন আর একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসে বললেন:

'তাহলে বিমানে চড়ব নাকি আমরা? মনে ত হয় চড়ব। এই যুদ্ধে, বাপু, একটা হাত উড়ে গেছে এমন লোকে দলকে এগিয়ে নিয়ে আক্রমণ চালায়, চরম আহতেরা চালায় মেসিনগান, নিজের শরীর দিয়ে ঠেকায় শত্রুপক্ষের মেসিনগান... যারা মৃত শুধু তারা লড়াই করে না...' বৃদ্ধের মুখে ছায়ার রেশ, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'না, এমন কি মৃতেরা পর্যন্ত লড়ছে... ওদের যশ দিয়ে। হ্যাঁ... আর, ছোকরা, আবার হাঁটতে শুরু করা যাক!'

ওয়ার্ডটা দ্বিতীয় বার ঘুরে বিশ্রাম করার জন্য আলেক্সেই থামল, অধ্যাপক তখন গভজ্‌দেভের বিছানাটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'ট্যাঙ্ক-অফিসারের কী হল? ও কি ছাড়া পেয়েছে?'

মেরেসিয়েভ জানাল যে ট্যাঙ্ক-অফিসার সেরে উঠে নিজের দলে আবার যোগ দিয়েছে। ওর একমাত্র গণ্ডগোল হল পোড়ার দাগে মুখটা ভয়াবহভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে নিচের অংশটা।

'তাহলে এরি মধ্যে তোমাকে চিঠি লিখেছে? মেয়েরা ভালোবাসে না বলে ওর হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে মনে হচ্ছে। ওকে বোলো যেন দাড়ি-গোঁফ রাখে। ঠাট্টা করছি না। ওকে তাহলে বেশ স্বতন্ত্র দেখাবে, মেয়েরা পছন্দ করবে।'

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একটি নার্স ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে জানাল জন কমিসার পরিষদ থেকে ওঁকে টেলিফোন করছে। কষ্ট করে উঠলেন অধ্যাপক, যে ভাবে ফোলা চামড়া-খসা হাতদুটো হাঁটুতে রাখলেন আর সেটা

করতে গিয়ে নুয়ে পড়লেন তাতে বোঝা গেল গত কয়েক সপ্তাহে কতটা বুড়িয়ে গেছেন তিনি। দরজায় পৌঁছিয়ে মেরেসিয়েভের দিকে ঘুরে প্রফুল্লভাবে বললেন:

'তাহলে ওকে... ওর নাম কী... মানে আপনার বন্ধুকে, চিঠি লিখতে ভুলবেন না... ওকে বলুন যে দাড়ি রাখতে বলেছি আমি। দাওয়াইটা পরখ করা... মেয়েরা দাড়ি খুব ভালোবাসে!'

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লিনিকের একজন পুরোনো পরিচারক মেরেসিয়েভের জন্য একটা ছড়ি নিয়ে এল, আবলুস কাঠের তৈরী, পুরোনো সুন্দর ছড়িটা, হাতির দাঁতের বাঁট, সংক্ষিপ্ত নামাক্ষর চিত্র আঁকা তাতে।

'অধ্যাপক এটা আপনাকে পাঠিয়েছেন,' বলল সে। 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। ওঁর নিজের ছড়ি। উপহার হিসেবে আপনাকে দিয়েছেন। বলেছেন যে ছড়ি নিয়ে আপনাকে হাঁটতে হবে।'

গ্রীষ্মের সেই সন্ধ্যায় হাসপাতালের লোকেদের বিরস লাগছিল, আর তাই ডাইনের, বাঁয়ের, এমন কি ওপরতলার ওয়ার্ড থেকে পর্যন্ত রোগীরা ৪২ নং ওয়ার্ডে এল বেড়াতে, অধ্যাপকের উপহারটি দেখার জন্য। হাঁটার ছড়িটা সত্যিই চমৎকার।

১৫

ফ্রন্টে তখনো ঝড়ের আগের গুমোট ভাব। ইস্তাহারে থাকে স্থানীয় লড়াই'এর আর স্কাউট দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের কথা। হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা কমে গিয়েছে, তাই ৪২ নং ওয়ার্ডের খালি খাটগুলো সরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন অধ্যক্ষ। ওয়ার্ডে রয়ে গেল শুধু মেরেসিয়েভ আর স্ত্রুচকভ; ডানদিকে মেরেসিয়েভের আর বাঁদিকে বাঁধমুখো জানলার কাছে মেজরের খাট।

স্কাউট দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ! মেরেসিয়েভ ও স্ত্রুচকভ দুজনেই অভিজ্ঞ সৈনিক, ওরা জানে যে সাময়িক বিরতি আর কণ্টকৃত প্রশান্তি যত বিলম্বিত হয় তত তীব্র হয় অবশ্যম্ভাবী ঝড়।

একদিনের ইস্তাহার উল্লেখ করল সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, স্নাইপার স্তেপান ইভুশকিনের কথা, দক্ষিণ ফ্রন্টের কোথায় পঁচিশটা জার্মান মেরেছে সে, এই নিয়ে তার মোট সংখ্যা হল দু'শ। গভজ্‌দেভের চিঠি এল। কোথায় আছে, কী করছে সেটা লেখেনি অবশ্য। লিখেছে তার প্রাক্তন সেনানায়ক,

পাভেল আলেক্সেয়েভিচ রতমিস্ত্রভের দলে ফিরেছে সে, জীবনযাত্রা ভালোই চলেছে, প্রচুর চোরি পাওয়া যায় আর সবাই পেট পুরে তাই খায়! আলেক্সেইকে অনুরোধ করেছে যেন চিঠিটা পাবার পর আনিউতাকে এক ছত্র লিখে খবর দেয়। সে-ও লিখেছে আনিউতাকে, কিন্তু চিঠিগুলো পৌঁছিয়েছে কিনা জানে না।

এই দুটো বার্তাতেই যে কোন সৈনিক বুঝতে পারে যে দক্ষিণের কোথাও ঝড় ভেঙ্গে পড়বে। বলাই বাহুল্য, আনিউতাকে চিঠি লিখল আলেক্সেই। অধ্যাপক দাড়ি রাখতে বলেছে, সে উপদেশটাও জানাল গভজ্‌দেভকে আর আনিউতাকে। কিন্তু আলেক্সেই জানত আসন্ন যুদ্ধের সেই অস্থির প্রতীক্ষায় আছে গভজ্‌দেভ যে অবস্থায় প্রত্যেক সৈনিকেরই মন উৎকণ্ঠায়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেও আচ্ছন্ন থাকে, আর সেজন্য দাড়ির, এমন কি হয়ত আনিউতার কথাও ভাবার সময় পাবে না গভজ্‌দেভ।

৪২ নং ওয়ার্ডে প্রীতিকর আর একটি জিনিস ঘটল। একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল যে মেজর পাভেল ইভানভিচ স্ত্রুচকভকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সুখবরেও মেজরের উৎফুল্লতা বেশী দিন জিইয়ে রইল না। আবার বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন সে, ভাঙ্গা হাঁটুদুটোকে বাপান্ত করে, ওদুটোর জন্যই ত এই কর্মমুখর সময়ে বিছানায় বন্দী হয়ে আছে। তার বিরস মেজাজের আর একটি কারণ ছিল, লুকোবার চেষ্টা করলেও অপ্রত্যাশিতভাবে সেটা ধরা পড়ল আলেক্সেই'র কাছে।

হাঁটিতে-শেখা মেরেসিয়েভের সমস্ত মন নিবদ্ধ একটিমাত্র বিষয়ে, আশেপাশে কী হচ্ছে প্রায় চোখে পড়ে না তার। প্রতিদিন কী করবে তার একটা তালিকা বানিয়ে কড়াভাবে পালন করে যাচ্ছে: সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এক একটা ঘণ্টা করে, রোজ তিন ঘণ্টা করিডরে কৃত্রিম অঙ্গে হাঁটা অভ্যেস করে সে। নীল গাউন পরে খোলা দরজার সামনে দিয়ে একটা লোক পেণ্ডুলামের মত নিয়মিতভাবে যাচ্ছে আর আসছে, চামড়ার পায়ের মচমচ আওয়াজে করিডরটা মুখর, প্রথম প্রথম অন্যান্য ওয়ার্ডের রোগীরা তাতে বিরক্ত হত; কিন্তু শেষে এটা তাদের এত সয়ে গেল যে দরজা ছাড়িয়ে লোকটি না গেলে দিনের কয়েকটি বিশেষ অংশের কথা কল্পনা করা কঠিন হত তাদের। জিনিসটা এমন দাঁড়িয়েছিল সত্যি যে একদিন মেরেসিয়েভ ফ্লু হওয়াতে শুয়ে আছে; অন্যান্য ওয়ার্ডের রোগীরা লোক পাঠিয়ে খবর নিল পদহীন লেফ্‌টেনাণ্টের কী হয়েছে।

সকালে দৈহিক ব্যায়ামের পরে চেয়ারে বসে আলেক্সেই বিমান চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গচালনায় অভ্যস্ত করাত পাদুটোকে। মাঝেমাঝে অনেকক্ষণ এটা করার জন্য মাথা ঘুরে উঠত, কানে ঝিঁঝিঁ ধরে যেত, চোখের সামনে দেখত উজ্জ্বল সবুজ বৃত্ত, সব ঘুরছে, পায়ের নিচে মেঝেটা দুলে উঠছে। তখন মুখ ধোবার জায়গায় গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকত, যাতে তাড়াতাড়ি সে ভাবটা কেটে যায় আর হাঁটা আর ব্যায়ামের মহড়াটা বাদ না পড়ে।

সে দিন হাঁটিতে হাঁটিতে মাথা ঘুরে উঠল, হাতড়ে মেরেসিয়েভ ফিরে এল ওয়ার্ডে, চোখে কিছু দেখতে পারছে না, এলিয়ে পড়ল বিছানায়। একটু ধাতস্থ হবার পর হুঁশ হল ওয়ার্ডে কারা কথা বলছে: ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার শান্ত কণ্ঠস্বর, একটু শ্লেষের ভাব তাতে, আর স্ত্রুচকভের। উত্তেজিত অনুনয়-ভরা গলা। কথাবার্তায় এত একাগ্র দুজন যে মেরেসিয়েভের ওয়ার্ডে আসাটা চোখে পড়েনি।

'বিশ্বাস করুন, আমি ঠাট্টা করছি না! বোঝেন না কেন? আপনি ত মেয়েমানুষ না আর কিছু?'

'মেয়েমানুষ ত বটে, কিন্তু কথাটা আমার মাথায় ঢুকছে না, আর এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে কথা বলতে পারেন না আপনি। আপনার আন্তরিকতা চাই না আমি!'

চটে উঠে স্ত্রুচকভ চেঁচিয়ে বলল:

'আপনায় আমি ভালোবাসি, দিব্যি করে বলছি! সেটা যদি না বোঝেন তাহলে মেয়েমানুষ নন আপনি, এক টুকরো পাথর। বুঝেছেন?' মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জানলার শার্সিতে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগল স্ত্রুচকভ।

দক্ষ নার্সের স্বভাবসিদ্ধ লঘু সতর্ক পদক্ষেপে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা গেল দরজার দিকে।

'কোথায় যাচ্ছেন? আমার কথার উত্তর দেবেন না?'

'আমার কাজের সময় এটা, এই নিয়ে কথা বলার স্থান আর কাল এটা নয়।'

'সরাসরি জবাব দিচ্ছেন না কেন? কেন আমাকে জ্বালাচ্ছেন? বলুন!' মেজরের কণ্ঠস্বরে এখন ক্লেশের ভাব।

দোরগোড়ায় থামল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা। অন্ধকার করিডরের পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার পাতলা সুঠাম দেহ। মেরেসিয়েভের ঘুণাক্ষরে কখনো মনে হয়নি এই শান্ত নার্সটি, যৌবন যার অতিক্রান্ত, নারীসুলভভাবে এত

দৃঢ়বদ্ধ আর কমনীয় হতে পারে। মাথা পিছনে হেলিয়ে দোরগোড়ায় থেমে মেজরের দিকে তাকাল সে, যেন অনেক উঁচু থেকে দেখছে।

'বেশ,' সে বলল 'জবাব দিচ্ছি। আমি আপনাকে ভালোবাসি না, হয়ত কখনো ভালোবাসতে পারব না।'

চলে গেল ও। মেজর বিছানায় আছড়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। এবারে মেরেসিয়েভ বুঝতে পারল মেজরের গত কয়েকদিনের বিচিত্র ব্যবহারের কারণটা কী, নার্স ঘরে এলে কেন খিটখিটে আর অস্থির হয়ে যেত ও, কেনই বা ফুর্তির ভাব সহসা পরিণত হত বিকট রাগের উচ্ছ্বাসে।

সত্যিকারের যন্ত্রণায় নিশ্চয়ই ও ভুগছে। মেজরের জন্য দুঃখিত বোধ করল আলেক্সেই, সঙ্গে সঙ্গে খুসিও হল। বিছানা ছেড়ে মেজর উঠছে, ওকে ক্ষেপাবার লোভ সামলাতে পারল না আলেক্সেই।

'কী, কমরেড মেজর, মুখে থুতু দিতে পারি কি?'

কথাটায় মেজরের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে জানলে ঠাট্টা করেও বলত না ওটা আলেক্সেই। আলেক্সেই'র খাটে ছুটে এসে হতাশা গভীর কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে উঠল স্ত্রুচকভ:

'থুতু ফেলো, হ্যাঁ, থুতু ফেলো! ফেললে ঠিকই করবে। আমার উচিত শাস্তি হবে। কিন্তু কী করব এখন বাতলাও ত? বলো বলো, কী করব? আমাদের কথাবার্তা শুনেছ ত?'

মাথা টিপে খাটে বসে পড়ল স্ত্রুচকভ, দেহটা এদিক ওদিক দুলছে।

'তোমার হয়ত মনে হচ্ছে যে ঠাট্টা করছিলাম? ঠাট্টা করছিলাম না। সত্যি কথা বলছিলাম। নির্বোধ মেয়েটাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম!'

সন্ধ্যেবেলায় রোঁদে যথারীতি ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা। শান্ত সহিষ্ণু আর সহৃদয় মনোভাবে কোন পরিবর্তন নেই। স্থিরতার প্রতিমূর্তি যেন। মেরেসিয়েভ আর মেজরের দিকে তাকিয়ে হাসল। মেজরের দিকে কিন্তু তাকাল উৎকণ্ঠায় এমন কি সভয়ে।

জানলার ধারে বসে মেজর নখ কামড়াচ্ছিল, করিডরে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাকাল, চাউনিতে সশ্রদ্ধ ক্রোধের ছাপ।

'সোভিয়েত দেবীই বটে!' গরগর করে উঠল মেজর। 'নামটা দিয়েছিল কোন বোকা? নার্সের পোশাকে শয়তানী!'

অফিসের নার্স, জীর্ণশীর্ণ মধ্যবয়স্কা মহিলা ওয়ার্ডে এসে জিজ্ঞেস করল:

'মেরেসিয়েভ আলেক্সেই, হাঁটতে পারার মত রোগী কি সে?'

'না, দৌড়ঝাঁপ করা রোগী,' খেঁকিয়ে উঠল স্তুচকভ।

'ইয়ার্কি করার জন্যে এখানে আসিনি,' কঠোর সুরে নার্স বলল। 'মেরেসিয়েভ আলেক্সেই, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, টেলিফোনে ডাকছে তাকে।'

'কোন কমবয়সী মেয়ে ডাকছে?' চাঙিয়ে উঠে চোখ ঠেরে ক্রুদ্ধ নার্সকে স্তুচকভ জিজ্ঞেস করল।

'ওর বিয়ের নথিপত্র দেখিনি আমি,' হিসহিস করে উঠল নার্স, সগাম্ভীর্যে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে।

একলাফে বিছানা থেকে নামল মেরেসিয়েভ। মহাফুর্তিতে ছড়ি নিয়ে ঠকঠক করে হেঁটে নার্সটিকে ধরে ফেলল আর সত্যি সত্যি দৌড়িয়ে নামল সিঁড়ি দিয়ে। প্রায় মাস খানেক ওলিয়ার জবাবের আশায় আছে মেরেসিয়েভ, চকিতে মনে হল, তাহলে ওলিয়াই কি ফোন করছে? কিন্তু সেটা হতে পারে না। এ সময়ে স্তালিনগ্রাদের কাছাকাছি জায়গাটা থেকে মস্কো আসা ওর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাছাড়া হাসপাতালেও মেরেসিয়েভকে খুঁজে বের করবে কেমন করে? মেরেসিয়েভ ত ওকে জানিয়েছে যে সে ফ্রণ্টের পিছনে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, মস্কোতে নয়, উপকণ্ঠে।

কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে অলৌকিকে আস্থাবান আলেক্সেই, নিজের অলক্ষিতে দৌড়ল ও. কৃত্রিম পায়ে এই প্রথম দৌড়নো তার; কেমন দুলে দুলে এগোচ্ছে, মাঝেমাঝে শুধু ভর দিচ্ছে ছড়িতে, বুটদুটো মচমচ, মচমচ করে চলেছে...

রিসিভারটা তুলে নেওয়াতে কানে এল প্রীতিকর গভীর কিন্তু একেবারে অচেনা কণ্ঠস্বর। ব্যক্তিটি জানতে চাইল সে ৪২ নং ওয়ার্ডের সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আলেক্সেই পেত্রভিচ মেরেসিয়েভ কি না।

প্রশ্নটাতে যেন অবমাননাসূচক কিছু আছে, তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ গলায় খেঁকিয়ে উঠল মেরেসিয়েভ:

'হ্যাঁ!'

এক মুহূর্ত কোন সাড়া নেই, তারপর ব্যক্তিটি ওকে বিরক্ত করার জন্য মাপ চাইল, কণ্ঠস্বর এখন উদাসীন আর আড়ষ্ট, স্পষ্টতই মেরেসিয়েভের সংক্ষিপ্ত উত্তরে চটেছে, বেশ চেষ্টা করে বলে চলল:

'আমি আন্না গ্রিবভা, লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভের বন্ধু। আমাকে চেনেন না আপনি,' উদাসীন উত্তরে ব্যথিত হয়ে করুণভাবে বলল মেয়েটি।

দুহাতে রিসিভারটা আঁকড়ে ধরে মেরেসিয়েভ প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলল:

'আপনি আনিউতা? আনিউতা? বিলক্ষণ চিনি আপনাকে: গ্রিশা আমাকে বলেছে...'

'ও এখন কোথায়? কী হয়েছে ওর? এমন ঝট করে চলে গেল! সাইরেন বাজতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, প্রাথমিক সাহায্যকারীদের সঙ্গে কাজ করি আমি, জানেন ত, ফিরে যখন এলাম তখন ও চলে গিয়েছে, কোন চিঠি কিম্বা ঠিকানা রেখে যায়নি... ভাই আলিওশা! এরকম করে ডাকার জন্যে মাপ করবেন, আপনাকেও চিনি আমি, ওর জন্যে ভয়ানক উদ্বিগ্ন লাগছে। কোথায় আছে, কেন ওরকম ঝট করে চলে গেল, জানতে মন চাইছে আমার...'

মরমী অনুভূতিতে আলেক্সেই'র বুক ভরে উঠল। বন্ধুর জন্য খুসি লাগল নিজেকে। লোকটা মজার, ভুল করেছিল ও, নিতান্ত অভিমানী লোক। তাহলে সৈনিকের বিকলাঙ্গতায় সত্যিকারের মেয়েরা ভয় পায় না। তার মানে, ও নিজেও ধরে নিতে পারে যে তার জন্য একজন কেউ উদ্বিগ্ন, ঠিক এরকম ভাবেই খুঁজছে তাকে। বিদ্যুৎ ঝলকের মত কথাগুলো তার মনে এল, রিসিভারে মুখ রেখে উত্তেজনায় প্রায় থুতু ছিটিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'আনিউতা! সবকিছু ঠিক আছে! দুজনের বুঝতে ভুল হয়েছিল, সেটা দুঃখের কথা। ও খুব ভালো আছে, আবার কাজ করছে। সত্যি! ফীল্ড পোস্ট ওর ৪২৫৩১-বি। দাড়ি রাখছে গ্রিশা, সত্যি বলছি, আনিউতা! খাসা দাড়ি একটা... এই যেমন পার্টিজানরা রাখে! বেশ মানায় ওকে!'

দাড়ি রাখাটার তারিফ করল না আনিউতা। ওর মতে কোন দরকার নেই সেটার। কথাটা শুনে আরো খুসি হয়ে মেরেসিয়েভ বলল সত্যিই যদি তাই হয় তাহলে গ্রিশা ত এক নিমেষে দাড়ি ত্যাগ করবে, যদিও সবাই বলছে দাড়ি রাখাতে ওকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে।

শেষে রিসিভার নামিয়ে যখন রাখা হল দুজনেই তখন পরম বন্ধু, ঠিক হল যে হাসপাতাল ছাড়ার আগে মেরেসিয়েভ ওকে ফোন করবে।

ওয়ার্ডে ফিরে যেতে যেতে আলেক্সেই'র মনে পড়ল যে টেলিফোন ধরার সময়ে ছুটে গিয়েছিল ও। আবার দৌড়তে চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু সুবিধে হল না। কৃত্রিম পায়ের চাপে তীক্ষ্ম যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর ব্যথিয়ে

উঠছে। যাক গে, ভাববার কিছু নেই! আজ দৌড়তে পারছে না বটে, কাল পারবে, কাল যদি না পারে তাহলে পরশু, আর চুলোয় যাক, দৌড়বেই সে! সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে! আবার দৌড়তে, বিমান চালাতে আর লড়তে পারবে সে। শপথ করতে ভালোবাসে আলেক্সেই, তাই শপথ করল যে প্রথম আকাশ-যুদ্ধের পরে, প্রথম জার্মান বিমান নামাবার পরে ওলিয়াকে সবকিছু লিখে জানাবে। যা ঘটে ঘটুক!

তৃতীয় খণ্ড

১

১৯৪২-এর ভরা গ্রীষ্মে একটি বলিষ্ঠ যুবক আবলুস কাঠের মোটা ছড়িতে ভর দিয়ে মস্কোর আর্মি হাসপাতালের ওকের ভারী দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। বিমান বাহিনীর শক্ত-কলার কোট আর ট্রাউজার পরনে, কলারে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের পরিচয়-চিহ্ন। সঙ্গে শাদা ওভারঅল গায়ে একটি মেয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে নার্সরা যেরকম রেডক্রস মার্কা রুমাল মাথায় দিত সেরকম রুমাল মাথায় তার, কোমল সুন্দর মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ এনেছে সেটা। প্রবেশদ্বারের বারান্দায় দাঁড়াল দুজনে। তোবড়ানো রঙচটা বাহিনীর টুপিটা খুলে বৈমানিক নার্সের হাতে চুম্বন করার জন্য ঝুঁকল আনাড়িভাবে। দুহাতে তার মাথা ধরে নার্স কপালে চুম্বন করল। তারপর বৈমানিক, একটু দুলে দুলে হাঁটার ভঙ্গী তার, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামল, পিছন ফিরে আর না তাকিয়ে এ্যাসফল্টের বাঁধ হয়ে হাসপাতাল ছাড়িয়ে চলে গেল।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নীল হলদে আর খয়েরী রঙের পাজামা-পরা রোগীরা, কেউ হাত, কেউ হাঁটবার ছড়ি আর কেউবা ক্রাচ নেড়ে চেঁচিয়ে বিদায়কালীন উপদেশ দিচ্ছে বৈমানিককে। উত্তরে হাত নাড়ল সে, কিন্তু বোঝা গেল এই বড়ো ধূসর বাড়িটা যত শীগগির সম্ভব পেরিয়ে যেতে চায় সে, নিজের উত্তেজনা গোপন করার জন্য তাড়াতাড়ি জানলার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তাড়াতাড়ি হাঁটছে, ছড়িতে অল্প ভর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে। প্রতি পদক্ষেপে অস্পষ্ট মচমচ আওয়াজ না হলে কারো মনে হত না যে এই সুগঠিত বলিষ্ঠ চেহারার কর্মঠ লোকটির পায়ের পাতা নেই।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে তাড়াতাড়ি যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে সেজন্য আলেক্সেইকে পাঠানো হয় মস্কোর কাছে বিমান বাহিনীর স্বাস্থ্যাগারে। মেজর স্ত্রুচকভকেও পাঠানো হয় সেখানে। ওদের স্বাস্থ্যাগারে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি এসেছিল, কিন্তু মেরেসিয়েভ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে বলল যে মস্কোতে ওর আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবে না। কিট-ব্যাগটা স্ত্রুচকভের কাছে রেখে হে'টে রওনা হল সে, কথা দিল বৈদ্যুতিক ট্রেনে সন্ধ্যেবেলায় স্বাস্থ্যাগারে পে'ছিবে।

মস্কোতে কোন আত্মীয় ছিল না আলেক্সেই'র, কিন্তু রাজধানী ঘুরে দেখবার খুব সখ তার, বিনা সাহায্যে হাঁটতে কতটা পারে পরীক্ষা করতে চায়, ওর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই এমন সরব জনতার মধ্যে যেতে চায়। টেলিফোনে আনিউতাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে বারোটা নাগাদ সে দেখা করতে পারে কি না। কোথায়? এই ধরো, পুশকিন স্মৃতিস্তম্ভের কাছে... আর তাই গ্রানিট-বদ্ধ মহিমান্বিত নদীটির বাঁধ ঘে'ষে চলেছে সে, নদীর ছোট ছোট ঢেউ রোদে চিকচিক করছে। হাঁটতে হাঁটতে মিষ্টি চেনা গন্ধে ভরপুর গ্রীষ্মের উষ্ণ হাওয়া প্রাণভরে নিচ্ছে সে।

চারিদিকে সর্বকিছু কী সুন্দর!

মেয়েরা হে'টে চলে যাচ্ছে। সবাইকে সুন্দর লাগছে তার; সবুজ গাছগুলো কী অসম্ভব উজ্জ্বল! হাওয়া এত সুগন্ধি যে মাতালের মত ওব মাথা ঘুরছে, এত পরিষ্কার যে পরিপ্রেক্ষিত বোধ থাকছে না, মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই এর আগে শুধু ছবিতে দেখা ক্রেমলিনের প্রাকারগুলো স্পর্শ করতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে মহান ইভানের ঘণ্টাঘরের গম্বুজ আর নদীর উপরে ভারীভাবে আনত সেতুর বিরাট নিচু খিলানটা। মিষ্টি মাতাল-করা গন্ধে সহর আচ্ছন্ন, নিজের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। গন্ধটা আসছে কোথা থেকে? হৃৎস্পন্দন এত দ্রুত কেন, কেন মায়ের কথা মনে পড়ছে, আজকের শীর্ণা বৃদ্ধাটি নয়, আগেকার সেই নবীনা দীর্ঘাকৃতি মানুষটির কথা, চুল যাঁর অসম্ভব সুন্দর ছিল? মায়ের সঙ্গে কখনো ত সে মস্কোয় আসেনি।

এর আগে মস্কোর সঙ্গে মেরেসিয়েভের পরিচয় হয় শুধু পত্রিকা আর সংবাদপত্রে ছবির মাধ্যমে, বই পড়ে, যারা সহরটা দেখেছে তাদের কাছে শোনা কথায়, রেডিওতে শোনা সহরের উপরে মধ্যরাত্রে মুখরিত প্রাচীন ঘড়িটির ঘণ্টায় আর উৎসবের দিনে শোভাযাত্রা আর সমাবেশের নানা

বিশৃঙ্খল ধ্বনিতে। আর আজ গ্রীষ্মের তপ্ত আলোয় বিচ্ছুরিত সহরটি চোখের সামনে বিস্তৃত!

ক্রেমলিনের প্রাকারের ধার ঘেঁষে জনহীন বাঁধ দিয়ে এগল মেরেসিয়েভ, জিরিয়ে নেবার জন্য ঠাণ্ডা গ্রানিট পারাপেটে ভর দিয়ে দাঁড়াল, নিচে চেয়ে দেখল ধূসর তৈলাক্ত জল গ্রানিট দেয়ালের গায়ে ঝুপঝুপ করে লাগছে, তারপর আস্তে আস্তে চড়াই ভেঙ্গে উঠল সেই পথে যেটা গিয়েছে রেড স্কোয়ারের দিকে। এ্যাসফল্টের রাস্তায় আর স্কোয়ারে লাইমগাছগুলোতে ফুল ফুটেছে, ছাঁটা চূড়োয় চূড়োয় সহজ মিষ্টি গন্ধে ভরা ফুলে মৌমাছির ব্যস্ত গুঞ্জন, চলন্ত মোটরগাড়ির হর্ণের আওয়াজ, ট্রামের ঢংঢং শব্দ, তপ্ত এ্যাসফল্ট থেকে ওঠা তেলের ধোঁয়াচ্ছন্ন ঝিকমিকে ঝাপসা চাদর কিছুরই পরোয়া করছে না মৌমাছিগুলো।

এই তাহলে মস্কো!

হাসপাতালে চার মাস কাটাবার পর গ্রীষ্মের এই মহিমায় এত অবাক আলেক্সেই যে প্রথমে তার চোখে পড়ল না যে রাজধানীর শরীরে এখন যুদ্ধের সজ্জা, অবস্থাটা এখন, বিমান বাহিনীতে যাকে বলা হয় "পয়লা নম্বরের প্রস্তুতি," অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তৈয়ার। সেতুর কাছে চওড়া রাস্তাটা প্রকাণ্ড কুৎসিৎ একটা ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো, বালিতে-ভরা কাঠের বাক্স দিয়ে তৈরী সেটা। সেতুর কোণে কোণে উদ্যত চতুশ্ছিদ্র মুখ, কামান বসানোর কংক্রিট জায়গা, যেন কোন বাচ্চা টেবিলে খেলনার ছক ফেলে গিয়েছে। রেড স্কোয়ারের ধূসর বুকে বাড়িঘরদোর, বীথি আর বড়ো রাস্তা নানা রঙে আঁকা হয়েছে। গোর্কি স্ট্রীটে দোকানগুলোর জানলা তক্তা আর বালির থলেয় ঢাকা; গলিগুলোতে রেল কণ্টকিত "সজারু", বাচ্চাদের পরিত্যক্ত খেলনার মত দেখাচ্ছে তাদেরো। ফ্রণ্ট থেকে আসা কোন সৈনিকের চোখে কিছু অস্বাভাবিক লাগবে না এসব, বিশেষ করে সে যদি আগে মস্কো দেখে না থাকে। দোকানের জানলা আর দেয়ালে লাগানো "তাস"এর গবাক্ষগুলো পথচারীদের দিকে তাকিয়ে আছে, কয়েকটা বাড়ির সামনের দিকে বিচিত্রভাবে রং দেওয়া হয়েছে, কিম্ভূতকিমাকার ফিউচরিষ্ট ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় সেটা, শুধু এগুলো দেখতে অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক।

মেরেসিয়েভ বেশ ক্লান্ত এখন; বুটদুটো মচমচ করছে, ছড়িতে আগের চেয়ে বেশী করে ভর দিয়ে গোর্কি স্ট্রীট হয়ে চলল সে; চারিদিকে তাকিয়ে

অবাক হয়ে যাচ্ছে সে — বোমার ছোট বড়ো গর্ত, বিধ্বস্ত বাড়ি, হাঁ-করা ফাঁকা জায়গা, ভাঙ্গা জানলা, কিছুই চোখে পড়ছে না ত। খুব পশ্চিমের দিকে বিমান-ঘাঁটিতে কাজ করেছে সে, প্রায় প্রতি রাত্রে ডাগ-আউটের উপর দিয়ে ঢেউ'এর পর ঢেউ'এ জার্মান বোমারু বিমানের পূবমুখো যাত্রার শব্দ শোনা তার অভ্যেস। এক দল চলে যেত, শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে না যেতে আসত আর একটা ঝাঁক, আর মাঝেমাঝে সারা রাত ধরে চলত বিমানগর্জন। বৈমানিকেরা জানত ফ্যাশিস্টরা যাচ্ছে মস্কোর দিকে, কী নরকের আগুন জ্বলেছে সেখানে কল্পনা করত।

আর আজ যুদ্ধকালীন মস্কোতে ঘুরতে ঘুরতে বিমান আক্রমণের চিহ্ন খুঁজে কিছু দেখতে পেল না মেরেসিয়েভ। এ্যাসফল্টের রাস্তাগুলো মসৃণ, বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ঠ সার বেঁধে। এমন কি কাগজ-আঁটা জানলাগুলো পর্যন্ত অক্ষত, মাত্র কয়েকটা বাদ দিয়ে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র বেশী দূরে নয়, সেটা বোঝা যায় বাসিন্দেদের ক্লান্ত শ্রান্ত মুখ থেকে। বাসিন্দেদের অর্ধেক সৈনিক, ধূলিধূসর তাদের উঁচু বুটগুলো, ঘামে পিঠে লেপটে আছে টিউনিক, পিঠে ন্যাপসাক। গলি থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল বড়ো রাস্তায় হঠাৎ এসে পড়ল লম্বা সারি বেঁধে একদল লরি, ধুলোয় আচ্ছন্ন, মাডগার্ড তোবড়ানো, উইন্ড-স্ক্রিণ ভেঙ্গে গিয়েছে। নড়বড়ে লরিগুলোতে যাত্রী সৈনিকেরা সকৌতূহলে চারিদিকে তাকাচ্ছে, হাওয়ায় উড়ছে কেপগুলো। লরির সারিটা ট্রলিবাস মোটরগাড়ি আর ট্রাম পেরিয়ে এগিয়ে গেল; শত্রুপক্ষ যে বেশী দূরে নয় তার জাজ্বল্য প্রমাণ সেটা। লরিগুলোর দিকে আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে রইল মেরেসিয়েভ, ভাবল, যদি ধূলিধূসর লরিগুলোর একটায় লাফিয়ে উঠতে পারে তাহলে সন্ধ্যার মধ্যে ফ্রন্টে, নিজের বিমান-ঘাঁটিতে পোঁছিয়ে যাবে! দেগতিয়ারেঙ্কোর সঙ্গে যে ডাগ-আউটে থাকত তার কথা ভাবল, ফার কাঠের খাট, আলকাতরা ও ফারগাছের গন্ধ, চ্যাপটা কার্তুজ থেকে তৈরী সেই আদিম প্রদীপটা থেকে পেট্রলের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরোচ্ছে, সকালে ইঞ্জিনের গর্জন, তাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে সেগুলো, আর মাথার উপরে কখনো থামে না দোদুল্যমান পাইনগাছের মর্মরধ্বনি। ডাগ-আউটটা তার নিজের বাড়ির মত মনে হল, চুপচাপ আরামে-ভরা বাড়ি। সেই জলাভূমিটায়, স্যাঁতসেঁতে বলে বৈমানিকদের চক্ষুশূল ছিল যেটা, সেই ভেজা মাটি আর মশার অবিরাম গুঞ্জনে-ভরা জায়গাটাতে যদি তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়তে পারে!

বেশ কষ্টে পা ফেলে পুশকিন স্মৃতিস্তম্ভের দিকে চলল মেরেসিয়েভ।

পথে জিরোবার জন্য কয়েকবার থামল, ছড়িতে দ্বহাতে ভর দিয়ে এমন ভাব দেখাল যেন দোকানের জানলায় টুকিটাকি জিনিস খ্ঁটিয়ে দেখছে। স্ম্তিস্তম্ভে পেণছিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটি গরম সব্জ বেঞ্চে বসে পড়ল, পড়ে গেল বলা চলে। কৃত্রিম চেটোর ফিতের চাপে পাদ্বটো যন্ত্রণায় জ্বলছে, পা ছড়িয়ে বসল মেরেসিয়েভ। ক্লান্ত লাগছে, কিন্তু আনন্দের ভাবটা কেটে যায়নি একেবারে। অদ্ভুত স্বন্দর রোদে-ভরা এই উজ্জ্বল দিনটি! রাস্তার মোড়ে বাড়িটার কোণের মিনারে পাথরের একটা স্ত্রীম্র্তি, তার উপরে আকাশটাকে অসীম মনে হচ্ছে। প্রশস্ত বীথি হয়ে হালকা হাওয়ায় আসছে লাইমগাছের তাজা মিষ্টি গন্ধ। ঢংঢং আওয়াজে ফুর্তিতে চলেছে ট্রামগ্বলো, স্ম্তিস্তম্ভের তলায় বাচ্চারা তাড়াহ্বড়ো করে শ্বকনো গরম বালি খ্রড়ছে, পান্ডুর আর রোগা তারা, কিন্তু হাসিটা খ্রসিতে উজ্জ্বল। বড়ো রাস্তায় আরো এগিয়ে, দড়ির বেড়ার আড়ালে চোখে পড়ে বিমান-রোধক বেল্বন-বাঁধের র্পালী, চুরোট-আকৃতি দেহ, খরখরে ফৌজী টিউনিক-পরা গোলাপী-গাল দ্বটি মেয়ে সেটা পাহারা দিচ্ছে। য্বদ্ধের এই অস্ত্রটিকে মস্কো আকাশের নিশা-প্রহরীর মত ঠেকল না মেরেসিয়েভের কাছে, বরঞ্চ মনে হল চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে এসে কোন বিপ্বলকায় নিরীহ জন্তু গাছের ঠান্ডা ছায়ায় ঝিমোচ্ছে।

চোখ ব্বজে আকাশের দিকে হাসি-ম্বখ ফেরাল মেরেসিয়েভ।

প্রথম প্রথম বাচ্চারা বৈমানিককে মনোযোগ দিয়ে দেখেনি। তাদের দেখে ৪২ নং ওয়ার্ডের জানলার কাঠে বসা চড়্বইগ্বলোর কথা মনে হল মেরেসিয়েভের, ওরা কিচির মিচির করে চলেছে, আর ও সমস্ত শরীর দিয়ে স্বর্যের উত্তাপ আর রাস্তার নানা শব্দ গ্রহণ করছে। কিন্তু খেলার সাথীদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে গিয়ে একটা ক্ষ্বদে মেরেসিয়েভের ছড়ানো পায়ে হোঁচট খেয়ে ধড়াস করে বালির উপরে পড়ল।

ম্বহ্বর্তের জন্য বাচ্চাটির ম্বখ কান্নায় বিকৃত হয়ে উঠল, তারপরে এল হতব্বদ্ধি ভাব, তারপর বিভীষিকা। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে তড়তড় করে ছ্বটে পালাল সে। বাচ্চার ঝাঁক তাকে ঘিরে দাঁড়াল, কিছ্বক্ষণ চলল ভয়ের কিচির মিচির, আড়চোখে বৈমানিককে দেখা। তারপর আস্তে আস্তে চোরের মত ওরা মেরেসিয়েভের কাছে এগিয়ে এল।

চিন্তায় একাগ্র মেরেসিয়েভ কিছ্বই লক্ষ্য করেনি। চোখ খ্বলে দেখল বাচ্চাগ্বলো ভয়ে আর বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, আর শ্বধ্ব তখনি ওরা কী বলছে হ্বঁশ হল তার।

'মিথ্যে কথা বলছিস তুই, ভিতামিন! আসল বৈমানিক ও। সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' বছর দশেকের একটি ফ্যাকাশে ক্ষীণ ছেলে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল।

'মিথ্যে বলছি না। সাঁচ্চা পাইওনিয়রের কথা দিচ্ছি, মিথ্যে বললে যেন জিভ খসে যায়! সত্যি ওগ্‌নলো কাঠের! আসল নয়, কাঠের।'

ব্‌নক ম্‌নচড়িয়ে উঠল মেরেসিয়েভের, তৎক্ষণাৎ দীপ্ত দিনটা অন্ধকার হয়ে এল তার কাছে। চোখ তুলে তাকাল, তা দেখে পিছ্‌ন হটে গেল বাচ্চারা, তখনো ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। বন্ধ্‌নর সন্দিগ্ধচিত্ততায় বিরক্ত হয়ে ভিতামিন য্‌নদ্ধং দেহি ভঙ্গীতে বলল:

'যদি বলিস ত ওকে জিজ্ঞেস করি। ভেবেছিস ভয় পেয়েছি? বাজী রাখবি নাকি?'

দল ছেড়ে আস্তে আস্তে সাবধানে আড়ভাবে ও এল মেরেসিয়েভের কাছে, এক ছ্‌নটে পালাতে প্রস্তুত, হাসপাতালের জানলায় বসা "সাব-মেসিনগানার"এর মত। অবশেষে স্টার্ট লাইনের কাছে দৌড়িয়ের মত কুঁজো আর টান-টানভাবে দাঁড়িয়ে সাহস করে জিজ্ঞেস করল:

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, আপনার পাদ্‌নটো কী ধরনের, আসল না কাঠের? আপনি কি পঙ্গ্‌ন হয়ে গিয়েছেন?'

বাচ্চাটি দেখল বৈমানিকের চোখ জলে ভরে গেল। যদি লাফিয়ে উঠে মেরেসিয়েভ চেঁচাত আর সোনালী অক্ষর বসানো মজার ছড়িটা দিয়ে তাড়া করত ওকে, তাহলে ততটা আশ্চর্য হত না বাচ্চাটি যতটা হল বিমান বাহিনীর একজন লেফ্‌টেনাণ্টকে কাঁদতে দেখে। "পঙ্গ্‌ন" শব্দটি উচ্চারণ করে বৈমানিককে যে ব্যথা দিয়েছে সেটা ব্‌নঝল না, অন্‌নভব করল সে তার ছোট্ট ব্‌নকে। কোন কথা না বলে বাচ্চাদের ভিড়ে ফিরে গেল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা, যেন গরম হাওয়ায় উবে গিয়েছে, সে হাওয়ায় মধ্‌নর আর তপ্ত এ্যাসফল্টের গন্ধ।

আলেক্সেই'র নাম ধরে কে ডাকল। তক্ষ্‌নণি উঠে পড়ল সে। সামনে দাঁড়িয়ে আনিউতা। তৎক্ষণাৎ চিনল তাকে, যদিও ফটোতে যেমন তেমন স্‌নন্দর নয়। ওর ম্‌নখ বিবর্ণ আর শ্রান্ত, গায়ে টিউনিক, পায়ে উঁচু ব্‌নট, মাথায় বসানো বাহিনীর প্‌নরোনো মলিন টুপি। কিন্তু সবজে, একটু বেরিয়ে-আসা চোখে এমন সহজ ও দীপ্তভাবে ও তাকাল মেরেসিয়েভের দিকে, সে

দৃষ্টিতে প্রীতির এমন বিকিরণ যে অচেনা মেয়েটিকে অনেক দিনের চেনা লোক মনে হল, যেন শৈশবে একই উঠোনে দুজনে খেলেছে।

এক মুহূর্ত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা না বলে। অবশেষে মেয়েটি বলল:

'আপনার একেবারে অন্য রকম চেহারা ভেবেছিলাম!'

'কী রকম চেহারা?' জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ, মুখের হাসিটা ঠিক মানানসই নয়, তবে সেটাকে তাড়াতে পারল না সে।

'কী করে বোঝাই, ভাবছি! এই ধরুন, বীরের মত চেহারা, লম্বা আর চওড়া। হ্যাঁ, ঠিক সে রকম, আর চোয়ালটা ভারী, এরকম, মুখে একটা পাইপ... গ্রিশা আপনার কথা এত লিখত!'

'আপনার গ্রিশা, সে কিন্তু সত্যিকারের বীর!' বাধা দিয়ে বলল আলেক্সেই। আর মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখে একই ঢঙে বলে চলল "আপনার" কথাটায় জোর দিয়ে, 'মানুষের মত মানুষ আপনার গ্রিশা! আমি আর এমন কী? কিন্তু আপনার গ্রিশা... মনে হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে ও আপনাকে কিছু বলেনি...'

'কী জানেন, আলিওশা... আপনাকে আলিওশা বলে ডাকতে পারি ত?..ওর চিঠিপত্রে এই নামটিই আমার খুব চেনা... মস্কোতে আপনার অন্য কাজ নেই ত? তাহলে আমার বাড়িতে চলুন। আমার কাজ শেষ, সারা দিন আর কাজ নেই। চলুন! বাড়িতে কিছু ভদকা আছে। ভদকা আপনার ভালো লাগে? কিছু খাওয়াব চলুন।'

সে নিমেষে আলেক্সেই'র স্মৃতির গভীর থেকে এক ঝলকে চোখের সামনে এল মেজর স্ত্রুচকভের সেয়ানা মুখ, দ্বেষ-কলুষ কণ্ঠে যেন বলছে: "দেখছ ত? কী ধরনের মেয়ে বোঝো এবার! একলা থাকে! ভদকা! বেশ, বেশ!" কিন্তু স্ত্রুচকভ এত লজ্জাকরভাবে নাজেহাল হয়েছে যে ওর কোন কথায় কান দেবে না আলেক্সেই। সন্ধ্যা হতে অনেক দেরী, তাই প্রশস্ত বীথি ধরে বেড়াল তারা, পুরোনো বন্ধুর মত গল্প করে চলেছে উৎফুল্লভাবে। যুদ্ধের শুরুতে কী বিপর্যয় ঘটেছিল গভজ্‌দেভের সেটা আলেক্সেই বলার সময়ে চোখের জল চাপার জন্য আনিউতা ঠোঁট কামড়াল, দেখে খুসি হল ও। ফ্রণ্টে ওর কীর্তিকলাপের কথা শোনার সময়ে মেয়েটির সবজে চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। গভজ্‌দেভের সম্বন্ধে কী গর্বিত মেয়েটি! খুঁটিনাটি খবর, আরো খবর জানবার জন্য প্রশ্ন করছে, আর গালদুটো কেমন টকটকে

লাল হয়ে উঠেছে! কী কারণে জানি না, নিজের মাইনের সার্টিফিকেট গভজ্‌দেভ ওকে পাঠিয়েছে শুনে কী চটেই না উঠল আনিউতা! আর ওরকম ভাবে পালিয়ে গিয়েছিল কেন সে, কোন কথা না বলে, চিঠি না লিখে, ঠিকানা না জানিয়ে! সামরিক গুপ্ত কথা গোছের ব্যাপার না কি? কিছু না বলে, কিছু না লিখে চলে যাওয়াটা বুঝি সামরিক গুপ্ত কথার রেওয়াজ?

'ভালো কথা, ও দাড়ি রাখছে সেটা এত জোর দিয়ে কেন বলছিলেন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইল আনিউতা।

'এমনি বলে ফেলেছিলাম, কিছু নয় ওটা,' এড়িয়ে যাবার মত করে বলল আলেক্সেই।

'না, ঠিক বলুন ত! না বললে আপনাকে ছাড়ছি না। ওটাও কি সামরিক গুপ্ত কথা?'

'তা নয় নিশ্চয়। আমাদের অধ্যাপক ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ... মানে... বলেছিলেন দাড়ি রাখতে এই আর কি... যাতে মেয়েরা মানে বিশেষ একটি মেয়ে, ওকে বেশী পছন্দ করে।'

'ও, তাই বুঝি! এখন ব্যাপারটা সাফ হল!'

আনিউতার সবজে চোখের জ্যোতি হঠাৎ মিলিয়ে গেল, মনে হল বয়স বেড়ে গিয়েছে। মুখের পান্ডুর ভাব হল স্পষ্টতর, পাতলা বলিরেখা — এত সূক্ষ্ম যে মনে হয় ছুঁচ দিয়ে আঁকা — দেখা গেল কপালে, চোখের কোণে; জীর্ণ পুরোনো টিউনিক, গাঢ় কটা চুলের উপরে বাহিনীর মলিন টুপি, সব মিলিয়ে ওকে দেখাল ক্লান্ত শ্রান্ত। শুধু ছোট ভরাট উজ্জ্বল লাল ঠোঁটজোড়া, গোঁফের অতি সূক্ষ্ম আভাস, আর উপরের ঠোঁটে ছোট্ট তিলটি দেখে বোঝা যায় তার বয়স এখনো কম, খুব বেশী হলে বিশ।

জমকালো নানা বাড়ি, তাদের ছায়ার নিচে প্রশস্ত রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে যেতে রাস্তা ছেড়ে কয়েক পা এগোল, সামনে দেখা গেল ছোটখাটো একটা বাড়ি, ছোট জানলাগুলো জরায় জীর্ণ; এরকম মস্কোতে দেখা যায়। এমন একটা বাড়িতে আনিউতা থাকে। সংকীর্ণ সিঁড়ি হয়ে ওরা গেল উপর তলায়, সিঁড়িতে বেড়াল আর কেরোসিনের গন্ধ। চাবি দিয়ে দরজা খুলল আনিউতা। অপরিসর প্রবেশপথে ঠাণ্ডায় রাখা খাবারদাবারের থলে, টিনের পাত্র কয়েকটা আর কৌটো, সেগুলো পেরিয়ে ওরা ঢুকল একটা বড়ো, শূন্য

রান্নাঘরে, ছোট বারান্দা হয়ে থামল একটা নিচু দরজার সামনে। অন্য দিকের দরজা দিয়ে মাথা বের করল ছোটখাটো শীর্ণা একটি বৃদ্ধা।

'আন্না দানিলভনা তোমার একটা চিঠি আছে,' বলল সে। ঘরে ঢোকা না পর্যন্ত সকৌতূহল ওদের দেখে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আনিউতার বাবা একটা ইনস্টিটিউটে পড়ান। ইনস্টিটিউটের লোকজন সরাবার সময়ে ওর বাবা-মাও চলে যান। দুটো ঘর লিনেন দিয়ে ঢাকা আসবাবপত্রে বোঝাই, আসবাবের দোকানের মত, রয়ে গেল মেয়ের তদারকে। আসবাবপত্রে, দরজা আর জানলায় ভারী পুরোনো পর্দায়, দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোতে, ছোট ছোট প্রতিমূর্তিতে আর পিয়ানোর উপরে রাখা ফুল-দানিতে ছাতা-ধরা বিষণ্ণ গন্ধ একটা।

'সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, কিছু মনে করবেন না। আমি হাসপাতালে থাকি আর সেখান থেকে সোজা যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে মাঝেমাঝে শুধু আসি,' লজ্জায় লাল হয়ে উঠে আনিউতা বলল, টেবিলের উপরে ছড়ানো জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি সরাতে গিয়ে টেবিল-ঢাকনাটাও তুলে নিয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল, টেবিল-ঢাকনাটা পেতে পাড়গুলো সযত্নে ঠিক করল।

'এখানে আসার সুযোগ পেলেও এত ক্লান্ত থাকি যে কোনক্রমে সোফার কাছে শরীরটাকে টেনে গিয়ে জামাকাপড় না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়ি। তাই গোছাবার সময় বিশেষ পাই না!'

কয়েক মিনিট পরে বৈদ্যুতিক কেটলির গান শুরু হল; টেবিলে ঝকঝক করছে রঙ-চটা পুরোনো চীনে মাটির কাপ, চীনে মাটির তৈরী রুটির প্লেটে গমের পাঁউরুটির পাতলা ফালি কয়েকটা, আর চিনি-দানির একেবারে তলায় চিনির ছোট ছোট টুকরো। পশমের থোপনার ঢাকনির নিচে কেটলিতে চা ভিজছে, গত শতাব্দীর জিনিস সেটাও। চায়ের সুগন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে, যুদ্ধের আগের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় সে গন্ধ। টেবিলের মাঝখানে একটা না-খোলা নীলচে বোতল, পাতলা হাতলহীন দুটো পানপাত্র দুদিক থেকে পাহারা দিচ্ছে সেটাকে।

মখমলে-মোড়া বড়ো একটা কেদারায় মেরেসিয়েভ বসেছে। সবুজ মখমলের আস্তরণ ভেদ করে উঁকি মারছে এত বেশী তুলো যে চেয়ারের পিছনে আর সিটে সযত্নে লাগানো কাজ-করা পশমের মোটা কম্বলগুলোও

সেগুলো ঢাকতে অক্ষম। কিন্তু চেয়ারটা এত আরামদায়ক, এত যত্নে আর মোলায়েমভাবে লোকজনকে গ্রহণ করে যে আলেক্সেই গা এলিয়ে দিল তাতে তৎক্ষণাৎ, ক্লান্ত টনটনে পাদুটো দিল ছড়িয়ে।

তার পাশে ছোট একটা টুলে বসে, ছোট মেয়ের মত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আনিউতা গভজ্‌দেভের বিষয়ে আবার ওকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব তার, তাড়াতাড়ি উঠে নিজেকে বকে আলেক্সেইকে টেনে নিয়ে গেল টেবিলে।

'এক গেলাস ভদকা খাবেন? গ্রিশা বলেছিল যে ট্যাঙ্ক-বাহিনীর লোকেরা, বৈমানিকেরাও, অবশ্য...'

আলেক্সেইকে একটা গেলাস ঠেলে দিল আনিউতা। আড়াআড়িভাবে ঘরে এসেছে সূর্যের উজ্জ্বল আলো, ঝিকঝিক করে উঠল ভদকার নীলচে আভা। মদের গন্ধে আলেক্সেই'র মনে পড়ল দূর বনে বিমান-ঘাঁটিটির কথা, অফিসারের মেস, নৈশভোজনের সময়ে "বরাদ্দ ইন্ধন" দেওয়া হয়েছে আর সবাই খুসিতে গুনগুন করছে। অন্য গেলাসটা শূন্য রয়ে গেল দেখে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করল:

'আপনি খাবেন না?'

'আমি মদ খাই না,' সরলভাবে জবাব দিল আনিউতা।

'কিন্তু ধরুন, যদি গ্রিশার স্বাস্থ্যকামনা করে খাই?'

আনিউতা হাসল, কোন কথা না বলে গেলাসটি ভরে নিয়ে, পাতলা টি ধরে আলেক্সেই'র গেলাসের সঙ্গে ঠেকাল, কী যেন ভেবে বলল:

'ওর কুশল কামনা করি!' বেশ কায়দায় গেলাসটা তুলে এক ঢোঁকে শেষ করল সেটা, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল কাশি, বিষম লেগেছে। মুখ রক্তিম, দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

অনেকদিন ভদকা খায়নি মেরেসিয়েভ, মদটা মনে হল সটান মাথায় চড়েছে, সমস্ত শরীর গরম হয়ে উঠল। গেলাসদুটো আবার ভর্তি করল সে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল আনিউতা।

'না না, মদ আমি খাই না। কী হল দেখলেন ত।'

'কিন্তু আমার সৌভাগ্য কামনা করে খাবেন না?' জোর দিয়ে বলল আলেক্সেই। 'যদি আপনি জানতেন, আনিউতা, কত দরকার আমার শুভেচ্ছার!'

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ওর দিকে তাকিয়ে গেলাস তুলল আনিউতা. হেসে

ওর দিকে মাথা নেড়ে, কনুই'এ ওকে আলগা চাপ দিয়ে শূন্য করল গেলাসটা: কিন্তু এবারেও বিষম লেগে কেশে উঠল সে।

'কী করছি, বলুন ত?' দম ফিরে এলে বলে উঠল আনিউতা। 'আর টানা চব্বিশ ঘণ্টা খাটার পর খাচ্ছি! শুধু আপনার জন্যে এটা করলাম, আলিওশা... আপনি... আপনার কথা গ্রিশা অনেক লিখত... আপনার সৌভাগ্য কামনা করি, বিশেষভাবে কামনা করি! আর আপনার যে ভালো হবে, আমার কোন সন্দেহ নেই তাতে। শুনছেন কী বললাম? আমার কোন সন্দেহ নেই!' আর খুসির হাসিতে উচ্চকিত হয়ে উঠল আনিউতা। 'কিন্তু আপনি ত খাচ্ছেন না! কিছু রুটি নিন। লজ্জা করবেন না। আরো আছে আমার। এটা কালকের রুটি। আজকের বরাদ্দ এখনো পাইনি।' চীনেমাটির রুটির প্লেটটা এগিয়ে দিল সে, পনীরের মত পাতলা করে কাটা রুটির ফালিগুলো। 'খান, নইলে মাতাল হয়ে যাবেন, তখন আপনাকে নিয়ে কী করব?'

রুটির প্লেটটা সরিয়ে দিয়ে সোজাসুজি আনিউতার সবজে চোখ আর ছোট ভরাট টুকটুকে ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় আলেক্সেই বলল:

'আপনাকে চুমু খেলে কী করবেন?'

ভীত দৃষ্টিতে তাকাল আনিউতা, তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। মুখে তার রাগের ভাব নেই, শুধু জিজ্ঞাসা আর হতাশা; এক মুহূর্ত আগে দামী জহরতের মত দূরে চিকচিক করছিল যে জিনিসটা এখন দেখা গেল সাধারণ কাচের টুকরো, এমনভাবে তাকিয়ে রইল আলেক্সেই'র দিকে।

'খুব সম্ভব আপনাকে তাড়িয়ে দেব আর গ্রিশাকে লিখব যে লোক চেনে না সে,' কঠোর সুরে বলল আনিউতা। আবার ওর দিকে রুটির প্লেটটা ঠেলে দিয়ে জোর দিয়ে বলল, 'কিছু খান, আপনার নেশা হয়েছে!'

মেরেসিয়েভের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আর সেটা করাই ত আপনার উচিত! ধন্যবাদ সেজন্যে! সারা সোভিয়েত বাহিনীর হয়ে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে! গ্রিশাকে লিখে জানাব যে সে লোক চেনে!'

প্রায় তিনটে পর্যন্ত ওদের গল্প চলল, ধূলিজালে আড়াআড়িভাবে আসা সূর্যের রেখা তখন গুঁড়ি দিয়ে দেয়ালে উঠছে। ট্রেন ধরবার সময় এসে পড়েছে আলেক্সেই'র। বিষণ্ণভাবে অনিচ্ছায় সবুজ মখমলের কেদারা ছেড়ে উঠল সে, কোটে লেগে রইল কিছুটা ছোবড়া। স্টেশন পর্যন্ত গেল আনিউতা।

হাত ধরাধরি করে দুজনে যাচ্ছে, আর জিরোবার পর এত স্বচ্ছন্দে হাঁটছে আলেক্সেই যে আনিউতা মনে মনে বলল, "বন্ধুর পায়ের পাতা নেই সেটা কি গ্রিশা ঠাট্টা করে লিখেছিল?" যে বেজ হাসপাতালে সে আর অন্যান্য ডাক্তারী ছাত্রছাত্রীরা কাজ করে, আহতদের বাছাই করার কাজ, তার কথা বলল আলেক্সেইকে। কাজের চাপ বেশ, কেননা প্রতিদিন দক্ষিণ থেকে ট্রেন বোঝাই আহত আসছে। আর তারা কী অদ্ভুত লোক, বীরের মত কেমন নিজেদের যন্ত্রণা সহ্য করে! হঠাৎ নিজেকে বাধা দিয়ে বলল আনিউতা:

'গ্রিশা দাড়ি রাখছে, সেটা ঠাট্টা করে বলেননি ত?' চুপ করে কী যেন ভেবে, তারপর বলল, 'সব বুঝতে পারছি এখন। আপনাকে সত্যি করে বলছি, যেমন বাবার কাছে বলি — প্রথম প্রথম ওর ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকালেই অসহ্য লাগত। অসহ্য নয়, কথাটা ঠিক হল না। মানে, ভয় করত। না সেটাও ঠিক নয়... কী করে বোঝাই জানি না। আপনি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? ওরকম করাটা হয়ত আমার উচিত হয়নি, কিন্তু কী করব বলুন! কিন্তু তাই বলে আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল! বোকার মত! সত্যি, কী বোকা লোক! ওকে চিঠি লিখলে জানিয়ে দেবেন ত যে আমার খুব খারাপ লেগেছে, ওর ব্যবহারে অত্যন্ত আহত আমি।'

বিরাট রেলওয়ে স্টেশনটির সবটাই প্রায় সৈন্যে বোঝাই। কেউ তাড়াহুড়ো করে ভারার্পিত কাজে যাচ্ছে, অন্যরা নিঃশব্দে দেয়ালের পাশে রাখা বেঞ্চিতে কিম্বা কিট-ব্যাগের উপরে বসে আছে, কেউ বা মেঝেতে, ভ্রূকুটিকুটিল চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, মনে হচ্ছে সবায়ের মাথায় একটি মাত্র কথা। এক সময়ে এই লাইনটি ছিল পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে প্রধান যোগসূত্র। এখন মস্কো থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম-মুখো রাস্তাটি শত্রুপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে। লাইনটির সংক্ষিপ্ত বাকি অংশে এখন শুধু সৈন্যবোঝাই ট্রেন যাতায়াত করে, দুঘণ্টার মধ্যেই রাজধানী থেকে সৈন্যরা তাদের নিজ নিজ ডিভিশনের দ্বিতীয় পঙক্তিতে পৌঁছয়, ডিভিশনগুলো সেখানকার প্রতিরোধ ঘাঁটি রক্ষা করছে। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর বৈদ্যুতিক ট্রেনে উপকণ্ঠ থেকে এসে প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে নামে শ্রমিকেরা আর কৃষাণীরা, শেষোক্তেরা আনে দুধ, ফল, ব্যাঙের ছাতা আর শাকসব্জি। কিছুক্ষণ তাদের ভিড়ে আর হৈচৈতে ভরে যায় রেলওয়ে স্টেশনটি, তারপর তারা ছড়িয়ে পড়ে স্কোয়ারে; তখন স্টেশনটি থাকে শুধু বাহিনীর লোকেদের হাতে।

স্টেশনের প্রধান হলটিতে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের একটি বিরাট

মানচিত্র দেয়াল জুড়ে টাঙ্গানো। সামরিক পোশাক গায়ে টুকটুকে গাল মোটাসোটা একটি মেয়ে মইতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে, পিনে আটকানো একটা তার দিয়ে কোথায় যুদ্ধ চলেছে দেখাচ্ছে। তার হাতের খবরের কাগজে সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের সর্বশেষ ইস্তাহার।

মানচিত্রের নিম্নাংশে তারটা হঠাৎ মোড় নিয়েছে ডানদিকে। দক্ষিণে জার্মানরা এগোচ্ছে। ইজিউম-বারভেন্‌কভো এলাকায় তারা প্রতিরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। ওদের ষষ্ঠ, বাহিনী দেশের বুকে মোটা গোঁজ বিঁধে দনের নীল শিরার দিকে অগ্রসর। দনের লাইনের কাছাকাছি তারটি বাঁধল মেয়েটি। বেশ কাছে বঙ্কিম রেখায় চলেছে ভলগার মোটা ধমনী, স্তালিনগ্রাদ বড়ো বৃত্ত দিয়ে ঘেরা, তার উপরে একটা বিন্দু, কামিশিন সেটা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দনকে আঘাত করেছে শত্রুপক্ষের যে গোঁজ সেটা এগিয়েছে প্রধান ধমনীটির দিকে, ইতিমধ্যে খুব কাছে এসে পড়েছে। গভীর স্তব্ধতা, অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে, মই'এ আরোহী মেয়েটি উদ্যত তাদের উপরে, মোটাসোটা হাতে পিনগুলোর জায়গা বদলাচ্ছে, সবাই দেখছে তাকে। নবীন সৈনিক একজন, মুখ তার ঘর্মাক্ত, ভাঁজ না পড়া নতুন বড়ো আর্মিকোট কাঁধ থেকে আড়ষ্টভাবে ঝুলছে, বিষণ্ণভাবে আপন মনে বলে উঠল:

'হারামীরা বেশ জোরে এগোচ্ছে... কেমন এগোচ্ছে দেখো।' দীর্ঘাকৃতি রোগা পাকা গোঁফ রেলকর্মী একজন, মাথায় রেলকর্মীর চটচটে টুপি, ভ্রূকুটি করে তাকাল সৈনিকটির দিকে, গরগর করে বলল:

'এগোচ্ছে, বটে! কিন্তু ওদের এগোতে দিচ্ছ কেন? তোমরা পিছু হটে এলে ওরা ত এগোবেই! খাসা লড়ুয়ে তোমরা! কোথায় এসে পড়েছে দেখো ত! প্রায় ভলগা পর্যন্ত!' কণ্ঠস্বরে ব্যথা আর বিষাদ, কোন সাঙ্ঘাতিক অমার্জনীয় ভুল করে ফেললে বাপ ছেলেকে যেমন করে ধমকায় তেমন তার কণ্ঠস্বর।

অপরাধীর মত ফিরে তাকাল সৈনিকটি, ডাহা নতুন আর্মিকোটটা ঠিক করে বসানোর জন্য ঘাড় নিচু করে, ভিড় ঠেলে বেরিয়ে চলল সে।

'ঠিক বলছে! আমরা অনেকটা জায়গা ছেড়ে এসেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আর একজন, তিক্তভাবে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'আঃ!'

ক্যাম্বিসের ধূসর কোট পরনে একটি বৃদ্ধ এবার — হয়ত গ্রামের স্কুলে পড়ায়, গ্রামের ডাক্তার হয়ত বা — সৈনিকটির পক্ষ নিল:

'ওকে দোষ দিচ্ছ কেন?.. ওর দোষ কী? এরি মধ্যে ওদের কতজনে না মারা গিয়েছে! যেটা আমাদের ঠেলে নিয়ে আসছে সেটার চেহারাটা

একবার দেখো ত! সারা ইউরোপ, তাও আবার ট্যাঙ্ক চেপে! ঝট করে সেটাকে আটকাবে কী করে? সত্যি বলছি, হাঁটু গেড়ে বসে ওই ছোকরাটিকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে আমরা এখনো বেঁচে আছি, স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করছি মস্কোতে। ভেবে দেখো না একবার, ফ্যাশিস্টরা এক হপ্তার মধ্যে কটা দেশকে ট্যাঙ্ক দিয়ে দলাইমলাই করে দিয়েছে! আর আমরা এক বছরের বেশী লড়াই করে চলেছি, পাল্টা আক্রমণও চালাচ্ছি, শুইয়ে দিয়েছি ওদের কত লোককে! সারা পৃথিবীর উচিত ছোকরাটির কাছে হাঁটু গেড়ে বসা। আর তুমি বলছ হটে এসেছে।'

'জানি, জানি, ভগবানের দোহাই, আমার কাছে প্রচার বাণী চালাতে হবে না! বুদ্ধি দিয়ে বুঝি সব কিন্তু আমার বুক ফেটে পড়ছে প্রায়!' রেল-কর্মীটি জবাবে বলল বিষাদভারী সুরে। 'জার্মানরা আমাদের দেশকেই ত পদদলিত করছে, ধ্বংস করছে আমাদেরই বাড়িঘরদোর!'

'ও কি ওখানে?' মানচিত্রের দক্ষিণাংশের দিকে আঙুল দেখিয়ে আনিউতা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। আর ওলিয়াও ওখানে,' জবাবে বলল আলেক্সেই।

ঠিক ভলগার নীল ফাঁসে, স্তালিনগ্রাদের উপরে চোখে পড়ল একটি ফুটদাগ, লেখা আছে "কামিশিন," মানচিত্রে ফুটদাগ শুধু নয়, তার কাছে সেটা আরো কিছু। চোখের সামনে এল ছোট সবুজ সহরটার ছবি, ঘাসে-ভরা সহরতলির রাস্তা, চকচকে ধুলো-মাখা পাতায় নড়ছে পপলারগাছগুলো, কঞ্চির বেড়া দেওয়া সব্জীর বাগান থেকে আসছে ধুলো, শাক আর পার্সলির গন্ধ, গোল গোল, ডোরা-কাটা তরমুজ, মনে হচ্ছে শুকনো পাতায় শুকনো মাটিতে কেউ ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের, সোমরাজের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরপুর স্তেপের হাওয়া, নদীর ঝকঝকে প্রসার, ছিপছিপে, ধূসর-চোখ রোদে-তামাটে একটি মেয়ে, আর ওর মা, চুল পেকে গিয়েছে তাঁর, অসহায়ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন...

'ওরা দুজনেই ওখানে,' আবার বলল আলেক্সেই।

২

মস্কোর উপকণ্ঠ হয়ে ছুটেছে বৈদ্যুতিক ট্রেন, চাকাগুলো ফুর্তিতে খটখট সুর ভাঁজছে, রাগের সুরে বাজছে ইঞ্জিনের বাঁশী। জানলার ধারে বসে মেরেসিয়েভ, একটি বৃদ্ধ তাকে দেয়াল ঠেসা করেছে; বৃদ্ধটির দাড়ি-

গোঁফ কামানো, মাথায় চওড়া ম্যাক্সিম গোর্কি টুপি, কালো সুতোয় বাঁধা সোনার রিমের প্যাঁস্‌নে চোখে। হাঁটুর মধ্যে বসানো কোদাল, শাবল আর উকনঠেঙ্গো, খবরের কাগজে সযত্নে মোড়া আর সুতো দিয়ে বাঁধা সেগুলো।

কঠিন দিনগুলোতে সবাই যুদ্ধের কথা ভাবছে, বৃদ্ধও ব্যতিক্রম নয়। মেরেসিয়েভের নাকের সামনে নিজের শীর্ণ হাত সজোরে নেড়ে, গুরুত্বপূর্ণ-ভাবে তার কানে ফিসফিসিয়ে সে বলল:

'অসামরিক লোক বলে আমাদের পরিকল্পনা বুঝি না, সেটা মনে কোরো না যেন। সব বুঝি আমি। মতলবটা হল শত্রুদের ভুলিয়ে ভলগার স্তেপে এনে ফেলা। হ্যাঁ। ওদের যোগাযোগের পথ যাতে আরো লম্বা হয়, যাতে, আজকালকার ভাষায়, পিছনের ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়, আর তারপর ওখান থেকে, পশ্চিম আর উত্তর থেকে ওদের যোগাযোগ ছিন্ন করে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেওয়া। হ্যাঁ। আর পরিকল্পনাটি খাসা। শুধু হিটলার আমাদের বিরুদ্ধে নয়। ও সারা ইউরোপকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে। ছটি দেশের সঙ্গে আমরা একলা লড়ছি। একলা! অন্তত জায়গা ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে ওদের আঘাতের শক্তি ভোঁতা করে দিতে হবে আমাদের। হ্যাঁ। একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি সেটা। তাছাড়া আমাদের মিত্রেরা ত চুপচাপ বসে আছে, তাই না? কী মনে হয় আপনার?'

'মনে হয় যা-তা বকছেন আপনি। আমাদের দেশটা ফেলনা নয় যে ধাক্কা সামলাবার গদি হিসেবে ব্যবহার করব সেটাকে,' বিরস সুরে জবাব দিল মেরেসিয়েভ; শীতকালে জনশূন্য দগ্ধ পোড়া যে গ্রামটি হামাগুড়ি দিয়ে পেরিয়ে এসেছিল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেটার কথা।

কিন্তু বুড়ো কানের কাছে বকবক করেই চলল, তামাকের আর বার্লি কফির গন্ধ লাগছে মুখে।

জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে রইল আলেক্সেই, ধুলো-ভরা গরম হাওয়ার ঝটকা মুখে লাগছে, ব্যগ্র চোখে দেখছে, রংচটা সবুজ বেড়ায় ঘেরা আর তক্তা আঁটা রঙীন দোকান সুদ্ধ স্টেশনগুলো একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবুজ বন থেকে উঁকি মারছে কুটিরগুলো, শুষ্ক ছোট ছোট স্রোতধারার মরকত-নীল পাড়, সূর্যাস্তের আলোয় রজনের মত জ্বলছে পাইনগাছের মোমবাতির মত গুঁড়ি আর বনের ওপারে প্রদোষে জমির নীল প্রসার।

'...আপনি ত বাহিনীর লোক, বলুন ত ঠিক বলছি কি না! এক বছরেরও বেশী আমরা একলা ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে লড়ছি। কেমন ধরনের ব্যাপার সেটা,

বল্‌ন ত? আমাদের মিত্রেরা কই, কই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট? একবার ভাব্‌ন ত: একজন লোক নিশ্চিন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, হঠাৎ তাকে ডাকাতে চড়াও করল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিল না লোকটা। ডাকাতগ্‌লোর সঙ্গে লড়াই চালাল। সমস্ত শরীর দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝড়ছে, কিন্তু হাতের কাছে যা অস্ত্র পেল তাই দিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। অনেকের বির্‌দ্ধে একজন, ওরা সশস্ত্র, অনেক দিন ধরে ওঁৎ পেতে বসেছিল ওর জন্য। হ্যাঁ। আর প্রতিবেশীরা দেখল ব্যাপারটা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারা সহান্‌ভূতি জানাচ্ছে, উৎসাহ দিয়ে বলছে: "সাবাস লেড়কা, ঠেঙ্গাও ওদের, কষে ঠেঙ্গাও!" কোথায় এগিয়ে এসে সাহায্য করবে তা না, লোহা আর পাথরের টুকরো দিতে চায় আর বলে এই যে, দেখো! এই দিয়ে মারো ওদের, আরো জোরে মারো! কিন্তু নিজেরা লড়াই করছে না। হ্যাঁ। আমাদের মিত্রদের ব্যবহার ঠিক এরকম। দর্শক শ্‌ধ্‌ সবাই ওরা...'

ঘ্‌রে সাগ্রহে ব্‌দ্ধের দিকে তাকাল মেরেসিয়েভ। ভিড়ে ঠেসা কামরাটায় অন্যান্য অনেক যাত্রীও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে: চারদিক থেকে শোনা গেল:

'হ্যাঁ, ঠিক কথা! আমরা একলা লড়ছি! দ্বিতীয় ফ্রণ্টের কী হল?'

'যাক গে! এই কাজ আমরা একলাই করব। সবকিছ্‌ শেষ হয়ে গেলে ওরা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খ্‌লবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!'

কিছ্‌ক্ষণের জন্য ট্রেন থামল। কামরায় ঢুকল পায়জামা-পরা কয়েকটি আহত লোক, ক্রাচে ভর দিয়ে কেউ, কেউ বা ছড়িতে, প্রত্যেকের হাতে কাগজের ঠোঙায় স্‌র্যম্‌খীর বীজ কিম্বা বেরি। ওরা নিশ্চয়ই কোন স্বাস্থ্যাগার থেকে এসেছে এখানকার বাজারে।

প্যাঁসনে-পরা ব্‌দ্ধটি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে লাল-চুল, এক পায়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, ক্রাচ-হাতে একটি ছেলেকে প্রায় জোর করে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিল।

'বোসো এখানে, বাছা, এখানে বোসো!' বলল সে। 'আমার জন্যে ভেবো না। আমি শীগগিরই নেমে যাব।'

আর সত্যি যে নেমে যাবে সেটা প্রমাণ করার জন্য ব্‌দ্ধ দরজার কাছে গেল। গয়লানীরা নিজেরা ঘে'ষাঘে'ষি করে বসে আহতদের জন্য জায়গা করে দিল। আলেক্সেই'র কানে এল পিছনে নারীকণ্ঠে নিন্দে করে কে যেন বলছে:

'ওর লজ্জা হওয়া উচিত, আহত লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, জায়গা

দিচ্ছে না তাকে! বেচারার পাটা ভেঙেচুরে গিয়েছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না লোকটা! বসে আছে গ্যাঁট হয়ে, নিজের কিছু হয়নি, গুলি যেন কখনো লাগবে না গায়ে! বিমান বাহিনীর অফিসার আবার!'

অকারণ ভর্ৎসনায় লাল হয়ে উঠল আলেক্সেই। রাগে নাসারন্ধ্র কাঁপছে। কিন্তু হঠাৎ স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে উঠে বলল:

'ওহে ছোকরা, বোসো এখানে।'

আহত লোকটি থতমত খেয়ে হটে গেল।

'না, ধন্যবাদ, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট, ঠিক আছে, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। বেশী দূর যাচ্ছি না। মাত্র দুটো স্টেশন।'

'বসে পড়ো বলছি!' কৃত্রিম কঠোর সুরে বলল আলেক্সেই, পরিস্থিতিটা একটু মজার মালুম হল।

কামরার পাশে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দুহাতে ছড়িটায় ভর দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল আলেক্সেই। চৌখুপী রুমাল মাথায় বুড়ীটি স্পষ্টত বুঝতে পারল যে মিছিমিছি ওকে বকেছে, ওর বকুনি শোনা গেল আবার:

'ওদের দেখ একবার! শুনছ, ওহে, টুপিওয়ালা শ্রীমতি! রাজকুমারীর মত বসে আছে দেখছি! ছড়ি-হাতে অফিসারটিকে বসার জায়গা দাও না! আপনি এখানে চলে আসুন, কমরেড অফিসার, আমার জায়গায় বসতে পারেন। দোহাই তোমাদের, ওকে পথ ছেড়ে দাও!'

কথাটা যেন কানে যায়নি ভান করল আলেক্সেই। একটু আগে মজা লাগছিল, সে ভাবটা আর নেই। ঠিক সে সময়ে মেয়ে-কন্ডাকটরটি যে স্টেশনে ওকে নামতে হবে তার নামটা হাঁকল, ট্রেন আস্তে আস্তে থামল। ভিড় ঠেলে আলেক্সেই প্যাঁসনে-চোখে বৃদ্ধটির কাছে এসে পড়ল। ওর দিকে মাথা নেড়ে, যেন অনেক দিনের আলাপী লোক, বৃদ্ধ ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কী মনে হয় আপনার শেষ পর্যন্ত, ওরা কি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলবে?'

'না খোলে আমরাই চালিয়ে নেব,' কাঠের প্ল্যাটফর্মে নামতে নামতে জবাব দিল আলেক্সেই।

চাকার ঘড় ঘড়, ইঞ্জিনের বাঁশীর তীক্ষ্ন ডাক, মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রেনটা, পিছনে রেখে গেল ধুলোর পাতলা রেশ। কয়েকজন মাত্র যাত্রী; প্ল্যাটফর্মে অল্পক্ষণের মধ্যে নামল সন্ধ্যার সুগন্ধি স্তব্ধতা। যুদ্ধের আগে জায়গাটি নিশ্চয়ই খাসা আর আরামী ছিল। পাইনের বন স্টেশন ঘেঁষে এসেছে, গাছের চূড়োগুলো মোলায়েম ছন্দে দুলছে। দু'বছর আগে এরকম

মনোরম সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই লোকেরা দলে দলে স্টেশন ছেড়ে অলিগলি হয়ে ছায়াচ্ছন্ন বনের পথ ধরে যেত বাগান-বাড়িতে — গ্রীষ্মের পাতলা ফ্রকে সাজগোজ করা মেয়েরা, মুখর বাচ্চার দল আর উৎফুল্ল রোদে-তামাটে পুরুষ সহর থেকে ফিরছে, সঙ্গে খাবারদাবারের পার্সেল আর মদের বোতল। কোদাল, শাবল, উকনঠেঙ্গো আর বাগানের অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে অল্প কয়েকজন যারা ট্রেন থেকে আজ নামল তারা তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বনে ঢুকল, প্রত্যেকে নিজের ভাবনাচিন্তায় মগ্ন। মেরেসিয়েভকে দেখে মনে হচ্ছে ছুটিতে এসেছে, শুধু সেই ছড়ি হাতে সুন্দর গ্রীষ্ম সন্ধ্যাটি উপভোগ করার জন্য রয়ে গেল; সুগন্ধি হাওয়া বুক ভরে নিচ্ছে, পাইনগাছ ভেদ করে সূর্যের উষ্ণ আলো মুখে পড়াতে চোখ কোঁচকাচ্ছে।

স্বাস্থ্যাবাসে কী পথে যেতে হয় মস্কোতে মেরেসিয়েভকে বলা হয়েছিল, ওদের দেওয়া কয়েকটি পথ নির্দেশ চিহ্ন ধরে জায়গাটিতে পৌছতে পারল সে, খাস সৈনিক ত বটে।

বিপ্লবের আগে এখানে অভূতপূর্ব একটা গ্রীষ্ম প্রাসাদ বানাবার সঙ্কল্প করেছিল রুশ কোটিপতি একজন। স্থপতিকে সে জানায় যে খরচাই লাগুক কিছু এসে যায় না, জিনিসটা অসামান্য হওয়া চাই। আর তাই পৃষ্ঠপোষকের খেয়াল মেটাবার জন্য স্থপতি হ্রদের ধারে ইঁটের বিরাট একটা বাড়ি বানায়, জাফরি-বসানো জানলা, গম্বুজ আর মিনার, দেয়ালের পোস্তা আর দরদালান। খাস রুশ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে, এখন আগাছায় আচ্ছন্ন হ্রদের তীরে আজব বাড়িটা কুৎসিৎ কলঙ্ক চিহ্নের মত। আর প্রাকৃতিক দৃশ্যটা সত্যিই সুন্দর। হ্রদের জল আবহাওয়া ভালো থাকলে কাচের মত মসৃণ, ধারে এক ঝাড় নবীন এ্যাসপেনগাছ, পাতাগুলো কাঁপছে। এখানে সেখানে আগাছা ভেদ করে সটান উঠেছে বার্চগাছের ফুটফুট দাগওয়ালা গুঁড়ি, হ্রদটি ঘিরেছে প্রাচীন বনের বিস্তৃত, নীলচে, মাঝেমাঝে করাতের মুখের মত কাটা-কাটা বৃত্ত। জলের ঠাণ্ডা স্তব্ধ নীলচে বুকে উল্টোভাবে প্রতিবিম্ব পড়েছে সবকিছুর।

বহু বিখ্যাত চিত্রকর অনেক দিন কাটিয়েছেন এ জায়গায়; আতিথেয়তার জন্য সারা রাশিয়ায় নাম ছিল মালিকটির। আর এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, সবটা কিম্বা আংশিকভাবে, উত্তর কালের জন্য এঁকেছেন অনেকে, রুশ দৃশ্যপটের বিরাট স্নিগ্ধ মহিমার উদাহরণ হিসেবে।

প্রাসাদটি এখন সোভিয়েত বিমান বাহিনীর স্বাস্থ্যাবাস। যুদ্ধের আগে পরিবার নিয়ে এখানে আসত বৈমানিকরা। এখন আহত বৈমানিকদের

হাসপাতাল থেকে এখানে পাঠানো হয় ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য। এ্যাসফল্টের যে চওড়া রাস্তাটা বার্চের সারির মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরে স্বাস্থ্যাবাসে পেঁাছিয়েছে সেটা ধরল না আলেক্সেই, স্টেশন থেকে বনের মধ্যে দিয়ে যে পথটা সটান হ্রদে গিয়েছে সেটা ধরে এল। বলা যায়, পিছন থেকে এল: প্রবেশপথের সামনে দুটো বোঝাই বাস দাঁড়িয়ে, ভিড় করে চেঁচামেচি করছে অনেকে, তাদের মধ্যে ভিড়ে গেল সে।

কথাবার্তা, বিদায় সম্ভাষণ আর মঙ্গল কামনা চলেছে। বুঝতে পারল আলেক্সেই যেসব বৈমানিকরা স্বাস্থ্যাবাস ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে, বিদায় জানানো হচ্ছে তাদের। বিদায়োদ্যত বৈমানিকরা বেশ উত্তেজিত আর উৎফুল্ল, মেঘের পিছনে মৃত্যু ওঁৎ পেতে বসে আছে এমন জায়গায় যাচ্ছে না যেন, যেন শান্তিকালীন ঘাঁটিতে ফিরছে। যারা বিদায় জানাচ্ছে তাদের মুখে বিষণ্ণ, অসহিষ্ণু ভাব। অনুভূতিটা আলেক্সেই'র চেনা। দক্ষিণে বিরাট যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে সেই অদম্য আকর্ষণ সমানে তাকেও টানছে; যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এখন গুরুতর, সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণটাও তীব্রতর হয়েছে। সামরিক মহলে স্তালিনগ্রাদের কথা যখন উল্লেখ করা হয়, যদিচ সাবধানে আর ধীরে ধীরে, তখন অনুভূতিটা অদম্য আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, হাসপাতালে এই জোর করে চুপ করে বসে থাকাটা অসহ্য ঠেকে।

চকচকে বাসগুলোর জানলায় জানলায় রোদে-তামাটে উত্তেজিত মুখ। ছোটখাটো খোঁড়া একটি আরমেনিয়ান, মাথায় টাক, ডোরা-কাটা পায়জামা পরে বাসের চারিদিকে ব্যস্তসমস্তভাবে নেংচিয়ে নেংচিয়ে ঘুরছে। স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীদের দলে হামেশাই একজন করে রসিক আর হাস্যাভিনেতা থাকে, সবাই তাকে চেনেশোনে; আরমেনিয়ানটিও তাই। ছড়ি দুলিয়ে সে বিদায় সম্ভাষণ হাঁকছে:

'ফেদিয়া! আকাশে উড়ে ফ্যাশিস্টদের আমার সেলাম দিও! চান্দ্র স্নান চিকিৎসা শেষ করতে দেয়নি তোমাকে, সেজন্য উচিত শিক্ষা দিও ওদের! ফেদিয়া! ফেদিয়া! ওদের বুঝিয়ে দিও যে সোভিয়েত বৈমানিকদের চাঁদ-স্নান শেষ করতে না দেওয়াটা মোটেই ভদ্রজনোচিত নয়!'

গোলমাথা ফেদিয়া, বয়স কম, মুখটা রোদে-তামাটে, প্রশস্ত কপালে দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে জানাল যে সে তার কর্তব্য করবে, স্বাস্থ্যাবাসের চন্দ্র সমিতি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

ভিড়ের সবাই জোর গলায় হেসে উঠল, হাসির শব্দের মধ্যে বাসগুলো রওনা হল, আস্তে আস্তে গেটের দিকে যাচ্ছে ওরা।

'ভালো শিকার মিলুক! শুভ যাত্রা!' ভিড়ের সবাই চেঁচিয়ে বলল।

'ফেদিয়া, ফেদিয়া! যত শীগগির পারো তোমার ডাক-ঘরের ঠিকানাটা জানিও। জিনচুকা রেজিস্ট্রি করে তোমার হৃদয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে!'

মোড়ের ওদিকে বাসগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। সূর্যাস্তের আলোয় সোনালী ধুলো নামল মাটিতে। ওভারঅল কিম্বা ডোরা-কাটা পায়জামা পরা স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীরা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাগানে ঘুরছে। দালানে গেল মেরেসিয়েভ, ক্লোক-রুমের আঁকড়ায় বৈমানিকদের নীল ফিতে দেওয়া ক্যাপ, দালানের কোণে মেঝেতে পড়ে রয়েছে স্কিটলস, বল, ক্রোকের হাতুড়ি আর টেনিস র‍্যাকেট। খোঁড়া আরমেনিয়ানটি তাকে নিয়ে গেল অফিস ঘরে। ওর মুখ বেশ চালাকচতুর; গম্ভীর সুন্দর বড়ো আর বিষণ্ণ চোখদুটো কাছ থেকে ভালো করে দেখল আলেক্সেই। যেতে যেতে আরমেনিয়ানটি ঠাট্টা করে জানাল যে চন্দ্র সমিতির সভাপতি সে নিজে; তার দৃঢ় মত, যে কোন রকমের ঘা শুকিয়ে যাবার প্রকৃষ্ট উপায় হল চন্দ্র স্নান, সেই চিকিৎসার জন্য চাই কড়া নিয়মানুবর্তিতা, চাঁদের আলোয় বেড়ানোর বন্দোবস্ত সে নিজে করে। মনে হয়, আরমেনিয়ানটি স্বতই ঠাট্টা করে চলে, মুখের গম্ভীরভাবের কোন পরিবর্তন হয় না, শ্রোতার মুখে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে সাগ্রহে, জিজ্ঞাসুভাবে।

অফিস-ঘরে মেরেসিয়েভকে অভ্যর্থনা করল শাদা ওভারঅল গায়ে একটি মেয়ে, তার চুল এত লাল যে মনে হয় মাথায় আগুন লেগেছে।

'মেরেসিয়েভ?' যে বইটা পড়ছিল সেটা সরিয়ে রেখে কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি। 'মেরেসিয়েভ, আলেক্সেই পেত্রোভিচ?' বৈমানিকের দিকে কঠিন দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল:

'আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না! এখানে লেখা আছে "মেরেসিয়েভ, সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট, ন-নম্বর হাসপাতাল, পায়ের পাতা কাটা..." আর আপনি...'

শুধু তখনি আলেক্সেই'র চোখে পড়ল আগুনের মত লাল চুলে প্রায় ঢাকা ওর গোলগাল শাদা মুখ — লাল-চুল মেয়েদের হামেশাই ওরকম মুখ হয়। নরম চামড়া রক্তাভ হয়ে উঠেছে। দীপ্ত বেয়াড়া চোখে সবিস্ময়ে মেয়েটি তাকিয়ে আছে আলেক্সেই'র দিকে।

'তবুও, আমিই আলেক্সেই মেরেসিয়েভ। এই দেখুন আমার কাগজপত্র... আপনার নাম কি লিওলিয়া?'

'না, কেন? আমার নাম জিনা।' সন্দিগ্ধভাবে আলেক্সেই'র পায়ের দিকে

তাকিয়ে মেয়েটি যোগ করল, 'আপনার নকল পাদুটো সত্যি সত্যি এত ভালো ... না ... ?'

'হ্যাঁ। তাহলে আপনিই সেই জিনচ্‌কা যার জন্যে ফেদিয়া পাগল!'

'ও, তাহলে মেজর বুরুনাজিয়ান এরিমধ্যে নানা বাজে গল্প করেছেন? লোকটাকে দুচক্ষে দেখতে পারি না। সবাইকে নিয়ে উনি মস্করা করেন। ফেদিয়াকে নাচতে শিখিয়েছিলাম আমি। তাতে এমন কি এসে যায়?'

'এখন তাহলে আমাকে নাচ শেখাবেন, কী বলুন? চন্দ্র-স্নানের জন্য বুরুনাজিয়ান আমার নাম লিখে নেবে কথা দিয়েছে।'

আরো অবাক হয়ে মেয়েটি আলেক্সেই'র দিকে তাকাল।

'কী বলছেন আপনি, নাচবেন? পা নেই, তবুও? বাজে কথা; মনে হচ্ছে আপনিও সবাইকে নিয়ে ঠাট্টা করতে চান।'

ঠিক সে সময়ে ঘরে দৌড়িয়ে এল মেজর স্ত্রুচকভ, গলা জড়িয়ে ধরল আলেক্সেই'র।

'জিনচ্‌কা! সব ঠিক তাহলে? সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আমার ঘরে থাকবে।'

হাসপাতালে অনেকদিন একসঙ্গে কাটানোর পর আবার দেখা হলে লোকেরা ভাই'এর মত মেলে। মেজরকে দেখে বেজায় খুসি আলেক্সেই, যেন কতদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। স্বাস্থ্যাবাসে কিট-ব্যাগ রাখা হয়ে গিয়েছে স্ত্রুচকভের, ইতিমধ্যেই বেশ ঘরোয়া লাগছে তার। সবাইকে সে চেনে, সবাই তাকে চেনে, একদিনের মধ্যেই কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে, ঝগড়া করেছে কয়েকজনের সঙ্গে।

দুজনের ছোট ঘরটির জানলাগুলো বাগানের উপরে, একেবারে বাড়ি ঘেঁষে এসেছে দীর্ঘ ঋজু পাইনগাছগুলো, সবুজ বিলবেরির ঝোপ, একটা পাতলা পাহাড়ে এ্যাসগাছ, তা থেকে ঝুলছে সুন্দর নক্‌সা-করা কয়েকটি পাতা আর একটি মাত্র ভারী বেরির গোছা। রাত্রির স্বল্পাহারের পর শুয়ে পড়ল আলেক্সেই, নরম চাদরে গা এলিয়ে তক্ষুণি পড়ল ঘুমিয়ে।

সে-রাত্রে অদ্ভুত, গোলমেলে নানা স্বপ্ন দেখল আলেক্সেই। নীলচে বরফ। চাঁদের আলো। পাতলা লোমের জালের মত বন ঘিরেছে তাকে। জাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু বরফে পা আটকে গিয়েছে। দারুণ চেষ্টা করছে বেরিয়ে আসার, জানে কোন ভয়াবহ বিপদ উদ্যত, কিন্তু বরফে পাদুটো জমে গিয়েছে, ছাড়িয়ে নেবার শক্তি নেই। কাতরে উঠল ও, ছটফট করছে — এখন বনে আর নেই, বিমান-ঘাঁটিতে। ইউরা, সেই ঢেঙ্গা মিস্ত্রীটা,

অদ্ভুত নরম ডানাবিহীন একটি বিমানের ককপিটে বসে। হাত নাড়িয়ে হাসল সে, তীরের মত উঠল আকাশে। মিখাইল দাদু জড়িয়ে ধরলেন আলেক্সেইকে, যেন ও শিশু এমনভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কিছু ভেবো না: আমরা খাসা বাস্প-স্নান করব। বেড়ে হবে, তাই না?" কিন্তু গরম জলের বদলে ঠাণ্ডা বরফে শুইয়ে দিলেন তাকে। উঠবার চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু আটকে গিয়েছে বরফে। না, বরফ নয়, ওর উপরে চেপে আছে উষ্ণদেহ ভালুক একটা, ঘোঁৎঘোঁৎ করছে, তার চাপে শরীর যাচ্ছে গুঁড়িয়ে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। জানলা দিয়ে খোশমেজাজে তাকিয়ে বাস বোঝাই বৈমানিক সব পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না তাকে। সাহায্যের জন্য আলেক্সেই চাইছে ওদের ডাকতে, চাইছে দৌড়িয়ে যেতে ওদের কাছে, অন্তত হাত দিয়ে ইসারা করতে, কিন্তু পারছে না। মুখ খুলল ও, শুধু ঘড়ঘড় আর ফিস্‌ফিস শব্দ। দম বন্ধ হয়ে এল, হৃৎস্পন্দন থেমে গিয়েছে মনে হচ্ছে, শেষ চেষ্টা করল আলেক্সেই, কী কারণে যেন ওর চোখের সামনে চকিতে এল আগুনের মত লাল চুলে ঘেরা জিনচ্‌কার হাসিমুখ, ওর বেয়াড়া, কৌতূহলী দুটো চোখ।

অদ্ভুত উৎকণ্ঠায় ঘুম ভেঙ্গে গেল আলেক্সেই'র। চারিদিক নিঝুম। মেজর ঘুমিয়ে আছে, নাক অল্প অল্প ডাকছে। ছায়ামূর্তির মত এক টুকরো চাঁদের আলো পড়েছে মেঝেতে। সেই সব ভয়াবহ দিন কেন ফিরে এসেছিল আবার? সে ত তাদের কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছে প্রায়, ভাবলেও অবাস্তব ঠেকে। ঠাণ্ডা সুরভি রাত্রির হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোলা, চন্দ্রালোকিত জানলা দিয়ে আসছে নরম ঘুমন্ত ছন্দময় শব্দ, অস্থিরভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে কখনো, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনো আবার উচ্চগ্রামে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, উৎকণ্ঠায় যেন গলা চেপে ধরেছে। বনের শব্দ।

বিছানায় উঠে বসে আলেক্সেই অনেকক্ষণ শুনল পাইনের রহস্যময় মর্মরধ্বনি। জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিল তারপর, ঘোর কাটাবার চেষ্টায় যেন, বলিষ্ঠ উৎফুল্ল ভাব ফিরে এল আবার। আটাশ দিন থাকতে হবে স্বাস্থ্যাবাসে, এ-কদিনে ঠিক হবে সে আবার বিমান চালাতে পারবে কিনা, পারবে কিনা লড়াই করতে আর বাঁচতে, আর তা না হলে অনুকম্পার দৃষ্টি সহ্য করে আজীবন কাটাতে হবে তাকে, ট্রামে বাসে উঠলে জায়গা ছেড়ে দেবে লোকে। সুতরাং এই দীর্ঘ অথচ সংক্ষিপ্ত আটাশ দিনের প্রতিটি মুহূর্ত লাগাতে হবে মানুষের মত মানুষ হবার সাধনায়।

মেজরের নাক ডাকছে, চাঁদের ভৌতিক আলো ঘরে; বিছানায় বসে

আলেক্সেই ব্যায়ামের একটা ছক মনে মনে বানাল। তাতে রইল সকাল আর সন্ধ্যার নানা ব্যায়াম কৌশল, হাঁটা, দৌড়, পায়ের জন্য বিশেষ ব্যায়াম, আর সবচেয়ে যেটা তার মনে লেগেছে, পায়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতিশ্রুতি যেটাতে আছে, জিনচ্‌কার সঙ্গে আলাপের সময়ে যে কথাটা তার মনে হয়েছিল সেটা।

আলেক্সেই ঠিক করল নাচ শিখবে।

৩

অগস্টের একটি পরিষ্কার প্রশান্ত অপরাহ্ন. চিকচিকে ঝকঝকে সবকিছু, হেমন্তের বিষণ্ণ ছোঁয়াচ ইতিমধ্যেই অলক্ষিতে এসেছে উষ্ণ হাওয়ায়। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কুলকুল শব্দে এঁকেবেঁকে চলেছে একটি ছোট্ট নদী, বালুতীরে বসে রোদ পোয়াচ্ছে কয়েকজন বৈমানিক।

রোদের ঝাঁঝে ঝিমোচ্ছে তারা, এমন কি অক্লান্ত বুর্‌নাজিয়ান পর্যন্ত চুপচাপ বসে উষ্ণ বালি জড়ো করে ভাঙ্গা পায়ে রাখছে, ভালো করে সারেনি পাটা। হেজেলের ঝোপের ধূসর পাতার আড়ালে অলক্ষ্য তারা, কিন্তু নদীর তীরে সবুজ ঘাসে একটি পায়ে-চলা পথ তাদের চোখে পড়ে। পা নিয়ে ব্যস্ত বুর্‌নাজিয়ান উপর দিকে তাকাতে অদ্ভুত একটি দৃশ্য চোখে পড়ল।

পায়জামা প্যাণ্ট আর বুট পরে বন থেকে বেরিয়ে এল নবাগতটি, গতকাল এসেছে সে। চারিদিক তাকিয়ে দেখল কেউ নেই, তখন শরীরের পাশে কনুই চেপে বিচিত্রভাবে দৌড়তে শুরু করল সে। প্রায় দুশ মিটার দৌড়িয়ে হাঁটতে লাগল, ঘেমে নেয়ে উঠেছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। দম ফিরে এলে আবার দৌড়। ক্লান্ত ঘোড়ার গায়ের পাশের মত চকচক করছে তার শরীর। নিঃশব্দে বুর্‌নাজিয়ান সঙ্গীদের দৃশ্যটি দেখাল, ঝোপের আড়াল থেকে সবাই চেয়ে রইল দৌড়িয়েটির দিকে। সহজ ব্যায়ামে নবাগতটি হাঁপাচ্ছে, প্রায়ই যন্ত্রণায় শিঁটকে উঠছে মুখ, কাতরিয়ে উঠছে, কিন্তু দৌড়িয়ে চলেছে।

আর চুপ করে থাকতে না পেরে বুর্‌নাজিয়ান হাঁকল:

'ওহে, দোস্ত! জ্‌নামেন্‌স্কিরা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না বুঝি!'

থমকে দাঁড়াল নবাগতটি। ক্লান্তি আর যন্ত্রণার ভাব মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। ঝোপের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে, কোন কথা না বলে চলে গেল বনে, একটু দুলে দুলে বিচিত্র হাঁটার ভঙ্গী ওর।

'লোকটা সার্কাসের খেলুড়ে না আধা-পাগল?' হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করল বুরুনাজিয়ান।

তন্দ্রা কেটে গিয়েছে মেজর স্ত্রুচকভের। বুঝিয়ে বলল সে:

'পায়ের পাতা নেই ওর। নকল পায়ে তালিম নিচ্ছে। জঙ্গী বিমান বাহিনীতে ফিরে যেতে চায়।'

ঝিমন্ত লোকগুলির মুখে যেন ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগল। তড়বড় করে উঠে বসে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল সবাই। যে লোকটিকে দেখে বিশেষ কিছু মনে হয়নি, হাঁটার বিচিত্র ভঙ্গীটি ছাড়া, তার পায়ের পাতা নেই শুনে সবাই এখন অবাক হয়ে গেল। জঙ্গী বিমান আবার চালাবার মতলবটা উদ্ভট, অবিশ্বাস্য, এমন কি কালাপাহাড়ী মনে হল। দুটো আঙুল নেই, কিম্বা স্নায়বিক ক্রিয়া বিকল, এমন কি পায়ের পাতা বিকৃত হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, এ সব ছোটখাটো কারণে বিমান বাহিনী থেকে লোক ছাড়িয়ে দেবার কথা বলাবলি করল ওরা। হামেশাই এমন কি যুদ্ধের সময়েও, বাহিনীর অন্যান্য শাখার তুলনায় বৈমানিকদের শারীরিক সুষ্ঠুতার মান সবচেয়ে বেশী। শেষ পর্যন্ত সবাই ওরা একমত হল যে পায়ের পাতা যার কৃত্রিম জঙ্গী বিমানের মত জটিল সূক্ষ্ম যন্ত্র চালানো তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

সবাই একমত যে মেরেসিয়েভের মতলবটা বিদঘুটে; তবুও বেপরোয়া স্বপ্নটা মন আকর্ষণ করল প্রত্যেকের।

'তোমার বন্ধুটি হয় নিরেট মূর্খ নয় মহাপুরুষ, মাঝামাঝি কিছু নয়, উপসংহারে বলল বুরুনাজিয়ান।

স্বাস্থ্যাবাসে একজন এসেছে যার পায়ের পাতা নেই, অথচ জঙ্গী বিমান চালাবার স্বপ্ন দেখে, খবরটা নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল সব ওয়ার্ডে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় এসে পড়বার আগেই সবায়ের লক্ষ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল আলেক্সেই, যদিও সেটা তার চোখে পড়েছে বলে মনে হল না। সবাই দেখে, খাবার টেবিলে পাশে যারা বসেছে তাদের সঙ্গে প্রাণখুলে হাসছে ও, বেশ আগ্রহে খাচ্ছে, ফুটফুটে ওয়েট্রেসদের প্রথামত প্রশংসা করছে, সঙ্গীদের সঙ্গে ঘুরছে বাগানে, ক্রোকে খেলতে শিখছে, এমন কি ভলিবলেও অংশ নিচ্ছে, ওর মধ্যে অসাধারণ কিছু চোখে পড়ে না, শুধু হাঁটার মন্থর ভঙ্গীটি ছাড়া। অতি সাধারণ লোক, বাস্তবিক। বেশী দিন যেতে না যেতে সবায়ের অভ্যেস হয়ে গেল ওকে, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কেউ আর দেখে না।

স্বাস্থ্যাবাসে পেঁছবার পরের দিন সন্ধ্যায় জিনচ্‌কার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে গেল আলেক্সেই। হাতে বার্ডকের পাতায় মোড়া একটা পেস্ট্রি, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে খায়নি সেটা। সৌখীন উদারভাবে পেস্ট্রিটা দিয়ে, অনুমতির অপেক্ষা না করে ডেস্কের পাশে বসে পড়ল আলেক্সেই, জিজ্ঞেস করল জিনচ্‌কাকে কবে সে নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবে।

'কীসের প্রতিশ্রুতি?' পেন্সিলে আঁকা উঁচু ভুরুজোড়া তুলে জানতে চাইল জিনচ্‌কা।

'আমাকে নাচ শেখাবে কথা দিয়েছিলেন, জিনচ্‌কা।'

'কিন্তু...' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল মেয়েটি।

'শুনেছি যে আপনি এত ভালো মাস্টারনী যে খোঁড়ারা পর্যন্ত নাচতে শেখে, আর যারা সুস্থ সবল লোক তারা শুধু যে পা খোয়ায় তা নয়, মাথাটিও হারায়, যেমন ফেদিয়ার হয়েছিল। কবে শুরু করব আমরা? মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।'

নবাগতকে বেশ ভালো লাগল জিনচ্‌কার। পায়ের পাতা নেই, তবু নাচ শেখাতে বলছে! আর শেখাবেই না কেন? খাসা দেখতে, রংটা তামাটে, তামাটে গালে রক্তাভা, চুল ঢেউ খেলানো, মসৃণ। সুস্থ লোকের মত হাঁটে, চোখদুটো চঞ্চল, পরিহাসচপল, একটু বিষণ্ণ ভাব লেগে আছে। নাচটা জিনচ্‌কার জীবনে সামান্য একটা জিনিস নয়, নাচতে ভালোবাসে সে, সত্যি সত্যি ভালোই নাচে... আর মেরেসিয়েভকে খাসা সুন্দর দেখতে!

সংক্ষেপে, রাজী হল জিনচ্‌কা। আলেক্সেইকে জানানো হল সারা সকোল্‌নিকিতে বিখ্যাত বোব গরোখভ নাচ শেখায় তাকে, বোব গরোখভ আবার সারা মস্কোয় বিখ্যাত পল সুদাকভ্‌স্কির শ্রেষ্ঠ ছাত্র আর অনুগামী, সুদাকভ্‌স্কি সামরিক আকাদেমিগুলোতে আর পররাষ্ট্র বিভাগের ক্লাবে নৃত্যশিক্ষক ছিল। বলরুম নাচের সেরা ঐতিহ্য জিনচ্‌কা পেয়েছে এই সব খ্যাতনামা শিল্পীদের কাছ থেকে, এমন কি আলেক্সেইকেও নাচ শেখাতে চেষ্টা করবে সে, যদিও সে জানে না পায়ের পাতা ছাড়া নাচা সম্ভব কিনা। যে সব সর্তে শেখাতে রাজী হল সেগুলো বেশ কঠিন: খুব বাধ্য আর অধ্যবসায়ী হতে হবে আলেক্সেইকে, জিনচ্‌কার প্রেমে যাতে না পড়ে তার চেষ্টা করতে হবে, কেননা প্রেমে পড়লে শিক্ষায় বাধা পড়বে, আর মোদ্দা কথা, অন্য লোক জিনচ্‌কাকে নাচতে ডাকলে হিংসে করা মোটেই চলবে না.

কেননা শুধু একজনের সঙ্গে নাচলে ওর নাচের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, একজনের সঙ্গে লেগে থাকায় কোন মজা নেই।

বিনা দ্বিধায় সর্তগুলো মেনে নিল মেরেসিয়েভ। আগুনের মত লাল-চুল মাথা ঝাঁকিয়ে জিনচ্‌কা সেখানেই সুঠাম পা ফেলে নাচের প্রথম পদক্ষেপগুলো কেমন তা দেখাল। এক কালে রুশকায়া নাচে আর কামিশিনের পার্কে ফায়ারব্রিগেড দলের বাজানো পুরোনো নাচগুলোয় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল আলেক্সেই'র। ছন্দজ্ঞান ছিল ওর, তাই ফুর্তি-ভরা এই কলাটি তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছিল সে। এখন মুশকিল যে জীবন্ত সচল পায়ে নয়, পায়ের ডিমে বাঁধা চামড়ার জিনিসে পদক্ষেপ শিখতে হবে তাকে। ভারী বেঢপ কৃত্রিম পায়ের পাতায় ছন্দ আর গতি আনার জন্য চাই অমানুষিক উদ্যম, ইচ্ছাশক্তির একাগ্র প্রচেষ্টা।

কিন্তু সেগুলোকে মানিয়ে চলতে বাধ্য করল আলেক্সেই। প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ শিখছে — গ্লিসেড, প্যারেড, সার্পেণ্ট, -- বলরুম নাচের সুচতুর কৌশল, বিখ্যাত পল সুদাকভ্‌স্কি সেগুলো তত্ত্বে বেঁধেছেন, জাঁকালো শ্রুতিমুখর তাদের নাম, বাচ্চার মত আনন্দে অধীর করে তুলছে তাকে। পদক্ষেপ শিখে শিক্ষয়িত্রীকে তুলে ধরে বনবন করে ঘুরিয়ে দেয় নিজের সাফল্যের উল্লাসে। আর কেউ, বিশেষ করে তার শিক্ষয়িত্রী জানতে পেত না এই সব নানামুখী জটিল পদক্ষেপ আয়ত্ত করতে গিয়ে কী যন্ত্রণা হত তার, নাচ শেখার কী মূল্য দিতে হয় তাকে। যেন কিছু হয়নি এমনভাবে স্মিত মুখ থেকে ঘাম মুছত যখন তখন আপনা থেকে এসে-পড়া চোখের জলও মুছতে হত আলেক্সেইকে, সেটা কারো নজরে পড়ত না।

একদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিজের ঘরে ফিরল আলেক্সেই, একেবারে ক্লান্ত কিন্তু খুসি।

'নাচতে শিখছি!' সগর্বে জানাল মেজর স্ত্রুচকভকে। জানলার ধারে চিন্তাকুলভাবে দাঁড়িয়ে মেজর; বাইরে গ্রীষ্মের দিনটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, সূর্যাস্তের শেষ আলো গাছের চূড়োয় সোনার মত ঝকঝক করছে।

কোন সাড়া দিল না মেজর।

'ঠিক শিখে ফেলব!' বলল মেরেসিয়েভ, কৃত্রিম পায়ের পাতা স্বস্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আড়ষ্ট পায়ে নখ দিয়ে সজোরে আঁচড়াতে লাগল।

জানলার দিকে মুখ করে রইল স্ত্রুচকভ; কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর, অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে, ফোঁপাচ্ছে যেন। কোন কথা না বলে

আলেক্সেই কম্বলের নিচে ঢুকল। বিচিত্র কিছু একটা ঘটছে মেজরের। বিগত যৌবন এই মানুষটির নারীবিদ্বেষ আর অবিশ্বাসী ইয়ার্কি কিছু দিন আগে পর্যন্ত হাসপাতাল ওয়ার্ডের সবায়ের হাসি আর ঘৃণার খোরাক জোগায়, তারপরে চ্যাংড়ার মত প্রেমে হাবুডুবু খায় লোকটা, হতাশ প্রেমিক মনে হয়েছিল। প্রতিদিন কয়েকবার অফিস-ঘরে যায় ও, মস্কোতে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে ফোন করার জন্য। হাসপাতাল ছেড়ে কেউ গেলে ও ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার জন্য পাঠায় ফুলফল, চকোলেট আর চিঠিপত্র। লম্বা চিঠি লেখে তাকে, পরিচিত লেফাফায় জবাব এলে ঠাট্টা তামাশা শুরু করত, খুসিই হত মেজর।

কিন্তু তার প্রেমে সাড়া দেয় না ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, দেয় না কোন উৎসাহ, এমন কি সহানুভূতি পর্যন্ত জানায় না। লিখত যে সে আর একজনকে ভালোবাসে, তার বিয়োগে শোকাতুর সে, মেজরকে বন্ধুর মত করে উপদেশ দিত সে যেন ওকে ভুলে যায়, ওর জন্য খরচ করা কিম্বা সময় নষ্ট করার মানে হয় না কোন। প্রেমের ব্যাপারে এই বন্ধুত্বপূর্ণ অথচ কাজের মানুষের ভঙ্গীটাই সবচেয়ে চটিয়ে দেয় মেজরকে।

আলেক্সেই কম্বলের নিচে বুদ্ধিমানের মত চুপচাপ পড়ে আছে, জানলার পাশ থেকে এক ঝটকায় ওর খাটের কাছে এসে মেজর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে নুয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল:

'কী চায় ও? আমাকে কী ভাবে বলো ত? একেবারে ফেলনা! আমি কি কুৎসিৎ, বুড়ো, কুষ্ঠরোগী একটা! ওর জায়গায় যদি অন্য কেউ হত .. কিন্তু কথা বলে কোন লাভ নেই!'

একটা কেদারায় ধপাস করে বসে পড়ল মেজর, দুহাতে মাথা টিপে এত জোরে এদিক ওদিক নড়তে লাগল যে কেদারাটা আর্তনাদ করে উঠল।

'ও ত মেয়েমানুষ, তাই না? আমার সম্বন্ধে অন্তত একটু আগ্রহ থাকা ত উচিত! শয়তানী! ওকে আমি ভালোবাসি আর কত না ভালোবাসি!.. যদি তুমি জানতে! অন্য লোকটিকে তুমি ত চিনতে? আমার চেয়ে কোন অংশে ভালো ছিল সে বলতে পারো? কীসে ওর মন ভুলিয়েছিল? আমার চেয়ে বুদ্ধি বেশী ছিল? দেখতে আরো ভালো ছিল? কী ধরনের বীরপুরুষ ছিল সে?'

আলেক্সেই'র মনে পড়ল কমিসার ভরোবিওভের কথা, প্রকান্ড ফাঁপা শরীর, বালিশে রাখা মোমের মত ফ্যাকাশে মুখ; নারীসুলভ চিরন্তন বিষাদে

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে মহিলাটি; মনে পড়ল মরুভূমিতে মার্চ করে যাওয়া লাল ফৌজের অদ্ভুত গল্পটি।

'মেজর, মানুষের মত মানুষ ছিল সে, বলশেভিক একজন। প্রার্থনা করি যেন আমরা সবাই তার মত হতে পারি।'

৪

খবরটা বিদঘুটে শোনালেও ছড়িয়ে পড়ল ওয়ার্ডে: পায়ের চেটোবিহীন বৈমানিকটি নাচ শিখছে।

অফিস-ঘরে কাজ শেষ হয়ে গেলেই জিনচ্‌কা দেখত ছাত্রটি বারান্দায় অপেক্ষা করছে। এক গোছা বুনো ফুল, কিম্বা চকোলেট, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে না-খাওয়া একটা কমলালেবু হয়ত এনেছে তার জন্য। গম্ভীরভাবে তার হাত ধরে জিনচ্‌কা যেত অবসর বিনোদনের ঘরে। গ্রীষ্মকালে ঘরটায় লোকজন নেই, এরি মধ্যে অধ্যবসায়ী ছাত্রটি তাস খেলার আর পিঙ-পঙের টেবিল দেয়ালের কাছে সরিয়ে রেখেছে। নতুন একটা নাচের ভঙ্গী সুন্দরভাবে দেখাত জিনচ্‌কা। ছোট্ট সুন্দর পায়ে মেঝেতে জটিল নানা নক্‌সা করে চলেছে সে, ভুরু কুঁচকে দেখছে বৈমানিক। তারপর গম্ভীরমুখে হাতে তাল রেখে জিনচ্‌কা গুণতে শুরু করত:

'এক, দুই, তিন... এক, দুই, তিন... ডানদিকে গ্লিসেড!.. এক, দুই, তিন.. এক, দুই, তিন... বাঁদিকে গ্লিসেড... ফিরুন এবার। ঠিক। এক, দুই, তিন... এক, দুই, তিন... এবার সার্পেণ্ট! একসঙ্গে করা যাক এটা।'

পায়ের পাতা নেই এমন একজনকে নাচ শেখানো, এধরনের কাজ বোব গরোখভ কিম্বা পল সুদাকভ্‌স্কি কখনো করেনি, হয়ত সেজন্য, হয়ত তামাটে পরিহাসপ্রিয় চোখ, কালো চুল, রোদে-পোড়া ছাত্রটিকে মনে লেগেছিল বলে, যে কারণেই হোক, অবসর পেলেই প্রাণ দিয়ে ওকে নাচ শেখাত জিনচ্‌কা।

সন্ধ্যেবেলায় বালি-ভরা নদীতীর, ভলিবলের মাঠ, স্কিটল খেলার জায়গা খালি হয়ে যেত, রোগীরা অবসর বিনোদনের জন্য নাচে মন দিত, তখন আলেক্সেই উৎসবে যোগ দিতে কখনো দ্বিধা করত না। ভালোই নাচত সে, কোন নাচ বাদ পড়ত না, আর কড়া সর্তে ওকে বেঁধেছে বলে একাধিকবার শিক্ষয়িত্রীর মনে আসত অনুশোচনা।

এ্যাকর্ডিয়নের তালে তালে জোড়ায় জোড়ায় সবাই ঘুরপাক খাচ্ছে, জ্বলজ্বলে মুখে, উত্তেজনায় দীপ্ত চোখে আলেক্সেই করে চলেছে সব কটা গ্লিসেড, সার্পেণ্ট, আর বক্রপাক; যেন অবলীলাক্রমে আগুনরঙা চুল লঘুপদ সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘুরত। মাঝেমাঝে এই বেপরোয়া নর্তকটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে কী করত, সেটা আঁচ পর্যন্ত করতে পারত না কোন দর্শক।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেত আলেক্সেই, রক্তিম মুখে হাসি, রুমাল দিয়ে হাওয়া খাচ্ছে হেলায়; কিন্তু দোরগোড়া ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই হাসির জায়গায় মুখে আসত যন্ত্রণার বিকৃতি। বারান্দার সিঁড়ির রেলিং ধরে টলতে টলতে নেমে কাতরে উঠে শুয়ে পড়ত শিশিরে-ভেজা ঘাসে, স্যাঁতসেঁতে তখনো উষ্ণ মাটিতে সমস্ত শরীর চেপে কৃত্রিম পায়ের পাতার আঁটো চামড়ার ফেট্টির চাপে যন্ত্রণায় কেঁদে উঠত।

ফিতেগুলো খুলে ফেলত যাতে আরাম হয় পাদুটোর। কিছুক্ষণ জিরোবার পর ফিতেগুলো আবার লাগিয়ে ঝট করে উঠে ফিরে যেত বাড়িটাতে। অলক্ষিতে হলে আসত আবার। ঘর্মাক্ত এ্যাকর্ডিয়নবাদক অক্লান্তভাবে বাজিয়ে চলেছে, আলেক্সেই জিনচ্কার কাছে যেত, এরি মধ্যে ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁজছিল মেয়েটি। হাসত আলেক্সেই, চীনেমাটির মত শাদা সার-বাঁধা দাঁত উঠত ঝলসে, আবার দুজনে ফিরে যেত নাচের বৃত্তে, ক্ষিপ্র কমনীয় জোড়ায়। ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে ধমকাত জিনচ্কা, ঠাট্টা করে জবাব দিত আলেক্সেই, দুজনে ঘুরপাক খেত আবার, অন্যান্য সবায়ের মত, কোন পার্থক্য নেই।

নাচের কঠিন পরিশ্রম সত্বর কাজ দিল। কৃত্রিম পায়ের পাতার নিগড় ক্রমশ হালকা হয়ে এল, মনে হল পায়ের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলো।

বেশ খুসি আলেক্সেই। শুধু একটা ব্যাপারে সে উদ্বিগ্ন — ওলিয়ার চিঠিপত্র আসছে না। আনিউতার সঙ্গে গভজ্দেভের দুর্ভাগ্য অভিজ্ঞতার পরে লেখা সেই চিঠিটার কোন উত্তর আসেনি, একমাসেরও বেশী হয়ে গিয়েছে। এখন তার মনে হয় চিঠিটা মারাত্মক, কোন মাথামুণ্ডু ছিল না সেটার। রোজ সকালে ব্যায়াম আর দৌড়বার পরে — দৌড়নোটা একশ পা করে বাড়িয়ে চলেছে প্রতিদিন — বসবার ঘরে চিঠিপত্রের বাক্স খোঁজ করে সে, যদি কিছু এসে থাকে। "ম" মার্কা খোপে চিঠির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হামেশাই, কিন্তু চিঠিপত্রগুলো বৃথায় ঘাঁটত সে।

একদিন নাচ শিখছে, শিক্ষার ঘরের জানলায় দেখা গেল বুরুনাজিয়ানের কালো মাথা। হাতে ছড়ি আর চিঠি একটা। কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বড়ো গোলগোল স্কুলের মেয়েসুলভ হাতে ঠিকানা লেখা খামটা ছিনিয়ে নিল আলেক্সেই আর দৌড়িয়ে চলে গেল ঘর থেকে, জানলায় দাঁড়িয়ে রইল বিমূঢ় বুরুনাজিয়ান আর ঘরের মধ্যখানে ক্রুদ্ধ শিক্ষয়িত্রী।

বকবকে পিসীর মত গলায় বলল বুরুনাজিয়ান:

'জিনচ্কা, আজকাল কাকে বাছবেন, সবাই এক ছাঁচে ঢালা... জোচ্চোর সবাই। কাউকে বিশ্বেস করবেন না। দেখলেই পালাবেন গঙ্গাজল দেখলে ভূতে যেমন পালায়। বরঞ্চ আমাকে আপনার ছাত্র করে নিন!' কথাটা বলে ছড়িটা ঘরে ছুঁড়ে ফেলে, ঘোঁৎঘোঁৎ করে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকল। জানলার ধারে বিষণ্ণ হতবুদ্ধিভাবে দাঁড়িয়ে রইল জিনচ্কা।

ইতিমধ্যে দৌড়িয়ে হ্রদের ধারে পেঁাছিয়েছে আলেক্সেই, চিঠিটা হাতের মুঠিতে, যেন কেউ তাড়া করে এসে ছিনিয়ে নেবে বহুমূল্য জিনিসটি। নলখাগড়া ঠেলে সরিয়ে শ্যাওলাচ্ছন্ন একটা বড়ো পাথরের উপরে সে বসল; লম্বা ঘাসের আড়ালে ওকে দেখা যাচ্ছে না একেবারে। মূল্যবান খামটি খুঁটিয়ে দেখল, আঙুলগুলো কাঁপছে। কী আছে চিঠিটাতে, কী দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হবে এখনি? খামটা ধারে ধারে ছেঁড়া, জীর্ণ; নিশ্চয়ই অনেক অনেক জায়গা ঘুরে গন্তব্যে এসেছে। খামের একদিক সন্তর্পণে ছেঁড়াতে শেষ ছত্রটি চোখে পড়ল: "আমরণ তোমার, ওলিয়া।" স্বস্তির অনুভূতিতে তক্ষুণি অভিভূত হয়ে গেল আলেক্সেই। লেখবার খাতার পাতাগুলো হাঁটুতে রেখে শান্তভাবে সমান করল সে — কী কারণে যেন পাতাগুলোয় এঁটেল মাটির ছাপ আর মোমবাতির তেলের দাগ। ওলিয়া ত বরাবর খুব গোছালো, কী হয়েছিল ওর? তারপর যে সব খবর পড়ল তাতে যুগপৎ গর্বে আর উৎকণ্ঠায় মন ভরে গেল তার। মনে হচ্ছে মাসখানেক আগে কারখানা ছেড়ে দিয়েছে ওলিয়া। কার্মিশনের অন্যান্য প্রবীণা আর তরুণীর সঙ্গে স্তেপের কোথাও ট্যাঙ্কবিরোধী-গর্ত আর গড়খাই বানানোর কাজে ব্যস্ত, কাজটা চলেছে "একটা বড়ো সহর ঘিরে, যার নাম" ওর কথায় "আমাদের সবায়ের কাছেই পূত"। স্তালিনগ্রাদ কথাটা চিঠির কোথাও নেই, কিন্তু যেরকম অনুরাগে উৎকণ্ঠায় আর আশায় "বড়ো সহরটির" বিষয়ে ও লিখেছে তাতে বোঝা যায় সহরটি স্তালিনগ্রাদই।

লিখেছে ওর মত হাজার হাজার স্বেচ্ছাকর্মী দিনরাত স্তেপে কাজ করে

চলেছে, মাটি খ্ঁড়ে গাড়ি বোঝাই করে আনছে, কংক্রিট বসাচ্ছে, গড় বানাচ্ছে। চিঠিটায় খ্সির ছাপ, কিন্তু কয়েকটি উক্তি থেকে বোঝা যায় যে স্তেপে ওদের সময় কষ্টে কাটছে। যে সব কাজে ও একাগ্রভাবে আচ্ছন্ন সে সবের কথা লেখার পরে শ্ধ্ আলেক্সেই'র প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। কড়া কথায় জানিয়েছে যে ওর শেষ চিঠিটায় বেশ ক্ষ্ব্ধ সে, চিঠিটা যখন পায় তখন ও "এখানে, ট্রেঞ্চে" আর আলেক্সেই ফ্রণ্টে, সেখানে মনের উপরে সাংঘাতিক চাপ পড়ে সেটা জানে বলেই মাপ করেছে এবারে, নইলে কখনো করত না।

"প্রিয়তম, আত্মত্যাগ করতে পারে না সেটা কী ধরনের প্রেম? ও ধরনের প্রেমের অস্তিত্ব নেই। থাকলেও আমার মতে সেটাকে প্রেম বলা যায় না মোটেই। এক হপ্তা ম্খ-হাত-পা ধ্ইনি, পাৎল্ন পরি আজকাল আর ব্ট, আঙ্লগ্লো বেরিয়ে পড়েছে তা থেকে। রোদে ম্খটা এমন পোড়া যে চামড়া খসে উঠে আসছে, তার নিচে নীলচে কড়া। ক্লান্ত নোংরা হাড় জিরজিরে আর কুৎসিৎ চেহারায় যদি তোমার কাছে হাজির হই, তাহলে কি তাড়িয়ে দেবে না দোষ দেবে আমাকে? কী বোকা তুমি! যা কিছ্ ঘটুক না তোমার, জানিয়ে দিচ্ছি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব, যে অবস্থাতেই তুমি থাক না কেন... প্রায়ই তোমার কথা ভাবি, ট্রেঞ্চে ঢুকে বাঙ্কে শ্লেই সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মত ঘ্মিয়ে পড়ি সবাই; ট্রেঞ্চে আসার আগে প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম তোমাকে। জানাতে চাই তোমাকে যে যতদিন বে'চে আছি ততদিন তোমার প্রতীক্ষায় থাকবে একজন, সর্বদাই প্রতীক্ষা করে থাকবে, তোমার যাই হোক না কেন... লিখেছ যে ফ্রণ্টে কিছ্ ঘটতে পারে তোমার: ট্রেঞ্চে আমার যদি কিছ্ ঘটে, দ্র্ঘটনায় পঙ্গ্ হয়ে যাই, তাহলে কি তুমি ম্খ ঘ্রিয়ে চলে যাবে? মনে আছে, শিক্ষানবিশি স্কুলে পড়ার সময় বীজগণিতের সম্পাদ্যগ্লো অন্কল্পবিধিতে করতাম আমরা? তোমার জায়গায় আমার কথা ভাবো, তা যদি কর তাহলে যা লিখেছ তাতে লজ্জা হবে তোমার..."

বসে বসে অনেকক্ষণ চিঠিটা নিয়ে ভাবল মেরেসিয়েভ। অন্ধকার জলে স্র্যের চোখ-ঝলসানো প্রতিবিম্ব, কাটফাটা রোদ, খাগড়ার সরসর শব্দ, নীল ড্র্যাগন-ফ্লাইগ্লো এ ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে উড়ে যাচ্ছে। ক্ষিপ্রগতি জলের পোকাগ্লো লম্বা সর্ পা ফেলে খাগড়ার মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, জলের মস্ণ ব্ক জরির ফিতের মত কুঁচকিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ঢেউ নিঃশব্দে লাগছে বাল্তীরে।

"এটা কী?" ভাবছে আলেক্সেই। "পূর্ববোধ, দিব্য দৃষ্টি?" ওর মা বলতেন, "মানুষের অন্তরই দৈবজ্ঞ," কিম্বা হয়ত ট্রেঞ্চ জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা ওকে প্রাজ্ঞ করেছে; আলেক্সেই বলতে সাহস করেনি যেটা সেটা বুঝেছে প্রজ্ঞায়? চিঠিটা আর একবার পড়ল আলেক্সেই, না, সে রকম কিছু নয়! পূর্ববোধ নয়। যা লিখেছিল তার জবাব মাত্র। আর জবাবটা কেমন!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে জামাকাপড় খুলে পাথরটার উপরে রাখল আলেক্সেই। খাগড়ার দেয়ালের আড়ালে শিকের মত লম্বা বালুকাময় ছোট নিরালা জায়গাটিতে বরাবর স্নান করত সে, জায়গাটি শুধু তার কাছেই জানা। কৃত্রিম পায়ের পাতার ফেট্টি খুলে পাথর থেকে আস্তে আস্তে গড়িয়ে নামল, কাটা পায়ে নুড়ির উপরে হাঁটা অত্যন্ত কষ্টকর হলেও হামাগুড়ি দিল না আলেক্সেই। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত, হেঁটে গেল হ্রদে, ঝাঁপ দিল ঠান্ডা ঘন জলে। কিছু দূর সাঁতরে গিয়ে চিৎ হয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। উপরে নীল অসীম আকাশ। ছোট ছোট মেঘ খরখর করে চলেছে, এ ওর গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আলেক্সেই দেখল তীরের ছায়া পড়েছে ঠান্ডা নীল মসৃণ জলের বুকে, গোল পাতার মধ্যে ভাসমান হলদে আর শাদা কুমুদ। হঠাৎ দেখল ওলিয়ার প্রতিবিম্ব, শেওলা-ভরা পাথরটার উপরে বসে আছে সে। ছাপা ফ্রক পরনে, স্বপ্নে-দেখা ওলিয়া। পাদুটো মুড়ে নয়, ঝুলিয়ে বসেছে, জল পর্যন্ত আসেনি — কুৎসিৎ দুটো ঠুঁটো পা জলের উপরে ঝুলছে। ছবিটা ভাগিয়ে দেবার জন্য জলে চড় মারল আলেক্সেই। না, ওলিয়ার প্রস্তাবিত অনুকল্প বিধিটা তার কাজে লাগবে না!

৫

দক্ষিণের অবস্থিতি আগেকার চেয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক। দন-যুদ্ধের কথা খবরের কাগজগুলো অনেকদিন হল বন্ধ করেছে। দনের অন্য পারে ভলগার দিকে স্তালিনগ্রাদের পথে কয়েকটি কসাক গ্রামের নাম সোভিয়েত সংবাদ বিভাগ একদিন উল্লেখ করল। যারা এ সব অঞ্চলের সঙ্গে অপরিচিত তাদের কাছে নামগুলোর বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু আলেক্সেই ত ওখানে জন্মেছে আর মানুষ হয়েছে, সে বুঝতে পারল দনের প্রতিরোধ রেখা

ভেঙ্গে গিয়েছে, স্তালিনগ্রাদের দেয়াল পর্যন্ত যুদ্ধ চলে এসেছে প্রখর গতিতে।

স্তালিনগ্রাদ! ইস্তাহারে নামটা এখন পর্যন্ত করা হয়নি বটে, কিন্তু নামটা প্রত্যেকের মুখে। ১৯৪২-এর হেমন্তে উৎকণ্ঠায় আর ব্যথায় নামটি উচ্চারণ করত লোকে, সহরের নাম নয়, চরম বিপদগ্রস্ত কোন নিকটজনের নাম যেন ওটা। ওলিয়া আছে সহরটির কাছে, বাইরের স্তেপে কোথাও, সাধারণ উৎকণ্ঠা সেজন্য তীব্রতর আলেক্সেই'র কাছে। কে বলতে পারে ওলিয়াকে কত কিছু সহ্য করতে হবে? রোজ চিঠি লেখে ওলিয়াকে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ডাকঘরের ঠিকানা দেওয়া চিঠিগুলোর মূল্য কতটুকু? ভলগা স্তেপে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে, সেই ঝঞ্ঝায় আর অপসারণের গণ্ডগোলের মধ্যে চিঠিগুলো কি পেঁছিবে ওর কাছে?

বৈমানিকদের স্বাস্থ্যাবাস অস্থির মুখর, মৌচাকে যেন ঢিল পড়েছে। অবসর বিনোদনের জন্য প্রচলিত সব খেলা — ড্রাফট, দাবা, ভলিবল, স্কিটল, আর সেই "একুশ" — জুয়া প্রিয় তাসুড়েরা হ্রদের কাছে ঝোপঝাড়ে খেলত যেটা — সব ছেড়ে দিল বৈমানিকরা। কারো মন নেই খেলাতে। প্রত্যেকে, এমন কি যারা দারুণ কুঁড়ে, তারাও সকালে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে উঠে পড়ত, রেডিওতে সাতটার সময় যুদ্ধের সর্বপ্রথম খবর শোনা চাই। বৈমানিকদের কীর্তিকলাপের কথা ইস্তাহারে উল্লেখ করলে সবাই বিরস মুখে ঘোরাফেরা করত, নার্সদের খুঁত ধরা শুরু হত, খাবারদাবার আর নিয়মকানুন নিয়ে চলত গজগজানি; ওরা যে রোদে ঘুরছে কিছু না করে, কাচের মত স্বচ্ছ হ্রদের কাছে নিঝুম বনে পড়ে আছে, স্তালিনগ্রাদের কাছে স্তেপে লড়তে পারছে না, তার জন্য যেন দায়ী স্বাস্থ্যাবাসের কর্মীবৃন্দেরা। অবশেষে স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীরা ঘোষণা করল স্বাস্থ্যাবাসে থাকাতে অরুচি, ছেড়ে দেওয়া হোক তাদের, যাতে নিজের নিজের দলে ফিরে যেতে পারে।

একদিন বিকেলে বিমান বাহিনীর কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ থেকে একটি কমিশন স্বাস্থ্যাবাসে এল। চিকিৎসা সার্ভিসের পরিচয়-চিহ্ন পোশাকে কয়েকটি অফিসার ধূলিধূসর গাড়ি থেকে নামলেন। সামনের সিট থেকে, সিটের পিঠে অনেকটা ভর দিয়ে নামলেন মজবুত চেহারার একটি অফিসার। ইনি হলেন কর্ণেল পদস্থ আর্মি সার্জন মিরভল্স্কি, বিমান বাহিনীতে বিশেষ পরিচিত, সস্নেহে চিকিৎসা করেন বলে ইনি বৈমানিকদের প্রিয়।

রাত্রের আহারের সময়ে ঘোষণা করা হল যে সব স্বাস্থ্যসঞ্চয়ী অসুখের ছুটির মেয়াদ স্বেচ্ছায় কমিয়ে নিজেদের দলে এক্ষুণি ফিরে যেতে চায়, তাদের মধ্য থেকে পরের দিন সকালে লোক বাছাই করবে কমিশন।

পরের দিন ভোর বেলায় উঠে মেরেসিয়েভ রীতি অনুযায়ী ব্যায়াম না করেই চলে গেল বনে, প্রাতরাশের সময় না হওয়া পর্যন্ত ফিরল না। কিছু খেল না। খাবারে হাত দেয়নি বলে ওয়েট্রেস বকাতে তার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করল মেরেসিয়েভ, আর যখন স্ত্রুচকভ বলল যে মেয়েটি তার ভালোর জন্যই বকেছিল, ওর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই তার, তখন এক ঝটকায় উঠে পড়ে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আলেক্সেই। করিডরে দেয়ালে আটকানো সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহার পড়ছিল জিনা। তার সঙ্গে একটিও কথা বলল না আলেক্সেই, জিনা ভাণ করল দেখতে পায়নি ওকে, শুধু মেয়েলিভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। কিন্তু সত্যি সত্যি ওকে না দেখেই যখন আলেক্সেই চলে যাচ্ছে তখন খুব ব্যথিত লাগল জিনার, প্রায় কেঁদে ফেলে ডাকল তাকে। মুখ ঘুরিয়ে রেগে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই:

'কী চান আপনি?'

'কমরেড সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট... কেন আপনি...' নরম সুরে জবাব দিল জিনা, গালদুটো এত লাল হয়ে উঠেছে যে চুলের রঙের সঙ্গে প্রায় খাপ খেল।

রাগ তক্ষুণি সামলে নিল আলেক্সেই, সারা শরীর হঠাৎ অবশ হয়ে গিয়েছে মনে হল।

'আজ বুঝব আমার কপালে কী আছে,' নিচু গলায় সে বলল। 'হাত হাত দিয়ে শুভ কামনা করুন...'

অন্য দিনের চেয়ে বেশী খোঁড়াচ্ছে আজ, নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তালা বন্ধ করে দিল।

কমিশন বসেছে হলে, সমস্ত যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে সেখানে — শক্তি ও নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষার মিটার, চক্ষুপরীক্ষার কার্ড ইত্যাদি। ঘরের বাইরে জমায়েৎ স্বাস্থ্যাবাসের সবাই, যারা ছুটির মেয়াদ কমাতে চায় তারা, অর্থাৎ স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীদের প্রায় সবাই, দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে। জিনচ্কা এসে প্রত্যেককে এক টুকরো কাগজ দিল, কোন সময়ে তলব পড়বে জানানো হয়েছে তাতে, বলল ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। প্রথম কয়েকজন কমিশনের কাছে যাবার পর গুজব রটে গেল যে পরীক্ষাটা বিশেষ কিছু নয়, কমিশন খুব কড়াভাবে দেখছে না। সত্যিই ত ভলগায় দারুণ যুদ্ধ চলেছে,

মহৎ প্রয়াসের প্রয়োজন এখন, কড়াভাবে দেখবে কী করে কমিশন? বারান্দার সামনে ইঁটের নিচু দেয়ালে পা রেখে বসে আছে আলেক্সেই, কেউ বাইরে এলেই, যেন তার বিশেষ কোন উৎসাহ নেই, এমন নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞেস করছে:

'কী হল?'

'পাশ করেছি!' টিউনিকের বোতাম আঁটতে আঁটতে কিম্বা বেল্ট কষে বাঁধতে বাঁধতে উৎফুল্লভাবে জবাব দিল হয়ত লোকটি।

মেরেসিয়েভের আগে বুর্নাজিয়ানের ডাক পড়ল। ছড়িটা দরজার বাইরে রেখে গেল সে, চেষ্টা করছে যাতে শরীরটা না দোলে আর ছোট পায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে না হয়। অনেকক্ষণ ভিতরে রইল সে। অবশেষে খোলা জানলা দিয়ে রাগী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল আলেক্সেই, দৌড়িয়ে বেরিয়ে এল বুর্নাজিয়ান, ভয়ানক ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে তাকে। আলেক্সেই'র দিকে সক্রোধে একবার চেয়ে নেংচাতে নেংচাতে পার্কে চলে গেল বুর্নাজিয়ান, সোজাসুজি সামনের দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে:

'আমলাতান্ত্রিক যত সব! খুঁত ধরতে ওস্তাদ! বিমান চালানোর বিষয়ে কী জানে ওরা? বিমান চালানোটা ওদের কাছে ব্যালের মত যেন! খাটো পা! পিচকারি আর সিরিঞ্জের দল বেটারা, আর কিছু নয়!'

হাতপা সেঁধিয়ে গিয়েছে মনে হল আলেক্সেই'র, কিন্তু হাসিমুখে উৎফুল্লভাবে ক্ষিপ্রপদে ঘরে ঢুকল ও। লম্বা টেবিল ঘিরে বসে আছে কমিশন। মধ্যের জায়গাটিতে বিরাট মাংসপিণ্ডের মত খাড়া হয়ে বসে আছেন আর্মি সার্জন মিরভল্স্কি। পাশের একটা টেবিলের ধারে এক গাদা কেস-কার্ডের সামনে রয়েছে জিনচ্কা, শাদা খরখরে স্মক পরনে, ছোট্ট সুন্দর একটা পুতুলের মত দেখাচ্ছে ওকে; এক গাছি লাল চুল গজের রুমালের নিচ থেকে মন-ভোলানো ভাবে উঁকি মারছে। আলেক্সেইকে ওর কার্ডটা দেবার সময়ে কোমলভাবে হাতে চাপ দিল জিনচ্কা।

চোখ কুঁচকিয়ে সার্জন বললেন:

'কোমর পর্যন্ত জামাটা খুলে ফেলুন ত!'

মেরেসিয়েভের ব্যায়াম বৃথায় যায়নি। খাসা সুগঠিত দেহ, তামাটে চামড়ার নিচে প্রত্যেকটি পেশী ফুটে বেরিয়ে আছে, দেখে তারিফ না করে পারলেন না সার্জন।

'ডেভিডের মূর্তির প্রতিকৃতি আপনি অনায়াসে হতে পারবেন,' নিজের বিদ্যেবুদ্ধি জাহির করে কমিশনের একজন সদস্য বললেন।

সবকিছু পরীক্ষা অনায়াসে উত্তীর্ণ হল মেরেসিয়েভ। মুষ্টির চাপ সাধারণ মানের তুলনায় দেড় গুণ বেশী, আর নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষার সময়ে এক ফুঁয়ে ইনডিকেটরটাকে একেবারে ডগায় পাঠাল সে। রক্তপ্রেষ স্বাভাবিক, স্নায়ুর অবস্থা চমৎকার। শেষে শক্তি পরীক্ষার যন্ত্রটির ইস্পাতের বাঁট এতো জোরে টানল ও যে স্প্রিংটা কেটে গেল।

'বৈমানিক বুঝি?' জিজ্ঞেস করলেন সার্জন, বেশ খুসি দেখাচ্ছে তাঁকে। আরো আরাম করে চেয়ারে বসে নিজের রায় লিখতে শুরু করলেন কেস-কার্ডটার উপরের কোণে। "সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট মেরেসিয়েভ আ. প."

'হ্যাঁ!'

'জঙ্গী বিমান চালক?'

'হ্যাঁ!'

'বেশ বেশ, আবার লড়াই চালান! আপনার মত লোক চায় ওরা, বিশেষভাবে চায়!. আচ্ছা, কী হয়েছিল আপনার?'

বিবর্ণ হয়ে গেল আলেক্সেই'র মুখ। মনে হল সবকিছু ছারখার হয়ে যাবে। খুঁটিয়ে কেস-কার্ডটি দেখলেন সার্জন, মুখে এল বিস্ময়ের ভাব।

'পায়ের পাতা কাটা... তার মানে? বাজে কথা! নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে, কী বলুন? জবাব দিচ্ছেন না কেন?'

'না, ভুল নয়,' নিচু গলায় আস্তে আস্তে বলল আলেক্সেই, যেন ফাঁসির মঞ্চে উঠছে।

বলিষ্ঠ সুগঠিত প্রাণচঞ্চল যুবকটির দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে সার্জন আর কমিশনের অন্যান্য সদস্যেরা, ব্যাপারটা কী মাথায় ঢুকল না তাদের।

'প্যাণ্টটা গুটিয়ে তুলুন ত!' অধীরভাবে আদেশ করলেন সার্জন। বিবর্ণমুখে, জিনচকার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে প্যাণ্ট তুলে ধরে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে রইল আলেক্সেই, চামড়ার পাদুটো সবায়ের চোখে পড়ল।

'আপনি কি এতক্ষণ আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছিলেন? কতো সময় নষ্ট করেছেন, দেখুন ত! পায়ের পাতা নেই, নিশ্চয়ই আপনি বিমান বাহিনীতে ফেরবার কথা ভাবছেন না?' অবশেষে বললেন সার্জন।

'ভাবার কিছু নেই, ফিরে যাচ্ছি আমি!' নিচু গলায় জবাব দিল আলেক্সেই, একগুঁয়ে জেদে ঝলসে উঠল তার চোখ।

'পায়ের পাতা নেই, তবু? পাগল হয়ে গিয়েছেন না কি?'

'পায়ের পাতা নেই সত্যি, কিন্তু আবার বিমান চালাব আমি,' জবাবে বলল আলেক্সেই, এবারে উদ্ধতভাবে নয়, শান্ত কণ্ঠে। বৈমানিকের পুরোনো ধরনের টিউনিকের পকেট থেকে সেই পত্রিকাটার একটি ভাঁজ-করা পাতা বের করল সে। পাতাটা সার্জনকে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন, ও এক পায়ে বিমান চালাত। দুটো পায়ের পাতা না থাকলেও চালাতে পারব না কেন আমি?'

পাতাটি পড়ে সার্জন সবিস্ময়ে সশ্রদ্ধভাবে আলেক্সেই'র দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা করবার আগে আপনাকে অনেক কিছু করতে হবে। ও লোকটি দশ বছর চেষ্টা করেছিল। নকল পায়ের পাতাদুটো ঠিক যেন আসল, এমন ভাবে তালিম নিতে হবে আপনাকে,' আগের চেয়ে নরম সুরে তিনি বললেন।

সে সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আলেক্সেইকে শক্তি যোগাল একজন। টেবিলের পিছনে অস্থিরভাবে নড়ে উঠল জিনচ্কা; টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ, বিন্দু বিন্দু ঘাম রগে, হাতদুটো জুড়ে, যেন প্রার্থনা করছে, তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'কমরেড আর্মি সার্জন! ওর নাচ দেখা উচিত আপনার! সুস্থদের চেয়ে ভালো নাচতে পারে। সত্যি কথা!'

'নাচ? তার মানে...' কমিশনের সদস্যদের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলে উঠলেন সার্জন।

জিনচ্কার কথাটার জের সানন্দে টেনে আলেক্সেই বলল:

'এখন কিছু ঠিক করবেন না। আজ রাত্রে আমাদের নাচে এসে দেখুন আমি কী করতে পারি।'

দরজার দিকে যেতে যেতে আয়নায় আলেক্সেই দেখল কমিশনের সদস্যরা উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের আগে পরিত্যক্ত পার্কের একটা ঝোপের মধ্যে আলেক্সেইকে খুঁজে পেল জিনচ্কা। বলল যে ঘর ছেড়ে চলে আসার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিয়ে আলোচনা চলে; সার্জন বলেন অদ্ভুত ছোকরা এই মেরেসিয়েভ, আর কে জানে, ও হয়ত সত্যি সত্যি বিমান চালাতে পারবে।

রুশ লোকে কী না পারে? কমিশনের একটি সদস্য বলে বিমান চালানোর ইতিহাসে এ রকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। তার জবাবে সার্জন বলে ওঠেন বিমান চালানোর ইতিহাসে অনেক কিছুই ত আগে ঘটেনি, আর এ যুদ্ধে সোভিয়েত মানুষ অনেক কিছু নতুন জিনিস দেখিয়েছে।

প্রায় দুশ লোক দেখা গেল স্বেচ্ছায় সামরিক কাজে ফিরে যাচ্ছে; তাদের বিদায়ের উপলক্ষ্যে নাচের বন্দোবস্ত করা হল, জমকালো অনুষ্ঠান একটা। মস্কো থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হল সামরিক বাজিয়েদের একটা দলকে; প্রাসাদের সব হল আর বারান্দা সঙ্গীতের বজ্রনির্ঘোষে গেল ভরে, জাফরি-দেওয়া জানলাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ঘর্মাক্ত মুখে অবিরাম নেচে চলেছে বৈমানিকরা, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ফুর্তিবাজ, ক্ষিপ্র আর প্রাণচঞ্চল হল মেরেসিয়েভ, তার সঙ্গে নাচছে লালচে চুল সেই মেয়েটি; ওদের জোড়া মেলা ভার!

খোলা জানলার পাশে বসে আছেন আর্মি সার্জন মিরভলস্কি, ঠাণ্ডা বিয়রের গেলাস সামনে, মেরেসিয়েভ আর তার আগুনের মত লাল-চুল সঙ্গিনীটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে তিনি পারছেন না। সার্জন তিনি, বাহিনীর সার্জন তাছাড়া, আসল আর নকল পায়ের তফাৎ জানা আছে তাঁর।

আর এখন তামাটে, সুগঠিত বৈমানিকটি ও ছোটখাটো কমনীয় মেয়েটির নাচ দেখে বারবার তাঁর মনে হতে লাগল এর পিছনে কিছু একটা চালাকি আছে। অবশেষে "বারিনিয়া" নাচল আলেক্সেই, তাকে ঘিরে তারিফ করছে সবাই; উরু আর গাল বেপরোয়াভাবে চাপড়ে লাফাল আলেক্সেই আরো নানা কসরৎ দেখাল, তারপর ঘর্মাক্ত কলেবরে উত্তেজিতভাবে গেল মিরভলস্কির কাছে। নির্বাক সম্ভ্রমে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন সার্জন। কিছু কথা বলল না আলেক্সেই, শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সার্জনের মুখের দিকে, জবাব দাবী করে সে, জবাব ভিক্ষা করে সে।

সার্জন অবশেষে বললেন:

'আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন আপনাকে কোন দলে নিযুক্ত করার অধিকার নেই আমার, কিন্তু কর্মচারীবৃন্দ বিভাগের জন্যে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দেব। লিখে দেব যে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে বিমান চালাতে পারবেন আপনি। যাই হোক, আপনাকে সমর্থন করব, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

স্বাস্থ্যাবাসের অধিকর্তাও বেশ অভিজ্ঞ সার্জন, হাত ধরাধরি করে তিনি আর মিরভলস্কি হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায় দুজনেই

অভিভূত। শুতে যাবার আগে অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন তাঁরা, সিগারেট খেতে খেতে আলোচনা চলল যে সত্যি সত্যি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে সোভিয়েত মানুষ কী না করতে পারে...

বাজনার গুরুগুরু ধ্বনি থামেনি তখনো, খোলা জানলার আলোয় বাইরে ঠিকরে পড়ছে নাচিয়েদের চলমান ছায়া। উপরের স্নানের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে মেরেসিয়েভ, পাদুটো ঠান্ডা জলে ডোবানো, এত জোরে ঠোঁট কামড়াচ্ছে যে রক্ত বেরিয়ে এল। যন্ত্রণায় প্রায় বেহুঁশ সে, নকল পায়ের পাতার ঘষড়ানিতে দাগা দাগা ঘা আর কালশিটে-পড়া কড়াগুলো ধুচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক পরে মেজর স্ত্রুচকভ ঘরে এল; আয়নার সামনে বসে তখনো ভিজে, ঢেউ-খেলানো চুল আঁচড়াচ্ছে মেরেসিয়েভ, স্নানের পর বেশ ঝরঝরে লাগছে ওকে।

'জিনচ্কা তোমার খোঁজ করছে। যাবার আগে ওকে নিয়ে বেড়িয়ে আসা উচিত তোমার। মেয়েটার জন্যে আমার খারাপ লাগছে।'

'দুজনে যাই চলো,' ব্যগ্রভাবে বলল মেরেসিয়েভ। 'পাভেল ইভানভিচ, এসো না আমার সঙ্গে,' অনুনয় করল ও।

ফুটফুটে মেয়েটি তাকে নাচ শেখাবার জন্য কত না করেছে, একা তার সঙ্গে ঘোরার কথা ভাবতে অস্বস্তি লাগছে মেরেসিয়েভের। ওলিয়ার চিঠি পাবার পর জিনচ্কার সান্নিধ্যে খাপছাড়া লাগত তার। স্ত্রুচকভকে বারবার অনুরোধ করল সঙ্গে যেতে, শেষে গজগজ করতে করতে টুপিটা তুলে নিল স্ত্রুচকভ।

ঘেরা বারান্দায় অপেক্ষা করছিল জিনচ্কা, হাতে এক গোছা ফুলের শেষ কয়েকটা। ফুলের বৃন্ত আর পাপড়িতে পায়ের নিচে মেঝেটা ভরে গিয়েছে। আলেক্সেই'র পায়ের শব্দ কানে আসাতে ব্যগ্রভাবে এগিয়ে এল ও, আলেক্সেই একা নয় দেখে হঠাৎ যেন মিইয়ে গেল জিনচ্কা।

'চলুন, বনকে বিদায় জানিয়ে আসি,' নির্লিপ্ত সুরে প্রস্তাব করল আলেক্সেই।

হাতে হাত রেখে, নিঃশব্দে ওরা লাইমগাছের বীথি হয়ে চলল। পায়ের সামনে, চন্দ্রালোকিত মাটিতে কয়লার মত কালো কালো ছায়া অনুসরণ করছে ওদের, এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত মুদ্রার মত হেমন্তের চিকচিকে প্রথম পাতা। বীথি ছাড়িয়ে গেট হয়ে ভিজে ধূসর ঘাসে পা ফেলে ওরা গেল হ্রদে। ফাঁকা জায়গাটা পাতলা কুয়াশার চাদরে ঢাকা, ভেড়ার লোমের মত শাদা

কুয়াশা। মাটিতে লেপটে আছে সে কুয়াশা, কোমর অবধি এসে যেন নিশ্বাস ফেলছে, চাঁদের হিম আলোয় ঝকঝক করছে হেঁয়ালি ভরে। আর্দ্র হাওয়া হেমন্তের পরিতৃপ্ত গন্ধে ভরা। এক একবার ঠাণ্ডা কনকনে লাগছে, পর মুহূর্তেই আবার গুমোট গরম, যেন কুয়াশার এই হ্রদটায় নিজস্ব ঠাণ্ডা আর উষ্ণ স্রোত আছে...

'মনে হচ্ছে দৈত্যের মত মেঘের ওপর দিয়ে চলেছি আমরা, তাই না?' কী যেন ভাবতে ভাবতে আলেক্সেই বলল; মেয়েটির ছোট বলিষ্ঠ হাত বেশ শক্ত করে তার কনুইতে ঠেকানো, অস্বস্তি হচ্ছে তার।

'দৈত্য নয়, বোকার মত, পা ভিজে ঠাণ্ডা লেগে যাবে,' গরগর করে উঠল স্ত্রুচকভ, মনে হল নিজের বিষণ্ণ নানা ভাবনায় সে আচ্ছন্ন।

'সেদিক থেকে আমার সুবিধে। পায়ের পাতার বালাই নেই, ঠাণ্ডা লাগবে না তাই,' হেসে বলল আলেক্সেই।

'চলুন, শীগগির চলুন, ওখানটা এখন ভারী সুন্দর হবে নিশ্চয়ই,' কুয়াশায় ঢাকা হ্রদের দিকে ওদের টেনে নিয়ে যেতে যেতে তাড়া দিয়ে বলল জিনচ্‌কা।

আর একটু হলে সটান জলে পড়ত ওরা, একেবারে পায়ের নিচে কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে জলের কালো রেখাটা চোখে পড়াতে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল তিনজনে। কাছে ছোট একটা জেটি, অন্ধকারে দাঁড়-নৌকোর অস্পষ্ট রেখা। কুয়াশায় ঝটপট ঢুকল জিনচ্‌কা, ফিরে এল জোড়া দাঁড় হাতে। দাঁড়ের আঙটা বাঁধা হল, দাঁড়দুটো নিল আলেক্সেই; জিনচ্‌কা আর মেজর হালের কাছে বসল। নিস্তরঙ্গ জল বেয়ে আস্তে আস্তে চলল নৌকো। কুয়াশার মধ্যে গিয়ে পড়ছে কখনো, কখনো আসছে খোলা জায়গায়। জলের কালো মসৃণ বুকে দরাজভাবে পড়েছে চাঁদের রুপালী আলো। কথা বলছে না কেউ, সবাই নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন। শান্ত রাত্রি; পারার ফোঁটার মত আর ঠিক সে রকম ভারীভাবে দাঁড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। দাঁড়ের আঙটার অস্পষ্ট শব্দ, কোথায় যেন একটা সারস ডাকল, অনেক দূর থেকে এল পেঁচার বিষণ্ণ চীৎকার, প্রায় শোনা যায় না ডাকটা।

'কাছাকাছি প্রচণ্ড লড়াই চলেছে, প্রায় বিশ্বাস হয় না সেটা...' মৃদুকণ্ঠে বলল জিনচ্‌কা। 'আমাকে চিঠি দেবেন ত আপনারা? আলেক্সেই পেত্রভিচ, আপনি নিশ্চয়ই লিখবেন, ঠিক ত? কয়েক ছত্র লিখলেই চলবে, ঠিকানা-লেখা কয়েকটা পোস্টকার্ড আপনার সঙ্গে দিয়ে দেব, কী বলেন? আপনি

লিখবেন: "বেঁচে আছি, ভালো আছি, নমস্কার," আর কোন ডাক-বাক্সে ফেলে দেবেন, কী বলুন?..'

'যাচ্ছি বলে আমি কত খুসি, ভাবতেই পারবেন না আপনারা। বাপ! বসে বসে ঘেন্না ধরে গিয়েছে! কাজের জন্যে হাত সুড়সুড় করছে!' স্ত্রুচকভ বলে উঠল।

আবার সবাই চুপচাপ। নৌকোর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ করে লাগছে ছোট ছোট ঢেউ, নৌকোর নিচে ঘুমন্ত ঘড়ঘড় শব্দে জলধারা ঝকঝকিয়ে কোণাকুণিভাবে গলুই'এর কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, নীলচে বিক্ষুব্ধ চাঁদের আলোর রেখা তীর থেকে জলের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে, কুমুদ ফুলের পাতার গোছাগুলো জ্বলছে এদিকে ওদিকে।

'গান গাওয়া যাক,' প্রস্তাব করল জিনচ্কা, উত্তরের অপেক্ষা না করেই অ্যাসগাছের বিষয়ে সেই গানটি ধরল।

প্রথম দুটো পঙ্ক্তি একলা গাইল সে, পরেরটা ধরল মেজর স্ত্রুচকভ, সুন্দর গভীর ব্যারিটোনে। এর আগে সবায়ের সামনে সে গায়নি কখনো, ওর যে এমন সুন্দর, সুরেলা গলা আলেক্সেই ভাবতেও পারেনি। মসৃণ জলের উপর দিয়ে ভেসে চলল গানের বিষণ্ণ, আবেগমুখর সুর: সতেজ দুটো কণ্ঠস্বর, একটি ছেলের, অন্যটি মেয়ের, আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরকে দোহা দিচ্ছে। আলেক্সেই'র মনে পড়ে গেল জানলার বাইরে সেই পাতলা এ্যাসগাছটার কথা, বেরির একটি মাত্র গোছা তাতে, মনে পড়ে গেল পাতাল সেই গ্রামটিতে ভারিয়ার কথা। তারপর সবকিছু — হ্রদ, অদ্ভুত চাঁদের আলো, নৌকো আর গায়কেরা, সবকিছু মিলিয়ে গেল আর রুপালী কুয়াশায় ও দেখল কামিশিনের সেই মেয়েটিকে, ফুলে-ভরা মাঠে ডেইজির মধ্যে বসেছিল যে ওলিয়া, সে ওলিয়া নয় কিন্তু, আলাদা ধরনের, অপরিচিত একটি মেয়ে, ক্লান্ত সে, গাল জায়গায় জায়গায় রোদে তামাটে হয়ে গিয়েছে, ঠোঁটদুটো ফাটা, ঘর্মমলিন টিউনিক পরনে, স্তালিনগ্রাদের কাছে স্তেপে কোথাও শাবল চালাচ্ছে সে।

দাঁড়দুটো ফেলে দিয়ে গানের শেষ দুটো কলি গাইতে যোগ দিল আলেক্সেই।

৬

পরের দিন ভোরে স্বাস্থ্যাবাসের গেট থেকে বেরোল সারি সারি অনেক বাস। প্রবেশদ্বারের অলিন্দ তখনো ছাড়িয়ে যায়নি সেগুলো, এরিমধ্যে একটা বাসের পাদানিতে বসে মেজর স্ত্রুচকভ এ্যাসগাছের বিষয়ে তার প্রিয়

গানটি ধরেছে। অন্যান্য বাসেও সবাই গানটা ধরল। আর বিদায় সম্ভাষণ, শুভেচ্ছা, বুর্নাজিয়ানের রসিকতা, বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিনচ্কা কী বিদায়কালীন উপদেশ চেঁচিয়ে দিচ্ছে আলেক্সেইকে, সবকিছু ছাপিয়ে উঠল গানটির সহজ কিন্তু অর্থঘন কথাগুলো; পুরোনো গানটি ভুলে গিয়েছিল লোকে, কিন্তু মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে আবার নতুন প্রাণ পেয়ে জনপ্রিয় হয় ওটি।

গেট পেরিয়ে চলেছে বাসগুলো, সঙ্গে নিয়ে চলেছে গানটির গভীর সুরেলা ধ্বনি। শেষ হয়ে গেল গান, সবাই চুপচাপ; সহরের উপকণ্ঠে কারখানা আর শ্রমিকদের বসতি যখন বাস থেকে চোখে পড়ছে, স্তব্ধতা ভাঙ্গল শুধু তখন।

টিউনিকের বোতামগুলো খোলা, মেজর স্ত্রুচকভ তখনো বাসের পাদানিতে বসে হাসি মুখে প্রাকৃতিক দৃশ্যের তারিফ করছে। অতিশয় খোশমেজাজে তখন মেজর; ভবঘুরে সৈনিকটি আবার বেরিয়েছে রাস্তায়, চলেছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, তাই নিজের প্রকৃত স্বভাব ফিরে এসেছে। কোন একটা সামরিক দলে যাচ্ছে, কোনটা সেটা এখনো জানা নেই, কিন্তু যে দলই হোক, নিজের বাড়ির সামিল করবে সেটাকে। মেরেসিয়েভ বসে আছে, নির্বাক, উৎকণ্ঠিত। ওর মনে হচ্ছে, আসল বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি হওয়া এখনো বাকি, আর কে জানে সেগুলোকে ও অতিক্রম করতে পারবে কি না?

বাস থেকে নেমেই, এমন কি রাত্রিযাপনের কোন ব্যবস্থা না করেই মেরেসিয়েভ সটান গেল মিরভলস্কির কাছে। মন্দভাগ্যের প্রথম ঝাপটা: যে হিতাকাঙ্ক্ষীকে এত কষ্টে হাত করেছিল মেরেসিয়েভ তিনি সহরে নেই, চিকিৎসা বিষয়ে কোন জরুরী কাজে বিমানে করে কোথায় গিয়েছেন, ফিরতে কিছুদিন লাগবে। যে অফিসারটির সঙ্গে আলেক্সেই'র কথাবার্তা হল, সে বলল নিয়মানুযায়ী একটা দরখাস্ত করতে। জানলার ধারে তক্ষুণি বসে মেরেসিয়েভ দরখাস্তটা লিখে ফেলে ক্ষীণদেহ ছোটখাটো ক্লান্ত-চোখ অফিসারটির হাতে দিল। যথাসাধ্য চেষ্টা করার কথা দিল অফিসার, দুদিনের মধ্যে দেখা করতে বলল আলেক্সেইকে। অনুনয়-বিনয় করল আলেক্সেই, এমন কি ভয় দেখাল পর্যন্ত, কিন্তু কিছু সুবিধে হল না। হাড্ডিসার, ছোট হাতদুটো বুকে রেখে জবাব দিল অফিসার, যা নিয়ম তা মেনে চলতে হবে, নিয়মভঙ্গ করার কোন ক্ষমতা নেই তার। সত্যি সত্যি হয়ত ব্যাপারটি তাড়াতাড়ি

সম্পন্ন করার কোন ক্ষমতা ছিল না তার। হাত নেড়ে চলে এল মেরেসিয়েভ।

এই ভাবে শুরু হল সামরিক অফিসের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে তার হন্যের মত ঘোরা। হাসপাতালে তাকে আনা হয়েছিল ভীষণ তাড়ায়, ফলে জামাকাপড়, খাবারদাবার আর ভাতার সার্টিফিকেট মেলেনি, এ পর্যন্ত সেগুলো জোগাড় করার কোন চেষ্টা সে করেনি, এতে তার অসুবিধে অনেক বেড়ে গেল। ছুটির সার্টিফিকেট পর্যন্ত আলেক্সেই'র নেই। এ সব ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি সহৃদয় আর উপকারী লোক, রেজিমেণ্টের সদর দপ্তরে তার করে দরকারী কাগজপত্রগুলো বিনা বিলম্বে পাঠিয়ে দিতে বলবে কথা দিল, কিন্তু মেরেসিয়েভ জানত এ সব ব্যাপারে কত সময় লাগে। বুঝতে পারল যুদ্ধকালীন কড়াকড়ির মধ্যে মস্কো সহরে, যেখানে রুটির প্রতিটি কিলোগ্রাম আর চিনির প্রতি গ্রাম অমূল্য, তাকে কিছু দিন কাটাতে হবে বিনা টাকায়, বিনা বাসায়, বিনা রেশনে।

হাসপাতালে আনিউতাকে ফোন করল মেরেসিয়েভ। গলা শুনে মনে হল কিছু একটা নিয়ে ও হয় উদ্বিগ্ন নয় ব্যস্ত আছে নিশ্চয়, কিন্তু মেরেসিয়েভ এসেছে শুনে খুব খুসি হয়ে জোর করে বলল এ-কদিন ওর বাড়িতে থাকতে হবে মেরেসিয়েভকে, বিশেষ করে এই জন্য যে ও নিজে এখন হাসপাতালে থাকছে, বাড়িতে একাধিপত্য হবে মেরেসিয়েভের।

চলে-আসা রোগীদের প্রত্যেককে স্বাস্থ্যাবাস থেকে পাঁচদিনের শুকনো রেশন দেওয়া হয়েছিল যাত্রার জন্য। তাই, বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে আলেক্সেই গেল নতুন, উঁচু সব বাড়ির পিছনের প্রাঙ্গণে বসানো সেই পরিচিত জীর্ণ ছোট বাসাটিতে।

মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলল, সঙ্গে কিছু খাবার আছে, তাই সবুর করতে পারে সে। চেনা, অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি ধরে উঠল, বেড়াল আর কেরোসিন আর ভিজে কাপড়ের গন্ধ তখনো রয়েছে; হাতড়ে দরজাটা বের করে সশব্দে টোকা দিল তাতে আলেক্সেই।

দরজাটা খুলে গেল বটে, কিন্তু দুটো শক্ত চেনে বাঁধা বলে আধখোলা অবস্থায় রইল। ছোটখাটো বৃদ্ধাটি স্বল্পপরিসর ফাঁকটি থেকে শীর্ণ মুখ বাড়িয়ে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল আলেক্সেই'র দিকে, জিজ্ঞেস করল কাকে চায়, কী নাম তার। জবাব পাবার পর চেনটার ঝনঝন আওয়াজ শোনা গেল, হাট করে খোলা হল দরজাটা।

'আন্না দানিলভনা বাড়িতে নেই, কিন্তু আপনার কথা টেলিফোন করে জানিয়েছে। ভেতরে আসুন, ওর ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে দিই,' বিরস বিবর্ণ চোখে আলেক্সেই'র মুখ, টিউনিক, বিশেষ করে ওর কিট-ব্যাগটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বৃদ্ধাটি বলল।

'গরম জল হয়ত লাগবে? রান্নাঘরে আনিচ্কার কেরোসিন স্টোভ আছে, কিছু জল ফুটিয়ে দেব...'

অসঙ্কোচে চেনা ঘরটায় প্রবেশ করল আলেক্সেই। যে কোন জায়গাকে নিজের বাড়ি মনে করার ক্ষমতাটা মেজর স্ত্রুচকভের অতিমাত্রায় ছিল, তার ছোঁয়াচ হয়ত লেগেছে আলেক্সেইকে। পুরোনো কাঠ, ধুলো আর ন্যাপথলিন, বহু বছর ধরে বিশ্বস্ত, ভালো কাজ দিয়েছে যে সব জিনিস, তাদের চেনা গন্ধ, এমন কি আবেগে ভরে দিল আলেক্সেই'র মন, যেন অনেক দিন ছন্নছাড়াভাবে ঘোরার পর নিজের বাড়িতে ফিরেছে সে।

পিছু পিছু এল বৃদ্ধা, বকবক করেই চলেছে, বক্তব্য হল: একটা রুটির দোকানে সার বাঁধে লোক, কপাল ভালো হলে সেখানে রেশন কার্ডে পাঁউরুটি পাওয়া যায়, গমের রুটি নয়; সেদিন হোমরাচোমরা একজন আর্মি অফিসার বাসে বলছিলেন যে স্তালিনগ্রাদে ফাঁপরে পড়েছে জার্মানরা, তাতে হিটলার এত ক্ষেপে যায় যে পাগলাগারদে আটক রাখতে হয়েছে তাকে, আর এখন নকল হিটলার জার্মানিতে রাজত্ব করছে; পড়শী আলেভ্তিনা আরকাদিয়েভনার সত্যি কোন অধিকার নেই শ্রমিকদের রেশন-কার্ড পাবার, এনামেলের সুন্দর একটা দুধের বাটি ধার করে আর ফেরৎ দেয়নি সে: আন্না দানিলভনার মা-বাবা, খাসা লোক তাঁরা, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে চলে গিয়েছেন; আর আন্না দানিলভনা নিজে বেশ মেয়ে, শান্ত শিষ্ট, অন্য ছুঁড়িদের মত যার তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায় না সে, বেটাছেলেদের নিজের ঘরে আনে না। শেষে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল:

'আপনি কি ওর সেই ট্যাঙ্ক-অফিসার ছোকরা, যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব পেয়েছে?'

'না, আমি বৈমানিক,' জবাব দিল মেরেসিয়েভ; বৃদ্ধার সজীব মুখে যুগপৎ এল বিস্ময়, বিতৃষ্ণা, অবিশ্বাস আর ক্রোধের ভাব, সেটা দেখে অনেক কষ্টে হাসি চাপল আলেক্সেই।

ঠোঁট চেটে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল বুড়ী, করিডর থেকে বলল, আগেকার মত আর মিঠে গলায় নয়:

'গরম জল দরকার হলে নীল কেরোসিন স্টোভটায় নিজেই ফুটিয়ে নিও বাপু।'

বেজ-হাসপাতালে আনিউতা নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত, কেননা হেমন্তের এই বিরস দিনে ঘরটাকে ভয়ানক পরিত্যক্ত দেখাচ্ছে। সবকিছুর উপরে ধুলোর পুরু স্তর, জানলায় আর ফুলদানিতে বসানো ফুলগুলো হলদে হয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। অনেক দিন জল দেওয়া হয়নি মনে হচ্ছে। টেবিলে ছাতা-পড়া খাবারের টুকরো, কেটলিটা সরানো হয়নি তখনো। পিয়ানোটাও নরম ধূসর ধুলোয় আচ্ছন্ন; একটা বড়ো মাছি, দেখে মনে হয় চাপা হাওয়ায় হাঁফ ধরে গেছে ওটার, বিমর্ষভাবে গুনগুন করে ঝাপসা হলদেটে জানলার শার্সিতে বারবার গিয়ে পড়ছে।

জানলাগুলো একেবারে খুলে দিল মেরেসিয়েভ। নিচের ঢালু বাগানটাকে সব্‌জিক্ষেতে পরিণত করা হয়েছে।

তাজা হাওয়ার ঝটকায় পুঞ্জীভূত ধুলো এত জোরে আলোড়িত হল যে ঘন কুয়াশার মত দেখাল। চট করে একটা কথা মনে হল আলেক্সেই'র... ঘরটা গুছিয়ে ফেললে হয় তাহলে আনিউতা অবাক আর খুসি হয়ে যাবে, যদি অবশ্য হাসপাতাল থেকে সময় করে সন্ধ্যেবেলায় আসতে পারে। বালতি আর ন্যাতা বুড়ীর কাছে চেয়ে নিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে কাজে লাগল আলেক্সেই, যে কাজ বহু যুগ ধরে হেয় মনে করত বেটাছেলেরা। প্রায় দেড় ঘণ্টা ঘর সাফ করা চলল, মেঝে ঘষছে, ধুলো ঝাড়ছে, বেশ ভালো লাগছে কাজটা আলেক্সেই'র।

বাড়িতে আসার সময়ে দেখেছিল সেতুতে দাঁড়িয়ে মেয়েরা বড়ো বড়ো রঙীন হেমন্তের ফুল বিক্রী করছে, সন্ধ্যেবেলায় সেখানে গেল সে। এক গোছা কিনে পিয়ানো আর টেবিলের উপরে ফুলদানিতে রেখে সবুজ কেদারায় আরাম করে গা ছড়িয়ে দিল; সারা শরীরে প্রীতিকর ক্লান্তির আমেজ, তার আনা খাবার রান্নাঘরে রাঁধছে বুড়ীটা, তার গন্ধ প্রাণভরে নিল আলেক্সেই।

কিন্তু আনিউতা যখন এল তখন এত ক্লান্ত সে যে কোনক্রমে ওকে সম্ভাষণ করেই শুয়ে পড়ল কোচে, ঘরটা কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নজরে পড়ল না। কিছুক্ষণ জিরিয়ে জল খেল, তখনি শুধু অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাল। ক্লান্তভাবে হেসে কৃতজ্ঞভাবে মেরেসিয়েভের কনুই'এ চাপ দিয়ে বলল:

'সত্যি, অবাক হবার কিছু নেই যে গ্রিশা আপনাকে এত ভালোবাসে,

একটু হিংসে হয় আমার তাতে। এটা আপনি নিজে করেছেন, আলিওশা! কী খাসা লোক! গ্রিশার কোন চিঠি পেয়েছেন? ও ওখানে আছে। সেদিন ওর একটা চিঠি পেয়েছি, ছোট্ট চিঠি, দুএক ছত্র মাত্র। ও এখন স্তালিনগ্রাদে, আর বোকারাম কী করছে জানেন? দাড়ি রাখছে! এই সময়ে!.. ওখানে বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশী, তাই না? সত্যি কিনা বলুন ত, আলিওশা! স্তালিনগ্রাদ সম্বন্ধে লোকেরা নানা মারাত্মক কথা বলছে!'

'লড়াই চলেছে ওখানে।'

ভ্রূকুটি করে আলেক্সেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। দারুণ লড়াই চলেছে ওখানে, ভলগায়, সবায়ের মুখে তার কথা, যারা ওখানে তাদের প্রত্যেককে হিংসে করে আলেক্সেই।

সারা সন্ধ্যা ওদের গল্প চলল, টিনের মাংসের খানা খাসা। অন্য ঘরটা তক্তা দিয়ে বন্ধ বলে এ ঘরটায় দুজনেই শুল বন্ধুর মত, আনিউতা বিছানায় আর আলেক্সেই কোচে, সঙ্গে সঙ্গে যৌবনসুলভ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেল দুজন।

ঘুম ভেঙ্গে যখন কোচে উঠে বসল আলেক্সেই তখন ধুলোর জালে সূর্যের আলো তেরছাভাবে ইতিমধ্যেই ঘরে পড়েছে। আনিউতা নেই। কোচের পিঠে পিন দিয়ে আটকানো এক টুকরো কাগজ: "হাসপাতালে তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছি। টেবিলে চা, খাবার-আলমারিতে রুটি আছে, চিনি নেই। শনিবারের আগে আসতে পারব না। আ.।"

এ ক'দিন ক্বচিৎ বাইরে গেল আলেক্সেই। কিছু করবার নেই, তাই বুড়ীর প্রাইমাস আর কেরোসিন স্টোভ, সস্‌প্যান আর ইলেকট্রিক সুইচগুলো মেরামত করল, এমন কি তার অনুরোধে সেই ঠোঁটকাটা মহিলা, আলেভতিনা আরকাদিয়েভ্‌নার কফি গুঁড়ো করার কলটি পর্যন্ত সারাল; প্রসঙ্গত দুধের সেই এনামেলের পাত্রটি এখনো সে ফিরিয়ে দেয়নি। এইভাবে বুড়ীর মন পেল আলেক্সেই, বুড়ীর স্বামীরও, সে নির্মাণ সংস্থার কর্মী, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক, অনেক সময়ে দিনের পর দিন তাকে বাইরে কাটাতে হয়। বুড়োবুড়ী শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এল যে ট্যাঙ্ক-বাহিনীর লোক অবশ্যই চমৎকার কিন্তু বৈমানিকরাও কোন অংশে ন্যূন নয়; ভালো করে চিনলে বোঝা যায় হাওয়াই পেশা সত্ত্বেও ওরা বেশ গম্ভীর প্রকৃতির সংসারী ঘরোয়া লোক।

অবশেষে কর্মচারিবৃন্দ বিভাগে গিয়ে তাদের রায় শোনবার দিন এসে

পড়ল। কোচে শুয়ে সারা রাত চোখ খুলে কাটাল আলেক্সেই। সকালে উঠে দাড়ি কামিয়ে মুখ ধুয়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় অফিসে পোঁছল, প্রশাসন বিভাগের যে মেজরের উপরে তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার ডেস্কে ওই প্রথম হাজির হল। মেজরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভালো লাগল না ওর। চোখ তুলে আলেক্সেইকে দেখল না পর্যন্ত মেজর, ভাবখানা যেন ওকে আসতে দেখেনি; কাজকর্মে বড়োই ব্যস্ত, ফাইল নিচ্ছে, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে, নানা লোককে টেলিফোন করা হল, বিশদভাবে মেয়ে কেরানীটিকে বোঝানো হল ফাইল কী করে রাখতে হয়, তারপর বেরিয়ে গেল ভদ্রলোক, অনেকক্ষণ টিকিটি দেখা গেল না। ততক্ষণে ভীষণ ঘেন্না ধরে গেছে আলেক্সেই'র, ওর লম্বা মুখ, লম্বা নাক, কামানো গাল, উজ্জ্বল ঠোঁট আর ঢালু কপাল, যেটা অলক্ষিতে মিলেছে চকচকে টেকো মাথায়, সবকিছু দুচক্ষের বিষ। অবশেষে ফিরে এল মেজর, বসে ক্যালেণ্ডারের পাতা উলটে শুধু তখনি আলেক্সেই'র দিকে দৃষ্টিপাত করল ব্যক্তিটি।

'আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট?' ভারিক্কি মোটা গলায় প্রশ্ন করা হল।

কী কাজে এসেছে মেরেসিয়েভ বলল। আলেক্সেই'র কাগজপত্র কেরানীটিকে আনতে বলে, পা ফাঁক করে বসে গভীর মনোযোগে দাঁত খুঁটতে লাগল মেজর, ভদ্রতার খাতিরে হাতের আড়াল করে রাখল দাঁত খোঁটার কাঠিটাকে। কাগজপত্র এল, শুরু হল মেরেসিয়েভের ফাইল পর্যবেক্ষণ করা। হঠাৎ হাত নাড়িয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে আলেক্সেইকে বসতে বলল মেজর: বোঝা গেল পায়ের পাতা কাটার কথায় পোঁছেছে সে। পড়ে চলল মেজর, ফাইল পড়া শেষ হলে আলেক্সেই'র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন?'

'ফাইটার কম্যাণ্ডের কোন দলে নিযুক্ত হতে চাই আমি।'

চেয়ারে ধড়াস করে হেলান দিয়ে অবাক হয়ে মেজর তাকাল বৈমানিকটির দিকে, সামনে সে তখনো দাঁড়িয়ে, নিজের হাতে তার জন্য একটা চেয়ার টেনে দিল মেজর। মেদল চকচকে কপালে পুরু ভুরুজোড়া তুলে জিজ্ঞেস করল:

'কিন্তু আপনি ত বিমান চালাতে পারবেন না!'

'পারি, পারবই! পরীক্ষা করার জন্যে কোন বিমান স্কুলে আমাকে পাঠিয়ে দিন!' প্রায় চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ। ওর বলার ঢঙে এত অদম্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ভাব যে অন্যান্য ডেস্কের অফিসাররা কৌতূহলী দৃষ্টিতে এদিকে তাকাল; তামাটে সুদর্শন লেফ্‌টেনাণ্টটি এত জোর দিয়ে কী চাইছে ভাবল তারা।

মেজরের দৃঢ় ধারণা হল সামনের লোকটি হয় একগুঁয়ে নয় বদ্ধ পাগল। আলেক্সেই'র ক্রুদ্ধ মুখ আর "বন্য", জ্বলজ্বলে চোখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সুরটা যথাসম্ভব নরম করার চেষ্টা করে বলল:

'কিন্তু শুনুন! পায়ের পাতা না থাকলে বিমান চালানো কী করে সম্ভব? আর সেটা আপনাকে করতে দেবে কে? ব্যাপারটা হাস্যকর। এ রকম ব্যাপার এর আগে কখনো হয়নি।'

'এর আগে কখনো হয়নি কিন্তু এখন হবে!' জেদ দিয়ে বলল মেরেসিয়েভ। নোটবুক থেকে সেলোফেনে মোড়া পত্রিকার পাতাটি বের করে ডেস্কে মেজরের সামনে রাখল সেটা।

অন্যান্য অফিসারেরা কাজ ছেড়ে ওদের কথাবার্তা একাগ্রভাবে শুনছে। ওদের মধ্যে একজন ডেস্ক থেকে উঠে মেজরের কাছে এল যেন কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চায়, দেশলাই চেয়ে নিয়ে তাকাল মেরেসিয়েভের দিকে। পত্রিকার পাতাটিতে চোখ বুলিয়ে মেজর জিজ্ঞেস করল:

'এটার ওপরে আমরা নির্ভর করতে পারি না। সরকারী দলিল নয় এটা। বিমান বাহিনীতে কর্মক্ষমতার নানা নির্দিষ্ট কড়া মানদণ্ড আছে, সে সব নির্দেশ মেনে চলতে হয় আমাদের। আপনার হাতের দুটো আঙুল না থাকলে বিমান চালাতে দিতাম না আপনাকে, পায়ের পাতার কথা ছেড়ে দিন। এই নিন আপনার কাগজ, কিছুই প্রমাণ করে না এটা। আপনার আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করি, কিন্তু...'

রাগে টগবগ করে ফুটছে মেরেসিয়েভ, মনে হল ডেস্ক থেকে দোয়াতদানিটা তুলে মেজরের চকচকে টেকো মাথায় ছুঁড়ে মারে। দম বন্ধ হয়ে আসা গলায় বলল:

'আর এটা?'

টেবিলের উপরে শেষ তাসটি রাখল মেরেসিয়েভ — কর্ণেলপদস্থ আর্মি সার্জন মিরভলস্কির সই-করা সার্টিফিকেট। দ্বিধান্বিতভাবে সেটা তুলে নিল মেজর। সার্টিফিকেটটি সরকারী কায়দায় লেখা, চিকিৎসা বাহিনী বিভাগের ছাপ মারা, সই করেছেন যে সার্জন বিমান বাহিনীতে বিশেষ খাতির তাঁর। পড়ে মেজরের কথা বলার ঢং বেশ নরম হয়ে এল। সামনের মানুষটি তাহলে উন্মাদ নয়। পায়ের পাতা নেই, তবু এই অনন্যসাধারণ যুবকটি সত্যি সত্যি

বিমান চালাতে ইচ্ছুক। চালাতে পারবে, সেটা বোঝাতে পেরেছে এমন কি প্রাজ্ঞ একজন আর্মি সার্জনকে, যাঁর কথার বিশেষ মূল্য আছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেরেসিয়েভের ফাইলটা সরিয়ে রেখে মেজর বলল:

'ইচ্ছে থাকলেও আপনার জন্যে আমি কিছু করতে পারি না। কর্ণেল পদস্থ আর্মি সার্জন যা খুসি লিখতে পারেন, কিন্তু আমাদের সুস্পষ্ট বাঁধা-ধরা নির্দেশ আছে, সেগুলো মানতেই হবে। যদি না মানি, তাহলে জবাবদিহি করবে কে... আর্মি সার্জন?'

গভীর ঘৃণায় হৃষ্টপুষ্ট আত্মবিশ্বাসী শান্ত আর সৌজন্যশীল অফিসারটির দিকে তাকাল মেরেসিয়েভ, দেখল তার সুষ্ঠু টিউনিকের পরিষ্কার কলার, লোমশ হাতদুটো, ছোট করে কাটা কুৎসিত বড়ো নখ। কী করে বোঝাবে একে? ওর মাথায় কিছু কি ঢুকবে? আকাশ-যুদ্ধ জিনিসটা কী ও কি জানে? হয়ত জীবনে কখনো গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শোনেনি। প্রাণপণে নিজেকে সামলে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ:

'কী করতে পারি তাহলে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল মেজর:

'আপনি যদি গোঁ ধরেন তাহলে কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের কমিশনে আপনাকে পাঠাতে পারি। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখি আপনাকে, তাতে কোন ফল হবে না।'

'জাহান্নমে যাক সব, কমিশনে পাঠিয়ে দিন আমাকে!' ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে মেরেসিয়েভ বলল।

তারপর শুরু হল অফিসে অফিসে ঘোরাঘুরি। ক্লান্ত সব অফিসার, কাজের অন্ত নেই তাদের, শুনল তার বক্তব্য, বিস্ময় ও সহানুভূতি জানাল আর অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। বাস্তবিক, কী করতে পারে তারা? নির্দেশ আছে ওদের, বেশ ভালো নির্দেশ, বাহিনীর কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠাঙ্কিত নির্দেশ, তাছাড়া আছে বাহিনীর বহু কালের ঐতিহ্য — কী করে অমান্য করে সেগুলো? আর মেরেসিয়েভের ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট! অদম্য কিন্তু পঙ্গু লোকটি ফ্রণ্টে ফিরে যেতে চাইছে গভীর আগ্রহে, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত সবাই, সোজাসুজি "না" বলার মত নিষ্ঠুর কেউ নয়; তাই ওরা ওকে কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ থেকে পাঠাল ফরমেসন্‌স্ বিভাগে, ডেস্ক থেকে ডেস্কে, প্রত্যেকে দয়া করে ওকে পাঠাত নানা কমিশনের কাছে।

প্রত্যাখ্যান কিম্বা তিরস্কার, অপমানজনক সহানুভূতি আর অনুগ্রহ করার ভাব, যেটাতে তার গর্বিত মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়, কিছুই আর দমাতে পারে না মেরেসিয়েভকে। রাগ সামলে চলতে শিখল সে, উমেদারের মত কথা বলার ঢং আয়ত্ত করে ফেলল। এক এক দিন দুতিন জায়গায় হয়ত ওকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু নিরাশ হল না সে। বারবার পকেট থেকে বের করতে হচ্ছে পত্রিকার সেই পাতা আর আর্মি সার্জনের সার্টিফিকেট, জীর্ণ হয়ে গেল দুটো, ভাঁজে ভাঁজে গেল ছিঁড়ে, অয়েল-পেপারে সেদুটো জুড়ে নিতে বাধ্য হল আলেক্সেই।

ঘোরাঘুরি করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকছে বিনা ভাতায়, তাতে দুর্ভোগ বেড়ে গেল। এ পর্যন্ত রেজিমেণ্ট থেকে ভাতার সার্টিফিকেট আসেনি, স্বাস্থ্যাবাসের দেওয়া খাবারদাবার শেষ হয়ে গিয়েছে। এটা সত্যি অবশ্য যে আনিউতার বাসায় বুড়োবুড়ীর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব এখন, তারা দেখে যে নিজের জন্য আর কিছু রাঁধে না আলেক্সেই, বারবার খেতে বলে ওকে: কিন্তু ওর জানা আছে জানলার নিচে ছোট্ট সব্জির ক্ষেতে কী পরিশ্রম করতে হয় বুড়োবুড়ীকে, ওদের কাছে প্রত্যেকটি পেঁয়াজ আর গাজরের মূল্য কতটা, কী করে রোজ সকালে রুটির খোরাক ওরা দুজনে ভাগ করে খায় ভাইবোনের মত। আর তাই বেশ উৎফুল্লভাবেই ওদের জানিয়ে দিল যে রান্নার হাঙ্গামা এড়াবার জন্য ও আজকাল অফিসারদের মেসে খায়।

শনিবার এল, আনিউতার ছুটির দিন — রোজ সন্ধ্যায় আলেক্সেই নিজের অসন্তোষজনক অবস্থার কথাটা ফোনে ওকে জানাত। মরীয়া গোছের কিছু একটা করবে ঠিক করল আলেক্সেই। কিট-ব্যাগে তখনো ছিল ওর বাবার রুপোর পুরোনো সিগারেট-কেসটা, কালো এনামেলে তার কোণে আঁকা তিনটে তুরন্ত ঘোড়ায় টানা একটা শ্লেজের নক্সা। ভিতরে লেখা: "পঞ্চবিংশ বিবাহ বার্ষিকীর দিনে। বন্ধুদের উপহার।" ধূমপান করে না আলেক্সেই, কিন্তু যুদ্ধে যাবার সময়ে মা বহুমূল্যবান পারিবারিক অভিজ্ঞানটি তার পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন, তারপর ওর সঙ্গে সঙ্গে হামেশা ঘুরেছে ভারী বেঢপ জিনিসটা, বিমান চালাবার সময়ে "কপাল ভালো করার" জন্য পকেটে রাখত ওটা। কিট-ব্যাগ থেকে হাতড়ে সেটা বের করে সেকেণ্ড-হাণ্ড জিনিসের দোকানে গেল আলেক্সেই।

রোগা একটি মহিলা — ন্যাপথলিনের গন্ধ গায়ে — ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

সিগারেট-কেসটি দেখল, হাড়-বের করা আঙুলে লিপিটা দেখিয়ে জানাল যে লিপি চিহ্নিত জিনিসপত্র বিক্রীর জন্য নেওয়া হয় না।

'কিন্তু বেশী দাম ত আমি চাইছি না। দামটা আপনিই বলুন না।'

'না, না! তাছাড়া কমরেড অফিসার, পঞ্চবিংশ বিবাহ বার্ষিকীতে উপহার নেওয়ার সময় আপনার এখনো আসেনি মনে হচ্ছে,' বিদ্রূপ করে বলল ন্যাপথলিন মহিলাটি, অসূয়াপরবশ বিবর্ণ চোখে আলেক্সেই'র দিকে তাকিয়ে। টকটকে লাল হয়ে উঠল আলেক্সেই'র মুখ, টেবিল থেকে সিগারেট-কেসটা ঝট করে তুলে বেরিয়ে যাবার দরজার দিকে গেল। কে যেন হাত ধরে থামাল তাকে, মুখে লাগল মদের ঝাঁঝালো গন্ধ, কানে কানে বলল:

'জিনিসটা খাসা দেখতে। সস্তা বলছ?' জিজ্ঞেস করল যে ব্যক্তিটি তার মুখটি কুৎসিৎ, দাড়িগোঁফ কামায়নি, নাকটা বড়ো আর নীল। সিগারেট-কেসের দিকে বাড়িয়ে দিল পেশল কম্পমান একটি হাত। 'বেজায় ভারী। স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের একটি বীরের খাতিরে তোমাকে পাঁচশ রুবল দেব আমি।'

দর কষাকষি করল না আলেক্সেই। পাঁচশ রুবলের নোটগুলো নিয়ে পুরোনো দুর্গন্ধ জিনিসপত্রের রাজত্ব থেকে এক দৌড়ে বেরোল খোলা হাওয়ায়। সবচেয়ে কাছের বাজারে গিয়ে কিছু মাংস, কিছু চর্বি, রুটি, আলু আর পেঁয়াজ কিনল, কয়েক গাছা পার্সলি সওদা করতেও ভুলল না। মোট বয়ে চলল বাসাতে, এই নামেই আজকাল ঘরটিকে ডাকে সে, চর্বির একটা টুকরো চিবোতে চিবোতে।

'নিজের রেশন নিয়ে আবার রান্না করে নেব নিজে, ঠিক করেছি। মেসে যা জঘন্য খাবার দেয়!' রান্নাঘরের টেবিলে কেনা জিনিসগুলো একটার পর একটা রাখতে রাখতে আলেক্সেই মিথ্যে কথা বলল বুড়ীকে।

সেদিন সন্ধ্যায় খাসা খানা তৈয়ার হল আনিউতার জন্য: মাংস দিয়ে তৈরী আলুর সুপ, রজন রঙের ঝোলে ভাসছে পার্সলির পাতা, পেঁয়াজে ভাজা মাংস, এমন কি ক্র্যানবেরির জেলি পর্যন্ত, আলুর খোসার শ্বেতসার থেকে সেটা বানিয়েছে বৃদ্ধা। আনিউতা এল, ফ্যাকাশে আর ক্লান্ত। জোর করে মুখ হাত ধুয়ে জামাকাপড় বদলাল। তাড়াহুড়ো করে খেল খানার প্রথম পদটি, তারপর দ্বিতীয়টি, আর গা ছড়িয়ে দিল পুরোনো কুহকী কেদারাটায়, দরদে-ভরা সিল্কের বাহুতে পুরোনো বন্ধুর মত জড়িয়ে ধরে লোককে সেটা, কানে কানে মধুর স্বপ্নের কথা বলে। ঘুমিয়ে পড়ল আনিউতা, পাকা রাঁধুনীর

হাতে তৈরী জেলিটা, খোলা কলের নিচে একটা টিনের কৌটোয় ঠান্ডা করা হচ্ছিল সেটাকে, তার জন্য অপেক্ষা করল না সে।

অল্প ঘুমিয়ে চোখ খুলল আনিউতা; এরিমধ্যে পুরোনো আরামী আসবাবপত্রে ভরা ছোট গোছালো ঘরটিতে প্রদোষের ধূসর ছায়া জড়ো হয়েছে। খাবার টেবিলের পাশে, পুরোনো বাতিদানিটার নিচে দুহাতে মাথা টিপে বসে আছে আলেক্সেই, এত জোরে টিপে আছে যে মনে হচ্ছে মাথাটা ভেঙ্গেচুরে ফেলতে চাইছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বসার ধরনে এমন গভীর হতাশা যে বলিষ্ঠ জেদী মানুষটির জন্য করুণায় আনিউতার বুক ভরে গেল। উঠে লঘু পায়ে ওর কাছে গিয়ে প্রকান্ড মাথাটি জড়িয়ে চুলে আঙুল বুলিয়ে দিল। আনিউতার হাত ধরে করতলে চুম্বন করল আলেক্সেই, তারপর হেসে উৎফুল্লভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বলল:

'ক্র্যানবেরি জেলিটার কী হল? বেড়ে লোক আপনি! আমি প্রাণপাত করে দেখছিলাম ওটা যাতে জলের তোড়ে ঠিক উত্তাপে আসে, আর আপনি কিনা ঘুমিয়ে পড়লেন! এতে যে কোন রাঁধুনী বিষাদসাগরে ডুবে যেত!'

ভিনিগারের মত টক "উৎকৃষ্ট" জেলি এক প্লেট করে দুজনে খেল; নানা বিষয়ে ফুর্তিতে গল্প চলেছে, দুটি বিষয় ছাড়া, যেন দুজনের সম্মতিক্রমে — সেদুটো হল গভজ্‌দেভ আর মেরেসিয়েভ। পরে যে যার কোচে শোবার ব্যবস্থা করা হল। করিডরে গিয়ে আনিউতা দাঁড়িয়ে রইল, ঠক করে আলেক্সেই'র নকল পায়ের পাতাদুটো মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনে ফিরে এল ঘরে, আলো নিভিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। অন্ধকার ঘর, কথা বলছে না কেউ, কিন্তু চাদরের খসখস আর খাটের স্প্রিঙের শব্দে আনিউতা বুঝতে পারল আলেক্সেই জেগে আছে। অবশেষে সে জিজ্ঞেস করল:

'ঘুমিয়েছেন না কি, আলিওশা?'

'না।'

'ভাবছেন?'

'হ্যাঁ। আর আপনি?'

'আমিও ভাবছি।'

আবার চুপ করে গেল দুজনে। রাস্তায় মোড় নিতে নিতে ট্রামের ঝনঝনানি। মুহূর্তের জন্য বিজলী তার থেকে আগুনের নীল স্ফুলিঙ্গে আলো হয়ে উঠল ঘরটা, দুজনের মুখ নিমেষের জন্য দুজনের চোখে পড়ল। চোখ খুলে জেগে আছে দুজনেই।

ওর নিষ্ফল ঘোরাফেরার বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেনি আলেক্সেই. কিন্তু আনিউতা আঁচ করল যে ওর ব্যাপার খুব সুবিধের নয়, হয়ত হতাশায় ওর অদম্য মন আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ছে। নারীসুলভ সহজাত বোধে বুঝতে পারল কী যন্ত্রণাই না পাচ্ছে মানুষটি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝল যে এখন যতই কষ্ট পাক না কেন ও, দরদ দেখালে যন্ত্রণাটা বেড়ে যাবে, সহানুভূতি খারাপ লাগবে শুধু।

আলেক্সেই চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, হাতে মাথা রেখে কয়েক পা দূরে বিছানায় শায়িত সুন্দরী মেয়েটির কথা ভাবছে, বন্ধুর মনের মানুষ মেয়েটি, নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু। অন্ধকার ঘরে কয়েক পা ফেললেই পৌছতে পারে তার কাছে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার বিনিময়ে সেটা ও করবে। খুব বেশী চেনে না মেয়েটিকে, আশ্রয় দিয়েছে ওকে, সহোদরার মত। মেজর স্ত্রুচকভ হয়ত আলেক্সেইকে বিদ্রূপ করবে, হয়ত এ কথাটা বললে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কিছু বলা যায় না... হয়ত এখন সবচেয়ে ভালো করে তাকে বুঝতে পারবে মেজর.. আনিউতা চমৎকার মেয়ে সত্যি! কী রকম ক্লান্ত হয়ে যায় বেচারা, অথচ কী আগ্রহে না কাজ করে বেজ-হাসপাতালে!

'আলিওশা!' নরম গলায় ডাকল আনিউতা।

নিশ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মিত শব্দ এল মেরেসিয়েভের কোচ থেকে। ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠে লঘু পায়ে ওর কোচের কাছে গিয়ে বালিশটা ঠিক করে দিল আনিউতা, কম্বলটা গুঁজে দিল, যেন ও শিশু।

৭

প্রথমেই মেরেসিয়েভকে ডাকল কমিশন। বিরাট থলথলে কর্ণেল পদস্থ আর্মি সার্জন বিশেষ কাজ সেরে ফিরে এসেছেন শেষ পর্যন্ত, তিনিই সভাপতির চেয়ারে। আলেক্সেইকে দেখেই চিনতে পারলেন তিনি, এমন কি ওকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'আপনাকে ওরা নিচ্ছে না বুঝি?' সহানুভূতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সার্জন। 'হ্যাঁ, আপনার কেসটা সত্যিই কঠিন। আইন এড়িয়ে যেতে হবে, সেটা করা সহজ নয়।'

আলেক্সেইকে পরীক্ষা করার ঝামেলা নিল না কমিশন। লাল পেন্সিলে আর্মি সার্জন ওর দরখাস্তের উপরে লিখলেন: "কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ।

পরীক্ষার জন্য বিমানি স্কুলে দরখাস্তকারীকে পাঠানো সম্ভব মনে করি।' লেখাটি নিয়ে আলেক্সেই সোজা গেল কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের প্রধানের কাছে। জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে তাকে দেওয়া হল না। দারুণ রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল আলেক্সেই, কিন্তু জেনারেলের এ্যাডজুটাণ্টটি, চটপটে তরুণ ক্যাপ্টেন একজন, ছোট কালো গোঁফ, আর এত হাসিখুসি দরদী মুখ তার যে আলেক্সেই নিজেই অবাক হয়ে গিয়ে ওর ডেস্কের পাশে বসে পড়ল। যদিও এ্যাডজুটাণ্টদের ভালো লাগত না তার, "চিত্রগুপ্ত" বলে ডাকত তাদের আলেক্সেই, তবু নিজের কাহিনীটি খুঁটিয়ে বলল তাকে। মাঝেমাঝে টেলিফোন বেজে ওঠাতে বাধা পড়ছে কাহিনীতে, প্রায়ই ক্যাপ্টেনটি উঠে চলে যাচ্ছে প্রধানের ঘরে, কিন্তু প্রতিবার ফিরে এসেই আলেক্সেই'র দিকে মুখ করে বসছে, অকপট শিশুসুলভ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টিতে কৌতূহল আর শ্রদ্ধা এবং কিছুটা অবিশ্বাসও নিয়ে, তাড়া দিয়ে বলছে:

'হ্যাঁ, বলুন, তারপর কী হল?' কিম্বা হয়ত হঠাৎ বাধা দিয়ে বিস্ময়োক্তি করে উঠছে, 'সত্যি না কি? সত্যি বলছেন? আচ্ছা, বেশ!'

এ-অফিসে ও-অফিসে ঘোরাঘুরির কথা জানাল আলেক্সেই। সরকারী কলকব্জার ব্যাপারটা যে কী জটিল সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে ক্যাপ্টেনটির মনে হল, দেখতে কমবয়সী হলেও। রাগতভাবে সে বলল:

'শয়তান বেটারা! ওরকম ভাবে আপনাকে এদিক ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কোন দরকার ছিল না। আপনি অসাধারণ... ঠিক কী করে ভাষায় প্রকাশ করি জানি না... অনন্যসাধারণ লোক আপনি... কিন্তু জানেন, শেষ পর্যন্ত ওরাই ঠিক বলেছে: পায়ের পাতা না থাকলে বিমান চালানো যায় না।'

'চালানো যায়... দেখুন এটা...' পত্রিকার সেই পাতাটি, আর্মি সার্জনের মতামত আর কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের উদ্দেশ্যে লেখা পড়চাটা দেখাল মেরেসিয়েভ।

'কিন্তু পায়ের পাতা নেই, বিমান চালাবেন কী করে? মজার লোক আপনি! ও প্রবচনটা জানেন ত: পায়ের পাতা নেই যার, কখনো নাচিয়ে হবার ক্ষমতা নেই তার।'

আর কেউ বললে অপমানিত বোধ করত মেরেসিয়েভ নিশ্চয়ই, চটে উঠে কড়া কথা শুনিয়ে দিত হয়ত, কিন্তু ক্যাপ্টেনটির মুখে সদাশয়তার এমন একটা দীপ্তি যে মেরেসিয়েভ লাফিয়ে উঠে বাচ্চাদের মত বাচালভাবে বলল:

'কখনো নয়, বলছেন? দেখুন তাহলে!' বসবার ঘরের মধ্যে মেরেসিয়েভ শুরু করল উদ্দাম নৃত্য।

তারিফ করে কিছুক্ষণ দেখল ক্যাপ্টেন, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে আলেক্সেই'র কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রধানের ঘরে।

বেশ কিছুক্ষণ সে ঘরে রইল ক্যাপ্টেন। ঘর থেকে কথাবার্তার চাপা শব্দ আসছে, আলেক্সেই'র সমস্ত শরীর টান হয়ে গেল, বুক ধুক ধুক করছে ব্যথায় আর প্রতীক্ষায়, কোন ক্ষিপ্রগতি বিমানে সটান নিচে নেমে আসার সময়কার মত।

অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন, বেশ হাসিখুসি উত্তেজিত।

'বেশ,' বলল সে। 'বৈমানিকদের দলে আপনার যোগ দেবার কথায় জেনারেল অবশ্য কান দিলেন না, কিন্তু উনি লিখে দিয়েছেন: "বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে নিযুক্ত করা হোক দরখাস্তকারীকে, মাইনে আর রেশন কমবে না।" বুঝলেন ত... ওটা কমবে না...'

অবাক হয়ে দেখল ক্যাপ্টেন, খুসি হওয়া দূরের কথা, রাগে ঝলসে উঠল আলেক্সেই'র চোখ।

'বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়ন! কক্ষণো নয়!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'কথাটা মাথায় ঢুকছে না কেন আপনাদের? মাইনে আর রেশন নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না: বৈমানিক আমি! বিমান চালাতে, লড়তে চাই আমি!.. কেন সেটা বুঝছে না লোকে? অতি সহজ কথা এটা...'

বিব্রত লাগল ক্যাপ্টেনের। বাস্তবিক আজব দরখাস্তকারীটি। অন্য কেউ হলে আনন্দে নেচে উঠত... কিন্তু ইনি! একেবারে উন্মাদ! কিন্তু উন্মাদটিকে ক্রমশ বেশী ভালো লাগছে ক্যাপ্টেনের। আন্তরিক সহানুভূতি বোধ করছে সে, ওর বিচিত্র দায়ে সাহায্য করতে চায়। হঠাৎ একটা ফন্দি এল ওর মাথায়। চোখ টিপে, আঙুলের ইসারায় মেরেসিয়েভকে ডেকে একবার প্রধানের ঘরের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বলল:

'যথাসাধ্য করেছেন জেনারেল। আর কিছু করার ক্ষমতা নেই ওঁর। শপথ করে বলছি। বৈমানিকদের দলে আপনাকে পাঠালে লোকে ভাববে ওঁর মাথার ঠিক নেই। কী করতে হবে বলি। বড়োকর্তার কাছে সোজা চলে যান। একমাত্র তিনিই আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।'

আলেক্সেই'র নতুন বন্ধু একটা পাস জোগাড় করে দিল। আধ-ঘণ্টা পরে বড়োকর্তার অফিসের বসবার ঘরের কার্পেট-ঢাকা মেঝেতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল মেরেসিয়েভ। কথাটা আগে তার মনে হয়নি কেন? সত্যি ত! সময় নষ্ট না করে উচিত ছিল সটান এখানে চলে আসা। হার কিম্বা জিৎ... এখন... লোকে বলে বড়োকর্তা নিজের কালে ওস্তাদ বৈমানিক ছিলেন। তাঁর ত বোঝা উচিত! জঙ্গী বিমানচালককে নিশ্চয়ই উনি বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে পাঠাবেন না!

কয়েকজন গম্ভীর জেনারেল আর কর্ণেল সেখানে বসে নিচু গলায় আলাপ করছিলেন। কয়েকজন স্পষ্টতই অস্থির, ক্রমাগত ধূমপান করছেন। বিচিত্রভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পায়চারি করছে সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট। অভ্যাগতরা সবাই চলে গেল, মেরেসিয়েভের পালা এবার, ক্ষিপ্রগতিতে ও গেল ডেস্কের কাছে. গোলগাল সাদাসিধে মুখ একটি নবীন মেজর সেখানে বসে ছিল।

'আপনি স্বয়ং বড়োকর্তার সঙ্গে দেখা করতে চান, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট?' জিজ্ঞেস করল মেজর।

'হ্যাঁ। আমার বিশেষ জরুরী একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলতে চাই ওঁকে।'

'আগে সে বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন কি? চেয়ার একটা টেনে বসুন। সিগারেট খান?' সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিল মেরেসিয়েভকে।

সিগারেট খায় না আলেক্সেই, কিন্তু কেন জানি একটা সিগারেট নিয়ে আঙুলের মধ্যে সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে রাখল ডেস্কে, তারপর হঠাৎ নিজের কাহিনীর সবটা শোনাল মেজরকে, যেমন করে বলেছিল ক্যাপ্টেনকে ঠিক তেমন ভাবে। কাহিনীটি শুনল মেজর, ভদ্রতা করে ঠিক নয়, বন্ধুভাবে সহানুভূতির সঙ্গে আর মনোযোগ দিয়ে। পত্রিকার পাতাটি আর আর্মি সার্জনের মতামত পড়ল মেজর। মেজর এত সহানুভূতি দেখাচ্ছে, যে তাতে ভরসা পেয়ে আর স্থানকালপাত্র ভুলে মেরেসিয়েভ দেখাতে চাইল যে সে নাচতে পারে... সমস্ত ব্যাপারটা আর একটু হলে ভণ্ডুল হয়ে যেত, কেননা ঠিক সে সময়ে সজোরে খুলে গেল অফিস-ঘরের দরজাটা, বেরিয়ে এলেন একটি লম্বা রোগা অফিসার চুল তাঁর কাকের মত কালো। ফটোগ্রাফে দেখা চেহারা, তৎক্ষণাৎ লোকটিকে চিনতে পারল আলেক্সেই। আর্মিকোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে পিছু পিছু আসা একটি জেনারেলকে কী যেন বলছিলেন

তিনি। অত্যন্ত চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে, মেরেসিয়েভকে দেখতে পর্যন্ত পেলেন না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মেজরকে তিনি বললেন, 'আমি ক্রেমলিনে যাচ্ছি। ছ'টার সময়ে বিমানে স্তালিনগ্রাদে রওনা হতে হবে, তার বন্দোবস্ত করুন। আমরা নামব ভেরখনিয়া পগ্রোমনায়াতে।' তারপর যেমন তাড়াহুড়ো করে ঢুকেছিলেন তেমনি তাড়াহুড়ো করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তক্ষুণি বিমান পাঠাতে বলল মেজর, মেরেসিয়েভ ঘরে আছে মনে পড়াতে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল:

'আপনার কপাল খারাপ। আমরা চলে যাচ্ছি। আবার আসতে হবে আপনাকে। থাকার জায়গা আছে আপনার?'

এক মুহূর্ত আগে অসাধারণ এই অভ্যাগতটিকে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর শক্ত দেখাচ্ছিল, আর এখন তার তামাটে মুখে এত গভীর হতাশা আর ক্লান্তির ছাপ পড়ল যে মেজর মত পরিবর্তন করল।

'আচ্ছা, বেশ...' বলল সে। 'জানি প্রধানও ঠিক এটাই করতেন।'

সরকারী কাগজে কয়েক লাইন লিখে কাগজটা খামে পুরে উপরে ঠিকানা লিখল: "কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের প্রধানকে।" খামটা মেরেসিয়েভকে দিয়ে করমর্দন করে মেজর বলল:

'সর্বান্তঃকরণে আপনার সাফল্য কামনা করি!'

চিঠিতে লেখা: "কম্যান্ডারের সঙ্গে দেখা করেছেন সিনিয়র লেফটেনান্ট আ. মেরেসিয়েভ। বিশেষভাবে সাহায্য করা উচিত ওঁকে। যাতে জঙ্গী বিমান বাহিনীর কাজে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য যা করা সম্ভব তা করতে হবে।"

এক ঘণ্টা পরে ছোট গোঁফওয়ালা ক্যাপ্টেনটি তার প্রধানের অফিস-ঘরে নিয়ে গেল মেরেসিয়েভকে। বৃদ্ধ জেনারেল, বলিষ্ঠ লোক তিনি, ভুরুজোড়া লোমশ আর খোঁচা খোঁচা, নোটটি পড়ে নীল প্রসন্ন চোখে বৈমানিকের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন:

'এরি মধ্যে তাহলে ওখানে যাওয়া হয়ে গিয়েছে? বেশ চটপটে বলতেই হবে। বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে পাঠাচ্ছিলাম বলে রাগে প্রায় ফেটে পড়েছিলে, তুমিই সেই ছোকরা তাহলে!' খোশমেজাজে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। 'খাসা ছোকরা! মালুম হচ্ছে ঘোড়েল বৈমানিক তুমি! বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে যেতে চাও না! চটে উঠেছিলে, তাই না?.. কিন্তু তোমার মত তুখোড় নাচিয়েকে নিয়ে কী করি বলো ত? ঘাড় মুচড়ে পড়বে তুমি, আর

বোকা বুড়োর মত তোমাকে কাজে পাঠিয়েছি বলে ওরা আমার টুঁটি চেপে ধরবে! কিন্তু তুমি কী করতে পার সেটা কে বলতে পারে? এই যুদ্ধে আমাদের ছেলেরা এর চেয়েও বড়ো অনেক কিছু করে সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে... তোমার কাগজপত্র কোথায়?'

তারপর জেনারেল মেরেসিয়েভের দরখাস্তটার উপরে নীল পেন্সিলে হিজিবিজি করে, দুষ্পাঠ্য ভাবে, কোনক্রমে কথাগুলো সমাপ্ত করে লিখলেন: "দরখাস্তকারীকে ট্রেনিং-স্কুলে পাঠানো হোক।" কম্পিত হাতে কাগজটা ছিনিয়ে নিল মেরেসিয়েভ, কী লেখা হয়েছে তক্ষুণি সেটা পড়ে ফেলল ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার পড়ল সেটা; নিচে সান্ত্রী যেখানে পাস দেখে সেখানে এসে, তারপর বাসে, তারপর বাইরে বৃষ্টি-পড়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবার পড়ল। সারা দুনিয়ায় একমাত্র ওই শুধু জানে তাড়াতাড়ি আর হিজিবিজি করে লেখা সেই পাঁচটি শব্দের মানে আর মূল্য কী।

সেদিন ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারের কাছে উপহার হিসেবে পাওয়া ঘড়িটা বেচে দিল আলেক্সেই মেরেসিয়েভ। বাজারে গিয়ে সেই টাকায় নানারকমের খাবার আর মদ কেনা হল, আনিউতাকে টেলিফোনে অনুনয় বিনয় করে বলল যেন ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি নিয়ে আসে, আনিউতার বাসার বুড়োবুড়ীকে নিমন্ত্রণ করল। নিজের বিরাট জয়লাভে আনন্দ করার জন্য ভোজের বন্দোবস্ত করল আলেক্সেই।

৮

মস্কোর কাছে, ছোট একটি বিমান-ঘাঁটির খুব কাছাকাছি ট্রেনিং-স্কুলটা। সেই সব উৎকণ্ঠায় ভরা দিনগুলিতে খুব কাজের তাড়া পড়েছে সেখানে।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে বড়ো একটা অংশ নিয়েছে বিমান বাহিনী। ভলগার এই গড়বন্দী জায়গাটির উপরে আকাশ হামেশাই আগুন আর বিস্ফোরণের ধোঁয়ায় রক্তাভ আর আচ্ছন্ন, অবিরত বিমান-হামলা রীতিমত বিরাট আকাশ-যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে সেখানে। দুপক্ষেই দারুণ লোকক্ষয় হচ্ছে। জঙ্গী স্তালিনগ্রাদ চায় বৈমানিক, আরো বেশী বৈমানিক, আরো বৈমানিক... লড়াই'এর তালিম দেবার ট্রেনিং-স্কুলটি শেখায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া বৈমানিকদের আর এতদিন বেসামরিক বিমান চালিয়েছে যারা তাদের, তাই

হাঁফ ছাড়ার সময় নেই এখন। ট্রেনিং দেবার বিমানগুলো দেখতে ড্র্যাগনফ্লাই'এর মত, ছোট ভিড়াক্রান্ত বিমান-ঘাঁটিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়িয়ে পড়েছে, রান্নাঘরে অপরিষ্কার টেবিলে মাছির মত, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শোনা যায় ওদের গুঞ্জন। চাকায় আড়াআড়িভাবে রেখাঙ্কিত মাটি, যখনি সেদিকে তাকানো যায় তখনি চোখে পড়ে একটা বিমান উঠছে, নামছে আর একটা।

স্কুলের চিফ অব স্টাফ লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলটি ছোটখাটো শক্তসমর্থ মানুষ, মুখটি লাল, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ লাল হয়ে গিয়েছে, মেরেসিয়েভের দিকে রাগতভাবে তাকালেন তিনি, যেন বলতে চান, "কোন শয়তান তোমাকে এনেছে? আমার হাতে যেন আর কাজ নেই।" বাড়িয়ে দেওয়া কাগজপত্রগুলি ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন তিনি।

"পায়ের পাতা নেই বলে আপত্তি তুলবে আর বলবে কেটে পড়তে," লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলের কালো দাড়ির গোড়ার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাবল মেরেসিয়েভ। কিন্তু ঠিক সময়ে একসঙ্গে দুবার টেলিফোনে ডাক পড়ল ওঁর। একটা রিসিভার কাঁধ দিয়ে কানে চেপে ধরে, অন্যটায় খিটখিট করে ভারী গলায় কী একটা বললেন, মেরেসিয়েভের কাগজপত্রে তাঁর সঙ্গে চোখ বুলিয়ে গেলেন। বোঝা গেল হিজিবিজি করে লেখা জেনারেলের নির্দেশটি শুধু তিনি পড়লেন, কেননা তক্ষুণি, রিসিভার তখনো হাতে, তার নিচে লিখে দিলেন: "লেফ্‌টেনাণ্ট নাউমভ, তৃতীয় ট্রেনিং ইউনিট। ভর্তি করে নেওয়া হোক।" দুটো রিসিভার একসঙ্গে নামিয়ে রেখে ক্লান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি:

"পোষাকের সার্টিফিকেট আছে? টাকার আর খাবারের সার্টিফিকেট? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি কী বলবেন। হাসপাতাল! সময় ছিল না হাতে। কিন্তু কী করে আপনাকে খাওয়াব? ওসবের জন্যে এক্ষুণি দরখাস্ত করে দিন। ভাতার সার্টিফিকেট না থাকলে আপনার নাম পাঠাব না!'

'বেশ, জো হুকুম!' কায়দায় সেলাম করে সানন্দে বলল মেরেসিয়েভ। 'যেতে পারি?'

'হ্যাঁ,' অবসন্নভাবে হাত নেড়ে বললেন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল। তারপর হঠাৎ ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের দেওয়া সোনালী নামাক্ষর আঁকা ভারী ছড়িটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন তারস্বরে, 'দাঁড়ান, কী ওটা?' অফিস থেকে চলে আসার সময়ে উত্তেজনায় ভুলে একটা কোণে রেখে এসেছিল ওটা মেরেসিয়েভ। 'ওটা কী? ফেলে দিন ওটা! দেখে মনে হচ্ছে

যেন এ জায়গাটা বেদেদের তাঁবু, সামরিক ইউনিট নয় — কিম্বা একটা বাগান: ছড়ি, বেত, ঘোড়ার চাবুক... শীগগিরই গলায় কবচ ঝোলাবেন মনে হচ্ছে আর ককপিটে নেবেন কালো বেড়াল! হতভাগা জিনিসটা যেন আর না দেখি! ফুলবাবু!'

'আচ্ছা, কমরেড লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল!'

আলেক্সেই জানে এখনো অনেক বাধাবিপত্তি সামনে: নতুন সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করতে হবে, পুরোনো কাগজপত্র কেন হারিয়ে গিয়েছে সেটা বোঝাতে হবে খিটখিটে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলকে। স্কুলে ক্রমাগত লোক আসছে আর যাচ্ছে, বিশৃঙ্খলায় খাবারটা পর্যাপ্ত নয়, মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হতে না হতে রাত্রির শেষ খাবারের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে লোকেরা; বৈমানিকদের জন্য ৩ নং মেস যেখানে আস্তানা গেড়েছে, সেই স্কুলের ভিড়ঠেসা বাড়িটায় বাস্পের নল ফেটে গিয়েছে, দারুণ ঠাণ্ডা, প্রথম দিন সারা রাত কম্বল আর চামড়ার কোটের নিচে শুয়ে ঠকঠক করে কেঁপেছে আলেক্সেই — কিন্তু সব মিলিয়ে সোরগোল আর অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও ভালো লাগল তার; বালুতীরে খাবি-খাওয়া মাছকে ঢেউ'এ আবার সমুদ্রে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে ঠিক এ-রকম লাগে। এখানকার সবকিছু ভালো লাগল তার, এমন কি শিবির-জীবনের নানা অসুবিধা মনে করিয়ে দিল যে লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি এসে পড়েছে সে।

অভ্যস্ত সেই পরিবেশ; রঙচটা চামড়ার কোট গায়ে, কুকুরের লোমের বিমানি বুট পায়ে, তামাটে মুখ, ভাঙ্গা গলা, সব হাসিখুসি লোক ওর বেশ জানা; বিমান পেট্রলের মিঠেকড়া গন্ধে ভরপুর সেই অভ্যস্ত হাওয়া ইঞ্জিন গরম করার গর্জনে আর উড়ন্ত বিমানের সমান মন-জিরোনো ঘর্ঘর আওয়াজে মুখর; চটচটে ওভারঅল পরনে, ক্লান্তিতে মুহ্যমান মিস্ত্রীদের কালিঝুল-মাখা মুখ; খিটখিটে ইনস্ট্রাকটর সব, রোদে পুড়ে মুখ কাংস্যবর্ণ; আবহাওয়া কেন্দ্রে টুকটুকে গাল মেয়েরা; পরিচালনা-ঘাঁটির স্টোভ থেকে স্তরে স্তরে নীলচে ধোঁয়া উঠছে, সঙ্কেত-যন্ত্রটির মৃদু গুঞ্জন আর টেলিফোন বেজে ওঠার আকস্মিক শব্দ; যাত্রোদ্যত বৈমানিকরা "স্মৃতির জন্য" চামচে নিয়ে যাওয়াতে খাবার ঘরে ঘাটতি; রঙীন পেন্সিলে লেখা দেয়াল-সংবাদপত্র, তাতে আকাশে উঠেও মেয়েদের স্বপ্নবিভোর তরুণ বৈমানিকদের বিষয়ে কার্টুন ত থাকবেই। বিমান-ঘাঁটির নরম হলদে মাটি চাকায় আর কীলকে কেটে কেটে গিয়েছে, খোশমেজাজে গল্প চলছে, রসালো নানা খিস্তি আর বিমানচালনা শাস্ত্রের বুলি — এ সব ত পরিচিত আর স্বীকৃত।

ধড়ে যেন প্রাণ এল মেরেসিয়েভের। জঙ্গী বিমান বাহিনীর লোকেদের সেই বিশেষ খোশমেজাজ আর বেপরোয়া ভাব ফিরে পেল সে, যে ভাব চিরকালের জন্য হারিয়েছে বলে মনে হয়েছিল। টান হয়ে দাঁড়িয়ে অধস্তন লোকেদের সেলাম কায়দায় ফিরিয়ে দেয় সে, ঊর্ধ্বতনদের দেখলে প্রথামত সম্মান জানায়। নতুন ইউনিফর্মটা হাতে এলে তক্ষুণি সেটা "মাপসই" করে বদলে নেওয়া হল, বদলাল যে সে হচ্ছে বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নের একজন প্রবীণ কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেণ্ট, বেসামরিক জীবনে সে ছিল দর্জি; অবসর সময়ে চটপটে খুঁতখুঁতে লেফ্‌টেনাণ্টদের একমাপে তৈরী সামরিক ইউনিফর্মগুলো বদলে সে একেবারে প্রমাণসই করে দিত।

প্রথম দিনেই বিমান-ঘাঁটিতে গেল মেরেসিয়েভ ৩ নং ইউনিটের ইনস্ট্রাকটর লেফ্‌টেনাণ্ট নাউমভের খোঁজে, যার অধীনে তাকে রাখা হয়েছে। খর্বদেহ, অত্যন্ত তৎপর লোক নাউমভ, মাথাটি বড়ো, হাতদুটো লম্বা, "টি" চিহ্নটির কাছে ছুটোছুটি করছে উপরের দিকে তাকিয়ে, ছোট একটা বিমান সে "খণ্ডে" উড়ছে। বৈমানিককে চেঁচিয়ে তিরস্কার করে সে বলল:

'বেটা চটের থলে... আহাম্মক... বলে কিনা জঙ্গী বিমান বাহিনীতে ছিল! আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না বাপু!'

নিজের পরিচয় দেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে প্রথাসম্মতভাবে সেলাম করল মেরেসিয়েভ, কিন্তু নাউমভ শুধু হাত নেড়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'দেখেছেন? জঙ্গী! আকাশের বীরপুঙ্গব! ফৎফৎ করছে ঘুড়ির মত...'

দেখামাত্র ইনস্ট্রাকটরকে পছন্দ হল আলেক্সেই'র। এ ধরনের অল্প ছিটগ্রস্ত লোকেরা নিজেদের কাজের প্রেমে হাবুডুবু খায়, ভালো লাগে এদের আলেক্সেই'র; এদের সঙ্গে সহজে মানিয়ে চলতে পারে দক্ষ উৎসাহী বৈমানিকরা। বৈমানিকটি যে ভাবে বিমান চালাচ্ছে তার বিষয়ে কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য করল আলেক্সেই। খর্বদেহ লেফ্‌টেনাণ্ট বিচক্ষণভাবে তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আমার ইউনিটে আসছেন? কী নাম আপনার? কী ধরনের বিমান চালিয়েছেন? লড়াই করেছেন কখনো? কবে শেষবার বিমানে চড়েছেন?'

সবকটি জবাব ও শুনল কিনা আলেক্সেই ঠিক জানে না, কেননা আবার উপরে তাকিয়ে রোদ বাঁচাবার জন্য এক হাতের আড়াল করে অন্য হাত ঝাঁকিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট চেঁচাল তারস্বরে:

'শালা ঠেলাগাড়ি!.. কী ভাবে ঘুরছে দেখুন! ড্রয়িং-রুমে জলহস্তী যেন।'

পরের দিন সকালেই আলেক্সেই যেন দেখা করে আদেশ দিল লেফ্‌টেনাণ্ট, কথা দিল বিনা বিলম্বে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে তাকে।

'এখন গিয়ে জিরিয়ে নিন, যাত্রার পরে বিশ্রাম দরকার। কিছু খেয়েছেন? এখানে বেজায় গণ্ডগোল, খাবার দিতে হয়ত ভুলে যাবে বুঝলেন? রামপাঁঠা বেটা! একবার নেমে এস, মজাটা দেখাচ্ছি তোমায়!'

জিরোতে গেল না আলেক্সেই, কেননা যেখানে শোবার ব্যবস্থা, "৯ক" নম্বর সেই ক্লাসরুমের চেয়ে বাইরে ঠাণ্ডা কম মনে হল; হাওয়ায় শুকনো, খরখরে বালি বিমান-ঘাঁটিতে সবেগে উড়ছে। ব্যাটেলিয়নে একটা মুচি খুঁজে বের করে, এক হপ্তার তামাক রেশন তাকে দিয়ে বলল তার অফিসারের পুরোনো বেল্ট কেটে যেন একজোড়া পেটি বানায়, বকলস আর ফাঁস থাকা চাই: সেদুটো দিয়ে যে বিমান চালাবে তার পাদানিতে নকল পায়ের পাতা বেঁধে নেবার মতলব আলেক্সেই'র। ফরমায়েসটা জরুরী আর একটু অদ্ভুত, মুচি তাই তামাক ছাড়াও আধ-লিটর ভদকা দাবী করল, কথা দিল যে বেশ ভালো করে বানিয়ে দেবে জিনিসটা। বিমান-ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে মেরেসিয়েভ বিমান চালনা অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগল, যেন জিনিসটা সাধারণ শিক্ষানবিশি নয়, সেরা বৈমানিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে; যতক্ষণ না শেষ বিমানটি মাটিতে নামল আর সেটাকে তার জায়গায় নিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল ততক্ষণ সেখানে সে রইল। বিমান চালনা যতটা না দেখল তার চেয়ে বেশী অনুভব করল বিমান-ঘাঁটির আবহাওয়া, আপন করে নিল ওখানকার কর্মব্যস্ততা, ইঞ্জিনের অবিশ্রান্ত গর্জন, হাউই'এর ভারী শব্দ, পেট্রল আর তেলের গন্ধ। সমস্ত সত্তা তার আনন্দমুখর; কাল বিমানটা অবাধ্যতায় বেসামাল হয়ে পড়ে যেতে পারে, দুর্ঘটনা হতে পারে সে কথাটা একবারও মনে হল না।

পরদিন সকালে যখন ওখানে গেল তখনো জায়গাটা ফাঁকা। ওদিকের লাইনে ইঞ্জিন গরম করা হচ্ছে, গর্জন উঠছে, বিশেষ স্টোভ থেকে বেরোচ্ছে আগুনের শিখা, প্রপেলারগুলো চালিয়ে দিয়ে মিস্ত্রীরা লাফিয়ে সরিয়ে আসছে, যেন সাপ ওগুলো। কানে আসছে সকালের পরিচিত নানা হাঁকডাক:

'তৈয়ার!'

'কনট্যাক্ট!'

'কনট্যাক্ট!'

কে যেন ধমকে উঠে আলেক্সেইকে জিজ্ঞেস করল এত ভোরে

বিমানগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করার মানেটা কী। ঠাট্টা করে জবাব দিল আলেক্সেই, আর চটুল ধুয়ার মত বার বার বলে চলল, "তৈয়ার, কনট্যাক্ট, কনট্যাক্ট!" কথাগুলো কী কারণে যেন মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছে না। অবশেষে আস্তে আস্তে রওনা হবার লাইনে বিমানগুলো এল, বেঢপভাবে হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে, পাখাগুলো কাঁপছে, মিস্ত্রীরা ধরে আছে সেগুলো। নাউমভ ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে, সিগারেটের টুকরো মুখে, টুকরোটা এত ছোট যে মনে হয় যে বাদামী আঙুলের ডগা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

'এসে পড়েছ দেখছি!' আলেক্সেই'র কায়দাসম্মত সেলামের প্রত্যুত্তরে বলল লেফ্‌টেনাণ্ট। 'বেশ, বেশ। প্রথমাগত, প্রথমে পরিবেষিত। ৯ নং বিমানের পিছনের ককপিটে বসো। আমি এক্ষুণি আসছি। দেখা যাক, কী ধরনের চিড়িয়া তুমি।'

সিগারেটের টুকরোটায় তাড়াতাড়ি কয়েকটা টান দিচ্ছে সে, আলেক্সেই সটান গেল বিমানটায়। ইনস্ট্রাকটর এসে পড়ার আগেই পায়ের পাতাদুটো পাদানিতে বেঁধে নেওয়া মতলব তার। লোকটি ত খাসা মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছু বলা যায় না! মাথায় হয়ত ঝট করে কিছু একটা ঢুকবে আর হট্টগোল বাঁধিয়ে বিমান চালাতে দেবে না ওকে। পিছল ডানা বেয়ে তাড়াহুড়ো করে উঠল মেরেসিয়েভ, ককপিটের পাশটা অস্থিরভাবে ধরে, উত্তেজনার দরুণ, আর অভ্যেস নেই বলে পাটা তুলে পোঁছতে পারছিল না ও ধারটায় কিছুতেই; প্রৌঢ় মিস্ত্রীটি লম্বাটে বিষণ্ণ মুখে সবিস্ময়ে তাকাল তার দিকে আর ভাবল, "বেটা নেশায় চুর দেখছি!"

শেষ পর্যন্ত একটা টান-টান পা ককপিটে ঢোকাতে পারল আলেক্সেই, অসম্ভব চেষ্টা করে অন্য পাটাও, আর ধপ করে বসে পড়ল সিটে। পেটি দিয়ে নকল পায়ের পাতাদুটো পাদানিতে বাঁধল। বেশ ভালোভাবে বানানো হয়েছে পেটিদুটো, বিমান চালাবার পাদানির সঙ্গে নকল পাদুটো ফাঁস দিয়ে শক্ত আর স্বচ্ছন্দভাবে জড়িত। ছেলেবেলায় ব্যবহৃত খাসা স্কেটজোড়াটার মত।

ককপিটে মাথা ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল ইনস্ট্রাকটর:

'কী হে, নেশা করেছ নাকি? একবার শুঁকে দেখি ত!'

নিশ্বাস ফেলল আলেক্সেই। মদের গন্ধ নেই, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মিস্ত্রীর দিকে চটেমটে হাত নাড়ল ইনস্ট্রাকটর।

'তৈয়ার!'

'কনট্যাক্ট!'

'কনট্যাক্ট!'

কয়েকবার গুর গুর করে উঠল ইঞ্জিনটা, তারপর নিয়মিত তালে শোনা গেল পিস্টনগুলোর স্পন্দন। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে স্বতই গ্যাসের লেভার টানল আলেক্সেই, কানে এল গরগর করে ইনস্ট্রাকটর কথা বলার যন্ত্রে বলছে:

'ষাড়ের মত তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই।'

থ্রটল নিজে খুলল ইনস্ট্রাকটর। গর্জিয়ে আর্তনাদ করে উঠল ইঞ্জিন, লাফিয়ে ডিঙিয়ে কিছুটা গিয়ে শুরু করল টানাদৌড়। ইনস্ট্রাকটর কল টিপল আর ড্র্যাগনফ্লাই'এর মত দেখতে ছোট বিমানটা খাড়াভাবে উঠল আকাশে। উত্তর ফ্রণ্টে ওর আদরের নাম "বনবাসী", কেন্দ্রীয় ফ্রণ্টে "কপিওয়ালা" আর দক্ষিণ ফ্রণ্টে "ভুট্টাওয়ালা।" সৈন্যরা সবাই বিমানটিকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি চালাত, পুরোনো কিঁচকিঁচে হলেও জিনিসটা বিশ্বস্ত আর অনুগত, সবাই খাতির করে সেটিকে, সব বৈমানিকই উড়তে শিখেছে সেটায়।

কোণাকুণি বসানো আয়নায় নতুন শিক্ষার্থীর মুখ দেখতে পাচ্ছে ইনস্ট্রাকটর। বেশ কিছুদিন ছেদের পর প্রথম বিমান চালাচ্ছে, এমন কত লোকের মুখ না সে দেখেছে! দেখেছে সেরা বৈমানিকদের অনুগ্রহসূচক হাসি; হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ক্লান্ত শ্রান্ত যাত্রার পরে আবার ধাতস্থ উৎসাহী লোকেদের উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ; বিমানপতনের দরুন সাংঘাতিক চোট পেয়েছে যারা, আকাশে ওঠবার পরে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে তাদের মুখ, দেখা দিয়েছে ভীতির লক্ষণ, ঠোঁট কামড়েছে তারা; দেখেছে প্রথম ওড়বার সময়ে শিক্ষানবীশদের বেয়াড়া কৌতূহলী মুখ। এতদিন ইনস্ট্রাকটরের কাজ করেছে সে, কিন্তু আয়নায় কখনো ছায়া পড়েনি এমন অদ্ভুত মুখভাবের, যে ভাব এই তামাটে, সুদর্শন সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টটির মুখে এসেছে, ওকে দেখে ত স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিমান চালনায় আনাড়ি নয় মোটেই।

নতুন শিক্ষার্থীর মুখের তামাটে চামড়া যেন জ্বরের প্রকোপে রক্তাভ হয়ে উঠেছে। ঠোঁটদুটো ফ্যাকাশে, ভয়ে নয়, উচ্চ একটা আবেগে, সেটা কী বুঝতে পারল না নাউমভ। লোকটি কে? কী ঘটছে ওর? কেনই বা মিস্ত্রীটি ওকে মাতাল ভেবেছিল?

বিমানটি আকাশে উঠেছে, ইনস্ট্রাকটর দেখল শিক্ষার্থীটার গগল্‌সহীন

কালো জেদী বেদে চোখ জলে ভরে উঠল, ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে গালে চোখের জল; বিমানটা মোড় ঘুরতে হাওয়ার ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে গেল অশ্রু বিন্দু।

"মাথাটা একটু খারাপ মনে হচ্ছে। সাবধান হতে হবে আমাকে। কিছুই ত বলা যায় না..." ভাবল নাউমভ। আয়নায় ছায়া পড়ছে, উত্তেজিত মুখটির ভাবে এমন কিছু একটা ছিল যেটা চিত্ত আকর্ষণ করল ইনস্ট্রাকটরের। অবাক হয়ে দেখল আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে নিজের, সামনের সব যন্ত্রপাতি ঝাপসা হয়ে গেল।

'এবার তুমি ভার নাও,' কথা বলার যন্ত্রে মুখ দিয়ে বলল সে, কিন্তু পাদানি আর কল সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিল না; অদ্ভুত শিক্ষার্থীটি দুর্বলতার কোন লক্ষণ দেখালেই যাতে নিজে সামলে নিতে পারে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। ডুপ্লিকেট গিয়ারে হাত দিয়ে বুঝতে পারছে যে নতুন শিক্ষার্থীটি স্বচ্ছন্দে, অভিজ্ঞভাবে বিমান চালাচ্ছে, যেন "জাত বৈমানিক"; কথাটা বলতে ভালোবাসতেন স্কুলের চিফ অব স্টাফ, তিনি নিজে ঘাগী বৈমানিক, গৃহযুদ্ধের সময় থেকে বিমান চালিয়েছেন।

প্রথম কিস্তির পরে নতুন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে কোন সংশয় রইল না নাউমভের।

"নিয়মানুযায়ী" মসৃণভাবে চলেছে বিমানটা। অদ্ভুত যেটা লাগছে সেটা হল যে সোজাসুজি চালানোর সময়ে শিক্ষার্থীটি প্রায়ই একটু ডাইনে কিম্বা বাঁয়ে মুড়ছে, কিম্বা উপরনিচ করছে। মনে হল নিজের দক্ষতা যাচাই করে নিচ্ছে। নাউমভ ঠিক করল পরের দিনই ওকে একলা উড়তে দেবে, দুতিন বার ওড়ার পর ট্রেনিং বিমানে ওকে বসাবে; প্লাইউডের তৈরী সেটা, জঙ্গী বিমানের ক্ষুদ্র অনুকৃতি।

বেশ ঠাণ্ডা। ডানায় বসানো থার্মোমিটারে শূন্যের নিচে বারো সেণ্টিগ্রেড। ককপিটে কনকনে হাওয়া এসে ইনস্ট্রাকটরের কুকুরের লোমের বিমানি বুট ভেদ করে ঢুকছে, পা জমে যাচ্ছে। নামবার সময় হয়েছে।

কিন্তু যতবার ইনস্ট্রাকটর নামতে আদেশ করে ততবার আয়নাতে দেখে একজোড়া কালো জ্বলজ্বলে অনুনয়-ভরা চোখ। না, অনুনয়বিনয় করছে না, দাবী করছে, আর প্রত্যাখ্যান করার মত নির্দয় হতে পারছে না সে। দশ মিনিটের জায়গায় আধ-ঘণ্টা উড়ল তারা।

ককপিট থেকে লাফিয়ে নেমে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল নাউমভ আর

দস্তানা সুদ্ধ হাতদুটো সজোরে ঘষতে লাগল: সকালের অকাল ঠাণ্ডা কনকনে সত্যিই! শিক্ষার্থীটি কিন্তু ককপিটে কী একটা নিয়ে অস্থিরভাবে কাটাল কিছুক্ষণ, তারপর নামল মন্থরভাবে, মনে হল অনিচ্ছা সত্ত্বে। মাটিতে পা ঠেকার পর ডানার পাশে উবু হয়ে বসে পড়ল, মুখে আনন্দের মাতাল-করা ভাব, ঠাণ্ডায় আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে গাল।

'ঠাণ্ডা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ইনস্ট্রাকটর। "বিমানি বুটে সটান ঢুকছিল হাওয়াটা, কিন্তু তুমি ত সাধারণ জুতো পরে আছো? পা জমে যায়নি?'

'পায়ের পাতা নেই আমার,' জবাবে বলল শিক্ষার্থী, নিজের চিন্তায় তখনো হাসছে ও।

'কী?' বলে উঠল নাউমভ, বিস্ময়ে ওর মুখ ঝুলে পড়েছে।

পায়ের পাতা নেই আমার,' স্পষ্টভাবে আবার বলল মেরেসিয়েভ।

'পায়ের পাতা নেই, তার মানে? দুটোর কিছু গড়বড় আছে, তাই বলছো?'

'না। আমার পায়ের পাতা একেবারেই নেই। এদুটো নকল।'

এক মুহূর্ত বিস্ময়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল নাউমভ। আজব লোকটা যা বলছে অবিশ্বাস্য সেটা। পায়ের পাতা নেই! কিন্তু এইমাত্র ত বিমান চালিয়েছে, আর ভালোই চালিয়েছে...

'দেখি ত,' বলল নাউমভ, গলায় উৎকণ্ঠার আভাস।

তার কৌতূহলে বিরক্তি কিম্বা অপমান বোধ করল না আলেক্সেই। বরঞ্চ ওস্তাদের মার দেখিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিতে চায় এই ফুর্তিবাজ লোকটিকে। যাদুকর যেন খেল দেখাচ্ছে এমন ভঙ্গীতে, ট্রাউজারের পা উপরে তুলে ধরল আলেক্সেই।

চামড়া আর এ্যালুমিনিয়ামে বানানো নকল পায়ে ভর করে শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে আছে, ইনস্ট্রাকটর মিস্ত্রী আর প্রতীক্ষারত বৈমানিকদের সারির দিকে ফুর্তিতে চেয়ে।

এক ঝলকে নাউমভ বুঝতে পারল লোকটি উত্তেজিত হয়েছিল কেন, ওর অস্বাভাবিক মুখভাবের কারণ কী, ওর কালো চোখে কেন জল এসেছিল, কেন বিমান চালাবার রোমাঞ্চ এত ব্যগ্রভাবে বিলম্বিত করতে চেয়েছিল সে। শিক্ষার্থীটি অবাক করে দিল তাকে। ছুটে কাছে গিয়ে পাগলের মত তার করমর্দন করে বলে উঠল ইনস্ট্রাকটর:

'কী করে এটা করলে, ছোকরা? তুমি জানো না, সত্যি তুমি জানো না, কী ধরনের মানুষ তুমি নিজে!..'

প্রধান ব্যাপারটি তাহলে সম্পন্ন এখন। ইনস্ট্রাকটরের চিত্তজয় করেছে সে। সন্ধ্যেবেলায় আবার দুজনের দেখা হল, শেখবার একটা কর্মসূচী তৈরী করা হল। দুজনেই মানল যে আলেক্সেই'র ব্যাপারটা সহজ নয়। বিন্দুমাত্র ভুল করলেই ওকে আর কখনো উড়তে না দেবার সম্ভাবনা আছে। আর যদিও এখন ওর একমাত্র বাসনা জঙ্গী বিমান চেপে যায় ভলগার বুকে বিখ্যাত সেই সহরটিতে যেখানে দেশের সেরা যোদ্ধারা দলে দলে যাচ্ছে, তবু ধৈর্য ধরে সে সর্বাঙ্গীন ট্রেনিং নিতে রাজী হল। আলেক্সেই বুঝতে পারল তার যে অবস্থা তাতে পয়লা নম্বরের সার্টিফিকেট না পেলে চলবে না।

৯

ট্রেনিং-স্কুলে মাস পাঁচেকের বেশী রইল মেরেসিয়েভ। বিমানক্ষেত্র বরফে-ঢাকা, বিমানগুলোকে রাখা হয়েছে রানারে। হেমন্তের নানা উজ্জ্বল রং আর ছড়িয়ে নেই, "আকাশ-খণ্ডে" উঠলে শুধু দুটো রং চোখে পড়ে আলেক্সেই'র: শাদা আর কালো। স্তালিনগ্রাদে জার্মানদের চরম পরাজয়ের উত্তেজনামূলক খবর, জার্মান ষষ্ঠ বাহিনীর সর্বনাশ আর পওলাসের আত্মসমর্পণ অতীতের ব্যাপার এখন। দক্ষিণে ক্রমশ শক্তিলাভ করছে অভূতপূর্ব অদম্য আক্রমণাত্মক প্রতিঘাত। জার্মানদের লাইন ভেঙ্গেচুরে জেনারেল রতমিস্ত্রভের ট্যাঙ্ক-বাহিনী শত্রুপক্ষের পিছনে পৌঁছিয়ে ওদের বিধ্বস্ত করছে। ফ্রণ্টে চলেছে এ ধরনের ব্যাপার, প্রচণ্ড আকাশ-যুদ্ধ চলেছে ফ্রণ্টের উপর, এ সময়ে ছোট্ট তালিমি বিমানে ধৈর্য ধরে কিঁচ কিঁচ করে ওড়া আরো কঠিন মনে হয় আলেক্সেই"র; এর চেয়ে সহজ ছিল হাসপাতালের করিডর ধরে দিনের পর দিন বিরামহীন পায়চারি, কিম্বা স্ফীত, ব্যথায় জর্জর নুলো পায়ে মাজুরকা কিম্বা ফক্সট্রট নাচা।

কিন্তু হাসপাতালে থাকার সময়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল ও যে বিমান বাহিনীতে আবার কার্যক্ষম অবস্থায় ফিরে যাবে। লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছিল নিজের, আর দুঃখ কষ্ট শ্রান্তি ও হতাশা সত্ত্বেও চলেছে সে লক্ষ্যের দিকে। নতুন ঠিকানায় একদিন একটা মোটা খাম এল, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা পাঠিয়েছে সেটা। কয়েকটা চিঠি খামে, একটা ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার

নিজের, সে জিজ্ঞেস করেছে যে তার কী রকম চলেছে, কী সাফল্য অর্জন করেছে, তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে কি না।

"হয়েছে কি?" নিজেকে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই, কিন্তু উত্তর না দিয়ে চিঠিগুলো বাছাই করতে লাগল। কয়েকটা চিঠি; একটি মা'র, ওলিয়ার একটি, একটি লিখেছে গভজ্‌দেভ; আর একটা তাকে বিশেষভাবে বিস্মিত করল, ঠিকানাটা "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" লেখা, নিচে লেখা "ক্যাপ্টেন ক. কুকুশকিনের কাছ থেকে।" প্রথমে এই চিঠিটা পড়ল আলেক্সেই।

কুকুশকিন লিখেছে, তার বিমানকে শত্রুপক্ষ নামায়, গুলি লেগে আগুন ধরে যায় ওটাতে, পারাস্যুটে করে নিজের লাইনে কোনক্রমে নামে, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে হাত মচকে গিয়েছে। চিকিৎসা বিভাগে পড়ে আছে এখন, ওর ভাষায় "ডুস্‌দাতাদের ভব্য দলের সঙ্গে থেকে থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে"। যাই হোক, মাথা ঘামাচ্ছে না সে, তার দৃঢ় বিশ্বাস যে শীগগিরই আবার বিমান চালাতে পারবে। আরো লিখেছে যে চিঠিটা ডিক্টেট করছে আলেক্সেই'র অতি-পরিচিত পত্রদাতা ভেরা গাভ্রিলভা, আলেক্সেই'র কৃপায় বাহিনীতে তার "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" নামটা এখনো চালু। চিঠিতে এ কথাও জানিয়েছে যে ভেরা বেশ ভালো দোসর, তার দুরবস্থায় সেই প্রধান অবলম্বন। এখানটায় নিজের হয়ে লিখেছে ভেরা, লঘুবন্ধনীতে অবশ্যই, যে কস্তিয়া বাড়াবাড়ি করছে। চিঠিটা থেকে আলেক্সেই জানল যে বাহিনীর লোক এখনো তাকে মনে রেখেছে, মেসরুমে টাঙ্গানো বাহিনীর বীরেদের ছবির মধ্যে তার ছবিও রাখা হয়েছে, ওর প্রত্যাবর্তনের আশা এখনো ছেড়ে দেয়নি রক্ষীরা। রক্ষীরা! হেসে মাথা নাড়ল মেরেসিয়েভ। বাহিনীকে রক্ষীর পতাকা দানের মত উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা তাকে জানাতে ভুলে গিয়েছে, কুকুশকিন আর তার বিনাবেতনের সেক্রেটারী তাহলে অন্য কিছু একটা নিয়ে নিশ্চয়ই খুব বিভোর।

মায়ের চিঠিটা আলেক্সেই খুলল। বুড়ী মায়েরা গল্পচ্ছলে যেমন সাধারণত লেখে ঠিক সে রকম, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আর উৎকণ্ঠায় ভরা: কেমন চলেছে ওর, ঠাণ্ডা লাগছে না ত, যথেষ্ট খাবার পাচ্ছে কিনা, শীতের জামাকাপড় পেয়েছে কি, একজোড়া দস্তানা বুনে পাঠাবেন কি তিনি? ইতিমধ্যেই পাঁচজোড়া বুনেছেন তিনি, সোভিয়েত বাহিনীর লোকেদের উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকটি দস্তানার বুড়ো আঙুলের উপরে দিয়েছেন একটি নোট... "আশা করি এটাতে তোমার কুশল হবে।" একজোড়া

আলেক্সেই'র কাছে পৌঁছিয়েছে তিনি আশা করেন। নিজের খরগোসের লোম থেকে তৈরী ওগুলো, বেশ সুন্দর আর গরম। হ্যাঁ, তিনি বলতে ভুলে গিয়েছেন যে একটি খরগোস পরিবার এখন তাঁর হয়েছে, মন্দা আর মাদীর জোড়া, আর সাতটা বাচ্চা। শুধু উপসংহারে, বুড়িমা-সুলভ স্নেহময় বকবকানির পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে:

জার্মানদের স্তালিনগ্রাদ থেকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওদের অনেক অনেক লোক মারা গিয়েছে, আর লোকে এমন কি বলছে ওদের একজন চাঁই জেনারেল পর্যন্ত ধরা পড়েছে। জার্মানদের ভাগানোর পর পাঁচ দিনের ছুটিতে ওলিয়া কামিশিনে এসেছিল। তাঁর কাছে ছিল ওলিয়া, কেননা ওলিয়ার বাড়িটা বোমায় ভেঙ্গে যায়। ও এখন স্যাপারস্ বাহিনীতে লেফ্‌টেনাণ্ট। ঘাড়ে চোট লেগেছিল ওলিয়ার, ওকে সম্মান-চিহ্ন দেওয়া হয়: ঠিক কী সম্মান-চিহ্ন সেটা অবশ্য জানানো প্রয়োজন মনে করেননি বৃদ্ধা। যোগ করেছেন যে তাঁর কাছে থাকার সময়ে প্রায় সব সময়েই ওলিয়া ঘুমোত, আর না ঘুমোলে আলেক্সেই'র কথা বলত; তাস খেলে ভাগ্যপরীক্ষা করত দুজনে, প্রতিবার চিড়িতনের রাজার উপরে আসত রুইতনের রাণী। তার অর্থটা আলেক্সেই'র নিশ্চয়ই জানা আছে! নিজের কথা বলতে গেলে, লিখেছেন তিনি, ওই রুইতনের রাণীটির চেয়ে শ্রেয় পুত্রবধূ তিনি কামনা করেন না।

বৃদ্ধার সরল কূটবুদ্ধিতে হাসল আলেক্সেই. "রুইতনের রাণীর" চিঠির ছাই রঙের খামটা খুলল সযত্নে। চিঠিটা দীর্ঘ নয়। ওলিয়া লিখেছে "ট্রেঞ্চ" খোঁড়ার পর, তার শ্রম বাহিনীর সবচেয়ে ভালো কর্মীদের খাস বাহিনীর একটি স্যাপারস্ দলে নেওয়া হয়। ও এখন লেফ্‌টেনাণ্ট-টেকনিশ্যানের পদে। ওর দলই শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণের মধ্যে মামায়েভ কুরগানের সেই বিখ্যাত রক্ষাব্যূহ গড়ে। ট্র্যাক্টর কারখানার চারিদিকে রক্ষাব্যূহও তাদের কাজ, এর জন্য দলটিকে অর্ডার অব দি রেড ব্যানার দেওয়া হয়। ওলিয়া লিখেছে যে ওদের কঠিন সময় যাচ্ছে, সমস্ত কিছু, টিনের মাংস থেকে শাবল পর্যন্ত ভলগার ওপার থেকে আনতে হচ্ছে, ক্রমাগত মেসিনগানের গুলি পড়ছে সেখানে। আরো লিখেছে যে সহরে একটিও বাড়ি অটুট নেই, বড়ো বড়ো গর্তে মাটি ভরা, দেখে মনে হয় চাঁদের বড়ো-করা ফটোগ্রাফ।

ওলিয়া লিখেছে যে হাসপাতাল ছাড়ার পর ওকে আর অন্যদের একটা গাড়ি করে স্তালিনগ্রাদের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ও দেখে রাশি রাশি

ফ্যাশিস্টদের মৃতদেহ কবর দেবার জন্য জড়ো করা হয়েছে। তখনো অনেকে রাস্তায় পড়ে আছে! "তোমার বন্ধু ট্যাঙ্ক-অফিসারটি, কী নাম তার ভুলে গিয়েছি, ওই যে সে যার সমস্ত পরিবারকে ওরা খুন করে, যদি সে একবার এখানে এসে স্বচক্ষে দৃশ্যটা দেখত; সত্যি বলছি, এ সবকিছুর সিনেমা তুলে ওর মত লোকদের দেখানো উচিত! কী প্রতিশোধ আমরা নিয়েছি দেখুক ওরা!" শেষে লিখেছে — দুর্বোধ্য ছত্রটি কয়েকবার পড়ল আলেক্সেই — এখন স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধশেষে সে নিজেকে বীরের মত বীর আলেক্সেই'র উপযুক্ত মনে করে। চিঠিটা লেখা তাড়ায়, ট্রেন থামা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। কোথায় যাচ্ছে ও জানে না, তাই ডাকঘরের ঠিকানাটা ওকে জানাতে পারছে না। ফলে ওর পরের চিঠিটা না পাওয়া পর্যন্ত আলেক্সেই আর জানাতে পারবে না যে সত্যিকারের বীরাঙ্গনা হল ওলিয়া নিজেই, যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যিখানে যে ছোট পাতলা মেয়েটি অক্লান্তভাবে কাজ করে গিয়েছে, সে। আবার খামটা ঘুরিয়ে দেখল পত্রলেখিকার নামটা স্পষ্টভাবে লেখা: গার্ডস জুনিয়র-লেফ্টেনাণ্ট ওলগা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুহূর্তখানেকের অবসর মিললেই চিঠিটা বের করে আবার পড়ত আলেক্সেই, বিমানক্ষেতের কনকনে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়ায়, আর জমে-যাওয়া ক্লাসরুম "৯ক" ঘরে, যেটা এখনো তার আস্তানা, চিঠিটা অনেক দিন ধরে উষ্ণ রাখে তাকে।

শেষ পর্যন্ত ওর বিমান চালনার পরীক্ষার দিন ঠিক করল ইনস্ট্রাকটর নাউমভ। জঙ্গী-ট্রেনার বিমান চালাতে হবে তাকে, পরীক্ষাটা নেবে ইনস্ট্রাকটর নয়, স্কুলের চিফ অব স্টাফ স্বয়ং, বলিষ্ঠ শক্তসমর্থ লাল-মুখ সেই লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেলটি, যিনি পৌঁছবার দিনে তাকে খুব সাদর সম্ভাষণ জানাননি।

নিচে থেকে তাকে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে, অদৃষ্ট নির্ণয়ের সময় এসেছে, সেটা জেনে আলেক্সেই সেদিন নিজেকেও ছাড়িয়ে গেল। ছোট হালকা বিমানটিকে এত দক্ষতায় চালাল যে মুখর প্রশংসার ধ্বনি না করে পারলেন না লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেল। বিমান থেকে নেমে যখন গেল ওঁর কাছে তখন নাউমভের মুখের খাঁজে খাঁজে আনন্দ আর উত্তেজনার দীপ্তি দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে।

'চমৎকার! হ্যাঁ, যাকে আমি বলি জাত বৈমানিক, তুমি তাই,'

গরগরিয়ে উঠলেন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল। 'শোনো, ইনস্ট্রাকটর হিসেবে এখানে থাকতে চাও? তোমার মত লোক আমাদের দরকার।'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়াল মেরেসিয়েভ।

'তুমি দেখছি নেহাৎ বোকা! লড়তে যে-কেউ পারে, কিন্তু এখানে উড়তে শেখাতে তুমি!'

হঠাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলের চোখে পড়ল ছড়িটা, সেটাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেরেসিয়েভ, আর রাগে কালো হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'আবার!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'দাও আমাকে! ছড়ি হাতে পিকনিকে যাওয়া হচ্ছে নাকি! কোথায় আছ — বুলভারে?.. আদেশ অমান্য করার জন্যে আটকঘরে আটচল্লিশ ঘণ্টা... সেরা বৈমানিক বটে! কবচ নিয়ে ঘোরা হচ্ছে! এর পরে বিমানের গায়ে রুইতনের টেক্কা আঁকবে দেখছি! আটচল্লিশ ঘণ্টা! কী বলছি কানে গিয়েছে?'

ছড়িটা মেরেসিয়েভের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল ক্রুদ্ধভাবে চারিদিকে তাকালেন, কিছুতে ঠুকে যদি ভাঙ্গা যায়।

'কমরেড লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল, যদি আমাকে বলার অনুমতি দেন... ওর পায়ের পাতা নেই,' মাঝে পড়ে বলল ইনস্ট্রাকটর নাউমভ।

আরো কালো হয়ে গেল অধিকর্তার মুখ; চোখদুটো যেন ফেটে পড়ছে, শ্বাস পড়ছে ঘনঘন।

'তার মানে? আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছ না কি? যা শুনলাম তা সত্যি?'

মাথা নেড়ে মেরেসিয়েভ মূল্যবান ছড়িটির দিকে আড়চোখে তাকাল, ওটার মরণকাল এসে পড়েছে। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের উপহারটি বাস্তবিকই ইদানীং কখনো সঙ্গছাড়া করত না মেরেসিয়েভ।

বন্ধুদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল টেনে টেনে বললেন:

'আচ্ছা, সত্যিই যদি হয়... তাহলে, অবশ্য... দেখি তোমার পাদুটো... হুঁ!'

প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দিয়ে ট্রেনিং-স্কুল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল আলেক্সেইকে। তার অদ্ভুত সাফল্যের সবচেয়ে বেশী তারিফ করলেন, মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করলেন বদমেজাজী ঘাগী বৈমানিক সেই লেফ্‌টেনাণ্ট-

কর্ণেলটি। তিনি লিখলেন যে মেরেসিয়েভ "দক্ষ অভিজ্ঞ আর দৃঢ়চিত্ত বৈমানিক, বিমান বাহিনীর যে কোন শাখার উপযুক্ত।"

১০

উৎকর্ষ বাড়াবার একটি স্কুলে মেরেসিয়েভ বাকি শীত আর বসন্তের প্রথম ভাগটা কাটাল। স্থায়ী সামরিক বিমান স্কুল এটি, বিমানক্ষেত্রটি চমৎকার, খাসা থাকবার জায়গা, ক্লাব-ঘরটি উৎকৃষ্ট, সেখানে মস্কোর নানা থিয়েটার দল মাঝেমাঝে এসে অভিনয় করে। এই স্কুলেও বেশ ভিড়, কিন্তু প্রাক-যুদ্ধ সব আইনকানুন কড়াভাবে পালন করা হয়, এমন কি পোশাকের খুঁটিনাটির বিষয়েও সাবধানে থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের: বুট চকচকে নেই, কোট থেকে বোতাম একটা পড়ে গেছে, বেল্টের উপরে হয়ত তাড়াহুড়ো করে লাগানো হয়েছে মানচিত্রের কেস, দোষীকে কম্যাণ্ডাণ্টের হুকুমে দু ঘণ্টা কাওয়াজ করতে হত।

আলেক্সেই মেরেসিয়েভ একটি বড়ো দলে আছে, দলটি নতুন ধরনের একটি সোভিয়েত জঙ্গী বিমান — "লাভচ্‌কিন-৫" — চালানো শিখছে। শিক্ষা প্রণালীটি নিখুঁত, ইঞ্জিন এবং বিমানের অন্যান্য অংশের বিষয়েও জানতে হয়। বক্তৃতা শোনার সময়ে বাহিনী থেকে তার সংক্ষিপ্ত অনুপস্থিতির মধ্যে সোভিয়েত বিমান বিদ্যা কত দূর এগিয়ে গিয়েছে দেখে বিস্মিত হত আলেক্সেই। যুদ্ধের আগে যেটা মনে হত চমকপ্রদ আবিষ্কার সেটা এখন একেবারে সেকেলে। ক্ষিপ্র "সোয়ালো" আর হালকা, খুব উঁচুতে ওড়া "মিগ", যুদ্ধের শুরুতে যাদের একেবারে শেষ কথা মনে হত, তাদের এখন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের জায়গা নিচ্ছে নতুন ধরনের সব বিমান; অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে সোভিয়েত বিমান কারখানা এদের ব্যাপক নির্মাণ শুরু করে দেয়: একেবারে হালের নক্‌সার অত্যুৎকৃষ্ট "ইয়াক," চল হয়েছে "লাভচ্‌কিন-৫"এর, আর দুই-সিট "ইল" — উড়ন্ত ট্যাঙ্ক যেন, প্রায় মাটি ছুঁয়ে জার্মানদের উপরে গোলাগুলি বর্ষণ করে, আতঙ্কিত জার্মানরা ইতিমধ্যেই এর নাম দিয়েছে "কালো যম"। সংগ্রামী জনগণের প্রতিভা সৃষ্টি করছে নতুন সব বিমান, আকাশ-যুদ্ধের কায়দা জটিল হয়ে উঠেছে গুরুতরভাবে; যে বিমানটি চালানো হচ্ছে তার বিষয়ে জানাটাই এখন যথেষ্ট নয়, অদম্য সাহস ছাড়াও দরকার হাওয়ায় নিমেষে ঠিক ভারসাম্যে ফিরে

আসার, আকাশ-যুদ্ধকে খণ্ড খণ্ড ভাগে দেখার, আর নির্দেশের অপেক্ষা না করে, লড়ার সময়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেগুলোকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা।

এ সব অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু ফ্রণ্টে কোন ছাড়ান না দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চলেছে; উজ্জ্বল উঁচু ক্লাসরুমে কালো খাসা ডেস্কের সামনে বসে বক্তৃতা শুনতে শুনতে ফ্রণ্টে যাবার, ওখানকার আবহাওয়ায় গিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষায় আলেক্সেই'র বুক ভরে যেত। শারীরিক যন্ত্রণা কী করে জয় করতে হয় শিখেছে সে, অসাধ্যসাধন করতে বাধ্য করেছে নিজেকে, কিন্তু এই যে জোর করে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা, তার অবসাদ জয় করার মত মনোবল নেই তার। মাঝেমাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিরসমুখে অন্যমনস্কভাবে বদমেজাজে স্কুলে ঘুরে বেড়াত আলেক্সেই।

আলেক্সেই'র সৌভাগ্যবশত, স্কুলে একই সময়ে ছিল মেজর স্ত্রুচকভ। পুরোনো বন্ধুর মত দুজনে মেলে। আলেক্সেই'র দু সপ্তাহ পরে স্ত্রুচকভ আসে, কিন্তু কালবিলম্ব না করে স্কুলের জীবন গ্রহণ করল সে, যুদ্ধের সময়ে যে সব কড়া রীতিনীতি এত বেমানান মনে হত সবগুলোকে সাবধানে মানিয়ে চলল, প্রত্যেকের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ ভাব। আলেক্সেই'র মন খারাপের কারণটা চট করে সে আঁচ করল; রাত্রে বাথরুম থেকে শোবার ঘরে যাবার সময়ে আলেক্সেই'র পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে বলত:

'ও হে, আর শোক কোরো না! লড়াই ত আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না! দেখো না, বার্লিন এখনো কত দূরে! অনেক অনেক মাইল বাকি। আমাদের দিন আসবেই, ভাববার কিছু নেই। প্রাণভরে লড়াই করতে পারব আমরা।'

দু-তিন মাস ওদের সাক্ষাৎ হয়নি, এরি মধ্যে মেজর রোগা আর বুড়িয়ে গিয়েছে, বাহিনীর ভাষায়, মনে হচ্ছে ও "ভেঙ্গেচুরে" গিয়েছে।

শীতের মাঝামাঝি যে দলে মেরেসিয়েভ আর স্ত্রুচকভ ছিল সে দলটি বিমান চালানোয় তালিম নিতে শুরু করল। এতদিনে "লাভচ্‌কিন-৫"এর সবকিছু জানা হয়ে গিয়েছে আলেক্সেই'র, ছোট খাটো-ডানা বিমানটি, চেহারাটা উড়ন্ত মাছের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রায়ই, বিরতির সময়ে বিমানক্ষেত্রে গিয়ে আলেক্সেই দেখত মাটিতে সংক্ষিপ্ত দৌড়ের পর খাড়া হয়ে আকাশে উঠছে বিমানগুলো, ঘোরার সময় সূর্যের আলোয় ঝিক ঝিক করে ওঠে ওদের নীলচে পেটগুলো। একটা বিমানের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করত সেটাকে, ডানাতে আর পাশে টোকা মারত, যেন জিনিসটা যন্ত্র নয়, সুন্দর ফিটফাট জাতঘোড়া একটা। অবশেষে সার বেঁধে দলটি দাঁড়াত, রওনা হতে

হবে এবার। প্রত্যেকেই ব্যগ্র নিজের দক্ষতা পরখ করতে, প্রথমে কে উঠবে তাই নিয়ে অল্প বাগবিতণ্ডা শুরু হত। স্ত্রুচকভকে প্রথমে ডাকল ইনস্ট্রাকটর। দীপ্ত হয়ে উঠল তার মুখ, চতুরভাবে হাসল, উত্তেজনায় শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পারাস্যুট এ'টে ককপিটের ঢাকনাটা টেনে দিল সে।

গর্জিয়ে উঠল ইঞ্জিন, বিমানক্ষেত হয়ে তীরের মত গেল বিমানটা, সূর্যালোকে রামধনুর মত ঝিকঝিকে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের রেশ পিছনে রেখে এক নিমেষে আকাশে উঠল, আলোয় ঝকঝক করছে ডানাদুটো। বিমানক্ষেতের উপরে অপরিসর বক্র রেখা আঁকল স্ত্রুচকভ, সুন্দরভাবে হেলল কয়েকবার, উল্টে গেল তারপর, আর নির্দিষ্ট সংখ্যা কসরৎ দেখিয়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে, হঠাৎ স্কুলের ছাতের উপর থেকে তীরের মত বেরিয়ে এসে, ইঞ্জিনের গর্জনে, বিমানক্ষেতের উপর দিয়ে এক ঝটকায় আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, প্রতীক্ষারত শিক্ষার্থীদের টুপি আর একটু হলে উড়ে যেত। যাই হোক, শীগগিরই ফিরে এল সে, ধীরেসুস্থে নিচের দিকে এসে সুকৌশলে নামল। ককপিট থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল সে, উত্তেজিত উচ্চকিত আনন্দে অধীর, দুষ্টুমিতে সফল খুসি ছোকরার মত।

'যন্ত্র নয় এটা, নিছক ভায়োলিন, সত্যি বলছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে বলল স্ত্রুচকভ, বেপরোয়াভাবে চালানোর জন্য ইনস্ট্রাকটরের বকবকানির বাধা দিয়ে। 'ওটাতে চাইকভস্কির সুর বাজানো যায়, সত্যি বলছি!' বলিষ্ঠ হাতে মেরেসিয়েভকে জড়িয়ে বলে উঠল, 'বেচে থাকা ভালো, আলিওশা!'

সত্যি অদ্ভুত ভালো বিমানটি। সে বিষয়ে সবাই একমত। মেরেসিয়েভের পালা এল। পাদানিতে পা বেঁধে শূন্যে উঠল সে, আর হঠাৎ মনে হল এই ঘোড়াটি ওর পক্ষে বড়ো বেশী তেজী, পা নেই তার, অতি সাবধানে চালাতে হবে। উপরে ওঠবার সময়ে যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগের সেই পরিপূর্ণ চমৎকার অনুভূতিটি, যেটা বিমান চালানোর আনন্দের উৎস, অনুভব করেনি সে। বিমানটি চমৎকারভাবে গঠিত। প্রতিটি সঞ্চালনে স্টিয়ারিং গিয়ারে হাতের স্বল্প স্পন্দনে সাড়া দিয়েই তক্ষুণি যথাযথভাবে যায়। সুরে-বাঁধা ভায়োলিনের মতই ওটার সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। আর এটাতেই তার চরম লোকসানের কথাটা তীব্রভাবে অনুভব করল আলেক্সেই, নকল পায়ের পাতায় সাড়া দেবার ক্ষমতা নেই: ও বুঝতে পারল যে এ-রকম একটা বিমানে নকল পায়ের পাতা, তা যতই ভালোভাবে বানানো হোক না কেন, যতই না অভ্যেস করা হোক, কখনোই আসল জীবন্ত নমনীয় পায়ের অভাব পূর্ণ করতে পারে না।

সহজে অবলীলাক্রমে হাওয়া কেটে চলেছে বিমানটি, স্টিয়ারিং-গিয়ারের প্রতিটি নড়নে সাড়া দিচ্ছে, কিন্তু বিমানটিকে ভয় হচ্ছে আলেক্সেই'র। লক্ষ্য করল যে ঘোরার সময়ে পায়ের পাতা ঠিক সময়ে পড়ছে না, যে সুষম সমন্বয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত বৈমানিকদের আয়ত্তাধীন হয়, সে ভাবটা আসছে না। দেরীর জন্য হঠাৎ ঘুরপাকে পড়তে পারে বিমানটা, সেটা হতে পারে মারাত্মক। নিজেকে পা বাঁধা ঘোড়ার মত মনে হল আলেক্সেই'র। ভীরু সে নয়, মৃত্যুর ভয় করে না, ওঠবার সময়ে পারাস্যুটটা ঠিক আছে কিনা সেটা পর্যন্ত দেখেনি; কিন্তু ওর আশঙ্কা যে সামান্য ভুল করলেও বিমান বাহিনী থেকে হয়ত সরিয়ে দেবে, তার প্রিয় কাজ আর কখনো করতে পারবে না। তাই অত্যন্ত সাবধানে চালাল সে, আর বিমানটি নামাবার সময়ে মুষড়ে পড়ল; সাড়াবিহীন পায়ের পাতার জন্য এত অপটুভাবে নামাল যে বিমানটি বরফের উপরে কয়েকবার বেঢপভাবে লাফাল।

দ্রুকুটিকুটিল মুখে নিঃশব্দে ককপিট থেকে নামল আলেক্সেই। অস্বস্তি গোপন করে ওর বন্ধুরা, ইনস্ট্রাকটরটি পর্যন্ত, ওকে প্রশংসা করল আর অভিনন্দন জানাল, কিন্তু ওদের অনুগ্রহের ভাবে অপমান বোধ করল আলেক্সেই! হাত অধীরভাবে নেড়ে পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে বরফের উপর দিয়ে চলল ধূসর স্কুল বাড়িটার দিকে। জঙ্গী বিমান এতদিন পরে চেপে বিফল হওয়া! মার্চের সেই সকালে চোট-খাওয়া বিমানটি পাইনগাছের মাথায় পড়ার সেই সর্বনেশে দুর্ঘটনার পর সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত এটা। মধ্যাহ্ন-ভোজনে গেল না সেদিন, রাত্রের শেষ খানায় অনুপস্থিত রইল। স্কুলের বিধিতে দিনের বেলায় শয়নাগারে থাকা শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে বারণ, সে বিধির খেলাপ করে বুটশুদ্ধ ও বিছানায় শুয়ে রইল, হাতে মাথা রেখে। ওর ব্যথার কথা জানত যারা, কি ভারপ্রাপ্ত অফিসার কি কর্তারা পাশ দিয়ে যাবার সময়ে কিছু বলল না ওকে। স্ত্রুচকভ একবার এসে কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু সাড়া না পেয়ে সমব্যথায় মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

ঘর ছেড়ে স্ত্রুচকভ চলে যাবার প্রায় পরমুহূর্তেই এলেন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল কাপুস্তিন, স্কুলের রাজনৈতিক অফিসার তিনি। খর্বদেহ কুৎসিৎ চেহারার লোক, চোখে মোটা চশমা, বেমানান ইউনিফর্ম থলের মত শরীর থেকে ঝুলে পড়েছে। আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা নিয়ে ওঁর বক্তৃতা শুনতে শিক্ষার্থীরা ভালোবাসে, সে সময়ে এই বেঢপ চেহারার মানুষটি ওদের মনে গর্ব জাগাত যে এই মহাযুদ্ধের অংশীদার তারা। কিন্তু অফিসার হিসেবে

তাঁর সম্বন্ধে উঁচু ধারণা ছিল না ওদের, মনে করত বেসামরিক লোক একটি, বিমানবিদ্যা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, দৈবক্রমে ঢুকে পড়েছেন বিমান বাহিনীতে। মেরেসিয়েভকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাপুস্তিন ঘরের চারিদিকে একবার তাকালেন, জোরে ঘ্রাণ নিয়ে চটে উঠে হঠাৎ বলে উঠলেন:

'কোন বেটা সিগারেট খেয়েছে এখানে? ধূমপানের জন্যে ত আলাদা ঘর আছে। এটার মানে কী, কমরেড সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট?'

'আমি সিগারেট খাই না,' বিছানা থেকে না উঠে নিস্পৃহভাবে জবাব দিল আলেক্সেই।

'আপনি এখানে শুয়ে আছেন কেন? স্কুলের নিয়ম কি জানেন না? ঊর্ধ্বতন কেউ এলে উঠে দাঁড়ান না কেন?.. উঠে দাঁড়ান।'

আদেশ করেননি তিনি। বরঞ্চ, বেসামরিক লোকের মত শিষ্টভাবে কথাটা বলা হয়েছিল। মেরেসিয়েভ অবসন্নভাবে কথাটা মেনে উঠে খাটের পাশে দাঁড়াল।

'বেশ, বেশ, কমরেড সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট,' উৎসাহ দিয়ে বললেন কাপুস্তিন। 'এবারে বসুন, কথা আছে।'

'কী বিষয়ে?'

'আপনার বিষয়ে। চলুন বাইরে যাই। পাইপ খেতে চাই, এখানে সেটা বারণ।'

স্বল্পালোকিত করিডরে গিয়ে জানলার কাছে দুজনে দাঁড়াল. ব্ল্যাক-আউটের জন্য ইলেকট্রিক বালবগুলোয় নীল রং-দেওয়া। পাইপে টান দিচ্ছেন কাপুস্তিন, প্রতিটি টানে চওড়া চিন্তাকুল মুখ আলো হয়ে উঠছে।

'আপনার ইনস্ট্রাকটরকে বকতে চাই আমি,' তিনি বললেন।

'কেন?'

'উপরওয়ালাদের অনুমতি বিনা আপনাকে উড়তে দেওয়ার জন্যে... ওরকমভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? সত্যি কথা বলতে, আপনার সঙ্গে আগে কথা না বলার জন্যে আমাকেই বকা উচিত। আমার সময় হয় না, সব সময়ে ব্যস্ত থাকি। আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু... যা থেকে, ও কথাটা ছেড়ে দেওয়া যাক। শুনুন, মেরেসিয়েভ, আপনার পক্ষে বিমান চালানো খুব সহজ ব্যাপার নয়, আর তাই ঠিক করেছি ইনস্ট্রাকটরকে উচিত শাস্তি দেব।'

কিছু বলল না আলেক্সেই। কী ধরনের লোক পাইপ টানছে ভাবল। স্কুলের জীবনে অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে, সেটা তাঁকে না বলায় ওঁর

আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে বিরক্ত একটি আমলাতান্ত্রিক জীব? বৈমানিকদের বাছাই করা হয় যে সব নিয়মাবলী অনুসরণ করে, শারীরিক অক্ষমতার জন্য বিমান চালানো নিষিদ্ধ করা একটি বিধি তাতে আছে, সেটা কি আবিষ্কার করেছেন এই ক্ষুদে অফিসারটি? কিম্বা নিজের আধিপত্য দেখাবার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত কোন খামখেয়ালী লোক? কী চান উনি? মেরেসিয়েভ এমনিতেই দারুণ মুষড়ে গিয়েছে, নিজের গলায় দড়ি দেবার মত অবস্থা, এ সময়ে ঝট করে কেন এসেছেন?..

মনটা তার একেবারে বিষিয়ে উঠেছে, কিন্তু অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করল আলেক্সেই। অনেক দিনের দুর্ভোগ তাড়াতাড়ি কোন অনুমানে না আসতে তাকে শিখিয়েছে। তা ছাড়া এই কুৎসিৎ মানুষটির মধ্যে একটা কিছু আছে যেটা তাকে ক্ষণিকের জন্য মনে করিয়ে দিল কমিসার ভরোবিওভের কথা, যাকে মেরেসিয়েভ বলত মানুষের মত মানুষ। কাপুস্তিনের পাইপের আগুন জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে, নীলচে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে তার চওড়া মুখ, মেদল নাক, আর প্রাজ্ঞ তীক্ষ্ণ চোখ। তিনি বলে চললেন:

'শুনুন, মেরেসিয়েভ। আপনাকে সাধুবাদ করছি না কিন্তু যাই বলুন না কেন, সারা দুনিয়াতে আপনিই একমাত্র লোক যে বিনা পায়ে জঙ্গী বিমান চালাতে পারে। একমাত্র লোক!' পাইপের নলটা ঘুরিয়ে বের করে ফুটো দিয়ে একটা বালবের ক্ষীণ আলোর দিকে তাকালেন তিনি, মাথা নাড়লেন বিরতভাবে। "লড়াই"এর দলে আপনার ফিরে যাবার ইচ্ছের কথা বলছি না। ওটা বীরের মত কাজ নিশ্চয়ই, কিন্তু এমন বিশেষ কিছু নয়। যা সময় পড়েছে, সবাই জয়লাভের জন্যে যথাসাধ্য করতে চায়... হতচ্ছাড়া পাইপটার কী হল?'

পাইপের নলটি আবার পরিষ্কার করা শুরু হল, মনে হল কাজটায় একেবারে মগ্ন তিনি; কিন্তু ভাবী অমঙ্গলের অস্পষ্ট বোধে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আলেক্সেই কাপুস্তিনের বক্তব্য শোনার জন্য উদগ্রীব। পাইপ নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি বলে চললেন, কথাগুলোয় কী প্রতিক্রিয়া হবে সে বিষয়ে উদাসীন যেন:

'এটা শুধু সিনিয়র লেফটেনান্ট আলেক্সেই মেরেসিয়েভের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। কথাটা হল এই, আপনার পায়ের পাতা নেই, আপনি যে জিনিসটা আয়ত্ত করেছেন সেটা এত কাল সারা পৃথিবী ভাবত শুধু সম্পূর্ণ

সুস্থ মানুষই পারে, তাও এক শ'র মধ্যে একজন। আপনি শুধু নাগরিক মেরেসিয়েভ নন, বিরাট পরীক্ষা চালিয়েছেন আপনি... যা হোক, এতক্ষণে এটা আবার ঠিক হয়েছে দেখছি, নিশ্চয় কিছু একটা নলটাতে আটকিয়েছিল... আর তাই বলছি, আপনাকে সাধারণ বৈমানিক হিসেবে নিতে আমরা পারিনি, নেবার কোন অধিকার নেই আমাদের, বুঝেছেন? গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষার অবতারণা করেছেন আপনি, যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু কী ভাবে? সেটা আপনাকেই বলতে হবে। আপনাকে কী ভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি?'

পাইপে আবার তামাক ভরিয়ে ধরানো হল, আবার কখনো দীপ্ত, কখনো অদৃশ্য লাল আভায় ওঁর চওড়া মুখ আর মেদল নাক অন্ধকার ভেদ করে দেখা যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

তিনি কথা দিলেন যে স্কুলের অধিকর্তার সঙ্গে কথা বলে মেরেসিয়েভের জন্য অতিরিক্ত ওড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন, আর বললেন নিজের জন্য একটি তালিমি কর্মসূচী আলেক্সেই ঠিক করে নিলে ভালো হয়।

'কিন্তু তাতে ত অনেক বেশী পেট্রল লাগবে!' অনুশোচনার সুরে বলল আলেক্সেই; কী সহজভাবে এই খর্বদেহ কুৎসিৎ চেহারার লোকটি তার সমস্ত সন্দেহের অবসান করে দিয়েছেন তাতে অবাক হয়ে গিয়েছে ও।

'পেট্রল খুব দামী জিনিস অবশ্য, বিশেষ করে এ সময়ে। আমরা ত টিপে টিপে পেট্রল দিই। কিন্তু পেট্রলের চেয়েও দামী জিনিস আছে,' উত্তর দিলেন কাপুস্তিন, আর পাইপের ছাই জুতোর গোড়ালিতে সযত্নে ঠুকে বের করলেন।

পরের দিন আলাদাভাবে শিখতে শুরু করল মেরেসিয়েভ। আর সেটা করল হাঁটা, দৌড়, আর নাচ যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অভ্যেস করেছিল শুধু সেভাবে নয়, অনুপ্রাণিতের মত। বিমান চালানোর কৌশল, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল সে, ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করে দেখল রীতিটাকে, প্রত্যেকটি আলাদা করে আয়ত্তে আনার প্রয়াস করল। যৌবনে যেটা সহজাতভাবে শিখেছিল, সেটার অধ্যয়ন, হ্যাঁ অধ্যয়ন শুরু হল। আগে যেটা অনুশীলন আর অভ্যাস দ্বারা শিখেছিল সেটা বুদ্ধির সাহায্যে আয়ত্তে আনল এবার। বিমান চালানোর পদ্ধতিকে মনে মনে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে, প্রত্যেকটির কসরৎ বিশেষভাবে শিখে নিল, আর পায়ের পাতার সব অনুভূতি চালান করল গাঁটে।

অত্যন্ত কঠিন আর ধৈর্যসাপেক্ষ কাজটা, ফলাফল এত সূক্ষ্ম যে নজরে প্রায় পড়ে না। যাই হোক, প্রতিবার ওড়ার সময়ে ওর অনুভূতি হতে লাগল যে বিমানটি শরীরের অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আরো শুনছে ওর কথা।

'কেমন চলেছে, ওস্তাদ?' দেখা হলেই জিজ্ঞেস করত কাপুস্তিন।

উত্তরে বুড়ো আঙুল তুলে দেখাত মেরেসিয়েভ। অত্যুক্তি নয় সেটা। কাজ এগোচ্ছে, মন্থরভাবে হয়ত, কিন্তু এগোচ্ছে যে সেটা নিশ্চিত। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, বিমানে উঠে তেজী ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ায় চাপা দুর্বল সওয়ারের মত আর মনে হয় না নিজেকে। নিজের দক্ষতায় বিশ্বাস আবার ফিরে এল, সে বিশ্বাসটা যেন সংক্রামিত হল বিমানেও, আর সেটা জীবন্ত সত্তার মত, দক্ষ সওয়ারের হাতে ঘোড়ার মত আরো বাধ্য হল, আস্তে আস্তে নিজের সমস্ত গুণ উন্মুক্ত করে দিল আলেক্সেই'র কাছে।

১১

অনেক দিন আগে বাল্যকালে ভলগার খাঁড়িতে প্রথম মসৃণ স্বচ্ছ বরফের উপরে স্কেট করা শিখতে বেরিয়েছিল আলেক্সেই। প্রকৃতপক্ষে স্কেট ছিল না ওর; একজোড়া কিনে দেবার সামর্থ্য ছিল না মায়ের। একজন কামারের জামাকাপড় ধুয়ে দিতেন তিনি, তাঁর অনুরোধে একজোড়া ছোট কাঠের কুঁদো বানিয়ে দিয়েছিল সে, নিচে ধাতুর ফালি, পাশে ছেঁদা।

দড়ি আর কাঠের টুকরোর সাহায্যে কুঁদোদুটো তালি-দেওয়া পুরোনো ফেল্টের বুটে লাগায় আলেক্সেই। তারপরে গেল নদীতীরে। পাতলা নরম বরফে মিঠে মচমচ শব্দ। কামিশিনের কাছাকাছি যে সব বাচ্চারা থাকত সবাই আনন্দে হট্টগোল করে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে, ক্ষুদে শয়তানের মত তীরের মত চলেছে, এ-ওকে ধাওয়া করছে, স্কেটে ভর দিয়ে লাফাচ্ছে আর নাচছে। ওদের কসরৎ আপাতসহজ, কিন্তু বরফে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল বরফটা পিছলে গেল আর চিৎ হয়ে পড়ে গেল আলেক্সেই।

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল, খেলার সঙ্গীরা যদি দেখে ফেলে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে সেই ভয় তার। আবার চেষ্টা করল স্কেট করতে, যাতে চিৎ হয়ে না পড়ে তার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে, কিন্তু এবার পড়ল নাক বরাবর। আবার তাড়াতাড়ি উঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, পাদুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, কেন পড়ে যাচ্ছে ভাববার চেষ্টা করে অন্য ছেলেরা কী ভাবে স্কেট করছে

চেয়ে চেয়ে দেখল। এবারে বুঝল যে সামনে কিম্বা পিছনে বেশী ঝুঁকলে চলবে না। খাড়া হয়ে থাকার চেষ্টা করে, পাশাপাশি পা ফেলল কয়েকবার, এবার একপাশে পড়ল সে। আর চলল পড়া, আবার ওঠা, আবার পড়া, আবার ওঠা, সূর্যাস্ত পর্যন্ত; বাড়ি যখন ফিরল তখন বিরক্তিতে মা দেখলেন ছেলের সারা গায়ে বরফ, ক্লান্তিতে পা তার কাঁপছে।

পরের দিন সকালে আবার আলেক্সেই গেল রিংকে। এবারে তার গতি আরো সহজ, আগেকার মত বারবার পড়ছে না, এক দৌড়ে কয়েক মিটার পর্যন্ত যেতে পারছে; কিন্তু ওই পর্যন্ত, প্রদোষ হয়ে এল, তখনো তার বেশী অগ্রসর হতে পারল না।

কিন্তু একদিন — দিনটার কথা সে কখনো ভোলেনি, কনকনে দিন, ঝোড়ো হাওয়া চকচকে তুষারের উপরে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে — দৌড় শুরু করল সে, আর অবাক হয়ে দেখল যে বেশ এগিয়ে যাচ্ছে, যত মোড় নিচ্ছে তত দ্রুতগতিতে স্বচ্ছন্দে। আগে পড়েছে, চোট খেয়েছে, উঠে আবার চেষ্টা করেছে, সে সময়ে অলক্ষিতে অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতা, ছোটখাটো যত অভ্যাস আর চাল মনে হল হঠাৎ এক হয়ে গিয়েছে, পা আর পায়ের পাতা ভালোভাবে পড়ছে, মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর আর বালকসুলভ, কৌতুকপ্রিয় একগুঁয়ে সত্তা তার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, প্রীতিকর আত্মবিশ্বাসে ভরে যাচ্ছে।

ঠিক এরকমটি তার ঘটল এখন। দৃঢ় অধ্যবসায়ে বিমান চালাল অনেক বার, বিমানটার সঙ্গে মিশে একাকার হবার প্রচেষ্টায়, নকল পায়ের পাতার ধাতু আর চামড়া ভেদ করে ওটিকে অনুভব করার ইচ্ছায়। মাঝেমাঝে মনে হত চেষ্টাটা সফল হচ্ছে, দারুণ খুসি হয়ে উঠত ও। একটা কসরৎ করার চেষ্টা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোধ হল চালটায় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটেছে, মনে হল বিমানটা ভীত, হাতছাড়া হবার চেষ্টা করছে। আর আশাভঙ্গের বিস্বাদ মুখে আলেক্সেই আবার রুটিন মাফিক বিরস চর্চা শুরু করত।

মার্চের একটি বরফ-গলা দিনে একটি সকালের মধ্যেই বিমানক্ষেতের তুষার কালো হয়ে বসে গেল, ফুঁয়ো ফুঁয়ো বরফে বিমানের চাকায় গভীর দাগ পড়ছিল; আলেক্সেই তার জঙ্গী বিমানে আকাশে উঠল। ওঠবার সময় পাশ থেকে হাওয়া গতিপথ থেকে হটিয়ে দিচ্ছে বিমানটাকে, বাধ্য হয়ে আলেক্সেই চেষ্টা করল সেটা যাতে না হয়। গতিপথে বিমানটাকে ফিরিয়ে আনবার সময়ে হঠাৎ বোধ হল ওটা তার বশ মেনেছে, সমস্ত সত্তা দিয়ে সে অনুভব

করতে পারে ওটাকে। অনুভূতিটা বিদ্যুৎ ঝলকের মত, প্রথমে বিশ্বাস হল না। এতবার নিরাশ হয়েছে যে বিশ্বাস করা শক্ত যে এখন তার কপাল খুলেছে। এক ঝটকায় ডাইনে ঘোরালো বিমানটাকে আলেক্সেই, নিখুঁত ও বাধ্যভাবে ওটা মোড় নিল। ভলগার সেই ছোট্ট খাড়িতে কালো খরখরে বরফের উপরে বাল্যকালের ঠিক সেই অনুভূতিটা ফিরে এল। মনে হল ধূসর দিন আলো হয়ে উঠেছে। আনন্দে বুক ঢিপঢিপ করছে, ভাবাবেগে গলা প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

তালিম নেবার অক্লান্ত প্রচেষ্টার সমস্ত ফলাফলের পরখ হল অলক্ষ্য একটি লাইনে। অতিক্রম করেছে সে লাইনটা, আর সেই সব কঠিন পরিশ্রমের দিনগুলোর ফলাফল আজ অনায়াসে বিনা ক্লেশে ভোগ করছে সে। যে মূল জিনিসটি অনেক দিন নিষ্ফলভাবে পেতে চেয়েছিল সেটা আজ হাতের মুঠোয়: বিমানটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিবোধ এসেছে, মনে হচ্ছে ওটা নিজের শরীরেরই বিস্তৃতি। এমন কি অসাড় কঠিন নকল পায়ের পাতাদুটো পর্যন্ত বাধা দিচ্ছে না সে অনুভূতিতে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সচকিত আলেক্সেই কয়েকবার ক্ষিপ্রভাবে মোড় নিল, তারপর বৃত্তাকারে নেমে উপরে ওঠা, সেটা সম্পূর্ণ হতে না হতেই বিমানটিকে ঘূরপাকে ফেলল। শিস দিয়ে সজোরে পাক দিচ্ছে জমি। অবিরত বৃত্তে একাকার হয়ে গিয়েছে বিমানক্ষেত স্কুলের বাড়ি আর আবহাওয়া কেন্দ্রটির পাশে ডোরাকাটা ফেঁপে ওঠা উড়ন্ত থলিটা। পাকা হাতে ঘূরপাক ক্ষান্ত করে আলেক্সেই সংকীর্ণ বৃত্তে নেমে আবার উপরে উঠল। আর শুধু এখনি ওর কাছে ধরা পড়ল বিখ্যাত "লাভচ্কিন-৫"এর সমস্ত জানা এবং অজানা গুণাবলী। অভিজ্ঞ হাতে কী চমৎকার চলে বিমানটি! স্টিয়ারিং-গিয়ারের প্রতিটি সঞ্চালনে দ্রুত সাড়া দেয়, জটিল সব কসরৎ অবলীলাক্রমে করে, উপরে ওঠে রকেটের মত, সংহত চটপটে ক্ষিপ্র।

টলতে টলতে মাতালের মত ককপিট থেকে নামল আলেক্সেই, বোকার হাসিতে বদন বিস্তৃত। চোখে পড়ল না ক্রুদ্ধ ইনস্ট্রাকটরটিকে, কানে গেল না তার বকুনি। বকতে দাও ওকে! আটক ঘর? বহুৎ আচ্ছা, আটক ঘরে এক প্রস্থ থেকে আসতে সে তৈয়ার। কী এসে যায় তাতে? একটা জিনিস জলের মত স্পষ্ট এখন: বৈমানিক সে, সুদক্ষ একজন বৈমানিক। শিক্ষার জন্য যে অতিরিক্ত পেট্রল খরচ করা হয়েছে বৃথায় যায়নি সেটা। সে ঋণ শোধ করবে সে অনেক মোটা সুদে যদি ওরা শুধু লড়াই'এ ফিরে যেতে দেয় তোকে!

আস্তানায় ওর জন্য অপেক্ষা করছিল আর একটি সুখের ব্যাপার: বালিশের উপরে দেখল গভজ্‌দেভের চিঠি। গন্তব্যে আসার আগে কোথায় কত দিন আর কার পকেটে ঘোরাফেরা করে ওটা বলা কঠিন, খামটা কুঁচকে গিয়েছে, তেলের দাগ মাখা। তাই খাসা নতুন খামে পুরে চিঠিটা আনিউতা পাঠিয়েছে।

ট্যাঙ্ক-অফিসার জানিয়েছে বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার তার ঘটেছে। একটা জার্মান বিমানের ডানায় তার মাথায় চোট লাগে! বাহিনীর হাসপাতালে এখন সে, যদিও দুএকদিনের মধ্যে ছাড়া পাবে নিশ্চয়। অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে এইভাবে। জার্মান ষষ্ঠ বাহিনী স্তালিনগ্রাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ঘেরাও হবার পরে পিছু-হটা জার্মানদের লাইন ভেদ করে গভজ্‌দেভের ট্যাঙ্ক-বাহিনী স্তেপ হয়ে ওদের পিছনে গিয়ে পড়ে; সে হামলায় একটি ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়নের ভার ছিল তার হাতে।

হামলাটি দারুণ! বিনামেঘে বজ্রপাতের মত সেই ইস্পাত বাহিনী জার্মানদের পিছনে, গড়বন্দী গ্রামে আর রেলওয়ে জংসনে ফেটে পড়ে। রাস্তায় আক্রমণ করে ট্যাঙ্কগুলো সামনে এসে-পড়া সৈন্যদের গুলি করে, পিষে দেয়, আর রক্ষী জার্মানদলের অবশিষ্টাংশ পালিয়ে গেলে ট্যাঙ্ক আর মোটরচালিত পদাতিক বাহিনী -- তারা ট্যাঙ্ক চেপে যাচ্ছিল — গোলাবারুদের ঘাঁটি, সেতু, টানা রেল আর জংসন উড়িয়ে দেয়, ফলে পিছু-হটা জার্মানদের ট্রেনগুলো আটকা পড়ে। শত্রুপক্ষের রসদ থেকে পেট্রল আর খাবার নিয়ে আবার তারা এগিয়ে গেল, যাতে জার্মানরা সামলে নেবার সময় না পায়, কিম্বা অন্তত হদিশ না পায় ট্যাঙ্কগুলো এর পরে কোন দিকে যাবে।

“বুদিওনির অশ্বারোহী বাহিনীর মত খরগতিতে স্তেপ হয়ে আমরা এগোলাম, আলিওশা! আর ফ্যাশিস্টদের কী নাজেহালটাই না হল! বিশ্বেস করবে না, মাঝেমাঝে তিনটে ট্যাঙ্ক আর জার্মানদের সাঁজোয়া গাড়ি একটা নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আর রসদ-ঘাঁটি দখল করলাম। যুদ্ধে, আলিওশা, আতঙ্কিত হয়ে যাওয়াটা বড়ো একটা ব্যাপার। শত্রুপক্ষের ঘাবড়ে যাওয়াটা আক্রমণকারীদের কাছে দুটো পুরো ডিভিশনের সামিল। শুধু কৌশলে জিইয়ে রাখতে হয় সে আতঙ্ক, অনেকটা তাঁবুর আগুনের মত; ইন্ধন — অপ্রত্যাশিত নানা আঘাত, অবিরত যোগাতে হয়, যাতে ওটা মিইয়ে না যায়। জার্মানদের লোহার খোলস ভেদ করে আমরা দেখলাম ভিতরটা অসার নাড়িভূঁড়িতে ঠাসা, আর কিছু নেই। ছুরিতে মাখন কাটার মত অনায়াসে আমরা ওদের ভেদ করে এগিয়ে গেলাম...

"...আর বোকার মত যেটা আমার হল সেটা ঘটল এই ভাবে। আমাদের প্রধান আমাদের এক সঙ্গে ডেকে জানালেন যে খবর-নেওয়া একটা বিমান থেকে বার্তা এসেছে যে অমুক জায়গায় বেশ বড়ো একটি বিমান-ঘাঁটি আছে, প্রায় তিনশ বিমান, তেল আর রসদ। খুসিতে গোঁফ মুচড়ে বললেন, 'গভজ্‌দেভ আজ রাত্রে ওখানে চলে যাও। চুপিচুপি যেও, গুলি ছুঁড়ো না যেন, এমন ভাবে যেও যেন জার্মান তোমরা, আর বেশ কাছে এসে পড়লে ঝট করে ওদের উপরে গিয়ে পড়বে, সমস্ত কামান এক সঙ্গে ছেড়ো, ওরা কিছু জানার আগে সব লণ্ডভণ্ড করে দিও; আর দেখো একটাও হারামজাদা পালাতে না পারে যেন।' আমার ব্যাটেলিয়নের উপরে ভারটা পড়ল, আর একটা ব্যাটেলিয়নের ভারও আমাকে দেওয়া হল। বাকি সবাই গেল রস্তোভের দিকে।

"মুরগীর খাঁচায় শেয়ালের মত আমরা বিমান-ঘাঁটিতে পেঁছিলাম। বিশ্বেস করবে না, আলিওশা, ঘাঁটির কাছে ট্র্যাফিক যারা নিয়ন্ত্রণ করছে একেবারে তাদের কাছে পর্যন্ত সটান গেলাম। কেউ থামাল না আমাদের --- কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, কিছু দেখতে পায়নি ওরা, শুধু ইঞ্জিনের শব্দ আর চাকার ঘর্ঘর কানে গিয়েছে। ভেবেছিল আমরা জার্মান। তারপর আমরা লণ্ডভণ্ড শুরু করলাম! মজার ব্যাপার, আলিওশা! সারি সারি দাঁড়ানো বিমানগুলো। লৌহাবরণ ভেদকারী গোলা ছুঁড়লাম আমরা, আর প্রত্যেকটা গোলা অন্তত ছটা বিমান ভেদ করে গেল। কিন্তু বুঝলাম কাজটা ঠিক এ ভাবে সম্পন্ন হবে না; বৈমানিকদের কয়েকজন, সাহসী তারা, ইঞ্জিন চালাতে শুরু করল। ট্যাঙ্কের ঢাকনা বন্ধ করে বিমানগুলোর পিছন দিকে আমরা ধাক্কা দিতে লাগলাম। যানবাহনের বিমান সব, প্রকাণ্ড জিনিস, ইঞ্জিনগুলো নাগালের বাইরে, তাই পিছনে আক্রমণ করা হল, লেজ বাদ দিয়ে ত ওগুলো উঠতে পারবে না, যেমন ইঞ্জিন বাদ দিয়ে ওড়া চলে না। আর তাই করতে গিয়ে কাত হলাম। ঢাকনা খুলে মাথা বের করে উঁকি মেরে দেখছি, ঠিক সে সময়ে ট্যাঙ্কটা একটা বিমানের উপরে গিয়ে পড়ল। ডানার এক টুকরোয় ঘা লাগল মাথায়। ভাগ্যিস, হেলমেটটার জন্য আঘাতটার তীব্রতা কমে যায়, নইলে ত পটল তুলতাম। এখন সবকিছু ঠিক, শীগগিরই হাসপাতাল ছেড়ে নিজের দলে আবার ফিরে যাব। আসল গণ্ডগোল হল এই যে হাসপাতালে ওরা আমার দাড়িটা কেটে দিয়েছে। অনেক কষ্টে গজিয়েছিলাম ওটা — খাসা চওড়া দাড়ি — কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে ওরা কেটে দিল। যাক গে, গোল্লায় যাক দাড়ি! মনে হয়, যুদ্ধ শেষ হবার আগে আর একটা গজাতে পারব, কুৎসিত

চেহারাটা ঢাকা পড়বে। তোমাকে কিন্তু বলা দরকার, আলিওশা, কী কারণে জানি না দাড়িটা আনিউতার পছন্দ নয়, প্রতি চিঠিতে এই নিয়ে আমাকে ও বকে।”

দীর্ঘ চিঠি। পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হাসপাতাল জীবনের একঘেয়েমী কমাবার জন্য গভজ্‌দেভ লিখেছে। প্রসঙ্গত, শেষের দিকে লিখেছে যে স্তালিনগ্রাদের কাছে ওরা পদাতিকের মত লড়াই চালিয়েছিল — ট্যাঙ্কগ়ুলো হাতছাড়া হয়, নতুন ট্যাঙ্কের জন্য ওরা অপেক্ষা করছে সে সময়ে বিখ্যাত মামায়েভ কুর্গান এলাকায় স্তেপান ইভানভিচের সঙ্গে ওর দেখা হয়। একটি কোর্সের পাঠ শেষ করে বৃদ্ধ এখন নন-কমিশন্‌ড অফিসার — সার্জেণ্ট-মেজর — ট্যাঙ্ক-বিরোধী রাইফেল দলের একটি পল্টনের ভার তার হাতে। কিন্তু স্নাইপারের অভ্যাস এখনো ছাড়েনি। গভজ্‌দেভকে বলেছে যে তফাৎটা হল এই — এখন বড়ো শিকারের খোঁজে থাকে সে — ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে রোদ পোয়াচ্ছে এমন সব অনবহিত ফ্যাশিস্ট নয়, জার্মান ট্যাঙ্কের সন্ধানে থাকে, বলিষ্ঠ ধূর্ত জানোয়ার ওগ়ুলো। কিন্তু এমন কি সেগ়ুলোর শিকারেও বৃদ্ধ পরিচয় দেয় সাইবেরিয়ান শিকারীর সমস্ত কৌশল, পাথরের মত অনড় ধৈর্য, সহনশীলতা আর অদ্ভুত, লক্ষ্যভেদী নিশানা। য়ুদ্ধে পাওয়া এক বোতল পচা মদ এতদিন সযত্নে সরিয়ে রেখেছিল মিতব্যয়ী স্তেপান ইভানভিচ, দেখা হওয়াতে দ়ুজনে শেষ করে সেটাকে, প়ুরোনো বন্ধ়ুদের খবর নেয় বৃদ্ধ। মেরেসিয়েভকে নিজের কথা মনে করিয়ে দিতে বলে, দ়ুজনকে নিমন্ত্রণ জানায় যে বেঁচে থাকলে য়ুদ্ধের পর যেন ওর যৌথখামারে আসে, কাঠবেড়ালী আর হাঁস শিকার করা হবে তখন।

চিঠিটা আশ্বস্ত করল আলেক্সেইকে বটে, কিন্তু বিষণ্ণ লাগল ওর। ৪২ নং ওয়ার্ডের সব বন্ধ়ুরাই অনেক দিন ধরে আবার লড়াই করছে। গ্রিশা গভজ্‌দেভ আর ব়ুড়ো স্তেপান ইভানভিচ এখন কোথায়? কেমন চলছে ওদের? য়ুদ্ধের হাওয়ায় কোথায় গিয়ে পড়েছে ওরা? এখনো বেঁচে আছে কি? ওলিয়া কোথায়?..

মনে পড়ল কমিসার ভরোবিওভের সেই কথাটা -- সৈন্যদের চিঠি তারার আলোর মত, পৌঁছতে অনেক সময় নেয়, হয়ত তারাটা নিভে গেছে অনেক দিন আগে, কিন্তু তার দীপ্ত প্রসন্ন আলো কাল ভেদ করে আসতে থাকে, যে জ্যোতিষ্কের আর অস্তিত্ব নেই তার স্নিগ্ধ বর্ণচ্ছটা আনে আমাদের কাছে।

চতুর্থ খণ্ড

১

১৯৪৩। গ্রীষ্মের একটি উত্তপ্ত দিনে পুরোনো ট্রাক একটা দ্রুতগতিতে চলেছে পথ বেয়ে: অগ্রগামী সোভিয়েত বাহিনীর মালগাড়িতে দলিত পরিত্যক্ত মাঠের পথ, লালচে আগাছায় কীর্ণ। চোরা গর্তে ঠোক্কর খেয়ে, নড়বড়ে শরীরে আওয়াজ তুলে ট্রাকটা চলেছে ফ্রণ্ট লাইনের দিকে। গাড়ির দুপাশটা ধূলোয় ভরা, ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, শাদা অক্ষরে লেখা কথাগুলো কোনক্রমে চোখে পড়ে: "ফিল্ড পোস্টাল সার্ভিস।" গাড়িটা ছুটে চলেছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে ধূসর-ধূলোর বৃহৎ রেখা, গুমোট স্তব্ধ হাওয়ায় সে রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ডাকের থলে আর হালের খবরের কাগজের বাণ্ডিলে ট্রাকটা বোঝাই, গাড়িতে বসে আছে দুজন সৈনিক, টিউনিক পরনে, মাথায় নীল ফিতে-দেওয়া খাড়া ক্যাপ, দুজনে ট্রাকের গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে দুলছে আর ধাক্কা খাচ্ছে। দুজনের মধ্যে যার বয়স কম তাকে আনকোরা নতুন কাঁধ পেটি থেকে বোঝা যায় বিমান বাহিনীর সার্জেণ্ট-মেজর, পাতলা সুগঠিত দেহ, সোনালী চুল। মুখ এমন সুকুমার আর পেলব যে মনে হয় সোনালী চামড়া দিয়ে রক্তের ছটা ফুটে বেরোচ্ছে। দেখে মনে হয় উনিশ বছর বয়স। পাকা সৈনিকের মত হাবভাব দেখাবার চেষ্টা করছে সে, দাঁত চেপে থুথু ফেলছে, ভাঙ্গা গলায় গালিগালাজ করছে, চেষ্টা করছে দেখাতে কিছুতে তার আগ্রহ নেই। কিন্তু তবু এটা স্পষ্ট যে এই প্রথম সে যাচ্ছে ফ্রণ্ট লাইনে, এবং স্থিরচিত্ত মোটেই নয় সে। চারিদিকে যা চোখে পড়ছে তা কোন অভিজ্ঞ সৈনিকের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করত না, কিন্তু দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে সে, তার কাছে মনে হচ্ছে

গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, গূঢ় অর্থ আছে সবকিছুর — রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা বিধ্বস্ত কামান, মাটির দিকে নলের মুখ; ভাঙ্গা সোভিয়েত ট্যাঙ্ক, বুরুজ পর্যন্ত আগাছা গজিয়েছে; জার্মান ট্যাঙ্কের ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, স্পষ্টতই বোমা সটান লেগেছিল ওটাতে; গোলার নানা গর্ত, ইতিমধ্যেই ঘাসে ঢেকে গিয়েছে; নতুন সাঁকোর কাছে গাদা-করা, রাস্তা থেকে স্যাপারদের সরানো মাইনের চাকতি, আর দূরে দেখা যাচ্ছে বার্চের ক্রুশচিহ্ন দেওয়া জার্মানদের গোরস্থান — হালের যুদ্ধের নানা চিহ্ন।

ওদিকে, সহজে বোঝা যায় ওর সঙ্গী সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টটি বাস্তবিকই পাকা সৈনিক। প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হবে তার বয়স তেইশ কিম্বা চব্বিশ· কিন্তু তামাটে, রোদে জলে পোড়া মুখের দিকে ভালোভাবে তাকালে নজরে পড়বে চোখ মুখ আর কপালে সূক্ষ্ম বলিরেখা, চোখজোড়া কালো, চিন্তাগ্রস্ত আর ক্লান্ত, তখন বয়সটা আরো দশ বছর বেশী মনে হবে। চারিপাশের দৃশ্য কোন ছাপ ফেলছে না ওর মনে। ওর বিস্ময় উদ্রেক করছে না ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যুদ্ধযন্ত্রের মরচে-পড়া, বিস্ফোরণে এবড়োখেবড়ো নানা ভগ্নাবশেষ, দগ্ধ অনেক গ্রামের পরিত্যক্ত পথ ঘাট, এমন কি একটি সোভিয়েত বিমানের ধ্বংসাবশেষ — বাঁকাচোরা এ্যালুমিনিয়ামের ছোট একটা স্তূপ; কিছু দূরে পড়ে আছে ভাঙ্গা ইঞ্জিনটা, লাল তারার চিহ্ন আর নম্বর আঁকা বিমানের লেজটা, যেটা দেখে লাল হয়ে শিউড়ে উঠল নবীন সৈনিকটি।

খবরের কাগজের বাণ্ডিলে আরামকেদারা বানিয়ে, অদ্ভুত চেহারার, সোনালী মনোগ্রাম করা একটা ভারী আবলুস কাঠের ছড়ির বাঁটে চিবুক রেখে ঝিমোচ্ছে অফিসারটি। মাঝেমাঝে চমকে উঠে চোখ খুলছে, ঝিমন্ত ভাব কাটাবার চেষ্টায় যেন, হাসিখুসি মুখে চারিদিকে তাকিয়ে উষ্ণ সুগন্ধি হাওয়া গভীর নিশ্বাসে নিচ্ছে। রাস্তা ছাড়িয়ে দূরে, লালচে আগাছার আন্দোলিত জঙ্গলের উপরে চোখে পড়ল দুটো দাগ, ভালো করে দেখে সে আঁচ করল ওদুটো বিমান, একটার পিছনে অন্যটা মন্থরভাবে চলেছে। তক্ষুণি তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল একেবারে, দীপ্ত হয়ে উঠল চোখদুটো, নাসারন্ধ্র কেঁপে উঠল, অগোচর দুটো দাগে চক্ষু নিবদ্ধ রেখে ড্রাইভারের কামরার ছাতে ঘা দিয়ে চেঁচিয়ে বললো:

'আড়ালে চল! রাস্তা ছেড়ে চল!'

দাঁড়িয়ে উঠে অভিজ্ঞ চোখে ভূমির চেহারাটা দেখে নিয়ে ড্রাইভারকে

দেখাল একটি ছোট নদীর কাদাটে নিচু জায়গা, তার দুটো তীর ধূসর কোল্টস্‌ফুট আর সেলানডাইনের সোনালী ঝাড়ে আচ্ছন্ন।

অবজ্ঞা ভরে হাসল তরুণ সৈনিকটি। বিমানদুটো ত অনেক দূরে নিরীহভাবে ঘুরছে, একটা ট্রাক বিরস পরিত্যক্ত মাঠে ধুলোর ঝড় তুলে চলেছে, তার সম্বন্ধে বিমানদুটোর যে বিন্দু মাত্র আগ্রহ আছে দেখে ত মনে হয় না। কিন্তু বাধা দিয়ে কিছু বলার আগেই রাস্তা ছাড়ল ড্রাইভার, নিচু জায়গাটার দিকে খরশব্দে দ্রুতগতিতে চলল ট্রাকটা।

জায়গাটায় পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট ট্রাক থেকে নেমে পড়ল, ঘাসে উবু হয়ে বসে সতর্কভাবে চেয়ে রইল রাস্তার দিকে।

'কেন আপনারা এ সব...' ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে অফিসারটির দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেছে তরুণ সৈনিকটি, কিন্তু কথাটা শেষ করার আগেই ধপ করে শুয়ে পড়ে অফিসার চেঁচিয়ে উঠল:

'শুয়ে পড়!'

ঠিক সে মুহূর্তে দুটো বিরাট ছায়া ইঞ্জিন গর্জন করে একেবারে মাথার উপর দিয়ে সবেগে চলে গেল, বিচিত্র খটখট আওয়াজ, হাওয়া কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু এটাতেও বিশেষ ভয় পেল না তরুণ সৈনিকটি: বিমানদুটো সাধারণ, নিশ্চয় আমাদের। ঘুরে তাকাল সে, হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার ধারে উল্টিয়ে পড়ে আছে একটা মরচে-ধরা ট্রাক, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আগুন উঠেছে জ্বলে।

'আগুনে-বোমা ফেলছে ওরা,' গোলায় বিধ্বস্ত ইতিমধ্যেই জ্বলন্ত ট্রাকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল ড্রাইভার। 'ট্রাকের পিছনে লেগেছে দেখি।'

'শিকার খুঁজছে,' ঘাসে আরো আরাম করে শুয়ে শান্তকণ্ঠে বলল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। 'আমাদের সবুর করতে হবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে ওরা। রাস্তায় নজর রেখেছে। তোমার ট্রাকটা আর একটু পেছনে, ওই বার্চগাছটার নিচে রাখলে ভালো করতে তুমি।'

শান্তভাবে, বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল কথাটা, যেন এইমাত্র জার্মান বৈমানিকরা নিজেদের অভিসন্ধি জানিয়েছে তাকে। ডাকগাড়ির সঙ্গে ছিল বাহিনীর একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে-ডাকহরকরা, ড্রাইভারের পাশে বসেছিল সে। এখন ঘাসের উপরে শুয়ে আছে মেয়েটি, মুখটা ফ্যাকাশে, ধুলো-মাখা ঠোঁটে ক্ষীণ বিব্রত হাসি, চোরাভাবে তাকাচ্ছে প্রশান্ত আকাশের দিকে, সেখানে

ঢেউ'এর পর ঢেউ'এ চলেছে গ্রীষ্মের মেঘ। সার্জেণ্ট-মেজরের বিশেষ বিব্রত লাগলেও মেয়েটির উপকার করার জন্য নিস্পৃহভাবে বলল:

'এবার রওনা হলে হয়। সময় নষ্ট করে কী হবে? যার অদৃষ্টে লেখা ফাঁসির দড়ি সে ডুবে মরবে না কখনো।'

এক ফালি ঘাস ধীরেসুস্থে চিবোতে চিবোতে যুবকটির দিকে তাকাল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, কঠোর কালো চোখে প্রসন্ন হাসির প্রায় অলক্ষিত ঝিকিমিকি, বলল:

'শোনো হে, ছোকরা! সময় থাকতে ওই নির্বোধ প্রবাদটি ভুলে যাও। আর একটা কথা, কমরেড সার্জেণ্ট-মেজর। ফ্রণ্টে উপরওয়ালাদের মেনে চলার নিয়ম একটা আছে। যদি হুকুম করা হয় শুয়ে পড়, তাহলে শুয়ে পড়া অবশ্য উচিত।'

একটা সরস সরেল ডাঁটা পেয়ে নখ দিয়ে ছালটা ছিঁড়ে, খরখরে ডাঁটাটা মহাতৃপ্তিতে চিবুতে লাগল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। আবার শোনা গেল বিমান-ইঞ্জিনের আওয়াজ, আবার সেই দুটো বিমান, একটু কাৎ হয়ে উড়ে গেল পথটির উপর দিয়ে; এত কাছ দিয়ে যে তাদের ডানার গভীর-হলদে রং, শাদা আর কালো ক্রুশগুলো, এমন কি সবচেয়ে কাছ দিয়ে যেটা গেল সেটার শরীরে আঁকা ইস্কাপনের টেক্কাটা পর্যন্ত দেখা গেল স্পষ্ট। আরো কয়েকটা ডাঁটা অলসভাবে ছিঁড়ে নিয়ে, ঘড়ির দিকে চেয়ে আদেশ করল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট:

'সব সাফ এখন! যাওয়া যাক এবার! আর তাড়াতাড়ি চালিও! এ জায়গাটা ছেড়ে যতদূর যাওয়া যায় ততই ভালো।'

গাড়ির হর্ণ ড্রাইভার বাজাল, নিচু জায়গাটা থেকে দৌড়িয়ে এল মেয়ে-ডাক হরকরাটি। সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের দিকে ডাঁটায় ঝোলা কয়েকটা লাল বুনো স্ট্রবেরি এগিয়ে দিল সে।

'এরি মধ্যে পাকতে শুরু করেছে... গ্রীষ্ম যে আসছে খেয়ালই হয়নি আমাদের,' বেরিগুলো শুঁকে টিউনিকের পকেটের বাটনহোলে ফুলের মত করে রাখতে রাখতে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট বলল।

'কী করে বুঝলেন যে ওরা আর ফিরে আসবে না, এখন যাওয়াটা নিরাপদ?' তরুণটি জিজ্ঞেস করল; চোরাগর্তের উপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রাকটা চলেছে, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট চুপ করে বসে দোলানিতে ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

'ওটা সহজে বোঝা যায়। ওগ্লো "মেসার", "মেসারস্মিদ-১০৯"। মাত্র প'য়তালিশ মিনিট মত ওড়বার পেট্রল ওদের থাকে। পেট্রলটা ইতিমধ্যেই শেষ, আবার ভর্তি করতে গিয়েছে।'

উত্তর দেবার ঢংটা এমন যে মনে হল এরকম সহজ জিনিস লোকের জানা নেই কেন সেটা সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের মাথায় ঢোকে না। এবারে তর্ণটি আরো সজাগভাবে আকাশের দিকে নজর রাখতে শ্র্ করল; "মেসারগ্লো" ফিরে আসার হ্শিয়ারি সেই প্রথমে দেবে, এই তার ইচ্ছে। কিন্তু পরিষ্কার হাওয়ায় সতেজে বাড়ন্ত ঘাস, ধ্লো আর তেতে-ওঠা মাটির তীব্র গন্ধ, গঙ্গাফড়িঙগ্লো ডাকছে সজোরে প্রফুল্লভাবে, আগাছায়-ভরা নিরানন্দ ভূমির উপরে লার্কগ্লোর উচ্চকণ্ঠ গান, এ সবের জন্য তর্ণটি জার্মান বিমান আর বিপদের কথা ভুলে গিয়ে পরিষ্কার মিঠে গলায় গান ধরল; গানটা সে সময়ে ফ্রণ্টে খ্ব প্রিয়, ডাগ-আউটে তর্ণ সৈনিক প্রিয়তমার জন্য আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তার গান।

'"এ্যাসগাছ"এর গানটা জানো?' বাধা দিয়ে সঙ্গী জিজ্ঞেস করল। মাথা নেড়ে তর্ণ প্রোনো গানটি ধরল। সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের ক্লান্ত ধ্লিধ্সর ম্খে বিষণ্ণ ভাব দেখা দিল।

'ঠিক ভাবে ওটা গাইছ না, ওহে,' সে বলল। 'ঠাট্টার গান নয় ওটা, প্রাণ দিয়ে গাওয়া চাই।' নরম নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় স্রটি ধরল সে।

ম্হ্তের জন্য ড্রাইভার গাড়ি থামাল, মেয়ে ডাকহরকরাটি বসবার জায়গা থেকে বেরিয়ে, লঘ্ভাবে লাফিয়ে গাড়িটার পিছন দিকে উঠছে, বলিষ্ঠ দরদী দ্টো হাত তাকে ধরে ফেলল।

'শ্নলাম আপনারা গাইছেন, তাই ভাবলাম আমিও যোগ দিই...'

তিনজনে গাইতে লাগল, সঙ্গত দিচ্ছে গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ আর গঙ্গাফড়িঙের ব্যগ্র ডাক।

তর্ণটি সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে কিটব্যাগ থেকে একটি মাউথ-অর্গান বের করল। কখনো বাজাচ্ছে সেটা, কখনো বা বেটনের মত সেটা নাড়িয়ে গানে যোগ দিচ্ছে, যেন অর্কেস্ট্রা-চালক। সেই বিমর্ষ পরিত্যক্ত রাস্তায়, ধ্লিধ্সর বাড়ন্ত সর্বভুক আগাছার ঝাড়ের মধ্যে বেজে উঠল গানটির বলিষ্ঠ বিষণ্ণ স্র, গ্রীষ্মের তাপে ঝিমন্ত এই সব ক্ষেতের মত, উষ্ণ স্গন্ধি ঘাসে গঙ্গাফড়িঙগ্লোর উচ্চকিত ডাকের মত, পরিষ্কার গ্রীষ্মের আকাশে লার্কের গানের মত উদার, অসীম আকাশের মত চিরপ্রাতন ও চিরনবীন গানটি।

হঠাৎ ব্রেক কষল ড্রাইভার, গানে ওরা এত বিভোর যে আর একটু হলে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যেত। রাস্তার মাঝখানে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার ধারের খাতে উল্টিয়ে পড়ে আছে তিন টনের একটা ট্রাক, ময়লা চাকাগুলো শূন্যমুখী। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তরুণটি, কিন্তু তার সঙ্গী গাড়ির পাশ বেয়ে নেমে তাড়াতাড়ি ওদিকে গেল। হাঁটার ভঙ্গীটি বিচিত্র, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেলে দুলে চলা। ডাক-গাড়ির ড্রাইভার উল্টে-যাওয়া ট্রাকটার কামরা থেকে একটি কোয়ার্টারমাস্টার ক্যাপ্টেনের রক্তাক্ত শরীর টেনে বের করল। মুখটা কাটা, ছড়া কাচের টুকরোয় নিশ্চয়, আর ছাই'এর মত শাদা। চোখের পাতা তুলে দেখল সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট।

'মারা গিয়েছে,' মাথা থেকে টুপি সরিয়ে বলল। 'ভেতরে আর কেউ আছে?'

'হ্যাঁ, ড্রাইভার আছে,' জবাব দিল ডাক-গাড়ির চালক।

'ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছো? এখানে এসে হাত লাগাও!' ভীতিবিহ্বল তরুণকে ধমকে ডাকল সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট। 'এর আগে রক্ত কি দেখোনি? অভ্যেস করে নাও, অনেক দেখতে হবে। এই যে এখানে, শিকারীর লক্ষ্যবস্তু।'

ড্রাইভার বেঁচে আছে। নিচু গলায় কাতরে উঠল সে, চোখদুটো তখনো বোজা। চোটের কোন চিহ্ন নেই। বোঝা গেল গোলা লাগাতে গাড়িটা যখন খাতে গিয়ে পড়ে তখন স্টিয়ারিং-হুইলে হুমড়ি খেয়ে পড়াতে বুকে বেশ লাগে আর আটকা পড়ে কামরাটির ধ্বংসাবশেষে। ওকে তুলে ডাক-গাড়িতে রাখার আদেশ দিল সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট। লেফ্‌টেনান্টের সঙ্গে ছিল কাপড়ে সযত্নে মোড়া ডাহা নতুন আর্মিকোট একটা। আহতকে শোয়াবার জন্য সেটি বিছিয়ে দিল লেফ্‌টেনান্ট, গাড়ির মেঝেতে বসে ওর মাথা রাখল নিজের কোলে।

'প্রাণপণে চালাও!' আদেশ দিল লেফ্‌টেনান্ট।

আহতের মাথা ধীরে ধরে রেখে, কী একটা সুদূর কথা ভেবে হাসল লেফ্‌টেনান্ট।

ছোট একটি গ্রামের রাস্তায় যখন দ্রুতগতিতে ট্রাকটা পেঁছল তখন প্রদোষ। অভিজ্ঞ লোকে দেখলেই বুঝতে পারে যে গ্রামটি বিমানের ছোট একটা ইউনিটের পরিচালনা-ঘাঁটি। বাড়িগুলোর সামনের বাগানে, চেরি আর কর্কশ আপেলগাছের ধূলিধূসর শাখায়, কুয়োর কাঠে আর বেড়ার খুঁটিতে লাগানো তারের সারি ঝুলছে। বাড়িগুলোর কাছাকাছি খড়ের গোয়ালে,

যেখানে সাধারণত চাষীরা ঘোড়ার গাড়ি আর চাষের যন্ত্রপাতি রাখে, দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গাচোরা "এমকা" আর জিপ। এখানে সেখানে কুঁড়েগুলোর জানলার আবছা শার্সি দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল ফিতে দেওয়া টুপি মাথায় সৈনিকদের টাইপরাইটারের খটখট আওয়াজ কানে আসছে। একটা বাড়িতে তারের জাল গিয়ে জড়ো হয়েছে, সেখানে শোনা যাচ্ছে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সমান টিক টিক শব্দ।

গ্রামটি বড়ো কিম্বা মাঝারি রাস্তা থেকে দূরে, হিটলার আক্রমণের আগে এরকম জায়গায় থাকাটা কতো সুখের ব্যাপার ছিল তার চিহ্ন হিসেবে যেন অধুনা নির্জন আর আগাছায়-ভরা জায়গাটি টিঁকে আছে। হলদে আগাছায় সমাচ্ছন্ন ছোট পুকুরটা পর্যন্ত জলে ভরা। পুরোনো উইলোর ছায়ায় চকচক করছে ঠান্ডা পুকুরটা, আগাছার ঝাড় ভেদ করে ভাসছে এক জোড়া ধবধবে শাদা, লাল-ঠোঁট হাঁস, জল ছড়িয়ে ঠোঁট দিয়ে নিজেদের গা সাফ করছে।

রেডক্রসের পতাকা লাগানো একটি কুটিরে আহত লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর ট্রাকটা গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়ে গ্রামের স্কুলের ছোট সুন্দর বাড়িটার সামনে থামল। অনেক তার ঢুকেছে ভাঙ্গা জানলা দিয়ে, প্রবেশপথে সাব-মেসিনগান হাতে শান্ত্রী, বোঝা যায় যে এটা স্টাফ হেডকোয়ার্টারস।

খোলা জানলার কাছে বসে ভারপ্রাপ্ত অফিসার "লাল ফৌজী" পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রসওয়ার্ড হেঁয়ালির সমাধানে ব্যস্ত, তাকে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট বলল: 'উইং কম্যান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।'

পিছু পিছু এসেছে তরুণটি, সে লক্ষ্য করল যে বাড়িতে ঢুকেই অভ্যাসবশে টিউনিকের সামনের দিকটায় হাত বুলিয়ে নিল লেফ্‌টেনাণ্ট, বুড়ো আঙুল দিয়ে বেল্টের নিচে ভাঁজগুলো ঠিক করা হল, গলার বোতামটা লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণটিও তাই করল। স্বল্পভাষী সঙ্গীটিকে তার বিশেষ পছন্দ, সব বিষয়ে তাকে অনুকরণের চেষ্টা করে সে।

'কর্ণেল ব্যস্ত আছেন,' বলল ভারপ্রাপ্ত-অফিসার।

'ওঁকে বলুন যে বিমান বাহিনীর স্টাফ হেডকোয়ার্টারসের কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ থেকে জরুরী চিঠি নিয়ে আমি এসেছি।'

'আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। আকাশ পরিদর্শন দলের সঙ্গে উনি কথা বলছেন। বলেছেন যেন এ সময়ে বিরক্ত করা না হয়। আপনারা বাইরে গিয়ে বাগানে একটু বসুন।'

ক্রসওয়ার্ড সমাধানে আবার মন দিল ভারপ্রাপ্ত অফিসার। নবাগতরা বাগানে গিয়ে কেয়ারির পাশে পুরোনো একটা বেঞ্চে বসল, এক কালে সাবধানে ইঁট দিয়ে ঘেরা হয়েছিল কেয়ারিটাকে কিন্তু এখন আর কেউ যত্ন নেয় না, আগাছায় ভরে গিয়েছে। যুদ্ধের আগে গ্রীষ্মের এরকম শান্ত বিকেলে গ্রামের স্কুলের বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী নিশ্চয়ই দিনের কাজের শেষে এখানে বিশ্রাম করতেন। খোলা জানলা দিয়ে দুজনের কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে শোনা গেল। একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় উত্তেজিতভাবে বলছে:

'এই রাস্তাটা আর ওইটা ধরে বলসয়ে গরোখভো আর ক্রেস্তোভজ্‌ভিজেন্‌স্কির গোরস্থান পর্যন্ত খুব যাতায়াত চলেছে, ক্রমাগত ট্রাকের সারি, সব যাচ্ছে একদিকে, ফ্রন্টে। এখানে গোরস্থানের একেবারে কাছে, একটা নিচু জায়গায় ট্রাক কিম্বা ট্যাঙ্ক আছে... মনে হচ্ছে একটা বড়ো দলকে জড়ো করা হচ্ছে...'

'কেন মনে হচ্ছে?' বাধা দিয়ে জিল সুরে একজন বলল।

'আমাদের আজ প্রচুর গুলিগোলা ছুঁড়েছে। কোনক্রমে এড়িয়ে আসতে পেরেছি। ওখানে কাল কিছুই ছিল না, শুধু কয়েকটা সৈন্যদের ধুমন্ত ফিল্ড-কিচেন। ওদের একেবারে উপরে গিয়ে কষে গুলি চালাই, যাতে একটু চৈতন্য হয়। কিন্তু আজ! দারুণ গুলি ছুঁড়েছে আজ... নিশ্চয়ই ফ্রন্টের দিকে যাচ্ছে ওরা।'

'৩ নং স্কোয়ারে কী দেখলেন?'

'ওখানেও নড়াচড়া দেখলাম, কিন্তু খুব বেশী নয়। এখানে বনের কাছে ট্যাঙ্কের একটা বড়ো দল এগোচ্ছে। প্রায় একশ'টা। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ধরে বিস্তৃত, সার বেঁধে এগোচ্ছে দিনের আলোয়, লুকিয়ে চলার কোন চেষ্টা নেই। হয়ত চোখে ধুলো দেবার চাল... এখানে, এখানে ওখানে আমরা কামান দেখলাম, ফ্রন্ট লাইনের একেবারে কাছে। আর গুলিবারুদের ঘাঁটি। কাঠের গাদাতে গোপন করার চেষ্টা করেছে। কাল ওগুলো ওখানে ছিল না... বেশ বড়ো বড়ো ঘাঁটি।'

'আর কিছু?'

'না, আর কিছু নয়, কমরেড কর্ণেল। রিপোর্ট লিখব একটা?'

'রিপোর্ট? না, রিপোর্ট লেখার সময় নেই! আর্মি হেডকোয়ার্টারসে এক্ষুণি চলে যান? এটার মানে কী জানেন... ভারপ্রাপ্ত অফিসার, আমার গাড়িটা! বাহিনীর হেডকোয়ার্টারসে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যান।'

বড়ো একটা ক্লাসঘরে কর্ণেলের অফিস। কাঠের কুঁদো দিয়ে তৈরী অনাড়ম্বর দেয়াল, আসবাবপত্রের মধ্যে শুধু একটা টেবিল, তার উপরে রাখা ফিল্ড টেলিফোনের চামড়ার খাপ, বিমান মানচিত্রের সঙ্গে বড়ো কেস একটা, আর একটা লাল পেন্সিল। কর্ণেলটি ছোটখাটো কর্মঠ সুগঠিত মানুষ, পিছনে হাত রেখে ঘরে পায়চারি করছেন। চিন্তায় এত মগ্ন যে সামরিক কায়দায় দণ্ডায়মান বৈমানিকদের পেরিয়ে গেলেন। হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে।

তামাটে রঙের অফিসারটি গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে সেলাম করে বলল:

'সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আলেক্সেই মেরেসিয়েভ।'

আরো জোরে আর্মি বুটের গোড়ালি ঠুকে, আরো কায়দায় সেলাম করার চেষ্টা করতে করতে তরুণটি বলল:

'সার্জেণ্ট-মেজর আলেক্সান্দ্র্‌ পেত্রভ।'

'উইং কম্যাণ্ডার কর্ণেল ইভানভ,' উত্তরে কর্কশস্বরে বললেন কর্ণেল। 'সরকারী চিঠি আছে?'

ম্যাপ-কেস থেকে নিখুঁতভাবে চিঠিটা বের করে মেরেসিয়েভ কর্ণেলকে দিল। সংক্ষিপ্ত বার্তাটি তাড়াতাড়ি পড়ে কর্ণেল নবাগতদের দেকে দ্রুত অন্তর্ভেদী দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন:

'ভালো! ঠিক সময়ে আপনারা এসেছেন। কিন্তু এত কম লোক কেন ওরা পাঠিয়েছে?' হঠাৎ বিস্ময়ের একটি ভাব মুখে এল, যেন কিছু একটা মনে পড়েছে। 'এক মিনিট সবুর করুন! আপনি কি সেই মেরেসিয়েভ? বাহিনীর চিফ অব স্টাফ আপনার বিষয়ে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন...'

'ওটা এমন কিছু নয়, কমরেড কর্ণেল,' বাধা দিয়ে বলল আলেক্সেই, খুব যে শিষ্টভাবে তা নয়। 'আমাকে কাজে যাবার অনুমতি দিন।'

সকৌতূহলে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টটিকে দেখলেন কর্ণেল, তারপর মাথা নেড়ে প্রশংসাসূচক হাসি হেসে বললেন:

'বেশ!.. অফিসার! এঁদের চিফ অব স্টাফের কাছে নিয়ে যান, আর আমার নাম করে বলুন এঁদের খাবার আর থাকার জায়গা দিতে। বলুন যে গার্ডস ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রনে এঁদের ভর্তি করতে হবে।'

পেত্রভের মনে হল উইং কম্যাণ্ডারটি একটু বেশী বাস্তবাগীশ। লোকটিকে মেরেসিয়েভের ভালো লাগল। ঠিক ওর মনের মত লোক — চটপটে, এক

নিমেষে যে কোন জিনিস বুঝতে পারে, স্পষ্টভাবে চিন্তা করে আর দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসতে পারে। বাগানে বসে থাকার সময়ে আকাশ পরিদর্শক দলের লোকটি যে রিপোর্ট দিয়েছে সেটা তাঁর মনে গেঁথে বসেছে। আর্মি হেডকোয়ার্টারস ছাড়ার পর যে সব রাস্তা ধরে তারা নানা পথচলতি গাড়ি করে এসেছে সেই সব রাস্তায় অতিরিক্ত সমাবেশ, রাত্রে রাস্তায় সান্ত্রীরা জোর দিয়ে বলেছে সব আলো নিভিয়ে চলতে হবে, আদেশ খেলাপ করলে টায়ারে গুলি করার ভয় দেখিয়েছে, বড়ো রাস্তার ধারে বার্চ-বনে ট্যাংক, ট্রাক আর কামান জড়ো করায় ভিড় আর হৈচৈ, আর পরিত্যক্ত মেঠো রাস্তাটাতেও জার্মান "শিকারীরা" সেদিন তাদের আক্রমণ করেছিল, এসব লক্ষণ সৈন্যদের চেনা; মেরেসিয়েভ আঁচ করল যে ফ্রন্টের স্তব্ধভাব শেষ হয়ে এসেছে, এই এলাকায় নতুন আক্রমণ শুরু করার মতলব জার্মানদের, শীগগিরই শুরু হবে সেটা; এও আঁচ করল মেরেসিয়েভ যে কথাটা সোভিয়েত আর্মি কমান্ডের জানা এবং প্রত্যুত্তরের সঠিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২

পেত্রভকে অস্থির সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মধ্যাহ্ন-ভোজনের তৃতীয় পদটির অপেক্ষা করতে দিল না, ওকে নিয়ে বিমান-ঘাঁটিতে যাওয়া একটি পেট্রলের ট্রাকে লাফিয়ে উঠল; বিমান-ঘাঁটিটা গ্রামের বাইরে একটি মাঠে। নবাগতরা সেখানে নিজেদের পরিচয় দিল গার্ডস ক্যাপ্টেন চেস্লোভের কাছে; স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারটি ভ্রূকুটিকুটিল, স্বল্পভাষী, কিন্তু সব মিলিয়ে খাসা প্রকৃতির মানুষ। বহুবাড়ম্বর না করে সে ওদের ঘাসে-ঢাকা, মাটির দেয়াল-ঘেরা জায়গায় নিয়ে গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে দুটো ডাহা নতুন, ঝকঝকে পালিশ দেওয়া, নীল "লাভচ্‌কিন", লেজে আঁকা দুটো নম্বর, "১১" আর "১২"। বিমানদুটি চালাতে হবে নবাগতদের। বাকি বিকেলটা তারা সুগন্ধি বার্চ-বনে কাটাল — সেখানে পাখির গান এমন কি বিমান ইঞ্জিনের গর্জনে পর্যন্ত চাপা পড়ছে না — বিমানগুলো খুঁটিয়ে ওরা দেখল, নতুন মিস্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ চলল, আর ওখানকার জীবনের সঙ্গে পরিচিত করে নিল নিজেদের।

এসব নিয়ে তারা এত বিভোর যে শেষ ট্রাকে ফিরল গ্রামে; ইতিমধ্যেই অন্ধকার হয়ে এসেছে, রাত্রের শেষ খাবার আর জুটল না। কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না ওদের। যাত্রার জন্য দেওয়া শুকনো রেশনের বাকিটুকু তখনো

ন্যাপসাকে ছিল। থাকবার জায়গা নিয়ে বরঞ্চ তারা ফ্যাসাদে পড়ল। পরিত্যক্ত, আগাছা-ভরা পতিত জায়গায় এই ছোট্ট মরুদ্যানটি বিমান বাহিনীর দুটো রেজিমেণ্টের লোকজনে বড়ো বেশী ভিড়াক্রান্ত। লোকঠেসা একটা বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাচ্ছে কোয়ার্টারমাস্টার, নবাগতদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে গররাজী বাসিন্দেদের সঙ্গে রেগে বচসা চলেছে; এটা আফসোসের কথা যে বাড়িগুলো রবারের তৈরী নয়, টেনে লম্বা করা যাবে না ওগুলোকে এই সব দার্শনিকসুলভ চিন্তার পর অবশেষে যে বাড়িটা হাতের কাছে পেল তাতে ঠেলে ওদের দুজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে কোয়ার্টারমাস্টার বলল.

'আজ রাতটা এখানে কাটান। কাল সকালে আপনাদের জন্যে অন্য কিছু বন্দোবস্ত করব।'

ছোট কুটিরে ইতিমধ্যেই ন'জন লোক, সবাই শুয়ে পড়েছে। ধূমায়িত একটি কেরোসিনের বাতির অস্পষ্ট আলো পড়েছে ঘুমন্ত লোকগুলির উপরে -- বাতিটা চ্যাপটা গোলার খাপ থেকে তৈরী, যুদ্ধের প্রথম দিকে এধরনের বাতিকে "কাতিউশা" বলা হত, পরে নামকরা হয় "স্তালিনগ্রাদকা"। কয়েকজন ঘুমোচ্ছে বিছানায় বা বাঙ্কে, কেউবা মেঝের উপরে খড়ে বর্ষাতি বিছিয়ে শুয়ে আছে। ন'জন বাসাড়িয়া ছাড়াও আছে কুটির মালিকেরা, একটি বৃদ্ধা আর তার বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা; জায়গার অভাবে তারা বিরাট রুশ স্টোভের উপর ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত লোকদের কী করে ডিঙিয়ে যাবে ভেবে দোরগোড়ায় নবাগতরা থমকে দাঁড়াল। স্টোভের উপর থেকে বৃদ্ধা সক্রোধে ওদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল:

'জায়গা নেই, একেবারে জায়গা নেই! দেখছ না তিল ধারণের জায়গা নেই? কোথায় তোমাদের শোয়াব, ঘরের ছাতে?'

এত বিব্রত লাগল পেত্রভের যে সরে পড়ার জন্য পা বাড়াল, কিন্তু এরি মধ্যে মেরেসিয়েভ টেবিলের দিকে পথ করে নেয়, সাবধানে, যাতে ঘুমন্ত লোকগুলির উপরে পা না পড়ে।

'যে কোন একটা কোণে বসে রাত্রের খানাটা খেয়ে নিতে চাই, দিদিমা। সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি,' বলল মেরেসিয়েভ। 'আমাদের একটা প্লেট আর গোটা দুই কাপ দিতে পারেন? এখানে ঘুমিয়ে আপনাদের জ্বালাব না। বেশ গরম, বাগানে শুতে পারি আমরা।'

ক্রুদ্ধা বৃদ্ধাটির পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এল দুটি ছোট্ট খালি পা;

স্টোভের কাছ থেকে নিঃশব্দে সরে গেল একটি দোহারা চেহারার মানুষ, নিদ্রিতদের গা নিপুণভাবে বাঁচিয়ে দরজার ওদিকে গেল চলে; প্লেট হাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল সে; পাতলা আঙুলে ধরা দুটো রঙীন কাপ। প্রথম পেত্রভের মনে হয়েছিল বাচ্চা বুঝি, কিন্তু যখন টেবিলের কাছে ও এল আর অন্ধকারে ঝাপসা, হলদে আলো পড়ল মেয়েটির মুখে, তখন দেখল মানুষটি নবীনা, চেহারাটা মিষ্টিও বটে; শুধু বাদামি ব্লাউজ, চটের কাপড়ের স্কার্ট আর বুকে জড়িয়ে পিছনে বুড়ীদের মত করে বাঁধা ছেঁড়াখোঁড়া শালটির জন্য সৌন্দর্যটি খোলেনি।

'মারিনা, এই মারিনা, এদিকে আয়, মেথরানি কোথাকার,' স্টোভের উপরে বুড়ীটি হিসহিসিয়ে উঠল।

কথাটা যে কানে গিয়েছে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নিপুণ হাতে টেবিলে একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপরে মেয়েটি প্লেট, কাপ আর কাঁটা রাখল, সঙ্গে সঙ্গে চলল পেত্রভের দিকে আড়চোখে তাকানো।

'স্বাস্থ্যের জন্যে খান!' বলল মেয়েটি। 'কিছু কাটতে কিম্বা গরম করতে চান? এখখুনি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিন্তু কোয়ার্টারমাস্টার বলেছেন যে বাইরে আগুন জ্বালানো চলবে না।'

'মারিনা, এদিকে আয় বলছি,' বুড়ী ডাকল।

'ওকে পরোয়া করবেন না, মাথাটা ওর একটু বিগড়ে গিয়েছে। জার্মানরা ওকে ভয়ে আধমরা করে দেয়,' তরুণী বলল। 'রাত্তিরে সৈন্য দেখলেই আমার জন্যে দুশ্চিন্তায় ভরে যায়। ওর ওপরে চটবেন না, শুধু রাত্তির বেলায় এরকম করে, দিনের বেলায় ঠিক হয়ে যায়।'

নিজের ন্যাপসাকে মেরেসিয়েভ পেল কিছু সসেজ, এক টিন মাংস, এমন কি পাতলা গায়ে চিকচিকে নুন দুটো শুকনো হেরিং আর আর্মির রুটি। দেখা গেল পেত্রভ অত মিতব্যয়ী নয়: ওর থাকার মধ্যে শুধু কিছুটা মাংস আর খড়খড়ে বিস্কুট। খাবারগুলো গোছালো হাতে কেটে টেবিলের উপরে বেশ লোভনীয় ভাবে সাজাল মারিনা। দীর্ঘ চক্ষুপল্লবে ঢাকা চোখজোড়া ক্রমশ বেশী করে পড়ছে পেত্রভের মুখে, পেত্রভও ওর দিকে চোরা চাউনি হানছে। চোখাচোখি হলেই দুজনেই লাল হয়ে উঠে, ভুরু কুঁচকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কথাবার্তা চলছে মেরেসিয়েভের মাধ্যমে, সরাসরি না। ওদের রকমসকম দেখতে বেশ মজা লাগছে আলেক্সেই'র আর একটু বিষণ্ণও; দুজনেরই বয়স

কত কম! ওদের তুলনায় নিজেকে বুড়ো লাগছে, মনে হচ্ছে জীবনের বেশী ভাগটা পিছনে ফেলে এসেছে।

'মারিনা, তোমার কাছে বোধহয় শশা নেই?' জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ।

'কপাল গুণে আছে,' মৃদু হেসে তরুণীটি বলল।

'দুটো সেদ্ধ আলু জোগাড় করতে পারবে বোধ হয়।'

'হ্যাঁ — চাইলে পাবেন।'

কোন শব্দ না করে, লঘুপদে নিদ্রিতদের ডিঙিয়ে, আলোর পোকার মত আবার ঘর ছেড়ে চলে গেল মেয়েটি।

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' আপত্তি জানিয়ে পেত্রভ বলল, 'কী করে ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন? অচেনা মেয়েটিকে "তুমি" বলে ডাকছেন? শশা চাইছেন আর...'

প্রফুল্লভাবে হেসে উঠল মেরেসিয়েভ।

'শোনো হে ছোকরা, কোথায় আছি মনে হচ্ছে বলো ত? ফ্রণ্টে, না অন্য কোথাও?.. আর দিদিমা, গজগজানি যথেষ্ট হয়েছে। নেমে এসে আমাদের সঙ্গে খেতে বসুন!'

গজগজ আর বিড়বিড় করতে করতে বুড়ী স্টোভ থেকে নেমে টেবিলের কাছে এসে সসেজের উপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল; দেখা গেল যুদ্ধের আগে সসেজ বিশেষ প্রিয় ছিল তার।

চারজনে টেবিলে বসে মহাতৃপ্তিতে খেল, অন্যান্যদের নাকডাকা আর ঘুমন্ত বিড়বিড় সঙ্গত রাখল ওদের নৈশ খানার। স্বচ্ছন্দে গল্পস্বল্প করে চলেছে আলেক্সেই, বুড়ীকে জ্বালাচ্ছে আর মারিনাকে হাসাচ্ছে। অভ্যস্ত শিবির জীবনে অবশেষে ফিরে এসে স্বরূপ ফিরে পেয়েছে ও, সবকিছু ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে বিদেশ বিভুঁয়ে অনেকদিন ঘুরে বাড়িতে ফিরে এসেছে।

খানা শেষ হয়ে আসার আগে ওরা জানল যে একটি জার্মান দলের হেডকোয়ার্টারস ছিল বলে গ্রামটা টি'কে আছে। সোভিয়েত বাহিনী আক্রমণ শুরু করাতে জার্মানরা এত তাড়াহুড়োয় পালায় যে গ্রামটি ধ্বংস করার সময় পায়নি। নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে চোখের সামনে ফ্যাশিস্টরা বলাৎকার করাতে বুড়ীর মাথা বিগড়ে যায়। পরে মেয়েটি পুকুরে ডুবে মরে। জার্মানরা যে আট মাস জেলায় ছিল সে কটা মাস মারিনা কাটায় উঠোনের পিছনে শূন্য মাড়াই ঘরে; খড় আর পুরোনো দড়ি, কাঁছি, রশারশির টুকরো দিয়ে প্রবেশপথটি চোখের আড়াল করে রাখা হয়েছিল। এ ক' মাস সূর্যের মুখ দেখেনি মারিনা।

রাত্রে ধোঁয়া বেরোবার পথ দিয়ে ওকে খাবার আর জল পৌঁছিয়ে দিত মা। আলেক্সেই গল্পসল্প করছে মেয়েটির সঙ্গে, মেয়েটি ঘনঘন তাকাচ্ছে পেত্রভের দিকে, বেয়াড়া অথচ লাজুক চোখদুটোয় অনুরাগের ছাপটা বেশ স্পষ্ট।

হাসিখুসিতে গল্প করে খানা শেষ হল। মিতব্যয়ীর মত বাকি খাবারটা মারিনা মেরেসিয়েভের ন্যাপসাকে রাখল, বলল সবকিছুই সৈনিকের কাজে লাগে। তারপর মা'কে ফিসফিস করে কী একটা বলে, মুখ ফিরিয়ে বেশ জোর দিয়ে বলল:

'শুনুন, কোয়ার্টারমাস্টার আপনাদেব এখানে পাঠিয়েছেন, আমি চাই আপনারা এখানে থেকে যান। স্টোভের ওপরে চাপুন, মা আর আমি নিচের ঘরটায় যাচ্ছি। যাত্রার পরে জিরোনো দরকার আপনাদের। কাল আপনাদের জন্যে জায়গা খুঁজে দেব।'

আবার লঘুপায়ে নিদ্রিতদের ডিঙিয়ে বাইরে গেল মারিনা, ফিরে যখন এল তখন হাতে খড়ের বোঝা, স্টোভে খড় বিছিয়ে, কিছু কাপড় গুটিয়ে বালিশের মত করল: সবকিছু করল চটপটে নিপুণ হাতে, বেড়ালের মত কৌশলে।

'খাসা মেয়েটা, কী বলো, ছোকরা?' খড়ের উপরে খুসিতে হাত পা ছড়িয়ে, গাঁটে গাঁটে শব্দ তুলে মন্তব্য করল মেরেসিয়েভ।

'মন্দ নয়,' কৃত্রিম উদাসীনতায় জবাব দিল পেত্রভ।

'কী ভাবে তোমার দিকে তাকাচ্ছিল লক্ষ্য করেছিলে?..'

'না, ও ত বরাবর আপনার সঙ্গেই গল্প করছিল!..'

পরের মুহূর্তে শোনা গেল ওর নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ। কিন্তু ঘুম এল না মেরেসিয়েভের। ঠান্ডা সুগন্ধি খড়ের উপরে শুয়ে দেখল কী একটা জিনিসের খোঁজে ঘরে এসেছে মারিনা, স্টোভের দিকে চোরা চাউনি হানছে প্রায়ই। টেবিলের উপরের বাতিটা কমিয়ে দিয়ে, আর একবার স্টোভের দিকে তাকিয়ে, নিদ্রিতদের মধ্য দিয়ে পথ করে গেল দরজার দিকে। কী কারণে যেন, এই ছিন্নবেশ, মিষ্টি চেহারার কমনীয় মেয়েটিকে দেখে বিষণ্ণ স্তব্ধতায় ভরে গেল আলেক্সেই'র অন্তর। থাকবার জায়গার সমস্যা মিটে গিয়েছে। কাল সকালে ওকে লড়াই'এর জন্য অনেক দিন পর এই প্রথম বিমান চালাতে হবে। পেত্রভ থাকবে সঙ্গে, মেরেসিয়েভ নেতা। ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াবে? পেত্রভকে খাসা ছোকরা মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতেই ওর প্রেমে পড়েছে মারিনা। যাই হোক, কিছু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার!

পাশ ফিরে শুল আলেক্সেই, খড়ে একটু খসখস আওয়াজ, তারপর অঘোর ঘুম।

সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটার অনুভূতিতে তার ঘুম ভাঙল। ব্যাপারটি কী তৎক্ষণাৎ পারল না বুঝতে, কিন্তু সৈনিকের সহজাত বোধে লাফিয়ে উঠে পিস্তলটা চেপে ধরল। কোথায় আছে মনে পড়ছে না। রশুনের মত তীব্র কটুগন্ধ ধোঁয়ার মেঘে ঘর আচ্ছন্ন; হাওয়ায় ধোঁয়া কেটে গেলে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল মাথার উপরে জ্বলছে অদ্ভুত, বিরাট সব নক্ষত্র। দিনের বেলার মত পরিষ্কার আলো, চোখে পড়ল দেশলাই'এর কাঠির মত কুটিরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঠের কুঁদো, ছাতটা স্থানচ্যুত, কড়িবরগা বেরিয়ে পড়েছে, কিছুদূরে আকারহীন কী একটা পুড়ছে। কানে এল কাতরানি, বিমান ইঞ্জিনের তরঙ্গিত গর্জন আর পড়ন্ত বোমার বিকট আর্তনাদ।

ধ্বংসাবশেষের উপরে উদ্যত স্টোভে হাঁটু গেড়ে বসে পেত্রভ হতচকিতভাবে চারিদিক দেখছে, মেরেসিয়েভ চেঁচিয়ে তাকে বলল:

'শুয়ে পড়ো!' ইটের উপরে ধড়াস করে পড়ে শরীর চিপটে শুয়ে রইল দুজন। ঠিক সেই মুহূর্তে বোমার বড়ো একটা টুকরো চিমনীতে লাগল আর লাল ধুলো আর শুকনো কাদা ঝুরঝুর করে ওদের উপরে পড়ল।

'নড়ো না! স্থির হয়ে শুয়ে থাকো!' আদেশ করল মেরেসিয়েভ, দমন করল লাফিয়ে উঠে ছুটে চলে যাবার সেই ইচ্ছেটা যেখানে হোক এসে যায় না, দৌড়তে পারলেই হল — নৈশ বিমান আক্রমণের সময়ে যে ইচ্ছেটা প্রত্যেকের হয়।

বোমারু বিমানগুলো দেখা যাচ্ছে না। নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত হাউই'এর অনেক উপরে অন্ধকারে ঘুরছে সেগুলো। কিন্তু দপদপে ধূসর আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ে বোমাগুলো কালো বিন্দুর মত আলোর এলাকার মধ্যে এসে পড়ছে, চোখের সামনে ক্রমশ আয়তনে বেড়ে সজোরে লাগছে মাটিতে, গ্রীষ্ম রাত্রির অন্ধকারে লাল অগ্নিশিখা ছিটকিয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে মাটি বিদীর্ণ হয়ে গর্জে উঠছে।

বৈমানিক দুজন স্টোভ আঁকড়ে আছে, প্রতিটি বিস্ফোরণে দুলে দুলে কেঁপে উঠছে সেটা। স্টোভে চেপে রেখেছে শরীর, গাল আর পা, চেষ্টা করছে নিজেদের মিশিয়ে দিতে, একাকার হয়ে যেতে ইটের সঙ্গে। ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আওয়াজ মিলিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল রাস্তার ওধারে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষে অগ্নিশিখার ক্রুদ্ধ হাঁক।

'বেশ একটা ধোলাই দিল বটে,' কাপড়চোপড় থেকে খড় আর মাটি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে কৃত্রিম অবিচলিত স্বরে বলল মেরেসিয়েভ।

'কিন্তু এখানে যারা ঘুমোচ্ছিল তাদের কী হল?' চোয়াল কাঁপছে, হেঁচকি জোর করে এসে পড়ছে সেটা, চাপার চেষ্টা করতে করতে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল পেত্রভ। 'আর মারিনা?'

স্টোভ থেকে নামল দুজনে। টর্চ ছিল মেরেসিয়েভের। মেঝেতে বিক্ষিপ্ত তক্তা আর কাঠের কুঁদোর নিচে খোঁজ করল অন্যদের। কেউ নেই। পরে শুনেছিল যে সাইরেন শুনে দৌড়িয়ে গর্তে চলে যেতে পেরেছিল ওরা। ধ্বংসাবশেষে অনেক খোঁজ করল মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ, কিন্তু মারিনা ও তার মা'র দেখা পেল না। হেঁকে ডাকল ওদের, কোন সাড়া নেই। কী হতে পারে ওদের? বিমান আক্রমণের পর ওরা কি বেঁচে আছে?

রাস্তায় ইতিমধ্যেই শৃংখলা ফিরিয়ে আনছে টহলদারেরা। স্যাপাররা আগুন নিভিয়ে দিল, ভূমিসাৎ করল ধ্বসে-পড়া বাড়িগুলোকে, হতাহতদের বের করল ভগ্নস্তূপ থেকে। আর্দালিরা রাস্তায় ছুটোছুটি করে বৈমানিকদের নাম ডেকে তলব করছে। বিমান বাহিনীর রেজিমেণ্টকে সত্বর অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হল। বৈমানিক দলকে জড়ো করা হল বিমানক্ষেতে, যাতে ভোর হলে বিমান নিয়ে চলে যেতে পারে তারা। প্রথম হিসেবে দেখা গেল হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী নয়। একজন বৈমানিক আহত, দুজন মিস্ত্রী আর কয়েকজন সান্ত্রী চৌকিতে নিহত হয়েছে। সকলের অনুমান গ্রামের অনেক লোক মারা গিয়েছে, কিন্তু কজন, সেটা অন্ধকার আর গণ্ডগোলের জন্য বলা কঠিন।

ভোরের ঠিক আগে বিমানক্ষেতে যাবার সময়ে মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ যে বাড়িতে ঘুমিয়েছিল সেখানে না থেমে পারল না। কাঠের কুঁদো আর তক্তার বিশৃংখল স্তূপ থেকে একটি স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুজন স্যাপার, রক্ত-মাখা চাদরে ঢাকা কী একটা শোয়ানো স্ট্রেচারে।

'কে ও?' জিজ্ঞেস করল পেত্রভ, মুখ ওর ফ্যাকাশে, অমঙ্গলের পূর্ববোধে বুক ভারী হয়ে উঠেছে।

গালপাট্টাওয়ালা প্রবীণ স্যাপার একজন, তাকে দেখে মেরেসিয়েভের স্তেপান ইভানভিচের কথা মনে হল, ব্যাখ্যা করে বলল:

'একটি বুড়ী আর একটি মেয়ে। মাটির নিচের ঘরে ওদের পেলাম। পড়ন্ত ইটে চোট লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। কিশোর না বালিকা জানি না,

এত ছোটখাটো শরীর! চেহারা দেখে মনে হয় সুন্দর দেখতে ছিল। বুকে ইট লাগে। বেশ দেখতে, বাচ্চা মেয়ের মত।'

...সেই রাত্রে জার্মানরা তাদের শেষ বড়ো আক্রমণ শুরু করল; সোভিয়েত লাইন আক্রমণ করাতে কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টের যুদ্ধ আরম্ভ হল, যে যুদ্ধটির পরিণামে সর্বনাশ হয় ওদের।

৩

সূর্য তখনো ওঠেনি; গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রির সবচেয়ে অন্ধকার সময়, কিন্তু বিমানক্ষেত্রে বিমানগুলোর ইঞ্জিন গরম করা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে, গর্জাচ্ছে সেগুলো। শিশিরে-ভেজা ঘাসে একটি মানচিত্র ছড়িয়ে ক্যাপ্টেন চেস্লোভ তার স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের নতুন বিমান-ঘাঁটি আর কোন দিক দিয়ে সেখানে যেতে হবে সেটা দেখাচ্ছে।

'চোখ খোলা রাখবেন, বুঝলেন,' সে বলছিল। 'পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ হারাবেন না। বিমান-ঘাঁটিটা একেবারে ফ্রণ্ট লাইনে।'

ঘাঁটিটা সত্যিই ফ্রণ্ট লাইনে, মানচিত্রে নীল পেন্সিলে চিহ্নিত লাইনটা জার্মান সৈন্যদলের অবস্থানের একটা জিভে ঢুকেছে। সেখানে যেতে হলে পিছনে উড়ে যেতে হবে না, যেতে হবে সামনে। বৈমানিকরা মহাখুসি। শত্রুপক্ষ আবার প্রথমে আক্রমণ করেছে, তা সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনী পিছু হটবার প্রস্তুতির বদলে প্রতিআক্রমণের ব্যবস্থা করছে।

সূর্যের প্রথম আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত, ক্ষেতের উপরে তখনো গোলাপী কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসছে; দ্বিতীয় স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারের বিমানের পিছনে পিছনে উপরে উঠে পরস্পরের কাছাকাছি থেকে চলল দক্ষিণ দিকে।

মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ আকাশপথে তাদের প্রথম একসঙ্গে যাত্রায় পরস্পরের খুব কাছাকাছি রইল; পথ হ্রস্ব হলেও যেরকম সহজে আর পাকা হাতে মেরেসিয়েভ বিমান চালাল তার তারিফ করল পেত্রভ। আর মেরেসিয়েভও ইচ্ছে করে কয়েকবার বিমানটা হঠাৎ বিশেষভাবে ঘোরাল, লক্ষ্য করল যে অনুসরণকারীর আছে উপস্থিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ন চোখ, বলিষ্ঠ স্নায়ু, আর যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে মনে করে, চালানোর কায়দাটা ওর ভালো, যদিও এখনো স্বচ্ছন্দ নয়।

একটি পদাতিক রেজিমেণ্টের পিছন দিকে নতুন বিমানক্ষেত্রটি। জার্মানদের কাছে ধরা পড়লে ওরা হালকা কামান, এমন কি ভারী ট্রেঞ্চ মর্টারের নাগালে আনতে পারে সেটাকে। কিন্তু ঠিক নাকের ডগায় হঠাৎ আবির্ভূত বিমানক্ষেত্রটিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ তাদের নেই। বসন্তে যত কামান জড়ো করেছিল ওরা, তাই দিয়ে ভোর হতে না হতে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর রক্ষাব্যূহাদির উপর গোলাবর্ষণ শুরু করেছে জার্মানরা। গড়বন্দী এলাকাটির অনেক উপরে উঠছে কম্পমান রক্তাভা। অবিরত বিস্ফোরণ প্রতি মুহূর্তে উত্থিত কালো। গাছ-কীর্ণ ঘন জঙ্গলের মত সবকিছু ঢেকে দিচ্ছে। সূর্য উঠল, তখনো বেশ ফরসা হল না। ঘর্ঘরিত গর্জিত কম্পমান অন্ধকারে কিছু চেনা ভার, বীভৎস লাল চাকার মত সূর্য আকাশে স্থির।

মাসখানেক আগে জার্মান গড়খাইগুলির উপরে সোভিয়েত বিমানের সন্ধানী যাত্রা বিফলে যায়নি। জার্মান কমাণ্ডের অভিসন্ধি ধরা পড়ে; সৈন্য অবস্থান আর সমাবেশের জায়গাগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত, ইঞ্চি মেপে দেখা হয়েছে প্রত্যেকটিকে। অভ্যাসবশে জার্মানরা ভেবেছিল যে ঘুমন্ত অসন্দিগ্ধ শত্রুর পিঠে সর্বশক্তিতে হঠাৎ ছোরা বসাতে পারবে; কিন্তু শত্রু শুধু ঘুমের ভান করেছে। আক্রমণকারীর হাত ধরে ফেলে ইস্পাত-কঠিন বলিষ্ঠ মুষ্টিতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। বেশ কিছু কিলোমিটার জায়গা নিয়ে কামানের প্রাথমিক আক্রমণ গর্জিয়ে চলল, নিজেদের সেই কামান গর্জনে বধির আর বারুদের আচ্ছন্ন করা ধোঁয়ায় অন্ধ জার্মানরা, বজ্রনির্ঘোষ থেমে যাবার আগেই দেখল নিজেদের সব ট্রেঞ্চে লাল গোলার বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে। সোভিয়েত গোলন্দাজের নিশানা নিখুঁত, জার্মানদের মত তার লক্ষ্য বর্গবদ্ধ নয়, তার লক্ষ্যবস্তু হল নির্দিষ্ট সব কামান সমষ্টি, আক্রমণের জন্য ইতিমধ্যে তৈয়ার ট্যাঙ্ক আর পদাতিক বাহিনীর সংহতি, সেতু, ভূগর্ভস্থ গোলাবারুদের ঘাঁটি, সৈন্যদের ডাগ-আউট, পরিচালনা-ঘাঁটি।

জার্মান কামান আক্রমণ পরিণত হল ভীষণ গোলা যুদ্ধে, উভয় পক্ষে বিভিন্ন শক্তির হাজার হাজার কামান গর্জে চলেছে। ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রন যখন নতুন বিমানক্ষেত্রে নামল তখন সমস্ত মাটি কাঁপছে, বিস্ফোরণের আওয়াজ একাকার হয়ে একটানা গভীর গর্জনে পরিণত, যেন রেলওয়ে সেতুর উপর দিয়ে একটা লম্বা ট্রেন বাঁশী বাজিয়ে ঘরঘর ঝনঝন শব্দ করে চলেছে, কিন্তু সেতুর শেষ নেই। বিশালায়তন কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ায়

দিগন্ত বিলুপ্ত। ছোট বিমানক্ষেতের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে বোমারু বিমান, কয়েকটা বা সারসের মত দল বেঁধে, কয়েকটা বা ছেড়ে ছেড়ে। কামানের অবিরত গর্জনের মধ্যে আলাদা করে শোনা যায় তাদের বোমা বিস্ফোরণের ভারী শব্দ।

"দোসরা নম্বর প্রস্তুতির" আদেশ দেওয়া হল স্কোয়াড্রনগুলিকে। তার মানে ককপিটে বসে থাকতে হবে বৈমানিকদের, যাতে প্রথম হাউই ছোঁড়া হলেই সটান উড়তে পারে তারা। একটি বার্চ-বনের ধারে বিমানগুলোকে নিয়ে গিয়ে ডালপালা দিয়ে আড়াল করা হল। বনের ঠান্ডা কনকনে হাওয়ায় ব্যাঙের ছাতা গোছের গন্ধ, মশার গুঞ্জন যুদ্ধের গর্জনে শোনা যায় না, মশাগুলো বৈমানিকদের মুখে ঘাড়ে আর হাতে তীব্র আক্রমণ শুরু করেছে।

হেলমেট খুলে নিয়ে অলসভাবে মশা তাড়িয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছে মেরেসিয়েভ, বনের ঝাঁঝালো ভোরের গন্ধ বেশ লাগছে। পরের মাটির দেয়াল-ঘেরা জায়গাটাতে পেত্রভের বিমান। প্রায়ই ককপিট থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে পেত্রভ, মাঝেমাঝে এমন কি ককপিটের উপরে দাঁড়িয়ে যেদিকে যুদ্ধ চলেছে সেদিকে তাকাচ্ছে, কিম্বা চলে-যাওয়া বোমারুগুলোকে অনুসরণ করছে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য উপরে উঠতে ব্যগ্র সে, এবার আর ট্রেনিং বিমানে দড়িতে টানা হাওয়ায়-ফাঁপানো কোন বেলুনে গুলি করা নয়, ট্রেসার গুলিগুলো পাঠাতে হবে সত্যিকারের সচল, চটপটে কোনো শত্রুবিমানে, তাতে খোলসের মধ্যে শামুকের মত হয়ত বসে আছে সেই লোকটা যে মেরেছে দোহারা সুন্দর মেয়েটিকে, শুভস্বপ্নে যাকে দেখেছে বলে এখন মনে হয় পেত্রভের।

অস্থির পেত্রভকে দেখে দেখে মেরেসিয়েভ ভাবল, "আমরা প্রায় একবয়সী। ও উনিশ, আমি তেইশ। তিনচার বছরের তফাতে কি এসে যায় পুরুষের?" কিন্তু অনুসরণকারীর পাশে মেরেসিয়েভের নিজেকে পাকা, ধীরস্থির, ক্লান্ত বৃদ্ধের মত লাগে। এ মুহূর্তে ককপিটে বসে ছটফট করছে পেত্রভ, হাত ঘষছে, চলে-যাওয়া সোভিয়েত বিমানগুলোকে উদ্দেশ্য করে হাসছে আর চেঁচিয়ে কিছু বলছে, আর আলেক্সেই ত নিজে হাত পা ছড়িয়ে বেশ আরাম করে বসে আছে। ধীর সে, পায়ের পাতা নেই, যে কোন বৈমানিকের তুলনায় ওর পক্ষে বিমান চালানো অনেক বেশী কঠিন, কিন্তু এমন কি সেটাতে পর্যন্ত তার উত্তেজনা নেই। নিজের দক্ষতায় দৃঢ় বিশ্বাস তার, বিকলাঙ্গ পাদুটোয় আস্থা আছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত "দোসরা নম্বর প্রস্তুতিতে" রইল ওদের বিমানগুলো। কী কারণে যেন ওদের মজুত রাখা হল। বোঝা গেল অকালে ওদের অবস্থিতি জানিয়ে দেওয়াটা কর্তৃপক্ষেরা চান না।

ঘুমোবার জন্য যে ডাগ-আউটগুলো ওদের জন্য নির্দিষ্ট করা হল সেগুলো জার্মানরা এখানে থাকার সময় তৈরী করেছিল। আরো আরামে থাকার জন্য কাঠের দেয়ালে তারা কার্ডবোর্ড আর প্যাকিং কাগজ লাগিয়েছিল। দেয়ালে তখনো লোভে লালায়িত মুখ সিনেমা-তারকাদের অর্ধনগ্ন ছবি, আর নানা জার্মান সহরের মুদ্রিত তেল রঙা ছবি। কামান যুদ্ধের বিরাম নেই। মাটি কাঁপছে। শুকনো বালি দেয়াল-কাগজ হয়ে ঝুরঝুর করে পড়ছে গুঁড়িগুঁড়ি খসখসে শব্দে, যেন ডাগ-আউটটা পোকায় ভর্তি।

মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ ঠিক করল বর্ষাতি বিছিয়ে বাইরে শোবে। পোষাক পরেই ঘুমোনোর আদেশ। পায়ের পাতার পেটি শুধু ঢিলে করল মেরেসিয়েভ। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, বিস্ফোরণের লাল ঝলকে আকাশ কাঁপছে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে পেত্রভ, নাক ডাকছে তার, বিড়বিড় করছে সে, চোয়াল নড়ছে, ঠোঁট সশব্দে চেটে ঘুমন্ত শিশুর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুল সে। নিজের আর্মিকোট দিয়ে ওর গা ঢেকে দিল মেরেসিয়েভ। ঘুমোতে পারবে না জেনে উঠে পড়ল মেরেসিয়েভ, হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, গরম হবার জন্য বেশ জোরে কয়েক হাত ব্যায়াম করে নিয়ে বসল একটা গাছের গুঁড়িতে।

কামান যুদ্ধের ঝড় থেমে গিয়েছে। শুধু মাঝেমাঝে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণ করে উঠছে কয়েকটা কামান। কয়েকটা ইতস্তত গোলা মাথার উপর দিয়ে গিয়ে বিমানক্ষেতের কাছাকাছি কোথাও ফাটল। তথাকথিত এই হয়রানি গুলিবর্ষণে কেউ বিচলিত বোধ করে না। বিস্ফোরণের আওয়াজে মুখ পর্যন্ত ঘোরাল না আলেক্সেই, সে তাকিয়ে আছে লড়াই'এর লাইনের দিকে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় সেটা। অনেক রাত্রি এখন, তবু চলেছে তীব্র অবিরাম কঠিন যুদ্ধ, সমস্ত দিগন্তে বিরাট আগুন জ্বলে উঠেছে, তার রক্তাভায় যুদ্ধের ছায়া পড়েছে ঘুমন্ত পৃথিবীতে। তার উপরে ঝলকাচ্ছে হাউই'এর কম্পমান আলো — জার্মানদের হাউইগুলো নীলচে, ফসফরাসের — সোভিয়েত সৈন্যদের ছোঁড়া হাউইগুলো হলদেটে। এখানে সেখানে চকিতে উঠছে বিরাট অগ্নিজিহ্বা, নিমেষের জন্য কালো যবনিকা সরে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, তারপর কানে আসছে বিস্ফোরণের জমাট দীর্ঘশ্বাস।

শোনা গেল রাত্রিবেলাকার বোমারু বিমানের গর্জন, আর সমস্ত ফ্রন্ট ট্রেসার বুলেটের নানা রঙের গুটিতে অলঙ্কৃত হয়ে উঠল। বিমান ধ্বংসী কামানের ক্ষিপ্র গোলা রক্তবিন্দুর মত উঠছে শূন্যে। আবার পৃথিবী কেঁপে উঠল, শুরু হল তার গোঙানি আর কাতরানি। বার্চগাছের মাথায় গুঞ্জনরত গুবরে পোকাগুলো কিন্তু বিচলিত নয় তাতে; বনের গভীরে মানুষের গলায় একটা পেঁচা ডেকে উঠল, অমঙ্গলের পূর্বসূচনায়; নিচু জায়গাটাতে একটা নাইটিংগেল দিনের ভয় কাটিয়ে প্রথমে দ্বিধায় গাইল, যেন নিজের গলা পরখ করছে, কিম্বা কোন যন্ত্রে সুর ঠিক করছে, তারপর গাইল ভরা কাঁপা গলায়, মনে হল যেন নিজের সঙ্গীতের শব্দে বুক ফেটে যাবে পাখিটার। সে গানে যোগ দিল অন্য নাইটিংগেলরা, কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিক থেকে আসা সুরেলা শব্দে মুখরিত হল সমস্ত বন। অবাক হবার কিছু নেই যে কুর্স্কের নাইটিংগেলের খ্যাতি আছে সারা পৃথিবীতে!

এখন তাদের গানে গানে আকাশ মুখরিত। পরীক্ষার জন্য হাজিরা দিতে হবে আলেক্সেইকে কাল, কমিশনের সামনে নয়, স্বয়ং যমের সামনে, নাইটিংগেলদের সমবেত সঙ্গীত আজ জাগিয়ে রেখেছে তাকে। আর কালকের কথা ভাবছে না সে, আসন্ন যুদ্ধের কথা, মৃত্যুর সম্ভাবনার কথাও নয়, আলেক্সেই ভাবছে কামিশিনের উপকণ্ঠে সেই দূরাগত নাইটিংগেলটির কথা, তাদের জন্য গাওয়া সেই "নিজেদের" নাইটিংগেলের কথা, ভাবছে ওলিয়ার আর প্রিয় সহরটির কথা।

ফরসা হয়ে এল পূর্বাকাশ। নাইটিংগেলের গান আস্তে আস্তে ছাপিয়ে এল কামানের ডাক। মন্থরভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে ভারী রক্তবর্ণ সূর্য উঠল, গুলিগোলার বিস্ফোরণের জমাট ধোঁয়া ভেদ করতে প্রায় অপারগ যে সূর্য।

৪

কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টের ভীষণ যুদ্ধ অবিরাম চলেছে। জার্মানদের মূল মতলব ছিল ট্যাঙ্কের সাহায্যে ক্ষিপ্র বলিষ্ঠ আঘাতে কুর্স্কের দক্ষিণে আর উত্তরে আমাদের রক্ষাব্যূহাদি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে, তারপর সাঁড়াশির মত দুভাগ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর কুর্স্ক দলকে একেবারে ঘেরাও করে স্তালিনগ্রাদের জার্মান সংস্করণ একটা দেখাবে। কিন্তু প্রতিরোধের দৃঢ়তায় বানচাল হয়ে গেল সে পরিকল্পনা। কয়েকদিন পরে জার্মান কমাণ্ডের হুঁশ

হল যে প্রতিরোধ ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে না, পারলেও এত লোকক্ষয় হবে যে সাঁড়াশি আক্রমণের জন্য যথেষ্ট লোক থাকবে না; কিন্তু তখন দেরী হয়ে গিয়েছে, আক্রমণ থামানো আর হল না। এই আক্রমণের উপরে বিশেষ আশা রেখেছিল হিটলার — রণনীতি ও কৌশল ঘটিত আশা, রাজনৈতিকও বটে। হিমানী-সম্প্রপাত শুরু, ক্রমশ বর্ধিষ্ণু ভরবেগে নেমে এসে বিরাট বরফ পুঞ্জ সামনে যা কিছু পড়ছে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর যারা শুরু করেছে সেটা রোধ করবার শক্তি নেই তাদের। জার্মানরা এগোচ্ছে মাত্র কয়েক কিলোমিটার, তাতে তাদের গোটা ডিভিশন ও বাহিনী, শত শত ট্যাঙ্ক, কামান আর হাজার হাজার গাড়ি নষ্ট হচ্ছে। রক্তক্ষয়ে এগিয়ে-যাওয়া বাহিনীগুলোর শক্তি কমে এল; কথাটা জার্মান হেডকোয়ার্টারসের অজানা নয়, কিন্তু অবস্থা প্রতিহত করার উপায় নেই তাদের, তাই যুদ্ধের আগুনে বেশী, আরো বেশী মজুত সৈন্য সমর্পণ করতে বাধ্য হল তারা।

এখানে প্রতিরোধরত বাহিনী দিয়ে জার্মান আক্রমণ কাটিয়ে উঠল সোভিয়েত কমান্ড। ওদের আক্রমণের প্রচন্ডতা ক্রমশ বাড়ছে দেখে ফ্রন্টের একেবারে পিছনে মজুত সৈন্যদের হাতে রাখা হল, যতক্ষণ না শত্রুপক্ষের অগ্রগতির বেগ কমে আসে। পরে মেরেসিয়েভ শুনেছিল যে ওর দলের কাজ ছিল প্রতিঘাতের জন্য সংহত একটি বাহিনীকে সাহায্য করা। তাতে বোঝা গেল ঘোরযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কেন ট্যাঙ্কবাহিনী আর জঙ্গী বিমানগুলোর ভূমিকা ছিল শুধু দর্শকের; উদ্দেশ্য ছিল বাহিনী প্রতি-আক্রমণ শুরু করলে একসঙ্গে ওদের কাজে লাগানো হবে। শত্রুদলের সমস্তটাকে যখন যুদ্ধে নামানো হল, তখন প্রত্যাহার করা হল "দোসরা নম্বর প্রস্তুতির" আদেশ। ডাগ-আউটে ঘুমোতে, এমন কি জামাকাপড় ছাড়তে দেওয়া হল দলটিকে। থাকবার জায়গা অন্যভাবে গুছিয়ে নিল মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ। সিনেমা-তারকাদের ছবি আর বিদেশী দৃশ্য সব ফেলে দিল তারা, ছিঁড়ে ফেলল জার্মান কার্ডবোর্ড আর প্যাকিং কাগজ, দেয়ালটা সাজানো হল ফার আর বার্চের শাখা দিয়ে। তারপর গুঁড়ি গুঁড়ি পড়া বালির খসখস শিরশির আওয়াজ আর বিরক্ত করত না।

একদিন সকালে দেয়ালের খোঁড়লে বাঙ্কে শুয়ে আছে ওরা দুজন, সূর্যের দীপ্ত আলো ইতিমধ্যে ডাগ-আউটের খোলা প্রবেশপথ দিয়ে পড়েছে মেঝের পাইন-কাঁটার কার্পেটে, ওপরের পথে শোনা গেল দ্রুত পদধ্বনি আর কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "ডাক হরকরা"। ফ্রন্টে শব্দটা ভেলকির কাজ দিত। একসঙ্গে

দুজনে কম্বল ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসল, মেরেসিয়েভ পায়ের পেটি শক্ত করে বাঁধছে, পেত্রভ দৌড়িয়ে উপরে গিয়ে ডাক হরকরাকে ধরে ফেলল, ফিরে এল উল্লাসে, হাতে আলেক্সেই'র দুটো চিঠি, একটি মা'র আর অন্যটি ওলিয়ার। বন্ধুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে চিঠিদুটো মেরেসিয়েভ, এমন সময়ে ঢং করে ঘণ্টার শব্দ এল বিমানক্ষেত্র থেকে, বিমানে যেতে হবে তাদের।

টিউনিকে চিঠিদুটো রেখেই সেগুলোর কথা ভুলে গেল মেরেসিয়েভ, পেত্রভের পিছু পিছু তাড়াতাড়ি গেল বনের পথ ধরে বিমানগুলোর দিকে। বেশ তাড়াতাড়ি গেল সে, হাতে ছড়ি, শুধু একটু হেলে দুলে চলেছে। বিমানের কাছে পেঁছিল যখন তখন ইঞ্জিনের ঢাকনা সরানো হয়ে গিয়েছে, আর মুখে ফুট ফুট দাগ, হাস্যপ্রিয় ছোকরা মিস্ত্রীটি অধৈর্যভাবে প্রতীক্ষা করছে তার জন্য।

ইঞ্জিনের গর্জন। স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারের বিমান "ছক্কা" — সেটির দিকে মেরেসিয়েভ তাকিয়ে রইল। বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় ক্যাপ্টেন চেস্লোভ তার বিমান নিয়ে এসে ককপিটে থেকেই হাত তুলল। তার মানে "এ্যাটেনশন!" গর্জে উঠল অন্যান্য সব ইঞ্জিন। ঘূর্ণিবায়ুতে ঘাসের মাথা নুয়ে পড়েছে, হাওয়ায় বার্চের বেণীর ঝটপট, যেন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

নিজের বিমানের দিকে দৌড়িয়ে যাচ্ছে আলেক্সেই, ওকে পেরিয়ে গেল আর একটি বৈমানিক, কোনক্রমে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল ট্যাঙ্ক আক্রমণ শুরু হয়েছে। তার মানে শত্রুপক্ষের বিধ্বস্ত লাইন ভেদ করে ট্যাঙ্কের পথ করে দেবার সাহায্য করতে হবে বৈমানিকদের, আক্রমণকারীদের রক্ষা করার জন্য পাহারা রাখতে হবে আকাশে। আকাশে পাহারা দেওয়া? কী এসে যায় তাতে? যে রকম তীব্র যুদ্ধ চলেছে তাতে পাহারা দেওয়াটা নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাপার হবে না মোটেই। এখন কিম্বা পরে আকাশে শত্রুপক্ষের সাক্ষাত মিলবেই। পরীক্ষা তাহলে আসন্ন। এবারে সে প্রমাণ করবে যে কোন বৈমানিকের চেয়ে ন্যূন নয়, সিদ্ধিলাভ করেছে সে!

আলেক্সেই'র অস্থির লাগছে। কিন্তু মৃত্যুর ভয় সেটা নয়। বিপদের যে বোধ সবচেয়ে সাহসী ও স্থিরচিত্ত লোকেরই হয়, সেটাও নয়। অন্য কিছু একটায় বিব্রত সে: শস্ত্রমিস্ত্রীরা কি মেসিনগান আর কামানগুলো পরীক্ষা করেছে; নতুন হেলমেটের ইয়ারফোনদুটো এর আগে যুদ্ধের সময়ে পরেনি, ঠিক আছে সেদুটো? শত্রুর সঙ্গে লড়াই লাগলে পেত্রভ কি পিছনে পড়ে থাকবে, কিম্বা তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাবে? ছড়িটা কোথায়? ভাসিলি

ভার্সিলিয়েভিচের দেওয়া জিনিসটা হারাতে সে চায় না; এমন কি ডাগ-আউটে যে বইটা রেখে এসেছে সেটা যদি কেউ নিয়ে যায়, তাই নিয়ে চিন্তিত সে; আগের দিন উপন্যাসটির সবচেয়ে রোমাঞ্চকর জায়গার আগে পর্যন্ত পড়েছিল, তাড়াহুড়োয় টেবিলে ফেলে রেখে এসেছে বইটা। মনে পড়ে গেল পেত্রভকে বিদায় জানানো হয়নি, তাই ককপিট থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল। কিন্তু পেত্রভ দেখতে পেল না তাকে; অধৈর্যভাবে সে দেখছে কম্যান্ডারের উত্তোলিত হাত, চামড়ার হেলমেটের বেড়ে ঘেরা মুখে ছাপ ছাপ রক্তাভা। হাত নামাল কম্যান্ডার। ককপিটের ঢাকনা টানা হল।

স্টার্ট লাইনে গর্জাচ্ছে তিনটি বিমান, চমকে উঠে দৌড়িয়ে গেল সেগুলো। তাদের পিছনে অন্য দলের যাত্রা শুরু হল। প্রথম তিনটি বিমান আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেরেসিয়েভের দল রওনা হয়ে তাদের অনুসরণ করল, নিচে সমতল মাটি দুলছে। প্রথম তিনটিকে নজরে রেখে ঠিক তার পিছন নিল মেরেসিয়েভের দলটি। তার পিছনে এল তৃতীয় দল।

ফ্রন্ট লাইন এসে পড়ল। গোলাগুলিতে মাটি কেটে ছিঁড়ে গিয়েছে, উপর থেকে দেখলে চেহারাটা জোর বৃষ্টির প্রথম কয়েক ফোঁটার পরে ধূলিধূসর রাস্তার মত মনে হয়। ট্রেঞ্চগুলো যেন লাঙল দিয়ে খুঁড়ে ফেলা, ফুস্কুরির মত রক্ষাব্যূহ আর কামান রাখবার জায়গাগুলো কাঠের টুকরো আর ইটের স্তূপে পরিণত। ছেঁড়াখোঁড়া উপত্যকার সর্বত্র হলদে স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি; বিরাট যুদ্ধের আগুন সেটা। উপর থেকে সবকিছু কেমন ছোট, খেলনার মত আর অদ্ভুত দেখাচ্ছে! বিশ্বাস করা কঠিন যে নিচে সবকিছু জ্বলছে, বিকারগ্রস্তের মত গর্জাচ্ছে, বিকলাঙ্গ পৃথিবীর ধোঁয়ায় আর ঝুলে গুঁড়ি মেরে ঘুরছে যম। বলির অভাব নেই।

যুদ্ধরেখার উপর দিয়ে ওরা গেল, শত্রুপক্ষের পিছনে অর্ধবৃত্তে ঘুরে আবার পেরোল যুদ্ধরেখা। ওদের লক্ষ্য করে কেউ গুলি ছুঁড়ল না। নিচে যারা তারা নিজেদের কঠিন সব পার্থিব ব্যাপার নিয়ে অতি ব্যস্ত, ন'টা ক্ষুদে বিমান মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, খেয়াল করার সময় নেই তাদের। কিন্তু ট্যাঙ্কগুলো কোথায়? ওই ত, ওখানে! মেরেসিয়েভ দেখল একটার পর একটা আস্তে আস্তে বন থেকে বেরিয়ে আসছে, উপর থেকে মনে হয় ধূসর বেঢপ গুবরে-পোকা। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেক ট্যাঙ্ক বেরিয়ে এল, কিন্তু আরো আসছে, বনের সবুজ থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা আর নিচু জায়গা হয়ে আস্তে আস্তে চলেছে। প্রথম কয়েকটা দ্রুতগতিতে

উঠল ছোট পাহাড়ে, পৌঁছল গোলাবিধ্বস্ত মাটিতে। তাদের ধড় থেকে ঝলকাচ্ছে লাল স্ফুলিঙ্গ। এই বিপুল ট্যাঙ্ক আক্রমণ, জার্মান লাইনের অবশিষ্টাংশের দিকে দুর্বার গতিতে ধাবমান শত শত এই ট্যাঙ্কের হামলা মেরেসিয়েভের সঙ্গে আকাশ থেকে দেখলে কোন শিশুর, এমন কি কোন স্নায়বিক পীড়ায় কাতর মহিলারও ভয় হত না। হেলমেটের ইয়ারফোনে নানা শব্দের গুঞ্জন, ঠিক সেই মুহূর্তে মেরেসিয়েভের কানে এল ক্যাপ্টেন চেস্লোভের ভাঙ্গা গলা, এমন কি এখন পর্যন্ত সে গলা নিরুৎসাহ :

'এ্যাটেনশন! ৩ নং চিতেবাঘ আমি! ৩ নং চিতেবাঘ, ডানদিকে "ইয়ুনকারস"!'

আলেক্সেই সামনে দেখল খাটো একটি রেখা। কম্যান্ডারের বিমান ওটা। দুলছে সেটা, তার মানে "আমি যা করছি তাই করো!"

নিজের দলের জন্য আদেশটি পুনরাবৃত্তি করল মেরেসিয়েভ। ফিরে দেখল পেত্রভ ওর পাশে, প্রায় সমান্তরালভাবে চলেছে। খাসা ছোকরা!

'ওহে, হুঁশিয়ার!' চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ।

'তাই করছি,' বিশৃঙ্খল ফটফট, গুনগুন আওয়াজের মধ্যে জবাব এল। আবার মেরেসিয়েভের কানে এল:

'৩ নং চিতেবাঘ আমি, ৩ নং চিতেবাঘ!' তারপর আদেশ হল, 'অনুসরণ করো আমাকে!'

শত্রুরা কাছে এসে পড়েছে। ঠিক তাদের নিচে লম্বালম্বিভাবে, জার্মানদের প্রিয় কায়দায় এক দল "ইয়ুনকারস-৮৭" একক-ইঞ্জিন ডাইভ-বোমারু। কুখ্যাত এই ডাইভ-বোমারুগুলি পোল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম আর যুগোস্লাভিয়ায় বোম্বেটে খ্যাতি অর্জন করে, যুদ্ধের গোড়াতে সারা পৃথিবীর সংবাদপত্র এদের বিভীষিকার বর্ণনায় মুখর ছিল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট বিস্তৃতিতে অল্পদিনের মধ্যেই এরা পাত্তা পেল না। অনেক আকাশ-যুদ্ধে এদের খুঁত ধরে ফেলল সোভিয়েত বৈমানিকরা, আর আমাদের সেরা বৈমানিকরা "ইয়ুনকারসদের" নিকৃষ্ট শিকার বলে গণ্য করতে শুরু করল, যেন বিলমোরগ কিম্বা খরগোস, ওদের শিকার করতে সত্যিকার দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

নিজের স্কোয়াড্রনকে সোজাসুজি শত্রুপক্ষের দিকে নিয়ে গেল না ক্যাপ্টেন চেস্লোভ, ঘুরপথে গেল। মেরেসিয়েভ ভাবল সাবধানী ক্যাপ্টেন

চায় "সূর্যকে পিছনে রাখতে," আর তারপর চোখ-ঝলসানো আলোর আড়ালে থেকে শত্রুর অগোচরে কাছে গিয়ে পড়ে ওদের আক্রমণ করতে। মনে মনে হেসে আলেক্সেই ভাবল, "এই জটিল ফন্দিটা করে ও "ইয়ুনকারসগুলোকে" বড্ড বেশী সম্মান দেখাচ্ছে। যাই হোক, সাবধানের মার নেই।" ফিরে তাকিয়ে দেখল পেত্রভ পিছনে আছে। একটা শাদা মেঘের গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে।

ওদের ডানদিকে এখন জার্মান বিমানগুলো। সুন্দরভাবে সার বেঁধে এগোচ্ছে ওরা, নিখুঁত শৃঙ্খলায়, যেন অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা। ওপর থেকে সূর্যের আলো এসে পড়াতে জ্বলজ্বল করছে ডানাগুলো।

কম্যান্ডারের আদেশের শেষ কয়েকটি কথা কানে এল আলেক্সেই'র:

'... ৩ নং চিতেবাঘ! আক্রমণ চালাও!'

আলেক্সেই দেখল চেস্লোভ আর তার অনুসরণকারী বাজপাখির মত শত্রুপক্ষের পার্শদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবচেয়ে কাছের "ইয়ুনকারসটির" দিকে ছুটল ট্রেসার গুলির রেখা: পড়ে গেল সেটা, আর চেস্লোভ, তার অনুসরণকারী এবং তার দলের তৃতীয় ব্যক্তিটি ভাঙ্গা জার্মান লাইনের ফাঁক দিয়ে সবেগে ঢুকল। তক্ষুণি লাইন সামলে নিল জার্মানরা, সুশৃঙ্খলায় এগিয়ে চলল "ইয়ুনকারসগুলো"।

আলেক্সেই ডাকের সংকেত করে চেঁচিয়ে বলতে চাইল: "আক্রমণ কর!" কিন্তু এত উত্তেজিত সে যে গলা থেকে শুধু বেরোল, "আ-আ-আ"। এরিমধ্যে তীরের মত নামতে শুরু করেছে সে, মসৃণভাবে অগ্রসর জার্মান লাইনটা ছাড়া চোখে আর কিছু পড়ছে না। চেস্লোভের নামানো বিমানটার জায়গা যে বিমানটি নিয়েছে, ওর লক্ষ্য হল সেটা। কান ভোঁ ভোঁ করছে, হৃৎস্পন্দন এত বেড়ে গিয়েছে যে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল। দৃষ্টিপথে এসে পড়ল শিকারটি, ঘোড়ার বোতামে বুড়ো আঙুলদুটো রেখে খরবেগে চলল সেদিকে। তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে গুলির ধোঁয়ার ধূসর, পশমের মত রেশ। বটে, তাহলে গুলি চালাচ্ছে! লাগেনি। আবার! এবার আগের চেয়ে কাছে! কোন ক্ষতি হয়নি। পেত্রভের কী হল? না, ওরও চোট লাগেনি। ও এখন বাঁয়ে আছে। এড়িয়ে গিয়েছে ওদের। খাসা ছোকরা! জার্মান বিমানটির ধূসর গা দৃষ্টিপথে বড়ো দেখাচ্ছে। বুড়ো আঙুলে এ্যালুমিনিয়াম বোতামদুটোর ঠাণ্ডা অনুভূতি। আর একটু কাছে এলে...

সেই মুহূর্তে আলেক্সেই'র বোধ হল বিমানটির সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে সে। ইঞ্জিনের ধকধকানি যেন নিজের হৃৎপিণ্ডে বাজছে, ডানাদুটোর আর

রাডারের অনুভূতি সমস্ত সত্তায়, ওর মনে হল এমন কি বেঢপ, নকল পাদুটো পর্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে, বিমানের ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে একীভূত হতে যেতে বাধা দিচ্ছে না তাকে। ফ্যাশিস্ট বিমানটির ছিপছিপে মসৃণ দেহ চলে গেল চোখের আড়ালে, কিন্তু গোচরে সেটাকে আবার এনে ঘোড়া টিপল সে। গুলির আওয়াজ কানে এল না, ট্রেসার গুলির রেখা পর্যন্ত পড়ল না চোখে, কিন্তু আলেক্সেই জানে যে সফল হয়েছে সে, এগিয়ে গেল দ্রুতবেগে, স্থির বিশ্বাস জার্মান বিমানটা পড়ে যাবে, ধাক্কা লাগবে না তার সঙ্গে। মুখ ঘুরিয়ে অবাক হয়ে দেখল আর একটা বিমান, প্রথমটির পাশে ছিল সেটা, পড়ে যাচ্ছে। তাহলে কি দুটোকে মেরেছে সে? না। ওটা পেত্রভের কাজ। তার ডানদিকে পেত্রভ। অনভিজ্ঞের পক্ষে মন্দ নয়। তরুণ বন্ধুটির সৌভাগ্যে তার নিজের সাফল্যের চেয়ে বেশী খুসি হল আলেক্সেই।

দ্বিতীয় দলটি ফাঁক ধরে জার্মান লাইনে ঢুকল। তারপর শুরু হল মজাটা। বোঝা গেল জার্মান বিমানগুলির দ্বিতীয় দলটি অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ বৈমানিকদের হাতে, তারা লাইন ভাঙ্গল। ছত্রভঙ্গ "ইয়ুনকারসদের" মধ্যে গিয়ে পড়ল চেস্লোভের দলের বিমানগুলো, এত তাড়া দিল তাদের যে নিজেদের লাইনের উপরে তাড়াতাড়ি বোমার বোঝা ফেলে দিতে বাধ্য হল তারা। ঠিক এই অভিসন্ধি নিয়ে বিমানগুলোকে চালনা করেছিল ক্যাপ্টেন চেস্লোভ — ওরা যাতে বাধ্য হয়ে নিজেদের লাইনে বোমা ফেলে! সূর্যকে পিছনে রাখা মূল উদ্দেশ্য ছিল না ওর।

জার্মানদের প্রথম লাইন আবার সংঘবদ্ধ হল, আর যে জায়গায় ট্যাঙ্কগুলো ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে সেদিকে আবার চলল "ইয়ুনকারসগুলো"। তৃতীয় দলের আক্রমণ সফল হল না।

এবারে একটিও বিমান নষ্ট হল না জার্মানদের, বরঞ্চ একটি জঙ্গী বিমান জার্মানেরা নামাল। ট্যাঙ্কের আক্রমণ যেখানে বিস্তৃতভাবে শুরু হবে, সে জায়গাটা কাছে এসে পড়েছে। উপরে ওঠবার সময় নেই। নিচে থেকে আক্রমণ করার ঝুঁকি নেবে ঠিক করল চেস্লোভ। মনে মনে সেটা অনুমোদন করল আলেক্সেই। খাড়া উঠে শত্রুর পেটে "খোঁচা" দেবার অদ্ভুত সামর্থ্য আছে "লাভচ্কিন-৫"গুলোর, সে সামর্থ্যের সুযোগ নিতে ব্যগ্র সে। প্রথম দলটি এরিমধ্যে তীরের মত উঠছে, ফোয়ারার মত ছুটেছে ট্রেসার গুলির রেখা। তৎক্ষণাৎ লাইন থেকে খসে পড়ল দুটো জার্মান বিমান। একটা আধ-

টুকরো হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই, কেন না ওটা হঠাৎ ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেল, লেজটা আর একটু হলে মেরেসিয়েভের বিমানে লাগত।

'হুঁশিয়ার!' চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ, পেত্রভের বিমানের কালো রেখার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে স্টিকটা টানল সে।

মাটি উল্টে গেল। টলে পড়ল আলেক্সেই, যেন ভীষণ জোরে কেউ তাকে সিটের কাছে চেপেছে। মুখে আর ঠোঁটে রক্তের স্বাদ, চোখে ঝাপসা লাল দেখছে। বিমানটি প্রায় খাড়া হয়ে তীরের মত উঠছে। সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে, দৃষ্টিপথে এক ঝলকে এল একটা "ইয়ুনকারসের" দাগ-দেওয়া পেট, ভোঁতা জুতোর মত মোটা চাকাগুলোর হাস্যকর আকৃতি, বিমানক্ষেতের এঁটেল মাটি লেগে আছে চাকায়, সেগুলো পর্যন্ত।

ঘোড়া টিপল আলেক্সেই। শত্রু বিমানটির কোথায় গুলি লাগল — পেট্রলের ট্যাঙ্কে, ইঞ্জিনে না বোমা রাখবার জায়গায় — জানে না আলেক্সেই, কিন্তু বিস্ফোরণের বাদামি ধোঁয়ায় নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

ধাক্কায় একপেশে হয়ে গেল মেরেসিয়েভের বিমান, আগুনের গোলক ঝট করে পেরিয়ে গেল সেটা, বিমানটা অনুমুখ করে চারিদিক দেখল আলেক্সেই। ডানদিকে, সাবানের ফেনার মত দেখতে শাদা মেঘের উপরে অসীম নীল শূন্যে পেত্রভের বিমান। আকাশ পরিত্যক্ত; শুধু দিগন্তে সুদূর মেঘের পটভূমিকায় ছোট ছোট বিন্দু চোখে পড়ে — ইতস্তত বিক্ষিপ্ত "ইয়ুনকারস" ওগুলো। ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল আলেক্সেই। মনে হয়েছিল যে যুদ্ধটা অন্তত আধ-ঘণ্টা চলেছে, পেট্রল নিশ্চয়ই কমে আসছে; কিন্তু ঘড়িতে দেখল মাত্র সাড়ে তিন মিনিট কেটেছে।

'বেঁচে আছ তাহলে?' এখন পাশাপাশি ডানদিকে চলেছে পেত্রভ, সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই।

ইয়ারফোনে নানা শব্দের গণ্ডগোলে কানে এল দূর উল্লসিত কণ্ঠস্বর: 'বেঁচে আছি... নিচে, নিচে দেখুন!'

নিচে ক্ষতবিক্ষত বিকলাঙ্গ উপত্যকার কয়েকটা জায়গায় পেট্রলের ট্যাঙ্ক জ্বলছে, স্তব্ধ হাওয়ায় ঘন ধোঁয়ার মেঘ থামের মত উঠছে। কিন্তু শত্রু বিমানগুলোর জ্বলন্ত ভগ্নাবশেষের দিকে তাকাল না আলেক্সেই। মাঠ হয়ে বিস্তৃতভাবে দ্রুতগতিতে চলেছে ধূসর-সবুজ অনেক গুবরে-পোকা, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সেদিকে। দুটো নিচু জায়গা হয়ে গুড়ি মেরে শত্রুপক্ষের লাইনে পৌঁছিয়েছে ওরা, সামনের গুলো এরি মধ্যে ট্রেঞ্চ পার হচ্ছে। ধড় থেকে

লাল স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে শত্রুপক্ষের লাইনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে তারা, এগিয়েই চলেছে, যদিও পিছনে জার্মান কামানের গোলাগুলির ঝলক আর ধোঁয়া।

শত্রুপক্ষের বিধ্বস্ত গড়খাইগুলির গভীরে শত শত গুবরে-পোকার উপস্থিতির মানেটা কী মেরেসিয়েভ বুঝল।

সোভিয়েত জনগণ, স্বাধীনতা-প্রিয় সমস্ত দেশের জনগণ পরদিন সংবাদপত্রে আনন্দে আর উল্লাসে যা পড়েছিল, তাই এখন দেখছে মেরেসিয়েভ। কুর্স্ক স্যালিয়েন্টের একটা খণ্ডে বাহিনীটি দু ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর শত্রুপক্ষের লাইন ভেদ করে সে ফাঁক দিয়ে ঢুকে পথ করে দেয় অন্যান্য সোভিয়েত সৈন্যদলের, যারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।

ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রনের ন'টি বিমানের মধ্যে দুটো ঘাঁটিতে ফিরল না। ন টি "ইয়ুনকারসকে" নামানো হয়েছে। বিমানের সংখ্যা গণনার সময় নয়-দুই হারটা নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু দুজন কমরেডের বিয়োগে জয়লাভের আনন্দটা কমে গেল। সফল আক্রমণের পরে সাধারণত বৈমানিকরা যা করে থাকে সেটা করল না তারা, বিমান থেকে নেমে উল্লাস, চীৎকার, অঙ্গভঙ্গী করে যুদ্ধের সাগ্রহ আলোচনা, অতিক্রান্ত বিপদের স্মরণ, কিছুই না। বিষণ্ণ মুখে চিফ অব স্টাফের কাছে গিয়ে সংক্ষিপ্ত নীরস কথায় যুদ্ধের ফলাফল জানিয়ে চলে গেল তারা পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে।

দলে আলেক্সেই নবাগত, যে দুজন মারা গিয়েছে তাদের চিনত না। কিন্তু অন্যদের মনোভাবের ছোঁয়া তার লাগল। ওর জীবনের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার জন্য শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এতদিন তৈরী হয়েছে, যেটা তার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা নির্ধারিত করল, সেটা ঘটেছে... সুস্থ সমর্থ লোকেদের দলে ফিরেছে সে। এটার কথা কতবার না স্বপ্ন দেখেছে, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে, হাঁটা আর নাচ শেখার সময়, বিমানচালনায় নিপুণতা ফিরে পাবার কঠিন শিক্ষার সময়ে! আর এখন বহুপ্রত্যাশিত দিনটি এসেছে, দুটো জার্মান বিমান সে নামিয়েছে, জঙ্গী বৈমানিকদের পরিবারে সমান অধিকারে প্রত্যাগত আবার, অন্যদের মত সেও চিফ অব স্টাফের কাছে গিয়ে ফলাফলের কথা বলল, জানাল খুঁটিনাটি কথা, পেত্রভের প্রশংসা করল, আর যারা সেদিন ফেরেনি তাদের কথা ভেবে বার্চগাছের ছায়ায় সরে গেল।

একমাত্র পেত্রভই বিমানক্ষেতে ছোটাছুটি করছে, খালি মাথা তার, হাওয়ায় চুল উড়ছে, যাকে পাচ্ছে তার আস্তিন আঁকড়ে ধরে শোনাচ্ছে:

'...একেবারে আমার পাশে ও ছিল, প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে... শোনো... সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট দেখলাম দলের নেতার দিকে নিশানা করছে... ওর পরেরটি আমার দৃষ্টিপথে এল, ব্যস, গুলি ছুঁড়লাম!'

মেরেসিয়েভের কাছে দৌড়িয়ে গিয়ে ওর পায়ের নিচে ঘাসওয়ালা নরম শেওলার উপরে শুয়ে গা হাতপা ছড়িয়ে দিল পেত্রভ। কিন্তু এরকম আরামে শুয়ে থাকতে না পেরে লাফিয়ে উঠে বসে বলল:

'চমৎকার কয়েকটা কসরৎ আজ আপনি দেখিয়েছেন! অদ্ভুত! দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম! কী করে ওটাকে ঘায়েল করলাম, জানেন? শুনুন... আপনার পিছু পিছু গিয়ে দেখলাম একেবারে পাশে এসে পড়েছে, আপনি এখন যেমন কাছে ঠিক সে রকম...'

'থাম ত, ছোকরা!' পকেট চাপড়ে বাধা দিয়ে বলল আলেক্সেই। 'চিঠিগুলো... চিঠিগুলোর কী হল?'

চিঠিগুলো সেদিন এসেছিল, পড়ার সময় হয়নি মনে পড়ে গেল। পকেট হাতড়ে না পাওয়াতে ভয়ে ঘেমে উঠল। টিউনিকের ভেতরে খোঁজাতে খসখসে খামগুলো হাতে লাগাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আলেক্সেই। উৎসাহী তরুণটি কী বলছে তাতে কান না দিয়ে ওলিয়ার চিঠিটা বের করে সাবধানে খামের একটা কোণ ছিঁড়ল।

ঠিক সে সময়ে হাউই'এর শব্দ। লাল জ্বলন্ত একটা সাপ উঠল আকাশে, বিমান-ঘাঁটির উপরে বৃত্ত রচনা করে মিলিয়ে গেল; ধূসর ধোঁয়ার রেশ আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছে। বৈমানিকরা এক লাফে উঠে পড়ল। টিউনিকে চিঠিটা রেখে দিল আলেক্সেই, একটিও কথা পড়তে পায়নি সে। খামটা খুলতে গিয়ে লেখার পাতাটা ছাড়াও শক্ত কী একটা হাতে ঠেকেছিল। নিজের দলের পুরোভাগে এখন-পরিচিত গতিপথে উড়তে উড়তে মাঝেমাঝে হাত দিয়ে খামটা দেখে ভিতরে কী আছে ভাবল।

ট্যাঙ্ক-বাহিনী যেদিন শত্রুপক্ষের লাইন ভেদ করে সেদিন থেকে আলেক্সেই'র জঙ্গী বিমান দলের যুদ্ধ কাজ শুরু। ভাঙ্গা লাইনের দিকে যাচ্ছে স্কোয়াড্রনের পর স্কোয়াড্রন। যুদ্ধের পর ফিরে এসে নামতে না নামতেই আর একটা স্কোয়াড্রন উঠছে, প্রত্যাগত বিমানগুলোর দিকে দৌড়িয়ে যাচ্ছে পেট্রলের ট্রাক। খালি ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালা হচ্ছে দিলদরাজ ধারায়। গনগনে ইঞ্জিনগুলোর উপরে কম্পমান ঝাপসা ভাপ, গরমিকালের বৃষ্টির পরে মাঠেঘাটে যেমনটা দেখা যায়। এমন কি মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যও ককপিট

ছেড়ে বৈমানিকরা যায় না; এ্যালুমিনিয়ামের টিনে খাবার তাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু খাবার মত মেজাজ কারোর নেই, গলায় আটকে যায় খাবার।

ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রন ফিরে এসে নামল· বিমানগুলোকে বনের কাছে নিয়ে গিয়ে আবার পেট্রল ভরা হচ্ছে, হাসিমুখে ককপিটে বসে আছে মেরেসিয়েভ; দবদপে ক্লান্তির প্রীতিকর অনুভূতি শরীরে, অধৈর্যভাবে সে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে, যারা পেট্রল ভরছে তাড়া দিচ্ছে তাদের। আবার হামলায় ফিরে যেতে চায় সে, চায় নিজেকে পরখ করতে। বারবার টিউনিকের ভিতরে হাত দিয়ে খসখসে খামগুলোকে স্পর্শ করছে, কিন্তু এই অবস্থায় পড়ার ইচ্ছে নেই তার।

প্রদোষ শুরু হল, শুধু তখন বৈমানিকদের ছাড়া মিলল। আস্তানার দিকে মেরেসিয়েভ গেল, সাধারণত বনের মধ্য দিয়ে যে সোজা পথে সে যায় সেটা ধরে নয়, আগাছায়-ভরা মাঠের ঘুরপথে। আপাত শেষহীন দিনটির দ্রুত পরিবর্তিত নানা ভাবের পরে, মুখর নানা শব্দের পরে বিশ্রাম করতে, গুছিয়ে ভাবতে চায় সে।

পরিষ্কার সুগন্ধি সন্ধ্যা, এত স্তব্ধ যে কামানের দূর গর্জনকে আর যুদ্ধের আওয়াজের মত ঠেকে না, মনে হয় গতপ্রায় ঝড়ের গুরুগুরু ধ্বনি। রাস্তাটা যে মাঠ দিয়ে গিয়েছে আগে সেটা ছিল গমের ক্ষেত। সাধারণত উঠোনের কোণে কিম্বা মাঠের ধারে পাথরের স্তূপের কাছে আগাছারা সন্তর্পণে পাতলা ডাঁটা মেলে দেয়, মালিকের নজর যায় না এমন সব জায়গায়, কিন্তু এখানে অখণ্ড প্রাকারের মত বিরাট উদ্ধত বলিষ্ঠভাবে উঠেছে আগাছার ঝাড়, পরাভূত করেছে জমিকে, বহু বংশপরম্পরায় চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে জমিকে উর্বরা করেছিল। শুধু এখানে সেখানে ঘন আগাছার মধ্যে ঘাসের ক্ষীণ ডগার মত গজিয়ে ওঠে গমের কয়েকটা পাতলা শিষ। জমির সমস্ত কিছু খেয়ে ফেলেছে আগাছা, শুষে নিয়েছে সূর্যালোক, গমকে বঞ্চিত করেছে সূর্যের আলো আর আহার্য থেকে, ফুল আর শস্য হবার আগেই তাই গমের শিষগুলো শুকিয়ে গিয়েছে।

মেরেসিয়েভ ভাবল: ঠিক এইভাবে ফ্যাশিস্টরা চায় আমাদের ক্ষেতে শেকড় গজাতে, জমির সার গিলে ফেলতে, কেড়ে নিতে চায় আমাদের সম্পদ, তারপর বিকট ঔদ্ধত্যে উঠে সূর্যকে আড়াল করে আমাদের পরিশ্রমপ্রিয়, বিরাট মহান জনগণকে তাড়িয়ে দিতে চায় ক্ষেত খামার থেকে। ফ্যাশিস্টরা চায় ওদের পরাভূত করে শুষে নিতে, ঠিক যেভাবে এই আগাছাগুলো

অল্পসংখ্যক গমের শিষগুলোকে সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত করেছে, সবল সুন্দর শস্যদানার সঙ্গে বাহ্য সাদৃশ্যটুকু পর্যন্ত এখন ওদের নেই। বালকসুলভ উদ্যমের প্রেরণায় আলেক্সেই আবলুস কাঠের ছড়িটা সজোরে ঘুরিয়ে লালচে, পালকের মত আগাছাগুলোকে ঘা দিল, গোছা গোছা উদ্ধত মাথা কেটে পড়ে যাওয়াতে খুসিতে ভরে উঠল তার মন। মুখ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, তবুও গমের টুঁটি-চাপা আগাছাগুলোকে কেটে চলল আলেক্সেই, ক্লান্ত শরীরে লড়াই আর আলোড়নের আমেজে উল্লসিত সে।

অপ্রত্যাশিতভাবে পিছনে হুঙ্কার দিয়ে একটা জিপ হঠাৎ কিঁচকিঁচিয়ে ব্রেক কষে থামল পথের উপরে। ফিরে না তাকিয়েই আঁচ করল আলেক্সেই যে উইং কম্যাণ্ডার কাছে এসে পড়েছেন, তার বালকসুলভ কার্যকলাপ দেখেছেন তিনি। কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল তার, গাড়িটা আসার শব্দ শুনতে পায়নি এমন ভান করে, ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। কিন্তু কানে এল কর্ণেল বলছেন:

'ওগুলো কাটা হচ্ছে বুঝি? কাজের মত কাজ বটে। আর আমি সারা বিমান-ঘাঁটিতে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাদের বীর কোথায়? কোথায় গেল? আর তিনি এখন আগাছার সঙ্গে যুদ্ধ মত্ত।'

জিপ থেকে লাফিয়ে নামলেন কর্ণেল। গাড়ি চালাতে এবং অবসর সময়ে গাড়ি নিয়ে ঘুরঘুর করতে ভালোবাসতেন তিনি, ঠিক যেমন ভালোবাসতেন কঠিন মহড়ার সময়ে নিজের দলের পুরোভাগে থাকাটা আর সন্ধ্যেবেলায় মিস্ত্রীদের সঙ্গে তৈলাক্ত ইঞ্জিনগুলো নাড়াচাড়া করা। সাধারণত নীল ওভারঅল থাকত গায়ে, শুধু তাঁর শীর্ণ, প্রভুত্বব্যঞ্জক চেহারা আর বিমান বাহিনীর চোস্ত ক্যাপটি দেখে বোঝা যেত তেলঝুল-মাখা মিস্ত্রীদের থেকে তিনি আলাদা।

তখনো বিব্রতভাবে ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়ছে মেরেসিয়েভ। তার কাঁধে হাত রেখে কর্ণেল বললেন:

'দেখি আপনার চেহারাটা একবার! হুঁ, গোল্লায় যান। আহা মরি এমন কিছু না! কথাটা এখন স্বীকার করি। যখন আমাদের এখানে এলেন তখন আপনার কথা বিশ্বাস করিনি, আর্মি হেডকোয়ার্টারসে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা সত্ত্বেও। বিশ্বাস করিনি যে আবার লড়তে পারবেন। তবুও আপনি পেরেছেন! আর তাও কেমন ভাবে... এই হল আমাদের জন্মভূমি রাশিয়া! অভিনন্দন জানাই আপনাকে! আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন নিন...

“পাতাল-সহরে” যাচ্ছেন বুঝি? চলুন, আপনাকে পৌঁছিয়ে দিই, ভেতরে আসুন।’

মেঠো পথ ধরে জিপ ছুটল, মোড় নেবার সময়ে পাগলের মত হেলে পড়ে।

‘শুনুন, আপনার হয়ত কিছু চাই, হয়ত আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে? আমার কাছে সাহায্য চাইতে ইতস্তত করবেন না, সাহায্য পাবার যোগ্য আপনি,’ পথহীন একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে নিপুণভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন কর্ণেল; দুধারে বৈমানিকদের থাকার জায়গা, ওরা সেটার নাম রেখেছে “পাতাল-সহর”।

‘আমার কিছু চাই না, কমরেড কর্ণেল। অন্যদের সঙ্গে আমার কোন তফাৎ নেই। আমার পা নেই, সেটা লোকে ভুলে গেলে ভালো,’ বলল মেরোসয়েভ।

—‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন... কোন ঘরটা আপনার? এটা?’

ডাগ-আউটের প্রবেশপথের সামনে ঝট করে জিপ দাঁড় করালেন কর্ণেল, মেরেসিয়েভ গাড়ি থেকে নামতে না নামতে জিপটা ধকধক শব্দে চলল বনের মধ্য দিয়ে, বার্চ আর ওকগাছের মাঝে এঁকেবেঁকে পথ করে নিয়ে।

ডাগ-আউটে গেল না আলেক্সেই। বার্চগাছের নিচে ব্যাঙের ছাতার গন্ধে-ভরা পশমের মত নরম শেওলার উপরে শুয়ে সাবধানে খাম থেকে বের করল ওলিয়ার চিঠিটা। একটা ফটোগ্রাফ গড়িয়ে পড়ল ঘাসে। তাড়াতাড়ি তুলে নিল সেটা আলেক্সেই, ব্যথায় ওর বুক ঢিপঢিপ করছে।

ফটোগ্রাফ থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে পরিচিত অথচ প্রায় চেনা যায় না একটি মানুষ। সামরিক পোশাকে ওলিয়ার ছবি: টিউনিক, পেটি, “অর্ডার অব্ দি রেড স্টার,” এমন কি গার্ডের তকমা — সেটা এত সুন্দর মানিয়েছে ওকে! দেখে মনে হয় অফিসারের পোশাকে পাতলা চেহারার সুদর্শন একটি ছেলে। শুধু ছেলেটির মুখে ক্লান্তির ছাপ, আর তার দীপ্ত বড়ো চোখজোড়ায় বয়সোনুচিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ চোখজোড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আলেক্সেই। সন্ধ্যেবেলায় দূর থেকে ভেসে আসা প্রিয় গানের সুরে মনে যে অকারণ ধীর বিষণ্ণ ভাব আসে, সে ভাবে ভরে গেল তার অন্তর। পকেটে ওলিয়ার পুরোনো ছবিটা পেল — শাদা তারার মত ডেইজির মধ্যে মাঠে বসে আছে ছাপা-ফ্রক পরনে। টিউনিক-পরা ক্লান্ত চোখ মেয়েটিকে আগে কখনো দেখেনি, আশ্চর্যের

বিষয়, চেনা মেয়েটির চেয়ে তাকে ভালো লাগল আলেক্সেই'র। নতুন ফটোগ্রাফটির পিছনে লেখা: "মনে রেখো।"

চিঠিটা ছোট, কিন্তু খুসিতে ভরা। স্যাপারদের একটি প্লেটুনের ভার এখন ওলিয়ার হাতে, যুদ্ধে নিযুক্ত নয় প্লেটুনটি, বেসামরিক কাজ, স্তালিনগ্রাদের পুনর্গঠনে সাহায্য করছে। নিজের কথা বিশেষ লেখেনি ওলিয়া, মহান সহরটির কথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছে: সহরটির ভগ্নাবশেষে প্রাণ ফিরে আসছে আবার, পুনর্গঠনের জন্য দেশের সব জায়গা থেকে এসেছে ছেলে মেয়ে আর প্রবীণারা, তাদের বাসা হল মাটির নিচে ঘর, কামান বসাবার জায়গা, বাঙ্কার — লড়াই শেষ হবার পরে টি'কে গিয়েছে সেগুলো — ট্রেঞ্চের কামরা, প্লাই-উডের ব্যারাক আর খোঁদল। লোকে বলছে যারা ভালো কাজ করবে তারা প্রত্যেকে পুনর্গঠিত সহরে ফ্ল্যাট পাবে। সেটা যদি সত্যি হয় তবে যুদ্ধ শেষ হলে বাসার অভাব আলেক্সেই'র হবে না।

গ্রীষ্মকালের গোধূলি নেমেছে তাড়াতাড়ি। টর্চের আলোয় চিঠির শেষ কয়েকটি ছত্র আলেক্সেই পড়ল। পড়া শেষ হয়ে গেলে ফটোগ্রাফটির উপরে আলো ফেলল। কঠিন অকপট চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ছেলে-সৈনিকটি। "প্রিয়তমা, তোমাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হচ্ছে... যুদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়ে যায়নি বটে, কিন্তু ভেঙ্গে ত পড়নি তুমি! তুমি কি প্রতীক্ষায় আছ? ধৈর্য ধর। আমি আসবই। আমাকে তুমি ভালোবাসো, বরাবর ভালোবেসো।" স্তালিনগ্রাদ যোদ্ধাটির কাছ থেকে আঠারো মাস নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চেপে রেখেছে বলে হঠাৎ লজ্জিত বোধ করল আলেক্সেই। প্রবল ইচ্ছে হল তক্ষুণি ডাগ-আউটে গিয়ে খোলাখুলিভাবে সবকিছু ওকে লেখে — যা ঠিক করবার ও যত শীগগির করে ততই ভালো। ব্যাপারটার ফয়সলা হয়ে গেলে দুজনের পক্ষেই মঙ্গল।

আজকের কীর্তিকলাপের পরে ওর সমকক্ষভাবে আলেক্সেই কথা বলতে পারে ওলিয়ার সঙ্গে। শুধু যে বিমান চালাচ্ছে নিজে তা নয়, লড়াইও করছে। নিজের কাছে ত শপথ করেছিল যে হয় সব আশা ভেঙ্গে গেলে নয় লড়াই'এ অন্যদের সমকক্ষ হলে সবকিছু জানাবে ওকে। সিদ্ধিলাভ করেছে সে। ওর নামানো বিমানদুটো সবায়ের চোখের সামনে ঝোপঝাড়ে পড়ে জ্বলেছে। উইঙের খাতায় ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছে সেদিনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, খবরটা গিয়েছে ডিভিশনাল ও আর্মি হেডকোয়ার্টারসে, মস্কোতেও।

এ সব সত্যি। নিজের অঙ্গীকার রেখেছে সে, এখন লিখতে পারে। কিন্তু একটা "স্তুকা" কি জঙ্গী বিমানের যোগ্য শিকার? ভাববার বিষয় সেটা। সত্যিকার শিকারী নিজের দক্ষতার কথা তুলে বলবে না যে সে, এই ধর না কেন, একটা খরগোস মেরেছে, বলবে কি?

বনে জোলো রাত্রি অন্ধকার হয়ে এল। যুদ্ধের বজ্রনির্ঘোষ দক্ষিণে চলে গিয়েছে, দূর অগ্নিকাণ্ডের রক্তাভা গাছের ডালপালার জাল ভেদ করে প্রায় দেখা যায় না, আর তাই স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে সুগন্ধি সতেজ গ্রীষ্মকালীন বনের সমস্ত শব্দ, ফাঁকা জায়গায় গঙ্গাফড়িঙের উন্মত্ত খসখস আওয়াজ, কাছের বিলে শত শত ব্যাঙের ডাক, একটি সারসের সুতীব্র চীৎকার, আর সবকিছু ছাপিয়ে ভিজে আধো-অন্ধকারে নাইটিংগেলের গান।

শিশিরে-ভেজা নরম শেওলার উপরে বার্চগাছের নিচে আলেক্সেই তখনো বসে, চাঁদের আলোর টুকরো কালো ছায়ায় মিশে পায়ের নিচে ঘাসে এসে পড়ছে। আবার পকেট থেকে ফটোটি বের করে হাঁটুর উপরে রেখে চাঁদের আলোয় সেদিকে তাকিয়ে থেকে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল আলেক্সেই। মাথার উপরে পরিষ্কার ঘন নীল আকাশে নৈশ বোমারু বিমানের ছোট কালো ছায়া একটার পর একটা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের শব্দ নিচু, খাদের সুরে বাঁধা, কিন্তু নাইটিংগেলের সঙ্গীতমুখর চন্দ্রালোকিত বনে যুদ্ধের এই শব্দটি পর্যন্ত শোনাচ্ছে গুবরে-পোকার শান্ত গুঞ্জনের মত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছবিটা টিউনিকের পকেটে রেখে আলেক্সেই সটান দাঁড়িয়ে উঠল, রাত্রির মোহ কাটাবার জন্য গা ঝাড়া দিল। পায়ের নিচে শুকনো ডালপালার খসখস, তাড়াতাড়ি সে নামল ডাগ-আউটে, সৈনিকের অপরিসর বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে দৈত্যের মত শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে পেত্রভ, নাক ডাকছে জোরে।

৫

ভোর হবার আগে বৈমানিক দলকে তুলে দেওয়া হল। আর্মি হেডকোয়ার্টারসে খবর এসেছে, যে-এলাকায় সোভিয়েত ট্যাঙ্ক লাইন ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল সেখানে তার আগের দিন জার্মান বিমানের একটা বড়ো দল এসেছে। কুর্স্ক স্যালিয়েন্টের একেবারে পীঠদেশের ব্যূহ ভেদ করে সোভিয়েত ট্যাঙ্কের অগ্রগতি যে বিপজ্জনক ব্যাপার সেটা বোধগম্য হয়েছে জার্মান কমাণ্ডের, তাই তলব করা হয়েছে সেরা জার্মান বৈমানিকরা যে দলে

আছে সেই "রিখথোফেন" বিমান ডিভিশনকে; পর্যবেক্ষণ আর স্কাউটদের আনা খবর সোভিয়েত হেডকোয়ার্টারসের এই ধারণা সমর্থন করল। স্তালিনগ্রাদের কাছে ছত্রভঙ্গ এই ডিভিশনটিকে পরে ফ্রন্ট লাইনের অনেক পিছনে কোথাও পুনর্গঠিত করা হয়। বৈমানিকদের সতর্ক করা হল যে শত্রু সংখ্যায় অনেক, একেবারে হালের বিমান... "ফোক-উলফ-১৯০" আছে ওদের, আর বিশেষ অভিজ্ঞ বৈমানিক ওরা, লড়াই করেছে অনেক। সে রাত্রে ফাঁক দিয়ে ট্যাঙ্কের অনুসরণ করতে শুরু করেছে মোটর চালিত বাহিনীর দ্বিতীয় দল, বৈমানিকদের সজাগ থাকতে এবং দলটিকে নির্ভরযোগ্য রক্ষণের কাজ করতে আদেশ দেওয়া হল।

"রিখথোফেন!" অভিজ্ঞ বৈমানিকরা নামটির সঙ্গে ভালো করে পরিচিত, হেরমান হেরিঙের বিশেষ পেটোয়া দল এটি। জার্মান সৈন্যরা কোণঠেসা হলেই দলটিকে পাঠানো হয়। এটির বৈমানিকরা — তাদের কয়েকজন প্রজাতান্ত্রিক স্পেনে বোম্বেটে যুদ্ধ চালিয়েছিল — হিংস্র দক্ষ লড়ুয়ে, বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে খ্যাতি ছিল তাদের।

'ওরা বলছে "রিখথোফেন" গোছের কী সব পাঠিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে! কী মজা! আশা করি শীগগিরই মুলাকাৎ হবে! "রিখথোফেনদের" আমরা দেখিয়ে দেব!' খাবার ঘরে বসে ভারিক্কি চালে বলল পেত্রভ, তাড়াতাড়ি খাবার গিলতে গিলতে আর জানলার দিকে তাকিয়ে, সেখানে ওয়েট্রেস রায়া বড়ো একটা গোছা থেকে ফুল বেছে, খড়ি দিয়ে মাজা ঝকঝকে ফাঁকা গোলার খাপে রাখছে।

বলাই বাহুল্য "রিখথোফেনদের" বিষয়ে এই বেপরোয়া উক্তিটি কফি পানরত আলেক্সেইকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি, কথাটা বলা হয়েছিল মেয়েটির জন্য, ফুল নিয়ে ব্যস্ত সে, মাঝেমাঝে সুদর্শন ফুটফুটে পেত্রভের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। অনুগ্রহসূচক হাসিতে দুজনকে দেখছিল আলেক্সেই, কিন্তু কাজ নিয়ে হাসি তামাসা আর বাচালতা তার পছন্দ নয়।

'"রিখথোফেন" যা-তা নয়,' আলেক্সেই বলল। 'আর "রিখথোফেন" মানে: যদি বনবাদাড়ে আজ পুড়তে না চাও তাহলে চোখজোড়া হামেশা খোলা রাখবে। ওটার মানে: কান খাড়া করে রাখবে, অন্যদের সঙ্গ ছাড়বে না। "রিখথোফেনরা" ছোকরা, বুনো জন্তুর মত, কোথায় আছ খেয়াল করতে না করতে শরীরে দাঁত বসিয়ে দেয়...'

ভোরবেলায় স্বয়ং কর্ণেলের পরিচালনায় প্রথম স্কোয়াড্রনটি আকাশে

উঠল। বারোটি জঙ্গী বিমানের আর একটি দল তৈরী হল ওঠবার জন্য। সেটির ভার "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর," গার্ডস-মেজর ফেদোতভের হাতে, কম্যান্ডারকে বাদ দিয়ে তিনি দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ বৈমানিক। বিমানগুলো প্রস্তুত, ককপিটে বসেছে বৈমানিকরা, নিচু গিয়ারে ইঞ্জিনগুলো বনের ধার ঘেঁষে হাওয়ার ঝটকা পাঠাচ্ছে, ঝড়ের আগে মাটি-ঝাঁটানো গাছ-নাড়ানো হাওয়ার মত, যখন বৃষ্টির প্রথম বড়ো ভারী ভারী ফোঁটা তৃষ্ণার্ত পৃথিবীতে সশব্দে পড়তে শুরু করে।

ককপিটে বসে আলেক্সেই দেখল প্রথম দলের বিমানগুলো খাড়া হয়ে নিচে নামছে, যেন আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। অভ্যাসবশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিমানগুলো গুণল সে, দুটোর নামতে একটু দেরী হওয়াতে উৎকণ্ঠায় সচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ বিমানটি নেমে এল। সবাই ফিরেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আলেক্সেই।

শেষ বিমানটি এক পাশে সরে যেতে না যেতেই মেজর ফেদোতভের "পয়লা" সজোরে উপরে উঠল, পিছু পিছু জোড়ায় জোড়ায় উঠল অন্য জঙ্গী বিমানগুলো। বনের ওধারে সারি বাঁধল তারা। গতিপথ দেখিয়ে চলেছেন ফেদোতভ। নিচুতে থেকে, ব্যূহভঙ্গের এলাকার উপরে সতর্কভাবে উড়ে চলল সবাই। আলেক্সেই দেখল তার বিমানের নিচে মাটিটা দৌড়িয়ে চলেছে, খুব উঁচু থেকে দূর পরিপ্রেক্ষিতে এবারে নয়, সে পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু দেখায় খেলনার মত, দেখল খুব কাছে থেকে। আগের দিন উপর থেকে যেটাকে খেলার মত মনে হয়েছিল এখন সেটা চোখের সামনে উপস্থিত বিরাট সীমাহীন রণক্ষেত্রের মত। বিমানের ডানার নিচে উন্মত্তগতিতে ধেয়ে চলেছে গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত, ট্রেঞ্চে কাটা এবড়োখেবড়ো মাটঘাট ঝোপঝাড়। মাঠে পড়ে আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাশ; পরিত্যক্ত কামান এক একটা, মায় গোটা ব্যাটারি, ভাঙ্গা ট্যাঙ্ক; যেখানে সৈন্যদলের উপরে গোলাগুলি বর্ষিত হয়েছিল সেখানে বাঁকাচোরা লোহা আর কাঠের ভারী স্তূপ; ভূমিসাৎ একটি বড়ো বন, উপর থেকে মনে হয় জানোয়ারের বিরাট পাল পায়ে দলেছে সেটাকে — সিনেমায় নানা দৃশ্যের মত সবেগে ভেসে যাচ্ছে, মনে হয় সিনেমাটির শেষ নেই। কী ভীষণ রক্তাক্ত যুদ্ধ চলে এখানে, কী দারুণ লোকক্ষয় হয়েছে, জয়লাভের গুরুত্বটা কত বিরাট দৃশ্যগুলি তার সাক্ষী।

বিস্তীর্ণ জায়গাটির সমস্তটা জুড়ে শত্রুপক্ষের অবস্থানের অনেক দূরে

পর্যন্ত, প্রায় আদিগন্ত গিয়েছে ট্যাঙ্কের চাকার জোড়া জোড়া আঁকাবাঁকা দাগ, যেন অদ্ভুত জানোয়ারের বিরাট একটা দল পথ না বেছে মাঠঘাট হয়ে দৌড়িয়ে, সমস্ত কিছু পায়ে দলে দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। মোটরচালিত কামান, পেট্রলের ট্যাঙ্ক, ট্রাক্টরে-টানা মেরামতের গাড়ি আর ঢাকা-দেওয়া লরি অন্তহীন সারিতে ট্যাঙ্কের পিছনে পিছনে চলেছে, ধুলোর গাঢ় পুচ্ছ অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। উপর থেকে মনে হয় এদের গতি শামুকের মত; আরো উঁচুতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এ সবকিছুকে দেখায় যেন বসন্তে বনের পথে অগ্রসর পিঁপড়ের বাহিনী।

অচঞ্চল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠছে ধুলোর রেখা, তাতে ঝাঁপিয়ে, যেন মেঘে ডুব মারছে এমনভাবে জঙ্গী বিমানগুলো সারির উপর দিয়ে গেল অগ্রগামী জিপগুলোর দিকে, ট্যাঙ্ক-বাহিনীর কম্যাণ্ডাররা বুঝি তাতে আছে। এদের উপরে আকাশে শত্রু বিমান নেই, দূরে ঝাপসা দিগন্তে যুদ্ধের ইতস্তত ধূম্ররেখা এরি মধ্যে চোখে পড়ে। বিমান দল পিছন ঘুরে সাপের মত এঁকেবেঁকে অগাধ আকাশে উড়ে চলল। ঠিক সেই মুহূর্তে আলেক্সেই দেখল দিগন্তে প্রথমে একটা, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে কালো দাগ খুব নিচুতে ভাসছে। জার্মানরা! ওরাও খুব নিচু দিয়ে প্রায় জমি ঘেঁষে আসছে, আগাছায়-ভরা লালচে মাঠের উপরে ধোঁয়ার রেখা যে ওদের লক্ষ্য বোঝা গেল। পিছন ফিরে স্বতই তাকাল আলেক্সেই। পেত্রভ ওর পিছনে, যতখানি কাছে থাকা যায় ততখানি কাছে।

কান পেতে আলেক্সেই শুনল দূর থেকে কে বলছে:

'আমি ২ নং গাঙচিল ফেদোতভ; আমি ২ নং গাঙচিল, ফেদোতভ। এ্যাটেনশন! আমার পিছনে চল!'

ওড়বার সময়ে জ্যাবদ্ধ থাকে বৈমানিকদের স্নায়ু, তখন আদেশ পালন করার ব্যাপারটা এমন যে অনেক সময় কমাণ্ডার হুকুম দিতে না দিতেই তার অভিপ্রায় মেনে চলে তারা। নানা আওয়াজ আর গুঞ্জনের মধ্যে নতুন আদেশটি শোনার আগেই সমস্ত দলটি জার্মানদের বাধা দেবার জন্য জোড়ায় জোড়ায় কিন্তু সার বেঁধে ঘুরল। দর্শন ও শ্রবণশক্তি আর মন একাগ্র। চোখের সামনে শত্রু বিমানগুলো দ্রুতবেগে বড়ো হচ্ছে, তা ছাড়া আর কিছু দেখছে না আলেক্সেই; দ্বিতীয় হুকুমটি কখন শুনবে তার প্রতীক্ষায় আছে, ইয়ারফোনে শুধু নানা চড়মড়, গুনগুন ধ্বনি। কিন্তু হুকুমটির জায়গায় স্পষ্টভাবে কানে এল জার্মান ভাষায় কার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর:

'আখটুং! আখটুং!.. "লা-ফিউন্‌ফ্‌!" আখটুং!* নিচের পরিদর্শক জার্মান বিমানগুলোকে বিপদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, তার কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই।

যথারীতি বিখ্যাত জার্মান বিমান ডিভিশনটি যেসব জায়গায় আকাশ যুদ্ধ হবে বলে মনে করেছে সেসব জায়গায় আগের দিন রাত্রে প্যারাসুটে লক্ষ্যকারী আর পরিদর্শক নামিয়েছে; রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে তারা কয়েকটি দলে সতর্কভাবে যুদ্ধভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

পরে অত স্পষ্টভাবে নয়, কানে এল আর একজন ভাঙ্গা গলায় ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে জার্মানে বলছে:

'দনের-ভেতের! লিঙ্ক্‌স "লা-ফিউন্‌ফ্‌!" লিঙ্ক্‌স "লা-ফিউন্‌ফ!"'**

বিরক্তি ছাড়াও সে কণ্ঠস্বরে ছিল আতঙ্কের আভাস।

'"রিখথোফেন," আমাদের "লাভচ্‌কিনদের" তোমরা ভয় পাও না নিশ্চয়ই,' মেরেসিয়েভ দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল, শত্রু বিমানগুলো সার বেঁধে আসছে, তাদের দেখতে দেখতে টান-টান শরীর উত্তেজনায় সচকিত হয়ে উঠল।

এবার শত্রু বিমানগুলো স্পষ্টভাবে গোচরে এসেছে। এরা হল "ফোক-উলফ-১৯০"। সবেমাত্র কাজে লাগানো হয়েছে সবল দ্রুতগতি বিমানগুলোকে।

সংখ্যায় তারা ফেদোতভের দলের চেয়ে দ্বিগুণ। যে ধরাবাঁধা কায়দা "রিখথোফেন" বাহিনীর বৈশিষ্ট্য সেই কায়দায় উড়ছে তারা, জোড়ায় জোড়ায়, মই'এর ধাপের মত, যাতে প্রত্যেকটি জোড়া সামনের বিমানদুটির পিছন দিকটা রক্ষা করতে পারে। উচ্চতার সুবিধে নিয়ে ফেদোতভ ওদের আক্রমণ করল। নিজের লক্ষ্য বাছাই করে নিয়েছে আলেক্সেই, অন্যদের নজরে রেখে সেদিকে চলেছে, চেষ্টা করছে যাতে সেটা দৃষ্টির বাইরে চলে না যায়। কিন্তু ফেদোতভের আগেই অন্য কে যেন কাজে নেমে পড়ল। অন্যদিক দিয়ে ঝড়ের মত এসে একদল "ইয়াক" উপর থেকে জার্মানদের দ্রুতবেগে আক্রমণ করল। আঘাতটা এত সফল যে তৎক্ষণাৎ শত্রুদের দল ভেঙ্গে গেল। আকাশে বিশৃঙ্খলা। দু পক্ষই দল ভেঙ্গে দুই'এ দুই'এ, চারে চারে লড়াই করছে। জঙ্গী বিমানগুলি ট্রেসার গুলির ফোয়ারা ছুটিয়ে চেষ্টা করছে শত্রুদের কেটে দিতে, পাশে এবং পিছনে গিয়ে পড়তে।

* অ্যাটেনশন! অ্যাটেনশন! "লাভচ্‌কিন-৫"! অ্যাটেনশন! (জার্মান ভাষায়)

** সর্বনাশ! বাঁয়ে! "লাভচ্‌কিন-৫"! বাঁয়ে! "লাভচ্‌কিন-৫"! (জার্মান ভাষায়)

জোড়া বিমানগুলি চক্রাকারে ঘুরছে, তাড়া করছে অন্যদের, জটিল নাগরদোলার মত তাদের সঞ্চরণ।

এই বিশৃঙ্খলায় ঠিক কী ঘটছে শুধু অভিজ্ঞ লোকেই বুঝতে পারে, ঠিক যেমন ইয়ারফোনে বিশৃঙ্খল হট্টগোলের অর্থ অভিজ্ঞ বৈমানিকের কানে ধরা পড়ে। সে সময়ে আকাশে কী না শোনা যায়! আক্রমণকারীরা ভাঙ্গা গলায় রসালো গালিগালাজ করছে, বিজয়ের উল্লসিত আর পরাজয়ের ভয়ার্ত চীৎকার, আহতদের আর্তনাদ, হঠাৎ মোড় নিতে নিতে দাঁতে দাঁত চাপছে কোন বৈমানিক, ভারী নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ... যুদ্ধের উন্মত্ততায় কে যেন গলা ফাটিয়ে জার্মান গান গাইছে, কে যেন রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল "মা"! কে যেন ঘোড়া টিপতে টিপতে বলল, "ঠেলা সামলাও এবার!"

মেরেসিয়েভের লক্ষ্য বিমানটি দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। তার পরিবর্তে উপরে দেখল একটি "ইয়াককে" পিছু ধাওয়া করেছে একটি চুরোটাকৃতি সোজা-পাখা "ফোক", দুপাশ থেকে ইতিমধ্যেই সমান্তরালভাবে ট্রেসার গুলির ফোয়ারা ছুটছে। "ইয়াকের" লেজে এসে পড়ছে গুলির ধারা। সেটিকে বাঁচাবার জন্য রকেটের মত উপরে উঠল মেরেসিয়েভ। মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য ঝট করে উপর দিয়ে একটি ছায়া গেল, আর সেই ছায়া লক্ষ্য করে সমস্ত কামান ছোটাল মেরেসিয়েভ। "ফোকটার" কী হল দেখতে পেল না মেরেসিয়েভ শুধু নজরে পড়ল "ইয়াকটা" এখন একলা, লেজটা জখম বটে। গণ্ডগোলের মধ্যে পেত্রভ হারিয়ে গিয়েছে কি না দেখবার জন্য পিছন ফিরে তাকাল মেরেসিয়েভ। না, ও প্রায় তার বরাবর উড়ছে।

'পিছনে পড়ে থেক না, ছোকরা,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল আলেক্সেই।

চড়চড়, গুনগুন, গান, দুই ভাষায় উল্লসিত ও ভয়ার্ত চীৎকার, গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ, দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ, গালিগালাজ, গভীর নিশ্বাসপ্রশ্বাস — আলেক্সেই'র কানে তালা ধরে গিয়েছে। শব্দগুলো শুনে মনে হয় না আকাশ-যুদ্ধ চলেছে, মনে হয় মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে হাতাহাতি করে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণে লড়ছে লোকে।

শত্রু বিমান কোথায় দেখার জন্য ফিরে তাকাল মেরেসিয়েভ, আর হঠাৎ শরীর হিম হয়ে গেল। ঠিক নিচে, একটা "ফোক" একটি "লাভচ্‌কিন-৫"কে আক্রমণ করেছে। সোভিয়েত বিমানটির নম্বর দেখতে পেল না আলেক্সেই, কিন্তু বুঝতে পারল ওটা পেত্রভের। "ফোক-উলফটা" আক্রমণ করেছে, সমস্ত কামান থেকে একসঙ্গে ছুটেছে ট্রেসার গুলি। আর এক মুহূর্ত শুধু পেত্রভ

টি'কে থাকবে! ওরা দুজনে এত কাছাকাছি যে আকাশ-যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম মেনে বন্ধুকে ঝট করে সাহায্য করার উপায় নেই, না আছে সময়, না আছে ঘোরবাব জায়গা। কিন্তু বন্ধুর জীবন সংশয়, তাই অসাধারণ একটা চালের ঝুঁকি নেবে ঠিক করল আলেক্সেই। সটান নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, গ্যাস বাড়িয়ে দিল। বিমানটির ভার জাড্যে আর ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তির সঞ্চারে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে, পাথরের মত, না, পাথরের মত নয়, রকেটের মত বিমানটি হ্রস্ব-পাখা "ফোকটির" উপরে সটান পড়ল, ট্রেসার গুলির জালে সেটিকে আচ্ছন্ন করে। প্রচণ্ড গতিবেগ আর দ্রুত অধোগতির জন্য চেতনা লুপ্ত হবার অনুভূতি আলেক্সেই'র, সটান ঝাঁপিয়ে নিচে পড়ল সে, ঝাপসা চোখে কোনক্রমে দেখল যে নিজের প্রপেলারের ঠিক সামনে বিস্ফোরণের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল "ফোকটি"। কিন্তু পেত্রভ কোথায়? কোন পাত্তা নেই। বিমানটি নামিয়ে দিয়েছে কি ওরা? পারাস্যুট নামতে পেরেছে? এড়িয়ে যেতে পেরেছে?

আকাশ ফাঁকা। নিঃশব্দ হাওয়ায় অদৃশ্য বিমান থেকে সুদূর কণ্ঠস্বর কানে এল:

'আমি ২ নং গাঙচিল, ফেদোতভ। আমি ২ নং গাঙচিল, ফেদোতভ। আমার পিছনে সার বাঁধ। ফিরে চল! আমি ২ নং গাঙচিল...'

ফেদোতভ নিজের দলকে তাহলে অপসরণ করছে।

"ফোক-উলফটিকে" সারা করে, বেপরোয়া পতনের পরে বিমানটিকে সোজা করে আলেক্সেই বসে আছে, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে; আকাশ এখন প্রশান্ত, ভালো লাগছে সেটা, বিপদ অতিক্রান্ত, বিজয়ের সচেতনতা মনে। ফেরবার গতিপথ ঠিক করার জন্য তাকাল কম্পাসের দিকে, তারপর পেট্রলের কাঁটার দিকে। ভুরু কোঁচকাল। পেট্রল অনেক কমে গিয়েছে, কোনক্রমে ঘাঁটিতে পোঁছন যেতে পারে। কিন্তু পর মুহূর্তে শূন্যের কাছাকাছি পেট্রলের কাঁটার চেয়েও ভয়াবহ আর একটি জিনিস আলেক্সেই দেখল — একটি তরঙ্গিত মেঘের পিছন থেকে, ভগবান জানেন কোথা থেকে, একটা "ফোক-উলফ-১৯০" সটান তার দিকে আসছে। ভাববার সময় নেই, এড়িয়ে যাবার সময় নেই।

শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য ক্ষিপ্রভাবে বিমান ঘোরাল আলেক্সেই।

৬

যে রাস্তা ধরে আক্রমণকারী বাহিনীর পশ্চাদবর্তী সৈন্যদল একটানা চলেছে, তার উপরে আকাশ-যুদ্ধের নানা শব্দ শুধু যে যুদ্ধরত বিমানগুলির কর্কপিটে বৈমানিকদের কানে যাচ্ছে তা নয়।

গার্ডস ফাইটার উইঙ্গের কম্যান্ডার কর্ণেল ইভানভ বিমানভূমিতে বড়ো একটা পরিচালনা-রেডিও বসিয়েছেন, তা দিয়েও শব্দগুলি শোনা যাচ্ছে। তিনি নিজে অভিজ্ঞ বৈমানিক, যে সব শব্দ আসছে তা শুনে বুঝতে পারলেন যে কড়া যুদ্ধ চলেছে, শত্রুপক্ষ জোরালো আর একরোখা, আকাশ ছেড়ে চলে যেতে একেবারে রাজী নয়। ফেদোতভের লোকেরা দলেভারি শত্রুদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে, খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিমান-ঘাঁটিতে। যারাই পারল তারাই বন থেকে খালি জায়গাটায় এসে উৎকণ্ঠিতভাবে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রইল, বিমানগুলির ওদিক থেকে ফেরার কথা।

শাদা ওভারঅল পরনে সার্জনরা খাবার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, খাবার চিবোতে চিবোতে তারা দৌড়চ্ছে। ছাতে বড়ো বড়ো রেডক্রস চিহ্নিত এম্বুলান্সের গাড়িগুলো ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে, ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আওয়াজ, কাজে লাগার জন্য তৈয়ার গাড়িগুলো।

প্রথম বিমানজোড়াটি গাছের মাথার উপর দিয়ে এসে পড়ল, বিমানভূমির উপরে চক্রাকারে না ঘুরেই নেমে প্রশস্ত জায়গাটির উপর দিয়ে চলল। জোড়ার একটা হচ্ছে "পয়লা", সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ফেদোতভ তার চালক আর একটি হল "দোসরা", চালক হল তাঁর অনুসরণকারী। ঠিক পরেই এল দ্বিতীয় জোড়াটি। বনের উপরে আকাশ ফিরতি বিমানগুলির ইঞ্জিনের গর্জনে মুখর।

'সাত, আট, নয়, দশ,' আকাশের দিকে ক্রমশ বর্ধিষ্ণু উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে দর্শকেরা গুণছে।

ফিরে-আসা বিমানগুলি নেমে মাঠ ছেড়ে ঢাকা জায়গায় চলে গেল, থেমে গেল তাদের আওয়াজ। দুটো বিমান এখনো ফেরেনি।

প্রতীক্ষারত লোকেরা উদগ্রীব, চুপচাপ। মুহূর্তগুলি কাটছে যন্ত্রণাদায়ক মন্থরতায়।

'মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ,' একজন আস্তে আস্তে বলল।

হঠাৎ বিমানভূমিতে শোনা গেল উল্লসিত নারীকণ্ঠ:

'ওই একটা!'

কানে এল বিমান ইঞ্জিনের গর্জন। বার্চগাছের উপর দিয়ে প্রায় তাদের ঘেঁষে "দ্বাদশ" এল। জখম হয়েছে বিমানটি, লেজের একটা ভাগ নেই, বাঁদিকের ডানার গোড়াটা ছিন্ন, বাকিটা এক ফালি তারে ঝুলছে। নেমে বিচিত্রভাবে হেলে দুলে চলল সেটা; সজোরে উপর দিকে উঠল, নেমে আবার লাফাল, আর এইভাবে বিমানভূমির সীমা পর্যন্ত গিয়ে একেবারে থেমে পড়ল, লেজটা একটু উঁচু হয়ে আছে। পাদানিতে সার্জন বসা এম্বুলেন্সগুলো, কয়েকটা জিপ আর প্রতীক্ষারত লোকেদের সবাই দৌড়িয়ে গেল সে দিকে। ককপিট থেকে উঠল না কেউ।

ঢাকনা সরানো হল। ককপিটে জড়পুত্তলির মত পড়ে আছে রক্তাক্ত পেত্রভ। মাথাটা অসহায়ভাবে বুকে ঝুলে পড়েছে। ভিজে সোনালী চুলের গোছায় মুখ ঢাকা। পেটিগুলো সার্জন আর নার্সরা খুলে ফেলল, গুলির টুকরোয় পারাসুট ব্যাগটা ছিঁড়ে গিয়েছে, সেটা সরিয়ে নিশ্চল দেহটি সাবধানে তুলে জমির উপরে রাখল। পেত্রভের পা আর হাত জখম হয়েছে। নীল ওভারঅলের উপরে কালো কালো দাগ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রাথমিক সাহায্যের পরে স্ট্রেচারে শোয়ানো হল পেত্রভকে। এম্বুলান্সে তোলা হচ্ছে, চোখ খুলল ও। ফিসফিসিয়ে কী যেন বলল, কিন্তু এত ক্ষীণ কণ্ঠে যে শোনা গেল না। মুখ কাছে নামালেন কর্ণেল।

'মেরেসিয়েভ কোথায়?' আহত পেত্রভ জিজ্ঞেস করল।

'এখনো ফেরেনি।'

স্ট্রেচারটা তোলা হল আবার, কিন্তু সজোরে মাথা নাড়ল আহত লোকটি, এমন কি নেমে পড়ার চেষ্টা পর্যন্ত করল।

'দাঁড়াও!' ও বলল। 'আমাকে নিয়ে যেও না। যেতে চাই না আমি। মেরেসিয়েভের অপেক্ষা করব। আমাকে বাঁচিয়েছে ও।'

বৈমানিক এত সজোরে আপত্তি জানাল আর ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলার ভয় দেখাল যে হাত নাড়লেন কর্ণেল, মুখ ঘুরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন:

'বেশ। থাকুক এখানে। মারা পড়বে না। মেরেসিয়েভের তেল যা আছে তাতে আর এক মিনিট মাত্র চলবে।'

স্টপ-ওয়াচ থেকে চোখ সরাতে পারলেন না কর্ণেল, লাল কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি এক একটি করে শেষ হচ্ছে। অন্য সবাই তাকিয়ে আছে ধূসর বনের দিকে, শেষ বিমানটির আসার কথা তার উপর দিয়ে। সবাই উৎকর্ণ,

কিন্তু কামানের দূর গুরুগুরু গর্জন আর কাছাকাছি একটি কাঠঠোকরার চাপা ঠকঠক শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

মাঝেমাঝে মিনিটের মেয়াদ কত না দীর্ঘ!

৭

শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য মেরেসিয়েভ ফিরল।

"লাভচ্‌কিন-৫" ও "ফোক-উলফ-১৯০" দুটোই ক্ষিপ্র বিমান। বিদ্যুৎবেগে দুটো পরস্পরের কাছে এল।

আলেক্সেই মেরেসিয়েভ আর বিখ্যাত "রিখথোফেন" ডিভিশনের অজানা পাকা বৈমানিকটি পরস্পরকে সরাসরি আক্রমণ করল। এ ধরনের আক্রমণ মুহূর্তের বেশী স্থায়ী হয় না, পাকা ধূমপায়ীর সিগারেট ধরাতে যত সময় লাগে এমন কি তার চেয়েও কম। কিন্তু মুহূর্তটি উদগ্র স্নায়বিক উত্তেজনায় সংহত, বৈমানিকের সমস্ত স্নায়ুর কঠোর পরীক্ষা চলে, ভূমিতে লড়াই করে যারা, সারাদিন যুদ্ধ করেও তাদের তেমন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় না।

যতখানি সম্ভব ক্ষিপ্র বেগে দুটি দ্রুতগতি জঙ্গী বিমান পরস্পরকে আক্রমণ করছে, তার একটি চালকের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করুন। চোখের সামনে প্রতিপক্ষের বিমানটির আকার বাড়ছে। হঠাৎ একেবারে সামনে দেখতে পেলেন খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু; ডানা, ঘুরন্ত প্রপেলারের ঝকঝকে বৃত্ত, কালো কালো বিন্দু, সেগুলো হল কামান। আর একটি মুহূর্ত, অমনি বিমানদুটির ধাক্কা লাগবে পরস্পরের সঙ্গে, ভেঙ্গেচুরে বিছিন্ন হয়ে যাবে এত অসংখ্য টুকরোয় যে কোনটি বৈমানিকের শরীরের অবশিষ্টাংশ আর কোনটিই বা বিমানের বের করা অসম্ভব হবে। শুধু ইচ্ছাশক্তি নয়, বৈমানিকের সমস্ত মনোবলের অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত সেটি। দুর্বলচিত্ত লোক সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না, জয়লাভের জন্য প্রাণ দিতে সে প্রস্তুত নয়। কিছু না ভেবেই স্টিকটা টানবে সে, ক্ষিপ্রবেগে আগুয়ান মারাত্মক প্রচণ্ড ঝড়টি লাফিয়ে পেরিয়ে যাবে। পর মুহূর্তে তার বিমানটি মাটিমুখো পড়বে, তলাটা কেটে গিয়েছে, হয়ত বা একটা ডানা খসে পড়েছে। তার পরিত্রাণ নেই। পাকা বৈমানিকদের এটা বিলক্ষণ জানা, সবচেয়ে সাহসী যারা শুধু তারাই সরাসরি আক্রমণের ঝুঁকি নেয়।

আকাশ ছিঁড়ে আসছে বিমানদুটো।

আলেক্সেই জানত, যে আসছে ওর দিকে সে আনাড়ি নয়, পূর্ব ফ্রণ্টে বিষম লোকক্ষয়ের পরে জার্মান বিমান বাহিনীর ফাঁকা জায়গা ভরাবার জন্য হেরিঙের আদেশে তালিকাভুক্ত, সংক্ষিপ্ত কর্মসূচীতে তাড়াতাড়ি তালিম-দেওয়া লোক নয়। "রিখথোফেন" বাহিনীর ঝানু বৈমানিক সে, আকাশে অনেক জয়ের চিহ্ন হিসেবে নিশ্চয়ই বিমানটির পাশে পরাভূত নানা বিমানের কালো ছায়া আঁকা। সে দ্বিধা করবে না, গতিপথ থেকে যাবে না সরে, যুদ্ধ এড়াবে না।

'সামাল, "রিখথোফেন",' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল আলেক্সেই। এত জোরে ঠোঁটদুটি চাপা যে রক্ত গড়াতে লাগল, সমস্ত পেশী সঙ্কুচিত করে, লক্ষ্যপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ইচ্ছাশক্তি সংহত করে আছে সে, যাতে সরাসরি আক্রমণোদ্যত বিমানটি এসে পড়লে চোখ বুজে না ফেলে।

স্নায়ু এত বেশী সংহত করেছে আলেক্সেই যে ঘূর্ণ্যমান প্রপেলারের ঝাপসা ঝড় ভেদ করে মনে হল শত্রু বিমানটির ককপিটের স্বচ্ছ ঢাকনাটা চোখে পড়ছে, তার পিছন থেকে তার দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে আছে একজোড়া চোখ, চোখদুটো উন্মত্ত হিংসায় জ্বলছে। ছবিটি স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি, কিন্তু আলেক্সেই'র দৃঢ় ধারণা সে সত্যিই দেখেছে। "এবার তাহলে শেষ," সমস্ত পেশী আরো সঙ্কুচিত করে সে ভাবল, "এবার তাহলে শেষ।" সামনে তাকিয়ে দেখল দ্রুতগতিতে বাড়ন্ত বিমানটি ঝড়ের মত আসছে তার দিকে। না, জার্মানটাও গতিপথ থেকে বিচ্যুত হবে না। এবার তাহলে শেষ।

আকস্মিক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হল আলেক্সেই। শত্রু বিমানটি মনে হচ্ছে হাতের নাগালে, হঠাৎ জার্মান বৈমানিকটি ঘাবড়ে গেল, বিমানটি ঝট করে উঠল উপরে, চোখের সামনে বিদ্যুত ঝলকের মত এসে পড়ল ওটির নীল রৌদ্রালোকিত নিম্ন দেশ। সেই মুহূর্তে ঘোড়া টিপে বিমানটিকে তিনবার গুলির জ্বলন্ত সুতোয় সেলাই করল আলেক্সেই, তারপর বৃত্তাকারে নেমে উঠল উপরে; মাথার উপরে পাক খেয়ে গেল জমি, তার পটভূমিকায় চোখে পড়ল বিমানটি অসহায়ভাবে ধীরে ধীরে ঝটপট করছে।

"ওলিয়া!" বিজয়োল্লাসে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সেই, সবকিছু ভুলে গিয়ে, খাড়া চক্রে পাক খেয়ে নামতে নামতে জার্মান বিমানটির অন্তিম

যাত্রায় সঙ্গ দিল সে, লাল আগাছায়-ভরা মাটি পর্যন্ত একেবারে, মাটিতে লাগল বিমানটি, শূন্যে উঠল কালো ধোঁয়ার থাম।

শুধু তখনি শিথিল হল স্নায়বিক সংহতি আর সঙ্কুচিত পেশী, অশেষ ক্লান্তির বোধ এল তার জায়গায়। পেট্রলের কাঁটার দিকে তাকাল আলেক্সেই। কাঁটাটি প্রায় শূন্যে পৌঁছিয়েছে। যা পেট্রল আছে তাতে তিন, বড়ো জোর চার মিনিট ওড়া চলে। বিমান-ঘাঁটিতে ফিরতে অন্তত দশ মিনিট লাগবে ওঠবার সময় বাদ দিয়ে। আহত "ফোকাটিকে" অনুসরণ করাটা বোকামী হয়েছে। "অবোধ শিশুর মত ব্যবহার," নিজেকে ভর্ৎসনা করল আলেক্সেই।

বিপদের মুহূর্তে সাহসী ধীরচিত্ত লোকেদের সব সময়ে যেমন হয়, আলেক্সেই'র মাথা পরিষ্কার, ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুলভাবে কাজ করছে। প্রথমে যেটা দরকার সেটা হল উপরে ওঠা, পাক খেয়ে নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিমান-ঘাঁটির দিকে আরোহণ। বেশ!

আবশ্যক গতিপথে বিমানটিকে আনল আলেক্সেই, নিচে মাটি নেমে গেল, দিগন্তে এল ঝাপসা ভাপ, সেটা দেখে আরো ধীরভাবে হিসেব করতে লাগল সে। পেট্রলের উপর নির্ভর করা বৃথা। মাপকাঠিতে সামান্য ভুল থাকলেও এ পেট্রলে অবশ্য কুলোবে না। বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছবার আগেই নামবে? কিন্তু কোথায়? সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথটির সবটা আবার মনে মনে ভেবে নিল আলেক্সেই। বন, জলা, আর স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যূহের এলাকায় অসমান মাঠ, আড়াআড়িভাবে কাটা, এখানে সেখানে গোলার গর্ত, আর কাঁটাতারে কীর্ণ।

'না, নামলে মারা পড়ব।'

পারাস্যুটে নামবে? সেটা করা যায়। এখনি! ঢাকনাটা খুলে বিমানটি ঘোরাও, স্টিকটা ঠেপো — ব্যস, আর কিছুর দরকার নেই। কিন্তু বিমানটির এই অদ্ভুত, দ্রুত চটপটে পাখিটির কী হবে! এর জঙ্গী গুণ একদিন তিনবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। পরিত্যাগ করবে এটাকে, ভেঙ্গেচুরে বাঁকাচোরা ধাতুর স্তূপে পরিণত করবে? সেটা করলে অবশ্য তার দোষ দেবে না কেউ। সে ভয় তার নেই। সত্যি বলতে, এ অবস্থায় পারাস্যুটে নামার অধিকার আছে তার। কিন্তু ঠিক এ সময়ে বিমানটিকে তার মনে হচ্ছিল বলিষ্ঠ উদার অনুগত জীবন্ত সত্তার মত, একে পরিত্যাগ করাটা ডাহা বেইমানি হবে। তা ছাড়া প্রথম কয়েকটি জঙ্গী নভোবিচরণের পরে বিনা বিমানে ফিরে যাওয়াটা কেমন হবে, আর একটি বিমান না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে, ফ্লন্টে শুরু

হয়েছে বিজয় যাত্রা, এরকম কর্মমুখর সময়ে অলসভাবে থাকা, হাত মুড়ে বসে থাকা!

"কিছুতেই না!" বেশ জোরে বলল আলেক্সেই যেন কারো প্রস্তাবের উত্তরে।

যতক্ষণ না ইঞ্জিন বন্ধ হয় ততক্ষণ উড়তে হবে। তারপর? দেখা যাবে।

আর উড়ে চলল আলেক্সেই, প্রথমে তিন হাজার, তারপর চার হাজার মিটার উপর দিয়ে মাটির দিকে চেয়ে দেখছে যদি কোন ছোট ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে। বিমান-ঘাঁটির সামনের বনটি এরিমধ্যে দেখা যাচ্ছে দিগন্তে, প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে। পেট্রলের কাঁটা আর নড়ছে না, শেষ পয়েণ্টে স্থিরভাবে আবদ্ধ সেটি। কিন্তু তখনো কাজ করে চলেছে ইঞ্জিন। কীসে চলছে ওটা? উঁচুতে আরো উঁচুতে... বেশ!

সুস্থ লোক যেমন নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা ভাবে না তেমন ইঞ্জিনের সমান ঘর্ঘর আওয়াজের হুঁশ থাকে না বৈমানিকের, সে আওয়াজে হঠাৎ এল অন্য সুর। পরিবর্তনটা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ল আলেক্সেই'র কাছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বনটিকে; প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে ওটা, চওড়ায় প্রায় তিন-চার কিলোমিটার। এমন কিছু দূর নয়। কিন্তু ইঞ্জিনের নিয়মিত আওয়াজে এসেছে অশুভ অন্য সুর। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করে এটা বৈমানিক, যেন নিজেরি শ্বাসরোধ হয়ে এসেছে। হঠাৎ আসে সেই অলক্ষুণে "চুক্ চুক্ চুক্" শব্দ, সেই শব্দে সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় ব্যথিয়ে ওঠে।

না, ঠিক আছে। আবার ঠিকভাবে চলছে ইঞ্জিনটা। কাজ করছে ঠিক! হুররে! আর এই ত বনটা এসে পড়েছে। রোদে সবুজ সমুদ্রের মত আন্দোলিত বার্চগাছের মাথাগুলো চোখে পড়ছে। বিমান ভূমি ছাড়া আর কোথাও নামা চলবে না এখন। এখন শুধু একটি জিনিস করা দরকার — এগিয়ে যাওয়া, আরো এগিয়ে যাওয়া!

চুক, চুক, চুক!..

আবার ইঞ্জিনের সমান ঘর্ঘর শব্দ। আর কতক্ষণ! বনের উপরে এসেছে আলেক্সেই। দেখতে পাচ্ছে মসৃণভাবে বন ভেদ করে সটান গিয়েছে বালি-ভরা পথ, উইং কম্যান্ডারের টেরির মত। আর তিন কিলোমিটার দূরে বিমানঘাঁটি, খাঁজ-খাঁজ প্রান্তটির ওপারে, আলেক্সেই'র মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই নজরে এসেছে সেটা।

চুক, চুক, চুক! তারপর হঠাৎ নেমে এল স্তব্ধতা, এত গভীর স্তব্ধতা যে

ডানায় আর লেজে লাগা হাওয়ার গুঞ্জন শোনা গেল। সব শেষ! মেরেসিয়েভের মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। পারাস্যুটে নামবে? না! আর একটু এগোনো যাক। ঢালুভাবে অবতরণের জন্য বিমানটিকে ঘুরিয়ে নামতে লাগল আলেক্সেই, বিমানটিকে যতদূর সম্ভব শয়ান রেখায় রাখার আর ঘুরপাকে না পড়ার চেষ্টা করছে সে।

কী ভয়াবহ আকাশের এই জমাট স্তব্ধতা! এত উদগ্র গভীর সে স্তব্ধতা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ইঞ্জিনের চড়চড় আওয়াজ, রগের দপদপানি আর ক্ষিপ্র অবতরণের দরুন নানা শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাকে মিলতে জমি ক্ষিপ্রভাবে উঠে আসছে, যেন বিরাট কোন চুম্বক বিমানের কাছে তাকে টানছে।

বনের প্রান্ত, তার ওধারে বিমানভূমির মরকত-সবুজ জমি দেখতে পেল আলেক্সেই। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে? অর্ধেক ঘুরে আটকিয়ে গেল প্রপেলার। আকাশে নিশ্চল প্রপেলারটাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছে। খুব কাছে এসে পড়েছে বনটি। সব শেষ তাহলে?.. ওলিয়া কখনো কি জানতে পারবে তার কী হয়েছিল, গত আঠারো মাস কী অমানুষিক প্রয়াস করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধি লাভ করে মানুষের মত মানুষ হয়েছে সে, আর হবার সঙ্গে সঙ্গে এরকম বিদঘুটেভাবে মাটিতে পড়ে মরতে হবে তাকে?

পারাস্যুটে নামবে? দেরী হয়ে গেছে! নিচে ছুটে চলেছে বনটি, বিমানটির ঝোড়ো বেগে গাছের মাথাগুলো ক্রমাগত সবুজ ফালিতে মিশে যাচ্ছে। এরকম কিছু একটা আগে সে দেখেছে। কখন? হ্যাঁ, তাইত! সেই বসন্তে, ভয়াবহ পতনের সময়ে। ঠিক এ ভাবে সবুজ ফালি সব বিমানের নিচে ছুটেছিল সে সময়ে। শেষ চেষ্টা করে আলেক্সেই স্টিকটা টানল...

৮

রক্তক্ষয়ের জন্য কান ঝিম ঝিম করছে পেত্রভের। বিমানভূমি, পরিচিত সব মুখ, বিকেলের সোনালী মেঘ — সবকিছু হঠাৎ দুলতে শুরু করে আস্তে আস্তে উল্টিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আহত পাটা নাড়াতে তীব্র যন্ত্রণায় হুঁশ ফিরে এল।

'ও এখনো আসেনি?' জিজ্ঞেস করল পেত্রভ।

'এখনো আসেনি। কথা বলবেন না,' জবাব এল।

সেদিন যখন পেত্রভের মনে হয়েছিল অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত, তখন

হঠাৎ দেবদূতের মত জার্মান বিমানটির সামনে কোথা থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিল মেরেসিয়েভ; এটা কি সম্ভব যে সেই মেরেসিয়েভ এখন গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত বিকলাঙ্গ ভূমির কোথাও পোড়া মাংস পিণ্ডের মত পড়ে আছে! সার্জেণ্ট-মেজর পেত্রভ আর কখনো কি দেখবে না তার নেতার কালো, স্বল্প বন্য আর সহৃদয় পরিহাসচটুল চোখ? কখনো নয়?

উইং কম্যাণ্ডার আস্তিনটা নামালেন। ঘড়ির আর দরকার নেই। দুহাতে টেরি ঠিক করতে করতে বিরস কণ্ঠে বললেন:

'ব্যস, সব শেষ!'

'কোন আশা নেই?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'না, পেট্রল খতম। কোথাও হয়ত বিমান নামিয়েছে, হয়ত পারাস্যুটে নেমেছে... স্ট্রেচারটা নিয়ে যাও!'

মুখ ফিরিয়ে শিস দিয়ে একটা সুর ভাঁজতে শুরু করলেন কর্ণেল, একেবারে বেসুরোভাবে। আবার শ্বাসরোধ হয়ে এল পেত্রভের, যেন ভীষণ গরম আর বেজায় বড়ো কিছু একটা গলায় আটকেছে। অদ্ভুত কাশির মত শব্দ শোনা গেল। বিমানভূমির মাঝখানে যারা তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল তারা একবার ফিরে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। স্ট্রেচারে আহত বৈমানিকটি কাঁদছে।

'ওকে নিয়ে যাও বলছি! যত সব!' রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্ণেল, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেলেন ভিড়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে যেন হাওয়ার জন্য চোখদুটো কুঁচকিয়ে।

লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে, ঠিক সে সময়ে ছায়ার মত নিঃশব্দে বনের ধার হয়ে এল একটি বিমান, চাকাগুলো গাছের চূড়োয় স্বল্প লেগেছে। প্রেতমূর্তির মত লোকেদের মাথার উপর দিয়ে, জমির উপর দিয়ে ভেসে এল সেটা, যেন জমি নিচের দিকে টানছে এমন ভাবে একসঙ্গে তিন চাকায় ঘাসে নামল। শোনা গেল ভারী একটা শব্দ, পাথরের নুড়ির আওয়াজ, আর ঘাসের খসখস, সেটা অস্বাভাবিক, কেননা নামার সময়ে ইঞ্জিনের গর্জনে এসব শব্দ বৈমানিকরা কখনো শোনে না। সবকিছু এত তাড়াতাড়ি হল যে কী ঘটেছে বুঝতে পারল না কেউ, যদিও সমস্তটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার: একটি বিমান নেমেছে, আর সেটা হল "একাদশ", যার জন্য সবাই এতক্ষণ এত উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ছিল।

'মেরেসিয়েভ!' কে একজন উদ্দাম অমানুষিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সবায়ের স্তম্ভিত ভাব গেল কেটে।

দৌড় শেষ করে বনের একেবারে ধারে, অস্তগামী সূর্যের কমলা আলোয় উজ্জ্বল নবীন কোঁকড়া শাদা-ছাল বার্চগাছগুলোর সামনে থামল বিমানটি।

এবারেও ককপিট থেকে বেরিয়ে এল না কেউ। হাঁপাতে হাঁপাতে বিমানটির কাছে ওরা দৌড়িয়ে গেল, প্রত্যেকের মনে অমঙ্গলের পূর্বাভাস। সবায়ের আগে দৌড়িয়ে গেলেন কর্ণেল, একলাফে ডানায় উঠে ঢাকনা সরিয়ে ককপিটের ভিতরটা দেখলেন। বসে আছে মেরেসিয়েভ, খালি মাথা, গ্রীষ্ম মেঘের মত ফ্যাকাশে মুখ, রক্তহীন সবজে ঠোঁটে হাসির রেশ। চাপা ঠোঁট থেকে রক্তের দুটি ধারা চিবুক হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

'বেঁচে আছ? চোট লেগেছে?'

দুর্বলভাবে হাসল মেরেসিয়েভ, নিষ্প্রাণ চোখে কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে বলল:

'কিছু হয়নি। শুধু ভয় পেয়েছিলাম... প্রায় ছয় কিলোমিটার এক ফোঁটা পেট্রল ছিল না।'

বিমানটির চারিদিকে ভিড় করে বৈমানিকরা উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দন করছে আলেক্সেইকে, করমর্দন করছে তার।

'ভায়ারা ডানাটা ভেঙ্গে ফেলবেন না! ওটা ভাঙ্গা চলবে না! আমাকে বেরোতে দিন দেখি!' হেসে বলল আলেক্সেই।

সেই মুহূর্তে ওর উপরে ঝুঁকে পড়া মাথার ভিড়ের নিচে থেকে কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর একটি, এত ক্ষীণ যে মনে হল অনেক দূর থেকে আসছে।

'আলিওশা, আলিওশা!'

নিমেষে শক্তি ফিরে পেল মেরেসিয়েভ। তাড়াতাড়ি উঠে, দুহাতে ভর দিয়ে ককপিটের উপর দিয়ে ভারী পাটা বের করে লাফিয়ে নামল নিচে, আর একটু হলে ডানার উপরের একজন ধাক্কা লেগে পড়ে যেত।

বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে পেত্রভ, মুখটা বালিশের মতই শাদা। চোখের তলায় গভীর কালি পড়েছে, বড়ো দুফোঁটা অশ্রুবিন্দু লেগে আছে সেখানে।

'কী হে ছোকরা, বেঁচে আছ তাহলে!.. ঘাগী শয়তান!'

স্ট্রেচারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সেই। বন্ধুর

অসহায়.মাথা জড়িয়ে তার নীল ক্লিষ্ট, অথচ আনন্দোজ্জ্বল চোখে চোখ রাখল।

'বেঁচে আছ?'

'ধন্যবাদ, আলিওশা, আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ। তুমি... আলিওশা... তুমি...'

'ধুত্তোর ছাই! আহত লোকটাকে নিয়ে যাও বলছি! হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেন?' কর্ণেলের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, ছোটখাটো চটপটে মানুষটি, শক্ত পায়ে ভর দিয়ে দুলছেন, মাপসই চকচকে বুটজোড়া নীল ওভারঅলের নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

'সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ, রিপোর্ট দিন। কোনো বিমান নামাতে পেরেছেন?' সরকারী সুরে জানতে চাইলেন কর্ণেল।

'হ্যাঁ, কমরেড কর্ণেল। দুটো "ফোক-উলফ"।'

'কী অবস্থায় নামিয়েছিলেন?'

'একটাকে ওপর থেকে আক্রমণে। পেত্রভের পিছু লেগেছিল সেটা। আর একটাকে সরাসরি আক্রমণে, সবাই যেখানে লড়ছিল সেখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে।'

'জানি। পরিদর্শক এইমাত্র খবর দিয়েছে... ধন্যবাদ।'

'সেবা...' বিধিসম্মত প্রথায় জবাব দেবার ইচ্ছায় শুরু করল আলেক্সেই। কিন্তু সাধারণত খুঁতখুঁতে কর্ণেলটি তাকে বাধা দিয়ে ঘরোয়াভাবে বললেন:

'বেশ, বেশ! কাল আপনি স্কোয়াড্রনের ভার নেবেন... তৃতীয় স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার ঘাঁটিতে ফিরে আসেনি।'

পরিচালনা-ঘাঁটিতে দুজনে একসঙ্গে গেল। জঙ্গী দিনের শেষ হল। সবাই পিছু পিছু চলেছে। পরিচালনা-ঘাঁটির সবুজ ঢিপিটা কাছে এসে পড়েছে, এমন সময় ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি দৌড়িয়ে কাছে এল। খালি মাথা তার, বেশ খুসি আর উত্তেজিত দেখাচ্ছে, কর্ণেলের সামনে দাঁড়িয়ে কী একটা বলার জন্য মুখ খুলেছে, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে নিরস কঠোর গলায় কর্ণেল বললেন:

'টুপি ছাড়া কেন? কী মনে হচ্ছে নিজেকে, টিফিনের সময়ে স্কুলের ছোকরার মত?'

সেলাম করে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত লেফ্‌টেনাণ্টটি প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কমরেড কর্ণেল, আমাকে রিপোর্ট করার অনুমতি দিন!'

'কী?'

'আমাদের প্রতিবেশী "ইয়াক" উইঙের কম্যাণ্ডার টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আমাদের প্রতিবেশী! কী চায় সে?..'

তাড়াতাড়ি ডাগ-আউটের দিকে গেলেন কর্ণেল।

'আপনার বিষয়ে বলছেন...' ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি মেরেসিয়েভকে বলতে শুরু করল, কিন্তু নিচে ডাগ-আউট থেকে কর্ণেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল:

'মেরেসিয়েভকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও!'

দুপাশে হাত রেখে সঠিক কায়দায় কর্ণেলের সামনে দাঁড়াতে তিনি টেলিফোনের রিসিভার হাতের তালুতে চেপে সক্রোধে গরগর করে উঠলেন:

'আমাকে ভুল খবর দিয়েছেন কেন? আমাদের প্রতিবেশী জানতে চাইল যে কে "একাদশ" চালিয়েছিল। আমি বললাম, মেরেসিয়েভ, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। তখন সে জিজ্ঞেস করল, "কটা বিমান ওর নামে লিখেছ?" জবাবে বললাম, "দুটো।" ও বলল, "আর একটা ওর নামে টুকে রেখো। আমার বিমানের পিছু লাগা একটা "ফোক-উলফকে" ও নামিয়েছে। আমি নিজে দেখেছি সেটা।" কী? চুপ করে আছেন কেন?' ভুরু কুঁচকিয়ে কর্ণেল তাকালেন ওর দিকে, ঠাট্টা করছেন না চটে উঠছেন বোঝা মুশকিল। 'কথাটা সত্যি? এই ত, আপনি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলুন... হ্যালো! তুমি আছ ত? ফোনে কথা বলছেন সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ। রিসিভারটা ওঁকে দিচ্ছি।'

টেলিফোনে এল অপরিচিত ভাঙ্গা গভীর কণ্ঠস্বর:

'ধন্যবাদ, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। চমৎকার! খুব তারিফ করছি আপনার। আমাকে আপনি বাঁচিয়েছেন। হ্যাঁ, মাটিতে ওটা না পড়া পর্যন্ত পিছু ছাড়িনি। আপনি কি ভদকা খান? আমার এখানে চলে আসুন। এক লিটার আপনাকে ধারি। বেশ, ধন্যবাদ। দেখা হলে করমর্দন করব। চালিয়ে যান!'

রিসিভার নামিয়ে রাখল মেরেসিয়েভ। আজ যে ধকল গিয়েছে তার পরে এত ক্লান্ত সে যে দাঁড়াতে পারছে না। ওর একমাত্র বাসনা যতো তাড়াতাড়ি পারে "পাতাল সহরে" ফিরে যাওয়া, নিজের ডাগ-আউটে পেঁাছিয়ে নকল পায়ের পাতাটি ছুঁড়ে ফেলে গা হাত ছড়িয়ে বাঙ্কে শুয়ে পড়া। মুহূর্তের

জন্য টেলিফোনের কাছে অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে গেল মেরেসিয়েভ।

বাধা দিয়ে কর্ণেল বললেন, 'কোথায় যাচ্ছেন?' মেরেসিয়েভের হাত নিজের ছোট শক্ত হাতে নিয়ে এত জোরে চাপ দিলেন যে ব্যথা করে উঠল। 'আপনাকে কী আর বলতে পারি? খাসা ছোকরা! আপনার মত লোক আমার অধীনে, সে জন্য আমি গর্বিত... বেশ, আর কী? ধন্যবাদ... হ্যাঁ, আর আপনার ওই বন্ধুটি, মানে পেত্রভ, ওটিও খাসা ছেলে। আর অন্যরা সত্যি বলছি, আপনাদের মত লোক আছে বলে যুদ্ধে আমরা হারতে পারি না!'

আবার মেরেসিয়েভের হাতে জোরে চাপ দিলেন তিনি।

ডাগ-আউটে মেরেসিয়েভ যখন গেল তখন রাত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঘুম এল না। ঘুম আনার চেষ্টা করল নানা রকম সুপরীক্ষিত উপায়ে — বালিশ উল্টিয়ে এক হাজার পর্যন্ত গুণে, তারপর হাজার থেকে এক পর্যন্ত, পরিচিত যাদের নাম "আ" দিয়ে শুরু তাদের নাম মনে করে, তারপর যাদের নাম "ব" দিয়ে শুরু তাদের, তারপর কেরোসিন-বাতির ঝাপসা আলোর দিকে চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে থেকে — কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিচিত মূর্তি সামনে এসে পড়ছে, কখনো স্পষ্টভাবে, কখনো বা যেন কুয়াশায় ঢাকা — রুপালী চুলের নিচে মিখাইল দাদুর বিব্রত চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে; "গরুর মত চোখের পাতা" পিটপিট করছে আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো; চটে উঠে পাক-ধরা কেশর ঝাঁকিয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কাকে যেন বকছেন; বুড়ো সেই স্নাইপারটি, সৈনিকসুলভ মুখ তার হাসিতে কুঞ্চিত; শাদা বালিশের পটভূমিতে কমিসার ভরোবিওভের মোমের মত ফ্যাকাশে মুখ, সেয়ানা তীক্ষ্ণ পরিহাসমুখর প্রাজ্ঞ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে; জিনচকার হাওয়ায় অস্থির লাল চুল এক ঝলকে সামনে দিয়ে ভেসে গেল; ছোটখাটো আর সজীব ইনস্ট্রাক্টর নাউমভ দরদে আর সব বোঝে এমনভাবে চোখ ঠারছে তাকে। অন্ধকার থেকে তার দিকে চেয়ে হাসছে অনেক চমৎকার মরমী মুখ, আর ইতিমধ্যেই প্লাবিত তার হৃদয়ে নানা স্মৃতি জাগিয়ে ভরে দিচ্ছে উষ্ণতায়। কিন্তু এই সব মরমী মুখের মধ্যে, সবাইকে তৎক্ষণাৎ মুছে দিয়ে এল ওলিয়ার মুখ, অফিসারের পোশাক-পরা একটি কিশোরের রোগা মুখ আর বড়ো, ক্লান্ত চোখ। পরিষ্কার স্পষ্ট তাকে দেখল, যেন সত্যি সত্যি সামনে আছে, এমনভাবে বাস্তব জীবনে

আগে কখনো দেখেনি তাকে। ছবিটা এত স্পষ্ট যে চমকে উঠল আলেক্সেই।

ঘুমের দেখা নেই! উচ্ছ্বাসিত উদ্যমের আহ্বানে সচকিত আলেক্সেই উঠে বসে "স্তালিনগ্রাদ্ কাটি" জ্বালিয়ে খাতা থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে পেন্সিলটা কেটে লিখতে শুরু করল।

মনে নানা কথা এত ভিড় করে আসছে যে তাল রেখে চলা প্রায় অসম্ভব। আলেক্সেই দুষ্পাঠ্য হাতে লিখল: "আমার ওলিয়া, আজ তিনটে জার্মান বিমান নামিয়েছি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আমার বন্ধুদের কয়েকজন ত প্রায় রোজ এরকম করে। সেটা নিয়ে তোমার কাছে বড়াই করতে চাই না। আমার প্রিয়, আমার আপনার ওলিয়া! আঠারো মাস আগে আমার যা ঘটেছিল সেটা বলতে চাই আজ, বলার অধিকার এখন হয়েছে; সেটা এত দিন বলিনি বলে ক্ষমা কোরো, দোহাই তোমার, রাগ কোরো না। কিন্তু আজ, শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করেছি..."

চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল আলেক্সেই। ডাগ-আউটে মোটা তক্তার দেয়ালের ওদিকে ইঁদুরের কিঁচ কিঁচ, শুকনো বালু ঝরার শব্দ। খোলা দরজা দিয়ে আসছে বার্চ আর কুসুমিত ঘাসের তাজা সোঁদা গন্ধ, আর নাইটিংগেলের একটু চাপা, কিন্তু অবারিত গান। দূরে কোথাও, নালার ওধারে, খুব সম্ভব অফিসারদের খাবার ঘরের বাইরে পুরুষ ও নারীকণ্ঠ "এ্যাসগাছের" সেই বিষণ্ণ গানটি গাইছে। দূর বলে সুরটি নরম হয়ে রাত্রে বিশেষ কোমল একটি মোহে ভরে উঠেছে, মধুর বিষণ্ণতা জাগিয়ে তুলছে মনে — প্রত্যাশার, আশার বিষণ্ণতা...

বিমান-ঘাঁটিটি ইতিমধ্যে আমাদের অগ্রগামী সৈন্যদলের অনেক পিছনে, *কামানের বহুদূর চাপা গুরু গুরু ডাক প্রায় শোনা যায় না; সে আওয়াজে চাপা পড়ছে না সুরটি, নাইটিংগেলের গান কিম্বা বনের ঘুমপাড়ানি গুন গুন ধ্বনি।*

পুনশ্চ

ওরিওলের যুদ্ধ বিরাট জয়লাভে সমাপ্ত হতে চলেছে, উত্তর থেকে অগ্রসর সামনের রেজিমেণ্টরা জানিয়েছে যে ক্রাস্নগস্কর্ পাহাড় থেকে ইতিমধ্যেই জ্বলন্ত সহরটি চোখে পড়ে, তখন একদিন ব্রিয়ান্স্ক ফ্রণ্টের হেডকোয়ার্টারসে খবর এল যে গত ন দিনে ও এলাকায় কার্যরত গার্ডস ফাইটার উইঙের বৈমানিকেরা সাতচল্লিশটি শত্রু বিমান নামিয়েছে। নিজেদের খোয়া গিয়েছে পাঁচটি বিমান আর তিনটি লোক, কেননা দুটি বৈমানিক পারাস্যুটে নেমে হেঁটে ঘাঁটিতে পেঁছয়। সোভিয়েত সেনার ক্ষিপ্র অগ্রগতির সেই সব দিনেও এ ধরনের জয়লাভ অসাধারণ। ওদের বিমান-ঘাঁটিতে একটি সংযোগী বিমান যাচ্ছিল, তাতে একটা জায়গা আমি পেলাম, আমার ইচ্ছে গার্ডস বৈমানিকদের কীর্তির বিষয়ে "প্রাভদায়" একটি প্রবন্ধের মালমশলা জোগাড় করা।

উইংটির বিমান-ঘাঁটি একটি যৌথ পশুচারণ ভূমিতে, ঢিবি সরিয়ে উঁচু নিচু জায়গাটা কোনক্রমে সমান করা হয়েছে। একটি নবীন বার্চ-বনের ধারে বিলমোরগের আন্ডাবাচ্চার মত বিমানগুলো লুকোনো। সংক্ষেপে, যুদ্ধের সেই সব কর্মমুখর দিনে স্বাভাবিক মেঠো বিমান-ঘাঁটি একটা।

বিকেল প্রায় শেষ, উইঙের লোকেরা আর একটি কঠিন ব্যস্ত দিনের কাজ সমাপ্ত করে এনেছে, সে সময়ে আমরা নামলাম। জার্মানরা তখন ওরিওল এলাকার উপরে বিশেষভাবে সক্রিয়, সেদিন প্রত্যেকটি জঙ্গী বিমানকে সাতবার উঠতে হয়েছে লড়াই'এর জন্য। অষ্টম পালা শেষ করে সূর্যাস্তের সময়ে শেষ বিমান কটি ফিরে আসছে। কর্ণেলটি ছোটখাটো চটপটে মানুষ, রোদে তামাটে মুখ, সযত্নে টেরি কাটা, বেল্ট আঁটো করে আঁটা, পরনে নতুন নীল ওভারঅল। তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করলেন যে সেদিন কোন গল্প গুছিয়ে বলতে

পারবেন না, সকাল ছটা থেকে বিমান-ঘাঁটিতে আছেন, তিনবার উপরে উঠতে হয়েছে তাঁকে, আর এখন এত ক্লান্ত যে দাঁড়াতে পারছেন না। সে সন্ধ্যায় সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মেজাজ অন্যান্য অফিসারদেরও নেই। বুঝতে পারলাম কালকের জন্য আমাকে থাকতে হবে; তা ছাড়া ফেরাও যাবে না, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। বার্চগাছের মাথায় ইতিমধ্যেই সূর্যের আলো গলিত সোনার রং লাগাচ্ছে।

শেষ বিমানগুলি ফিরে এল, ইঞ্জিন চলছে, সটান বনে গেল তারা। মিস্ত্রীরা ঘুরিয়ে রাখল তাদের। নালের মত মাটির দেয়াল-ঘেরা ঘাসে-ঢাকা সবুজ জায়গায় বিমানগুলিকে রাখার পরে ককপিট থেকে আস্তে আস্তে নামল বিবর্ণ ক্লান্ত বৈমানিকরা, তার আগে নয়।

একেবারে শেষের বিমানে ফিরল তৃতীয় স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার। ককপিটের স্বচ্ছ ঢাকনা সরানো হল। প্রথমেই সোনালী মনোগ্রাম করা আবলুস কাঠের একটি বড়ো ছড়ি উড়ে বেরিয়ে এসে পড়ল ঘাসে। তারপর একটি রোদে তামাটে, চওড়া-মুখ কালো-চুল মানুষ বলিষ্ঠ হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াল, পাশ দিয়ে ক্ষিপ্রভাবে শরীরটাকে দুলিয়ে ডানার উপরে উঠে আস্তে আস্তে নামল মাটিতে। কে যেন আমাকে বলল উইঙের সেরা বৈমানিক। সন্ধ্যেটা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য ঠিক করলাম ওর সঙ্গে কথা বলব। বেশ মনে আছে আমার দিকে প্রফুল্ল প্রাণবন্ত কালো চোখে তাকাল ও, বালকসুলভ বেয়াড়া ভাব তখনো নিভে যায়নি সে চোখে, তার সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিশেছে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঋানু ক্লান্ত প্রজ্ঞা। হেসে আমাকে বলল:

'দোহাই আপনার! আমি ভয়ানক ক্লান্ত। পাদুটো টেনে চলার বেশী শক্তি নেই, মাথা ঘুরছে। আপনি খেয়েছেন কি? না? তাহলে আমার সঙ্গে খাবার ঘরে চলুন, একসঙ্গে খাওয়া যাবে। একটা বিমান নামালে ওরা রাত্রের শেষ খানার সময়ে দুশ গ্রাম ভদকা দেয়। আজ আমার প্রাপ্য ছ'শ গ্রাম। দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। চলি তাহলে? খেতে খেতে গল্প করা যাবে, আপনি ত গল্প বাগাবার জন্যে অধৈর্য দেখছি।'

রাজী হলাম আমি। এই খোলাখুলি গোছের, প্রফুল্ল অফিসারটিকে ভালো লাগল। বৈমানিকদের যাওয়া আসায় বনে যে পথটি হয়েছিল সেটি ধরে চললাম। নতুন পরিচিত ব্যক্তিটি চটপটভাবে যাচ্ছে, মাঝেমাঝে নিচু হয়ে বিলবেরি কুড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে টপটপ করে মুখে দিচ্ছে। অত্যন্ত ক্লান্ত নিশ্চয়ই, হাঁটছে ভারী পদক্ষেপে, কিন্তু অদ্ভুত ছড়িটায় ভর দিচ্ছে না। হাতে

ঝুলছে সেটা, ক্বচিৎ কখনো সেটা দিয়ে ব্যাঙের ছাতায় কিম্বা আগাছায় ঘা দিচ্ছে। কোনো নালা পেরিয়ে পিছল কাদাটে ঢাল, গা বেয়ে ওঠার সময়ে চলতে কষ্ট হচ্ছে তার, ঝোপঝাড় ধরে উঠছে, কিন্তু ছড়িতে ভর দিচ্ছে না।

খাবার ঘরে পেঁছনো মাত্র ওর ক্লান্তির লেশমাত্র রইল না। জানলার কাছে একটি টেবিল বেছে নিল; সূর্যাস্তের হিম রক্তাভা দেখা যাচ্ছে, পরের দিন ঝোড়ো আবহাওয়ার পূর্বলক্ষণ সেটা বৈমানিকদের কাছে। বড়ো এক মগ জল সাগ্রহে ঢকঢক করে খেয়ে বৈমানিকটি ফুটফুটে কোঁকড়া-চুল ওয়েট্রেসটির পিছনে লাগল: হাসপাতালে মারেসিয়েভের একটি বন্ধুর কথা ভেবে সে নাকি অন্যদের খাবারে বড্ড বেশি নুন দিয়ে ফেলছে। বেশ তৃপ্তি করে খানা খেল বৈমানিক, মাটন চপের হাড়টা চিবোল শক্ত দাঁতে। পাশের টেবিলের বন্ধুদের সঙ্গে চলল হাসি তামাসা। আমাকে জিজ্ঞেস করল মস্কোর নতুন খবর কী, হালে কী কী বই আর নাটক বেরিয়েছে, মস্কোর কোনো থিয়েটারে কখনো যায়নি বলে দুঃখ করল। খানার তৃতীয় পদ — বিলবেরি জেলি, এখানকার বৈমানিকরা তার নাম দিয়েছে “বজ্রমেঘ” — খাবার পর আমাকে জিজ্ঞেস করল:

‘রাত্রে কোথায় থাকবেন ঠিক করেছেন? জায়গা নেই? তাহলে আমার ডাগ-আউটে আসুন!’ ও বলল। এক মুহূর্তে ভুরু কুঁচকিয়ে নিচু গলায় যোগ করল, ‘আমার সঙ্গে যে থাকে সে ফেরেনি আজ... একটা বাঙ্ক তাই খালি আছে। পরিষ্কার বিছানার চাদর খুঁজে বের করা যাবে। আসুন তাহলে।’

বোঝা গেল, নবাগতদের সঙ্গে আলাপ করতে ভালোবাসে যারা তাদের একজন সে। রাজী হয়ে গেলাম। নালায় নামলাম, নালার ঢালুদুটোয় বুনো রাস্‌প্‌বেরি, লাংঅর্ট আর আগাছার ঘন ঝোপের মধ্যে ডাগ-আউটগুলো খোঁড়া, ঝোপঝাড়ে পচা পাতা আর ব্যাঙের ছাতার সোঁদা গন্ধ।

বাড়িতে তৈরী “স্তালিনগ্রাদ্‌কা” কেরোসিন-বাতির সরু ধোঁয়াটে শিখা বাড়িয়ে দেওয়াতে আলো হয়ে উঠল ডাগ-আউটের ভেতরটা, তখন দেখা গেল ডাগ-আউটটা বড়ো গোছের আর আরামী, মনে হল অনেক দিন ধরে এখানে লোক আছে। কাদাটে দেয়ালের তাকে দুটো পরিচ্ছন্ন বাঙ্ক, গদি পাতা, টাটকা সুগন্ধি খড় চাদরে ভরে তৈরী সেগুলো। কোণে বসানো কচিপাতা কয়েকটি বার্চগাছ, “গন্ধের জন্য,” ব্যাখ্যা করে বলল বৈমানিকটি। দেয়ালে

বাঙ্কের উপরে সুষ্ঠুভাবে কাটা খবরের কাগজে ঢাকা নানা তাকে বই'এর গাদা, দাড়ি কামাবার টুকিটাকি, সাবান আর টুথব্রাশ। একটি বাঙ্কের উপরে ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে সুন্দরভাবে হাতে-গড়া প্লেক্সিগ্লাসের ফ্রেমে বাঁধানো দুটো ফটোগ্রাফ, যুদ্ধ বিরতির সময়ে আলস্যের একঘেয়েমী দূর করার জন্য শত্রু বিমানের ভগ্নাংশ থেকে কারিৎকর্মীরা এ ধরনের ফ্রেম অনেক বানিয়েছিল। টেবিলে বার্চ'ক পাতায় ঢাকা বুনো সুরভি রাস্‌প্‌বেরিতে ভরা একটি বিলিক্যান। রাস্‌প্‌বেরি, নবীন বার্চ'গাছ, খড় আর মেঝেতে ছড়ানো ফারের ডালপালা থেকে এত মিষ্টি আর ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে, ডাগ-আউটটি এত ঠাণ্ডা, নালায় গঙ্গাফড়িঙের ডাক এত শ্রুতিমধুর যে প্রীতিকর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আমরা, ঠিক করলাম কথাবার্তা আর রাস্‌প্‌বেরি খাওয়া কাল সকাল পর্যন্ত স্থগিত থাক।

বাইরে গেল বৈমানিক। কানে এল সজোরে দাঁত মাজার আর ঠাণ্ডা জলে গা হাত পা ধোবার আওয়াজ, নানা শব্দের সাড়া উঠছে বনে। ফিরে এল, বেশ ঝরঝরে প্রফুল্ল ভাব, চুলে আর ভুরুজোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা জল, বাতির পলতেটা কমিয়ে দিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে লাগল। ভারী কী একটা সশব্দে মেঝেতে পড়াতে তাকালাম, যা দেখলাম নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না। লোকটার পাদুটো মেঝেতে পড়ে রয়েছে! পাহীন বৈমানিক! তার উপর আবার জঙ্গী বিমান চালক! সেদিন সাতবার উপরে উঠেছে বিমান-যুদ্ধের জন্য আর তিনটি শত্রু বিমান নামিয়েছে! অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কিন্তু সত্যিই ত, ওর দুটো পা, নকল অবশ্য, বেশ খাপসই সামরিক জুতোয় পড়ে রয়েছে মেঝেতে! মনে হল বাঙ্কের নিচে লুকিয়ে থাকা কোনো লোকের পাদুটো উঁকি মারছে। আমাকে দেখে নিশ্চয় বোঝা গেল যে বিস্মিত হয়েছি, কেননা বৈমানিক আমার দিকে তাকিয়ে সেয়ানা প্রফুল্ল হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল:

'আগে লক্ষ্য করেননি আপনি?'

'স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'শুনে খুসি হলাম! ধন্যবাদ! কিন্তু অবাক লাগছে যে আপনাকে কথাটা কেউ বলেনি। আমাদের উইঙে পাকা বৈমানিক যেমন অনেক আছে তেমন ব্যস্তবাগীশ লোকদেরও অভাব নেই। নতুন একটি ভদ্রলোক এসেছেন, "প্রাভদার" সাংবাদিক আবার তিনি, এমন সুযোগ পেয়ে ভার কাছে তাদের অদ্ভুত চিজটিকে নিয়ে বড়াই করেনি, সেটা আশ্চর্য!'

'কিন্তু ব্যাপারটা অসাধারণ, সেটা ত আপনি মানবেন। পা নেই অথচ জঙ্গী বিমান চালাচ্ছেন! বীরের মত ব্যাপার! বিমান চালনের ইতিহাসে এরকম জিনিস ঘটেনি।'

ফুর্তিতে শিস দিয়ে বৈমানিক বলল:

'বিমান চালনের ইতিহাস!.. সে ইতিহাসে অনেক কিছুই অজানা ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে আমাদের বৈমানিকদের কাছে অনেক কথা ইতিহাস শুনেছে। কিন্তু খুসি হবার কী আছে? বিশ্বাস করুন, এদুটোর জায়গায় আসল পা থাকলে বিমান চালাতে আরো ভালো লাগত আমার। কিন্তু নিরুপায়।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বৈমানিক আরো বলল, 'ঠিক বলতে গেলে, বিমান চালনের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা অজানা নয়।'

মানচিত্রের খাপ হাতড়িয়ে পত্রিকার একটি পাতা খুঁজে বের করল সে, ভাঁজ পড়া ছেঁড়াখোঁড়া পাতাটা সযত্নে সেলোফেনের পাতে আঁটা। একটি পায়ের পাতা ছিল না একজন বৈমানিকের, তা সত্ত্বেও বিমান চালায় সে, গল্পটি তার বিষয়ে।

'কিন্তু ওর একটা পা ত ছিল। তা ছাড়া ও জঙ্গী বিমান নয়, একটা প্রাচীন "ফারমান" চালিয়েছিল,' আমি বললাম।

'কিন্তু আমি সোভিয়েত বৈমানিক,' জবাবে ও বলল। 'বড়াই করছি ভাববেন না দোহাই। আমার কথা নয়। একজন অত্যন্ত ভালো লোক, মানুষের মত মানুষ একজন কথাটা আমাকে বলেন।' "মানুষের মত মানুষ"এ বিশেষ জোর দিল সে। 'তিনি মারা গিয়েছেন।'

বৈমানিকের চওড়া বলিষ্ঠ মুখে এল মধুর কোমল বিষণ্ণ ভাব, চোখে পরিষ্কার মরমী আলোর দীপ্তি; চেহারা দেখে মনে হল বয়স প্রায় দশ বছর কমে গিয়েছে, প্রায় তরুণের মত দেখাচ্ছে: এক মুহূর্ত আগে ভেবেছিলাম যে বৈমানিকটি মধ্যবয়সী, এখন অবাক হয়ে বুঝলাম তার বয়স বড়ো জোর তেইশ।

'কী হয়েছিল, কখন এবং কী ভাবে হয়েছিল সেটা লোকে জিজ্ঞেস করলে আমার বিরক্ত লাগে... কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতে সবকিছু আমার মনে ফিরে আসছে... আপনাকে আমি চিনি না। কাল পরস্পরের কাছে বিদায় নেব, হয়ত আর কখনো দেখা হবে না... যদি চান ত আমার পায়ের গল্পটা আপনাকে বলি।'

বাঙ্কে উঠে বসে চিবুক পর্যন্ত কম্বল টেনে নিয়ে বলতে শুরু করল

বৈমানিক। দেখে মনে হল আমার উপস্থিতির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছে, নিজের মনে কথা বলে চলেছে। গল্পটা কিন্তু বলল খুব গুছিয়ে। টের পেলাম যে তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, স্মরণশক্তি ভালো, হৃদয় উদার। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে গুরুত্বপূর্ণ আর অভূতপূর্ব কিছু একটা এক্ষুণি শ্রুতিগোচর হবে, পরে আর কখনো হয়ত শোনার সুযোগ হবে না আমার, তাই তাড়াতাড়ি একটা স্কুলের খাতা টেনে নিলাম, মলাটে লেখা ছিল: "তৃতীয় স্কোয়াড্রনের রোজনামচা"। বৈমানিকের কাহিনীটি টুকে নিতে শুরু করলাম।

বনের উপর দিয়ে অলক্ষিতে রাত্রি কেটে যাচ্ছে। টেবিলের উপরে বাতিটার চড়চড় হিস হিস আওয়াজ, শিখায় দগ্ধ-ডানা অনেক অসাবধানী প্রজাপতি পড়ে আছে চারিদিকে। প্রথম প্রথম হাওয়ায় ভেসে এল এ্যাকর্ডিয়নে বাজানো একটি সুর। তারপর থেমে গেল এ্যাকর্ডিয়নের করুণ ধ্বনি, বৈমানিকের বিষণ্ণ, নিম্নকণ্ঠের ছন্দময় কথায় সঙ্গত দিল শুধু বনের নানা নৈশ শব্দ, বকের তীক্ষ্ণ চীৎকার, পেঁচার দূরাগত আর্তনাদ, কাছের জলায় ব্যাঙের ক্রোক ক্রোক আর গঙ্গাফড়িঙের কিচ কিচ।

শোনা গল্পটি এত রোমাঞ্চকর যে যতখানি সাধ্যে কুলোয় ততখানি লিখে রাখার চেষ্টা করি। খাতাটা ভরে গেল, তাকে আর একটা ছিল, সেটাও গেল ভরে। ডাগ-আউটের অপরিসর প্রবেশপথ দিয়ে আকাশ দেখা যায়, আকাশ পাতলা হয়ে এসেছে যে চোখে পড়ল না। আলেক্সেই মারেসিয়েভ তখন বলছে সেই দিনটির কথা যেদিন "রিখথোফেন" ডিভিশনের তিনটে বিমান নামিয়ে ও আবার টের পেল যে অন্য বৈমানিকদের সমান হয়ে উঠেছে।

'গল্প করতে করতে রাত কেটে গিয়েছে, আর সকাল হলেই আমাকে বিমান চালাতে হবে,' গল্প বন্ধ করে ও বলল। 'আপনাকে নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত করেছি। এখন একটুখানি ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।'

'কিন্তু ওলিয়া? কী উত্তর সে দিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, তারপর আত্মসংবরণ করে বললাম: 'মাফ করুন, প্রশ্নটি হয়ত অস্বস্তিকর। তাহলে জবাব দেবেন না।'

'কেন?' হেসে জিজ্ঞেস করল মারেসিয়েভ। 'আমরা দুজনেই মজার লোক। দেখা গেল যে আমার সবকিছুই ও জানত। আমার দোস্ত আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো ওকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে জানিয়েছিল, প্রথমে আমার বিমান পতনের, তারপর আমার পা কেটে ফেলার কথাটা। কিন্তু ও যখন দেখল যে

কথাটা আমি চেপে গিয়েছি তখন ধরে নিল যে ওকে বলতে আমার খারাপ লাগছে, আর কিছু না জানার ভান করল। দেখা গেল দুজন দুজনকে ঠকাচ্ছিলাম, ভগবান জানেন কেন! ওর চেহারাটা দেখবেন নাকি?'

পলতেটা বাড়িয়ে বাতিটা নিয়ে গেল বাঙ্কের উপরে দেয়ালে টাঙানো, সুষ্ঠু প্লেক্সিগ্লাসের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলোর কাছে। একটি ফটো আনাড়ির তোলা, সেটা প্রায় সবটাই ঝাপসা পুরোনো হয়ে গিয়েছে, কোনক্রমে দেখা যায় মাঠের ফুলের মধ্যে হাসিমুখে বসে আছে একটি ভাবনাচিন্তাহীন মেয়ে। অন্য ছবিটি তারই, জুনিয়র লেফ্টেনাণ্ট-টেকনিশ্যানের পোশাক পরনে, রোগা বুদ্ধিমন্ত মুখ, একাগ্র ভাব চোখে। এত ছোট মেয়েটি যে ইউনিফর্ম পরনে সুশ্রী কিশোরের মত চেহারা, শুধু চোখদুটো ক্লান্ত আর তীক্ষ্ণ, কিশোরসুলভ নয়।

'ওকে পছন্দ হয়?'

'অত্যন্ত,' আন্তরিকভাবে আমি বললাম।

'আমারও ভালো লাগে,' স্মিত হাসি হেসে সে বলল।

'আর স্থুচকভ, সে এখন কোথায়?'

'জানি না। ওর শেষ চিঠি এসেছিল শীতকালে, ভেলিকিয়ে লুকি'র কাছাকাছি কী একটা জায়গা থেকে।'

'আর ট্যাঙ্ক-অফিসারটি, কী যেন তার নাম?'

'গ্রিশা গভজ্‌দেভের কথা বলছেন? সে এখন মেজর। প্রখরভ্‌কার বিখ্যাত যুদ্ধে ছিল, আর পরে কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টে ট্যাঙ্কের ব্যূহভেদে। একই এলাকায় আমরা দুজনেই কাজে ছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি। একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টের নেতা এখন। কিছু দিন হল ওর কোন চিঠি পাইনি, কেন জানি না। কিন্তু কিছু এসে যায় না। যুদ্ধে বেঁচে থাকলে আমাদের আবার দেখা হবে। আর বেঁচে থাকবই না কেন? কিছু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক?.. রাত কাবার হয়ে গিয়েছে!'

ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল সে, আধো-অন্ধকারে ভরে গেল ডাগ-আউটটা। ভ্রূকুটিকুটিল ভোরের আবছা ধূসর আলোয় কানে আসছে মশার গুনগুন, বনের মধ্যে এই চমৎকার আশ্রয়টিতে মশাগুলোই বোধ হয় একমাত্র আপদ।

'আপনার বিষয়ে "প্রাভদায়" লেখার খুব ইচ্ছে আমার,' আমি বললাম।

'আপনার খুসি,' বিশেষ কোন উৎসাহ না দেখিয়ে জবাব দিল বৈমানিক।

তারপর নিদ্রালস গলায় যোগ করল, 'না লিখলেই বোধ হয় ভালো। গল্পটার সুযোগ নিয়ে গেবেল্‌স সারা পৃথিবীতে ঢাক পিটিয়ে জানাবে যে পায়ের পাতা নেই এমন লোকেদেরও রুশরা জোর করে লড়াই'এ নামাচ্ছে, আরো কত কিছু... ফ্যাশিস্টরা কী ধরনের চিজ আপনি ত জানেন।'

পর মুহূর্তেই জোরে নাক ডাকতে শুরু করল তার। কিন্তু আমার ঘুম এল না। ওর সরল ও উদাত্ত গল্পটি রোমাঞ্চিত করেছিল আমাকে। সুন্দর উপকথার মত মনে হত গল্পটি যদি না নায়কটি চোখের সামনে ঘুমোত, যদি না স্পষ্ট দেখতে পেতাম মেঝেতে, ভোরের ধূসর আলোয় চিকচিক করছে শিশিরে ভেজা নকল পাদুটো।

... এরপরে অনেকদিন আলেক্সেই মারেসিয়েভের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, কিন্তু যুদ্ধের স্রোতে যেখানেই ভেসে যাই না কেন, সঙ্গে থাকত স্কুল-খাতাদুটো, যে দুটোয় ওরিওলের কাছে বৈমানিকটির অনন্যসাধারণ ওডিসি আমি লিখে নিই। যুদ্ধের সময়ে, হয়ত সাময়িক বিরতি ঘটেছে, আর তারপর অবরোধমুক্ত ইউরোপের নানা দেশে ঘোরার সময়ে কত বার না ওর কাহিনীটি লিখতে শুরু করি আর ছেড়ে দিই, কেননা যা লিখি তা ওর আসল জীবনের ক্ষীণ ছায়ামাত্র মনে হয়!

নুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক সামরিক বিচারকমণ্ডলীর একটি অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিন হের্মান গোরিঙের জেরা শেষ হয়ে আসছিল। দলিলী সাক্ষ্যের চাপে বিচলিত আর সোভিয়েত অভিযোক্তার জেরায় কোণ ঠেসা হল "দুনম্বর জার্মান নাৎসি", অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চেপে আদালতকে জানাল কী করে ফ্যাশিস্টদের বিরাট আর তখন পর্যন্ত অজেয় বাহিনী আমাদের বিরাট দেশে নানা যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে ভেঙ্গেচুরে যায়, বিলুপ্ত হয়ে আসে। আত্মসমর্থন করে, আকাশের দিকে নিষ্প্রভ চোখ তুলে হোরিং বলল:

'ভগবদ্বিধানের জন্যই এটা হল।'

'জার্মানি পরাজিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের ফলে, এই বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ যে অতিঘৃণ্য অপরাধ সেটা কি আপনি স্বীকার করেন?' সোভিয়েত অভিযোক্তা হেরিংকে জিজ্ঞেস করলেন।

'অপরাধ নয়, মারাত্মক ভুল,' ভুরু কুঁচকিয়ে চোখ নামিয়ে নিচু গলায় জবাব দিল গেরিং। 'আমি শুধু স্বীকার করছি যে না ভেবেচিন্তে আমরা সেটা করি, যুদ্ধ চলার সময়ে এটা স্পষ্ট দেখা গেল যে আমরা অনেক বিষয়ে

অজ্ঞ ছিলাম, অনেক কিছুর অস্তিত্ব আমরা কল্পনাও করিনি। প্রধান যে জিনিসটা আমাদের অজানা ছিল, বুঝতে পারিনি যেটা, সেটা হল সোভিয়েত রুশদের চরিত্র। ওরা তখন এবং এখনো আমাদের কাছে হেঁয়ালির মত। দুনিয়ার সেরা গুপ্তচর বিভাগ ওদের সত্যিকার অন্তর্নিহিত সামরিক শক্তির হদিশ করতে পারবে না। কামান বিমান আর ট্যাঙ্কের সংখ্যার কথা বলছি না। সেটা মোটামুটি আমরা জানি। ওদের শিল্পের পরিসর আর সামর্থ্যের কথাও বলছি না। রুশ জনগণের কথা ভাবছি। বিদেশীর কাছে রুশরা বরাবরই হেঁয়ালির মত। নেপোলিয়নও ওদের বুঝে উঠতে পারেনি। আমরা শুধু নেপোলিয়নের ভুলের পুনরাবৃত্তি করি।'

"রুশ হেঁয়ালি" আর আমাদের "অন্তর্নিহিত সামরিক শক্তির" কথা যে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়েছে গেরিংকে তাতে গর্বিত বোধ করলাম। সোভিয়েত জনগণের সামর্থ্য, প্রতিভা, সাহস আর আত্মত্যাগ যুদ্ধের সময়ে সারা পৃথিবীকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল, সেগুলো যে তখন এবং এখনো গেরিংদের কাছে হেঁয়ালির মত, সেটা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি আমরা। "জার্মানরা ঈশ্বরের পেয়ারের লোক", এই হীন তত্ত্বের আবিষ্কর্তারা কী করে সমাজতান্ত্রিক দেশে লালিতপালিত জনগণের চরিত্রবল আর শক্তির কথা বুঝবে? আলেক্সেই মারেসিয়েভের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। ওকের চৌখুপী দেওয়া সেই নিরালঙ্কার হলে আমার চোখের সামনে স্পষ্টভাবে এল তার প্রায় ভুলে যাওয়া চেহারা। আর সেখানেই, ফ্যাশিজ্‌মের জন্মস্থান নুরেমবার্গে আমার ইচ্ছে হল একজনের কথা বলি, সে লক্ষ লক্ষ সাধারণ সোভিয়েত মানুষেরই একজন, তাদেরি একজন যারা কাইটেলের সেনাদল আর গেরিঙের বিমান বাহিনীকে চুরমার করে দেয়, রোদেরের জাহাজগুলোকে পাঠায় সমুদ্রের অতলে, বলিষ্ঠ আঘাতে ভেঙ্গে দেয় হিটলারের লুঠেরা রাষ্ট্রকে।

নুরেমবার্গে আমার কাছে হলুদ মলাট-দেওয়া স্কুলের খাতাদুটো ছিল, তার একটাতে মারেসিয়েভের হাতে লেখা: "তৃতীয় স্কোয়াড্রনের রোজনামচা"।

বিচারকমণ্ডলীর অধিবেশন থেকে বাড়ি ফিরে পুরোনো নোটগুলি দেখে নিয়ে আবার কাজে নামলাম। আলেক্সেই মারেসিয়েভ আমাকে যা বলেছিল তা থেকে ওর সম্বন্ধে ঠিক মত সবকিছু বলার ইচ্ছে ছিল আমার।

আমাকে ও যা বলে তার অনেকটা লিখে নিতে পারিনি, তা ছাড়া চার বছরে অনেক কিছু মন থেকে মুছে যায়। বিনয়ী বলে নিজের সম্বন্ধে অনেক

কথা বাদ দিয়েছিল আলেক্সেই মারেসিয়েভ, কল্পনার সাহায্যে ফাঁকগুলো ভরাতে বাধ্য হলাম আমি। নিজের বন্ধুদের ছবি সে রাত্রে স্পষ্ট ও সহৃদয়ভাবে সে এ'কেছিল, সেগুলো মনে ছিল না আমার, আবার নতুন করে আঁকতে হল তাদের। তথ্যগুলি পুরোপুরি অনুসরণ করে বলতে পারিনি আমি, নায়কের নাম একটু বদলে দিয়েছি; ওর বন্ধুদের, আর ওর কঠোর বীরত্বপূর্ণ যাত্রার সময়ে যারা ওকে সাহায্য করেছিল, নতুন নাম দিয়েছি তাদের। এর জন্য আশা করি নিজেদের ছবি এই কাহিনীতে চিনতে পারলে আমাকে মাপ করবেন তাঁরা।

বই'এর নাম দিয়েছি "মানুষের মত মানুষ", কেননা আলেক্সেই মারেসিয়েভ সোভিয়েত মানুষের মত মানুষ, হীনতম মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার মত লোকদের চিনতে পারেনি হের্মান গেরিং; আর এখনো চিনতে পারেনি তারা যারা ইতিহাসের পাঠ ভুলতে ইচ্ছুক, যারা এখনো গোপনে নেপোলিয়ন ও হিটলারের পন্থা অনুসরণ করতে চায়।

এইভাবে "মানুষের মত মানুষ" লেখা হয়।

ছাপার জন্য পাণ্ডুলিপিটা তৈরী হলে আমি চেয়েছিলাম প্রকাশের আগে যাতে বইটির প্রধান নায়ক সেটি পড়ে। কিন্তু যুদ্ধের হট্টগোলে তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ হারিয়ে গিয়েছিল; যে সব বৈমানিকদের আমরা দুজনে চিনতাম কিম্বা যে সব সরকারী মহলে খোঁজ নিয়েছিলাম তারা কেউই বলতে পারল না আলেক্সেই পেত্রোভিচ মারেসিয়েভ কোথায়।

গল্পটি একটি পত্রিকায় বেরোতে শুরু হয়েছে আর রেডিওতে বলা হচ্ছে, একদিন সকালে টেলিফোনটা বেজে উঠল, রিসিভারটা তোলাতে কানে এল একটু ভাঙ্গা, বলিষ্ঠ, অস্পষ্ট-চেনা কণ্ঠস্বর:

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনি কে?'

'গার্ডস মেজর আলেক্সেই মারেসিয়েভ।'

কয়েক ঘণ্টা পরে ভালুকের মত দুলে দুলে হাঁটার ভঙ্গীতে আমার ঘরে ঢুকল আলেক্সেই মারেসিয়েভ, ঠিক আগেকার মত তৎপর, প্রফুল্ল আর কর্মঠ দেখাচ্ছে তাকে। যুদ্ধের চার বছরে বলতে গেলে কোন পরিবর্তন হয়নি তার।

'বাড়িতে বসে পড়ছিলাম। রেডিও চলছিল, কিন্তু বইটিতে এত মগ্ন ছিলাম যে বেতারে কান দিইনি একেবারে। হঠাৎ মা বলে উঠলেন, "শোনো,

বাছা, ওরা তোমার কথা বলছে!” কান খাড়া করে বসলাম। সত্যিই তাই। আমার কথা বলছে। অবাক কাণ্ড, কে লিখতে পারে ওটা? কাউকে বলেছি বলে মনে পড়ল না। তারপর ওরিওলের কাছে ডাগ-আউটে আমাদের সাক্ষাৎকারের কথাটি মনে পড়ল, আমার অভিজ্ঞতার নানা গল্প করে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিলাম আপনাকে, মনে পড়ল... কিন্তু কী করে এটা সম্ভব... ভাবলাম। ওটা ঘটে অনেক দিন আগে, প্রায় পাঁচ বছর আগে। কিন্তু তাহলেও ত গল্পটি পড়া হচ্ছে। অধ্যায়টি শেষ করে লেখকের নাম করল কথক। তাই ঠিক করলাম আপনাকে খুঁজে বের করব।'

প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল, উদার একটু লাজুক হাসি হেসে; মারেসিয়েভের নিজস্ব হাসি, আগে দেখেছি সেটা।

অনেক দিন অসাক্ষাতের পরে দুজন সৈনিকের দেখা হলে বরাবর যা হয়, আমরা আবার আমাদের সব যুদ্ধ নতুন করে লড়লাম, দুজনের চেনা অফিসারদের কথা উঠল, যারা আমাদের জয়লাভ দেখে যেতে পারেনি তাদের সম্বন্ধে কথা বললাম। আগেকার মত আলেক্সেই নিজের বিষয়ে বলতে অনিচ্ছুক, তবুও জানলাম যে আমাদের সাক্ষাৎকারের পর যুদ্ধে আরো অনেক সাফল্য অর্জন করে সে। নিজের গার্ডস উইঙের সঙ্গে ১৯৪৩-১৯৪৫ সালের নানা অভিযানে ও লড়ে। আমাদের দেখা হবার পরে ওরিওলের কাছে তিনটে শত্রু বিমান নামায়, তারপর বল্টিক উপকূলে যুদ্ধের সময়ে আরো দুটো। সংক্ষেপে পায়ের পাতা হারানোর জন্য শত্রুকে অনেক মূল্য দিতে বাধ্য করে সে। সরকার ওকে “সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর” খেতাব দেন।

ব্যক্তিগত জীবনের কথাও বলল আলেক্সেই; এ সূত্রে আমার গল্পটির সুখী পরিসমাপ্তিতেও আমি খুসি।

যুদ্ধের পর আলেক্সেই যে মেয়েটিকে ভালোবাসত তাকে বিয়ে করে, একটি ছেলে হয়েছে, তার নাম ভিক্তর। মারেসিয়েভের মা কামিশিন থেকে এসে ওদের সঙ্গে আছেন, ওদের সুখে সুখী তিনি, পৌত্রের দেখাশোনা করেন।

এখন আমার গল্পের প্রধান নায়কটির নাম খবরের কাগজে প্রায়ই বেরোয়। আমাদের পূত সোভিয়েত ভূমিতে হামলাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে সোভিয়েত অফিসারটি সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার এত দীপ্ত দৃষ্টান্ত স্থাপিত করে সে এখন বিশ্বশান্তির উৎসাহী সমর্থক। নানা সম্মেলনে ও

সমাবেশে তাকে একাধিকবার দেখেছে বুদাপেস্ত, প্রাগ, প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন ও ওয়ারস'র মেহনতী জনগণ। এই সোভিয়েত যোদ্ধাটির বিস্ময়কর কাহিনী নিজের দেশের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর গিয়েছে, যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা যে এমন অটলভাবে সহ্য করেছে তার মুখে শান্তির মহৎ দাবী বিশেষ করে জোরালো শোনায়।

স্বাধীনতাপ্রিয় পরাক্রান্ত জনগণের সন্তান আলেক্সেই মারেসিয়েভ, যুদ্ধের সময়ে যে দৃঢ় আগ্রহে জয়লাভে নিঃসংশয় হয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়ে তাদের হারায়, ঠিক সে ভাবে এখন শান্তির জন্য লড়াই করছে সে।

তাই মানুষের মত সোভিয়েত মানুষ, আলেক্সেই মারেসিয়েভের কাহিনীর উত্তরভাগ রচনা করছে জীবন নিজেই।

মানুষের মতো মানুষ

'রাদুগা' প্রকাশন

অনুবাদ: **সমর সেন**

দ্বিতীয় সংস্করণ

বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৫৮



Б. Полевой

সূচিপত্র

লেখকের কথা

আমাব জন্ম হয় মস্কোতে, ১৯০৮-এর ১৭ই মার্চে। কিন্তু আমি মানুষ হই ত্ভের সহরে, যার নাম এখন কালিনিন। তাই এখনো আমি নিজেকে কালিনিনের অধিবাসী বলে মনে করি।

আমার বাবা. উকিল ছিলেন তিনি, ১৯১৬ সালে টিবি'তে মারা যান। তাঁকে বলতে গেলে আমার মনে নেই, কিন্তু চিরায়ত রুশ ও বিদেশী সাহিত্যের যে চমৎকার লাইব্রেরী তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তা থেকে এবং মায়ের কথা থেকে বোঝা যায় যে নিজের কালে তিনি প্রগতিশীল ও উচ্চ শিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আমার মা একটি কারখানার হাসপাতালে ডাক্তারের কাজ নেন, এবং আমরা বিরাট মরজভ সুতী কলের একটি বাড়িতে চলে যাই।

সেখানেই কাটে আমার শৈশব ও যৌবন।

তথাকথিত 'কর্মচারীদেব বাড়িতে' আমরা থাকতাম বটে, কিন্তু মজুরদের ছেলেদের সঙ্গে আমাব মিতালি ছিল, স্কুলে পড়তাম তাদের সঙ্গে। প্রায়ই মা হাসপাতালে এত ব্যস্ত থাকতেন যে আমাকে কোন সময় দিতে পারতেন না, তাই আমি বেশীর ভাগ সময় বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতাম মজুরদের 'শোবার ঘবে', হস্টেলগুলিকে ওই নামে ডাকা হত তখন. আর বসতির উপকণ্ঠে। পড়াশুনোয় খারাপ ছিলাম না, কিন্তু কোন বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না আমার। অবসর সময় কাটত ত্মাকা নামে কারখানার একটি পঙ্কিল ছোট নদীর ধারে, আর বাবার লাইব্রেরীর বই'এর অধ্যয়নে। পাঠের নির্দেশ দেবার চেষ্টা করতেন আমার ব্যস্তসমস্ত মা, তাঁর প্রিয় লেখকদের নাম সুপারিশ করতেন। মনে পড়ে আমার প্রথম-পড়া বইগুলোর মধ্যে ছিল গোগল, চেখভ, নেক্রাসভ আর পমিয়ালভস্কির লেখা। সবচেয়ে ভালো লাগত গোর্কিকে। ছাত্রাবস্থায় আমার মা বাবা দুজনেই গোর্কিকে পুজো করতেন, আর আমাদের লাইব্রেরীতে গোর্কির প্রাক-বিপ্লব প্রায় সমস্ত বইই ছিল।

মনে পড়ে, আমার শৈশবের আর একটি সখ ছিল প্রকৃতির অধ্যয়ন। চতুর্থ শ্রেণী থেকে কিশোর অধ্যয়নকারীদের চক্রে আমি ছিলাম 'পাণ্ডা' আর সহর এবং প্রজাতন্ত্রের নবীন প্রকৃতি অধ্যয়নকারীদের সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতাম। বাড়িতে সব সময়ে থাকত কোন না কোন জন্তু বা পাখি, কারখানার উঠোনে কোথা থেকে আসা, তারে লেগে ডানা-ভাঙ্গা একটি শিকারী শ্যেন; নীড়চ্যুত, বেড়ালের হাত থেকে রেহাই-পাওয়া একটি বাচ্চা দাঁড়কাক; একটা শজারু কিম্বা একটা ঘাস সাপ, জানলার তাকে দুটো পাল্লার মাঝখানে একটি বিশেষ বাক্সে সেটাকে রেখেছিলাম।

'ত্ভেরস্কায়া প্রাভদা' নামক আঞ্চলিক সংবাদপত্র আমাদের সহর থেকে বেরোত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কারখানায় শ্রমিক-সাংবাদিকের একটি বড়ো সংস্থা গঠিত হয়, পাম্প-হাউসে খোলা হয় একটি শাখা সম্পাদকীয় অফিস। ছোট সেই ইঁটের বাড়ির দরজা হয়ে যাঁরা যাতায়াত করতেন তাঁদের দেখে আমরা সব বাচ্চারা শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে যেতাম। ওঁরা হচ্ছেন শ্রমিক-সাংবাদিক! কাগজে লেখেন ওঁরা! সংস্থাটির সভাপতি ছিলেন একটি ফিটার, কারখানার সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিদের একজন হয়ে উঠলেন তিনি।

সুদূর সেই সব দিনে নিশ্চয়ই সাংবাদিকতা আমাকে প্রথম আকর্ষণ করে; মনে হত সাংবাদিকতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, আর সে সময় যেমন মনে হত, কিছুটা রহস্যময়ও বটে।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমার প্রথম লেখা বেরয় 'ত্ভেরস্কায়া প্রাভদা'তে। যতদূর মনে হয়, লেখাটা সাত লাইনের, সুপরিচিত কৃষাণ-কবি স দ. দ্রজ্জিন আমাদের স্কুলে আসেন, তাঁর বিষয়ে। পিছনের পাতার একটা কোণে সেটা ছাপা হয়, মনে হয় লেখকের নাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমি ত জানতাম লেখাটা কার, খবরের কাগজের সেই সংখ্যাটি আমার পকেটে ঘুরত, যত দিন না সেটা প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। 'ত্ভেরস্কায়া প্রাভদা'য় আমার নিয়মিত লেখার প্রথম সেটি। শুরুতে সহরের নানা অসুবিধার বিষয়ে লিখতাম, পরে আরো গুরু বিষয়বস্তু হাতে নিই; আর যখন খবরের কাগজের লোকেরা আমাকে আরো ভালো করে চিনল তখন সহরের জীবন আর কলকারখানার বিষয়ে নানা প্রবন্ধ আর রেখাচিত্র লিখতে আমাকে বলা হত।

তখনো স্কুলে যেতাম, স্কুলের পড়া শেষ হলে শিল্প কলেজে ভর্তি হলাম। সেখানে রসায়ন ছিল আমার পাঠ্য, সংখ্যাগত এবং গুণগত নানা বিশ্লেষণ করতাম। কিন্তু মন পড়ে থাকত মুদ্রাকরের কালির গন্ধে-ভরা সম্পাদকীয় অফিসে। বাণিজ্যের ক্লাসে মাস্টারমশাই যা বলছেন তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন কোন জিনিসের বিষয়ে প্রবন্ধ কিম্বা রেখাচিত্র লুকিয়ে লুকিয়ে লিখতাম। এইভাবে ক্রমশ জড়িত হয়ে পড়লাম সাংবাদিকের মহৎ পেশার সঙ্গে, সাহিত্যের নানা বিভাগের মধ্যে যে পেশাটি আমার কাছে এখনো সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মনে হয়।

তখনকার দিনের 'ত্ভেরস্কায়া প্রাভদা' বেশ সজীব উদ্যোগী সংবাদপত্র ছিল। সময়মত খবরের হুঁশ রাখত কাগজটি, কলকারখানায় আর গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক জীবন প্রতিদিন নতুন কিছু না কিছুর সৃষ্টি করছে, সেগুলো চট করে ধরে পাঠকের সামনে হাজির করত। জীবনকে গভীর অভিনিবেশে দেখা, আশেপাশে যা ঘটছে সেগুলো বোঝার চেষ্টা করা, বিষয়টি হাতের মুঠোয় এলে পড়ে তবে লেখা, সাংবাদিকের কাজ আমাকে এসব শেখায়। ছুটির দিনগুলো লাগাতাম সংবাদপত্রটিতে, পর্যবেক্ষণের জন্য সময়ের সদ্ব্যবহারের যতখানি সম্ভব চেষ্টা করতাম।

শৈশব থেকে গোর্কির বই আমার প্রিয়, তাঁর মূর্তি দীপ্ত শিখার মত আমার যাত্রাপথকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। জীবনকে কী করে দেখতে হয় তাঁর কাছ থেকে শিখি। একটি গ্রীষ্মে সংবাদপত্রটির সঙ্গে কথা হল যে ত্ভের কাঠুরিয়া আর ভেলা

মাঝিদের বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখব, তারপর ত্ভের গ্বের্নিয়ার সোলিজ্ঞারভ উয়েজ্দে যাই। সেখানে কাঠুরিয়াদের দলে ভিড়ি, ভেলায় কাঠ আনতাম, পরে একটি নৌকোর তৃতীয় দাঁড়ী হই। গেলাম ভলগায়, ভলগার উৎসমুখ থেকে নিজের সহবে, তারপরে আরো ভাঁটিতে রিবিনস্কে, সেখানে কাঠের জেটিতে নৌকোগুলো লাগার পর আমার যাত্রা নিরাপদে শেষ হল।

ইতিমধ্যে সংবাদপত্রটিতে 'ভেলায় কাঠ আনার' বিষয়ে আমার প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে বেরোচ্ছে; নৌকোর মাঝখানের ছাউনির কাছে আগুনের সামনে বসে রাত্রে লিখতাম।

পরের গ্রীষ্মে একটি গ্রাম্য সংবাদপত্র 'ত্ভেরস্কায়া দেরেভনিয়া' প্রাক-যৌথখামার গ্রামটিতে সমাজতান্ত্রিক জীবন কী করে আসছে তার বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখার ভার আমাকে দেয়। ত্ভের কারেলিয়ার গভীরে মিকশিনো গ্রামে গ্রন্থাগারিকের কাজ নিলাম, সেখান থেকে গ্রাম জীবন আর যৌথ শ্রমের প্রথম অঙ্কুর সম্বন্ধে লেখা পাঠাতাম।

আমার প্রথম সংবাদপত্র প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয় ১৯২৭-এ। সে সময়ে 'স্মেনা' নামক কমসমল সংবাদপত্রের জন্য কাজ করতাম আমি, সেখানকার বন্ধুরা আমাকে না জানিয়ে সরেণ্টোতে মাক্সিম গোর্কির কাছে বইটা পাঠায়।

খবরটা কানে আসাতে আতঙ্কিত বোধ করলাম। ইতিমধ্যেই আমি জানতাম যে প্রবন্ধগুলো নেহাৎ সাধারণ, কোন মহান লেখককে আমার কাঁচা লেখা পড়তে দেওয়াটা পাপ মনে হল। বিদেশী টিকিট দেওয়া, পরিষ্কার বড়ো অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা লেখা ভারী একটা প্যাকেট যখন এল তখন আমি কী রকম বিস্মিত হয়েছিলাম, কল্পনা করতে পারেন।

ফুলস্কেপ কাগজের ছ'পাতা ভরে, অত্যন্ত অবহিত আর বদান্যভাবে আমার অপরিণত রচনাগুলির সমালোচনা করেছেন গোর্কি, উপদেশ দিয়েছেন উন্নতি সাধনের জন্য অবিরত খাটতে, শিল্পগুরুদের কাছে শিখতে, কী ভাবে লেখনভঙ্গী আরো মার্জিত করতে হয়, 'ঠিক যে ভাবে লেদ্চালক ধাতু মাজাঘষা করে', সে ভাবে। মহান লেখকের চিঠিটি আমার কাছে গোটা একটা স্কুলের কাজ দেয়। তাঁর লেখা প্রত্যেকটি শব্দ নিয়ে চিন্তা করি, চেষ্টা করি তা থেকে সঠিক ও কার্যকরী সিদ্ধান্তে পেণছতে। গোর্কি আমাকে বুঝতে সাহায্য করলেন যে সাংবাদিকতা আর সাহিত্য অত্যন্ত জটিল ও কঠিন পেশা, অন্য যে কোন পেশার মত, বেশী বই ত কম নয়, চর্চাসাপেক্ষ। বুঝতে পারলাম যে সাংবাদিকতা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক গোছের মনোভঙ্গী কোন কাজে লাগে না, বলশেভিক সংবাদপত্র জীবনের উপযুক্ত প্রতিনিধি হবার বিন্দুমাত্র আশা রাখলে প্রাণমন দিয়ে খাটতে হবে।

তখন কলেজ থেকে পাস করে আমি ত্ভেরে 'প্রলেতারকা' কারখানার ছাপাকলে, কিম্বা লোকে যেটাকে 'রং-ছোপানোর' কল বলত, সেখানে কাজ করছি। বেশী দিন যেতে না যেতেই সেখানে আমি শ্রমিক-সাংবাদিক চক্রের সভ্য হলাম। সংবাদপত্রের কাজ আমার অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু কারখানার ডিউটি আর নানা সামাজিক কাজ কর্মের পর লেখার সময় প্রায় থাকত না। তবু সংবাদপত্রের কাজ ক্রমশ গভীরভাবে আকর্ষণ করতে লাগল

আমাকে। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে. কারখানা ছেড়ে দিয়ে 'স্মেনায়' গুবেনিয়ার কমসমল সংবাদপত্রে যোগ দিলাম আমি।

'স্মেনার' লেখকেরা বেশ সক্ষম, তাঁদের অনেকে পরে প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক হন। আমরা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতাম। সংবাদপত্রটির টাকাকড়ি এমন কিছু ছিল না, সপ্তাহে দুবার যে ছয় কিম্বা আট পাতা ছাপা হত তার তুলনায় বরঞ্চ অনেক কম। সে জন্য বেশীর ভাগ কাজ বিনা পয়সায় করত উৎসাহী, নবীন শ্রমিক-সাংবাদিকরা। আমাদের কাগজটির উদ্যমের সুপারিশ কয়েকবার 'প্রাভদা' করে। 'স্মেনায়' এবং সেটি বন্ধ হয়ে গেলে কালিনিনের আঞ্চলিক সংবাদপত্র 'প্রলেতারস্কায়া প্রাভদায়' কাজ করি মহান স্বদেশী যুদ্ধ শুরু না হওয়া পর্যন্ত। রেখাচিত্র আর সমালোচনা লিখতাম, শিল্প আর সংস্কৃতি বিভাগের ভার ছিল আমার হাতে।

১৯৩০ থেকে কমিউনিস্ট যুব সংঘের সদস্য ছিলাম আমি, ১৯৪০ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিই। পরে যা কিছু আমাকে সাহিত্যিক হতে সাহায্য করেছে তার জন্য আমি ঋণী মহান কমিউনিস্ট পার্টির কাছে।

সংবাদপত্রে কাজের সঙ্গে সঙ্গে গল্পও লিখতাম, কিন্তু গোর্কির উপদেশ মনে ছিল বলে কয়েকটি গল্প মাত্র আমাদের কাগজে আর 'আমাদের সময়' নামক আঞ্চলিক পত্রিকায় ছাপিয়েছিলাম। ১৯৩৯ সালে আমার প্রথম আখ্যায়িকা 'গনগনে কর্মশালা' প্রকাশিত হয় 'অক্টোবর' পত্রিকায়।

কালিনিনের নানা কলকারখানার সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলন শুরু হয়েছে, নতুন নতুন দুঃসাহসী উদ্ভাবন প্রবর্তিত হচ্ছে, সে বিষয়ে আমি যা দেখি তা সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করি বইটিতে। সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী আমি ছিলাম, আমাদের সংবাদপত্রে লিখেছিলাম সে বিষয়ে। বইটি যা কিছু সাফল্য অর্জন করেছিল তার জন্য দায়ী এতে বর্ণিত নানা ঘটনার মাহাত্ম্য আর লোকজন। স্বীকার করছি যে বইটির বিষয়বস্তু আর প্রধান চরিত্রগুলি বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া, এত বেশীভাবে নেওয়া যে কালিনিন রেলগাড়ির কারখানার পুরোনো লোকেরা বইটিতে নিজেদের সহকর্মীদের চটপট চিনে ফেলে। নায়কের প্রতিরূপ যে সে আমাকে তার বিয়েতে নিমন্ত্রণ করল, এইভাবে ব্যাপারটির সমাপ্তি ঘটে। কনে হল আমার নায়িকার প্রতিরূপ। বিবাহে আমন্ত্রিতরা আমাকে ঠাট্টা করল এই বলে যে নায়ক ও নায়িকাকে শেষ পর্যন্ত জের টেনে আখ্যায়িকাটি শেষ করতে হল, পরিসমাপ্তিটি মামুলী হলেও মধুর।

সাংবাদিক হিসেবে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রথম এই আখ্যায়িকাটি লিখতে সাহায্য করে। কিন্তু সাহিত্য কর্মী হিসেবে আমার সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করি 'প্রাভদায়'। ১৯৪১ সালের অক্টোবরে আমাদের সহর জার্মান দখলে চলে যাবার পর 'প্রাভদার' যুদ্ধ সাংবাদিকদের দলে যোগ দিই।

সাংবাদিক হামেশাই পা বাড়িয়েই থাকে, সংবাদপত্রের নির্দিষ্ট কাজ করতে হয় তাকে, ঘটনাবিবৃতির কাজ জরুরী, রয়ে সয়ে, মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে করলে চলে না, নির্ধারিত কয়েকটি পঙ্ক্তির মধ্যে শেষ করতে হয় বর্ণনাটি; সে জন্য আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে সংবাদপত্রের কাজ আমার সাহিত্যিক উদ্যমকে ব্যাহত করে কি না।

এ ধরনের প্রশ্নে আমি বিরক্ত বোধ করি না, শুধু হাসি পায়। কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের কাজ সাহিত্যের পথ আমাকে দেখায়, জীবনে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক আর গুরুত্বপূর্ণ যা তা খুলে ধরে চোখের সামনে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, আমার কালের লোকেদের চরিত্রে যা কিছু নতুন আর সত্যিকারের কমিউনিস্ট গুণসম্পন্ন তা ধরতে শেখায়। 'প্রাভদার' যুদ্ধ-সাংবাদিক হিসেবে বিরাট ফ্রন্টলাইনের নানা প্রধান খণ্ডে আমি অবিরত থাকি, আমার সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির ভাগ্য নির্ণয় চলছিল সেখানে। আমাকে অমূল্য মালমশলা যোগায় সেটা পরবর্তী বইগুলির জন্য।

আজ এ কথাটা বহু লোকে জানে যে 'মানুষের মত মানুষ' আর 'আমরা — সোভিয়েত জনগণ' বইদুটির নায়ক নায়িকারা সত্যিকারের জীবন্ত নরনারী, তাদের বেশীর ভাগ স্বনামে কিম্বা অল্প অদলবদল করা নামে উপস্থিত হয়েছে বইদুটিতে। বইগুলি লেখার কথা মনে হয় 'প্রাভদার' সম্পাদকীয় অফিসে। সেটা হয় এভাবে।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারীতে 'মাৎভেই কুজমিনের কীর্তি' শিরোনামায় একটি গল্প প্রকাশিত হয় 'প্রাভদায়'। কুজমিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে ফিরে এসেই তাড়াতাড়িতে গল্পটা লিখি, বিষয় ছিল 'সূর্যোদয়' তিসি চাষ যৌথখামারের একটি আশি বছরের কর্মী, যে ইভান সুসানিনের কীর্তির পুনরাবৃত্তি করে। গল্পটি কাঁচা, ঠিকমত লেখা হয়নি। ফ্রন্ট থেকে মস্কোতে ফিরেছি, সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সম্পাদক ডেকে পাঠালেন আমাকে, বললেন যে এই অসাধারণ কীর্তিটির বিবৃতি অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে, ভঙ্গীটি আনাড়ি সংবাদদাতার মত।

'চমৎকার গল্প হতে পারত এটা,' আমাকে বকে তিনি বললেন, সবকিছু সাধারণ সূত্রে ফেলা অভ্যাস ছিল তাঁর, তাই যোগ করলেন, 'যুদ্ধ সাংবাদিক সবাইকে বলেছি, আপনাকেও বলি: আমাদের লোকেরা অসাধারণ কিছু করেছে চোখে পড়লেই কিম্বা দেখলেই খুঁটিয়ে লিখে নেবেন। নাগরিক হিসেবে এটা আপনাদের কর্তব্য। তাছাড়া পার্টির সদস্য হিসেবে সেটা আপনার কর্তব্য। একবার ভাবুন ত এই যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ যে সাহসের পরিচয় দিচ্ছে তার তুলনা প্রাচীন, মধ্যযুগীয় কিম্বা আধুনিক ইতিহাসের কোন বীরের বৃত্তান্তে মেলে না। এসব কীর্তির কথা লোকে যাতে না ভোলে, আমাদের জনগণ যাতে আজ না হয় কাল জানতে পারে তাদের দেশবাসীরা কী ভাবে ফ্যাশিবাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে আর জয়লাভ করেছে, তার জন্য প্রত্যেকটি জিনিস লিখে নেওয়া উচিত।'

তাই শক্ত মলাট দেওয়া মোটা একটা নোটবুক জোগাড় করলাম, শৌর্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখলে বা শুনলেই লিখে রাখতে শুরু করলাম। ঘটনাস্থানগুলির নাম আর পাত্রপাত্রী কিম্বা প্রত্যক্ষদর্শীর বাড়ির ঠিকানা লিখে রাখতে ভুলতাম না।

যুদ্ধ-সাংবাদিকের কাজের জন্য রণক্ষেত্রের এ অংশ থেকে সে অংশে যেতাম, ফ্রন্ট থেকে 'পার্টিজান এলাকায়', সেখান থেকে বনে যেখানে শত্রুদের পিছন থেকে আক্রমণ করছে নির্ভীক নানা দল, তারপর আবার ফ্রন্টে, স্তালিনগ্রাদ, কুর্স্ক স্যালিয়েণ্ট, কর্সুন-শেভচেঙ্কোভস্কি, ভিস্টুলা, নিস্ আর স্প্রি'র ফ্রন্টে... আর সর্বত্রই আমার চোখে পড়ল সোভিয়েত জনগণের শৌর্য, ইভান সুসানিন, মারফা কাজিনা, সেভাস্তপলের নাবিক

কশকার মত অতীতের নানা গণ বীর এবং ইতিহাস ও সাহিত্যে প্রতিমূর্তিত আরো অনেকের কীর্তিকলাপ ছাড়িয়ে গিয়েছে সে শৌর্য।

যুদ্ধের সময় সবশুদ্ধ এরকম ৬৫টি নোট তৈরী করি। তার একটিতে বর্ণিত হয়েছে বৈমানিক গার্ডস সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আলেক্সেই মারেসিয়েভের সঙ্গে ওরেলের কাছে একটি বিমান-ঘাঁটিতে আমার অসাধারণ সাক্ষাৎকারের কথা, সহরটিতে তখন আক্রমণ চলেছে; গল্পটি পরিণত হয় 'মানুষের মত মানুষ'এর কাহিনীতে। বাকি নোটগুলি থেকে ২৪টি বাছাই করি; আমার মতে সেগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর নমুনামূলক, সোভিয়েত মানুষের চিত্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে এগুলিতে; 'আমরা — সোভিয়েত জনগণ' বইটির গল্পগুলির জন্য ব্যবহার করি এদের।

বর্তমানে যুদ্ধের পরে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ে লেখার ধারা অনুসরণ করে চলেছি। 'প্রত্যাবর্তন' নামের ছোট গল্পটিতে মস্কোর একটি বিখ্যাত ইস্পাত ঢালাইকারীর জীবনের একটি ঘটনাকে শিল্পায়নের চেষ্টা করেছি। 'সোনা' নামের উপন্যাসটি ১৯৪২ সালের শুরুতে কালিনিন ফ্রণ্টে আমাদের সৈন্যদের আক্রমণের সময় একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমার মনে হয় না এই প্রত্যক্ষধর্মিতা অসাধারণ কিছু। আমাদের সমাজতান্ত্রিক জীবন এগিয়ে চলেছে, চলার সময়ে ক্রমাগত নানা পরিবর্তন হচ্ছে, প্রতি দিন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় লেখকের সামনে আসছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, সরল অথচ অসাধারণ নানা জিনিস। সাম্যবাদের উজ্জ্বল ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত সোভিয়েত জনগণ শ্রম আর সামরিক বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, দেশের নামে তারা যা করছে তা কল্পনাতীত। আর লেখকের সামনে সোভিয়েত বাস্তব জীবন নানা ধরনের যে সব চরিত্র খুলে ধরে তার শেষ নেই!

সংবাদপত্রের কাজের জন্য আমাদের সময়ের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক লোকজনের সংস্পর্শে ক্রমাগত আমি আসি, তাদের জীবন ও কাজ দেখার সুবিধা আমার হয়। সাংবাদিকতা চোখ আর কানকে সজাগ করে। আমার কথা বলতে পারি, শিল্পের কল্পনায় ফাঁক যদি ঘটে, তাহলে সেটার ক্ষতিপূরণ করে জীবন থেকে আহৃত নানা ঘটনা।

আমার নায়কেরা বই'এর পাতার বাইরে তাদের প্রবহমান জীবন দিয়ে যেন আখ্যায়িকার জের টেনে চলেছে। আলেক্সেই মারেসিয়েভের সঙ্গে আমার দেখা হয় ওয়ার্স'তে, নায়ক আর লেখক হিসেবে নয়, দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসেবে; 'একটি মহাকাব্যের জন্ম' গল্পটির নায়ক মালিক গাব্‌দুলিন, এখন কাজাখ বিজ্ঞান আকাদমীর সাহিত্য ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা; সেই পলতাভা কৃষাণী উলিয়ানা বেলগ্রুদ, যিনি একটি ট্যাঙ্ক দলের পতাকা বাঁচিয়েছিলেন ('রেজিমেণ্টের পতাকা' গল্প), তিনি যুদ্ধের পর চিনিবীট চাষে সাফল্যের জন্য উচ্চ পুরস্কার পান।

এসব লোকেদের কর্মমুখর সৃষ্টিশীল সুখী জীবন দেখে দ্বিগুণ আনন্দ হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশের লেখক হওয়াটা পরম আনন্দের কথা!

ব. পলেভয়

নভেম্বর, ১৯৫০

প্রথম খণ্ড

১

তীক্ষ্ন ঠান্ডা আলোয় তখনো তারারা ভাস্বর, কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্বাকাশ সকালের ক্ষীণ আভায় উদ্ভাসিত। ঝাপসা আলোয় গাছপালা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হঠাৎ দমকা তাজা হাওয়ায় গাছের মাথাগুলো নড়ে উঠল, সমস্ত বন ভরে গেল উচ্চকিত, প্রতিধ্বনিমুখর শব্দে। বহু প্রাচীন পাইনগাছগুলি উৎকণ্ঠিত মৃদুস্বরে ফিসফিস করে পরস্পরকে ডাকল, বিচলিত শাখা থেকে শুকনো গুঁড়োগুঁড়ো বরফ ঝরে পড়ল ঝরঝর করে।

হঠাৎ-আসা হাওয়া হঠাৎ থেমে গেল। গাছগুলো আবার ঘনীভূত জড়তায় আচ্ছন্ন। আর তারপরেই ভোরের সূচনা করে বনের নানা শব্দ ভেঙ্গে পড়ল: কাছের খোলা জায়গায় নেকড়ের ক্ষুধিত গর্জন, শেয়ালের সতর্ক ডাক, আর সদ্য-জাগ্রত কাঠঠোকরার প্রথম অনিশ্চিত ঠকঠক, নিস্তব্ধ বনে এত সুরেলা সে শব্দ যে মনে হয় পাখিটা বেহালায় টোকা দিচ্ছে, গাছের গুঁড়িতে নয়।

আবার ভারী ভারী পাইনের মাথায় দমকা হাওয়া। ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আকাশে শেষ তারা কটি আস্তে আস্তে নিভে গেল; মনে হল আকাশ ছোট আর ঘন হয়ে এসেছে। রাত্রের বিষণ্ণ অন্ধকারের রেশ ঝেড়ে ফেলে সজীব সবুজ মহিমায় সমস্ত বন জাগ্রত। পাইনের কোঁকড়া মাথায়, ফারের ঋজু পাতলা শাখায় গোলাপী রং থেকে বোঝা যায় সূর্য উঠেছে আর দিনটি হবে উজ্জ্বল, ঝরঝরে আর হিমশীতল।

বেশ আলো হয়ে এল। রাত্রের শিকার ধীরেসুস্থে হজম করার জন্য নেকড়েগুলো বনের গভীরে চলে গিয়েছে, খোলা জায়গায় শেয়ালগুলোও

আর নেই, বরফে তাদের পায়ের আঁকাবাঁকা ধূর্ত ছাপ। প্রাচীন বনটি সমান অবিরাম শব্দে মুখরিত। সেই বিষণ্ণ, উৎকণ্ঠিত একটানা শব্দের পাতলা ঢেউ'এ কিছুটা বৈচিত্র্য আনছে শুধু পাখিদের অকারণ ব্যস্ততা, কাঠঠোকরার ঠকঠক, এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে যাওয়া হলুদ টমটিটগুলোর খুসির কিচির মিচির আর কাকগুলোর খরখরে লোভী ডাক।

অল্ডারগাছে বসে একটা হাঁড়িচাঁচা ছুঁচলো কালো ঠোঁট ডালে ঘষে সাফ করছিল, হঠাৎ মাথা খাড়া করে কী যেন শুনল, উড়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে ডালে বুক দিয়ে বসল। শুকনো ডালগুলো উৎকণ্ঠায় মড়মড় করে উঠল। নিচের ঝোপঝাপ ঠেলে যাচ্ছে লম্বা চওড়া কী একটা। সরসর করছে ঝোপগুলো, অস্থিরভাবে দুলছে বাচ্চা পাইনগুলির মাথা, শোনা গেল খরখরে বরফ ভাঙ্গার আওয়াজ। তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে হাঁড়িচাঁচাটা উড়ে গেল, লেজটা ঠিকরে রইল তীরের মত।

বরফে-ঢাকা পাইনগুলো ভেদ করে বেরিয়ে এল একটা লম্বা বাদামী মুখ, ভারী প্যাঁচালো শিং জানোয়ারটার মাথায়। ভীত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল বিরাট ফাঁকা জায়গাটি। লাল, মখমলের মত ওর নাসারন্ধ্র কেঁপে কেঁপে উঠল আক্ষেপে, গরম ভাপের নিঃশ্বাস ফোঁস ফোঁস করে পড়তে লাগল।

পাইনের মধ্যে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল বুড়ো হরিণটা। শুধু পিঠের লোমশ চামড়া অস্থির থরথর করে কাঁপছে। কানদুটো ভয়ে খাড়া, প্রত্যেকটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, এত প্রখর ওর শ্রবণশক্তি যে একটা বড়ো গুবরে পোকা পাইনগাছের গা ফুটো করছে, সে আওয়াজটা পর্যন্ত কানে এল। তবু এমন কি তার সূক্ষ্ম কানেও বনের কোন অস্বাভাবিক ধ্বনি ধরা পড়ল না, শুধু পাখির কিচির মিচির, কাঠঠোকরার ঠকঠক আর পাইনের মাথায় একটানা সরসর শব্দ।

শুনে আশ্বস্ত হল বটে হরিণটা, কিন্তু ওর ঘ্রাণশক্তি বিপদের কথা জানাল। গলন্ত বরফের তাজা গন্ধের সঙ্গে মিশছে এই গভীর বনের অনাত্মীয় নানা কটু অপ্রীতিকর অশুভ গন্ধ। হরিণটার কালো বিষণ্ণ চোখে ধরা পড়ল চোখ-ঝলসানো শাদা বরফের শক্ত আবরণে কালো কী সব পড়ে আছে। হরিণটা নড়ল না বটে, তবে শরীরের সমস্ত পেশী সংকুচিত করে ঝোপঝাড়ে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু বরফের উপরে নিশ্চল পড়ে রইল মূর্তিগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি করে, তালগোল পাকিয়ে। সংখ্যায় অনেক তারা,

কিন্তু কেউ নড়ছে না, আদিম স্তব্ধতা ভাঙ্গছে না কেউ। ওদের কাছাকাছি বরফের পুঞ্জে উদ্যত অদ্ভুত নানা দৈত্য; ওইখান থেকেই আসছে কটু অশুভ সব গন্ধ।

ফাঁকা জায়গার প্রান্তে দাঁড়িয়ে হরিণটা সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে আছে, ভেবে পাচ্ছে না কী ঘটেছে এই নিশ্চল আপাত নিরীহ মানুষের দলটির।

হঠাৎ একটি শব্দে চমকে উঠল হরিণটা। পিঠের চামরা আবার কেঁপে উঠল থরথর করে, পিছনের পাদুটোর সমস্ত পেশী আরো সংকুচিত হয়ে এল।

কিন্তু দেখা গেল ভয়ের কোন কারণ নেই। অংকুরিত কোন বার্চগাছের পাতা ঘিরে উড়ছে গুবরে পোকা, তার অস্ফুট গুনগুনের মত আওয়াজটা। তার সঙ্গে মাঝেমাঝে মিশছে সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ন ঘনঘনে কর্কশ একটা শব্দ, সন্ধ্যাবেলায় জলায় সারসের ডাকের মত।

তারপর গুবরে পোকাগুলোকে দেখা গেল, জ্বলজ্বলে পাখায় নীল ঠাণ্ডা আকাশে নাচছে। উঁচুতে বারবার শোনা যাচ্ছে সারসটার ডাক। একটা গুবরে পোকা পাখা ছড়িয়ে ঠুকরে মাটিতে পড়ল, বাকিগুলো নেচেই চলল। হরিণটার পেশীর টান-টান ভাব চলে গেল, ফাঁকা জায়গায় এসে, আকাশের দিকে সতর্কভাবে তাকিয়ে মুড়মুড়ে বরফ চাটল একবার। হঠাৎ আর একটা গুবরে পোকা নাচিয়েদের দল ছেড়ে সটান নেমে এল খোলা জায়গাটায়, পিছনে রেখে এল লোমশ পুচ্ছ। যত নিচে আসছে তত বড়ো হচ্ছে পোকাটা, এত তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল যে হরিণটা লাফিয়ে বনে ঢোকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট, আর হেমন্ত-ঝড়ের হঠাৎ ফেটে পড়ার চেয়েও ভয়াবহ কিছু একটা লাগল গাছের মাথায়, তারপর ঠিকরে পড়ল মাটিতে, ঝনঝন শব্দে সমস্ত বন উচ্চকিত হয়ে উঠল। শব্দটা শোনাল গোঙানির মত, আর তার প্রতিধ্বনি গাছপালায় ধেয়ে চলল, বনের গভীরে দ্রুত ধাবমান হরিণটাকে পেরিয়ে গেল সে শব্দ।

বনের নীল গভীরে প্রতিধ্বনি থিতিয়ে এল। পড়ন্ত বিমানে বিক্ষিপ্ত গুঁড়োগুঁড়ো বরফ গাছের মাথা থেকে ঝিকঝিক করে পড়ছে। আবার সমস্ত কিছু চাপা দিয়ে ভারী স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতায় স্পষ্ট শোনা গেল একজন গোঙাচ্ছে, আর একটা ভালুকের থাবার চাপে বরফ মড়মড় করে উঠল, অস্বাভাবিক নানা আওয়াজ শুনে বনের গভীর থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে জানোয়ারটা।

ভাল্লুকটা বুড়ো, বিরাট আর লোমশ। ওর দুটো ঢুকে-যাওয়া পাঁজর থেকে এবড়োখেবড়ো লোম খোঁচা খোঁচা বাদামী গোছায় বেরিয়ে আছে, শীর্ণ পাছা থেকেও লোম গোছায় গোছায় ঝুলছে। হেমন্ত থেকে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে এ সব অঞ্চলে, পশ্চিমের এই ঘন বন যেখানে আগে শুধু বনরক্ষী আর শিকারীরা আসত, তাও বেশী নয়, যুদ্ধের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। হেমন্তে যখন শীতের ঘুমের জন্য তৈরী হচ্ছিল ভাল্লুকটা ঠিক সে সময় যুদ্ধের রোল কাছাকাছি এসে পড়ে তাকে আস্তানা ছাড়া করেছে, আর এখন পেটের জ্বালায় রাগে অস্থিরভাবে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

ফাঁকা জায়গার ধারে একটু আগেই হরিণটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে ভাল্লুকটা থামল। মাটিতে নাক দিয়ে হরিণটার পায়ের ছাপের তাজা রসালো গন্ধ শুঁকে লোভে গভীর নিশ্বাসে ওর শীর্ণ পাঁজর কেঁপে উঠল, কান পেতে শুনতে লাগল। হরিণটা চলে গিয়েছে, কিন্তু তার জায়গায় জীবন্ত এবং খুব সম্ভব দুর্বল কিছু একটা থেকে আওয়াজ আসছে। ভাল্লুকটার গলার লোম খাড়া হয়ে উঠল। নাক বাড়িয়ে দিল ও। আবার খোলা জায়গার প্রান্ত থেকে এল অনুচ্চ করুণ ধ্বনি।

আস্তে আস্তে নরম থাবা ফেলে এগিয়ে গেল ভাল্লুকটা, বরফে আধো-ঢাকা মানুষটা যেখানে নিশ্চল পড়ে আছে সেই দিকে; সতর্ক থাবার চাপে শুকনো কঠিন বরফের কর্কশ বিলাপ।

২

পাইলট আলেক্সেই মেরেসিয়েভ দুজোড়া "সাঁড়াশীর" প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিল। বিমানযুদ্ধে এর চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। গোলাগুলি সমস্ত ফুরিয়ে গিয়েছে, এমন সময় চারটি জার্মান বিমান তাকে ঘেরাও করে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে, এড়িয়ে যাবার কিম্বা দিক বদলাবার কোন সুযোগ তার ছিল না ..

ব্যাপারটা ঘটে এভাবে। কয়েকটা "ইলিউশিন" শত্রুপক্ষের একটি বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাচ্ছে, লেফ্টেনান্ট মেরেসিয়েভের অধীনে একদল জঙ্গী বিমান রক্ষী হিসেবে সঙ্গে গেল। দুঃসাহসী আক্রমণ সফল হল। পদাতিকরা যাদের "উড়ন্ত ট্যাঙ্ক" বলত, সেই স্তরমোভিকগুলো প্রায় পাইনগাছের মাথা ছুঁয়ে অলক্ষিতে বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছল, সেখানে

যানবাহনের কয়েকটি বড়ো "ইয়ুনকারস" সারি সারি সাজানো, তারপর হঠাৎ ধূসর-নীল পাইন বনের পিছন থেকে ছোঁ মেরে গেল ঘাঁটিটায়, গম্ভীর শব্দে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে, ভারী "ইয়ুনকারস"গুলোর উপর মেসিনগান আর কামানের গুলি বর্ষণ করতে করতে। চারটে বিমান নিয়ে মেরেসিয়েভ আক্রমণ স্থলে পাহারা রাখছিল, পরিষ্কার দেখল ঘাঁটিতে কালো কালো নানা মূর্তির যত্রতত্র ছোটাছুটি, যানবাহনের বিমানগুলো কঠিন বরফের উপরে আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে, বারবার আক্রমণ চালাচ্ছে স্তরমোভিকগুলো, তারপর "ইয়ুনকারসের" লোকগুলো গোলাগুলির বৃষ্টির মধ্যে বিমানগুলোকে রানওয়েতে জোরে চালিয়ে উপরে তুলল।

ঠিক এই সময়ে আলেক্সেই মারাত্মক ভুল করে। আক্রমণ স্থলে কড়া নজর না রেখে সে, বৈমানিকদের ভাষায়, "সহজ শিকারের লোভে" ধরা দিল। একটা ভারী, মন্থর "ইয়ুনকারস" সবেমাত্র জমি ছেড়ে উঠেছে, মেরেসিয়েভ নিজের বিমানকে তীরের মত নামিয়ে একখণ্ড পাথরের মত টুপ করে এল তার উপরে, মহানন্দে ওটার বহুরঙা, সমকোণ কুঞ্চিত ডুরালুমিনে গড়া শরীর মেসিনগানের গুলির দীর্ঘ দমকে রেখাঙ্কিত করল। এত আত্মপ্রত্যয় তার যে শত্রুপক্ষের বিমানটা মাটিতে পড়ে গিয়েছে কি না সেটা দেখবার তোয়াক্কা পর্যন্ত করল না। ঘাঁটির ওদিকে আর একটা "ইয়ুনকারস" আকাশে উঠল। তার পিছন ধাওয়া করল আলেক্সেই। আক্রমণ করল, কিন্তু সফল হল না। আস্তে আস্তে উঠছে শত্রু বিমানটা, তার উপর দিয়ে ওর ট্রেসারগুলির ধারা চলে গেল। এক ঝটকায় ঘুরে আবার আক্রমণ করল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল দ্বিতীয় বার, আবার কাছে এসে পড়ে ওটার চওড়া সিগার-আকৃতি শরীরে অধীরভাবে দমকা গুলি বর্ষণ করে বনের ওধারে নামিয়ে দিল। "ইয়ুনকারস" নামিয়ে, সীমাহীন অরণ্যের আন্দোলিত সবুজ সমুদ্রে যেখানে কালো ধোঁয়ার থাম উঠছে তার উপরে বিজয়গর্বে দুবার চক্রাকারে ঘুরে বিমান-ঘাঁটির দিকে আবার চলল মেরেসিয়েভ।

কিন্তু সেখানে মেরেসিয়েভের আর পৌঁছন হল না। দলের আর তিনটি বিমানকে নটা "মেসার" আক্রমণ করছে ও দেখল, স্তরমোভিকদের হটিয়ে দেবার জন্য জার্মান বিমান-ঘাঁটির নায়ক সেগুলোকে তলব করেছে নিশ্চয়ই। জার্মান বিমানগুলো সংখ্যায় তিনগুণ হলেও অসম সাহসে তিনটি বিমান ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্তরমোভিকগুলো যাতে শত্রুদের হাত থেকে

বেঁচে যায় তার চেষ্টায়। দূরে, ক্রমশ দূরে শত্রু বিমানগুলোকে ওরা নিয়ে গেল, বিলমোরগেরা যেমন জখম হবার ভান করে নিজেদের বাচ্চার কাছ থেকে শিকারীদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

সহজ শিকারের লোভে ধরা দিয়েছে বলে আলেক্সেই এত লজ্জিত যে হেলমেটের নিচে গালদুটো গরম হয়ে উঠেছে টের পেল। একটা বিমান বেছে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। যেটাকে বাছল সেটা একটা "মেসার", নিজের দল থেকে একটু দূরে সরে সেটাও কোন শিকারের সন্ধানে আছে, বোঝা গেল। যতখানি বেগে সম্ভব ততখানি বেগে বিমান চালিয়ে আলেক্সেই শত্রুকে পাশ থেকে আক্রমণ করল। যুদ্ধ বিজ্ঞানের সমস্ত রীতি অনুসারেই আক্রমণ করল জার্মানটিকে। আড়কষির জালের মত দৃষ্টিপথে শত্রু বিমানটার ধূসর শরীর স্পষ্ট পড়েছে, ঘোড়া টিপল ও, কিন্তু অক্ষতদেহে ওটা চট করে পেরিয়ে গেল। আলেক্সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে না, কাছেই ছিল বিমানটি, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। "গোলাগুলি খতম!" আঁচ করে আলেক্সেই'র মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। কামানগুলো পরীক্ষা করার জন্য আবার ঘোড়া টিপল, কিন্তু পেল না সেই স্পন্দন, গুলি চালিয়ে সমস্ত শরীরে যে স্পন্দন বৈমানিকরা অনুভব করে। বারুদ খতম, "ইয়ুনকারসগুলোকে" তাড়াতে গিয়ে গোলাগুলি নিঃশেষ।

কিন্তু শত্রুরা জানে না সেটা! ওদের সংখ্যাধিক্য কমাবার জন্য অন্তত যুদ্ধে যোগ দিতে ঠিক করল আলেক্সেই। কিন্তু ভুল ভেবেছিল সে। যে জঙ্গী বিমানকে আক্রমণ করেও সে কিছু করতে পারেনি, তার চালক অভিজ্ঞ ও সেয়ানা। প্রতিযোগীর গোলাবারুদ ফুরিয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে সহকর্মীদের নির্দেশ দিল। চারটি "মেসার" দলছাড়া হয়ে ঘেরাও করল আলেক্সেইকে, উপরে একটি, নিচে একটি, আর দুটি দুপাশে। ট্রেসারগুলির দমকে পরিষ্কার নীল আকাশে স্পষ্ট রেখা কেটে তার গতিপথ নির্দেশ করে ওরা ওকে দুজোড়া "সাঁড়াশীর" প্যাঁচে ফেলল।

কিছুদিন আগে আলেক্সেই শুনেছিল যে জার্মানদের প্রখ্যাত "রিখথোফেন" বিমান ডিভিশন পশ্চিম থেকে ও অঞ্চলে, স্তারায়া রুসাতে এসেছে। এ দলের মুরুব্বী হেরিং নিজে, এতে আছে ফ্যাশিস্ট রাইখের সেরা বৈমানিকরা। আলেক্সেই বুঝতে পারল যে এইসব আকাশ নেকড়েদের খপ্পরে পড়েছে সে, আর ওকে নিজেদের বিমান-ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে বন্দী করতে ওরা চাইছে। এ ধরনের ঘটনা আগে ঘটেছে। ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু,

সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাবপ্রাপ্ত আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কোর চালনায় জঙ্গী বিমানের দল একটি জার্মান পর্যবেক্ষককে নিজেদের ঘাঁটিতে নামাতে কী করে বাধ্য করে তা ত আলেক্সেই নিজে দেখেছে।

ওর চোখের সামনে ভেসে এল বন্দী জার্মানটির লম্বাটে, ছাই'এর মত বিবর্ণ মুখ আর এলোমেলো পদক্ষেপ। "বন্দী করবে? কখনো নয়! ওসব চালাকি চলবে না!" দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল আলেক্সেই।

কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ওদের এড়িয়ে যাওয়া গেল না। যে দিকে ওকে জার্মানরা চালাচ্ছে সে দিক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেই মেসিনগানের গুলিতে পথ আটকে যাচ্ছে। আবার ওর মানসপটে এল বন্দী জার্মানটির বিকৃত মুখ, থরথর করে চোয়াল কাঁপছে। হীন পশুসুলভ ভয়ের স্পষ্ট ছাপ সে মুখে।

আবার দাঁতে দাঁত চেপে আলেক্সেই যতখানি পারে ততখানি ইঞ্জিনের থ্রটল খুলল, আর যে জার্মান বিমানটা তাকে মাটির দিকে ঘেঁষে নিয়ে যাচ্ছে, লম্বালম্বিভাবে তার নিচে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করল। তার নিচে থেকে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু ঠিক সময়ে জার্মান বৈমানিক ঘোড়া টিপল। গতিছন্দ হারাল আলেক্সেই'র বিমান, তাল কাটতে লাগল একবার, দুবার, যেন মারাত্মক জ্বরের ঘোরে সমস্ত বিমানটি থরথর করে কাঁপছে।

বিমানটা জখম হয়েছে। ঘোলাটে শাদা একটি মেঘের পুঞ্জে বিমানটিকে ঝট করে নামিয়ে নিয়ে যেতে আলেক্সেই পারল, পিছু তাড়া যারা করছিল তারা খেই হারাল। কিন্তু অতঃ কিম? আহত বিমানটির স্পন্দনে ওর সমস্ত শরীব ধকধক করছে, যেন যন্ত্রটির মৃত্যু যন্ত্রণায় নয়, নিজের শরীরের জ্বরেই সে কম্পমান।

বিমানটির কোথায় চোট লেগেছে? কতক্ষণ উড়তে পারবে সেটা? তেলের ট্যাঙ্কগুলো কি ফাটবে? প্রশ্নগুলি আলেক্সেই ঠিক যে করল তা নয়, অনুভব করল। ঠাস ডিনামাইটের উপরে বসে আছে, পলতেতে ইতিমধ্যেই আগুন দেওয়া হয়েছে, এই মনোভাবে বিমানটিকে ঘুরিয়ে নিজের ঘাঁটির দিকে চলল। মরতেই যদি হয়, তাহলে যেন স্বজনেই কবর দেয়।

চরম মুহূর্তটি এল আচম্বিতে। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বিমানটা গড়িয়ে নামতে লাগল, যেন খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াচ্ছে। নিচে বনটা আন্দোলিত,

অনন্ত সমুদ্রের ধূসর-সবুজ ঢেউ'এর মত... "যাই হোক, আমাকে ত ওরা বন্দী করতে পারবে না?" কথাটা ওর মনে ঝলকিয়ে উঠল, তখন সবচেয়ে কাছের গাছগুলো সমান সারিতে মিলে গিয়ে বিমানের পাখাদুটোর নিচে ধাবমান। বুনো জন্তুর মত বনটি যখন ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন কিছু না ভেবেই থ্রটল বন্ধ করে দিল আলেক্সেই। বিকট আওয়াজ একটা, মুহূর্তে সবকিছু মিলিয়ে গেল, মনে হল কালো, ঘন জলের বিস্তারে আলেক্সেই ও বিমানটা ঝপ করে পড়েছে।

পড়বার সময় পাইনের মাথায় ধাক্কা খাওয়াতে পতন বেগ কমে যায়। কয়েকটা গাছ ভেঙ্গে বিমানটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কিন্তু ঠিক তার আগে ককপিট থেকে ঝটকে আলেক্সেই পড়ল শাখা প্রশাখায় আচ্ছন্ন বহু পুরাতন একটা ফারগাছে, ডালপালায় গড়িয়ে নেমে এল হাওয়ায় গাছের নিচে জমাট বাঁধা বরফের স্তূপে। তাতে প্রাণে বেঁচে গেল...

কতক্ষণ যে নিসাড় অজ্ঞান অবস্থায় সেখানে পড়ে ছিল আলেক্সেই'র মনে নেই। ভাসা-ভাসা মানুষের ছায়া, বাড়িঘর দোরের রেখা আর অবিশ্বাস্য নানা যন্ত্র নিমেষে নিমেষে ওকে পেরিয়ে যাচ্ছে, এত উদ্দাম বেগে, ঘূর্ণীবায়ুর মত ভেসে যাচ্ছে যে সমস্ত শরীর চাপা ব্যথায় কনকন করছে। তারপর সে বিশৃঙখলা থেকে বেরিয়ে এল বৃহৎ উষ্ণ অনির্দিষ্ট আকারের কিছু একটা, ওর মুখে ফেলল গরম আবিল নিশ্বাস। ওটার কাছ থেকে গড়িয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু বরফে শরীর গেঁথে গিয়েছে মনে হল। আশেপাশে সঞ্চারিত সেই অজানা বিভীষিকার তাড়নায় হঠাৎ একটা চেষ্টা করল আলেক্সেই, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া বুকে ঢুকল, গালে লাগল ঠাণ্ডা বরফ, আর অনুভব করল তীব্র যন্ত্রণা, এবার সমস্ত শরীরে নয়, শুধু পায়ে।

"বেঁচে আছি তাহলে!" চকিতে মনে হল। ওঠবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু কানে এল কার পায়ের চাপে বরফ ভাঙ্গছে, সজোরে কর্কশ নিশ্বাস কে যেন ফেলছে কাছে। "জার্মানগুলো!" তক্ষুণি ভাবল সে, চোখ খুলে লাফিয়ে উঠে আত্মরক্ষা করার ঝোঁক দাবাল কোনক্রমে। "বন্দী তাহলে, শেষ পর্যন্ত তাহলে বন্দী করবে! কী করি?"

মনে পড়ল, পিস্তলের খাপের পটি ছিঁড়ে গিয়েছিল, আগের দিন ওর মিস্ত্রী সবজান্তা ইউরা সেটা ঠিক করে দেবে বলে, কিন্তু তা না করাতে বিমানি পোশাকের নিচের পকেটে পিস্তলটা নিতে হয়। ওটা বের করতে হলে পাশ ফিরতে হবে, কিন্তু শত্রুদের নজর এড়িয়ে সেটা করতে পারবে

না, এখন ত উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। উরুতে পিস্তলটার সূক্ষ্ম বেখা অনুভব করলেও নিশ্চল পড়ে রইল আলেক্সেই; মরে গিয়েছে ভেবে হয়ত শত্রুরা চলে যাবে।

জার্মানটা কাছে ঘুরল, অদ্ভুতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কাছে এল, বরফ ভাঙ্গার শব্দ। মুখে আবার ওর দুর্গন্ধ নিশ্বাস অনুভব করল আলেক্সেই। এবারে বুঝতে পারল একটাই মাত্র জার্মান, পরিত্রাণের সুযোগ তাহলে আছে; নজর রেখে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে, ও বন্দুকে হাত দেবার আগেই যদি ওর টুঁটি চিপে ধরতে পারে... কিন্তু সেটা করতে হবে সাবধানে, একটুও ভুল না করে।

না নড়েচড়ে আস্তে আস্তে চোখ খুলল আলেক্সেই, আনত চোখের পাতায় নজরে যেটা এল সেটা জার্মান নয়, বাদামী লোমশ একটা কিছু। চোখ আরো খুলে তৎক্ষণাৎ বুজে ফেলল একেবারে: সামনে থাবা গেড়ে বসে আছে বড়ো, হ্যাংলা, লোমশ ভালুক একটা।

৩

নিঃশব্দে বসে আছে ভালুকটা, শুধু বুনো জন্তুরাই ওরকম চুপচাপ থাকতে পারে। কাছে অনড় মানুষের দেহ, সূর্যের আলোয় ঝকঝকে নীলচে বরফে তার প্রায় সমস্তটা ঢাকা।

জন্তুটার নোংরা নাসারন্ধ্র আস্তে আস্তে কুঁচকে গেল। মুখটা অর্ধেক খোলা, বুড়ো, হলদে কিন্তু ধারালো দাঁত দেখা যাচ্ছে, পুরু লালার সরু ফালি হাওয়ায় দুলছে।

শীতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে যুদ্ধ, ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ ও। কিন্তু মড়াব মাংস ভালুকে খায় না। নিসাড় শরীরটা শুঁকেছে একবার, পেট্রলের তীব্র গন্ধ তাতে, তারপর আস্তে আস্তে ফাঁকা জায়গায় ঘুরেছে ভালুকটা, আরো অনেক মানুষের শরীর সেখানে খরখর বরফে জমে পড়ে আছে; কিন্তু একটা কাতরোক্তি আর খসখস আওয়াজ হওয়াতে ও আবার আলেক্সেই'র কাছে ফিরে এসেছে।

আর তাই আলেক্সেই'র পাশে থাবা পেতে বসে আছে ও। ক্ষুধার তাড়না মড়ার মাংসের প্রতি বিতৃষ্ণা দূর করার চেষ্টা করছে। ক্ষুধার জয় হতে চলেছে। নিশ্বাস ফেলে ভালুকটা উঠল, থাবা দিয়ে শরীরটাকে উল্টে ফেলে বিমানি পোশাকটায় নখ বসাল। পোশাকটা ছিঁড়ল না। নিচু গলায় গরগর করে

উঠল ভালুকটা। সেই মুহূর্তে আলেক্সেই'র ইচ্ছে হল চোখ খুলে পাশ ফিরে চেঁচিয়ে বুকের উপরে লাফিয়ে-পড়া ওই ভারী দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, কিন্তু অনেক কষ্টে ইচ্ছেটা সে দমন করল। প্রাণপণে, বেপরোয়াভাবে আত্মরক্ষা করার জন্য ওর সমস্ত সত্তা ওকে উত্তেজিত করছে, কিন্তু সে ইচ্ছে দাবিয়ে, আস্তে আস্তে, অলক্ষিতে পকেটে হাত চালিয়ে দিল, পিস্তলের বাঁটটা হাতড়ে খুঁজে সাবধানে ঘোড়াটা বসাল যাতে শব্দ না হয়, তারপর সেটা অলক্ষিতে বের করল।

বিমানি পোশাকটা ভালুকটা তখন আরো আক্রোশে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। শক্ত চামড়া ফেটে গেল বটে কিন্তু ছিঁড়ল না। উন্মত্ত ক্রোধে গর্জিয়ে উঠল ভালুকটা, মুখ দিয়ে পোশাকটা চেপে ফার আর ভিতরের তুলো ভেদ করে দাঁত চালাল। প্রাণপণ চেষ্টায় আর্তনাদ চাপল আলেক্সেই আর যে মুহূর্তে ভালুকটা এক ঝটকায় বরফের স্তূপ থেকে ওকে তুলল ঠিক সে মুহূর্তে পিস্তল তুলে ঘোড়া টিপল।

পিস্তলের তীক্ষ্ম আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল চারিদিকে।

পাখা ঝটপটিয়ে হাঁড়িচাঁচাটা দ্রুত উড়ে গেল। ডালপালা নড়ে ওঠাতে শুকনো বরফ আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ছে। আস্তে আস্তে শিকার ছেড়ে দিল ভালুকটা। বরফে পড়ে গেল আলেক্সেই — ভালুকটার উপরে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। থাবা গেড়ে বসে আছে জানোয়ারটা, কালো পুঁযে-ভরা চোখে হতচকিত ভাব। সূচীমুখ দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পুরু ফ্যাকাশে রক্ত চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বরফে পড়ছে। কর্কশ ভয়াবহ গর্জন করে পিছনের পাদুটোতে ভর দিয়ে কষ্টে দাঁড়িয়ে উঠল ওটা, আলেক্সেই আবার গুলি চালাবার আগেই পড়ে গেল। নীলচে বরফ আস্তে আস্তে ঘোর লাল হয়ে উঠল আর গলে যাবার সময়ে ওর মাথার কাছে দেখা গেল পাতলা বাস্পের রেশ। মরে গিয়েছে।

যে একাগ্র টান-টান ভাব এতক্ষণ আলেক্সেইকে আচ্ছন্ন করেছিল, হঠাৎ আলগা হয়ে গেল সেটা। পায়ের সেই তীক্ষ্ম দারুণ ব্যথা ফিরে এল আবার। বরফে পড়ে আবার অচেতন হয়ে গেল আলেক্সেই।

জ্ঞান যখন ফিরে এল সূর্য তখন অনেক উঁচুতে। ঘন পাইনগুলোর মাথা ভেদ করে সূর্যের আলো পড়েছে নিচে, সেই আলোয় বরফের ঝিলিক। ছায়ায় বরফের রং গভীর নীল, পাতলা নীল রং আর নেই।

জ্ঞান ফিরে আসাতে প্রথমে আলেক্সেই'র মনে হল, "ভালুকটা কী স্বপ্ন তাহলে?"

কাছে নীল বরফে পড়ে আছে বাদামী, লোমশ বিকৃতদর্শন লাশটা। বন থেকে নানা মুখর শব্দ উঠছে। কাঠঠোকরাটা সশব্দে গাছ ঠোকরাচ্ছে, এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে যেতে যেতে হলুদ-বুক ক্ষিপ্র টমটিটগুলো খুসিতে কিচির মিচির করছে।

"বেঁচে আছি আমি, বেঁচে আছি, বেঁচে আছি!" বারবার আলেক্সেই নিজেকে বলল। মারাত্মক বিপদ কাটিয়ে ওঠার পর বেঁচে থাকার যে উদ্দাম রহস্যময় মাতাল-করা অনুভূতি প্রত্যেককে আচ্ছন্ন করে সেই ঘোরে ওর সমস্ত সত্তা, ওর সমস্ত শরীর উল্লসিত হয়ে উঠল।

সেই উদ্দাম অনুভূতির তাড়নায় লাফিয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল আলেক্সেই, কিন্তু তক্ষুণি কাতরে উঠে পড়ে গেল ভালুকটার লাশের উপরে। পায়ের ব্যথায় সমস্ত শরীর টনটন করে উঠল। ভারী ঘরঘর শব্দে ওর মাথা ভরে গেল, যেন একজোড়া পুরোনো কর্কশ শান-পাথর ঘুরছে আর ঘষছে, ওর মাথা ভরিয়ে দিচ্ছে তাদের ঘরঘরে। চোখদুটো টাটাচ্ছে, যেন কার আঙুলের চাপ তাদের উপরে। একবার আশেপাশের সমস্ত কিছু সূর্যের ঠাণ্ডা হলুদ আলোয় প্লাবিত হয়ে স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখাচ্ছে; পর মুহূর্তে সমস্ত কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ধূসর চিকচিকে পর্দার আড়ালে।

'ব্যাপার বেগতিক মনে হচ্ছে। পড়বার সময় মাথায় চোট লেগেছিল নিশ্চয়ই। তাছাড়া পায়ে কিছু গড়বড় হয়েছে,' আলেক্সেই ভাবল।

কনুই'এ ভর দিয়ে উঠে আলেক্সেই বিস্ময়ে দেখল বনের প্রান্তের ওপারে চওড়া মাঠ, দূর বনের ধূসর অর্ধবৃত্ত দিগন্তে তার সীমারেখা রচনা করেছে।

স্পষ্টতই হেমন্তে, কিম্বা সম্ভবত শীতের প্রথম দিকে সোভিয়েত বাহিনীর কোন দল বনের প্রান্তে ঘাঁটি বাঁধে, বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি হয়ত, কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ ছিল অদম্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। তুলোর পাঁজার মত বরফের স্তরে জায়গাটির ক্ষতচিহ্ন তুষার-ঝড়ে ঢাকা পড়েছে; কিন্তু সে স্তরের নিচেও চোখে পড়ে ট্রেঞ্চের সারির রেখা, মেসিনগান বসানোর ভাঙ্গা জায়গার সব অনুচ্চ ঢিবি, গোলায় কাটা অগণন ছোট বড়ো গর্ত গিয়েছে বনের ধারে বিকলাঙ্গ চূড়াহীন দগ্ধ গাছগুলো পর্যন্ত। ক্ষতবিক্ষত মাঠের এদিকে ওদিকে পড়ে আছে কয়েকটা ট্যাংক, পাইক-মাছের আঁশের নানা রঙে রঙ করা। বরফে জমে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো, অদ্ভুত জানোয়ারের লাশের মত চেহারা প্রত্যেকের, বিশেষ করে একেবারে শেষের দিকের ট্যাংকটার, হাত-

বোমায় কিম্বা মাইনে একপাশে হেলে পড়ে গিয়েছে নিশ্চয় ওটা, বেরিয়ে-আসা জিভের মত ওর কামানের লম্বা নলটা মাটিতে ঠেকানো। আর সারা মাঠে, অপরিসর ট্রেঞ্চের ধারে ধারে, ট্যাঙ্কগুলোর কাছে, বনের ধারে পড়ে আছে সোভিয়েত ও জার্মান সৈনিকের মৃতদেহ, এত অসংখ্য যে জায়গায় জায়গায় একটির উপরে আর একটি গাদা করা; তারা জমে পড়ে আছে ঠিক সেই ভঙ্গীতে যে ভঙ্গীতে মাত্র কয়েকমাস আগে শীতের প্রান্তে যুদ্ধের সময় মারা যায়।

দেখে বুঝতে পারল আলেক্সেই কী ভীষণ অদম্য যুদ্ধ চলেছিল এখানে, বুঝল তার সহচরেরা এখানে লড়াই করেছে, শত্রুকে আটকাতে হবে, এগিয়ে যেতে দেবে না, এছাড়া আর কোন চিন্তা তাদের মাথায় ছিল না। আর একটু দূরে বনের ধারে একটা মোটা পাইন, গোলায় মাথাটা উড়ে গিয়েছে, দীর্ঘ বিক্ষত গুঁড়ি থেকে হলুদ স্বচ্ছ রস চুঁইয়ে পড়ছে, পাইনটার তলায় পড়ে আছে জার্মান সৈনিকদের মৃতদেহ, খুলি ফাটা, মুখ ক্ষতে বিকৃত। মাঝখানে একটি জার্মানের মৃতদেহের উপরে আড়াআড়িভাবে হুমড়ি খেয়ে আছে চওড়া-মাথা একটি যুবক, পরনে তার আর্মিকোট নেই, শুধু কোমরবন্ধ ছাড়া টিউনিক, কলার ছেঁড়া; পাশে রাইফেল একটা, সঙ্গীনটা ভাঙ্গা, ক্ষতবিক্ষত বাঁটে রক্তের দাগ।

আর একটু এগিয়ে, যে রাস্তাটা বনের দিকে গিয়েছে, সেখানে বালুতে আচ্ছন্ন একটি নবীন ফারগাছের নিচে গোলার গর্ত থেকে অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে ময়লা রঙের উজবেক একজন, লম্বাটে মুখটা মনে হয় পুরোনো হাতির দাঁত খুদে তৈরী করা। পিছনে ফারগাছের ডালপালার নিচে স্তূপ করে হাত-বোমা সাজানো; উজবেকটির মৃত, উত্তোলিত হাতে একটা হাত-বোমা, যেন ওটা ছোঁড়বার আগে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল একবার, আর সেই ভঙ্গীতেই পাথর হয়ে গিয়েছে।

আরো আগে, বনের রাস্তায় দাগওয়ালা ট্যাঙ্কের পাশে, বড়ো বড়ো গোলা-গর্তের ধারে, ছোট ছোট ট্রেঞ্চে পুরোনো গাছের গুঁড়ির কাছে ছড়ানো মৃতদেহ, পরনে তুলো-ভর্তি জ্যাকেট আর পাৎলুন, অন্যদের টিউনিকের রঙ ধূসর-সবুজ; শিঙওয়ালা টুপি কান পর্যন্ত টানা; দোমড়ানো হাঁটু, ওপরে তোলা চিবুক, শেয়ালে চেবানো, হাঁড়িচাঁচা আর দাঁড়কাকে ঠোকরানো মোমের মত শাদা সব মুখ বরফের স্তূপ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আছে।

ফাঁকা জায়গার উপরে কয়েকটা দাঁড়কাক মন্থরভাবে চক্কর দিয়ে ঘুরছিল,

হঠাৎ আলেক্সেই'র মনে পড়ল মহৎ রুশ শিল্পীর আঁকা "ইগরের যুদ্ধ" নামের বিষণ্ণ উদাত্ত পরাক্রান্ত ছবিটির কথা, স্কুলের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে ছবিটা সে দেখেছিল।

"ওদের মত আমিও এখানে পড়ে থাকতাম হয়ত," মেরেসিয়েভ ভাবল, আবার বেঁচে থাকার অনুভূতি ওর সমস্ত সত্তাকে ভরিয়ে দিল। নিজেকে ঝাঁকুনি দিল আলেক্সেই। কর্কশ শান-পাথরদুটো তখনো মন্থরভাবে ওর মাথায় ঘুরছে, পায়ের জ্বালা আর যন্ত্রণা আরো বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু ও উঠে ভালুকটার লাশের উপরে বসল, শুকনো বরফের গুঁড়োয় সেটা এখন ঠাণ্ডা আর রুপালী, ভাবতে শুরু করল কী করা উচিত, কোথায় যাবে, কী করে পেঁছবে নিজের লাইনে।

বিমান থেকে ঝটকে পড়ে যাবার সময় মানচিত্রের কেসটা হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন পথে যেতে হবে খুব স্পষ্টভাবে সেটা আলেক্সেই কল্পনা করতে পারল। যে জার্মান বিমান-ঘাঁটিটাকে স্তরমোভিকগুলো আক্রমণ করে সেটা ফ্রন্ট লাইনের প্রায় ষাট কিলোমিটার পশ্চিমে। আকাশ-যুদ্ধের সময় ওর সহচরেরা শত্রুদের বিমান-ঘাঁটি থেকে পূর্ব দিকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আর জোড়া "সাঁড়াশীর" খপ্পর থেকে বেরিয়ে ও নিজে পূবমুখো আর কিছু দূরে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। তাহলে ও যেখানে পড়েছে সেটা নিশ্চয়ই ফ্রন্ট লাইন থেকে প্রায় পয়ঁত্রিশ কিলোমিটার দূরে হবে, এগিয়ে-যাওয়া জার্মান দলের অনেক পিছনে, "কৃষ্ণ অরণ্য" নামের বিরাট বিস্তৃত বনভূমির এলাকার কোন একটা জায়গায় সে এখন। ফ্রন্ট লাইনের কাছাকাছি জার্মান ঘাঁটিতে সংক্ষিপ্ত হামলার সময়ে বোমারু আর স্তরমোভিকের রক্ষী হিসেবে একাধিক বার এই বনের উপরে দিয়ে সে গিয়েছে। উপর থেকে বনটাকে হামেশাই সীমাহীন সবুজ সমুদ্রের মত তার কাছে ঠেকেছে। পরিষ্কার দিনে পাইনগাছের দোদুল্যমান চূড়োয় বনটা বিক্ষুব্ধ হত; কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হলে পাতলা ধূসর কুয়াশার আচ্ছাদনে ওটাকে দেখাতে ছোট ছোট ঢেউ-তোলা মসৃণ নিরানন্দ জলরাশির মত।

বিরাট বনের মাঝামাঝি জায়গায় যে সে পড়েছে তার ভালোমন্দ দুটো দিক আছে। ভালোর দিকটা হল এই — কোন জার্মানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা কম, কারণ জার্মানরা সাধারণত রাস্তা আর সহর ধরে চলে। খারাপ দিকটা — ওর যাত্রাপথ দীর্ঘ না হলেও কঠিন হবে; ঘনগভীর ঝোপঝাড় ঠেলে যেতে হবে ওকে, মানুষের সাহায্য মিলবে না হয়ত, হয়ত মিলবে না

কোন আশ্রয়, রুটির টুকরো একটা, গরম পানীয় কিছু। আর পাদুটো... ওর বোঝা কি সইতে পারবে! হাঁটতে কি পারবে ও? ..

ভালুকটার লাশ ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠল আলেক্সেই। আবার পায়ের সেই তীব্র যন্ত্রণা, নিচে থেকে শুরু করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে আবার বসে পড়ল ও। ফারবুট খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু একটুও নড়ল না সেগুলো; এক একবার টানছে আর কাতরাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ একেবারে বন্ধ করে দুহাতে একটা বুট ধরে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল — আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল। জ্ঞান ফিরে এলে সাবধানে পায়ের কাপড়ের পট্টি খুলল। পাটা ফুলে গিয়েছে, সমস্তটা জুড়ে কালশিটের মত দেখাচ্ছে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা আর জ্বালা। বরফের উপরে পাটা কিছুক্ষণ রাখাতে যন্ত্রণার উপশম হল কিছুটা। আবার আগেকার মত মরীয়াভাবে, হ্যাঁচকা টানে, যেন নিজের দাঁত ওপড়াচ্ছে, অন্য বুটটাও খুলে ফেলল।

দুটো পা-ই গিয়েছে। বিমানের ককপিট থেকে যখন এক ঝটকায় পড়ে যায় তখন নিশ্চয়ই কিছু একটায় পাদুটো আটকে গিয়েছিল, তাতে পাতার ওপর দিকটা আর আঙুলের হাড় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অন্য কোনো সময়ে পাদুটোর এই ভয়াবহ অবস্থায় উঠে দাঁড়াবার কল্পনা পর্যন্ত আলেক্সেই করত না। কিন্তু এখন আদিম অরণ্যের গভীরে সে একা শত্রুদের পিছনে পড়ে আছে, এখানে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হবার মানে মৃত্যু, পরিত্রাণ নয়। তাই বনের মধ্য দিয়ে কোনক্রমে পূব বরাবর যাওয়া মনস্থ করল সে, সুবিধাজনক রাস্তা কিম্বা লোকের বসতি এড়িয়ে চলতে হবে; যে কোন প্রকারে এগিয়ে যেতে হবে।

ভালুকটার লাশ ছেড়ে দৃঢ়চিত্তে দাঁড়াল আলেক্সেই, দাঁড়াতেই দম বন্ধ হয়ে এল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রথম পা ফেলল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে অন্য পাটাও বরফ থেকে অতিকষ্টে তুলে আর এক পা বাড়াল। মাথায় নানা শব্দের ভিড়, বন আর খোলা জায়গাটা দুলে ভেসে যাচ্ছে।

প্রয়াসে আর যন্ত্রণায় নিজেকে আরো দুর্বল লাগছে। ঠোঁট কামড়ে এগিয়ে চলল ও, এল একটা বনের রাস্তায়, ভাঙ্গা ট্যাঙ্ক পেরিয়ে, হাত-বোমা যার হাতে সেই মৃত উজবেকটিকে পেরিয়ে বনের গভীরে পূবমুখো রাস্তাটা চলে গিয়েছে। নরম বরফে খুঁড়িয়ে হাঁটা অতটা খারাপ নয়, কিন্তু হাওয়ায় কঠিন, বরফে-ঢাকা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পা পড়তেই যন্ত্রণাটা এত দুর্বিষহ হল যে আর পা বাড়াবার সাহস হল না আলেক্সেই'র, থামল সে। দাঁড়িয়ে

রইল, দ্বটো পা বিচ্ছিরিভাবে ফাঁক করে, শরীরটা দ্বলছে, যেন হাওয়ায় নড়ছে। হঠাৎ ঝাপসা কুয়াশা চোখের সামনে দেখল। রাস্তা, পাইন আর পাইনগ্বলোর ধ্বসর মাথা আর তাদের মাঝখানের আকাশের নীল আয়ত টুকরোটা মিলিয়ে গেল... নিজের বিমান-ঘাঁটিতে প্রত্যাগত সে, দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গী বিমানের পাশে, নিজের বিমানটার পাশে, তার পাশে ওর মিস্ত্রী ঢেঙ্গা ইউরা, ওর দাড়িগোঁফ না-কামানো, সদা-চটুল ম্বখে দাঁত আর চোখ আগেকার মতই চিকচিক করছে, ইসারা করে আলেক্সেইকে ডাকছে ককপিটে, যেন বলছে, "ওটা তৈয়ার, রওনা হ'ও এবার!" বিমানটার দিকে এক পা বাড়াল আলেক্সেই, কিন্তু মাটি দ্বলে উঠল, পাদ্বটো জ্বলছে, যেন গনগনে গরম ধাতুর পাতে পা পড়েছে। জ্বলন্ত মাটির টুকরোটার উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি বিমানটার পাখার দিকে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ঠাণ্ডা কাঠামোটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। অবাক হয়ে দেখল কাঠামোর পাশটা মস্বণ ঝকঝকে নয়, কর্কশ, যেন পাইনের ছাল দিয়ে তৈরী... কিন্তু কোন জঙ্গী বিমান নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতড়াচ্ছে একটা গাছের গ্বঁড়ি।

"বিকারের ঘোরের স্বপ্ন! মাথায় চোট লাগাতে পাগল হয়ে যাচ্ছি!" ভাবল আলেক্সেই। "এ রাস্তা ধরে গেলে দ্বর্দশার শেষ থাকবে না। রাস্তাটা ছেড়ে দেব না কি? কিন্তু তাহলে অনেক সময় লাগবে..." বরফের উপরে বসে পড়ে আগেকার মত সজোরে, হ্যাঁচকা টানে ফারব্বটদ্বটো খ্বলে, দাঁত আর নখ দিয়ে ওপর দিকটা ছিঁড়ল, যাতে ভাঙ্গা পায়ে চলা সহজ হয়, আঙ্গোরা পশমের বড়ো নরম গলাবন্ধটা খ্বলে ছিঁড়ে ফালি করে পায়ে জড়িয়ে আবার ব্বট পরল।

আগেকার চেয়ে সহজে হাঁটা যায় এখন। সেটাকে হাঁটা বলা কিন্তু ঠিক হবে না. হাঁটা নয়, সামনে এগিয়ে যাওয়া, সাবধানে এগিয়ে যাওয়া, গোড়ালির উপরে ভর দিয়ে, পায়ের পাতা অনেকখানি তুলে, কাদার উপরে লোকে যেমন করে হাঁটে। দ্বএক পা ফেললেই যন্ত্রণায় আর পরিশ্রমে মাথা ঘ্বরছে। থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছে আলেক্সেই, চোখ ব্বজে কোন গাছের গ্বঁড়িতে হেলান দিচ্ছে কিম্বা কোন বরফের ঢিবিতে বসে পড়ছে, শিরায় শিরায় রক্তের দপদপানির অন্বভূতি।

কয়েক ঘণ্টা এইভাবে চলল আলেক্সেই। কিন্তু ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল বনের ধারে সেই রোদে-ভরা রাস্তাটি, সেখানে ম্বত উজবেকটি বরফে ছোট একটা কালো দাগের মত পড়ে আছে। ভয়ানক হতাশ লাগল ওর। হতাশ, কিন্তু ভীত নয়। ঠিক করল গতি আরো বাড়াতে হবে। বরফের ঢিবি

থেকে উঠে পড়ে, দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে চলল, কাছাকাছি সব জিনিস ওর লক্ষ্যবস্তু, সমস্ত মন তাতে নিবদ্ধ—একটা পাইন থেকে অন্য পাইনে, গাছের গুঁড়ি থেকে অন্য গুঁড়িতে, একটা বরফের ঢিবি থেকে অন্য ঢিবিতে। এগিয়ে যাচ্ছে ও, পিছনে জনহীন বনের রাস্তায় বরফের উপরে পড়ছে আঁকাবাঁকা অসমান পদচিহ্ন, আহত জন্তুর খুরের দাগের মত।

৪

সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলল। পিছনে কোথাও সূর্য অস্ত গেল, ঠাণ্ডা লাল আভা গাছের মাথায়, বনে ধূসর ছায়া ক্রমশ ঘন হচ্ছে, আলেক্সেই এসে পড়ল একটা জুনিপারকীর্ণ জায়গায়, সেখানে যা দেখল তাতে মনে হল শিরদাঁড়ায় কেউ ঠাণ্ডা ভিজে তোয়ালে বোলাচ্ছে, হেলমেটের নিচে চুল খাড়া হয়ে উঠল।

বোঝা গেল বনের ফাঁকা জায়গায় যখন যুদ্ধ চলেছিল তখন চিকিৎসা কর্মীদের একটা দলকে এখানে মোতায়েন করা হয়। আহতদের এখানে এনে শোয়ানো হয় পাইন-কাঁটার বিছানায়। ঝোপঝাড়ের আড়ালে তারা এখনো পড়ে আছে, বরফে কয়েক জনের শরীর অর্ধেক ঢাকা, আর অন্যরা একেবারে বরফের নিচে। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় জখম হয়ে ওরা মারা যায়নি! কেউ সুকৌশলে ছুরির ঘায়ে ওদের গলা কেটেছে, ওরা একইভাবে পড়ে আছে, মাথাগুলো পিছনে হেলিয়ে, যেন পিছনে কী হচ্ছে দেখবার চেষ্টা করছে। আর ভয়াবহ ঘটনাটির টীকাও সেখানে। পাইনগাছের নিচে, বরফাবৃত একটি সোভিয়েত সৈনিকের দেহের পাশে, সৈন্যটির মাথা কোলে নিয়ে, কোমর পর্যন্ত বরফে ঢাকা বসে আছে একটি নার্স, ছোট পাতলা চেহারা, মাথায় ফারের টুপি, টুপির কানদুটো ফিতে দিয়ে চিবুকের নিচে বাঁধা। কাঁধের হাড় থেকে বেরিয়ে আছে ছোরার চকচকে বাঁট। কাছে পড়ে আছে ঝঞ্ঝা বাহিনীর কালো পোশাক-পরা একটা ফ্যাশিস্ট আর মাথায় রক্তাক্ত পট্টি জড়ানো একটি সোভিয়েত সৈনিকের মৃতদেহ। মরণ আলিঙ্গনে দুজনে দুজনের টুঁটি চেপে ধরেছে। আলেক্সেই তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে কালো পোশাক-পরা সৈনিকটি আহতদের হত্যা করে, নার্সকে ছুরিকাঘাত করার সময় তখনো জীবিত সোভিয়েত সৈনিকটি ছুটে এসে নিভন্ত জীবনে যতটুকু শক্তি আছে তাতে হত্যাকারীর টুঁটি চেপে ধরে।

আর তুষার-ঝড়ে সবাই আবৃত — মাথায় ফারের টুপি ক্ষীণদেহ মেয়েটি শরীর দিয়ে আহত সৈনিকটিকে বাঁচাচ্ছে, যে হত্যা করেছে আর যে প্রতিহিংসা নিয়েছে দুজনে পরস্পরের টুঁটি চেপে মেয়েটির পায়ের নিচে পড়ে আছে মেয়েটির পায়ে বাহিনীর চওড়া পুরোনো বড়ো বুট।

পাথরের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল আলেক্সেই, তারপর খুঁড়িয়ে নার্সটির কাছে গিয়ে পিঠ থেকে ছোরাটা টেনে বের করল। ঝঞ্ঝা বাহিনীর ছোরা, প্রাচীন জার্মান তলোয়ারের ধাঁচে গড়া, মেহগনির বাঁটে ঝঞ্ঝা বাহিনীর রুপালী প্রতিচিহ্ন। মরচে-পড়া ফলকে "Alles für Deutschland" তখনো পড়া যায়। জার্মান সৈনিকের দেহ থেকে ছোরার চামড়ার খাপটা আলেক্সেই সরিয়ে নিল, যাত্রায় কাজে লাগবে ওটা। বরফের নিচে থেকে জমে-যাওয়া কঠিন বর্ষাতিটা বের করে সযত্নে নার্সকে চাপা দিল, উপরে বসাল পাইনের কয়েকটা ডাল...

তখন প্রদোষ হয়ে এসেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা মিলিয়ে গেল। নিচু জায়গাটিতে নেমে এসেছে কনকনে ঘন অন্ধকার। জায়গাটি স্তব্ধ, শুধু পাইনের মাথায় সন্ধ্যার হাওয়ার ঝাপটা আর বনের গান। কখনো কোমল ঘুম-পাড়ানো গান, কখনো বা উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের সুর। পাতলা শুকনো বরফ আর চোখে পড়ছে না বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে ঝরছে, মুখে চিমটি কাটছে, উড়ে এসে পড়ছে নিচু জায়গাটিতে।

ভলগা স্তেপের কামিশিনে আলেক্সেই'র জন্ম, সহরবাসী ও, বন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাই বনে রাত কাটাবার কিম্বা আগুন জ্বালাবার কোন বন্দোবস্ত করেনি। সূচীভেদ্য অন্ধকারে অভিভূত আলেক্সেই, ক্লান্ত ভাঙ্গা পায়ে দুর্বিষহ যন্ত্রণা, জ্বালানী কাঠ জোগাড় করার শক্তি নেই; একটি নবীন পাইনের গভীর ঝোপঝাড়ে গুড়ি মেরে গিয়ে গুটিগুটি হয়ে গাছটার তলায় বসল সে, হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতে মাথা রাখল, নিজের নিশ্বাসের উত্তাপে নিজেকে গরম করে চুপ করে বসে রইল, স্তব্ধতা আর বিরতি ভালো লাগছে।

পিস্তলের ঘোড়া ঠিক করে রাখল আলেক্সেই, কিন্তু বনে প্রথম রাত্রে সেটা ব্যবহার করতে পারত কি না সন্দেহ। এক ঘুমে রাত কেটে গেল, ওকে ঘনিষ্ঠভাবে ঘিরেছে গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার, সে অন্ধকার বনের নানা শব্দে চঞ্চল — পাইনের অবিরাম মর্মর, রাস্তার কাছে কোথাও পেঁচার ডাক, দূরে নেকড়ের চীৎকার — কিছুই কানে গেল না।

ভোরের প্রথম আলোয় হিম বিষণ্ণতায় গাছগুলোর ঝাপসা কালো কালো চেহারার আভাস দেখা যাচ্ছে, ধড়মড় করে জেগে উঠল আলেক্সেই যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিয়েছে। জেগে উঠেই মনে পড়ল তার কী হয়েছিল আর এখন কোথায় আছে, আর এত অনবধানতায় বনে রাত কাটিয়েছে ভেবে ভয় পেল। অসহ্য ঠাণ্ডা, ফার-দেওয়া বিমানি পোশাক ফুঁড়ে ঢুকছে, হাড় পর্যন্ত বিঁধছে। ঠকঠক করে কেঁপে উঠল আলেক্সেই, যেন কাঁপুনি দিয়ে পালাজ্বর এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে পাদুটো; নড়াচড়া না করলেও আগেব চেয়ে যন্ত্রণা অনেক বেড়ে গিয়েছে। দাঁড়াতে হবে ভাবলেই আতঙ্ক। তবু দৃঢ়চিত্তে উঠল আলেক্সেই, এক ঝটকায়, যেমন করে আগের দিন পা থেকে বুটদুটো খুলে নিয়েছিল। সময় নষ্ট করা চলবে না।

আর সমস্ত যন্ত্রণার সঙ্গে শুরু হল ক্ষুধার যাতনা। আগের দিন নার্সের দেহটি বর্ষাতিতে ঢাকার সময় পাশে রেড ক্রশের একটা ছোট ক্যাম্বিশের থলি আলেক্সেই দেখে। কোন ছোট জন্তুর নজরে সেটা ইতিমধ্যেই পড়াতে দাঁত দিয়ে ফুটো করেছিল সেটা, খাবারের টুকরো ইতস্তত ছড়ানো। তখন বলতে গেলে নজরই দেয়নি আলেক্সেই, কিন্তু এখন থলিটা তুলে দেখল ভিতরে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ কয়েকটা, মাংসের বড়ো টিন, একগোছা চিঠি, ছোট্ট আয়না আর আয়নাটার পিছনে একটি শীর্ণমুখ বয়স্কা স্ত্রীলোকের ছবি। থলিতে কিছু রুটিও ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু পাখিতে কিম্বা কোন জন্তুতে সেগুলো সাবাড় করেছে। টিনটা আর ব্যাণ্ডেজগুলো বিমানি পোশাকের পকেটে রাখতে রাখতে আলেক্সেই বলল, "অনেক অনেক ধন্যবাদ," হাওয়ায় মেয়েটির পায়ের উপর থেকে বর্ষাতিটা সরে গিয়েছিল, সেটা ঠিক করে দিয়ে আস্তে আস্তে চলল পূব দিকে, ডালপালার পিছনে যেখানে আকাশ ইতিমধ্যেই কমলা রঙের আগুনে উদ্ভাসিত।

হাতে এখন এক কিলোগ্রাম মাংস মজুত, আলেক্সেই ঠিক করল দিনে একবার, দুপুরবেলায় খাবে।

৫

প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণা, তাই অন্যদিকে মন ঘোরাবার জন্য আলেক্সেই রাস্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। হিসেব করে দেখল যে দিনে দশ থেকে বারো কিলোমিটার গেলে তিন দিনে, বড়োজোর চার দিনে গন্তব্যে পেঁছবে।

"ঠিক আছে! দশ-বারো কিলোমিটার যাওয়ার মানেটা কী? এক কিলোমিটার মানে দুহাজার বার পা ফেলতে হবে; তাহলে দশ কিলোমিটার মানে কুড়ি হাজার পা, কিন্তু সেটা ত বেশ খানিকটা, বিশেষ করে পাঁচ-ছশ পা অন্তর আমাকে থেমে বিশ্রাম করতে হবে..."

আগের দিন হাঁটার কষ্ট লাঘব করার জন্য আলেক্সেই কয়েকটা জিনিস নির্দিষ্ট করে: পাইনগাছ একটা, গাছের গুঁড়ি, কিম্বা রাস্তায় ওই গর্তটা, আর প্রত্যেকটায় যাবার চেষ্টা করে, পেঁছিয়ে থামতে পারে যেন। এখন সমস্ত কিছু সংখ্যা হিসেবে দেখল -- ক'বার পা ফেলতে হবে তার হিসেবে। একবারে এক হাজার পা হাঁটবে ঠিক করল, তার মানে আধ কিলোমিটার, আর ঘড়ি ধরে জিরোবে, পাঁচ মিনিটের বেশী নয়। হিসেব করে দেখল কষ্ট করে সারা দিনে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দশ কিলোমিটার যেতে পারবে।

কিন্তু প্রথম এক হাজার পা কী দুঃসাধ্যই না ছিল! যন্ত্রণাটা ভুলতে পারার জন্য প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গুণে চলার চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু পাঁচশ পর্যন্ত গুণে খেই হারিয়ে গেল, তারপর শুধু দপ্‌দপে যন্ত্রণার জ্বালা, আর কিছু ভাবার নেই। তবু প্রথম এক হাজার পা সে গেল! বসবার শক্তি নেই, হুমড়ি খেয়ে সটান বরফের উপরে পড়ে গেল, দারুণ তৃষ্ণায় বরফ চাটল, কপাল আর দপ্‌দপে রগ বরফে চেপে ধরল, বরফের হিম স্পর্শে পেল অবর্ণনীয় পরিতৃপ্তি।

শিউরে উঠে আলেক্সেই ঘড়ি দেখল। সেকেণ্ডের কাঁটাটি বরাদ্দ পাঁচ মিনিটের শেষ মুহূর্তকটি টিকটিক করে কমিয়ে দিচ্ছে। চলন্ত কাঁটাটির দিকে আতঙ্কে তাকিয়ে রইল আলেক্সেই, যেন ঘুরে আসার শেষে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটবে; কিন্তু কাঁটাটা ষাটে পেঁছল যেই, কাতরে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে, এগিয়ে চলল।

বারোটা বাজল, সূর্যের আলোর পাতলা রেখা পাইনের ঘন ডালপালা ভেদ করে পড়াতে আধো-অন্ধকার বন চিকচিক করছে, সমস্ত বন ভরে গিয়েছে আলকাতরা আর গলন্ত বরফের তীব্র গন্ধে, তখন পর্যন্ত মাত্র চার হাজার পা এগিয়েছে আলেক্সেই। শেষ এক হাজার পা চলার পর বরফের উপরে পড়ে গেল, প্রায় হাতের নাগালে একটা বড়ো বার্চগাছের গুঁড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। অনেকক্ষণ বসে রইল সে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, কিছু ভাবছে না, কিছু দেখছে না, শুনছে না এমন কি ক্ষিধের জ্বালার সাড়াও নেই।

গভীর নিশ্বাস নিয়ে কয়েক চিমটি বরফ মুখে দিল আলেক্সেই, শরীরের ঘোর অবসাদ কাটিয়ে পকেট থেকে মাংসের টিনটা বের করে জার্মান ছোরাটা দিয়ে খুলল। এক টুকরো জমা স্বাদহীন চর্বি মুখে দিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করল, কিন্তু চর্বিটা গলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন দারুণ ক্ষিধেয় অভিভূত হল আলেক্সেই যে অতি কষ্টে মাংসের টিনটা সরিয়ে রাখতে পারল, বরফ খেতে লাগল ও, যা হোক কিছু একটা গিলতে হবে।

চলা শুরু করার আগে একটা জুনিপারগাছ থেকে একজোড়া হাঁটবার ছড়ি তৈরী করে নিল। সেদুটোয় ভর দিয়ে আলেক্সেই চলল বটে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

৬

...গভীর অরণ্যে ক্লিষ্ট যাত্রার তৃতীয় দিনে--তখন পর্যন্ত কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন চোখে পড়েনি — অপ্রত্যাশিত একটি জিনিস ঘটল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সেই জেগে উঠল, শীতে ও জ্বরে শরীর কাঁপছে। বিমানি পোশাকের একটা পকেটে সিগারেট ধরাবার একটা লাইটার পেল, রাইফেলের ফাঁকা টোটা দিয়ে বানিয়ে স্মারক-চিহ্ন হিসেবে ওটা আলেক্সেইকে তার মিস্ত্রী দিয়েছিল। ওটার কথা, আর আগুন জ্বালাতে যে পারে এবং জ্বালানো যে উচিত সমস্ত ভুলে গিয়েছিল ও। যে ফারগাছের নিচে ঘুমিয়েছিল সেটার কয়েকটা শুকনো নরম ডাল ভেঙ্গে পাইনের কাঁটার গোছায় ঢেকে আলেক্সেই আগুন লাগাল। ধূসর ধোঁয়া থেকে আচম্বিত উঠল চড়চড়ে হলুদ অগ্নিশিখা। শুকনো রজনাক্ত কাঠ চটপট জ্বলছে। আগুনের শিখা পাইনের কাঁটায় পেঁৗছতে হাওয়া লেগে হিসহিস চড়চড় শব্দে ঝলসে উঠল সেগুলো।

হিসহিস চড়চড় করে আগুন জ্বলছে, ছড়াচ্ছে শুকনো, আরামী উত্তাপ। আরামের মৌতাতে আচ্ছন্ন হয়ে এল আলেক্সেই। বিমানি পোশাকের জিপার টেনে টিউনিকের পকেট থেকে কয়েকটা ছেঁড়াখোঁড়া চিঠি বের করল, একই হাতে সব কটি লেখা। তার একটাতে পেল সেলোফেনে মোড়া পাতলা একটি মেয়ের ছবি, পরনে ফুল-তোলা ফ্রক, পা গুটিয়ে ঘাসে বসে আছে। কিছুক্ষণ

ছবিটার দিকে তাকিয়ে তারপর সেলোফেনে আবার মুড়ে খামে পুরল আর এক মুহূর্ত ভেবে সেটাকে ধরে রেখে পকেটে রাখল।

"কিছু ভেবো না, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আবার." নিজেকে না মেয়েটিকে বলল, সেটা বলা কঠিন। চিন্তান্বিতভাবে আবার বলল, "কিছু না..."

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে এবারে ফারবুটদুটো ঝট করে খুলে ফেলে, পশমের গলাবন্ধের ফালি সরিয়ে, পাদুটো ভালো করে দেখল সে। আরো ফুলে গিয়েছে, আঙুলগুলো ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে: রবারের ফাঁপানো থলির মত দেখাচ্ছে পাদুটোকে, আগের দিনের চেয়ে কালো তাদের রং।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নিভে-আসা আগুনের দিকে বিদায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলেক্সেই আবার কোনক্রমে চলল। ছড়ির চাপে শক্ত বরফের শব্দ। ঠোঁট কামড়ে এগিয়ে চলল সে, মাঝেমাঝে প্রায় বেঘোরের মত। বনের নানা সাধারণ শব্দে সে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে বলতে গেলে প্রায় শুনতেই পেত না, সে সব শব্দ হঠাৎ ভেদ করে এল মোটর ইঞ্জিনের দূর ধকধক আওয়াজ। প্রথমে মনে হল সেটা ক্লান্তিজনিত বিকার মাত্র, কিন্তু বেড়েই চলল শব্দটা, প্রথম গিয়ারে দেওয়াতে কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে। নিশ্চয়ই ওরা জার্মান, আর ও যে দিকে যাচ্ছে সেই দিকেই ওরা অগ্রসর। পেটের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এল আলেক্সেই'র।

ভয় ওকে জোগাল শক্তি। ক্লান্তি আর পায়ের যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে একটা ফারের ঝোপের দিকে গেল সে। একেবারে ভিতরে ঢুকে ধপ করে শুয়ে পড়ল বরফের উপরে। রাস্তা থেকে ওকে দেখা কঠিন অবশ্য, কিন্তু রাস্তাটা স্পষ্টভাবে ও দেখতে পারছে দুপুরের আলোয়, মধ্যদিনের সূর্য তখন ফারগাছের মাথার দাঁতওয়ালা বেড়ার অনেক উঁচুতে।

শব্দ আরো কাছে এল। আলেক্সেই'র মনে পড়ে গেল যে রাস্তা ছেড়ে চলে এসেছে তাতে ওর পায়ের একলা দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ে, কিন্তু এখন আরো সরে যাবার চেষ্টা করার সময় নেই, সামনের গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ খুব কাছে এসে পড়েছে। বরফে আরো ঘেঁষে শুল ও। ডালপালার মধ্যে দিয়ে দেখল একটা চেপটা, গোঁজের আকারের শাদা রঙের সাঁজোয়া গাড়ি। আলেক্সেই'র পায়ের দাগ যেখানে রাস্তা ছেড়ে এসেছে তার খুব কাছে দুলতে দুলতে শেকল ঝনঝনিয়ে গাড়িটা এল। নিশ্বাস চেপে রইল আলেক্সেই। সাঁজোয়া গাড়িটা এগিয়ে গেল। পিছনে এল একটা মোটরগাড়ি। চালকের

পাশে বসে আছে একজন, উঁচু টুপি মাথায়, বাদামী ফারের কলারে নাকের সবটা ঢাকা, আর তার পিছনে কয়েকজন সাব-মেসিনগানার, পরনে শীতকালীন সবজে ধূসর বড়ো ফৌজী কোট, মাথায় ইস্পাতের হেলমেট, উঁচু বেঞ্চিতে বসে আছে সবাই, গাড়ির গতির তালে এপাশ ওপাশ দুলছে। আরো বড়ো একটা সাঁজোয়া গাড়ি সবচেয়ে পিছনে, ইঞ্জিনটা গর্জাচ্ছে, শেকলগুলো ঝনঝন করে উঠছে। প্রায় পনেরো জন জার্মান তাতে সার বেঁধে বসে।

বরফে আরো চিপটে শুল আলেক্সেই। গাড়িগুলো এত কাছে এল যে চোঙের গ্যাসের ধোঁয়া মুখে চোখে লাগছে। আলেক্সেই'র ঘাড়ের লোম সব খাড়া হয়ে উঠল, পেশীগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যেন আঁটোসাঁটো বলের মত হয়ে গেল। কিন্তু গাড়িগুলো সবেগে চলে গেল, গ্যাসের ধোঁয়াও গেল মিলিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিনের শব্দ প্রায় আর শোনা যায় না।

সব শব্দ মিলিয়ে গেলে আবার রাস্তায় গেল আলেক্সেই, গাড়ির চাকার দাগ স্পষ্টভাবে পড়েছে সেখানে, সেই দাগ ধরে চলল পূবমুখো। আগেকার মত মেপে জুকে এগোচ্ছে, বিশ্রাম করছে, আগেকার মতই খাচ্ছে, বরাদ্দ যাত্রার অর্ধেকটা কেটে গেল। কিন্তু এবারে চলেছে বুনো জানোয়ারের মত, অতি সন্তর্পণে। সতর্ক কানে আসছে সামান্য খসখস শব্দটুকু, এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে, যেন সে হুঁশিয়ার যে কোন বড়ো হিংস্র জন্তু কাছাকাছি কোথাও ওঁৎ পেতে বসে আছে।

আলেক্সেই বৈমানিক, আকাশ-যুদ্ধেই অভ্যস্ত, এই প্রথম অক্ষত জীবিত শত্রুকে দেখল জমির উপরে। এখন ওদের চিহ্নরেখা ধরে চলতে চলতে আক্রোশের হাসি হাসল আলেক্সেই। সময় ওদের ভালো কাটছে না, যে জায়গা ওরা দখল করেছে সেখানে কোন আরাম, আতিথেয়তা মিলছে না। এমন কি এই গভীর বনেও, যেখানে তিন দিনের মধ্যে কোন মানুষের চিহ্ন ও দেখেনি, ওদের অফিসারকে এত পাহারাদার নিয়ে যেতে হয়।

"ভেবো না কিছু, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে!" নিজেকে খোশ করার জন্য আলেক্সেই বলে এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে, ভোলবার চেষ্টা করল যে পায়ের যন্ত্রণাটা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে, নিজের শক্তিও স্পষ্ট কমে আসছে। নবীন ফারগাছের ছাল সে চিবিয়ে চিবিয়ে গিলছে, বার্চের তেতো কুঁড়ি আর নবীন লিণ্ডেনের নরম চটচটে ছাল চিয়ুং-গামের মত মুখে রয়েছে, কিন্তু ক্ষিধে তাতে আর বশ মানছে না।

অন্ধকার যখন হয়ে এল তখন কোনক্রমে যাত্রার পাঁচটি পর্যায় কেটেছে। রাত্রে পাইনের অনেক ডাল আর শুকনো জ্বালানী কাঠ জড়ো করে একটা মাটিতে-পড়া বড়ো আধো-পচা বার্চের গুঁড়ির চারিধারে বড়ো করে আগুন জ্বালাল আলেক্সেই। লাল আভায় গুঁড়িটা পুড়ছে, উত্তাপটা বেশ আরামের, গা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমল সে সঞ্জীবনী উত্তাপ অনুভব করে। মাঝেমাঝে এপাশ ওপাশ ফিরে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে গুঁড়ির পাশে অলসভাবে জ্বলন্ত আগুনে জ্বালানী কাঠ দিল কয়েকবার।

মাঝরাতে তুষার-ঝড় শুরু হল। মাথার উপরে পাইনগুলো দুলে দুলে উঠে সরসর আর কিচকিচ নানা আওয়াজে উৎকণ্ঠায় গোঙাতে লাগল। ক্ষুরধার বরফের কুচি সব মাটি ঘেঁষে ছুটে চলেছে। চড়চড়ে চকচকে আগুনের চারিধারে ঘুরছে শব্দমুখর অন্ধকার। তুষার-ঝড়ে কিন্তু আলেক্সেই'র বিশ্রাম ব্যাহত হল না, আগুনের উত্তাপে গভীর নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন।

বনের পশুরাও কাছে এল না আগুনের ভয়ে। আর জার্মানরা -- এরকম রাত্রে ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। তুষার-ঝড়ে বনের গভীরে আসার সাহস ওদের নেই। যাই হোক না কেন, ধূমন্ত উত্তাপে ক্লান্ত শরীর আরামে এলিয়ে দিলেও আলেক্সেই'র কানে সবকিছু শব্দ আসছে, সে কান বনের জীবজন্তুর সতর্কতা এরিমধ্যে আয়ত্ত করেছে। ভোরের ঠিক আগে তুষার-ঝড়ের প্রকোপ তখন কমে গিয়েছে, ঘন শাদা কুয়াশা নিস্তব্ধ বনে নামল, আলেক্সেই'র মনে হল যে দোদুল্যমান পাইনের সরসর আওয়াজ আর পড়ন্ত বরফের নরম ঝুরঝুর শব্দ ভেদ করে সে শুনতে পারছে যুদ্ধের দূরাগত নানা শব্দ, বিস্ফোরণের আওয়াজ, মেসিনগানের দমক আর রাইফেলের ডাক।

"যুদ্ধের লাইন এত কাছে হতে পারে? এত শীগগির?"

৭

কিন্তু সকালে কুয়াশা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল; রাত্রে বনে এসেছিল রূপালী রঙ, এখন সূর্যের আলোয় বনটি বরফে চিকচিক করে উঠছে, আর যেন এই হঠাৎ রূপান্তরে খুসি হয়ে পাখিরা কিচকিচ কিচির মিচির শুরু করল, গান গেয়ে উঠল আসন্ন বসন্তের আগমনীতে। একাগ্রে কান পেতেও

যুদ্ধের কোন আওয়াজ আলেক্সেই আর শুনতে পেল না, না রাইফেলের ডাক, না কামানের গুরু গুরু গর্জন।

আলোয় বরফের কণা স্ফটিকের মত উজ্জ্বল, গাছ থেকে শাদা ধোঁয়াটে স্রোতে গড়িয়ে পড়ছে। এখানে সেখানে ভারী ফোঁটা বরফে পড়ছে পাতলা টপটপ শব্দে। বসন্ত! এই প্রথম এত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বসন্ত তার আগমন বার্তা ঘোষণা করল।

টিনের মাংসের সামান্য বাকিটুকু সকালে খাবে ঠিক করল আলেক্সেই — সুস্বাদু চর্বিতে ঢাকা মাংসের ফেঁসো মাত্র — না খেলে ওঠবার শক্তি হবে না বলে ওর মনে হল। তর্জনী দিয়ে সারা টিনটা চেঁচে পুঁছে সাফ করল, টিনটার এবড়োখেবড়ো ধারে লেগে হাতটা কয়েক জায়গায় কেটে গেল বটে, কিন্তু ওর মনে হল এখনো চর্বির কিছু টুকরো বাকি আছে। বরফে টিনটা ভরে, নিভন্ত আগুন থেকে পাঁশুটে ছাই চেঁচে সরিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে ওটাকে বসাল সে। পরে পরম তৃপ্তিতে গরম জলটা খেল, তাতে মাংসের অল্প আস্বাদ। তারপরে পকেটে রাখল টিনটা, চা বানাতে কাজ দেবে। গরম চা! আবিষ্কারটা প্রীতিকর, ওটার কথা ভেবে আবার যাত্রা শুরু করার সময় মেজাজটা একটু ভালো হল।

কিন্তু পথে নেমেই বিরাট হতাশার মুখোমুখি হল আলেক্সেই। তুষার-ঝড়ে রাস্তাটা একেবারে মুছে গিয়েছে, ঢালু ধারালো মাথার মত দেখতে বরফের স্তূপে পথ বন্ধ। একঘেয়ে নীলচে তীব্র আলোয় চোখে ধাঁধা লাগে। নরম বরফে পা বসে যাচ্ছে, বহু কষ্টে টেনে তুলতে পারছে আলেক্সেই। ছড়িদুটোয় বলতে গেলে কোন কাজই দিচ্ছে না, বরফে অনেকখানি ডুবে যাচ্ছে।

দুপুর হল, গাছের নিচের ছায়া কালো হয়ে এল, গাছের উপর থেকে সূর্যের আলো পড়েছে বনের মধ্যে, ততক্ষণে মাত্র পনেরো শ পা এগিয়েছে আলেক্সেই, এত ক্লান্ত যে প্রত্যেকটি পা ফেলার জন্য সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করতে হচ্ছে। মাথা ঘুরছে। পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে। প্রায়ই পড়ে যাচ্ছে সে, কোন বরফের স্তূপের উপরে এক মুহূর্ত নিশ্চল শুয়ে থেকে খরখরে বরফে মাথা গুঁজে, আবার উঠে কয়েক পা যাচ্ছে। অদম্য আগ্রহ হচ্ছে ঘুমোবার, শুয়ে পড়ার, সবকিছু ভুলে যাবার, একেবারে নড়াচড়া না করার। যা ঘটবার ঘটুক! থেমে গেল আলেক্সেই, দাঁড়িয়ে রইল অসাড় হয়ে, এপাশ ওপাশ দুলছে, তারপরই এত জোরে ঠোঁট কামড়াল যে ব্যথা

হল, আবার নিজেকে সামলে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল, কোনক্রমে পাদুটো ঘষড়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত তার মনে হল আর হাঁটতে পারবে না, কোন কিছুতে তাকে একচুল নড়াতে পারবে না এখান থেকে, একবার যদি বসে পড়ে তাহলে উঠতে পারবে না আর। চারিদিকে ব্যগ্রভাবে তাকাল আলেক্সেই। রাস্তার ধারে একটা নবীন বাঁকা পাইনগাছ। শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে একটু এগিয়ে গাছের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলেক্সেই। ডালের সন্ধিস্থানে চিবুকের ভর রাখল। তাতে ভাঙ্গা পায়ের ভার কিছুটা কমে যাওয়াতে একটু আরাম লাগল। টান-টান ডালে ভর দিয়ে বিশ্রাম করতে বেশ লাগছে। আরো যাতে আরাম পায় তার জন্য প্রথমে এক পা টেনে নিল, তারপরে অন্য পাটা, ডালের সন্ধিস্থানে তখনো চিবুক লাগানো, শরীরের ভারমুক্ত পাদুটো সহজেই বরফের স্তূপ থেকে উঠে এল। আলেক্সেই'র মাথায় হঠাৎ চমৎকার একটি ফন্দি জাগল।

"সত্যি ত! গাছটাকে সহজেই কেটে, সব ছেঁটে ডালের শুধু ফেঁকড়াটা রেখে তাতে চিবুক দিয়ে শরীরের ভার রেখে পা ফেলা যাবে, ঠিক এখন যা করছি। তাহলে সহজে হাঁটা যাবে। তাড়াতাড়ি যেতে পারব না বটে, কিন্তু এত ক্লান্ত লাগবে না, আর বরফের স্তূপ কখন বসে যাবে আর শক্ত হবে তার অপেক্ষা না করেই এগিয়ে যেতে পারব।"

হাঁটু গেড়ে বসে সে ছোরা দিয়ে নবীন গাছটাকে কাটল, ডালপালা ছিঁড়ে ফেলে পকেটের রুমাল আর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঠেকনোটাকে জড়িয়ে তক্ষুণি রওনা দিল। ঠেকনোটাকে এগিয়ে দিয়ে ডালের ফেঁকড়ায় চিবুক আর হাতদুটোর ভর দিয়ে এক পা ফেলছে, তারপর অন্যটা, আবার ঠেকনোটা এগিয়ে দিচ্ছে, দু পা এগোচ্ছে। এইভাবে চলল সে, পা গুণে গুণে, যাবার গতির নতুন একটা মাত্রা ঠিক করে।

গভীর বনে একজন এরকম অদ্ভুতভাবে চলেছে, ঘন বরফ স্তূপের উপরে মন্থর গতিতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হেঁটে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এগোল, কেউ দেখলে নিশ্চয় অবাক হত। কিন্তু এই বিচিত্র যাত্রা শুধু দেখল হাঁড়িচাঁচাগুলো; আর এই অদ্ভুত, তিনঠেঙ্গো বেঢপ জীবটি যে তাদের কোন ক্ষতি করবে না সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা ও কাছে এলে উড়ে গেল না মোটেই, শুধু লাফিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পথ ছেড়ে

দিল, মাথা হেলিয়ে কালো কৌতূহলী গুটি গুটি চোখ মেলে ঠাট্টার ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

৮

দুদিন ধরে বরফ-ঢাকা রাস্তায় এইভাবে নেংচিয়ে চলল আলেক্সেই, ঠেকনোটা এগিয়ে দিয়ে, তাতে ভর করে, পাদুটো টেনে নিয়ে। এতক্ষণে পাতাদুটো একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছে, কোন বোধ নেই, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে শরীরটা যন্ত্রণায় শিঁটিয়ে উঠছে। ক্ষিধের জ্বালা আর নেই। পেটের খিঁচুনি আর তীক্ষ্ম যন্ত্রণা একটানা ভারী একটা ব্যথার অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে, যেন খালি পেটটা খামচি দিয়ে দুপাশে চাপ দিচ্ছে।

আলেক্সেই'র আহার্য শুধু বিশ্রামের সময়ে ছোরা দিয়ে গাছ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া কচি পাইনের ছাল, বার্চ আর লাইমের কুঁড়ি, আর নরম সবুজ শ্যাওলা, বরফের নিচ থেকে খুঁড়ে বের করে গরম জলে ফুটিয়ে সেটা সে খায় রাত্রে। মাঝেমাঝে বরফ যেখানে গলে গিয়েছে সেখান থেকে বিলবেরির চকচকে পাতা জড়ো করে তা থেকে "চা" বানিয়ে খাওয়াটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার ওর কাছে। উষ্ণ পানীয়তে সমস্ত শরীর গরম হয়ে যায়, এমন কি চরম পরিতৃপ্তির মত একটা অনুভূতি হয়। উষ্ণ পানীয়তে পাতা আর ধোঁয়ার গন্ধ, আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে আরাম লাগে ওর, যাত্রাটা আর এত দীর্ঘ ও ভয়াবহ মনে হয় না।

যাত্রার ষষ্ঠ রাত্রিতে বিশ্রামের সময় আলেক্সেই আবার একটি বড়ো ফারগাছের সবুজ তাঁবুর নিচে শুল, একটা বুড়ো রজনাক্ত গাছের গুঁড়ি ঘিরে আগুন জ্বালাল, ওর হিসেবে ওটা সারা রাত জ্বলবে আর তাপ দেবে। তখনো অন্ধকার হয়নি। উপরে গাছের মাথায় অদৃশ্য একটি কাঠবিড়ালী খুব ব্যস্ত, ফারের মোচা কুড়ে কুড়ে খোসাগুলো মাটিতে ফেলছে। আলেক্সেই'র মাথায় তখন খালি খাবারের চিন্তা, ভাবল ফারের মোচায় কাঠবিড়ালীটা কী পাচ্ছে। একটা দানা তুলে আঁশ ছাড়িয়ে দেখল যোয়ারের দানার মত ছোট একটা বীজ। দেখতে দেবদারুর ছোট্ট বাদামের মত। বীজটা মুখে দিয়ে দাঁত দিয়ে ভাঙ্গল, তাতে দেবদারু তেলের সুগন্ধ।

এদিক এদিকে ছড়ানো কয়েকটা ফার ফল তুলে আলেক্সেই আগুনের কাছে সেগুলোকে রাখল, একমুঠো জ্বালানী কাঠ দেওয়াতে উত্তাপে

মোচাগুলোর মুখ ফাঁক হয়ে গেল, সেগুলোকে ঝেড়ে বীজগুলো হাতে ঘসে খোসাগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বাদামগুলো মুখে দিল।

বনের চাপা গুনগুনানি। রজনাক্ত গাছের গুঁড়িটা আস্তে আস্তে জ্বলছে, তার নরম সুগন্ধি ধোঁয়া আলেক্সেইকে ধূপের কথা মনে করিয়ে দিল। ক্ষীণ শিখাগুলো কাঁপছে, দপ করে জ্বলে উঠে ঢিমিয়ে যাচ্ছে, তাতে আলোর বৃত্তে সোনালী পাইন আর রুপালী বার্চগুলোর গুঁড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠে আবার গুঞ্জরিত অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আগুনে আরো কিছু জ্বালানী কাঠ ফেলে, আরো কয়েকটা ফার-ফল আলেক্সেই ভাঙ্গল। দেবদারু তেলের গন্ধে শৈশবের বহুদিন-বিস্মৃত একটি দৃশ্য মনে পড়ল... ছোট একটা ঘর, পরিচিত জিনিসে ঠাসা। ছাত থেকে ঝুলছে আলো, তার নিচে টেবিল। উৎসবের পোশাক পরনে ওর মা সন্ধ্যার প্রার্থনা থেকে সবেমাত্র ফিরে সিন্দুক থেকে গম্ভীরভাবে কাগজের থলে বের করে দেবদারুর বাদাম বাটিতে ঢালছেন। টেবিল ঘিরে বসেছে বাড়ির সবাই — মা, ঠাকুমা, ওর দুজন ভাই, ও নিজে, সবচেয়ে ছোট ও - খুব আড়ম্বরে শুরু হচ্ছে দেবদারুর বাদাম ভাঙ্গা · · উৎসবের অঙ্গ সেটা। কথা বলছে না কেউ। ঠাকুমা চুলের কাঁটা দিয়ে শাঁস দেখছেন, মাও তাই করছেন একটা কাঁটা দিয়ে। দাঁত দিয়ে সুকৌশলে মা খোলাগুলো ভেঙ্গে শাঁস বের করে টেবিলে জড়ো করছেন; যখন বেশ একটা স্তূপ হল তখন এক নিমেষে হাতের মুঠোয় সেটাকে নিয়ে সবটা একটি ছেলের খোলা মুখে দিয়ে দিলেন, কপাল ভালো সে ছেলেটির, মা'র হাতের ছোঁয়াচ ঠোঁটে লাগল; হাতটা কর্কশ, পরিশ্রমে জীর্ণ, কিন্তু উৎসবের দিন বলে সুগন্ধী সাবানের সুরভি তাতে।

কামিশিন!.. ছেলেবেলা! সহরের উপকণ্ঠে ছোট্ট বাড়িটাতে দিন কাটত আরামে!

কিন্তু এখানে, বনের গুনগুনানির মধ্যে মুখ জ্বলছে, পিঠে লাগছে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। অন্ধকারে পেঁচার ডাক; শেয়ালের আওয়াজ কানে এল। আগুনের কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসে, নিভন্ত কম্পমান শিখার দিকে চিন্তান্বিতভাবে তাকিয়ে আছে ক্ষুধার্ত, আহত, চরম ক্লান্ত একটি মানুষ, গভীর বিরাট এই বনে একাকী, সামনে অন্ধকারে পড়ে আছে অপ্রত্যাশিত বিপদ বিঘ্নসংকুল অজানা পথ।

"ভেবো না কিছু, সব ঠিক হয়ে যাবে!" হঠাৎ বলল মানুষটি, আর

আগুনের শেষ, লাল কম্পমান শিখার আলোয় ওর ফাটা ঠোঁট কী একটা সুদূর ভাবনার হাসিতে ফাঁক হয়ে গেল।

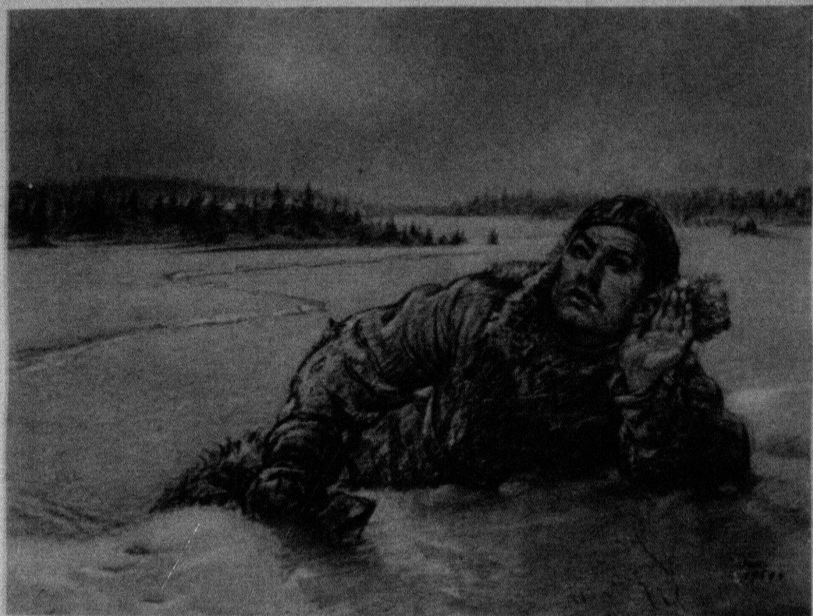
৯

তুষার-ঝড়ের রাত্রে কোন খান থেকে দূরের যুদ্ধের আওয়াজ এসেছিল, সপ্তম দিনে আলেক্সেই সেটা বুঝতে পারল।

শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, প্রতি মুহূর্তে বিশ্রামের জন্য থেমে আলেক্সেই বনের রাস্তা ধরে কায়ক্লেশে চলেছে, বরফ গলতে শুরু করেছে রাস্তায়। বসন্তের দূরের হাতছানি আর নয়, আদিম অরণ্যে বসন্ত এখন অভ্যাগত। উষ্ণ দমকা হাওয়া বইছে, সূর্যের উজ্জ্বল আলো ডালপালা ভেদ করে ছোট পাহাড় আর ঢিপি থেকে বরফ ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিচ্ছে, সন্ধ্যাবেলায় বড়ো বড়ো কাকের বিষন্ন ডাক, রাস্তার বুক এখন বাদামী, তার উপরে মন্থর ধীর দাঁড়কাকেরা বসে, মৌমাছির চাকের মত সচ্ছিদ্র ভিজে বরফ এখন, গলন্ত বরফের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট চিকচিকে ডোবা, আর সেই বলিষ্ঠ মাদক গন্ধ, যে গন্ধ সমস্ত জীবকে আনন্দে অধীর করে দেয়।

বছরের এই সময়টা আশৈশব আলেক্সেই'র প্রিয়, আর এখনো ভিজে থলথলে ফারবুট-পরা ক্লিষ্ট পায়ে জল ঠেলে যেতে যেতে যদিও ক্ষিধেয় আর যন্ত্রণায় আর ক্লান্তিতে চেতনা লোপ পাচ্ছে, জলের ডোবা, তলতলে বরফ আর কাদাকে শাপান্ত করছে, তবুও এই সোঁদা, মাতাল-করা সুগন্ধি হাওয়া প্রাণ ভরে ঘ্রাণ করছে ও। জলের ডোবায় পথ বেছে আর চলছে না আলেক্সেই, হোঁচট খেয়ে পড়ছে, উঠে ঠেকনোতে জোরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে আর শক্তি সঞ্চয় করে ঠেকনোটা আবার যতখানি পারে এগিয়ে দিয়ে পূবমুখো চলেছে মন্থরভাবে।

বনের রাস্তাটা একটা জায়গায় হঠাৎ বামে ঘুরেছে, সেখানে গিয়ে আচম্বিতে আলেক্সেই থেমে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। একটু এগিয়ে পথটা ভয়ানক অপরিসর, দুধার থেকে পাইনের ঘন নবীন ঝাড় যেন চেপে ধরেছে, সেখানে ও দেখল জার্মান গাড়িগুলো, যেগুলো কিছুদিন আগে ওকে পেরিয়ে চলে এসেছিল। ওদের রাস্তা আটকেছে দুটো প্রকাণ্ড পাইন। গাছদুটোর সামনে দাঁড়িয়ে গোঁজের মত চেহারার সাঁজোয়া গাড়িটা, রেডিয়েটরটা দুটো গাছের মধ্যে আটকানো, রংটা আর যেমন-তেমন গোছের শাদা দাগওয়ালা নয়, মরচে লাল; টায়ার-বিহীন চাকার উপরে নিচু হয়ে



গাড়িটা দাঁড়িয়ে, টায়ারগুলো পুড়ে গিয়েছে। বরফের উপরে গাছের নিচে গাড়ির বুরুজটা পড়ে আছে অতিকায় ব্যাঙের ছাতার মত। কাছে তিনটি লাশ — গাড়ির চালকরা — খাটো কালো তৈলাক্ত টিউনিক পরনে, মাথায় কাপড়ের হেলমেট।

মোটর গাড়িদুটো, তাদের রংও মরচে লাল আর পোড়াটে, সাঁজোয়া গাড়ির পিছনে গলন্ত বরফের উপরে দাঁড়িয়ে; ধোঁয়ায়, ছাই'এ আর পোড়া কাঠে বরফ কালো হয়ে গিয়েছে। চারিধারে, রাস্তার পাশে, ঝোপঝাড়ের নিচে, গর্তে গর্তে জার্মান সৈনিকদের মৃতদেহ। বোঝা গেল দারুণ আতঙ্কে ছুটোছুটি করেছিল ওরা, প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি ঝোপ তখন তুষার-ঝড়ের বরফে আচ্ছাদিত, তার পিছন থেকে মৃত্যু হানা দিয়েছে, কী ঘটছে ঠিক বোঝার আগেই ওরা নিহত হয়েছে। অফিসারটির পাৎলুনবিহীন দেহ গাছের সঙ্গে বাঁধা। ওর কালো কলারওয়ালা সবুজ টিউনিকে এক টুকরো কাগজ পিন দিয়ে লাগানো, তাতে লেখা: "যা চেয়েছিলে তাই মিলেছে", আর তার নিচে অন্য হাতে পাকা পেন্সিলে লেখা – "কুত্তা"।

কিছু খাবার মেলে কিনা এই যুদ্ধভূমিতে আলেক্সেই তার খোঁজ করল। পেল শুধু এক টুকরো ছাতা-পড়া বাসি রুটি, বরফে পায়ের চাপে পেষা, পাখিতে ঠুকরে খেয়েছে। তৎক্ষণাৎ মুখে দিল সেটা আলেক্সেই, আর দারুণ লোভে গমের রুটির টকটক গন্ধ শুঁকল। ইচ্ছে করছিল সবটা মুখে পুরে সুগন্ধি তলতলে রুটিটা চিবিয়েই চলে, কিন্তু ইচ্ছেটা দাবিয়ে রুটিটাকে তিন টুকরো করল, নিচের পকেটে দু টুকরো গুঁজে রেখে তৃতীয়টি গুঁড়ো করে প্রতিটি গুঁড়ো চুষতে শুরু করল, যেন মিঠাই একটা, চুষে যতক্ষণ আনন্দ পাওয়া যায় তাই ভালো।

আর একবার যুদ্ধদৃশ্যটি দেখল আলেক্সেই, আর হঠাৎ মনে হল: "কাছাকাছি নিশ্চয়ই পার্টিজানেরা আছে! ওদের পায়ের চাপেই ঝোপঝাড়ে আর গাছের চারিদিকে বরফ তলতলে হয়ে গিয়েছে। হয়ত ইতিমধ্যেই ওকে মৃতদেহের মধ্যে ঘুরতে দেখেছে ওরা, আর ফারগাছের মাথায় বসে কিম্বা কোন ঝোপের পিছন থেকে কোন পার্টিজান চর হয়ত ওকে লক্ষ্য করছে?" মুখের কাছে দুটো হাত জোড় করে প্রাণপণে চেঁচাল আলেক্সেই, 'হো, পার্টিজান, পার্টিজান!'

নিজের ক্ষীণ আর দুর্বল কণ্ঠস্বরে আলেক্সেই বিস্মিত হল। বনের

গভীর থেকে প্রতিধ্বনি এল, গাছের গুঁড়িতে লেগে আবার প্রতিধ্বনি উঠল, এমন কি সেটাও তার কণ্ঠস্বরের চেয়ে জোরালো।

'পার্টিজান, হো, পার্টিজান!' শত্রুদের মূক মৃতদেহের মধ্যে কালো চটচটে বরফে বসে বারবার চেঁচাল সে।

কান পেতে রইল উত্তরের প্রত্যাশায়। ওর গলা কর্কশ, ভেঙ্গে গিয়েছে, ও বুঝতে পারল যে নিজেদের কাজ সেরে, যা নেবার তা নিয়ে পার্টিজানেরা অনেক দিন চলে গিয়েছে -- সত্যি ত এই পরিত্যক্ত শূন্য জায়গায় থেকে যাবার কোন অর্থ নেই — কিন্তু ডেকেই চলল আলেক্সেই, অলৌকিক কিছু ঘটবে সেই প্রত্যাশায়, ওর আশা এই যে, দাড়িওয়ালা যে লোকদের এত গল্প সে শুনেছে তারা হঠাৎ ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে ওকে তুলে এমন কোথাও নিয়ে যাবে যেখানে সারাদিন না হোক অন্তত একঘণ্টা কিছু না ভেবে, কোথাও যাবার চেষ্টা না করে জিরোতে পারবে ও।

বন থেকে কেঁপে কেঁপে ফিরে এল প্রতিধ্বনি। কিন্তু হঠাৎ পাইনের গভীর সুরেলা গুনগুন ছাপিয়ে ও শুনল, অন্তত মনে হল যে শুনেছে — এমন একাগ্রভাবে কান পেতে ছিল ও — ভারী দ্রুত ধপ ধপ শব্দ, কখনো বেশ স্পষ্ট, কখনো বা ক্ষীণ, তালগোল পাকানো। চমকে উঠল আলেক্সেই, যেন দূর থেকে কোন বন্ধুর ডাক এই শূন্যতায় তার কাছে পৌঁছিয়েছে। নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, গলা বাড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ একাগ্রভাবে শুনল।

না, ভুল হয়নি ওর। পূব থেকে বওয়া আর্দ্র হাওয়া তার কাছে আনল কামানের দূরে গর্জন; আর শব্দটা অন্যরকম, দুটো বিপক্ষ দল ট্রেঞ্চ বানিয়ে আত্মরক্ষার দৃঢ় ব্যূহ রচনা করে পরস্পরকে উত্ত্যক্ত করার জন্য একটানা গুলির বিনিময় করছে, গত কয়েক মাস ধরে শোনা সে রকম শব্দের মত ঢিমে আর খাপছাড়া নয়। শব্দটা দ্রুত আর সুতীব্র, মনে হচ্ছে কে যেন ভারী পাথর গড়িয়ে ফেলছে, কিম্বা উল্টোনো ওকের পিপের তলায় ঘুষি মারছে।

সত্যিই ত! ঘোর কামান যুদ্ধ চলেছে। শব্দের ধরনে মনে হয় যুদ্ধের সীমান্ত দশ কিলোমিটারের মধ্যেই হবে, গুরুতর কিছু একটা ঘটছে ওখানে, কারা আক্রমণ চালিয়েছে আর কারা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করছে। আনন্দে আলেক্সেই'র গাল বেয়ে নামল চোখের জল।

পূব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল আলেক্সেই। এটা সত্যি যে ও যেখানে এখন দাঁড়িয়ে সেখানে পথটা হঠাৎ ঘুরে উল্টো দিকে গিয়েছে, সামনে

বরফের আস্তরণ; কিন্তু পূব দিক থেকেই শব্দের আমন্ত্রণ আসছে: ওই দিকেই গিয়েছে পার্টিজানদের পায়ের কালো কালো দাগ: ওখানেই কোথাও থাকে বনের বীরেরা।

আর আলেক্সেই বিড়বিড় করে বলল, "ভেবো না কিছু, সব ঠিক, দোস্ত, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" সজোরে ঠেকনোটা ফেলে চিবুক রেখে শরীরের সমস্ত ভার তাতে দিয়ে, বরফের উপরে একটা পা রাখল, তারপর আর একটা, আর রাস্তা ছেড়ে বেশ কষ্টে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলল।

১০

সে দিন বরফের উপরে এমন কি দেড় শ পাও এগোতে পারল না আলেক্সেই। অন্ধকার হওয়াতে থেমে যেতে হল। আবার পুরোনো একটা গাছের গুঁড়ি বেছে, চারদিকে জ্বালানী কাঠ বসিয়ে, টোটায় তৈরী সিগারেট লাইটারটা বের করে ছোট ইস্পাতের চাকাটা ঘোরাল, আর একবার ঘোরাল — তারপর হাত পা ঠান্ডা হয়ে এল; তেল নেই লাইটারে। ওটাকে ঝাঁকিয়ে ভিতরে ফুঁ দিল যাতে বাকি গ্যাসটুকু জ্বলে ওঠে, কিন্তু কিছু হল না। রাত্রি এল। বিদ্যুতের ক্ষণচ্ছটার মত চকমকির পাথর থেকে ছিটকে বেরিয়ে-আসা ফুলকিতে নিমেষের জন্য মুখের কাছের অন্ধকার হটে গেল। বারবার চাকাটায় ঝটকা দিচ্ছে আলেক্সেই, অবশেষে চকমকির পাথরটা একেবারে ক্ষয়ে গেল, আগুন জ্বালানো গেল না।

হাতড়ে কচি পাইনগাছের একটা ঝাড়ে গেল ও, সেখানে গুটিগুটি হয়ে বসে, হাঁটুতে চিবুক রেখে হাঁটুদুটো জড়িয়ে চুপচাপ বসে রইল, বনের শনশন শব্দ কানে আসছে। সে রাত্রে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারত আলেক্সেই, কিন্তু ঘুমন্ত বনে কামানের ডাক আরো স্পষ্টভাবে কানে এল, আর ওর মনে হল যে গোলা ফাটার গুমগুম আওয়াজের মধ্যে রাইফেলের খরখর শব্দ আলাদা করে শোনা যাচ্ছে।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল উৎকণ্ঠা আর বিষাদের একটা অজানিত অনুভূতিতে। তক্ষুণি সে জিজ্ঞেস করল নিজেকে, "কারণটা কী? কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছি?" মনে পড়ল — সিগারেট লাইটারটা। কিন্তু সূর্যের দয়ালু তাপে গরম লাগছে, চারিদিকে সমস্ত কিছু — গলা বরফ, গাছের গুঁড়ি, এমন কি পাইনের কাঁটাগুলো পর্যন্ত — উজ্জ্বল, চিকচিকে, সবকিছু

মিলে দুর্ভাগ্যের গুরুত্বটা কমিয়ে দিল। কিন্তু আরো খারাপ একটা জিনিস ঘটল। অসাড় হাত হাঁটু থেকে খুলে দেখল উঠতে পারছে না। কয়েকবার ওঠার চেষ্টা করাতে ঠেকনোটা ভেঙ্গে গেল, আর ও মাটিতে পড়ে গেল গড়িয়ে বোরার মত। গড়িয়ে চিৎ হয়ে শুল, যাতে ফুলে-ওঠা শরীরটা জিরোতে পারে। পাইনের ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অসীম নীল আকাশ, সোনালী আর বাঁকা পাড় শাদা পালকের মত মেঘ তড়তড় করে চলেছে, তাকিয়ে রইল সে দিকে। ওর শরীর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে এল, কিন্তু পাদুটোয় কিছু একটা ঘটেছে। সে দুটোতে এক মুহূর্তও ভর দিতে পারছে না। পাইনগাছ ধরে আর একবার ওঠবার চেষ্টা করল আলেক্সেই, এবারে সফল হল, কিন্তু গাছের কাছে পাদুটো আনার চেষ্টা করাতেই দুর্বলতায় আর পায়ের পাতায় নতুন শিরশিরে অসম্ভব একটা ব্যথার জন্য পড়ে গেল।

শেষ তা হলে? এখানেই মরতে হবে, পাইনগাছের নিচে, হয়ত কেউ দেখতে পাবে না ওকে, হাড়গুলো মাটি চাপা দেবে না, বনের জন্তু সব সেগুলো চেঁচে পুঁছে ঝকঝকে করবে? নিদারুণ দুর্বলতা মাটিতে চিপটে রেখেছে ওকে। কিন্তু দূরে তখনো কামানের গুমগুম আওয়াজ। যুদ্ধ চলেছে ওখানে, আপন জন সবাই ওখানে। শেষের আট-দশ কিলোমিটার যাবার শক্তিটুকু কি সঞ্চয় করতে পারবে না?

কামানের গর্জন নতুন সাহস যোগাল আলেক্সেইকে, ওকে ডাকছে সে আওয়াজ, সে ডাকে সাড়া দিল ও। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে জন্তুর মত চলল, প্রথমে কিছু না ভেবে, দূর যুদ্ধের আওয়াজে মন্ত্রমুগ্ধের মত, কিন্তু পরে সচেতনভাবে, মন ঠিক করে, কেননা ও বুঝতে পারল যে ঠেকনো না থাকলে এই ভাবেই বন ধরে যাওয়া আরো সহজ। পায়ে কোন চাপ না পড়াতে ব্যথাটা কম, হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারল আলেক্সেই। আবার তীব্র আনন্দে তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল। এরকম অবিশ্বাস্য অদ্ভুতভাবে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় আস্থা হারিয়ে কেউ হতাশ হয়ে পড়েছে, তাকে উৎসাহ দিচ্ছে যেন এমনভাবে উচ্চকণ্ঠে ও বলল:

"ভেবো না কিছু, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে!"

যাত্রার এক কদমের শেষে আলেক্সেই ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া হাতদুটো বগলের নিচে রেখে গরম করল, তারপর একটা নবীন ফারগাছে গেল গুড়ি মেরে, চৌকো করে দু টুকরো ছাল কাটতে গিয়ে নখ ভেঙে গেল, তারপর বার্চের গুঁড়ি থেকে ছালের কয়েকটা লম্বা ফালি ছিঁড়ে নিল। ফারবুট থেকে

পশমের গলাবন্ধের ফালিগুলো খুলে দুহাতে জড়াল; আঙুলের গাঁটে ছালের টুকরোগুলো রেখে বার্চের ছালের ফালি দিয়ে আটকিয়ে সমস্তটা একটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে ফেলল। ডান হাতে এভাবে হল বড়ো আর বেশ সুবিধাজনক একটা দস্তানা। কিন্তু দাঁত দিয়ে বাঁধতে হয়েছিল বলে বাঁ হাতের জন্য এরকম সুবিধে করে উঠতে পারল না; যাই হোক, হাত জোড়ায় "জুতো" পরানো হয়েছে ত, আলেক্সেই এগিয়ে চলল, আগের চেয়ে সহজ মনে হল চলনটা। পরে যেখানে থামল সেখানে হাঁটুতেও পাইনের ছাল লাগিয়ে নিল।

দুপুর হল, বেশ গরম হয়ে এসেছে, ততক্ষণে আলেক্সেই হাতে ভর দিয়ে বেশ কয়েক "পা" এগিয়েছে। যেখান থেকে কামানের আওয়াজ আসছে তার কাছাকাছি এসে পড়েছে বলেই হোক, কিম্বা কোন শব্দবিভ্রমের জন্যই হোক, আওয়াজগুলো প্রখর লাগছে। এত গরম লাগছে যে আলেক্সেই বিমানি পোশাকের জিপার খুলে ফেলল।

শ্যাওলায়-ভরা তলতলে এক টুকরো জলা, সেখানে গলন্ত বরফ থেকে উঁকি মারছে সবুজ পাতা, জলাটায় হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে আলেক্সেই, হঠাৎ ওর প্রতি অদৃষ্ট সদয় হল: পাঁশুটে নরম স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলায় ও দেখল একটা গাছের সূক্ষ্ম ডাঁটা, পাতাগুলো বিরল সূচীমুখ চকচকে, তার মধ্যে ঢিবির ঠিক উপরে পড়ে আছে টকটকে লাল, অল্প থেঁতলানো, কিন্তু রসে টইটুম্বুর ক্র্যানবেরি। উষ্ণ, মখমলের মত শ্যাওলা, জলার স্যাঁতসেঁতে গন্ধ তাতে, মাথা নিচু করে আলেক্সেই ঠোঁট দিয়ে একটার পর একটা বেরি ছিঁড়ে নিতে লাগল।

গত কয়েক দিনের মধ্যে এই প্রথম সত্যিকার খাবার পেল আলেক্সেই, কিন্তু খাসা টকটক-মিষ্টি ক্র্যানবেরিগুলোর সুস্বাদে ওর পেট মোচড় দিয়ে উঠল। সেটা কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার মানসিক শক্তি ছিল না ওর, এক গোছা থেকে অন্য গোছায় গেল শরীর মুচড়িয়ে, আর ভালুকের মত জিভ আর ঠোঁট দিয়ে টকটক-মিষ্টি বেরিগুলো ছিঁড়ে নিতে লাগল। এইভাবে কয়েক গোছা সাবাড় করল, থলথলে বুটে বসন্তের জল ঢুকছে, ব্যথায় পা জ্বলছে, আর ক্লান্তি, কিছুরই হুঁশ নেই ওর, শুধু মুখে মিষ্টি ঝাঁঝালো স্বাদ, আর পেটে প্রীতিকর ভারী একটা অনুভূতি।

বমি করল আলেক্সেই, কিন্তু তবুও লোভ চাপতে না পেরে আবার বেরিগুলো ছিঁড়ে যেতে লাগল। নিজের তৈরী "জুতো" হাত থেকে খুলে মাংসের পুরোনো টিনটা বেরিতে ভরে নিল; হেলমেটটাও ভরে নিল, বেল্টে

সেটা ফিতে দিয়ে বেঁধে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল, সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করা অবসাদ অতিকষ্টে চেপে।

সেই রাত্রে পুরোনো একটা ফারগাছের নিচে আশ্রয় নিয়ে বেরিগুলো খেল আলেক্সেই, আর গাছের ছাল আর ফার ফলের বীচি চিবোল। তারপর পাশ ফিরে শুল। ঘুমটা কিন্তু হল উৎকণ্ঠিত পাহারাদারের মত। কয়েকবার মনে হল অন্ধকারে কে যেন গুড়ি মেরে নিঃশব্দে ওর দিকে আসছে, চোখ খুলে আলেক্সেই এত একাগ্রভাবে শুনতে লাগল যে কানদুটো ঝিম ঝিম করে উঠল, পিস্তলটা বের করে নিঃসাড় বসে রইল; ফারের ফল পড়ছে, রাত্রে জমে-যাওয়া বরফের কড়কড়, বরফের নিচে ক্ষুদে ক্ষুদে জলের স্রোতের অস্ফুট কুলকুল, প্রত্যেকটি শব্দে সে চমকে উঠল।

ভোরের আগে ঘুম এল। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বেশ আলো হয়ে গিয়েছে, যে গাছের নিচে ঘুমিয়েছে তার চারদিকে ও দেখল শেয়ালের পায়ের আঁকাবাঁকা দাগ, আর তার মধ্যিখানে টেনে নিয়ে যাওয়া লেজের লম্বা ছাপ।

"এই জন্যই তাহলে ভালো ঘুম হয়নি!" পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল যে শেয়ালটা চারিদিকে ঘুরেছে, থাবা গেড়ে বসেছে, আবার ঘুরেছে। হঠাৎ আলেক্সেই'র দুশ্চিন্তা হল। শিকারীদের মতে ধূর্ত শেয়াল মানুষ মরছে আঁচ পেয়ে অনুসরণ করে তাকে। তারি পূর্ব আভাসেই কি ভীরু জানোয়ারটা ওর কাছে এসেছিল।

"বাজে কথা! একেবারে বাজে কথা! সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে," নিজেকে সান্ত্বনা দিল আলেক্সেই, আর হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়েই চলল, এই ভয়াবহ জায়গাটা যত সম্ভব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবার চেষ্টা তার।

সেদিন আবার কপাল খুলল আলেক্সেই'র। একটা সুগন্ধি জুনিপারের ঝোপ থেকে ফ্যাকাশে ধূসর বেরি ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ছে, ঝরা পাতার অদ্ভুত একটা স্তূপ চোখে পড়ল। হাত দিয়ে স্তূপটা ছুঁল, কিন্তু ভেঙ্গে গেল না সেটা। পাতাগুলো টেনে সরিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ আঙুলে কীসের খোঁচা লাগল। শজারু একটা, তৎক্ষণাৎ আঁচ করল আলেক্সেই। বড়ো বুড়োটে একটা শজারু শীত কাটাবার জন্য ঝোপে ঢুকেছিল, নিজেকে গরম রাখার জন্য হেমন্তের ঝরা পাতায় শরীরটা জড়িয়েছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে গেল আলেক্সেই। ক্লিষ্ট যাত্রার সময়ে জন্তু কি পাখি একটা মারার স্বপ্ন ও দেখেছে। কতবার না পিস্তল বের করে হাঁড়িচাঁচা একটা, বড়ো কাক কিম্বা কোন

খরগোসের দিকে নিশানা করেছে, আর প্রত্যেক বার অতিকষ্টে গুলি ছোঁড়ার ইচ্ছে দমন করেছে; মাত্র তিনটে গুলি বাকি আছে — দরকার হলে দুটো শত্রুর জন্য আর একটা নিজের জন্য। জোর করে পিস্তল সরিয়ে রেখেছে ও; ঝুঁকি নিলে চলবে না।

আর এখানে এক টুকরো মাংস সটান ওর হাতে এসে পড়েছে। সাধারণের মতে শজারু নোংরা জীব, সেটা ভেবেচিন্তে না দেখেই তাড়াতাড়ি শেষের পাতাকটি সরিয়ে ফেলল। শজারুটার ঘুম ভাঙ্গল না, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, কাঁটাওয়ালা বড়ো মটরের মত হাস্যকর চেহারা। ছোরা দিয়ে ওটাকে মেরে সোজা করল আলেক্সেই, আনাড়িভাবে ওর কাঁটার বর্মটা আর পেটের নিচের হলদে চামড়াটা টেনে ছিঁড়ে, শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে, দারুণ লোভে হাড়ে শক্ত করে লাগা গরম ধূসর পেশল মাংস দাঁতে ছিঁড়তে লাগল। কিছু বাকি পড়ে রইল না জানোয়ারটার। ছোট ছোট হাড়গুলো চিবিয়ে গিলল আলেক্সেই, আর শুধু তখনি মাংসটার কটু, কুকুরের মত আস্বাদটা টের পেল। কিন্তু কী এসে যায় গন্ধতে? পেট ত ভরেছে, সমস্ত শরীরে জাগছে পরিতৃপ্তির, উষ্ণতার আর অবসাদের একটা অনুভূতি!

আবার দেখে শুনে প্রত্যেকটি হাড় চুষল আলেক্সেই, তারপর বরফে শুয়ে পড়ল, বেশ গরম আর আরাম লাগছে। হয়ত ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে একটা শেয়াল সতর্কভাবে ডাকাতে ঘোর কেটে গেল। কান খাড়া করে শুনল আলেক্সেই, পূব থেকে বরাবর আসা দূরাগত কামানের গর্জনের মধ্যে হঠাৎ মেশিনগানের খরখরে আওয়াজ।

সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে, শেয়ালটার আর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে গিয়ে, আবার বনের গভীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল আলেক্সেই।

১১

যে জলাটা পেরিয়ে এসেছে তার ওধারে খোলা জায়গা একটা, রোদেবৃষ্টিতে জীর্ণ খোঁটার দুটো সারির একটা বেড়া সেখান হয়ে চলে গিয়েছে, খোঁটাগুলো গাছের ছাল আর উইলো ডাল দিয়ে খুঁটিতে বাঁধা, খুঁটিগুলো মাটিতে পোঁতা।

খোঁটাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, এখানে সেখানে বরফের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত অচলা পথের রেখা উঁকি মারছে। কাছাকাছি নিশ্চয়ই বসতি আছে তাহলে! আলেক্সেই'র হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে এল। এত দূর জায়গায় জার্মানদের আসার কোনই সম্ভাবনা নেই বলতে গেলে; আর যদিও ওরা এসে থাকে, আশেপাশে আপনার লোকজনও থাকবে, আর তারা অবশ্যই আহত আলেক্সেইকে আশ্রয় দেবে, সমস্ত রকম সাহায্য করবে।

যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে আঁচ করে প্রাণপণ শক্তিতে এগিয়ে চলল আলেক্সেই, বিশ্রামের জন্য থামল না। হামাগুড়ি দিয়ে চলল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বরফে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে, পরিশ্রমে জ্ঞান হারাচ্ছে; একটা টিবির উপরে পেঁছবার জন্য তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিচ্ছে আলেক্সেই, ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওটাতে উঠলেই যে গ্রামটা ওকে আশ্রয়ের স্বর্গ জোটাবে সেটা নজরে আসবে। বসতিতে পেঁছবার একাগ্র চেষ্টায় ও দেখতে পেল না যে, বেড়াটা আর গলন্ত বরফে ক্রমশ স্পষ্টতর রাস্তার চিহ্নটা ছাড়া আর কিছু নেই যেটা কাছাকাছি লোকালয়ের ইঙ্গিতসূচক।

অবশেষে টিবির উপরে পেঁছল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আলেক্সেই চোখ তুলে তাকাল — আর তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিল — সামনের দৃশ্যটি এত ভয়াবহ।

সন্দেহ নেই যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে বনের মধ্যে ছোট্ট একটা গ্রাম ছিল। পোড়া বাড়িগুলোর বরফে-ঢাকা ভগ্নস্তূপের উপরে চিমনীর দুটো উদ্যত অসমান সারিতে গ্রামটার রেখা সহজে ধরা যায়। এখন শুধু চোখে পড়ছে কয়েকটা ফুল-বাগান, কঞ্চির বেড়া আর জায়গায় জায়গায় জানলার পাশে রোয়ানগাছের ঝাড়। আর এখন বরফের মধ্য থেকে খুঁচিয়ে বেরিয়ে আছে ওগুলো, মরা, আগুনে-ঝলসানো। বরফে-ঢাকা ফাঁকা ক্ষেতের উপরে চিমনীগুলো বেরিয়ে আছে, বনের ফাঁকা জায়গায় গাছের গুঁড়ির মত, আর মাঝখানে উঠেছে কুয়োর জল তোলার যন্ত্র, একেবারে বেমানান দেখাচ্ছে সেটাকে, তা থেকে ঝুলছে পুরোনো, লোহায় বাঁধানো কাঠের বালতি একটা, মরচে-পড়া শেকলে আস্তে আস্তে হাওয়ায় দুলছে সেটা। গ্রামের প্রবেশপথে, সবুজ বেড়ায় ঘেরা বাগানের কাছে সুন্দর একটা ছাতওয়ালা খিলান, তার নিচে মরচে-পড়া কব্জায় কিঁচকিঁচ করে দরজাটা আস্তে আস্তে নড়ছে।

জনপ্রাণী নেই, শব্দ নেই, ধোঁয়ার রেশ মাত্র নেই... মরুভূমি। জন মানুষের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। আলেক্সেই আসাতে ভয় পেয়ে একটা

খরগোস ছুটে সোজা গ্রামটির দিকে গেল, পিছনের পাদুটো হাস্যকরভাবে ছুঁড়ে। কণ্ডির গেটে থেমে গিয়ে বসল ওটা, সামনের পাদুটো তুলে, কানটা একটু হেলিয়ে; বড়ো অদ্ভুত জীবটা তখনো হামাগুড়ি দিয়ে আসছে দেখে ওটা ঝলসে-যাওয়া পরিত্যক্ত বাগানের ধার ঘেঁষে আবার লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

যন্ত্রবৎ এগিয়ে চলল আলেক্সেই। দাড়ি-না-কামানো গাল বেয়ে চোখের জলের বড়ো বড়ো ফোঁটা টপটপ করে বরফে পড়ছে। কণ্ডির গেটটায় থামল ও, এক মুহূর্ত আগে খরগোসটা সেখানে ছিল। গেটের উপরে ভাঙ্গাচোরা বোর্ডে লেখা: "কিণ্ডা..." সহজেই আঁচ করা যায় যে এই সবুজ বেড়ার পিছনে ছিল একটি কিণ্ডারগার্টেনের পরিচ্ছন্ন বাড়িঘরদোর। এমন কি নিচু কয়েকটা বেঞ্চও পড়ে আছে, গ্রামের ছুতোর সেগুলো বানিয়েছিল, আর বাচ্চাদের ভালোবাসত বলে কাচ দিয়ে চেঁচে সেগুলোকে সমান আর মসৃণ করেছিল। গেট ঠেলে ঢুকে একটা বেঞ্চের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে গেল আলেক্সেই, বসার ইচ্ছে তার, কিন্তু ওর শরীরটা আড়াআড়ি অবস্থায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। শেষে যখন বসল তখন সমস্ত শিরদাঁড়াটা কনকন করতে লাগল। জিরিয়ে নেবার জন্য বরফের উপরে শুয়ে পড়ল ও, কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্লান্ত জানোয়ারেরা যেমন করে শোয়।

ওর বুক বিষাদে ভারী।

বেঞ্চের চারিধারে বরফ গলছে, দেখা যাচ্ছে কালো মাটি, সেখান থেকে উষ্ণ ভাপ উঠে চোখের সামনে বেঁকে যাচ্ছে আর কাঁপছে। উষ্ণ গলন্ত মাটি এক মুঠো খুঁড়ে নিল আলেক্সেই; চর্বির মত আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চুঁইয়ে পড়ল সেটা, ভিজে ভিজে গোবরের গন্ধ তাতে, গোয়ালের আর বাড়ির গন্ধ।

বসতি ছিল এখানে... অনেক, অনেক দিন আগে কোন সময় লোকেরা "কৃষ্ণ অরণ্যের" কাছ থেকে জমির এই টুকরোটা জয় করে, লাঙল চালায় এর উপরে, কাঠের বিদেমই দেয়, সার দেয়, দেখাশুনো করে। কঠিন জীবন সেটা, বনের আর জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামের জীবন, পরের ফসল তোলার আগে কী করে সংসার চলবে তার অবিরাম দুশ্চিন্তার জীবন। সোভিয়েত শাসনে একটা যৌথখামার গড়া হয়, আর সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে লোকেরা; কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি এল, তাদের সঙ্গে এল প্রাচুর্য। কিণ্ডারগার্টেন বানাল গ্রামের ছুতোররা, আর সন্ধ্যাবেলায় টুকটুকে বাচ্চারা এই বাগানে হুড়োহুড়ি করছে দেখতে দেখতে গ্রামের লোকেরা

নিশ্চয়ই ভাবত যে এবারে একটা ক্লাব আর পড়বার ঘর তৈরী করার সময় হয়েছে, বাইরে যখন তুষার-ঝড় তখন ক্লাবের ঘরে উষ্ণ আরামে শীতের সন্ধ্যা কাটানো যাবে; বনের গভীরে বৈদ্যুতিক আলোর স্বপ্নও তারা নিশ্চয়ই দেখেছিল। আর এখন শুধু মরুভূমি, বনের অনন্ত অটল স্তব্ধতা...

যত ভাবছে গ্রামটির কথা আলেক্সেই তত ওর মন নাড়া দিয়ে উঠছে। চোখের সামনে এল কামিশিনের ছবি, সমতল শুকনো স্তেপে ভলগাপারের ধুলো-ভরা একটা ছোট সহর। গ্রীষ্মে আর হেমন্তে স্তেপের ধারালো হাওয়া সহরে বইত, ধুলো আর বালি চোখে মুখে ছুঁচের মত লাগত, জোরে ঢুকত বাড়িঘরদোরে, বন্ধ জানলা দিয়ে চোরাভাবে আসত, চোখ অন্ধ করে দিয়ে দাঁতে লাগত। স্তেপের এই কিড়কিড়ে বালির মেঘকে "কামিশিন বৃষ্টি" বলা হত, অনেক অনেক বছর ধরে এই বালি আটকাবার, পরিষ্কার টাটকা হাওয়া প্রাণভরে নেবার স্বপ্ন লোকে দেখেছিল। কিন্তু স্বপ্নটা সত্য হল শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশে। সলাপরামর্শ করে লোকেরা হাওয়া আর বালির বিরুদ্ধে লড়াই চালাল। প্রতি শনিবার গাঁতি শাবল আর কুঠার নিয়ে সমস্ত লোক বেরিয়ে আসত, আর কালক্রমে সহরটির আগেকার ফাঁকা চকে একটা বাগান হল, অপরিসর রাস্তার দুধারে উঠল নবীন পাতলা পপলারগাছ। গাছে সযত্নে জল দিত লোকে, সময়ে ছাঁটত, যেন নিজেদের জানলার কার্নিশের ফুল। আলেক্সেই'র মনে পড়ল বসন্তে যখন গাছগুলোর পাতলা নগ্ন শাখা অংকুরিত হয়ে সবুজ রং ধরত তখন ছেলে বুড়ো সবাই কী ভাবে আনন্দিত হত... হঠাৎ ও কল্পনা করল ওর নিজের কামিশিনের রাস্তায় ফ্যাশিস্টরা ঘুরছে। অসীম যত্নে লালিত গাছগুলো ওরা কেটে ফেলছে আগুন জ্বালাবার জন্য। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে ওর নিজের সহর। ওর বাড়ি যেখানে ছিল, যেখানে ও বড়ো হয়েছে, ওর মা যেখানে ছিলেন, সেখানে উঠেছে একটা নগ্ন, ঝুল-মাখা বিকট চিমনী, এখানকার চিমনীর মত।

ব্যথায় আর যন্ত্রণায় ওর বুক চিরে গেল।

"ওদের আর এক চুল এগোনো চলবে না! রুখতেই হবে ওদের, শরীরে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ, যেমন করে রুখেছিল ওই রুশ সৈনিকটি, শত্রুদের দেহের গাদার ওপরে বনের ফাঁকা জায়গায় যে পড়ে আছে।"

গাছের ধূসর মাথায় সূর্যের আলো ইতিমধ্যেই পড়েছে।

এক কালে যেটা গ্রামের রাস্তা ছিল সেটা ধরে আলেক্সেই হামাগুড়ি দিয়ে চলল। ছাই'এর গাদা থেকে মড়ার গন্ধ আসছে। গ্রামের চেহারাটা বনের

চেয়েও পরিত্যক্ত। হঠাৎ একটি বিচিত্র শব্দে ও হুঁশিয়ার হ'ল। রাস্তার একেবারে শেষে ছাই'এর গাদার পাশে একটা কুকুর। ঝোলা-কান লোমশ পোষা কুকুর একটা, সাধারণ "ববিক" কিম্বা "ঝুচকা"। নিচু গলায় গরগর করে, থাবাতে এক টুকরো মেদল মাংস ধরে নাড়াচাড়া করছে। আলেক্সেইকে দেখে কুকুরটা হঠাৎ ফুঁসে উঠে দাঁত দেখাল -- লোকে বলে কুকুরের মত নরম মেজাজের জীব আর নেই, গিন্নীদের যত বকুনীর লক্ষ্যবস্তু ওরা, আর বাচ্চাদের প্রিয়। কুকুরটার চোখদুটো এত হিংস্রভাবে জ্বলছে যে আলেক্সেই'র শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। "দস্তানা" জোড়া চট করে খুলে পিস্তলটা নিল সে। কয়েক মুহূর্ত মানুষ আর কুকুর -- সেটা এখন বুনো জন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে – পরস্পরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ কুকুরটার পুরোনো স্মৃতি ফিরে এল নিশ্চয়ই, কেননা মুখ নিচু করে, যেন দোষ করে ফেলেছে এমন ভাবে লেজ নাড়িয়ে মাংসের টুকরোটা চট করে তুলে নিয়ে ছাই'এর গাদার পিছনে দৌড়িয়ে চলে গেল লেজ গুটিয়ে।

চলে যেতে হবে, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে! আলোর শেষ কটি রেখার সুযোগ নিয়ে, কোন রাস্তা না বেছে, বরফের উপর আড়াআড়িভাবে আলেক্সেই হামাগুড়ি দিয়ে বনে ঢুকল, কিছু না ভেবেই যেদিক থেকে কামানের শব্দ এখন স্পষ্টভাবে আসছে সে দিকে চলল। শব্দটা ওকে টানছে চুম্বকের মত, যত কাছে যাচ্ছে তত বাড়ছে ওটার আকর্ষণী শক্তি।

১২

আর এইভাবে আরো দুতিন দিন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল আলেক্সেই . সময়ের হিসেব ওর নেই, সমস্ত কিছু যন্ত্রচালিত প্রয়াসের একটানা পরম্পরায় পরিণত। কখনো কখনো ঘুম, বিস্মরণ হয়ত বা ওকে আচ্ছন্ন করছে। হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ছে সে, কিন্তু যে শক্তি তাকে পূর্বদিকে নিয়ে যাচ্ছে এত প্রখর তার আকর্ষণ যে বিস্মরণের অবস্থাতেও আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে কোন গাছ কিম্বা ঝোপের সঙ্গে ধাক্কা লাগা বা হাত পিছলে মুখ থুবড়ে গলন্ত বরফের উপরে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি, ভাসা-ভাসা সব চিন্তা একটি কেন্দ্রে, আলোর বিন্দুর মত একটি কেন্দ্রে আবদ্ধ: হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, যেমন করে পারো এগিয়ে চলো।

যেতে যেতে প্রত্যেকটা ঝোপ খুঁজে দেখছে সে, যদি আর একটা শজারু মেলে। বরফের নিচে পাওয়া বেরি আর শ্যাওলা ওর আহার্য এখন। একবার একটা বিরাট পিঁপড়ের ঢিবির কাছে এল, বৃষ্টিতে ভেজা মসৃণ খড়ের গাদার মত ঢিবিটা খাড়া। পিঁপড়েগুলো তখনো ঘুমোচ্ছে, মনে হচ্ছে ঢিবিতে কিছু নেই। নরম ঢিবির ভিতরে ঝপ করে হাত ঢুকিয়ে আলেক্সেই বের করে নিল, পিঁপড়েগুলো চামড়ায় নাছোড়বান্দার মত লেপটে আছে। অসীম তৃপ্তিতে পিঁপড়েগুলো খেতে শুরু করল সে, শুকনো ফাটা জিভে লাগছে পিঁপড়ের ঝাঁঝালো টক রস। বারবার ঢিবির মধ্যে হাত ঢোকাল, শেষ পর্যন্ত এই অপ্রত্যাশিত হামলায় সমস্ত পিঁপড়ে জেগে উঠল।

হিংস্রভাবে আত্মরক্ষা শুরু করল ক্ষুদে পোকাগুলো; আলেক্সেই'র হাত, ঠোঁট, জিভ কামড়াচ্ছে, বিমানি পোশাকের ভিতরে ঢুকে শরীর পর্যন্ত পেঁছিল ওরা। কিন্তু আর কিছু না হোক, ওদের কামড়ের জ্বালা ভালোই লাগছে, ওদের ঝাঁঝালো রস যেন বলকারক ওষুধ। তেষ্টা পেল আলেক্সেই'র। ঝোপঝাড়ের মধ্যে বনের ঘোলাটে জলের একটা ডোবা, ও মুখ বাড়াল পানের জন্য, কিন্তু তক্ষুণি পিছিয়ে এল — ঘোলাটে জল, আকাশের নীল ছায়া তাতে পড়েছে, তার পটভূমিতে একটা অদ্ভুত ভয়াবহ মুখ ওর দিকে উঁকি মারছে। কঙ্কালের মুখ সেটা, চামড়াটা কালো, অপরিচ্ছন্ন খোঁচা খোঁচা শক্ত লোমে ইতিমধ্যেই কণ্টকিত। গভীর কোটর থেকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বড়ো, গোলগোল, বন্য উজ্জ্বল একজোড়া চোখ, আলুথালু চুল কপালে নেমেছে এলোমেলো গোছায়।

"আমার ছায়া ওটা?" ভাবল আলেক্সেই, আর তাকাবার সাহস হল না ওর, জল না খেয়ে মুখে কিছু বরফ গুঁজে পুবমুখো হামাগুড়ি দিয়ে চলল সেই জোরালো চুম্বকটার আকর্ষণে।

সে রাত্রে বিশ্রামের জন্য একটা বড়ো বোমা-গর্ত বেছে নিল আলেক্সেই, গর্তটার চারিধারে হলুদ বালিতে ঘেরা, বিস্ফোরণের চাপে উপরে ছিটকে এসেছে। গর্তের ভিতরটায় শুয়ে বেশ আরাম লাগছে। হাওয়া আসছে না সেখানে, শুধু উপরের বালি ঝুরঝুর করে পড়ছে হাওয়ার চাপে। উপরে তাকাল আলেক্সেই, তারাগুলোকে বেজায় বড়ো ঠেকছে, মনে হচ্ছে ওরা খুব নিচে নেমে এসেছে। পাইনগাছের একটা মোটা ডাল তারার নিচে এদিক ওদিক দুলছে, মনে হচ্ছে ছেঁড়া নেকড়ার টুকরো হাতে সেটা জ্বলজ্বলে আলোগুলোকে মুছে চকচকে করছে। ভোরের আগে ঠান্ডা পড়ল। বনের

উপরে কনকনে কুয়াশা। হাওয়ার গতি বদলে গেল। উত্তর থেকে বইছে সেটা, কুয়াশাটা জমে যাচ্ছে। ধূসর, বিলম্বিত আলো যখন ডালপালা ভেদ করে এল তখন ঘন কুয়াশা নেমে আস্তে আস্তে গলে গেল, পেছল গুঁড়ো গুঁড়ো বরফে সবকিছু ঢাকা পড়েছে। উপরের ডালটাকে আর নেকড়াওয়ালা হাতের মত দেখাচ্ছে না, মনে হচ্ছে অদ্ভুত, স্ফটিক ঝালর একটা, তা থেকে ঝোলানো ছোট ছোট ত্রিশির কাচের কলম হাওয়ায় আস্তে আস্তে ঠুনঠুন করছে।

আলেক্সেই জেগে উঠল, এত দুর্বল তার আগে কখনো লাগেনি। বিমানি পোশাকের বুকপকেটে মজুত রাখা পাইনগাছের ছাল পর্যন্ত চিবল না ও। অনেক কষ্টে মাটি ছেড়ে উঠল, যেন রাত্রে শরীরটা মাটির সঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে গিয়েছে। পোশাক আর দাড়ি গোঁফ থেকে বরফ ঝেড়ে না ফেলে, গর্তটার গা ধরে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু রাত্রে জমে-যাওয়া বালিতে হাত গেল পিছলে। বারবার বেরোবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবার পিছলে পড়ে গেল। ওঠবার উদ্যম ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে এল। শেষে গভীর আতঙ্কে আলেক্সেই বুঝতে পারল যে কেউ সাহায্য না করলে সে বেরোতে পারবে না। সেটা ভেবে আর একবার গর্তটার পেছল গা বেয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে পারল না, কিন্তু অল্প একটু ওঠার পরেই আবার পিছলে পড়ে গেল, একেবারে ক্লান্ত আর অসহায়।

"শেষ তাহলে! কিছুই আর করার নেই!"

গর্তে কুঁকড়িয়ে শুল আলেক্সেই, বিশ্রামের একটা ভয়াবহ ঘোর সমস্ত শরীরে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে ইচ্ছাশক্তিকে চুম্বকের টান থেকে মুক্ত করে অসাড় করে দিচ্ছে, বুঝতে পারল ও। ছিন্ন পত্রগুলো অস্থিরভাবে টিউনিকের পকেট থেকে বের করে নিল, কিন্তু পড়বার শক্তি আর নেই। সেলোফেনের মোড়ক থেকে মেয়েটির ছবি বের করল, মাঠের ঘাসে ছাপা ফ্রক পরে বসে আছে। বিষণ্ণভাবে হেসে জিজ্ঞেস করল তাকে:

"সত্যিই তাহলে বিদায়?" আর হঠাৎ চমকে উঠল আলেক্সেই, ছবি হাতে পাথরের মত বসে রইল। বনের অনেক উপরে ঠাণ্ডা হিম হাওয়ায় পরিচিত একটা শব্দ শুনেছে মনে হল।

অবসাদ তক্ষুণি ঝেড়ে ফেলল আলেক্সেই। শব্দটা অসাধারণ কিছু নয়। এত ক্ষীণ যে বনের কোন জন্তুর সূক্ষ্ম কানেও বরফে-ঢাকা গাছের মাথার একঘেয়ে খসখস শব্দের মধ্যে ওটা আলাদাভাবে ধরা পড়বে না। কিন্তু

বিশেষ একটা শিসের মত ধ্বনিতে আলেক্সেই নির্ভুলভাবে আঁচ করল যে ওটা আসছে "ই-১৬" থেকে, যে ধরনের বিমান ও চালাত সে ধরনের বিমান থেকে।

ইঞ্জিনের গম্ভীর শব্দ আরো কাছে এল, মাত্রায় বাড়ল, কখনো বা শিসের মত বাজছে, আর বিমানটি ঘোরার সময় গোঙানোর শব্দ। শেষে, ধূসর আকাশে অনেক উঁচুতে ছোট মন্থরগতি একটা ক্রুশ আলেক্সেই দেখল, কুয়াশাচ্ছন্ন ধূসর মেঘে কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটা, আবার বেরিয়ে আসছে। পাখাদুটোয় লাল তারার চিহ্ন আলেক্সেই'র চোখে পড়ল, ওর ঠিক মাথাব উপরে বিমানটি তীরবেগে নেমে আবার বৃত্তাকারে উপরে উঠে গেল সূর্যের আলোয় ঝকঝকিয়ে, তারপর একটা পাশ উঁচু করে উড়ে চলে গেল। ইঞ্জিনের শব্দ গেল থেমে, সে শব্দ ছাপিয়ে এল হাওয়ায় দোলা, বরফে-ঢাকা ডালপালার মৃদুকর্কশ ধ্বনি, কিন্তু পরে অনেকক্ষণ ধরে আলেক্সেই'র মনে হল সেই সূক্ষ্ম শিসের ধ্বনি তখনো কানে আসছে।

ককপিটে বসে আছে নিজে, ও কল্পনা করল। এক নিমেষে, এমন কি একটা সিগারেটে টান দিতে না দিতে, বনে নিজের বিমান-ঘাঁটিতে ফিরে যেতে পারে ও। বৈমানিকটি কে? হয়ত আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো, সকালের টহলে বেরিয়েছে। ও টহল দেবার সময় অনেক উঁচুতে উঠত, শত্রু বিমানের দেখা পাবার গোপন আশায়... দেগতিয়ারেঙ্কো... বিমানটা... বন্ধু বৈমানিকেরা...

নতুন উদ্যমের আবেগে গর্তটার জমে-যাওয়া গায়ের দিকে তাকাল আলেক্সেই। "এভাবে কখনোই বেরোতে পারব না," মনে মনে বলল। "কিন্তু এখানে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা চলবে না।" খাপ থেকে ছোরা বের করে অস্থির, দুর্বল খোঁচায় গর্তটার গায়ে পা রাখবার জায়গা তৈরী করতে লাগল আলেক্সেই, নখ দিয়ে আঁচড়ে জমে-যাওয়া বালি সরাল। আঁচড়াতে আঁচড়াতে নখ ফেটে গেল, আঙুল থেকে রক্ত গড়িয়ে এল, কিন্তু একটুও ঢিলে না দিয়ে কুপিয়ে চলল ও। তারপর খাঁজগুলোর উপরে হাত রেখে, হাঁটুতে ভর করে গর্তটার গা বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে পাঁচিলটার কাছে পৌঁছল। ওটাতে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়া, তারপর গড়িয়ে যাওয়া -- ব্যস, তাহলেই বেঁচে যাবে, কিন্তু পা পিছলে সে আবার পড়ে গেল, বরফে মুখটা জোরে ঠুকে গেল। খুব চোট লেগেছে, কিন্তু তখনো কানে বিমানটির গম্ভীর শব্দ বেজে চলেছে। আবার গর্তটার গা বেয়ে উপরে উঠল, পিছলে পড়ে গেল আবার। তারপর নিজের হাতে-কাটা

খাঁজগুলো খুঁটিয়ে দেখে সেগুলোকে আরো গভীর করতে শুরু করল, উপরের খাঁজগুলোর পাশ আরো ধারালো করল: সেটা করা শেষ হলে উপরে উঠতে লাগল আবার, খুব সাবধানে, ক্ষীণ শক্তি যাতে নিঃশেষ না হয়ে যায়।

বালির পাঁচিলে অসহ্য কষ্টে আড়াআড়িভাবে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে অসহায়ভাবে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল আলেক্সেই। বিমানটি যে দিকে উড়ে গিয়েছে সেদিকে হামাগুড়ি দিয়ে চলল, সেদিকে বনের উপরে সূর্য উঠেছে, বরফ-খেগো কুয়াশা মিলিয়ে যেতে সূর্যের আলোয় গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ স্ফটিকের মত চকচক করছে।

১৩

কিন্তু হামাগুড়ি দিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে আলেক্সেই'র। হাতদুটো কেঁপে অবশ হয়ে আসছে, শরীরের ভার রাখতে পারছে না। কয়েকবার গলন্ত বরফে মুখ ঠুকে গেল। মনে হচ্ছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে, সেটার টান রোখা অসম্ভব। ভয়ানক ইচ্ছে করছে শুয়ে অন্তত আধ-ঘণ্টা জিরিয়ে নিতে, কিন্তু এগিয়ে চলার সংকল্প আজ ক্ষিপ্ততায় পরিণত, আর তাই অবসাদ কাটিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েই চলল আলেক্সেই, পড়ে যাচ্ছে, উঠছে, আবার হামাগুড়ি দিচ্ছে, ব্যথা কিম্বা ক্ষিধের কোন হুঁশ নেই, কিছু দেখতে পারছে না, কামান আর মেসিনগানের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না।

যখন শরীরের ভার হাত আর নিতে পারছে না তখন কনুই'এ ভর দিয়ে এগোবার চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু সেটা বিশেষ অসুবিধাজনক, তাই শুয়ে পড়ে কনুই'এর সাহায্যে গড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। দেখল সেরকম ভাবে এগোতে পারবে। হামাগুড়ি দেবার চেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া সহজতর, খুব পরিশ্রম করতে হয় না তাতে। কিন্তু গড়িয়ে যাওয়াতে মাথা ঘুরছে, মাঝেমাঝে চেতনা লোপ পাচ্ছে। প্রায়ই থেমে উঠে বসে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ওকে, যতক্ষণ পৃথিবী, বন আর আকাশের চর্কিপাক বন্ধ না হয়।

গাছের সারি পাতলা হয়ে এল, এখানে সেখানে ফাঁকা জায়গা, গাছ কাটা হয়েছে সেখানে। শীতের রাস্তার ফালি দেখা যাচ্ছে। নিজের লোকজনদের কাছে পেঁছতে পারবে কিনা, সেটা আর ভাবছে না আলেক্সেই, যতক্ষণ নড়বার শক্তি আছে ততক্ষণ গড়িয়ে গড়িয়ে যাবে, এই তার দৃঢ় সংকল্প।

দুর্বল পেশীতে নিদারুণ শ্রমের চাপে জ্ঞান হারাচ্ছে যখন, তখনো হাতদুটো আর সারা শরীর আপনা থেকেই জটিল ক্রিয়া করে চলেছে, আর বরফের উপরে গড়িয়ে চলেছে ও পূর্বদিকে, কামানের শব্দের দিকে।

সে রাত্রি কী ভাবে কাটল, পরের দিন সকালে খুব বেশী এগোতে পেরেছে কি না, কিছু মনে নেই আলেক্সেই'র। আধো-বিস্মরণের অন্ধকারে সমস্ত কিছু চাপা পড়েছে। রাস্তায় নানা বাধার শুধু অস্পষ্ট স্মৃতি: একটা কেটে-ফেলা পাইনের সোনালী গুঁড়ি, হলুদ রঙের রজন চুঁইয়ে পড়ছে তা থেকে, কাঠের কুঁদোর একটা স্তূপ, করাতের গুঁড়ো আর কুচি চারিদিকে ইতস্তত ছড়ানো, একটা গাছের গুঁড়ি, আড়াআড়িভাবে যেখানে কাটা হয়েছে সেখানে বাৎসরিক আংটাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে...

একটা অস্বাভাবিক শব্দে ওর আধো-বিস্মরণের ঘোর কেটে গেল, জ্ঞান ফিরে আসাতে উঠে বসে চারিদিকে তাকাল সে। বনের একটা বড়ো পরিষ্কার জায়গায় এসে পড়েছে, সূর্যালোকে প্লাবিত জায়গাটা, কাটা গাছে আর কাঠের কুঁদোতে ভর্তি, সেগুলো তখনো ছাঁটা হয়নি। জ্বালানী কাঠের সাজানো স্তূপ ছাড়া ছাড়া দাঁড়িয়ে। দুপুরের সূর্য অনেক উঁচুতে, রজনের, তপ্ত সূচীমুখ ফারের আর স্যাঁতসেঁতে বরফের তীব্র গন্ধ হাওয়ায়, মাটি এখনো গলেনি, অনেক উঁচুতে একটা লার্ক গাইছে সহজ সুরে প্রাণ ঢেলে দিয়ে।

অজানা বিপদের অনুভূতিতে চকিত হয়ে আলেক্সেই ফাঁকা জায়গাটা ভালো করে দেখল। পরিষ্কার জায়গাটা, পরিত্যক্ত গোছের চেহারা নয়। গাছগুলো হালে কাটা হয়েছে, ছাল-না-ছাড়ানো গাছের ডালপালা তখনো টাটকা আর সবুজ, মধুর মত রজন চুঁইয়ে পড়ছে, আর চারিদিকে ছড়ানো গাছের কুচি আর কাঁচা ছাল থেকে তাজা গন্ধ আসছে। তাই ফাঁকা জায়গাটাতে জীবনের সাড়া। হয়ত পরিখা আর ডাগ-আউটের জন্য জার্মানরা এখানে কাঠের কুঁদো ঠিক করছে? তা যদি হয়, পত্রপাঠ এখান থেকে সরে পড়া ভালো, কেননা যে কোন মুহূর্তে কাঠুরিয়ারা এসে পড়তে পারে। কিন্তু শরীরটা তীব্র যন্ত্রণায় বিবশ হয়ে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে, নড়বার শক্তি নেই আলেক্সেই'র।

হামাগুড়ি দিয়ে কি এগিয়ে যাবে? বনে কয়েক দিন কাটিয়ে যে সহজাত বোধ গড়ে উঠেছে সেটা ওকে হুঁশিয়ার করল। নজরে পড়ছে না বটে, কিন্তু বোধ হচ্ছে কে যেন ওকে জানোয়ারের মত একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছে। কে?



বনটা শান্ত, ফাঁকা জায়গার উপরে লার্কের গান, একটা কাঠঠোকরার ফাঁপা ঠকঠক আওয়াজ, কাটা গাছের আনত ডালপালায় লাফিয়ে লাফিয়ে টমটিটগুলো রাগে কিচির মিচির করে পরস্পরকে ডাকছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কে যেন ওকে দেখছে, সমস্ত শরীর দিয়ে আলেক্সেই বুঝতে পারল।

গাছের ডাল ভাঙ্গার শব্দ। চারিদিকে তাকাল আলেক্সেই, নবীন পাইনগাছের ধূসর ঝাড়, ওদের কোঁকড়ান মাথাগুলো হাওয়ায় দুলছে, তার মধ্যে ও দেখল কয়েকটা ডালপালা যেন আলাদাভাবে নড়ছে, অন্যদের সঙ্গে তাল রাখছে না। আর মনে হল ওখান থেকে উত্তেজিত ফিসফিসানি ওর কানে আসছে, মানুষের গলার শব্দ। আবার ওর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল, কুকুরটাকে দেখে যেমন হয়েছিল।

বিমানি পোশাকের বুকপকেট থেকে তাড়াতাড়ি পিস্তলটা বের করে নিল আলেক্সেই। পিস্তলটায় ইতিমধ্যেই মরচে ধরেছে, দুহাতে ঘোড়া ঠিক করতে হল। ঘোড়া বসাবার শব্দে পাইনগুলোর পিছনে লুকনো কে যেন চমকে উঠল। গাছের কয়েকটা মাথা জোরে নড়ে উঠল, যেন কেউ তাদের ধাক্কা দিয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার সবকিছু চুপচাপ।

"কী ওটা, মানুষ না জন্তু?" নিজেকে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই, আর মনে হল গাছের ঝাড়েও কেউ যেন জিজ্ঞেস করছে: "ওটা মানুষ না কি?" কল্পনা, না সত্যিসত্যি গাছের ঝাড়ে রুশ ভাষায় কারো কথা কানে এল? হ্যাঁ, সত্যিই ত রুশ ভাষায়। আর রুশ ভাষা বলেই আলেক্সেই হঠাৎ আনন্দে এত অধীর হয়ে পড়ল যে শত্রু মিত্র কিছু না ভেবেই বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে যেখানে কণ্ঠস্বর শুনেছে সেদিকে দৌড়িয়ে ধপাস করে পড়ে গেল যেন কার ধাক্কায়, বরফে ছিটকে পড়ল পিস্তলটা।

১৪

ওঠবার নিষ্ফল চেষ্টা করে আবার পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল আলেক্সেই, কিন্তু আসন্ন বিপদের বোধে তৎক্ষণাৎ হুঁশ ফিরে এল। পাইনগুলোর পিছনে লুকিয়ে আছে লোকে, কোন সন্দেহ নেই তাতে, ওকে দেখছে তারা, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে।

হাতে ভর দিয়ে উঠে, বরফ থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে মাটি ঘেঁষে দৃষ্টির বাইরে রাখল সেটাকে আলেক্সেই, আবার দেখতে লাগল চারিদিকে। বিপদের

আশঙ্কায় বিস্মরণের ঘোর একেবারে কেটে গিয়েছে। সঠিকভাবে কাজ করছে ওর বিচারশক্তি। কারা ওরা? কাঠুরিয়াগুলো হয়ত, জ্বালানী কাঠ ঠিক করার জন্য এখানে আসতে ওদের জার্মানরা বাধ্য করেছে? হয়ত রুশ ওরা, ঘেরাও হয়েছে ওর মত, আর জার্মান লাইন ভেঙ্গে নিজেদের লোকজনের কাছে যাবার চেষ্টা করছে? কিম্বা আশেপাশের চাষীরা হয়ত? যাই হোক না, ও ত স্পষ্ট শুনেছে কে একজন বলল, "মানুষ একটা!"

হামাগুড়ি দিয়ে হাত অসাড়, পিস্তলটা কাঁপছে; কিন্তু লড়তে প্রস্তুত ও, গুলি তিনটের সদ্ব্যবহার করবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের ঝাড় থেকে উত্তেজিত শিশুসুলভ গলায় কে একজন হাঁকল:

'কে তুমি? জার্মান? ফ্রিটজ্?'

অচেনা কথায় আলেক্সেই হুঁশিয়ার হল, কিন্তু যে ডাকছে সে রুশ কোন সন্দেহ নেই তাতে, আর ওটা যে শিশু সেটাও নিঃসন্দেহ।

শিশুর গলায় আর একজন জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কী করছ এখানে?'

'আর তোমরা কারা?' জানতে চাইল আলেক্সেই, কথা বলেই থেমে গেল, নিজের ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে।

ওর প্রশ্নে গাছগুলোর মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল নিশ্চয়ই, ওখানে যারাই থাকুক না তারা চুপিচুপি অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করল, উত্তেজিতভাবে হাত পা নেড়ে, কেননা ডালপালাগুলো অধীরভাবে নড়ে নড়ে উঠল।

'ধোঁকা আর মেরো না, আমাদের ধাপ্পা দেওয়া অত সহজ নয়! মাইল খানেক দূর থেকে জার্মান দেখলেও চিনতে পারি। তুমি জার্মান?'

'তোমরা কারা?'

'সেটা জানার কী দরকার তোমার? নিখত্ ফেরস্টেইন...'*

'আমি রুশ।'

'মিথ্যে কথা... সত্যি হলে চোখজোড়া উপড়ে ফেলব। ফ্যাশিস্ট তুমি!'

'রুশ আমি, রুশ! আমি বৈমানিক। জার্মানরা আমার বিমানটা পেড়ে ফেলে।'

* বুঝতে পারছি না! (জার্মান ভাষায়)

সাবধানতার কোন বালাই আর রাখল না আলেক্সেই। ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে নিজেদের লোকজনই গাছগুলোর পিছনে, রুশ, সোভিয়েত লোকজন। ওকে বিশ্বাস করছে না ওরা। সেটা স্বাভাবিক। যুদ্ধে লোককে সাবধান করে। আর যাত্রা শুরু করার পর এই প্রথম ওর মনে হল যে শরীরে শক্তির লেশমাত্র নেই, হাতে পায়ে, হাঁটতে পারবে না আর, নড়ার ক্ষমতা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই। গালের গভীর খাঁজ বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

'দেখো, ও কাঁদছে!' গাছের পিছন থেকে একজন বলল। 'এই, কাঁদছ কেন?'

'আমি রুশ, তোমাদের মতই একজন, আমি বৈমানিক...'

'কোন বিমান-ঘাঁটির লোক?'

'কিন্তু তোমরা কারা?'

'সেটা জানতে চাইছ কেন? আমাদের কথার জবাব দাও!'

'মনচালভ বিমান-ঘাঁটির লোক। আমাকে সাহায্য করছ না কেন তোমরা? বেরিয়ে এসো! ওখানে কী ছাই...'

গাছগুলোর পিছনে আবার আরো উত্তেজিত চুপিচুপি পরামর্শ চলল। কথাগুলো আলেক্সেই'র কানে স্পষ্ট এল:

'শুনছিস কী বলছে? বলছে মনচালভ বিমান-ঘাঁটি থেকে এসেছে... হয়ত সত্যি কথা বলছে... আর ও কাঁদছে...' তারপর একজন হাঁকল, 'শোনো, বৈমানিক, পিস্তলটা ফেলে দাও ত! ফেলে দাও বলছি, নইলে আমরা এখান থেকে বেরোব না, পালিয়ে যাব!'

পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল আলেক্সেই। ডালপালাগুলো ফাঁক হয়ে গেল, আর দুটি ছেলে, খুব হুঁশিয়ার, একজোড়া কৌতূহলী টমটিটের মত ঝট করে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, হাত ধরাধরি করে সাবধানে ওর দিকে এল। ওদের মধ্যে যে বড়ো সে ক্ষীণদেহ, চোখ তার নীল, হলদেটে চুল, হাতে একটা কুঠার। অন্যটি ক্ষুদে, লাল চুল, মুখে ফুট ফুট দাগ, চোখজোড়া অদম্য কৌতূহলে জ্বলছে, প্রথমটির পিছনে পায়ে পায়ে আসতে আসতে ফিসফিস করে বলল:

'ও কাঁদছে, সত্যি কাঁদছে! আর হাড় জিরজির করছে। কী অসম্ভব রোগা দেখো!'

তখনো হাতে কুঠার, বড়োটি কাছে এসে প্রকাণ্ড ফেল্টের বুট দিয়ে পিস্তলটাকে আরো সরিয়ে দিল, বুটজোড়া খুব সম্ভব ওর বাবার, তারপর বলল:

'তুমি বলছ তুমি বৈমানিক। কোন দলিলপত্র আছে? দেখাও ত সেগুলো!'

'এখানে কারা, আমাদের লোক না জার্মানরা?' অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই, আর হাসি চাপতে পারল না ও।

'বনের মধ্যে থাকি, কী করে বলব? আমাদের ত কেউ খবর দেয় না,' বড়োটি কূটনীতিজ্ঞের মত জবাব দিল।

গত্যন্তর নেই, টিউনিকের পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করতে হল আলেক্সেইকে। অফিসারের লাল কার্ড, উপরে তারার চিহ্ন, সেটা ছোকরাদের উপরে মন্ত্রের মত কাজ করল। ওদের শৈশব জার্মান অধিকারের সময় বিলুপ্ত হয়েছে, আপনার জন এই সোভিয়েত বৈমানিকের আবির্ভাবে হঠাৎ যেন ফিরে এল সেটা।

'হ্যাঁ, আমাদের লোকেরা এখানে। তিন দিন ধরে এখানে আছে!'

'তোমার এরকম হাড় বেরিয়ে গেছে কেন?'

'...আমাদের লোকে ওদের কী শিক্ষাটাই না দিয়েছে! দারুণ পিটিয়েছে ওদের, পিটোয়নি আর! ভয়ংকর লড়াই চলে এখানে, জব্বর লড়াই! ওদের অনেক লোক মারা গিয়েছে, বিস্তর লোক! সাংঘাতিক ব্যাপার!'

'আর লেজ গুটিয়ে পালাল ওরা! ওদের দেখে হাসি পাচ্ছিল। ওদের একজন কাপড়-কাচার একটা টবে ঘোড়া যুতে কেটে পড়ল। আর জখম দুজন একটা ঘোড়ার লেজ আঁকড়ে ধরল, ঘোড়াটার পিঠে আর একজন চাপল, যেন নবাব। যদি দেখতে ওদের!... কোথায় তোমাকে ওরা নামাল?'

কিছুক্ষণ বকবক করে ছোকরারা কাজে লাগল। বসতি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ওরা থাকে, সেটা জানাল আলেক্সেইকে। আলেক্সেই এত দুর্বল যে ফিরে চিৎ হয়ে আর একটু ভালো করে শোবার ক্ষমতাও নেই। ছোকরাদের সঙ্গে একটা স্লেজ, "জার্মান কাঠের গুদাম" থেকে — ফাঁকা জায়গাটাকে ওরা এই বলে ডাকে জ্বালানী কাঠ নেবার জন্য ওরা ওটা এনেছিল, কিন্তু সেটা এত ছোট যে আলেক্সেইকে তাতে নেওয়া চলে না। আর তাছাড়া গভীর বরফের উপর দিয়ে ওর ভার টেনে নিয়ে যেতেও ওরা পারত না। বড়ো ছেলেটির নাম সেরিওন্‌কা, ছোট ভাই ফেদকাকে সে বলল যত শীগগির পারে গ্রামে গিয়ে লোক ডেকে আনতে, আর ও নিজে রয়ে গেল, জার্মানদের হাতে আলেক্সেই যাতে না পড়ে, উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে সেরিওন্‌কা বলল বটে, কিন্তু আসলে আলেক্সেইকে তখনো ও ঠিক বিশ্বাস করেনি। মনে মনে ভাবল, "কিছুই বলা যায় না। ফ্যাশিস্টগুলো ভয়ানক

সেয়ানা, মরবার ভান ওরা করতে পারে, আর সোভিয়েত বাহিনীর কাগজপত্তরও জোগাড় করতে পারে..." ক্রমশ কিন্তু তার সন্দেহ ঘুচে গেল, তখন সহজভাবে কথা বলতে শুরু করল সে।

পাইন-কাঁটার বিছানায় শুয়ে আলেক্সেই ঝিমোচ্ছে, চোখদুটো আধো-বোজা, অন্যমনস্কভাবে সেরিওন্‌কার বকবকানি শুনছে। বিশ্রামের অবসাদে সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন, তার ঘোরে টুকরো টুকরো কয়েকটা মাত্র কথা তার মনে পেঁাছচ্ছে; আর যদিও কথাগুলোর অর্থ সে ধরতে পারছে না, তবুও মাতৃভাষার শব্দ পরম প্রীতি জোগাচ্ছে ওকে। প্লাভনি গ্রামের লোকেদের উপরে যে দুর্যোগ হঠাৎ ফেটে পড়ে তার কথা পরে সে শোনে।

অক্টোবরের মধ্যেই জার্মানরা এই বনে আর হ্রদ অঞ্চলে এসে পড়ে, তখন বার্চগুলোর পাতায় পাতায় হলদে আভা আর এ্যাসপেনগুলোতে যেন ভয়াবহ লাল আগুন লেগেছে। প্লাভনির ঠিক কাছাকাছি লড়াই চলেনি। গ্রাম থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পশ্চিমে কয়েকটি জার্মান বাহিনী আসে, সবায়ের আগে ট্যাঙ্কের অগ্রগামী মজবুত একটা দল, সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর ছোট একটা দল তাড়াতাড়িতে প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করেছিল, সে দলটিকে নিঃশেষ করে জার্মানরা প্লাভনিতে না ঢুকে পূর্বদিকে এগিয়ে যায়, রাস্তা ছাড়িয়ে একটা বন-হ্রদের আড়ালে গ্রামটা ঢাকা ছিল। বলগয়ে নামের বড়ো রেলওয়ে কেন্দ্রে পেঁাছিয়ে সেটা দখলে আনার তাড়া ছিল জার্মানদের, যাতে পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে, সহর থেকে অনেক দূরে, সারা গ্রীষ্ম আর হেমন্ত ধরে কালিনিন এলাকার লোকেরা, আবালবৃদ্ধবনিতা, নানা বৃত্তি ও পেশার লোকেরা, সহরবাসী আর চাষীরা, দিনরাত কাজ করে যায়, বৃষ্টিতে আর গরমে, মশার কামড়ে, জলার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়, পানীয় জলের অভাব সয়ে, মাটি খুঁড়ে পরিখা আর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। কয়েকশ কিলোমিটার ধরে চলে পরিখার সারি, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, বন আর জলাভূমি হয়ে, হ্রদের পাশ ঘুরে, ছোট ছোট নদী আর স্রোতস্বিনীর তীর ঘেঁষে।

অনেক কষ্ট পেয়েছিল নির্মাতারা, কিন্তু তাদের পরিশ্রম সফল হল। গতির বেগে জার্মানরা কয়েকটা লাইন ভাঙ্গল বটে, কিন্তু শেষটায় এসে তাদের থেমে যেতে হল। এক জায়গায় আবদ্ধ থেকে যুদ্ধ চলল। ব্যূহ ভেঙ্গে জার্মানরা বলগয়েতে পেঁাছতে পারল না; আক্রমণের চাপে আরো দক্ষিণে সরে যেতে হল তাদের, এ এলাকায় তাদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাতে হল।

প্লাভনির বালুকাময় চটচটে জমিতে সাধারণত বেশী ফসল ফলত না, যা ফলত সেটা আর বনের হ্রদে ধরা মাছ দিয়ে চাষীরা চালিয়ে নিত। গ্রামে লড়াই হয়নি বলে ওরা খুসি। জার্মানদের হুকুম মেনে ওরা ওদের যৌথখামারের সভাপতির নাম বদলে গ্রামের মোড়ল করল, কিন্তু যৌথখামার হিসেবেই কাজ করে চলল, ওদের আশা, ফ্যাশিস্টরা চিরকাল ত সোভিয়েত ভূমিতে গেড়ে বসে থাকবে না, ঝড়ঝঞ্ঝা কেটে যাওয়া না পর্যন্ত নিজেদের দূর নিরাপদ স্থানে শান্তিতে ওরা থাকতে পারবে। কিন্তু সৈনিকদের ধূসর পোশাক-পরা জার্মানদের পিছু পিছু এল অন্যরা, কালো পোশাক গায়ে, টুপিতে খুলি আর হাড়ের আড়াআড়ি চিহ্ন। প্লাভনির অধিবাসীদের হুকুম করা হল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জার্মানীতে স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য পনেরো জন স্বেচ্ছাকর্মী যোগাতে হবে, আদেশ অমান্য করলে দারুণ সাজা মিলবে। স্বেচ্ছাকর্মীদের জমায়েৎ হতে হবে গ্রামের প্রান্তে একটি বাড়িতে, সেটা যৌথখামারের অফিস আর মাছের গুদামও বটে, প্রত্যেককে অন্তর্বাস, একটা করে চামচ, ছুরি আর কাঁটা আর দশ দিনের খাবার নিয়ে হাজির হতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কেউ হাজির হল না। এটা বলা অবশ্য দরকার যে ঠেকে-শেখা কৃষ্ণবাস জার্মানরা খুব আশা করেনি যে কেউ হাজির হবে। গ্রামবাসীদেরর উচিত শিক্ষা দেবার জন্য জার্মানরা যৌথখামারের সভাপতি, অর্থাৎ গ্রামের মোড়ল, আর কিণ্ডারগার্টেনের প্রৌঢ়া তত্ত্বাবধায়িকা ভেরনিকা গ্রিগরিয়েভনা, যৌথখামার দলের দুটি পাণ্ডা আর হাতের কাছে-পাওয়া আরো দশজন চাষীকে ধরে গুলি করে মারল। হুকুম করল, ওরা পড়ে থাকবে, কবর দেওয়া হবে না, আর বলল যে পরের দিন নির্দিষ্ট জায়গায় স্বেচ্ছাকর্মীরা না এলে গ্রামের সমস্ত লোকেরই একই দশা হবে।

কেউ এল না। পরের দিন সকালে ঝঞ্ঝা বাহিনীর সণ্ডারকমাণ্ডোর হিটলারীরা গ্রামে ঘুরল, কিন্তু কোন বাড়িতে লোক নেই। জনপ্রাণী নেই, বুড়ো কিম্বা জোয়ান, কেউ নয়। ভিটেমাটি, বহু বছরের পরিশ্রমে সঞ্চিত জিনিসপত্র সব আর গরুবাছুরের অধিকাংশ ছেড়ে দিয়ে লোকেরা এই অঞ্চল-সুলভ রাত্রির ঘন কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, চিহ্নমাত্র রেখে যায়নি। গ্রামের সবাই, কেউ বাদ পড়েনি, আঠারো কিলোমিটার দূরে বনের গভীরে একটি খোলা জায়গায় গেল। থাকবার জন্য পরিখার মত খোঁদল খুঁড়ে, পুরুষেরা পার্টিজানদের দলে যোগ দিতে চলে গেল, মেয়েরা আর শিশুরা বসন্ত পর্যন্ত কোনক্রমে কাটানোর জন্য রয়ে গেল। সণ্ডারকমাণ্ডো

বিদ্রোহী গ্রামটিকে পুড়িয়ে দিল, এ জেলার অধিকাংশ গ্রামেরই একই দশা হয়েছিল, জার্মানরা জেলাটাকে মরা এলাকা বলে ডাকত।

'... আমার বাবা ছিলেন যৌথখামারের সভাপতি, ওরা ওকে গ্রামের মোড়ল বলে ডাকত,' বলল সেরিওন্‌কা, কথাগুলো আলেক্সেই'র কাছে পেঁৗছল যেন দেয়ালের ওপাশ থেকে। 'বাবাকে মেরে ফেলল ওরা। আমার বড়ো ভাইকেও মেরে ফেলল। সে পঙ্গু ছিল, একটা মাত্র হাত ছিল। হাতটা খামারের ঢেঁকিতে ভেঙ্গে যাওয়াতে কেটে ফেলতে হয়। ষোলোজনকে ওরা খুন করে... নিজের চোখে দেখেছি। জার্মানরা আমাদের সবাইকে বেরিয়ে এসে দেখতে বাধ্য করে। বাবা চেঁচিয়ে ওদের গালাগালি দেন, "এর সাজা তোদের মিলবে, বদমায়েস কোথাকার! মুখে রক্ত উঠে মরবি তোরা!"

বিষণ্ণ শ্রান্ত বড়ো বড়ো চোখ আর সোনালী চুল ছেলেটির কথা শুনতে শুনতে আলেক্সেই'র মন অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ভরে গেল। মনে হল জমাট কুয়াশায় ভেসে চলেছে। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে কয়েক দিন, অসীম ক্লান্তিতে শরীর আচ্ছন্ন। একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না আলেক্সেই, আর নিজেরি বিশ্বাস হচ্ছে না যে মাত্র দুঘণ্টা আগে পর্যন্ত সে চলেছিল।

'তাহলে তোমরা বনে থাক?' প্রায় শোনা যায় না এমন ক্ষীণকণ্ঠে ও বলল, ঘুমের ঘোর কষ্টে কাটিয়ে উঠে।

'থাকিই ত! আমরা তিনজন এখন — ফেদকা, মা আর আমি। আমার একটি বোন ছিল, নিউশ্‌কা নাম। শীতকালে মারা যায়। সমস্ত শরীর ফুলে ওঠে, তারপর মারা যায়। আমার ছোট্ট ভাইটা, সেও মারা যায়। আর এখন আমরা তিনজন... জার্মানরা আর ফিরে আসছে না, কী বলো? কী মনে হয় তোমার? দাদামশাই, তিনি এখন আমাদের সভাপতি, তিনি বলেন যে ওরা আর ফিরবে না; তিনি বলেন, "কবর থেকে মড়ারা আর ফিরে আসবে না।" কিন্তু মা, বড্ড ভয় মা'র। পালিয়ে যেতে চান তিনি। বলেন, ওরা ফিরে আসতে পারে... ওই দেখো! দাদু আর ফেদকা আসছে।'

ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তে লাল-চুল ফেদকা দাঁড়িয়ে আলেক্সেইকে দেখাচ্ছে; ওর সঙ্গে একজন কাঁধ-বসা দীর্ঘাকৃতি চওড়া বুড়ো, পরনে বাড়িতে-বোনা ছেঁড়াখোঁড়া, পাতলা বাদামী রঙের কোট, দড়ি দিয়ে সেটা কোমরে বাঁধা, মাথায় জার্মান অফিসারের উঁচু টুপি।

মিখাইল দাদু, ছেলেরা এই নামেই তাঁকে ডাকে। গ্রামের অনাড়ম্বর

আইকনে আঁকা সেণ্ট নিকলাসের মত দয়ালু মুখ, চোখদুটো স্বচ্ছ উজ্জ্বল, শিশুর মত, নরম পাতলা লম্বা দাড়ি শাদা হয়ে গিয়েছে। আলেক্সেইকে নানা রঙের তাপ্পি দেওয়া ভেড়ার চামড়ার একটা পুরোনো কোটে তিনি জড়ালেন, তার হালকা ক্ষীণ দেহ তুলতে তুলতে সরল বিস্ময়ে বারবার বললেন:

'আহা বেচারা! তুমি ত শুকিয়ে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছ! একেবারে কঙ্কালসার! যুদ্ধে লোকের কী না হচ্ছে! দুঃসময় পড়েছে।'

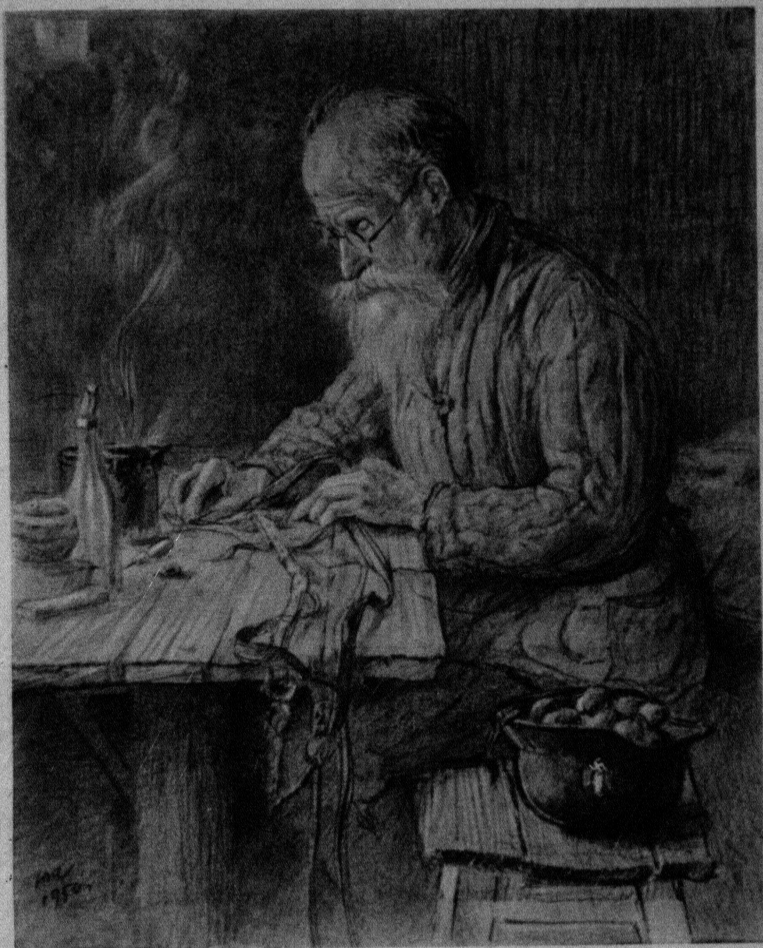
যেন সদ্যজাত শিশুকে নাড়াচাড়া করছেন এমন ভাবে সাবধানে শ্লেজে শোয়ালেন আলেক্সেইকে, দড়ি দিয়ে বাঁধলেন তাকে, এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিজের কোট খুলে পাট করে ওর মাথার নিচে রাখলেন। তারপর শ্লেজের সামনে গিয়ে মোটা কাপড়ে তৈরী ছোট একটা কলারে নিজেকে যুতে, দুটো দড়ি দুটো ছেলেকে দিয়ে তিনি বললেন, 'ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!' তিনজনে গলন্ত বরফের উপর দিয়ে শ্লেজটাকে টেনে নিয়ে চলল, বরফ আটকে ধরছে পা, কিরকির করছে, পায়ের চাপে বসে যাচ্ছে।

১৫

পরের দু তিনদিন আলেক্সেই'র মনে হল যেন জমাট উষ্ণ কুয়াশায় আবৃত সে, সেটা ভেদ করে চারিদিকে কী হচ্ছে তার শুধু ভাসা-ভাসা ছবি তার সামনে আসছে। বাস্তব মিশে গেল বিকারগ্রস্ত কল্পনায়, বেশ কিছু দিন না কাটার আগে প্রকৃত ঘটনাগুলোকে পূর্বাপরভাবে সাজাতে সে পারল না।

বনের গভীরে ফেরারীরা থাকে। মাটিতে খোঁড়া থাকবার জায়গাগুলো পাইনের ডালপালা দিয়ে ছাওয়া, বরফে এখনো ঢাকা, প্রায় চোখে পড়ে না। ধোঁয়া যখন ওঠে তখন মনে হয় সটান মাটি থেকে উঠছে। যেদিন ওখানে পৌঁছল আলেক্সেই সেদিন হাওয়া বন্ধ, কনকনে ঠাণ্ডা, শ্যাওলায় ধোঁয়া লেগে আছে, গাছে গাছে এঁকেবেঁকে চলেছে ধোঁয়া, তাতে ওর মনে হল যে নিভন্ত দাবাগ্নিতে সমস্ত জায়গাটা ঘেরা।

যখন খবর গেল যে একজন সোভিয়েত বৈমানিক কেমন করে কেউ জানে না এখানে এসে পড়েছে, মিখাইল তাকে নিয়ে আসছে, আর ফেদকার ভাষায়, তাকে দেখতে ঠিক কঙ্কালের মত, তখন ওখানকার বাসিন্দারা সবাই দলে দলে বেরিয়ে এল; বেশীর ভাগই মেয়ে আর বাচ্চা, কয়েকজন মাত্র বুড়ো। গাছের মাঝখান দিয়ে দেখা গেল "গ্রয়কা"টা আসছে, মেয়েরা দৌড়িয়ে



গেল সেদিকে, দঙ্গল-করা বাচ্চাদের হটিয়ে দিয়ে চারদিক থেকে শ্লেজটাকে ঘিরে ফেলল, কাঁদতে কাঁদতে সেটাকে নিয়ে চলল নিজেদের খোঁদলে। সবায়ের জামাকাপড় ছেঁড়াখোঁড়া, সবাই সমানভাবে বুড়িয়ে গিয়েছে মনে হয়। খোঁদলের চুল্লীর ধোঁয়া আর ঝুলে মুখগুলো সব কালো, কালো চামড়ায় কারো কারো চোখ আর দাঁত ঝকঝকে শাদা দেখাচ্ছে, শুধু তাই থেকে আঁচ করা সম্ভব যে তাদের বয়স কম।

'মেয়েদের নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল! তোমরা এখানে ভিড় করছ কেন? তামাশা পেয়েছ না কি?' কলারটা জোরে টেনে মিখাইল দাদু রেগে বললেন। 'দয়া করে পথ ছেড়ে দাও ত! হায় ভগবান, এরা সবাই একেবারে ভেড়ার মত! বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে!'

আলেক্সেই'র কানে গেল মেয়েদের ভিড়ে কারা যেন বলছে:

'কী অসম্ভব রোগা! সত্যি সত্যি কঙ্কালের মত দেখতে! নড়াচড়া করছে না একেবারে। বেঁচে আছে ত?'

'ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে... কী হয়েছে ওর? কী রোগা, কী অসম্ভব রোগা!'

তারপর বিস্ময়সূচক উক্তি সব থেমে গেল। অজানা কিন্তু ভয়াবহ কত অভিজ্ঞতা বৈমানিকটিকে নিশ্চয়ই ভুগতে হয়েছে, তার কথা ভেবে মেয়েরা বিশেষভাবে বিচলিত হল। বনের ধার দিয়ে শ্লেজটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পাতাল গ্রামটি কাছে এসে পড়েছে যখন তখন কোন খোঁদলে আলেক্সেইকে রাখা হবে সেই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হল।

'আমার খোঁদলটা খটখটে, বালিতে ভরা, বেশ হাওয়া আসে... তাছাড়া একটা চুল্লীও আছে,' ছোটখাটো, গোলমুখ একটি মেয়ে বলল, চোখদুটো চটুল, চোখের শাদা ভাগটা তরুণ নিগ্রোর চোখের মত চিকচিকে।

'চুল্লী ত আছে কিন্তু তোমরা কজন একসঙ্গে থাক, বলো ত! গন্ধে ভূত পালায়!.. মিখাইল, ওকে আমার ঘরে নিয়ে চলো। আমার তিনটি ছেলে সোভিয়েত ফৌজে, আর আমার কিছু ময়দাও আছে। ওকে চাপাটি বানিয়ে দেব!'

'না, না, ওকে আমার ঘরে রাখো! অনেক জায়গা আছে। আমরা মাত্র দুজন, অনেক জায়গা আছে। চাপাটিগুলো পাঠিয়ে দিও, যেখানে হোক খেলেই হল। ক্সিউশা আর আমি ওকে দেখাশোনা করব, তুমি নিশ্চিত

থাকতে পার। আমাদের কিছু জমা নোনা মাছ আর ব্যাঙের ছাতা আছে... ওকে মাছ রান্না করে দেব আর ব্যাঙের ছাতার ঝোল...'

'ও ত মরতে বসেছে, মাছ খেয়ে কী লাভ হবে? ওকে আমাদের আস্তানায় রাখো, দাদু, আমাদের একটা গরু আছে, দুধ খেতে পারবে ও!'

কিন্তু মিখাইল স্লেজ টেনে নিজের আস্তানায় নিয়ে গেল, পাতাল গ্রামটির মাঝামাঝি জায়গায় সেটা।

...আলেক্সেই'র মনে আছে মাটির নিচে ছোট, ময়লা একটি খোঁদলে তক্তার পাটাতনে সে শুয়েছিল, দেয়ালে-লাগানো ধোঁয়ায় মলিন কাঠির আগুন ফটফট করে জ্বলছে আর আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরিয়ে আসছে। তার আলোয় দেখা যাচ্ছে পোঁতা খুঁটিতে ভর দিয়ে বসানো জার্মান মাইনের বাক্স দিয়ে তৈরী একটা টেবিল, তার চারধারে কাঠের কুঁদো কয়েকটা টুলের কাজ দিচ্ছে; কালো রুমাল মাথায়, পরনে পুরোনো জামাকাপড়, পাতলা চেহারার একটি মেয়ে টেবিলের উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে — মেয়েটি হল ভারভারা, মিখাইল দাদুর কনিষ্ঠা পুত্রবধূ -- আর স্বয়ং দাদুটির পাতলা পক্ককেশ মাথা।

খড়ের ডোরা-কাটা তোষকে আলেক্সেই শুয়ে, ওর গায়ে তখনো তাপ্পি-মারা ভেড়ার চামড়ার কোটটা জড়ানো, তা থেকে টক টক, প্রীতিকর ঘরোয়া গন্ধ বেরোচ্ছে। আর যদিও সমস্ত শরীরে লাঠিপেটার মত ব্যথা, আর পাদুটো এমন জ্বলছে যেন গনগনে ইটের উপরে রাখা হয়েছে, তবুও এভাবে নড়াচড়া না করে শুয়ে থাকতে বেশ লাগছে; ও জানে ভয়ের আর কোন কারণ নেই, চলতে কি ভাবতে হবে না, হামেশা হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে না।

খোঁদলের কোণায় চুল্লী, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে ধূসর সজীব পাকে পাকে; আলেক্সেই'র মনে হল শুধু ধোঁয়া নয়, টেবিলটা, সব সময় কিছু না কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত মিখাইল দাদুর পাকা মাথাটি আর ভারভারার পাতলা শরীরও ভাসছে, দুলছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজল আলেক্সেই। চট-দেওয়া দরজা থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আসাতে জেগে উঠে আবার চোখ খুলল। টেবিলের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। টেবিলে একটি ব্যাগ রেখে তার উপরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, যেন ভাবছে ওটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কিনা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি ভারভারাকে বলল:

'যুদ্ধের আগে থেকেই কিছু ফেরিনা আমার কাছে আছে। কসতিউন্‌কার জন্যে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু ওর ত আর কিছুরই দরকার নেই

এখন। এটা নাও, তোমার অতিথিকে রান্না করে দিও। বাচ্চাদের খাবার এটা, ঠিক এরকম জিনিস ওর এখন খাওয়া উচিত।'

ফিরে চলে গেল মেয়েটি, খোঁদলের সবাই ওর শোকে শোকার্ত। আর একজন কিছু জমা নোনা মাছ নিয়ে এল, আর কেউ আনল চুল্লীতে সেঁকা চাপাটি, সদ্য-সেঁকা রুটির উষ্ণ টক গন্ধে খোঁদল ভরে গেল।

সেরিওন্‌কা আর ফেদকা এল। চাষীসুলভ গাম্ভীর্যে ফৌজী টুপি সরিয়ে সেরিওন্‌কা বলল, 'সুপ্রভাত,' টেবিলে তামাকের গুঁড়ো আর ভূষি-লাগা চিনির দুটো ডেলা রাখল।

'চিনিটা মা পাঠিয়েছেন। আপনার পক্ষে চিনি ভালো, এটা খাবেন,' সেরিওন্‌কা বলল। তারপর মিখাইলের দিকে ঘুরে কাজের কথা বলার সুরে জানাল, 'সে-জায়গাটায় আবার গিয়েছিলাম। একটা লোহার ঘটি, প্রায় আস্ত দুটো শাবল, আর কুঠারের গোড়া একটা পেয়েছি। ওগুলো কাজে লাগতে পারে।'

ভাইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে ফেদকা লোভী দৃষ্টিতে চিনির দিকে তাকিয়ে আছে, বেশ শব্দ করেই জিভ চাটল সে, নাল গড়িয়ে পড়ছে।

পরে এসব কথা ভাবার সময় আলেক্সেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিল গ্রামে তার জন্য আনা টুকিটাকি জিনিসগুলোর মূল্য কতখানি, গ্রামের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী সেই শীতে অনাহারে মারা যায়, এমন কোন ঘর ছিল না যেটি একটি, এমন কি দুটি প্রিয়জনের জন্য শোকার্ত নয়।

'সত্যি, মেয়েদের মত লোক হয় না! কী বলছি শুনছ আলিওশা, আমি বলছি যে রুশী মেয়েদের তুলনা হয় না। ওদের হৃদয় নাড়া দিলেই সর্বস্ব দিয়ে দেবে, দরকার হলে জানও দেবে। আমাদের মেয়েরা এইরকম। ঠিক বলছি না?' মেয়েরা আলেক্সেইর জন্য জিনিস আনলে সেগুলো নিতে নিতে মিখাইল দাদু বলতেন, তারপর হাতের কাজে আবার মন দিতেন, কাজ সব সময় লেগে আছে — ঘোড়ার সাজ কিম্বা একজোড়া ক্ষয়ে-যাওয়া ফেল্টের জুতো সারাচ্ছেন। 'তাছাড়া কাজেও আমাদের মেয়েরা ছেলেদের সমান! সত্যি কথা বলতে ওরা দুএকটা জিনিসে তালিম দিতে পারে আমাদের! শুধু ওদের উগ্র বচন আমার ভালো লাগে না, ওরা আমাকে নাজেহাল করে ছাড়বে, এই মেয়েগুলো আমাকে নাজেহাল করে মারবে, সত্যি বলছি! যখন আমার আনিসিয়া মারা গেল তখন, আমি পাপী, মনে মনে ভাবলাম, "ভগবানকে ধন্যবাদ, একটু শান্তিতে থাকতে পারব এখন!"

কিন্তু জানো, সেটা ভাবার জন্য ভগবান আমাকে সাজা দিলেন। আমাদের সব মরদ, ফৌজে যাদের নেওয়া হয়নি, জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য পার্টিজানদের দলে গেল তারা, আর আমি কৃতকর্মের জন্য পড়ে রইলাম মেয়েদের পান্ডা হিসেবে, ভেড়ার দলে ছাগ-সর্দারের মত!.. আমার কপাল খারাপ, সত্যি বলছি!'

এই বনের বসতিতে অনেক কিছু দেখে আলেক্সেই অত্যন্ত অবাক হল। প্লাভনির অধিবাসীদের সবকিছু, বহু পুরুষের শ্রমে অর্জিত সবকিছু জার্মানরা কেড়ে নিয়েছে -- বাড়িঘরদোর, জিনিসপত্র, চাষের সরঞ্জাম, গরুবাছুর, হাঁড়িকুঁড়ি, জামাকাপড়, আর এখন তারা বহুকষ্টে বনে সময় কাটাচ্ছে, ফ্যাশিস্টরা ওদের দেখে ফেলবে তার ভয় হামেশা রয়েছে। অনাহারে ওরা দিন কাটাচ্ছে, শীতে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু যৌথখামার ভেঙ্গেচুরে যায়নি; বরঞ্চ যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা ওদের আরো সংহত করেছে। এমন কি খোঁদলগুলো পর্যন্ত ওরা যেমন-তেমন ভাবে করেনি, খামারের দল অনুযায়ী যৌথভাবে তৈরী করে সেগুলোতে প্রবেশ করে। জামাইকে জার্মানরা হত্যা করার পর যৌথখামারের সভাপতির কাজের ভার নেবার পর মিখাইল দাদু বনেও যৌথখামারের সমস্ত রীতিনীতি পুরোপুরি মেনে চলেন। এখন তাঁর পরিচালনায় আদিম অরণ্যের গভীরে এই গুহা-গ্রামের অধিবাসীরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে বসন্তের জন্য তৈরী হচ্ছে।

গ্রাম থেকে পালিয়ে আসার সময় যতটুকু শস্য বাঁচাতে পেরেছিল সবটুকু, খুদকুঁড়ো পর্যন্ত কিষাণীরা অনাহার সত্ত্বেও সাধারণ খোঁদলে জমা করে। জার্মানদের হাত থেকে কয়েকটি গরু বাঁচানো গিয়েছিল, তাদের বাছুর হলে অতি যত্নে তাদের রাখা হয়। উপবাস করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু যৌথ সম্পত্তি এই গরুবাছুরগুলোকে ওরা হত্যা করেনি। মৃত্যুর পরোয়া না করে ছেলেরা পুরোনো, ভস্মীভূত গ্রামে গিয়ে ছাই'এর গাদায় হাতড়ে খুঁজে আগুনের আঁচে নীল কয়েকটা লাঙলের ফলা পায়। পাতাল গ্রামে নিয়ে এসে যেগুলো ব্যবহারযোগ্য সেগুলোতে কাঠের বাঁট লাগিয়ে নেয়। বসন্তে গরু যুতে লাঙল দেবার জন্য মেয়েরা চট থেকে জোয়াল বানায়। পালা করে হ্রদে মেয়েরা মাছ ধরে, এইভাবে শীতকালে সারা গ্রামের আহার্য জোগাড় করে তারা।

মেয়েদের উদ্দেশ্যে মিখাইল দাদু গজগজ, গরগর করতেন; যৌথখামারের কোন বিষয় নিয়ে ওরা ওঁর খোঁদলে অনেকক্ষণ ধরে রেগেমেগে ঝগড়া করছে,

বিষয়টির তাৎপর্য কি সেটা আলেক্সেই'র অজানা; কানে আঙুল দিতেন মিখাইল দাদু, ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলে তীক্ষ্ণ জিল গলায় চীৎকার করে মেয়েদের বকতেন বটে, কিন্তু ওদের গুণের তারিফ করতে ছাড়তেন না, নির্বাক শ্রোতাটির নিরীহতার সুযোগ নিয়ে "নারীজাতিকে" প্রশংসা করে আকাশে তুলতেন তিনি।

'কিন্তু ব্যাপারটি কী বলো ত, আলিওশা ভায়া,' বলতেন মিখাইল। 'মেয়েরা সব সময়ে যে-কোন জিনিস দুটো হাত দিয়ে আঁকড়ে থাকে। ঠিক বলছি না? কেন ওরকম করে? কিপটে বলে? একেবারেই নয়। জিনিসটা তাদের দরকার বলে ওরকম করে। বাচ্চাদের ওরাই ত খাওয়ায়, যাই বলো না কেন, সংসার ত ওরাই চালায়। এখানে কী ঘটেছিল শোনো এবার। কেমন ভাবে আমরা থাকি দেখছ ত, প্রত্যেকটি খুদ হিসেব করে চলি। আমরা না খেয়ে সময় কাটাচ্ছি, সত্যি কথা। ব্যাপারটা জানুয়ারী মাসে ঘটে। একদল পার্টিজান হঠাৎ হাজির। আমাদের গ্রামের লোক নয়, তারা ত ওলেনিনের কাছে কোথায় লড়ছে শুনেছিলাম। এরা আমাদের অজানা, রেলওয়ে থেকে এসেছিল। হঠাৎ এসে পড়ে আমাদের বলে, "ক্ষিধেয় আমরা মরে যাচ্ছি।" কী হল বলো ত? পরের দিন মেয়েরা ওদের ঝোলা খাবারে বোঝাই করে দিল, যদিও নিজেদের বাচ্চারা না খেতে পেয়ে ফুলে উঠেছে, হাঁটবার ক্ষমতাও তাদের নেই। কী মনে হয়? ঠিক বলছি?.. মনে ত হয় ঠিক বলছি। যদি বড়ো গোছের জেনারেল হতাম, জার্মানদের ভাগিয়ে দেবার পর আমাদের সেরা সৈনিকদের জড়ো করে, সার বেঁধে মেয়েদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতাম ওদের সেলাম করে মার্চ করে যাও। ঠিক তাই করতাম!..'

বুড়োর বকবকানি ঘুম-পাড়ানো ছড়ার মত কাজ করত, তিনি কথা বলে চলেছেন, আলেক্সেই মাঝেমাঝে ঘুমিয়ে নিত। মাঝেমাঝে অবশ্য ওর আগ্রহ হত পকেট থেকে চিঠিপত্তর আর মেয়েটির ছবি বের করে মিখাইলকে দেখায়, কিন্তু নড়বার শক্তি ছিল না ওর। কিন্তু মিখাইল দাদু মেয়েদের প্রশংসা শুরু করলে আলেক্সেই'র মনে হত টিউনিকের কাপড় ভেদ করে চিঠিগুলোর উত্তাপ অনুভব করতে পারছে।

টেবিলের ধারে বসে থাকত মিখাইল দাদুর নির্বাক পুত্রবধূ, সব সময়ে কিছু না কিছু সে করছে। প্রথম প্রথম ওকে বৃদ্ধা ভেবেছিল আলেক্সেই, দাদুর স্ত্রী বুঝি, কিন্তু পরে দেখল যে ওর বয়স বিশ-বাইশের বেশী হতে পারে না। মেয়েটি লঘুগতি, সুঠাম সুন্দর; আলেক্সেই লক্ষ্য করল যে যখনি

মেয়েটি তার দিকে তাকায় তখনি ভীত উৎকণ্ঠিত একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ওর বুক কেঁপে ওঠে, ঢোক গেলার মত। রাত্রে মাঝেমাঝে, ঘাসের পলতেটা নিভে গিয়েছে, আর খোঁদলের ধোঁয়াটে অন্ধকারে ডাকছে ঝিঁঝিঁপোকাটা — ভস্মীভূত গ্রামে ওটাকে পেয়ে মিখাইল দাদু আস্তিনে করে নিয়ে আসেন, সঙ্গে আনেন কয়েকটা পোড়া বাসন যাতে জায়গাটা আপনার মনে হয় ওটার — তখন আলেক্সেই'র মনে হত অন্য কাঠের পাটাতনে কে যেন চাপা গলায় কাঁদছে আর বালিশ কামড়ে কান্নার শব্দ চাপার চেষ্টা করছে।

১৬

মিখাইল দাদুর ওখানে থাকার তৃতীয় দিন সকালে বৃদ্ধ বেশ জোর দিয়ে আলেক্সেইকে বললেন:

'উকুনে ভরে গিয়েছ তুমি, আলিওশা, সত্যি বলছি! গোবর-পোকার মত। আর গা চুলকানো ত তোমার পক্ষে মুশকিল। কী করব শোনো, তোমাকে স্নান করিয়ে দেব। কী বলো?.. ভাপে নাইয়ে দেব। তাহলে চমৎকার লাগবে। তোমাকে ধুয়ে হাড়গুলোতে একটু সেঁক দিতে হবে। যা ভোগান্তি তোমার গিয়েছে, স্নান করলে ভালোই হবে। কী বলো? ঠিক বলছি না?'

স্নানের বন্দোবস্ত করতে শুরু করলেন মিখাইল দাদু। কোণের চুল্লীর আগুন এত গনগনে করে তুললেন যে চুল্লীর পাথরগুলো চড়চড় করতে লাগল। খোঁদলের বাইরে বড়ো করে আগুন জ্বালানো হল, আলেক্সেই শুনল সেখানে একটা বড়ো গোছের পাথর গরম করা হচ্ছে। পুরোনো একটা কাঠের টব জলে ভর্তি করল ভারিয়া। মেঝেতে বিছোনো হল সোনালী খড়। তারপর মিখাইল দাদু খালি গায়ে, শুধু আণ্ডারউইয়ার পরে, কিছু ক্ষারের জিনিস একটা ছোট কাঠের বালতিতে তাড়াতাড়ি গুলে নিলেন, গাছের ভিতরের ছাল দিয়ে তৈরী তোষকের এক টুকরো কেটে স্নানের সাজ বানানো হল। খোঁদলটা এত তেতে উঠল যে ছাত থেকে টপটপ করে ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা পড়তে লাগল, তখন বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে লোহার পাতে করে গনগনে লাল পাথরটা নিয়ে এলেন। টবে ফেললেন পাথরটা। ছাত পর্যন্ত ঝট করে উঠল বাষ্পের পুঞ্জ, ছড়িয়ে পড়ল তার নিচে, তারপর

বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেড়ার কুঞ্চিত লোমের মত হয়ে গেল। কিছু দেখা যাচ্ছে না বাস্পের কুয়াশায়, কিন্তু আলেক্সেই বুঝল যে সুদক্ষ হাতে বৃদ্ধ তার জামাকাপড় খুলে নিচ্ছেন।

শ্বশুরকে সাহায্য করছে ভারিয়া। এত গরম যে সে তুলো-ভরা কোট আর মাথার রুমাল খুলে ফেলল। ছেঁড়াখোঁড়া রুমালের নিচে যার অস্তিত্বের কথা প্রায় ভাবা যেত না সেই চুলের ভারী গোছা ছড়িয়ে পড়ল তার পিঠে; পাতলা চেহারা, লঘু পা, বড়ো বড়ো চোখ তার, হঠাৎ ধর্মভীরু একটি বৃদ্ধা থেকে যুবতীতে রূপান্তরিত হল ভারিয়া। এত অপ্রত্যাশিত এই রূপান্তর যে আলেক্সেই নিজের নগ্নতায় লজ্জিত বোধ করল, এতদিন সে ভালো করে ভারিয়াকে দেখেনি একবার।

'কিছু ভেবো না, আলিওশা! কিছু ভেবো না,' মিখাইল দাদু আশ্বাস দিয়ে বললেন। 'নিরুপায়, তোমার এ কাজটা করতেই হবে আমাদের! শুনেছি ফিনল্যাণ্ডে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে স্নান করে। কী? সত্যি নয় সেটা? হয়ত আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু ভারিয়া, এখন ত ও হাসপাতালের নার্সের মত একজন, আহতকে দেখাশোনা করছে, লজ্জা পাবার কিছু নেই। ওকে ধর ত ভারিয়া, সার্টটা খুলে নিই। হায় ভগবান, সার্টটা যে একেবারে পচে গিয়েছে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে!'

তরুণীটির বড়ো কালো চোখে বিভীষিকার ছাপ আলেক্সেই দেখল। ভাপের নড়ন্ত পর্দা ভেদ করে নজরে পড়ল নিজের শরীর, তার বিপর্যয়ের পর এই প্রথম। সোনালী খড়ে শোয়া একটা মানুষ, চর্মসার কঙ্কাল, হাঁটুর গোছ বেরিয়ে আছে, সংকীর্ণ কুক্ষি, পেট একেবারে বসে গিয়েছে, পাঁজরার হাড় ফুটে উঠেছে।

বৃদ্ধ বালতিতে ক্ষারের জল ঘুলিয়ে, গাছের ছালের স্পঞ্জ পাঁশুটে তেলা জলে ডুবিয়ে আলেক্সেই'র শরীরের উপরে সেটা তুলে ধরলেন। উষ্ণ বাস্পের মধ্যে চোখে পড়ল খড়ের উপরে শায়িত তার ক্ষীণদেহ, আর স্পঞ্জশুদ্ধ হাত আর নামাতে পারলেন না।

'হায় ভগবান,' তিনি বলে উঠলেন। 'তোমার দারুণ দুর্দশা দেখছি, আলিওশা! তোমার অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়! কী? জার্মানদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছ বটে, কিন্তু তুমি কি...' ভারিয়া পিছন থেকে আলেক্সেইকে ধরে রেখেছিল, হঠাৎ তার দিকে সক্রোধে ঘুরে বৃদ্ধ বললেন, 'উলঙ্গ একটা মানুষের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছো কেন, সরম নেই

নাকি! ঠোঁট কামড়াচ্ছ কেন? তোমরা মেয়েরা সবাই সমান! আর আলেক্সেই, কিছু ভেবো না তুমি, মাথা ঘামাবার কিছু নেই! যমকে কাছ ঘেঁষতেই দেব না আমরা, কিছুতেই দেব না! তোমাকে সারিয়ে তুলবই, একেবারে চাঙ্গা করে দেব, বিশ্বাস করো আমার কথা!'

সযত্নে, বেশ দক্ষভাবে, যেন শিশুকে স্নান করাচ্ছেন এমন ভাবে আলেক্সেইকে ক্ষারজল দিয়ে ধোয়ালেন তিনি, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে জল ঢেলে দিলেন, এত জোরে গা দলাই-মলাই করলেন যে খোঁচা খোঁচা পাঁজরার হাড়ের উপরে পিছলিয়ে হাতদুটো সত্যি সত্যি মড়মড় করে উঠল।

নিঃশব্দে ভারিয়া তাঁকে সাহায্য করে গেল।

ওকে বকবার কোন কারণ ছিল না বৃদ্ধের। হাতে ভর-দেওয়া অসহায়, ভয়াবহ জীর্ণ দেহটির দিকে তাকায়নি সে। চেষ্টা করছিল না তাকাতে, কিন্তু বাস্পের মধ্য দিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখনি আলেক্সেই'র পা কিম্বা হাত চোখে পড়ছিল তখনি দৃষ্টিতে আসছিল বিভীষিকার আভাস। ভারিয়া কল্পনা করতে শুরু করল যে বৈমানিকটি হঠাৎ এসে-পড়া আগন্তুক নয়, ওর মিশা সে; ফ্যাশিস্ট পশুরা যাকে এই অবস্থায় পরিণত করেছে সে অপ্রত্যাশিত কোন অতিথি নয়, তার নিজের স্বামী সে, একটি বসন্ত যার সঙ্গে কাটিয়েছিল, চওড়া-পিঠ জোয়ান একজন, মুখে চকচকে ফুটফুট দাগ, এত পাতলা ভুরু যে মনে হত ভুরু নেই, হাতদুটো বিরাট আর বলিষ্ঠ। হাতে ধরে আছে নিজের মিশার মৃতপ্রায় দেহ, কল্পনা করল ভারিয়া। আর বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে, মাথা ঘুরতে লাগল, শুধু ঠোঁট কামড়ে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল।

...পরে পাতলা, ডোরা-কাটা তোষকে শোয়ানো হল আলেক্সেইকে, গায়ে দেওয়া হল মিখাইল দাদুর লম্বা, অনেক জোড়াতালি-দেওয়া কিন্তু পরিষ্কার আর নরম সার্ট একটা; সমস্ত শরীরে এল বেশ তাজা আর বলিষ্ঠ একটা অনুভূতি। স্নানের পর চুল্লীর উপরে ছাতের ফুটো দিয়ে বাস্প সব বেরিয়ে গিয়েছে, ভারিয়া ওকে বিলবেরির গরম ধোঁয়াটে চা দিল। চিনির ছোট ছোট টুকরোর সঙ্গে আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে চা খেল আলেক্সেই, চিনির ডেলাদুটো ছেলেরা এনেছিল, ডেলাদুটো ভেঙ্গে বার্চের শাদা ছালের ফালিতে রেখে ভারিয়া ওকে দিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল আলেক্সেই, বিপর্যয়ের পর এই প্রথম নিটোল স্বপ্নহীন ঘুম।

উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তার শব্দে ওর ঘুম ভাঙ্গল। খোঁদলে প্রায় ঘুটঘুটে অন্ধকার, কাঠির আগুনটা কোনোক্রমে টিমটিম করে জ্বলছে। ধোঁয়াটে অন্ধকারে মিখাইল দাদুর তীক্ষ্ণ ভাঙ্গা গলা শুনতে পেল আলেক্সেই:

'মেয়েলী বুদ্ধি আর কাকে বলে! তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! লোকটা এগারো দিন জোয়ারের বীচি পর্যন্ত মুখে দিতে পারেনি, আর তুমি ওগুলোকে সেদ্ধ করে শক্ত করে ফেলেছ... এই শক্ত সেদ্ধ ডিমগুলো খেলে আর ওকে বাঁচতে হবে না!'.. তারপর অনুনয়ের সুরে মিখাইল দাদু বললেন, 'ওর ডিমের দরকার এখন নেই। কীসে ওর ভালো হবে জানো, ভাসিলিসা? মুরগীর খাসা সুরুয়া! ব্যস, আর কিছু নয়! তাতে ও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। যদি "পার্টিজান্‌কা" কিছু আনতে পার -- বুঝলে...'

একটি বৃদ্ধার আতঙ্কিত খরখরে কণ্ঠস্বর মিখাইল দাদুকে বাধা দিল:

'পারব না আনতে! কিছুতেই আনব না! বুড়ো শয়তান কোথাকার, আমার কাছে চেয়ে কোন লাভ হবে না! "পার্টিজানকা"... মুরগীর সুরুয়া!.. দেখো দিকি, ওরা কত কিছু এরি মধ্যে এনেছে। একটা বিয়ের ভোজ ওতে চলে! এর পরে আর কি চাইবে তুমি শুনি।'

বৃদ্ধের ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'এভাবে মেয়েলী কথা বলার জন্যে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, ভাসিলিসা। তোমার দুটো ছেলে রণাঙ্গনে লড়ছে, আর তুমি কিনা বোকার মত বকবক করছ! এই লোকটা, বলা যায়, আমাদের জন্যে নিজেকে পঙ্গু করেছে, নিজের রক্ত দিয়েছে...'

'ওর রক্ত চাই না আমি। আমার ছেলেরা আমার জন্যে নিজেদের রক্তপাত করছে। আমার কাছে চেয়ে কোন লাভ হবে না। বলেছি ত দেব না, ব্যস, দেব না আমি!'

দরজার কাছে দ্রুতবেগে চলে গেল প্রাচীনার ছায়া, দরজাটা খোলাতে বসন্তের আলোর রেখা খোঁদলে এক ঝলকে এল, এত উজ্জ্বল সে আলো যে চোখ একেবারে বুজে কাতরে উঠল আলেক্সেই। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি কাছে এলেন:

'তুমি জেগেছিলে না কি, আলিওশা? আমাদের কথাবার্তা কানে গিয়েছে? গিয়েছে বুঝি? কিন্তু ওকে খারাপ ভেবো না, আলিওশা, যা বলেছে তার জন্যে নিন্দে কোরো না। কথা ত শুধু খোসা, ওর শাঁসটা কিন্তু ভালো। মুরগী দিতে নারাজ মনে হচ্ছে? একেবারেই না, আলিওশা! জার্মানরা ওর পরিবারের সমস্ত লোককে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, আর পরিবারটা

নেহাৎ ছোট ছিল না, দশজন লোক ছিল। ওর সবচেয়ে বড়ো ছেলে কর্ণেল। জার্মানরা সেটা জানতে পেরে কর্ণেলের পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে গুলি করে মারে, শুধু ভাসিলিসাকে ছেড়ে দেয়। ওদের বাড়িঘরদোর পুড়িয়ে দেয়। আত্মীয় বলতে ওর কেউ নেই। বুঝতেই পারছ ওর মত বয়সে পরিবারবর্গহীন হয়ে থাকার মানে কী! থাকবার মধ্যে আছে একটা মুরগী। আর মুরগীটা বেশ সেয়ানা, সত্যি বলছি, আলিওশা! প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই জার্মানরা সবকটা মুরগী আর হাঁস সাবাড় করে দেয়। বেটারা মুরগী আর হাঁসের যম, সব সময় মুখে লেগে আছে -- "মুরগী আর মুরগী"। কিন্তু এই মুরগীটা ওদের হাত এড়িয়ে যায়। যেমন-তেমন মুরগী নয়, সত্যি বলছি! সার্কাসের যুগ্যি ওটা। উঠোনে কোন ফ্যাশিস্ট এলে চিলেকুঠিতে চেপে চুপচাপ বসে থাকে, যেন কেউ নেই ওখানে। কিন্তু আমাদের লোক উঠোনে এলে মোটেই বিচলিত হয় না। ভগবান জানেন তফাৎটা কী করে বোঝে! আর তাই সারা গ্রামে এখন একটা মাত্র মুরগী রয়ে গিয়েছে। ওর সেয়ানা বুদ্ধির জন্যে আমরা ওকে পার্টিজান্‌কা নাম দিয়েছি।'

মেরেসিয়েভ চোখ খুলে ঝিমোচ্ছে; বনে থাকবার সময় ওটা ওর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। ওর স্তব্ধতায় মিখাইল দাদু নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। খোঁদলের এদিকে ওদিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে, টেবিলে কী একটা করতে করতে, যে কথাটি বলছিলেন সেটা আবার শুরু করলেন:

'বুড়ীটাকে খারাপ ভেবো না, আলিওশা! ওকে বুঝতে চেষ্টা করো, দোস্ত! আগে ও ছিল বিরাট বনে প্রাচীন বার্চগাছের মত, হাওয়ার উৎপাত সহ্য করতে হত না। আর এখন খোলা জায়গায় পচা গাছের গুঁড়ির মত ও. মুরগীটা একমাত্র সান্ত্বনা। কিছু বলছ না কেন? ঘুমিয়ে পড়েছ না কি? আচ্ছা, ঘুমোও, ঘুমোও।'

ঘুমিয়ে পড়লেও ঠিক ঘুমোয়নি আলেক্সেই। ভেড়ার চামড়ার কোটের নিচে শুয়ে আছে, তাতে রুটির টকটক গন্ধ, প্রাচীন কোন কৃষাণ বসতির গন্ধ; কানে আসছে ঝিঁঝিঁটার মিঠে ডাক, আঙুল নড়াতেও ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে শরীরে কোন হাড় নেই, গরম তুলোতে শরীরটা ভরা, আর তার মধ্যে ধুকধুক করে ধমনীতে রক্ত বয়ে চলেছে। ভাঙ্গা ফোলা পাদুটো দুর্বিষহ যন্ত্রণায় জ্বলছে, দপদপ করছে, কিন্তু পাশ ফিরে শোবার, এমন কি নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই।

আধো-বেহুঁশ সেই অবস্থায় চারিদিকের জীবন টুকরো টুকরো ভাবে তার

চেতনায় পেঁছিচ্ছে, যেন আসল জীবন নয়, সিনেমার পর্দায় অস্থির প্রভায় দেখা অদ্ভুত বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলী।

বসন্ত এসেছে। ফেরারী গ্রামের আর কষ্টের সীমা নেই। মাটিতে যেসব খাবার-দাবার কোনক্রমে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, আর পরে ভস্মীভূত গ্রামে রাত্রে গিয়ে গোপনে যা উদ্ধার করে বনে আনা হয়, তা প্রায় শেষ হতে চলেছে। বরফ গলছে। তাড়াতাড়িতে তৈরী করা খোঁদলগুলো "কাঁদছে", দেয়াল আর ছাত থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। পাতাল গ্রামের পশ্চিমে, ওলেনিন অরণ্যে যারা পার্টিজান যুদ্ধ চালাচ্ছিল তারা আগে এক একজন করে রাত্রে আসত, কিন্তু এখন রণাঙ্গনের লাইনের ওপারে তারা রয়ে গেছে। তাদের কোন খবর আর আসে না। তাতে মেয়েদের দুর্ভোগ আরো বেড়েছে। আর বসন্ত এসে পড়েছে, বরফ গলছে, শস্য বোনার আর সব্জিক্ষেত তৈরী করবার কথা ত ভাবতে হবে।

মেয়েরা কাজ করে চলেছে, দুশ্চিন্তায় শ্রান্ত তারা, মেজাজ খিটখিটে। মিখাইল দাদুর খোঁদলে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি শুরু হত, চলত পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, সে সময় মেয়েরা তাদের পুরোনো আর নতুন, বাস্তব আর কল্পিত, যত কিছু অভাব অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি দিত। মাঝেমাঝে হট্টগোল ছাড়া আর কিছু শোনা যেত না, কিন্তু নারীকণ্ঠের এই ক্রুদ্ধ সোরগোলের মধ্যে ধূর্ত বৃদ্ধটি যৌথখামারের ব্যাপার নিয়ে কোন কার্যকরী প্রস্তাব করলেই বাগবিতণ্ডা এক মুহূর্তে থেমে যেত — যেমন "পুরোনো গ্রামে গিয়ে বরফ গলে গিয়েছে কিনা সেটা দেখার সময় হয়নি কি?" কিম্বা "বেশ হাওয়া দিচ্ছে। বীজগুলোকে এখন বাইরে রাখা হয়ত উচিত। মাটির নিচে গোলাঘরের ভেজা জমিতে ওগুলো স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে।"

একদিন মিখাইল দাদু খোঁদলে ঢুকলেন, মুখে খুসির ছাপ, তবুও চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। হাতে ঘাসের সবুজ শীষ। জামড়ো-পড়া তেলোয় সেটা আস্তে রেখে আলেক্সেইকে দেখালেন তিনি। বললেন:

'দেখছ? খেত দেখে এইমাত্র এলাম। বরফ গলছে, আর ভগবানকে ধন্যবাদ, শীতের ফসল দেখা দিয়েছে। অনেক বরফ পড়েছিল এবার। বসন্তের ফসল না পেলেও শীতের ফসলে রুটি জুটবে আমাদের। মেয়েদের ডেকে আনি, শুনলে ওরা খুসি হবে, আহা বেচারারা!'

খোঁদলের বাইরে মেয়েরা এক ঝাঁক দাঁড়কাকের মত কিচির মিচির করছে;

মাঠ থেকে আনা ঘাসের সবুজ শীষটা নতুন আশা জুগিয়েছে ওদের। সন্ধ্যাবেলায় হাত ঘষতে ঘষতে মিখাইল দাদু এসে বললেন:

'আমার দীর্ঘকেশী মন্ত্রীরা কী ঠিক করেছে জানো, আলিওশা? সিদ্ধান্তটা খারাপ নয়, সত্যি বলছি। একটা দল নিচের জায়গায় জমির ফালিটা চাষ করবে, ওখানে চাষ করা শক্ত। গরুগুলোকে হালে জুতবে ওরা। অবশ্য গরুগুলোকে দিয়ে বিশেষ কিছু করা যাবে না, গোটা পালের মাত্র ছটা এখন রয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দলটা ওপরের জমিটার ভার নেবে, ওটা বেশী শুকনো। ওরা শাবল আর খন্তা দিয়ে কাজ চালাবে। সব্জিক্ষেত ত আমরা এইভাবে খুঁড়ি, তাই না? তৃতীয় দলটা যাবে উঁচু ক্ষেতে। ওখানকার জমি বালুতে ভরা; আলুর চাষ করা হবে ওখানে। সেটা করা শক্ত নয়, বাচ্চাদের আর কমজোরি মেয়েদের লাগিয়ে দেব। আর হয়ত সরকারের সাহায্য এসে পড়বে। সেটা না এলেও চালিয়ে নেব আমরা। নিজেরাই সব করব, জমির সিকিটুকু পড়ে থাকতে দেব না। ফ্যাশিস্টদের ঝাঁটা মেরে দূর করে দিয়েছিল যারা তাদের ধন্যবাদ; বেঁচে থাকতে এখন পারব। শক্তহাড় জাত আমরা, সবকিছু সইতে পারি, যতই কঠিন হোক না কেন!'

অনেকক্ষণ ঘুম এল না দাদুর। খড়ের বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করলেন তিনি, বেঁকে শুলেন, চুলকালেন নিজেকে আর গোঙালেন, "ভগবান, হে ভগবান!" কয়েকবার উঠে জলের বালতির হাতায় খটখট শব্দ করে, ঢকঢক করে বড়ো বড়ো ঢোকে আকণ্ঠ জল খেলেন, ক্লান্ত ঘোড়ার মত। শেষে আর থাকতে পারলেন না। উঠে কাঠির আগুনটা ধরিয়ে আলেক্সেই'র গায়ে হাত দিলেন, আলেক্সেই চোখ খুলে আধো-অচেতন অবস্থায় শুয়ে ছিল, বললেন তাকে:

'ঘুমিয়ে পড়েছ না কি, আলিওশা? আমি শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবছি, শুয়ে আছি আর ভাবছি। ওখানের পুরোনো গ্রামটার চকে একটা ওকগাছ এখনো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে... প্রায় তিরিশ বছর আগে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে, নিকলাস তখন সিংহাসনে, বাজ পড়ে ওটার মাথাটা পুড়ে যায়। কিন্তু গাছটা বেশ শক্ত ছিল, জোরালো শেকড় আর অনেক রস। ওপরে যাবার উপায় ছিল না রসের, তাই পাশ থেকে নতুন নতুন ছোট একটা পল্লব গজাল, কী সুন্দর সেটার কোঁকড়ানো নতুন মাথাটা, যদি দেখতে... আমাদের প্লাভনিও ঠিক সে রকম... যদি রোদ থাকে আর জমিতে ফসল ফলে, তাহলে আমাদের সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে পাঁচ বছরের মধ্যে সবকিছু আমরা

ঠিক করে ফেলব, ভাই আলিওশা। আমরা যে টি'কে থাকতে পারি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু লড়াইটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়! ওদের ছারখার করে দিয়ে আবার কাজে লাগব, সবাই মিলে! কী মনে হয় তোমার?'

সে রাত্রে আলেক্সেই'র অবস্থা আরো খারাপ হল।

মিখাইল দাদুর স্নান করিয়ে দেওয়াটা ওর উপরে তেজী ওষুধের কাজ করে, জড়তার ঘোর কেটে গেল। অসীম অবসাদ, অমানুষিক ক্লান্তি আর পায়ের যন্ত্রণার বোধ এর আগে এত প্রখর কখনো হয়নি। জ্বরের ঘোরে বিছানায় গড়াচ্ছে সে, কাতরাচ্ছে, দাঁতে দাঁত ঘষছে, কাকে ডাকছে, কাউকে বা বকছে আর কিছু না কিছু দিতে বলছে।

সমস্ত রাত ওর সঙ্গে জেগে রইল ভারভারা, পা মুড়ে হাঁটুতে চিবুক রেখে, বিষণ্ণ বড়ো চোখ এক ভাবে সামনের দিকে মেলে। প্রায়ই আলেক্সেই'র মাথায় কিম্বা বুকে একটুকরো ঠাণ্ডা ভিজে ন্যাকড়া চাপা দিচ্ছে, অথবা ভেড়ার চামড়াটা ঠিক করে দিচ্ছে, চামড়াটা বারবার আলেক্সেই সরিয়ে দিচ্ছিল, আর সব সময়ে নিজের স্বামীর কথা ভাবছে, সে এখন বহুদূরে, যুদ্ধের হাওয়ায় তাকে এদিকে ওদিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

ভোরের প্রথম আলোয় বৃদ্ধ জেগে উঠে আলেক্সেই'র দিকে তাকালেন, ও তখন চুপচাপ ঝিমোচ্ছে। ভারিয়াকে চুপিচুপি কী একটা বলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। ফেল্ট বুট-পরা পাদুটো ঢোকালেন গালোশে, গাড়ির টায়ার থেকে যেটা বানিয়েছিলেন তিনি, কোটটা গাছের ছালের একটা ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন আর হাতে নিলেন জুনিপারের ছড়ি, ঘষেমেজে চকচকে করেছিলেন সেটাকে, দূর যাত্রার সময় ছড়িটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

আলেক্সেইকে একটি কথা না বলে রওনা হলেন মিখাইল দাদু।

১৭

মেরেসিয়েভের যা অবস্থা তাতে গৃহকর্তার যাওয়াটা চোখে পড়ল না। পরের সারাটা দিন তার চেতনা ছিল না, তৃতীয় দিনে যখন জ্ঞান হল সূর্য তখন অনেক উ'চুতে, আলোর ঝকঝকে বলিষ্ঠ একটা রেখা চুল্লীর ধূসর জমাট ধোঁয়া ভেদ করে সমস্ত খোঁদলে ছড়িয়ে পড়েছে, স্কাইলাইট থেকে আলেক্সেই'র পা পর্যন্ত, তাতে অন্ধকার ঘোচার চেয়ে ঘন হয়েছে বেশী।

খোঁদলে কেউ নেই। দরজা দিয়ে আসছে ভারিয়ার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলা।

বোঝা গেল কাজ করতে করতে এই বনের অঞ্চলে প্রিয় পুরোনো একটা গান গাইছে। নিঃসঙ্গ একটি অ্যাসগাছের গান, কিছু দূরে তারি মত নিঃসঙ্গ একটি ওকের কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ অ্যাসগাছটি।

এর আগে একাধিকবার গানটি শুনেছে আলেক্সেই; বিমান-ঘাঁটির জমি পিটিয়ে সমান আর সাফ করার জন্য আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা ফুর্তিতে উচ্ছল মেয়েদের দল গানটি গাইত, মন্থর বিষণ্ণ সুরটি ভালো লাগত আলেক্সেই'র। এর আগে কিন্তু কথাগুলোতে মন দেয়নি ও, সৈন্যবাহিনী জীবনের ব্যস্ততায় কথাগুলো মিলিয়ে যেত, মনে কোন ছাপ রাখেনি। কিন্তু এখন কথাগুলো আসছে অল্পবয়স্কা, বিশালাক্ষী, কোমল অনুভূতিতে ভরাট এই মেয়েটির মুখ থেকে, আর তাতে শুধু কাব্যিক নয়, নারীসুলভ আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার ছাপ এত স্পষ্ট যে সুরটির গভীরতা সম্পূর্ণভাবে আলেক্সেই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করল, বুঝতে পারল নিজের ওকের জন্য অ্যাসগাছের মত ভারিয়ার ব্যাকুলতা কতো তীব্র।

...নিঃসঙ্গ ওকের পাশে যাওয়া
অ্যাসগাছটির কপালে নেই।
বেচারীকে বুঝি চিরকাল
দুলতে হবে একা একা...

গাইল ভারিয়া, সত্যিকার চোখের জলের তিক্ত স্বাদ ওর গলায়। গান থেমে গেল, আলেক্সেই কল্পনা করল বসন্তের আলোয় প্লাবিত গাছগুলোর নিচে বসে আছে ও, ওর বড়ো বড়ো ব্যাকুল চোখ জলে ভরে গিয়েছে। নিজের গলা কেমন ধরে এল আলেক্সেই'র, অদম্য ইচ্ছে হল টিউনিকের পকেটের পুরোনো চিঠিগুলো দেখে, পড়বে না, দেখবে শুধু, চিঠিতে কী লেখা সেটা ত ওর মুখস্থ, দেখবে খোলা মাঠে বসা পাতলা মেয়েটির ফটো। টিউনিকে হাত দেবার চেষ্টা করাতে তোষকে অসহায়ভাবে হাতটা ঢলে পড়ল। আবার সবকিছু সেই রামধনু রঙের চাকা-কাটা ধূসর অন্ধকারে ভাসছে। পরে অন্ধকারে ধারালো অদ্ভুত নানা শব্দের খসখসানিতে দুজনের গলা আলেক্সেই'র কানে এল, ভারিয়ার আর একটি বৃদ্ধার পরিচিত গলা। চুপিচুপি কথা বলছে তারা:

'কিছু খায় না ও?'

'না, কিছু খেতে পারে না!.. কাল এক টুকরো চাপাটি চিবিয়েছিল,

ছোট্ট একটা টুকরো কিন্তু বমি হয়ে গেল। চাপাটি ওর খাওয়া উচিত নয়। অল্প দুধ খেতে পারে, তাই আমরা দিই।'

'শোনো, আমি কিছু সুরুয়া এনেছি। বেচারার হয়ত ভালো লাগবে।'

'ভাসিলিসা দিদিমা!' ভারিয়া বলে উঠল। 'সত্যি সত্যি আপনি...'

'হ্যাঁ, মুরগীর সুরুয়া। তাতে অবাক হবার কী আছে? অসাধারণ কিছু নয় এটা। ওকে জাগিয়ে দাও, হয়ত অল্প খাবে।'

ওদের কথাবার্তা আলেক্সেই'র কানে গিয়েছে, কিন্তু ও চোখ খোলার আগেই ভারিয়া খুব জোরে, শিষ্টাচারের বালাই না রেখে, ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে বলল:

'আলেক্সেই পেত্রভিচ, আলেক্সেই পেত্রভিচ! উঠে পড়ুন!.. ভাসিলিসা দিদিমা আপনার জন্য কিছু মুরগীর সুরুয়া এনেছেন, উঠে পড়ুন বলছি!'

দরজার কাছের দেয়ালে ঘাসের পলতেটা চড়চড় করে সজোরে জ্বলে উঠল। ধোঁয়াটে কম্পমান আলোয় একটি ছোটখাটো বক্রদেহ বৃদ্ধাকে আলেক্সেই দেখল, নাক বাঁকা, কুঁদুলে মুখ বলিকুঞ্চিত। টেবিলে মোড়ক থেকে বড়ো কিছু একটা খুলতে ব্যস্ত বৃদ্ধাটি; প্রথমে একটুকরো চট সরাল, তারপর মেয়েদের পুরোনো একটা কোট, তারপর এক খণ্ড কাগজ, অবশেষে দেখা গেল লোহার ছোট একটি বাটি, মুরগীর ঘন সুরুয়ার গন্ধে খোঁদলটা গেল ভরে, গন্ধটা এত খাসা যে আলেক্সেই'র পেট মোচড় দিয়ে উঠল।

ভাসিলিসা দিদিমার কুঞ্চিত মুখ থেকে তখনো কঠোর রাগী ভাবটা মুছে যায়নি।

'দেখো, তোমার জন্যে এনেছি এটা,' বৃদ্ধা বলল। 'খেতে নারাজ হোয়ো না, যেন খেয়ে ভালো হয়ে ওঠ। এটা খেলে ভগবানের কৃপায় হয়ত তোমার ভালো হবে।'

আর আলেক্সেই'র মনে পড়ল বৃদ্ধাটির পরিবারের করুণ কাহিনী, পার্টিজান্‌কা নামের সেই মুরগীটির কথা, আর সবকিছু — বৃদ্ধাটি, ভারিয়া, টেবিলের উপরে রাখা খাসা গন্ধ ছড়ানো লোহার ধূমায়িত পাত্রটি — সবকিছু চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল, সেই ঝাপসা পর্দা ভেদ করে চোখে পড়ছে শুধু বৃদ্ধাটির কঠোর চোখজোড়া, অসীম করুণায় তার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

বৃদ্ধাটি চলে যাচ্ছে, 'ধন্যবাদ, দিদিমা,' এর বেশী আর কিছু বলতে পারল না আলেক্সেই।

দরজায় পেঁীছিয়ে বৃদ্ধা বলল:

'ধন্যবাদ আর দিও না! ধন্যবাদ দেবার কী আছে? আমার ছেলেরাও ত লড়াই করছে। ওদেরও হয়ত কেউ সুরুয়া দেবে। তুমি এটা খাও, তোমার ভালো হোক। সেরে ওঠ।'

'দিদিমা!' আলেক্সেই উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারিয়া বাধা দিয়ে আস্তে আস্তে ওকে বিছানায় ঠেলে শুইয়ে দিল।

'শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন ত! কিছুটা সুরুয়া খান!' জার্মান সৈনিকের এ্যালুমিনিয়ামের কৌটোর ঢাকনা ওকে দিল ভারিয়া, সুগন্ধি ভাপ থেকে মাথা ঘুরিয়ে নিল, চোখে জল এসে পড়েছে কখন, সেটা ঢাকবার জন্য 'কিছুটা খান!' বলল আবার।

'মিখাইল দাদু কোথায়?'

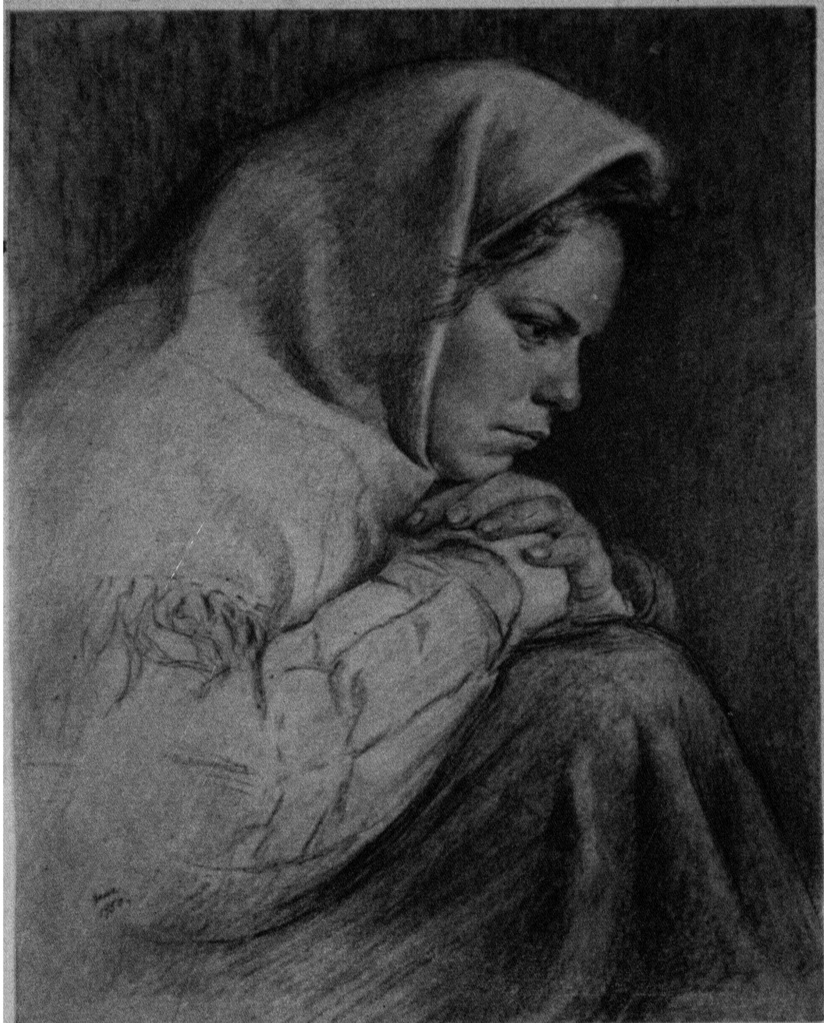
'তিনি বেরিয়ে গেছেন, কাজে গিয়েছেন। জেলা কমিটি কোথায় খোঁজ করতে গিয়েছেন। ফিরতে অনেক দিন লাগবে। কিন্তু সুরুয়াটা খান, খেয়ে নিন।'

মুখের কাছে আলেক্সেই দেখল কাঠের একটা চামচে, এত পুরোনো যে কালো হয়ে গিয়েছে, রজন রঙের সুরুয়াতে ভরা।

প্রথম কয়েক চামচ সুরুয়া পেটে যেতেই নেকড়ের মত ক্ষিধে পেল আলেক্সেই'র, এত ক্ষুধার্ত লাগল যে ব্যথায় পেট মোচড় দিয়ে উঠল; কিন্তু দশ চামচের বেশী সুরুয়া আর মুরগীর নরম শাদা মাংসের কয়েকটা ফেঁসো ছাড়া খেল না ও। যদিও পেট প্রবলভাবে আরো, আরো বেশী চাইছে, তবুও দৃঢ়ভাবে খাবারটা সরিয়ে রাখল আলেক্সেই, ও জানে যে ওর বর্তমান অবস্থায় আর এক চামচ খেলে বিষের মত হতে পারে।

দিদিমার সুরুয়া অশ্চর্য কাজ দিল। ঘুমিয়ে পড়ল আলেক্সেই, মূর্চ্ছার ঘোর সেটা নয়, সত্যিকারের নিটোল স্বাস্থ্যকর ঘুম। একেকবার জেগে উঠে অল্পকিছু খেয়ে আবার ঘুম, চুল্লীর ধোঁয়ায়, মেয়েদের কথাবার্তায় কিম্বা ভারিয়ার স্পর্শে সে-ঘুম ভাঙ্গল না; ভারিয়ার ভয় হচ্ছিল ও মরে গিয়েছে, তাই প্রায়ই ঝুঁকে পড়ে ওর বুকে হাত দিয়ে দেখছিল বেঁচে আছে কিনা।

বেঁচে আছে, সমানে, গভীরভাবে বুক ওঠাপড়া করছে। বাকি দিনটা আলেক্সেই ঘুমল, সারা রাতটাও, এমন ভাবে ঘুমিয়ে রইল যেন পৃথিবীর কোন কিছু ওকে জাগাতে পারবে না।



পরের দিন প্রত্যুষে বনের নানা শব্দের মত অস্পষ্টভাবে কানে এল দূরে, একটানা, ঘরঘর আওয়াজ। চমকে উঠে আলেক্সেই বালিশ থেকে মাথা তুলল, কান পেতে রইল।

অদম্য উদ্দাম আনন্দে ওর সমস্ত শরীর ভরে গেল। না নড়েচড়ে শুয়ে রইল ও, উত্তেজনায় চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। কানে আসছে চুল্লীর উপরে ঠাণ্ডা হয়ে আসা পাথরের জোরালো চড়চড় শব্দ, রাত্রির ডাকের পর ক্লান্ত ঝিঁঝিঁটার ক্ষীণ আওয়াজ, খোঁদলের উপরে দোদুল্যমান পাইন-গাছগুলোর প্রশান্ত সমান মর্মরধ্বনি, এমন কি বসন্তের গলন্ত বরফের বড়ো বড়ো ফোঁটা দরজার বাইরে টপটপ করে পড়ছে, তারো শব্দ। কিন্তু সমস্ত শব্দ ভেদ করে স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে সেই সমান ঘরঘর আওয়াজটা। আলেক্সেই আঁচ করল ওটা কোন "পলিকার্পভ-২" বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ। শব্দটা কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে, কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে না। নিশ্বাস চেপে রইল আলেক্সেই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বিমানটা কাছাকাছি কোথাও কোনো লক্ষ্য নিয়ে বনের উপরে চক্কর দিচ্ছে, কিম্বা নামার জায়গা খুঁজছে।

'ভারিয়া, ভারিয়া!' কনুই'এ ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে আলেক্সেই ডাকল।

কিন্তু ভারিয়া খোঁদলে নেই। বাইরে মেয়েদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আর দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। কিছু একটা ঘটছে ওখানে।

মুহূর্তের জন্য খোঁদলের দরজাটা খুলে গেল, দেখা গেল ফুটফুট দাগওয়ালা ফেদকার মুখ।

'ভারিয়া পিসী, ভারিয়া পিসী!' হাঁকল ফেদকা, তারপর উত্তেজিতভাবে বলল, 'বিমানটা, আমাদের বনের ওপরে চক্কর খাচ্ছে বিমানটা!' আর আলেক্সেই কিছু বলার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

চেষ্টা করে আলেক্সেই উঠে বসল। বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠল, রগ দপদপ করছে, আহত পাদুটোর ব্যথায় সমস্ত শরীর কাঁপছে। বিমানটি বৃত্তাকারে ঘুরছে ক'বার গুণল — এক, দুই, তিন — তারপর উত্তেজনায় বিবশ হয়ে বিছানায় পড়ে গেল, আবার সেই অদম্য, নিটোল স্বাস্থ্যকর ঘুমের ঘোর সত্বর আচ্ছন্ন করে দিল তাকে।

কার গমগমে ভারী তাজা কণ্ঠস্বরে আলেক্সেই'র ঘুম ভাঙল। দল বেঁধে অনেকে গান গাইলেও সে-গলা চিনতে পারত আলেক্সেই। জঙ্গী বিমানের

দলে মাত্র একজনের ওরকম গলা ছিল — সে হচ্ছে স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো।

চোখ খুলল আলেক্সেই কিন্তু মনে হল এখনো ঘুমিয়ে আছে। স্বপ্নে দেখছে বন্ধুটিকে, চওড়া, চোয়াল-উ'চু, কর্কশভাবে-গড়া সহৃদয় মুখ তার, কপালে কালশিটের দাগ, চোখদুটো হালকা রঙের, ভোমাও তেমনি হালকা, আন্দ্রেই'র শত্রুদের ভাষায়, "শুয়োরের ভোমার" মত বর্ণহীন। ধোঁয়াটে আধো-অন্ধকারে খোঁজার ভঙ্গীতে উ'কি দিচ্ছে একজোড়া হালকা-নীল চোখ।

'আচ্ছা দাদু, এবার তোমার যুদ্ধে-জেতা চিজটিকে দেখাও ত!' গমগম করে উঠল দেগতিয়ারেঙ্কোর গলা, উক্রেনীয় উচ্চারণের স্পষ্ট ছাপ তার কথায়।

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল না। লোকটি সত্যিই তাহলে দেগতিয়ারেঙ্কো, যদিও এই বনের গভীরে পাতাল গ্রামে সে হাজির হয়েছে সেটা বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব মনে হয়। ও দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, লম্বা-চওড়া লোক, টিউনিকের কলার যথারীতি খোলা। হাতে হেলমেট, তা থেকে রেডিওফোনের তারগুলো ঝুলছে, আর কয়েকটা মোড়ক আর পুঁটলি। কাঠির আগুনটা পিছনে জ্বলছে, ওর ছোট করে ছাঁটা খোঁচা খোঁচা সোনালী চুলে আলোর প্রভা।

দেগতিয়ারেঙ্কোর পিছন থেকে মিখাইল দাদুর পাণ্ডুর ক্লান্ত মুখ উ'কি মারছে, উত্তেজনায় ওঁর চোখদুটো বিস্ফারিত; তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তারণী। ওটি হল খাঁদা-নাক, বেহায়া লেনচ্‌কা, অত্যন্ত কৌতূহলে অন্ধকারে চেয়ে আছে সে। ওর বগলের নিচে রেডক্রসের ক্যাম্বিসের একটা থলে, কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার ফুল বুকে চেপে রয়েছে ও।

সবাই কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। বিব্রতভাবে দেগতিয়ারেঙ্কো চারিদিকে তাকাচ্ছে, অন্ধকারে কিছু দেখতে পারছে না বোঝা গেল। দুএকবার আলেক্সেই'র মুখে ওর দৃষ্টি অনবধানে পড়ল; আর আলেক্সেই'রও বিশ্বাস হচ্ছে না যে ওর বন্ধু হঠাৎ এখানে এসে পড়েছে, হয়ত শেষ পর্যন্ত সমস্তটা জ্বরবিকারের স্বপ্নে দাঁড়াবে এই ভয়ে সে কাঁপছে।

'এই ত উনি শুয়ে আছেন,' ভেড়ার চামড়াটা সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে ভারিয়া বলল।

আলেক্সেই'র মুখের দিকে আবার হতবুদ্ধিভাবে দেগতিয়ারেঙ্কো তাকাল।

'আন্দ্রেই!' কনুই'এ ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে করতে ক্ষীণকণ্ঠে আলেক্সেই ডাকল।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল আন্দ্রেই, ভয় পেয়েছে যে সেটা বোঝা গেল।

'আন্দ্রেই! আমাকে চিনতে পারছ না?' ক্ষীণকণ্ঠে বলল মেরেসিয়েভ, সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে মনে হল।

আর এক মুহূর্ত জীবন্ত কংকালটির দিকে তাকিয়ে রইল আন্দ্রেই. কালো, প্রায় ঝলসানো চামড়ায় কংকালটি ঢাকা, ওর বন্ধুর হাসিখুসি চেহারার তলাশ করার চেষ্টা করল আন্দ্রেই. আর শুধু বিশাল. প্রায় গোল চোখদুটোতে খোলাখুলি, বলিষ্ঠ সেই চেনা ছাপ দেখল যেটি বিশেষ করে মেরেসিয়েভের। মাটিতে পড়ে গেল আন্দ্রেই'র হেলমেট, মোড়ক আর পুঁটলিও, সেগুলো খুলে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল আপেল কমলালেবু আর বিস্কুট।

'লিওশ্‌কা! তুমি!' আবেগে ওর গলা ভেঙ্গে গেল, ওর দীর্ঘ বর্ণহীন ভোমা এল নেমে। 'লিওশ্‌কা, লিওশ্‌কা!' আবার ডাকল ও। বিছানা থেকে হালকাভাবে ক্ষীণ দেহটি তুলে নিল, যেন শিশুর দেহ, আর বুকে চেপে বারবার বলতে লাগল, 'লিওশ্‌কা, লিওশ্‌কা!'

হাতে এক মুহূর্ত আলেক্সেইকে রেখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে আন্দ্রেই, যেন নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছে যে ও সত্যিই তার সেই বন্ধুটি. তারপর আবার বুকে চেপে ধরল.

'হ্যাঁ, তুমিই! লিওশ্‌কা! লিওশ্‌কা বেটা!'

ওর বলিষ্ঠ, ভালুকের মত মুঠি থেকে আলেক্সেই'র ক্ষীণ দেহ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল ভারিয়া আর ডাক্তারণী।

'ভগবানের দোহাই, ওঁকে ছেড়ে দিন. ওঁর দেহে বলতে গেলে প্রাণ নেই!' ক্রুদ্ধভাবে ভারিয়া বলল।

'কোন উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ভালো নয়! শুইয়ে দিন ওঁকে!' ডাক্তারণী তাড়াতাড়ি বলল।

এতক্ষণে আন্দ্রেই'র বিশ্বাস হয়েছে যে এই কালো, শুকিয়ে-যাওয়া. পালকের মত হালকা শরীরটা সত্যি সত্যি ওর সহচর, ওর বন্ধু, আলেক্সেই মেরেসিয়েভের, যার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল; আলেক্সেইকে শুইয়ে দিয়ে. নিজের মাথা আঁকড়ে, দুর্বার বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আন্দ্রেই,

তারপর আলেক্সেই'র কাঁধদুটো চেপে ধরে ওর কোটরগ্রস্ত, আনন্দোজ্জ্বল চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'বেঁচে আছে! কুমারী মেরি! বেঁচে আছে! গোল্লায় যাও তুমি, এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে? কী হয়েছিল?'

ডাক্তারণীটি বেঁটেখাটো, গোলগাল, নাক খাঁদা, ওর লেফ্টেনান্ট পদ অগ্রাহ্য করে বিমানদলের সবাই ওকে হয় লেনচ্কা নয় "চিকিৎসাশাস্ত্র পরিষেবিকা" বলে ডাকত, কেননা ওই নামেই উপরওয়ালার কাছে, পরে কী ঘটবে না ভেবে, নিজের পরিচয় ও দিয়েছিল; হামেশাই হাস্যমুখর আর সঙ্গীতিপ্রিয় লেনচ্কা সবকটি লেফ্টেনান্টের সঙ্গে একই সময়ে প্রেমে পড়ত। কিন্তু এবারে সেই লেনচ্কাই দৃঢ়ভাবে উত্তেজিত আন্দ্রেইকে বিছানার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে কঠোরস্বরে বলল:

'কমরেড ক্যাপ্টেন! রোগীর কাছ থেকে সরে আসুন!'

আগের দিন যে ফুলগুলোর জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রে লেনচ্কা গিয়েছিল বিমানে এখন কোন কাজে লাগল না সেগুলো, ফুলের গোছাটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে, রেডক্রসের ক্যাম্বিসের থলে খুলে কাজের লোকের মত রোগীকে পরীক্ষা করতে শুরু করল। খাটো আঙুলে দক্ষভাবে পাদুটোতে টোকা মেরে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেইকে:

'লাগছে? এখানে? আর এখানটায়?'

এই প্রথম ভালো করে নিজের পাদুটো দেখল আলেক্সেই। সাঙ্ঘাতিক ফুলে গিয়েছে পায়ের পাতাদুটোই, প্রায় কালো দেখাচ্ছে। একটু ছুঁলেই সমস্ত শরীর ব্যথিয়ে ওঠে। বিজলীতে হাত লাগলে যেমন হয়। আঙুলের ডগাগুলোর চেহারা দেখে লেনচ্কা সবচেয়ে চিন্তিত হল। একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে সেগুলো, বোধশক্তি আর নেই।

টেবিলের পাশে রইলেন মিখাইল দাদু আর দেগতিয়ারেঙ্কো। এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করার জন্য বৈমানিকের বোতলটিতে চুপিচুপি এক চুমুক দেবার পর উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা চলল। ভাঙ্গা খনখনে বুড়োটে গলায় মিখাইল দাদু বলতে শুরু করলেন স্পষ্টতই প্রথম বার নয় কী করে আলেক্সেইকে পাওয়া যায়।

'বনের ফাঁকা জায়গাটাতে ছোকরারা ওকে দেখে। নিজেদের ডাগ-আউটের জন্যে জার্মানরা গাছ কেটেছিল ওখানে, আর ছোকরাদুটোর মা, মানে আমার মেয়ে, কাঠের জন্যে ওদের ওখানে পাঠিয়েছিল। তাইতে ওকে দেখতে পায়।

"ওখানে অদ্ভুত গোছের ওটা কী?" প্রথম ওরা ভাবল কোন ভালুক চোট খেয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর চম্পট দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের বশে ওরা গেল ফিরে। "কী রকম ভালুক ওটা? গড়াগড়ি দিচ্ছে কেন? ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে!" ওরা ফিরে গিয়ে দেখল ও গড়াচ্ছে আর গোঙাচ্ছে...'

'গড়াচ্ছিল, তার মানে কী?' দাদুকে সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিয়ে দেগতিয়ারেঙ্কো খটকার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ধূমপান করেন?'

কেস থেকে একটা সিগারেট নিলেন দাদু, পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজের টুকরো বের করে এক ফালি ছিঁড়ে ফেলে সিগারেটের তামাক তাতে ঢেলে, জড়িয়ে ধরালেন সেটা, খুব আমেজে টান দিলেন।

'ধূমপান? নিশ্চয়ই,' আর একটা টান দিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু জার্মানরা আসার পর তামাকের নামগন্ধ পাইনি। শেওলা আর স্পার্জের শুকনো পাতা টানি!.. আর কী করে ও গড়াচ্ছিল, সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করো। আমি ত দেখিনি। ছোকরারা বলল চিৎ-উপুড়, উপুড়-চিৎ হয়ে ও গড়াচ্ছিল। হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতা ওর ছিল না, বুঝলে না! এই ধরনের লোক ও!'

প্রায়ই তড়াক করে উঠে দেগতিয়ারেঙ্কো বন্ধুর দিকে তাকাচ্ছে, ডাক্তারণীর আনা ছাই রঙের ফৌজী কম্বলে মেয়েরা ওকে তখন জড়াচ্ছিল।

'স্থির হয়ে বোসো, বাপু, স্থির হয়ে বসে থাকো। কাপড়-চোপড় পরানো বেটাছেলের কাজ নয়,' বললেন দাদু। 'কী বলছি শোনো। আর কথাটা তোমাদের উপরওয়ালাদের বলতে ভুলো না খুব বড়ো কাজ করেছে আলেক্সেই! ওর এখনকার অবস্থাটা দেখছই ত। আমরা সবাই, যৌথখামারের সবাই এক হপ্তা ধরে ওকে দেখাশোনা করেছি, কিন্তু তবুও নড়াচড়া করতে পারছে না ও। কিন্তু বন আর জলায় হামাগুড়ি দিয়ে আসার শক্তি ও ধরেছিল। খুব বেশী লোকে সেটা পারে না! এমন কি আমাদের পুণ্যাত্মা ঋষিরা পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের সময়ে এরকম কিছু করেননি। খুঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকাটা এমন কী আর? ঠিক বলছি না? মনে হচ্ছে ঠিক বলছি। কিন্তু শোনো, বাছা, শোনো!..'

দেগতিয়ারেঙ্কোর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ, ওঁর নরম, পেঁজা তুলোর মত দাড়ির সুড়সুড়ি দিয়ে দেগতিয়ারেঙ্কোকে প্রায় ফিসফিস করে বললেন:

'আমার মনে হয় ও বাঁচবে না। তোমার কী মনে হয়? জার্মানদের এড়াতে পেরেছে ও, কিন্তু যমের হাত থেকে কী রেহাই পাবে? একেবারে হাড্ডিসার, কী করে হামাগুড়ি দিয়েছিল ভাবতেই পারি না। নিজের লোকেদের কাছে আসার ইচ্ছেটা খুব প্রবল হয়েছিল, কী বলো? যতক্ষণ অজ্ঞান ছিল ততক্ষণ শুধু বলেছে, "বিমান-ঘাঁটি, বিমান-ঘাঁটি।" আরো অন্য সব কথা, তাছাড়া ওলগার নাম করেছে। ও নামের কোন মেয়ে তোমাদের ওখানে আছে না কি? হয়ত ওর বউ। শুনছ, কী বলছি শুনছ? ওহে বৈমানিক!'

কিন্তু দেগতিয়ারেঙ্কো ওঁর কথা শুনছিল না। এই মানুষটি, ওর দোস্ত যে, যাকে মনে হত নেহাৎ সাধারণ লোক, ভাঙ্গা, হয়ত জমে-যাওয়া অসাড় পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে গলন্ত বরফের উপর দিয়ে, বন আর জলা ভেদ করে হামাগুড়ি দিচ্ছে, গড়িয়ে এগোচ্ছে, শত্রুকে এড়িয়ে যাবার জন্য, স্বজনের কাছে আসার জন্য, সে-ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে দেগতিয়ারেঙ্কো। জঙ্গী বিমান চালিয়ে বিপদ সম্বন্ধে তার খেয়াল আর নেই। লড়াই'এ যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন মৃত্যুর কথা মনে হয় না দেগতিয়ারেঙ্কোর, বরঞ্চ আনন্দের রোমাঞ্চ বোধ করে। কিন্তু বনে একেবারে একা কোন মানুষে যে এমন করতে পারে...

'কখন ওকে দেখতে পায়?'

"কখন?' বৃদ্ধ ঠোঁট নাড়ালেন, খোলা কেস থেকে আর একটা সিগারেট নিলেন। 'কখন, ঠিক কখন? তাই ত, ঠিক এক হপ্তা আগে।'

তারিখগুলোর কথা তাড়াতাড়ি ভেবে দেগতিয়ারেঙ্কো হিসেব করল যে মেরেসিয়েভ আঠারো দিন হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরেছে। একে আহত, তার উপর বিনা আহারে এতদিন হামাগুড়ি দেওয়াটা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, দাদু!' বৃদ্ধকে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন করে বুকে চেপে ধরে বৈমানিক বলল। 'ধন্যবাদ আপনাকে, দোস্ত!'

'ধন্যবাদ আর দিও না। ধন্যবাদ দেবার কী আছে? আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ, আমি কী? আমি কি কোন আগন্তুক না বিদেশী?' পুত্রবধূ হাতে চিবুক রেখে অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে কী ভাবছিল, ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে তাকে বৃদ্ধ বললেন, 'খাবারগুলো মেঝে থেকে কুড়িয়ে নাও না! দামী জিনিসগুলো ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে, ভাবো ত একবার! আবার বলছে "ধন্যবাদ!"'

ইতিমধ্যে মেরেসিয়েভকে যাত্রার জন্য ঠিকঠাক করে ফেলেছে লেনচ্‌কা।

'সব ঠিক, সব ঠিক, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' তড়বড় করে বলল লেনচ্‌কা, কথাগ‍ুলো থলে থেকে পড়ন্ত মটরের মত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছে। 'মস্কোতে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আপনাকে ওরা সারিয়ে দেবে। মস্কো বিরাট সহর, নয় কি? আপনার চেয়ে খারাপ কেস ওখানে সারিয়ে দেয়!'

ওর অতি-উৎসাহ, আর মেরেসিয়েভ একনিমেষে সেবে উঠবে সেটা বারবার বলার ধরন থেকে দেগতিয়ারেঙ্কো আঁচ করল রোগী দেখার পর লেনচ্‌কা ব‍ুঝতে পেরেছে যে খারাপ কেস এটা, মেরেসিয়েভের অবস্থা সঙ্কটজনক। "হাঁড়িচাঁচার মত কিচির মিচির করছে," গরগর করে নিজেকে বলল দেগতিয়ারেঙ্কো, "চিকিৎসাশাস্ত্র পরিষেবিকাটির" দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাল। হঠাৎ ওর মনে হল বিমানদলের কেউ লেনচ্‌কাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না, ঠাট্টা করে সবাই বলে যে একমাত্র জিনিস যেটা ও সারাতে পারে সেটা হল প্রেম — কথাটা ভেবে দেগতিয়ারেঙ্কো কিছ‍ুটা আশ্বস্ত বোধ করল।

কম্বলে জড়ানো হয়েছে আলেক্সেইকে। শ‍ুধ‍ু মাথাটা দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ইতিহাসের বইতে স্কুলে-দেখা ফারাও'র মামির কথা দেগতিয়ারেঙ্কোর মনে পড়ল। বন্ধ‍ুর গালে চওড়া হাতটা একবার বোলাল, খোঁচা খোঁচা শক্ত লাল দাড়িতে সেটা ভরা।

'সব ঠিক, লিওশকা! সেরে উঠবে ঠিক! মস্কোতে তোমাকে আজই ভালো হাসপাতালে পাঠাবার আদেশ এসেছে, সেখানে সবাই নামকরা চিকিৎসক! আর নার্সের কথা ছেড়ে দাও,' একবার চুকচুক শব্দ করে, লেনচ্‌কার দিকে চোখ ঠেরে দেগতিয়ারেঙ্কো বলল, 'ওদের সেবায় মড়ারা পর্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে। তুমি আর আমি আবার আকাশে উড়ব!' হঠাৎ ও ব‍ুঝতে পারল ঠিক লেনচ্‌কার মত জোর-করা, প্রাণহীন আমোদের স‍ুরে কথা বলছে। বন্ধ‍ুর গালে টোকা দিতে দিতে হঠাৎ হাতের তলাটা ভিজে লাগল। 'স্ট্রেচারটা কোথায়?' চটে উঠে জানতে চাইল দেগতিয়ারেঙ্কো। 'ওকে নিয়ে যাওয়া যাক এবার! মিছিমিছি সময় নষ্ট করে কী হবে?'

কম্বলে-জড়ানো আলেক্সেইকে ওরা আস্তে আস্তে স্ট্রেচারে শোয়াল, ব‍ৃদ্ধ সাহায্য করলেন। আলেক্সেই'র জিনিসপত্র জড়ো করে একটা পোঁটলায় বাঁধল ভারিয়া।

ঝঞ্ঝা বাহিনীর ছোরাটা পোঁটলাতে ঢোকাচ্ছে ভারিয়া, তাকে থামিয়ে বলল, 'দাদ‍ু! এটা আপনি রাখ‍ুন স্ম‍ৃতিচিহ্ন হিসেবে।' মিতব্যয়ী

মিখাইল দাদু প্রায়ই সকৌতূহলে ছোরাটা দেখতেন, সেটাকে পরিষ্কার আর ধারালো করে বুড়ো-আঙুলের উপরে রেখে পরখ করতেন।

'ধন্যবাদ, আলিওশা, ধন্যবাদ! খাসা ইস্পাতের জিনিস এটা। আর দেখো, এটার ওপরে কী একটা লেখা আছে, বিদেশী ভাষায়,' দেগতিয়ারেঙ্কোকে ছোরাটা দেখাতে দেখাতে বৃদ্ধ বললেন।

দেগতিয়ারেঙ্কো লেখাটা পড়ে অনুবাদ করে দিল:

'Alles für Deutschland -- সবকিছু জার্মানির জন্য।'

'সবকিছু জার্মানির জন্য,' পুনরুক্তি করল আলেক্সেই, কী করে ছোরাটা পেয়েছিল সেটা মনে করে!

'আচ্ছা, এবার ওকে তুলুন ত,' স্ট্রেচারের একটা দিক ধরে দেগতিয়ারেঙ্কো তাড়া দিল।

দোলন্ত স্ট্রেচারটা খোঁদলের অপরিসর দরজা দিয়ে কষ্টে বের করা হল। ধাক্কা লেগে দেয়ালের মাটি খসে পড়ল।

খোঁদলে ভিড়-করে-দাঁড়ানো সবাই ছুটে বেরিয়ে এল কুড়িয়ে-পাওয়া লোকটিকে বিদায় জানাবার জন্য। শুধু ভারিয়া রয়ে গেল। তাড়াহুড়ো না করে ঘাসের পলতেটা সে ঠিক করল, তারপর ডোরা-কাটা গদিটার কাছে গেল, সেখানে এতদিন শোয়া মানুষটির ছাপ এখনো আছে, গদিটাতে হাত দিল ভারিয়া। তাড়াহুড়োয় ফুলের গোছাটার কথা কারো মনে ছিল না, সেটা নজরে পড়ল ভারিয়ার। কাঁচের ঘর থেকে আনা কয়েকটা লাইলাক, রং-ঝরা, শুকনো, এই ফেরারী গ্রামটির অধিবাসীদের মত, যারা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে খোঁদলে শীতটা কাটিয়েছে। ফুলগুলো তুলে নিল মেয়েটি, ঘ্রাণ করল বসন্তের নরম আভাস, এত ক্ষীণ সে-গন্ধ যে ধোঁয়া আর ঝুলের মধ্যে প্রায় পাওয়া যায় না, তারপর কাঠের পাটাতনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিক্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ভারিয়া।

১৮

অপ্রত্যাশিত অতিথিকে বিদায় জানাবার জন্য প্লাভনি গ্রামে উপস্থিত সবাই বেরিয়ে এল। বনের পিছনে একটি লম্বাগোছের ছোট হ্রদে বিমানটি নেমেছিল, ধারে ধারে বরফ গলতে শুরু করলেও এখনো জমাট আর শক্ত হ্রদটি। ওখানে যাবার কোন রাস্তা নেই। পায়ে চলা একটা পথ আছে, এক ঘণ্টা আগে পায়ের চাপে বসে-যাওয়া নরম বরফের উপর দিয়ে এসেছিলেন

মিখাইল দাদ্, দেগতিয়ারেঙ্কো আর লেনচ্কা। পথ ধরে ভিড় করে হ্রদের দিকে লোকেরা যাচ্ছে, গ্রামের ছেলেরা সামনে, ধীরস্থির সেরিওন্কা আর ফেদকা একেবারে আগে আগে, উৎসাহে টগবগ করছে ফেদকা। বৈমানিককে বনে প্রথম দেখেছিল সেরিওন্কা, ওর প্রোনো দোস্ত সে, সেই অধিকারে স্ট্রেচারের সামনে গম্ভীরভাবে যাচ্ছে সেরিওন্কা, ওর মরা বাপের বিরাট ফেল্টবুট পরা পা অনেক কষ্টে বরফ থেকে টেনে তুলছে, আর শাদা দাঁত, ক্লিষ্টমুখ, ছেঁড়াখোঁড়া নানা অদ্ভুত জামাকাপড়-পরা অন্যান্য ছেলেদের কঠোরভাবে ধমকাচ্ছে। দেগতিয়ারেঙ্কো আর মিখাইল দাদ্ স্ট্রেচারটা পা মিলিয়ে বহন করছেন, পাশে নরম পলকা বরফের উপরে হাঁটতে হাঁটতে লেনচ্কা কখনো আলেক্সেই'র কম্বল ঠিক করে দিচ্ছে কখনো বা নিজের রুমাল ওর মাথায় জড়িয়ে দিচ্ছে। ওর পিছনে বকবক করতে করতে আসছে প্রবীণা, নবীনা আর বুড়োরা।

প্রথম প্রথম বরফে ঠিকরনো উজ্জ্বল আলোয় চোখ ঝলসে গেল আলেক্সেই'র। বসন্তের সুন্দর দিনটি এত জোরে চোখে লাগছে যে চোখ বন্ধ করতে হল ওকে, প্রায় বেহুঁশ হয়ে গেল। চোখের পাতা অল্প খুলে আলোটা সইয়ে নিয়ে চারিদিকে তাকাল সে। পাতাল গ্রামটির ছবি চোখের সামনে এল ভেসে।

যেদিকে তাকাও না কেন, পুরোনো বনটি পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে। গাছের মাথাগুলো প্রায় এক জোট, নিচেটা তাই আধো-অন্ধকারে ভরা। নানা রকমের গাছ বনটিতে। বার্চগুলো এখনো পত্রহীন, চুড়োগুলো হাওয়ায় জমে-যাওয়া ধোঁয়ার মত দেখাচ্ছে, শাদা গুঁড়িগুলো পাইনগাছের সোনালী গুঁড়িগুলোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, আর তাদের মধ্যে এখানে সেখানে ফারগাছের ধারালো কালো মাথা দেখা যাচ্ছে।

গাছের নিচে একটা জায়গায় বরফ বহু লোকের পায়ে অনেক দিন দলিত, সেখানে খোঁদলগুলো, গাছের আড়ালে বলে উপর কিম্বা নিচ থেকে শত্রুদের চোখে পড়ে না। বহু প্রাচীন ফারগাছের শাখায় শাখায় বাচ্চাদের জামাকাপড় শুকোচ্ছে, আলো হাওয়া লাগাবার জন্য হাঁড়িকুঁড়ি বসানো পাইনের ডালপালায়, একটা পুরোনো ফারগাছের গুঁড়ি থেকে ঝুলছে শেওলার সরু সরু ফালি আর তার মোটা শেকড়ের মাঝখানেতে পেন্সিল দিয়ে আঁকা সরল, চেপটা মুখ একটা চটচটে ন্যাকড়ার পুতুল পড়ে আছে; সেখানটায় কোন হিংস্র জানোয়ার শুয়ে থাকলেই স্বাভাবিক লাগত।

স্ট্রেচারটি চলেছে আগে আগে, আর দলিত শেওলার আস্তরণে ঢাকা "রাস্তা" ধরে পিছু পিছু ভিড় করে আসছে লোকেরা।

খোলা হাওয়ায় এসে প্রথমে সহজাত বন্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে আলেক্সেই ভরে গেল, কিন্তু তারপরে এল মধুর নিঃশব্দ বিষণ্ণতার অনুভূতি।

ছোট একটা পকেট-রুমালে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল লেনচ্‌কা, চোখের জলের কারণ নিজের মত করে বুঝে স্ট্রেচার-বাহকদের আরো আস্তে আস্তে যেতে বলল।

'না, না, আরো জোরে, আরো জোরে চলুন!' তাগাদা দিয়ে মেরেসিয়েভ বলল।

ওর মনে হচ্ছিল ওরা ভয়ানক ধীরেসুস্থে চলেছে। ভয় করছে যে এখান থেকে চলে যেতে পারবে না ও, মস্কো থেকে আসা বিমানটি তার জন্য অপেক্ষা না করেই চলে যাবে, ক্লিনিকে পেঁছিতে ও আর পারবে না। স্ট্রেচার-বাহকেরা কদম বাড়িয়ে দেওয়াতে কষ্ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে গোঙাচ্ছে ও, কিন্তু তবু বারবার বলতে লাগল, "তাড়াতাড়ি, দয়া করে, আরো তাড়াতাড়ি চলুন!" মিখাইল দাদু হাঁপাচ্ছেন শুনল, দেখল যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন তিনি, তবু আরো তাড়াতাড়ি যেতে ওদের বলল। বৃদ্ধের জায়গায় স্ট্রেচারে দুজন স্ত্রীলোক হাত লাগাল; লেনচ্‌কার উল্টোদিকে স্ট্রেচারের পাশাপাশি বৃদ্ধ চললেন কষ্ট করে। নিজের ফৌজী টুপিতে ঘর্মাক্ত টেকো মাথা, লাল-হয়ে-ওঠা মুখ আর কুঞ্চিত ঘাড় মুছতে মুছতে প্রশান্তভাবে বিড়বিড় করে বৃদ্ধ বললেন:

'আমাদের ছোটাচ্ছ, বুঝি! খুব তাড়া দেখছি!.. ঠিক করেছ, আলিওশা, একদম ঠিক করছ, খুব তাড়া দাও ওদের! মানুষের তাড়া থাকলে বোঝা যায় শরীরে প্রাণ আছে, বেশ জোরে ধকধক করছে সেটা। ঠিক বলছি না, কুড়িয়ে পাওয়া আমাদের পেয়ারের ছেলে?.. হাসপাতাল থেকে চিঠি দিও আমাদের। ঠিকানাটা মনে রেখো: কালিনিন অঞ্চল, বলগয়ে জেলা, ভাবী প্লাভনি গ্রাম। কী? ভাবী গ্রাম বলছি। ভাববার কিছু নেই, চিঠিটা ঠিক পেঁছিবে। ভুলো না যেন। ঠিকানায় কোনো গড়বড় নেই!'

স্ট্রেচারটি যখন বিমানে তোলা হল আর বিমান পেট্রলের ঝাঁঝালো গন্ধ ঝট করে নাকে এল, তখন আবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল আলেক্সেই। সেলুলয়েডের ঢাকনাটা মাথার উপর দেওয়া হয়েছে। ওকে বিদায় জানাতে এসে যারা হাত নাড়ছে তাদের আর দেখা যাচ্ছে না; ছাই রঙের রুমাল মাথায় রুষ্ট দাঁড়কাকের মত চেহারা ছোটখাটো সেই বক্রনাসা বৃদ্ধাটি বিমানের

প্রপেলারের ঝাপটা হাওয়া আর ভয় কাটিয়ে দেগতিয়ারেঙ্কোর কাছে ঠেলে এসে মুরগীর বাকি অংশটুকুর মোড়কটা দিল তার হাতে, সেটা দেখতে পেল না আলেক্সেই; তার চোখে পড়ল না মিখাইল দাদু বিমানটির চারপাশে কেমন ব্যস্তসমস্তভাবে ঘুরছেন, মেয়েদের বকছেন আর বাচ্চাদের ভাগিয়ে দিচ্ছেন; চোখে পড়ল না, হাওয়ায় ওঁর টুপিটা উড়ে গিয়ে বরফে গড়িয়ে চলেছে, খোলা মাথায় উনি দাঁড়িয়ে, টাকটা চকচক করছে, পাতলা রুপোলী চুল, গ্রামের অনাড়ম্বর আইকনে আঁকা সেণ্ট নিকলাসের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। বিদায়োন্মুখ বিমানটির দিকে হাত নাড়ছেন মিখাইল দাদু, মেয়েদের দঙ্গলে একমাত্র পুরুষ।

হ্রদের জমাট বরফ থেকে এক চাকায় উঠিয়ে বিমানটিকে লোকজনের মাথার উপর দিয়ে নিয়ে গেল দেগতিয়ারেঙ্কো, রানারগুলো বরফে প্রায় লাগে লাগে, উঁচু, খাড়া তীরের নিচে হ্রদ ঘেঁষে সাবধানে চলে একটি বনাকীর্ণ দ্বীপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল বিমানটি। জঙ্গী বিমান বাহিনীর এই অসমসাহসিক লোকটি একাধিকবার ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে বেপরোয়াভাবে বিমান চালানোর জন্য বকুনি খেয়েছে, কিন্তু এখন খুব সাবধানে চলেছে সে, উড়ছে না, গুঁড়ি মেরে, প্রায় মাটি ঘেঁষে, ছোট ছোট নদীর রেখায় পথ চিনে, নানা হ্রদের তীরের আড়ালে থেকে এগোচ্ছে। আলেক্সেই দেখল না কিছু, কিছু এল না তার কানে। পেট্রল আর অন্য তেলের চেনা গন্ধে, ওড়বার অনুভূতির উল্লাসে জ্ঞান হারাল সে। জ্ঞান হল যখন বিমান-ঘাঁটিতে পেঁছিয়ে স্ট্রেচারটা নামানো হচ্ছে, মস্কো থেকে ইতিমধ্যে আগত রেডক্রসের একটি জরুরী বিমানে তাকে তোলা হবে।

১৯

নিজের বিমান-ঘাঁটিতে যখন পেঁছিল তখন কাজের চাপ সবচেয়ে বেশী। পুরোদমে কাজ চলেছে, সেই কর্মমুখর বসন্তে কোনদিন নিশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকত না।

ইঞ্জিনের গর্জন ক্রমাগত কানে আসছে। পেট্রল ভরার জন্য কোন স্কোয়াড্রন নামলেই তার জায়গায় অন্য একটা স্কোয়াড্রন উড়ছে, আবার একটা আসছে। বৈমানিক থেকে আরম্ভ করে পেট্রলট্যাঙ্কের চালক আর পেট্রলগুদাম-রক্ষক পর্যন্ত আপ্রাণ কাজ করে চলেছে। চিফ অব স্টাফের গলা ভেঙ্গে গিয়েছে, কোন রকমে ফিসফিস করে কথা বলছেন তিনি।

কিন্তু নিদারুণ কর্মব্যস্ততা আর সাধারণ উত্তেজনা সত্ত্বেও সবাই সাগ্রহে মেরেসিয়েভের পৌঁছনোর অপেক্ষায় ছিল।

নেমে ঢাকা জায়গায় বিমানগুলোকে নিয়ে যাবার আগেই বৈমানিকেরা ইঞ্জিনের গর্জনের মধ্যে চেঁচিয়ে মিস্ত্রীদের জিজ্ঞেস করছে, 'এখনো আসেনি ও?'

'ওর কোন খবর এসেছে?' গুদামে পেট্রল-ট্যাঙ্কগুলোকে নিয়ে আসতে না আসতেই সেখানকার "পেট্রল-চাঁই"রা খোঁজ করছে।

বনের উপর থেকে পরিচিত রেডক্রস বিমানটি কখন আসবে তার শব্দ শোনার জন্য প্রত্যেকে কান পেতে আছে...

জ্ঞান হয়ে আলেক্সেই দেখল একটি দুলন্ত স্ট্রেচারে শুয়ে আছে, চারিদিকে চেনাশোনা মুখের ঘনিষ্ঠ ভিড়। চোখ খুলল ও। আনন্দের ধ্বনি উঠল ভিড় থেকে। স্ট্রেচারের ঠিক পাশে আলেক্সেই দেখল উইং কম্যাণ্ডারের নবীন, অনড় মুখ আর সংযত হাসি। তার পাশে চিফ অব স্টাফের লাল, ঘর্মাক্ত মুখ, আর বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়ন যার অধীনে তার গোল ভরাট পাণ্ডুর মুখ, লোকটিকে তার কিপ্‌টেমি আর আমলাতান্ত্রিকতার জন্য আলেক্সেই দুচক্ষে দেখতে পারত না। কত চেনা মুখ! স্ট্রেচার-বাহকদের সামনেরটি হল ঢেঙ্গা ইউরা, ফিরে ফিরে আলেক্সেইকে দেখছে আর হোঁচট খাচ্ছে। ওর পাশে তাড়াতাড়ি হাঁটছে লাল-চুল, ছোটখাটো একটি মেয়ে, আবহাওয়া কেন্দ্রের সার্জেণ্ট। আগে আলেক্সেই'র মনে হত কোন কারণে মেয়েটি তাকে পছন্দ করে না, তার চোখের আড়ালে থাকার চেষ্টা করত মেয়েটি, লুকিয়ে তাকাত ওর দিকে, সে দৃষ্টিতে বিচিত্র কী একটা ভাব। ঠাট্টা করে আলেক্সেই ওকে "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" বলে ডাকত। মেয়েটির কাছাকাছি কুকুশকিন তাড়াতাড়ি হাঁটছে, ছোটখাটো মানুষ, মুখে কেমন যেন অপ্রীতিকর হলদে ভাব, ওর খিটখিটে মেজাজের জন্য স্কোয়াড্রনের লোকেরা ওকে পছন্দ করত না। কুকুশকিনও হাসছে, চেষ্টা করছে ইউরার বিরাট পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে। মেরেসিয়েভের মনে পড়ল শেষবার ওড়বার আগে, ধার শোধ করেনি বলে অনেকের সামনে ওকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল আর ভেবেছিল এই প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকটি সে-কথা কখনো ভুলবে না। কিন্তু এখন স্ট্রেচারের পাশে দৌড়চ্ছে সে, সাবধানে ওটাকে ধরছে আর যাতে কেউ ধাক্কা না দেয় তার জন্য কনুই দিয়ে হটাচ্ছে লোকজনকে।

এত বন্ধু যে তার আলেক্সেই কখনো ভাবেনি। লোকেদের সত্যিকারের

চেহারা তাহলে এরকম! যে "আবহাওয়া সার্জেণ্টটি" কোন কারণে তাকে ভয় করে তার জন্য দুঃখ হল আলেক্সেই'র; বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডারকে দেখে লজ্জা হল তার, ওর কিপটেমি নিয়ে কত না ইয়ার্কি আর টিপ্পনী বিমান ডিভিশনে ছড়িয়েছে! আর কুকুশকিনের কাছে মাপ চাইতে ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল অন্যদের বলে যে লোকটা শেষ পর্যন্ত সত্যিই অতটা অপ্রীতিকর আর একরোখা নয়। আলেক্সেই'র মনে হল অনেক যন্ত্রণা আর দুর্ভোগের পর অবশেষে আপন ঘরে ফিরেছে, ওর প্রত্যাবর্তনে সবাই আনন্দিত।

মাঠ হয়ে সাবধানে ওকে রুপালী রেডক্রস বিমানটিব কাছে নিয়ে যাওয়া হল, পত্রহীন একটি বার্চবনের ধারে প্রচ্ছন্নভাবে রাখা হয়েছিল বিমানটিকে। মিস্ত্রীরা ইতিমধ্যেই এঞ্জিন চালাতে শুরু করেছে।

'কমরেড মেজর...' উইং কম্যাণ্ডারকে মেরেসিয়েভ হঠাৎ ডাকল, যতখানি সম্ভব জোরে আর দৃঢ়ভাবে কথা বলার চেষ্টা করল ও।

স্বভাবসিদ্ধ শান্ত, হেঁয়ালি-ভরা হাসি মুখে, কম্যাণ্ডার আলেক্সেই'র কাছে ঝুঁকলেন।

'কমরেড মেজর... মস্কোতে আমাকে পাঠাবেন না, আমাকে এখানে, আপনাদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দিন...'

কম্যাণ্ডার শুনতে পেলেন না বলে হেলমেটটি খুলে ফেললেন।

'মস্কোতে যেতে আমি চাই না। এখানে, চিকিৎসা-কর্মীদের দলে থাকতে চাই!'

ফারের দস্তানা খুলে, কম্বলের নিচে হাতড়ে আলেক্সেই'র হাতে চাপ দিয়ে মেজর বললেন:

'মজার লোক আপনি! আপনার বিশেষ চিকিৎসার দরকার।'

মাথা নাড়ল আলেক্সেই। এখানে এত ভালো আর আরাম লাগছে। যে-সব দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে সেগুলো আর ভয়াবহ মনে হচ্ছে না এখন, পায়ের ব্যথাটাও নয়।

'ও কী বলছে?' চিফ অব স্টাফ ভাঙ্গা গলায় জানতে চাইলেন। 'আমাদের সঙ্গে এখানে থাকতে চায়,' হেসে উত্তর দিলেন কম্যাণ্ডার। আর এখন, এই মুহূর্তে হাসিটা অন্য সময়ের মত হেঁয়ালি-ভরা নয়, বন্ধুত্বসূচক আর বিষণ্ণ হাসি।

'বোকা, রোমাণ্টিক! "পিওনেরস্কায়া প্রাভদার" জন্য দৃষ্টান্ত একটা,'

বললেন চিফ অব স্টাফ। ‘স্বয়ং সেনানায়কের আদেশে মস্কো থেকে ওর জন্য বিমান পাঠিয়ে দিয়ে ওকে সম্মান দেখিয়েছে ওরা, আর ও, কেমন লোক বলো ত?..’

মেরেসিয়েভ জবাবে বলতে চাইল যে সে রোমাণ্টিক নয়, শুধু ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে এখানে চিকিৎসা-ঘাঁটির তাঁবুতে চেনা পরিবেশে আরো অনেক তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে, এখানে একবার ত কয়েকদিন কাটিয়েছিল, বিমান জখম হবার পরে অসফল অবতরণের ফলে হাঁটুর গাঁট মচকে যায় তখন; মস্কো ক্লিনিকের অজানা সুযোগ-সুবিধের মধ্যে অত তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে না। চিফ অব স্টাফকে মুখের মত জবাব কী ভাষায় দেবে সেটা ঠিক করে ফেলেছে. কিন্তু মুখ খোলার আগেই সাইরেনের বিষণ্ণ আওয়াজ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের মুখে এল গম্ভীর কর্মব্যস্ততার ভাব। মেজর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আদেশ দিলেন আর পিঁপড়ের মত ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই; বনের প্রান্তে গোপনে দাঁড়ানো বিমানটির কাছে কয়েকজন দৌড়িয়ে গেল, কয়েকজন গেল পরিচালনা-ঘাঁটিতে, মাঠের ধারে একটা ছোট ঢিবি থেকে পরিচালনা-ঘাঁটিটা চেনা যায়. আর বনের মধ্যে লুকোনো গাড়িগুলোর দিকে গেল কয়েকজনে। আকাশে ধোঁয়ার একটা স্পষ্ট দীর্ঘ রেশ আলেক্সেই দেখল, একটা বহু-পুচ্ছ হাউইর রেখা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী সে বুঝতে পারল: "হুঁশিয়ারির" সঙ্কেত।

ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করল, নাসারন্ধ্র কাঁপছে, মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল, বিপদের মুহূর্তে হামেশাই তার এরকম হত।

বিপৎসূচক ধ্বনি যখন বাজল তখন বিমান-ঘাঁটির অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততায় লেনচ্‌কা, মিস্ত্রী ইউরা আর "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" বিশেষ কিছু করার ছিল না, তারা স্ট্রেচারটা চট করে তুলে নিয়ে বনের ধারের সবচেয়ে কাছাকাছি জায়গায় দৌড়ল, তিনজনেই দৌড়চ্ছে, মিলিয়ে পা ফেলার চেষ্টা সবাই করছে, কিন্তু উত্তেজনায় সেটা হয়ে উঠছে না।

আলেক্সেই কাতরে ওঠাতে হাঁটবার কদমে তারা চলল। দূরে ইতিমধ্যেই স্বয়ংক্রিয় বিমানধ্বংসী কামানের অস্থির খরখর আওয়াজ শুরু হয়েছে। একটার পর একটা বিমান গুড়ি মেরে রানওয়েতে পৌঁছিয়ে ঝট করে উপরে উঠছে। ইঞ্জিনের চেনা শব্দ ছাপিয়ে একটু পরেই বন থেকে আলেক্সেই'র কানে এল অসমান, মৃদু মুখর ঘড় ঘড় আওয়াজ, আর তাতে তার পেশীগুলো

সঙ্কুচিত হয়ে এল, টান-টান তারের মত; স্ট্রেচারে বাঁধা মানুষটি কল্পনা করল জঙ্গী বিমানের ককপিটে বসে আছে সে, শত্রুর সঙ্গে মোলাকাতে দ্রুতগতিতে যাচ্ছে।

অপরিসর লম্বা গর্তে স্ট্রেচারটা ঢোকান গেল না। ইউরা আর মেয়েরা ওকে কোলে করে নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু বাধা দিয়ে আলেক্সেই বলল যে বনের ধারে একটা বড়ো, বলিষ্ঠ বার্চগাছের নিচে স্ট্রেচারটাকে রাখা হোক। সেখানে শুয়ে যা সব ঘটল তা দেখল আলেক্সেই, দুঃস্বপ্নে যেমন তেমন দ্রুত ঘটনাগুলির পরম্পরা। মাটি থেকে আকাশ-যুদ্ধ দেখার সুযোগ বৈমানিকদের কালেভদ্রে হয়। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই মেরেসিয়েভ বিমান বাহিনীতে, কিন্তু এ পর্যন্ত মাটি থেকে আকাশ-যুদ্ধ কখনো দেখেনি। আকাশ-যুদ্ধের বিদ্যুৎগতিতে অভ্যস্ত সে, আর এখন অবাক হয়ে দেখল মাটি থেকে আকাশ-যুদ্ধটা কত নিরীহ মনে হয়, খাঁদা-নাক পুরোনো জঙ্গী বিমানগুলোর চলাফেরা কী রকম শ্লথ, আকাশে ওদের মেসিনগানগুলোর খরখর আওয়াজও কেমন সাদাসিধে — ঘরোয়া নানা শব্দের কথা মনে হয় — সেলাই কলের ঘড়ঘড় কিম্বা সুতী সাদা কাপড় ছেঁড়ার শব্দ।

বারোটা জার্মান বোমারু বিমান, ইংরাজী ভি-র আকারে দল বেঁধে বিমান-ঘাঁটিটাকে এড়িয়ে উজ্জ্বল আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেল, সূর্য এখন অনেক উঁচুতে। মেঘের ধারে ধারে এত ঝকঝকে আলো যে সেদিকে তাকাতে কষ্ট হয়, মেঘের আড়াল থেকে এল ওদের ইঞ্জিনের নিচু ঘড়ঘড় আওয়াজ, গুবরে পোকার ডাকের মত।

বনের বিমানধ্বংসী কামানগুলোর গর্জন আর গরগর চরমে পেঁছিল। ওদের ফাটন্ত গোলার ধোঁয়া ডানডেলিয়নের রোঁয়াওয়ালা বীচির মত আকাশে ভাসছে। জঙ্গী বিমানের ডানার ক্বচিৎ ঝলক, আর কিছু চোখে পড়ে না।

ক্রমশ গুবরে পোকারা গুনগুনে বাধা দিচ্ছে সুতী কাপড় ছেঁড়ার খ্যাস খ্যাস শব্দ। চোখ-ঝলসানো আলোয় যুদ্ধ চলেছে, কিন্তু আকাশ-যুদ্ধ করার সময় বৈমানিকেরা যা দেখে সেটা আর নিচে থেকে দেখা এটার চেহারা এত আলাদা, এটা এত অর্থহীন আর সাধারণ মনে হচ্ছে যে আলেক্সেই দেখে চলল বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র উত্তেজনা হল না।

ক্রমশ বেড়ে-ওঠা তীক্ষ্ম কর্ণভেদী আওয়াজে এক সারি বোমা ঝড়ের গতিতে আয়তনে বড়ো হয়ে উঠে নিচে সবেগে নেমে আসছে, ঝোপ থেকে

ঝাড়া কালো জলের ফোঁটার মত; এমন কি তখনো ভয় হল না
মাথা একটু তুলে দেখল বোমাগুলো কোথায় পড়বে।

ঠিক সেই মুহূর্তে "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" ব্যবহারে আলেক্সেই অবাক হয়ে গেল। কোমর পর্যন্ত গর্তে মেয়েটি দাঁড়িয়ে যথারীতি আড়চোখে তাকে দেখছিল; বোমাগুলোর কর্ণভেদী চীৎকার চরমে পেঁছিয়েছে, হঠাৎ এক লাফে বেরিয়ে ছুটে স্ট্রেচারটার কাছে গেল মেয়েটি, সটান শুয়ে পড়ে নিজের শরীর দিয়ে আলেক্সেইকে ঢাকল, ভয়ে আর উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে।

নিমেষের জন্য নিজের চোখের খুব কাছে আলেক্সেই দেখল রোদে-পোড়া, শিশুসুলভ একটি মুখ, ভবাট ঠোঁট, খাঁদা নাক। বনের কোথা থেকে এল বিস্ফোরণের গভীর আওয়াজ, পরমুহূর্তেই আর একটি, সেটি অনেক কাছে, তারপর আরো দুটি বিস্ফোরণ। পঞ্চম বিস্ফোরণটি এত প্রচণ্ড যে মাটি কেঁপে দুলে উঠল। যে গাছটির নিচে আলেক্সেই শুয়ে তার মাথাটা বিস্ফোরণের একটা টুকরোয় ভেঙ্গে গিয়ে সশব্দে মাটিতে পড়ল। আবার আলেক্সেই দেখল মেয়েটির বিবর্ণ ভয়ার্ত মুখ, নিজের গালে ওর গালের ঠাণ্ডা ছোঁয়াচ লাগল। দুটো বিস্ফোরণের মাঝের মুহূর্তটিতে ভয়ার্ত মেয়েটি ফিসফিস করে বলল:

'লক্ষ্মী আমার!.. সোনা আমার!'

বিকট আওয়াজে আর এক সারি বোমা ফেটে পড়ল, মাটি উঠল কেঁপে, মনে হল গাছগুলো আমূল বিমান-ঘাঁটির উপরে আকাশে ছিটকে গিয়েছে, ওদের মাথা খুলে গেল, আর জমাট মাটির বিরাট ডেলা বাজের গুরুগুরু ধ্বনিতে মাটিতে পড়ল, আকাশে রেখে গেল তামাটে ঝাঁঝালো ধোঁয়ার রেশ, রসুনের মত গন্ধ তাতে।

ধোঁয়া মিলিয়ে গেল, চারিদিক চুপচাপ। বনের পিছনে আকাশ-যুদ্ধের আওয়াজ প্রায় শোনা যাচ্ছে না। মেয়েটি ইতিমধ্যে ঝট করে দাঁড়িয়ে উঠেছে, ওর গালদুটো আর পাণ্ডুর নেই, লাল হয়ে উঠেছে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ, প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা, আলেক্সেই'র দিকে না তাকিয়ে অপরাধীর মত গলায় বলল:

'আপনার লাগেনি ত! কী বোকা, হে ভগবান, কী দারুণ বোকা আমি! বিশেষ দুঃখিত আমি!'

'এখন মাপ চেয়ে আর কী হবে,' গরগর করে ইউরা বলল, ও লজ্জিত যে আবহাওয়া কেন্দ্রের মেয়েটি তার বন্ধুকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল, ও নিজে যায়নি।

গরগর করতে করতে ওভারঅল থেকে বালি ঝাড়ল ইউরা, মাথার পেছনটা চুলকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কবন্ধ বার্চগাছটির এবড়োখেবড়ো গোড়ার দিকে, সেটির গুঁড়ি থেকে স্বচ্ছ রস অঝোর ধারায় চুঁইয়ে পড়ছে। আহত গাছটির রস আলোয় ঝিকঝিক করে শেওলাচ্ছন্ন ছাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়ছে, পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখের জলের মত।

'দেখো, গাছটা কাঁদছে!' বলল লেনচকা, বিপদের মধ্যেও ওর বেহায়া কৌতূহলের ভাবটা যায়নি।

'তুমিও কাঁদতে ওরকম করে!' বিষণ্ণভাবে ইউরা বলল। 'যাক, তামাশা শেষ। এবার যাওয়া যাক! আশা করি এ্যামবুলান্স-বিমানটি জখম হয়নি।'

'বসন্ত শুরু হয়েছে এখানে!' বিকলাঙ্গ গাছের গুঁড়ি, চিকচিকে স্বচ্ছ রস টপটপ করে মাটিতে পড়ছে, খাঁদা-নাক "আবহাওয়া সার্জেন্ট", যার আর্মিকোটটা বেজায় বড়ো, যার নামটা পর্যন্ত অজানা, সবকিছুর দিকে তাকিয়ে আলেক্সেই বলল।

ওরা তিনজন — ইউরা সামনে, মেয়েদুটি পিছনে, ওকে নিয়ে চলল বিমানটির দিকে; বোমার বিস্ফোরণে কয়েক জায়গায় হাঁ হয়ে যাওয়া মাটি থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে, গলন্ত বরফের জল তাতে চুঁইয়ে পড়ছে, গর্তগুলো এড়িয়ে আঁকাবাঁকা পথে ওরা চলল; আর্মিকোটের মোটা আস্তিন থেকে যে ছোট বলিষ্ঠ হাতটা দৃঢ়ভাবে স্ট্রেচারের একটা বাঁট চেপে আছে তার দিকে সকৌতূহলে আড়চোখে তাকাল আলেক্সেই। কী হয়েছে মেয়েটির! কিম্বা হয়ত ভয়ের মুহূর্তে কথাগুলো শুনেছে কল্পনা করেছিল নিজে?

তার পক্ষে ভবিতব্যতায় ভারী সেই দিনটিতে আর একটি ঘটনা দেখল মেরেসিয়েভ। রূপালী রেডক্রস বিমানটি আর ফ্লাইট মিস্ত্রীটি ইতিমধ্যেই দৃষ্টিপথে এসেছে, মিস্ত্রীটি মাথা নেড়ে বিমানটির চারিদিকে ঘুরে দেখছে বিস্ফোরণের ঝটকায় কিম্বা কোন টুকরোয় ওটা জখম হয়েছে কিনা, এমন সময় জঙ্গী বিমানগুলো ফিরে এসে নামতে শুরু করল। বনের উপর দিয়ে সোঁ করে এসে যথারীতি বৃত্তাকারে না ঘুরেই নামল আর বেগ না কমিয়ে গেল বনের ধারে মাটির দেয়াল-ঘেরা জায়গায়।

আকাশে আর কোন হৈচৈ নেই। বিমান-ঘাঁটি সাফ করা হয়েছে, বনে ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ থেমে গেল। কিন্তু পরিচালনা-ঘাঁটিতে লোকজন তখনো দাঁড়িয়ে, রোদ বাঁচাবার জন্য চোখের সামনে হাতের আড়াল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ন নম্বর ফেরেনি! কুকুশকিন কোথাও আটকা পড়েছে,' ইউরা বলল।

কুকুশকিনের ছোট গোমড়া মুখের কথা আলেক্সেই ভাবল, তাতে হামেশাই অসন্তোষের ছাপ লেগে থাকত, মনে পড়ল সকালে কী যত্নে ওর স্ট্রেচারে হাত রেখে কুকুশকিন চলেছিল। ও কী তাহলে... ভাবনাটা কর্মমুখর দিনে অন্য কোন বৈমানিকের পক্ষে অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু আলেক্সেই ত এখন বিমান-ঘাঁটির জীবনের বাইরে, ও শিউড়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ।

আনন্দে লাফিয়ে ইউরা চেঁচিয়ে উঠল:

'ওই আসছে কুকুশকিন!'

পরিচালনা-ঘাঁটির লোকজনের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কিছু একটা ঘটেছে। "ন নম্বর" নামল না, বিমান-ঘাঁটির চারিদিকে বড়ো বৃত্তে ঘুরছে, আলেক্সেই'র উপর দিয়ে যখন গেল তখন ও দেখল যে ডানাটার একটা অংশ গুলিতে উড়ে গিয়েছে, আর, আরো অনেক খারাপ ব্যাপার সেটা, কাঠামোর নিচে একটা মাত্র "পা" দেখা যাচ্ছে। দুটো লাল হাউই একটার পর একটা আকাশে ছোঁড়া হল। বিমান-ঘাঁটির উপরে আবার উড়ে এল কুকুশকিন। ওর বিমানটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা পাখি নষ্ট নীড়ের উপরে ঘুরছে, কোথায় নামবে জানে না। তৃতীয় বার বৃত্তাকারে বিমানটি চলল।

'ও এক্ষুণি পারাস্যুটে নামবে, পেট্রল শেষ হতে চলেছে, শেষ কয়েকটা ফোঁটায় ওটা উড়ছে,' ফিসফিস করে বলল ইউরা, ওর চোখ ঘড়ির কাঁটায় আটকিয়ে গিয়েছে।

এরকম অবস্থায়, নামা যখন অসম্ভব, তখন বৈমানিকেরা কিছু উঁচুতে উঠে পারাস্যুট করে নামতে পারে। খুব সম্ভব এ মর্মের নির্দেশ "ন নম্বর"কে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একগুঁয়ের মত বিমানটি বৃত্তাকারে ঘুরেই চলল।

ইউরা একবার বিমানটির দিকে তাকাচ্ছে আর একবার ঘড়ির দিকে। বিমানের গতিবেগ মন্থর হয়ে আসছে যখন মনে হচ্ছে তখন উবু হয়ে বসে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে ও। "ও কি বিমানটাকে বাঁচাবার কথা ভাবছে?" উপস্থিত সবায়ের মনে এক চিন্তা: "লাফাও, লাফাও এবার!"

লেজে "১" আঁকা একটি জঙ্গী বিমান তীরের মত আকাশে উড়ে প্রথম চক্কর নিয়েই সুকৌশলে আহত "ন নম্বরের" পাশে এসে পড়ল। যে রকম

কৌশলে আর অবিচলিতভাবে বিমানটি চালানো হচ্ছে তা থেকে আলেক্সেই আঁচ করল যে চালক উইং কম্যাণ্ডার স্বয়ং। তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন যে কুকুশকিনের রেডিও বেকার; কিম্বা তার মাথা গুলিয়ে গিয়েছে, তাই তাকে সাহায্য করতে অচিরাৎ এসেছেন। বিমানের ডানা দুলিয়ে সংকেত করলেন, "আমি যা করছি, ঠিক সেইরকম করো," আর একপাশে হেলে উপরে উঠলেন। কুকুশকিনকে তিনি আদেশ দিলেন পাশে উড়ে গিয়ে বিমান ছেড়ে লাফাতে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গ্যাস কমিয়ে দিয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হল কুকুশকিন। ডানা-ভাঙ্গা বিমানটি আলেক্সেই'র ঠিক মাথার উপর দিয়ে সবেগে উড়ে মাটির কাছাকাছি এসে পড়ল। হঠাৎ বাঁ দিকে হেলে, যে "পার্টি" অক্ষত তাতে ভর করে নামল, এক চাকায় কিছুটা এগিয়ে গতিবেগ কমিয়ে বিমানটি ডান দিকে হেলে পড়ল, অক্ষত ডানাটি মাটিতে লাগাতে বরফের ঝড় তুলে সবেগে ঘুরপাক খেল।

বরফের ঘূর্ণি কমে গেলে দেখা গেল কালো কী একটা পঙ্গু বিমানটার কাছে পড়ে আছে। কালো জিনিসটির দিকে লোকজনেরা দৌড়িয়ে গেল, সাইরেন বাজিয়ে এ্যাম্বুলান্সের গাড়ি ছুটল সেদিকে।

"বিমানটিকে বাঁচিয়েছে ও! কুকুশকিন তাহলে এ ধরনের মানুষ! এরকম কাজ করতে কবে শিখল ও?" স্ট্রেচারে শুয়ে মেরেসিয়েভ ভাবছে, কুকুশকিনের উপর হিংসে হচ্ছে তার।

ওর আগ্রহ হল প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে যায় সেখানে যেখানে শুয়ে আছে ছোটখাটো, সবায়ের অপ্রিয় মানুষটি, যে মানুষটি নিজেকে সাহসী আর সুদক্ষ বৈমানিক বলে প্রমাণ করেছে। কিন্তু স্ট্রেচারে বাঁধা আলেক্সেই, তাকে ঘিরেছে যন্ত্রণার নাগপাশ, স্নায়বিক উত্তেজনা থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে যন্ত্রণায় আবার সে অভিভূত।

সবকিছু ঘটতে এক ঘণ্টারও বেশী লাগেনি, কিন্তু ঘটনাগুলি সংখ্যায় এত বেশী, এত তাড়াতাড়ি ঘটে যে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে আলেক্সেই তৎক্ষণাৎ পারেনি। রেডক্রস বিমানের বিশেষ খোলে স্ট্রেচারটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে; আবার তার চোখে পড়ল "আবহাওয়া সার্জেণ্টটি" একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে, শুধু তখনি বোমাবৃষ্টির সময়ে মেয়েটির বিবর্ণ মুখ দিয়ে যে কথাগুলো ফসকে বেরিয়ে এসেছিল তাদের আসল অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারল আলেক্সেই। এই চমৎকার, আত্মত্যাগী মেয়েটির নাম পর্যন্ত জানে না বলে ওর লজ্জা হল।

'কমরেড সার্জেণ্ট,' নিচু গলায় ও ডাকল, কৃতজ্ঞভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে।

ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়ের মধ্যে মেয়েটি শুনল কিনা সন্দেহ, কিন্তু এগিয়ে একটা প্যাকেট ওর সামনে ধরে সে বলল:

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, এগুলো আপনার চিঠি। চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিলাম, কেননা আমি জানতাম আপনি বে'চে আছেন, আবার ফিরে আসবেন। জানতাম সেটা, মনে প্রাণে জানতাম...'

চিঠির ছোট গোছাটা আলেক্সেই'র বুকের উপরে রাখল মেয়েটি। ও দেখল কয়েকটি চিঠি এসেছে মায়ের কাছ থেকে, তিনকোণা করে ভাঁজ করা, ঠিকানাগুলো বয়স্কার টেরাবাঁকা হাতে লেখা। আর কয়েকটার খাম পরিচিত, সেরকম খাম ও সব সময়ে টিউনিকের পকেটে রাখত। সেগুলো দেখে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কম্বলের নিচে থেকে হাত বের করার চেষ্টা করল আলেক্সেই।

'কোন মেয়ে লিখেছে বুঝি?' "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" বিষণ্নভাবে জিজ্ঞেস করল, আবার ওর মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখে জল আসাতে ওর দীর্ঘ তামাটে চোখের পাতা ভিজে জুড়ে গেল।

আলেক্সেই বুঝতে পারল যে বিস্ফোরণের সময়ের সে কথাগুলো তাহলে কল্পিত নয়; বুঝতে পেরে সত্যি কথা বলার সাহস হল না তার।

'আমার বোনের চিঠি, সে বিবাহিত। ওর পদবী অন্য এখন,' বলে আলেক্সেই আত্মগ্লানি বোধ করল।

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে অন্যদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। পাশের দরজা খুলে গেল, একজন অচেনা চিকিৎসক বিমানে উঠলেন, তাঁর আর্মিকোটের উপরে শাদা ওভারঅল চাপানো।

'রোগীদের একজন তাহলে ইতিমধ্যেই এখানে? বেশ, বেশ,' মেরেসিয়েভের দিকে তাকিযে তিনি বললেন। 'অন্যটিকেও নিয়ে এসো। আমরা এক্ষুণি ছাড়ব। আর আপনি এখানে কী করছেন, মহাশয়া?' বাস্পে-ঝাপসা চশমার মধ্যে দিয়ে "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, মেয়েটি ইউরার আড়ালে থাকার চেষ্টা করছিল। 'আপনি যান, দয়া করে, আমরা এক্ষুণি ছাড়ব। ওহে, স্ট্রেচারটি ঢোকাও!'

'চিঠি দেবেন, ভগবানের দোহাই, চিঠি দেবেন, আমি অপেক্ষায় থাকব!' আলেক্সেই শুনল মেয়েটি ফিসফিস করে বলছে।

ইউরার সহায়তায় চিকিৎসকটি একটি স্ট্রেচার বিমানের মধ্যে তুলে নিলেন, তার উপরে শুয়ে কে যেন গোঙাচ্ছে। খোলে বসানোর সময় ঢাকা-দেওয়া চাদরটা স্ট্রেচার থেকে খসে পড়াতে আলেক্সেই'র চোখে পড়ল যন্ত্রণায় বিকৃত কুকুশকিনের মুখ। ডাক্তার হাতে হাত ঘষে কামরার চারিদিকে তাকিয়ে মেরেসিয়েভের পেট চাপড়িয়ে বললেন:

'খাসা, চমৎকার! একজন সহযাত্রী আপনার সঙ্গে দেব। কী বলুন? আর এখন অন্য সবাই বেরিয়ে যাও। সার্জেন্টের চিহ্নওয়ালা লরেলি তাহলে চলে গিয়েছে? বেশ! এবার রওনা হওয়া যাক!'

ইউরার চলে যেতে দেরী হল। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক তাকে ঠেলে বের করে দিলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বিমানটি কেঁপে উঠল, চলতে শুরু করল, তারপর উপরে উঠে ধীর মসৃণভাবে তার নিজের জগতে ভেসে গেল, ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় সমানে বেজে চলেছে। দেয়াল ধরে ধরে চিকিৎসক মেরেসিয়েভের কাছে গেলেন।

'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'নাড়ীটা দেখি।' জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে মেরেসিয়েভের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আচ্ছা। মনের জোর আছে!' তারপর মেরেসিয়েভকে বললেন, 'আপনার বন্ধুদের কাছে আপনার দুঃসাহসিক কাজের কথা শুনেছি, প্রায় অবিশ্বাস্য গল্পগুলো, অনেকটা জ্যাক লন্ডনের গল্পের মত।'

ধপাস করে বসে আরামে গা ছড়ালেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে পড়ে ঝিমোতে শুরু করলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল এই বিগতযৌবন, বিবর্ণমুখ লোকটি অসীম ক্লান্ত।

"জ্যাক লন্ডনের গল্পের মত।" ভাবল মেরেসিয়েভ, আর সুন্দর শৈশবের স্মৃতি আবার ফিরে এল: একটি লোক, ঠান্ডায় তার পা অসাড় হয়ে গিয়েছে, মরুভূমিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে, পিছু পিছু আসছে রুগ্ন ক্ষুধিত একটি নেকড়ে, তার গল্প। ইঞ্জিনের সমান ঘড়ঘড় আওয়াজে ঘুম পাচ্ছে, সবকিছু ভাসছে, অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে ধূসর অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে যে অদ্ভুত কথাটি তার মনে হল সেটি হচ্ছে যে যুদ্ধ থেমে গেছে, বোমা আর পড়ছে না, পায়ের সেই অবিরত দবদবে যন্ত্রণা আর নেই, মস্কো অভিমুখে খরবেগে চলছে না বিমানটা, এসব কিছু কামিশিন সহরে তার ছেলেবেলায় পড়া কোন আশ্চর্য বই থেকে নেওয়া।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

রাজধানীর যে হাসপাতালে মেরেসিয়েভ ও লেফ্‌টেনাণ্ট কনস্তান্তিন কুকুশকিনকে রাখা হল সেটি সত্যিই চমৎকার, বন্ধুর কাছে সেটির বর্ণনা করার সময় আন্দ্রেই দেগ্‌তিয়ারেঙ্কো আর লেনচ্‌কা মোটেই অত্যুক্তি করেনি।

যুদ্ধের আগে একটি ইনস্টিটিউটের ক্লিনিক ছিল সেটি, ব্যাধি কিম্বা আঘাতের পরে লোকেরা কী করে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারে তার নতুন নানা উপায় নিয়ে একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সোভিয়েত বিজ্ঞানী গবেষণা করতেন সেখানে। ইনস্টিটিউটটি নানা ঐতিহ্যে গরীয়ান, পৃথিবী জুড়ে তার খ্যাতি।

যুদ্ধ বাধার পর ক্লিনিকটিকে বাহিনীর আহত অফিসারদের হাসপাতালে পরিণত করেন বিজ্ঞানীটি। আধুনিক বিজ্ঞানের জানা যত কিছু পদ্ধতিতে রোগীদের চিকিৎসা চলে। মস্কোর অনতিদূরে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে, ফলে আহতদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে আগেকার তুলনায় খাটের সংখ্যা চারগুণ বাড়াতে হল। অন্যান্য সমস্ত ঘর — আগন্তুকদের বসবার ঘর, পড়ার আর বিশ্রামের ঘর, কর্মচারীবৃন্দের ঘর আর খাবার ঘর — ওয়ার্ডে পরিণত করা হল। এমন কি গবেষণাগারের পাশে নিজের পড়বার ঘরটি পর্যন্ত বিজ্ঞানী ছেড়ে দিয়ে বইটই নিয়ে ছোট্ট একটি ঘরে গেলেন, সেটিতে আগে কাজের সময় নার্সরা থাকত। তা সত্ত্বেও করিডরে মাঝেমাঝে খাট পাততে হত।

ঝকঝকে শাদা দেয়ালগুলো দেখে মনে হত চিকিৎসা মন্দিরের উপযুক্ত গম্ভীর স্তব্ধতার জন্যই বিশেষ করে ওদের বানানো হয়েছে, দেয়ালের ওধার থেকে আসছে ঘুমন্ত রোগীদের গোঙানি আর নাক ডাকার শব্দ, বিকারগ্রস্তদের প্রলাপ। যুদ্ধের নানা গুমোট ভারী গন্ধে জায়গাটি আচ্ছন্ন, রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ,

দগদগে ঘা আর জীবন্ত মানুষের পচা মাংসের গন্ধ. সে গন্ধ কিছুতেই তাড়ানো যায় না। বিজ্ঞানীর নিজের নক্সায় তৈরী আরামি খাটগুলোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর ভাঁজ-করা খাট। বাসনপত্র কম পড়ে গিয়েছিল। ক্লিনিকের সুন্দর সুন্দর চীনামাটির বাসন ছাড়াও এ্যালুমিনিয়ামের টোল-খাওয়া বাটি ব্যবহার করা হত। কাছাকাছি ফাটা বোমার ঝটকায় বিরাট ইতালীয় জানলাগুলোর কাচ ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে. জানলাগুলো পিজবোর্ড দিয়ে ঢাকা। এমন কি জলের অভাবও ছিল. প্রায়ই গ্যাস বন্ধ করে দেওয়া হত, পুরোনো অপ্রচলিত স্পিরিট-স্টোভে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ করে নেওয়া হত। কিন্তু আহতদের ভিড় কমছে না। ক্রমাগত তাদের আনা হচ্ছে — বিমানে. গাড়িতে আর ট্রেনে -- সংখ্যা তাদের বেড়েই চলেছে। আমাদের আক্রমণের জোর যত বাড়ছে সেই অনুপাতে বাড়ছে আহতদের সংখ্যাও।

কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও হাসপাতালের সবাই — সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্য. মাননীয় বিজ্ঞানী যিনি সেই অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে, ওয়ার্ডের মেয়েরা. ক্লোকরুমের পরিচারিকা আর মেয়ে পোর্টাররা পর্যন্ত সবাই ইনস্টিটিউটটির প্রচলিত সমস্ত প্রথার একচুল এদিক ওদিক হতে দেয় না. যদিও তারা ক্লান্ত. মাঝেমাঝে আধ-পেটা থাকতে হয়. পুরো রাত্রির বিশ্রাম কাকে বলে ভুলে গিয়েছে তারা। ওয়ার্ডের মেয়েরা মাঝেমাঝে বিশ্রাম না করে একটানা দু'তিন পালা কাজ করে যায়. এতটুকু অবসর মিললেই ধোয়ামোছা শুরু করে. এক মুহূর্ত নষ্ট হতে দেয় না। নার্সরা শীর্ণ. বুড়িয়ে গিয়েছে তারা. অবসাদে ঠিকমত পা পড়ে না. আগেকার মতই ধবধবে শাদা ওভারঅলে কাজে আসে, ডাক্তারদের সব নির্দেশ আগেকার মতই একচুল এদিক ওদিক না করে কার্যকরী করে। হাউস সার্জনরা রোগীদের বিছানায় দাগটুকু দেখলেই যথারীতি কঠোর মন্তব্য করে, রুমাল দিয়ে দেয়াল, সিঁড়ির থাম্বার রেল আর দরজার হাতল ঘষে দেখে যে কোন ময়লা আছে কিনা। দিনে দুবার, নির্ধারিত সময়ে অধ্যক্ষ নিজে যুদ্ধের আগে যেমন তেমন ওয়ার্ডে রোঁদ দিতে আসেন. পিছু পিছু শাদা ওভারঅল পরনে হাউস সার্জন আর সহকারীর রীতিমত একটা দল . দীর্ঘাকৃতি, টকটকে লাল মুখ বৃদ্ধ অধ্যক্ষটি দারুণ নিয়ম মেনে চলেন, তাঁর প্রশস্ত কপালের উপরে ঘন চুলে পাক ধরেছে, গোঁফজোড়া কালো. জমকালো দাড়িতে শাদার ছিট. নতুন রোগীদের কার্ড পর্যবেক্ষণ করে. অবস্থা যাদের খারাপ তাদের বিষয়ে নির্দেশ দেন।

বিক্ষুব্ধ সেই সব দিনগুলোতে হাসপাতালের বাইরেও তাঁকে অসম্ভব কাজ করতে হত, কিন্তু ঘুম আর অবসরের বালাই না করে নিজের গড়া ইনস্টিটিউটটির দেখাশোনা করার সময় তিনি করে নিতেন। হাসপাতালের কর্মচারীকে কোন ত্রুটির জন্য যখন বকতেন — আর "অকুস্থলেই" বরাবর বকাবকিটা তিনি উচ্চকণ্ঠে গভীর আবেগের সঙ্গে করতেন — তখন হামেশাই জোর দিয়ে বলতেন যে এমনি কি যুদ্ধকালীন, নিষ্প্রদীপ, হুঁশিয়ারি মস্কো সহরেও ইনস্টিটিউটটিকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করে যেতে হবে, সেটাই হবে হিটলার আর হেরিং গুষ্ঠির মুখের মত জবাব। যুদ্ধকালীন অসুবিধার কোন ছুতোয় তিনি কান দিতেন না, বলতেন কুঁড়ে আর অলস যারা তারা এখান থেকে বিদায় নিয়ে জাহান্নমে যেতে পারে, সময় এখন বেগতিক বলেই ইনস্টিটিউটের সব নিয়ম বিশেষ কড়াভাবে চালু রাখতে হবে। তিনি নিজে রোঁদে আসতেন ঘড়ির কাঁটা ধরে, ওয়ার্ডের মেয়েরা আগেকার মতই তাঁকে দেখে দেয়াল-ঘড়ি মেলাত। বিমান আক্রমণের সময়েও মানুষটির সময়ের কোন নড়চড় হত না। তাঁরি প্রেরণায় অবিশ্বাস্য নানা অসুবিধা সত্ত্বেও হাসপাতালের কর্মচারীরা কামাল করত, যুদ্ধের আগেকার সব বন্দোবস্ত চালু রাখতে পেরেছিল তারা।

সকালের রোঁদে ঘোরার সময় একদিন অধ্যক্ষটি -- আমরা ওঁকে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বলে ডাকব -- দোতলার সিঁড়ির সামনে পাশাপাশি পাতা দুটো খাটের কাছে এলেন।

'এই তামাসার মানে কী?' গরগর করে উঠে তিনি ঝাঁকড়া ভুরুজোড়া কুঁচকিয়ে হাউস সার্জনের দিকে এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করলেন যে সেই চওড়া-কাঁধ, মধ্যবয়স্ক, গম্ভীর চেহারার লোকটি পাঠশালার ছাত্রের মত সসম্মানে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল:

'মাত্র কাল রাত্রে এসেছে... বৈমানিক ওরা। এটির উরু আর ডান হাত ভেঙ্গে গিয়েছে। অবস্থা স্বাভাবিক। কিন্তু ওটির,' চোখ বুজে, অনড়ভাবে শুয়ে আছে অতিশীর্ণ লোকটি, বয়স কত বোঝা যাচ্ছে না, তার দিকে দেখিয়ে হাউস সার্জন বলল, 'অবস্থা খুব খারাপ। পায়ের পাতার ওপরদিকটা ভেঙ্গে গেছে, দুটো পায়ে গাংগ্রীন, কিন্তু প্রধানত, শরীরে আর শক্তি নেই। ওদের যে চিকিৎসক এখানে আনেন তিনি বলেন, কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি অবশ্য, যে যার পা ভাঙ্গা সে জার্মান লাইনের ওদিক থেকে আঠারো দিন হামাগুড়ি দিয়ে এসেছে। এটা, অবশ্যই, অতিরঞ্জিত...'

হাউস সার্জনের কথায় কান না দিয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কম্বলটা তুললেন। বুকের উপরে হাত জোড় করে মেরেসিয়েভ শুয়ে আছে। নতুন ফরসা সার্ট আর চাদরগুলোর পটভূমিতে কালো চামড়ায় মোড়া হাতদুটো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তা থেকে মানুষের অস্থি সংস্থানের বিষয়ে লোকে জেনে নিতে পারে। আস্তে আস্তে কম্বলটা নামিয়ে রেখে, হাউস সার্জনকে বাধা দিয়ে অধ্যাপক গরগর করে বললেন:

'ওদের এখানে রাখা হয়েছে কেন!'

'করিডরে আর জায়গা নেই। আপনি নিজেই ত...'

'আমি নিজে! আমি নিজে! ৪২ নং ঘরটার কী হল?'

'ওটা কর্ণেলের ওয়ার্ড।'

'বটে!' চেঁচিয়ে উঠলেন অধ্যাপক। 'কর্ণেলের ওয়ার্ড। কোন নির্বোধের আবিষ্কার এটা!'

'আমাদের কিন্তু বলা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বীবদের জন্যে একটা কামরা আলাদা করে রাখতে!'

'বীর, বীর বটে! এই যুদ্ধে সবাই বীর! কিন্তু আমাকে কী শেখাবার চেষ্টা করছ? হাসপাতালটার ভার কার হাতে? এদের দুজনকে এক্ষুণি ৪২ নং ঘরে নিয়ে যাও। "কর্ণেলের ওয়ার্ড!" যতো সব বাজে কথা!'

এগিয়ে গেলেন অধ্যাপক, পিছু পিছু এখন বিনীতভাবে যাচ্ছে অনুচরবর্গ, কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে মেরেসিয়েভের বিছানায় ঝুঁকে পড়ে ওর কাঁধে নিজের ফোলা-ফোলা হাত রাখলেন তিনি, নানা রকমের ডিস্‌ইনফেকটাণ্টের ঝাঁঝে হাতের চামড়া উঠে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করলেন:

'জার্মান লাইনের ওধারে দু হপ্তার বেশী তুমি হামাগুড়ি দিয়েছিলে, কথাটা কী সত্যি?'

প্রত্যুত্তরে ক্ষীণকণ্ঠে মেরেসিয়েভ জিজ্ঞেস করল, 'আমার কী গাংগ্রীন হয়েছে?'

দরজার কাছে অনুচরবর্গ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে অধ্যাপক বৈমানিকের দুঃখ আর উৎকণ্ঠায় ভরা বড়ো কালো চোখে চোখ রেখে কোন ভণিতা না করে বললেন:

'তোমার মত লোককে ধাপ্পা দেওয়া পাপ। হ্যাঁ, গাংগ্রীন হয়েছে। কিন্তু মুষড়ে পড়ো না। এমন কোন রোগ নেই যা সারানো যায় না, ঠিক যেমন এমন কোন অবস্থা নেই যা বদলানো যায় না। মনে রেখো! ব্যস।'

আর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন দীর্ঘাকৃতি চটপটে মানুষটি। একটু পরেই করিডরের কাচের দরজা দিয়ে তাঁর গরগরানির দূর আওয়াজ এল।

'মজার লোক বটে!' ভারী চোখে পশ্চাদপসারণী মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে মেরেসিয়েভ বলল।

'লোকটার মাথা খারাপ। কী বলল শুনলে ত? আমাদের দেখিয়ে রোয়াব নিচ্ছে। এ সব ভিজে বেড়ালদের খুব চিনি,' নিজের বিছানা থেকে বাঁকা হাসি হেসে কুকুশকিন সাড়া দিল, 'তাহলে কর্ণেলের ওয়ার্ডে আমাদের রেখে কৃতার্থ করে দেবে!'

'গাংগ্রীন,' অস্ফুট স্বরে বলল মেরেসিয়েভ, বিষণ্ণভাবে পুনরুক্তি করল, 'গাংগ্রীন ...'

২

তথাকথিত "কর্ণেলের ওয়ার্ডটি" দোতলার করিডরের এক প্রান্তে। দক্ষিণ আর পূবমুখো জানলাগুলো, ফলে সব সময়ে সূর্যের আলো পাওয়া যায়, এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় আস্তে আস্তে আলোর রেখা সরে সরে যায়। ওয়ার্ডটা বড় নয়। কাঠের মেঝেতে কালো কালো দাগ থেকে বোঝা যায় আগে দুটি মাত্র খাট, খাটের ধারে দুটো আলমারি আর মাঝখানে একটা গোল টেবিল ছিল। সে জায়গায় এখন চারটে খাট। একটাতে শুয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি আহত লোক, কাপড়ে-জড়ানো নবজাত শিশুর মত দেখাচ্ছে তাকে। চিৎ হয়ে শুয়ে ব্যাণ্ডেজের ফাঁকে শূন্য অনড় দৃষ্টিতে ঘরের ছাতের দিকে তাকিয়ে আছে। আলেক্সেই'র পাশের বিছানায় শুয়ে আর একজন, কুঞ্চিত দাগদুষ্ট সৈনিকসুলভ মুখ, পাতলা বিবর্ণ গোঁফ, লোকটি খুব উপকারপরায়ণ, গপ্পে আর চটপটে।

হাসপাতালে তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সন্ধ্যা হতে না হতে আলেক্সেই জানতে পারল গুটি-মুখ লোকটি সাইবেরিয়ান, যৌথখামারের সভাপতি সে আর শিকারী, সৈন্যবাহিনীতে স্নাইপার ছিল, কাজটা বেশ ভালোই করত। ইয়েল্নিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধগুলির সময়ে ও, ওর দুই ছেলে আর জামাই সাইবেরিয়ান বাহিনীতে লড়াই'এ নামে, সে-সময় থেকে শুরু করে সত্তরটি ফ্যাশিস্টকে, ওর ভাষায়, "একে একে সাবাড় করেছে" সে। সোভিয়েত

ইউনিয়নের বীর খেতাব পেয়েছে, নিজের নাম বলাতে সকৌতূহলে আলেক্সেই এই ঘরোয়া চেহারার মানুষটির দিকে তাকাল। সৈন্যবাহিনীতে নামটা বেশ চেনা সে-সময়ে, বড়ো বড়ো খবরের কাগজগুলো ওর বিষয়ে এমন কি সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখেছিল। হাসপাতালের সবাই নার্সরা, হাউস সার্জনটি, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ নিজে সম্মান দেখিয়ে ওকে স্তেপান ইভানভিচ বলে ডাকত।

ওয়ার্ডের চতুর্থ বাসিন্দেটি, যার আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, সারা দিন নিজের সম্বন্ধে একটি কথা বলেনি; সত্যি বলতে, কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরোয়নি। কিন্তু পৃথিবীর সবকিছু বিষয়ে স্তেপান ইভানভিচ ওয়াকিবহাল, সে মেরেসিয়েভকে আস্তে আস্তে ওর কাহিনীটা শোনায়। ওর নাম গ্রিগরি গভজ্‌দেভ, ট্যাঙ্ক-বাহিনীর লেফ্‌টেনান্ট, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব ও-ও পেয়েছে। ট্যাঙ্ক স্কুল থেকে পাস করে শুরু থেকেই লড়াই'এ ছিল। ব্রেস্ত-লিতভ্‌স্কের দুর্গের কাছাকাছি কোথায়, সীমান্তে যুদ্ধের প্রথম স্বাদ ও পায়। বেলস্তকের কাছে বিখ্যাত ট্যাঙ্ক-যুদ্ধে ওর ট্যাঙ্কটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু অন্য একটা ট্যাঙ্কে, যার কম্যাণ্ডার নিহত হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ চেপে ট্যাঙ্ক ডিভিশনের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে মিনস্কের দিকে যে-সব সৈন্যবা হটে যাচ্ছিল তাদের আগলে ও নিয়ে যায়। বুগের যুদ্ধে ও আহত হয়, দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটিও নষ্ট হয়। আবার অন্য একটা ট্যাঙ্কে, তারো কম্যাণ্ডার মারা গিয়েছিল, ও চলে যায়, আর একটি ট্যাঙ্ক কম্পানির ভার নেয়। পরে ও দেখল শত্রুপক্ষের একেবারে পিছনে পড়ে আছে, তখন তিনটে ট্যাঙ্ক নিয়ে একটা ভ্রাম্যমাণ দল গড়ে প্রায় এক মাস জার্মান লাইনের অনেক পিছনে থাকে, যানবাহন আর জার্মান সৈন্যদের খুব ভোগায়। যুদ্ধ যেখানে হয়ে গিয়েছে সেই সব জায়গা থেকে পেট্রল, গোলাগুলি আর যন্ত্রপাতি জোগাড় করে ওরা চালায়। রাস্তার ধারে ধারে সবুজ নিচু জায়গায়, বনে আর জলায় সব রকমের ভাঙ্গা যন্ত্রের কোন অভাব ছিল না।

দরগবুজের কাছাকাছি একটা জায়গায় তার জন্ম। ট্যাঙ্কের লোকেরা নিয়মিতভাবে রেডিও-সেটে সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহার পেত, তা থেকে গ্রিগরি যখন জানতে পেল যে যুদ্ধের গতি ওর জন্মস্থানের কাছে এসে পড়েছে তখন আর নিজেকে সামলাতে পারেনি, তিনটে ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়ে ও নিজে আর আটজন উত্তরজীবী বনের মধ্যে দিয়ে চলল নিজেদের বাহিনীতে আবার যোগ দেবার জন্য।

যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে, বিস্তৃত মাঠে এঁকেবেঁকে প্রবহমান ছোট একটি নদীর ধারে তার ছোট গ্রামটিতে এসে গভজ্‌দেভ ছিল ছুটির সময়। ওর মা, গ্রামের স্কুলে পড়াতেন তিনি, বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়াতে বাড়ি আসার জন্য ওর বাবা ওকে তার করেন। ওর বাবা পুরোনো কৃষিবিদ আর শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের আঞ্চলিক সোভিয়েতের সদস্য।

গভজ্‌দেভের মনে পড়ে গেল স্কুলের কাছে কাঠের নিচু ঘরটা, ছোটখাটো শীর্ণদেহ ওর মা অসহায়ভাবে পুরোনো সোফায় শুয়ে আছেন, পুরোনো ধরনের সানটুঙ্গ কোট পরনে ওর বাবা মার শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কাশছেন আর পাকা ছোট দাড়িতে উৎকণ্ঠায় টান দিচ্ছেন; ওর ছোট্ট তিনটি বোন, কালো চুল তাদের, মায়ের চেহারার সঙ্গে তাদের খুব আদল আছে। আর মনে পড়ল পাতলা, নীল-চোখ জেনিয়ার কথা, গ্রামের ডাক্তার সে, ঘোড়ার গাড়িতে রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ওর সঙ্গে এসেছিল বিদায় জানাতে। প্রত্যেক দিন ওকে চিঠি দেবে কথা দিয়েছিল গভজ্‌দেভ। বেলরুশিয়ার পদদলিত মাঠেঘাটে আর পোড়া জনহীন গ্রামে বন্য জন্তুর মত লুকিয়ে, সহর আর বড়ো রাস্তা এড়িয়ে যাচ্ছে সে, ব্যথায় বুক টনটন করে উঠছে, চেষ্টা করছে আঁচ করতে নিজের গ্রামে ফিরে কী দেখবে, ভাবছে নিজের লোকজন চলে যেতে পেরেছে কিনা, না পেরে থাকলে তাদের কপালে কী জুটেছে।

গ্রামে পৌঁছিয়ে যা দেখল তা তার অশুভতম ধারণারও বাইরে। ভিটে নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, জেনিয়া নেই, গ্রামটি পর্যন্ত নেই। আধো-পাগলী একটা বুড়ী নাচার ভঙ্গীতে পা দুলিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে ঝলসানো জিনিসের মধ্যে স্টোভে কী একটা রান্না করছিল, তার কাছে গভজ্‌দেভ শুনল যে ফ্যাশিস্টরা যখন কাছাকাছি এসে পড়ে তখন ওর মা এত অসুস্থ যে কৃষিবিদ আর মেয়েরা ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বা ছেড়ে চলে যেতে সাহস করেনি। ফ্যাশিস্টরা জানতে পারল যে শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের আঞ্চলিক সোভিয়েতের একজন সদস্য আর তার পরিবার গ্রামে থেকে গিয়েছে। তারা সবাইকে ধরে সেই রাত্রেই বাড়ির সামনের বার্চগাছটিতে লটকে দেয়, বাড়িটা দেয় পুড়িয়ে। বুড়ীর কাছে এও শুনল যে গভজ্‌দেভ পরিবারের হয়ে মিনতি জানাতে জেনিয়া গিয়েছিল ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে, অফিসারটি নাকি ওকে ভোগ করতে চায়, ওকে নাকি অনেকক্ষণ উৎপীড়ন করে তারা। ঠিক কী হয়েছিল বুড়ী সেটা জানে না, কিন্তু যে বাড়িতে অফিসারটি আস্তানা গেড়েছিল তার পরের দিন সে বাড়ি থেকে

জেনিয়ার মৃতদেহ বের করে আনা হয়, নদীর ধারে দুদিন দেহটি পড়ে ছিল। পরে যৌথখামারের আস্তাবলে রাখা তাদের পেট্রলের ট্যাংকে কেউ আগুন লাগিয়ে দেওয়াতে জার্মানরা সমস্ত গ্রামটা পুড়িয়ে দেয়। এটা ঘটে মাত্র পাঁচ দিন আগে।

গভজ্‌দেভকে বুড়ী নিয়ে গেল ওর বাড়ির ভস্মাবশেষের কাছে, বার্চগাছটা দেখাল। শৈশবে গাছটার একটা মোটা ডালে ওর দোলনাটা ঝুলত। ডালটা শুকিয়ে গেছে, পোড়া ডাল থেকে ঝুলে হাওয়ায় দুলছে পাঁচটা দড়ির গোড়ার দিকটা। হেলেদুলে, বিড়বিড় করে কী একটা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে বুড়ী নদীতে নিয়ে গেল গভজ্‌দেভকে, রোজ যাকে চিঠি লেখার কথা দিয়ে লেখবার সময় পায়নি সেই মেয়েটির দেহ কোথায় পড়ে ছিল দেখাল বুড়ী। নলখাগড়ার খসখস শব্দ। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে গভজ্‌দেভ বনে ফিরে গেল, ওর লোকেরা সেখানে তার অপেক্ষায় ছিল। একটিও কথা বলেনি সে, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি।

জুনের শেষে, জেনারেল কনেভ তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালিয়েছেন, গ্রিগরি গভজ্‌দেভ আর ওর লোকেরা জার্মান লাইন ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে। অগস্টে ওকে নতুন একটা ট্যাঙ্ক, "টি-৩৪" দেওয়া হল আর শীতের আগেই ব্যাটেলিয়নের সবাই ওকে "কোন কিছুর পরোয়া করে না" বলে চিনল। ওর সম্বন্ধে নানা গল্প মুখে মুখে চলত, ছাপাও হত, গল্পগুলো অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। একটি রাত্রে পর্যবেক্ষণে গিয়ে ও জার্মান লাইন তীব্র গতিতে ভেঙ্গে ওদের বসানো মাইন এড়িয়ে ট্যাঙ্কের কামান চালায়, ভয়ে বিহ্বল শত্রুদের পেরিয়ে একটি ছোট সহরে পৌঁছয়, সেই সহরটির অর্ধেক সোভিয়েত বাহিনী ঘেরাও করেছিল, ওধারে গিয়ে নিজেদের দলে আবার যোগ দেয় গভজ্‌দেভ, শত্রুপক্ষের বিড়ম্বনা নেহাৎ কম হয়নি। আর একবার জার্মান লাইনের পিছনে একটি সচল দলের সঙ্গে থাকার সময়ে গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে একটি জার্মান পরিবহন দলকে হঠাৎ আক্রমণ করে ওদের ঘোড়া আর গাড়ি গুঁড়িয়ে দেয় ট্যাঙ্কের চাকায়।

শীতকালে ট্যাঙ্কের একটি ছোট দলের পুরোভাগে থেকে ও র্‌জেভের কাছে গড়বন্দী একটি গ্রামের রক্ষী সেনাদলকে আক্রমণ করে, গ্রামটিতে যুদ্ধ চালনার জন্য শত্রুপক্ষের ছোট একটি হেডকোয়ার্টার ছিল। গ্রামের উপকণ্ঠে ট্যাঙ্কগুলো প্রতিরোধ এলাকা পার হচ্ছে, এমন সময়ে দাহ্য তরল জিনিসের একটা বোতল ওর ট্যাংকে লাগে। ধোঁয়াটে, দমবন্ধ করা অগ্নিশিখায় ট্যাঙ্কটি

আচ্ছন্ন কিন্তু ভেতরের লোকেরা কাজ চালিয়ে গেল। বিরাট একটা মশালের মত গ্রামটির মধ্য দিয়ে ছুটে চলল ট্যাঙ্কটা, সব কটা কামান চালিয়ে এদিকে বেঁকছে, ওদিকে ঘুরছে, পলাতক জার্মান সৈন্যদের ধাওয়া করে পিষে দিচ্ছে। যারা একদা ওর সঙ্গে শত্রুপক্ষের পিছনে ছিল তাদের থেকে বাছাই করে লোক নিয়েছিল গভজ্‌দেভ, ওরা সবাই জানে যে কোন মুহূর্তে তেল কিম্বা গোলাবারুদের বিস্ফোরণে ট্যাঙ্কটা উড়ে যেতে পারে। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে ওদের, গনগনে লাল লৌহাবরণে শরীর পুড়ে যাচ্ছে, কাপড়-চোপড়ে ইতিমধ্যেই আগুন লেগে ধিক ধিক করছে, কিন্তু লড়াই করে চলল ওরা। ভারী একটা গোলা চাকার নিচে ফাটল, উল্টে গেল ট্যাঙ্কটা, বিস্ফোরণের ঝটকায়, কিম্বা তার ফলে ধুলো আর বরফের ঘূর্ণিতে, যে কারণেই হোক আগুন গেল নিভে। গভজ্‌দেভকে ট্যাঙ্ক থেকে বের করা হল, ভয়াবহভাবে পুড়ে গিয়েছে ওর শরীর। বুরুজে মৃত কামানচালকের পাশে বসে ও কামান চালাচ্ছিল...

জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দুমাস পড়ে আছে গভজ্‌দেভ, সেরে ওঠার ব্যাপারে বীতস্পৃহ, কোন কিছুতে আগ্রহ নেই, মাঝেমাঝে বেশ কিছুদিন একেবারে কথা বলে না।

সাঙ্ঘাতিক চোট লাগে যাদের তাদের পৃথিবী হাসপাতাল ওয়ার্ডের চারটে দেয়ালের মধ্যে সাধারণত সীমাবদ্ধ। দেয়ালগুলোর বাইরের পৃথিবীতে কোথাও যুদ্ধ চলেছে, অনেক কিছু ঘটছে যার গুরুত্ব বেশী কিম্বা কম, আবেগ চরমে পেঁছচ্ছে, আর প্রতিটি দিন প্রত্যেক মানুষের অন্তরে নতুন ছাপ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু যে ওয়ার্ডে ভীষণ আহত লোকেরা থাকে সে ওয়ার্ডে বাইরের জীবনের প্রবেশ নিষেধ, হাসপাতালের বাইরে যে ঝড় অবিরত বইছে তার টুকরো টুকরো চাপা শব্দ মাত্র সেখানে পেঁছয়। ওয়ার্ডের জীবন নিজস্ব ছোটখাটো ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। রোদে তপ্ত জানলার শার্সিতে অলস, ধুলো-ভরা কোন মাছি বসল, সেটা একটা ঘটনা। ওয়ার্ডের ভার যার হাতে সেই ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা সন্ধ্যেবেলায় হাসপাতাল থেকে সোজা থিয়েটারে যাবে ঠিক করেছে বলে নতুন উঁচু-গোড়ালি জুতো পরেছে, সেটা একটা খবর। খোবানীর টকে সবায়ের ঘেন্না ধরে গিয়েছে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের তৃতীয় পদে তার বদলে বদরীর সরবৎ পরিবেশন করা হল, আলাপ আলোচনার বিষয় সেটা।

কিন্তু ভীষণ আহত লোকের উৎকণ্ঠ দীর্ঘ, হাসপাতাল দিনগুলি যেটা

ভরিয়ে রাখে, তার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্র যেটা সেটা হল তার নিজের ক্ষতস্থান, এই ক্ষতই ত সৈন্যদের সারি থেকে, যুদ্ধের কঠোর জীবন থেকে তাকে ছিটকে বের করে মোলায়েম আর আয়েসী বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, শোওয়াবার মুহূর্ত থেকে বিছানাটার প্রতি তার বিদ্বেষ। ক্ষতস্থানের কথা, স্ফীতি কিম্বা হাড় ভাঙার কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমোয়, স্বপ্ন দেখে সে বিষয়ে, ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায় স্ফীতিটা কম কিনা, আঙ্গিক প্রদাহ মিলিয়ে গিয়েছে কিনা, জ্বর বেড়েছে কি কমেছে। রাত্রে জাগ্রত কানে সামান্য খসখস শব্দটুকু যেমন মাত্রাতিরক্তভাবে বেশী শোনায়, তেমন এখানেও নিজের ব্যাধির বিষয়ে অবিরত একাগ্র চিন্তা ক্ষতের যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তোলে, অধ্যাপকের গলায় সামান্য সুরবিভেদটুকু ধবার আর তাঁর মুখের ভাব থেকে ব্যাধির গতি আঁচ করার জন্য সভয়ে, কম্পিত হৃদয়ে ব্যগ্র হয়ে থাকে এমন কি তারাও যাদের চারিত্র্যবল আর সহিষ্ণুতা অসামান্য, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা মৃত্যুর পরোয়া করেনি।

হামেশাই অভিযোগ করে কুকুশকিন. গজগজ করে। ওর মনে হয় যেখানে চোট লেগেছে সেখানটা ভালো করে বাঁধা হয়নি, বন্ধফলক খুব কষে বাঁধা হয়েছে, ফলে হাড়গুলো ঠিকমত জোড়া লাগবে না, আবার তাদের নতুন করে বসাতে হবে। গ্রিশা গভজ্দেভ বিষণ্ণ আধো-ঘোরে আচ্ছন্ন, কোন কথা বলে না সে। কিন্তু ব্যাণ্ডেজ বদলাবার সময়ে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা যখন ওর ক্ষতস্থানে প্রচুর পরিমাণে ভ্যাসেলিন ছড়াত তখন কী ব্যগ্র অসহিষ্ণুভাবে ও নিজের স্ফীত শরীর আর ছিন্নভিন্ন চামড়ার দিকে তাকিয়ে দেখত, ডাক্তারদের সলাপরামর্শ কী আগ্রহে শুনত, সেটা কারো নজর এড়াত না। ওয়ার্ডে একমাত্র স্তেপান ইভানভিচই চলাফেরা করতে পারে, অবশ্য প্রায় একেবারে কুঁজো হয়ে; খাটের শিক আঁকড়ে যেতে যেতে শাপান্ত করত তার সর্বনাশের কারণ সেই "নচ্ছার বোমাটাকে" আর চোট লাগার ফলে আসা "ঘৃণ্য সায়েটিকাকে"।

নিজের ভাব গোপন করার চেষ্টা করত মেরেসিয়েভ, এমন ভাব দেখাত যে ডাক্তাররা পরস্পরকে কী বলছে তা শোনার কোন আগ্রহ তার নেই। কিন্তু যতবার তড়িৎ চিকিৎসার জন্য পায়ের ব্যাণ্ডেজ খোলা হত আর ওর নজরে আসত যে ভয়াবহ স্ফীতিটা আস্তে আস্তে, কিন্তু সমানে, পায়ের পাতার উপর হয়ে আসছে ততবার আতঙ্কে বিস্ফারিত হত ওর চোখ।

অস্থির বিষণ্ণ হয়ে পড়ল মেরেসিয়েভ। ঘরে কোন রোগী বে'ফাস ঠাট্টা

করল হয়ত, বিছানার চাদরে একটা ভাঁজ পড়েছে, ওয়ার্ডের বৃদ্ধা পরিচারিকার হাত থেকে ঝাঁটা খসে পড়েছে, রাগে অধীর হয়ে পড়ত সে, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করত। এটা সত্যি অবশ্য যে হাসপাতালের বাঁধাধরা আর ক্রমশ বাড়ানো খাবারে ওর শক্তি ফিরে এল, ব্যাণ্ডেজ বদলাবার কিম্বা তড়িৎ চিকিৎসার সময়ে ওর উৎকট দেহ দেখে ডাক্তারী ছাত্রীরা আর ভয়ে চমকে উঠত না। কিন্তু শরীরে শক্তি যত বাড়ছে তত খারাপ হচ্ছে পাদুটো। পায়ের পাতার উপর দিকটা ফুলে আর দেখা যায় না, পায়ের গাঁট বেয়ে প্রদাহটা ছড়াচ্ছে। পায়ের আঙুলগুলো একেবারে অসাড়, ডাক্তার ছুঁচ দিয়ে খোঁচা দিতেন, অনেকখানি ফুঁড়তেন, কিন্তু আলেক্সেই'র একেবারে লাগত না। নতুন একটা পদ্ধতিতে — বিচিত্র তার নাম "অবরোধ" — স্ফীতিটা আটকাতে ডাক্তারেরা সমর্থ হল, কিন্তু পায়ের যন্ত্রণা বেড়েই গেল। প্রায় অসহ্য সে যন্ত্রণা। দিনের বেলায় বালিশে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকত আলেক্সেই। রাত্রে ওকে মরফিয়া দিত ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা।

ডাক্তারদের সলাপরামর্শের সময় "অঙ্গচ্ছেদ" — এই ভয়াবহ শব্দটি ক্রমশ বেশী শোনা যেতে লাগল। মাঝেমাঝে আলেক্সেই'র বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ জিজ্ঞেস করতেন:

'হামাগুড়িতে ওস্তাদ লোকটি আজ কেমন আছে? পাদুটো হয়ত কেটে ফেলব, কী বলো? কচাৎ করে একটা টান, ব্যস, ওদুটো আর থাকবে না!'

আলেক্সেই শিরশির করে উঠত। দাঁতে দাঁত চেপে ধরত যাতে চেঁচিয়ে না ওঠে, মাথা নাড়াত শুধু, আর অধ্যাপক গরগর করে বলতেন:

'তাহলে সয়ে যাও, সয়ে যাও, তোমার ব্যাপার এটা। দেখা যাক এতে কী হয়।' চিকিৎসার নতুন একটা নির্দেশ দিতেন তিনি।

অধ্যাপক চলে যেতেন, দরজা বন্ধ হয়ে গেল, করিডরে ওঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। তখনো চোখ বুজে শুয়ে থাকত মেরেসিয়েভ। "পাদুটো, আমার পাদুটো!" ওদুটো কি বাদ দিতে হবে, নিজের কামিশিনের খেয়াঘাটের পঙ্গু মাঝি বুড়ো আরকাশার মত কাঠের পা লাগিয়ে চলতে হবে? ওই বুড়োটার মত স্নান করার সময় পাদুটো খুলে ঘাটে রেখে, হামাগুড়ি দিয়ে বাঁদরের মত জলে নামতে হবে?

আরো একটি ঘটনায় ওর তিক্ত দুর্ভাবনা সব বেড়ে গেল। হাসপাতালে পৌঁছিয়ে প্রথম দিনেই কামিশিন থেকে আসা চিঠিগুলো ও পড়েছিল। তিনকোণায় ভাঁজ-করা মায়ের ছোট চিঠিগুলো যথারীতি সংক্ষিপ্ত, তাদের



অর্ধেকটা আত্মীয়দের সাদর সম্ভাষণে ভরা, ঈশ্বরের কৃপায় সবাই ভালো আছে জানানো হয়েছে, মা'র বিষয়ে ওর ভাবার কোন কারণ নেই, আর অর্ধেকটায় অনুনয় করা হয়েছে যেন নিজের যত্ন ও নেয়, ঠান্ডা না লাগায়, পা না ভেজায়, ঝট করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে যেন না পড়ে, ধূর্ত জার্মানদের বিষয়ে যেন সাবধান থাকে, ওদের ধূর্ততার কথা প্রতিবেশীদের কাছে অনেক শুনেছেন তিনি। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু সব সমান, তফাৎটা শুধু এই একটাতে তিনি জানিয়েছেন যে একজন প্রতিবেশিনীকে তিনি আলেক্সেই'র জন্য গির্জায় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তিনি নিজে ধর্মবিশ্বাসী নন বটে, কিন্তু যদি আমাদের মাথার উপরে সত্যি সত্যি কেউ থেকে থাকেন? আর একটি চিঠিতে বলেছেন যে তাঁর বড়ো ছেলেদের জন্য তিনি দুশ্চিন্তায় আছেন, ওরা দক্ষিণে কোথাও যুদ্ধ করছে, অনেক দিন ওদের চিঠি আসেনি; আর শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছেন একটি স্বপ্নের কথা—ভলগায় বসন্ত প্লাবনের সময় তাঁর সব ছেলে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে; মাছ ধরার সফল অভিযান থেকে তারা ফিরে এসেছে, সঙ্গে ওদের বিগত বাবাও ফিরেছেন। আর ওদের জন্য ওদের প্রিয় পিঠে — ভিয়াজিগা পিঠে* — বানিয়েছেন তিনি। প্রতিবেশীরা ব্যাখ্যা করে বলেছে স্বপ্নটির মানে হল এই যে ওঁর একটি ছেলে রণাঙ্গন থেকে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। সেজন্য তিনি আলেক্সেইকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন যেন উপরওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে যে অন্তত একদিনের জন্য বাড়ি ফিরতে পারে কিনা।

নীল খামগুলো, স্কুলের মেয়ের বড়ো বড়ো স্পষ্ট হাতে ঠিকানা লেখা, চিঠিগুলো লিখেছে কারখানার শিক্ষানবিশি স্কুলে ওর সহপাঠী একটি মেয়ে। নাম তার ওলগা। কামিশিন করাত-কারখানায় সে এখন টেকনিশিয়ান, একই কারখানায় আলেক্সেই টার্নারের কাজ আগে করত। বাল্যবন্ধু ছাড়াও মেয়েটি আরো কিছু, ওর চিঠিগুলো গতানুগতিক নয়। অবাক হবার কিছু নেই যে এক একটা চিঠি আলেক্সেই কয়েক বার পড়েছে, বারবার তুলে নিয়ে সামান্য কথাগুলো মন দিয়ে দেখেছে, যাতে তাদের মধ্যে অন্য কোন আনন্দমুখর, গোপন অর্থ উদ্ধার করতে পারে, যদিও চিঠিগুলোতে ঠিক কী যে চায় ও সেটা ওর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

মেয়েটি লিখেছে যে কাজে ডুবে আছে, এমন কি রাত্রেও বাড়ি ফেরে

* স্টার্জন মাছের শিরদাঁড়ার পুর দিয়ে তৈরী পিঠে।

না, অফিসেই ঘুমোয়, যাতে যাতায়াতে সময় নষ্ট না হয়; করাত-কারখানাটা এখন দেখলে হয়ত আলেক্সেই চিনতেই পারবে না, অবাক হয়ে যাবে, আনন্দে অধীর হয়ে যাবে যদি কারখানায় এখন কী তৈরী হচ্ছে সেটা জানতে পারে। প্রসঙ্গত লিখেছে, ছুটির বিরল দিনে, মাসে একদিনের বেশী ছুটি নেই, ও আলেক্সেই'র মা'কে দেখতে যায়, বৃদ্ধা ছেলেদের কোন খবর না পাওয়াতে দুশ্চিন্তায় আছেন, ওঁর সময় খারাপ যাচ্ছে, হালে শরীর খারাপ হয়েছে। মেয়েটি বিশেষ অনুরোধ করেছে যেন আলেক্সেই আরো বেশী, আর আরো বড়ো করে চিঠি দেয় ওঁকে, নিজের বিষয়ে কোন দুঃসংবাদ দিয়ে ওঁকে যেন বিচলিত না করে, কারণ, খুব সম্ভব, আলেক্সেই'ই ওঁর একমাত্র ভরসা এখন।

ওলগার চিঠি বারবার পড়ে আলেক্সেই ধরতে পারল ওকে স্বপ্নের কথাটি বলার পিছনে মায়ের সরল ফন্দিটি কী। বুঝতে পারল ওকে দেখার জন্য মা ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, ওঁর ভরসা এখন সে; এটাও বুঝতে পারল যে ওঁকে আর ওলগাকে নিজের পায়ের কথা লিখলে কী ভীষণ আঘাত পাবে তারা। কী করা উচিত অনেকক্ষণ ভাবল আলেক্সেই, কিন্তু সত্যি কথা লেখার সাহস হল না। ঠিক করল কথাটা কিছু দিন চেপে যাবে, ওদের দুজনকেই লিখবে ও ভালো আছে, যুদ্ধ চলছে না এমন একটা জায়গায় ওকে বদলি করা হয়েছে; ঠিকানা বদল হয়েছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য লিখল যে পিছনের একটি দলের সঙ্গে বিশেষ কাজ করতে দেওয়া হয়েছে ওকে, সেখানে অনেক দিন থাকতে হবে।

আর এখন বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে পরামর্শের সময়ে ডাক্তাররা যখন "অঙ্গচ্ছেদের" কথা প্রায়ই বলতে আরম্ভ করল তখন বিভীষিকায় অভিভূত হয়ে যেত আলেক্সেই। পঙ্গু হয়ে কী করে বাড়ি ফিরবে কামিশিনে? কাঠের পাদুটো কী করে দেখাবে ওলগাকে? কী সাঙ্ঘাতিক আঘাতই না মা পাবেন, অন্য ছেলেদের কোনও খবর নেই, তার জন্য, একমাত্র ছেলের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তিনি। ওয়ার্ডের গুমোট বিষণ্ণ স্তব্ধতায় শুয়ে শুয়ে এই সব কথা ভাবত আলেক্সেই, কানে আসত কুকুশকিনের ছটফটে শরীরের চাপে ওর গদির স্প্রিংগুলোর ক্রুদ্ধ কিঁচ কিঁচ আওয়াজ, নির্বাক ট্যাঙ্ক-অফিসারের দীর্ঘশ্বাস; আর জানলায় দাঁড়িয়ে শার্সিতে আঙুল দিয়ে শব্দ করছে প্রায় নুয়ে-পড়া স্তেপান ইভানভিচ, দিনের বেশীর ভাগ জানলার কাছে কাটায় সে।

"পাদুটো কাটা হবে? না, সেটা ছাড়া আর যাকিছু হোক! তার চেয়ে মরা অনেক ভালো... "অঙ্গচ্ছেদ" — কী ভয়াবহ, অমানুষিক শব্দটা। যেন

কেউ ছোরা মারছে, তার মত। অঙ্গচ্ছেদ? কখনোই নয়, কখনোই হতে দেব না সেটা!" আলেক্সেই ভাবত। স্বপ্নে এই ভয়াবহ কথাটি এল প্রকান্ড একটা ধাতব মাকড়সার আকারে, ধারালো বাঁকা নখরে তার মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে সেটা।

৩

৪২ নং ঘরে মাত্র চারজন রোগী, একসপ্তাহ কাটল। কিন্তু তারপরে একদিন ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা এল, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে, সঙ্গে দুজন আর্দালী, রোগীদের বলল একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে জায়গা করে দিতে হবে। স্তেপান ইভানভিচের খাটটা একেবারে জানলার কাছে নিয়ে যাওয়া হল, বেজায় খুসি তাতে সে। তার খাটের পাশে একটা কোণে রাখা হল কুকুশকিনের খাট, খালি জায়গাটায় বসানো হল একটি সুন্দর, নিচু, স্প্রিং-দেওয়া নরম গদির খাট।

ভয়ানক চটে উঠল কুকুশকিন। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, বিছানার পাশের তাকে ঘুঁষি মেরে, তীক্ষ্ন কর্কশ কণ্ঠে নার্সকে, হাসপাতালকে, এমন কি ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে গালিগালাজ করল, ভয় দেখাল যে কাউকে না কাউকে নালিশ করবে, আর রাগে এমন দিশে হারাল যে আলেক্সেই বেদে চোখে অগ্নিবান হেনে এক ঝটকায় ওকে বাধা না দিলে আর একটু হলে বেচারী ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে বাটি ছুঁড়ে মেরে বসত।

ঠিক সেই মুহূর্তে পঞ্চম রোগীটিকে ঘরে আনা হল।

খুব ভারী লোক নিশ্চয়ই, কেননা স্ট্রেচার-বাহকদের পা ফেলার তালে তালে স্ট্রেচারটা নুয়ে পড়ে কিঁচ কিঁচ করছে। বালিশে অসহায়ভাবে এদিকে ওদিকে হেলে পড়ছে একটা গোল, কামানো মাথা। চওড়া, হলদে, মোমের মত মুখটা প্রাণহীন মনে হচ্ছে। ভরাট, বিবর্ণ ঠোঁটে যন্ত্রণার অনড় ছাপ আঁকা।

মনে হল নতুন রোগীটির জ্ঞান নেই। কিন্তু স্ট্রেচারটা মেঝেতে রাখার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলল সে, কনুই'এ ভর দিয়ে উঠে সকৌতূহলে ওয়ার্ডের চারিদিকে তাকিয়ে কেন জানি না স্তেপান ইভানভিচকে চোখ ঠারল, যেন বলতে চায়: "কেমন সময় কাটছে, খুব খারাপ নয় মনে হচ্ছে?" তারপর জোরে কেশে উঠল সে। বোঝা গেল ওর ভারী শরীরটা ভয়ানক বিপর্যস্ত হয়েছে, দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছে সে। প্রথম দৃষ্টিতে ওর বিরাট স্ফীত দেহটার চেহারা ভালো লাগল না আলেক্সেই'র কী কারণে যেন, বেজারভাবে দেখল

দুজন আর্দালী, দুজন ওয়ার্ডের পরিচারিকা আর নার্সটি, সবাই মিলে স্ট্রেচার থেকে তাকে তুলে বিছানায় শোয়াল। দেখল ওর শক্ত, কাঠের কুঁদোর মত একটা পা'কে বেকায়দায় ওরা ঝটকা দেওয়াতে ও হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে ঘেমে উঠল. ঠোঁটদুটো যে যন্ত্রণায় থর থর করে কেঁপে উঠল সেটাও চোখে পড়ল। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না রোগীটির, শুধু দাঁতে দাঁত চেপে রইল।

বিছানায় শুয়েই কম্বলের চাদরটার পাড় ঠিক করে নিল সে, সঙ্গে-আনা বই আর খাতাপত্র বিছানার পাশের তাকটাতে ঠিক করে গুছিয়ে রাখল, টুথ-পেস্ট আর বুরুশ, ও-ডি-কলোন, দাড়ি কামাবার জিনিস আর সাবানের বাক্স নিচের তাকটাতে সাজিয়ে রেখে বিচক্ষণ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে হাতের কাজ সব দেখল একবার, তারপর. চটপট যেন ঘরোয়া লাগছে এমন ভাবে, গভীর গমগমে গলায় বলল:

'বেশ, এবার আমাদের আলাপ পরিচয় হোক। রেজিমেণ্টাল কমিসার সেমিওন ভরোবিওভ। চুপচাপ লোক। ধূমপান করি না। অনুগ্রহ করে আপনাদের দলে আমাকে যোগ দিতে দিন।'

ওয়ার্ডের অন্যান্যদের দিকে ধীরে আগ্রহে তাকাল সে, তার তীক্ষ্ন সংকীর্ণ সোনালী চোখের ধারালো বিচক্ষণ দৃষ্টি মেরেসিয়েভের নজরে পড়ল।

'বেশী দিন আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আপনারা কী করবেন জানি না, কিন্তু এখানে বেশী দিন শুয়ে থাকার সময় আমার নেই। ঘোড়সওয়াররা আমার অপেক্ষায় আছে। বরফ চলে গেলে, রাস্তাঘাট শুকিয়ে গেলেই কেটে পড়ব। "আমরা হচ্ছি লাল ফৌজের অশ্বারোহী দল, আর আমাদের কথা নিয়ে..."' বকবক করে চলল ও, ওর প্রফুল্ল, গভীর খাদের কণ্ঠস্বরে ওয়ার্ড গেল ভরে।

'আমাদের কেউই বেশী দিন এখানে নেই। বরফ গলতে শুরু করলেই সবাই আমরা কেটে পড়ব, পা বাড়িয়ে একেবারে ৫০ নং ওয়ার্ডে চলে যাব, খিটখিটিয়ে বলে উঠে কুকুশকিন, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল।

হাসপাতালে ৫০ নং ওয়ার্ড ছিল না। লাশঘরের নাম ওটা, রোগীদের দেওয়া। এর মধ্যে কমিসার সেটা জেনেছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু ইয়ার্কিটার অশুভ অর্থ তৎক্ষণাৎ তার কাছে ধরা পড়ল। যাই হোক, কিছু মনে সে করল না, শুধু বিস্ময়ে কুকুশকিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আর আপনার বয়স কত. বন্ধু? ওহে দাড়িওয়ালা! অকালে বুড়িয়ে গেছেন মনে হচ্ছে!'

৪

৪২ নং'এ নতুন রোগীটির আবির্ভাবে --- ওকে ওরা নিজেদের মধ্যে কমিসার বলে ডাকত --- ওয়ার্ডের জীবনযাত্রা আমূল বদলে গেল। আসবার দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই এই বিশেষ আহত, ভারী লোকটি সবায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিল, স্তেপান ইভানভিচের ভাষায়, প্রত্যেকেরই মনে নাড়া দেবার মত কলকাঠি ও জোগাড় করে ফেলেছে।

স্তেপান ইভানভিচের সঙ্গে ও প্রাণ খুলে ঘোড়া আর শিকারের গল্প করত, বিষয়দুটি দুজনেরই প্রিয়, দুজনেই ওয়াকিবহাল। মেরেসিয়েভ যুদ্ধের বিষয়ে তত্ত্বমূলক আলোচনা চালাতে ভালোবাসে, তার সঙ্গে বিমান, ট্যাঙ্ক আর অশ্বারোহী বাহিনী প্রয়োগের হালের সমস্ত পদ্ধতি নিয়ে তুমুল তর্ক চলত। কমিসার একটু উত্তেজিতভাবেই প্রমাণ করার চেষ্টা করত যে বিমান আর ট্যাঙ্ক অত্যন্ত কাজের জিনিস হলেও ঘোড়া একেবারে সেকেলে হয়ে যায়নি, ওর মূল্য সবাই আবার টের পাবে। অশ্বারোহী বাহিনীকে যদি ভালো ঘোড়া আবার জোগানো হয়, যদি ট্যাঙ্ক আর কামানের সাহায্য পায়, আর যদি বহুসংখ্যক সাহসী আর বুদ্ধিমান যুবক অফিসারকে ঘোড়েল সেনানায়কদের সাহায্য করতে শেখানো হয়, তাহলে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী আবার সারা দুনিয়াকে চমক লাগিয়ে দেবে। এমন কি নির্বাক ট্যাঙ্ক-অফিসারের সঙ্গেও কথাবার্তা চালাবার বিষয় কমিসার বের করল। জানা গেল যে বাহিনীতে সে কমিসার হিসেবে ছিল সেটা ইয়ার্ৎসেভোতে লড়াই করে, পরে দুখোভশ্চিনায় জেনারেল কনেভের প্রতি-আক্রমণেও যোগ দেয়, দুখোভশ্চিনাতেই ট্যাঙ্ক-অফিসার ও তার দল জার্মান লাইন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। অসীম আগ্রহে কমিসার দুজনের চেনা গ্রামগুলির নাম করে, কী করে এবং কোথায় জার্মানদের অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছিল তার গল্প করে। ট্যাঙ্ক-অফিসার যথারীতি চুপ করে থাকত বটে, কিন্তু কেউ কথা বললে আগেকার মত আর মুখ ঘুরিয়ে নিত না। ব্যান্ডেজে-ঢাকা মুখ দেখা যেত না, কিন্তু মাথা নেড়ে কথায় সায় দিত। কমিসার দাবা খেলার আমন্ত্রণ করাতেই কুকুশকিনের রাগ পড়ে গিয়ে মেজাজ খোশ হয়ে উঠল। দাবার ছক কুকুশকিনের বিছানায় রাখা হল আর নিজের বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে কমিসার "চোখ বেঁধে" খেলল। গজগজে লেফ্টেনাণ্ট খেলায় বেকসুর হেরে গেল, তাতে কমিসারের মূল্য ওর কাছে গেল অনেক বেড়ে।

ওয়ার্ডে কমিসারের আবির্ভাবটা মস্কোর প্রথম বসন্তের তাজা জোলো হাওয়ার মত কাজ করল, সকালে পরিচারিকারা জানলাগুলো খুললে যে হাওয়া ঝটকায় ঘরে আসে, রাস্তার উচ্ছ্বল কোলাহলে রোগীর ঘরের গুমোট স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। সজীবতা আনতে কমিসারকে মোটেই বেগ পেতে হত না। সে শুধু বাঁচত, টগবগে জীবনের স্বাদ সতৃষ্ণভাবে গ্রহণ করে যন্ত্রণার জ্বালা ভুলে যেত, কিম্বা ভুলে যেতে বাধ্য করত নিজেকে।

সকালে জেগে উঠে বিছানায় বসে "ব্যায়াম" চলত — হাতদুটো মাথার উপরে তুলে, আর পাশে নামিয়ে শরীরটা একবার এদিকে, একবার অন্যদিকে ঝুঁকিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামাত আর ঘোরাত সমান তালে। মুখ ধোবার জল আনলে বলত যতটা সম্ভব ততটা ঠাণ্ডা জল ওকে দেওয়া হোক; অনেকক্ষণ ধরে চলত হাতমুখ ধোওয়া আর নানারকম আওয়াজ বের করা, তারপর তোয়ালে দিয়ে এত জোর রগড়ানো যে ফুলে-ওঠা শরীরটা লাল হয়ে উঠত; আর ওকে দেখে সেরকম করার দারুণ ইচ্ছে হত অন্যান্য রোগীদের। খবরের কাগজ এলেই নার্সের হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিত কমিসার, সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহার তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলে ধীরেসুস্থে পড়ত যুদ্ধক্ষেত্রের নানা ফ্রণ্ট থেকে পাঠানো যুদ্ধ সংবাদদাতাদের বিবরণ। পড়বার একটা নিজস্ব ভঙ্গী ছিল ওর, সেটাকে "সক্রিয় পঠন" বলা যায়। কোন বিবরণের একটা অংশ মনের মত হয়েছে, কখনো সেটা ফিসফিস করে আবার পড়ে বিড়বিড় করে উঠত, "ঠিক কথা," আর সে-অংশটায় দাগ দিয়ে রাখত; কিম্বা হঠাৎ বলে উঠত, "মিথ্যে কথা বলছে বেটা, জায়গাটার কাছে কক্ষণো ও ছিল না, বিয়ারের বোতলের বদলে জান কবুল করে বলতে পারি! বেটা বদমায়েস! তবুও লেখা চাই!" অতিশয় কল্পনাপ্রবণ একটি যুদ্ধ সংবাদদাতার কী একটা বিবরণীতে একদিন ও এতো চটে গেল যে তৎক্ষণাৎ খবরের কাগজটিতে পোস্ট-কার্ড লেখা হয়ে গেল, বেশ রুষ্টভাবে তাতে জানাল যে এ ধরনের ব্যাপার যুদ্ধে ঘটে না, ঘটতে পারে না, এই "নির্লজ্জ মিথ্যাবাদীর" কলমে রাশ দেওয়া উচিত। অন্য সময়ে কোন বিবরণী পড়ে ভাবতে শুরু করত, বালিশে হেলান দিয়ে খোলা চোখে চিন্তায় ডুবে যেত, কিম্বা অশ্বারোহী বাহিনীর নিজের দলটার কোন গল্প করত, ওর কথা মত দলটার প্রত্যেকেই বীরপুরুষ, প্রত্যেকেই "অসমসাহসী ছোকরা"। তারপর আবার খবরের কাগজ পড়া চলত। আর, বিচিত্র সেটা, ওর এইসব মন্তব্যে, ভাবমুখর নানা অপ্রাসঙ্গিক কথায় শ্রোতাদের মনোযোগে

কোন ছেদ পড়ত না, বরঞ্চ যা ও পড়ছে সেটা আরো ভালো করে বুঝতে তাদের সাহায্য হত।

মধ্যাহ্ন-ভোজন আর চিকিৎসাপর্বের মধ্যে প্রতিদিন দু'ঘণ্টা জার্মান পড়ত ও, কথাগুলো মুখস্থ করত, রচনা করত পূর্ণ বাক্য, আর কখনো কখনো বিজাতীয় কথাগুলোর শব্দে হঠাৎ বিস্মিত হয়ে বলে উঠত:

'ওহে ছোকরারা "মুরগীছানার" জার্মান কী জানেন? "কুহেলহেন"। শুনতে খাসা কথাটা! শুনলেই পালক-ভরা নরম ক্ষুদে কিছু একটা জিনিসের কথা মনে হয়। "ছোট ঘণ্টার" জার্মান কী জানেন? "গ্লকলিং"। ঠুনঠুন একটা ভাব আছে কথাটাতে, তাই না?'

একদিন আর চুপ করে থাকতে না পেরে স্তেপান ইভানভিচ জিজ্ঞেস করল:

'কমরেড কমিসার, কেন আপনি জার্মান শিখতে চান? মিছিমিছি ধকল সহ্য করছেন, তার চেয়ে শরীরের শক্তি বাঁচিয়ে রাখলে কাজ দেবে ...'

বৃদ্ধ সৈনিকের দিকে সেয়ানাভাবে তাকিয়ে কমিসার বলল:

'তাই নাকি? ওহে দাড়িওয়ালা! রুশদের জন্যে এটা কী জীবনের মত জীবন? বার্লিনে যখন হাজির হব তখন কী ভাষায় জার্মান ছুঁড়িদের সঙ্গে কথা বলব, ভাঙ্গা রুশে?'

কমিসারের বিছানার ধারে বসে যেটা স্তেপান ইভানভিচ বলতে চাইল সেটা যুক্তিসঙ্গত; মনে মনে ভাবল এখন অবধি ত যুদ্ধের সীমান্ত মস্কো থেকে খুব বেশী দূরে নয়, জার্মান ছুঁড়িদের কাছে পৌঁছতে এখনো অনেক দিন, কিন্তু কমিসারের গলায় দৃঢ় বিশ্বাসের এমন স্বচ্ছন্দ ছাপ যে স্তেপান ইভানভিচ গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল:

'না, ভাঙ্গা রুশে নয় অবশ্য। কিন্তু তবু, কমরেড কমিসার, নিজের যত্ন নেওয়া আপনার উচিত, যা ভোগান্তি গিয়েছে আপনার!'

'যে ঘোড়াকে তোয়াজে রাখা হয় সেই আগেভাগে ধপাস করে পড়ে। এ কথাটা আগে শোনেননি? আপনার উপদেশ মোটেই সুবিধের নয়, দাড়িওয়ালা!'

ওয়ার্ডে কারো দাড়ি ছিল না, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, কমিসার সবাইকে "দাড়িওয়ালা" বলে ডাকত, আর তার বলার ভঙ্গীতে অসন্তোষজনক কিছু ছিল না, বরঞ্চ ছিল সহৃদয় ঠাট্টার একটা ছাপ, রোগীদের মন তাতে জুড়িয়ে যেত।

দিনের পর দিন কমিসারকে দেখল আলেক্সেই, ওর অফুরন্ত ফুর্তির উৎসটা কী তা বের করার চেষ্টা করত। ও যে ভয়াবহ যন্ত্রণায় ভুগছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘুমিয়ে পড়লে নিজের উপরে আর দখল থাকত না, তখন শুরু হত গোঙানি আর ছটফটানি, দাঁতে দাঁত চেপে ধরা, মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যেত। অবস্থাটার কথা নিজেও জানত সে, তাই দিনের বেলায় জেগে থাকার চেষ্টা করত, কিছু না কিছু একটা করার অভাব হত না। জাগ্রত অবস্থায় সে শান্ত, ভাববিকার হয় না, যেন কোন যন্ত্রণা নেই। ডাক্তারদের সঙ্গে ধীরেসুস্থে আলাপ চালাত, শরীরের আহত স্থানগুলো ওরা ঠুকে ঠুকে দেখার সময়ে ইয়ার্কি করতে ছাড়ত না, শুধু বিছানার চাদর যেভাবে মুচড়ে ধরত আর নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম থেকে আঁচ করা যেত নিজেকে সামলে রাখা ওর পক্ষে কী কঠিন ব্যাপার। অসম্ভব যন্ত্রণা চেপে লোকটা কী করে এরকম উদ্যম, প্রফুল্লতা আর সজীবতা দখলে আনতে পারে বৈমানিক বুঝতে পারত না। হেঁয়ালিটার সমাধানের জন্য আলেক্সেই খুব উদগ্রীব, কারণ ঘুমের ওষুধের মাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও রাত্রে তার ঘুম আসত না, কখনো কখনো সারা রাত চোখ না বুজে শুয়ে থাকে, কম্বল কামড়ে চেষ্টা করত যাতে গোঙানির আওয়াজ কেউ না শোনে।

শরীর পরীক্ষার সময় ডাক্তারদের মুখে ক্রমশ বেশী করে সেই ভয়াবহ কথাটা — "অঙ্গচ্ছেদ" — আসতে লাগল। ভয়াবহ দিনটা এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে আলেক্সেই ঠিক করল পা বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই।

৫

আর সেই দিনটা এসে পড়ল। রোঁদে এসে একদিন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ অনেকক্ষণ ধরে আলেক্সেই'র কালশিটে-নীল আর সম্পূর্ণ অসাড় পায়ে টোকা দিলেন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'দুটোকে কাটতেই হবে!' মড়ার মত শাদা হয়ে গেল বৈমানিকের মুখ, কিন্তু ও একটি কথা বলার আগেই অধ্যাপক কঠোরভাবে আবার বললেন, 'কাটতেই হবে। আর কোন কথা শুনব না, বুঝলে? না কাটলে জাহান্নমে যাবে! বুঝতে পারছ?'

নিজের অনুচরবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ওয়ার্ডে গুমোট স্তব্ধতা। পাথরের মত মুখে

মেরেসিয়েভ খোলা চোখে শুয়ে আছে। যেন কুয়াশায় ওর চোখের সামনে ভাসছে বুড়ো মাঝির কালো কদাকার কাঠের পাদুটো, আবার ও দেখল বুড়োটা ভেজা বালুর উপরে হামাগুড়ি দিয়ে বাঁদরের মত জলে নামছে।

'আলিওশা,' কমিসার আস্তে আস্তে ডাকল।

'কী?' সুদূর, অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দিল আলেক্সেই।

'এটা দরকার, ভায়া!'

ঠিক সেই মুহূর্তে আলেক্সেই'র মনে হল মাঝিটা নয়, ও নিজেই কাঠের পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে, আর ওর বান্ধবী, ওর ওলিয়া, বালুময় নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছে, পরনের উজ্জ্বল রঙীন ফ্রক হাওয়ায় উড়ছে, পাতলা দীপ্ত সুন্দর মেয়েটি একাগ্রভাবে ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াবে এরকম! নিঃশব্দ কান্নার দমকে ভেঙ্গে পড়ে সে মুখ গুঁজল বালিশে। ওয়ার্ডের সবাই অত্যন্ত বিচলিত। স্তেপান ইভানভিচ বিছানা ছেড়ে উঠে গোঙাতে গোঙাতে পোষাক চড়িয়ে, চটি-পরা পা টেনে টেনে, খাটের শিক ধরে খুঁড়িয়ে চলল আলেক্সেই'র খাটের দিকে, কিন্তু কমিসার ওকে অঙ্গুলি নির্দেশে বারণ করল, যেন বলতে চায়: "বাধা দিও না, প্রাণভরে কাঁদতে দাও ওকে।"

আর সত্যিই, কেঁদে হালকা লাগল আলেক্সেই'র। অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে এল, এমন কি মনে সেই স্বস্তির ভাব এল, বহুদিন বিড়ম্বনা-দেওয়া কোন সমস্যার হেস্তনেস্ত অবশেষে হয়ে গেলে যে স্বস্তি মানুষের মনে আসে। অস্ত্রোপচারাগারে নিয়ে যাবার জন্য সন্ধ্যেবেলায় আর্দালিরা এল, ততক্ষণ একটিও কথা বলল না সে। ঝকঝকে শাদা ঘরটায় গিয়েও একটিও কথা বেরোল না ওর মুখ থেকে। এমন কি যখন বলা হল যে ওর হৃৎপিণ্ডের যা অবস্থা তাতে ওকে অজ্ঞান করা চলবে না, স্থানীয় এ্যানেস্থেটিক দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হবে, তখনো শুধু মাথা নাড়ল আলেক্সেই। অস্ত্রোপচারের সময়ে গোঙাল না, কাতরোক্তি পর্যন্ত করল না। সহজ অস্ত্রোপচারটি করলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ স্বয়ং; যথারীতি নার্স আর সহকারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্রুদ্ধ গরগরানি চলছে, যে সহকারীটি আলেক্সেই'র নাড়ী দেখছে তার দিকে কয়েকবার উৎকণ্ঠিতভাবে তাকালেন তিনি।

হাড়গুলো কাটা হল, তখনকার যন্ত্রণা ভয়াবহ; কিন্তু যন্ত্রণায় আলেক্সেই এখন অভ্যস্ত, শাদা পোষাক, গজের মুখোস-পরা লোকগুলো ওর পায়ের কাছে কী করছে বুঝতেও পারল না সেটা।

ওয়ার্ডে পৌঁছিয়ে জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমেই দেখল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার দরদে-ভরা মুখ। আশ্চর্যের বিষয়, কিছু মনে ছিল না ওর, এমন কি অবাক হয়ে ভাবল কেন এই সোনালী-চুল, সহৃদয় সুশ্রী মেয়েটি উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ খুলেছে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ, কম্বলের নিচে ওর হাতে আস্তে চাপ দিল।

'অবাক করে দিয়েছেন আপনি!' বলে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা তক্ষুণি ওর হাত ধরে নাড়ী দেখতে লাগল।

"কী বলছে ও?" ভাবল আলেক্সেই। আর তখনি পায়ে যন্ত্রণার বোধ ফিরে এল, আগেকার মত নিচুতে নয়, উপরে, আর যন্ত্রণাটা আগেকার মত তীক্ষ্ন তীব্র দবদবে নয়, চাপা ব্যথা, যেন হাঁটুর নিচে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ বিছানার ভাঁজ দেখে ও উপলব্ধি করল যে আগেকার তুলনায় শরীরটা ছোট হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু মনে ফিরে এল: চোখ-ঝলসানো শাদা ঘরটা, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের ক্রুদ্ধ গরগরানি, এনামেলের বাটিতে জিনিস রাখার ভারী শব্দ। "হয়ে গিয়েছে তা হলে?" স্বল্প অস্থিরতায় ভেবে আলেক্সেই জোর করে হেসে বলল নার্সকে:

'মনে হচ্ছে ছোট হয়ে গিয়েছি।'

অশুভ হাসি সেটা, মুখবিকৃতির মত। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা বলল:

'ঠিক আছে, এবার আপনার সহজ লাগবে।'

'হ্যাঁ। দেহের বোঝাটা কমে গিয়েছে।'

'ওটা বলবেন না! কিন্তু সত্যি আপনি অবাক করে দিয়েছেন! অনেকে চেঁচায়, অনেককে এমন কি বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু আপনি টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি... ওঃ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ!'

গোধুলির আলোয় কমিসারের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'এবার প্যানপ্যানানি থামান! এই চিঠিগুলো দিন, নার্স। কয়েকজনের কপাল ভালো, হিংসে হয় আমার। ভেবে দেখো ত, এতগুলো চিঠি একসঙ্গে পাচ্ছে!'

একগোছা চিঠি কমিসার মেরেসিয়েভকে দিল। আলেক্সেই'র বিমান-রেজিমেণ্ট থেকে এসেছে, ভিন্ন ভিন্ন তারিখে, কিন্তু যেমন করেই হোক একসঙ্গে এসেছে। আর এখন, পাদুটো নেই, শুয়ে শুয়ে দোস্তির চিঠিগুলো

পড়ল আলেক্সেই, কঠিন পরিশ্রমে ভরা বিপদবাধাসঙ্কুল সুদূর জীবনের কথা সেগুলোতে, সেই জীবন ওকে টানছে চুম্বকের মত, কিন্তু সেখানে ফেরার আর কোন উপায় নেই তার। ওর দল থেকে আসা নানা বড়ো আর ছোট খবর সাগ্রহে পড়ল ও: কোর হেডকোয়ার্টার্সের রাজনৈতিক অফিসার আভাস দিয়েছে যে বিমান-রেজিমেণ্টটাকে লাল পতাকা খেতাব দেবার সুপারিশ করা হয়েছে; ইভানচুক দুটো পুরস্কার পেয়েছে একসঙ্গে; ইয়াশিন শিকারে গিয়ে একটা শেয়াল মেরেছে, যে কোন কারণেই হোক সেটা লেজবিহীন; আর স্তিওপা রস্তভের দাঁতের কড়া হয়েছে, সেজন্য লেনচ্‌কার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারটা ভেস্তে গিয়েছে — সব খবরে আলেক্সেই'র সমান আগ্রহ। মুহূর্তের জন্য তার মন চলে গেল বনে গুপ্ত সেই বিমান-ঘাঁটিটাতে, চোরা মাটির জন্য যেটিকে বৈমানিকেরা বাপান্ত করত; এখন তার মনে হল পৃথিবীতে ওরকম জায়গা আর নেই।

চিঠিগুলোতে বর্ণিত সব ঘটনা এত মনোযোগ দিয়ে পড়ছে যে বিভিন্ন তারিখগুলো ওর চোখে পড়ল না, দেখল না যে নার্সকে চোখ ঠেরে কমিসার ওর দিকে দেখিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলছে, 'আমার দাওয়াইটা তোমাদের সমস্ত ঘুমেব ওষুধের চেয়ে ভালো।' এরকম অবস্থার উদ্ভব হতে পারে ভেবে কমিসার কয়েকটা চিঠি চেপে রেখেছিল, যাতে ওর প্রিয় বিমান-ঘাঁটির খবর আর সাদর সম্ভাষণে ওর সাঙ্ঘাতিক ক্লেশের কিছুটা লাঘব হয়, সে কথাটা আলেক্সেই কখনো জানতে পারেনি। ঝানু সৈনিক কমিসার। তাড়াতাড়ি, যেমন-তেমনভাবে লেখা কাগজের টুকরোগুলোর মূল্য কতটা, যুদ্ধক্ষেত্রে ওষুধ কিম্বা খাবারের চেয়ে অনেক সময় ওদের দাম যে বেশী, সেটা জানা ছিল তার।

আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কোর চিঠিটা তার মতই সহজ আর অনাড়ম্বর, সঙ্গে একটা চিরকুট, ছোট, বাঁকা হাতের লেখা, বিস্ময়ের চিহ্নে কণ্টকিত। চিঠিটা হল:

"কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট! কথা রাখেননি, এটা ভালো নয়!!! এখানের বাহিনীতে আপনার কথা প্রায়ই হয়; মিথ্যে বলছি না, ওরা হামেশাই আপনার কথা বলে। কিছুক্ষণ আগে উইং কম্যান্ডার খাবার ঘরে বললেন: 'আলেক্সেই মেরেসিয়েভ, মানুষের মত মানুষ ও !!!' আপনি ত জানেন যে শুধু সেরা লোকদের বিষয়েই উনি এভাবে কথা বলেন। শীগগির ফিরে আসুন, সবাই আপনার প্রতীক্ষায় আছে!!! খাবার ঘরের মোটা

লিওলিয়া লিখতে বলছে যে আপনার সঙ্গে আর তর্কাতর্কি করবে না, মধ্যাহ্ন-ভোজনের দ্বিতীয় পদ আপনাকে বারবার তিনবার দেবে, তাতে যদি চাকরীও যায় তাও সই, কিন্তু আপনি কথা রাখেন না, খুব খারাপ কিন্তু সেটা!!! অন্যদের চিঠি দিয়েছেন, আমাকে লেখেননি কিন্তু। তাতে আমার ভয়ানক খারাপ লাগছে, আর সেইজন্যই আলাদা করে চিঠি আপনাকে লিখছি না। কিন্তু দয়া করে আমাকে চিঠি দেবেন — আলাদা খামে — কেমন আছেন, কী করছেন, সবকিছু জানাবেন!..”

মজার চিরকুটটির তলায় সই করা হয়েছে: “আবহাওয়া সার্জেণ্ট”। হাসল মেরেসিয়েভ, কিন্তু ওর চোখে আবার পড়ল নিচে দাগ-দেওয়া সেই কথাগুলো “শীগগির ফিরে আসুন, সবাই আপনার প্রতীক্ষায় আছে!!!” বিছানায় উঠে বসে, পাদুটো যেখানে ছিল সেখানটায় অস্থিরভাবে হাতড়াল, পকেট খুঁজে দেখা গেল জরুরী দলিল একটা হারিয়ে গেছে এমন ভাবে। জায়গাটা ফাঁকা।

শুধু তখনি ওর লোকসানের গুরুত্বটা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করল আলেক্সেই। আর কখনো নিজের রেজিমেণ্টে, বিমান বাহিনীতে, লড়াই'এ ফিরে যেতে পারবে না ও। বিমানে উঠে আকাশ-যুদ্ধে আর কখনো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না, কখনো নয়! পঙ্গু এখন, প্রিয় কাজে আর হাত দিতে পারবে না, এক জায়গায় জড়ের মত থাকতে হবে, বাড়িতে বোঝার মত, পৃথিবী আর ওকে চায় না। আর এরকম চলবে আমরণ।

৬

অস্ত্রোপচারের পরে এ অবস্থায় সবচেয়ে খারাপ যেটা হতে পারে মেরেসিয়েভের তাই হল। ও নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল। কোন অভিযোগ নেই, কাঁদল না, কখনো খিটখিটে হল না, শুধু নির্বাক হয়ে রইল।

দিনের পর দিন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে মেরেসিয়েভ, ঘরের ছাতের টেরাবাঁকা চিড়ে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ওয়ার্ডের সাথীরা কথা বললে শুধু “হ্যাঁ” কিম্বা “না” বলে, ঠিক জবাব সেটা হত না প্রায়ই, আবার চুপ করে পলস্তারার কালো একটা চিড়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, দুর্বোধ্য সঙ্কেতচিহ্ন যেন ওটা, ওটার পাঠোদ্ধার যেন ওর মোক্ষ। ডাক্তারের সমস্ত নির্দেশ ও বিনা বাধায় মেনে

চলত, যা ওষুধ খেতে বলা হত তাই খেত, খাবারে রুচি নেই, অবসন্নভাবে ভোজন সেরে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ত।

'ওহে দাড়িওয়ালা!' কমিসার ডাকত। 'কী ভাবা হচ্ছে?'

মুখ ঘুরিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে কমিসারের দিকে তাকাত আলেক্সেই, যেন ওকে দেখতে পায়নি।

'জিজ্ঞেস করছি, কী ভাবছ?'

'কিছু না।'

একদিন ওয়ার্ডে এসে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ তাঁর স্বভাবসুলভ কর্কশ খোলাখুলিভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলেন.

'কী হে, হামাগুড়ি-ওস্তাদ, বেঁচে আছ তাহলে? কেমন সময় কাটছে? বীরপুঙ্গব তুমি, সত্যি বলছি! মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয়নি তোমার। এখন বিশ্বাস করি যে জার্মানদের ওখানে থেকে চলে আসার জন্য আঠারো দিন স্রেফ হামাগুড়ি দিয়েছিলে। তোমার বয়সে যত আলু খেয়েছ তার চেয়ে বেশী লোককে কাটাছেঁড়া আমি করেছি কিন্তু তোমার মত আদমী আজ পর্যন্ত আমার হাতে আসেনি।' হাতে হাত ঘষলেন অধ্যাপক, হাতদুটো লাল, চামড়া উঠে আসছে, নখগুলো কালচে হয়ে গিয়েছে। 'মুখ বেঁকাচ্ছ কেন? প্রশংসা করছি আর লোকটা মুখ বেঁকাচ্ছে! চিকিৎসা-বাহিনীতে লেফ্‌টেনান্ট-জেনারেল আমি, তোমাকে হাসতে হুকুম করছি!'

কষ্টে ঠোঁট ফাঁক করে ফাঁপা রবারের মত হাসি মুখে আনল আলেক্সেই, আর ভাবল, "পরিণতিটা এরকম হবে জানলে কষ্ট করে আর হামাগুড়ি দিতাম না। পিস্তলে তিনটে গুলি ত পড়ে ছিল।"

খবরের কাগজে কোন সংবাদদাতা একটি চিত্তাকর্ষক যুদ্ধের বর্ণনা করেছে, সেটা পড়ে শোনাল কমিসার। আমাদের ছ'টা জঙ্গী বিমান বাইশটা জার্মান বিমানের সঙ্গে লড়াই চালায়, ওদের আটটা প্লেন নামায়, আমাদের মাত্র একটা নষ্ট হয়। এত উৎসাহে গল্পটি পড়ে শোনাল কমিসার যে মনে হল ওর অপরিচিত বৈমানিকেরা নয়, নিজের দলের ঘোড়সওয়াররাই এরকমভাবে নাম কিনেছে। পরে যে আলোচনা শুরু হল তাতে এমন কি কুকুশকিনও খুব উৎসাহ দেখাল, কী করে যুদ্ধটা চলেছিল সেই নিয়ে মতভেদ আর আলোচনা। শুধু শুয়ে শুয়ে আলেক্সেই ভাবল, "কপাল ভালো ওদের, আকাশে উড়ছে আর লড়াই করছে ওরা, কিন্তু আমি ত আর কখনো উড়তে পারব না।"

সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহারগুলো ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে এল।

লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে জার্মানদের আবার ঘা দেবার জন্য সোভিয়েত বাহিনীর পিছনে কোথাও বিরাট শক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। কোথায় ঘাটা দেওয়া হবে, জার্মানদের উপরে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তাই নিয়ে গম্ভীর আলাপ আলোচনা চালাত কমিসার আর স্তেপান ইভানভিচ। কিছু দিন আগে পর্যন্ত এ ধরনের আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে আলেক্সেই, কিন্তু এখন তাতে কান না দেবার চেষ্টা করত সে। বিরাট কিছু একটা, প্রচণ্ড এবং হয়ত, চূড়ান্ত যুদ্ধ আসন্ন, সেটা আলেক্সেই'ও আঁচ করেছে। কিন্তু ওর বন্ধুরা, এমন কি হয়ত কুকুশকিন পর্যন্ত, তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে সে, এই সব যুদ্ধে যোগ দেবে, আর ও পিছনে পড়ে থেকে পচবে, কিছু করার উপায় নেই তার, ব্যাপারটা ওর কাছে মর্মান্তিক; তাই কমিসার খবরের কাগজ পড়ে শোনালে কিম্বা যুদ্ধের বিষয়ে কোন আলোচনা শুরু হলে ও কম্বলে মাথা চেপে বালিশে গাল ঘষত, যাতে চোখে কিছু না পড়ে, কানে কিছু না আসে। আর কোন কারণে মাক্সিম গোর্কির সেই পরিচিত "বাজপাখির গান" এর লাইনটা বারবার মনে আসত: "গুড়ি মেরে যেতে জন্মেছে যারা উড়তে পারে না তারা"।

কয়েকটা নরম উইলো ডাল নিয়ে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা— যুদ্ধকালীন, অবরোধ প্রাচীরে কীর্ণ, কঠোর মস্কো সহরে কী করে সেগুলো এল ভগবান জানেন — প্রত্যেকের বিছানার পাশে গেলাসে এক একটা শাখা রাখল। লালচে শাখায় আর তুলোর পেঁজার মত নরম শুঁটিতে তাজা গন্ধ, মনে হল ৪২ নং ওয়ার্ডে মূর্তিমান বসন্ত এসেছে। সেদিন প্রত্যেকের মনে আনন্দ আর চঞ্চলতা। এমন কি নির্বাক ট্যাংক-অফিসারটি পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজের মধ্য দিয়ে বিড়বিড় করে কী একটা বলল।

শুয়ে শুয়ে আলেক্সেই ভাবছে: কামিশিনে, ছোট ছোট ঘোলাটে জলের ধারা কর্দমাক্ত অলিগলি বেয়ে চিকচিকে বড়ো পাথর দিয়ে তৈরী রাস্তায় এসে পড়ছে, তপ্ত মাটির আর গোবরের গন্ধ, তাজা স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ। এমন একটি দিনে ভলগার খাড়া পাড়ে দাঁড়িয়েছিল ওলগা আর সে, নদীর সীমাহীন বিস্তারে মসৃণ গতিতে বরফ ভেসে গিয়েছে ওদের পেরিয়ে, চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা, শুধু লার্কগুলোর ঘণ্টার মত রূপালী ডাকে সে স্তব্ধতা ভাঙছে। আর মনে হয়েছিল যে স্রোতে বরফ নয়, সে আর ওলগা নিঃশব্দে ভেসে চলেছে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কোন নদীর দিকে। কোন কথা না বলে দাঁড়িয়েছিল দুজনে, আগামী সুখের দিনের রঙীন স্বপ্নে এত বিভোর যে

বিশাল বিস্তৃত ভলগার উপরের সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে, বসন্তের চঞ্চল এলোমেলো হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে এসেছিল ওদের। সে-সব স্বপ্ন আর সত্যি হবে না এখন। ওর কাছে ওলগা আর আসবে না। আর আসেও যদি, ওর আত্মত্যাগ কী করে মেনে নেবে ও? নিজে ত কাঠের পায়ে নেংচিয়ে চলবে, কী করে দীপ্ত সুঠাম সুন্দর ওলগাকে নিজের পাশে হাঁটতে দেবে?.. বসন্তের সেই সাদাসিধে অগ্রদূতটিকে বিছানার পাশ থেকে সরিয়ে নিতে আলেক্সেই মিনতি করল নার্সকে।

উইলোর শাখাটি সরানো হল বটে, কিন্তু মন থেকে তিক্ত ভাবনা সব সহজে সরিয়ে দিতে পারল না আলেক্সেই। পাদুটো গিয়েছে শুনলে কী বলবে ওলগা ? ওকে ছেড়ে চলে যাবে, নিজের জীবন থেকে একেবারে মুছে দেবে? আলেক্সেই'র সমস্ত সত্তা এটাতে আপত্তি জানাল। না, এরকম লোক ওলগা নয়! ওকে ছেড়ে চলে যাবে না, মুখ ঘুরিয়ে নেবে না সে। কিন্তু সেটা যদি না করে তাহলে আরো খারাপ। মহৎ অন্তরের আবেগের ঝোঁকে সে ওকে বিয়ে করছে কল্পনা করল আলেক্সেই, বিয়ে করল পঙ্গুকে, তার খাতিরে ইঞ্জিনিয়ারিঙ শিক্ষার স্বপ্ন ছেড়ে দিল, অফিসের গতানুগতিক কাজ নিল যাতে নিজের, পঙ্গু স্বামীর, আর কে বলতে পারে, হয়ত ছেলেপুলের সংসার চলে।

এ ধরনের আত্মত্যাগ ওকে করতে দেওয়ার কী অধিকার আছে তার? দুজনের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোন বন্ধন নেই, বাগদান মাত্র হয়েছে, এখনো স্বামী স্ত্রী হয়নি। ওলগাকে ভালোবাসে, অসম্ভব ভালোবাসে, আর তাই ও ঠিক করল ও ধরনের কোন অধিকার নেই ওর, দুজনের যোগসূত্র নিজেকেই ছিন্ন করতে হবে, বিনা বিলম্বে, এক কথায়, তাতে ভবিষ্যতের দুরূহ বোঝা ওলগাকে বইতে হবে না, আর বর্তমান সমস্যার যন্ত্রণা থেকেও রেহাই পাবে ও।

কিন্তু কামিশিনের ডাকঘরের ছাপ দেওয়া কয়েকটি চিঠি আসাতে আলেক্সেই'র সমস্ত সিদ্ধান্ত ওলটপালট হয়ে গেল। ওলিয়ার চিঠির প্রতি লাইনে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোচ্ছে। সর্বনাশের পূর্বাভাসে যেন পীড়িত এমনভাবে সে লিখেছে যে আলেক্সেই'র যা কিছু ঘটুক না কেন, চিরকাল ওর সঙ্গে থাকবে ও, ওর জন্যই সে বেঁচে আছে, সময় পেলেই ওর কথা ভাবে, আর ওর চিন্তাই যুদ্ধকালীন সমস্ত কষ্ট, কারখানায় বিনিদ্র রাত্রি, পরিখা, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী নালা খোঁড়া, আর লুকিয়ে কী হবে, আধ-পেটা খেয়ে থাকা, সমস্ত কিছু সওয়াতে সাহায্য করে ওকে। "তোমার সেই শেষ

ছবিটা, গাছের গুঁড়িতে একটা কুকুর নিয়ে বসে আছ, মুখে হাসি লেগে আছে, সেটা কখনো হাতছাড়া করি না। মা'র লকেটে সেটা রেখে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। মন খারাপ লাগলে সেটা খুলে ছবিটা দেখি... আমার বিশ্বাস, আমাদের ভালোবাসা যতদিন অটুট থাকবে ততদিন ভয় করার কিছু নেই।" আরো লিখেছে যে হালে আলেক্সেই'র মা ছেলের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত, তাঁকে আরো বেশী চিঠি লেখা ওর উচিত, কিন্তু কোন দুঃসংবাদ দিয়ে যেন তাঁকে উদ্বিগ্ন না করা হয়। বাড়ির চিঠি পেলে আগে সব সময়েই বিশেষ ভালো লাগত, যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্বিপাক-ভরা জীবনে সেগুলো ছিল আনন্দের উৎস। কিন্তু এখন, চিঠি পেয়ে এই প্রথম তার কোন আনন্দ হল না। চিঠিগুলোতে তার মন আরো ভারী হয়ে উঠল, আর একটা ভুল সে করল, যে ভুলের জন্য পরে অনেক ভুগতে হয়েছিল: পাদুটো কাটা হয়েছে—এ খবরটা বাড়িতে জানাবার সাহস তার হল না।

নিজের দুর্ভাগ্যের আর নিরানন্দ ভাবনাচিন্তার কথা খুঁটিয়ে লিখল শুধু একজনকে, আবহাওয়া কেন্দ্রের সেই মেয়েটিকে। দুজনের আলাপ পরিচয় নেই বললেও চলে, সেজন্য এসব ব্যাপার তাকে জানানো আরো সহজ। মেয়েটির নাম অজানা, ওর ঠিকানা তাই লিখল: "ফিল্ড পোস্ট অফিস, অমুক-অমুক আবহাওয়া কেন্দ্র "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" জন্য।" যুদ্ধক্ষেত্রে চিঠিপত্রের উপরে বিশেষ মূল্যারোপ করা হয় সেটা জানত আলেক্সেই, তাই ওর আশা যে ঠিকানাটা অদ্ভুত হলেও কোন না কোন সময়ে ঠিক জায়গায় পেঁাছবে। আর না পেঁাছলেও কিছু এসে যাবে না, নিজের মনের ভাবকে ভাষায় রূপ দিতে ও শুধু চেয়েছিল।

তিক্ত ভাবনা চিন্তায় হাসপাতালে একঘেয়ে দিনগুলো কাটছে আলেক্সেই মেরেসিয়েভের। অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল সুপটুভাবে, ওর লোহার মত শক্ত শরীর সেটা সইয়ে নিল; ক্ষতগুলো তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দিনে দিনে ও দুর্বল হয়ে যেতে লাগল, সেটা রোধ করার নানা চেষ্টা সত্ত্বেও ও দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে সবায়ের চোখের সামনে।

৭

বাইরে ইতিমধ্যেই বসন্তের উদ্দাম জোয়ার।

দুর্বার বসন্ত ঢুকল ৪২ নং ওয়ার্ডে, আইওডোফর্মের গন্ধে ঝাঁঝালো ঘরটায়। জানলা দিয়ে এল সেটা, সঙ্গে আনল গলন্ত বরফের ঠাণ্ডা ভিজে

গন্ধ, চড়ুই'এর অস্থির কিচির মিচির, মোড়-ঘোরা ট্রামগুলোর প্রফুল্ল মুখর ঝনঝনানি, বরফ-মুক্ত এ্যাসফল্টের রাস্তায় পায়ের জোরালো শব্দ আর সন্ধ্যেবেলায় একটা একর্ডিয়নের নিচু একটানা সুর। পাশের জানলা দিয়ে বসন্ত উঁকি মারল, জানলাটা দিয়ে চোখে পড়ে পপলারগাছের রৌদ্রোজ্জ্বল একটা শাখা, তার উপরে হলদে রসে-ভরা বড়ো গোছের কুঁড়ি ফেঁপে উঠছে। ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার পাণ্ডুর মমতাময় মুখের সোনালী ফুট ফুট দাগের আকারে বসন্ত এল ওয়ার্ডে, নানা রকমের পাউডার মেখেও দাগগুলো যায়নি বলে নার্সটির বিরক্তির সীমা নেই। জানলার বাইরের টিনে-ঢাকা কার্নিশে বড়ো বড়ো বিন্দু ফুর্তিতে টপটপ করে পড়ছে, তাতে বসন্তের কথা খালি মনে পড়ে।

আগেকার মত এবারেও মানুষের অন্তরে কোমলতা আনল বসন্ত, জাগাল নানা স্বপ্ন।

প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষায় কমিসার বলল: 'বনের ফাঁকা জায়গায় বন্দুক হাতে এ সময়ে থাকাটা খাসা ব্যাপার, তাই না, স্তেপান ইভানভিচ? চালায় ওৎ পেতে শিকারের জন্য ভোরবেলায় বসে থাকা... চমৎকার কিন্তু!.. গোলাপী ভোর, ঝরঝরে বরফের একটু ঘন আমেজ তাতে, আর চালায় চুপ করে বসে থাকা। হঠাৎ পাখির ডাক, ডানার ঝটপট, উড়ে মাথার ওপরে বসল পাখিটা — পাখার মত লেজ ছড়িয়ে, তারপর আর একটা এল, আরো একটা...'

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্তেপান ইভানভিচ চকাৎ আওয়াজ একটা করল, যেন মুখে জল এসে গিয়েছে, কিন্তু কমিসার তার স্বপ্নবিলাস থামাল না:

'তারপর আগুন জ্বালানো হল, বর্ষাতি বিছোনো হল, সুগন্ধি খাসা চা বানানো হল, ধোঁয়ার আস্বাদ তাতে, আর এক চুমুক ভদকা, ব্যস, সমস্ত শরীর গরম হয়ে উঠল, তাই না? খাটুনির পরে...'

'এবার থামুন, কমরেড কমিসার, আমাদের অঞ্চলে বছরের এ সময়ে কী ধরনের শিকার পাওয়া যায়, জানেন? পাইক-মাছ! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, কিন্তু কথাটা সত্যি। আগে শোনেননি কথাটা? বেশ মজার ব্যাপার এটা, আর কিছু রোজগারও করা যায় অবশ্য। হ্রদে বরফ গলতে আর নদীর জল ছাপিয়ে উঠতে শুরু করলেই মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে যায় পাড়ে, ঘাসে আর বসন্তের জলে ঢাকা শেওলায় গিয়ে ওঠে। ঘাসে গিয়ে ডিম পাড়ে। নদীর

তীর ঘেঁষে যাচ্ছে, জলে-ডোবা কাঠের কেঁদোর মত জিনিস চোখে পড়বে, কিন্তু আসলে ওগুলো মাছ! বন্দুক চালান, মাঝেমাঝে এতগুলো একসঙ্গে পাবেন যে থলেতে আঁটতে পারবে না। সত্যি কথা বলছি!..'

তারপর শিকারীদের স্মৃতিবিনিময় চলে। সকলের অজান্তে যুদ্ধের কথা এসে পড়ে, ডিভিশনে কিম্বা দলে এখন কী হচ্ছে ভাবে ওরা, ভাবে শীতকালে খোঁড়া ডাগ-আউটগুলিতে জল চুঁইয়ে পড়ছে কি না, গড়খাইগুলোর অবস্থাই বা কী, ফ্যাশিস্টদের হাল কেমন, পশ্চিমে ওরা ত এ্যাসফল্টের রাস্তায় অভ্যস্ত।

মধ্যাহ্ন-ভোজন হয়ে গেলে চড়ুইগুলোকে খাওয়ায় ওরা। বেশ মজার ব্যাপার এটা, স্তেপান ইভানভিচের আবিষ্কার। চুপ করে বসে থাকতে সে কখনো পারে না, ক্ষীণ অস্থির হাতে কিছু না কিছু সব সময়ে করছে। একদিন ও বলল যে খাবারের পর গুঁড়োগুলো জানলার বাইরের কার্নিশে ছড়িয়ে দেওয়া হোক পাখিগুলোর জন্য। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল এটা, শুধু উচ্ছিষ্ট গুঁড়ো নয়, রুটির টুকরো ইচ্ছে করে ফেলে রাখত ওরা, সেগুলো গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হত, ফলে এক ঝাঁক চড়ুইকে, স্তেপান ইভানভিচের ভাষায়, "রসদের বরাদ্দ তালিকায় রাখা হল," ক্ষুদে, সরব প্রাণীগুলো বড়ো একটা টুকরো ঠোকরাচ্ছে, কিচির মিচির ঝগড়া চলেছে, ঝনকাঠে খুদটুকু আর পড়ে নেই, পপলারের ডালে বসে ঠোঁট দিয়ে নিজেদের গা সাফ করা চলল, তারপর ফরফর করে নিজেদের বিশেষ বিশেষ কাজে উড়ে চলে গেল, দৃশ্যটা দেখে ওয়ার্ডের লোকেদের আনন্দের অন্ত থাকত না। চড়ুইদের খাওয়ানো ওদের বিশেষ প্রিয় আমোদে দাঁড়াল। কয়েকটা চড়ুইকে আলাদা করে চিনল রোগীরা, নামকরণও হল তাদের। ওদের বিশেষ প্রিয় ছিল একটা বেঁড়ে বেয়াড়া খুরখুরে ক্ষুদে চড়ুই, ঝগড়ুটে স্বভাবের জন্যই লেজটা সে হারিয়েছিল খুব সম্ভব। স্তেপান ইভানভিচ ওর নাম রাখল "সাব-মেসিনগানার"।

এটা মজার ব্যাপার যে ক্ষুদে সরব চড়ুইগুলোকে নিয়ে আমোদ প্রমোদের ফলেই ট্যাঙ্ক-অফিসারের বিমর্ষ ভাবটা কেটে গেল। প্রায় একেবারে কুঁজো স্তেপান ইভানভিচ লাঠিতে ভর দিয়ে রেডিয়েটরে ওঠবার চেষ্টা করছে, যাতে হাওয়া চলাচলের খোলা জানলাটা হাতের নাগালে আসে, দৃশ্যটা অবসন্ন নিরুৎসাহ ট্যাঙ্ক-অফিসার দেখল। কিন্তু পরের দিন চড়ুইগুলো উড়ে এল জানলাটায়, আর ব্যস্তসমস্ত ক্ষুদে প্রাণীগুলোকে ভালো করে দেখবার জন্য

ব্যথায় শিঁটিয়ে ওঠা সত্ত্বেও এমন কি বিছানায় উঠে বসল সে। তার পরের দিন মধ্যাহ্নের খাবার থেকে পিঠের বড়ো একটা টুকরো বাঁচিয়ে রাখল, তার বিশ্বাস হাসপাতালের এই উপাদেয় খাবারের টুকরোটা উচ্চকণ্ঠ ভিখিরীগুলোর বিশেষ পছন্দ হবে। একদিন "সাব-মেসিনগানারের" কোন পাত্তা নেই, কুকুশকিনের অনুমান যে ওটাকে বেড়ালে খেয়েছে, সে বলল উচিত শাস্তি পেয়েছে ওটা। বিরস ট্যাংক-অফিসারের মেজাজ গেল চড়ে, বলল কুকুশকিন বেজায় "বদমেজাজী" লোক! তার পরের দিন বেঁড়ে চড়ুইটা যখন আবার এসে জানলার ঝনকাঠে বসে, মাথা একদিকে হেলিয়ে, গোলগোল বেয়াড়া জ্বলজ্বলে চোখে কিচির মিচির করে ঝগড়া শুরু করল তখন সশব্দে হেসে উঠল ট্যাংক-অফিসার, অনেক মাস পরে এই প্রথম হাসল সে।

কিছুদিনের মধ্যেই গভজ্‌দেভের মেজাজ একেবারে হালকা হয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখল যে ও বেশ ফুর্তিবাজ, গপ্পে লোক, ওর সঙ্গে সহজেই মেশা যায়। পরিবর্তনের জন্য দায়ী কমিসার অবশ্যই, স্তেপান ইভানভিচের ভাষায়, কাকে কী ভাবে নাড়া দিতে হয় তার চাবিকাঠি ওর ওস্তাদ হাতে। আর সেটা সে করল এই ভাবে।

৪২ নং ওয়ার্ডের সবচেয়ে সুখের সময় হল যখন রহস্যময় হাসিমুখে, হাত পেছন করে দরজায় এসে দাঁড়ায় ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, সবায়ের দিকে দীপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে:

'কে কে নাচবেন আজ?'

তার অর্থ হল ডাক এসেছে। যাদের চিঠি এসেছে, চিঠি হাতে পাবার আগে সেই সব সৌভাগ্যবানদের ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার কথামত অন্তত অল্পক্ষণের জন্য বিছানায় নাচের অনুকরণে নড়াচড়া করতে হত। বেশীর ভাগ সেটা করতে হত কমিসারকে, কেননা মাঝেমাঝে এক সঙ্গে দশ-বারোটা চিঠি তার কাছে আসে। চিঠিগুলো আসে ডিভিশন থেকে, যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পিছন থেকেও, সেগুলো লিখত ওর বন্ধু অফিসাররা, সাধারণ সৈনিকেরা আর বন্ধু অফিসারদের স্ত্রীরা; পুরোনো দিনের খাতিরে হয়ত তারা লিখত, কিম্বা অনুরোধ জানাত যেন বিগড়ে-যাওয়া স্বামীদের সে কড়কে দেয়; যুদ্ধে নিহত বন্ধু অফিসারদের স্ত্রীরাও নিজেদের ব্যাপার কী করে গুছিয়ে নিতে হবে তার পরামর্শ কিম্বা সাহায্য চেয়ে লিখত। যুদ্ধে নিহত রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের একটি মেয়ে, কাজাখস্তানের পাইওনিয়র দলের সদস্যা, তার নামটা পর্যন্ত মনে নেই, এমন কি সে-ও চিঠি লেখে।

প্রত্যেকটি চিঠি অসীম আগ্রহে পড়ত কমিসার, নিয়ম করে জবাব দিত; অমুক কম্যাণ্ডারের স্ত্রীকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানাত সেখানকার কর্তৃপক্ষকে, বিগড়ে-যাওয়া স্বামীটিকে চিঠিতে ধমকাল, কোন গৃহ-ব্যবস্থাপককে ভয় দেখাল যে যদি অমুক কম্যাণ্ডারের পরিবারের ঘরে সে স্টোভ না বসায় তাহলে নিজে গিয়ে তার "মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবে"। চিঠি লিখল কাজাখস্তানের সেই মেয়েটিকে যার বিদঘুটে নামটা কিছুতেই মনে থাকে না, শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় ভাগে রুশ ভাষায় খারাপ নম্বর পাওয়ার জন্য ধমকাল তাকে।

যুদ্ধক্ষেত্র আর যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনের জায়গার সঙ্গে স্তেপান ইভানভিচেরও বেশ পত্রালাপ চলত। চিঠি লিখত ওর ছেলেরা, তারাও বাহিনীতে, স্নাইপার তারা, কাজে বেশ দক্ষ, লিখত ওর মেয়ে, যৌথখামারের একটি দলের নেতা সে, চিঠিগুলোতে থাকত অসংখ্য আত্মীয়স্বজন আর জানাশোনাদের কুশলকামনা, খবর থাকত যে যদিও যৌথখামারের আরো বেশী লোককে নির্মাণের কাজে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে তবুও অমুক-অমুক পরিকল্পনার অতিপূরণ হয়েছে কয়েকভাগ। চিঠিগুলো পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো পড়ে শোনাত স্তেপান ইভানভিচ, ওর ঘরোয়া ব্যাপারের বিষয়ে নিয়মিতভাবে ওয়াকিবহাল থাকত সারা ওয়ার্ড, ওয়ার্ডের সমস্ত মেয়েরা, নার্সরা, এমন কি নিরস বদমেজাজী হাউস সার্জনটি পর্যন্ত।

এমন কি কুকুশকিন, মোটেই মিশুকে যে নয়, সারা দুনিয়ার সঙ্গে যার ঝগড়া লেগে আছে মনে হয়, তারো কাছে মায়ের চিঠি আসে, তিনি বার্নাউলের কোথায় একটা জায়গায় থাকেন। নার্সের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিত কুকুশকিন, ওয়ার্ডের সবাই ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর সেটা পড়ত, কথাগুলো চুপিচুপি উচ্চারণ করে। তখন ওর উগ্র চেহারা নরম দেখাত, মুখে আসত কোমল গম্ভীর একটি ভাব, যেটা একেবারে ওর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বুড়ী মা গ্রামের চিকিৎসক, তাঁকে ভয়ানক ভালোবাসে কুকুশকিন, কিন্তু কোন কারণে ভালোবাসাটার বিষয়ে লজ্জিত সে, সেটা ঢাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

খুসিতে ওয়ার্ডে খবরের বিনিময় চলছে, একমাত্র ট্যাঙ্ক-অফিসার এসব আনন্দের অংশীদার হত না, আরো বিষণ্ণ মুখে দেয়ালের দিকে ফিরে কম্বলে মাথা ঢাকা দিত। ওকে চিঠি লেখবার কেউ নেই। যত চিঠি ওয়ার্ডে আসে তত তীব্র ঠেকে নিজের নিঃসঙ্গতা। কিন্তু একদিন দোরগোড়ায় দেখা গেল

ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে, অন্য দিনের তুলনায় ওর মুখ আরো বেশী উত্তেজিত দেখাচ্ছে। কমিসারের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বলল ও:

'আজকে নাচের পালা কার?'

ট্যাঙ্ক-অফিসারের খাটের দিকে তাকিয়ে ওর মুখ সহৃদয় হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সবাই বুঝল অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে। প্রত্যাশায় সচকিত হয়ে উঠল ওয়ার্ডটি।

'লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভ, আজ আপনার নাচবার পালা। নাচুন তাহলে।'

মেরেসিয়েভ দেখল চমকে উঠে গভজ্‌দেভ হঠাৎ ঘুরে তাকাল, ব্যাণ্ডেজের ফাঁকে ওর চোখ ঝলসে উঠল, সেটাও নজরে পড়ল। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিল কিন্তু গভজ্‌দেভ, গলা কেঁপে উঠলেও নির্লিপ্ত ভাব আনার চেষ্টা করে বলল:

'ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। পাশের ওয়ার্ডে অন্য কোন গভজ্‌দেভ নিশ্চয়ই হাজির।' কিন্তু ওর ব্যগ্র চোখদুটো লোভীর মত তিনটি চিঠিতে নিবদ্ধ, উঁচুতে ধরে আছে সেগুলো নার্স, যেন পতাকা।

'না, কোন ভুল হয়নি,' বলল নার্স। 'কী লেখা আছে দেখুন! লেফ্‌টেনাণ্ট গ. ম. গভজ্‌দেভ, আর ওয়ার্ডের নম্বরটা পর্যন্ত আছে — ৪২। তাহলে?'

কম্বলের নিচে থেকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটা হাত ঝট করে বেরিয়ে এল। লেফ্‌টেনাণ্ট দাঁত দিয়ে অস্থিরভাবে একটা খাম খুলে ফেলল, হাতটা থরথর করে কাঁপছে, চোখ জ্বলছে উত্তেজনায়, আশ্চর্য ব্যাপার! একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাটি তিনটি মেয়ে, বান্ধবী তিনজন, ভিন্ন হাতের লেখায় ভিন্ন ভাষায় প্রায় একই কথা লিখেছে। বীর ট্যাঙ্ক-অফিসার লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভ আহত অবস্থায় মস্কোতে আছে খবর পেয়ে তার সঙ্গে পত্রবিনিময় করবে ঠিক করেছে তারা। যদি ওদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিরক্ত না হয় তাহলে কেমন আছে সেটা কি লিখে জানাবে? ওদের মধ্যে একজন, আনিউতা বলে সে সই করেছে, জিজ্ঞেস করেছে কোনভাবে ওকে সাহায্য করতে পারে কিনা, ওর ভালো বই চাই কিনা, যদি কিছুর দরকার থাকে তাহলে ইতস্তত না করে যেন জানায়।

সারা দিন লেফ্‌টেনাণ্ট চিঠিগুলো নাড়ল চাড়ল, ঠিকানাগুলো ভালো করে দেখল, হাতের লেখাও খুঁটিয়ে দেখা হল। এ ধরনের পত্রবিনিময় চলে, সেটা ওর জানা ছিল অবশ্য, একজন অজানা পত্রলেখিকার সঙ্গে তার

এরকমের পত্রবিনিময় চলেছিল একবার, উৎসবে উপহার হিসেবে পাওয়া একজোড়া পশমের দস্তানায় ছোট্ট একটি চিঠি পাবার পর বিনিময়টা শুরু হয়। পত্রলেখিকা একবার ঠাট্টা করে লেখার সঙ্গে নিজের ফটো পাঠায়, চার ছেলের মা একটি প্রবীণার ছবি — তারপর আপনা থেকেই চিঠি লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আজকের চিঠিগুলো অনেকটা আলাদা। অবাক আর খটকা লাগছে, অপ্রত্যাশিত চিঠিগুলো একসঙ্গে এসে পড়ল কী করে শুধু সেটা ভেবে। আর একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না: যুদ্ধে ও কী করেছে সেটার খবর এই ডাক্তারী ছাত্রীদের কাছে পৌঁছল কী করে? সমস্ত ওয়ার্ড এ-বিষয়ে মাথা ঘামাল, বিশেষ করে কমিসার। কিন্তু স্তেপান ইভানভিচের সঙ্গে ওর ইসারায় দৃষ্টিবিনিময় মেরেসিয়েভের চোখে পড়াতে বুঝতে পারল যে ব্যাপারটার মূলে আছে কমিসার।

যাই হোক না কেন, পরের দিন সকালে গভজ্‌দেভ চিঠির কাগজ কমিসারের কাছে চেয়ে নিল, আর কারোর অনুমতির অপেক্ষা না করে ডান হাতের ব্যাণ্ডেজটা খুলে সন্ধ্যা পর্যন্ত লিখে চলল, কাটাকুটি অনেক হল, একটা চিঠি দুমড়ে মুচড়ে আবার নতুন করে লিখল, অবশেষে অপরিচিত পত্রলেখিকাদের চিঠির জবাব তৈরী হল।

দুটি মেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই আপনা থেকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল, কিন্তু সহৃদয়া আনিউতা তিনজনের হয়ে লিখত। গভজ্‌দেভ আলাপপ্রিয় লোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় কোর্সে কী হচ্ছে না হচ্ছে সারা ওয়ার্ডটি এখন সে খবর রাখে: জীববিদ্যা রোমাঞ্চকর বিষয়, জৈব রসায়নশাস্ত্র বড়ো নীরস জিনিস, অধ্যাপকটির গলা খাসা, চমৎকার পড়ান তিনি, অমুক উপাধ্যায়টি বড়োই বিরক্তিকর, স্বেচ্ছামূলক-সাহায্য করে আগের রবিবারে ছাত্রেরা কতটা জ্বালানী কাঠ মালের ট্রলিতে বোঝাই করেছে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের কাজ করা কত কঠিন, ও মেয়েটা কেমন তোতাপাখির মত, মোটেই সুবিধের লোক নয় সে — সমস্ত খবর ওয়ার্ডের জানতে বাকি রইল না।

শুধু যে কথা বলতে শুরু করল গভজ্‌দেভ তা নয়, মনে হল ও নতুন জীবন পেয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগল।

কুকুশকিনের বন্ধফলকগুলো খুলে ফেলা হল। লাঠিতে ভর না দিয়ে চলতে শিখছে স্তেপান ইভানভিচ, ইতিমধ্যেই অনেকটা সোজা হয়ে হাঁটতে পারে। এখন সারা দিন জানলার ধারে কাটায় সে, "বিরাট পৃথিবীতে" কী

ঘটছে দেখে। দিনে দিনে শুধু কমিসার আর মেরেসিয়েভের অবস্থা সমানে খারাপের দিকে চলেছে, বিশেষ করে কমিসারের। সকালের ব্যায়াম করা ছেড়ে দিয়েছে সে। শরীরে এসেছে ভীতিকর, হলদেটে, প্রায় স্বচ্ছ একটা ফাঁপা ভাব। হাতদুটো মুড়তে কষ্ট হয়, পেন্সিল কি চামচ আর ধরতে পারে না কমিসার।

সকালে ওয়ার্ডের পরিচারিকা তাকে ধুইয়ে খাইয়ে দেয়। এটা বোঝা যায় যে যন্ত্রণার জন্য নয়, নিজের অসহায়তায় বিষণ্ণ ও ব্যথিত বোধ করছে সে। কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল না কমিসার। ওর ভারী গলা আগেকার মতই ফুর্তিতে গমগম করে ওঠে, সমান আগ্রহে খবরের কাগজ পড়া চলে, জার্মান শেখাটাও বাদ পড়েনি; কিন্তু পড়বার সময় বইগুলো ধরতে পারে না আর, তাই তার দিয়ে বই ঠেস দিয়ে রাখবার একটা স্ট্যান্ড বানিয়েছে স্তেপান ইভানভিচ, ওর বিছানার পাশে বসে বইগুলোর পাতা উল্টিয়ে দেয় সে। সকালে, খবরের কাগজ তখনো আসেনি, কমিসার ব্যগ্রভাবে নার্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষ ইস্তাহারে কী বলেছে, রেডিওর খবর কী, আবহাওয়া কেমন, মস্কোতে কী গুজব।

মনে হয় শরীর যতই দুর্বল হচ্ছে ততই বাড়ছে ওর মনোবল। আগেকার মত সমান আগ্রহে অগুন্তি চিঠিপত্র পড়ে কমিসার, উত্তর দেয়, কুকুশকিন আর গভজ্‌দেভ পালা করে ওর কথামত চিঠি লেখে। একদিন চিকিৎসার পর মেরেসিয়েভ ঝিমোচ্ছে, কমিসারের বজ্রকঠোর গলায় জেগে উঠল।

বিছানার উপরে তারের তৈরী বই-স্ট্যান্ডে ডিভিশনের একটা খবরের কাগজের ছাই-রঙা পাতা পড়ে আছে। তার উপরে ছাপ দেওয়া: "স্থানান্তর নিষিদ্ধ", কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়মিতভাবে কাগজটা কমিসারের কাছে এক বন্ধু পাঠায়।

'প্রতিরোধ ব্যূহে বসে বসে ওদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে না কি?' কমিসার হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল। 'ক্রাভৎসভ আমলাতান্ত্রিক লোক, তাই বুঝি? বাহিনীর সেরা পশু-চিকিৎসক ও, আর ও কিনা আমলাতান্ত্রিক লোক। এক্ষুণি যা বলছি লেখো ত!'

কমিসার বলে গেল, লিখল গভজ্‌দেভ। বাহিনীর সামরিক পরিষদের একটি সভ্যকে কড়া চিঠি লেখা হল, তাকে অনুরোধ করা হল যে "কলমবাজদের" যেন রাশ টেনে রাখা হয়, একটি খাঁটি সুকর্মীর উপরে অন্যায় দোষারোপ করেছে তারা। ডাকে দেবার জন্য চিঠিটা নার্সের হাতে দেওয়া হল, তখনো "কলমবাজগুলো" বকুনির হাত থেকে রেহাই পেল না;

যে মানুষটি বালিশে মাথা পর্যন্ত নড়াতে পারে না, কী আবেগে সে কথা বলছে শুনলে অবাক লাগে।

আরো উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা সে-দিন সন্ধ্যাবেলায় ঘটল। সব চুপচাপ, তখনো আলো জ্বালা হয়নি, ঘরের আনাচে-কানাচে ছায়া ঘন হচ্ছে, জানলার ধারে বসে স্তেপান ইভানভিচ চিন্তাকুলভাবে বাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্যাম্বিসের এপ্রন গায়ে নদীতে বরফ ভাঙ্গছে কয়েকটি মেয়ে। গাঢ় চৌকো একটা বরফগর্তের ধার থেকে লম্বা লম্বা চাঁই শাবল দিয়ে ভেঙে, শাবলের দুএক ঘায়ে সেগুলোকে সরু টুকরো করে নৌকোর আঁকড়া দিয়ে জল থেকে টেনে তুলছে কাঠের পাটাতন বেয়ে। সারি সারি বরফের চাঁই পড়ে আছে, নিচের দিকটা সবুজ আর স্বচ্ছ, উপর দিকটা হলদে। বরফ যেখানে কাটা হচ্ছে সেদিকে নদীর ধার হয়ে আস্তে আস্তে আসছে শ্লেজের দীর্ঘ সারি, একটার সঙ্গে অন্যটা আটকানো। বরফ পড়ে আছে যেখানে সেখানে একটার পর একটা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে একটি বুড়ো, কান-ঢাকা টুপি মাথায়, পরনে তুলো-ভরা প্যাণ্ট আর কোট, কটিবন্ধে কুঠার গোঁজা, আর মেয়েরা বরফের চাঁইগুলো শ্লেজে চাপাচ্ছে।

স্তেপান ইভানভিচের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল যৌথখামারের কোন দল কাজটা করছে, কিন্তু বন্দোবস্তটা মোটেই সুবিধের নয়। কাজে লাগানো হয়েছে বড্ড বেশী লোককে, ফলে এ-ওর বাধার সৃষ্টি করছে। পরিচালনার একটি পরিকল্পনা ওর ঝানু মাথায় এল। মনে মনে তিনজনের এক একটা দলে ওদের ভাগ করে ফেলল — জল থেকে বিনা ক্লেশে বরফ তোলার জন্য তিন জনের দলই যথেষ্ট। বিভিন্ন জায়গার জন্য নির্দিষ্ট করল দলগুলোকে, মোটমাট টাকা দেওয়া হবে উপস্থিত সমস্ত লোক হিসেবে নয়, চাঁই কটা তোলা হল হিসেব করে দলগুলোকে আলাদা করে। ওদের মধ্যে একজনকে, গোলগাল মুখ, গোলাপী গাল বেশ সমর্থ একটি মেয়েকে নিজেদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা শুরু করতে বলার কথা ভাবল স্তেপান ইভানভিচ... চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছে, একটা ঘোড়া এসে পড়ল বরফের গর্তের ধারে, পিছনের পাদুটো পিছলে জলে পড়ে গেল, সেটার হুঁশ নেই। শ্লেজের ভার ঘোড়াটাকে ভাসিয়ে রেখেছে বটে, কিন্তু খরস্রোতে ক্রমাগত নিচে টানছে। কুঠার হাতে বুড়োটা অসহায়ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, একবার শ্লেজের শিকে টান মারছে, একবার টানছে লাগামটা।

স্তেপান ইভানভিচের হাঁফ ধরে এল, তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে:

'ঘোড়াটা ডুবে যাচ্ছে যে!'

অনেক কষ্টে কনুই'এর ভর দিয়ে উঠল কমিসার. যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে গিয়েছে, জানলার ঝনকাঠে বুকের ভর দিয়ে বাইরে তাকাল, তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠল:

'বেটা গবেট! মাথায় ঢুকছে না কিছু? গলার দড়িগুলো... দড়িগুলো কেটে ফেল... ঘোড়াটা তাহলে নিজেই বেরিয়ে আসবে! না, ঘোড়াটাকে মেরে ফেলবে দেখছি!'

জানলার ঝনকাঠে কোনক্রমে উঠল স্তেপান ইভানভিচ। ঘোড়াটা ডুবে যাচ্ছে। ঘোলা জলে প্রায় পিঠ পর্যন্ত আমগ্ন, উঠে আসার চেষ্টা প্রাণপণে করছে, পারের বরফে লোহার নাল-দেওয়া সামনের পাদুটো মাঝেমাঝে জোরে বসাচ্ছে।

'দড়িগুলো কেটে ফেল!' চেঁচাল কমিসার, যেন নদীর ওখানে বুড়োটা ওর গলা শুনতে পারবে।

হাতদুটো মুখের সামনে মেগাফোনের মত করে ধরে স্তেপান ইভানভিচ কমিসারের নির্দেশটা চেঁচিয়ে জানাল:

'ওহে বুড়ো, শুনছ! লাগামের দড়িগুলো কেটে ফেল! বেল্টের কুঠারটা দিয়ে ওগুলো কেটে ফেলো, জলদি কেটে ফেল!'

বুড়োর কানে গেল কথাটা, মনে হল নির্দেশটা আকাশ-বাণীর মত। এক ঝটকায় বেল্ট থেকে কুঠারটা খুলে নিয়ে দুএক ঘায়ে দড়িগুলো কেটে ফেলল। লাগাম থেকে ছাড়া পেয়ে, ধড়মড় করে বরফের উপরে উঠল ঘোড়াটা, গর্তের পাড় এড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গা ঝাড়তে লাগল কুকুরের মত।

'কী হচ্ছে এখানে?' ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন জানতে চাইল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, ওভারঅলের বোতামগুলো খোলা, সাধারণত যে শাদা টুপিটা পরেন মাথায় নেই সেটা। দারুণ রেগে গিয়ে মেঝেতে পা ঠুকে তিনি জানালেন কারো কোন কথায় কান দেবেন না। সমস্ত ওয়ার্ডটা বিলকুল পাগল হয়ে গিয়েছে, সবাইকে এখান থেকে জাহান্নমে বিদায় করবেন তিনি, ঠিক কী হয়েছে সেটা জানবার চেষ্টা না করেই প্রত্যেককে ধমকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তারপরেই এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, চোখের জলের দাগ মুখে, অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে তাকে। এক্ষুণি তাকে ভীষণ বকেছেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। কমিসারের

দিকে তাকিয়ে দেখল ওর মুখ ছাই'এর মত শাদা আর প্রাণহীন হয়ে গিয়েছে, চোখ বুজে অনড়ভাবে পড়ে আছে সে, তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল তার দিকে।

সন্ধ্যার দিকে কমিসারের অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়াল। কর্পূরের ইনজেকশন দেওয়া হল, তারপরে অক্সিজেন, কিন্তু অনেকক্ষণ জ্ঞান ফিরে এল না। জ্ঞান ফিরে এলেই কিন্তু ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল কমিসার, অক্সিজেন ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

'কিচ্ছু ভেবো না, নার্স। নরক থেকেও আলবৎ ফিরে আসব আমি, শয়তানের বাচ্চারা যে জিনিসে মুখের ফুট-ফুট দাগ তাড়ায় তোমার জন্যে নিয়ে আসব সেটা।'

দুর্বলতার সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে যুঝে দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে বিরাট বলিষ্ঠ লোকটা, দেখলে দারুণ খারাপ লাগে।

৮

প্রতিদিন মেরেসিয়েভও দুর্বল হয়ে পড়ছে। একমাত্র "আবহাওয়া সার্জেণ্টকেই" সে এখন নিজের দুঃখের কথা জানায়, পরের চিঠিতে তাকে এমন কি এটা পর্যন্ত লিখল যে হাসপাতাল থেকে খুব সম্ভব আর বেঁচে ফিরবে না, আর না বাঁচাই ভালো: পাবিহীন বৈমানিক ডানাবিহীন পাখির মত, খুদকুড়ো ঠুকরে খেয়ে বেঁচে থাকে পাখি কিন্তু উড়তে পারে না কখনো। ডানাবিহীন পাখি হতে চায় না সে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, যত শীগগির মরে তত ভালো। এরকমভাবে লেখাটা নিষ্ঠুর, কেননা চিঠিপত্রের বিনিময়ে এক সময়ে মেয়েটি স্বীকার করেছিল যে "কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের" প্রতি অনুরাগ তার অনেক দিনের, মেরেসিয়েভ ভীষণ আঘাত না পেলে গোপন কথাটা সে প্রকাশ করত না কখনো।

'বিয়ে করতে চায় মেয়েটা। ছেলেদের দাম এখন বেশ চড়া। লোকটার পা আছে কি না আছে তাতে কী এসে যায় ওর, মোটা ভাতা পেলেই হল,' মন্তব্য করল কুকুশকিন, ওর বদমেজাজ বদলায়নি।

মাথার উপরে মৃত্যু গজরাচ্ছে, সেই মুহূর্তে নিজের মুখে রাখা মেয়েটির ফ্যাকাশে মুখটির কথা মনে পড়ল মেরেসিয়েভের, কুকুশকিন যা বলছে সেটা ঠিক নয়, সে জানে। ওর বিষণ্ণ নানা স্বীকারোক্তিতে মেয়েটির বুক যে

ব্যথায় মুচড়িয়ে ওঠে, সেটাও জানে। "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" নামটি পর্যন্ত জানা নেই, তবু তাকে নিজের নিরানন্দ ভাবনা চিন্তার কথা লিখে চলল মেরেসিয়েভ।

প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করার চাবিকাঠি বের করতে কমিসার পারে, কিন্তু এখন পর্যন্ত মেরেসিয়েভকে সাড়া দেওয়াতে পারেনি সে। ওর অস্ত্রোপচারের পরের দিন ওস্ত্রভস্কির "ইস্পাত" বইটা ওয়ার্ডে এল। চেঁচিয়ে পড়া হল বইটা। পড়াটা ওকে উদ্দেশ্য করে বুঝতে পারল আলেক্সেই, কিন্তু গল্পটি বিশেষ কোন সান্ত্বনা জোগাল না। পাভেল করচাগিন ওর ছেলেবেলার বীরেদের একজন। "কিন্তু করচাগিন ত বৈমানিক ছিল না, 'আকাশের জন্য আকুলিবিকুলির' মানে কি সে জানত?" ভাবল আলেক্সেই। "দেশের সমস্ত পুরুষ আর মেয়েদের অনেকে লড়াই করছে, এমন কি শিকনী-নাকে বাচ্চারা পর্যন্ত কুঁদযন্ত্র নাগালে আনবার জন্য বাক্সের উপরে চেপে গুলিগোলা তৈরী করছে, এমন একটা সময়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওস্ত্রভস্কি ত নিজের বইগুলো লেখেননি।"

সংক্ষেপে, এবারে বইটা কাজ দিল না। পাশ থেকে এগোতে হবে এবার, ঠিক করল কমিসার। প্রসঙ্গত, একটি লোকের বিষয়ে গল্প শুরু করল, লোকটির দুটো পা পক্ষাঘাতে অসাড়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বড়ো একটা চাকরী সে করত। পৃথিবীর সবকিছুতে স্তেপান ইভানভিচের আগ্রহ, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে। তারপর মনে পড়ে গেল যে তার এলাকায় একজন ডাক্তার ছিল, একটা মাত্র হাত থাকা সত্ত্বেও জেলার সেরা ডাক্তার সে, ঘোড়ায় চাপত, ভালোবাসত শিকারে যেতে আর বন্দুক চালাত এমন যে টিপ করে কাঠবিড়ালীর চোখে গুলি করতে পারত; এরপর কমিসার বিগত আকাদেমিশ্যান ভিলিয়ামসের কথা স্মরণ করল, ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল তাঁর সঙ্গে। শরীরের অর্ধেকটা তাঁর পক্ষাঘাতে অসাড়, একটা মাত্র হাত চালু ছিল, তবুও কৃষি ইনস্টিটিউটের পরিচালনা তিনি করতেন, ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজ চালাতেন।

শুনতে শুনতে মেরেসিয়েভ হাসল। ভাবা, কথা বলা, লেখা, আদেশ দেওয়া, লোকজনকে সারানো, এমন কি শিকারে যাওয়া বিনা পায়ে সম্ভব, কিন্তু ও বৈমানিক, জন্ম থেকে বৈমানিক; ফাটল-ধরা জমিতে, পাতার মধ্যে পড়ে আছে সারা ভলগা এলাকায় বিখ্যাত বিরাট, ডোরা-কাটা সব তরমুজ, ছেলেবেলায় একদিন তরমুজক্ষেত পাহারা দিচ্ছে সে, হঠাৎ কানে এল

আওয়াজ, তারপর দেখল ছোট র্পালী একটা "ড্রাগন-ফ্লাই", ডানাজোড়া স্র্যের আলোয় ঝলকিয়ে ধ্লিধ্সর স্তেপের উপর দিয়ে স্তালিনগ্রাদের দিকে কোথাও উড়ে চলেছে মন্থরভাবে।

সেই ম্হ্র্তে থেকে বৈমানিক হবার স্বপ্ন ওকে কখনো রেহাই দেয়নি। স্কুলে পড়ছে, পরে কুঁদযন্ত্র চালাচ্ছে কারখানায়, সব সময়ে মন ভরিয়ে রাখত সেই স্বপ্ন। রাত্রে সবাই ঘ্মিয়ে পড়েছে, ও আর বিখ্যাত বৈমানিক লিয়াপিদেভ্স্কি "চেলিউস্কিন" অভিযাত্রীদের হদিশ পেয়ে উদ্ধার করল তাদের, ভদোপিয়ানভের সঙ্গে ভারী বিমান নামাল উত্তর মের্র বরফে আর চ্কালভের সঙ্গে মের্ হয়ে মার্কিন য্ক্তরাষ্ট্রে যাবার অনাবিষ্কৃত আকাশ-পথের স্চনা করল।

কমিউনিস্ট য্ব সংঘ স্দ্র প্রাচ্যে পাঠায় আলেক্সেইকে, তাইগায় তর্ণদের সেই সহর — আম্রতীরের কমসমলস্ক — গঠন করতে সাহায্য করে সে, কিন্তু সেই স্দ্র স্থানেও বৈমানিক হবার স্বপ্নটা রয়ে গেল। নির্মাতাদের মধ্যে তার মত তর্ণ-তর্ণীদের সঙ্গে আলাপ হল, বৈমানিক হবার স্বপ্ন দেখে তারাও, আর বিশ্বাস করা কঠিন যে নিজেদের হাতে সত্যি সত্যি তারা সেই সহরে নিজেদের জন্য একটা বিমান-ক্লাব তৈরী করল, তখন পর্যন্ত সহরটা শ্ধ্ ত নকসার আকারে বেঁচে ছিল। সন্ধ্যায় বিরাট নির্মাণস্থানটি কুয়াশায় ভরে যেত। ব্যারাকে ফিরে যেত নির্মাতারা, জানলা বন্ধ করে দিত, ঝাঁক ঝাঁক মশা আর ডাঁশের তীক্ষ্ণ বিকট গ্নগ্নানি হাওয়ায়, ওগ্লো তাড়াবার জন্য ভিজে ডালের ধ্মায়িত আগ্ন জ্বালানো হত দরজার বাইরে। সারা দিনের খাটুনির পরে আর সবাই বিশ্রাম করছে, বিমান-ক্লাবের সদস্যরা আলেক্সেই'র পরিচালনায় যেত তাইগাতে। ওদের গায়ে কেরসিন মাখানো, তাতে নাকি মশা আর ডাঁশেরা পালায়, হাতে কুঠার, গাঁতি, করাত, শাবল আর ডিনামাইট। সেখানে গাছ কাটত ওরা, বিস্ফোরণে গাছের গুঁড়ি-শিকড় উড়িয়ে জমি সমান করা হত — তাইগাতে একটা বিমান-ঘাঁটি তৈরী হবে, জায়গা করা হচ্ছে তারই। আর নিজের হাতে আদিম অরণ্যের কয়েক কিলোমিটার জমি ছিনিয়ে নিয়ে জায়গাটি করে নিল ওরা।

সেই বিমান-ঘাঁটি থেকেই তালিমি বিমানে চেপে প্রথম আকাশে ওঠে আলেক্সেই, ছেলেবেলার স্বপ্ন সত্যি হয় অবশেষে।

পরে বাহিনীর একটি বিমান স্কুলে পড়ে নিজে শিক্ষাদাতা হল আলেক্সেই। য্দ্ধ যখন লাগল তখন স্কুলে ছিল সে। স্কুলের কর্তৃপক্ষরা

আপত্তি করলেও চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে বিমান বাহিনীতে সে যোগ দিল বিমান চালানোর সঙ্গে জড়িত ছিল ওর সমস্ত উৎকণ্ঠা আর আনন্দ, ভবিষ্যৎ চিন্তা, ওর সমস্ত সাফল্য।

তবুও উইলিয়াম্‌সের কথা ওরা ওকে শোনাচ্ছে!

'উইলিয়াম্‌স ত আর বৈমানিক ছিল না,' বলে আলেক্সেই দেয়ালের দিকে ফিরে শুল।

কিন্তু ওকে সাড়া দেওয়াবার চেষ্টা ছাড়ল না কমিসার। একদিন ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আলেক্সেই শুয়ে আছে, সাধারণত যেমন ও থাকত কমিসারের ভারি গলা কানে এল:

'লিওশা, এটা পড়ো ত। তোমাকে নিয়ে লেখা।'

ইতিমধ্যেই মেরেসিয়েভের কাছে পত্রিকাটি নিয়ে আসছিল স্তেপান ইভানভিচ। ছোট একটি প্রবন্ধ, পেন্সিলে দাগ দেওয়া। তাড়াতাড়ি পাতাটাতে চোখ বোলাল আলেক্সেই কিন্তু নিজের নাম দেখতে পেল না। প্রথম মহা যুদ্ধের সময়কার রুশ বৈমানিকদের নিয়ে প্রবন্ধটি লেখা। পত্রিকার পাতা থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে নবীন একটি অফিসারের অপরিচিত মুখ ছুঁচলো ছোট গোঁফ, মাথায় ফৌজী টুপি, তাতে শাদা একটা ব্যাজ, টুপিট একপাশে কান পর্যন্ত নেমেছে।

'পড়ো, পড়ো, তোমার জন্য ওটা লেখা হয়েছে,' তাড়া দিয়ে বলল কমিসার।

প্রবন্ধটি পড়ল মেরেসিয়েভ। রুশ বিমান বাহিনীর একজন লেফ্‌টেনাণ্টকে নিয়ে লেখা, নাম তার ভালেরিয়ান কারপভিচ, শত্রুপক্ষের লাইনের উপরে ওড়বার সময়ে জার্মানদের দমদম গুলি পায়ে লাগে। পা ভেঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও "ফার্মানটিকে" ওদের লাইন পেরিয়ে এনে নিজের ঘাঁটিতে নামায়। একটা পায়ের পাতা কেটে ফেলতে হল, কিন্তু নবীন অফিসারটি চাইল বাহিনীতে থেকে যেতে। নিজে নক্‌সা বানিয়ে তার অনুযায়ী কৃত্রিম একটা পা তৈরি করাল সে। অনেক দিন ধরে অসীম ধৈর্যে ব্যায়াম করে সেটা ব্যবহার করতে শিখল, ফলে যুদ্ধের শেষের দিকে আবার ফিরে গেল বাহিনীতে। বাহিনীর একটি বিমান স্কুলের ইনস্পেক্টর করা হয় তাকে; প্রবন্ধটিতে লেখা হয়েছে "মাঝেমাঝে নিজের বিমানে চেপে ওড়বার ঝুঁকিও সে নিত।" অফিসারদের সেণ্ট জর্জ ক্রুশ তাকে দেওয়া হয়, সফলভাবে বিমান বাহিনীতে কাজ চালিয়ে সে গেল, পরে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

একবার, দুবার, তিনবার প্রবন্ধটি পড়ল মেরেসিয়েভ। ক্ষীণদেহ নবীন লেফ্‌টেনাণ্টটি ক্লান্ত অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, মুখে মোটামুটি নির্ভীক হাসি, ক্লেশের স্বল্প আভাস তাতে। এদিকে সারা ওয়ার্ড একাগ্র দৃষ্টিতে মেরেসিয়েভকে লক্ষ্য করছে। চুলে তাড়াতাড়ি একবার হাত বোলাল ও; পত্রিকা থেকে চোখ নড়ছে না, বিছানার পাশের তাকে হাতড়ে একটা পেন্সিল নিয়ে প্রবন্ধটির চারিদিকে চৌকো করে বলিষ্ঠ কয়েকটা টান দিল।

'পড়েছ?' জানতে চাইল কমিসার, চোখে সেয়ানা দৃষ্টি। চুপ করে রইল আলেক্সেই, তখনো প্রবন্ধের লাইনগুলোতে চোখ বোলাচ্ছে। 'কী মনে হয় তোমার?'

'ওর কিন্তু একটা মাত্র পায়ের পাতা গিয়েছিল।'

'কিন্তু তুমি ত সোভিয়েত মানুষ।'

'ও "ফার্মান" চালাত। ওটা আবার বিমান না কি? বই'এর তাক বলা চলে। ওটা চালানো আর কি। কোন কৌশল বা দ্রুততা দরকার হত না।'

'কিন্তু সোভিয়েত মানুষ তুমি!' জোর দিয়ে আবার কমিসার বলল।

'সোভিয়েত মানুষ,' যন্ত্রের মত পুনরুক্তি করল আলেক্সেই, তখনো প্রবন্ধে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তারপর অন্তরের কী একটা আলোয় মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, একে একে সহচর রোগীদের প্রত্যেকের দিকে আনন্দ আর বিস্ময়ে ভরা চোখে ও তাকাল।

সে রাত্রে পত্রিকাটি বালিশের নিচে রেখে শুল আলেক্সেই: মনে পড়ল শৈশবে পুরোনো নরম কাপড় দিয়ে ওর জন্য একটা কুৎসিৎ ছোট ভালুক পুতুল তৈরী করে দিয়েছিলেন মা, রাত্রে ভাইদের সঙ্গে শুতে গিয়ে ও ঠিক এমনি করেই লুকিয়ে রাখত সেটাকে। কথাটা মনে পড়াতে বেশ জোরে হেসে উঠল আলেক্সেই।

সে রাত্রে এক ফোঁটা ঘুম এল না চোখে। গভীর ঘুমে মগ্ন ওয়ার্ডটি। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে গভজ্‌দেভ, গদির স্প্রিংগুলো ঝনঝন করে উঠছে। শিসের মত আওয়াজ করে স্তেপান ইভানভিচের নাক ডাকছে, যেন ওর নাড়িভুঁড়ি ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এক একবার পাশ ফিরছে কমিসার, দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কাতরোক্তি করছে। কিন্তু আলেক্সেই কিছুই শুনছে না। কিছুক্ষণ পর পর বালিশের নিচে থেকে পত্রিকাটি বের করে, প্রদীপের আলোয় লেফ্‌টেনাণ্টটির স্মিত মুখ দেখছে ও। "কঠিন কাজ ছিল তোমার,

কিন্তু করেছিলে সেটা," আলেক্সেই ভাবল। "আমার কাজ দশগুণ দুরূহ, কিন্তু আমিও পারব, দেখো তুমি!"

মধ্যরাত্রে কমিসারের নড়নচড়ন হঠাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কনুই'এ ভর দিয়ে উঠে আলেক্সেই দেখল ও বিবর্ণ ও প্রশান্তভাবে শুয়ে আছে, মনে হচ্ছে নিশ্বাস পড়ছে না। পাগলের মত ঘণ্টা বাজাল আলেক্সেই। খালি মাথায়, ঘুমন্ত চোখে, চুলের গোছা পিঠে ঝুলে পড়েছে, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা দৌড়িয়ে এল ওয়ার্ডে। কয়েক মুহূর্ত পরে হাউস সার্জনকে ডাকা হল। কমিসারের নাড়ী দেখে সে কর্পূরের ইনজেকশন দিল, অক্সিজেন ব্যাগের নল লাগাল মুখে। সার্জন আর নার্স ঘণ্টাখানেক ধরে কমিসারকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল, মনে হল কোন ফল পাচ্ছে না। অবশেষে চোখ খুলল কমিসার, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার দিকে চেয়ে ক্ষীণ হেসে, হাসিটা প্রায় দেখাই যায় না, আস্তে আস্তে বলল:

'মিছিমিছি তোমাদের এত কষ্ট দিলাম, সেজন্য দুঃখিত। নরক পর্যন্ত যেতে পারিনি, তাই তোমার মুখের দাগের ওষুধটাও আর আনা গেল না। আরো কিছুদিন তোমাকে দাগগুলো বইতে হবে দেখছি। কী করব, নিরুপায়।'

ঠাট্টাটি শুনে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওকের মত শক্ত মানুষটি, হয়ত তার মত প্রবল ঝড়ও সইতে পারবে। হাউস সার্জন বিদায় নিল, বারান্দায় তার জুতোর কিচকিচ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল; ওয়ার্ডের পরিচারিকারাও চলে গেল, শুধু থেকে গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা। কমিসারের খাটের ধারে একপাশ হয়ে বসল সে। রোগীরা ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, শুধু মেরেসিয়েভ চোখ বুজে পড়ে আছে; বিমানের পা-দানে, ফেট্টি দিয়েও হোক, নকল পাদুটো লাগানো যেতে পারবে, সে দুটোর কথা ভাবছে ও। মনে পড়ল বিমান-ক্লাবের ইনস্পেক্টরের কাছে শোনা গৃহযুদ্ধের সময়কার একটি বৈমানিকের গল্প, পাদুটো ছোট বলে বিমানের পা-দানিতে ছোট ছোট কাঠের খণ্ড লাগিয়ে নিয়েছিল সে, যাতে পায়ের নাগাল পায়।

"তোমার মতই খাসা কাজ চালাব, বৎস," কারপভিচকে ভরসা দিল আলেক্সেই। আবার উড়তে পারার কথাটায় আনন্দে বিভোর হয়ে যাচ্ছে মন, ঘুম আসছে না চোখে। চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে আছে। দেখলে মনে হয় গভীর ঘুমে মগ্ন. ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে একটি বাক্যালাপ কানে এল, পরে দুরূহ মুহূর্তগুলিতে একাধিকবার সেটির কথা তার মনে পড়েছে।

'কিন্তু আপনি এরকম ব্যবহার করেন কেন? যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছেন, সে সময়ে হাসি ঠাট্টা করাটা ভয়াবহ ব্যাপার মনে হয় আমার। যে কষ্টটা পাচ্ছেন সেটার কথা ভাবলে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। আলাদা ওয়ার্ডে যেতে আপনার কী আপত্তি?'

বলার ধরনে মনে হয় সুশ্রী সহৃদয় কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আবেগহীন ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা কথা বলছে না, বলছে অন্য কোন মেয়ে, আবেগে প্রতিবাদ করে, গলায় বিষাদের ছাপ, হয়ত অন্য কিছুরও। চোখ খুলল মেরেসিয়েভ। রুমাল দিয়ে ঢাকা বালবের আলোয় দেখল কমিসারের বালিশে-রাখা বিবর্ণ স্ফীত মুখ, স্নিগ্ধ দীপ্ত চোখ আর নার্সটির নরম মেয়েলী মুখের রেখা। ওর মাথার পিছনে আলো পড়াতে কোমল সোনালী চুল জ্বলছে; ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না মেরেসিয়েভ, তাকিয়ে থাকাটা ঠিক নয় সেটা জানা সত্ত্বেও।

'আহা, কেঁদো না, লক্ষ্মীটি... কিছু ব্রোমাইড দেব নাকি তোমাকে?' কমিসার বলল, যেন কোন বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কথা চলেছে।

'আবার ঠাট্টা করছেন! কী অদ্ভুত লোক আপনি! যে সময় কাঁদা উচিত সে সময়ে হাসাটা ভয়ঙ্কর, যন্ত্রণায় নিজের শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে, সে সময়ে অন্যদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ভয়ঙ্কর সেটা। আপনাকে এত ভালো লাগে! এরকম ভাবে ব্যবহার আর কক্ষণো করবেন না বলছি...'

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল নার্স। তার ক্ষীণ, শাদা কাপড়-ঢাকা কাঁধ কান্নায় থরথর করে কাঁপছে, বিষণ্ণ মমতায় সেদিকে তাকিয়ে রইল কমিসার।

'অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে,' কমিসার বলল। 'নিজের ব্যাপারে বরাবরই আমি লজ্জাকর ভাবে পিছিয়ে থাকি। অন্য সব জিনিস নিয়ে বরাবর বড্ড বেশী মাথা ঘামিয়েছি। আর এখন, মনে হয়, একেবারে দেরী হয়ে গেছে আমার।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কমিসার। মাথা তুলে নার্স তাকাল তার দিকে, চোখে জল আর ব্যাকুল প্রত্যাশা। কমিসার হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আবার, স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয় ঠাট্টার ভঙ্গীতে বলে চলল:

'গল্পটা শুনুন, লক্ষ্মী মেয়ে! গল্পটা এক্ষুণি মনে পড়ল। ওটা ঘটেছিল অনেক দিন আগে, গৃহযুদ্ধের সময়ে, তুর্কিস্তানে। অশ্বারোহী বাহিনীর একটি স্কোয়াড্রন বাসমাচের পিছু এমন তাড়া করেছিল যে হঠাৎ মরুভূমিতে



এসে পড়ল, এমন সে মরুভূমি যে ঘোড়াগুলো একে একে মরতে শুরু করল। রুশ ঘোড়া সেগুলো, মরুভূমির বালিতে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং অশ্বারোহী বাহিনী থেকে আমরা পরিণত হলাম পদাতিক বাহিনীতে। স্কোয়াড্রনের নেতা ঠিক করল যে মালপত্তর সমস্ত ফেলে, শুধু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সবচেয়ে কাছের বড়ো সহরের দিকে যাব আমরা। সহরটা একশ ষাট কিলোমিটার দূরে, বন্ধ্যা বালুর উপর দিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভাবতে পারেন, লক্ষ্মীটি! একদিন, দুদিন, তিনদিন আমাদের যাত্রা চলল। রোদে গা পুড়ে যাচ্ছে। জল নেই। মুখ এত শুকিয়ে গিয়েছে যে চামড়া ফাটছে। হাওয়ায় শুধু বালি, পায়ের নিচে কচকচে বালি, দাঁতে লাগছে বালি, খোঁচা দিচ্ছে চোখে, মুখের মধ্যে ঢুকছে। ভয়াবহ অবস্থা, সত্যি বলছি! হোঁচট খেয়ে কেউ পড়ে গেলে বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, ওঠবার ক্ষমতা নেই। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি কমিসার, তার নাম ইয়াকভ পাভলভিচ ভলদিন, থসথসে বুদ্ধিজীবীর মত চেহারা, লোকটা ইতিহাসবিদ... কিন্তু পাকা বলশেভিক ছিল সে। দেখে মনে হত প্রথমেই ও পড়ে যাবে, কিন্তু চলতেই লাগল, অন্যদের উৎসাহ দিত। 'বেশী দূর আর যেতে হবে না, শীগগিরই ওখানে পৌঁছব,' বারবার বলত। আর কেউ শুয়ে পড়লে তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বলত, 'উঠে পড়ো, নইলে গুলি করব...'

'চতুর্থ দিনে, সহর থেকে তখন আমরা প্রায় পোনেরো কিলোমিটার মাত্র দূরে, আমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। টলতে টলতে মাতালের মত এগোচ্ছি, আহত জন্তুর মত আঁকাবাঁকা পায়ের দাগ পিছনে রেখে। হঠাৎ কমিসার একটা গান ধরল। ক্ষীণ কুৎসিত গলা, গানটাও এমন কিছু নয়, পুরোনো বাহিনীতে মার্চ করে যাবার সময়ে ওটা গাইত লোকে, কিন্তু আমরা সবাই সুর মিলিয়ে গাইতে শুরু করলাম। হুকুম করলাম আমি, 'সার বেঁধে চল,' আর সেভাবে চলল ওরা। তুমি বিশ্বাস করবে না হয়ত, কিন্তু চলাটা আগের চেয়ে সহজ হল।

'ও গানটার পরে আরো একটা, তারপর আর একটা গান গাইলাম আমরা। ব্যাপারটা ভেবে দেখো! শুকনো চড়চড়ে মুখে আমরা গাইলাম, রোদের সে কী অসম্ভব ঝাঁজ। যতগুলো গান জানা ছিল সব কটা গাইলাম, শেষে সহরে পৌঁছলাম আমরা, মরুভূমিতে একটিও লোক পড়ে রইল না... কী মনে নয়?'

'কমিসারের কী হল?'

'কী হল? বেঁচে আছে এখনো, বেশ ভালোই আছে। প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ও। প্রাগৈতিহাসিক বসতি সব খুঁড়ে বের করে। সত্যি, মরুভূমিতে যাত্রার ফলে গলাটি গিয়েছে ওর। ভাঙ্গা গলায় কথা বলে। কিন্তু গলার কী দরকার ওর? আচ্ছা, আর গল্প নয়। এবার আপনি যান, অশ্বারোহী বাহিনীর লোক আমি, কথা দিচ্ছি আজ রাত্রে আর মারা যাব না।'

শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল আলেক্সেই, আর স্বপ্নে দেখল একটি অদ্ভুত মরুভূমি, রক্তাক্ত ফেটে-যাওয়া মুখে গানের খেই, আর কমিসার ভলোদিন, স্বপ্নে কোন কারণে তাকে কমিসার ভরোবিওভের মত দেখাচ্ছে।

আলেক্সেই'র ঘুম ভাঙ্গল বেলায়। ওয়ার্ডের মাঝখানে রোদ এসে পড়েছে, তার মানে মধ্যাহ্ন, অন্তরে আনন্দের একটি অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভাঙ্গল ওর। স্বপ্ন দেখেছে? কী স্বপ্ন?.. চোখে পড়ল পত্রিকাটি, ঘুমের সময়ে শক্ত করে হাতে ধরে রেখেছিল সেটাকে। দোমড়ানো পাতায় লেফ্‌টেনান্ট কারপভিচের মুখে তখনো সেই ঈষৎ ক্লিষ্ট, নির্ভীক হাসি। পত্রিকাটি সযত্নে মসৃণ করে লেফ্‌টেনান্টকে চোখ ঠারল মেরেসিয়েভ।

কমিসারের হাতমুখ ধোওয়া আর চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছে, হাসিমুখে মেরেসিয়েভকে লক্ষ্য করছে সে।

'ওকে চোখ ঠারছ কেন?' খুসিতে জিজ্ঞেস করল কমিসার।

'আবার বিমান চালাব আমি,' জবাবে বলল আলেক্সেই।

'কেমন করে? ওর ত একটা পা ছিল, তোমার ত দুটোই গিয়েছে।'

'আমি যে সোভিয়েত, রুশ!' সাড়া দিল আলেক্সেই।

কথা বলার ঢঙে একটা দৃঢ় আস্থার ভাব ছিল যে লেফ্‌টেনান্ট কারপভিচকেও ছাড়িয়ে যাবে সে, আবার উড়বে।

সেদিন প্রাতরাশের সময়ে পরিচারিকার আনা সবকিছু খাবার খেল আলেক্সেই, খালি প্লেটগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আরো খেতে চাইল। ছটফটে উত্তেজিত ভাব ওর, গান গাইছে, চেষ্টা করছে শিস দেবার, নিজের সঙ্গে জোরে বকে চলছে। অধ্যাপক রোঁদে এলেন, ওর প্রতি তাঁর বিশেষ নেকনজরের সুযোগ নিয়ে আলেক্সেই নানা প্রশ্নে তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তুলল, তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে গেলে কী কী অবশ্য কর্তব্য, প্রশ্নগুলো সে বিষয়ে। অধ্যাপক বললেন আরো বেশী খাওয়া আর ঘুমোনো দরকার তার। তারপরে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে দ্বিতীয় পদের খাবার দুবার চেয়ে নিল আলেক্সেই,

জোর করে চারটে কাটলেট খেল। খাবার পর প্রায় দেড় ঘণ্টা চোখ বুজে রইল শুয়ে, কিন্তু চট করে ঘুম এল না।

সুখে লোকের আত্মানুরাগ বাড়ে। অধ্যাপককে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার সময়ে সারা ওয়ার্ডের দৃষ্টি কীসে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল সেটা লক্ষ্য করেনি আলেক্সেই। মেঝের পার্কেটের একটা টুকরো উধাও, সূর্যের আলো ওয়ার্ডের সারা মেঝে আস্তে আস্তে অতিক্রম করে ঠিক সে জায়গাটাতে এসে পড়েছে, অধ্যাপক ঘরে এলেন, যথারীতি সঠিক সময়ে। আগেকার মতই অবহিত তিনি, কিন্তু সবাই লক্ষ্য করল ওঁর মুখে একটা অভূতপূর্ব অন্যমনস্কতার ছাপ। অন্য দিনের মত বকাবকি করলেন না তিনি, ফোলা চোখের কোণে শিরগুলো দবদব করছে ক্রমাগত। সন্ধ্যাবেলায় রোঁদে যখন এলেন তখন মনে হল শুকনো দেখাল তাঁকে, মনে হল বেশ বুড়িয়ে গিয়েছেন। দরজার হাতলে ঝাড়ন ফেলে রাখার জন্য পরিচারিকাকে নিচু গলায় ধমকালেন, দেখলেন কমিসারের জ্বরের চার্ট, তার জন্য কী একটা ওষুধের নির্দেশ করে নিঃশব্দে গেলেন বেরিয়ে, পিছু পিছু অনুচরবর্গ, তারাও চুপচাপ, বিচলিত দেখাচ্ছে তাদের। দোরগোড়ায় হোঁচট খেয়ে অধ্যাপক আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিলেন, একজন ওঁর কনুই ধরে সামলাল। লম্বা-চওড়া, ভগ্নকণ্ঠ, দুর্দান্ত, নিয়মনিষ্ঠ এই মানুষটিকে চুপচাপ আর অমায়িক হওয়াটা মানাত না। বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি, ৪২ নং ওয়ার্ডের রোগীরা বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। চওড়া, দিলদরাজ মানুষটিকে সবাই তারা ভালোবাসত, ওঁর পরিবর্তনে সবাই উদ্বিগ্ন।

পরিবর্তনের কারণটি কী পরদিন সকালে জানা গেল। পশ্চিম রণাঙ্গনে মারা গিয়েছে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের একমাত্র সন্তান, তারো নাম ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, সেও ছিল ডাক্তার, উদীয়মান বিজ্ঞানী, বাপের গর্ব আর আনন্দের উৎস। নির্দিষ্ট সময়ে সারা হাসপাতাল রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে, অধ্যাপক তাঁর নিয়মিত রোঁদে আসবেন কিনা। ৪২ নং ওয়ার্ডে সবাই একাগ্রভাবে তাকিয়ে আছে মেঝের উপরে আলোর টুকরোটার মন্থর, প্রায় অগোচর গতির দিকে। অবশেষে সেটা এসে পড়ল সেই জায়গাটিতে যেখানে পার্কেটের টুকরোটা নেই, আর সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, ভাবটা এই যে অধ্যাপক তাহলে আর আসছেন না। কিন্তু সেই মুহূর্তে শোনা গেল করিডরে পরিচিত ভারী পায়ের শব্দ, সঙ্গে আসছে বহুসংখ্যক অনুচরবর্গ। অধ্যাপককে এমন কি আগের চেয়ে একটু ভালো দেখাচ্ছে। অবশ্য চোখগুলো লাল,

চোখের পাতা আর নাক ফোলা ফোলা, খুব সর্দি হলে যেমন হয়; টেবিল থেকে কমিসারের জ্বরের চার্ট তুলে নেবার সময়ে ওঁর মোটা খসখসে হাতটা বেশ কেঁপে উঠল, কিন্তু আগেকার মতই কর্মতৎপর আর উদ্যমী তিনি। গোলমেলে ভাব আর ধমকানির ঝোঁকটা, যা হোক, আর নেই।

সর্বসম্মতিক্রমে যেন সেদিন আহতরা এবং অন্যান্য রোগীরা অধ্যাপককে খুসি করার জন্য পাল্লা দিয়ে যথাসাধ্য করল। প্রত্যেকে তাঁকে বলল যে ভালো আছে, এমন কি যাদের অবস্থা বেশ খারাপ তাদেরো অভিযোগ নেই কোন, বরঞ্চ তারা জানাল যে আরোগ্যের পথে তারা। হাসপাতালের ব্যবস্থার গুণগান সমস্বরে করল সবাই, নানা চিকিৎসা প্রথা যে অলৌকিক ফলাফল দিচ্ছে সেটা ত স্পষ্ট। হাসপাতালটি সেদিন বিপুল ও সমান শোকে ব্যথিত ঘনিষ্ঠ একটি পরিবার।

আজকের সকালের এই অসামান্য সাফল্যের কারণ কী, ওয়ার্ড ঘুরতে ঘুরতে অবাক হয়ে ভাবছিলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

সত্যি কি অবাক হয়েছিলেন? নিঃশব্দ, অকপট ষড়যন্ত্রটি হয়ত তাঁর কাছে ধরা পড়ে, ধরা পড়াতে হয়ত নিজের গভীর অনারোগ্য ব্যথা বহন করা সহজতর হয় তাঁর।

৯

পুবমুখো জানলাটার বাইরে পপলারগাছের শাখাটায় ইতিমধ্যেই কচি কচি পাতলা-হলুদ চটচটে পাতা গজিয়েছে, পাতার নিচে লাল, পেঁজা তুলোর মত নরম ফুলের ছড়ি, দেখতে মোটা শুঁয়াপোকার মত। সকালে সূর্যের আলোয় পাতাগুলো চিক চিক করে, মনে হয় অয়েল-পেপারে তৈরী। নোনতা তাজা ভাবের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বায়ুচলাচলের খোলা ছোট জানলাটা ভেদ করে আসে, ওয়ার্ড থেকে হাসপাতালের সব গন্ধ দেয় ছাপিয়ে।

স্তেপান ইভানভিচের বদান্যতায় হৃষ্টপুষ্ট চড়ুইগুলোর বেয়াড়াপনা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে আজকাল। "সাব-মেসিনগানারের" নতুন লেজ গজিয়েছে একটা, তার হৈহৈ আর কোঁদলপ্রিয়তা আরো বেড়ে গিয়েছে। সকালে জানলার বাইরের ঝনকাঠে ওদের সভা বসে, এত কিচির মিচির চলে যে ওয়ার্ড পরিষ্কার করতে এসে পরিচারিকা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, গজগজ করতে করতে জানলায় উঠে ঝাড়ন দিয়ে তাড়ায় ওদের।

মস্কো নদীতে বরফ নেই আর। উন্দামতায় কাটল কয়েকদিন, তারপর শান্ত হয়ে এল নদীটি, ফিরে এল পাড়ে, চওড়া বুক বাধ্যভাবে মেলে দিল জাহাজ, বজরা আর স্টীমারের চলাচলের জন্য; মোটরযানের সংখ্যা দুর্দিনে মহানগরীতে অনেক কমে গিয়েছিল, নদীর যানবাহন সে অভাব মেটাতে সাহায্য করত। কুকুশকিনের ভয়াল ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, ৪২ নং ওয়ার্ডের কেউই বসন্তের বন্যায় "ভেসে গেল" না। কমিসার ছাড়া প্রত্যেকেরই অবস্থা ভালোর দিকে, কখন হাসপাতাল ছাড়বে, বেশীর ভাগ সময়েই কথাবার্তা চলত তা নিয়ে।

ওয়ার্ড ছেড়ে প্রথমে গেল স্তেপান ইভানভিচ। যাবার আগের দিন উৎকণ্ঠায়, আনন্দে আর উত্তেজনায় হাসপাতালে ঘুরে বেড়াল সে। একদণ্ড স্থির হয়ে আর থাকতে পারছে না। করিডরে কয়েকজন রোগীর সঙ্গে কথা বলে ওয়ার্ডে ফিরে আসতে আসতে জানলার ধারে বসে রুটি দিয়ে কিছু একটা বানাতে শুরু করে, তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে বাইরে চলে গেল। সন্ধ্যেবেলায় শুধু, প্রদোষ হয়ে এসেছে, জানলার ঝনকাঠে উঠে বসে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল স্তেপান ইভানভিচ। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। রোগীদের নানা চিকিৎসার সময় এটা, ওয়ার্ডে মাত্র দুজন অন্য রোগী তখন— কমিসার, স্তেপান ইভানভিচকে নিঃশব্দে দেখছে সে, আর মেরেসিয়েভ, প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করছে সে।

সব চুপচাপ। হঠাৎ কমিসার স্তেপান ইভানভিচের দিকে মুখ ঘোরাল, সূর্যাস্তের শেষ আলোয় ওর ছায়া স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে - অনুচ্চকণ্ঠে বলল:

'গাঁয়ে গোধূলি এখন, সব শান্ত, কী শান্ত আহা! গলন্ত মাটি, স্যাঁতসেঁতে সার আর ধোঁয়ার গন্ধ। গোয়ালে গরুটা খড়ের গাদায় পা ঠুকছে, ছটফট করছে, বাছুর হবার সময় এসে পড়েছে। বসন্ত... ক্ষেতে মেয়েরা সার দিতে পেরেছে কিনা কে জানে! আর বীজ আর ঘোড়ার সাজ? তোমার কি মনে হয় সব ঠিক চলছে?'

মেরেসিয়েভের মনে হল কমিসারের স্মিত মুখের দিকে বিস্ময়ে নয়, সভয়ে তাকিয়ে স্তেপান ইভানভিচ জবাব দিল:

'অন্যেরা কী ভাবছে সেটা যাদুকরের মত আপনি ধরে ফেলেন দেখছি, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার!. হ্যাঁ, মেয়েদের ব্যবহারিক বুদ্ধি বেশ প্রখর, সেটা সত্যি বটে, কিন্তু আমাদের ছাড়া ওরা কী করে চালাচ্ছে সেটা শুধু শয়তান জানে... সত্যি এটা।'

আবার সবাই চুপচাপ। নদীতে একটি জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল, তার ধ্বনি প্রতিধ্বনি জলের উপরে গড়িয়ে গ্রানিটের পাড়ে পাড়ে মুখর হয়ে উঠল।

'যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি থেমে যাবে তোমার মনে হয়?' কী কারণে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল স্তেপান ইভানভিচ। 'শরৎকালের আগেই কী থেমে যাবে?'

জবাবে কমিসার বলল:

'তাতে তোমার কী? তোমার বয়সের লোকদের বাহিনীতে ডাকা হয়নি। তুমি ত স্বেচ্ছাসৈনিক। যুদ্ধে তোমার যা কববার ছিল তা করেছ। দরখাস্ত করলেই তোমাকে ওরা ছেড়ে দেবে, তখন মেয়েদের পরিচালনার ভার নিতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনেও অভিজ্ঞ লোকেদের দরকার, নয় কি? কী বল তুমি, দাড়িওয়ালা?'

কথাগুলো বলবার সময়ে এমন সহৃদয়ভাবে তাকাল কমিসার যে বুড়ো সৈনিকটি জানলার ঝনকাঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল অস্থির উত্তেজনায়।

'বাহিনী ছেড়ে দিতে বলছ, বটে!' বলে উঠল সে। 'আমিও ভাবছিলাম তাই। মনে মনে বলছিলাম: কমিশনে দরখাস্ত করলে কী হয়? তিনটে যুদ্ধে ত এপর্যন্ত যোগ দিয়েছি – সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, আর এই যুদ্ধের কিছুটা। হয়ত সেটাই যথেষ্ট, কী বলো? আমার কী করা উচিত বলো ত, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার?'

'দরখাস্তে বলো যে যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে মেয়েদের সঙ্গে কাজ করার জন্যে বাহিনী থেকে ছাড়া পেতে তুমি চাও। জার্মানদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে অন্য লোক ত আছে!' নিজেকে সামলাতে না পেরে বিছানা থেকে চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ।

অপরাধীর মত তার দিকে তাকাল স্তেপান ইভানভিচ। রাগতভাবে ভুরু কুঁচকিয়ে কমিসার বলল:

'তোমাকে কী বাতলাব জানি না, স্তেপান ইভানভিচ। তোমার অন্তর কী চায় ভেবে দেখো। রুশ অন্তর ত তোমার। উচিত পরামর্শ দেবে সেটা।'

পরের দিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল স্তেপান ইভানভিচ। সামরিক পোশাকে সবাইকে বিদায় জানাতে ওয়ার্ডে এল সে। বেঁটেখাটো মানুষ, ধুয়ে ধুয়ে পুরোনো টিউনিকের রং চটে শাদা হয়ে গিয়েছে, কোমরে আঁটো করে বেল্ট জড়ানো, এত টেনে সেটা পরেছে যে সামনে টিউনিকে একটুও ভাঁজ পড়েনি, বয়সের তুলনায় অন্তত পোনেরো বছর কম দেখাচ্ছে ওকে। বুকে

ঝকঝকে পালিশ-করা "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" স্বর্ণপদক, "অর্ডার অব লেনিন" আর "সাহসের জন্য" প্রাপ্ত পদক। হাসপাতালের ওভারঅল বর্ষাতির মত কাঁধে ঝোলানো। ওর আপাদমস্তক, বাহিনীর পুরোনো উঁচু বুটের কোণ থেকে শুরু করে বিশেষ কায়দায় ছুঁচলো-করা গোঁফজোড়ার কোণগুলো পর্যন্ত মনে করিয়ে দেয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার ক্রিসমাস কার্ডে ছাপানো চটপটে রুশ সৈনিকদের কথা।

ওয়ার্ডের সহচরদের প্রত্যেকের কাছে এগিয়ে এসে বিদায় নিল সে, সামরিক পদ হিসেবে প্রত্যেককে সম্বোধন করে এত সুষ্ঠুভাবে পা ঠুকে বিদায় নিল যে ওকে দেখলে খুসিতে মন ভরে যায়।

'বিদায় নিতে দিন, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার।' কোণের বিছানাটার কাছে এসে বিশেষ খুসির সুরে বলল স্তেপান ইভানভিচ।

'বিদায়, স্তিওপা, শুভ যাত্রা কামনা করি,' উত্তর দিল কমিসার, কষ্ট হলেও পাশ ফিরে সৈনিকটির দিকে তাকাল সে।

হাঁটু গেড়ে বসে কমিসারের বড়ো বড়ো হাত নিজের হাতে নিল সে; আর প্রাচীন রুশ কায়দায় ওরা পরস্পরকে চুম্বন করল তিনবার।

'সেরে ওঠ, সেমিওন ভাসিলিয়েভিচ। ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ আর দীর্ঘজীবী করুন। সোনার মত খাঁটি তোমার অন্তঃকরণ। আমাদের সবায়ের কাছে বাপের চেয়েও বেশী তুমি ছিলে। আমরণ তোমাকে মনে থাকবে...' গভীর আবেগে অনুচ্চকণ্ঠে বলল সৈনিকটি।

'এবারে আপনি যান, স্তেপান ইভানভিচ! উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ভালো নয়,' সৈনিকের আস্তিনে টান দিয়ে বলল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা।

'আর আপনাকে আদরযত্নের জন্যে ধন্যবাদ জানাই, নার্স,' গভীর আন্তরিকতায় বলল স্তেপান ইভানভিচ, বিশেষ শ্রদ্ধায় অভিবাদন জানাল তাকে। 'সোভিয়েত দেবী আপনি, সত্যি বলছি...'

আর কী বলবে ভেবে না পেয়ে এবারে বিব্রতভাবে দরজার দিকে হটে গেল স্তেপান ইভানভিচ।

'কী ঠিকানায় তোমাকে চিঠি লিখব, সাইবেরিয়ায়?' হেসে জিজ্ঞেস করল কমিসার।

'কী বলব, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার? কর্মরত সৈনিককে কোন ঠিকানায় লিখতে হয়ে সেটা ত জানেন,' বিব্রতভাবে জবাব দিল স্তেপান

ইভানভিচ, আবার সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে দরজার ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়ার্ডে স্তব্ধতা নেমে এল, মনে হল সেখানে কেউ নেই। কিছুক্ষণ পরে আবার নিজেদের রেজিমেণ্ট, বন্ধুবান্ধব আর যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব বড়ো অভিযানের সম্মুখীন ওরা হবে, সে বিষয়ে কথাবার্তা চলল। সবাই ত এখন সেরে উঠছে, সুতরাং ওগুলো আর স্বপ্ন নয়, কাজের আলোচনা। ইতিমধ্যেই কুকুশকিন করিডরে হেঁটে বেড়াতে পারে, সেখানে গিয়ে নার্সদের খুঁত ধরে, অন্য রোগীদের জ্বালায়, তাদের মধ্যে অনেকেরই সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। ট্যাঙ্ক-অফিসারও আর শয্যাশায়ী নয়, করিডরের আয়নাটার সামনে প্রায়ই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মুখ, গলা আর ঘাড় খুঁটিয়ে দেখে, ব্যাণ্ডেজ আর নেই, ঘাগুলো শুকিয়ে আসছে। আনিউতার সঙ্গে পত্রবিনিময় যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ব্যাপারের বিষয়ে জ্ঞান যত বাড়ছে ততই বেড়ে যাচ্ছে নিজের ঝলসে-যাওয়া বিকৃত মুখটাকে খুঁটিয়ে দেখাটা। গোধূলির সময়ে বা স্বল্পালোকিত ওয়ার্ডে নেহাৎ মন্দ দেখায় না মুখটা, বরঞ্চ ভালোই লাগে: পরিষ্কার গড়ন, প্রশস্ত কপাল, নাকটা ছোট আর একটু বাঁকা, ছোট, কালো গোঁফ, হাসপাতালে থাকার সময়ে রেখেছে সেটা, আর তাজা তেজী যোয়ান ঠোঁট। কিন্তু উজ্জ্বল আলোয় চোখে পড়ে ওর মুখ ক্ষতচিহ্নে কীর্ণ, সেগুলোর চারপাশে চামড়া কুঁচকিয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। উত্তেজিত হলে, অথবা স্নান-চিকিৎসার পরে মুখে রক্তাভা নিয়ে ফিরে আসার সময় ক্ষতচিহ্নগুলোয় এত বীভৎস দেখায় ওকে যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে কান্না পেয়ে আসে ওর। ওকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াসে মেরেসিয়েভ বলল:

'মুখ গোমড়া করে আছ কেন? সিনেমায় অভিনয় করার মৎলব ত নেই তোমার, আছে কি? তোমার সেই মেয়েটি সাঁচ্চা হলে এতে তার কিছু এসে যাবে না। আর যদি এসে যায় তাহলে বুঝতে হবে ও গবেট। তখন ওকে বোলো গোল্লায় যেতে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে তুমি। খাঁটি আর কাউকে পাবে।'

'সব মেয়েই সমান,' বলে উঠল কুকুশকিন।

'আর আপনার মা?' জিজ্ঞেস করল কমিসার, ওয়ার্ডে একমাত্র কুকুশকিনকেই "আপনি" বলে সম্বোধন করে সে।

শান্ত প্রশ্নটিতে লেফ্‌টেনাণ্টের যে প্রতিক্রিয়া হল সেটা বর্ণনা করা



কঠিন। বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসল সে, চোখ দারুণ জবলে উঠল, মুখ কাগজের চেয়ে শাদা।

'এই দেখুন, এই দেখুন! তাহলে দেখছেন ত দুনিয়াতে ভালো মেয়েও আছে,' আপোস করার সুরে বলল কমিসার। 'গ্রিশার কপাল খুলবে না, কেন সেটা আপনার মনে হয়? জীবনে সব সময়েই ঘটে এটা: যারা চায় তারা পায়।'

সংক্ষেপে, সমস্ত ওয়ার্ডে আবার প্রাণচঞ্চলতা ফিরে এল। একমাত্র কমিসারের অবস্থা সমানে খারাপের দিকে চলেছে। মরফিয়া আর কর্পূর দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তার ফলে মাঝেমাঝে দিনের পর দিন ওষুধের ঘোরে আধো-আচ্ছন্ন অবস্থায় বিছানায় ছটফট করে সে। স্তেপান ইভানভিচ চলে যাবার পর আরো তাড়াতাড়ি কাহিল হয়ে পড়ছে কমিসার। মেরেসিয়েভ অনুরোধ করল ওর খাটটা যেন কমিসারের খাটের আরো কাছে রাখা হয়, দরকার হলে যাতে সাহায্য করতে পারে। যত দিন যাচ্ছে কমিসারের প্রতি তত আকৃষ্ট হচ্ছে মেরেসিয়েভ।

আলেক্সেই জানত যে পা নেই বলে অন্যদের তুলনায় ওর জীবনযাত্রা অনেক কঠিন আর জটিল হবে, সেজন্য টান তার কমিসারের দিকে: কী করে সত্যি সত্যি বাঁচতে হয় সেটি জানে মানুষটি, নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যদের টানে চুম্বকের মত। আজকাল কমিসারের আধো-আচ্ছন্ন অবস্থা কদাচিৎ কাটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এলে ঠিক আগেকার মতই ব্যবহার করে সে।

একদিন, সন্ধ্যা ঘন হয়েছে, হাসপাতালের সাড়াশব্দ গিয়েছে মিলিয়ে, স্তব্ধতা ভাঙ্গছে শুধু ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রোগীদের অস্ফুট ক্ষীণ নাকডাকার শব্দ, কাতরোক্তি আর বিকারের প্রলাপে, এমন সময়ে করিডরে শোনা গেল পরিচিত পায়ের ভারী জোরালো শব্দ। দরজার কাচ দিয়ে মেরেসিয়েভের চোখে পড়ে স্বল্পালোকিত করিডরের সবটা, একেবারে ওধারে টেবিলের কাছে বসে একটি নার্স সোয়েটার বুনে চলেছে বিনা ছেদে। করিডরের শেষে দেখা গেল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের দীর্ঘ দেহ, হাতদুটো পিছনে মুড়ে আস্তে আস্তে হাঁটছেন। লাফিয়ে উঠল নার্সটি, কিন্তু বিরক্তির ভঙ্গীতে হাতের ইশারায় তাকে সরিয়ে দিলেন তিনি। ঢিলে কোটটা খোলা, খালিমাথা, কপালে নেমে এসেছে ভারী পাকা চুলের গোছা।

'ভাসিয়া আসছে,' ফিসফিসিয়ে মেরেসিয়েভ বলল কমিসারকে,

তাকে এতক্ষণ বিশেষ ধরনের কৃত্রিম পায়ের নিজস্ব নক্‌সা একটা বোঝাচ্ছিল সে।

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ থমকে দাঁড়ালেন, যেন কোন বাধা পেয়েছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে সামলালেন নিজেকে, কী যেন বললেন বিড়বিড় করে, তারপর দেয়াল ছেড়ে দিয়ে ৪২ নং ওয়ার্ডে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কপালটা রগড়াতে লাগলেন, যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন। মুখে মদের গন্ধ।

'একটু বসুন, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, গল্পগুজব করা যাক,' বলল কমিসার।

পা টেনে টেনে খাটের কাছে গিয়ে অধ্যাপক খাটে ধপাস করে বসলেন, স্প্রিংগুলো কিঁচকিঁচ করে উঠল, তারপর রগ ঘষতে লাগলেন তিনি। এর আগে রোঁদের সময়ে কমিসারের খাটের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি প্রায় যুদ্ধ কী ভাবে চলছে সে বিষয়ে কথা বলতেন। এটা সবাই জানত যে রোগীদের মধ্যে কমিসারকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি, তাই সন্ধ্যা ঘন হয়ে গেলে তাঁর আসাটা বিচিত্র ছিল না মোটেই। কিন্তু মেরেসিয়েভের মনে হল এদের দুজনের কোন গোপন কথা আছে, তাই সে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল।

'আজ ২৯শে এপ্রিল... ওর জন্মদিন। ওর বয়স এখন — না, বেঁচে থাকলে ওর বয়স হত... ছত্রিশ,' অনুচ্চকণ্ঠে বললেন অধ্যাপক।

অনেক কষ্টে নিজের বড়ো ফোলা হাত কম্বলের নিচ থেকে বের করে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের হাতে রাখল কমিসার। অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার ঘটল: কেঁদে ফেললেন অধ্যাপক। লম্বা-চওড়া মানুষটি কাঁদছে, সেটা দেখাটাও কষ্টকর। স্বতই ঘাড় গুঁজে, কম্বলে মাথা চাপা দিল আলেক্সেই।

'ফ্রণ্টে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল,' অধ্যাপক বলে চললেন। 'আমাকে বলল যে জনগণের স্বেচ্ছা সেনাদলে যোগ দিয়েছে, ওর কাজের ভার অন্য কাউকে দেবার অনুরোধ করল আমাকে। এখানে আমার সঙ্গে ও কাজ করত। এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে চেঁচামেচি করেছিলাম। কিছুতেই মাথায় ঢোকেনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যাণ্ডিডেট পদবী প্রাপ্ত একজন, প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী একজন, কেন রাইফেল ঘাড়ে নেবে। কিন্তু ও বলল — প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে — ও বলল, "বাবা, মাঝেমাঝে এমন সময় আসে যখন চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যাণ্ডিডেটও রাইফেল না ধরে পারে না।" কথাটা বলে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আমার জায়গায় কে আসবে?"

আমি যদি একবার শুধু টেলিফোন করতাম তাহলে কিছুই ঘটত না, বুঝতে পারছেন, কিছুই ঘটত না? সামরিক হাসপাতালের একটা বিভাগের ভার ত ওর ওপরে ছিল... ঠিক বলছি না?'

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ থামলেন, নিশ্বাস পড়ছে কষ্টে, গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন.

'...ওটা করবেন না। হাতটা সরিয়ে নিন। নড়াচড়া করলে আপনার কষ্ট যে কী রকম বাড়ে জানি... হ্যাঁ, সারা রাত বসে রইলাম, কী করা উচিত ভাবলাম। আর একজনের কথা আমার জানা ছিল কার কথা বলছি আপনি জানেন ত - তার একটি ছেলে ছিল, ছেলেটি অফিসার, যুদ্ধের প্রথমেই মারা যায়। ওর বাবা কী করল জানেন? দ্বিতীয় ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাল, জঙ্গী বিমানচালক হিসেবে পাঠাল, যুদ্ধের সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল পেশা এটা... সেই লোকটির কথা তখন মনে পড়ে গেল, আর যা ভাবছিলাম তার জন্যে লজ্জিত লাগল, তাই টেলিফোন আর করা হল না...'

'সেজন্যে আপনি কি এখন দুঃখিত?'

'না। এটাকে কি দুঃখিত হওয়া বলা চলে? আমি নিজেকে খালি জিজ্ঞেস করি: আমার একমাত্র সন্তানকে তাহলে কি আমিই খুন করেছি? আমার সঙ্গে এখানে এখনো থাকতে পারত ও, আমরা দুজনে দেশের জন্যে বিশেষ জরুরী কাজ করতে পারতাম। সত্যিকারের প্রতিভা ছিল ওর - বলিষ্ঠ, দুঃসাহসী, উজ্জ্বল প্রতিভা। সোভিয়েত চিকিৎসা বিভাগের গর্ব করবার মত লোক হতে পারত ও – যদি সে সময়ে একবার শুধু টেলিফোন করতাম!'

'টেলিফোন করেননি বলে আপনি কি দুঃখিত?'

'কী বলতে চাইছেন?... আমি জানি না। জানি না আমি।'

'আচ্ছা ধরুন, সে-রকম সময় ফিরে এলে কি টেলিফোন করবেন?'

কোন কথাবার্তা নেই। রোগীদের নিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। সমানভাবে খাটটা কিঁচকিঁচ করছে, বোঝা গেল গভীর চিন্তায় আমগ্ন অধ্যাপক এপাশ ওপাশ দুলছেন, আর ঘর গরম রাখার নলগুলোর মধ্যেকার আওয়াজ।

'কী মনে হয়?' বোধে ও সমবেদনায় গভীর সুরে আবার জিজ্ঞেস করল কমিসার।

'জানি না... কী জবাব দেব জানি না। জানি না আমি। কিন্তু মনে হয় সবকিছু যদি আবার একই ভাবে ঘটে তাহলে আগে যা করেছিলাম তাই

করব। অন্যান্য বাপেদের মতই ত আমি, দোষেগুণে তাদেরি মত... যুদ্ধ কী ভয়াবহ ব্যাপার...'

'আর বিশ্বাস করুন, দারুণ দুঃসংবাদ সহ্য করাটা অন্যান্য বাপেদের পক্ষে আপনার চেয়ে সহজ নয়। মোটেই সহজ নয়।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। কী ভাবছেন তিনি, মন্থর মুহূর্তগুলিতে তাঁর প্রশস্ত বলিকীর্ণ কপালের পিছনে জোট পাকাচ্ছে কী সব ভাবনা?

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন,' অবশেষে বললেন তিনি। 'ওর পক্ষে সহজতর ছিল না, তবু মেজ ছেলেকে ত যুদ্ধে পাঠিয়েছিল... ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ, বন্ধু! সত্যি ত, করবার কিছু নেই এ ব্যাপারে...'

খাট থেকে উঠে, আস্তে আস্তে কমিসারের হাত কম্বলের নিচে রেখে, কম্বলটা ভালো করে গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

গভীর রাত্রে কমিসারের অবস্থা আবার বিশেষ খারাপ হল। জ্ঞান নেই, দাঁতে দাঁত চেপে বিছানায় ছটফটানি, বেশ জোরে গোঙানি। তারপর চুপ করে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে টান হয়ে শুয়ে থাকাতে সবাই ভাবল সব শেষ। ছেলের মৃত্যুর পরে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ নিজের ফাঁকা বড়ো ফ্ল্যাট ছেড়ে হাসপাতালে তাঁর ছোট অফিস-ঘরে চলে এসেছিলেন, সেখানে অয়েলক্লথ-দেওয়া একটা সোফায় শুতেন: কমিসারের অবস্থা এত খারাপ হল যে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ ওর বিছানাকে পর্দা দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন, সবাই জানে সেটার মানে হল রোগীকে হয়ত "৫০ নং ওয়ার্ডে" নিয়ে যাওয়া হবে।

কর্পূর আর অক্সিজেন দেওয়ার ফলে কমিসারের নাড়ী ফিরে এল আবার; রাত্রের সার্জন ও ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ চলে গেলেন যতটুকু পারেন ঘুমোতে, ভোর হতে বিশেষ আর দেরী নেই। পর্দার আড়ালে রোগীর বিছানার পাশে বসে রইল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, অশ্রুসিক্ত উৎকণ্ঠিত মুখে। ঘুম এল না মেরেসিয়েভের। আতঙ্কে খালি ভাবল সে, "তাহলে সত্যিই কি ও মারা যাবে?" স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কমিসার তখনো পর্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর। বিকারের ঘোরে সে বকছে, বারবার বলছে একটি কথা, মেরেসিয়েভের মনে হল ও বলছে:

'জল দাও, আমাকে জল দাও...'

ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার মনে হল কমিসার জল খেতে চাইছে, পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কম্পিত হাতে গেলাসে জল ঢেলে নিল সে।

কিন্তু জল খেতে রোগী চায়নি। দাঁতে লেগে গেলাসটা শব্দ করে উঠল আর জল ছপাৎ করে বালিশে পড়ল। তখনো ও বলে চলল "দাও" গোছের কথাটা, কখনো আদেশের, কখনো অনুনয়ের সুরে। হঠাৎ মেরেসিয়েভ বুঝতে পারল কথাটা "দাও" নয়, "বাঁচতে দাও", বুঝতে পারল শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বিরাট মানুষটি লড়াই করছে মৃত্যুর সঙ্গে।

একটু পরে শান্ত হয়ে এল কমিসার, চোখ খুলল।

'ভগবানকে ধন্যবাদ,' অনুচ্চকণ্ঠে বলে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা স্বস্তিতে পর্দাটা ভাঁজ করতে শুরু করল।

'ওটা থাক, দোহাই তোমার!' বাধা দিয়ে কমিসার বলে উঠল। 'ওটা নিয়ে যেও না, লক্ষ্মীটি। ওটা থাকলে বেশী আরাম লাগে। আর কাঁদবেন না, এমনিতে পৃথিবীতে অনেক যন্ত্রণা আছে... কেন কাঁদছেন, সোভিয়েত দেবী!.. শুধু শুধু ওই জায়গাটার দোরগোড়ায় দেবীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, কী আফসোসের ব্যাপার সেটা।'

১০

নতুন একটি অনুভূতি আলেক্সেই'র মনে, এরকম অনুভূতি আগে তার কখনো হয়নি।

যে মুহূর্তে থেকে সে বিশ্বাস করতে শুরু করল যে পায়ের পাতা না থাকলেও চেষ্টা করে আবার বিমান চালানো সম্ভব, আবার বৈমানিক হতে পারে সে, সে মুহূর্ত থেকে সক্রিয় জীবনের অদম্য স্পৃহায় ও আচ্ছন্ন।

জীবনে ওর একমাত্র লক্ষ্য এখন জঙ্গীবিমান আবার চালানো। পার্টিজানদের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছবার সময়ে যে অসম্ভব দৃঢ়তা সে দেখিয়েছিল, ঠিক সেরকম দৃঢ়তায় এখন লক্ষ্যবস্তুর দিকে আবার এগোচ্ছে সে। কৈশোর থেকে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে চলা ওর অভ্যাস, এখন প্রথমেই সুনিশ্চিতভাবে ঠিক করে নিল যে সিদ্ধির জন্য কী সাধনা করা তার অবশ্যকর্তব্য, সময় নষ্ট না করে। আর তাই ঠিক করল যে প্রথমে দরকার তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা, অনাহারের জন্য শক্তিহ্রাস হয়েছিল, দরকার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া, আর সেজন্য বেশী খেতে হবে, ঘুমোতে হবে বেশী। দ্বিতীয়ত,

বৈমানিকের জঙ্গী গুণ ফিরে পেতে হবে, শয্যাশায়ী রোগীর পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা ব্যায়াম করতে হবে তাকে, যাতে শরীর গড়ে ওঠে আবার। তৃতীয়ত, সবচেয়ে জরুরী আর দুঃসাধ্য এটা, পাদুটোর যতটুকু আছে ততটুকু দিয়ে তালিম নিতে হবে, যাতে তাদের শক্তি আর সক্রিয়তা বজায় থাকে; পরে নকল পা পেলে সেদুটো পরে বিমান চালানো শিখতে হবে।

পায়ের পাতা না থাকলে এমন কি হাঁটাও সহজ নয়। মেরেসিয়েভ কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে বিমান চালাবে, যেমন-তেমন বিমান নয়, জঙ্গী বিমান। আকাশ-যুদ্ধে বিশেষ করে সবকিছুর হিসেব মুহূর্তের ভগ্নাংশে মাপাজোকা, স্বভাবসিদ্ধ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতই স্বতঃস্ফূর্ত হতে হয় প্রতিটি নড়নচড়ন, হাতে যেমন কাজ করা যায় তেমন পাদুটোকেও নির্ভুল নিপুণভাবে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ঠিক তেমন দ্রুতবেগে চালাতে হয়। এমন ভাবে নিজেকে তৈরী করতে হবে যাতে পায়ে লাগানো চামড়া আর কাঠের টুকরোগুলো শরীরের জীবন্ত অংশগুলির মতই জটিল কাজ সব করতে পারে।

যারা বিমানচালনা প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত তাদের কাছে অসম্ভব মনে হবে এটা, কিন্তু আলেক্সেই'র দৃঢ় বিশ্বাস এটা সম্ভব, আর তাই সিদ্ধিলাভ করবেই সে। সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করার জন্য কাজ করে চলল সে। চিকিৎসা-পদ্ধতি ও ওষুধ যা কিছু নির্দেশ করা হত, প্রত্যেকটি এত কঠোর নিষ্ঠায় মেনে চলত যে নিজেরি অবাক লাগত তার। প্রচুর খেত ও, ক্ষিধে বিশেষ না থাকলেও হামেশাই দ্বিতীয়বার চেয়ে খেত। অবস্থা যাই হোক না কেন, যতক্ষণ ঘুমোনো উচিত বলা হয়েছে জোর করে ততক্ষণ ঘুমোত, এমন কি মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে অল্প একটু ঘুমিয়ে নেওয়াও অভ্যাস করে নিল ও, যদিও সেটা ওর সক্রিয় সজীব প্রকৃতির বিরোধী।

জোর করে খাওয়া, ঘুমোনো, ওষুধ খাওয়া কঠিন ছিল না ওর পক্ষে। ব্যায়ামটা কিন্তু আলাদা ব্যাপার। আগে সাধারণ যে সব ব্যায়াম নিয়মিতভাবে ও করত সেগুলো শয্যাশায়ী, পায়ের পাতাবিহীন লোকের করা সম্ভব নয়। তাই নতুন কয়েকটি ব্যায়াম রীতির উদ্ভাবন করল আলেক্সেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমরে হাত রেখে শরীরটা সামনে পিছনে পাশে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে নোয়াত, এত উৎসাহে আর জোরে এদিক ওদিক মাথা ঘোরাত যে শিরদাঁড়া চড়চড় করে উঠত। ওয়ার্ডের সহবাসীরা ব্যায়াম নিয়ে ওকে হালকা ঠাট্টা করত, সপরিহাসে অভিনন্দন জানিয়ে কুকুশকিন ওকে

জ্নামেনস্কি ভাইদের একজন, কিম্বা লাদ্মেগ অথবা অন্য কোন বিখ্যাত দৌড়িয়েদের নাম ধরে ডাকত। এ ধরনের ব্যায়াম দ্চক্ষে দেখতে পারত না কুকুশকিন, ব্যায়ামের ব্যাপারটা হাসপাতালের আর একটা আজগ্বী খেয়াল মাত্র ওর কাছে। আলেক্সেই ব্যায়াম শ্রু করলেই গজগজ করতে করতে তাড়াতাড়ি করিডরে চলে যেত সে।

পা থেকে ব্যাণ্ডেজ খোলা হল, বিছানায় আরো স্বচ্ছন্দভাবে নড়াচড়া করতে পারে আলেক্সেই, তখন আর একটি ব্যায়াম রীতি চাল্ করল। পাদ্টোকে বিছানার নিচের শিকের মধ্যে দিয়ে কোমরে হাত রেখে যতখানি পারে শরীরটাকে আস্তে আস্তে নোয়াত, তারপর আবার পিছন দিকে হেলত। নোয়ানোর বেগ প্রতিদিন কমিয়ে আনছে, বাড়াচ্ছে সটান হবার সংখ্যা। তারপর পাদ্টোকে খাটাবার জন্য কয়েকটি কায়দা চাল্ করল সে। চিৎ হয়ে শ্য়ে পালা করে দ্টো পা'কে নোয়াত, হাঁটু ব্কের দিকে টেনে এনে তারপর দিত পাদ্টো ছড়িয়ে। প্রথম এটা করার সময়ে ও উপলব্ধি করল কী ভীষণ এবং হয়ত অনতিক্রম্য বাধার ম্খোম্খি হতে হবে ওকে। গোছ থেকে পাদ্টো কাটা, সে দ্টো ছড়াতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। গতি হয় ইতস্তত অনিয়মিত। ঠিকমত পা ছড়ানো, ডানা কিম্বা পিছনের অংশ গিয়েছে এমন একটি বিমান চালানোর মত কঠিন ব্যাপার। মনে মনে বিমানের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে আলেক্সেই ব্ঝল যে মান্ষের শরীরের আদর্শ স্সমঞ্জস গঠনের যতিপাত ঘটেছে তার ক্ষেত্রে, ওর শরীর যদিও সবল ও বলিষ্ঠ তব্ আশৈশব অভ্যস্ত বিভিন্ন অঙ্গের ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়া আর কখনো ফিরে পাবে না সে।

পায়ের ব্যায়ামে অসম্ভব কষ্ট পেত মেরেসিয়েভ, কিন্তু প্রতিদিন সময়ের মাত্রা এক মিনিট করে বাড়িয়ে চলল। কখনো কখনো ভয়াবহ যন্ত্রণায় চোখ জলে ভরে যেত, কাতরোক্তি চাপার জন্য এত জোরে ঠোঁট কামড়াত যে রক্ত পড়ত। কিন্তু তব্ জোর করে ব্যায়াম চালিয়ে গেল সে, প্রথমে দিনে একবার করে, পরে দ্বার। প্রতিদিন ব্যায়ামের সময় বেড়ে চলল। ব্যায়াম করার পর প্রতিবার অসহায়ভাবে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ভাবত আর করতে পারবে কি না। কিন্তু সময় এলে আবার ব্যায়াম শ্রু হত। সন্ধ্যেবেলায় উর্ আর পায়ের ডিম টিপে দেখত আর আনন্দে লক্ষ্য করত ব্যায়াম শ্রু করার গোড়াকার দিকের সেই থলথলে মাংস আর চর্বির জায়গায় এসেছে আগেকার দৃঢ় পেশীবদ্ধতা।

পাদ্বটোর কথায় মেরেসিয়েভের সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন। মাঝেমাঝে চিন্তায় মগ্ন সে, পায়ের নিচের দিকটা ব্যথিয়ে উঠল, তখন অন্যভাবে পাদ্বটো রাখার সময়েই শ্বধ্ব মনে পড়ত পায়ের পাতা তার নেই। অনেক দিন কোন স্নায়বিক অসঙ্গতির জন্য কাটা পায়ের পাতাদ্বটো শরীরের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে রইল। হঠাৎ শিরশির করে উঠত সেদ্বটো, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় উঠত ব্যথিয়ে, মাঝেমাঝে এমনকি যন্ত্রণাও হত। পাদ্বটোর কথায় এত বিভোর আলেক্সেই যে মাঝেমাঝে স্বপ্ন দেখত যে সবেগে ও চলাফেরা করছে। হ্বঁশিয়ারি বাঁশি বেজেছে, দৌড়িয়ে গেল বিমানে, ডানায় লাফিয়ে উঠে ককপিটে বসল, পা দিয়ে পা-দানিটা দেখছে, ওদিকে ইঞ্জিন থেকে ঢাকনা সরিয়ে নিচ্ছে ইউরা। আবার কখনো ও আর ওলিয়া খালি পায়ে, হাত ধরাধরি করে ফুল ফোটা স্তেপে দৌড়চ্ছে, উষ্ণ ভিজে মাটির নরম স্পর্শ বেশ লাগছে দ্বজনের। ভারী ভালো লাগছে। কিন্তু ঘ্বম থেকে উঠে যখন দেখত পায়ের পাতা নেই তখন কী হতাশ না লাগত আলেক্সেই'র!

এ ধরনের স্বপ্ন দেখার পরে মাঝেমাঝে হতাশ্বাস হয়ে যেত আলেক্সেই। মনে হত বৃথায় নিজের শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে, আর কখনো বিমান চালাতে পারবে না সে, যেমন আর কখনো খালি পায়ে স্তেপে আর দৌড়তে পারবে না সেই কমনীয় মেয়েটির সঙ্গে। ওর কাছ থেকে দ্বরে যত দিন কাটছে ততই চাইছে ওকে, ততই প্রিয় হয়ে উঠছে মেয়েটি।

ওলিয়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্কে আনন্দ পায় না আলেক্সেই। প্রায় প্রতি সপ্তাহে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা ওকে "নাচায়," অর্থাৎ বিছানায় ঝটকা দিতে হয়, দিতে হয় হাততালি, তার পরে মেলে চিঠি, স্কুলের মেয়ের গোলগোল পরিচ্ছন্ন হাতে লেখা ঠিকানাটা। ক্রমশ দীর্ঘতর আর অন্তরঙ্গ হচ্ছে চিঠিগ্বলো, যেন য্বদ্ধে ব্যাহত মেয়েটির নবীন প্রেম দিনে দিনে দানা বাঁধছে। চিঠিগ্বলো আলেক্সেই পড়ে আকাঙ্ক্ষায় আর উৎকণ্ঠায়, জানে যে প্রতিদান দেবার কোন অধিকার নেই তার।

স্কুলে সহপাঠী ছিল তারা, করাত-কলের শিক্ষানবিশি স্কুলে একসঙ্গে পড়েছে, দ্বজনের মনের ভরাট রোমাণ্টিক আবেগকে বড়োদের অন্বকরণে প্রেম বলে ডেকেছিল তারা। পরে ছ-সাত বছরের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়। প্রথমে মেয়েটি-কারিগরি স্কুলে পড়তে চলে যায়। মেকানিক হয়ে যখন করাত-কলে ফিরল তখন সহরে ছিল না আলেক্সেই, সে তখন বিমান স্কুলে। য্বদ্ধের ঠিক আগে আবার দ্বজনের দেখা হয়। দেখাসাক্ষাৎ করতে তারা চায়নি, হয়ত

পরস্পরকে ভুলে গিয়েছিল ওরা — বিচ্ছেদের পরে অনেক জল ত গড়িয়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মায়ের সঙ্গে আলেক্সেই কোথায় যাচ্ছে, একটি মেয়ে ওদের পেরিয়ে গেল। মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকায়নি পর্যন্ত আলেক্সেই, শুধু লক্ষ্য করেছিল ওর পাদুটোর গড়ন বেশ।

'ওকে ডাকলে না কেন? ও ত ওলিয়া!' মেয়েটির পদবীটি উল্লেখ করে বকে উঠলেন মা।

পিছনে তাকাল আলেক্সেই। মেয়েটিও দেখার জন্য ফিরে তাকিয়েছে। দৃষ্টিবিনিময় হল ওদের, আর আলেক্সেই'র হৃৎস্পন্দন হল দ্রুততর। মাকে ছেড়ে ও দৌড়িয়ে গেল মেয়েটির কাছে, ফুটপাথে পত্রহীন একটি পপলার-গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল ও।

'তুমি?' বিস্ময়ে বলে উঠল আলেক্সেই, এমন ভাবে ওর দিকে চাইল যেন কোন সুন্দরী, অসামান্য বিদেশিনী এই বসন্ত সন্ধ্যায় কর্দমাক্ত প্রশান্ত রাস্তায় দৈবক্রমে এসে পড়েছে।

'আলিওশা?' ঠিক ওর মত বিস্মিত অবিশ্বাসী সুরে বলল মেয়েটি।

ছ-সাত বছর বিচ্ছেদের পর এই প্রথম দেখা। আলেক্সেই'র সামনে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো একটি মেয়ে, পেলব নরম গঠন, সুন্দর গোলগাল কিশোরের মত মুখ, নাকের ডগায় কয়েকটি সোনালী ফুট ফুট দাগ। পাতলা, কোণের দিকে একটু ঘন ভুরুজোড়া অল্প তুলে বড়ো বড়ো কটা চকচকে চোখে মেয়েটি তাকাল ওর দিকে। শিক্ষানবিশি স্কুলে শেষ দেখা যখন ওদের হয়েছিল তখন ওর চেহারাটা ছিল শক্তসমর্থ — গোলগাল মুখ, গোলাপী গাল, কর্কশ গোছের একটি কিশোরী, বাপের তেল-চটচটে কোট আস্তিন গুটিয়ে পরে বেশ গর্বিতভাবে চলাফেরা করত তার সঙ্গে আজকের এই সজীব কমনীয় মেয়েটির আদল খুব কম।

মা'র কথা ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে তারিফ করল আলেক্সেই। মনে হল এ ক' বছরে কখনো ভোলেনি ওকে, আজকের সাক্ষাতের স্বপ্ন দেখেছে বরাবর।

'তাহলে এরকম দেখতে হয়েছ তুমি!' অবশেষে বলল আলেক্সেই।

'কী রকম?' ভরাট মুখর গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটি, স্কুলে একসঙ্গে পড়ার সময়কার মত গলাটা নয় মোটেই।

রাস্তার কোণ থেকে দমকা হাওয়া এসে পত্রহীন পপলারগাছের শাখাগুলোর মধ্য দিয়ে শিস দিয়ে গেল। সুঠাম পাদুটোর উপরে মেয়েটির

ফ্রক ফরফর করে উঠল। খিলখিল করে হেসে, হেঁট হয়ে ফ্রকটা চেপে ধরল ও সহজ সুন্দরভাবে।

'এরকম!' উত্তর দিল আলেক্সেই, সে যে মুগ্ধ সেটা চাপতে পারল না আর।

'কেমন বলো ত?' হেসে উঠে আবার জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

এক মুহূর্ত তরুণ তরুণীর দিকে তাকিয়ে বিষণ্নভাবে হেসে চলে গেলেন আলেক্সেই'র মা। ওরা রয়ে গেল, পরস্পরকে তারিফ করলে, উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা চলল, কথার মধ্যিখানে বাধা দিলে পরস্পরকে, নানারকম বিস্ময়ের উক্তি করলে, যেমন "তোমার মনে পড়ে?" "জানো এটা?" "কোথায়?.." "ওর কী হল?.."

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প চলল, অবশেষে ওলিয়া আঙুল দিয়ে কাছের বাড়িগুলোর জানলাগুলো দেখাল। ফারের শাখা আর জেরানিয়ামের ফুলদানির আড়ালে সেখানে কৌতূহলী মুখ সব দেখা যাচ্ছে।

'তোমার সময় থাকলে চলো নদীর ধারে যাই,' প্রস্তাব করল ওলিয়া। হাত ধরাধরি করে, এমন কি শৈশবে সেটা কখনো করেনি তারা, সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ওরা গেল নদীর উঁচু পাড়ে, খাড়াভাবে নদীতে নেমেছে সেটা, সেখান থেকে অদ্ভুত ভালোভাবে দেখা যায় ভলগার চওড়া বিস্তার আর বন্যার জলে বরফের চাঁই'এর গম্ভীর শোভাযাত্রা।

সে সময় থেকে আদরের ছেলেকে কদাচিৎ বাড়িতে দেখতে পেতেন মা। জামাকাপড়ের বিষয়ে সাধারণত ও মাথা ঘামাত না, কিন্তু এখন রোজ প্যাণ্ট ইস্ত্রি করা হয়, ইউনিফর্মের বোতামগুলো খড়ি দিয়ে পালিশ করে, বিমান বাহিনীর ব্যাজ দেওয়া শাদা-চুড়ো টুপিটা চড়ায় মাথায়, খরখরে চিবুক কামানো হয় প্রত্যহ, আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখে ও যায় করাত-কলের গেটে ওলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। দিনের বেলাতেও প্রায় উধাও হয়ে যায় আলেক্সেই, একটা অন্যমনস্ক ভাব, প্রশ্নের সঠিক জবাব পারে না দিতে। মায়ের সহজাত বোধে ধরা পড়ল ওর কী হয়েছে; সেটা বুঝে ওকে মাপ করলেন তিনি, সেই প্রবাদবাক্যটি সান্ত্বনা যোগাল তাঁকে: বুড়োরা দিনে দিনে বুড়ো হয়, নবীনদের বাড়া অবশ্যকর্তব্য।

ভালোবাসার কথা একবারও বলেনি দুজনে। বিকেলের সূর্যের আলোয় ঝিক ঝিক করে মন্থর স্রোতে বইছে ভলগা, তার খাড়া পাড়ে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরেছে, কিম্বা হয়ত সহরের বাইরে তরমুজ ক্ষেত ধরে গিয়েছে, সেখানে

ঘন আর আলকাতরার মত কালো আঙুরের গোছা ইতিমধ্যেই ঘন সবুজ আর জলচর পাখির পায়ের মত পাতায় দেখা দিয়েছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে ভাবত ছুটির দিন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে ত আসছে, ওলিয়াকে এবার হৃদয়ের কথা সব খুলে বলা যাক। সন্ধ্যা আসত আবার। কলের গেটে দেখা হত ওলিয়ার সঙ্গে, যেত ছোট দোতলা কাঠের বাড়িটিতে, সেখানে বিমানের কামরার মত ঝকঝকে, তকতকে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে ওলিয়া। আলমারীর খোলা পাটের আড়ালে সে জামাকাপড় বদলাত আর ধৈর্য ধরে বসে থাকত আলেক্সেই, পাটের আড়াল থেকে নগ্ন কনুই, ঘাড় আর পা উঁকি মারছে, চেষ্টা করত সেদিকে না তাকাতে। হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসত ও, বেশ ঝরঝরে চেহারা, গাল গোলাপী, ভিজে চুল, পরনে সাদা সিল্কের ব্লাউজ, শনি রবিবার বাদ দিয়ে যেটা সব সময়ে পরত ও।

তারপর দুজনে যেত সিনেমায়, সার্কাসে কিম্বা পার্কে। কোথায় যাওয়া হল তাতে কিছু এসে যেত না আলেক্সেই'র। সিনেমার পর্দা, সার্কাসের মঞ্চ, পার্কের ভিড় কিছুই দেখত না সে; ওর চোখ ভরে থাকত শুধু ওলিয়া, ওকে দেখতে দেখতে ভাবত, "আজ রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়ে পথে বিয়ের কথা বলব, নিশ্চয়ই বলব!" কিন্তু পথ যেত ফুরিয়ে, বলায় সাহস হত না ওর।

রবিবার সকালে একদিন ভলগার ওপারের মাঠে বেড়াতে গেল দুজন। ওলিয়ার খাতিরে সবচেয়ে ভালো সাদা ট্রাউজার চাপিয়েছে আলেক্সেই, খোলা-কলার একটা সার্ট গায়ে, মা বলতেন ওটা ওর রোদে-পোড়া চওড়া মুখের পক্ষে চমৎকার মানানসই। ওলিয়া তৈরী হয়েই ছিল। ন্যাপকিনে জড়ানো একটা পার্সেল ওর হাতে দিল ওলিয়া, তারপর দুজনে নদীতে গেল। বুড়ো খেয়ামাঝিটা প্রথম মহাযুদ্ধে পঙ্গু হয়, আশেপাশের বাচ্চাদের বিশেষ প্রিয় সে, চড়ার কাছে গাজন-মাছ ধরতে আলেক্সেইকে শিখিয়েছিল ছেলেবেলায়। কাঠের পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে ভারী নৌকোটাকে জলে ঠেলে দাঁড়ের ছোট ছোট ঘায়ে চালাতে শুরু করল। স্রোতে কোণাকুণিভাবে এগিয়ে, দাঁড়ের সংক্ষিপ্ত ঘায়ে নদী পার হয়ে নৌকোটা ওপারের নিচু উজ্জ্বল সবুজ তীরে পৌঁছল। মেয়েটি পিছনের গলুইতে বসে আছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন, হাতটা নিচে নামানো নৌকোর গায়ে, আঙুলের মধ্য দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে।

'আরকাশা খুড়ো, আমাদের চিনতে পারছ না?' আলেক্সেই জিজ্ঞেস করল।

দুজনের নবীন মুখের দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে মাঝি বলল, 'না।'

'কেন, আমার নাম আলিওশ্‌কা মেরেসিয়েভ। কাঁটা দিয়ে চড়ায় গাজন ধরতে তুমিই ত আমাকে শিখিয়েছিলে।'

'শিখিয়েছিলাম হয়ত। তোমার মত নাছোরবান্দা অনেকেই ত খেলত এখানে। সবাইকে মনে নেই।'

একটা পোত পেরিয়ে গেল নৌকোটা, নোঙর ফেলেছে একটা চওড়া-গলুই ছোট স্টীমার, গলুইটা জায়গায় জায়গায় রঙচটা, তার উপরে বিখ্যাত নাম "অরোরা" লেখা, সেটা ছাড়িয়ে নৌকোটা বালুময় তীরে খরখর শব্দ করে ঢুকল।

'আমার কাজ আজকাল এখানে, মিউনিসিপ্যালিটির জন্যে আর খাটি না। নিজের কাজ করি, মানেটা বুঝলে ত—ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর কি,' জলে নেমে নৌকোটাকে তীরে আরো উঁচুতে ঠেলতে ঠেলতে বুঝিয়ে বলল আরকাশা। কিন্তু কাঠের পাদুটো বালিতে গেল ডুবে, নৌকোটা ভারী বলে সরাতে পারল না সেটাকে। "লাফিয়ে নামতে হবে তোমাদের," উদাসীনভাবে বলল আরকাশা।

'কতো দিতে হবে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই।

'তোমার যা খুসি; বেশ খুসি দেখাচ্ছে তোমাদের, সেজন্য একটু বেশী দেওয়া উচিত। কিন্তু তোমাকে চিনতে পারছি না, সত্যি পারছি না।'

লাফিয়ে নামতে গিয়ে ওদের পা ভিজে গেল, জুতো খুলে নিতে বলল ওলিয়া। জুতো খুলে ফেলল দুজনে, নদীর ভিজে তপ্ত বালিতে খোলা পা লাগাতে এত ভালো আর স্বচ্ছন্দ লাগল ওদের যে ঘাসে বাচ্ছাদের মত দৌড়ঝাঁপ করার ইচ্ছে হল।

'ধরো দিকি আমাকে!' চড়া দিয়ে নিচু মরকত-সবুজ মাঠের দিকে তীরের মত ছুটো যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল ওলিয়া, তার বলিষ্ঠ তামাটে পাদুটো ঝলসিয়ে উঠল।

পিছনে দৌড়োল আলেক্সেই, ওর পাতলা উজ্জ্বল ফ্রকটার বহুরঙা ছোপ ছাড়া চোখে আর কিছু পড়ছে না। দৌড়চ্ছে, আর মেঠো ফুল আর সরেলের শিষ খালি পায়ে বেশ বিঁধে যাচ্ছে, পায়ের নিচে বসে যাচ্ছে নরম ভিজেভিজে রৌদ্রতপ্ত মাটি। ওলিয়াকে ধরে ফেলাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে হল তার কাছে, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করছে সেটার উপরে; মনে হল এখানে, ফুল-ভরা মাঠে, মাতাল-করা গন্ধে এত দিন ওকে যা বলার সাহস হয়নি সেটা বলা সহজ হবে। কিন্তু যতবার ওর কাছে এসে

পড়ে ধরতে হাত বাড়ায় আলেক্সেই ততবার হঠাৎ ঘুরে ওর নাগাল পেরিয়ে বেড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে অন্যদিকে পালিয়ে যায় ওলিয়া, আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠে।

ধরা দেবে না দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওলিয়া, ওকে ধরতে পারল না আলেক্সেই। ওলিয়া নিজেই মাঠ ছেড়ে নদীতীরে গিয়ে তপ্ত সোনালী বালিতে ছুঁড়ে দিল নিজেকে, টকটকে লাল মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে, স্পন্দমান বুকে গভীর আগ্রহে নিশ্বাস নিচ্ছে সে আর হাসছে। পরে ফুল-ভরা মাঠে, শাদা চুমকি-বসানো ডেইজির মধ্যে দাঁড় করিয়ে ওর ছবি তুলল আলেক্সেই। নদীতে স্নান করল দুজনে তারপর; নাইবার পোশাক নিঙড়ে জামাকাপড় যখন পরল ওলিয়া, ও বাধ্য ছেলের মত ঝোপের আড়ালে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

ওলিয়া ডাকতে কাছে গেল। রোদে-পোড়া পাদুটো মুড়ে বালিতে বসে আছে ও, পরনে হালকা পাতলা ফ্রক, মাথায় তোয়ালে। পরিষ্কার শাদা ন্যাপকিনটা ঘাসের উপরে বিছিয়ে কোণে কোণে পাথরের টুকরো দিয়ে চাপা দিল ওলিয়া, পার্সেল থেকে খাবারগুলো বের করে রাখল, তাতে স্যালাড, অয়েল-পেপারে সযত্নে মোড়া ঠান্ডা মাছ, বাড়িতে তৈরী বিস্কুট; লাঞ্চ খাওয়া হল। এমন কি নুন আর সরষে আনতে ভোলেনি ওলিয়া, প্রসাধনের কৌটোয় সেগুলো এনেছে। গৃহকর্ত্রীর মত গম্ভীর আর নিপুণভাবে কাজ করেছে একরত্তি মেয়েটি, ওর ধরনে মধুর আর মর্মস্পর্শী কিছু একটা আছে। নিজেকে বলল আলেক্সেই, "গয়ং-গচ্ছ আর নয়! সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় বিয়ের প্রস্তাব করব। ওকে বোঝাব, বুঝিয়ে বলব যে আমাকে বিয়ে করতেই হবে।"

বালির উপরে বসে রোদ পোয়াল দুজন, আর একবার স্নান করা হল; ঠিক হল যে ওলিয়ার ঘরে সন্ধ্যেবেলায় আবার দেখা হবে। তারপরে মন্থরভাবে খেয়া-ঘাটে গেল ওরা, ক্লান্ত এবং সুখী। কী একটা কারণে স্টীমার কিম্বা খেয়া-নৌকো কোনটাই সেখানে নেই। অনেকক্ষণ ধরে আরকাশা খুড়োকে চেঁচিয়ে ডাকল ওরা, ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙ্গে গেল। স্তেপে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের দীপ্ত আলোহিত রেখা নদীর উঁচু ওপার ছুঁয়ে নামছে, সহরের আপাতত নিশ্চল ধূলিধূসর গাছগুলোর মাথা আর বাড়ির ছাত সোনালী হয়ে উঠছে সে আভায়। জানলাগুলো টকটকে লাল। গ্রীষ্মের তপ্ত শান্ত সন্ধ্যা। কিন্তু সহরে কিছু একটা ঘটেছে নির্ঘাত। এ সময়ে রাস্তায়

সাধারণত লোকজন থাকে না, আজ কিন্তু অসংখ্য লোক। লোকবোঝাই দুটো লরি চলে গেল; ছোট একটা দল সামরিক কায়দায় মার্চ করে চলেছে।

'আরকাশা খুড়ো নিশ্চয়ই খুব নেশা করেছে,' বলল আলেক্সেই। 'এখানে যদি রাত কাটাতে হয়?'

'তুমি সঙ্গে থাকলে আমার কোন ভয় হয় না,' বড়ো বড়ো চকচকে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল ওলিয়া।

ওলিয়াকে জড়িয়ে আলেক্সেই চুম্বন করল, প্রথম ও শেষ চুম্বন। দাঁড়ের আওয়াজ এল নদী থেকে; ওধার থেকে লোকবোঝাই খেয়া-নৌকোটা আসছে। নৌকোটাকে দেখে এবার ভয়ানক বিরক্ত লাগল দুজনের, তবু বাধ্যভাবে এগিয়ে গেল সেদিকে, যেন ওটা যা বয়ে আনছিল তার পূর্বসূচনা টেনে নিয়ে গেল তাদের।

কোন কথা না বলে নৌকো থেকে লাফিয়ে নামল যাত্রীরা। সবাই ছুটির পোশাকে, সবাইকে বিচলিত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কিন্তু। পুরুষেরা গম্ভীর, বিশেষ তাড়া আছে যেন, আর কেঁদে কেঁদে মেয়েদের চোখ লাল হয়ে গিয়েছে; একটি কথা না বলে তারা ওদের পেরিয়ে গেল। কী ঘটেছে দুজনে জানে না, নৌকোয় লাফিয়ে উঠল। ওদের সুখোজ্জ্বল মুখের দিকে না তাকিয়েই আরকাশা খুড়ো বলল:

'যুদ্ধ বেধেছে... আজ সকালে পররাষ্ট্র জন কমিসার রেডিওতে বলেছেন।'

'যুদ্ধ?.. কার সঙ্গে?' প্রায় লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই।

'ওই নচ্ছার ফ্যাশিস্টগুলোর সঙ্গে, আর কার সঙ্গে আবার?' সক্রোধে দাঁড় টানতে টানতে গরগর করে বলল আরকাশা খুড়ো। 'ছেলেরা ত এরি মধ্যে জেলা সামরিক কমিসারিয়াতে চলে গিয়েছে... সৈন্যদলে ঢোকা শুরু হয়েছে।'

বাড়ি না ফিরে আলেক্সেই সটান গেল সামরিক কমিসারিয়াতে; সে রাত্রেই বারোটা চল্লিশের ট্রেনে চেপে রওনা হল যে বিমান দলে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেদিকে। সুটকেসটা আনার জন্য কোনক্রমে বাড়িতে যেতে পেরেছিল একবার, ওলিয়াকে বিদায় পর্যন্ত জানাতে পারেনি।

চিঠিপত্র খুব কম লেখে ওরা; তার কারণ এই নয় যে পরস্পরের প্রতি দুজনের মনের ভাব মিইয়ে গিয়েছে কিম্বা পরস্পরকে ভুলে যাচ্ছে ওরা। কারণটা তা নয়। গোলগোল স্কুলের মেয়ের হাতে লেখা চিঠিগুলোর জন্য অধৈর্যভাবে প্রতীক্ষা করে থাকত আলেক্সেই, পকেটে রাখত সেগুলো, যখন

একলা তখন বারবার পড়ত। বনে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে এই চিঠিগুলোই বুকে চেপে ধরত ও, চেয়ে থাকত তাদের দিকে। কিন্তু দুজনের বয়স কম, ওদের সম্পর্ক আচমকা ব্যাহত ও ছিন্ন হয়ে যায় যখন তখনো সম্পর্কটা পাকাপাকি হয়নি। তাই পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত পত্রালাপ করত ওরা। শেষ পর্যন্ত অনুচ্চারিত সেই বৃহত্তর জিনিসটির বিষয়ে লিখতে সাহস হত না ওদের।

আর এখন হাসপাতালে শুয়ে, ওলিয়ার চিঠি পেয়ে বিব্রত লাগে আলেক্সেই'র, বিব্রত ভাবটা বেড়ে যায় প্রতি চিঠিতে, কেননা ও দেখছে ওলিয়া নিজে হঠাৎ যেন এগিয়ে এসেছে তার দিকে। এখনকার চিঠিগুলোতে একেবারে খোলাখুলিভাবে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা লেখে ও; সেই সন্ধ্যায় বিশেষ সেই মুহূর্তটিতে ওদের নিতে আরকাশা খুড়ো এসে পড়েছিল বলে তার দুঃখ। আলেক্সেইকে আশ্বাস জানায় যা কিছু ঘটুক না তার, পৃথিবীতে একজনের উপরে সে সব সময়ে নির্ভর করতে পারে; অনুরোধ জানায় যে ঘর ছেড়ে বিভুঁইয়ে ঘোরার সময়ে আলেক্সেই যেন মনে রাখে আপন বলতে পারে এমন একটা ঠাঁই আছে তার, যুদ্ধশেষে যেখানে ফিরে সে আসতে পারে। আলেক্সেই'র মনে হত যে চিঠিগুলো অন্য কোন ওলিয়ার লেখা। ওর ফটোটা দেখলেই আলেক্সেই'র মনে হয় হাওয়া বইলেই ফুল-তোলা ফ্রক পরনে মেয়েটি ভেসে যাবে, পাকা ডানডেলিওয়নের উড়ন্ত বীজের মত। কিন্তু চিঠিগুলো আসছে একটি নারীর কাছ থেকে -- অন্তঃকরণ যার ভালো, ভালোবাসে যে, প্রিয়র ফিরে আসার অপেক্ষায়, আকাঙ্ক্ষায় দিন কাটছে যার। তাতে একসঙ্গে খুসি আর বিষণ্ণ লাগে আলেক্সেই'র; অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুসি লাগে, বিষণ্ণ লাগে কেননা ওর ধারণা ওলিয়ার প্রেমে তার কোন অধিকার নেই। সত্যি, এখন ত ওলিয়ার চেনা সেই রোদে-তামাটে বলিষ্ঠ যুবক আর সে নয়, আরকাশা খুড়োর মত পঙ্গু সে, সেটা ওকে লিখে জানাবার সাহস পর্যন্ত তার নেই। সত্যি কথা লিখলে রুগ্না মা মারা যাবেন সেই ভয়ে লেখেনি, তাই ওলিয়াকেও ঠকাতে বাধ্য হচ্ছে সে, আর যত দিন যাচ্ছে ততই প্রতি চিঠিতে মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়ছে।

তাই কামিশিন থেকে চিঠি এলে পরস্পরবিরোধী অনুভূতি জাগে তার মনে — আনন্দ আর বিষাদ, আশা আর উৎকণ্ঠা — চিঠিগুলো তাকে একই সঙ্গে খুসি করে আর যন্ত্রণা দেয়। মিথ্যে কথা বলেছে একবার, এখন নতুন নতুন মিথ্যে কথা তাই বানাতে হয়, কিন্তু এ ধরনের উদ্ভাবনে

পারদর্শিতা নেই তার। সেইজন্য ওলিয়াকে লেখা তার চিঠিগুলো হয় সংক্ষিপ্ত নীরস।

"আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" লেখা আরো সহজ মনে হয় আলেক্সেই'র। মেয়েটি সহজ সরল আর আত্মত্যাগী। অস্ত্রোপচারের পরে হতাশাচ্ছন্ন একটি মুহূর্তে কাউকে নিজের দুঃখ জানাবার তাগিদ বোধ করে আলেক্সেই, মেয়েটিকে লেখে একটি দীর্ঘ বিষণ্ণ চিঠি। বেশী দিন যেতে না যেতেই উত্তর এল, লেখার খাতা থেকে ছেঁড়া একটা পাতা, তাড়াতাড়িতে লেখা চিঠি, পঙক্তিগুলো বিস্ময়ের চিহ্নে কীর্ণ, যেন বিস্কুটের উপরে যোয়ানের বীজ ছড়ানো, তার উপর সমস্ত চিঠিটা অশ্রু জলের দাগে অলঙ্কৃত। মেয়েটি লিখেছে সামরিক আইনকানুনের বাধা না থাকলে সমস্ত কিছু এক্ষুণি ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে চলে আসত, দেখাশুনো করত ওকে, ওর দুঃখের ভাগীদার হত। বেশী করে চিঠি লিখতে অনুনয় করেছে। এলোমেলো চিঠিটাতে সরল শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসের আতিশয্য, পড়ে বিষণ্ণ লাগল আলেক্সেই'র; ওলিয়ার চিঠিগুলো মেয়েটি ওকে দেবার সময় ওলিয়া তার বিবাহিতা বোন বলেছিল বলে নিজেকে গালি দিল সে। ওরকম মেয়েকে ঠকানো কখনো উচিত নয়। তাই খুলে লিখল যে কামিশিনে একটি মেয়ে আছে, তাকে ও ভালোবাসে, তাকে কিম্বা মা'কে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানাবার সাহস তার হয়নি।

"আবহাওয়া সার্জেণ্টের" উত্তর এল খুব তাড়াতাড়ি, যুদ্ধের সময়ে এত তাড়াতাড়ি চিঠি আসাটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সে লিখেছে যে চিঠিটা পাঠাচ্ছে একটি মেজরের হাতে, যুদ্ধ-সাংবাদিক সে, ওদের বিমান-ঘাঁটিতে গিয়েছিল। মেজরটি চেষ্টা করে ওর মন পাবার, লোকটি হাসিখুসি খাসা, কিন্তু তাকে পাত্তা দেয়নি সে। চিঠির সুরে বোঝা যায় মেয়েটি হতাশ হয়েছে, চটেছেও, নিজের মনোভাব ঢাকার চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য করেনি, চেষ্টাটা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। সেবার সত্যি কথা না জানানোর জন্য ধমকে বলেছে যে ওকে যেন এবার বন্ধুভাবে গণ্য করে আলেক্সেই। চিঠিতে পুনশ্চ একটি, কালিতে নয়, পেন্সিলে, তাতে আশ্বাস দিয়েছে যে সে "কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের" বিশ্বস্ত বন্ধু; যদি "কামিশিনের সেই মেয়েটি" ওকে ছেড়ে দেয় (যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনের জায়গায় মেয়েদের হালচাল কী সেটা জানতে ওর বাকি নেই), কিম্বা ওকে আর না ভালোবাসে, অথবা ওর পঙ্গুতায় বিরূপ হয়, তাহলে আলেক্সেই যেন "আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" না ভোলে; যে হোক সব সময়ে ওকে সত্যি কথা জানানো চাই। পত্রবাহকটির সঙ্গে গুছিয়ে মোড়া একটি পার্সেল, তাতে

রয়েছে পারাস্যুট সিল্কের তৈরী, আলেক্সেই'র নামের আদ্যাক্ষর দেওয়া কয়েকটি কাজ-করা রুমাল, বিমানের ছবি আঁকা তামাকের থলে একটা, একটা চিরুণী, এক বোতল "ম্যাগনোলিয়া" ও-ডি-কলোন, একটুকরো স্নানের সাবান। এই দুঃসময়ে বাহিনীতে কার্যরত মেয়েদের কাছে জিনিসগুলোর দাম যে কত আলেক্সেই'র জানা। ও জানত যে উপহার হিসেবে পাওয়া এক টুকরো সাবান কিম্বা ও-ডি-কলোনের একটা বোতল ওরা মহাযত্নে রাখে রক্ষাকবচের মত, যুদ্ধের আগেকার দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় জিনিসগুলো। জিনিসগুলোর মূল্য সে জানে বলে বিছানার ধারের তাকে সেগুলো সাজিয়ে রাখার সময়ে যুগপৎ আনন্দিত ও লজ্জিত বোধ করল আলেক্সেই।

এখন স্বভাবসিদ্ধ উদ্যমে নিজের পঙ্গু পাদুটোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে আলেক্সেই, আবার আকাশে উড়ে লড়াই করার স্বপ্ন দেখছে বলে পরস্পরবিরোধী মনোভাবে সে পীড়িত। ওলিয়ার প্রতি ওর অনুরাগ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে কিন্তু চিঠিতে সত্যি কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে অর্ধ-সত্য, আর এদিকে খোলাখুলি সব কথা জানাচ্ছে প্রায় অচেনা একটি মেয়েকে। ব্যাপারটায় তার বিবেক ভারাক্রান্ত।

কিন্তু দৃঢ় শপথ করেছে আলেক্সেই যে স্বপ্ন বাস্তব হবার আগে, লড়বার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে আবার বাহিনীতে যোগ দেওয়া না পর্যন্ত প্রেমের কথা লিখবে না ওলিয়াকে। এটা তার লক্ষ্যে পৌঁছবার দুর্মর উৎসাহকে আরো শক্তি জোগাল।

১১

মে মাসের প্রথম দিনে মারা গেল কমিসার।

কী ভাবে অন্তিম মুহূর্তটি এল কেউ জানে না। সকালে মুখহাত ধোওয়া আর চুল আঁচড়ানোর পর যে মেয়েটি তার দাড়ি কামাচ্ছিল তাকে কমিসার জিজ্ঞেস করল আবহাওয়া কেমন, উৎসবের এই দিনে কেমন চেহারা মস্কোর। রাস্তা থেকে ব্যারিকেড সরানো হচ্ছে শুনে খুসি হল কমিসার, বসন্তের এই অদ্ভুত দিনটিতে কোন সমাবেশ বা শোভাযাত্রা হবে না বলে দুঃখ করল, উৎসবের দিনে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা মুখের ফুটফুট দাগগুলো ঢাকার দারুণ একটা চেষ্টা করেছে বলে তার পেছনে লাগল। আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে কমিসারকে, সবায়ের আশা যে সঙ্কট কাটিয়ে উঠে হয়ত এখন আরোগ্যের পথে চলেছে সে।

খবরের কাগজ আর পড়তে পারত না বলে কয়েক দিন হল কমিসারের বিছানার পাশে একটি ইয়ার-ফোন লাগানো বেতার যন্ত্র রাখা হয়েছিল। বেতার টেকনিকের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল গভজ্‌দেভ কিছু একটা করাতে এখন সারা ওয়ার্ডটাই বেতারে গান আর কথাবার্তা শুনতে পায়। নটা বাজল, ঘোষণাকারীটি — সে-সব দিনে সারা পৃথিবী তার গলা চিনত আর তার বার্তা শুনত — দেশরক্ষামন্ত্রীর অর্ডার পড়তে শুরু করল। দেয়ালে ঝোলানো কালো ডিস্কদুটোর দিকে গলা বাড়িয়ে সবাই নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে, পাছে কোন কথা হারিয়ে যায়। এমন কি "মহান লেনিনের অজেয় পতাকার তলে সবাই অগ্রসর হও জয়লাভের দিকে" — কথাগুলি উচ্চারিত হবার পরেও ওয়ার্ডে গভীর স্তব্ধতা।

'কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার, এটা দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে দিন ত...' কুকুশকিন বলল; তারপর হঠাৎ বিভীষিকায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কমরেড কমিসার!'

ফিরে তাকাল সবাই। আড়ষ্ট কঠিন টান হয়ে শুয়ে আছে কমিসার, ঘরের ছাতের একটি জায়গাতে অনড় চোখদুটো নিবদ্ধ। বিবর্ণ শীর্ণ মুখে প্রশান্ত গম্ভীর মহিমাময় ছাপ।

'মরে গিয়েছে!' তার বিছানার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে চেঁচিয়ে বলল কুকুশকিন। 'মরে গিয়েছে!'

ওয়ার্ডের ভীতিবিহ্বল পরিচারিকাদের দৌড়োদৌড়ি, নার্সের এদিক ওদিক ছুটোছুটি। ঝড়ের মতন এলেন হাউস সার্জন, ওভারঅলটার বোতাম তখনো আঁটা হয়নি। বদরাগী অমিশুক লেফ্‌টেনাণ্ট কনস্তান্তিন কুকুশকিন মৃত কমিসারের দেহের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, কারো কথায় কান দিচ্ছে না, কম্বলে মুখ গোঁজা শিশুর মত ফোঁপানি আর কান্নার প্রবল আক্ষেপে তার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে...

সেই দিন সন্ধ্যায় নতুন একটি রোগীকে আনা হল প্রায় অর্ধেক-খালি ৪২নং ওয়ার্ডে। সে হল মেজর পাভেল ইভানভিচ স্ত্রুচকভ, মস্কো রক্ষা-বাহিনীর জঙ্গী বিমান ডিভিশনের লোক। উৎসবের দিনে ফ্যাশিস্টরা মস্কোতে বড়ো গোছের বিমান হামলা চালানোর সংকল্প করে, কিন্তু সমান্তরাল কয়েকটি দলে অগ্রসর ওদের বোমারু বিমানগুলোকে বাধা দিয়ে ভীষণ যুদ্ধের পর পদসল্‌নেচ্‌নায়া অঞ্চলের কোথাও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। শুধু একটা "ইয়ুনকারস" বেরিয়ে এসে অনেক উঁচুতে থেকে মস্কোর দিকে

এগোয়। যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেটাকে যে কোন প্রকারে করতে স্পষ্টত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিমানের লোকগুলো, ওদের উদ্দেশ্য উৎসব আনন্দে বাদ সাধা। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে হঠাৎ স্ত্রুচকভ দেখল বিমানটা সরে পড়ছে, তৎক্ষণাৎ সেটাকে ধাওয়া করে সে। স্ত্রুচকভের হাতে চমৎকার একটি সোভিয়েত বিমান, সে সময়ে জঙ্গী বিমানবাহিনীতে ওধরনের বিমান দেওয়া হচ্ছিল। অনেক উঁচুতে, মাটি থেকে প্রায় ছ কিলোমিটার উপরে, মস্কোর উপকণ্ঠ যখন এসে পড়েছে, জার্মান বিমানটির কাছে এসে পড়ে সে। নিপুণ ফিকিরে বিমানটির পিছনে গিয়ে দৃষ্টিপথে ওটা পরিষ্কার আসাতে কামানের ঘোড়া টিপল। টিপল বটে, কিন্তু সেই পরিচিত খরখর আওয়াজ কানে না আসাতে অবাক হয়ে গেল। ঘোড়াটা কাজ করছে না।

জার্মান বিমানটি একটু আগে। পিছনে লেগে রইল সে, এমন ভাবে যাতে বিমানটার পিছনদিককার জোড়া মেসিনগানের গুলি নিজের বিমানে না লাগে। মে'র দীপ্ত সকালের পরিষ্কার আলোয় দিগন্তে মস্কোর আভাস, কুয়াশায় আচ্ছন্ন ধূসর পুঞ্জ। দুঃসাহসী একটি জিনিস করার সংকল্প করল স্ত্রুচকভ। বুকপেটি খুলে ফেলে, ককপিটের ছাদটা তুলে দিয়ে, যেন লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন ভাবে টান করল নিজের শরীরকে। বোমারুটার সঙ্গে সমান লাইনে নিয়ে এল নিজের বিমানকে; নিমেষের জন্য একটার পিছনে একটা এমন ভাবে উড়ল যে মনে হল দুটো কোন অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা। "ইয়ুনকারসটার" ককপিটের স্বচ্ছ ছাদ দিয়ে স্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে বুরুজের জার্মান মেশিনগানারের চোখদুটো ওর প্রতিটি ফিকির লক্ষ্য করছে, নিরাপদ জায়গা থেকে ওর বিমানের ডানাটা একটু বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় আছে সে। স্ত্রুচকভ দেখল উত্তেজনায় নিজের হেলমেট খুলে ফেলল জার্মানটা, এমন কি কপালের উপরে গোছায় ঝুলে পড়া তার লম্বা কটা চুল পর্যন্ত তার চোখে পড়ল। ওর দিকে ঘোরানো, বড়ো মেসিনগানের কালো নাকদুটো জীবন্ত জিনিসের মত নড়ছে; সুযোগের অপেক্ষায় নিরস্ত্র লোকের দিকে পিস্তলের নিশানা করেছে কোন ডাকাত, হঠাৎ সেরকম লোকের মত নিজেকে মনে হল স্ত্রুচকভের, আর এই অবস্থায় নিরস্ত্র সাহসী লোকে যা করে ঠিক তাই করল সে -- ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপরে। জমিতে হাতাহাতি লড়াই চলে, সেরকম ভাবে নয় অবশ্য; শত্রু বিমানটির পিছনের দিকে নিজের বিমানের ঝকঝকে প্রপেলারের বৃত্তটি লাগাবার জন্য ঝটকায় এগিয়ে গেল সে।

সংঘাতের শব্দ তার কানে আসেনি। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ধাক্কায় উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মনে হল আকাশ ডিগবাজি খাচ্ছে। মাথার উপরে ঝলকে চলে গেল মাটি, গেল থেমে, তারপর তীরবেগে এগিয়ে এল ওর দিকে, উজ্জ্বল সবুজ আর ঝকঝকে মাটি। পারাস্যুট খুলে ফেলল স্ত্রুচকভ, দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে জ্ঞান হারাবার আগে চোখের কোণে পড়ল "ইয়ুনকারসটার" চুরোট-আকৃতি দেহ, লেজটা নেই, হেমন্ত হাওয়ায় ছিন্ন ম্যাপেল পাতার মত ঘুরতে ঘুরতে সেটা সবেগে পেরিয়ে গেল তাকে। পারাস্যুটের দড়িতে অসহায়ভাবে ঝুলতে ঝুলতে, বাড়ির ছাতে জোর ধাক্কা লেগে, মস্কোর উপকণ্ঠে উৎসবমুখর একটি রাস্তায় অচেতন অবস্থায় পড়ল স্ত্রুচকভ। ওখানকার লোকেরা নিচে থেকে দেখেছিল কী অদ্ভুতভাবে জার্মান বিমানটিকে ধাক্কা দিয়ে সে ফেলে দেয়। ওকে তুলে নিয়ে সবচেয়ে কাছের বাড়িতে নিয়ে যায় ওরা। আশেপাশের রাস্তা ভিড়ে ভিড়াক্রান্ত হয়ে গেল, যে ডাক্তারকে ডাকা হয় তিনি অতিকষ্টে গন্তব্যস্থানে পৌঁছলেন। ছাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ফলে ওর হাঁটুর হাড়ে চোট লেগেছে।

"শেষ খবর" এর বিশেষ ঘোষণায় মেজর স্ত্রুচকভের অসমসাহসিকতার কথা বলা হল বেতারে। সহরের সেরা হাসপাতালে ওকে নিয়ে যেতে মস্কো সোভিয়েতের সভাপতি নিজে এলেন। যখন স্ত্রুচকভ ওয়ার্ডে পৌঁছল তখন ওর পিছনে পিছনে আর্দালিরা নিয়ে এল ফুল ফল আর চকোলেট -- মস্কোর কৃতজ্ঞ অধিবাসীদের উপহার।

দেখা গেল স্ত্রুচকভ বেশ হাসিখুসি মিশুকে লোক। ওয়ার্ডের দোরগোড়া পেরোতে না পেরোতে রোগীদের কাছে খোঁজখবর নেওয়া হয়ে গেল, এখানকার ভক্ষণ কী রকম, বিধিগুলো কড়া কিনা, ফুটফুটে চেহারার নার্স আছে কিনা। আর যখন হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছে তখন বাহিনীর ক্যানটিন সম্বন্ধে একটি মজার গল্প বলল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে, ভালো চেহারার জন্য তাকে অসঙ্কোচে তারিফ করল। নার্স চলে গেলে তার দিকে চোখ ঠেরে স্ত্রুচকভ বলল:

'খাসা মেয়েটি! কড়া বুঝি? ধর্মভয় জাগিয়ে দেয়? কুছ পরোয়া নেই। যুদ্ধ কৌশলের কথা কিছু ত জানা আছে তোমাদের? যে কোন দুর্গ জয় করা যায়, মেয়েরা ত কোন ছার!' কথাটা বলে বেশ জোরে হেসে উঠল স্ত্রুচকভ।

পুরোনো রোগীর মত ওর হাবভাব, যেন হাসপাতালে বছর খানেক কাটিয়েছে। প্রত্যেককে প্রথম থেকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করল সে। নাক

ঝাড়বার ইচ্ছে হওয়াতে বিনা লৌকিকতায় মেরেসিয়েভের পারাস্যুট সিল্কের রুমালের একটা তুলে নিল, যে রুমালগুলো সযত্নে বানিয়েছিল "আবহাওয়া সার্জেণ্ট"।

'প্রেয়সীর পাঠানো বুঝি?' চোখ ঠেরে আলেক্সেইকে জিজ্ঞেস করে বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখল রুমালটা। 'অনেক রুমাল তোমার, যদি অনেক নাও হয়, তোমার প্রেয়সী খুব খুসির সঙ্গে আর একটা বানিয়ে দেবে তোমার জন্য।'

রোদে-তামাটে গালে গোলাপী আভাস ফেটে বেরোচ্ছে, তবুও আর নবীন মনে হয় না তাকে। চোখের কোণ থেকে শুরু করে গভীর বলিরেখা রগ পর্যন্ত আগাছার মত বিস্তৃত, ওকে দেখলেই মনে হয় ঝানু সৈনিকের কথা -- যেখানেই কিট-ব্যাগ, মুখ ধোবার জায়গার উপরের তাকে যেখানটায় সাবানের বাক্স আর টুথব্রাস রাখা হয় সেখানটাই নিজের বাড়িঘরদোর ভাবতে অভ্যস্ত সে। ওয়ার্ডে সে আনল বেশ হৈচৈ আর ফুর্তির ভাব, আর যে-ভাবে আনল তাতে চটল না কেউ, বরঞ্চ সবায়ের মনে হল ও যেন কতকালের চেনা লোক। নবাগতকে সবায়ের বেশ পছন্দ, শুধু মেয়েদের প্রতি ওর স্পষ্ট দুর্বলতা মেরেসিয়েভের কেমন যেন খারাপ লাগল। প্রসঙ্গত, সে-দুর্বলতা গোপন করার কোন চেষ্টা স্ত্রুচকভ করেনি, যে কোন ছুতো পেলেই মেয়েদের আলোচনা শুরু করত সে।

পরের দিন কমিসারের সমাধি।

জানলার তাকে বসে মেরেসিয়েভ, কুকুশকিন আর গভজ্‌দেভ প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে আছে। গোলন্দাজ বাহিনীর এক দল ঘোড়া কামান-গাড়িটাকে টেনে নিয়ে এল, বাদকেরা দাঁড়াল সার বেঁধে, রোদে চকচক করছে বাদ্যযন্ত্রগুলি, একদল সৈনিক মার্চ করে এল। ওয়ার্ডে এসে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা জানলা থেকে সরে আসতে রোগীদের আদেশ দিল। যথারীতি শান্ত আর তৎপর দেখাচ্ছে ওকে, কিন্তু কথা বলার সময়ে ওর গলা যে কেঁপে উঠল সেটা মেরেসিয়েভের কাছে গোপন রইল না। নতুন রোগীটির জ্বর দেখতে এসেছে ও, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে শবযাত্রার একটি সুর বাজাতে শুরু করল বাদকেরা। ফ্যাকাশে হয়ে গেল নার্সের মুখ, হাত থেকে পড়ে গেল থার্মোমিটার, পারার ছোট ছোট চকচকে বিন্দু পার্কেটের মেঝেতে পড়ল ছড়িয়ে। দুহাতে মুখ ঢেকে ওয়ার্ড ছেড়ে ছুটে চলে গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা।

'কী ব্যাপার? ওর মনের মানুষ ছিল বুঝি লোকটা?' বিষণ্ণ সঙ্গীতের সুর জানলা থেকে ভেসে আসছে সে দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল স্ত্রুচকভ।

উত্তর দিল না কেউ।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওরা, কামান-গাড়ির উপরে খোলা লাল শবাধার গেট পেরিয়ে রাস্তায় পেঁছিল। ফুল আর ফুলের মালার স্তূপের মাঝখানে শোয়ানো কমিসারের দেহ। কুশনে আঁটা তার সম্মান-চিহ্নগুলো কামান-গাড়ির পিছনে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে লোকজন — একটা, দুটো, পাঁচটা, আটটা সম্মান-চিহ্ন। মাথা নিচু করে পিছু পিছু যাচ্ছে জেনারেলরা। তাদের মধ্যে আছেন জেনারেলের আর্মিকোট পরনে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, কিন্তু কেন জানি খোলা মাথায়। তারপর, অন্যদের থেকে একটু দূরে, মন্থরগতি সৈনিকদের সামনে খোলা মাথায় ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, পরনে শাদা ওভারঅল, প্রায়ই হোঁচট খাচ্ছে, বোঝা গেল সামনের কিছু তার চোখে পড়ছে না। গেটে কে যেন তার কাঁধে একটা কোট চাপিয়ে দিয়েছিল কিন্তু হাঁটবার সময়ে কোটটা মাটিতে পড়ে গেল, কোটটা যাতে পদদলিত না হয় সে জন্য ওর পিছনে অগ্রসর সৈনিকরা সারি ভাঙ্গল।

'কে ও, দোস্ত?' মেজর জানতে চাইল।

উঠে জানলা দিয়ে দেখতে সে-ও চায়, কিন্তু পাদুটো বন্ধফলক দিয়ে বাঁধা।

চোখের বাইরে চলে গেল দলটা। নদীর কাছ থেকে আসছে গম্ভীর সঙ্গীতের বিষণ্ণ কলি, চাপা আর দূর ধ্বনি, বাড়ির দেয়ালে লেগে অস্ফুট প্রতিধ্বনি উঠছে। খোঁড়া দৌবারিকা লোহার গেট বন্ধ করে দিতে ইতিমধ্যেই এসেছে, কিন্তু ৪২ নং ওয়ার্ডের সহবাসীরা তখনো জানলায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে কমিসারকে তার অন্তিম যাত্রায়।

'লোকটা কে বলছ না কেন? তোমরা সবাই পাথর বনে গিয়েছ মনে হচ্ছে!' অধৈর্যভাবে মেজর বলল, তখনো উঠে জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সে।

অবশেষে শুকনো চিড়-খাওয়া গলায় জবাব দিল কুকুশকিন:

'মানুষের মত একজন মানুষের... একজনের বলশেভিকের অন্ত্যেষ্টি।'

"মানুষের মত মানুষ" উক্তিটা গভীর দাগ কাটল মেরেসিয়েভের মনে।

এর চেয়ে ভালো বর্ণনা কল্পনা করা যায় না। ওরও প্রবল বাসনা হল মানুষের মত মানুষ হবার, অন্তিম যাত্রায় যাকে এইমাত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মত হবার।

১২

কমিসারের মৃত্যুর পরে ৪২ নং ওয়ার্ডের আবহাওয়া একেবারে বদলে গেল। হাসপাতাল ওয়ার্ডে মাঝেমাঝে বিষণ্ণ স্তব্ধতা নামে, বিরস চিন্তায় সবাই হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, বুক ভারী হয়ে ওঠে; ছোট্ট দরদী কথায় সে স্তব্ধতা দূর করার লোক আর নেই। গভজ্‌দেভের নৈরাশ্য হালকা ঠাট্টায় ভাঙ্গার কেউ নেই, মেরেসিয়েভ উপদেষ্টাহীন, কুকুশকিন গজগজ করেই চলে, না চটিয়ে হালকা কথায় তাকে দাবাবার কেউ নেই। যে চুম্বক এতদিন বিভিন্ন স্বভাবের লোককে আকর্ষণ করে একত্র করত সে চুম্বক অদৃশ্য।

কিন্তু সেটার প্রয়োজনও এখন ততটা নেই। চিকিৎসা আর সময় কাজ দিয়েছে। সবাই তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে, হাসপাতাল ছাড়ার সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই কমে যাচ্ছে রোগ নিয়ে আলোচনা। হাসপাতালের বাইরে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে, নিজের নিজের সামরিক দল কী ভাবে তাদের অভ্যর্থনা করবে, কী কাজ করতে হবে, সেই ভাবনায় সবাই বিভোর। অভ্যস্ত সামরিক জীবনে ফিরে যেতে সবায়ের আকাঙ্ক্ষা, হাসপাতাল ছেড়ে গিয়ে সময়মত নতুন আক্রমণে যোগ দেবার ব্যাকুল আগ্রহে প্রত্যেকের হাত যেন সুড়সুড় করছে। আক্রমণ যে শুরু হবে, আকাশে আসন্ন ঝড়ের মত তার আভাস, রণাঙ্গনে হঠাৎ নামা স্তব্ধতা থেকেও আঁচ করা যায় সেটা।

হাসপাতাল থেকে বাহিনীতে কাজে ফিরে যাওয়া সৈনিকের পক্ষে অসাধারণ কিছু ব্যাপার নয়। মেরেসিয়েভের পক্ষে কিন্তু সেটা একটা সমস্যা। পায়ের পাতা নেই, দক্ষতা আর শিক্ষা তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে কি? জঙ্গী বিমানের ককপিটে সে কি আবার চড়তে পারবে? লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ আগ্রহে আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কাজ করে যাচ্ছে সে। ব্যায়ামের সময় আস্তে আস্তে বাড়িয়েছে, পাদুটোকে খাটায়, তালিমি ব্যায়াম, সাধারণ সব ব্যায়াম রীতির চর্চা করে সে সকাল আর সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা ধরে। তবুও যথেষ্ট মনে হয় না তার। বিকেলেও ব্যায়াম শুরু করল আলেক্সেই। ওর দিকে অপাঙ্গে তাকাত স্ত্রুচকভ, চোখে চটুল ইয়ার্কির ঝিলিক, আর ঘোষণা করত অধিকারীর মত:

'আর এখন, সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই প্রহেলিকাটি, ওঝা-পণ্ডিত, সাইবেরিয়ার জঙ্গলে অতুলনীয় আলেক্সেই মেরেসিয়েভ নানা খেলা এখন দেখাবেন!'

দারুণ উৎসাহে ব্যায়াম চালাত আলেক্সেই, তার ব্যায়াম রীতিতে সত্যি সত্যি এমন কিছু ছিল যাতে ওকে দেখাত ওঝার মত। শরীরটা যেভাবে অবিরাম নোয়াত আর সোজা করত, ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাত, ঘাড় আর হাতের ব্যায়াম পেণ্ডুলামের মত নিয়মিতভাবে আর দৃঢ়চিত্তে করে যেত সেটা দেখলে কষ্ট হত, সে সময়ে ওয়ার্ডের সহবাসীরা যাবা হাঁটাচলা করতে পারে বেরিয়ে যেত করিডরে; আর শয্যাশায়ী স্ত্রুচকভ কম্বলে মাথা ঢেকে চেষ্টা করত ঘুমোবার। ওয়াডের কেউ অবশ্য বিশ্বাস করত না যে পায়ের পাতা নেই যার তার পক্ষে ওড়া কখনো সম্ভব, কিন্তু অধ্যবসায়ের জন্য সহবাসীকে খাতির করত তারা, ভক্তিও হয়ত, আর সেটা ইয়ার্কি-তামাশায় গোপন রাখত।

প্রথমে যা মনে হয়েছিল তার চেয়ে গুরুতর দাঁড়াল স্ত্রুচকভের হাঁটুর গাঁট ভাঙ্গা। খুব আস্তে আস্তে সারছে সে, পাদুটো বন্ধফলকে আটকানো, আর যদিও ওর সেরে ওঠায় কোন সন্দেহ নেই তবুও "হতচ্ছাড়া গাঁটের হাড়গুলোকে" বাপান্ত করার বিরাম নেই, ওগুলো ভয়ানক জ্বালাচ্ছে ওকে। মেজরের গজগজানি গরগরানি বেড়ে পরিণত হত ক্রোধে। তুচ্ছ কোন বিষয় নিয়ে রাগে প্রায় পাগল হয়ে যেত সে, গালিগালাজ করত সবাইকে, সমস্ত কিছুকে। তখন মনে হত কেউ বোঝাবার চেষ্টা করলেই ওর হাতে মার খাবে। সর্বসম্মতিক্রমে এরকম আক্ষেপের সময়ে ওয়ার্ডের রোগীরা ওকে একলা ছেড়ে দিত, ওদের ভাষায়, "গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিক গে লোকটা"। যুদ্ধে স্নায়বিক বৈকল্য ঘটেছে তার, সেটা কাটিয়ে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরে না আসা পর্যন্ত চুপচাপ থাকত সহবাসীরা।

অধৈর্য ভাবটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ, স্ত্রুচকভের নিজের মতে, ও বাইরে গিয়ে শৌচাগারে সিগারেট খেতে পারে না; করিডরে গিয়ে দেখতে পায় না অস্ত্রোপচারাগারের সেই লাল-চুল নার্সকে, পায়ে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ পরাবার সময়ে মেয়েটির সঙ্গে নাকি তার আড়চোখের বিনিময় হয়েছিল। কথাটা কিছু সত্যি হয়ত। কিন্তু মেরেসিয়েভ লক্ষ্য করল যে ওর খিটখিট ভাবটা ফিরে আসে তখনি যখন হাসপাতালের উপর দিয়ে কোন বিমান উড়ে যায়, কিম্বা কোন অভিনব আকাশ-যুদ্ধের কথা অথবা পরিচিত কোন বৈমানিকের বিক্রমের বর্ণনা রেডিও ও খবরের কাগজে প্রচারিত হয়।

মেরেসিয়েভেরও এরকম সময়ে খিটখিটে অধৈর্য লাগে, কিন্তু সে প্রকাশ করে না সেটা, আর স্ত্রুচকভের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে অন্তরে জয়োল্লাসের একটা অনুভূতি হয় তার। মনে হয়, "মানুষের মত মানুষ' এর যে আদর্শ সে খাড়া করেছে তার একটু কাছে অন্তত আসতে পেরেছে।

নিজের স্বভাব মত আছে মেজর স্ত্রুচকভ। প্রচুর খায়, দিলভরা হাসি, মেয়েদের গল্প করতে ভালোবাসে, মনে হয় যে সে একই সঙ্গে ভালোবাসে আর ঘৃণা করে মেয়েদের। ফ্রণ্টের পশ্চাদ্ভাগে যে সব মেয়েরা, কোন কারণে বিশেষ তীব্র নিন্দে করে তাদের।

স্ত্রুচকভের গালগল্প অত্যন্ত ঘৃণা করে মেরেসিয়েভ। ওর কথা শোনার সময়ে মেরেসিয়েভের চোখের সামনে সর্বদাই আসে ওলিয়ার কিম্বা আবহাওয়া কেন্দ্রের সেই মেয়েটির ছবি যার সম্বন্ধে রেজিমেণ্টে একটি গল্প চালু ছিল: ব্যাটেলিয়নের একটি অতি-উৎসাহী সার্জেণ্ট-মেজরকে সে একবার তার গুমটি থেকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে খুঁচিয়ে ভাগায়, উত্তেজনায় আর একটু হলে তাকে গুলি করে বসত। আলেক্সেই'র মনে হত এ ধরনের মেয়েদেরই নিন্দে করছে স্ত্রুচকভ। একদিন মেজর স্ত্রুচকভ একটি গল্প বলে এইভাবে শেষ করল সেটা - "ওরা সবাই সমান," "চক্ষের নিমেষে" ওদের যে কোন কাউকে বাগানো যায়। সক্রোধে গল্পটা শুনল মেরেসিয়েভ, নিজেকে সামলাতে না পেরে, দাঁতে দাঁত চেপে পাণ্ডুর মুখে জিজ্ঞেস করল:

'যে কোন কাউকে?'

'হ্যাঁ, যে কোন কেউ,' নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল মেজর।

ঠিক সে সময়ে ওয়ার্ডে ঢুকল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, রোগীদের মুখে উত্তেজনার ভাব দেখে বিস্মিত বোধ করল।

'ব্যাপার কী?' মাথার রুমালের নিচে এক গোছা চুল কিছু না ভেবে ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করল সে।

'জীবন নিয়ে আলোচনা চলেছে, নার্স! আমাদের ব্যাপার ত এখন বুড়োদের মত কথা বলা ছাড়া আর কিছু করার নেই,' মধুর হেসে জবাব দিল মেজর।

'আর এই মেয়েটি?' নার্স চলে গেলে ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ।

'তোমার কি মনে হয় ও আলাদা মালমশলায় তৈরী?'

'ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার কথা তুলো না!' কঠোর সুরে বলল গভজদেভ। 'আমাদের সঙ্গে থাকত একজন, সে ওকে সোভিয়েত দেবী বলে ডাকত।'

'বাজী রাখবে কেউ?'

'বাজী?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ, ওর কালো চোখ ঝলসে উঠল। 'কী বাজী রাখবে?'

'ধরো পিস্তলের গুলি একটা, আগেকার দিনে অফিসাররা যা করত: তুমি জিতলে আমাকে নিশানা করে ছুঁড়তে পারো, যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমার চাঁদমারি হবে,' হাসতে হাসতে বলল স্ত্রুচকভ, সমস্ত ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চায় ও।

'বাজী? ও রকম বাজী? মনে হচ্ছে ভুলে যাচ্ছ সোভিয়েত অফিসার তুমি। তোমার কথা ঠিক হলে আমার মুখে থুথু দিতে পার,' মেরেসিয়েভের দৃষ্টি ভ্রূকুটিকুটিল। 'কিন্তু দেখো যেন, তোমার মুখে আমাকে থুথু না দিতে হয়।'

'না চাইলে বাজী রাখার কোন দরকার নেই। তোমাদের সবাইকে আমি এমনিতেই দেখিয়ে দেব যে ওকে নিয়ে ঝগড়া করার কোন কারণ নেই।'

সেদিন থেকে স্ত্রুচকভ অত্যন্ত আগ্রহে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার মন কাড়ার চেষ্টা শুরু করল। মজার মজার গল্প বলে হাসাত ওকে, এধরনের গল্প বলায় সে ওস্তাদ। যুদ্ধে অভিজ্ঞতার কথা কোন অচেনা লোককে অসংযতভাবে বলা বৈমানিকের পক্ষে নিয়মবিরুদ্ধ, অলিখিত এই নিয়মটি না মেনে স্ত্রুচকভ নার্সটিকে নিজের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলল, ঘটনাবলী সত্যি সত্যিই বিরাট আর চমৎকার। এমন কি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের পারিবারিক জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা ইঙ্গিতে জানাত, নিজের তিক্ত নিঃসঙ্গতা নিয়ে হা-হুতাশ করত। ওয়ার্ডের সবায়ের অবশ্য জানা ছিল যে ও অবিবাহিত, বিশেষ কোন পারিবারিক দুর্ভোগ ওর নেই।

এটা ঠিক যে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা অন্যদের তুলনায় একটু বেশী মনোযোগ দিত ওকে। মাঝেমাঝে খাটের ধারে বসে শুনত ওর নানা অসমসাহসিকতার কথা। আর স্ত্রুচকভ, নিজের অজ্ঞাতসারে যেন, হাত ধরলে সরিয়ে নিত না সেটা। রাগ জমে উঠছে মেরেসিয়েভের মনে, সমস্ত ওয়ার্ড স্ত্রুচকভের প্রতি ক্ষিপ্ত, ও এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সহবাসীদের কাছে প্রমাণ করবেই যে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা অন্য মেয়েদের মতন। অনুচিৎ কাজটা থামাতে ওকে বিশেষভাবে সাবধান করা হল, হস্তক্ষেপ করাতে ওয়ার্ডের

লোকেরা দৃঢ় সংকল্প হয়েছে, এমন সময় সমস্ত ব্যাপারটি একেবারে অভাবনীয় মোড় নিল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় কাজের সময়ের ফাঁকে ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, কোন রোগীকে দেখতে নয়, এমনি গল্প করতে -- এর জন্যই রোগীরা ওকে বিশেষ পছন্দ করত। গল্প বলতে শুরু করল মেজর, ওর বিছানার পাশে বসল নার্স। কী করে ঘটল সেটা কারো নজরে পড়েনি, কিন্তু হঠাৎ ও এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে উঠল। ফিরে তাকাল সবাই। ভ্রূকুটিকুটিল মুখে, গাল টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, সক্রোধে মেজর স্ত্রুচকভের দিকে তাকিয়ে -- মেজরকে লজ্জিত এমন কি সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে -- নার্স বলল:

'কমরেড মেজর, আপনি রোগী আর আমি নার্স, তা না হলে আপনার গালে চড় মারতাম!'

'শুনুন, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, শপথ করে বলছি কিছু মনে না করেই আমি ওটা করেছি... তাছাড়া, কী এসে যায় ওতে!..'

'তাই নাকি? কী এসে যায় ওতে?' এবারে সক্রোধে নয়, অবজ্ঞায় ওর দিকে তাকাল নার্স। 'বেশ। আর কিছু বলার নেই। শুনতে পাচ্ছেন কথাটা? আর আপনাকে আমি বলছি, আপনার বন্ধুদের সামনেই বলছি, চিকিৎসার দরকার না হলে আমার সঙ্গে আর কখনো কথা বলবেন না। শুভ রাত্রি কমরেডরা!'

ঘর ছেড়ে চলে গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, ভারী পদক্ষেপে, ওর পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক; বোঝা গেল নিজেকে অবিচলিত দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করছে।

মুহূর্তের জন্য সবাই চুপচাপ। তারপর শোনা গেল মেরেসিয়েভের রুদ্ধ উল্লসিত হাসি, আর সবাই একজোটে মেজরকে নিয়ে পড়ল:

'উচিত শিক্ষা মিলেছে তা হলে!'

দীপ্ত চোখে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ: 'আপনার মুখে এখন থুথু দেব না পরে, কী চান আপনি?'

স্ত্রুচকভকে অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করল না সে। সে বলল, দৃঢ় প্রত্যয়ে যে নয়, তা ঠিক:

'হ্যাঁ। আক্রমণ করে হটে আসতে হয়েছে। কিছু এসে যায় না, আবার চেষ্টা করা যাবে।'

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চুপ করে শুয়ে রইল সে, শিস দিচ্ছে কখানো আর যেন নিজের নানা ভাবনার জবাবে মাঝেমাঝে বলে উঠছে "হ্যাঁ"।

ঘটনাটির কয়েকদিন পরে কনস্তান্তিন কুকুশকিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। যাবার সময়ে কোন আবেগ দেখাল না সে, ওয়ার্ডের সহবাসীদের কাছে বিদায় নিতে নিতে শুধু বলল যে হাসপাতালের জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে তার। একটু হেলায় সবাইকে বিদায় জানাল, শুধু মেরেসিয়েভ আর নার্সটিকে অনুরোধ করল যে ওর মায়ের কোন চিঠি এলে সেটা নিয়ে তার রেজিমেণ্টে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

'ওখানে কেমন চলেছে, তোমার বন্ধুরাই বা কী ভাবে তোমাকে অভ্যর্থনা করল, চিঠি লিখে জানিও আমাদের,' বিদায়ের সময়ে বলল মেরেসিয়েভ।

'তোমাকে চিঠি লিখব কেন! আমার কী পরোয়া কর তুমি? লিখব না আমি, মিছিমিছি কাগজ নষ্ট করে কী হবে, আর লিখলেও তুমি ত জবাব দেবে না।'

'যা খুসি তোমার।'

বোঝা গেল শেষ উক্তিটি কানে যায়নি কুকুশকিনের। ফিরে না তাকিয়ে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল সে। হাসপাতালের গেট ছেড়ে বেরিয়ে গেল, বাঁধ ধরে এগিয়ে মোড় ঘুরল, পিছনে একবারও না তাকিয়ে, যদিও ও ভালো করেই জানত যে প্রথা মত ওয়ার্ডে ওর সহবাসীরা সবাই জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে।

যা হোক, আলেক্সেইকে চিঠি লিখল কুকুশকিন, একটু শীগগিরই বলতে হবে। কোন আবেগ নেই, নীরস ঢঙে লেখা। নিজের কথা শুধু লিখেছে যে উইঙের লোকেরা ওকে ফিরে পেয়ে খুসি মনে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা জানিয়ে দিয়েছে যে হালের যুদ্ধে অনেক লোক হতাহত হয়েছে, সেজন্য অভিজ্ঞ যে কোন কাউকে ফিরে পেলে ওরা অবশ্যই খুসি হয়। হতাহতের একটি ফিরিস্তি দিয়েছে কুকুশকিন, লিখেছে যে বিমান-ঘাঁটিতে এখনো মেরেসিয়েভের কথা বলে। আর উইং-কম্যাণ্ডার, পদোন্নতির ফলে যিনি এখন লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেল, মেরেসিয়েভের ব্যায়াম বিদ্যা আর বিমান বাহিনীতে ফিরে আসার সংকল্পের কথা শুনে বলেছেন, "মেরেসিয়েভ ফিরে আসবে নিশ্চয়ই। কোন গোঁ ধরলে সেটা ছাড়ে না, ও এধরনের লোক।" সেটা শুনে চিফ অব্ স্টাফ বলেন, অসম্ভব যেটা সেটা কেউ করতে পারে না। জবাব দেন উইং-কম্যাণ্ডার যে মেরেসিয়েভের মত লোকের কাছে অসম্ভব বলে কিছু

নেই। বিস্মিত হয়ে আলেক্সেই দেখল যে এমন কি "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" বিষয়েও কুকুশকিন কয়েক ছত্র লিখেছে। লিখেছে যে প্রশ্নবাণে সার্জেণ্টটি তাকে এমন জর্জরিত করে যে বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হয়, "এবাউট টার্ণ, মার্চ!" উপসংহারে কুকুশকিন লিখেছে যে ইউনিটে ফিরে গিয়ে প্রথম দিনেই দুবার বিমান চালায় ও, পাদুটো একেবারে সেরে গিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা নতুন বিমান পাবে—'লাভচ্কিন-৫,' শীগ্‌গিরই এসে পড়বে সেগুলো। সেগুলোকে চালিয়ে দেখেছিল আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো, ওর মতে এগুলোর তুলনায় জার্মানদের সব বিমান বস্তাপচা মাল।

১৩

তাড়াতাড়ি গ্রীষ্ম শুরু হল। সেই পপলারগাছটার শাখা থেকেই উঁকি মারল ৪২ নং ওয়ার্ডে, গাছের পাতাগুলো এখন কঠিন আর উজ্জ্বল। যেন ফিসফিসানি চলেছে নিজেদের মধ্যে এমন অধীরভাবে পাতাগুলো নড়ে। সন্ধ্যার দিকে রাস্তার ধুলোর দরুন তাদের জৌলুষ মিলিয়ে যায়। লাল ফুলের ছড়িগুলো অনেকদিন হল ঝকঝকে সবুজ ঝাড়ে পরিণত হয়েছে, ফেটে গিয়েছে ঝাড়গুলো, হালকা ফেঁসো রোঁয়া পড়ছে তা থেকে। মধ্যাহ্নে, দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে উষ্ণ পপলার রোঁয়া মস্কোর চারিদিকে উড়ে বেড়ায়, খোলা জানলা দিয়ে ঢোকে হাসপাতালে, গরম হাওয়ায় উড়ে দরজায় আর কোণে কোণে লালচে গোছায় জমা হয়।

গ্রীষ্মের একটি শীতল উজ্জ্বল সোনালী সকালে খুব গম্ভীর মুখে ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা; সঙ্গে প্রবীণ ব্যক্তি একজন, স্টিলের চশমা তার দিয়ে বাঁধা, পরনে নতুন, শক্ত করে মাড়-দেওয়া শাদা ওভারঅল, তা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে যে ও পুরোনো কারিগর। শাদা কাপড়ে-মোড়া কী একটা জিনিস ওর হাতে। মেরেসিয়েভের বিছানার পাশে মেঝেতে বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে গম্ভীরভাবে যাদুকরের মত ওটাকে খুলতে শুরু করল লোকটি। চামড়ার মচমচ আওয়াজ শোনা গেল, চামড়ার প্রীতিকর তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো গন্ধে ওয়ার্ড ভরপুর।

বাণ্ডিলটা খোলা হল, দেখা গেল একজোড়া নতুন হলদে কচকচে কৃত্রিম অঙ্গ, নিপুণভাবে মাপসই তৈরী করা। কৃত্রিম অঙ্গদুটোর উপরে রয়েছে

বাহিনীর নতুন বাদামী একজোড়া বুট; বুটজোড়া এত মাপসই যে দেখলে মনে হয় অঙ্গদুটো বুট-পরা জীবন্ত দুটো পা।

'আর একজোড়া গ্যালশ শুধু আপনার দরকার, সেটা পেলেই, ব্যস, আপনি পরে বিয়ে করতে যেতে পারবেন,' চশমার মধ্য দিয়ে নিজের হাতের কাজের তারিফ করতে করতে বলল কারিগর। 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ নিজে ফরমায়েস করেছিলেন। তিনি বলেন, "জুয়েভ, আসল পায়ের চেয়েও ভালো একজোড়া পা বানাও ত," আর দেখুন, জোড়াটা সামনেই রয়েছে! জুয়েভের তৈরী জিনিস। রাজার যুগ্যি!'

নকল পাদুটো দেখে মেরেসিয়েভের অন্তর সংকুচিত হয়ে গেল, কুঁকড়ে জমে গেল; কিন্তু সে ভাবটা বেশীক্ষণ রইল না; ও-দুটো পরে দেখার আর হাঁটার, নিজে নিজে হাঁটার আগ্রহ জয়লাভ করল। কম্বলের তলা থেকে পাদুটো ঝট করে বের করে কৃত্রিম অঙ্গদুটোকে তাড়াতাড়ি পরিয়ে দিতে বলল কারিগরকে। কিন্তু বুড়ো তাড়াহুড়ো পছন্দ করে না; ও যে-সে লোক নয়, জানাল যে বিপ্লবের অনেক আগে "বড়ো একজন ডিউক" এর জন্য কৃত্রিম পা বানিয়ে দিয়েছিল, ঘোড়দৌড়ের মাঠে ডিউকের পাটি ভেঙ্গে যায়। নিজের কাজে বিশেষ জাঁক তার, ক্রেতাকে জিনিসটা রসিয়ে দিতে চায়।

আস্তিন দিয়ে অঙ্গদুটোকে মুছে ছোট একটা দাগ নখ দিয়ে ঘষে তুলে ফুঁ দিল সে জায়গাটায়, ধবধবে শাদা ওভারঅলে ঝকঝকে করা হল জায়গাটা, তারপর অঙ্গদুটোকে মেঝেতে রেখে নেকড়াটা ধীরেসুস্থে ভাঁজ করে পকেটে রাখল কারিগর।

'চটপট করো, দাদু, পরে দেখা যাক ওদুটোকে,' বিছানার ধারে বসে অধৈর্যভাবে বলল মেরেসিয়েভ।

কাটা, খোলা পাদুটোর দিকে এবার অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকাল মেরেসিয়েভ, ভালোই লাগল দেখে। শক্ত আর পেশল দেখাচ্ছে পাদুটোকে, বাধ্য হয়ে নড়াচড়া বন্ধ করলে যে ধরনের চর্বি সাধারণত জমে ওঠে, সেরকম নয়, কালো চামড়ার নিচে শক্ত পেশী উচ্ছল, কাটা অঙ্গের পেশী যেন নয়, খুব তাড়াতাড়ি চলায় অভ্যস্ত কারোর সুস্থ অঙ্গের পেশীর মত!

'"চটপট করো, চটপট করো," বলার মানেটা কী? বলাটা যত সহজ করাটা তত নয়,' গজগজ করল বুড়ো। 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আমাকে বলেন, "জুয়েভ, তোমার সারা জীবনের সেরা একটা জোড়া বানাও ত। লেফ্‌টেনাণ্টটি," তিনি বলেন, "পায়ের পাতা না থাকা সত্ত্বেও বিমান চালাতে

চায়।" আর তাই বানিয়েছি আমি! দেখো দুটোকে! ওদুটো পরে শুধু হাঁটা নয়, এমন কি বাইক চড়তে আর মেয়েদের সঙ্গে পোলকা নাচতেও পারবে... খাসা জিনিস, সত্যি বলছি!'

কৃত্রিম অঙ্গটির নরম পশমী খাপে আলেক্সেই'র ডান পাটা ঢুকিয়ে দিল সে, ফিতে দিয়ে শক্ত করে সেটাকে বেঁধে, এক পা হটে, তারিফ করে চুকচুক শব্দ করল।

'খাসা বুট! পায়ে ঠিক হয়েছে ত? কোন জায়গায় বিঁধছে না, বিঁধছে কি? মনে ত হয় বিঁধছে না! সারা মস্কোতে জুয়েভের চেয়ে ভালো কারিগর কোথাও পাবে না!'

নিপুণ হাতে কারিগর অন্যটি পরিয়ে দিল মেরেসিয়েভের পায়ে, কিন্তু ফেট্টি বেঁধে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ ঝটকায় বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে মেঝেতে পা রাখল মেরেসিয়েভ। ভারী, ধপাস একটা শব্দ। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে মেরেসিয়েভ বিছানার ধারে মেঝেতে সটান পড়ে গেল।

এত অবাক হয়ে গেল বুড়ো কারিগর যে চশমাজোড়া কপালে উঠল। ওর খরিদ্দার যে এত চপল হবে আশা করেনি সে। মেঝেতে অসহায় অসাড়ভাবে শুয়ে আছে মেরেসিয়েভ, বুট-পরা কৃত্রিম পাদুটো ফাঁক করে ছড়ানো। হতবুদ্ধি ব্যথিত ভীত ভাব মুখে। সত্যিই কি নিজেকে ঠকাতে চেয়েছিল সে?

বিস্ময়ে দুটো হাত জুড়ে ছুটে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, ধরাধরি করে কারিগর আর সে আলেক্সেইকে তুলে বসিয়ে দিল বিছানায়। আলেক্সেই বসে রইল অবশ বিরসভাবে, মূর্তিমান হতাশার মত।

'ওহে বাপু, এরকম কক্ষণো কোরো না আর!' সমঝিয়ে বলল কারিগর। 'লাফের মত লাফ বটে, যেন পাদুটো সত্যিকারের! তাহলেও বাপু, মুষড়ে পড়া তোমার চলবে না। কী করে হাঁটতে হয় আবার শিখতে হবে, গোড়া থেকে শুরু করে। তুমি যে সৈনিক সেটা বেমালুম ভুলে যাও। নেহাৎ বাচ্চা তুমি, হাঁটাচলা শিখতে হবে, ধীরে ধীরে প্রথমে ক্রাচ ধরে, তারপর দেয়াল ধরে, আর শেষে লাঠি। ঝট করে সব একসঙ্গে করা চলবে না, আস্তে আস্তে করতে হবে। পাদুটো ভালো, কিন্তু তোমার আসল পা ত নয়। তোমার মা-বাপ যে দুটো ঠ্যাং তোমাকে দিয়েছিল তার জোড়া আর কোথায় মিলবে!'

বেয়াড়া লাফটার পরে পাদুটোয় বেশ ব্যথা, তাহলেও তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম অঙ্গদুটো আবার পরে দেখবার আগ্রহ আলেক্সেই'র। ওরা এ্যালুমিনিয়ামের দুটো হালকা ক্রাচ নিয়ে এল। ডগাটা মেঝেতে চেপে, প্যাডদুটো বগলের

নিচে দিয়ে ধীরে ধীরে আর সাবধানে বিছানা থেকে নেমে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল আলেক্সেই। আর বাস্তবিকই সে পা ফেলল শিশুর মত, যে সবেমাত্র হাঁটতে শিখছে, সহজাতভাবে জানে যে হাঁটতে পারে, কিন্তু দেয়ালটা ছেড়ে দেবার ভরসা নেই। শিশুর বুকে তোয়ালে জড়িয়ে মা কিম্বা ঠাকুমা প্রথম পা ফেলতে শেখাচ্ছে, ঠিক সেরকমভাবে আলেক্সেইকে দুধার থেকে সাবধানে ধরল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা আর বুড়ো কারিগর। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে, কৃত্রিম অঙ্গদুটো আর পায়ের সন্ধিস্থলে অসম্ভব ব্যথা। তারপর ইতস্তত করে একটা ক্রাচ এগিয়ে দিল, তারপর পরেরটা, শরীরের ভার তাদের উপরে দিয়ে, একটার পর একটা পা ফেলল। চামড়ার মচমচ আওয়াজ, মেঝেতে দুটো জোর ঠকঠক শব্দ।

'শুভ যাত্রা, শুভ যাত্রা!' নিশ্বাস চেপে বলল বুড়ো কারিগর।

সাবধানে আরো কয়েক পা এগুল মেরেসিয়েভ। কিন্তু কৃত্রিম পায়ের পাতায় প্রথম কয়েক পা হেঁটে ভয়ানক পরিশ্রম হল, দরজা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে বিছানায় ফিরে এসে মনে হল যেন এক বস্তা চাল ঘাড়ে করে সিঁড়ি ভেঙ্গে চারতলায় নিয়ে গিয়েছে। হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, দরদর ঘাম, চিৎ হয়ে শোবার ক্ষমতা নেই।

'কেমন লাগল ওদুটো, বলো ত? জুয়েভের মত আদমী দুনিয়ায় আছে, সেজন্য ভগবানকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত,' ফিতে খুলে আলেক্সেই'র পাদুটো ছাড়াতে ছাড়াতে দেমাকে বকবক করে চলল বুড়ো। অনভ্যস্ত চাপে পাদুটো একটু ফুলে গিয়েছে। 'মামুলি ওড়া কেন, ওদুটো পরে একদম ভগবানের কাছে উড়ে চলে যেতে পারবে। খাসা হয়েছে, সত্যি বলছি!'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দাদু! খাসা হয়েছে, সত্যি। সেটা ত চোখেই দেখতে পাচ্ছি,' কোনক্রমে বলল আলেক্সেই।

কিছুক্ষণ বুড়ো দাঁড়িয়ে রইল যেন কিছু জিজ্ঞেস কবাব জন্য অস্থির, কিন্তু সাহস হচ্ছে না, অথবা ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা হবে, তার প্রতীক্ষায় আছে। অবশেষে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আস্তে আস্তে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল:

'বিদায় তাহলে। আশা করি ওদুটো তোমার পছন্দসই।' দরজার কাছে তখনো পোঁছয়নি, স্ত্রুচকভ ওকে ডেকে বলল:

'ওহে, বুড়ো! এটা নাও, রাজার যোগ্য পা বানিয়েছ, তার জন্যে ফুর্তি করে পান করা ত চাই!' বুড়োকে কয়েকটা নোট দিল স্ত্রুচকভ।



'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে! পান করার মত ব্যাপার এটা নিশ্চয়ই!' বলল বুড়ো, ওভারঅলের পাড়টা তুলে, যেন কারিগরের এপ্রণ ওটা, টাকাটা পিছনের পকেটে রাখল উচিত গাম্ভীর্যে। 'ধন্যবাদ। এক পাত্র খাব নিশ্চয়ই। আর পাদুটো, সত্যি বলছি, ওদুটো বানাতে প্রাণ দিয়ে খেটেছি। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বলেছিলেন, "জুয়েভ, এটা মামুলি ফরমায়েস নয়। সবচেয়ে ভালো করে করা চাই," কিন্তু জুয়েভ কি কখনো গা ঢিলে দিয়ে কাজ করেছে? ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন আমার কাজে আপনারা খুসি হয়েছেন।'

সেলাম জানিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বুড়ো চলে গেল। খাটের পাশে নতুন পাদুটো, যত তাদের দেখছে মেরেসিয়েভের তত ভালো লাগছে ওদুটোর নিপুণ নক্সা, চমৎকার পালিশ আর লঘুভার। "বাইক চড়ো, পোলকা নাচো, বিমানে ওড়ো, স্বয়ং ভগবানের কাছে উড়ে চলে যাও' করব তাই, সবকিছু করব!" ভাবল আলেক্সেই।

সেদিন ওলিয়াকে একটা লম্বা আর খোশমেজাজী চিঠি লিখল সে। জানাল যে নতুন বিমান নেবার কাজ শেষ হয়ে আসছে, আশা করছে যে হেমন্তে, বড়ো জোর শীতে, বড়ো কর্তারা ফ্রন্টের পিছনে এই বিবস কাজ থেকে মুক্তি দেবে ওকে, কাজটা মোটেই ভালো লাগছে না; তারপর ওরা ওকে ফ্রন্টে, নিজের রেজিমেন্টে পাঠাবে, সেখানে বন্ধুরা এখনো ওকে মনে রেখেছে ওর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় আছে। বিপর্যয়ের পর এই প্রথম খোশমেজাজী চিঠি আলেক্সেইর, এই প্রথম সে প্রেয়সীকে জানাল যে সব সময় তার কথা ভাবে, বিরহে কাতর সে; আর একটু সঙ্কোচে জানাল তার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার কথা, যুদ্ধের শেষে দেখা হবে আবার, তখন দুজনে ঘর বাঁধবে, অবশ্য ওর মন যদি বদলে না যায়। চিঠিটা কয়েকবার পড়ল আলেক্সেই, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষের কটা লাইন সাবধানে কেটে দিল।

সেদিন "আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" লেখা তার চিঠিটাতে ফূর্তি আর আমোদের ভাব যেন উপচিয়ে পড়ছে, অতি-উল্লেখযোগ্য দিনটির সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হল। কৃত্রিম পাদুটো— ওরকম জোড়া কোন লাট কখনো পরেনি -- তাদের একটা বর্ণনা দিল আলেক্সেই, কী করে প্রথম কয়েক পা হেঁটেছে বলল, জানাল বকবকে বুড়ো কারিগরটা কেমন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছে সে যে আলেক্সেই বাইক চড়তে পারবে, পোলকা নাচবে আর সটান বেহেস্ত পর্যন্ত উড়ে যেতে পারবে। তাহলে রেজিমেন্টে আমি যাচ্ছি, আমাকে ভুলে যেও

না, কম্যান্ডাণ্টকে বলে নতুন ঘাঁটিতে আমার জন্য একটা ঘর ঠিক করে রাখতে লিখল আলেক্সেই, মেঝের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে। খাটের নিচে থেকে বেরিয়ে আছে পায়ের চেটোদুটো, যেন কেউ লুকিয়ে রয়েছে। চারদিক চেয়ে আলেক্সেই দেখে নিল কেউ তাকে দেখছে কিনা, তারপর ঝুঁকে ঠাণ্ডা চকচকে চামড়াটায় আদর করে টোকা মারল।

আর একটা জায়গায় ৪২ নং ওয়ার্ডে "রাজার যুগ্যি" একজোড়া কৃত্রিম পাএর আবির্ভাবের কথা নিয়ে ব্যগ্র আলোচনা চলল: জায়গাটা হল সেখানে যেখানে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠক্রমের তৃতীয় কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে। সেখানকার সমস্ত মেয়েরা—সে সময়ে তারাই সবচেয়ে দলে ভারী ৪২ নং ওয়ার্ডের সমস্ত কিছু বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল পাকাপোক্তভাবে। পত্রলেখককে নিয়ে আনিউতার গর্বের সীমা ছিল না; লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভের চিঠিপত্র সবাইয়ের জন্য লেখা না হলেও সবটা কিম্বা খানিকটা চেঁচিয়ে পড়ে শোনাত আনিউতা, অন্তরঙ্গ কথাগুলো অবশ্য বাদ দিয়ে। প্রসঙ্গত, চিঠিপত্র চলতে চলতে অন্তরঙ্গ অংশগুলোর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

পাঠক্রমের তৃতীয় কোর্সের সবাই বীর গ্রিশা গভজ্‌দেভকে ভালোবাসে, বদমেজাজী কুকুশকিনকে পছন্দ নয় তাদের, অদম্য সংকল্পের জন্য সম্ভ্রম করে তারা মেরেসিয়েভকে। কমিসারের মৃত্যু স্বজনবিয়োগের মত লেগেছিল তাদের, গভজ্‌দেভের উচ্ছ্বসিত বর্ণনার ফলে সবাই কমিসারকে বুঝতে পেরেছিল আর ভালোবেসেছিল। যখন খবর এল যে বিরাট প্রাণমুখর মানুষটি আর নেই, তখন চোখের জল সামলাতে পারেনি অনেকে।

হাসপাতাল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় ক্রমশ বেড়ে চলল। সাধারণ ডাকে সন্তুষ্ট নয় ওরা, সে সময়ে সাধারণ ডাকে চিঠিপত্র আসতে বেশ দেরী হত। একটা চিঠিতে গভজ্‌দেভ লিখল, কমিসার বলেছে যে আজকাল চিঠিপত্র গন্তব্যে পৌঁছয় সুদূর তারার আলোর মত। মানুষের জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার চিঠিপত্র ঢিমে তালে চলে অবশেষে যাকে লেখা তার কাছে পৌঁছিয়ে বহুদিন মৃত পত্রলেখকের কথা জানাবে তাকে। বেশ উদ্যোগী আর চটপটে মেয়ে আনিউতা, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান আরো তাড়াতাড়ি কী করে হতে পারে খোঁজখবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত বের করল একটি বয়স্কা নার্সকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক আর ভার্সিল ভার্সিলিয়েভিচের হাসপাতাল, দুটো জায়গাতেই কাজ করে সে।

সেদিন থেকে ৪২ নং ওয়ার্ডে কী ঘটছে তার খবর দ্বিতীয়, বড়ো জোর, তৃতীয় দিনেই পেঁছত বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাড়াও পড়ে যেত চটপট। "রাজার মুর্গি" কৃত্রিম পাদুটো নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হল, প্রতিপাদ্য বিষয়টা হল মেরেসিয়েভ বিমান চালাতে পারবে কি না। যৌবনসুলভ আগ্রহে চলল তর্ক; দুপক্ষেরই সহানুভূতি মেরেসিয়েভের দিকে। জঙ্গী বিমান চালানো জটিল কাজ, সেটা ভেবে নৈরাশ্যবাদীরা বলল মেরেসিয়েভ পারবে না। আর আশাবাদীরা জবাবে বলল যে মানুষ শত্রুকে এড়াবার জন্য গভীর বনে দুসপ্তাহ হামাগুড়ি দেয়, ভগবান জানেন ক কিলোমিটার, তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। নিজেদের যুক্তির সমর্থনে তারা ইতিহাস এবং উপন্যাস থেকে অনেক নজির বের করল।

তর্কে যোগ দিল না আনিউতা। অজানা বৈমানিকের কৃত্রিম পায়ে বিশেষ উৎসাহ নেই তার। বিরল অবসর মুহূর্তগুলিতে ও ভাবত গভজ্‌দেভের বিষয়ে নিজের মনোভাবের কথা, ওর মনে হচ্ছে যে সম্পর্কটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। বিশেষ মর্মান্তিক এই বীর অফিসারটির জীবন, প্রথমে তার কথা শুনে ওর দুঃখ কিছুটা লাঘব করার নিঃস্বার্থ আবেগে চিঠি লেখে আনিউতা। কিন্তু চিঠিপত্রের মারফৎ পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল, তখন দেশপ্রেমিক যুদ্ধের এই বিমূর্ত বীরটির জায়গায় ওর মনে এল আসল জীবন্ত একটি যুবকের ছবি, আর তার বিষয়ে আগ্রহ বেড়ে চলল ক্রমশ। দেখল চিঠিপত্র না এলে উৎকণ্ঠিত বিষণ্ন লাগে। অনুভূতিটা নতুন কিছু, তাতে খুসি হল আর ভয় পেল। এটা কি ভালোবাসা? যাকে কখনো দেখেনি, যার গলা পর্যন্ত শোনেনি, যার সঙ্গে চেনা শুধু চিঠির মাধ্যমে, তাকে ভালোবাসা কি সম্ভব? ট্যাঙ্ক-অফিসারের চিঠিপত্রে ক্রমশ এমন সব কথা এসে পড়ত যেগুলো বন্ধুবান্ধবকে শোনাতে পারত না আনিউতা। একটা চিঠিতে গভজ্‌দেভ স্বীকার করল "চিঠিপত্রের আদানপ্রদানে প্রেমে পড়েছে" সে, সেটা পড়ে আনিউতা উপলব্ধি করল সে নিজেও প্রেমে পড়েছে, স্কুলের মেয়ের সে-প্রেম নয়, সত্যিকারের ভালোবাসা। চিঠির প্রতীক্ষায় অধৈর্যভাবে থাকত সে, বুঝতে পারল যে চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেলে জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে যাবে।

দেখাসাক্ষাৎ না হলেও নিজেদের প্রেমের কথা এইভাবে স্বীকার করল দুজনে, কিন্তু তার পরেই গভজ্‌দেভের অদ্ভুত কিছু একটা ঘটল নিশ্চয়ই। অস্থির অস্বস্তিতে ভরা অস্পষ্ট ওর চিঠিগুলো। পরে সাহসে বুক বেঁধে

আনিউতাকে লিখে পাঠাল যে দেখাসাক্ষাৎ হবার আগেই প্রেমের কথা বলা দুজনেরি ভুল হয়েছে: ওর নিজের মুখ কি ভয়াবহভাবে বিকৃত সেটা ধারণা করতে পারবে না আনিউতা, যে পুরোনো ফটোটা পাঠিয়েছে তার সঙ্গে এখনকার চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই। আনিউতাকে ঠকাতে চায় না সে, যাকে ভালোবাসে তাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত আনিউতা যেন আর নিজের মনোভাবের কথা না লেখে, অনুরোধ করল গভজ্‌দেভ।

চিঠিটা পড়ে প্রথমে রাগ হল্ আনিউতার, তারপর ভয়। পকেট থেকে ফটোটা বের করল। রোগাটে যুবাসুলভ মুখাবয়ব, দৃঢ় গঠন, সোজা খাড়া নাক, ছোট গোঁফ, আর সুগঠিত মুখ চেয়ে আছে তাব দিকে। "আর এখন? কেমন চেহারা হয়েছে তোমার, লক্ষ্মী বেচারি" ফটোটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল আনিউতা। ডাক্তারি ছাত্রী হিসেবে ও জানত যে পোড়ার ঘা সহজে সারে না, গভীর চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়। কোন কারণে মনে পড়ল অ্যানাটমিক্যাল মিউজিয়ামে দেখা লুপুস রোগীর মুখের প্রতিকৃতির কথা: নীলচে বলিরেখায় আর ছোট ছোট ফুস্কুড়িতে মুখটা ক্ষতবিক্ষত, ক্ষয়ে-যাওয়া, এবড়োখেবড়ো ঠোঁট, গোছা গোছা ভুরু, চোখের পাতা লাল, ভোমা নেই। ওর চেহারাও যদি এরকম হয়? কথাটা মনে আসাতেই আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল আনিউতা কিন্তু তক্ষুণি মনে মনে নিজেকে বকল ও.. বেশ, যদি তাই হয়? জ্বলন্ত ট্যাঙ্কে বসে আমাদের শত্রুর সঙ্গে লড়েছে ও, আনিউতার স্বাধীনতা, শিক্ষাধিকার, সম্মান আর জীবন রক্ষা করেছে। গভজ্‌দেভ বীর। কতবার না নিজের জীবন সংশয় করেছে, এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে প্রাণের পরোয়া না করে আবার লড়াই করার জন্য উন্মুখ ও। আর যুদ্ধে সে নিজে কী করেছে? পরিখা খুঁড়েছে, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছে, আর এখন বেজ-হাসপাতালে কাজ করছে। কিই বা ও করেছে তার তুলনায় এদের মূল্য কতখানি? "সন্দেহ করা মানে ওর যোগ্য আমি নই," নিজেকে ধমকাল আনিউতা, চোখের সামনে আসা সেই বিকৃত মুখটির ভয়াবহ ছবিটাকে দূর করে দেবার চেষ্টা কবল। গভজ্‌দেভকে চিঠি লিখল একটা আনিউতা, পত্র বিনিময় শুরু হবার পর দীর্ঘতম আর কোমলতম চিঠি। ওর নানা সন্দেহের কথা স্বভাবতই গভজ্‌দেভ কিছু জানতে পারল না। নিজের উৎকণ্ঠিত চিঠির জবাবে পাওয়া চমৎকার চিঠিটা বারবার পড়ল সে। এমন কি স্ত্রুচকভকেও জানানো হল ওটার কথা; সে একটু অনুকম্পার ভাবে গল্পটা শুনে বলল:

'কুছ পরোয়া নেই, বন্ধু। কথাটা শুনেছ ত: "সুন্দর মুখ, পাষাণ হৃদয়; সাদাসিধে মুখ, সোনার বুক।" এখন আরো বেশী করে সত্যি এটা, বেটাছেলে এত বিরল আজকাল।'

স্বভাবতই খোলাখুলি কথায় আশ্বাস পেল না গভজ্‌দেভ। হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার দিন এগিয়ে আসছে যত তত ঘন ঘন আয়নায় নিজের মুখ দেখে, কখনো দূরে থেকে, তাড়াতাড়ি করে, চকিত দৃষ্টিতে, আবার কখনো বা প্রায় আয়নার কাচে লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজের ক্ষতবিক্ষত, ঝলসে-খাওয়া মুখে হাত বোলায়।

তার অনুরোধে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা কিছু পাউডার আর ক্রিম এনে দিল, কিন্তু শীগগিরই সে বুঝতে পারল দাগগুলো কোন প্রসাধনেই ঢাকবে না। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ও চুপিচুপি বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাগগুলো ঘষত, পাউডার লাগিয়ে আবার ঘষত, তারপর প্রত্যাশায় তাকাত আয়নার দিকে। দূর থেকে দারুণ ভালো দেখায় ওকে: শক্ত চেহারা, চওড়া কাঁধ, অপ্রশস্ত কোমর পেশল পায়ের উপরে সুন্দর বসানো। কিন্তু কাছে থেকে! গালে আর চিবুকে লাল লাল ক্ষতচিহ্ন, টানা কোঁচকানো চামড়া, দেখে হতাশায় তার মন ভরে যায়। "চেহারাটা দেখে কী ভাববে ও?" মনে মনে জিজ্ঞেস করত গভজ্‌দেভ। আতঙ্কিত হবে আনিউতা। একবার তাকিয়ে ঘুরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে যাবে ও। কিম্বা সেটা আরো বিশ্রী হবে -- ভদ্রতার খাতিরে হয়ত ঘণ্টাখানেক গভজ্‌দেভের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবে, তারপর সৌজন্য করে কিছু একটা বলে বিদায় জানাবে। রাগে ফ্যাকাশে হয়ে গেল গভজ্‌দেভ, যেন ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছে।

তারপর গাউনের পকেট থেকে একটা ফটো বের করে গভজ্‌দেভ চেহারাটি দেখত খুঁটিয়ে: গোলগাল মুখ, হালকা পাতলা কিন্তু ফাঁপানো চুল প্রশস্ত কপালের উপরে টান করে আঁচড়ানো, বোঁচা, উপর দিকে তোলা খাস রুশ নাক, আর নরম শিশুসুলভ ঠোঁট। উপরের ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা তিল। সরল মিষ্টি মুখ থেকে একজোড়া কটা, কিম্বা নীল আর একটু বেরিয়ে-আসা চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে সহজ ও খোলাখুলিভাবে।

"কেমন ধরনের লোক তুমি, বলো ত? ভয়ে কি আঁতকে উঠবে তুমি? ছুটে পালাবে? তোমার মন কি এত দরাজ যে রাক্ষসের চেহারাটা চোখ এড়িয়ে যাবে?" একাগ্রভাবে ফটোটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে গভজ্‌দেভ।

আর এদিকে ক্র্যাচের ঠকঠক শব্দে, চামড়ার মচমচ আওয়াজে সিনিয়র

লফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ করিডরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অক্লান্তভাবে ওকে পেরিয়ে যায় আর আসে একবার, দুবার, দশবার, বিশবার। নিজের জন্য কর্মসূচী একটা ঠিক করেছে মেরেসিয়েভ, প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে হাঁটে, প্রতিদিন ব্যায়ামের মাত্রা বাড়াচ্ছে।

"খাসা লোক!" মনে মনে ওর সাধুবাদ করল গভজ্‌দেভ। "লেগে থাকতে পারে বটে। লোকটার মনোবলের সীমা নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে শিখে ফেলল! অনেকের ত কয়েক মাস লেগে যায়। কাল স্ট্রেচারে যেতে রাজী হল না, চিকিৎসার জন্য হেঁটে সিঁড়ি ভেঙ্গে গেল নিচে, হেঁটে ফিরে এল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু হাল ছেড়ে দিল না, এমন কি সাহায্য করতে চেয়েছিল বলে আর্দালিটাকে কী ধমকই না লাগাল! আর নিজে নিজে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে পেঁছবার পর ওর হাসিটা যদি দেখতে! মাউণ্ট এলব্রুজের চূড়োয় পেঁছেছে যেন!'

আয়না থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গভজ্‌দেভ দেখল মেরেসিয়েভ ক্রাচের সাহায্যে বেশ তাড়াতাড়ি চলেছে। "দেখো একবার! সত্যি সত্যি দৌড়চ্ছে। আর লোকটার কি মিষ্টি সুন্দর চেহারা! ভুরুর ওপরে ছোট্ট একটা কাটার দাগ, কিন্তু তাতে একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না, বরঞ্চ ভালোই দেখাচ্ছে।" যদি গভজ্‌দেভের মুখটা ওর মত হত! পা'তে কী এসে যায়? পা ত আর দেখার জিনিস নয়। আর ও ত হাঁটতে শিখবে নিশ্চয়ই, বিমানও চালাবে। কিন্তু তোমার নিজের মুখটা? এ প্রেতমূর্তি ত আর গোপন করার মত নয়, দেখে মনে হয় মাতাল ভূতেরা রাত্রে ওটার উপরে মটর ভেঙ্গেছে।

...করিডরে বৈকালিক ব্যায়ামের ত্রয়োবিংশ চক্করে পেঁছিয়েছে আলেক্সেই তখন। স্ফীত উরুর জ্বালা আর ক্রাচের প্যাডের ঠেলায় কাঁধের যন্ত্রণার বোধ তার সমস্ত ক্লান্ত শরীরে। খুঁড়িয়ে যেতে যেতে আয়নার সামনে দণ্ডায়মান ট্যাঙ্ক-অফিসারের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকাল আলেক্সেই। "মজার লোক বটে!" মনে মনে বলল সে। "মুখ নিয়ে এত চিন্তা করার কী আছে। অবশ্য সিনেমার তারকা হতে পারবে না আর, সেটা সত্যি। কিন্তু ট্যাঙ্কচালক হতে পারে ত। কে আটকাচ্ছে ওকে। মুখে কী এসে যায় ওর, যতক্ষণ ওর মগজ আছে, হাত আর পা আছে? হ্যাঁ, পা, সত্যিকারের পা আছে, আমার মত চামড়ার টুকরো নয়, টনটন করছে আর জ্বলছে যেগুলো, যেন চামড়ার নয়, গনগনে গরম লোহার জিনিস।"

ঠক, ঠক, মচ, মচ। ঠক, ঠক, মচ, মচ...

অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে জল এসে পড়ছে, ঠোঁট কামড়ে সেটা চাপার চেষ্টা করতে করতে সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ কষ্টে করিডরে তার উনত্রিংশ চক্কর শেষ করল, সমাপ্ত হল সে দিনের ব্যায়াম।

১৪

জুনের মাঝামাঝি গ্রিগরি গভজ্দেভ হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেল।

যাবার দু একদিন আগে আলেক্সেই'র সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। সমব্যথী দুজনে, দুজনের ব্যক্তিগত জীবন সমান জটিল, সেজন্য ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল; আর এরকম ক্ষেত্রে যা হয়, পরস্পরের কাছে নিজেদের সব ব্যাপার ওরা খোলাখুলিভাবে বলল, গোপন করল না আগামী দিনের বিষয়ে নিজেদের নানা উৎকণ্ঠার কথা; নিজেদের সমস্যা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করা গর্বে বাধত বলে অনেক কিছু দ্বিগুণ দুর্বহ হয়ে উঠেছিল ওদের, সেগুলোর বিষয়ে কথাবার্তা হল। পরস্পরকে দেখাল মেয়ে দুটির ছবি।

ওলিয়ার ছবিটা পুরোনো, ঝাপসা হয়ে এসেছে। জুনের সেই পরিষ্কার দীপ্ত দিনে ভলগার ওপারে ফুলে-ভরা স্তেপে খালি পায়ে দৌড়াবার সময়ে ছবিটা তোলে আলেক্সেই। খাসা ছাপা-ফ্রক পরনে দোহারা চেহারার একটি মেয়ে পা মুড়ে বসে আছে, কোলে ফুল। ডেইজির মধ্যে ওলিয়াকেও দেখাচ্ছে শাদা আর নিষ্কলঙ্ক, সকালের শিশিরে ভেজা ডেইজির মত। ফুলগুলো সাজাবার সময়ে চিন্তান্বিতভাবে মাথা একটু হেলানো, চোখদুটি বিস্ফারিত আর বিহ্বল, যেন পৃথিবীটার সৌজন্য জীবনে এই প্রথম নজরে পড়েছে তার।

ফটোটা দেখে ট্যাঙ্ক-অফিসার বলল এ ধরনের মেয়ে বিপদের সময়ে বন্ধুকে ছেড়ে কখনো চলে যায় না; আর যায় যদি তাহলে গোল্লায় যাক ও, তাতে শুধু প্রমাণ হয় চেহারা খোলস মাত্র, আর সে ক্ষেত্রে ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো, কেননা মেয়েটা অপদার্থ, ওধরনের অপদার্থ লোকের সঙ্গে বরাবর থাকার কোন মানে হয় না, হয় কি?

আনিউতার চেহারা ভালো লাগল আলেক্সেই'র, আর নিজের অলক্ষিতে, ঠিক গভজ্দেভ যা বলেছে ওকে এইমাত্র, তাই বলল নিজের মত করে। আলোচনাটায় গভীর কিছু ছিল না, ওদের নানা সমস্যা মেটাতে সেটা সাহায্য

করল না একবিন্দু, কিন্তু কথাবার্তার পরে দুজনেরই আগের চেয়ে ভালো লাগল, যেন অনেক দিনের একটা বিষফোঁড়া ফেটে গিয়েছে!

ওরা ঠিক করল যে হাসপাতাল থেকে চলে যাবার পরে গভজ্‌দেভ আর আনিউতা -- আনিউতা টেলিফোন করে কথা দিয়েছিল যে এসে ওর সঙ্গে দেখা করবে -- ওয়ার্ডের জানলার পাশ দিয়ে যাবে; পরে আলেক্সেই লিখে জানাবে মেয়েটিকে দেখে তার কী মনে হয়েছে। আর গভজদেভ কথা দিল যে আলেক্সেইকে চিঠিতে জানাবে আনিউতা কী ভাবে ওর সঙ্গে দেখা করল, ওর বিকৃত মুখ দেখে তার প্রতিক্রিয়া কী রকম, কেমন চলছে তাদের। আলেক্সেই স্থির করল যে গ্রিশার ব্যাপার যদি ভালোয় ভালোয় চলে তাহলে অবিলম্বে ওলিয়াকে চিঠি লিখে নিজের সমস্ত কথা জানাবে, কিন্তু বলে দেবে যেন মা'কে না বলা হয়, মা এখনো অসুস্থ, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না প্রায়।

অস্থিরভাবে দুজনেই সেজন্য গভজ্‌দেভের হাসপাতাল ছাড়ার প্রতীক্ষায় ছিল। এত উদ্বিগ্ন দুজন যে ঘুম এল না, রাত্রে চুপিচুপি তারা গেল করিডরে — গভজ্‌দেভের উদ্দেশ্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষতচিহ্নগুলো আর একবার রগড়াবে, আর মেরেসিয়েভ চায় বরাদ্দের বেশী হাঁটবে, শব্দ যাতে না হয় সেজন্য ক্রাচের পায়ে নেকড়া লাগিয়ে নিল।

দশটার সময়ে ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, চতুর হাসি মুখে, জানাল গভজ্‌দেভের সঙ্গে কে যেন দেখা করতে এসেছে। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠল গভজ্‌দেভ, যেন দমকা হাওয়ায় তাকে উৎক্ষিপ্ত করেছে। মুখ টকটকে লাল, তাতে ক্ষতচিহ্নগুলো আরো প্রকট হয়ে উঠল, তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল সে।

'খাসা মেয়েটি, চেহারাটা গম্ভীর প্রকৃতির,' ব্যস্তসমস্তভাবে বিদায়ের আয়োজনরত গভজ্‌দেভের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল নার্স।

খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ।

'সত্যি বলছ? ভালো লেগেছে ওকে? মেয়েটি বেশ, নয়?' জিজ্ঞেস করল গভজ্‌দেভ, আর উত্তেজনায় বিদায়সম্ভাষণ জানাতে ভুলে গিয়ে দৌড়িয়ে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে।

'রামপাঁঠা! চট করে ফাঁদে পা দেয় সেই গোছের লোক!' গরগর করে বলল মেজর স্ত্রুচকভ।

গত কয়েক দিনে এই উচ্ছৃংখল লোকটির মন্দ কিছু একটা ঘটেছে। বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে, বিনা কারণে ভয়ানক চটে ওঠে মাঝেমাঝে, বিছানায় উঠে



বসতে পারে বলে বসে বসে সারাদিন জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে হাতে চিবুক রেখে, কেউ কথা বললে জবাব দেয় না।

ওয়ার্ডের সবাই — বিমর্ষ মেজর, মেরেসিয়েভ আর নতুন দুটি রোগী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে, কখন তাদের পূর্বতন সহবাসীকে রাস্তায় দেখা যাবে। দিনটা গরম। নরম, ঢেউ-খেলানো মেঘ দীপ্ত সোনালী পাড়ে দ্রুতগতিতে ভেসে যাচ্ছে, চেহারা তাদের বদলাচ্ছে। ঠিক সে মুহূর্তে ছোট ধূসর ফাঁপা বৃষ্টি-ঝরা মেঘ একটা তড়তড় করে গেল নদীর উপর দিয়ে, বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা সূর্যের আলোয় চিকচিক করে ছড়িয়ে পড়ল। বাঁধের গ্রানিট দেয়ালগুলো ঝকঝকে, যেন পালিশ করা হয়েছে; এ্যাসফল্টের রাস্তাটা কালো কালো গোল দাগে ভরে গেল, এমন সূক্ষ্ম, ভেজা ভাপ তা থেকে উঠল যে ইচ্ছে করে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে সুন্দর বৃষ্টিবিন্দুলোকে ধরে ফেলি।

'ও আসছে!' ফিসফিস করে বলল মেরেসিয়েভ।

প্রবেশদ্বারের ভারী ওকের পাল্লাদুটো আস্তে আস্তে খুলে গেল, দেখা গেল দুজনকে: মোটাসোটা গোছের একটি তরুণী, খালি মাথা, কপাল থেকে টান করে পিছনে চুল আঁচড়ানো, পরনে শাদা ব্লাউজ, কালো স্কার্ট; আর তরুণ সৈনিক একজন, সে যে ট্যাঙ্ক-অফিসার সেটা এমন কি আলেক্সেই-ও চট করে ঠাহর করতে পারল না। এক হাতে সুটকেশ, অন্য হাতে আর্মিকোট; এমন বলিষ্ঠ তার হাঁটার কায়দা যে দেখলেও ভালো লাগে। বোঝা গেল নিজের শক্তি পরীক্ষা করছে ও, স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটাচলা করতে পারে দেখে এত খুসি যে মনে হয় সিঁড়ি দিয়ে দৌড়িয়ে নামছে না, ভেসে নামছে। সঙ্গিনীর হাত ধরে বাঁধের পাশ দিয়ে ও চলল ওয়ার্ডের জানলার দিকে — ভারী সোনালী বৃষ্টিবিন্দু লেগে আছে ওদের শরীরে।

ওদের দেখে দেখে আনন্দে বুক ভরে গেল আলেক্সেই'র। তাহলে নির্বিঘ্নে সবকিছু হয়েছে! মেয়েটির মুখ যে এত অকপট, মিষ্টি আর সরল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওর মত মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে না। না, ওর মত মেয়েরা বিপাকগ্রস্ত মানুষকে ফেলে চলে যায় না।

জানলার কাছে এসে ওরা থামল, তাকাল উপরের দিকে। বাঁধের বৃষ্টি-ধোওয়া পারাপেটের কাছে তরুণ-তরুণীটি দাঁড়িয়ে, তাদের পিছনে শ্লথ বৃষ্টি ঝকঝকে আড়াআড়ি রেখায় পটভূমি এ'কে চলেছে। আর আলেক্সেই লক্ষ্য করল যে ট্যাঙ্ক-অফিসারকে বিব্রত উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে, আর

আনিউতা — ফটোতে যেমন সত্যি তেমন মিষ্টি চেহারা তার — তাকেও বিব্রত উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছে। হাতটা ট্যাঙ্ক-অফিসারের হাতে শিথিলভাবে পড়ে আছে, সব মিলিয়ে তাকে দেখাচ্ছে অস্থিরচিত্ত আর উত্তেজিত, যেন হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে এক্ষুণি পালিয়ে যাবে।

হাত নাড়ল দুজনে, কষ্টকৃত হাসি হেসে, বাঁধ হয়ে আরো এগিয়ে মোড়ের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। কোন কথা না বলে রোগীরা যে যার বিছানায় ফিরল।

'বেচারা গভজ্‌দেভ সফল হয়নি,' মন্তব্য করল মেজর। করিডরে শোনা গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার জুতোর শব্দ, চমকে উঠে মেজর হঠাৎ জানলার দিকে মুখ ফেরাল।

সারাটা দিন অস্বস্তিতে কাটল আলেক্সেই'র। এমন কি সন্ধ্যাকালীন হাঁটার ব্যায়ামটাও বাদ পড়ল সেদিন, সবায়ের আগে শুয়ে পড়ল সে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর খাটের স্প্রিঙের কিঁচকিঁচ আওয়াজ বন্ধ হল না।

পরদিন সকালে নার্স ঘরে আসতে না আসতে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করল তার কোন চিঠি এসেছে কিনা। কোন চিঠি আসেনি। হাতমুখ ধুয়ে ও প্রাতরাশ খেল বিনা আগ্রহে, কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় হাঁটবার ব্যায়ামটা বাড়িয়ে দিল সেদিন। আগের সন্ধ্যায় যে দুর্বলতা দেখিয়েছে তার জন্য নিজেকে সাজা দেবার জন্য আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে পোনেরো চক্কর বেশী ঘুরল আলেক্সেই। নিজের এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেল মন থেকে। ও দেখিয়েছে যে ক্রাচ নিয়ে সহজে চলাফেরা করতে পারে, খুব ক্লান্ত না হয়ে। করিডরের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ মিটার। পঁয়তাল্লিশ বার করিডরটা ঘুরেছে সে, পঁয়তাল্লিশ দিয়ে পঞ্চাশকে গুণ করলে হয় দু হাজার দুশ পঞ্চাশ মিটার, অর্থাৎ সওয়া দুই কিলোমিটার, অফিসারদের মেস থেকে বিমান-ঘাঁটি যতটা, ততটা। মনে মনে পরিচিত সেই পথ ধরে আবার গেল আলেক্সেই, পথটা গিয়েছে গ্রামের পুরোনো গির্জার ধ্বংসাবশেষ আর দগ্ধ স্কুলের ইঁটের স্তূপ ছাড়িয়ে; শার্সিহীন জানলার ফাঁকা কোটর থেকে রাস্তার দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছে স্কুলটি; বনের মধ্য দিয়ে, সেখানে ফারের শাখায় পেট্রলের ট্রাকগুলো ঢাকা, আর — কম্যাণ্ডারের ডাগ-আউট পেরিয়ে গিয়েছে পথটি, পেরিয়ে গিয়েছে সেই ছোট কাঠের কুটিরটি যেখানে মানচিত্র

আর চার্টে ঝ‌ুঁকে পড়ে "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" তার নানা অন‌ুষ্ঠান চালায়। অনেকখানি পথ, অনেকখানি পথ সত্যি!

মেরেসিয়েভ ঠিক করল যে দৈনন্দিন চক্কর বাড়িয়ে ছেচল্লিশ করবে, সকালে তেইশ আর বিকেলে তেইশ, আর পরের দিন সকালে, রাত্রির বিশ্রামের পর শরীর যখন ঝরঝর থাকে, বিনা ক্রাচে হাঁটবার চেষ্টা করবে। সিদ্ধান্তটা তৎক্ষণাৎ ওর মন ঘ‌ুরিয়ে দিল বিষণ্ণ দ‌ুর্ভাবনা থেকে, উৎসাহিত আর কাজের মান‌ুষের মত লাগল নিজেকে। সন্ধ্যেবেলায় এত আগ্রহে ব্যায়াম শ‌ুর‌ু করল যে দেখতে না দেখতে তিরিশের বেশী চক্কর করে ফেলল। আর ঠিক তখনি ব্যায়ামে বাধা পড়ল, ক্লোকর‌ুমের পরিচারিকা এসে হাজির, হাতে একটি চিঠি। চিঠিটা তার নামে। ছোট খামের উপরে লেখা: "সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ। ব্যক্তিগত।" "ব্যক্তিগতটার" নিচে দাগ দেওয়া, সেটা মোটেই ভালো লাগল না আলেক্সেই'র। চিঠিটার কোণেও লেখা "ব্যক্তিগত", দাগ দেওয়া তাতেও।

জানলার তাকে হেলান দিয়ে চিঠিটা খ‌ুলল আলেক্সেই। গত রাত্রে রেলওয়ে স্টেশন থেকে লিখেছে গভজ্‌দেভ, দীর্ঘ চিঠিটা যত পড়ছে তত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আলেক্সেই'র ম‌ুখ। গভজ্‌দেভ লিখেছে আনিউতার চেহারা যেরকম তারা কল্পনা করেছিল ঠিক সেরকম, খ‌ুব সম্ভব মস্কোর সবচেয়ে মিষ্টি-চেহারার মেয়ে সে, বোনের মত তার সঙ্গে দেখা করে আনিউতা, আগের চেয়ে অনেক ভালো লেগেছে তাকে গভজ্‌দেভের।

"...কিন্তু যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা দাঁড়াল ঠিক আমরা যেরকম ভেবেছিলাম সেভাবে। মেয়েটি ভালো। কোন কথা বলল না আমাকে, কোন কিছ‌ুর ইঙ্গিত পর্যন্ত করল না। সবকিছ‌ু ভালো। কিন্তু অন্ধ নই আমি। দেখলাম আমার ঝলসানো কুৎসিৎ ম‌ুখ দেখে ও ভয় পেয়েছে। সবকিছ‌ু ঠিক মনে হচ্ছে, হঠাৎ আবার দেখছি ও আমার ম‌ুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ও লজ্জিত ভীত কিম্বা দ‌ুঃখিত আমার জন্য — ঠিক কি জানি না .. বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেল আমাকে। না গেলেই ভালো হত। মেয়েরা ভিড় করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে... বিশ্বাস করবে কি? আমাদের সবাইকে ওরা চেনে! আনিউতা আমাদের সব কথা ওদের বলেছে... ব‌ুঝতে পারলাম একটু লজ্জিতভাবে ও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ভয়াবহ জিনিসটা ওখানে নিয়ে যাবার জন্য মাপ চাইছে। কিন্তু আসল কথাটা শোনো আলিওশা, নিজের মনোভাব গোপন করার চেষ্টা করছিল ও:

আমার সঙ্গে বেশ ভালো আর সহৃদয় ব্যবহার করল, কথা বলছে ত বলছেই, যেন কথা থামাতে ওর ভয়। তারপর ওর বাড়িতে গেলাম। একলা থাকে আনিউতা। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে চলে গিয়েছে ওর বাপ-মা। স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওরা ভালো ঘরের লোক। চা খাওয়াল আমাকে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে নিকেলের কেটলিতে আমার ছায়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গল্প বাড়িয়ে লাভ নেই। সংক্ষেপে, মনে মনে ভাবলাম যে এরকম করে চলবে না। সোজাসুজি ওকে বললাম, 'বুঝতে পারছি আমার চেহারাটা আপনার পছন্দ হয়নি। তাতে আপনার দোষ নেই, সেটা আমি বুঝি। অপমানিত লাগছে না নিজেকে।' কেঁদে ফেলল ও. কিন্তু আমি বললাম, 'কাঁদবেন না। লক্ষ্মী মেয়ে আপনি। আপনার সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে। নিজের জীবন নষ্ট করবেন কেন!' আবার বললাম, 'দেখছেন ত, কী অপরূপ চেহারা আমার! ভেবে দেখুন। বাহিনীতে ফিরে যাচ্ছি, সেখানকার ঠিকানা জানাব আপনাকে। যদি আপনার সংকল্প ঠিক থাকে, তাহলে আমাকে জানাবেন।' আরো বললাম, 'যা করতে চান না তা জোর করে করবেন না। আজ আমি এখানে ,কাল সেখানে — যুদ্ধ চলেছে।' ও অবশ্য বলল, 'না, না, না!' কান্না থামছে না। আর ঠিক সে সময়ে হতভাগা সাইরেনটা চেঁচাতে শুরু করল। বাইরে গেল ও, আর হৈচৈ'এর সুযোগ নিয়ে চলে এলাম আমি, সোজা গেলাম অফিসারদের রেজিমেণ্টে, তক্ষুণি ওরা কাজ দিল আমাকে। এখন সব ঠিক। রেলের টিকিট পেয়েছি, রওনা হলাম। কিন্তু এটা তোমাকে বলা দরকার, আলিওশা, ওকে আগের চেয়ে ঢের বেশী ভালোবাসি এখন, ওকে ছেড়ে কী করে থাকব জানি না।"

বন্ধুর চিঠি পড়তে পড়তে আলেক্সেই'র মনে হল নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কোন সন্দেহ নেই, তারো কপালে ঠিক এরকম ঘটবে। চলে যেতে বলবে না তাকে ওলিয়া, নেবে না মুখ ঘুরিয়ে, তার জন্য ঠিক এরকম মহৎ আত্মত্যাগ করতে চাইবে সে, মমতায় কথা বলবে, চোখের জলে হাসবে আর চেষ্টা করবে বিতৃষ্ণা চাপার।

'না, না, সেটা চাই না!' বলে উঠল আলেক্সেই।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে গেল ওয়ার্ডে, টেবিলের পাশে বসে ওলিয়াকে চিঠি লিখল, ছোট নিষ্প্রাণ নীরস চিঠি। সত্যি কথা বলার সাহস হল না। বলবেই বা কেন? মা অসুস্থ, তাঁর দুঃখ বাড়াবে কেন? লিখল যে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে তার জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকাটা

ওলিয়ার পক্ষে নিশ্চয়ই কষ্টকর। কেউ জানে না কতদিন যুদ্ধ চলবে কিন্তু সময় আর যৌবন ত বসে থাকে না। যুদ্ধ এমন একটা জিনিস যে প্রতীক্ষা করার কোন মানে হয় না। মারা যেতে পারে আলেক্সেই, তাহলে স্ত্রী না হয়েও বিধবা হবে ওলিয়া; কিম্বা, সেটা আরো খারাপ ব্যাপার, তার অঙ্গহানি হতে পারে, তাহলে পঙ্গুকে বিয়ে করতে হবে ওলিয়াকে। তাতে কী ভালোটা হবে? নিজের যৌবন নষ্ট করা উচিত নয় ওর, যত শীগগির পারে আলেক্সেইকে ভুলে যাক। চিঠিটার জবাব না দিলেও চলবে, না দিলে কিছু মনে করবে না সে। ওর অবস্থা বুঝতে পারে আলেক্সেই, যদিও সেটা স্বীকার করা তার পক্ষে কঠিন। কিন্তু যা বলছে সেটা করাই ভালো।

মনে হল চিঠিটায় হাত পুড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বার না পড়ে, খামে চিঠিটা ভরে, তাড়াতাড়ি খোঁড়াতে খোঁড়াতে জল গরম করার যন্ত্রটির পিছনে করিডরে টাঙানো নীল ডাক বাক্সটার কাছে গেল আলেক্সেই।

ওয়ার্ডে ফিরে এল, আবার বসল টেবিলের পাশে। কার সঙ্গে মনের কথা বলবে? মা'র সঙ্গে নয়। গভজ্‌দেভ? সে বুঝবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন কোথায় সে? কত রাস্তার গোলক-ধাঁধা গিয়েছে ফ্রন্টে, কোথায় খুঁজে পাবে তাকে? ওর রেজিমেন্টে লিখবে? কিন্তু যুদ্ধকালীন নানা কাজে ব্যস্ত থাকার সৌভাগ্য যাদের, তারা কি মাথা ঘামাবে আলেক্সেইকে নিয়ে? "আবহাওয়া সার্জেন্টকে" লিখবে? হ্যাঁ, ওকেই লেখা যায়। তক্ষুণি লিখতে শুরু করল আলেক্সেই, কথাগুলো আসছে অবলীলাক্রমে, বন্ধুর আলিঙ্গনে বদ্ধ হলে চোখের জল যেমন অঝোরে পড়ে। একটি পঙ্‌ক্তি শেষ হয়নি, হঠাৎ লেখা বন্ধ করল আলেক্সেই, এক মুহূর্ত কী ভেবে চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলল।

"লেখকের যন্ত্রণার চেয়ে গভীরতর যন্ত্রণা আর কিছু নেই," স্বভাবসুলভ ঠাট্টার সুরে আবৃত্তি করল স্ত্রুচকভ।

বিছানায় বসে সে গভজ্‌দেভের চিঠিটা পড়ছে, আলেক্সেই'র বিছানার পাশের তাক থেকে তুলে নিয়েছিল সেটা।

'আজ কী হল সবায়ের?.. গভজ্‌দেভও! রামপাঁঠা বটে। একটা মেয়ে নাক শিঁটকিয়েছে, তাই চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। মনের রোগের বিশ্লেষণ শুরু হল। চিঠিটা পড়ার জন্য চটনি ত? আমরা সবাই সৈনিক, আমাদের মধ্যে গোপন কথা কী থাকতে পারে?'

চটেনি আলেক্সেই। সে ভাবছিল, "হয়ত পিওন কাল আসা না পর্যন্ত

অপেক্ষা করা আমার উচিত, বাক্স থেকে চিঠি নেবার সময়ে চিঠিটা ফেরৎ নিয়ে নেব?"

সে রাত্রে ভালো ঘুম হল না আলেক্সেই'র। প্রথমে স্বপ্ন দেখল বরফে-ঢাকা বিমান-ঘাঁটিতে গিয়েছে সে, সেখানে অদ্ভুত চেহারার একটা বিমান "লাভচ্‌কিন-৫" নামবার গিয়ারের জায়গায় পাখির পা লাগানো। ইউরা মিস্ত্রী ককপিটে ঢুকে বলল আলেক্সেই'র বিমান চালানোর দিন আর নেই, এবার ওর চালানোর পালা। তারপর স্বপ্ন দেখল খড়ের উপর নিজে শুয়ে আছে, আর মিখাইল দাদু, তাঁর পরনে সাদা সার্ট আর ভিজে প্যাণ্ট, বাষ্পস্নান করাচ্ছেন তাকে, হাসতে হাসতে বলছেন, "বিয়ের আগে ঠিক এটাই তোমার দরকার।" ঠিক ভোরের আগে ওলিয়াকে স্বপ্নে দেখল আলেক্সেই, একটা উল্টে-যাওয়া নৌকোর উপরে বসে আছে ওলিয়া, পাতলা দোহারা দীপ্ত চেহারা, রোদে-তামাটে বলিষ্ঠ পাদুটো জলে দিয়ে এক হাতে চোখ ঢেকে রোদের আড়াল করছে, আর হাসি মুখে অন্য হাতের ইসারায় ডাকছে তাকে। সাঁতরে যাচ্ছে তার দিকে আলেক্সেই, কিন্তু খর উদ্দাম স্রোত তীর আর মেয়েটির কাছ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। হাত পা, শরীরের সমস্ত পেশীর জোর ক্রমাগত খাটিয়ে ক্রমশ ওলিয়ার কাছে এসে পড়ল, আরো কাছে, চোখে পড়ছে হাওয়ায় ঝটপটে ওর চুল, রোদে-তামাটে পায়ের উপরে চিকচিকে জলের ফোঁটা...

ঘুম ভেঙ্গে গেল আলেক্সেই'র, বেশ ফূর্তি আর খুসি লাগছে। চোখ বুজে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল, যাতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, যাতে মধুর স্বপ্নটা ফিরে আসে আবার, তার আশায়। কিন্তু এরকম ঘটে শুধু শৈশবে। স্বপ্নে দেখা মেয়েটির সেই পাতলা, রোদে-তামাটে প্রতিচ্ছবিতে সমস্ত কিছু দীপ্ত হয়ে উঠেছে মনে হল। উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই আলেক্সেই'র, মন খারাপ করার দরকার নেই, শুধু সাঁতরাতে হবে ওলিয়ার দিকে, সাঁতরাতে হবে উজানে, যা কিছু ঘটুক না, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাঁতরাতে হবে, পোঁছতে হবে তার কাছে। কিন্তু চিঠিটার কী হবে? ডাক বাক্সের কাছে গিয়ে পিওনের জন্য অপেক্ষা করার ইচ্ছে হল তার, কিন্তু মত বদলাল আলেক্সেই; হাত নাড়িয়ে বলল নিজেকে: "যাক ওটা। ওটাতে সত্যিকারের প্রেম ত আর কেটে যাবে না।" আর ওর এখন বিশ্বাস হল যে সত্যিকারের প্রেম, দুঃখে সুখে, সুস্থ কিম্বা অসুস্থ যে অবস্থায়ই থাকুক না সে নিজে, প্রেম তার প্রতীক্ষায় আছে। বিশ্বাসটা নতুন শক্তি যোগাল তাকে।

সেদিন সকালে বিনা ক্রাচে হাঁটবার চেষ্টা করল আলেক্সেই। সাবধানে খাট ছেড়ে উঠে পা ফাঁক করে দাঁড়াল, হাত সামনে এগিয়ে দিয়ে অসহায়ভাবে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করল। দেয়াল ধরে পা ফেলল আলেক্সেই। কৃত্রিম পায়ের চামড়া মচমচ করছে। দুলে উঠল শরীরটা, কিন্তু হাত দিয়ে ভারসাম্য রাখল ও। দেয়াল ধরে আবার পা ফেলল। কখনো কল্পনা করেনি হাঁটাটা এত কঠিন ব্যাপার। বাল্যকালে রণপা দিয়ে হাঁটতে শিখেছিল আলেক্সেই। দেয়ালে হেলান দিয়ে রণপায়ে ভর দিয়ে উঠে দেয়াল ছেড়ে এক পা ফেলত, তারপর আর একটা পা, আবার একটা... কিন্তু দুলে উঠত শরীরটা, লাফিয়ে নেমে পড়ত ও, উপকণ্ঠের রাস্তার ঘাসে পড়ে থাকত রণপাদুটো। রণপায়ে হাঁটতে শেখাটা, যাই হোক, অতটা খারাপ ছিল না, কেননা তা থেকে লাফিয়ে নামা যায়, কিন্তু কৃত্রিম পা ছেড়ে দিয়ে লাফান ত চলে না। আর তৃতীয় বার পা ফেলার চেষ্টা করাতে ওর শরীর দুলে উঠল, পায়ে শক্তি নেই, উপুড় হয়ে পড়ল মেঝেতে।

অন্যান্য রোগীরা নানা চিকিৎসা নিতে চলে গিয়েছে, ওয়ার্ডে কেউ নেই, ব্যায়ামের জন্য সে সময়টা বেছে নিয়েছিল আলেক্সেই। সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকল না। হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে আস্তে উঠে দাঁড়াল, পড়ে যাওয়াতে পাশে চোট লেগেছে, ঘষল সে জায়গাটা, কনুইটা ছড়ে কালসিটে পড়তে শুরু করেছে, সেটা দেখে দাঁতে দাঁত চেপে আবার পা ফেলল, দেয়াল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে! মনে হল কারসাজিটা এবার আয়ত্তে এসেছে। আসল আর নকল পায়ের পাতার তফাৎটা হল শেষোক্তটির স্থিতিস্থাপকতার অভাব। তাদের স্বকীয় ধর্ম এখনো তার জানা নেই, কয়েকটি অভ্যেস, প্রায় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত, আয়ত্তে আনতে হবে তাকে, যেমন হাঁটবার সময়ে পায়ের পাতার স্থান সঙ্গে সঙ্গে বদলানো, পা ফেলার সময়ে শরীরের ভার গোড়ালি থেকে পদাঙ্গুলিতে দেওয়া, আবার পা ফেলার সময়ে ভারটা গোড়ালি থেকে পদাঙ্গুলিতে আনা। সমান্তরালভাবে পা ফেললে চলবে না, ফেলতে হবে আড়ভাবে, পায়ের ডগা ছাড়াছাড়া রেখে, তাতে হাঁটবার সময়ে শরীরে আরো বেশী স্থিতি আসে।

মায়ের তদারকে ছোটখাটো পায়ে প্রথম বিসদৃশ পা ফেলার সময়ে এসব সবাই শেখে শৈশবে। অভ্যেসগুলো সারা জীবন টিঁকে থাকে, পরিণত হয় সহজাত ঝোঁকে। কিন্তু কৃত্রিম অঙ্গ পরতে বাধ্য হলে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক সঙ্গতির বিচ্যুতি ঘটে, শৈশবে অধিকৃত ঝোঁক সাহায্য করা দূরের

কথা, বাধা দেয় তার গতিকে। নতুন অভ্যেস সব আয়ত্তে আনার সময়ে পুরোনো ঝোঁকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। এমন অনেকে আছে যারা অঙ্গহানির পরে মনোবলের অভাবে হাঁটার বিদ্যা আর আয়ত্তে আনতে পারে না, যে বিদ্যাটা অত সহজে শৈশবে আমরা শিখে ফেলি।

নিজের জন্য লক্ষ্যবস্তু ঠিক করেছে মেরেসিয়েভ, গন্তব্যে পেঁাছবে ও, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার। প্রথম উদ্যমে যে ভুল করেছিল, সেটা হৃদয়ঙ্গম করে আবার চেষ্টা করল ও। এবারে কৃত্রিম পায়ের ডগা এগিয়ে গোড়ালিতে ভর দিয়ে শরীরের ভার ছাড়ল ডগাগুলোর উপরে। জোরে মচমচ করে উঠল চামড়াটা। শরীরের ভার পদাঙ্গুলিতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সেই অন্য পাটি তুলে এগিয়ে দিল। মেঝেতে লাগল গোড়ালিটা। দেয়াল ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইল ও, হাত বাড়িয়ে শরীরের ভারসাম্য রাখছে, আবার পা ফেলার সাহস হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে রইল ও, শরীরটা দুলছে, পড়ে না যায় চেষ্টা করছে তার, অনুভব করছে নাকের ডগা ঘেমে উঠছে।

এরকম একটা অবস্থায় ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আবিষ্কার করলেন ওকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন, তারপরে এগিয়ে এসে বগলের নিচে হাত দিয়ে ভার রক্ষা করে বললেন:

'বেশ চলেছে! একেবারে একলা যে, কোন নার্স আর আর্দালি দেখছি না ত: দেমাকের ব্যাপার মনে হচ্ছে... যা হোক, কিছু এসে যায় না। যে কোন কাজে যেমন, প্রথম পদক্ষেপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর সবচেয়ে কঠিন অংশটা ত তুমি কাটিয়ে উঠেছ।'

এর অল্প কিছুদিন আগে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। কাজটি খুব বড়ো, অনেক সময় লাগত সেটা করতে। হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন তিনি, কিন্তু ঝানু যোদ্ধাটি এখনো পরামর্শদাতার কাজ করতেন; অন্য লোকের হাতে হাসপাতালের পরিচালনার ভার থাকলেও প্রত্যহ এখানে আসতেন, সময় থাকলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সন্তানের মৃত্যুর পরে বদলে গিয়েছে মানুষটি। পুরোনো প্রখর ফূর্তির ভাব আর নেই; আর চেঁচিয়ে বকাবকি করেন না; যারা তাকে ভালোভাবে চেনে তারা এটাকে আসন্ন বার্ধক্যের লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছে।

'আচ্ছা, মেরেসিয়েভ, একসঙ্গে শেখার চেষ্টা করি আমরা...' প্রস্তাব করলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। অনুচরবর্গের দিকে ঘুরে বললেন, 'তোমরা



কেটে পড়ো ত বাপু, সার্কাস নয় এটা, হাঁ করে দেখার কিছু নেই। আমাকে বাদ দিয়ে রোঁদ শেষ করো।' তারপর বললেন মেরেসিয়েভকে:

'তাহলে, বাপু... এক! ধরে থাকো, আমাকে ধরে থাকো, লজ্জা পাবার কিছু নেই! আমি জেনারেল, আমার কথা শুনতে বাধ্য তুমি। আচ্ছা, দুই! ঠিক হয়েছে ওটা। এবার ডান পাটা। বেশ, বেশ! বাঁয়ে! চমৎকার!'

মহানন্দে বিখ্যাত সার্জন হাতে হাত ঘষলেন, যেন একটি লোককে হাঁটতে শিখিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান, ভগবান জানেন কত মূল্যবান, কোন পরীক্ষামূলক গবেষণা করছেন। কিন্তু ওঁর স্বভাবই এ ধরনের, যা কিছু করেন সোৎসাহে করেন, বিরাট উদ্যমী প্রাণের সবটা ঢেলে দিয়ে। সারা ওয়ার্ডটা হাঁটতে মেরেসিয়েভকে বাধ্য করলেন তিনি, আর যখন আলেক্সেই ক্লান্তিতে সারা হয়ে ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারে, তখন আর একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসে বললেন:

'তাহলে বিমানে চড়ব নাকি আমরা? মনে ত হয় চড়ব। এই যুদ্ধে, বাপু, একটা হাত উড়ে গেছে এমন লোকে দলকে এগিয়ে নিয়ে আক্রমণ চালায়, চরম আহতেরা চালায় মেসিনগান, নিজের শরীর দিয়ে ঠেকায় শত্রুপক্ষের মেসিনগান... যারা মৃত শুধু তারা লড়াই করে না...' বৃদ্ধের মুখে ছায়ার রেশ, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'না, এমন কি মৃতেরা পর্যন্ত লড়ছে... ওদের যশ দিয়ে। হ্যাঁ... আর, ছোকরা, আবার হাঁটতে শুরু করা যাক!'

ওয়ার্ডটা দ্বিতীয় বার ঘুরে বিশ্রাম করার জন্য আলেক্সেই থামল, অধ্যাপক তখন গভজ্‌দেভের বিছানাটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'ট্যাঙ্ক-অফিসারের কী হল? ও কি ছাড়া পেয়েছে?'

মেরেসিয়েভ জানাল যে ট্যাঙ্ক-অফিসার সেরে উঠে নিজের দলে আবার যোগ দিয়েছে। ওর একমাত্র গন্ডগোল হল পোড়ার দাগে মুখটা ভয়াবহভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে নিচের অংশটা।

'তাহলে এরি মধ্যে তোমাকে চিঠি লিখেছে? মেয়েরা ভালোবাসে না বলে ওর হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে মনে হচ্ছে। ওকে বোলো যেন দাড়ি-গোঁফ রাখে। ঠাট্টা করছি না। ওকে তাহলে বেশ স্বতন্ত্র দেখাবে, মেয়েরা পছন্দ করবে।'

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একটি নার্স ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে জানাল জন কমিসার পরিষদ থেকে ওঁকে টেলিফোন করছে। কষ্ট করে উঠলেন অধ্যাপক, যে ভাবে ফোলা চামড়া-খসা হাতদুটো হাঁটুতে রাখলেন আর সেটা

করতে গিয়ে নুয়ে পড়লেন তাতে বোঝা গেল গত কয়েক সপ্তাহে কতটা বুড়িয়ে গেছেন তিনি। দরজায় পেঁছিয়ে মেরেসিয়েভের দিকে ঘুরে প্রফুল্লভাবে বললেন:

'তাহলে ওকে... ওর নাম কী... মানে আপনার বন্ধুকে, চিঠি লিখতে ভুলবেন না... ওকে বলুন যে দাড়ি রাখতে বলেছি আমি। দাওয়াইটা পরখ করা... মেয়েরা দাড়ি খুব ভালোবাসে!'

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লিনিকের একজন পুরোনো পরিচারক মেরেসিয়েভের জন্য একটা ছড়ি নিয়ে এল, আবলুস কাঠের তৈরী, পুরোনো সুন্দর ছড়িটা, হাতির দাঁতের বাঁট, সংক্ষিপ্ত নামাক্ষর চিত্র আঁকা তাতে।

'অধ্যাপক এটা আপনাকে পাঠিয়েছেন,' বলল সে। 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। ওঁর নিজের ছড়ি। উপহার হিসেবে আপনাকে দিয়েছেন। বলেছেন যে ছড়ি নিয়ে আপনাকে হাঁটতে হবে।'

গ্রীষ্মের সেই সন্ধ্যায় হাসপাতালের লোকেদের বিরস লাগছিল, আর তাই ডাইনের, বাঁয়ের, এমন কি ওপরতলার ওয়ার্ড থেকে পর্যন্ত রোগীরা ৪২ নং ওয়ার্ডে এল বেড়াতে, অধ্যাপকের উপহারটি দেখার জন্য। হাঁটার ছড়িটা সত্যিই চমৎকার।

১৫

ফ্রন্টে তখনো ঝড়ের আগের গুমোট ভাব। ইস্তাহারে থাকে স্থানীয় লড়াই'এর আর স্কাউট দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের কথা। হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা কমে গিয়েছে, তাই ৪২ নং ওয়ার্ডের খালি খাটগুলো সরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন অধ্যক্ষ। ওয়ার্ডে রয়ে গেল শুধু মেরেসিয়েভ আর স্ত্রুচকভ; ডানদিকে মেরেসিয়েভের আর বাঁদিকে বাঁধমুখো জানলার কাছে মেজরের খাট।

স্কাউট দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ! মেরেসিয়েভ ও স্ত্রুচকভ দুজনেই অভিজ্ঞ সৈনিক, ওরা জানে যে সাময়িক বিরতি আর কণ্টকৃত প্রশান্তি যত বিলম্বিত হয় তত তীব্র হয় অবশ্যম্ভাবী ঝড়।

একদিনের ইস্তাহার উল্লেখ করল সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, স্নাইপার স্তেপান ইভুশকিনের কথা, দক্ষিণ ফ্রন্টের কোথায় পঁচিশটা জার্মান মেরেছে সে, এই নিয়ে তার মোট সংখ্যা হল দু'শ। গভজ্‌দেভের চিঠি এল। কোথায় আছে, কী করছে সেটা লেখেনি অবশ্য। লিখেছে তার প্রাক্তন সেনানায়ক,

পাভেল আলেক্সেয়েভিচ রতমিস্ত্রভের দলে ফিরেছে সে, জীবনযাত্রা ভালোই চলেছে, প্রচুর চোরি পাওয়া যায় আর সবাই পেট পুরে তাই খায়। আলেক্সেইকে অনুরোধ করেছে যেন চিঠিটা পাবার পর আনিউতাকে এক ছত্র লিখে খবর দেয়। সে-ও লিখেছে আনিউতাকে, কিন্তু চিঠিগুলো পৌঁছিয়েছে কিনা জানে না।

এই দুটো বার্তাতেই যে কোন সৈনিক বুঝতে পারে যে দক্ষিণের কোথাও ঝড় ভেঙ্গে পড়বে। বলাই বাহুল্য, আনিউতাকে চিঠি লিখল আলেক্সেই। অধ্যাপক দাড়ি রাখতে বলেছে, সে উপদেশটাও জানাল গভজ্‌দেভকে আর আনিউতাকে। কিন্তু আলেক্সেই জানত আসন্ন যুদ্ধের সেই অস্থির প্রতীক্ষায় আছে গভজ্‌দেভ যে অবস্থায় প্রত্যেক সৈনিকেরই মন উৎকণ্ঠায়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেও আচ্ছন্ন থাকে, আর সেজন্য দাড়ির, এমন কি হয়ত আনিউতার কথাও ভাবার সময় পাবে না গভজ্‌দেভ।

৪২ নং ওয়ার্ডে প্রীতিকর আর একটি জিনিস ঘটল। একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল যে মেজর পাভেল ইভানভিচ স্ত্রুচকভকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সুখবরেও মেজরের উৎফুল্লতা বেশী দিন জিইয়ে রইল না। আবার বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন সে, ভাঙ্গা হাঁটুদুটোকে বাপান্ত করে, ওদুটোর জন্যই ত এই কর্মমুখর সময়ে বিছানায় বন্দী হয়ে আছে। তার বিরস মেজাজের আর একটি কারণ ছিল, লুকোবার চেষ্টা করলেও অপ্রত্যাশিতভাবে সেটা ধরা পড়ল আলেক্সেই'র কাছে।

হাঁটতে-শেখা মেরেসিয়েভের সমস্ত মন নিবদ্ধ একটিমাত্র বিষয়ে, আশেপাশে কী হচ্ছে প্রায় চোখে পড়ে না তার। প্রতিদিন কী করবে তার একটা তালিকা বানিয়ে কড়াভাবে পালন করে যাচ্ছে: সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এক একটা ঘণ্টা করে, রোজ তিন ঘণ্টা করিডরে কৃত্রিম অঙ্গে হাঁটা অভ্যেস করে সে। নীল গাউন পরে খোলা দরজার সামনে দিয়ে একটা লোক পেণ্ডুলামের মত নিয়মিতভাবে যাচ্ছে আর আসছে, চামড়ার পায়ের মচমচ আওয়াজে করিডরটা মুখর, প্রথম প্রথম অন্যান্য ওয়ার্ডের রোগীরা তাতে বিরক্ত হত; কিন্তু শেষে এটা তাদের এত সয়ে গেল যে দরজা ছাড়িয়ে লোকটি না গেলে দিনের কয়েকটি বিশেষ অংশের কথা কল্পনা করা কঠিন হত তাদের। জিনিসটা এমন দাঁড়িয়েছিল সত্যি যে একদিন মেরেসিয়েভ ফ্লু হওয়াতে শুয়ে আছে; অন্যান্য ওয়ার্ডের রোগীরা লোক পাঠিয়ে খবর নিল পদহীন লেফ্‌টেনাণ্টের কী হয়েছে।

সকালে দৈহিক ব্যায়ামের পরে চেয়ারে বসে আলেক্সেই বিমান চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গচালনায় অভ্যস্ত করাত পাদুটোকে। মাঝেমাঝে অনেকক্ষণ এটা করার জন্য মাথা ঘুরে উঠত, কানে ঝিঁঝিঁ ধরে যেত, চোখের সামনে দেখত উজ্জ্বল সবুজ বৃত্ত, সব ঘুরছে, পায়ের নিচে মেঝেটা দুলে উঠছে। তখন মুখ ধোবার জায়গায় গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকত, যাতে তাড়াতাড়ি সে ভাবটা কেটে যায় আর হাঁটা আর ব্যায়ামের মহড়াটা বাদ না পড়ে।

সে দিন হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘুরে উঠল, হাতড়ে মেরেসিয়েভ ফিরে এল ওয়ার্ডে, চোখে কিছু দেখতে পারছে না, এলিয়ে পড়ল বিছানায়। একটু ধাতস্থ হবার পর হুঁশ হল ওয়ার্ডে কারা কথা বলছে: ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার শান্ত কণ্ঠস্বর, একটু শ্লেষের ভাব তাতে, আর স্ত্রুচকভের। উত্তেজিত অনুনয়-ভরা গলা। কথাবার্তায় এত একাগ্র দুজন যে মেরেসিয়েভের ওয়ার্ডে আসাটা চোখে পড়েনি।

'বিশ্বাস করুন, আমি ঠাট্টা করছি না! বোঝেন না কেন? আপনি ত মেয়েমানুষ না আর কিছু?'

'মেয়েমানুষ ত বটে, কিন্তু কথাটা আমার মাথায় ঢুকছে না, আর এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে কথা বলতে পারেন না আপনি। আপনার আন্তরিকতা চাই না আমি!'

চটে উঠে স্ত্রুচকভ চেঁচিয়ে বলল:

'আপনায় আমি ভালোবাসি, দিব্যি করে বলছি! সেটা যদি না বোঝেন তাহলে মেয়েমানুষ নন আপনি, এক টুকরো পাথর। বুঝেছেন?' মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জানলার শার্সিতে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগল স্ত্রুচকভ।

দক্ষ নার্সের স্বভাবসিদ্ধ লঘু সতর্ক পদক্ষেপে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা গেল দরজার দিকে।

'কোথায় যাচ্ছেন? আমার কথার উত্তর দেবেন না?'

'আমার কাজের সময় এটা, এই নিয়ে কথা বলার স্থান আর কাল এটা নয়।'

'সরাসরি জবাব দিচ্ছেন না কেন? কেন আমাকে জ্বালাচ্ছেন? বলুন!' মেজরের কণ্ঠস্বরে এখন ক্লেশের ভাব।

দোরগোড়ায় থামল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা। অন্ধকার করিডরের পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার পাতলা সুঠাম দেহ। মেরেসিয়েভের ঘুণাক্ষরে কখনো মনে হয়নি এই শান্ত নার্সটি, যৌবন যার অতিক্রান্ত, নারীসুলভভাবে এত

দৃঢ়বদ্ধ আর কমনীয় হতে পারে। মাথা পিছনে হেলিয়ে দোরগোড়ায় থেমে মেজরের দিকে তাকাল সে, যেন অনেক উঁচু থেকে দেখছে।

'বেশ,' সে বলল 'জবাব দিচ্ছি। আমি আপনাকে ভালোবাসি না, হয়ত কখনো ভালোবাসতে পারব না।'

চলে গেল ও। মেজর বিছানায় আছড়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। এবারে মেরেসিয়েভ বুঝতে পারল মেজরের গত কয়েকদিনের বিচিত্র ব্যবহারের কারণটা কী, নার্স ঘরে এলে কেন খিটখিটে আর অস্থির হয়ে যেত ও, কেনই বা ফুর্তির ভাব সহসা পরিণত হত বিকট রাগের উচ্ছ্বাসে।

সত্যিকারের যন্ত্রণায় নিশ্চয়ই ও ভুগছে। মেজরের জন্য দুঃখিত বোধ করল আলেক্সেই, সঙ্গে সঙ্গে খুসিও হল। বিছানা ছেড়ে মেজর উঠছে, ওকে ক্ষেপাবার লোভ সামলাতে পারল না আলেক্সেই।

'কী, কমরেড মেজর, মুখে থুতু দিতে পারি কি?'

কথাটায় মেজরের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে জানলে ঠাট্টা করেও বলত না ওটা আলেক্সেই। আলেক্সেই'র খাটে ছুটে এসে হতাশা গভীর কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে উঠল স্ত্রুচকভ.

'থুতু ফেলো, হ্যাঁ, থুতু ফেলো! ফেললে ঠিকই করবে। আমার উচিত শাস্তি হবে। কিন্তু কী করব এখন বাতলাও ত? বলো বলো, কী করব? আমাদের কথাবার্তা শুনেছ ত?'

মাথা টিপে খাটে বসে পড়ল স্ত্রুচকভ, দেহটা এদিক ওদিক দুলছে।

'তোমার হয়ত মনে হচ্ছে যে ঠাট্টা করছিলাম? ঠাট্টা করছিলাম না। সত্যি কথা বলছিলাম। নির্বোধ মেয়েটাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম!'

সন্ধ্যেবেলায় রোঁদে যথারীতি ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা। শান্ত সহিষ্ণু আর সহৃদয় মনোভাবে কোন পরিবর্তন নেই। স্থিরতার প্রতিমূর্তি যেন। মেরেসিয়েভ আর মেজরের দিকে তাকিয়ে হাসল। মেজরের দিকে কিন্তু তাকাল উৎকণ্ঠায় এমন কি সভয়ে।

জানলার ধারে বসে মেজর নখ কামড়াচ্ছিল, করিডরে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাকাল, চাউনিতে সশ্রদ্ধ ক্রোধের ছাপ।

'সোভিয়েত দেবীই বটে!' গরগর করে উঠল মেজর। 'নামটা দিয়েছিল কোন বোকা? নার্সের পোশাকে শয়তানী!'

অফিসের নার্স, জীর্ণশীর্ণ মধ্যবয়স্কা মহিলা ওয়ার্ডে এসে জিজ্ঞেস করল:

'মেরেসিয়েভ আলেক্সেই, হাঁটতে পারার মত রোগী কি সে?'

'না, দৌড়ঝাঁপ করা রোগী,' খেঁকিয়ে উঠল স্ত্রুচকভ।

'ইয়ার্কি করার জন্যে এখানে আসিনি,' কঠোর স্বরে নার্স বলল। 'মেরেসিয়েভ আলেক্সেই, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, টেলিফোনে ডাকছে তাকে।'

'কোন কমবয়সী মেয়ে ডাকছে?' চাঁচিয়ে উঠে চোখ ঠেরে ক্রুদ্ধ নার্সকে স্ত্রুচকভ জিজ্ঞেস করল।

'ওর বিয়ের নথিপত্র দেখিনি আমি,' হিসহিস করে উঠল নার্স, সগাম্ভীর্যে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে।

একলাফে বিছানা থেকে নামল মেরেসিয়েভ। মহাফুর্তিতে ছড়ি নিয়ে ঠকঠক করে হেঁটে নার্সটিকে ধরে ফেলল আর সত্যি সত্যি দৌড়িয়ে নামল সিঁড়ি দিয়ে। প্রায় মাস খানেক ওলিয়ার জবাবের আশায় আছে মেরেসিয়েভ, চকিতে মনে হল, তাহলে ওলিয়াই কি ফোন করছে? কিন্তু সেটা হতে পারে না। এ সময়ে স্তালিনগ্রাদের কাছাকাছি জায়গাটা থেকে মস্কো আসা ওর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাছাড়া হাসপাতালেও মেরেসিয়েভকে খুঁজে বের করবে কেমন করে? মেরেসিয়েভ ত ওকে জানিয়েছে যে সে ফ্রণ্টের পিছনে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, মস্কোতে নয়, উপকণ্ঠে।

কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে অলৌকিকে আস্থাবান আলেক্সেই, নিজের অলক্ষিতে দৌড়ল ও, কৃত্রিম পায়ে এই প্রথম দৌড়নো তার; কেমন দুলে দুলে এগোচ্ছে, মাঝেমাঝে শুধু ভর দিচ্ছে ছড়িতে, বুটদুটো মচমচ, মচমচ করে চলেছে...

রিসিভারটা তুলে নেওয়াতে কানে এল প্রীতিকর গভীর কিন্তু একেবারে অচেনা কণ্ঠস্বর। ব্যক্তিটি জানতে চাইল সে ৪২ নং ওয়ার্ডের সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আলেক্সেই পেত্রভিচ মেরেসিয়েভ কি না।

প্রশ্নটাতে যেন অবমাননাসূচক কিছু আছে, তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ গলায় খেঁকিয়ে উঠল মেরেসিয়েভ:

'হ্যাঁ!'

এক মুহূর্ত কোন সাড়া নেই, তারপর ব্যক্তিটি ওকে বিরক্ত করার জন্য মাপ চাইল, কণ্ঠস্বর এখন উদাসীন আর আড়ষ্ট, স্পষ্টতই মেরেসিয়েভের সংক্ষিপ্ত উত্তরে চটেছে, বেশ চেষ্টা করে বলে চলল:

'আমি আন্না গ্রিবভা, লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভের বন্ধু। আমাকে চেনেন না আপনি,' উদাসীন উত্তরে ব্যথিত হয়ে করুণভাবে বলল মেয়েটি।

দুহাতে রিসিভারটা আঁকড়ে ধরে মেরেসিয়েভ প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলল:

'আপনি আনিউতা? আনিউতা? বিলক্ষণ চিনি আপনাকে: গ্রিশা আমাকে বলেছে...'

'ও এখন কোথায়? কী হয়েছে ওর? এমন ঝট করে চলে গেল! সাইরেন বাজতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, প্রাথমিক সাহায্যকারীদের সঙ্গে কাজ করি আমি, জানেন ত, ফিরে যখন এলাম তখন ও চলে গিয়েছে, কোন চিঠি কিম্বা ঠিকানা রেখে যায়নি... ভাই আলিওশা! এরকম করে ডাকার জন্যে মাপ করবেন, আপনাকেও চিনি আমি, ওর জন্যে ভয়ানক উদ্বিগ্ন লাগছে। কোথায় আছে, কেন ওরকম ঝট করে চলে গেল, জানতে মন চাইছে আমার...'

মরমী অনুভূতিতে আলেক্সেই'র বুক ভরে উঠল। বন্ধুর জন্য খুসি লাগল নিজেকে। লোকটা মজার, ভুল করেছিল ও, নিতান্ত অভিমানী লোক। তাহলে সৈনিকের বিকলাঙ্গতায় সত্যিকারের মেয়েরা ভয় পায় না। তার মানে, ও নিজেও ধরে নিতে পারে যে তার জন্য একজন কেউ উদ্বিগ্ন, ঠিক এরকম ভাবেই খুঁজছে তাকে। বিদ্যুৎ ঝলকের মত কথাগুলো তার মনে এল, রিসিভারে মুখ রেখে উত্তেজনায় প্রায় থুতু ছিটিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'আনিউতা! সবকিছু ঠিক আছে! দুজনের বুঝতে ভুল হয়েছিল, সেটা দুঃখের কথা। ও খুব ভালো আছে, আবার কাজ করছে। সত্যি! ফীল্ড পোস্ট ওর ৪২৫৩১-বি। দাড়ি রাখছে গ্রিশা, সত্যি বলছি, আনিউতা! খাসা দাড়ি একটা... এই যেমন পার্টিজানরা রাখে! বেশ মানায় ওকে!'

দাড়ি রাখাটার তারিফ করল না আনিউতা। ওর মতে কোন দরকার নেই সেটার। কথাটা শুনে আরো খুসি হয়ে মেরেসিয়েভ বলল সত্যিই যদি তাই হয় তাহলে গ্রিশা ত এক নিমেষে দাড়ি ত্যাগ করবে, যদিও সবাই বলছে দাড়ি রাখাতে ওকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে।

শেষে রিসিভার নামিয়ে যখন রাখা হল দুজনেই তখন পরম বন্ধু, ঠিক হল যে হাসপাতাল ছাড়ার আগে মেরেসিয়েভ ওকে ফোন করবে।

ওয়ার্ডে ফিরে যেতে যেতে আলেক্সেই'র মনে পড়ল যে টেলিফোন ধরার সময়ে ছুটে গিয়েছিল ও। আবার দৌড়তে চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু সুবিধে হল না। কৃত্রিম পায়ের চাপে তীক্ষ্ন যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর ব্যথিয়ে

উঠছে। যাক গে, ভাববার কিছু নেই! আজ দৌড়তে পারছে না বটে, কাল পারবে, কাল যদি না পারে তাহলে পরশু, আর চুলোয় যাক, দৌড়বেই সে! সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে! আবার দৌড়তে, বিমান চালাতে আর লড়তে পারবে সে। শপথ করতে ভালোবাসে আলেক্সেই, তাই শপথ করল যে প্রথম আকাশ-যুদ্ধের পরে, প্রথম জার্মান বিমান নামাবার পরে ওলিয়াকে সবকিছু লিখে জানাবে। যা ঘটে ঘটুক!

তৃতীয় খণ্ড

১

১৯৪২-এর ভরা গ্রীষ্মে একটি বলিষ্ঠ যুবক আবলুস কাঠের মোটা ছড়িতে ভর দিয়ে মস্কোর আর্মি হাসপাতালের ওকের ভারী দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। বিমান বাহিনীর শক্ত-কলার কোট আর ট্রাউজার পরনে. কলারে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের পরিচয়-চিহ্ন। সঙ্গে শাদা ওভারঅল গায়ে একটি মেয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে নার্সরা যেরকম রেডক্রস মার্কা রুমাল মাথায় দিত সেরকম রুমাল মাথায় তার, কোমল সুন্দর মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ এনেছে সেটা। প্রবেশদ্বারের বারান্দায় দাঁড়াল দুজনে। তোবড়ানো রঙচটা বাহিনীর টুপিটা খুলে বৈমানিক নার্সের হাতে চুম্বন করার জন্য ঝুঁকল আনাড়িভাবে। দুহাতে তার মাথা ধরে নার্স কপালে চুম্বন করল। তারপর বৈমানিক, একটু দুলে দুলে হাঁটার ভঙ্গী তার, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামল, পিছন ফিরে আর না তাকিয়ে এ্যাসফল্টের বাঁধ হয়ে হাসপাতাল ছাড়িয়ে চলে গেল।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নীল হলদে আর খয়েরী রঙের পাজামা-পরা রোগীরা, কেউ হাত, কেউ হাঁটবার ছড়ি আর কেউবা ক্রাচ নেড়ে চেঁচিয়ে বিদায়কালীন উপদেশ দিচ্ছে বৈমানিককে। উত্তরে হাত নাড়ল সে, কিন্তু বোঝা গেল এই বড়ো ধূসর বাড়িটা যত শীগগির সম্ভব পেরিয়ে যেতে চায় সে, নিজের উত্তেজনা গোপন করার জন্য তাড়াতাড়ি জানলার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তাড়াতাড়ি হাঁটছে, ছড়িতে অল্প ভর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে। প্রতি পদক্ষেপে অস্পষ্ট মচমচ আওয়াজ না হলে কারো মনে হত না যে এই সুগঠিত বলিষ্ঠ চেহারার কর্মঠ লোকটির পায়ের পাতা নেই।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে তাড়াতাড়ি যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে সেজন্য আলেক্সেইকে পাঠানো হয় মস্কোর কাছে বিমান বাহিনীর স্বাস্থ্যাগারে। মেজর স্ত্রুচকভকেও পাঠানো হয় সেখানে। ওদের স্বাস্থ্যাগারে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি এসেছিল, কিন্তু মেরেসিয়েভ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে বলল যে মস্কোতে ওর আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবে না। কিট-ব্যাগটা স্ত্রুচকভের কাছে রেখে হেঁটে রওনা হল সে, কথা দিল বৈদ্যুতিক ট্রেনে সন্ধ্যেবেলায় স্বাস্থ্যাগারে পেঁছিবে।

মস্কোতে কোন আত্মীয় ছিল না আলেক্সেই'র, কিন্তু রাজধানী ঘুরে দেখবার খুব সখ তার, বিনা সাহায্যে হাঁটতে কতটা পারে পরীক্ষা করতে চায়, ওর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই এমন সরব জনতার মধ্যে যেতে চায়। টেলিফোনে আনিউতাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে বারোটা নাগাদ সে দেখা করতে পারে কি না। কোথায়? এই ধরো, পুশকিন স্মৃতিস্তম্ভের কাছে... আর তাই গ্রানিট-বদ্ধ মহিমান্বিত নদীটির বাঁধ ঘেঁষে চলেছে সে, নদীর ছোট ছোট ঢেউ রোদে চিকচিক করছে। হাঁটতে হাঁটতে মিষ্টি চেনা গন্ধে ভরপুর গ্রীষ্মের উষ্ণ হাওয়া প্রাণভরে নিচ্ছে সে।

চারিদিকে সবকিছু কী সুন্দর!

মেয়েরা হেঁটে চলে যাচ্ছে। সবাইকে সুন্দর লাগছে তার; সবুজ গাছগুলো কী অসম্ভব উজ্জ্বল! হাওয়া এত সুগন্ধি যে মাতালের মত ওর মাথা ঘুরছে, এত পরিষ্কার যে পরিপ্রেক্ষিত বোধ থাকছে না, মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই এর আগে শুধু ছবিতে দেখা ক্রেমলিনের প্রাকারগুলো স্পর্শ কবতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে মহান ইভানের ঘণ্টাঘরের গম্বুজ আর নদীর উপরে ভারীভাবে আনত সেতুর বিরাট নিচু খিলানটা। মিষ্টি মাতাল-করা গন্ধে সহর আচ্ছন্ন, নিজের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। গন্ধটা আসছে কোথা থেকে? হৃৎস্পন্দন এত দ্রুত কেন, কেন মায়ের কথা মনে পড়ছে, আজকের শীর্ণা বৃদ্ধাটি নয়, আগেকার সেই নবীনা দীর্ঘাকৃতি মানুষটির কথা, চুল যাঁর অসম্ভব সুন্দর ছিল? মায়ের সঙ্গে কখনো ত সে মস্কোয় আসেনি।

এর আগে মস্কোর সঙ্গে মেরেসিয়েভের পরিচয় হয় শুধু পত্রিকা আর সংবাদপত্রে ছবির মাধ্যমে, বই পড়ে, যারা সহরটা দেখেছে তাদের কাছে শোনা কথায়, রেডিওতে শোনা সহরের উপরে মধ্যরাত্রে মুখরিত প্রাচীন ঘড়িটির ঘণ্টায় আর উৎসবের দিনে শোভাযাত্রা আর সমাবেশের নানা

বিশৃঙ্খল ধ্বনিতে। আর আজ গ্রীষ্মের তপ্ত আলোয় বিচ্ছুরিত সহরটি চোখের সামনে বিস্তৃত!

ক্রেমলিনের প্রাকারের ধার ঘেঁষে জনহীন বাঁধ দিয়ে এগল মেরেসিয়েভ, জিরিয়ে নেবার জন্য ঠান্ডা গ্রানিট পারাপেটে ভর দিয়ে দাঁড়াল, নিচে চেয়ে দেখল ধূসর তৈলাক্ত জল গ্রানিট দেয়ালের গায়ে ঝুপঝুপ করে লাগছে, তারপর আস্তে আস্তে চড়াই ভেঙ্গে উঠল সেই পথে যেটা গিয়েছে রেড স্কোয়ারের দিকে। এ্যাসফল্টের রাস্তায় আর স্কোয়ারে লাইমগাছগুলোতে ফুল ফুটেছে, ছাঁটা চূড়োয় চূড়োয় সহজ মিষ্টি গন্ধে ভরা ফুলে মৌমাছির ব্যস্ত গুঞ্জন, চলন্ত মোটরগাড়ির হর্ণের আওয়াজ, ট্রামের ঢংঢং শব্দ, তপ্ত এ্যাসফল্ট থেকে ওঠা তেলের ধোঁয়াচ্ছন্ন ঝিকমিকে ঝাপসা চাদর কিছুরই পরোয়া করছে না মৌমাছিগুলো।

এই তাহলে মস্কো!

হাসপাতালে চার মাস কাটাবার পর গ্রীষ্মের এই মহিমায় এত অবাক আলেক্সেই যে প্রথমে তার চোখে পড়ল না যে রাজধানীর শরীরে এখন যুদ্ধের সজ্জা, অবস্থাটা এখন, বিমান বাহিনীতে যাকে বলা হয় "পয়লা নম্বরের প্রস্তুতি," অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তৈয়ার। সেতুর কাছে চওড়া রাস্তাটা প্রকান্ড কুৎসিৎ একটা ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো, বালিতে-ভরা কাঠের বাক্স দিয়ে তৈরী সেটা। সেতুর কোণে কোণে উদ্যত চতুশ্ছিদ্র মুখ, কামান বসানোর কংক্রিট জায়গা, যেন কোন বাচ্চা টেবিলে খেলনার ছক ফেলে গিয়েছে। রেড স্কোয়ারের ধূসর বুকে বাড়িঘরদোর, বীথি আর বড়ো রাস্তা নানা রঙে আঁকা হয়েছে। গোর্কি স্ট্রীটে দোকানগুলোর জানলা তক্তা আর বালির থলেয় ঢাকা: গলিগুলোতে রেল কণ্টকিত "সজারু", বাচ্চাদের পরিত্যক্ত খেলনার মত দেখাচ্ছে তাদেরো। ফ্রণ্ট থেকে আসা কোন সৈনিকের চোখে কিছু অস্বাভাবিক লাগবে না এসব, বিশেষ করে সে যদি আগে মস্কো দেখে না থাকে। দোকানের জানলা আর দেয়ালে লাগানো "তাস"এর গবাক্ষগুলো পথচারীদের দিকে তাকিয়ে আছে, কয়েকটা বাড়ির সামনের দিকে বিচিত্রভাবে রং দেওয়া হয়েছে, কিম্ভূতকিমাকার ফিউচরিষ্ট ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় সেটা, শুধু এগুলো দেখতে অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক।

মেরেসিয়েভ বেশ ক্লান্ত এখন; বুটদুটো মচমচ করছে, ছড়িতে আগের চেয়ে বেশী করে ভর দিয়ে গোর্কি স্ট্রীট হয়ে চলল সে; চারিদিকে তাকিয়ে

অবাক হয়ে যাচ্ছে সে — বোমার ছোট বড়ো গর্ত, বিধ্বস্ত বাড়ি, হাঁ-করা ফাঁকা জায়গা, ভাঙ্গা জানলা, কিছুই চোখে পড়ছে না ত। খুব পশ্চিমের দিকে বিমান-ঘাঁটিতে কাজ করেছে সে, প্রায় প্রতি রাত্রে ডাগ-আউটের উপর দিয়ে ঢেউ'এর পর ঢেউ'এ জার্মান বোমারু বিমানের পূবমুখো যাত্রার শব্দ শোনা তার অভ্যেস। এক দল চলে যেত, শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে না যেতে আসত আর একটা ঝাঁক, আর মাঝেমাঝে সারা রাত ধরে চলত বিমানগর্জন। বৈমানিকেরা জানত ফ্যাশিস্টরা যাচ্ছে মস্কোর দিকে, কী নরকের আগুন জ্বলেছে সেখানে কল্পনা করত।

আর আজ যুদ্ধকালীন মস্কোতে ঘুরতে ঘুরতে বিমান আক্রমণের চিহ্ন খুঁজে কিছু দেখতে পেল না মেরেসিয়েভ। এ্যাসফল্টের রাস্তাগুলো মসৃণ, বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ঠ সার বেঁধে। এমন কি কাগজ-আঁটা জানলাগুলো পর্যন্ত অক্ষত, মাত্র কয়েকটা বাদ দিয়ে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র বেশী দূরে নয়, সেটা বোঝা যায় বাসিন্দেদের ক্লান্ত শ্রান্ত মুখ থেকে। বাসিন্দেদের অর্ধেক সৈনিক, ধূলিধূসর তাদের উঁচু বুটগুলো, ঘামে পিঠে লেপটে আছে টিউনিক, পিঠে ন্যাপসাক। গলি থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল বড়ো রাস্তায় হঠাৎ এসে পড়ল লম্বা সারি বেঁধে একদল লরি, ধুলোয় আচ্ছন্ন, মাডগার্ড তোবড়ানো, উইন্ড-স্ক্রিণ ভেঙ্গে গিয়েছে। নড়বড়ে লরিগুলোতে যাত্রী সৈনিকেরা সকৌতূহলে চারিদিকে তাকাচ্ছে, হাওয়ায় উড়ছে কেপগুলো। লরির সারিটা ট্রলিবাস মোটরগাড়ি আর ট্রাম পেরিয়ে এগিয়ে গেল; শত্রুপক্ষ যে বেশী দূরে নয় তার জাজ্বল্য প্রমাণ সেটা। লরিগুলোর দিকে আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে রইল মেরেসিয়েভ, ভাবল, যদি ধূলিধূসর লরিগুলোর একটায় লাফিয়ে উঠতে পারে তাহলে সন্ধ্যার মধ্যে ফ্রণ্টে, নিজের বিমান-ঘাঁটিতে পেঁাছিয়ে যাবে! দেগতিয়ারেঙ্কোর সঙ্গে যে ডাগ-আউটে থাকত তার কথা ভাবল, ফার কাঠের খাট, আলকাতরা ও ফারগাছের গন্ধ, চ্যাপটা কার্তুজ থেকে তৈরী সেই আদিম প্রদীপটা থেকে পেট্রলের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরোচ্ছে, সকালে ইঞ্জিনের গর্জন, তাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে সেগুলো, আর মাথার উপরে কখনো থামে না দোদুল্যমান পাইনগাছের মর্মরধ্বনি। ডাগ-আউটটা তার নিজের বাড়ির মত মনে হল, চুপচাপ আরামে-ভরা বাড়ি। সেই জলাভূমিটায়, স্যাঁতসেঁতে বলে বৈমানিকদের চক্ষুশূল ছিল যেটা, সেই ভেজা মাটি আর মশার অবিরাম গুঞ্জনে-ভরা জায়গাটাতে যদি তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়তে পারে!

বেশ কষ্টে পা ফেলে পুশকিন স্মৃতিস্তম্ভের দিকে চলল মেরেসিয়েভ।

পথে জিরোবার জন্য কয়েকবার থামল. ছড়িতে দুহাতে ভর দিয়ে এমন ভাব দেখাল যেন দোকানের জানলায় টুকিটাকি জিনিস খুঁটিয়ে দেখছে। স্মৃতিস্তম্ভে পেঁাছিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটি গরম সবুজ বেঞ্চে বসে পড়ল, পড়ে গেল বলা চলে। কৃত্রিম চেটোর ফিতের চাপে পাদুটো যন্ত্রণায় জ্বলছে, পা ছড়িয়ে বসল মেরেসিয়েভ। ক্লান্ত লাগছে. কিন্তু আনন্দের ভাবটা কেটে যায়নি একেবারে। অদ্ভুত সুন্দর রোদে-ভরা এই উজ্জ্বল দিনটি! রাস্তার মোড়ে বাড়িটার কোণের মিনারে পাথরের একটা স্ত্রীমূর্তি, তার উপরে আকাশটাকে অসীম মনে হচ্ছে। প্রশস্ত বীথি হয়ে হালকা হাওয়ায় আসছে লাইমগাছের তাজা মিষ্টি গন্ধ। ঢংঢং আওয়াজে ফুর্তিতে চলেছে ট্রামগুলো. স্মৃতিস্তম্ভের তলায় বাচ্চারা তাড়াহুড়ো করে শুকনো গরম বালি খুঁড়ছে, পাণ্ডুর আর রোগা তারা, কিন্তু হাসিটা খুসিতে উজ্জ্বল। বড়ো রাস্তায় আরো এগিয়ে. দড়ির বেড়ার আড়ালে চোখে পড়ে বিমান-রোধক বেলুন-বাঁধের রুপালী, চুরোট-আকৃতি দেহ. খরখরে ফৌজী টিউনিক-পরা গোলাপী-গাল দুটি মেয়ে সেটা পাহারা দিচ্ছে। যুদ্ধের এই অস্ত্রটিকে মস্কো আকাশের নিশা-প্রহরীর মত ঠেকল না মেরেসিয়েভের কাছে. বরঞ্চ মনে হল চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে এসে কোন বিপুলকায় নিরীহ জন্তু গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় ঝিমোচ্ছে।

চোখ বুজে আকাশের দিকে হাসি-মুখ ফেরাল মেরেসিয়েভ।

প্রথম প্রথম বাচ্চারা বৈমানিককে মনোযোগ দিয়ে দেখেনি। তাদের দেখে ৪২ নং ওয়ার্ডের জানলার কাঠে বসা চড়ুইগুলোর কথা মনে হল মেরেসিয়েভের, ওরা কিচির মিচির করে চলেছে. আর ও সমস্ত শরীর দিয়ে সূর্যের উত্তাপ আর রাস্তার নানা শব্দ গ্রহণ করছে। কিন্তু খেলার সাথীদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে গিয়ে একটা ক্ষুদে মেরেসিয়েভের ছড়ানো পায়ে হোঁচট খেয়ে ধড়াস করে বালির উপরে পড়ল।

মুহূর্তের জন্য বাচ্চাটির মুখ কান্নায় বিকৃত হয়ে উঠল, তারপরে এল হতবুদ্ধি ভাব. তারপর বিভীষিকা। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে তড়তড় করে ছুটে পালাল সে। বাচ্চার ঝাঁক তাকে ঘিরে দাঁড়াল, কিছুক্ষণ চলল ভয়ের কিচির মিচির, আড়চোখে বৈমানিককে দেখা। তারপর আস্তে আস্তে চোরের মত ওরা মেরেসিয়েভের কাছে এগিয়ে এল।

চিন্তায় একাগ্র মেরেসিয়েভ কিছুই লক্ষ্য করেনি। চোখ খুলে দেখল বাচ্চাগুলো ভয়ে আর বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, আর শুধু তখনি ওরা কী বলছে হুঁশ হল তার।

'মিথ্যে কথা বলছিস তুই, ভিতামিন! আসল বৈমানিক ও। সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' বছর দশেকের একটি ফ্যাকাশে ক্ষীণ ছেলে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল।

'মিথ্যে বলছি না। সাঁচ্চা পাইওনিয়রের কথা দিচ্ছি, মিথ্যে বললে যেন জিভ খসে যায়! সত্যি ওগুলো কাঠের! আসল নয়, কাঠের।'

বুক মুচড়িয়ে উঠল মেরেসিয়েভের, তৎক্ষণাৎ দীপ্ত দিনটা অন্ধকার হয়ে এল তার কাছে। চোখ তুলে তাকাল, তা দেখে পিছু হটে গেল বাচ্চারা, তখনো ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। বন্ধুর সন্দিগ্ধচিত্ততায় বিরক্ত হয়ে ভিতামিন যুদ্ধং দেহি ভঙ্গীতে বলল:

'যদি বলিস ত ওকে জিজ্ঞেস করি। ভেবেছিস ভয় পেয়েছি? বাজী রাখবি নাকি?'

দল ছেড়ে আস্তে আস্তে সাবধানে আড়ভাবে ও এল মেরেসিয়েভের কাছে, এক ছুটে পালাতে প্রস্তুত, হাসপাতালের জানলায় বসা "সাব-মেসিনগানার"এর মত। অবশেষে স্টার্ট লাইনের কাছে দৌড়িয়ের মত কুঁজো আর টান-টানভাবে দাঁড়িয়ে সাহস করে জিজ্ঞেস করল:

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, আপনার পাদুটো কী ধরনের, আসল না কাঠের? আপনি কি পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন?'

বাচ্চাটি দেখল বৈমানিকের চোখ জলে ভরে গেল। যদি লাফিয়ে উঠে মেরেসিয়েভ চেঁচাত আর সোনালী অক্ষর বসানো মজার ছড়িটা দিয়ে তাড়া করত ওকে, তাহলে ততটা আশ্চর্য হত না বাচ্চাটি যতটা হল বিমান বাহিনীর একজন লেফ্‌টেনাণ্টকে কাঁদতে দেখে। "পঙ্গু" শব্দটি উচ্চারণ করে বৈমানিককে যে ব্যথা দিয়েছে সেটা বুঝল না, অনুভব করল সে তার ছোট্ট বুকে। কোন কথা না বলে বাচ্চাদের ভিড়ে ফিরে গেল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা, যেন গরম হাওয়ায় উবে গিয়েছে, সে হাওয়ায় মধুর আর তপ্ত এ্যাসফল্টের গন্ধ।

আলেক্সেই'র নাম ধরে কে ডাকল। তক্ষুণি উঠে পড়ল সে। সামনে দাঁড়িয়ে আনিউতা। তৎক্ষণাৎ চিনল তাকে, যদিও ফটোতে যেমন তেমন সুন্দর নয়। ওর মুখ বিবর্ণ আর শ্রান্ত, গায়ে টিউনিক, পায়ে উঁচু বুট, মাথায় বসানো বাহিনীর পুরোনো মলিন টুপি। কিন্তু সবজে, একটু বেরিয়ে-আসা চোখে এমন সহজ ও দীপ্তভাবে ও তাকাল মেরেসিয়েভের দিকে, সে

দৃষ্টিতে প্রীতির এমন বিকিরণ যে অচেনা মেয়েটিকে অনেক দিনের চেনা লোক মনে হল, যেন শৈশবে একই উঠোনে দুজনে খেলেছে।

এক মুহূর্ত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা না বলে। অবশেষে মেয়েটি বলল:

'আপনার একেবারে অন্য রকম চেহারা ভেবেছিলাম!'

'কী রকম চেহারা?' জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ. মুখের হাসিটা ঠিক মানানসই নয়, তবে সেটাকে তাড়াতে পারল না সে।

'কী করে বোঝাই, ভাবছি! এই ধরুন, বীরের মত চেহারা, লম্বা আর চওড়া। হ্যাঁ, ঠিক সে রকম, আর চোয়ালটা ভারী, এরকম, মুখে একটা পাইপ... গ্রিশা আপনার কথা এত লিখত!'

'আপনার গ্রিশা, সে কিন্তু সত্যিকারের বীর!' বাধা দিয়ে বলল আলেক্সেই। আর মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখে একই ঢঙে বলে চলল "আপনার" কথাটায় জোর দিয়ে, 'মানুষের মত মানুষ আপনার গ্রিশা! আমি আর এমন কী? কিন্তু আপনার গ্রিশা... মনে হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে ও আপনাকে কিছু বলেনি...'

'কী জানেন, আলিওশা... আপনাকে আলিওশা বলে ডাকতে পারি ত?..ওর চিঠিপত্রে এই নামটিই আমার খুব চেনা... মস্কোতে আপনার অন্য কাজ নেই ত? তাহলে আমার বাড়িতে চলুন। আমার কাজ শেষ, সারা দিন আর কাজ নেই। চলুন! বাড়িতে কিছু ভদকা আছে। ভদকা আপনার ভালো লাগে? কিছু খাওয়াব চলুন।'

সে নিমেষে আলেক্সেই'র স্মৃতির গভীর থেকে এক ঝলকে চোখের সামনে এল মেজর স্ত্রুচকভের সেয়ানা মুখ, দ্বেষ-কলুষ কণ্ঠে যেন বলছে: "দেখছ ত? কী ধরনের মেয়ে বোঝো এবার! একলা থাকে! ভদকা! বেশ, বেশ!" কিন্তু স্ত্রুচকভ এত লজ্জাকরভাবে নাজেহাল হয়েছে যে ওর কোন কথায় কান দেবে না আলেক্সেই। সন্ধ্যা হতে অনেক দেরী, তাই প্রশস্ত বীথি ধরে বেড়াল তারা, পুরোনো বন্ধুর মত গল্প করে চলেছে উৎফুল্লভাবে। যুদ্ধের শুরুতে কী বিপর্যয় ঘটেছিল গভজ্‌দেভের সেটা আলেক্সেই বলার সময়ে চোখের জল চাপার জন্য আনিউতা ঠোঁট কামড়াল, দেখে খুসি হল ও। ফ্রণ্টে ওর কীর্তিকলাপের কথা শোনার সময়ে মেয়েটির সবজে চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। গভজ্‌দেভের সম্বন্ধে কী গর্বিত মেয়েটি! খুঁটিনাটি খবর, আরো খবর জানবার জন্য প্রশ্ন করছে, আর গালদুটো কেমন টকটকে

লাল হয়ে উঠেছে! কী কারণে জানি না, নিজের মাইনের সার্টিফিকেট গভজ্‌দেভ ওকে পাঠিয়েছে শুনে কী চটেই না উঠল আনিউতা! আর ওরকম ভাবে পালিয়ে গিয়েছিল কেন সে, কোন কথা না বলে, চিঠি না লিখে, ঠিকানা না জানিয়ে! সামরিক গুপ্ত কথা গোছের ব্যাপার না কি? কিছু না বলে, কিছু না লিখে চলে যাওয়াটা বুঝি সামরিক গুপ্ত কথার রেওয়াজ?

'ভালো কথা, ও দাড়ি রাখছে সেটা এত জোর দিয়ে কেন বলছিলেন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইল আনিউতা।

'এমনি বলে ফেলেছিলাম, কিছু নয় ওটা,' এড়িয়ে যাবার মত করে বলল আলেক্সেই।

'না, ঠিক বলুন ত! না বললে আপনাকে ছাড়ছি না। ওটাও কি সামরিক গুপ্ত কথা?'

'তা নয় নিশ্চয়। আমাদের অধ্যাপক ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ... মানে... বলেছিলেন দাড়ি রাখতে এই আর কি... যাতে মেয়েরা মানে বিশেষ একটি মেয়ে, ওকে বেশী পছন্দ করে।'

'ও, তাই বুঝি! এখন ব্যাপারটা সাফ হল!'

আনিউতার সবজে চোখের জ্যোতি হঠাৎ মিলিয়ে গেল, মনে হল বয়স বেড়ে গিয়েছে। মুখের পাণ্ডুর ভাব হল স্পষ্টতর, পাতলা বলিরেখা — এত সূক্ষ্ম যে মনে হয় ছুঁচ দিয়ে আঁকা — দেখা গেল কপালে, চোখের কোণে; জীর্ণ পুরোনো টিউনিক, গাঢ় কটা চুলের উপরে বাহিনীর মলিন টুপি, সব মিলিয়ে ওকে দেখাল ক্লান্ত শ্রান্ত। শুধু ছোট ভরাট উজ্জ্বল লাল ঠোঁটজোড়া, গোঁফের অতি সূক্ষ্ম আভাস, আর উপরের ঠোঁটে ছোট্ট তিলটি দেখে বোঝা যায় তার বয়স এখনো কম, খুব বেশী হলে বিশ।

জমকালো নানা বাড়ি, তাদের ছায়ার নিচে প্রশস্ত রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে যেতে রাস্তা ছেড়ে কয়েক পা এগোল, সামনে দেখা গেল ছোটখাটো একটা বাড়ি, ছোট জানলাগুলো জরায় জীর্ণ; এরকম মস্কোতে দেখা যায়। এমন একটা বাড়িতে আনিউতা থাকে। সংকীর্ণ সিঁড়ি হয়ে ওরা গেল উপর তলায়, সিঁড়িতে বেড়াল আর কেরোসিনের গন্ধ। চাবি দিয়ে দরজা খুলল আনিউতা। অপরিসর প্রবেশপথে ঠাণ্ডায় রাখা খাবারদাবারের থলে, টিনের পাত্র কয়েকটা আর কৌটো, সেগুলো পেরিয়ে ওরা ঢুকল একটা বড়ো, শূন্য

রান্নাঘরে, ছোট বারান্দা হয়ে থামল একটা নিচু দরজার সামনে। অন্য দিকের দরজা দিয়ে মাথা বের করল ছোটখাটো শীর্ণা একটি বৃদ্ধা।

'আন্না দানিলভনা তোমার একটা চিঠি আছে,' বলল সে। ঘরে ঢোকা না পর্যন্ত সকৌতূহল ওদের দেখে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আনিউতার বাবা একটা ইনস্টিটিউটে পড়ান। ইনস্টিটিউটের লোকজন সরাবার সময়ে ওর বাবা-মাও চলে যান। দুটো ঘর লিনেন দিয়ে ঢাকা আসবাবপত্রে বোঝাই, আসবাবের দোকানের মত, রয়ে গেল মেয়ের তদারকে। আসবাবপত্রে, দরজা আর জানলায় ভারী পুরোনো পর্দায়, দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোতে, ছোট ছোট প্রতিমূর্তিতে আর পিয়ানোর উপরে রাখা ফুল-দানিতে ছাতা-ধরা বিষণ্ণ গন্ধ একটা।

'সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, কিছু মনে করবেন না। আমি হাসপাতালে থাকি আর সেখান থেকে সোজা যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে মাঝেমাঝে শুধু আসি,' লজ্জায় লাল হয়ে উঠে আনিউতা বলল, টেবিলের উপরে ছড়ানো জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি সরাতে গিয়ে টেবিল-ঢাকনাটাও তুলে নিয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল, টেবিল-ঢাকনাটা পেতে পাড়গুলো সযত্নে ঠিক করল।

'এখানে আসার সুযোগ পেলেও এত ক্লান্ত থাকি যে কোনক্রমে সোফার কাছে শরীরটাকে টেনে গিয়ে জামাকাপড় না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়ি। তাই গোছাবার সময় বিশেষ পাই না!'

কয়েক মিনিট পরে বৈদ্যুতিক কেটলির গান শুরু হল; টেবিলে ঝকঝক করছে রঙ-চটা পুরোনো চীনে মাটির কাপ, চীনে মাটির তৈরী রুটির প্লেটে গমের পাঁউরুটির পাতলা ফালি কয়েকটা, আর চিনি-দানির একেবারে তলায় চিনির ছোট ছোট টুকরো। পশমের থোপনার ঢাকনির নিচে কেটলিতে চা ভিজছে, গত শতাব্দীর জিনিস সেটাও। চায়ের সুগন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে, যুদ্ধের আগের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় সে গন্ধ। টেবিলের মাঝখানে একটা না-খোলা নীলচে বোতল, পাতলা হাতলহীন দুটো পানপাত্র দুদিক থেকে পাহারা দিচ্ছে সেটাকে।

মখমলে-মোড়া বড়ো একটা কেদারায় মেরেসিয়েভ বসেছে। সবুজ মখমলের আস্তরণ ভেদ করে উঁকি মারছে এত বেশী তুলো যে চেয়ারের পিছনে আর সিটে সযত্নে লাগানো কাজ-করা পশমের মোটা কম্বলগুলোও

সেগ্বলো ঢাকতে অক্ষম। কিন্তু চেয়ারটা এত আরামদায়ক, এত যত্নে আর মোলায়েমভাবে লোকজনকে গ্রহণ করে যে আলেক্সেই গা এলিয়ে দিল তাতে তৎক্ষণাৎ, ক্লান্ত টনটনে পাদ্বটো দিল ছড়িয়ে।

তার পাশে ছোট একটা টুলে বসে, ছোট মেয়ের মত ওর ম্বখের দিকে তাকিয়ে আনিউতা গভজ্‌দেভের বিষয়ে আবার ওকে জিজ্ঞাসাবাদ শ্বর্ব করল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব তার, তাড়াতাড়ি উঠে নিজেকে বকে আলেক্সেইকে টেনে নিয়ে গেল টেবিলে।

'এক গেলাস ভদকা খাবেন? গ্রিশা বলেছিল যে ট্যাঙ্ক-বাহিনীর লোকেরা, বৈমানিকেরাও, অবশ্য ...'

আলেক্সেইকে একটা গেলাস ঠেলে দিল আনিউতা। আড়াআড়িভাবে ঘরে এসেছে স্বর্যের উজ্জ্বল আলো, ঝিকঝিক করে উঠল ভদকার নীলচে আভা। মদের গন্ধে আলেক্সেই'র মনে পড়ল দ্বর বনে বিমান-ঘাঁটিটির কথা, অফিসারের মেস, নৈশভোজনের সময়ে "বরাদ্দ ইন্ধন" দেওয়া হয়েছে আর সবাই খ্বসিতে গ্বনগ্বন করছে। অন্য গেলাসটা শ্বন্য রয়ে গেল দেখে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করল:

'আপনি খাবেন না?'

'আমি মদ খাই না,' সরলভাবে জবাব দিল আনিউতা।

'কিন্তু ধর্বন, যদি গ্রিশার স্বাস্থ্যকামনা করে খাই?'

আনিউতা হাসল, কোন কথা না বলে গেলাসটি ভরে নিয়ে, পাতলা ডাঁটিটি ধরে আলেক্সেই'র গেলাসের সঙ্গে ঠেকাল, কী যেন ভেবে বলল:

'ওর কুশল কামনা করি!' বেশ কায়দায় গেলাসটা তুলে এক ঢোঁকে শেষ করল সেটা, সঙ্গে সঙ্গে শ্বর্ব হল কাশি, বিষম লেগেছে। ম্বখ রক্তিম, দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

অনেকদিন ভদকা খায়নি মেরেসিয়েভ, মদটা মনে হল সটান মাথায় চড়েছে, সমস্ত শরীর গরম হয়ে উঠল। গেলাসদ্বটো আবার ভর্তি করল সে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল আনিউতা।

'না না, মদ আমি খাই না। কী হল দেখলেন ত!'

'কিন্তু আমার সৌভাগ্য কামনা করে খাবেন না?' জোর দিয়ে বলল আলেক্সেই। 'যদি আপনি জানতেন, আনিউতা, কত দরকার আমার শ্বভেচ্ছার!'

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ওর দিকে তাকিয়ে গেলাস তুলল আনিউতা, হেসে

ওর দিকে মাথা নেড়ে, কনুই'এ ওকে আলগা চাপ দিয়ে শূন্য করল গেলাসটা: কিন্তু এবারেও বিষম লেগে কেশে উঠল সে।

'কী করছি, বলুন ত?' দম ফিরে এলে বলে উঠল আনিউতা। 'আর টানা চব্বিশ ঘণ্টা খাটার পর খাচ্ছি! শুধু আপনার জন্যে এটা করলাম, আলিওশা... আপনি... আপনার কথা গ্রিশা অনেক লিখত... আপনার সৌভাগ্য কামনা করি, বিশেষভাবে কামনা করি! আর আপনার যে ভালো হবে, আমার কোন সন্দেহ নেই তাতে। শুনছেন কী বললাম? আমার কোন সন্দেহ নেই!' আর খুসির হাসিতে উচ্চকিত হয়ে উঠল আনিউতা। 'কিন্তু আপনি ত খাচ্ছেন না! কিছু রুটি নিন। লজ্জা করবেন না। আরো আছে আমার। এটা কালকের রুটি। আজকের বরাদ্দ এখনো পাইনি।' চীনেমাটির রুটির প্লেটটা এগিয়ে দিল সে, পনীরের মত পাতলা করে কাটা রুটির ফালিগুলো। 'খান, নইলে মাতাল হয়ে যাবেন, তখন আপনাকে নিয়ে কী করব?'

রুটির প্লেটটা সরিয়ে দিয়ে সোজাসুজি আনিউতার সবজে চোখ আর ছোট ভরাট টুকটুকে ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় আলেক্সেই বলল:

'আপনাকে চুমু খেলে কী করবেন?'

ভীত দৃষ্টিতে তাকাল আনিউতা, তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। মুখে তার রাগের ভাব নেই, শুধু জিজ্ঞাসা আর হতাশা: এক মুহূর্ত আগে দামী জহরতের মত দূরে চিকচিক করছিল যে জিনিসটা এখন দেখা গেল সাধারণ কাচের টুকরো, এমনভাবে তাকিয়ে রইল আলেক্সেই'র দিকে।

'খুব সম্ভব আপনাকে তাড়িয়ে দেব আর গ্রিশাকে লিখব যে লোক চেনে না সে,' কঠোর সুরে বলল আনিউতা। আবার ওর দিকে রুটির প্লেটটা ঠেলে দিয়ে জোর দিয়ে বলল, 'কিছু খান, আপনার নেশা হয়েছে!'

মেরেসিয়েভের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আর সেটা করাই ত আপনার উচিত! ধন্যবাদ সেজন্যে! সারা সোভিয়েত বাহিনীর হয়ে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে! গ্রিশাকে লিখে জানাব যে সে লোক চেনে!'

প্রায় তিনটে পর্যন্ত ওদের গল্প চলল, ধূলিজালে আড়াআড়িভাবে আসা সূর্যের রেখা তখন গুঁড়ি দিয়ে দেয়ালে উঠছে। ট্রেন ধরবার সময় এসে পড়েছে আলেক্সেই'র। বিষণ্ণভাবে অনিচ্ছায় সবুজ মখমলের কেদারা ছেড়ে উঠল সে, কোটে লেগে রইল কিছুটা ছোবড়া। স্টেশন পর্যন্ত গেল আনিউতা।

হাত ধরাধরি করে দুজনে যাচ্ছে, আর জিরোবার পর এত স্বচ্ছন্দে হাঁটছে আলেক্সেই যে আনিউতা মনে মনে বলল, "বন্ধুর পায়ের পাতা নেই সেটা কি গ্রিশা ঠাট্টা করে লিখেছিল?" যে বেজ হাসপাতালে সে আর অন্যান্য ডাক্তারী ছাত্রছাত্রীরা কাজ করে, আহতদের বাছাই করার কাজ, তার কথা বলল আলেক্সেইকে। কাজের চাপ বেশ, কেননা প্রতিদিন দক্ষিণ থেকে ট্রেন বোঝাই আহত আসছে। আর তারা কী অদ্ভুত লোক, বীরের মত কেমন নিজেদের যন্ত্রণা সহ্য করে! হঠাৎ নিজেকে বাধা দিয়ে বলল আনিউতা:

'গ্রিশা দাড়ি রাখছে, সেটা ঠাট্টা করে বলেননি ত?' চুপ করে কী যেন ভেবে, তারপর বলল, 'সব বুঝতে পারছি এখন। আপনাকে সত্যি করে বলছি, যেমন বাবার কাছে বলি — প্রথম প্রথম ওর ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকালেই অসহ্য লাগত। অসহ্য নয়, কথাটা ঠিক হল না। মানে, ভয় করত। না সেটাও ঠিক নয়... কী করে বোঝাই জানি না। আপনি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? ওরকম করাটা হয়ত আমার উচিত হয়নি, কিন্তু কী করব বলুন! কিন্তু তাই বলে আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল! বোকার মত! সত্যি, কী বোকা লোক! ওকে চিঠি লিখলে জানিয়ে দেবেন ত যে আমার খুব খারাপ লেগেছে, ওর ব্যবহারে অত্যন্ত আহত আমি।'

বিরাট রেলওয়ে স্টেশনটির সবটাই প্রায় সৈন্যে বোঝাই। কেউ তাড়াহুড়ো করে ভারার্পিত কাজে যাচ্ছে, অন্যরা নিঃশব্দে দেয়ালের পাশে রাখা বেঞ্চিতে কিম্বা কিট-ব্যাগের উপরে বসে আছে, কেউ বা মেঝেতে, ভ্রূকুটিকুটিল চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, মনে হচ্ছে সবায়ের মাথায় একটি মাত্র কথা। এক সময়ে এই লাইনটি ছিল পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে প্রধান যোগসূত্র। এখন মস্কো থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম-মুখো রাস্তাটি শত্রুপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে। লাইনটির সংক্ষিপ্ত বাকি অংশে এখন শুধু সৈন্যবোঝাই ট্রেন যাতায়াত করে, দুঘণ্টার মধ্যেই রাজধানী থেকে সৈন্যরা তাদের নিজ নিজ ডিভিশনের দ্বিতীয় পঙক্তিতে পৌঁছয়, ডিভিশনগুলো সেখানকার প্রতিরোধ ঘাঁটি রক্ষা করছে। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর বৈদ্যুতিক ট্রেনে উপকণ্ঠ থেকে এসে প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে নামে শ্রমিকেরা আর কৃষাণীরা, শেষোক্তেরা আনে দুধ, ফল, ব্যাঙের ছাতা আর শাকসব্জি। কিছুক্ষণ তাদের ভিড়ে আর হৈচৈতে ভরে যায় রেলওয়ে স্টেশনটি, তারপর তারা ছড়িয়ে পড়ে স্কোয়ারে: তখন স্টেশনটি থাকে শুধু বাহিনীর লোকেদের হাতে।

স্টেশনের প্রধান হলটিতে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টের একটি বিরাট

মানচিত্র দেয়াল জুড়ে টাঙ্গানো। সামরিক পোশাক গায়ে টুকটুকে গাল মোটাসোটা একটি মেয়ে মইতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে, পিনে আটকানো একটা তার দিয়ে কোথায় যুদ্ধ চলেছে দেখাচ্ছে। তার হাতের খবরের কাগজে সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের সর্বশেষ ইস্তাহার।

মানচিত্রের নিম্নাংশে তারটা হঠাৎ মোড় নিয়েছে ডানদিকে। দক্ষিণে জার্মানরা এগোচ্ছে। ইজিউম-বারভেন্‌কভো এলাকায় তারা প্রতিরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। ওদের ষষ্ঠ, বাহিনী দেশের বুকে মোটা গোঁজ বিঁধে দনের নীল শিরার দিকে অগ্রসর। দনের লাইনের কাছাকাছি তারটি বাঁধল মেয়েটি। বেশ কাছে বঙ্কিম রেখায় চলেছে ভলগার মোটা ধমনী, স্তালিনগ্রাদ বড়ো বৃত্ত দিয়ে ঘেরা, তার উপরে একটা বিন্দু, কামিশিন সেটা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দনকে আঘাত করেছে শত্রুপক্ষের যে গোঁজ সেটা এগিয়েছে প্রধান ধমনীটির দিকে, ইতিমধ্যে খুব কাছে এসে পড়েছে। গভীর স্তব্ধতা, অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে, মই'এ আরোহী মেয়েটি উদ্যত তাদের উপরে, মোটাসোটা হাতে পিনগুলোর জায়গা বদলাচ্ছে, সবাই দেখছে তাকে। নবীন সৈনিক একজন, মুখ তার ঘর্মাক্ত, ভাঁজ না পড়া নতুন বড়ো আর্মিকোট কাঁধ থেকে আড়ষ্টভাবে ঝুলছে, বিষণ্ণভাবে আপন মনে বলে উঠল:

'হারামীরা বেশ জোরে এগোচ্ছে... কেমন এগোচ্ছে দেখো।' দীর্ঘাকৃতি রোগা পাকা গোঁফ রেলকর্মী একজন, মাথায় রেলকর্মীর চটচটে টুপি, ভ্রূকুটি করে তাকাল সৈনিকটির দিকে, গরগর করে বলল:

'এগোচ্ছে, বটে! কিন্তু ওদের এগোতে দিচ্ছ কেন? তোমরা পিছু হটে এলে ওরা ত এগোবেই! খাসা লড়ুয়ে তোমরা! কোথায় এসে পড়েছে দেখো ত! প্রায় ভলগা পর্যন্ত!' কণ্ঠস্বরে ব্যথা আর বিষাদ, কোন সাঙ্ঘাতিক অমার্জনীয় ভুল করে ফেললে বাপ ছেলেকে যেমন করে ধমকায় তেমন তার কণ্ঠস্বর।

অপরাধীর মত ফিরে তাকাল সৈনিকটি, ডাহা নতুন আর্মিকোটটা ঠিক করে বসানোর জন্য ঘাড় নিচু করে, ভিড় ঠেলে বেরিয়ে চলল সে।

'ঠিক বলছে! আমরা অনেকটা জায়গা ছেড়ে এসেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আর একজন, তিক্তভাবে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'আঃ!'

ক্যাম্বিসের ধূসর কোট পরনে একটি বৃদ্ধ এবার — হয়ত গ্রামের স্কুলে পড়ায়, গ্রামের ডাক্তার হয়ত বা — সৈনিকটির পক্ষ নিল:

'ওকে দোষ দিচ্ছ কেন?.. ওর দোষ কী? এরি মধ্যে ওদের কতজনে না মারা গিয়েছে! যেটা আমাদের ঠেলে নিয়ে আসছে সেটার

একবার দেখো ত! সারা ইউরোপ, তাও আবার ট্যাংক চেপে! ঝট করে সেটাকে আটকাবে কী করে? সত্যি বলছি, হাঁটু গেড়ে বসে ওই ছোকরাটিকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে আমরা এখনো বেঁচে আছি, স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করছি মস্কোতে। ভেবে দেখো না একবার, ফ্যাশিস্টরা এক হপ্তার মধ্যে কটা দেশকে ট্যাংক দিয়ে দলাইমলাই করে দিয়েছে! আর আমরা এক বছরের বেশী লড়াই করে চলেছি, পাল্টা আক্রমণও চালাচ্ছি, শুইয়ে দিয়েছি ওদের কত লোককে! সারা পৃথিবীর উচিত ছোকরাটির কাছে হাঁটু গেড়ে বসা। আর তুমি বলছ হটে এসেছে।'

'জানি, জানি, ভগবানের দোহাই, আমার কাছে প্রচার বাণী চালাতে হবে না! বুদ্ধি দিয়ে বুঝি সব কিন্তু আমার বুক ফেটে পড়ছে প্রায়!' রেল-কর্মীটি জবাবে বলল বিষাদভারী সুরে। 'জার্মানরা আমাদের দেশকেই ত পদদলিত করছে, ধ্বংস করছে আমাদেরই বাড়িঘরদোর!'

'ও কি ওখানে?' মানচিত্রের দক্ষিণাংশের দিকে আঙুল দেখিয়ে আনিউতা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। আর ওলিয়াও ওখানে,' জবাবে বলল আলেক্সেই।

ঠিক ভলগার নীল ফাঁসে, স্তালিনগ্রাদের উপরে চোখে পড়ল একটি ফুটদাগ, লেখা আছে "কামিশিন," মানচিত্রে ফুটদাগ শুধু নয়, তার কাছে সেটা আরো কিছু। চোখের সামনে এল ছোট সবুজ সহরটার ছবি, ঘাসে-ভরা সহরতলির রাস্তা, চকচকে ধুলো-মাখা পাতায় নড়ছে পপলারগাছগুলো, কঞ্চির বেড়া দেওয়া সব্জীর বাগান থেকে আসছে ধুলো, শাক আর পার্সলির গন্ধ, গোল গোল, ডোরা-কাটা তরমুজ, মনে হচ্ছে শুকনো পাতায় শুকনো মাটিতে কেউ ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের, সোমরাজের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরপুর স্তেপের হাওয়া, নদীর ঝকঝকে প্রসার, ছিপছিপে, ধূসর-চোখ রোদে-তামাটে একটি মেয়ে, আর ওর মা, চুল পেকে গিয়েছে তাঁর, অসহায়ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন...

'ওরা দুজনেই ওখানে.' আবার বলল আলেক্সেই।

২

মস্কোর উপকণ্ঠ হয়ে ছুটেছে বৈদ্যুতিক ট্রেন, চাকাগুলো ফুর্তিতে খটখট সুর ভাঁজছে, রাগের সুরে বাজছে ইঞ্জিনের বাঁশী। জানলার ধারে বসে মেরেসিয়েভ, একটি বৃদ্ধ তাকে দেয়াল ঠেসা করেছে; বৃদ্ধটির দাড়ি-

গোঁফ কামানো, মাথায় চওড়া মাক্সিম গোর্কি টুপি, কালো সুতোয় বাঁধা সোনার রিমের প্যাঁস্‌নে চোখে। হাঁটুর মধ্যে বসানো কোদাল, শাবল আর উকনঠেঙ্গো, খবরের কাগজে সযত্নে মোড়া আর সুতো দিয়ে বাঁধা সেগুলো।

কঠিন দিনগুলোতে সবাই যুদ্ধের কথা ভাবছে, বৃদ্ধও ব্যতিক্রম নয়। মেরেসিয়েভের নাকের সামনে নিজের শীর্ণ হাত সজোরে নেড়ে, গুরুত্বপূর্ণ-ভাবে তার কানে ফিসফিসিয়ে সে বলল:

'অসামরিক লোক বলে আমাদের পরিকল্পনা বুঝি না, সেটা মনে কোরো না যেন। সব বুঝি আমি। মতলবটা হল শত্রুদের ভুলিয়ে ভলগার স্তেপে এনে ফেলা। হ্যাঁ' ওদের যোগাযোগের পথ যাতে আরো লম্বা হয়, যাতে, আজকালকার ভাষায়, পিছনের ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়, আর তারপর ওখান থেকে, পশ্চিম আর উত্তর থেকে ওদের যোগাযোগ ছিন্ন করে একেবারে ধুলিসাৎ করে দেওয়া। হ্যাঁ। আর পরিকল্পনাটি খাসা। শুধু হিটলার আমাদের বিরুদ্ধে নয়। ও সারা ইউরোপকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে। ছটি দেশের সঙ্গে আমরা একলা লড়ছি। একলা! অন্তত জায়গা ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে ওদের আঘাতের শক্তি ভোঁতা করে দিতে হবে আমাদের। হ্যাঁ। একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি সেটা। তাছাড়া আমাদের মিত্রেরা ত চুপচাপ বসে আছে, তাই না? কী মনে হয় আপনার?'

'মনে হয় যা-তা বকছেন আপনি। আমাদের দেশটা ফেলনা নয় যে ধাক্কা সামলাবার গদি হিসেবে ব্যবহার করব সেটাকে,' বিরস সুরে জবাব দিল মেরেসিয়েভ; শীতকালে জনশূন্য দগ্ধ পোড়া যে গ্রামটি হামাগুড়ি দিয়ে পেরিয়ে এসেছিল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেটার কথা।

কিন্তু বুড়ো কানের কাছে বকবক করেই চলল, তামাকের আর বার্লি কফির গন্ধ লাগছে মুখে।

জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে রইল আলেক্সেই, ধুলো-ভরা গরম হাওয়ার ঝটকা মুখে লাগছে, ব্যগ্র চোখে দেখছে, রংচটা সবুজ বেড়ায় ঘেরা আর তক্তা আঁটা রঙীন দোকান সুদ্ধ স্টেশনগুলো একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবুজ বন থেকে উঁকি মারছে কুটিরগুলো, শুষ্ক ছোট ছোট স্রোতধারার মরকত-নীল পাড়, সূর্যাস্তের আলোয় রজনের মত জ্বলছে পাইনগাছের মোমবাতির মত গুঁড়ি আর বনের ওপারে প্রদোষে জমির নীল প্রসার।

'...আপনি ত বাহিনীর লোক, বলুন ত ঠিক বলছি কি না! এক বছরেরও বেশী আমরা একলা ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে লড়ছি। কেমন ধরনের ব্যাপার সেটা,

বলুন ত? আমাদের মিত্রেরা কই, কই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট? একবার ভাবুন ত: একজন লোক নিশ্চিন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, হঠাৎ তাকে ডাকাতে চড়াও করল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিল না লোকটা। ডাকাতগুলোর সঙ্গে লড়াই চালাল। সমস্ত শরীর দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝড়ছে, কিন্তু হাতের কাছে যা অস্ত্র পেল তাই দিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। অনেকের বিরুদ্ধে একজন, ওরা সশস্ত্র, অনেক দিন ধরে ওঁৎ পেতে বসেছিল ওর জন্য। হ্যাঁ। আর প্রতিবেশীরা দেখল ব্যাপারটা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারা সহানুভূতি জানাচ্ছে, উৎসাহ দিয়ে বলছে: "সাবাস লেড়কা, ঠেঙ্গাও ওদের, কষে ঠেঙ্গাও!" কোথায় এগিয়ে এসে সাহায্য করবে তা না, লোহা আর পাথরের টুকরো দিতে চায় আর বলে এই যে, দেখো! এই দিয়ে মারো ওদের, আরো জোরে মারো! কিন্তু নিজেরা লড়াই করছে না। হ্যাঁ। আমাদের মিত্রদের ব্যবহার ঠিক এরকম। দর্শক শুধু সবাই ওরা...'

ঘুরে সাগ্রহে বৃদ্ধের দিকে তাকাল মেরেসিয়েভ। ভিড়ে ঠেসা কামরাটায় অন্যান্য অনেক যাত্রীও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে: চারদিক থেকে শোনা গেল:

'হ্যাঁ, ঠিক কথা! আমরা একলা লড়ছি! দ্বিতীয় ফ্রণ্টের কী হল?'

'যাক গে! এই কাজ আমরা একলাই করব। সবকিছু শেষ হয়ে গেলে ওরা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!'

কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন থামল। কামরায় ঢুকল পায়জামা-পরা কয়েকটি আহত লোক, ক্রাচে ভর দিয়ে কেউ, কেউ বা ছড়িতে, প্রত্যেকের হাতে কাগজের ঠোঙায় সূর্যমুখীর বীজ কিম্বা বেরি। ওরা নিশ্চয়ই কোন স্বাস্থ্যাগার থেকে এসেছে এখানকার বাজারে।

প্যাঁসনে-পরা বৃদ্ধটি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে লাল-চুল, এক পায়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, ক্রাচ-হাতে একটি ছেলেকে প্রায় জোর করে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিল।

'বোসো এখানে, বাছা, এখানে বোসো!' বলল সে। 'আমার জন্যে ভেবো না। আমি শীগগিরই নেমে যাব।'

আর সত্যি যে নেমে যাবে সেটা প্রমাণ করার জন্য বৃদ্ধ দরজার কাছে গেল। গয়লানীরা নিজেরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আহতদের জন্য জায়গা করে দিল। আলেক্সেই'র কানে এল পিছনে নারীকণ্ঠে নিন্দে করে কে যেন বলছে:

'ওর লজ্জা হওয়া উচিত, আহত লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, জায়গা

দিচ্ছে না তাকে! বেচারার পাটা ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না লোকটা! বসে আছে গ্যাঁট হয়ে, নিজের কিছু হয়নি, গুলি যেন কখনো লাগবে না গায়ে! বিমান বাহিনীর অফিসার আবার!'

অকারণ ভর্ৎসনায় লাল হয়ে উঠল আলেক্সেই। রাগে নাসারন্ধ্র কাঁপছে। কিন্তু হঠাৎ স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে উঠে বলল:

'ওহে ছোকরা, বোসো এখানে।'

আহত লোকটি থতমত খেয়ে হটে গেল।

'না, ধন্যবাদ, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, ঠিক আছে, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। বেশী দূর যাচ্ছি না। মাত্র দুটো স্টেশন।'

'বসে পড়ো বলছি!' কৃত্রিম কঠোর সুরে বলল আলেক্সেই, পরিস্থিতিটা একটু মজার মালুম হল।

কামরার পাশে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দুহাতে ছড়িটায় ভর দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল আলেক্সেই। চৌখুপী রুমাল মাথায় বুড়ীটি স্পষ্টত বুঝতে পারল যে মিছিমিছি ওকে বকেছে, ওর বকুনি শোনা গেল আবার:

'ওদের দেখ একবার! শুনছ, ওহে, টুপিওয়ালা শ্রীমতি! রাজকুমারীর মত বসে আছে দেখছি! ছড়ি-হাতে অফিসারটিকে বসার জায়গা দাও না! আপনি এখানে চলে আসুন, কমরেড অফিসার, আমার জায়গায় বসতে পারেন। দোহাই তোমাদের, ওকে পথ ছেড়ে দাও!'

কথাটা যেন কানে যায়নি ভান করল আলেক্সেই। একটু আগে মজা লাগছিল, সে ভাবটা আর নেই। ঠিক সে সময়ে মেয়ে-কণ্ডাকটরটি যে স্টেশনে ওকে নামতে হবে তার নামটা হাঁকল, ট্রেন আস্তে আস্তে থামল। ভিড় ঠেলে আলেক্সেই প্যাঁসনে-চোখে বৃদ্ধটির কাছে এসে পড়ল। ওর দিকে মাথা নেড়ে, যেন অনেক দিনের আলাপী লোক, বৃদ্ধ ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কী মনে হয় আপনার শেষ পর্যন্ত, ওরা কি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলবে?'

'না খোলে আমরাই চালিয়ে নেব,' কাঠের প্ল্যাটফর্মে নামতে নামতে জবাব দিল আলেক্সেই।

চাকার ঘড় ঘড়, ইঞ্জিনের বাঁশীর তীক্ষ্ম ডাক, মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রেনটা, পিছনে রেখে গেল ধুলোর পাতলা রেশ। কয়েকজন মাত্র যাত্রী; প্ল্যাটফর্মে অল্পক্ষণের মধ্যে নামল সন্ধ্যার সুগন্ধি স্তব্ধতা। যুদ্ধের আগে জায়গাটি নিশ্চয়ই খাসা আর আরামী ছিল। পাইনের বন স্টেশন ঘেঁষে এসেছে, গাছের চূড়োগুলো মোলায়েম ছন্দে দুলছে। দু'বছর আগে এরকম

মনোরম সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই লোকেরা দলে দলে স্টেশন ছেড়ে অলিগলি হয়ে ছায়াচ্ছন্ন বনের পথ ধরে যেত বাগান-বাড়িতে — গ্রীষ্মের পাতলা ফ্রকে সাজগোজ করা মেয়েরা, মুখর বাচ্চার দল আর উৎফুল্ল রোদে-তামাটে পুরুষ সহর থেকে ফিরছে, সঙ্গে খাবারদাবারের পার্সেল আর মদের বোতল। কোদাল, শাবল, উকনঠেঙ্গো আর বাগানের অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে অল্প কয়েকজন যারা ট্রেন থেকে আজ নামল তারা তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বনে ঢুকল, প্রত্যেকে নিজের ভাবনাচিন্তায় মগ্ন। মেরেসিয়েভকে দেখে মনে হচ্ছে ছুটিতে এসেছে, শুধু সেই ছড়ি হাতে সুন্দর গ্রীষ্ম সন্ধ্যাটি উপভোগ করার জন্য রয়ে গেল; সুগন্ধি হাওয়া বুক ভরে নিচ্ছে, পাইনগাছ ভেদ করে সূর্যের উষ্ণ আলো মুখে পড়াতে চোখ কোঁচকাচ্ছে।

স্বাস্থ্যাবাসে কী পথে যেতে হয় মস্কোতে মেরেসিয়েভকে বলা হয়েছিল, ওদের দেওয়া কয়েকটি পথ নির্দেশ চিহ্ন ধরে জায়গাটিতে পৌঁছতে পারল সে, খাস সৈনিক ত বটে।

বিপ্লবের আগে এখানে অভূতপূর্ব একটা গ্রীষ্ম প্রাসাদ বানাবার সংকল্প করেছিল রুশ কোটিপতি একজন। স্থপতিকে সে জানায় যে খরচাই লাগুক কিছু এসে যায় না, জিনিসটা অসামান্য হওয়া চাই। আর তাই পৃষ্ঠপোষকের খেয়াল মেটাবার জন্য স্থপতি হ্রদের ধারে ইঁটের বিরাট একটা বাড়ি বানায়, জাফরি-বসানো জানলা, গম্বুজ আর মিনার, দেয়ালের পোস্তা আর দরদালান! খাস রুশ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে, এখন আগাছায় আচ্ছন্ন হ্রদের তীরে আজব বাড়িটা কুৎসিৎ কলঙ্ক চিহ্নের মত। আর প্রাকৃতিক দৃশ্যটা সত্যিই সুন্দর। হ্রদের জল আবহাওয়া ভালো থাকলে কাচের মত মসৃণ, ধারে এক ঝাড় নবীন এ্যাসপেনগাছ, পাতাগুলো কাঁপছে। এখানে সেখানে আগাছা ভেদ করে সটান উঠেছে বার্চগাছের ফুটফুট দাগওয়ালা গুঁড়ি, হ্রদটি ঘিরেছে প্রাচীন বনের বিস্তৃত, নীলচে, মাঝেমাঝে করাতের মুখের মত কাটা-কাটা বৃত্ত। জলের ঠাণ্ডা স্তব্ধ নীলচে বুকে উল্টোভাবে প্রতিবিম্ব পড়েছে সবকিছুর।

বহু বিখ্যাত চিত্রকর অনেক দিন কাটিয়েছেন এ জায়গায়; আতিথেয়তার জন্য সারা রাশিয়ায় নাম ছিল মালিকটির। আর এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, সবটা কিম্বা আংশিকভাবে, উত্তর কালের জন্য এঁকেছেন অনেকে, রুশ দৃশ্যপটের বিরাট স্নিগ্ধ মহিমার উদাহরণ হিসেবে।

প্রাসাদটি এখন সোভিয়েত বিমান বাহিনীর স্বাস্থ্যাবাস। যুদ্ধের আগে পরিবার নিয়ে এখানে আসত বৈমানিকরা। এখন আহত বৈমানিকদের

হাসপাতাল থেকে এখানে পাঠানো হয় ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য। এ্যাসফল্টের যে চওড়া রাস্তাটা বার্চের সারির মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরে স্বাস্থ্যাবাসে পৌঁছিয়েছে সেটা ধরল না আলেক্সেই, স্টেশন থেকে বনের মধ্যে দিয়ে যে পথটা সটান হ্রদে গিয়েছে সেটা ধরে এল। বলা যায়, পিছন থেকে এল: প্রবেশপথের সামনে দুটো বোঝাই বাস দাঁড়িয়ে, ভিড় করে চেঁচামেচি করছে অনেকে, তাদের মধ্যে ভিড়ে গেল সে।

কথাবার্তা, বিদায় সম্ভাষণ আর মঙ্গল কামনা চলেছে। বুঝতে পারল আলেক্সেই যেসব বৈমানিকরা স্বাস্থ্যাবাস ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে, বিদায় জানানো হচ্ছে তাদের। বিদায়োদ্যত বৈমানিকরা বেশ উত্তেজিত আর উৎফুল্ল, মেঘের পিছনে মৃত্যু ওঁৎ পেতে বসে আছে এমন জায়গায় যাচ্ছে না যেন, যেন শান্তিকালীন ঘাঁটিতে ফিরছে। যারা বিদায় জানাচ্ছে তাদের মুখে বিষণ্ণ, অসহিষ্ণু ভাব। অনুভূতিটা আলেক্সেই'র চেনা। দক্ষিণে বিরাট যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে সেই অদম্য আকর্ষণ সমানে তাকেও টানছে; যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এখন গুরুতর, সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণটাও তীব্রতর হয়েছে। সামরিক মহলে স্তালিনগ্রাদের কথা যখন উল্লেখ করা হয়, যদিচ সাবধানে আর ধীরে ধীরে, তখন অনুভূতিটা অদম্য আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, হাসপাতালে এই জোর করে চুপ করে বসে থাকাটা অসহ্য ঠেকে।

চকচকে বাসগুলোর জানলায় জানলায় রোদে-তামাটে উত্তেজিত মুখ। ছোটখাটো খোঁড়া একটি আরমেনিয়ান, মাথায় টাক, ডোরা-কাটা পায়জামা পরে বাসের চারিদিকে ব্যস্তসমস্তভাবে নেংচিয়ে নেংচিয়ে ঘুরছে। স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীদের দলে হামেশাই একজন করে রসিক আর হাস্যাভিনেতা থাকে, সবাই তাকে চেনেশোনে; আরমেনিয়ানটিও তাই। ছড়ি দুলিয়ে সে বিদায় সম্ভাষণ হাঁকছে:

'ফেদিয়া! আকাশে উড়ে ফ্যাশিস্টদের আমার সেলাম দিও! চান্দ্র স্নান চিকিৎসা শেষ করতে দেয়নি তোমাকে, সেজন্য উচিত শিক্ষা দিও ওদের! ফেদিয়া! ফেদিয়া! ওদের বুঝিয়ে দিও যে সোভিয়েত বৈমানিকদের চাঁদ-স্নান শেষ করতে না দেওয়াটা মোটেই ভদ্রজনোচিত নয়!'

গোলমাথা ফেদিয়া, বয়স কম, মুখটা রোদে-তামাটে, প্রশস্ত কপালে দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে জানাল যে সে তার কর্তব্য করবে, স্বাস্থ্যাবাসের চন্দ্র সমিতি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

ভিড়ের সবাই জোর গলায় হেসে উঠল, হাসির শব্দের মধ্যে বাসগুলো রওনা হল, আস্তে আস্তে গেটের দিকে যাচ্ছে ওরা।

'ভালো শিকার মিলুক! শুভ যাত্রা!' ভিড়ের সবাই চেঁচিয়ে বলল।

'ফেদিয়া, ফেদিয়া! যত শীগগির পারো তোমার ডাক-ঘরের ঠিকানাটা জানিও। জিনচ্কা রেজিস্ট্রি করে তোমার হৃদয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে!'

মোড়ের ওদিকে বাসগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। সূর্যাস্তের আলোয় সোনালী ধুলো নামল মাটিতে। ওভারঅল কিম্বা ডোরা-কাটা পায়জামা পরা স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীরা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাগানে ঘুরছে। দালানে গেল মেরেসিয়েভ, ক্লোক-রুমের আঁকড়ায় বৈমানিকদের নীল ফিতে দেওয়া ক্যাপ, দালানের কোণে মেঝেতে পড়ে রয়েছে স্কিটল্‌স, বল, ক্রোকের হাতুড়ি আর টেনিস র‍্যাকেট। খোঁড়া আরমেনিয়ানটি তাকে নিয়ে গেল অফিস ঘরে। ওর মুখ বেশ চালাকচতুর; গম্ভীর সুন্দর বড়ো আর বিষণ্ণ চোখদুটো কাছ থেকে ভালো করে দেখল আলেক্সেই। যেতে যেতে আরমেনিয়ানটি ঠাট্টা করে জানাল যে চন্দ্র সমিতির সভাপতি সে নিজে; তার দৃঢ় মত, যে কোন রকমের ঘা শুকিয়ে যাবার প্রকৃষ্ট উপায় হল চন্দ্র স্নান, সেই চিকিৎসার জন্য চাই কড়া নিয়মানুবর্তিতা, চাঁদের আলোয় বেড়ানোর বন্দোবস্ত সে নিজে করে। মনে হয়, আরমেনিয়ানটি স্বতই ঠাট্টা করে চলে, মুখের গম্ভীরভাবের কোন পরিবর্তন হয় না, শ্রোতার মুখে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে সাগ্রহে, জিজ্ঞাসুভাবে।

অফিস-ঘরে মেরেসিয়েভকে অভ্যর্থনা করল শাদা ওভারঅল গায়ে একটি মেয়ে, তার চুল এত লাল যে মনে হয় মাথায় আগুন লেগেছে।

'মেরেসিয়েভ?' যে বইটা পড়ছিল সেটা সরিয়ে রেখে কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি। 'মেরেসিয়েভ, আলেক্সেই পেত্রভিচ?' বৈমানিকের দিকে কঠিন দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল:

'আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না! এখানে লেখা আছে "মেরেসিয়েভ, সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট, ন-নম্বর হাসপাতাল, পায়ের পাতা কাটা..." আর আপনি...'

শুধু তখনি আলেক্সেই'র চোখে পড়ল আগুনের মত লাল চুলে প্রায় ঢাকা ওর গোলগাল শাদা মুখ — লাল-চুল মেয়েদের হামেশাই ওরকম মুখ হয়। নরম চামড়া রক্তাভ হয়ে উঠেছে। দীপ্ত বেয়াড়া চোখে সবিস্ময়ে মেয়েটি তাকিয়ে আছে আলেক্সেই'র দিকে।

'তবুও, আমিই আলেক্সেই মেরেসিয়েভ। এই দেখুন আমার কাগজপত্র... আপনার নাম কি লিওলিয়া?'

'না, কেন? আমার নাম জিনা।' সন্দিগ্ধভাবে আলেক্সেই'র পায়ের দিকে

তাকিয়ে মেয়েটি যোগ করল, 'আপনার নকল পাদুটো সত্যি সত্যি এত ভালো ... না ... ?'

'হ্যাঁ। তাহলে আপনিই সেই জিনচ্‌কা যার জন্যে ফেদিয়া পাগল!'

'ও, তাহলে মেজর বুর্‌নাজিয়ান এরিমধ্যে নানা বাজে গল্প করেছেন? লোকটাকে দুচক্ষে দেখতে পারি না। সবাইকে নিয়ে উনি মস্করা করেন। ফেদিয়াকে নাচতে শিখিয়েছিলাম আমি। তাতে এমন কি এসে যায়?'

'এখন তাহলে আমাকে নাচ শেখাবেন, কী বলুন? চন্দ্র-স্নানের জন্য বুর্‌নাজিয়ান আমার নাম লিখে নেবে কথা দিয়েছে।'

আরো অবাক হয়ে মেয়েটি আলেক্সেই'র দিকে তাকাল।

'কী বলছেন আপনি, নাচবেন? পা নেই, তবুও? বাজে কথা: মনে হচ্ছে আপনিও সবাইকে নিয়ে ঠাট্টা করতে চান।'

ঠিক সে সময়ে ঘরে দৌড়িয়ে এল মেজর স্ত্রুচকভ, গলা জড়িয়ে ধরল আলেক্সেই'র।

'জিনচ্‌কা! সব ঠিক তাহলে? সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আমার ঘরে থাকবে।'

হাসপাতালে অনেকদিন একসঙ্গে কাটানোর পর আবার দেখা হলে লোকেরা ভাই'এর মত মেলে। মেজরকে দেখে বেজায় খুসি আলেক্সেই, যেন কতদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। স্বাস্থ্যাবাসে কিট-ব্যাগ রাখা হয়ে গিয়েছে স্ত্রুচকভের, ইতিমধ্যেই বেশ ঘরোয়া লাগছে তার। সবাইকে সে চেনে, সবাই তাকে চেনে, একদিনের মধ্যেই কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে, ঝগড়া করেছে কয়েকজনের সঙ্গে।

দুজনের ছোট ঘরটির জানলাগুলো বাগানের উপরে, একেবারে বাড়ি ঘেঁষে এসেছে দীর্ঘ ঋজু পাইনগাছগুলো, সবুজ বিলবেরির ঝোপ, একটা পাতলা পাহাড়ে এ্যাসগাছ, তা থেকে ঝুলছে সুন্দর নক্‌সা-করা কয়েকটি পাতা আর একটি মাত্র ভারী বেরির গোছা। রাত্রির স্বল্পাহারের পর শুয়ে পড়ল আলেক্সেই, নরম চাদরে গা এলিয়ে তক্ষুণি পড়ল ঘুমিয়ে।

সে-রাত্রে অদ্ভুত, গোলমেলে নানা স্বপ্ন দেখল আলেক্সেই। নীলচে বরফ। চাঁদের আলো। পাতলা লোমের জালের মত বন ঘিরেছে তাকে। জাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু বরফে পা আটকে গিয়েছে। দারুণ চেষ্টা করছে বেরিয়ে আসার, জানে কোন ভয়াবহ বিপদ উদ্যত, কিন্তু বরফে পাদুটো জমে গিয়েছে, ছাড়িয়ে নেবার শক্তি নেই। কাতরে উঠল ও, ছটফট করছে — এখন বনে আর নেই, বিমান-ঘাঁটিতে। ইউরা, সেই ঢেঙ্গা মিস্ত্রীটা,

অদ্ভুত নরম ডানাবিহীন একটি বিমানের ককপিটে বসে। হাত নাড়িয়ে হাসল সে, তীরের মত উঠল আকাশে। মিখাইল দাদু জড়িয়ে ধরলেন আলেক্সেইকে, যেন ও শিশু এমনভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কিছু ভেবো না· আমরা খাসা বাষ্প-স্নান করব। বেড়ে হবে, তাই না?" কিন্তু গরম জলের বদলে ঠাণ্ডা বরফে শুইয়ে দিলেন তাকে। উঠবার চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু আটকে গিয়েছে বরফে। না, বরফ নয়, ওর উপরে চেপে আছে উষ্ণদেহ ভালুক একটা, ঘোঁৎঘোঁৎ করছে, তার চাপে শরীর যাচ্ছে গুঁড়িয়ে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। জানলা দিয়ে খোশমেজাজে তাকিয়ে বাস বোঝাই বৈমানিক সব পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না তাকে। সাহায্যের জন্য আলেক্সেই চাইছে ওদের ডাকতে, চাইছে দৌড়িয়ে যেতে ওদের কাছে, অন্তত হাত দিয়ে ইসারা করতে, কিন্তু পারছে না। মুখ খুলল ও, শুধু ঘড়ঘড় আর ফিস্‌ফিস শব্দ। দম বন্ধ হয়ে এল, হৃৎস্পন্দন থেমে গিয়েছে মনে হচ্ছে, শেষ চেষ্টা করল আলেক্সেই, কী কারণে যেন ওর চোখের সামনে চকিতে এল আগুনের মত লাল চুলে ঘেরা জিনচ্‌কার হাসিমুখ, ওর বেয়াড়া, কৌতূহলী দুটো চোখ।

অদ্ভুত উৎকণ্ঠায় ঘুম ভেঙ্গে গেল আলেক্সেই'র। চারিদিক নিঝুম। মেজর ঘুমিয়ে আছে, নাক অল্প অল্প ডাকছে। ছায়ামূর্তির মত এক টুকরো চাঁদের আলো পড়েছে মেঝেতে। সেই সব ভয়াবহ দিন কেন ফিরে এসেছিল আবার? সে ত তাদের কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছে প্রায়, ভাবলেও অবাস্তব ঠেকে। ঠাণ্ডা সুরভি রাত্রির হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোলা, চন্দ্রালোকিত জানলা দিয়ে আসছে নরম ঘুমন্ত ছন্দময় শব্দ, অস্থিরভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে কখনো, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনো আবার উচ্চগ্রামে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, উৎকণ্ঠায় যেন গলা চেপে ধরেছে! বনের শব্দ।

বিছানায় উঠে বসে আলেক্সেই অনেকক্ষণ শুনল পাইনের রহস্যময় মর্মরধ্বনি। জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিল তারপর, ঘোর কাটাবার চেষ্টায় যেন, বলিষ্ঠ উৎফুল্ল ভাব ফিরে এল আবার। আটাশ দিন থাকতে হবে স্বাস্থ্যাবাসে, এ-কদিনে ঠিক হবে সে আবার বিমান চালাতে পারবে কিনা, পারবে কিনা লড়াই করতে আর বাঁচতে, আর তা না হলে অনুকম্পার দৃষ্টি সহ্য করে আজীবন কাটাতে হবে তাকে, ট্রামে বাসে উঠলে জায়গা ছেড়ে দেবে লোকে। সুতরাং এই দীর্ঘ অথচ সংক্ষিপ্ত আটাশ দিনের প্রতিটি মুহূর্ত লাগাতে হবে মানুষের মত মানুষ হবার সাধনায়।

মেজরের নাক ডাকছে, চাঁদের ভৌতিক আলো ঘরে; বিছানায় বসে

আলেক্সেই ব্যায়ামের একটা ছক মনে মনে বানাল। তাতে রইল সকাল আর সন্ধ্যার নানা ব্যায়াম কৌশল, হাঁটা, দৌড়, পায়ের জন্য বিশেষ ব্যায়াম, আর সবচেয়ে যেটা তার মনে লেগেছে, পায়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতিশ্রুতি যেটাতে আছে, জিনচ্‌কার সঙ্গে আলাপের সময়ে যে কথাটা তার মনে হয়েছিল সেটা।

আলেক্সেই ঠিক করল নাচ শিখবে।

৩

অগস্টের একটি পরিষ্কার প্রশান্ত অপরাহ্ন, চিকচিকে ঝকঝকে সবকিছু, হেমন্তের বিষণ্ণ ছোঁয়াচ ইতিমধ্যেই অলক্ষিতে এসেছে উষ্ণ হাওয়ায়। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কুলকুল শব্দে এঁকেবেঁকে চলেছে একটি ছোট্ট নদী, বালুতীরে বসে রোদ পোয়াচ্ছে কয়েকজন বৈমানিক।

রোদের ঝাঁঝে ঝিমোচ্ছে তারা, এমন কি অক্লান্ত বুর্‌নাজিয়ান পর্যন্ত চুপচাপ বসে উষ্ণ বালি জড়ো করে ভাঙ্গা পায়ে রাখছে, ভালো করে সারেনি পাটা। হেজেলের ঝোপের ধূসর পাতার আড়ালে অলক্ষ্য তারা, কিন্তু নদীর তীরে সবুজ ঘাসে একটি পায়ে-চলা পথ তাদের চোখে পড়ে। পা নিয়ে ব্যস্ত বুর্‌নাজিয়ান উপর দিকে তাকাতে অদ্ভুত একটি দৃশ্য চোখে পড়ল।

পায়জামা প্যাণ্ট আর বুট পরে বন থেকে বেরিয়ে এল নবাগতটি, গতকাল এসেছে সে। চারিদিক তাকিয়ে দেখল কেউ নেই, তখন শরীরের পাশে কনুই চেপে বিচিত্রভাবে দৌড়তে শুরু করল সে। প্রায় দুশ মিটার দৌড়িয়ে হাঁটতে লাগল, ঘেমে নেয়ে উঠেছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। দম ফিরে এলে আবার দৌড়। ক্লান্ত ঘোড়ার গায়ের পাশের মত চকচক করছে তার শরীর। নিঃশব্দে বুর্‌নাজিয়ান সঙ্গীদের দৃশ্যটি দেখাল, ঝোপের আড়াল থেকে সবাই চেয়ে রইল দৌড়িয়েটির দিকে। সহজ ব্যায়ামে নবাগতটি হাঁপাচ্ছে, প্রায়ই যন্ত্রণায় শিঁটকে উঠছে মুখ, কাতরিয়ে উঠছে, কিন্তু দৌড়িয়ে চলেছে।

আর চুপ করে থাকতে না পেরে বুর্‌নাজিয়ান হাঁকল:

'ওহে, দোস্ত! জ্‌নামেন্‌স্কিরা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না বুঝি!'

থমকে দাঁড়াল নবাগতটি। ক্লান্তি আর যন্ত্রণার ভাব মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। ঝোপের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে, কোন কথা না বলে চলে গেল বনে, একটু দুলে দুলে বিচিত্র হাঁটার ভঙ্গী ওর।

'লোকটা সার্কাসের খেলুড়ে না আধা-পাগল?' হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করল বুর্নাজিয়ান।

তন্দ্রা কেটে গিয়েছে মেজর স্ত্রুচকভের। বুঝিয়ে বলল সে:

'পায়ের পাতা নেই ওর। নকল পায়ে তালিম নিচ্ছে। জঙ্গী বিমান বাহিনীতে ফিরে যেতে চায়।'

ঝিমন্ত লোকগুলির মুখে যেন ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগল। তড়বড় করে উঠে বসে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল সবাই। যে লোকটিকে দেখে বিশেষ কিছু মনে হয়নি, হাঁটার বিচিত্র ভঙ্গীটি ছাড়া, তার পায়ের পাতা নেই শুনে সবাই এখন অবাক হয়ে গেল। জঙ্গী বিমান আবার চালাবার মতলবটা উদ্ভট, অবিশ্বাস্য, এমন কি কালাপাহাড়ী মনে হল। দুটো আঙুল নেই, কিম্বা স্নায়বিক ক্রিয়া বিকল, এমন কি পায়ের পাতা বিকৃত হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, এ সব ছোটখাটো কারণে বিমান বাহিনী থেকে লোক ছাড়িয়ে দেবার কথা বলাবলি করল ওরা। হামেশাই এমন কি যুদ্ধের সময়েও, বাহিনীর অন্যান্য শাখার তুলনায় বৈমানিকদের শারীরিক সুষ্ঠুতার মান সবচেয়ে বেশী। শেষ পর্যন্ত সবাই ওরা একমত হল যে পায়ের পাতা যার কৃত্রিম জঙ্গী বিমানের মত জটিল সূক্ষ্ম যন্ত্র চালানো তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

সবাই একমত যে মেরেসিয়েভের মতলবটা বিদঘুটে; তবুও বেপরোয়া স্বপ্নটা মন আকর্ষণ করল প্রত্যেকের।

'তোমার বন্ধুটি হয় নিরেট মূর্খ নয় মহাপুরুষ, মাঝামাঝি কিছু নয়, উপসংহারে বলল বুর্নাজিয়ান।

স্বাস্থ্যাবাসে একজন এসেছে যার পায়ের পাতা নেই, অথচ জঙ্গী বিমান চালাবার স্বপ্ন দেখে, খবরটা নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল সব ওয়ার্ডে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় এসে পড়বার আগেই সবায়ের লক্ষ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল আলেক্সেই, যদিও সেটা তার চোখে পড়েছে বলে মনে হল না। সবাই দেখে, খাবার টেবিলে পাশে যারা বসেছে তাদের সঙ্গে প্রাণখুলে হাসছে ও, বেশ আগ্রহে খাচ্ছে, ফুটফুটে ওয়েট্রেসদের প্রথামত প্রশংসা করছে, সঙ্গীদের সঙ্গে ঘুরছে বাগানে, ক্রোকে খেলতে শিখছে, এমন কি ভলিবলেও অংশ নিচ্ছে, ওর মধ্যে অসাধারণ কিছু চোখে পড়ে না, শুধু হাঁটার মন্থর ভঙ্গীটি ছাড়া। অতি সাধারণ লোক, বাস্তবিক। বেশী দিন যেতে না যেতে সবায়ের অভ্যেস হয়ে গেল ওকে, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কেউ আর দেখে না।



স্বাস্থ্যাবাসে পৌঁছবার পরের দিন সন্ধ্যায় জিনচ্‌কার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে গেল আলেক্সেই। হাতে বার্ডকের পাতায় মোড়া একটা পেস্ট্রি, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে খায়নি সেটা। সৌখীন উদারভাবে পেস্ট্রিটা দিয়ে, অনুমতির অপেক্ষা না করে ডেস্কের পাশে বসে পড়ল আলেক্সেই, জিজ্ঞেস করল জিনচ্‌কাকে কবে সে নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবে।

'কীসের প্রতিশ্রুতি?' পেন্সিলে আঁকা উঁচু ভুরুজোড়া তুলে জানতে চাইল জিনচকা।

'আমাকে নাচ শেখাবে কথা দিয়েছিলেন, জিনচ্‌কা।'

'কিন্তু...' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল মেয়েটি।

'শুনেছি যে আপনি এত ভালো মাস্টারনী যে খোঁড়ারা পর্যন্ত নাচতে শেখে, আর যারা সুস্থ সবল লোক তারা শুধু যে পা খোয়ায় তা নয়, মাথাটিও হারায়, যেমন ফেদিয়ার হয়েছিল। কবে শুরু করব আমরা? মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।'

নবাগতকে বেশ ভালো লাগল জিনচ্‌কার। পায়ের পাতা নেই, তবু নাচ শেখাতে বলছে! আর শেখাবেই না কেন? খাসা দেখতে, রংটা তামাটে, তামাটে গালে রক্তাভা, চুল ঢেউ খেলানো, মসৃণ। সুস্থ লোকের মত হাঁটে, চোখদুটো চঞ্চল, পরিহাসচপল, একটু বিষণ্ণ ভাব লেগে আছে। নাচটা জিনচ্‌কার জীবনে সামান্য একটা জিনিস নয়, নাচতে ভালোবাসে সে, সত্যি সত্যি ভালোই নাচে... আর মেরেসিয়েভকে খাসা সুন্দর দেখতে!

সংক্ষেপে, রাজী হল জিনচ্‌কা। আলেক্সেইকে জানানো হল সারা সকোল্‌নিকিতে বিখ্যাত বোব গরোখভ নাচ শেখায় তাকে, বোব গরোখভ আবার সারা মস্কোয় বিখ্যাত পল সুদাকভ্‌স্কির শ্রেষ্ঠ ছাত্র আর অনুগামী, সুদাকভ্‌স্কি সামরিক আকাদেমিগুলোতে আর পররাষ্ট্র বিভাগের ক্লাবে নৃত্যশিক্ষক ছিল। বলরুম নাচের সেরা ঐতিহ্য জিনচ্‌কা পেয়েছে এই সব খ্যাতনামা শিল্পীদের কাছ থেকে, এমন কি আলেক্সেইকেও নাচ শেখাতে চেষ্টা করবে সে, যদিও সে জানে না পায়ের পাতা ছাড়া নাচা সম্ভব কিনা। যে সব সর্তে শেখাতে রাজী হল সেগুলো বেশ কঠিন: খুব বাধ্য আর অধ্যবসায়ী হতে হবে আলেক্সেইকে, জিনচ্‌কার প্রেমে যাতে না পড়ে তার চেষ্টা করতে হবে, কেননা প্রেমে পড়লে শিক্ষায় বাধা পড়বে, আর মোদ্দা কথা, অন্য লোক জিনচকাকে নাচতে ডাকলে হিংসে করা মোটেই চলবে না,

কেননা শুধু একজনের সঙ্গে নাচলে ওর নাচের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, একজনের সঙ্গে লেগে থাকায় কোন মজা নেই।

বিনা দ্বিধায় সর্তগুলো মেনে নিল মেরেসিয়েভ। আগুনের মত লাল-চুল মাথা ঝাঁকিয়ে জিনচ্কা সেখানেই সুঠাম পা ফেলে নাচের প্রথম পদক্ষেপগুলো কেমন তা দেখাল। এক কালে রুশকায়া নাচে আর কামিশিনের পার্কে ফায়ারব্রিগেড দলের বাজানো পুরোনো নাচগুলোয় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল আলেক্সেই'র। ছন্দজ্ঞান ছিল ওর, তাই ফুর্তি-ভরা এই কলাটি তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছিল সে। এখন মুশকিল যে জীবন্ত সচল পায়ে নয়, পায়ের ডিমে বাঁধা চামড়ার জিনিসে পদক্ষেপ শিখতে হবে তাকে। ভারী বেঢপ কৃত্রিম পায়ের পাতায় ছন্দ আর গতি আনার জন্য চাই অমানুষিক উদ্যম, ইচ্ছাশক্তির একাগ্র প্রচেষ্টা।

কিন্তু সেগুলোকে মানিয়ে চলতে বাধ্য করল আলেক্সেই। প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ শিখছে — গ্লিসেড, প্যারেড, সার্পেণ্ট, — বলরুম নাচের সুচতুর কৌশল, বিখ্যাত পল সুদাকভ্স্কি সেগুলো তত্ত্বে বেঁধেছেন, জাঁকালো শ্রুতিমুখর তাদের নাম, বাচ্চার মত আনন্দে অধীর করে তুলছে তাকে। পদক্ষেপ শিখে শিক্ষয়িত্রীকে তুলে ধরে বনবন করে ঘুরিয়ে দেয় নিজের সাফল্যের উল্লাসে। আর কেউ, বিশেষ করে তার শিক্ষয়িত্রী জানতে পেত না এই সব নানামুখী জটিল পদক্ষেপ আয়ত্ত করতে গিয়ে কী যন্ত্রণা হত তার, নাচ শেখার কী মূল্য দিতে হয় তাকে। যেন কিছু হয়নি এমনভাবে স্মিত মুখ থেকে ঘাম মুছত যখন তখন আপনা থেকে এসে-পড়া চোখের জলও মুছতে হত আলেক্সেইকে, সেটা কারো নজরে পড়ত না।

একদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিজের ঘরে ফিরল আলেক্সেই, একেবারে ক্লান্ত কিন্তু খুসি।

'নাচতে শিখছি!' সগর্বে জানাল মেজর স্ত্রুচকভকে। জানলার ধারে চিন্তাকুলভাবে দাঁড়িয়ে মেজর; বাইরে গ্রীষ্মের দিনটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, সূর্যাস্তের শেষ আলো গাছের চূড়োয় সোনার মত ঝকঝক করছে।

কোন সাড়া দিল না মেজর।

'ঠিক শিখে ফেলব!' বলল মেরেসিয়েভ, কৃত্রিম পায়ের পাতা স্বস্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আড়ষ্ট পায়ে নখ দিয়ে সজোরে আঁচড়াতে লাগল।

জানলার দিকে মুখ করে রইল স্ত্রুচকভ; কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর, অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে, ফোঁপাচ্ছে যেন। কোন কথা না বলে

আলেক্সেই কম্বলের নিচে ঢুকল। বিচিত্র কিছু একটা ঘটছে মেজরের। বিগত যৌবন এই মানুষটির নারীবিদ্বেষ আর অবিশ্বাসী ইয়ার্কি কিছু দিন আগে পর্যন্ত হাসপাতাল ওয়ার্ডের সবায়ের হাসি আর ঘৃণার খোরাক জোগায়, তারপরে চ্যাংড়ার মত প্রেমে হাবুডুবু খায় লোকটা, হতাশ প্রেমিক মনে হয়েছিল। প্রতিদিন কয়েকবার অফিস-ঘরে যায় ও, মস্কোতে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে ফোন করার জন্য। হাসপাতাল ছেড়ে কেউ গেলে ও ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার জন্য পাঠায় ফুলফল, চকোলেট আর চিঠিপত্র। লম্বা চিঠি লেখে তাকে, পরিচিত লেফাফায় জবাব এলে ঠাট্টা তামাশা শুরু করত, খুসিই হত মেজর।

কিন্তু তার প্রেমে সাড়া দেয় না ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, দেয় না কোন উৎসাহ, এমন কি সহানুভূতি পর্যন্ত জানায় না। লিখত যে সে আর একজনকে ভালোবাসে, তারি বিয়োগে শোকাতুর সে, মেজরকে বন্ধুর মত করে উপদেশ দিত সে যেন ওকে ভুলে যায়, ওর জন্য খরচ করা কিম্বা সময় নষ্ট করার মানে হয় না কোন। প্রেমের ব্যাপারে এই বন্ধুত্বপূর্ণ অথচ কাজের মানুষের ভঙ্গীটাই সবচেয়ে চটিয়ে দেয় মেজরকে।

আলেক্সেই কম্বলের নিচে বুদ্ধিমানের মত চুপচাপ পড়ে আছে, জানলার পাশ থেকে এক ঝটকায় ওর খাটের কাছে এসে মেজর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে নুয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল:

'কী চায় ও? আমাকে কী ভাবে বলো ত? একেবারে ফেলনা! আমি কি কুৎসিৎ, বুড়ো, কুষ্ঠরোগী একটা! ওর জায়গায় যদি অন্য কেউ হত... কিন্তু কথা বলে কোন লাভ নেই!'

একটা কেদারায় ধপাস করে বসে পড়ল মেজর, দুহাতে মাথা টিপে এত জোরে এদিক ওদিক নড়তে লাগল যে কেদারাটা আর্তনাদ করে উঠল।

'ও ত মেয়েমানুষ, তাই না? আমার সম্বন্ধে অন্তত একটু আগ্রহ থাকা ত উচিত! শয়তানী! ওকে আমি ভালোবাসি আর কত না ভালোবাসি!.. যদি তুমি জানতে! অন্য লোকটিকে তুমি ত চিনতে?.. আমার চেয়ে কোন অংশে ভালো ছিল সে বলতে পারো? কীসে ওর মন ভুলিয়েছিল? আমার চেয়ে বুদ্ধি বেশী ছিল? দেখতে আরো ভালো ছিল? কী ধরনের বীরপুরুষ ছিল সে?'

আলেক্সেই'র মনে পড়ল কমিসার ভরোবিওভের কথা, প্রকাণ্ড ফাঁপা শরীর, বালিশে রাখা মোমের মত ফ্যাকাশে মুখ; নারীসুলভ চিরন্তন বিষাদে

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে মহিলাটি; মনে পড়ল মরুভূমিতে মার্চ করে যাওয়া লাল ফৌজের অদ্ভুত গল্পটি।

'মেজর, মানুষের মত মানুষ ছিল সে, বলশেভিক একজন। প্রার্থনা করি যেন আমরা সবাই তার মত হতে পারি।'

৪

খবরটা বিদঘুটে শোনালেও ছড়িয়ে পড়ল ওয়ার্ডে: পায়ের চেটোবিহীন বৈমানিকটি নাচ শিখছে।

অফিস-ঘরে কাজ শেষ হয়ে গেলেই জিনচ্‌কা দেখত ছাত্রটি বারান্দায় অপেক্ষা করছে। এক গোছা বুনো ফুল, কিম্বা চকোলেট, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে না-খাওয়া একটা কমলালেবু হয়ত এনেছে তার জন্য। গম্ভীরভাবে তার হাত ধরে জিনচ্‌কা যেত অবসর বিনোদনের ঘরে। গ্রীষ্মকালে ঘরটায় লোকজন নেই, এরি মধ্যে অধ্যবসায়ী ছাত্রটি তাস খেলার আর পিঙ-পঙের টেবিল দেয়ালের কাছে সরিয়ে রেখেছে। নতুন একটা নাচের ভঙ্গী সুন্দরভাবে দেখাত জিনচ্‌কা। ছোট্ট সুন্দর পায়ে মেঝেতে জটিল নানা নক্‌সা করে চলেছে সে, ভুরু কুঁচকে দেখছে বৈমানিক। তারপর গম্ভীরমুখে হাতে তাল রেখে জিনচ্‌কা গুণতে শুরু করত:

'এক, দুই, তিন... এক, দুই, তিন... ডানদিকে গ্লিসেড!.. এক, দুই, তিন... এক, দুই, তিন... বাঁদিকে গ্লিসেড... ফিরুন এবার। ঠিক। এক, দুই, তিন... এক, দুই, তিন... এবার সার্পেণ্ট! একসঙ্গে করা যাক এটা।'

পায়ের পাতা নেই এমন একজনকে নাচ শেখানো, এধরনের কাজ বোব গরোখভ কিম্বা পল সুদাকভ্‌স্কি কখনো করেনি, হয়ত সেজন্য, হয়ত তামাটে পরিহাসপ্রিয় চোখ, কালো চুল, রোদে-পোড়া ছাত্রটিকে মনে লেগেছিল বলে, যে কারণেই হোক, অবসর পেলেই প্রাণ দিয়ে ওকে নাচ শেখাত জিনচ্‌কা।

সন্ধ্যেবেলায় বালি-ভরা নদীতীর, ভলিবলের মাঠ, স্কিটল খেলার জায়গা খালি হয়ে যেত, রোগীরা অবসর বিনোদনের জন্য নাচে মন দিত, তখন আলেক্সেই উৎসবে যোগ দিতে কখনো দ্বিধা করত না। ভালোই নাচত সে, কোন নাচ বাদ পড়ত না, আর কড়া সর্তে ওকে বেঁধেছে বলে একাধিকবার শিক্ষয়িত্রীর মনে আসত অনুশোচনা।

এ্যাকর্ডিয়নের তালে তালে জোড়ায় জোড়ায় সবাই ঘুরপাক খাচ্ছে, জ্বলজ্বলে মুখে, উত্তেজনায় দীপ্ত চোখে আলেক্সেই করে চলেছে সব কটা গ্লিসেড, সার্পেণ্ট, আর বক্রপাক; যেন অবলীলাক্রমে আগুনরঙা চুল লঘুপদ সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘুরত। মাঝেমাঝে এই বেপরোয়া নর্তকটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে কী করত, সেটা আঁচ পর্যন্ত করতে পারত না কোন দর্শক।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেত আলেক্সেই, রক্তিম মুখে হাসি, রুমাল দিয়ে হাওয়া খাচ্ছে হেলায়; কিন্তু দোরগোড়া ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই হাসির জায়গায় মুখে আসত যন্ত্রণার বিকৃতি। বারান্দার সিঁড়ির রেলিং ধরে টলতে টলতে নেমে কাতরে উঠে শুয়ে পড়ত শিশিরে-ভেজা ঘাসে, স্যাঁতসেঁতে তখনো উষ্ণ মাটিতে সমস্ত শরীর চেপে কৃত্রিম পায়ের পাতার আঁটো চামড়ার ফেট্টির চাপে যন্ত্রণায় কেঁদে উঠত।

ফিতেগুলো খুলে ফেলত যাতে আরাম হয় পাদুটোর। কিছুক্ষণ জিরোবার পর ফিতেগুলো আবার লাগিয়ে ঝট করে উঠে ফিরে যেত বাড়িটাতে। অলক্ষিতে হলে আসত আবার। ঘর্মাক্ত এ্যাকর্ডিয়নবাদক অক্লান্তভাবে বাজিয়ে চলেছে, আলেক্সেই জিনচ্কার কাছে যেত, এরি মধ্যে ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁজছিল মেয়েটি। হাসত আলেক্সেই, চীনেমাটির মত শাদা সার-বাঁধা দাঁত উঠত ঝলসে, আবার দুজনে ফিরে যেত নাচের বৃত্তে, ক্ষিপ্র কমনীয় জোড়ায়। ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে ধমকাত জিনচ্কা, ঠাট্টা করে জবাব দিত আলেক্সেই, দুজনে ঘুরপাক খেত আবার, অন্যান্য সবায়ের মত, কোন পার্থক্য নেই।

নাচের কঠিন পরিশ্রম সত্বর কাজ দিল। কৃত্রিম পায়ের পাতার নিগড় ক্রমশ হালকা হয়ে এল, মনে হল পায়ের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলো।

বেশ খুসি আলেক্সেই। শুধু একটা ব্যাপারে সে উদ্বিগ্ন — ওলিয়ার চিঠিপত্র আসছে না। আনিউতার সঙ্গে গভজ্দেভের দুর্ভাগ্য অভিজ্ঞতার পরে লেখা সেই চিঠিটার কোন উত্তর আসেনি, একমাসেরও বেশী হয়ে গিয়েছে। এখন তার মনে হয় চিঠিটা মারাত্মক, কোন মাথামুণ্ডু ছিল না সেটার। রোজ সকালে ব্যায়াম আর দৌড়বার পরে — দৌড়নোটা একশ পা করে বাড়িয়ে চলেছে প্রতিদিন — বসবার ঘরে চিঠিপত্রের বাক্স খোঁজ করে সে, যদি কিছু এসে থাকে। "ম" মার্কা খোপে চিঠির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হামেশাই, কিন্তু চিঠিপত্রগুলো বৃথায় ঘাঁটত সে।

একদিন নাচ শিখছে, শিক্ষার ঘরের জানলায় দেখা গেল বুরুনাজিয়ানের কালো মাথা। হাতে ছড়ি আর চিঠি একটা। কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বড়ো গোলগোল স্কুলের মেয়েসুলভ হাতে ঠিকানা লেখা খামটা ছিনিয়ে নিল আলেক্সেই আর দৌড়িয়ে চলে গেল ঘর থেকে, জানলায় দাঁড়িয়ে রইল বিমূঢ় বুরুনাজিয়ান আর ঘরের মধ্যখানে ক্রুদ্ধ শিক্ষয়িত্রী।

বকবকে পিসীর মত গলায় বলল বুরুনাজিয়ান:

'জিনচ্‌কা, আজকাল কাকে বাছবেন, সবাই এক ছাঁচে ঢালা... জোচ্চোর সবাই। কাউকে বিশ্বেস করবেন না। দেখলেই পালাবেন গঙ্গাজল দেখলে ভূতে যেমন পালায়। বরঞ্চ আমাকে আপনার ছাত্র করে নিন!' কথাটা বলে ছড়িটা ঘরে ছুঁড়ে ফেলে, ঘোঁৎঘোঁৎ করে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকল। জানলার ধারে বিষণ্ণ হতবুদ্ধিভাবে দাঁড়িয়ে রইল জিনচ্‌কা।

ইতিমধ্যে দৌড়িয়ে হ্রদের ধারে পেঁৗছিয়েছে আলেক্সেই, চিঠিটা হাতের মুঠিতে, যেন কেউ তাড়া করে এসে ছিনিয়ে নেবে বহুমূল্য জিনিসটি। নলখাগড়া ঠেলে সরিয়ে শ্যাওলাচ্ছন্ন একটা বড়ো পাথরের উপরে সে বসল; লম্বা ঘাসের আড়ালে ওকে দেখা যাচ্ছে না একেবারে। মূল্যবান খামটি খুঁটিয়ে দেখল, আঙুলগুলো কাঁপছে। কী আছে চিঠিটাতে, কী দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হবে এখনি? খামটা ধারে ধারে ছেঁড়া, জীর্ণ; নিশ্চয়ই অনেক অনেক জায়গা ঘুরে গন্তব্যে এসেছে। খামের একদিক সন্তর্পণে ছেঁড়াতে শেষ ছত্রটি চোখে পড়ল: "আমরণ তোমার, ওলিয়া।" স্বস্তির অনুভূতিতে তক্ষুণি অভিভূত হয়ে গেল আলেক্সেই। লেখবার খাতার পাতাগুলো হাঁটুতে রেখে শান্তভাবে সমান করল সে — কী কারণে যেন পাতাগুলোয় এঁটেল মাটির ছাপ আর মোমবাতির তেলের দাগ। ওলিয়া ত বরাবর খুব গোছালো, কী হয়েছিল ওর? তারপর যে সব খবর পড়ল তাতে যুগপৎ গর্বে আর উৎকণ্ঠায় মন ভরে গেল তার। মনে হচ্ছে মাসখানেক আগে কারখানা ছেড়ে দিয়েছে ওলিয়া। কার্মিশিনের অন্যান্য প্রবীণা আর তরুণীর সঙ্গে স্তেপের কোথাও ট্যাঙ্কবিরোধী-গর্ত আর গড়খাই বানানোর কাজে ব্যস্ত, কাজটা চলেছে "একটা বড়ো সহর ঘিরে, যার নাম" ওর কথায় "আমাদের সবায়ের কাছেই পূত"। স্তালিনগ্রাদ কথাটা চিঠির কোথাও নেই, কিন্তু যেরকম অনুরাগে উৎকণ্ঠায় আর আশায় "বড়ো সহরটির" বিষয়ে ও লিখেছে তাতে বোঝা যায় সহরটি স্তালিনগ্রাদই।

লিখেছে ওর মত হাজার হাজার স্বেচ্ছাকর্মী দিনরাত স্তেপে কাজ করে

চলেছে, মাটি খ্ঁড়ে গাড়ি বোঝাই করে আনছে, কংক্রিট বসাচ্ছে, গড় বানাচ্ছে। চিঠিটায় খ্সির ছাপ, কিন্তু কয়েকটি উক্তি থেকে বোঝা যায় যে স্তেপে ওদের সময় কষ্টে কাটছে। যে সব কাজে ও একাগ্রভাবে আচ্ছন্ন সে সবের কথা লেখার পরে শ্ধ্ আলেক্সেই'র প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। কড়া কথায় জানিয়েছে যে ওর শেষ চিঠিটায় বেশ ক্ষ্ব্ধ সে, চিঠিটা যখন পায় তখন ও "এখানে, ট্রেঞ্চে" আর আলেক্সেই ফ্রন্টে, সেখানে মনের উপরে সাংঘাতিক চাপ পড়ে সেটা জানে বলেই মাপ করেছে এবারে, নইলে কখনো করত না।

"প্রিয়তম, আত্মত্যাগ করতে পারে না সেটা কী ধরনের প্রেম? ও ধরনের প্রেমের অস্তিত্ব নেই। থাকলেও আমার মতে সেটাকে প্রেম বলা যায় না মোটেই। এক হপ্তা ম্খ-হাত-পা ধ্ইনি, পাৎল্ন পরি আজকাল আর ব্ট, আঙ্লগ্লো বেরিয়ে পড়েছে তা থেকে। রোদে ম্খটা এমন পোড়া যে চামড়া খসে উঠে আসছে, তার নিচে নীলচে কড়া। ক্লান্ত নোংরা হাড় জিরজিরে আর কুৎসিৎ চেহারায় যদি তোমার কাছে হাজির হই, তাহলে কি তাড়িয়ে দেবে না দোষ দেবে আমাকে? কী বোকা তুমি! যা কিছ্ ঘটুক না তোমার, জানিয়ে দিচ্ছি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব, যে অবস্থাতেই তুমি থাক না কেন... প্রায়ই তোমার কথা ভাবি, ট্রেঞ্চে ঢুকে বাঙ্কে শ্লেই সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মত ঘ্মিয়ে পড়ি সবাই, ট্রেঞ্চে আসার আগে প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম তোমাকে। জানাতে চাই তোমাকে যে যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তোমার প্রতীক্ষায় থাকবে একজন, সর্বদাই প্রতীক্ষা করে থাকবে, তোমার যাই হোক না কেন... লিখেছ যে ফ্রন্টে কিছ্ ঘটতে পারে তোমার: ট্রেঞ্চে আমার যদি কিছ্ ঘটে, দ্র্ঘটনায় পঙ্গ্ হয়ে যাই, তাহলে কি তুমি ম্খ ঘ্রিয়ে চলে যাবে? মনে আছে, শিক্ষানবিশি স্কুলে পড়ার সময় বীজগণিতের সম্পাদ্যগ্লো অন্কল্পাবিধিতে করতাম আমরা? তোমার জায়গায় আমার কথা ভাবো, তা যদি কর তাহলে যা লিখেছ তাতে লজ্জা হবে তোমার..."

বসে বসে অনেকক্ষণ চিঠিটা নিয়ে ভাবল মেরেসিয়েভ। অন্ধকার জলে স্র্যের চোখ-ঝলসানো প্রতিবিম্ব, কাটফাটা রোদ, খাগড়ার সরসর শব্দ, নীল ড্র্যাগন-ফ্লাইগ্লো এ ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে উড়ে যাচ্ছে। ক্ষিপ্রগতি জলের পোকাগ্লো লম্বা সর্ পা ফেলে খাগড়ার মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, জলের মস্ণ ব্ক জরির ফিতের মত কুঁচকিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ঢেউ নিঃশব্দে লাগছে বাল্তীরে।

"এটা কী?" ভাবছে আলেক্সেই। "পূর্ববোধ, দিব্য দৃষ্টি?" ওর মা বলতেন, "মানুষের অন্তরই দৈবজ্ঞ," কিম্বা হয়ত ট্রেঞ্চ জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা ওকে প্রাজ্ঞ করেছে; আলেক্সেই বলতে সাহস করেনি যেটা সেটা বুঝেছে প্রজ্ঞায়? চিঠিটা আর একবার পড়ল আলেক্সেই, না, সে রকম কিছু নয়! পূর্ববোধ নয়। যা লিখেছিল তার জবাব মাত্র। আর জবাবটা কেমন!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে জামাকাপড় খুলে পাথরটার উপরে রাখল আলেক্সেই। খাগড়ার দেয়ালের আড়ালে শিকের মত লম্বা বালুকাময় ছোট নিরালা জায়গাটিতে বরাবর স্নান করত সে, জায়গাটি শুধু তার কাছেই জানা। কৃত্রিম পায়ের পাতার ফেট্টি খুলে পাথর থেকে আস্তে আস্তে গড়িয়ে নামল, কাটা পায়ে নুড়ির উপরে হাঁটা অত্যন্ত কষ্টকর হলেও হামাগুড়ি দিল না আলেক্সেই। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত, হেঁটে গেল হ্রদে, ঝাঁপ দিল ঠান্ডা ঘন জলে। কিছু দূর সাঁতরে গিয়ে চিৎ হয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। উপরে নীল অসীম আকাশ। ছোট ছোট মেঘ খরখর করে চলেছে, এ ওর গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আলেক্সেই দেখল তীরের ছায়া পড়েছে ঠান্ডা নীল মসৃণ জলের বুকে, গোল পাতার মধ্যে ভাসমান হলদে আর শাদা কুমুদ। হঠাৎ দেখল ওলিয়ার প্রতিবিম্ব, শেওলা-ভরা পাথরটার উপরে বসে আছে সে। ছাপা ফ্রক পরনে, স্বপ্নে-দেখা ওলিয়া। পাদুটো মুড়ে নয়, ঝুলিয়ে বসেছে, জল পর্যন্ত আসেনি — কুৎসিৎ দুটো ঠুঁটো পা জলের উপরে ঝুলছে। ছবিটা ভাগিয়ে দেবার জন্য জলে চড় মারল আলেক্সেই। না, ওলিয়ার প্রস্তাবিত অনুকল্প বিধিটা তার কাজে লাগবে না!

৫

দক্ষিণের অবস্থিতি আগেকার চেয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক। দন-যুদ্ধের কথা খবরের কাগজগুলো অনেকদিন হল বন্ধ করেছে। দনের অন্য পারে ভলগার দিকে স্তালিনগ্রাদের পথে কয়েকটি কসাক গ্রামের নাম সোভিয়েত সংবাদ বিভাগ একদিন উল্লেখ করল। যারা এ সব অঞ্চলের সঙ্গে অপরিচিত তাদের কাছে নামগুলোর বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু আলেক্সেই ত ওখানে জন্মেছে আর মানুষ হয়েছে, সে বুঝতে পারল দনের প্রতিরোধ রেখা



ভেঙ্গে গিয়েছে, স্তালিনগ্রাদের দেয়াল পর্যন্ত যুদ্ধ চলে এসেছে প্রখর গতিতে।

স্তালিনগ্রাদ! ইস্তাহারে নামটা এখন পর্যন্ত করা হয়নি বটে, কিন্তু নামটা প্রত্যেকের মুখে। ১৯৪২-এর হেমন্তে উৎকণ্ঠায় আর ব্যথায় নামটি উচ্চারণ করত লোকে, সহরের নাম নয়, চরম বিপদগ্রস্ত কোন নিকটজনের নাম যেন ওটা। ওলিয়া আছে সহরটির কাছে, বাইরের স্তেপে কোথাও, সাধারণ উৎকণ্ঠা সেজন্য তীব্রতর আলেক্সেই'র কাছে। কে বলতে পারে ওলিয়াকে কত কিছু সহ্য করতে হবে? রোজ চিঠি লেখে ওলিয়াকে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ডাকঘরের ঠিকানা দেওয়া চিঠিগুলোর মূল্য কতটুকু? ভলগা স্তেপে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে, সেই ঝঞ্ঝায় আর অপসারণেব গণ্ডগোলের মধ্যে চিঠিগুলো কি পেঁাছবে ওর কাছে?

বৈমানিকদের স্বাস্থ্যাবাস অস্থির মুখর, মৌচাকে যেন ঢিল পড়েছে। অবসর বিনোদনের জন্য প্রচলিত সব খেলা — ড্রাফট, দাবা, ভলিবল, স্কিটল, আর সেই "একুশ" — জুয়া প্রিয় তাসুড়েরা হ্রদেব কাছে ঝোপঝাড়ে খেলত যেটা — সব ছেড়ে দিল বৈমানিকরা। কারো মন নেই খেলাতে। প্রত্যেকে, এমন কি যারা দারুণ কুঁড়ে, তারাও সকালে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে উঠে পড়ত, রেডিওতে সাতটার সময় যুদ্ধের সর্বপ্রথম খবর শোনা চাই। বৈমানিকদের কীর্তিকলাপের কথা ইস্তাহারে উল্লেখ করলে সবাই বিরস মুখে ঘোরাফেরা করত, নার্সদের খুঁত ধরা শুরু হত, খাবারদাবার আর নিয়মকানুন নিয়ে চলত গজগজানি; ওরা যে রোদে ঘুরছে কিছু না করে, কাচের মত স্বচ্ছ হ্রদের কাছে নিঝুম বনে পড়ে আছে, স্তালিনগ্রাদের কাছে স্তেপে লড়তে পারছে না, তার জন্য যেন দায়ী স্বাস্থ্যাবাসের কর্মীবৃন্দেরা। অবশেষে স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীরা ঘোষণা করল স্বাস্থ্যাবাসে থাকাতে অরুচি, ছেড়ে দেওয়া হোক তাদের, যাতে নিজের নিজের দলে ফিরে যেতে পারে।

একদিন বিকেলে বিমান বাহিনীর কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ থেকে একটি কমিশন স্বাস্থ্যাবাসে এল। চিকিৎসা সার্ভিসের পরিচয়-চিহ্ন পোশাকে কয়েকটি অফিসার ধূলিধূসর গাড়ি থেকে নামলেন। সামনের সিট থেকে, সিটের পিঠে অনেকটা ভর দিয়ে নামলেন মজবুত চেহারার একটি অফিসার। ইনি হলেন কর্ণেল পদস্থ আর্মি সার্জন মিরভল্স্কি, বিমান বাহিনীতে বিশেষ পরিচিত, সস্নেহে চিকিৎসা করেন বলে ইনি বৈমানিকদের প্রিয়।

রাত্রের আহারের সময়ে ঘোষণা করা হল যে সব স্বাস্থ্যসঞ্চয়ী অসুখের ছুটির মেয়াদ স্বেচ্ছায় কমিয়ে নিজেদের দলে এক্ষুণি ফিরে যেতে চায়, তাদের মধ্য থেকে পরের দিন সকালে লোক বাছাই করবে কমিশন।

পরের দিন ভোর বেলায় উঠে মেরেসিয়েভ রীতি অনুযায়ী ব্যায়াম না করেই চলে গেল বনে, প্রাতরাশের সময় না হওয়া পর্যন্ত ফিরল না। কিছু খেল না। খাবারে হাত দেয়নি বলে ওয়েট্রেস বকাতে তার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করল মেরেসিয়েভ, আর যখন স্ত্রুচকভ বলল যে মেয়েটি তার ভালোর জন্যই বকেছিল, ওর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই তার, তখন এক ঝটকায় উঠে পড়ে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আলেক্সেই। করিডরে দেয়ালে আটকানো সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহার পড়ছিল জিনা। তার সঙ্গে একটিও কথা বলল না আলেক্সেই, জিনা ভাণ করল দেখতে পায়নি ওকে, শুধু মেয়েলিভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। কিন্তু সত্যি সত্যি ওকে না দেখেই যখন আলেক্সেই চলে যাচ্ছে তখন খুব ব্যথিত লাগল জিনার, প্রায় কেঁদে ফেলে ডাকল তাকে। মুখ ঘুরিয়ে রেগে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই·

'কী চান আপনি?'

'কমরেড সিনিয়র লেফটেনাণ্ট... কেন আপনি...' নরম সুরে জবাব দিল জিনা, গালদুটো এত লাল হয়ে উঠেছে যে চুলের রঙের সঙ্গে প্রায় খাপ খেল।

রাগ তক্ষুণি সামলে নিল আলেক্সেই, সারা শরীর হঠাৎ অবশ হয়ে গিয়েছে মনে হল।

'আজ বুঝব আমার কপালে কী আছে,' নিচু গলায় সে বলল। 'হাত হাত দিয়ে শুভ কামনা করুন...'

অন্য দিনের চেয়ে বেশী খোঁড়াচ্ছে আজ, নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তালা বন্ধ করে দিল।

কমিশন বসেছে হলে, সমস্ত যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে সেখানে - শক্তি ও নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষার মিটার, চক্ষুপরীক্ষার কার্ড ইত্যাদি। ঘরের বাইরে জমায়েৎ স্বাস্থ্যাবাসের সবাই, যারা ছুটির মেয়াদ কমাতে চায় তারা, অর্থাৎ স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীদের প্রায় সবাই, দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে। জিনচ্‌কা এসে প্রত্যেককে এক টুকরো কাগজ দিল, কোন সময়ে তলব পড়বে জানানো হয়েছে তাতে, বলল ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। প্রথম কয়েকজন কমিশনের কাছে যাবার পর গুজব রটে গেল যে পরীক্ষাটা বিশেষ কিছু নয়, কমিশন খুব কড়াভাবে দেখছে না। সত্যিই ত ভলগায় দারুণ যুদ্ধ চলেছে,

মহৎ প্রয়াসের প্রয়োজন এখন, কড়াভাবে দেখবে কী করে কমিশন? বারান্দার সামনে ইঁটের নিচু দেয়ালে পা রেখে বসে আছে আলেক্সেই, কেউ বাইরে এলেই, যেন তার বিশেষ কোন উৎসাহ নেই, এমন নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞেস করছে:

'কী হল?'

'পাশ করেছি!' টিউনিকের বোতাম আঁটতে আঁটতে কিম্বা বেল্ট কষে বাঁধতে বাঁধতে উৎফুল্লভাবে জবাব দিল হয়ত লোকটি।

* মেরেসিয়েভের আগে বুরুনাজিয়ানের ডাক পড়ল। ছড়িটা দরজার বাইরে রেখে গেল সে, চেষ্টা করছে যাতে শরীরটা না দোলে আর ছোট পায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে না হয়। অনেকক্ষণ ভিতরে রইল সে। অবশেষে খোলা জানলা দিয়ে রাগী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল আলেক্সেই, দৌড়িয়ে বেরিয়ে এল বুরুনাজিয়ান, ভয়ানক ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে তাকে। আলেক্সেই'র দিকে সক্রোধে একবার চেয়ে নেংচাতে নেংচাতে পার্কে চলে গেল বুরুনাজিয়ান, সোজাসুজি সামনের দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে:

'আমলাতান্ত্রিক যত সব! খুঁত ধরতে ওস্তাদ! বিমান চালানোর বিষয়ে কী জানে ওরা? বিমান চালানোটা ওদের কাছে ব্যালের মত যেন! খাটো পা! পিচকারি আর সিরিঞ্জের দল বেটারা, আর কিছু নয়!'

হাতপা সেঁধিয়ে গিয়েছে মনে হল আলেক্সেই'র, কিন্তু হাসিমুখে উৎফুল্লভাবে ক্ষিপ্রপদে ঘরে ঢুকল ও। লম্বা টেবিল ঘিরে বসে আছে কমিশন। মধ্যের জায়গাটিতে বিরাট মাংসপিণ্ডের মত খাড়া হয়ে বসে আছেন আর্মি সার্জন মিরভল্স্কি। পাশের একটা টেবিলের ধারে এক গাদা কেস-কার্ডের সামনে রয়েছে জিনচ্কা, শাদা খরখরে স্মক পরনে, ছোট্ট সুন্দর একটা পুতুলের মত দেখাচ্ছে ওকে; এক গাছি লাল চুল গজের রুমালের নিচ থেকে মন-ভোলানো ভাবে উঁকি মারছে। আলেক্সেইকে ওর কার্ডটা দেবার সময়ে কোমলভাবে হাতে চাপ দিল জিনচ্কা।

চোখ কুঁচকিয়ে সার্জন বললেন:

'কোমর পর্যন্ত জামাটা খুলে ফেলুন ত!'

মেরেসিয়েভের ব্যায়াম বৃথায় যায়নি। খাসা সুগঠিত দেহ, তামাটে চামড়ার নিচে প্রত্যেকটি পেশী ফুটে বেরিয়ে আছে, দেখে তারিফ না করে পারলেন না সার্জন।

'ডোভডের মূর্তির প্রতিকৃতি আপনি অনায়াসে হতে পারবেন,' নিজের বিদ্যেবুদ্ধি জাহির করে কমিশনের একজন সদস্য বললেন।

সবকিছু পরীক্ষা অনায়াসে উত্তীর্ণ হল মেরেসিয়েভ। মুষ্টির চাপ সাধারণ মানের তুলনায় দেড় গুণ বেশী, আর নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষার সময়ে এক ফুঁয়ে ইনডিকেটরটাকে একেবারে ডগায় পাঠাল সে। রক্তপ্রেষ স্বাভাবিক, স্নায়ুর অবস্থা চমৎকার। শেষে শক্তি পরীক্ষার যন্ত্রটির ইস্পাতের বাঁট এতো জোরে টানল ও যে স্প্রিংটা কেটে গেল।

'বৈমানিক বুঝি?' জিজ্ঞেস করলেন সার্জন, বেশ খুসি দেখাচ্ছে তাঁকে। আরো আরাম করে চেয়ারে বসে নিজের রায় লিখতে শুরু করলেন কেস-কার্ডটার উপরের কোণে। "সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ আ. প."

'হ্যাঁ!'

'জঙ্গী বিমান চালক?'

'হ্যাঁ!'

'বেশ বেশ, আবার লড়াই চালান! আপনার মত লোক চায় ওরা, বিশেষভাবে চায়!. আচ্ছা, কী হয়েছিল আপনার?'

বিবর্ণ হয়ে গেল আলেক্সেই'র মুখ। মনে হল সবকিছু ছারখার হয়ে যাবে। খুঁটিয়ে কেস-কার্ডটি দেখলেন সার্জন, মুখে এল বিস্ময়ের ভাব।

'পায়ের পাতা কাটা... তার মানে? বাজে কথা! নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে, কী বলুন? জবাব দিচ্ছেন না কেন?'

'না, ভুল নয়,' নিচু গলায় আস্তে আস্তে বলল আলেক্সেই, যেন ফাঁসির মঞ্চে উঠছে।

বলিষ্ঠ সুগঠিত প্রাণচঞ্চল যুবকটির দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে সার্জন আর কমিশনের অন্যান্য সদস্যেরা, ব্যাপারটা কী মাথায় ঢুকল না তাদের।

'প্যাণ্টটা গুটিয়ে তুলুন ত!' অধীরভাবে আদেশ করলেন সার্জন। বিবর্ণমুখে, জিনচকার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে প্যাণ্ট তুলে ধরে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে রইল আলেক্সেই, চামড়ার পাদুটো সবায়ের চোখে পড়ল।

'আপনি কি এতক্ষণ আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছিলেন? কতো সময় নষ্ট করেছেন, দেখুন ত! পায়ের পাতা নেই, নিশ্চয়ই আপনি বিমান বাহিনীতে ফেরবার কথা ভাবছেন না?' অবশেষে বললেন সার্জন।

'ভাবার কিছু নেই, ফিরে যাচ্ছি আমি!' নিচু গলায় জবাব দিল আলেক্সেই, একগুঁয়ে জেদে ঝলসে উঠল তার চোখ।

'পায়ের পাতা নেই, তবু? পাগল হয়ে গিয়েছেন না কি?'

'পায়ের পাতা নেই সত্যি, কিন্তু আবার বিমান চালাব আমি,' জবাবে বলল আলেক্সেই, এবারে উদ্ধতভাবে নয়, শান্ত কণ্ঠে। বৈমানিকের পুরোনো ধরনের টিউনিকের পকেট থেকে সেই পত্রিকাটার একটি ভাঁজ-করা পাতা বের করল সে। পাতাটা সার্জনকে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন, ও এক পায়ে বিমান চালাত। দুটো পায়ের পাতা না থাকলেও চালাতে পারব না কেন আমি?'

পাতাটি পড়ে সার্জন সবিস্ময়ে সশ্রদ্ধভাবে আলেক্সেই'র দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা করবার আগে আপনাকে অনেক কিছু করতে হবে। ও লোকটি দশ বছর চেষ্টা করেছিল। নকল পায়ের পাতাদুটো ঠিক যেন আসল, এমন ভাবে তালিম নিতে হবে আপনাকে,' আগের চেয়ে নরম সুরে তিনি বললেন।

সে সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আলেক্সেইকে শক্তি যোগাল একজন। টেবিলের পিছনে অস্থিরভাবে নড়ে উঠল জিনচ্‌কা; টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ, বিন্দু বিন্দু ঘাম রগে, হাতদুটো জুড়ে, যেন প্রার্থনা করছে, তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'কমরেড আর্মি সার্জন! ওর নাচ দেখা উচিত আপনার! সুস্থদের চেয়ে ভালো নাচতে পারে। সত্যি কথা!'

'নাচ? তার মানে...' কমিশনের সদস্যদের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলে উঠলেন সার্জন।

জিনচ্‌কার কথাটার জের সানন্দে টেনে আলেক্সেই বলল:

'এখন কিছু ঠিক করবেন না। আজ রাত্রে আমাদের নাচে এসে দেখুন আমি কী করতে পারি।'

দরজার দিকে যেতে যেতে আয়নায় আলেক্সেই দেখল কমিশনের সদস্যরা উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের আগে পরিত্যক্ত পার্কের একটা ঝোপের মধ্যে আলেক্সেইকে খুঁজে পেল জিনচ্‌কা। বলল যে ঘর ছেড়ে চলে আসার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিয়ে আলোচনা চলে; সার্জন বলেন অদ্ভুত ছোকরা এই মেরেসিয়েভ, আর কে জানে, ও হয়ত সত্যি সত্যি বিমান চালাতে পারবে।

রুশ লোকে কী না পারে? কমিশনের একটি সদস্য বলে বিমান চালানোর ইতিহাসে এ রকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। তার জবাবে সার্জন বলে ওঠেন বিমান চালানোর ইতিহাসে অনেক কিছুই ত আগে ঘটেনি, আর এ যুদ্ধে সোভিয়েত মানুষ অনেক কিছু নতুন জিনিস দেখিয়েছে।

প্রায় দুশ লোক দেখা গেল স্বেচ্ছায় সামরিক কাজে ফিরে যাচ্ছে; তাদের বিদায়ের উপলক্ষ্যে নাচের বন্দোবস্ত করা হল, জমকালো অনুষ্ঠান একটা। মস্কো থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হল সামরিক বাজিয়েদের একটা দলকে; প্রাসাদের সব হল আর বারান্দা সঙ্গীতের বজ্রনির্ঘোষে গেল ভরে, জাফরি-দেওয়া জানলাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ঘর্মাক্ত মুখে অবিরাম নেচে চলেছে বৈমানিকরা, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ফুর্তিবাজ, ক্ষিপ্র আর প্রাণচঞ্চল হল মেরেসিয়েভ, তার সঙ্গে নাচছে লালচে চুল সেই মেয়েটি; ওদের জোড়া মেলা ভার!

খোলা জানলার পাশে বসে আছেন আর্মি সার্জন মিরভলস্কি, ঠাণ্ডা বিয়রের গেলাস সামনে, মেরেসিয়েভ আর তার আগুনের মত লাল-চুল সঙ্গিনীটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে তিনি পারছেন না। সার্জন তিনি, বাহিনীর সার্জন তাছাড়া, আসল আর নকল পায়ের তফাৎ জানা আছে তাঁর।

আর এখন তামাটে, সুগঠিত বৈমানিকটি ও ছোটখাটো কমনীয় মেয়েটির নাচ দেখে বারবার তাঁর মনে হতে লাগল এর পিছনে কিছু একটা চালাকি আছে। অবশেষে "বারিনিয়া" নাচল আলেক্সেই, তাকে ঘিরে তারিফ করছে সবাই; উরু আর গাল বেপরোয়াভাবে চাপড়ে লাফাল আলেক্সেই আরো নানা কসরৎ দেখাল, তারপর ঘর্মাক্ত কলেবরে উত্তেজিতভাবে গেল মিরভলস্কির কাছে। নির্বাক সম্ভ্রমে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন সার্জন। কিছু কথা বলল না আলেক্সেই, শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সার্জনের মুখের দিকে, জবাব দাবী করে সে, জবাব ভিক্ষা করে সে।

সার্জন অবশেষে বললেন:

'আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন আপনাকে কোন দলে নিযুক্ত করার অধিকার নেই আমার, কিন্তু কর্মচারীবৃন্দ বিভাগের জন্যে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দেব। লিখে দেব যে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে বিমান চালাতে পারবেন আপনি। যাই হোক, আপনাকে সমর্থন করব, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

স্বাস্থ্যাবাসের অধিকর্তাও বেশ অভিজ্ঞ সার্জন, হাত ধরাধরি করে তিনি আর মিরভলস্কি হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায় দুজনেই

অভিভূত। শুতে যাবার আগে অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন তাঁরা, সিগারেট খেতে খেতে আলোচনা চলল যে সত্যি সত্যি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে সোভিয়েত মানুষ কী না করতে পারে...

বাজনার গুরুগুরু ধ্বনি থামেনি তখনো, খোলা জানলার আলোয় বাইরে ঠিকরে পড়ছে নাচিয়েদের চলমান ছায়া। উপরের স্নানের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে মেরেসিয়েভ, পাদুটো ঠাণ্ডা জলে ডোবানো, এত জোরে ঠোঁট কামড়াচ্ছে যে রক্ত বেরিয়ে এল। যন্ত্রণায় প্রায় বেহুঁশ সে, নকল পায়ের পাতার ঘষড়ানিতে দাগা দাগা ঘা আর কালশিটে-পড়া কড়াগুলো ধুচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক পরে মেজর স্ত্রুচকভ ঘরে এল; আয়নার সামনে বসে তখনো ভিজে, ঢেউ-খেলানো চুল আঁচড়াচ্ছে মেরেসিয়েভ, স্নানের পর বেশ ঝরঝরে লাগছে ওকে।

'জিনচ্‌কা তোমার খোঁজ করছে। যাবার আগে ওকে নিয়ে বেড়িয়ে আসা উচিত তোমার। মেয়েটার জন্যে আমার খারাপ লাগছে।'

'দুজনে যাই চলো,' ব্যগ্রভাবে বলল মেরেসিয়েভ। 'পাভেল ইভানভিচ, এসো না আমার সঙ্গে,' অনুনয় করল ও।

ফুটফুটে মেয়েটি তাকে নাচ শেখাবার জন্য কত না করেছে, একা তার সঙ্গে ঘোরার কথা ভাবতে অস্বস্তি লাগছে মেরেসিয়েভের। ওলিয়ার চিঠি পাবার পর জিনচ্‌কার সান্নিধ্যে খাপছাড়া লাগত তার। স্ত্রুচকভকে বারবার অনুরোধ করল সঙ্গে যেতে, শেষে গজগজ করতে করতে টুপিটা তুলে নিল স্ত্রুচকভ।

ঘেরা বারান্দায় অপেক্ষা করছিল জিনচ্‌কা, হাতে এক গোছা ফুলের শেষ কয়েকটা। ফুলের বৃন্ত আর পাপড়িতে পায়ের নিচে মেঝেটা ভরে গিয়েছে। আলেক্সেই'র পায়ের শব্দ কানে আসাতে ব্যগ্রভাবে এগিয়ে এল ও, একা নয় দেখে হঠাৎ যেন মিইয়ে গেল জিনচ্‌কা।

'চলুন, বনকে বিদায় জানিয়ে আসি,' নির্লিপ্ত সুরে প্রস্তাব করল।

হাতে হাত রেখে, নিঃশব্দে ওরা লাইমগাছের বীথি হয়ে চলল। পায়ের সামনে, চন্দ্রালোকিত মাটিতে কয়লার মত কালো কালো ছায়া অনুসরণ করছে ওদের, এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত মুদ্রার মত হেমন্তের চিকচিকে প্রথম পাতা। বীথি ছাড়িয়ে গেট হয়ে ভিজে ধূসর ঘাসে পা ফেলে ওরা গেল হ্রদে। ফাঁকা জায়গাটা পাতলা কুয়াশার চাদরে ঢাকা, ভেড়ার লোমের মত শাদা

কুয়াশা। মাটিতে লেপটে আছে সে কুয়াশা, কোমর অবধি এসে যেন নিশ্বাস ফেলছে, চাঁদের হিম আলোয় ঝকঝক করছে হেঁয়ালি ভরে। আর্দ্র হাওয়া হেমন্তের পরিতৃপ্ত গন্ধে ভরা। এক একবার ঠাণ্ডা কনকনে লাগছে, পর মুহূর্তেই আবার গুমোট গরম, যেন কুয়াশার এই হ্রদটায় নিজস্ব ঠাণ্ডা আর উষ্ণ স্রোত আছে...

'মনে হচ্ছে দৈত্যের মত মেঘের ওপর দিয়ে চলেছি আমরা, তাই না?' কী যেন ভাবতে ভাবতে আলেক্সেই বলল; মেয়েটির ছোট বলিষ্ঠ হাত বেশ শক্ত করে তার কনুইতে ঠেকানো, অস্বস্তি হচ্ছে তার।

'দৈত্য নয়, বোকার মত, পা ভিজে ঠাণ্ডা লেগে যাবে,' গরগর করে উঠল স্ত্রুচকভ, মনে হল নিজের বিষণ্ণ নানা ভাবনায় সে আচ্ছন্ন।

'সেদিক থেকে আমার সুবিধে। পায়ের পাতার বালাই নেই, ঠাণ্ডা লাগবে না তাই,' হেসে বলল আলেক্সেই।

'চলুন, শীগগির চলুন, ওখানটা এখন ভারী সুন্দর হবে নিশ্চয়ই,' কুয়াশায় ঢাকা হ্রদের দিকে ওদের টেনে নিয়ে যেতে যেতে তাড়া দিয়ে বলল জিনচ্কা।

আর একটু হলে সটান জলে পড়ত ওরা, একেবারে পায়ের নিচে কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে জলের কালো রেখাটা চোখে পড়াতে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল তিনজনে। কাছে ছোট একটা জেটি, অন্ধকারে দাঁড়-নৌকোর অস্পষ্ট রেখা। কুয়াশায় ঝটপট ঢুকল জিনচ্কা, ফিরে এল জোড়া দাঁড় হাতে। দাঁড়ের আঙটা বাঁধা হল, দাঁড়দুটো নিল আলেক্সেই; জিনচ্কা আর মেজর হালের কাছে বসল। নিস্তরঙ্গ জল বেয়ে আস্তে আস্তে চলল নৌকো। কুয়াশার মধ্যে গিয়ে পড়ছে কখনো, কখনো আসছে খোলা জায়গায়। জলের কালো মসৃণ বুকে দরাজভাবে পড়েছে চাঁদের রুপালী আলো। কথা বলছে না কেউ, সবাই নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন। শান্ত রাত্রি; পারার ফোঁটার মত আর ঠিক সে রকম ভারীভাবে দাঁড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। দাঁড়ের আঙটার অস্পষ্ট শব্দ, কোথায় যেন একটা সারস ডাকল, অনেক দূর থেকে এল পেঁচার বিষণ্ণ চীৎকার, প্রায় শোনা যায় না ডাকটা।

'কাছাকাছি প্রচণ্ড লড়াই চলেছে, প্রায় বিশ্বাস হয় না সেটা...' মৃদুকণ্ঠে বলল জিনচ্কা। 'আমাকে চিঠি দেবেন ত আপনারা? আলেক্সেই পেত্রভিচ, আপনি নিশ্চয়ই লিখবেন, ঠিক ত? কয়েক ছত্র লিখলেই চলবে, ঠিকানা-লেখা কয়েকটা পোস্টকার্ড আপনার সঙ্গে দিয়ে দেব, কী বলেন? আপনি

লিখবেন: "বে'চে আছি, ভালো আছি, নমস্কার," আর কোন ডাক-বাক্সে ফেলে দেবেন, কী বলুন?..'

'যাচ্ছি বলে আমি কত খুসি, ভাবতেই পারবেন না আপনারা। বাপ! বসে বসে ঘেন্না ধরে গিয়েছে! কাজের জন্যে হাত সুড়সুড় করছে!' স্ত্রুচকভ বলে উঠল।

আবার সবাই চুপচাপ। নৌকোর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ করে লাগছে ছোট ছোট ঢেউ, নৌকোর নিচে ঘুমন্ত ঘড়ঘড় শব্দে জলধারা ঝকঝকিয়ে কোণাকুণিভাবে গলুই'এর কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, নীলচে বিক্ষুব্ধ চাঁদের আলোর রেখা তীর থেকে জলের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে, কুমুদ ফুলের পাতার গোছাগুলো জ্বলছে এদিকে ওদিকে।

'গান গাওয়া যাক,' প্রস্তাব করল জিনচকা, উত্তরের অপেক্ষা না করেই অ্যাসগাছের বিষয়ে সেই গানটি ধরল।

প্রথম দুটো পঙ্‌ক্তি একলা গাইল সে, পরেরটা ধরল মেজর স্ত্রুচকভ, সুন্দর গভীর ব্যারিটোনে। এর আগে সবায়ের সামনে সে গায়নি কখনো, ওর যে এমন সুন্দর, সুরেলা গলা আলেক্সেই ভাবতেও পারেনি। মসৃণ জলের উপর দিয়ে ভেসে চলল গানের বিষণ্ণ, আবেগমুখর সুর: সতেজ দুটো কণ্ঠস্বর, একটি ছেলের, অন্যটি মেয়ের, আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরকে দোহাই দিচ্ছে। আলেক্সেই'র মনে পড়ে গেল জানলার বাইরে সেই পাতলা এ্যাসগাছটার কথা, বেরির একটি মাত্র গোছা তাতে, মনে পড়ে গেল পাতাল সেই গ্রামটিতে ভারিয়ার কথা। তারপর সবকিছু -- হ্রদ, অদ্ভুত চাঁদের আলো, নৌকো আর গায়কেরা, সবকিছু মিলিয়ে গেল আর রুপালী কুয়াশায় ও দেখল কামিশিনের সেই মেয়েটিকে, ফুলে-ভরা মাঠে ডেইজির মধ্যে বসেছিল যে ওলিয়া, সে ওলিয়া নয় কিন্তু, আলাদা ধরনের, অপরিচিত একটি মেয়ে, ক্লান্ত সে, গাল জায়গায় জায়গায় রোদে তামাটে হয়ে গিয়েছে, ঠোঁটদুটো ফাটা, ঘর্মমলিন টিউনিক পরনে, স্তালিনগ্রাদের কাছে স্তেপে কোথাও শাবল চালাচ্ছে সে।

দাঁড়দুটো ফেলে দিয়ে গানের শেষ দুটো কলি গাইতে যোগ দিল আলেক্সেই।

৬

পরের দিন ভোরে স্বাস্থ্যাবাসের গেট থেকে বেরোল সারি সারি অনেক বাস। প্রবেশদ্বারের অলিন্দ তখনো ছাড়িয়ে যায়নি সেগুলো, এরিমধ্যে একটা বাসের পাদানিতে বসে মেজর স্ত্রুচকভ এ্যাসগাছের বিষয়ে তার প্রিয়

গানটি ধরেছে। অন্যান্য বাসেও সবাই গানটা ধরল। আর বিদায় সম্ভাষণ, শুভেচ্ছা, বুরুনাজিয়ানের রসিকতা, বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিনচুকা কী বিদায়কালীন উপদেশ চেঁচিয়ে দিচ্ছে আলেক্সেইকে, সবকিছু ছাপিয়ে উঠল গানটির সহজ কিন্তু অর্থঘন কথাগুলো; পুরোনো গানটি ভুলে গিয়েছিল লোকে, কিন্তু মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে আবার নতুন প্রাণ পেয়ে জনপ্রিয় হয় ওটি।

গেট পেরিয়ে চলেছে বাসগুলো, সঙ্গে নিয়ে চলেছে গানটির গভীর সুরেলা ধ্বনি। শেষ হয়ে গেল গান, সবাই চুপচাপ; সহরের উপকণ্ঠে কারখানা আর শ্রমিকদের বসতি যখন বাস থেকে চোখে পড়ছে, স্তব্ধতা ভাঙ্গল শুধু তখন।

টিউনিকের বোতামগুলো খোলা, মেজর স্ত্রুচকভ তখনো বাসের পাদানিতে বসে হাসি মুখে প্রাকৃতিক দৃশ্যের তারিফ করছে। অতিশয় খোশমেজাজে তখন মেজর; ভবঘুরে সৈনিকটি আবার বেরিয়েছে রাস্তায়, চলেছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, তাই নিজের প্রকৃত স্বভাব ফিরে এসেছে। কোন একটা সামরিক দলে যাচ্ছে, কোনটা সেটা এখনো জানা নেই, কিন্তু যে দলই হোক, নিজের বাড়ির সামিল করবে সেটাকে। মেরেসিয়েভ বসে আছে, নির্বাক, উৎকণ্ঠিত। ওর মনে হচ্ছে, আসল বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি হওয়া এখনো বাকি, আর কে জানে সেগুলোকে ও অতিক্রম করতে পারবে কি না?

বাস থেকে নেমেই, এমন কি রাত্রিযাপনের কোন ব্যবস্থা না করেই মেরেসিয়েভ সটান গেল মিরভলস্কির কাছে। মন্দভাগ্যের প্রথম ঝাপটা: যে হিতাকাঙ্ক্ষীকে এত কষ্টে হাত করেছিল মেরেসিয়েভ তিনি সহরে নেই, চিকিৎসা বিষয়ে কোন জরুরী কাজে বিমানে করে কোথায় গিয়েছেন, ফিরতে কিছুদিন লাগবে। যে অফিসারটির সঙ্গে আলেক্সেই'র কথাবার্তা হল, সে বলল নিয়মানুযায়ী একটা দরখাস্ত করতে। জানলার ধারে তক্ষুণি বসে মেরেসিয়েভ দরখাস্তটা লিখে ফেলে ক্ষীণদেহ ছোটখাটো ক্লান্ত-চোখ অফিসারটির হাতে দিল। যথাসাধ্য চেষ্টা করার কথা দিল অফিসার, দুদিনের মধ্যে দেখা করতে বলল আলেক্সেইকে। অনুনয়-বিনয় করল আলেক্সেই, এমন কি ভয় দেখাল পর্যন্ত, কিন্তু কিছু সুবিধে হল না। হাড্ডিসার, ছোট হাতদুটো বুকে রেখে জবাব দিল অফিসার, যা নিয়ম তা মেনে চলতে হবে, নিয়মভঙ্গ করার কোন ক্ষমতা নেই তার। সত্যি সত্যি হয়ত ব্যাপারটি তাড়াতাড়ি

সম্পন্ন করার কোন ক্ষমতা ছিল না তার। হাত নেড়ে চলে এল মেরেসিয়েভ।

এই ভাবে শুরু হল সামরিক অফিসের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে তার হন্যের মত ঘোরা। হাসপাতালে তাকে আনা হয়েছিল ভীষণ তাড়ায়, ফলে জামাকাপড়, খাবারদাবার আর ভাতার সার্টিফিকেট মেলেনি, এ পর্যন্ত সেগুলো জোগাড় করার কোন চেষ্টা সে করেনি, এতে তার অসুবিধে অনেক বেড়ে গেল। ছুটির সার্টিফিকেট পর্যন্ত আলেক্সেই'র নেই। এ সব ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি সহৃদয় আর উপকারী লোক, রেজিমেণ্টের সদর দপ্তরে তার করে দরকারী কাগজপত্রগুলো বিনা বিলম্বে পাঠিয়ে দিতে বলবে কথা দিল, কিন্তু মেরেসিয়েভ জানত এ সব ব্যাপারে কত সময় লাগে। বুঝতে পারল যুদ্ধকালীন কড়াকড়ির মধ্যে মস্কো সহরে, যেখানে রুটির প্রতিটি কিলোগ্রাম আর চিনির প্রতি গ্রাম অমূল্য, তাকে কিছু দিন কাটাতে হবে বিনা টাকায়, বিনা বাসায়, বিনা রেশনে।

হাসপাতালে আনিউতাকে ফোন করল মেরেসিয়েভ। গলা শুনে মনে হল কিছু একটা নিয়ে ও হয় উদ্বিগ্ন নয় ব্যস্ত আছে নিশ্চয়, কিন্তু মেরেসিয়েভ এসেছে শুনে খুব খুসি হয়ে জোর করে বলল এ-কদিন ওর বাড়িতে থাকতে হবে মেরেসিয়েভকে, বিশেষ করে এই জন্য যে ও নিজে এখন হাসপাতালে থাকছে, বাড়িতে একাধিপত্য হবে মেরেসিয়েভের।

চলে-আসা রোগীদের প্রত্যেককে স্বাস্থ্যাবাস থেকে পাঁচদিনের শুকনো রেশন দেওয়া হয়েছিল যাত্রার জন্য। তাই, বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে আলেক্সেই গেল নতুন, উঁচু সব বাড়ির পিছনের প্রাঙ্গণে বসানো সেই পরিচিত জীর্ণ ছোট বাসাটিতে।

মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলল, সঙ্গে কিছু খাবার আছে, তাই সবুর করতে পারে সে। চেনা, অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি ধরে উঠল, বেড়াল আর কেরোসিন আর ভিজে কাপড়ের গন্ধ তখনো রয়েছে; হাতড়ে দরজাটা বের করে সশব্দে টোকা দিল তাতে আলেক্সেই।

দরজাটা খুলে গেল বটে, কিন্তু দুটো শক্ত চেনে বাঁধা বলে আধখোলা অবস্থায় রইল। ছোটখাটো বৃদ্ধাটি স্বল্পপরিসর ফাঁকটি থেকে শীর্ণ মুখ বাড়িয়ে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল আলেক্সেই'র দিকে, জিজ্ঞেস করল কাকে চায়, কী নাম তার। জবাব পাবার পর চেনটার ঝনঝন আওয়াজ শোনা গেল, হাট করে খোলা হল দরজাটা।

'আন্না দানিলভনা বাড়িতে নেই, কিন্তু আপনার কথা টেলিফোন করে জানিয়েছে। ভেতরে আসুন, ওর ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে দিই,' বিরস বিবর্ণ চোখে আলেক্সেই'র মুখ, টিউনিক, বিশেষ করে ওর কিট-ব্যাগটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বৃদ্ধাটি বলল।

'গরম জল হয়ত লাগবে? রান্নাঘরে আনিচ্কার কেরোসিন স্টোভ আছে, কিছু জল ফুটিয়ে দেব...'

অসঙ্কোচে চেনা ঘরটায় প্রবেশ করল আলেক্সেই। যে কোন জায়গাকে নিজের বাড়ি মনে করার ক্ষমতাটা মেজর স্তুচকভের অতিমাত্রায় ছিল, তার ছোঁয়াচ হয়ত লেগেছে আলেক্সেইকে। পুরোনো কাঠ, ধুলো আর ন্যাপথলিন, বহু বছর ধরে বিশ্বস্ত, ভালো কাজ দিয়েছে যে সব জিনিস, তাদের চেনা গন্ধ, এমন কি আবেগে ভরে দিল আলেক্সেই'র মন, যেন অনেক দিন ছন্নছাড়াভাবে ঘোরার পর নিজের বাড়িতে ফিরেছে সে।

পিছু পিছু এল বৃদ্ধা, বকবক করেই চলেছে, বক্তব্য হল: একটা রুটির দোকানে সার বাঁধে লোক, কপাল ভালো হলে সেখানে রেশন কার্ডে পাঁউরুটি পাওয়া যায়, গমের রুটি নয়; সেদিন হোমরাচোমরা একজন আর্মি অফিসার বাসে বলছিলেন যে স্তালিনগ্রাদে ফাঁপরে পড়েছে জার্মানরা, তাতে হিটলার এত ক্ষেপে যায় যে পাগলাগারদে আটক রাখতে হয়েছে তাকে, আর এখন নকল হিটলার জার্মানিতে রাজত্ব করছে; পড়শী আলেভতিনা আরকাদিয়েভনার সত্যি কোন অধিকার নেই শ্রমিকদের রেশন-কার্ড পাবার, এনামেলের সুন্দর একটা দুধের বাটি ধার করে আর ফেরৎ দেয়নি সে: আন্না দানিলভনার মা-বাবা, খাসা লোক তাঁরা, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে চলে গিয়েছেন; আর আন্না দানিলভনা নিজে বেশ মেয়ে, শান্ত শিষ্ট, অন্য ছুঁড়িদের মত যার তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায় না সে, বেটাছেলেদের নিজের ঘরে আনে না। শেষে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল:

'আপনি কি ওর সেই ট্যাঙ্ক-অফিসার ছোকরা, যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব পেয়েছে?'

'না, আমি বৈমানিক,' জবাব দিল মেরেসিয়েভ; বৃদ্ধার সজীব মুখে যুগপৎ এল বিস্ময়, বিতৃষ্ণা, অবিশ্বাস আর ক্রোধের ভাব, সেটা দেখে অনেক কষ্টে হাসি চাপল আলেক্সেই।

ঠোঁট চেটে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল বুড়ী, করিডর থেকে বলল, আগেকার মত আর মিঠে গলায় নয়:

'গরম জল দরকার হলে নীল কেরোসিন স্টোভটায় নিজেই ফুটিয়ে নিও বাপু।'

বেজ-হাসপাতালে আনিউতা নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত, কেননা হেমন্তের এই বিরস দিনে ঘরটাকে ভয়ানক পরিত্যক্ত দেখাচ্ছে। সবকিছুর উপরে ধুলোর পুরু স্তর, জানলায় আর ফুলদানিতে বসানো ফুলগুলো হলদে হয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। অনেক দিন জল দেওয়া হয়নি মনে হচ্ছে। টেবিলে ছাতা-পড়া খাবারের টুকরো, কেটলিটা সরানো হয়নি তখনো। পিয়ানোটাও নরম ধূসর ধুলোয় আচ্ছন্ন; একটা বড়ো মাছি, দেখে মনে হয় চাপা হাওয়ায় হাঁফ ধরে গেছে ওটার, বিমর্ষভাবে গুনগুন করে ঝাপসা হলদেটে জানলার শার্সিতে বারবার গিয়ে পড়ছে।

জানলাগুলো একেবারে খুলে দিল মেরেসিয়েভ। নিচের ঢালু বাগানটাকে সব্জিক্ষেতে পরিণত করা হয়েছে।

তাজা হাওয়ার ঝটকায় পুঞ্জীভূত ধুলো এত জোরে আলোড়িত হল যে ঘন কুয়াশার মত দেখাল। চট করে একটা কথা মনে হল আলেক্সেই'র... ঘরটা গুছিয়ে ফেললে হয় তাহলে আনিউতা অবাক আর খুসি হয়ে যাবে, যদি অবশ্য হাসপাতাল থেকে সময় করে সন্ধ্যেবেলায় আসতে পারে। বালতি আর ন্যাতা বুড়ীর কাছে চেয়ে নিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে কাজে লাগল আলেক্সেই, যে কাজ বহু যুগ ধরে হেয় মনে করত বেটাছেলেরা। প্রায় দেড় ঘণ্টা ঘর সাফ করা চলল, মেঝে ঘষছে, ধুলো ঝাড়ছে, বেশ ভালো লাগছে কাজটা আলেক্সেই'র।

বাড়িতে আসার সময়ে দেখেছিল সেতুতে দাঁড়িয়ে মেয়েরা বড়ো বড়ো রঙীন হেমন্তের ফুল বিক্রী করছে, সন্ধ্যেবেলায় সেখানে গেল সে। এক গোছা কিনে পিয়ানো আর টেবিলের উপরে ফুলদানিতে রেখে সবুজ কেদারায় আরাম করে গা ছড়িয়ে দিল; সারা শরীরে প্রীতিকর ক্লান্তির আমেজ, তার আনা খাবার রান্নাঘরে রাঁধছে বুড়ীটা, তার গন্ধ প্রাণভরে নিল আলেক্সেই।

কিন্তু আনিউতা যখন এল তখন এত ক্লান্ত সে যে কোনক্রমে ওকে সম্ভাষণ করেই শুয়ে পড়ল কোচে, ঘরটা কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নজরে পড়ল না। কিছুক্ষণ জিরিয়ে জল খেল, তখনি শুধু অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাল। ক্লান্তভাবে হেসে কৃতজ্ঞভাবে মেরেসিয়েভের কনুই'এ চাপ দিয়ে বলল:

'সত্যি, অবাক হবার কিছু নেই যে গ্রিশা আপনাকে এত ভালোবাসে,

একটু হিংসে হয় আমার তাতে। এটা আপনি নিজে করেছেন, আলিওশা! কী খাসা লোক! গ্রিশার কোন চিঠি পেয়েছেন? ও ওখানে আছে। সেদিন ওর একটা চিঠি পেয়েছি, ছোট্ট চিঠি, দুএক ছত্র মাত্র। ও এখন স্তালিনগ্রাদে, আর বোকারাম কী করছে জানেন? দাড়ি রাখছে! এই সময়ে!.. ওখানে বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশী, তাই না? সত্যি কিনা বলুন ত, আলিওশা! স্তালিনগ্রাদ সম্বন্ধে লোকেরা নানা মারাত্মক কথা বলছে!'

'লড়াই চলেছে ওখানে।'

ভ্রূকুটি করে আলেক্সেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। দারুণ লড়াই চলেছে ওখানে, ভলগায়, সবায়ের মুখে তার কথা, যারা ওখানে তাদের প্রত্যেককে হিংসে করে আলেক্সেই।

সারা সন্ধ্যা ওদের গল্প চলল, টিনের মাংসের খানা খাসা। অন্য ঘরটা তক্তা দিয়ে বন্ধ বলে এ ঘরটায় দুজনেই শুল বন্ধুর মত, আনিউতা বিছানায় আর আলেক্সেই কোচে, সঙ্গে সঙ্গে যৌবনসুলভ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেল দুজন।

ঘুম ভেঙ্গে যখন কোচে উঠে বসল আলেক্সেই তখন ধুলোর জালে সূর্যের আলো তেরছাভাবে ইতিমধ্যেই ঘরে পড়েছে। আনিউতা নেই। কোচের পিঠে পিন দিয়ে আটকানো এক টুকরো কাগজ: "হাসপাতালে তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছি। টেবিলে চা, খাবার-আলমারিতে রুটি আছে, চিনি নেই। শনিবারের আগে আসতে পারব না। আ.।"

এ ক'দিন ক্বচিৎ বাইরে গেল আলেক্সেই। কিছু করবার নেই, তাই বুড়ীর প্রাইমাস আর কেরোসিন স্টোভ, সস্‌প্যান আর ইলেকট্রিক সুইচগুলো মেরামত করল, এমন কি তার অনুরোধে সেই ঠোঁটকাটা মহিলা, আলেভতিনা আরকাদিয়েভ্‌নার কফি গুঁড়ো করার কলটি পর্যন্ত সারাল; প্রসঙ্গত দুধের সেই এনামেলের পাত্রটি এখনো সে ফিরিয়ে দেয়নি। এইভাবে বুড়ীর মন পেল আলেক্সেই, বুড়ীর স্বামীরও, সে নির্মাণ সংস্থার কর্মী, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক, অনেক সময়ে দিনের পর দিন তাকে বাইরে কাটাতে হয়। বুড়োবুড়ী শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এল যে ট্যাঙ্ক-বাহিনীর লোক অবশ্যই চমৎকার কিন্তু বৈমানিকরাও কোন অংশে ন্যূন নয়; ভালো করে চিনলে বোঝা যায় হাওয়াই পেশা সত্ত্বেও ওরা বেশ গম্ভীর প্রকৃতির সংসারী ঘরোয়া লোক।

অবশেষে কর্মচারিবৃন্দ বিভাগে গিয়ে তাদের রায় শোনবার দিন এসে

পড়ল। কোচে শুয়ে সারা রাত চোখ খুলে কাটাল আলেক্সেই। সকালে উঠে দাড়ি কামিয়ে মুখ ধুয়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় অফিসে পেঁছিল, প্রশাসন বিভাগের যে মেজরের উপরে তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার ডেস্কে ওই প্রথম হাজির হল। মেজরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভালো লাগল না ওর। চোখ তুলে আলেক্সেইকে দেখল না পর্যন্ত মেজর, ভাবখানা যেন ওকে আসতে দেখেনি; কাজকর্মে বড়োই ব্যস্ত, ফাইল নিচ্ছে, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে, নানা লোককে টেলিফোন করা হল, বিশদভাবে মেয়ে কেরানীটিকে বোঝানো হল ফাইল কী করে রাখতে হয়, তারপর বেরিয়ে গেল ভদ্রলোক, অনেকক্ষণ টিকিটি দেখা গেল না। ততক্ষণে ভীষণ ঘেন্না ধরে গেছে আলেক্সেই'র, ওর লম্বা মুখ, লম্বা নাক, কামানো গাল, উজ্জ্বল ঠোঁট আর ঢালু কপাল, যেটা অলক্ষিতে মিলেছে চকচকে টেকো মাথায়, সবকিছু দুচক্ষের বিষ। অবশেষে ফিরে এল মেজর, বসে ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে শুধু তখনি আলেক্সেই'র দিকে দৃষ্টিপাত করল ব্যক্তিটি।

'আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, কমরেড সিনিয়র লেফটেনান্ট?' ভারিক্কি মোটা গলায় প্রশ্ন করা হল।

কী কাজে এসেছে মেরেসিয়েভ বলল। আলেক্সেই'র কাগজপত্র কেরানীটিকে আনতে বলে, পা ফাঁক করে বসে গভীর মনোযোগে দাঁত খুঁটতে লাগল মেজর, ভদ্রতার খাতিরে হাতের আড়াল করে রাখল দাঁত খোঁটার কাঠিটাকে। কাগজপত্র এল, শুরু হল মেরেসিয়েভের ফাইল পর্যবেক্ষণ করা। হঠাৎ হাত নাড়িয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে আলেক্সেইকে বসতে বলল মেজর: বোঝা গেল পায়ের পাতা কাটার কথায় পেঁছেছে সে। পড়ে চলল মেজর, ফাইল পড়া শেষ হলে আলেক্সেই'র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন?'

'ফাইটার কম্যান্ডের কোন দলে নিযুক্ত হতে চাই আমি।'

চেয়ারে ধড়াস করে হেলান দিয়ে অবাক হয়ে মেজর তাকাল বৈমানিকটির দিকে, সামনে সে তখনো দাঁড়িয়ে, নিজের হাতে তার জন্য একটা চেয়ার টেনে দিল মেজর। মেদল চকচকে কপালে পুরু ভুরুজোড়া তুলে জিজ্ঞেস করল:

'কিন্তু আপনি ত বিমান চালাতে পারবেন না!'

'পারি, পারবই! পরীক্ষা করার জন্যে কোন বিমান স্কুলে আমাকে পাঠিয়ে দিন!' প্রায় চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ। ওর বলার ঢঙে এত অদম্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ভাব যে অন্যান্য ডেস্কের অফিসাররা কৌতূহলী দৃষ্টিতে এদিকে তাকাল; তামাটে সুদর্শন লেফ্‌টেনাণ্টটি এত জোর দিয়ে কী চাইছে ভাবল তারা।

মেজরের দৃঢ় ধারণা হল সামনের লোকটি হয় একগুঁয়ে নয় বদ্ধ পাগল। আলেক্সেই'র ক্রুদ্ধ মুখ আর "বন্য", জ্বলজ্বলে চোখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সুরটা যথাসম্ভব নরম করার চেষ্টা করে বলল:

'কিন্তু শুনুন! পায়ের পাতা না থাকলে বিমান চালানো কী করে সম্ভব? আর সেটা আপনাকে করতে দেবে কে? ব্যাপারটা হাস্যকর। এ রকম ব্যাপার এর আগে কখনো হয়নি।'

'এর আগে কখনো হয়নি কিন্তু এখন হবে!' জেদ দিয়ে বলল মেরেসিয়েভ। নোটবুক থেকে সেলোফেনে মোড়া পত্রিকার পাতাটি বের করে ডেস্কে মেজরের সামনে রাখল সেটা।

অন্যান্য অফিসারেরা কাজ ছেড়ে ওদের কথাবার্তা একাগ্রভাবে শুনছে। ওদের মধ্যে একজন ডেস্ক থেকে উঠে মেজরের কাছে এল যেন কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চায়, দেশলাই চেয়ে নিয়ে তাকাল মেরেসিয়েভের দিকে। পত্রিকার পাতাটিতে চোখ বুলিয়ে মেজর জিজ্ঞেস করল:

'এটার ওপরে আমরা নির্ভর করতে পারি না। সরকারী দলিল নয় এটা। বিমান বাহিনীতে কর্মক্ষমতার নানা নির্দিষ্ট কড়া মানদণ্ড আছে, সে সব নির্দেশ মেনে চলতে হয় আমাদের। আপনার হাতের দুটো আঙুল না থাকলে বিমান চালাতে দিতাম না আপনাকে, পায়ের পাতার কথা ছেড়ে দিন। এই নিন আপনার কাগজ, কিছুই প্রমাণ করে না এটা। আপনার আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করি, কিন্তু...'

রাগে টগবগ করে ফুটছে মেরেসিয়েভ, মনে হল ডেস্ক থেকে দোয়াতদানিটা তুলে মেজরের চকচকে টেকো মাথায় ছুঁড়ে মারে। দম বন্ধ হয়ে আসা গলায় বলল:

'আর এটা?'

টেবিলের উপরে শেষ তাসটি রাখল মেরেসিয়েভ - কর্ণেলপদস্থ আর্মি সার্জন মিরভলস্কির সই-করা সার্টিফিকেট। দ্বিধান্বিতভাবে সেটা তুলে নিল মেজর। সার্টিফিকেটটি সরকারী কায়দায় লেখা, চিকিৎসা বাহিনী বিভাগের ছাপ মারা, সই করেছেন যে সার্জন বিমান বাহিনীতে বিশেষ খাতির তাঁর। পড়ে মেজরের কথা বলার ঢং বেশ নরম হয়ে এল। সামনের মানুষটি তাহলে উন্মাদ নয়। পায়ের পাতা নেই, তবু এই অনন্যসাধারণ যুবকটি সত্যি সত্যি

বিমান চালাতে ইচ্ছুক। চালাতে পারবে, সেটা বোঝাতে পেরেছে এমন কি প্রাজ্ঞ একজন আর্মি সার্জনকে, যাঁর কথার বিশেষ মূল্য আছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেরেসিয়েভের ফাইলটা সরিয়ে রেখে মেজর বলল:

'ইচ্ছে থাকলেও আপনার জন্যে আমি কিছু করতে পারি না। কর্ণেল পদস্থ আর্মি সার্জন যা খুসি লিখতে পারেন, কিন্তু আমাদের সুস্পষ্ট বাঁধা-ধরা নির্দেশ আছে, সেগুলো মানতেই হবে। যদি না মানি, তাহলে জবাবদিহি করবে কে... আর্মি সার্জন?'

গভীর ঘৃণায় হৃষ্টপুষ্ট আত্মবিশ্বাসী শান্ত আর সৌজন্যশীল অফিসারটির দিকে তাকাল মেরেসিয়েভ, দেখল তার সুষ্ঠু টিউনিকের পরিষ্কার কলার, লোমশ হাতদুটো, ছোট করে কাটা কুৎসিত বড়ো নখ। কী করে বোঝাবে একে? ওর মাথায় কিছু কি ঢুকবে? আকাশ-যুদ্ধ জিনিসটা কী ও কি জানে? হয়ত জীবনে কখনো গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শোনেনি। প্রাণপণে নিজেকে সামলে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ:

'কী করতে পারি তাহলে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল মেজর:

'আপনি যদি গোঁ ধরেন তাহলে কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের কমিশনে আপনাকে পাঠাতে পারি। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখি আপনাকে, তাতে কোন ফল হবে না।'

'জাহান্নমে যাক সব, কমিশনে পাঠিয়ে দিন আমাকে!' ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে মেরেসিয়েভ বলল।

তারপর শুরু হল অফিসে অফিসে ঘোরাঘুরি। ক্লান্ত সব অফিসার, কাজের অন্ত নেই তাদের, শুনল তার বক্তব্য, বিস্ময় ও সহানুভূতি জানাল আর অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। বাস্তবিক, কী করতে পারে তারা? নির্দেশ আছে ওদের, বেশ ভালো নির্দেশ, বাহিনীর কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠাঙ্কিত নির্দেশ, তাছাড়া আছে বাহিনীর বহু কালের ঐতিহ্য -- কী করে অমান্য করে সেগুলো? আর মেরেসিয়েভের ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট! অদম্য কিন্তু পঙ্গু লোকটি ফ্রণ্টে ফিরে যেতে চাইছে গভীর আগ্রহে, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত সবাই, সোজাসুজি "না" বলার মত নিষ্ঠুর কেউ নয়: তাই ওরা ওকে কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ থেকে পাঠাল ফরমেসন্‌স্‌ বিভাগে, ডেস্ক থেকে ডেস্কে, প্রত্যেকে দয়া করে ওকে পাঠাত নানা কমিশনের কাছে।

প্রত্যাখ্যান কিম্বা তিরস্কার, অপমানজনক সহানুভূতি আর অনুগ্রহ করার ভাব, যেটাতে তার গর্বিত মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়, কিছুই আর দমাতে পারে না মেরেসিয়েভকে। রাগ সামলে চলতে শিখল সে, উমেদারের মত কথা বলার ঢং আয়ত্ত করে ফেলল। এক এক দিন দুতিন জায়গায় হয়ত ওকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু নিরাশ হল না সে। বারবার পকেট থেকে বের করতে হচ্ছে পত্রিকার সেই পাতা আর আর্মি সার্জনের সার্টিফিকেট, জীর্ণ হয়ে গেল দুটো, ভাঁজে ভাঁজে গেল ছিঁড়ে, অয়েল-পেপারে সেদুটো জুড়ে নিতে বাধ্য হল আলেক্সেই।

ঘোরাঘুরি করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকছে বিনা ভাতায়, তাতে দুর্ভোগ বেড়ে গেল। এ পর্যন্ত রেজিমেন্ট থেকে ভাতার সার্টিফিকেট আসেনি, স্বাস্থ্যাবাসের দেওয়া খাবারদাবার শেষ হয়ে গিয়েছে। এটা সত্যি অবশ্য যে আনিউতার বাসায় বুড়োবুড়ীর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব এখন, তারা দেখে যে নিজের জন্য আর কিছু রাঁধে না আলেক্সেই, বারবার খেতে বলে ওকে: কিন্তু ওর জানা আছে জানলার নিচে ছোট্ট সব্জির ক্ষেতে কী পরিশ্রম করতে হয় বুড়োবুড়ীকে, ওদের কাছে প্রত্যেকটি পেঁয়াজ আর গাজরের মূল্য কতটা, কী করে রোজ সকালে রুটির খোরাক ওরা দুজনে ভাগ করে খায় ভাইবোনের মত। আর তাই বেশ উৎফুল্লভাবেই ওদের জানিয়ে দিল যে রান্নার হাঙ্গামা এড়াবার জন্য ও আজকাল অফিসারদের মেসে খায়।

শনিবার এল, আনিউতার ছুটির দিন – রোজ সন্ধ্যায় আলেক্সেই নিজের অসন্তোষজনক অবস্থার কথাটা ফোনে ওকে জানাত। মরীয়া গোছের কিছু একটা করবে ঠিক করল আলেক্সেই। কিট-ব্যাগে তখনো ছিল ওর বাবার রুপোর পুরোনো সিগারেট-কেসটা, কালো এনামেলে তার কোণে আঁকা তিনটে তুরন্ত ঘোড়ায় টানা একটা শ্লেজের নক্সা। ভিতরে লেখা: "পঞ্চবিংশ বিবাহ বার্ষিকীর দিনে। বন্ধুদের উপহার।" ধূমপান করে না আলেক্সেই, কিন্তু যুদ্ধে যাবার সময়ে মা বহুমূল্যবান পারিবারিক অভিজ্ঞানটি তার পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন, তারপর ওর সঙ্গে সঙ্গে হামেশা ঘুরেছে ভারী বেঢপ জিনিসটা, বিমান চালাবার সময়ে "কপাল ভালো করার" জন্য পকেটে রাখত ওটা। কিট-ব্যাগ থেকে হাতড়ে সেটা বের করে সেকেণ্ড-হাণ্ড জিনিসের দোকানে গেল আলেক্সেই।

রোগা একটি মহিলা -- ন্যাপথলিনের গন্ধ গায়ে — ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

সিগারেট-কেসটি দেখল, হাড়-বের করা আঙুলে লিপিটা দেখিয়ে জানাল যে লিপি চিহ্নিত জিনিসপত্র বিক্রীর জন্য নেওয়া হয় না।

'কিন্তু বেশী দাম ত আমি চাইছি না। দামটা আপনিই বলুন না।'

'না, না! তাছাড়া কমরেড অফিসার, পঞ্চবিংশ বিবাহ বার্ষিকীতে উপহার নেওয়ার সময় আপনার এখনো আসেনি মনে হচ্ছে,' বিদ্রূপ করে বলল ন্যাপথলিন মহিলাটি, অসূয়াপরবশ বিবর্ণ চোখে আলেক্সেই'র দিকে তাকিয়ে। টকটকে লাল হয়ে উঠল আলেক্সেই'র মুখ, টেবিল থেকে সিগারেট-কেসটা ঝট করে তুলে বেরিয়ে যাবার দরজার দিকে গেল। কে যেন হাত ধরে থামাল তাকে, মুখে লাগল মদের ঝাঁঝালো গন্ধ, কানে কানে বলল:

'জিনিসটা খাসা দেখতে। সস্তা বলছ?' জিজ্ঞেস করল যে ব্যক্তিটি তার মুখটি কুৎসিৎ, দাড়িগোঁফ কামায়নি, নাকটা বড়ো আর নীল। সিগারেট-কেসের দিকে বাড়িয়ে দিল পেশল কম্পমান একটি হাত। 'বেজায় ভারী। স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের একটি বীরের খাতিরে তোমাকে পাঁচশ রুবল দেব আমি।'

দর কষাকষি করল না আলেক্সেই। পাঁচশ রুবলের নোটগুলো নিয়ে পুরোনো দুর্গন্ধ জিনিসপত্রের রাজত্ব থেকে এক দৌড়ে বেরোল খোলা হাওয়ায়। সবচেয়ে কাছের বাজারে গিয়ে কিছু মাংস, কিছু চর্বি, রুটি, আলু আর পেঁয়াজ কিনল, কয়েক গাছা পার্সলি সওদা করতেও ভুলল না। মোট বয়ে চলল বাসাতে, এই নামেই আজকাল ঘরটিকে ডাকে সে, চর্বির একটা টুকরো চিবোতে চিবোতে।

'নিজের রেশন নিয়ে আবার রান্না করে নেব নিজে, ঠিক করেছি। মেসে যা জঘন্য খাবার দেয়!' রান্নাঘরের টেবিলে কেনা জিনিসগুলো একটার পর একটা রাখতে রাখতে আলেক্সেই মিথ্যে কথা বলল বুড়ীকে।

সেদিন সন্ধ্যায় খাসা খানা তৈয়ার হল আনিউতার জন্য: মাংস দিয়ে তৈরী আলুর সুপ, রজন রঙের ঝোলে ভাসছে পার্সলির পাতা, পেঁয়াজে ভাজা মাংস, এমন কি ক্র্যানবেরির জেলি পর্যন্ত, আলুর খোসার শ্বেতসার থেকে সেটা বানিয়েছে বৃদ্ধা। আনিউতা এল, ফ্যাকাশে আর ক্লান্ত। জোর করে মুখ হাত ধুয়ে জামাকাপড় বদলাল। তাড়াহুড়ো করে খেল খানার প্রথম পদটি, তারপর দ্বিতীয়টি, আর গা ছড়িয়ে দিল পুরোনো কুহকী কেদারাটায়, দরদে-ভরা সিল্কের বাহুতে পুরোনো বন্ধুর মত জড়িয়ে ধরে লোককে সেটা, কানে কানে মধুর স্বপ্নের কথা বলে। ঘুমিয়ে পড়ল আনিউতা, পাকা রাঁধুনীর

হাতে তৈরী জেলিটা, খোলা কলের নিচে একটা টিনের কৌটোয় ঠাণ্ডা করা হচ্ছিল সেটাকে, তার জন্য অপেক্ষা করল না সে।

অল্প ঘুমিয়ে চোখ খুলল আনিউতা; এরিমধ্যে পুরোনো আরামী আসবাবপত্রে ভরা ছোট গোছালো ঘরটিতে প্রদোষের ধূসর ছায়া জড়ো হয়েছে। খাবার টেবিলের পাশে, পুরোনো বাতিদানিটার নিচে দুহাতে মাথা টিপে বসে আছে আলেক্সেই, এত জোরে টিপে আছে যে মনে হচ্ছে মাথাটা ভেঙ্গেচুরে ফেলতে চাইছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বসার ধরনে এমন গভীর হতাশা যে বলিষ্ঠ জেদী মানুষটির জন্য করুণায় আনিউতার বুক ভরে গেল। উঠে লঘু পায়ে ওর কাছে গিয়ে প্রকাণ্ড মাথাটি জড়িয়ে চুলে আঙুল বুলিয়ে দিল। আনিউতার হাত ধরে করতলে চুম্বন করল আলেক্সেই, তারপর হেসে উৎফুল্লভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বলল:

'ক্র্যানবেরি জেলিটার কী হল? বেড়ে লোক আপনি! আমি প্রাণপাত করে দেখছিলাম ওটা যাতে জলের তোড়ে ঠিক উত্তাপে আসে, আর আপনি কিনা ঘুমিয়ে পড়লেন! এতে যে কোন রাঁধুনী বিষাদসাগরে ডুবে যেত!'

ভিনিগারের মত টক "উৎকৃষ্ট" জেলি এক প্লেট করে দুজনে খেল; নানা বিষয়ে ফুর্তিতে গল্প চলেছে, দুটি বিষয় ছাড়া, যেন দুজনের সম্মতিক্রমে — সেদুটো হল গভজ্‌দেভ আর মেরেসিয়েভ। পরে যে যার কোচে শোবার ব্যবস্থা করা হল। করিডরে গিয়ে আনিউতা দাঁড়িয়ে রইল, ঠক করে আলেক্সেই'র নকল পায়ের পাতাদুটো মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনে ফিরে এল ঘরে, আলো নিভিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। অন্ধকার ঘর, কথা বলছে না কেউ, কিন্তু চাদরের খসখস আর খাটের স্প্রিঙের শব্দে আনিউতা বুঝতে পারল আলেক্সেই জেগে আছে। অবশেষে সে জিজ্ঞেস করল:

'ঘুমিয়েছেন না কি, আলিওশা?'

'না।'

'ভাবছেন?'

'হ্যাঁ। আর আপনি?'

'আমিও ভাবছি।'

আবার চুপ করে গেল দুজনে। রাস্তায় মোড় নিতে নিতে ট্রামের ঝনঝনানি। মুহূর্তের জন্য বিজলী তার থেকে আগুনের নীল স্ফুলিঙ্গে আলো হয়ে উঠল ঘরটা, দুজনের মুখ নিমেষের জন্য দুজনের চোখে পড়ল। চোখ খুলে জেগে আছে দুজনেই।

ওর নিষ্ফল ঘোরাফেরার বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেনি আলেক্সেই, কিন্তু আনিউতা আঁচ করল যে ওর ব্যাপার খুব সুবিধের নয়, হয়ত হতাশায় ওর অদম্য মন আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ছে। নারীসুলভ সহজাত বোধে বুঝতে পারল কী যন্ত্রণাই না পাচ্ছে মানুষটি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝল যে এখন যতই কষ্ট পাক না কেন ও, দরদ দেখালে যন্ত্রণাটা বেড়ে যাবে, সহানুভূতি খারাপ লাগবে শুধু।

আলেক্সেই চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, হাতে মাথা রেখে কয়েক পা দূরে বিছানায় শায়িত সুন্দরী মেয়েটির কথা ভাবছে, বন্ধুর মনের মানুষ মেয়েটি, নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু। অন্ধকার ঘরে কয়েক পা ফেললেই পেঁছতে পারে তার কাছে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার বিনিময়ে সেটা ও করবে। খুব বেশী চেনে না মেয়েটিকে, আশ্রয় দিয়েছে ওকে, সহোদরার মত। মেজর স্ত্রুচকভ হয়ত আলেক্সেইকে বিদ্রূপ করবে, হয়ত এ কথাটা বললে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কিছু বলা যায় না... হয়ত এখন সবচেয়ে ভালো করে তাকে বুঝতে পারবে মেজর... আনিউতা চমৎকার মেয়ে সত্যি! কী রকম ক্লান্ত হয়ে যায় বেচারা, অথচ কী আগ্রহে না কাজ করে বেজ-হাসপাতালে!

'আলিওশা!' নরম গলায় ডাকল আনিউতা।

নিশ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মিত শব্দ এল মেরেসিয়েভের কোচ থেকে। ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠে লঘু পায়ে ওর কোচের কাছে গিয়ে বালিশটা ঠিক করে দিল আনিউতা, কম্বলটা গুঁজে দিল, যেন ও শিশু।

৭

প্রথমেই মেরেসিয়েভকে ডাকল কমিশন। বিরাট থলথলে কর্ণেল পদস্থ আর্মি সার্জন বিশেষ কাজ সেরে ফিরে এসেছেন শেষ পর্যন্ত, তিনিই সভাপতির চেয়ারে। আলেক্সেইকে দেখেই চিনতে পারলেন তিনি, এমন কি ওকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'আপনাকে ওরা নিচ্ছে না বুঝি?' সহানুভূতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সার্জন। 'হ্যাঁ, আপনার কেসটা সত্যিই কঠিন। আইন এড়িয়ে যেতে হবে, সেটা করা সহজ নয়।'

আলেক্সেইকে পরীক্ষা করার ঝামেলা নিল না কমিশন। লাল পেন্সিলে আর্মি সার্জন ওর দরখাস্তের উপরে লিখলেন: "কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ।

পরীক্ষার জন্য বিমানি স্কুলে দরখাস্তকারীকে পাঠানো সম্ভব মনে করি।' লেখাটি নিয়ে আলেক্সেই সোজা গেল কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের প্রধানের কাছে। জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে তাকে দেওয়া হল না। দারুণ রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল আলেক্সেই, কিন্তু জেনারেলের এ্যাডজুটাণ্টটি, চটপটে তরুণ ক্যাপ্টেন একজন, ছোট কালো গোঁফ, আর এত হাসিখুসি দরদী মুখ তার যে আলেক্সেই নিজেই অবাক হয়ে গিয়ে ওর ডেস্কের পাশে বসে পড়ল। যদিও এ্যাডজুটাণ্টদের ভালো লাগত না তার, "চিত্রগুপ্ত" বলে ডাকত তাদের আলেক্সেই, তবু নিজের কাহিনীটি খুঁটিয়ে বলল তাকে। মাঝেমাঝে টেলিফোন বেজে ওঠাতে বাধা পড়ছে কাহিনীতে, প্রায়ই ক্যাপ্টেনটি উঠে চলে যাচ্ছে প্রধানের ঘরে, কিন্তু প্রতিবার ফিরে এসেই আলেক্সেই'র দিকে মুখ করে বসছে, অকপট শিশুসুলভ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টিতে কৌতূহল আর শ্রদ্ধা এবং কিছুটা অবিশ্বাসও নিয়ে, তাড়া দিয়ে বলছে:

'হ্যাঁ, বলুন, তারপর কী হল?' কিম্বা হয়ত হঠাৎ বাধা দিয়ে বিস্ময়োক্তি করে উঠছে, 'সত্যি না কি? সত্যি বলছেন? আচ্ছা, বেশ!'

এ-অফিসে ও-অফিসে ঘোরাঘুরির কথা জানাল আলেক্সেই। সরকারী কলকব্জার ব্যাপারটা যে কী জটিল সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে ক্যাপ্টেনটির মনে হল, দেখতে কমবয়সী হলেও। রাগতভাবে সে বলল:

'শয়তান বেটারা! ওরকম ভাবে আপনাকে এদিক ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কোন দরকার ছিল না। আপনি অসাধারণ... ঠিক কী করে ভাষায় প্রকাশ করি জানি না... অনন্যসাধারণ লোক আপনি... কিন্তু জানেন, শেষ পর্যন্ত ওরাই ঠিক বলেছে: পায়ের পাতা না থাকলে বিমান চালানো যায় না।'

'চালানো যায়... দেখুন এটা...' পত্রিকার সেই পাতাটি, আর্মি সার্জনের মতামত আর কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের উদ্দেশ্যে লেখা পড়চাটা দেখাল মেরেসিয়েভ।

'কিন্তু পায়ের পাতা নেই, বিমান চালাবেন কী করে? মজার লোক আপনি! ও প্রবচনটা জানেন ত: পায়ের পাতা নেই যার, কখনো নাচিয়ে হবার ক্ষমতা নেই তার।'

আর কেউ বললে অপমানিত বোধ করত মেরেসিয়েভ নিশ্চয়ই, চটে উঠে কড়া কথা শুনিয়ে দিত হয়ত, কিন্তু ক্যাপ্টেনটির মুখে সদাশয়তার এমন একটা দীপ্তি যে মেরেসিয়েভ লাফিয়ে উঠে বাচ্চাদের মত বাচালভাবে

'কখনো নয়, বলছেন? দেখুন তাহলে!' বসবার ঘরের মধ্যে মেরেসিয়েভ শুরু করল উদ্দাম নৃত্য।

তারিফ করে কিছুক্ষণ দেখল ক্যাপ্টেন, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে আলেক্সেই'র কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রধানের ঘরে।

বেশ কিছুক্ষণ সে ঘরে রইল ক্যাপ্টেন। ঘর থেকে কথাবার্তার চাপা শব্দ আসছে, আলেক্সেই'র সমস্ত শরীর টান হয়ে গেল, বুক ধুক ধুক করছে ব্যথায় আর প্রতীক্ষায়, কোন ক্ষিপ্রগতি বিমানে সটান নিচে নেমে আসার সময়কার মত।

অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন, বেশ হাসিখুসি উত্তেজিত।

'বেশ,' বলল সে। 'বৈমানিকদের দলে আপনার যোগ দেবার কথায় জেনারেল অবশ্য কান দিলেন না, কিন্তু উনি লিখে দিয়েছেন: "বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে নিযুক্ত করা হোক দরখাস্তকারীকে, মাইনে আর রেশন কমবে না।" বুঝলেন ত ... ওটা কমবে না ...'

অবাক হয়ে দেখল ক্যাপ্টেন, খুসি হওয়া দূরের কথা, রাগে ঝলসে উঠল আলেক্সেই'র চোখ।

'বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়ন! কক্ষণো নয়!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'কথাটা মাথায় ঢুকছে না কেন আপনাদের? মাইনে আর রেশন নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না: বৈমানিক আমি! বিমান চালাতে, লড়তে চাই আমি!.. কেন সেটা বুঝছে না লোকে? অতি সহজ কথা এটা ...'

বিব্রত লাগল ক্যাপ্টেনের। বাস্তবিক আজব দরখাস্তকারীটি। অন্য কেউ হলে আনন্দে নেচে উঠত ... কিন্তু ইনি! একেবারে উন্মাদ! কিন্তু উন্মাদটিকে ক্রমশ বেশী ভালো লাগছে ক্যাপ্টেনের। আন্তরিক সহানুভূতি বোধ করছে সে, ওর বিচিত্র দায়ে সাহায্য করতে চায়। হঠাৎ একটা ফন্দি এল ওর মাথায়। চোখ টিপে, আঙুলের ইসারায় মেরেসিয়েভকে ডেকে একবার প্রধানের ঘরের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বলল:

'যথাসাধ্য করেছেন জেনারেল। আর কিছু করার ক্ষমতা নেই ওঁর। শপথ করে বলছি। বৈমানিকদের দলে আপনাকে পাঠালে লোকে ভাববে ওঁর মাথার ঠিক নেই। কী করতে হবে বলি। বড়োকর্তার কাছে সোজা চলে যান। একমাত্র তিনিই আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।'

আলেক্সেই'র নতুন বন্ধু একটা পাস জোগাড় করে দিল। আধ-ঘণ্টা পরে বড়োকর্তার অফিসের বসবার ঘরের কার্পেট-ঢাকা মেঝেতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল মেরেসিয়েভ। কথাটা আগে তার মনে হয়নি কেন? সত্যি ত! সময় নষ্ট না করে উচিত ছিল সটান এখানে চলে আসা। হার কিম্বা জিৎ... এখন... লোকে বলে বড়োকর্তা নিজের কালে ওস্তাদ বৈমানিক ছিলেন। তাঁর ত বোঝা উচিত! জঙ্গী বিমানচালককে নিশ্চয়ই উনি বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে পাঠাবেন না!

কয়েকজন গম্ভীর জেনারেল আর কর্ণেল সেখানে বসে নিচু গলায় আলাপ করছিলেন। কয়েকজন স্পষ্টতই অস্থির, ক্রমাগত ধূমপান করছেন। বিচিত্রভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পায়চারি করছে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। অভ্যাগতরা সবাই চলে গেল, মেরেসিয়েভের পালা এবার, ক্ষিপ্রগতিতে ও গেল ডেস্কের কাছে, গোলগাল সাদাসিধে মুখ একটি নবীন মেজর সেখানে বসে ছিল।

'আপনি স্বয়ং বড়োকর্তার সঙ্গে দেখা করতে চান, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট?' জিজ্ঞেস করল মেজর।

'হ্যাঁ। আমার বিশেষ জরুরী একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলতে চাই ওঁকে।'

'আগে সে বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন কি? চেয়ার একটা টেনে বসুন। সিগারেট খান?' সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিল মেরেসিয়েভকে।

সিগারেট খায় না আলেক্সেই, কিন্তু কেন জানি একটা সিগারেট নিয়ে আঙুলের মধ্যে সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে রাখল ডেস্কে, তারপর হঠাৎ নিজের কাহিনীর সবটা শোনাল মেজরকে, যেমন করে বলেছিল ক্যাপ্টেনকে ঠিক তেমন ভাবে। কাহিনীটি শুনল মেজর, ভদ্রতা করে ঠিক নয়, বন্ধুভাবে সহানুভূতির সঙ্গে আর মনোযোগ দিয়ে। পত্রিকার পাতাটি আর আর্মি সার্জনের মতামত পড়ল মেজর। মেজর এত সহানুভূতি দেখাচ্ছে, যে তাতে ভরসা পেয়ে আর স্থানকালপাত্র ভুলে মেরেসিয়েভ দেখাতে চাইল যে সে নাচতে পারে... সমস্ত ব্যাপারটা আর একটু হলে ভণ্ডুল হয়ে যেত, কেননা ঠিক সে সময়ে সজোরে খুলে গেল অফিস-ঘরের দরজাটা, বেরিয়ে এলেন একটি লম্বা রোগা অফিসার চুল তাঁর কাকের মত কালো। ফটোগ্রাফে দেখা চেহারা, তৎক্ষণাৎ লোকটিকে চিনতে পারল আলেক্সেই। আর্মিকোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে পিছু পিছু আসা একটি জেনারেলকে কী যেন বলছিলেন

তিনি। অত্যন্ত চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে, মেরেসিয়েভকে দেখতে পর্যন্ত পেলেন না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মেজরকে তিনি বললেন, 'আমি ক্রেমলিনে যাচ্ছি। ছ'টার সময়ে বিমানে স্তালিনগ্রাদে রওনা হতে হবে, তার বন্দোবস্ত করুন। আমরা নামব ভেরখনিয়া পগ্রোমনায়াতে।' তারপর যেমন তাড়াহুড়ো করে ঢুকেছিলেন তেমনি তাড়াহুড়ো করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তক্ষুণি বিমান পাঠাতে বলল মেজর, মেরেসিয়েভ ঘরে আছে মনে পড়াতে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল:

'আপনার কপাল খারাপ। আমরা চলে যাচ্ছি। আবার আসতে হবে আপনাকে। থাকার জায়গা আছে আপনার?'

এক মুহূর্ত আগে অসাধারণ এই অভ্যাগতটিকে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর শক্ত দেখাচ্ছিল, আর এখন তার তামাটে মুখে এত গভীর হতাশা আর ক্লান্তির ছাপ পড়ল যে মেজর মত পরিবর্তন করল।

'আচ্ছা, বেশ ...' বলল সে। 'জানি প্রধানও ঠিক এটাই করতেন।'

সরকারী কাগজে কয়েক লাইন লিখে কাগজটা খামে পুরে উপরে ঠিকানা লিখল: "কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের প্রধানকে।" খামটা মেরেসিয়েভকে দিয়ে করমর্দন করে মেজর বলল:

'সর্বান্তঃকরণে আপনার সাফল্য কামনা করি!'

চিঠিতে লেখা: "কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করেছেন সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আ. মেরেসিয়েভ। বিশেষভাবে সাহায্য করা উচিত ওঁকে। যাতে জঙ্গী বিমান বাহিনীর কাজে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য যা করা সম্ভব তা করতে হবে।"

এক ঘণ্টা পরে ছোট গোঁফওয়ালা ক্যাপ্টেনটি তার প্রধানের অফিস-ঘরে নিয়ে গেল মেরেসিয়েভকে। বৃদ্ধ জেনারেল, বলিষ্ঠ লোক তিনি, ভুরুজোড়া লোমশ আর খোঁচা খোঁচা, নোটটি পড়ে নীল প্রসন্ন চোখে বৈমানিকের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন:

'এরি মধ্যে তাহলে ওখানে যাওয়া হয়ে গিয়েছে? বেশ চটপটে বলতেই হবে। বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে পাঠাচ্ছিলাম বলে রাগে প্রায় ফেটে পড়েছিলে, তুমিই সেই ছোকরা তাহলে!' খোশমেজাজে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। 'খাসা ছোকরা! মালুম হচ্ছে ঘোড়েল বৈমানিক তুমি! বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে যেতে চাও না! চটে উঠেছিলে, তাই না?.. কিন্তু তোমার মত তুখোড় নাচিয়েকে নিয়ে কী করি বলো ত? ঘাড় মুচড়ে পড়বে তুমি, আর

বোকা বুড়োর মত তোমাকে কাজে পাঠিয়েছি বলে ওরা আমার টুঁটি চেপে ধরবে! কিন্তু তুমি কী করতে পার সেটা কে বলতে পারে? এই যুদ্ধে আমাদের ছেলেরা এর চেয়েও বড়ো অনেক কিছু করে সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে... তোমার কাগজপত্র কোথায়?'

তারপর জেনারেল মেরেসিয়েভের দরখাস্তটার উপরে নীল পেন্সিলে হিজিবিজি করে, দুষ্পাঠ্য ভাবে, কোনক্রমে কথাগুলো সমাপ্ত করে লিখলেন: "দরখাস্তকারীকে ট্রেনিং-স্কুলে পাঠানো হোক।" কম্পিত হাতে কাগজটা ছিনিয়ে নিল মেরেসিয়েভ, কী লেখা হয়েছে তক্ষুণি সেটা পড়ে ফেলল ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার পড়ল সেটা; নিচে সান্ত্রী যেখানে পাস দেখে সেখানে এসে, তারপর বাসে, তারপর বাইরে বৃষ্টি-পড়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবার পড়ল। সারা দুনিয়ায় একমাত্র ওই শুধু জানে তাড়াতাড়ি আর হিজিবিজি করে লেখা সেই পাঁচটি শব্দের মানে আর মূল্য কী।

সেদিন ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারের কাছে উপহার হিসেবে পাওয়া ঘড়িটা বেচে দিল আলেক্সেই মেরেসিয়েভ। বাজারে গিয়ে সেই টাকায় নানারকমের খাবার আর মদ কেনা হল, আনিউতাকে টেলিফোনে অনুনয় বিনয় করে বলল যেন ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি নিয়ে আসে, আনিউতার বাসার বুড়োবুড়ীকে নিমন্ত্রণ করল। নিজের বিরাট জয়লাভে আনন্দ করার জন্য ভোজের বন্দোবস্ত করল আলেক্সেই।

৮

মস্কোর কাছে, ছোট একটি বিমান-ঘাঁটির খুব কাছাকাছি ট্রেনিং-স্কুলটা। সেই সব উৎকণ্ঠায় ভরা দিনগুলিতে খুব কাজের তাড়া পড়েছে সেখানে।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে বড়ো একটা অংশ নিয়েছে বিমান বাহিনী। ভলগার এই গড়বন্দী জায়গাটির উপরে আকাশ হামেশাই আগুন আর বিস্ফোরণের ধোঁয়ায় রক্তাভ আর আচ্ছন্ন, অবিরত বিমান-হামলা রীতিমত বিরাট আকাশ-যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে সেখানে। দুপক্ষেই দারুণ লোকক্ষয় হচ্ছে। জঙ্গী স্তালিনগ্রাদ চায় বৈমানিক, আরো বেশী বৈমানিক, আরো বৈমানিক... লড়াই'এর তালিম দেবার ট্রেনিং-স্কুলটি শেখায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া বৈমানিকদের আর এতদিন বেসামরিক বিমান চালিয়েছে যারা তাদের, তাই

হাঁফ ছাড়ার সময় নেই এখন। ট্রেনিং দেবার বিমানগুলো দেখতে ড্র্যাগনফ্লাই'এর মত, ছোট ভিড়াক্রান্ত বিমান-ঘাঁটিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়িয়ে পড়েছে, রান্নাঘরে অপরিষ্কার টেবিলে মাছির মত, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শোনা যায় ওদের গুঞ্জন। চাকায় আড়াআড়িভাবে রেখাঙ্কিত মাটি, যখনি সেদিকে তাকানো যায় তখনি চোখে পড়ে একটা বিমান উঠছে, নামছে আর একটা।

স্কুলের চিফ অব স্টাফ লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলটি ছোটখাটো শক্তসমর্থ মানুষ, মুখটি লাল, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ লাল হয়ে গিয়েছে, মেরেসিয়েভের দিকে রাগতভাবে তাকালেন তিনি, যেন বলতে চান, "কোন শয়তান তোমাকে এনেছে? আমার হাতে যেন আর কাজ নেই।" বাড়িয়ে দেওয়া কাগজপত্রগুলি ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন তিনি।

"পায়ের পাতা নেই বলে আপত্তি তুলবে আর বলবে কেটে পড়তে," লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলের কালো দাড়ির গোড়ার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাবল মেরেসিয়েভ। কিন্তু ঠিক সময়ে একসঙ্গে দুবার টেলিফোনে ডাক পড়ল ওঁর। একটা রিসিভার কাঁধ দিয়ে কানে চেপে ধরে, অন্যটায় খিটখিট করে ভারী গলায় কী একটা বললেন, মেরেসিয়েভের কাগজপত্রে তারি সঙ্গে চোখ বুলিয়ে গেলেন। বোঝা গেল হিজিবিজি করে লেখা জেনারেলের নির্দেশটি শুধু তিনি পড়লেন, কেননা তক্ষুণি, রিসিভার তখনো হাতে, তার নিচে লিখে দিলেন: "লেফ্‌টেনাণ্ট নাউমভ, তৃতীয় ট্রেনিং ইউনিট। ভর্তি করে নেওয়া হোক।" দুটো রিসিভার একসঙ্গে নামিয়ে রেখে ক্লান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি:

"পোষাকের সার্টিফিকেট আছে? টাকার আর খাবারের সার্টিফিকেট? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি কী বলবেন। হাসপাতাল! সময় ছিল না হাতে। কিন্তু কী করে আপনাকে খাওয়াব? ওসবের জন্যে এক্ষুণি দরখাস্ত করে দিন। ভাতার সার্টিফিকেট না থাকলে আপনার নাম পাঠাব না!'

'বেশ, জো হুকুম!' কায়দায় সেলাম করে সানন্দে বলল মেরেসিয়েভ। 'যেতে পারি?'

'হ্যাঁ,' অবসন্নভাবে হাত নেড়ে বললেন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল। তারপর হঠাৎ ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের দেওয়া সোনালী নামাক্ষর আঁকা ভারী ছড়িটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন তারস্বরে, 'দাঁড়ান, কী ওটা?' অফিস থেকে চলে আসার সময়ে উত্তেজনায় ভুলে একটা কোণে রেখে এসেছিল ওটা মেরেসিয়েভ। 'ওটা কী? ফেলে দিন ওটা! দেখে মনে হচ্ছে

যেন এ জায়গাটা বেদেদের তাঁবু, সামরিক ইউনিট নয় — কিম্বা একটা বাগান: ছড়ি, বেত, ঘোড়ার চাবুক... শীগগিরই গলায় কবচ ঝোলাবেন মনে হচ্ছে আর কর্কপিটে নেবেন কালো বেড়াল! হতভাগা জিনিসটা যেন আর না দেখি! ফুলবাবু!'

'আচ্ছা, কমরেড লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেল!'

আলেক্সেই জানে এখনো অনেক বাধাবিপত্তি সামনে: নতুন সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করতে হবে, পুরোনো কাগজপত্র কেন হারিয়ে গিয়েছে সেটা বোঝাতে হবে খিটখিটে লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেলকে। স্কুলে ক্রমাগত লোক আসছে আর যাচ্ছে, বিশৃঙ্খলায় খাবারটা পর্যাপ্ত নয়, মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হতে না হতে রাত্রির শেষ খাবারের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে লোকেরা; বৈমানিকদের জন্য ৩ নং মেস যেখানে আস্তানা গেড়েছে, সেই স্কুলের ভিড়ঠেসা বাড়িটায় বাস্পের নল ফেটে গিয়েছে, দারুণ ঠাণ্ডা, প্রথম দিন সারা রাত কম্বল আর চামড়ার কোটের নিচে শুয়ে ঠকঠক করে কেঁপেছে আলেক্সেই -- কিন্তু সব মিলিয়ে সোরগোল আর অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও ভালো লাগল তার; বালুতীরে খাবি-খাওয়া মাছকে ঢেউ'এ আবার সমুদ্রে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে ঠিক এ-রকম লাগে। এখানকার সবকিছু ভালো লাগল তার, এমন কি শিবির-জীবনের নানা অসুবিধা মনে করিয়ে দিল যে লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি এসে পড়েছে সে।

অভ্যস্ত সেই পরিবেশ; রঙচটা চামড়ার কোট গায়ে, কুকুরের লোমের বিমানি বুট পায়ে, তামাটে মুখ, ভাঙ্গা গলা, সব হাসিখুসি লোক ওর বেশ জানা; বিমান পেট্রলের মিঠেকড়া গন্ধে ভরপুর সেই অভ্যস্ত হাওয়া ইঞ্জিন গরম করার গর্জনে আর উড়ন্ত বিমানের সমান মন-জিরোনো ঘর্ঘর আওয়াজে মুখর; চটচটে ওভারঅল পরনে, ক্লান্তিতে মুহ্যমান মিস্ত্রীদের কালিঝুল-মাখা মুখ; খিটখিটে ইনস্ট্রাকটর সব, রোদে পুড়ে মুখ কাংস্যবর্ণ; আবহাওয়া কেন্দ্রে টুকটুকে গাল মেয়েরা; পরিচালনা-ঘাঁটির স্টোভ থেকে স্তরে স্তরে নীলচে ধোঁয়া উঠছে, সঙ্কেত-যন্ত্রটির মৃদু গুঞ্জন আর টেলিফোন বেজে ওঠার আকস্মিক শব্দ; যাত্রোদ্যত বৈমানিকরা "স্মৃতির জন্য" চামচে নিয়ে যাওয়াতে খাবার ঘরে ঘাটতি; রঙীন পেন্সিলে লেখা দেয়াল-সংবাদপত্র, তাতে আকাশে উঠেও মেয়েদের স্বপ্নবিভোর তরুণ বৈমানিকদের বিষয়ে কার্টুন ত থাকবেই। বিমান-ঘাঁটির নরম হলদে মাটি চাকায় আর কীলকে কেটে কেটে গিয়েছে, খোশমেজাজে গল্প চলছে, রসালো নানা খিস্তি আর বিমানচালনা শাস্ত্রের বুলি — এ সব ত পরিচিত আর স্বীকৃত।

ধড়ে যেন প্রাণ এল মেরেসিয়েভের। জঙ্গী বিমান বাহিনীর লোকেদের সেই বিশেষ খোশমেজাজ আর বেপরোয়া ভাব ফিরে পেল সে, যে ভাব চিরকালের জন্য হারিয়েছে বলে মনে হয়েছিল। টান হয়ে দাঁড়িয়ে অধস্তন লোকেদের সেলাম কায়দায় ফিরিয়ে দেয় সে, ঊর্ধ্বতনদের দেখলে প্রথামত সম্মান জানায়। নতুন ইউনিফর্মটা হাতে এলে তক্ষুণি সেটা "মাপসই" করে বদলে নেওয়া হল, বদলাল যে সে হচ্ছে বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নের একজন প্রবীণ কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেণ্ট, বেসামরিক জীবনে সে ছিল দর্জি; অবসর সময়ে চটপটে খুঁতখুঁতে লেফ্‌টেনাণ্টদের একমাপে তৈরী সামরিক ইউনিফর্মগুলো বদলে সে একেবারে প্রমাণসই করে দিত।

প্রথম দিনেই বিমান-ঘাঁটিতে গেল মেরেসিয়েভ ৩ নং ইউনিটের ইনস্ট্রাকটর লেফ্‌টেনাণ্ট নাউমভের খোঁজে, যার অধীনে তাকে রাখা হয়েছে। খর্বদেহ, অত্যন্ত তৎপর লোক নাউমভ, মাথাটি বড়ো, হাতদুটো লম্বা, "টি" চিহ্নটির কাছে ছুটোছুটি করছে উপরের দিকে তাকিয়ে, ছোট একটা বিমান সে "খণ্ডে" উড়ছে। বৈমানিককে চেঁচিয়ে তিরস্কার করে সে বলল:

'বেটা চটের থলে... আহাম্মক... বলে কিনা জঙ্গী বিমান বাহিনীতে ছিল! আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না বাপু!'

নিজের পরিচয় দেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে প্রথাসম্মতভাবে সেলাম করল মেরেসিয়েভ, কিন্তু নাউমভ শুধু হাত নেড়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'দেখেছেন? জঙ্গী! আকাশের বীরপুঙ্গব! ফৎফৎ করছে ঘুড়ির মত...'

দেখামাত্র ইনস্ট্রাকটরকে পছন্দ হল আলেক্সেই'র। এ ধরনের অল্প ছিটগ্রস্ত লোকেরা নিজেদের কাজের প্রেমে হাবুডুবু খায়, ভালো লাগে এদের আলেক্সেই'র; এদের সঙ্গে সহজে মানিয়ে চলতে পারে দক্ষ উৎসাহী বৈমানিকরা। বৈমানিকটি যে ভাবে বিমান চালাচ্ছে তার বিষয়ে কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য করল আলেক্সেই। খর্বদেহ লেফ্‌টেনাণ্ট বিচক্ষণভাবে তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আমার ইউনিটে আসছেন? কী নাম আপনার? কী ধরনের বিমান চালিয়েছেন? লড়াই করেছেন কখনো? কবে শেষবার বিমানে চড়েছেন?'

সবকটি জবাব ও শুনল কিনা আলেক্সেই ঠিক জানে না, কেননা আবার উপরে তাকিয়ে রোদ বাঁচাবার জন্য এক হাতের আড়াল করে অন্য হাত ঝাঁকিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট চেঁচাল তারস্বরে:

'শালা ঠেলাগাড়ি!.. কী ভাবে ঘুরছে দেখুন! ড্রয়িং-রুমে জলহস্তী যেন।'

পরের দিন সকালেই আলেক্সেই যেন দেখা করে আদেশ দিল লেফ্টেনাণ্ট, কথা দিল বিনা বিলম্বে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে তাকে।

'এখন গিয়ে জিরিয়ে নিন, যাত্রার পরে বিশ্রাম দরকার। কিছু খেয়েছেন? এখানে বেজায় গণ্ডগোল, খাবার দিতে হয়ত ভুলে যাবে বুঝলেন? রামপাঁঠা বেটা! একবার নেমে এস, মজাটা দেখাচ্ছি তোমায়!'

জিরোতে গেল না আলেক্সেই, কেননা যেখানে শোবার ব্যবস্থা, "৯ক" নম্বর সেই ক্লাসরুমের চেয়ে বাইরে ঠাণ্ডা কম মনে হল; হাওয়ায় শুকনো, খরখরে বালি বিমান-ঘাঁটিতে সবেগে উড়ছে। ব্যাটেলিয়নে একটা মুচি খুঁজে বের করে, এক হপ্তার তামাক রেশন তাকে দিয়ে বলল তার অফিসারের পুরোনো বেল্ট কেটে যেন একজোড়া পেটি বানায়, বকলস আর ফাঁস থাকা চাই: সেদুটো দিয়ে যে বিমান চালাবে তার পাদানিতে নকল পায়ের পাতা বেঁধে নেবার মতলব আলেক্সেই'র। ফরমায়েসটা জরুরী আর একটু অদ্ভুত, মুচি তাই তামাক ছাড়াও আধ-লিটর ভদকা দাবী করল, কথা দিল যে বেশ ভালো করে বানিয়ে দেবে জিনিসটা। বিমান-ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে মেরেসিয়েভ বিমান চালনা অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগল, যেন জিনিসটা সাধারণ শিক্ষানবিশি নয়, সেরা বৈমানিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে; যতক্ষণ না শেষ বিমানটি মাটিতে নামল আর সেটাকে তার জায়গায় নিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল ততক্ষণ সেখানে সে রইল। বিমান চালনা যতটা না দেখল তার চেয়ে বেশী অনুভব করল বিমান-ঘাঁটির আবহাওয়া, আপন করে নিল ওখানকার কর্মব্যস্ততা, ইঞ্জিনের অবিশ্রান্ত গর্জন, হাউই'এর ভারী শব্দ, পেট্রল আর তেলের গন্ধ। সমস্ত সত্তা তার আনন্দমুখর; কাল বিমানটা অবাধ্যতায় বেসামাল হয়ে পড়ে যেতে পারে, দুর্ঘটনা হতে পারে সে কথাটা একবারও মনে হল না।

পরদিন সকালে যখন ওখানে গেল তখনো জায়গাটা ফাঁকা। ওদিকের লাইনে ইঞ্জিন গরম করা হচ্ছে, গর্জন উঠছে, বিশেষ স্টোভ থেকে বেরোচ্ছে আগুনের শিখা, প্রপেলারগুলো চালিয়ে দিয়ে মিস্ত্রীরা লাফিয়ে সরিয়ে আসছে, যেন সাপ ওগুলো। কানে আসছে সকালের পরিচিত নানা হাঁকডাক:

'তৈয়ার!'

'কনট্যাক্ট!'

'কনট্যাক্ট!'

কে যেন ধমকে উঠে আলেক্সেইকে জিজ্ঞেস করল এত ভোরে

বিমানগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করার মানেটা কী। ঠাট্টা করে জবাব দিল আলেক্সেই, আর চটুল ধুয়ার মত বার বার বলে চলল, "তৈয়ার, কনট্যাক্ট, কনট্যাক্ট!" কথাগুলো কী কারণে যেন মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছে না। অবশেষে আস্তে আস্তে রওনা হবার লাইনে বিমানগুলো এল, বেঢপভাবে হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে, পাখাগুলো কাঁপছে, মিস্ত্রীরা ধরে আছে সেগুলো। নাউমভ ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে, সিগারেটের টুকরো মুখে, টুকরোটা এত ছোট যে মনে হয় যে বাদামী আঙুলের ডগা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

'এসে পড়েছ দেখছি!' আলেক্সেই'র কায়দাসম্মত সেলামের প্রত্যুত্তরে বলল লেফ্‌টেনাণ্ট। 'বেশ, বেশ। প্রথমাগত, প্রথমে পরিবেষিত। ৯ নং বিমানের পিছনের ককপিটে বসো। আমি এক্ষুণি আসছি। দেখা যাক, কী ধরনের চিড়িয়া তুমি।'

সিগারেটের টুকরোটায় তাড়াতাড়ি কয়েকটা টান দিচ্ছে সে, আলেক্সেই সটান গেল বিমানটায়। ইনস্ট্রাকটর এসে পড়ার আগেই পায়ের পাতাদুটো পাদানিতে বেঁধে নেওয়া মতলব তার। লোকটি ত খাসা মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছু বলা যায় না! মাথায় হয়ত ঝট করে কিছু একটা ঢুকবে আর হট্টগোল বাঁধিয়ে বিমান চালাতে দেবে না ওকে। পিছল ডানা বেয়ে তাড়াহুড়ো করে উঠল মেরেসিয়েভ, ককপিটের পাশটা অস্থিরভাবে ধরে, উত্তেজনার দরুণ, আর অভ্যেস নেই বলে পাটা তুলে পেঁছতে পারছিল না ও ধারটায় কিছুতেই; প্রৌঢ় মিস্ত্রীটি লম্বাটে বিষণ্ণ মুখে সবিস্ময়ে তাকাল তার দিকে আর ভাবল, "বেটা নেশায় চুর দেখছি!"

শেষ পর্যন্ত একটা টান-টান পা ককপিটে ঢোকাতে পারল আলেক্সেই, অসম্ভব চেষ্টা করে অন্য পাটাও, আর ধপ করে বসে পড়ল সিটে। পেটি দিয়ে নকল পায়ের পাতাদুটো পাদানিতে বাঁধল। বেশ ভালোভাবে বানানো হয়েছে পেটিদুটো, বিমান চালাবার পাদানির সঙ্গে নকল পাদুটো ফাঁস দিয়ে শক্ত আর স্বচ্ছন্দভাবে জড়িত। ছেলেবেলায় ব্যবহৃত খাসা স্কেটজোড়াটার মত।

ককপিটে মাথা ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল ইনস্ট্রাকটর:

'কী হে, নেশা করেছ নাকি? একবার শুঁকে দেখি ত!'

নিশ্বাস ফেলল আলেক্সেই। মদের গন্ধ নেই, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মিস্ত্রীর দিকে চটেমটে হাত নাড়ল ইনস্ট্রাকটর।

'তৈয়ার!'

'কনট্যাক্ট!'

'কনট্যাক্ট!'

কয়েকবার গুর গুর করে উঠল ইঞ্জিনটা, তারপর নিয়মিত তালে শোনা গেল পিস্টনগুলোর স্পন্দন। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে স্বতই গ্যাসের লেভার টানল আলেক্সেই. কানে এল গরগর করে ইনস্ট্রাকটর কথা বলার যন্ত্রে বলছে:

'ষাড়ের মত তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই।'

থ্রটল নিজে খুলল ইনস্ট্রাকটর। গর্জিয়ে আর্তনাদ করে উঠল ইঞ্জিন, লাফিয়ে ডিঙিয়ে কিছুটা গিয়ে শুরু করল টানাদৌড়। ইনস্ট্রাকটর কল টিপল আর ড্র্যাগনফ্লাই'এর মত দেখতে ছোট বিমানটা খাড়াভাবে উঠল আকাশে। উত্তর ফ্রন্টে ওর আদরের নাম "বনবাসী", কেন্দ্রীয় ফ্রন্টে "কপিওয়ালা" আর দক্ষিণ ফ্রন্টে "ভুট্টাওয়ালা।" সৈন্যরা সবাই বিমানটিকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি চালাত, পুরোনো কিঁচকিঁচে হলেও জিনিসটা বিশ্বস্ত আর অনুগত, সবাই খাতির করে সেটিকে, সব বৈমানিকই উড়তে শিখেছে সেটায়।

কোণাকুণি বসানো আয়নায় নতুন শিক্ষার্থীর মুখ দেখতে পাচ্ছে ইনস্ট্রাকটর। বেশ কিছুদিন ছেদের পর প্রথম বিমান চালাচ্ছে, এমন কত লোকের মুখ না সে দেখেছে! দেখেছে সেরা বৈমানিকদের অনুগ্রহসূচক হাসি; হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ক্লান্ত শ্রান্ত যাত্রার পরে আবার ধাতস্থ উৎসাহী লোকেদের উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ; বিমানপতনের দরুন সাংঘাতিক চোট পেয়েছে যারা, আকাশে ওঠবার পরে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে তাদের মুখ, দেখা দিয়েছে ভীতির লক্ষণ, ঠোঁট কামড়েছে তারা; দেখেছে প্রথম ওড়বার সময়ে শিক্ষানবীশদের বেয়াড়া কৌতূহলী মুখ। এতদিন ইনস্ট্রাকটরের কাজ করেছে সে, কিন্তু আয়নায় কখনো ছায়া পড়েনি এমন অদ্ভুত মুখভাবের, যে ভাব এই তামাটে, সুদর্শন সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টটির মুখে এসেছে, ওকে দেখে ত স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিমান চালনায় আনাড়ি নয় মোটেই।

নতুন শিক্ষার্থীর মুখের তামাটে চামড়া যেন জ্বরের প্রকোপে রক্তাভ হয়ে উঠেছে। ঠোঁটদুটো ফ্যাকাশে, ভয়ে নয়, উচ্চ একটা আবেগে, সেটা কী বুঝতে পারল না নাউমভ। লোকটি কে? কী ঘটছে ওর? কেনই বা মিস্ত্রীটি ওকে মাতাল ভেবেছিল?

বিমানটি আকাশে উঠেছে, ইনস্ট্রাকটর দেখল শিক্ষার্থীটার গগল্‌সহীন

কালো জেদী বেদে চোখ জলে ভরে উঠল, ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে গালে চোখের জল; বিমানটা মোড় ঘুরতে হাওয়ার ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে গেল অশ্রু বিন্দু।

"মাথাটা একটু খারাপ মনে হচ্ছে। সাবধান হতে হবে আমাকে। কিছুই ত বলা যায় না..." ভাবল নাউমভ। আয়নায় ছায়া পড়ছে, উত্তেজিত মুখটির ভাবে এমন কিছু একটা ছিল যেটা চিত্ত আকর্ষণ করল ইনস্ট্রাকটরের। অবাক হয়ে দেখল আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে নিজের, সামনের সব যন্ত্রপাতি ঝাপসা হয়ে গেল।

'এবার তুমি ভার নাও,' কথা বলার যন্ত্রে মুখ দিয়ে বলল সে, কিন্তু পাদানি আর কল সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিল না; অদ্ভুত শিক্ষার্থীটি দুর্বলতার কোন লক্ষণ দেখালেই যাতে নিজে সামলে নিতে পারে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। ডুপ্লিকেট গিয়ারে হাত দিয়ে বুঝতে পারছে যে নতুন শিক্ষার্থীটি স্বচ্ছন্দে, অভিজ্ঞভাবে বিমান চালাচ্ছে, যেন "জাত বৈমানিক"; কথাটা বলতে ভালোবাসতেন স্কুলের চিফ অব স্টাফ, তিনি নিজে ঘাগী বৈমানিক, গৃহযুদ্ধের সময় থেকে বিমান চালিয়েছেন।

প্রথম কিস্তির পরে নতুন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে কোন সংশয় রইল না নাউমভের।

"নিয়মানুযায়ী" মসৃণভাবে চলেছে বিমানটা। অদ্ভুত যেটা লাগছে সেটা হল যে সোজাসুজি চালানোর সময়ে শিক্ষার্থীটি প্রায়ই একটু ডাইনে কিম্বা বাঁয়ে মুড়ছে, কিম্বা উপরনিচ করছে। মনে হল নিজের দক্ষতা যাচাই করে নিচ্ছে। নাউমভ ঠিক করল পরের দিনই ওকে একলা উড়তে দেবে, দুতিন বার ওড়ার পর ট্রেনিং বিমানে ওকে বসাবে; প্লাইউডের তৈরী সেটা, জঙ্গী বিমানের ক্ষুদ্র অনুকৃতি।

বেশ ঠাণ্ডা। ডানায় বসানো থার্মোমিটারে শূন্যের নিচে বারো সেণ্টিগ্রেড। ককপিটে কনকনে হাওয়া এসে ইনস্ট্রাকটরের কুকুরের লোমের বিমানি বুট ভেদ করে ঢুকছে, পা জমে যাচ্ছে। নামবার সময় হয়েছে।

কিন্তু যতবার ইনস্ট্রাকটর নামতে আদেশ করে ততবার আয়নাতে দেখে একজোড়া কালো জ্বলজ্বলে অনুনয়-ভরা চোখ। না, অনুনয়বিনয় করছে না, দাবী করছে, আর প্রত্যাখ্যান করার মত নির্দয় হতে পারছে না সে। দশ মিনিটের জায়গায় আধ-ঘণ্টা উড়ল তারা।

ককপিট থেকে লাফিয়ে নেমে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল নাউমভ আর

দস্তানা সুদ্ধ হাতদুটো সজোরে ঘষতে লাগল: সকালের অকাল ঠাণ্ডা কনকনে সত্যিই! শিক্ষার্থীটি কিন্তু ককপিটে কী একটা নিয়ে অস্থিরভাবে কাটাল কিছুক্ষণ, তারপর নামল মন্থরভাবে, মনে হল অনিচ্ছা সত্ত্বে। মাটিতে পা ঠেকার পর ডানার পাশে উবু হয়ে বসে পড়ল, মুখে আনন্দের মাতাল-করা ভাব, ঠাণ্ডায় আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে গাল।

'ঠাণ্ডা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ইনস্ট্রাকটর। "বিমানি বুটে সটান ঢুকছিল হাওয়াটা, কিন্তু তুমি ত সাধারণ জুতো পরে আছো? পা জমে যায়নি?'

'পায়ের পাতা নেই আমার,' জবাবে বলল শিক্ষার্থী, নিজের চিন্তায় তখনো হাসছে ও।

'কী?' বলে উঠল নাউমভ, বিস্ময়ে ওর মুখ ঝুলে পড়েছে।

'পায়ের পাতা নেই আমার,' স্পষ্টভাবে আবার বলল মেরেসিয়েভ।

'পায়ের পাতা নেই, তার মানে? দুটোর কিছু গড়বড় আছে, তাই বলছো?'

'না। আমার পায়ের পাতা একেবারেই নেই। এদুটো নকল।'

এক মুহূর্ত বিস্ময়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল নাউমভ। আজব লোকটা যা বলছে অবিশ্বাস্য সেটা। পায়ের পাতা নেই! কিন্তু এইমাত্র ত বিমান চালিয়েছে, আর ভালোই চালিয়েছে...

'দেখি ত,' বলল নাউমভ, গলায় উৎকণ্ঠার আভাস।

তার কৌতূহলে বিরক্তি কিম্বা অপমান বোধ করল না আলেক্সেই। বরঞ্চ ওস্তাদের মার দেখিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিতে চায় এই ফুর্তিবাজ লোকটিকে। যাদুকর যেন খেল দেখাচ্ছে এমন ভঙ্গীতে, ট্রাউজারের পা উপরে তুলে ধরল আলেক্সেই।

চামড়া আর এ্যালুমিনিয়ামে বানানো নকল পায়ে ভর করে শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে আছে, ইনস্ট্রাকটর মিস্ত্রী আর প্রতীক্ষারত বৈমানিকদের সারির দিকে ফুর্তিতে চেয়ে।

এক ঝলকে নাউমভ বুঝতে পারল লোকটি উত্তেজিত হয়েছিল কেন, ওর অস্বাভাবিক মুখভাবের কারণ কী, ওর কালো চোখে কেন জল এসেছিল, কেন বিমান চালাবার রোমাঞ্চ এত ব্যগ্রভাবে বিলম্বিত করতে চেয়েছিল সে। শিক্ষার্থীটি অবাক করে দিল তাকে। ছুটে কাছে গিয়ে পাগলের মত তার করমর্দন করে বলে উঠল ইনস্ট্রাকটর:

'কী করে এটা করলে, ছোকরা? তুমি জানো না, সত্যি তুমি জানো না, কী ধরনের মানুষ তুমি নিজে!..'

প্রধান ব্যাপারটি তাহলে সম্পন্ন এখন। ইনস্ট্রাকটরের চিত্তজয় করেছে সে। সন্ধ্যেবেলায় আবার দুজনের দেখা হল, শেখবার একটা কর্মসূচী তৈরী করা হল। দুজনেই মানল যে আলেক্সেই'র ব্যাপারটা সহজ নয়। বিন্দুমাত্র ভুল করলেই ওকে আর কখনো উড়তে না দেবার সম্ভাবনা আছে। আর যদিও এখন ওর একমাত্র বাসনা জঙ্গী বিমান চেপে যায় ভলগার বুকে বিখ্যাত সেই সহরটিতে যেখানে দেশের সেরা যোদ্ধারা দলে দলে যাচ্ছে, তবু ধৈর্য ধরে সে সর্বাঙ্গীন ট্রেনিং নিতে রাজী হল। আলেক্সেই বুঝতে পারল তার যে অবস্থা তাতে পয়লা নম্বরের সার্টিফিকেট না পেলে চলবে না।

৯

ট্রেনিং-স্কুলে মাস পাঁচেকের বেশী রইল মেরেসিয়েভ। বিমানক্ষেত্র বরফে-ঢাকা, বিমানগুলোকে রাখা হয়েছে রানারে। হেমন্তের নানা উজ্জ্বল রং আর ছড়িয়ে নেই, "আকাশ-খণ্ডে" উঠলে শুধু দুটো রং চোখে পড়ে আলেক্সেই'র: শাদা আর কালো। স্তালিনগ্রাদে জার্মানদের চরম পরাজয়ের উত্তেজনামূলক খবর, জার্মান ষষ্ঠ বাহিনীর সর্বনাশ আর পওলাসের আত্মসমর্পণ অতীতের ব্যাপার এখন। দক্ষিণে ক্রমশ শক্তিলাভ করছে অভূতপূর্ব অদম্য আক্রমণাত্মক প্রতিঘাত। জার্মানদের লাইন ভেঙ্গেচুরে জেনারেল রতমিস্ত্রভের ট্যাঙ্ক-বাহিনী শত্রুপক্ষের পিছনে পৌঁছিয়ে ওদের বিধ্বস্ত করছে। ফ্রণ্টে চলেছে এ ধরনের ব্যাপার, প্রচণ্ড আকাশ-যুদ্ধ চলেছে ফ্রণ্টের উপর, এ সময়ে ছোট তালিমি বিমানে ধৈর্য ধরে কিঁচ কিঁচ করে ওড়া আরো কঠিন মনে হয় আলেক্সেই'র; এর চেয়ে সহজ ছিল হাসপাতালের করিডর ধরে দিনের পর দিন বিরামহীন পায়চারি, কিম্বা স্ফীত, ব্যথায় জর্জর নুলো পায়ে মাজুরকা কিম্বা ফক্সট্রট নাচা।

কিন্তু হাসপাতালে থাকার সময়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল ও যে বিমান বাহিনীতে আবার কার্যক্ষম অবস্থায় ফিরে যাবে। লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছিল নিজের, আর দুঃখ কষ্ট শ্রান্তি ও হতাশা সত্ত্বেও চলেছে সে লক্ষ্যের দিকে। নতুন ঠিকানায় একদিন একটা মোটা খাম এল, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা পাঠিয়েছে সেটা। কয়েকটা চিঠি খামে, একটা ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার

নিজের, সে জিজ্ঞেস করেছে যে তার কী রকম চলেছে, কী সাফল্য অর্জন করেছে, তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে কি না।

"হয়েছে কি?" নিজেকে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই, কিন্তু উত্তর না দিয়ে চিঠিগুলো বাছাই করতে লাগল। কয়েকটা চিঠি; একটি মা'র, ওলিয়ার একটি, একটি লিখেছে গভজদেভ; আর একটা তাকে বিশেষভাবে বিস্মিত করল, ঠিকানাটা "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" লেখা, নিচে লেখা "ক্যাপ্টেন ক. কুকুশকিনের কাছ থেকে।" প্রথমে এই চিঠিটা পড়ল আলেক্সেই।

কুকুশকিন লিখেছে, তার বিমানকে শত্রুপক্ষ নামায়, গুলি লেগে আগুন ধরে যায় ওটাতে, পারাসুটে করে নিজের লাইনে কোনক্রমে নামে, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে হাত মচকে গিয়েছে। চিকিৎসা বিভাগে পড়ে আছে এখন, ওর ভাষায় "ডুস্‌দাতাদের ভব্য দলের সঙ্গে থেকে থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে"। যাই হোক, মাথা ঘামাচ্ছে না সে, তার দৃঢ় বিশ্বাস যে শীগগিরই আবার বিমান চালাতে পারবে। আরো লিখেছে যে চিঠিটা ডিক্টেট করছে আলেক্সেই'র অতি-পরিচিত পত্রদাতা ভেরা গাভ্রিলভা, আলেক্সেই'র কৃপায় বাহিনীতে তার "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" নামটা এখনো চালু। চিঠিতে এ কথাও জানিয়েছে যে ভেরা বেশ ভালো দোসর, তার দুরবস্থায় সেই প্রধান অবলম্বন। এখানটায় নিজের হয়ে লিখেছে ভেরা, লঘুবন্ধনীতে অবশ্যই, যে কস্তিয়া বাড়াবাড়ি করছে। চিঠিটা থেকে আলেক্সেই জানল যে বাহিনীর লোক এখনো তাকে মনে রেখেছে, মেসরুমে টাঙ্গানো বাহিনীর বীরেদের ছবির মধ্যে তার ছবিও রাখা হয়েছে, ওর প্রত্যাবর্তনের আশা এখনো ছেড়ে দেয়নি রক্ষীরা। রক্ষীরা! হেসে মাথা নাড়ল মেরেসিয়েভ। বাহিনীকে রক্ষীর পতাকা দানের মত উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা তাকে জানাতে ভুলে গিয়েছে, কুকুশকিন আর তার বিনাবেতনের সেক্রেটারী তাহলে অন্য কিছু একটা নিয়ে নিশ্চয়ই খুব বিভোর।

মায়ের চিঠিটা আলেক্সেই খুলল। বুড়ী মায়েরা গলপচ্ছলে যেমন সাধারণত লেখে ঠিক সে রকম, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আর উৎকণ্ঠায় ভরা: কেমন চলেছে ওর, ঠাণ্ডা লাগছে না ত, যথেষ্ট খাবার পাচ্ছে কিনা, শীতের জামাকাপড় পেয়েছে কি, একজোড়া দস্তানা বুনে পাঠাবেন কি তিনি? ইতিমধ্যেই পাঁচজোড়া বুনেছেন তিনি, সোভিয়েত বাহিনীর লোকেদের উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকটি দস্তানার বুড়ো আঙুলের উপরে দিয়েছেন একটি নোট... "আশা করি এটাতে তোমার কুশল হবে।" একজোড়া

আলেক্সেই'র কাছে পেঁাছিয়েছে তিনি আশা করেন। নিজের খরগোসের লোম থেকে তৈরী ওগুলো, বেশ সুন্দর আর গরম। হ্যাঁ, তিনি বলতে ভুলে গিয়েছেন যে একটি খরগোস পরিবার এখন তাঁর হয়েছে, মদ্দা আর মাদীর জোড়া, আর সাতটা বাচ্চা। শুধু উপসংহারে, বুড়িমা-সুলভ স্নেহময় বকবকানির পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে:

জার্মানদের স্তালিনগ্রাদ থেকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওদের অনেক অনেক লোক মারা গিয়েছে, আর লোকে এমন কি বলছে ওদের একজন চাঁই জেনারেল পর্যন্ত ধরা পড়েছে। জার্মানদের ভাগানোর পর পাঁচ দিনের ছুটিতে ওলিয়া কামিশিনে এসেছিল। তাঁর কাছে ছিল ওলিয়া, কেননা ওলিয়ার বাড়িটা বোমায় ভেঙ্গে যায়। ও এখন স্যাপারস্ বাহিনীতে লেফ্‌টেনাণ্ট। ঘাড়ে চোট লেগেছিল ওলিয়ার, ওকে সম্মান-চিহ্ন দেওয়া হয়: ঠিক কী সম্মান-চিহ্ন সেটা অবশ্য জানানো প্রয়োজন মনে করেননি বৃদ্ধা। যোগ করেছেন যে তাঁর কাছে থাকার সময়ে প্রায় সব সময়েই ওলিয়া ঘুমোত, আর না ঘুমোলে আলেক্সেই'র কথা বলত; তাস খেলে ভাগ্যপরীক্ষা করত দুজনে, প্রতিবার চিড়িতনের রাজার উপরে আসত রুইতনের রাণী। তার অর্থটা আলেক্সেই'র নিশ্চয়ই জানা আছে! নিজের কথা বলতে গেলে, লিখেছেন তিনি, ওই রুইতনের রাণীটির চেয়ে শ্রেয় পুত্রবধূ তিনি কামনা করেন না।

বৃদ্ধার সরল কূটবুদ্ধিতে হাসল আলেক্সেই, "রুইতনের রাণীর" চিঠির ছাই রঙের খামটা খুলল সযত্নে। চিঠিটা দীর্ঘ নয়। ওলিয়া লিখেছে "ট্রেঞ্চ" খোঁড়ার পর, তার শ্রম বাহিনীর সবচেয়ে ভালো কর্মীদের খাস বাহিনীর একটি স্যাপারস্ দলে নেওয়া হয়। ও এখন লেফ্‌টেনাণ্ট-টেকনিশ্যানের পদে। ওর দলই শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণের মধ্যে মামায়েভ কুরগানের সেই বিখ্যাত রক্ষাব্যূহ গড়ে। ট্র্যাক্টর কারখানার চারিদিকে রক্ষাব্যূহও তাদের কাজ, এর জন্য দলটিকে অর্ডার অব দি রেড ব্যানার দেওয়া হয়। ওলিয়া লিখেছে যে ওদের কঠিন সময় যাচ্ছে, সমস্ত কিছু, টিনের মাংস থেকে শাবল পর্যন্ত ভলগার ওপার থেকে আনতে হচ্ছে, ক্রমাগত মেসিনগানের গুলি পড়ছে সেখানে। আরো লিখেছে যে সহরে একটিও বাড়ি অটুট নেই, বড়ো বড়ো গর্তে মাটি ভরা, দেখে মনে হয় চাঁদের বড়ো-করা ফটোগ্রাফ।

ওলিয়া লিখেছে যে হাসপাতাল ছাড়ার পর ওকে আর অন্যদের একটা গাড়ি করে স্তালিনগ্রাদের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ও দেখে রাশি রাশি

ফ্যাশিস্টদের মৃতদেহ কবর দেবার জন্য জড়ো করা হয়েছে। তখনো অনেকে রাস্তায় পড়ে আছে! "তোমার বন্ধু ট্যাঙ্ক-অফিসারটি, কী নাম তার ভুলে গিয়েছি, ওই যে সে যার সমস্ত পরিবারকে ওরা খুন করে, যদি সে একবার এখানে এসে স্বচক্ষে দৃশ্যটা দেখত; সত্যি বলছি, এ সবকিছুর সিনেমা তুলে ওর মত লোকদের দেখানো উচিত! কী প্রতিশোধ আমরা নিয়েছি দেখুক ওরা!" শেষে লিখেছে — দুর্বোধ্য ছত্রটি কয়েকবার পড়ল আলেক্সেই — এখন স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধশেষে সে নিজেকে বীরের মত বীর আলেক্সেই'র উপযুক্ত মনে করে। চিঠিটা লেখা তাড়ায়, ট্রেন থামা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। কোথায় যাচ্ছে ও জানে না, তাই ডাকঘরের ঠিকানাটা ওকে জানাতে পারছে না। ফলে ওর পরের চিঠিটা না পাওয়া পর্যন্ত আলেক্সেই আর জানাতে পারবে না যে সত্যিকারের বীরাঙ্গনা হল ওলিয়া নিজেই, যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যিখানে যে ছোট পাতলা মেয়েটি অক্লান্তভাবে কাজ করে গিয়েছে, সে। আবার খামটা ঘুরিয়ে দেখল পত্রলেখিকার নামটা স্পষ্টভাবে লেখা: গার্ডস জুনিয়র-লেফ্‌টেনাণ্ট ওলগা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুহূর্তখানেকের অবসর মিললেই চিঠিটা বের করে আবার পড়ত আলেক্সেই, বিমানক্ষেতের কনকনে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়ায়, আর জমে-যাওয়া ক্লাসরুম "৯ক" ঘরে, যেটা এখনো তার আস্তানা, চিঠিটা অনেক দিন ধরে উষ্ণ রাখে তাকে।

শেষ পর্যন্ত ওর বিমান চালনার পরীক্ষার দিন ঠিক করল ইনস্ট্রাকটর নাউমভ। জঙ্গী-ট্রেনার বিমান চালাতে হবে তাকে, পরীক্ষাটা নেবে ইনস্ট্রাকটর নয়, স্কুলের চিফ অব স্টাফ স্বয়ং, বলিষ্ঠ শক্তসমর্থ লাল-মুখ সেই লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলটি, যিনি পৌঁছবার দিনে তাকে খুব সাদর সম্ভাষণ জানাননি।

নিচে থেকে তাকে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে, অদৃষ্ট নির্ণয়ের সময় এসেছে, সেটা জেনে আলেক্সেই সেদিন নিজেকেও ছাড়িয়ে গেল। ছোট হালকা বিমানটিকে এত দক্ষতায় চালাল যে মুখর প্রশংসার ধ্বনি না করে পারলেন না লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল। বিমান থেকে নেমে যখন গেল ওঁর কাছে তখন নাউমভের মুখের খাঁজে খাঁজে আনন্দ আর উত্তেজনার দীপ্তি দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে।

'চমৎকার! হ্যাঁ, যাকে আমি বলি জাত বৈমানিক, তুমি তাই,'

গরগরিয়ে উঠলেন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল। 'শোনো, ইনস্ট্রাকটর হিসেবে এখানে থাকতে চাও? তোমার মত লোক আমাদের দরকার।'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়াল মেরেসিয়েভ।

'তুমি দেখছি নেহাৎ বোকা! লড়তে যে-কেউ পারে. কিন্তু এখানে উড়তে শেখাতে তুমি!'

হঠাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলের চোখে পড়ল ছড়িটা. সেটাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেরেসিয়েভ, আর রাগে কালো হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'আবার!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'দাও আমাকে! ছড়ি হাতে পিকনিকে যাওয়া হচ্ছে নাকি! কোথায় আছ -- বুলভারে?.. আদেশ অমান্য করার জন্যে আটকঘরে আটচল্লিশ ঘণ্টা... সেরা বৈমানিক বটে! কবচ নিয়ে ঘোরা হচ্ছে! এর পরে বিমানের গায়ে রুইতনের টেক্কা আঁকবে দেখছি! আটচল্লিশ ঘণ্টা! কী বলছি কানে গিয়েছে?'

ছড়িটা মেরেসিয়েভের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল ক্রুদ্ধভাবে চারিদিকে তাকালেন, কিছুতে ঠুকে যদি ভাঙ্গা যায়।

'কমরেড লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল, যদি আমাকে বলার অনুমতি দেন... ওর পায়ের পাতা নেই,' মাঝে পড়ে বলল ইনস্ট্রাকটর নাউমভ।

আরো কালো হয়ে গেল অধিকর্তার মুখ; চোখদুটো যেন ফেটে পড়ছে, শ্বাস পড়ছে ঘনঘন।

'তার মানে? আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছ না কি? যা শুনলাম তা সত্যি?'

মাথা নেড়ে মেরেসিয়েভ মূল্যবান ছড়িটির দিকে আড়চোখে তাকাল, ওটার মরণকাল এসে পড়েছে। ভার্সিলি ভার্সিলিয়েভিচের উপহারটি বাস্তবিকই ইদানীং কখনো সঙ্গছাড়া করত না মেরেসিয়েভ।

বন্ধুদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল টেনে টেনে বললেন:

'আচ্ছা, সত্যিই যদি হয়... তাহলে, অবশ্য... দেখি তোমার পাদুটো... হুঁ!'

প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দিয়ে ট্রেনিং-স্কুল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল আলেক্সেইকে। তার অদ্ভুত সাফল্যের সবচেয়ে বেশী তারিফ করলেন, মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করলেন বদমেজাজী ঘাগী বৈমানিক সেই লেফ্‌টেনাণ্ট-

কর্ণেলটি। তিনি লিখলেন যে মেরেসিয়েভ "দক্ষ অভিজ্ঞ আর দৃঢ়চিত্ত বৈমানিক, বিমান বাহিনীর যে কোন শাখার উপযুক্ত।"

১০

উৎকর্ষ বাড়াবার একটি স্কুলে মেরেসিয়েভ বাকি শীত আর বসন্তের প্রথম ভাগটা কাটাল। স্থায়ী সামরিক বিমান স্কুল এটি, বিমানক্ষেত্রটি চমৎকার, খাসা থাকবার জায়গা, ক্লাব-ঘরটি উৎকৃষ্ট, সেখানে মস্কোর নানা থিয়েটার দল মাঝেমাঝে এসে অভিনয় করে। এই স্কুলেও বেশ ভিড়, কিন্তু প্রাক-যুদ্ধ সব আইনকানুন কড়াভাবে পালন করা হয়, এমন কি পোশাকের খুঁটিনাটির বিষয়েও সাবধানে থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের: বুট চকচকে নেই, কোট থেকে বোতাম একটা পড়ে গেছে, বেল্টের উপরে হয়ত তাড়াহুড়ো করে লাগানো হয়েছে মানচিত্রের কেস, দোষীকে কম্যান্ডান্টের হুকুমে দু ঘণ্টা কাওয়াজ করতে হত।

আলেক্সেই মেরেসিয়েভ একটি বড়ো দলে আছে, দলটি নতুন ধরনের একটি সোভিয়েত জঙ্গী বিমান — "লাভচ্‌কিন-৫" — চালানো শিখছে। শিক্ষা প্রণালীটি নিখুঁত, ইঞ্জিন এবং বিমানের অন্যান্য অংশের বিষয়েও জানতে হয়। বক্তৃতা শোনার সময়ে বাহিনী থেকে তার সংক্ষিপ্ত অনুপস্থিতির মধ্যে সোভিয়েত বিমান বিদ্যা কত দূর এগিয়ে গিয়েছে দেখে বিস্মিত হত আলেক্সেই। যুদ্ধের আগে যেটা মনে হত চমকপ্রদ আবিষ্কার সেটা এখন একেবারে সেকেলে। ক্ষিপ্র "সোয়ালো" আর হালকা, খুব উঁচুতে ওড়া "মিগ", যুদ্ধের শুরুতে যাদের একেবারে শেষ কথা মনে হত, তাদের এখন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের জায়গা নিচ্ছে নতুন ধরনের সব বিমান; অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে সোভিয়েত বিমান কারখানা এদের ব্যাপক নির্মাণ শুরু করে দেয়: একেবারে হালের নক্‌সার অত্যুৎকৃষ্ট "ইয়াক," চল হয়েছে "লাভচ্‌কিন-৫"এর, আর দুই-সিট "ইল" -- উড়ন্ত ট্যাঙ্ক যেন, প্রায় মাটি ছুঁয়ে জার্মানদের উপরে গোলাগুলি বর্ষণ করে, আতঙ্কিত জার্মানরা ইতিমধ্যেই এর নাম দিয়েছে "কালো যম"। সংগ্রামী জনগণের প্রতিভা সৃষ্টি করছে নতুন সব বিমান, আকাশ-যুদ্ধের কায়দা জটিল হয়ে উঠেছে গুরুতরভাবে; যে বিমানটি চালানো হচ্ছে তার বিষয়ে জানাটাই এখন যথেষ্ট নয়, অদম্য সাহস ছাড়াও দরকার হাওয়ায় নিমেষে ঠিক ভারসাম্যে ফিরে



আসার, আকাশ-যুদ্ধকে খণ্ড খণ্ড ভাগে দেখার, আর নির্দেশের অপেক্ষা না করে, লড়ার সময়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেগুলোকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা।

এ সব অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু ফ্রন্টে কোন ছাড়ান না দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চলেছে; উজ্জ্বল উঁচু ক্লাসরুমে কালো খাসা ডেস্কের সামনে বসে বক্তৃতা শুনতে শুনতে ফ্রন্টে যাবার, ওখানকার আবহাওয়ায় গিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষায় আলেক্সেই'র বুক ভরে যেত। শারীরিক যন্ত্রণা কী করে জয় করতে হয় শিখেছে সে, অসাধ্যসাধন করতে বাধ্য করেছে নিজেকে, কিন্তু এই যে জোর করে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা, তার অবসাদ জয় করার মত মনোবল নেই তার। মাঝেমাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিরসমুখে অন্যমনস্কভাবে বদমেজাজে স্কুলে ঘুরে বেড়াত আলেক্সেই।

আলেক্সেই'র সৌভাগ্যবশত, স্কুলে একই সময়ে ছিল মেজর স্ত্রুচকভ। পুরোনো বন্ধুর মত দুজনে মেলে। আলেক্সেই'র দু সপ্তাহ পরে স্ত্রুচকভ আসে, কিন্তু কালবিলম্ব না করে স্কুলের জীবন গ্রহণ করল সে, যুদ্ধের সময়ে যে সব কড়া রীতিনীতি এত বেমানান মনে হত সবগুলোকে সাবধানে মানিয়ে চলল, প্রত্যেকের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ ভাব। আলেক্সেই'র মন খারাপের কারণটা চট করে সে আঁচ করল; রাত্রে বাথরুম থেকে শোবার ঘরে যাবার সময়ে আলেক্সেই'র পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে বলত:

'ও হে, আর শোক কোরো না! লড়াই ত আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না! দেখো না, বার্লিন এখনো কত দূরে! অনেক অনেক মাইল বাকি। আমাদের দিন আসবেই, ভাববার কিছু নেই। প্রাণভরে লড়াই করতে পারব আমরা।'

দু-তিন মাস ওদের সাক্ষাৎ হয়নি, এরি মধ্যে মেজর রোগা আর বুড়িয়ে গিয়েছে, বাহিনীর ভাষায়, মনে হচ্ছে ও "ভেঙ্গেচুরে" গিয়েছে।

শীতের মাঝামাঝি যে দলে মেরেসিয়েভ আর স্ত্রুচকভ ছিল সে দলটি বিমান চালানোয় তালিম নিতে শুরু করল। এতদিনে "লাভচ্কিন-৫"এর সবকিছু জানা হয়ে গিয়েছে আলেক্সেই'র, ছোট খাটো-ডানা বিমানটি, চেহারাটা উড়ন্ত মাছের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রায়ই, বিরতির সময়ে বিমানক্ষেত্রে গিয়ে আলেক্সেই দেখত মাটিতে সংক্ষিপ্ত দৌড়ের পর খাড়া হয়ে আকাশে উঠছে বিমানগুলো, ঘোরার সময় সূর্যের আলোয় ঝিক ঝিক করে ওঠে ওদের নীলচে পেটগুলো। একটা বিমানের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করত সেটাকে, ডানাতে আর পাশে টোকা মারত, যেন জিনিসটা যন্ত্র নয়, সুন্দর ফিটফাট জাতঘোড়া একটা। অবশেষে সার বেঁধে দলটি দাঁড়াত, রওনা হতে

হবে এবার। প্রত্যেকেই ব্যগ্র নিজের দক্ষতা পরখ করতে, প্রথমে কে উঠবে তাই নিয়ে অল্প বাগবিতণ্ডা শুরু হত। স্তুচকভকে প্রথমে ডাকল ইনস্ট্রাকটর। দীপ্ত হয়ে উঠল তার মুখ, চতুরভাবে হাসল, উত্তেজনায় শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পারাস্যুট এ'টে ককপিটের ঢাকনাটা টেনে দিল সে।

গর্জিয়ে উঠল ইঞ্জিন, বিমানক্ষেত হয়ে তীরের মত গেল বিমানটা, সূর্যালোকে রামধনুর মত ঝিকঝিকে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের রেশ পিছনে রেখে এক নিমেষে আকাশে উঠল, আলোয় ঝকঝক করছে ডানাদুটো। বিমানক্ষেতের উপরে অপরিসর বক্র রেখা আঁকল স্তুচকভ, সুন্দরভাবে হেলল কয়েকবার, উল্টে গেল তারপর, আর নির্দিষ্ট সংখ্যা কসরৎ দেখিয়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে, হঠাৎ স্কুলের ছাতের উপর থেকে তীরের মত বেরিয়ে এসে, ইঞ্জিনের গর্জনে, বিমানক্ষেতের উপর দিয়ে এক ঝটকায় আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, প্রতীক্ষারত শিক্ষার্থীদের টুপি আর একটু হলে উড়ে যেত। যাই হোক, শীগগিরই ফিরে এল সে, ধীরেসুস্থে নিচের দিকে এসে সুকৌশলে নামল। ককপিট থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল সে, উত্তেজিত উচ্চকিত আনন্দে অধীর, দুষ্টুমিতে সফল খুসি ছোকরার মত।

'যন্ত্র নয় এটা, নিছক ভায়োলিন, সত্যি বলছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে বলল স্তুচকভ, বেপরোয়াভাবে চালানোর জন্য ইনস্ট্রাকটরের বকবকানির বাধা দিয়ে। 'ওটাতে চাইকভস্কির সুর বাজানো যায়, সত্যি বলছি!' বলিষ্ঠ হাতে মেরেসিয়েভকে জড়িয়ে বলে উঠল, 'বেঁচে থাকা ভালো, আলিওশা!'

সত্যি অদ্ভুত ভালো বিমানটি। সে বিষয়ে সবাই একমত। মেরেসিয়েভের পালা এল। পাদানিতে পা বেঁধে শূন্যে উঠল সে, আর হঠাৎ মনে হল এই ঘোড়াটি ওর পক্ষে বড়ো বেশী তেজী, পা নেই তার, অতি সাবধানে চালাতে হবে। উপরে ওঠবার সময়ে যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগের সেই পরিপূর্ণ চমৎকার অনুভূতিটি, যেটা বিমান চালানোর আনন্দের উৎস, অনুভব করেনি সে। বিমানটি চমৎকারভাবে গঠিত। প্রতিটি সঞ্চালনে স্টিয়ারিং গিয়ারে হাতের স্বল্প স্পন্দনে সাড়া দিয়েই তক্ষুণি যথাযথভাবে যায়। সুরে-বাঁধা ভায়োলিনের মতই ওটার সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। আর এটাতেই তার চরম লোকসানের কথাটা তীব্রভাবে অনুভব করল আলেক্সেই, নকল পায়ের পাতায় সাড়া দেবার ক্ষমতা নেই; ও বুঝতে পারল যে এ-রকম একটা বিমানে নকল পায়ের পাতা, তা যতই ভালোভাবে বানানো হোক না কেন, যতই না অভ্যেস করা হোক, কখনোই আসল জীবন্ত নমনীয় পায়ের অভাব পূর্ণ করতে পারে না।

সহজে অবলীলাক্রমে হাওয়া কেটে চলেছে বিমানটি, স্টিয়ারিং-গিয়ারের প্রতিটি নড়নে সাড়া দিচ্ছে, কিন্তু বিমানটিকে ভয় হচ্ছে আলেক্সেই'র। লক্ষ্য করল যে ঘোরার সময়ে পায়ের পাতা ঠিক সময়ে পড়ছে না, যে সূষম সমন্বয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত বৈমানিকদের আয়ত্তাধীন হয়, সে ভাবটা আসছে না। দেরীর জন্য হঠাৎ ঘূরপাকে পড়তে পারে বিমানটা, সেটা হতে পারে মারাত্মক। নিজেকে পা বাঁধা ঘোড়ার মত মনে হল আলেক্সেই'র। ভীরু সে নয়, মৃত্যুর ভয় করে না, ওঠবার সময়ে পারাসুটটা ঠিক আছে কিনা সেটা পর্যন্ত দেখেনি; কিন্তু ওর আশঙ্কা যে সামান্য ভুল করলেও বিমান বাহিনী থেকে হয়ত সরিয়ে দেবে, তার প্রিয় কাজ আর কখনো করতে পারবে না। তাই অত্যন্ত সাবধানে চালাল সে, আর বিমানটি নামাবার সময়ে মুষড়ে পড়ল; সাড়াবিহীন পায়ের পাতার জন্য এত অপটুভাবে নামাল যে বিমানটি বরফের উপরে কয়েকবার বেঢপভাবে লাফাল।

ভ্রূকুটিকুটিল মুখে নিঃশব্দে ককপিট থেকে নামল আলেক্সেই। অস্বস্তি গোপন করে ওর বন্ধুরা, ইনস্ট্রাকটরটি পর্যন্ত, ওকে প্রশংসা করল আর অভিনন্দন জানাল, কিন্তু ওদের অনুগ্রহের ভাবে অপমান বোধ করল আলেক্সেই। হাত অধীরভাবে নেড়ে পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে বরফের উপর দিয়ে চলল ধূসর স্কুল বাড়িটার দিকে। জঙ্গী বিমান এতদিন পরে চেপে বিফল হওয়া! মার্চের সেই সকালে চোট-খাওয়া বিমানটি পাইনগাছের মাথায় পড়ার সেই সর্বনেশে দুর্ঘটনার পর সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত এটা। মধ্যাহ্ন-ভোজনে গেল না সেদিন, রাত্রের শেষ খানায় অনুপস্থিত রইল। স্কুলের বিধিতে দিনের বেলায় শয়নাগারে থাকা শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে বারণ, সে বিধির খেলাপ করে বুটশুদ্ধ ও বিছানায় শুয়ে রইল, হাতে মাথা রেখে। ওর ব্যথার কথা জানত যারা, কি ভারপ্রাপ্ত অফিসার কি কর্তারা পাশ দিয়ে যাবার সময়ে কিছু বলল না ওকে। স্ত্রুচকভ একবার এসে কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু সাড়া না পেয়ে সমব্যথায় মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

ঘর ছেড়ে স্ত্রুচকভ চলে যাবার প্রায় পরমুহূর্তেই এলেন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল কাপুস্তিন, স্কুলের রাজনৈতিক অফিসার তিনি। খর্বদেহ কুৎসিৎ চেহারার লোক, চোখে মোটা চশমা, বেমানান ইউনিফর্ম থলের মত শরীর থেকে ঝুলে পড়েছে। আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা নিয়ে ওঁর বক্তৃতা শুনতে শিক্ষার্থীরা ভালোবাসে, সে সময়ে এই বেঢপ চেহারার মানুষটি ওদের মনে গর্ব জাগাত যে এই মহাযুদ্ধের অংশীদার তারা। কিন্তু অফিসার হিসেবে

তাঁর সম্বন্ধে উ‍ঁচু ধারণা ছিল না ওদের, মনে করত বেসামরিক লোক একটি, বিমানবিদ্যা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, দৈবক্রমে ঢুকে পড়েছেন বিমান বাহিনীতে। মেরেসিয়েভকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাপুস্তিন ঘরের চারিদিকে একবার তাকালেন, জোরে ঘ্রাণ নিয়ে চটে উঠে হঠাৎ বলে উঠলেন:

'কোন বেটা সিগারেট খেয়েছে এখানে? ধূমপানের জন্যে ত আলাদা ঘর আছে। এটার মানে কী, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট?'

'আমি সিগারেট খাই না,' বিছানা থেকে না উঠে নিস্পৃহভাবে জবাব দিল আলেক্সেই।

'আপনি এখানে শুয়ে আছেন কেন? স্কুলের নিয়ম কি জানেন না? ঊর্ধ্বতন কেউ এলে উঠে দাঁড়ান না কেন?.. উঠে দাঁড়ান।'

আদেশ করেননি তিনি। বরঞ্চ, বেসামরিক লোকের মত শিষ্টভাবে কথাটা বলা হয়েছিল। মেরেসিয়েভ অবসন্নভাবে কথাটা মেনে উঠে খাটের পাশে দাঁড়াল।

'বেশ, বেশ, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' উৎসাহ দিয়ে বললেন কাপুস্তিন। 'এবারে বসুন, কথা আছে।'

'কী বিষয়ে?'

'আপনার বিষয়ে। চলুন বাইরে যাই। পাইপ খেতে চাই, এখানে সেটা বারণ।'

স্বল্পালোকিত করিডরে গিয়ে জানলার কাছে দুজনে দাঁড়াল, ব্ল্যাক-আউটের জন্য ইলেকট্রিক বালবগুলোয় নীল রং-দেওয়া। পাইপে টান দিচ্ছেন কাপুস্তিন, প্রতিটি টানে চওড়া চিন্তাকুল মুখ আলো হয়ে উঠছে।

'আপনার ইনস্ট্রাকটরকে বকতে চাই আমি,' তিনি বললেন।

'কেন?'

'উপরওয়ালাদের অনুমতি বিনা আপনাকে উড়তে দেওয়ার জন্যে... ওরকমভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? সত্যি কথা বলতে, আপনার সঙ্গে আগে কথা না বলার জন্যে আমাকেই বকা উচিত। আমার সময় হয় না, সব সময়ে ব্যস্ত থাকি। আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু... যা থেকে, ও কথাটা ছেড়ে দেওয়া যাক। শুনুন, মেরেসিয়েভ, আপনার পক্ষে বিমান চালানো খুব সহজ ব্যাপার নয়, আর তাই ঠিক করেছি ইনস্ট্রাকটরকে উচিত শাস্তি দেব।'

কিছু বলল না আলেক্সেই। কী ধরনের লোক পাইপ টানছে ভাবল। স্কুলের জীবনে অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে, সেটা তাঁকে না বলায় ওঁর

আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে বিরক্ত একটি আমলাতান্ত্রিক জীব? বৈমানিকদের বাছাই করা হয় যে সব নিয়মাবলী অনুসরণ করে, শারীরিক অক্ষমতার জন্য বিমান চালানো নিষিদ্ধ করা একটি বিধি তাতে আছে, সেটা কি আবিষ্কার করেছেন এই ক্ষুদে অফিসারটি? কিম্বা নিজের আধিপত্য দেখাবার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত কোন খামখেয়ালী লোক? কী চান উনি? মেরেসিয়েভ এমনিতেই দারুণ মুষড়ে গিয়েছে, নিজের গলায় দড়ি দেবার মত অবস্থা, এ সময়ে ঝট করে কেন এসেছেন?..

মনটা তার একেবারে বিষিয়ে উঠেছে, কিন্তু অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করল আলেক্সেই। অনেক দিনের দুর্ভোগ তাড়াতাড়ি কোন অনুমানে না আসতে তাকে শিখিয়েছে। তা ছাড়া এই কুৎসিৎ মানুষটির মধ্যে একটা কিছু আছে যেটা তাকে ক্ষণিকের জন্য মনে করিয়ে দিল কমিসার ভরোবিওভের কথা, যাকে মেরেসিয়েভ বলত মানুষের মত মানুষ। কাপুস্তিনের পাইপের আগুন জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে, নীলচে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে তার চওড়া মুখ, মেদল নাক, আর প্রাজ্ঞ তীক্ষ্ণ চোখ। তিনি বলে চললেন:

'শুনুন, মেরেসিয়েভ। আপনাকে সাধুবাদ করছি না কিন্তু যাই বলুন না কেন, সারা দুনিয়াতে আপনিই একমাত্র লোক যে বিনা পায়ে জঙ্গী বিমান চালাতে পারে। একমাত্র লোক!' পাইপের নলটা ঘুরিয়ে বের করে ফুটো দিয়ে একটা বালবের ক্ষীণ আলোর দিকে তাকালেন তিনি, মাথা নাড়লেন বিব্রতভাবে। "লড়াই"এর দলে আপনার ফিরে যাবার ইচ্ছের কথা বলছি না। ওটা বীরের মত কাজ নিশ্চয়ই, কিন্তু এমন বিশেষ কিছু নয়। যা সময় পড়েছে, সবাই জয়লাভের জন্যে যথাসাধ্য করতে চায়... হতচ্ছাড়া পাইপটার কী হল?'

পাইপের নলটি আবার পরিষ্কার করা শুরু হল, মনে হল কাজটায় একেবারে মগ্ন তিনি; কিন্তু ভাবী অমঙ্গলের অস্পষ্ট বোধে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আলেক্সেই কাপুস্তিনের বক্তব্য শোনার জন্য উদগ্রীব। পাইপ নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি বলে চললেন, কথাগুলোয় কী প্রতিক্রিয়া হবে সে বিষয়ে উদাসীন যেন:

'এটা শুধু সিনিয়র লেফটেনাণ্ট আলেক্সেই মেরেসিয়েভের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। কথাটা হল এই, আপনার পায়ের পাতা নেই, আপনি যে জিনিসটা আয়ত্ত করেছেন সেটা এত কাল সারা পৃথিবী ভাবত শুধু সম্পূর্ণ

সুস্থ মানুষই পারে, তাও এক শ'র মধ্যে একজন। আপনি শুধু নাগরিক মেরেসিয়েভ নন, বিরাট পরীক্ষা চালিয়েছেন আপনি... যা হোক, এতক্ষণে এটা আবার ঠিক হয়েছে দেখছি, নিশ্চয় কিছু একটা নলটাতে আটকিয়েছিল... আর তাই বলছি, আপনাকে সাধারণ বৈমানিক হিসেবে নিতে আমরা পারিনি, নেবার কোন অধিকার নেই আমাদের, বুঝেছেন? গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষার অবতারণা করেছেন আপনি, যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু কী ভাবে? সেটা আপনাকেই বলতে হবে। আপনাকে কী ভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি?'

পাইপে আবার তামাক ভরিয়ে ধরানো হল, আবার কখনো দীপ্ত, কখনো অদৃশ্য লাল আভায় ওঁর চওড়া মুখ আর মেদল নাক অন্ধকার ভেদ করে দেখা যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

তিনি কথা দিলেন যে স্কুলের অধিকর্তার সঙ্গে কথা বলে মেরেসিয়েভের জন্য অতিরিক্ত ওড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন, আর বললেন নিজের জন্য একটি তালিমি কর্মসূচী আলেক্সেই ঠিক করে নিলে ভালো হয়।

'কিন্তু তাতে ত অনেক বেশী পেট্রল লাগবে!' অনুশোচনার সুরে বলল আলেক্সেই; কী সহজভাবে এই খর্বদেহ কুৎসিৎ চেহারার লোকটি তার সমস্ত সন্দেহের অবসান করে দিয়েছেন তাতে অবাক হয়ে গিয়েছে ও।

'পেট্রল খুব দামী জিনিস অবশ্য, বিশেষ করে এ সময়ে। আমরা ত টিপে টিপে পেট্রল দিই। কিন্তু পেট্রলের চেয়েও দামী জিনিস আছে,' উত্তর দিলেন কাপুস্তিন, আর পাইপের ছাই জুতোর গোড়ালিতে সযত্নে ঠুকে বের করলেন।

পরের দিন আলাদাভাবে শিখতে শুরু করল মেরেসিয়েভ। আর সেটা করল হাঁটা, দৌড়, আর নাচ যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অভ্যেস করেছিল শুধু সেভাবে নয়, অনুপ্রাণিতের মত। বিমান চালানোর কৌশল, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল সে, ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করে দেখল রীতিটাকে, প্রত্যেকটি আলাদা করে আয়ত্তে আনার প্রয়াস করল। যৌবনে যেটা সহজাতভাবে শিখেছিল, সেটার অধ্যয়ন, হ্যাঁ অধ্যয়ন শুরু হল। আগে যেটা অনুশীলন আর অভ্যাস দ্বারা শিখেছিল সেটা বুদ্ধির সাহায্যে আয়ত্তে আনল এবার। বিমান চালানোর পদ্ধতিকে মনে মনে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে, প্রত্যেকটির কসরৎ বিশেষভাবে শিখে নিল, আর পায়ের পাতার সব অনুভূতি চালান করল গাঁটে।

অত্যন্ত কঠিন আর ধৈর্যসাপেক্ষ কাজটা, ফলাফল এত সূক্ষ্ম যে নজরে প্রায় পড়ে না। যাই হোক, প্রতিবার ওড়ার সময়ে ওর অনুভূতি হতে লাগল যে বিমানটি শরীরের অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আরো শুনছে ওর কথা।

'কেমন চলেছে, ওস্তাদ?' দেখা হলেই জিজ্ঞেস করত কাপুস্তিন।

উত্তরে বুড়ো আঙুল তুলে দেখাত মেরেসিয়েভ। অত্যুক্তি নয় সেটা। কাজ এগোচ্ছে, মন্থরভাবে হয়ত, কিন্তু এগোচ্ছে যে সেটা নিশ্চিত। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, বিমানে উঠে তেজী ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ায় চাপা দুর্বল সওয়ারের মত আর মনে হয় না নিজেকে। নিজের দক্ষতায় বিশ্বাস আবার ফিরে এল, সে বিশ্বাসটা যেন সংক্রামিত হল বিমানেও, আর সেটা জীবন্ত সত্তার মত, দক্ষ সওয়ারের হাতে ঘোড়ার মত আরো বাধ্য হল, আস্তে আস্তে নিজের সমস্ত গুণ উন্মুক্ত করে দিল আলেক্সেই'র কাছে।

১১

অনেক দিন আগে বাল্যকালে ভলগার খাঁড়িতে প্রথম মসৃণ স্বচ্ছ বরফের উপরে স্কেট করা শিখতে বেরিয়েছিল আলেক্সেই। প্রকৃতপক্ষে স্কেট ছিল না ওর; একজোড়া কিনে দেবার সামর্থ্য ছিল না মায়ের। একজন কামারের জামাকাপড় ধুয়ে দিতেন তিনি, তাঁর অনুরোধে একজোড়া ছোট কাঠের কুঁদো বানিয়ে দিয়েছিল সে, নিচে ধাতুর ফালি, পাশে ছেঁদা।

দড়ি আর কাঠের টুকরোর সাহায্যে কুঁদোদুটো তালি-দেওয়া পুরোনো ফেল্টের বুটে লাগায় আলেক্সেই। তারপরে গেল নদীতীরে। পাতলা নরম বরফে মিঠে মচমচ শব্দ। কামিশিনের কাছাকাছি যে সব বাচ্চারা থাকত সবাই আনন্দে হট্টগোল করে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে, ক্ষুদে শয়তানের মত তীরের মত চলেছে, এ-ওকে ধাওয়া করছে, স্কেটে ভর দিয়ে লাফাচ্ছে আর নাচছে। ওদের কসরৎ আপাতসহজ, কিন্তু বরফে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল বরফটা পিছলে গেল আর চিৎ হয়ে পড়ে গেল আলেক্সেই।

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল, খেলার সঙ্গীরা যদি দেখে ফেলে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে সেই ভয় তার। আবার চেষ্টা করল স্কেট করতে, যাতে চিৎ হয়ে না পড়ে তার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে, কিন্তু এবার পড়ল নাক বরাবর। আবার তাড়াতাড়ি উঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, পাদুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, কেন পড়ে যাচ্ছে ভাববার চেষ্টা করে অন্য ছেলেরা কী ভাবে স্কেট করছে

চেয়ে চেয়ে দেখল। এবারে বুঝল যে সামনে কিম্বা পিছনে বেশী ঝুঁকলে চলবে না। খাড়া হয়ে থাকার চেষ্টা করে, পাশাপাশি পা ফেলল কয়েকবার, এবার একপাশে পড়ল সে। আর চলল পড়া, আবার ওঠা, আবার পড়া, আবার ওঠা, সূর্যাস্ত পর্যন্ত; বাড়ি যখন ফিরল তখন বিরক্তিতে মা দেখলেন ছেলের সারা গায়ে বরফ, ক্লান্তিতে পা তার কাঁপছে।

পরের দিন সকালে আবার আলেক্সেই গেল রিঙ্কে। এবারে তার গতি আরো সহজ, আগেকার মত বারবার পড়ছে না, এক দৌড়ে কয়েক মিটার পর্যন্ত যেতে পারছে; কিন্তু ওই পর্যন্ত, প্রদোষ হয়ে এল, তখনো তার বেশী অগ্রসর হতে পারল না।

কিন্তু একদিন — দিনটার কথা সে কখনো ভোলেনি, কনকনে দিন, ঝোড়ো হাওয়া চকচকে তুষারের উপরে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে -- দৌড় শুরু করল সে, আর অবাক হয়ে দেখল যে বেশ এগিয়ে যাচ্ছে, যত মোড় নিচ্ছে তত দ্রুতগতিতে স্বচ্ছন্দে। আগে পড়েছে, চোট খেয়েছে, উঠে আবার চেষ্টা করেছে, সে সময়ে অলক্ষিতে অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতা, ছোটখাটো যত অভ্যাস আর চাল মনে হল হঠাৎ এক হয়ে গিয়েছে, পা আর পায়ের পাতা ভালোভাবে পড়ছে, মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর আর বালকসুলভ, কৌতুকপ্রিয় একগুঁয়ে সত্তা তার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, প্রীতিকর আত্মবিশ্বাসে ভরে যাচ্ছে।

ঠিক এরকমটি তার ঘটল এখন। দৃঢ় অধ্যবসায়ে বিমান চালাল অনেক বার, বিমানটার সঙ্গে মিশে একাকার হবার প্রচেষ্টায়, নকল পায়ের পাতার ধাতু আর চামড়া ভেদ করে ওটিকে অনুভব করার ইচ্ছায়। মাঝেমাঝে মনে হত চেষ্টাটা সফল হচ্ছে, দারুণ খুসি হয়ে উঠত ও। একটা কসরৎ করার চেষ্টা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোধ হল চালটায় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটেছে, মনে হল বিমানটা ভীত, হাতছাড়া হবার চেষ্টা করছে। আর আশাভঙ্গের বিস্বাদ মুখে আলেক্সেই আবার রুটিন মাফিক বিরস চর্চা শুরু করত।

মার্চের একটি বরফ-গলা দিনে একটি সকালের মধ্যেই বিমানক্ষেতের তুষার কালো হয়ে বসে গেল, ফুঁয়ো ফুঁয়ো বরফে বিমানের চাকায় গভীর দাগ পড়ছিল; আলেক্সেই তার জঙ্গী বিমানে আকাশে উঠল। ওঠবার সময় পাশ থেকে হাওয়া গতিপথ থেকে হটিয়ে দিচ্ছে বিমানটাকে, বাধ্য হয়ে আলেক্সেই চেষ্টা করল সেটা যাতে না হয়। গতিপথে বিমানটাকে ফিরিয়ে আনবার সময়ে হঠাৎ বোধ হল ওটা তার বশ মেনেছে, সমস্ত সত্তা দিয়ে সে অনুভব

করতে পারে ওটাকে। অনুভূতিটা বিদ্যুৎ ঝলকের মত, প্রথমে বিশ্বাস হল না। এতবার নিরাশ হয়েছে যে বিশ্বাস করা শক্ত যে এখন তার কপাল খুলেছে। এক ঝটকায় ডাইনে ঘোরালো বিমানটাকে আলেক্সেই, নিখুঁত ও বাধ্যভাবে ওটা মোড় নিল। ভলগার সেই ছোট্ট খাড়িতে কালো খরখরে বরফের উপরে বাল্যকালের ঠিক সেই অনুভূতিটা ফিরে এল। মনে হল ধূসর দিন আলো হয়ে উঠেছে। আনন্দে বুক ঢিপঢিপ করছে, ভাবাবেগে গলা প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

তালিম নেবার অক্লান্ত প্রচেষ্টার সমস্ত ফলাফলের পরখ হল অলক্ষ্য একটি লাইনে। অতিক্রম করেছে সে লাইনটা, আর সেই সব কঠিন পরিশ্রমের দিনগুলোর ফলাফল আজ অনায়াসে বিনা ক্লেশে ভোগ করছে সে। যে মূল জিনিসটি অনেক দিন নিষ্ফলভাবে পেতে চেয়েছিল সেটা আজ হাতের মুঠোয়: বিমানটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিবোধ এসেছে, মনে হচ্ছে ওটা নিজের শরীরেরই বিস্তৃতি। এমন কি অসাড় কঠিন নকল পায়ের পাতাদুটো পর্যন্ত বাধা দিচ্ছে না সে অনুভূতিতে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সচকিত আলেক্সেই কয়েকবার ক্ষিপ্রভাবে মোড় নিল, তারপর বৃত্তাকারে নেমে উপরে ওঠা, সেটা সম্পূর্ণ হতে না হতেই বিমানটিকে ঘুরপাকে ফেলল। শিস দিয়ে সজোরে পাক দিচ্ছে জমি। অবিরত বৃত্তে একাকার হয়ে গিয়েছে বিমানক্ষেত স্কুলের বাড়ি আর আবহাওয়া কেন্দ্রটির পাশে ডোরাকাটা ফেঁপে ওঠা উড়ন্ত থলিটা। পাকা হাতে ঘুরপাক ক্ষান্ত করে আলেক্সেই সংকীর্ণ বৃত্তে নেমে আবার উপরে উঠল। আর শুধু এখনি ওর কাছে ধরা পড়ল বিখ্যাত "লাভচ্‌কিন-৫"এর সমস্ত জানা এবং অজানা গুণাবলী। অভিজ্ঞ হাতে কী চমৎকার চলে বিমানটি! স্টিয়ারিং-গিয়ারের প্রতিটি সঞ্চালনে দ্রুত সাড়া দেয়, জটিল সব কসরৎ অবলীলাক্রমে করে, উপরে ওঠে রকেটের মত, সংহত চটপটে ক্ষিপ্র।

টলতে টলতে মাতালের মত ককপিট থেকে নামল আলেক্সেই, বোকার হাসিতে বদন বিস্তৃত। চোখে পড়ল না ক্রুদ্ধ ইনস্ট্রাকটরটিকে, কানে গেল না তার বকুনি। বকতে দাও ওকে! আটক ঘর? বহুৎ আচ্ছা, আটক ঘরে এক প্রস্ত থেকে আসতে সে তৈয়ার। কী এসে যায় তাতে? একটা জিনিস জলের মত স্পষ্ট এখন: বৈমানিক সে, সুদক্ষ একজন বৈমানিক। শিক্ষার জন্য যে অতিরিক্ত পেট্রল খরচ করা হয়েছে বৃথায় যায়নি সেটা। সে ঋণ শোধ করবে সে অনেক মোটা সুদে যদি ওরা শুধু লড়াই'এ ফিরে যেতে দেয় তাকে!

আস্তানায় ওর জন্য অপেক্ষা করছিল আর একটি সুখের ব্যাপার: বালিশের উপরে দেখল গভজ্‌দেভের চিঠি। গন্তব্যে আসার আগে কোথায় কত দিন আর কার পকেটে ঘোরাফেরা করে ওটা বলা কঠিন, খামটা কুঁচকে গিয়েছে, তেলের দাগ মাখা। তাই খাসা নতুন খামে পুরে চিঠিটা আনিউতা পাঠিয়েছে।

ট্যাঙ্ক-অফিসার জানিয়েছে বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার তার ঘটেছে। একটা জার্মান বিমানের ডানায় তার মাথায় চোট লাগে! বাহিনীর হাসপাতালে এখন সে, যদিও দুএকদিনের মধ্যে ছাড়া পাবে নিশ্চয়। অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে এইভাবে। জার্মান ষষ্ঠ বাহিনী স্তালিনগ্রাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ঘেরাও হবার পরে পিছু-হটা জার্মানদের লাইন ভেদ করে গভজ্‌দেভের ট্যাংক-বাহিনী স্তেপ হয়ে ওদের পিছনে গিয়ে পড়ে; সে হামলায় একটি ট্যাংক ব্যাটেলিয়নের ভার ছিল তার হাতে।

হামলাটি দারুণ! বিনামেঘে বজ্রপাতের মত সেই ইস্পাত বাহিনী জার্মানদের পিছনে, গড়বন্দী গ্রামে আর রেলওয়ে জংসনে ফেটে পড়ে। রাস্তায় আক্রমণ করে ট্যাংকগুলো সামনে এসে-পড়া সৈন্যদের গুলি করে, পিষে দেয়, আর রক্ষী জার্মানদলের অবশিষ্টাংশ পালিয়ে গেলে ট্যাংক আর মোটরচালিত পদাতিক বাহিনী - - তারা ট্যাংক চেপে যাচ্ছিল - গোলাবারুদের ঘাঁটি, সেতু, টানা রেল আর জংসন উড়িয়ে দেয়, ফলে পিছু-হটা জার্মানদের ট্রেনগুলো আটকা পড়ে। শত্রুপক্ষের রসদ থেকে পেট্রল আর খাবার নিয়ে আবার তারা এগিয়ে গেল, যাতে জার্মানরা সামলে নেবার সময় না পায়, কিম্বা অন্তত হদিশ না পায় ট্যাংকগুলো এর পরে কোন দিকে যাবে।

“বুদিওনির অশ্বারোহী বাহিনীর মত খরগতিতে স্তেপ হয়ে আমরা এগোলাম, আলিওশা! আর ফ্যাশিস্টদের কী নাজেহালটাই না হল! বিশ্বেস করবে না, মাঝেমাঝে তিনটে ট্যাংক আর জার্মানদের সাঁজোয়া গাড়ি একটা নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আর রসদ-ঘাঁটি দখল করলাম। যুদ্ধে, আলিওশা, আতঙ্কিত হয়ে যাওয়াটা বড়ো একটা ব্যাপার। শত্রুপক্ষের ঘাবড়ে যাওয়াটা আক্রমণকারীদের কাছে দুটো পুরো ডিভিশনের সামিল। শুধু কৌশলে জিইয়ে রাখতে হয় সে আতঙ্ক, অনেকটা তাঁবুর আগুনের মত: ইন্ধন — অপ্রত্যাশিত নানা আঘাত, অবিরত যোগাতে হয়, যাতে ওটা মিইয়ে না যায়। জার্মানদের লোহার খোলস ভেদ করে আমরা দেখলাম ভিতরটা অসার নাড়িভূঁড়িতে ঠাসা, আর কিছু নেই। ছুরিতে মাখন কাটার মত অনায়াসে আমরা ওদের ভেদ করে এগিয়ে গেলাম...

“...আর বোকার মত যেটা আমার হল সেটা ঘটল এই ভাবে। আমাদের প্রধান আমাদের এক সঙ্গে ডেকে জানালেন যে খবর-নেওয়া একটা বিমান থেকে বার্তা এসেছে যে অমুক জায়গায় বেশ বড়ো একটি বিমান-ঘাঁটি আছে, প্রায় তিনশ বিমান, তেল আর রসদ। খুসিতে গোঁফ মুচড়ে বললেন, ‘গভজ্‌দেভ আজ রাত্রে ওখানে চলে যাও। চুপিচুপি যেও, গুলি ছুঁড়ো না যেন, এমন ভাবে যেও যেন জার্মান তোমরা, আর বেশ কাছে এসে পড়লে ঝট করে ওদের উপরে গিয়ে পড়বে, সমস্ত কামান এক সঙ্গে ছেড়ো, ওরা কিছু জানার আগে সব লণ্ডভণ্ড করে দিও; আর দেখো একটাও হারামজাদা পালাতে না পারে যেন।’ আমার ব্যাটেলিয়নের উপরে ভারটা পড়ল, আর একটা ব্যাটেলিয়নের ভারও আমাকে দেওয়া হল। বাকি সবাই গেল রস্তোভের দিকে।

“মুরগীর খাঁচায় শেয়ালের মত আমরা বিমান-ঘাঁটিতে পে'ছিলাম। বিশ্বেস করবে না, আলিওশা, ঘাঁটির কাছে ট্র্যাফিক যারা নিয়ন্ত্রণ করছে একেবারে তাদের কাছে পর্যন্ত সটান গেলাম। কেউ থামাল না আমাদের — কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, কিছু দেখতে পায়নি ওরা, শুধু ইঞ্জিনের শব্দ আর চাকার ঘর্ঘর কানে গিয়েছে। ভেবেছিল আমরা জার্মান। তারপর আমরা লণ্ডভণ্ড শুরু করলাম! মজার ব্যাপার, আলিওশা! সারি সারি দাঁড়ানো বিমানগুলো। লৌহাবরণ ভেদকারী গোলা ছুঁড়লাম আমরা, আর প্রত্যেকটা গোলা অন্তত ছটা বিমান ভেদ করে গেল। কিন্তু বুঝলাম কাজটা ঠিক এ ভাবে সম্পন্ন হবে না; বৈমানিকদের কয়েকজন, সাহসী তারা, ইঞ্জিন চালাতে শুরু করল। ট্যাঙ্কের ঢাকনা বন্ধ করে বিমানগুলোর পিছন দিকে আমরা ধাক্কা দিতে লাগলাম। যানবাহনের বিমান সব, প্রকাণ্ড জিনিস, ইঞ্জিনগুলো নাগালের বাইরে, তাই পিছনে আক্রমণ করা হল, লেজ বাদ দিয়ে ত ওগুলো উঠতে পারবে না, যেমন ইঞ্জিন বাদ দিয়ে ওড়া চলে না। আর তাই করতে গিয়ে কাত হলাম। ঢাকনা খুলে মাথা বের করে উ'কি মেরে দেখছি, ঠিক সে সময়ে ট্যাংকটা একটা বিমানের উপরে গিয়ে পড়ল। ডানার এক টুকরোয় ঘা লাগল মাথায়। ভাগ্যিস, হেলমেটটার জন্য আঘাতটার তীব্রতা কমে যায়, নইলে ত পটল তুলতাম। এখন সবকিছু ঠিক, শীগগিরই হাসপাতাল ছেড়ে নিজের দলে আবার ফিরে যাব। আসল গণ্ডগোল হল এই যে হাসপাতালে ওরা আমার দাড়িটা কেটে দিয়েছে। অনেক কষ্টে গজিয়েছিলাম ওটা — খাসা চওড়া দাড়ি — কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে ওরা কেটে দিল। যাক গে, গোল্লায় যাক দাড়ি! মনে হয়, যুদ্ধ শেষ হবার আগে আর একটা গজাতে পারব, কুৎসিত

চেহারাটা ঢাকা পড়বে। তোমাকে কিন্তু বলা দরকার, আলিওশা, কী কারণে জানি না দাড়িটা আনিউতার পছন্দ নয়, প্রতি চিঠিতে এই নিয়ে আমাকে ও বকে।"

দীর্ঘ চিঠি। পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হাসপাতাল জীবনের একঘেয়েমী কমাবার জন্য গভজ্‌দেভ লিখেছে। প্রসঙ্গত, শেষের দিকে লিখেছে যে স্তালিনগ্রাদের কাছে ওরা পদাতিকের মত লড়াই চালিয়েছিল—ট্যাংকগুলো হাতছাড়া হয়, নতুন ট্যাঙ্কের জন্য ওরা অপেক্ষা করছে সে সময়ে বিখ্যাত মামায়েভ কুর্গান এলাকায় স্তেপান ইভানভিচের সঙ্গে ওর দেখা হয়। একটি কোর্সের পাঠ শেষ করে বৃদ্ধ এখন নন-কমিশন্‌ড অফিসার — সার্জেণ্ট-মেজর — ট্যাংক-বিরোধী রাইফেল দলের একটি পল্টনের ভার তার হাতে। কিন্তু স্নাইপারের অভ্যাস এখনো ছাড়েনি। গভজ্‌দেভকে বলেছে যে তফাৎটা হল এই — এখন বড়ো শিকারের খোঁজে থাকে সে — ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে রোদ পোয়াচ্ছে এমন সব অনবহিত ফ্যাশিস্ট নয়, জার্মান ট্যাঙ্কের সন্ধানে থাকে, বলিষ্ঠ ধূর্ত জানোয়ার ওগুলো। কিন্তু এমন কি সেগুলোর শিকারেও বৃদ্ধ পরিচয় দেয় সাইবেরিয়ান শিকারীর সমস্ত কৌশল, পাথরের মত অনড় ধৈর্য, সহনশীলতা আর অদ্ভুত, লক্ষ্যভেদী নিশানা। যুদ্ধে পাওয়া এক বোতল পচা মদ এতদিন সযত্নে সরিয়ে রেখেছিল মিতব্যয়ী স্তেপান ইভানভিচ, দেখা হওয়াতে দুজনে শেষ করে সেটাকে, পুরোনো বন্ধুদের খবর নেয় বৃদ্ধ। মেরেসিয়েভকে নিজের কথা মনে করিয়ে দিতে বলে, দুজনকে নিমন্ত্রণ জানায় যে বেঁচে থাকলে যুদ্ধের পর যেন ওর যৌথখামারে আসে, কাঠবেড়ালী আর হাঁস শিকার করা হবে তখন।

চিঠিটা আশ্বস্ত করল আলেক্সেইকে বটে, কিন্তু বিষণ্ণ লাগল ওর। ৪২ নং ওয়ার্ডের সব বন্ধুরাই অনেক দিন ধরে আবার লড়াই করছে। গ্রিশা গভজ্‌দেভ আর বুড়ো স্তেপান ইভানভিচ এখন কোথায়? কেমন চলছে ওদের? যুদ্ধের হাওয়ায় কোথায় গিয়ে পড়েছে ওরা? এখনো বেঁচে আছে কি? ওলিয়া কোথায়?..

মনে পড়ল কমিসার ভরোবিওভের সেই কথাটা — সৈন্যদের চিঠি তারার আলোর মত, পেঁছিতে অনেক সময় নেয়, হয়ত তারাটা নিভে গেছে অনেক দিন আগে, কিন্তু তার দীপ্ত প্রসন্ন আলো কাল ভেদ করে আসতে থাকে, যে জ্যোতিষ্কের আর অস্তিত্ব নেই তার স্নিগ্ধ বর্ণচ্ছটা আনে আমাদের কাছে।

চতুর্থ খণ্ড

১

১৯৪৩। গ্রীষ্মের একটি উত্তপ্ত দিনে পুরোনো ট্রাক একটা দ্রুতগতিতে চলেছে পথ বেয়ে: অগ্রগামী সোভিয়েত বাহিনীর মালগাড়িতে দলিত পরিত্যক্ত মাঠের পথ, লালচে আগাছায় কীর্ণ। চোরা গর্তে ঠোক্কর খেয়ে, নড়বড়ে শরীরে আওয়াজ তুলে ট্রাকটা চলেছে ফ্রণ্ট লাইনের দিকে। গাড়ির দুপাশটা ধুলোয় ভরা, ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, শাদা অক্ষরে লেখা কথাগুলো কোনক্রমে চোখে পড়ে: "ফিল্ড পোস্টাল সার্ভিস।" গাড়িটা ছুটে চলেছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে ধূসর-ধুলোর বৃহৎ রেখা, গুমোট স্তব্ধ হাওয়ায় সে রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ডাকের থলে আর হালের খবরের কাগজের বাণ্ডিলে ট্রাকটা বোঝাই, গাড়িতে বসে আছে দুজন সৈনিক, টিউনিক পরনে, মাথায় নীল ফিতে-দেওয়া খাড়া ক্যাপ, দুজনে ট্রাকের গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে দুলছে আর ধাক্কা খাচ্ছে। দুজনের মধ্যে যার বয়স কম তাকে আনকোরা নতুন কাঁধ পেটি থেকে বোঝা যায় বিমান বাহিনীর সার্জেণ্ট-মেজর, পাতলা সুগঠিত দেহ, সোনালী চুল। মুখ এমন সুকুমার আর পেলব যে মনে হয় সোনালী চামড়া দিয়ে রক্তের ছটা ফুটে বেরোচ্ছে। দেখে মনে হয় উনিশ বছর বয়স। পাকা সৈনিকের মত হাবভাব দেখাবার চেষ্টা করছে সে, দাঁত চেপে থুথু ফেলছে, ভাঙ্গা গলায় গালিগালাজ করছে, চেষ্টা করছে দেখাতে কিছুতে তার আগ্রহ নেই। কিন্তু তবু এটা স্পষ্ট যে এই প্রথম সে যাচ্ছে ফ্রণ্ট লাইনে, এবং স্থিরচিত্ত মোটেই নয় সে। চারিদিকে যা চোখে পড়ছে তা কোন অভিজ্ঞ সৈনিকের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করত না, কিন্তু দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে সে, তার কাছে মনে হচ্ছে

গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, গূঢ় অর্থ আছে সবকিছুর — রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা বিধ্বস্ত কামান, মাটির দিকে নলের মুখ; ভাঙ্গা সোভিয়েত ট্যাঙ্ক, বুরুজ পর্যন্ত আগাছা গজিয়েছে; জার্মান ট্যাঙ্কের ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, স্পষ্টতই বোমা সটান লেগেছিল ওটাতে; গোলার নানা গর্ত, ইতিমধ্যেই ঘাসে ঢেকে গিয়েছে; নতুন সাঁকোর কাছে গাদা-করা, রাস্তা থেকে স্যাপারদের সরানো মাইনের চাকতি, আর দূরে দেখা যাচ্ছে বার্চের ক্রুশচিহ্ন দেওয়া জার্মানদের গোরস্থান হালের যুদ্ধের নানা চিহ্ন।

ওদিকে, সহজে বোঝা যায় ওর সঙ্গী সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টটি বাস্তবিকই পাকা সৈনিক। প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হবে তার বয়স তেইশ কিম্বা চব্বিশ; কিন্তু তামাটে, রোদে জলে পোড়া মুখের দিকে ভালোভাবে তাকালে নজরে পড়বে চোখ মুখ আর কপালে সূক্ষ্ম বলিরেখা, চোখজোড়া কালো, চিন্তাগ্রস্ত আর ক্লান্ত, তখন বয়সটা আরো দশ বছর বেশী মনে হবে। চারিপাশের দৃশ্য কোন ছাপ ফেলছে না ওর মনে। ওর বিস্ময় উদ্রেক করছে না ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যুদ্ধযন্ত্রের মরচে-পড়া, বিস্ফোরণে এবড়োখেবড়ো নানা ভগ্নাবশেষ, দগ্ধ অনেক গ্রামের পরিত্যক্ত পথ ঘাট, এমন কি একটি সোভিয়েত বিমানের ধ্বংসাবশেষ — বাঁকাচোরা এ্যালুমিনিয়ামের ছোট একটা স্তূপ; কিছু দূরে পড়ে আছে ভাঙ্গা ইঞ্জিনটা, লাল তারার চিহ্ন আর নম্বর আঁকা বিমানের লেজটা, যেটা দেখে লাল হয়ে শিউড়ে উঠল নবীন সৈনিকটি।

খবরের কাগজের বাণ্ডিলে আরামকেদারা বানিয়ে, অদ্ভুত চেহারার, সোনালী মনোগ্রাম করা একটা ভারী আবলুস কাঠের ছড়ির বাঁটে চিবুক রেখে ঝিমোচ্ছে অফিসারটি। মাঝেমাঝে চমকে উঠে চোখ খুলছে, ঝিমন্ত ভাব কাটাবার চেষ্টায় যেন, হাসিখুসি মুখে চারিদিকে তাকিয়ে উষ্ণ সুগন্ধি হাওয়া গভীর নিশ্বাসে নিচ্ছে। রাস্তা ছাড়িয়ে দূরে, লালচে আগাছার আন্দোলিত জঙ্গলের উপরে চোখে পড়ল দুটো দাগ, ভালো করে দেখে সে আঁচ করল ওদুটো বিমান, একটার পিছনে অন্যটা মন্থরভাবে চলেছে। তক্ষুণি তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল একেবারে, দীপ্ত হয়ে উঠল চোখদুটো, নাসারন্ধ্র কেঁপে উঠল, অগোচর দুটো দাগে চক্ষু নিবদ্ধ রেখে ড্রাইভারের কামরার ছাতে ঘা দিয়ে চেঁচিয়ে বললো:

'আড়ালে চল! রাস্তা ছেড়ে চল!'

দাঁড়িয়ে উঠে অভিজ্ঞ চোখে ভূমির চেহারাটা দেখে নিয়ে ড্রাইভারকে

দেখাল একটি ছোট নদীর কাদাটে নিচু জায়গা, তার দুটো তীর ধূসর কোল্টস্‌ফুট আর সেলানডাইনের সোনালী ঝাড়ে আচ্ছন্ন।

অবজ্ঞা ভরে হাসল তরুণ সৈনিকটি। বিমানদুটো ত অনেক দূরে নিরীহভাবে ঘুরছে, একটা ট্রাক বিরস পরিত্যক্ত মাঠে ধুলোর ঝড় তুলে চলেছে, তার সম্বন্ধে বিমানদুটোর যে বিন্দু মাত্র আগ্রহ আছে দেখে ত মনে হয় না। কিন্তু বাধা দিয়ে কিছু বলার আগেই রাস্তা ছাড়ল ড্রাইভার, নিচু জায়গাটার দিকে খরশব্দে দ্রুতগতিতে চলল ট্রাকটা।

জায়গাটায় পেঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট ট্রাক থেকে নেমে পড়ল, ঘাসে উবু হয়ে বসে সতর্কভাবে চেয়ে রইল রাস্তার দিকে।

'কেন আপনারা এ সব...' ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে অফিসারটির দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেছে তরুণ সৈনিকটি, কিন্তু কথাটা শেষ করার আগেই ধপ করে শুয়ে পড়ে অফিসার চেঁচিয়ে উঠল:

'শুয়ে পড়!'

ঠিক সে মুহূর্তে দুটো বিরাট ছায়া ইঞ্জিন গর্জন করে একেবারে মাথার উপর দিয়ে সবেগে চলে গেল, বিচিত্র খটখট আওয়াজ, হাওয়া কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু এটাতেও বিশেষ ভয় পেল না তরুণ সৈনিকটি: বিমানদুটো সাধারণ, নিশ্চয় আমাদের। ঘুরে তাকাল সে, হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার ধারে উল্টিয়ে পড়ে আছে একটা মরচে-ধরা ট্রাক, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আগুন উঠেছে জ্বলে।

'আগুনে-বোমা ফেলছে ওরা,' গোলায় বিধ্বস্ত ইতিমধ্যেই জ্বলন্ত ট্রাকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল ড্রাইভার। 'ট্রাকের পিছনে লেগেছে দেখি।'

'শিকার খুঁজছে,' ঘাসে আরো আরাম করে শুয়ে শান্তকণ্ঠে বলল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। 'আমাদের সবুর করতে হবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে ওরা। রাস্তায় নজর রেখেছে। তোমার ট্রাকটা আর একটু পেছনে, ওই বার্চগাছটার নিচে রাখলে ভালো করতে তুমি।'

শান্তভাবে, বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল কথাটা, যেন এইমাত্র জার্মান বৈমানিকরা নিজেদের অভিসন্ধি জানিয়েছে তাকে। ডাকগাড়ির সঙ্গে ছিল বাহিনীর একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে-ডাকহরকরা, ড্রাইভারের পাশে বসেছিল সে। এখন ঘাসের উপরে শুয়ে আছে মেয়েটি, মুখটা ফ্যাকাশে, ধুলো-মাখা ঠোঁটে ক্ষীণ বিব্রত হাসি, চোরাভাবে তাকাচ্ছে প্রশান্ত আকাশের দিকে, সেখানে

ঢেউ'এর পর ঢেউ'এ চলেছে গ্রীষ্মের মেঘ। সার্জেণ্ট-মেজরের বিশেষ বিব্রত লাগলেও মেয়েটির উপকার করার জন্য নিস্পৃহভাবে বলল:

'এবার রওনা হলে হয়। সময় নষ্ট করে কী হবে? যার অদৃষ্টে লেখা ফাঁসির দড়ি সে ডুবে মরবে না কখনো।'

এক ফালি ঘাস ধীরেসুস্থে চিবোতে চিবোতে যুবকটির দিকে তাকাল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, কঠোর কালো চোখে প্রসন্ন হাসির প্রায় অলক্ষিত ঝিকিমিকি, বলল:

'শোনো হে, ছোকরা! সময় থাকতে ওই নির্বোধ প্রবাদটি ভুলে যাও। আর একটা কথা, কমরেড সার্জেণ্ট-মেজর। ফ্রণ্টে উপরওয়ালাদের মেনে চলার নিয়ম একটা আছে। যদি হুকুম করা হয় শুয়ে পড়, তাহলে শুয়ে পড়া অবশ্য উচিত।'

একটা সরস সরেল ডাঁটা পেয়ে নখ দিয়ে ছালটা ছিঁড়ে, খরখরে ডাঁটাটা মহাতৃপ্তিতে চিবুতে লাগল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। আবার শোনা গেল বিমান-ইঞ্জিনের আওয়াজ, আবার সেই দুটো বিমান, একটু কাৎ হয়ে উড়ে গেল পথটির উপর দিয়ে; এত কাছ দিয়ে যে তাদের ডানার গভীর-হলদে রং, শাদা আর কালো ক্রুশগুলো, এমন কি সবচেয়ে কাছ দিয়ে যেটা গেল সেটার শরীরে আঁকা ইস্কাপনের টেক্কাটা পর্যন্ত দেখা গেল স্পষ্ট। আরো কয়েকটা ডাঁটা অলসভাবে ছিঁড়ে নিয়ে, ঘড়ির দিকে চেয়ে আদেশ করল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট:

'সব সাফ এখন! যাওয়া যাক এবার! আর তাড়াতাড়ি চালিও! এ জায়গাটা ছেড়ে যতদূর যাওয়া যায় ততই ভালো।'

গাড়ির হর্ণ ড্রাইভার বাজাল, নিচু জায়গাটা থেকে দৌড়িয়ে এল মেয়ে-ডাক হরকরাটি। সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের দিকে ডাঁটায় ঝোলা কয়েকটা লাল বুনো স্ট্রবেরি এগিয়ে দিল সে।

'এরি মধ্যে পাকতে শুরু করেছে... গ্রীষ্ম যে আসছে খেয়ালই হয়নি আমাদের,' বেরিগুলো শুঁকে টিউনিকের পকেটের বাটনহোলে ফুলের মত করে রাখতে রাখতে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট বলল।

'কী করে বুঝলেন যে ওরা আর ফিরে আসবে না, এখন যাওয়াটা নিরাপদ?' তরুণটি জিজ্ঞেস করল; চোরাগর্তের উপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রাকটা চলেছে, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট চুপ করে বসে দোলানিতে ঝাঁকুনি খাচ্ছে।



৯

'ওটা সহজে বোঝা যায়। ওগুলো "মেসার", "মেসারস্মিদ-১০৯"। মাত্র পঁয়তালিশ মিনিট মত ওড়বার পেট্রল ওদের থাকে। পেট্রলটা ইতিমধ্যেই শেষ, আবার ভর্তি করতে গিয়েছে।'

উত্তর দেবার ঢংটা এমন যে মনে হল এরকম সহজ জিনিস লোকের জানা নেই কেন সেটা সিনিয়র লেফ্‌টেনান্টের মাথায় ঢোকে না। এবারে তরুণটি আরো সজাগভাবে আকাশের দিকে নজর রাখতে শুরু করল: "মেসারগুলো" ফিরে আসার হুঁশিয়ারি সেই প্রথমে দেবে, এই তার ইচ্ছে। কিন্তু পরিষ্কার হাওয়ায় সতেজে বাড়ন্ত ঘাস, ধুলো আর তেতে-ওঠা মাটির তীব্র গন্ধ, গঙ্গাফড়িঙগুলো ডাকছে সজোরে প্রফুল্লভাবে, আগাছায়-ভবা নিরানন্দ ভূমির উপরে লার্কগুলোর উচ্চকণ্ঠ গান, এ সবের জন্য তরুণটি জার্মান বিমান আর বিপদের কথা ভুলে গিয়ে পরিষ্কার মিঠে গলায় গান ধরল; গানটা সে সময়ে ফ্রণ্টে খুব প্রিয়, ডাগ-আউটে তরুণ সৈনিক প্রিয়তমার জন্য আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তার গান।

'"এ্যাসগাছ"এর গানটা জানো?' বাধা দিয়ে সঙ্গী জিজ্ঞেস করল। মাথা নেড়ে তরুণ পুরোনো গানটি ধরল। সিনিয়র লেফ্‌টেনান্টের ক্লান্ত ধূলিধূসর মুখে বিষণ্ণ ভাব দেখা দিল।

'ঠিক ভাবে ওটা গাইছ না, ওহে,' সে বলল! 'ঠাট্টার গান নয় ওটা, প্রাণ দিয়ে গাওয়া চাই।' নরম নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় সুরটি ধরল সে।

মুহূর্তের জন্য ড্রাইভার গাড়ি থামাল, মেয়ে ডাকহরকরাটি বসবার জায়গা থেকে বেরিয়ে, লঘুভাবে লাফিয়ে গাড়িটার পিছন দিকে উঠছে, বলিষ্ঠ দরদী দুটো হাত তাকে ধরে ফেলল।

'শুনলাম আপনারা গাইছেন, তাই ভাবলাম আমিও যোগ দিই...'

তিনজনে গাইতে লাগল, সঙ্গত দিচ্ছে গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ আর গঙ্গাফড়িঙের ব্যগ্র ডাক।

তরুণটি সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে কিটব্যাগ থেকে একটি মাউথ-অর্গান বের করল। কখনো বাজাচ্ছে সেটা, কখনো বা বেটনের মত সেটা নাড়িয়ে গানে যোগ দিচ্ছে, যেন অর্কেস্ট্রা-চালক। সেই বিমর্ষ পরিত্যক্ত রাস্তায়, ধূলিধূসর বাড়ন্ত সর্বভুক আগাছার ঝাড়ের মধ্যে বেজে উঠল গানটির বলিষ্ঠ বিষণ্ণ সুর, গ্রীষ্মের তাপে ঝিমন্ত এই সব ক্ষেতের মত, উষ্ণ সুগন্ধি ঘাসে গঙ্গাফড়িঙগুলোর উচ্চকিত ডাকের মত, পরিষ্কার গ্রীষ্মের আকাশে লার্কের গানের মত উদার, অসীম আকাশের মত চিরপুরাতন ও চিরনবীন গানটি।

হঠাৎ ব্রেক কষল ড্রাইভার, গানে ওরা এত বিভোর যে আর একটু হলে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যেত। রাস্তার মাঝখানে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার ধারের খাতে উল্টিয়ে পড়ে আছে তিন টনের একটা ট্রাক, ময়লা চাকাগুলো শূন্যমুখী। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তরুণটি, কিন্তু তার সঙ্গী গাড়ির পাশ বেয়ে নেমে তাড়াতাড়ি ওদিকে গেল। হাঁটার ভঙ্গীটি বিচিত্র, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেলে দুলে চলা। ডাক-গাড়ির ড্রাইভার উল্টে-যাওয়া ট্রাকটার কামরা থেকে একটি কোয়ার্টারমাস্টার ক্যাপ্টেনের রক্তাক্ত শরীর টেনে বের করল। মুখটা কাটা, ছড়া কাচের টুকরোয় নিশ্চয়, আব ছাই'এর মত শাদা। চোখের পাতা তুলে দেখল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট।

'মারা গিয়েছে,' মাথা থেকে টুপি সরিয়ে বলল। 'ভেতরে আর কেউ আছে?'

'হ্যাঁ, ড্রাইভার আছে,' জবাব দিল ডাক-গাড়ির চালক।

'ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছো? এখানে এসে হাত লাগাও!' ভীতিবিহ্বল তরুণকে ধমকে ডাকল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। 'এর আগে রক্ত কি দেখোনি? অভ্যেস করে নাও, অনেক দেখতে হবে। এই যে এখানে, শিকারীর লক্ষ্যবস্তু।'

ড্রাইভার বেঁচে আছে। নিচু গলায় কাতরে উঠল সে, চোখদুটো তখনো বোজা। চোটের কোন চিহ্ন নেই। বোঝা গেল গোলা লাগাতে গাড়িটা যখন খাতে গিয়ে পড়ে তখন স্টিয়ারিং-হুইলে হুমড়ি খেয়ে পড়াতে বুকে বেশ লাগে আর আটকা পড়ে কামরাটির ধ্বংসাবশেষে। ওকে তুলে ডাক-গাড়িতে রাখার আদেশ দিল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। লেফ্‌টেনাণ্টের সঙ্গে ছিল কাপড়ে সযত্নে মোড়া ডাহা নতুন আর্মিকোট একটা। আহতকে শোয়াবার জন্য সেটি বিছিয়ে দিল লেফ্‌টেনাণ্ট, গাড়ির মেঝেতে বসে ওর মাথা রাখল নিজের কোলে।

'প্রাণপণে চালাও!' আদেশ দিল লেফ্‌টেনাণ্ট।

আহতের মাথা ধীরে ধরে রেখে, কী একটা সুন্দর কথা ভেবে হাসল লেফ্‌টেনাণ্ট।

ছোট একটি গ্রামের রাস্তায় যখন দ্রুতগতিতে ট্রাকটা পেঁছল তখন প্রদোষ। অভিজ্ঞ লোকে দেখলেই বুঝতে পারে যে গ্রামটি বিমানের ছোট একটা ইউনিটের পরিচালনা-ঘাঁটি। বাড়িগুলোর সামনের বাগানে, চেরি আর কর্কশ আপেলগাছের ধুলিধূসর শাখায়, কুয়োর কাঠে আর বেড়ার খুঁটিতে লাগানো তারের সারি ঝুলছে। বাড়িগুলোর কাছাকাছি খড়ের গোয়ালে,

যেখানে সাধারণত চাষীরা ঘোড়ার গাড়ি আর চাষের যন্ত্রপাতি রাখে, দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গাচোরা "এমকা" আর জিপ। এখানে সেখানে কুঁড়েগুলোর জানলার আবছা শার্সি দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল ফিতে দেওয়া টুপি মাথায় সৈনিকদের টাইপরাইটারের খটখট আওয়াজ কানে আসছে। একটা বাড়িতে তারের জাল গিয়ে জড়ো হয়েছে, সেখানে শোনা যাচ্ছে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সমান টিক টিক শব্দ।

গ্রামটি বড়ো কিম্বা মাঝারি রাস্তা থেকে দূরে, হিটলার আক্রমণের আগে এরকম জায়গায় থাকাটা কতো সুখের ব্যাপার ছিল তার চিহ্ন হিসেবে যেন অধুনা নির্জন আর আগাছায়-ভরা জায়গাটি টিঁকে আছে। হলদে আগাছায় সমাচ্ছন্ন ছোট পুকুরটা পর্যন্ত জলে ভরা। পুরোনো উইলোর ছায়ায় চকচক করছে ঠাণ্ডা পুকুরটা, আগাছার ঝাড় ভেদ করে ভাসছে এক জোড়া ধবধবে শাদা, লাল-ঠোঁট হাঁস, জল ছড়িয়ে ঠোঁট দিয়ে নিজেদের গা সাফ করছে।

রেডক্রসের পতাকা লাগানো একটি কুটিরে আহত লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর ট্রাকটা গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়ে গ্রামের স্কুলের ছোট সুন্দর বাড়িটার সামনে থামল। অনেক তার ঢুকেছে ভাঙ্গা জানলা দিয়ে, প্রবেশপথে সাব-মেসিনগান হাতে শান্ত্রী, বোঝা যায় যে এটা স্টাফ হেডকোয়ার্টারস।

খোলা জানলার কাছে বসে ভারপ্রাপ্ত অফিসার "লাল ফৌজী" পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রসওয়ার্ড হেঁয়ালির সমাধানে ব্যস্ত, তাকে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট বলল: 'উইং কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।'

পিছু পিছু এসেছে তরুণটি, সে লক্ষ্য করল যে বাড়িতে ঢুকেই অভ্যাসবশে টিউনিকের সামনের দিকটায় হাত বুলিয়ে নিল লেফ্‌টেনাণ্ট, বুড়ো আঙুল দিয়ে বেল্টের নিচে ভাঁজগুলো ঠিক করা হল, গলার বোতামটা লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণটিও তাই করল। স্বল্পভাষী সঙ্গীটিকে তার বিশেষ পছন্দ, সব বিষয়ে তাকে অনুকরণের চেষ্টা করে সে।

'কর্ণেল ব্যস্ত আছেন,' বলল ভারপ্রাপ্ত-অফিসার।

'ওঁকে বলুন যে বিমান বাহিনীর স্টাফ হেডকোয়ার্টারসের কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ থেকে জরুরী চিঠি নিয়ে আমি এসেছি।'

'আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। আকাশ পরিদর্শন দলের সঙ্গে উনি কথা বলছেন। বলেছেন যেন এ সময়ে বিরক্ত করা না হয়। আপনারা বাইরে গিয়ে বাগানে একটু বসুন।'

ক্রসওয়ার্ড সমাধানে আবার মন দিল ভারপ্রাপ্ত অফিসার। নবাগতরা বাগানে গিয়ে কেয়ারির পাশে পুরোনো একটা বেঞ্চে বসল, এক কালে সাবধানে ইঁট দিয়ে ঘেরা হয়েছিল কেয়ারিটাকে কিন্তু এখন আর কেউ যত্ন নেয় না, আগাছায় ভরে গিয়েছে। যুদ্ধের আগে গ্রীষ্মের এরকম শান্ত বিকেলে গ্রামের স্কুলের বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী নিশ্চয়ই দিনের কাজের শেষে এখানে বিশ্রাম করতেন। খোলা জানলা দিয়ে দুজনের কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে শোনা গেল। একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় উত্তেজিতভাবে বলছে:

'এই রাস্তাটা আর ওইটা ধরে বলসয়ে গরোখভো আর ক্রেস্তোভজ্‌দ্ভিজেন্‌স্কির গোরস্থান পর্যন্ত খুব যাতায়াত চলেছে, ক্রমাগত ট্রাকের সারি, সব যাচ্ছে একদিকে, ফ্রন্টে। এখানে গোরস্থানের একেবারে কাছে, একটা নিচু জায়গায় ট্রাক কিম্বা ট্যাঙ্ক আছে... মনে হচ্ছে একটা বড়ো দলকে জড়ো করা হচ্ছে...'

'কেন মনে হচ্ছে?' বাধা দিয়ে জিল সুরে একজন বলল।

'আমাদের আজ প্রচুর গুলিগোলা ছুঁড়েছে। কোনক্রমে এড়িয়ে আসতে পেরেছি। ওখানে কাল কিছুই ছিল না, শুধু কয়েকটা সৈন্যদের ধূমন্ত ফিল্ড-কিচেন। ওদের একেবারে উপরে গিয়ে কষে গুলি চালাই, যাতে একটু চৈতন্য হয়। কিন্তু আজ! দারুণ গুলি ছুঁড়েছে আজ... নিশ্চয়ই ফ্রন্টের দিকে যাচ্ছে ওরা।'

'৩ নং স্কোয়ারে কী দেখলেন?'

'ওখানেও নড়াচড়া দেখলাম, কিন্তু খুব বেশী নয়। এখানে বনের কাছে ট্যাঙ্কের একটা বড়ো দল এগোচ্ছে। প্রায় একশ'টা। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ধরে বিস্তৃত, সার বেঁধে এগোচ্ছে দিনের আলোয়, লুকিয়ে চলার কোন চেষ্টা নেই। হয়ত চোখে ধুলো দেবার চাল... এখানে, এখানে ওখানে আমরা কামান দেখলাম, ফ্রন্ট লাইনের একেবারে কাছে। আর গুলিবারুদের ঘাঁটি। কাঠের গাদাতে গোপন করার চেষ্টা করেছে। কাল ওগুলো ওখানে ছিল না... বেশ বড়ো বড়ো ঘাঁটি।'

'আর কিছু?'

'না, আর কিছু নয়, কমরেড কর্ণেল। রিপোর্ট লিখব একটা?'

'রিপোর্ট? না, রিপোর্ট লেখার সময় নেই! আর্মি হেডকোয়ার্টারসে এক্ষুণি চলে যান? এটার মানে কী জানেন... ভারপ্রাপ্ত অফিসার, আমার গাড়িটা! বাহিনীর হেডকোয়ার্টারসে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যান।'

২

বড়ো একটা ক্লাসঘরে কর্ণেলের অফিস। কাঠের কুঁদো দিয়ে তৈরী অনাড়ম্বর দেয়াল, আসবাবপত্রের মধ্যে শুধু একটা টেবিল, তার উপরে রাখা ফিল্ড টেলিফোনের চামড়ার খাপ, বিমান মানচিত্রের সঙ্গে বড়ো কেস একটা, আর একটা লাল পেন্সিল। কর্ণেলটি ছোটখাটো কর্মঠ সুগঠিত মানুষ, পিছনে হাত রেখে ঘরে পায়চারি করছেন। চিন্তায় এত মগ্ন যে সামরিক কায়দায় দণ্ডায়মান বৈমানিকদের পেরিয়ে গেলেন। হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে।

তামাটে রঙের অফিসারটি গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে সেলাম করে বলল:

'সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আলেক্সেই মেরেসিয়েভ।'

আরো জোরে আর্মি বুটের গোড়ালি ঠুকে, আরো কায়দায় সেলাম করার চেষ্টা করতে করতে তরুণটি বলল:

'সার্জেণ্ট-মেজর আলেক্সান্দ্র্ পেত্রভ।'

'উইং কম্যাণ্ডার কর্ণেল ইভানভ,' উত্তরে কর্কশস্বরে বললেন কর্ণেল। 'সরকারী চিঠি আছে?'

ম্যাপ-কেস থেকে নিখুঁতভাবে চিঠিটা বের করে মেরেসিয়েভ কর্ণেলকে দিল। সংক্ষিপ্ত বার্তাটি তাড়াতাড়ি পড়ে কর্ণেল নবাগতদের দিকে দ্রুত অন্তর্ভেদী দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন:

'ভালো! ঠিক সময়ে আপনারা এসেছেন। কিন্তু এত কম লোক কেন ওরা পাঠিয়েছে?' হঠাৎ বিস্ময়ের একটি ভাব মুখে এল, যেন কিছু একটা মনে পড়েছে। 'এক মিনিট সবুর করুন! আপনি কি সেই মেরেসিয়েভ? বাহিনীর চিফ অব স্টাফ আপনার বিষয়ে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন...'

'ওটা এমন কিছু নয়, কমরেড কর্ণেল,' বাধা দিয়ে বলল আলেক্সেই, খুব যে শিষ্টভাবে তা নয়। 'আমাকে কাজে যাবার অনুমতি দিন।'

সকৌতূহলে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টটিকে দেখলেন কর্ণেল, তারপর মাথা নেড়ে প্রশংসাসূচক হাসি হেসে বললেন:

'বেশ!.. অফিসার! এঁদের চিফ অব স্টাফের কাছে নিয়ে যান, আর আমার নাম করে বলুন এঁদের খাবার আর থাকার জায়গা দিতে। বলুন যে গার্ডস ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রনে এঁদের ভর্তি করতে হবে।'

পেত্রভের মনে হল উইং কম্যাণ্ডারটি একটু বেশী ব্যস্তবাগীশ। লোকটিকে মেরেসিয়েভের ভালো লাগল। ঠিক ওর মনের মত লোক -- চটপটে, এক

নিমেষে যে কোন জিনিস বুঝতে পারে, স্পষ্টভাবে চিন্তা করে আর দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসতে পারে। বাগানে বসে থাকার সময়ে আকাশ পরিদর্শক দলের লোকটি যে রিপোর্ট দিয়েছে সেটা তাঁর মনে গেঁথে বসেছে। আর্মি হেডকোয়ার্টারস ছাড়ার পর যে সব রাস্তা ধরে তারা নানা পথচলতি গাড়ি করে এসেছে সেই সব রাস্তায় অতিরিক্ত সমাবেশ, রাত্রে রাস্তায় সান্ত্রীরা জোর দিয়ে বলেছে সব আলো নিভিয়ে চলতে হবে, আদেশ খেলাপ করলে টায়ারে গুলি করার ভয় দেখিয়েছে, বড়ো রাস্তার ধারে বার্চ-বনে ট্যাংক, ট্রাক আর কামান জড়ো করায় ভিড় আর হৈচৈ, আর পরিত্যক্ত মেঠো রাস্তাটাতেও জার্মান "শিকারীরা" সেদিন তাদের আক্রমণ করেছিল, এসব লক্ষণ সৈন্যদের চেনা; মেরেসিয়েভ আঁচ করল যে ফ্রণ্টের স্তব্ধভাব শেষ হয়ে এসেছে, এই এলাকায় নতুন আক্রমণ শুরু করার মতলব জার্মানদের, শীগগিরই শুরু হবে সেটা; এও আঁচ করল মেরেসিয়েভ যে কথাটা সোভিয়েত আর্মি কমাণ্ডের জানা এবং প্রত্যুত্তরের সঠিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২

পেত্রভকে অস্থির সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মধ্যাহ্ন-ভোজনের তৃতীয় পদটির অপেক্ষা করতে দিল না, ওকে নিয়ে বিমান-ঘাঁটিতে যাওয়া একটি পেট্রলের ট্রাকে লাফিয়ে উঠল; বিমান-ঘাঁটিটা গ্রামের বাইরে একটি মাঠে। নবাগতরা সেখানে নিজেদের পরিচয় দিল গার্ডস ক্যাপ্টেন চেস্লোভের কাছে; স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারটি ভ্রূকুটিকুটিল, স্বল্পভাষী, কিন্তু সব মিলিয়ে খাসা প্রকৃতির মানুষ। বহবাড়ম্বর না করে সে ওদের ঘাসে-ঢাকা, মাটির দেয়াল-ঘেরা জায়গায় নিয়ে গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে দুটো ডাহা নতুন, ঝকঝকে পালিশ দেওয়া, নীল "লাভচ্‌কিন", লেজে আঁকা দুটো নম্বর, "১১" আর "১২"। বিমানদুটি চালাতে হবে নবাগতদের। বাকি বিকেলটা তারা সুগন্ধি বার্চ-বনে কাটাল — সেখানে পাখির গান এমন কি বিমান ইঞ্জিনের গর্জনে পর্যন্ত চাপা পড়ছে না — বিমানগুলো খুঁটিয়ে ওরা দেখল, নতুন মিস্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ চলল, আর ওখানকার জীবনের সঙ্গে পরিচিত করে নিল নিজেদের।

এসব নিয়ে তারা এত বিভোর যে শেষ ট্রাকে ফিরল গ্রামে; ইতিমধ্যেই অন্ধকার হয়ে এসেছে, রাত্রের শেষ খাবার আর জুটল না। কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না ওদের। যাত্রার জন্য দেওয়া শুকনো রেশনের বাকিটুকু তখনো

ন্যাপসাকে ছিল। থাকবার জায়গা নিয়ে বরঞ্চ তারা ফ্যাসাদে পড়ল। পরিত্যক্ত, আগাছা-ভরা পতিত জায়গায় এই ছোট্ট মরূদ্যানটি বিমান বাহিনীর দুটো রেজিমেণ্টের লোকজনে বড়ো বেশী ভিড়াক্রান্ত। লোকঠেসা একটা বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাচ্ছে কোয়ার্টারমাস্টার, নবাগতদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে গররাজী বাসিন্দেদের সঙ্গে রেগে বচসা চলেছে; এটা আফসোসের কথা যে বাড়িগুলো রবারের তৈরী নয়, টেনে লম্বা করা যাবে না ওগুলোকে, এই সব দার্শনিকসুলভ চিন্তার পর অবশেষে যে বাড়িটা হাতের কাছে পেল তাতে ঠেলে ওদের দুজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে কোয়ার্টারমাস্টার বলল:

'আজ রাতটা এখানে কাটান। কাল সকালে আপনাদের জন্যে অন্য কিছু বন্দোবস্ত করব।'

ছোট কুটিরে ইতিমধ্যেই ন'জন লোক, সবাই শুয়ে পড়েছে। ধূমায়িত একটি কেরোসিনের বাতির অস্পষ্ট আলো পড়েছে ঘুমন্ত লোকগুলির উপরে -- বাতিটা চ্যাপটা গোলার খাপ থেকে তৈরী, যুদ্ধের প্রথম দিকে এধরনের বাতিকে "কাতিউশা" বলা হত, পরে নামকরা হয় "স্তালিনগ্রাদকা"। কয়েকজন ঘুমোচ্ছে বিছানায় বা বাঙ্কে, কেউবা মেঝের উপরে খড়ে বর্ষাতি বিছিয়ে শুয়ে আছে। ন'জন বাসাড়িয়া ছাড়াও আছে কুটির মালিকেরা, একটি বৃদ্ধা আর তার বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা; জায়গার অভাবে তারা বিরাট রুশ স্টোভের উপর ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত লোকদের কী করে ডিঙিয়ে যাবে ভেবে দোরগোড়ায় নবাগতরা থমকে দাঁড়াল। স্টোভের উপর থেকে বৃদ্ধা সক্রোধে ওদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল:

'জায়গা নেই, একেবারে জায়গা নেই! দেখছ না তিল ধারণের জায়গা নেই? কোথায় তোমাদের শোয়াব, ঘরের ছাতে?'

এত বিরত লাগল পেত্রভের যে সরে পড়ার জন্য পা বাড়াল, কিন্তু এরি মধ্যে মেরেসিয়েভ টেবিলের দিকে পথ করে নেয়, সাবধানে, যাতে ঘুমন্ত লোকগুলির উপরে পা না পড়ে।

'যে কোন একটা কোণে বসে রাত্রের খানাটা খেয়ে নিতে চাই, দিদিমা। সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি,' বলল মেরেসিয়েভ। 'আমাদের একটা প্লেট আর গোটা দুই কাপ দিতে পারেন? এখানে ঘুমিয়ে আপনাদের জ্বালাব না। বেশ গরম, বাগানে শুতে পারি আমরা।'

ক্রুদ্ধা বৃদ্ধাটির পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এল দুটি ছোট্ট খালি পা;

স্টোভের কাছ থেকে নিঃশব্দে সরে গেল একটি দোহারা চেহারার মানুষ, নিদ্রিতদের গা নিপুণভাবে বাঁচিয়ে দরজার ওদিকে গেল চলে; প্লেট হাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল সে; পাতলা আঙুলে ধরা দুটো রঙীন কাপ। প্রথম পেত্রভের মনে হয়েছিল বাচ্চা বুঝি, কিন্তু যখন টেবিলের কাছে ও এল আর অন্ধকারে ঝাপসা, হলদে আলো পড়ল মেয়েটির মুখে, তখন দেখল মানুষটি নবীনা, চেহারাটা মিষ্টিও বটে; শুধু বাদামি ব্লাউজ, চটের কাপড়ের স্কার্ট আর বুকে জড়িয়ে পিছনে বুড়ীদের মত করে বাঁধা ছেঁড়াখোঁড়া শালটির জন্য সৌন্দর্যটি খোলেনি।

'মারিনা, এই মারিনা, এদিকে আয়, মেথরানি কোথাকার,' স্টোভের উপরে বুড়ীটি হিসহিসিয়ে উঠল।

কথাটা যে কানে গিয়েছে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নিপুণ হাতে টেবিলে একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপরে মেয়েটি প্লেট, কাপ আর কাঁটা রাখল, সঙ্গে সঙ্গে চলল পেত্রভের দিকে আড়চোখে তাকানো।

'স্বাস্থ্যের জন্যে খান!' বলল মেয়েটি। 'কিছু কাটতে কিম্বা গরম করতে চান? এখখুনি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিন্তু কোয়ার্টারমাস্টার বলেছেন যে বাইরে আগুন জ্বালানো চলবে না।'

'মারিনা, এদিকে আয় বলছি,' বুড়ী ডাকল।

'ওকে পরোয়া করবেন না, মাথাটা ওর একটু বিগড়ে গিয়েছে। জার্মানরা ওকে ভয়ে আধমরা করে দেয়,' তরুণী বলল। 'রাত্তিরে সৈন্য দেখলেই আমার জন্যে দুশ্চিন্তায় ভরে যায়। ওর ওপরে চটবেন না, শুধু রাত্তির বেলায় এরকম করে, দিনের বেলায় ঠিক হয়ে যায়।'

নিজের ন্যাপস্যাকে মেরেসিয়েভ পেল কিছু সসেজ, এক টিন মাংস, এমন কি পাতলা গায়ে চিকচিকে নুন দুটো শুকনো হেরিং আর আর্মির রুটি। দেখা গেল পেত্রভ অত মিতব্যয়ী নয়: ওর থাকার মধ্যে শুধু কিছুটা মাংস আর খড়খড়ে বিস্কুট। খাবারগুলো গোছালো হাতে কেটে টেবিলের উপরে বেশ লোভনীয় ভাবে সাজাল মারিনা। দীর্ঘ চক্ষুপল্লবে ঢাকা চোখজোড়া ক্রমশ বেশী করে পড়ছে পেত্রভের মুখে, পেত্রভও ওর দিকে চোরা চাউনি হানছে। চোখাচোখি হলেই দুজনেই লাল হয়ে উঠে, ভুরু কুঁচকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কথাবার্তা চলছে মেরেসিয়েভের মাধ্যমে, সরাসরি না। ওদের রকমসকম দেখতে বেশ মজা লাগছে আলেক্সেই'র আর একটু বিষণ্ণও; দুজনেরই বয়স

কত কম! ওদের তুলনায় নিজেকে বুড়ো লাগছে, মনে হচ্ছে জীবনের বেশী ভাগটা পিছনে ফেলে এসেছে।

'মারিনা, তোমার কাছে বোধহয় শশা নেই?' জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ।

'কপাল গুণে আছে,' মৃদু হেসে তরুণীটি বলল।

'দুটো সেদ্ধ আলু জোগাড় করতে পারবে বোধ হয়।'

'হ্যাঁ — চাইলে পাবেন।'

কোন শব্দ না করে, লঘুপদে নিদ্রিতদের ডিঙিয়ে, আলোর পোকার মত আবার ঘর ছেড়ে চলে গেল মেয়েটি।

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' আপত্তি জানিয়ে পেত্রভ বলল, 'কী করে ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন? অচেনা মেয়েটিকে "তুমি" বলে ডাকছেন? শশা চাইছেন আর...'

প্রফুল্লভাবে হেসে উঠল মেরেসিয়েভ।

'শোনো হে ছোকরা, কোথায় আছি মনে হচ্ছে বলো ত? ফ্রণ্টে, না অন্য কোথাও?.. আর দিদিমা, গজগজানি যথেষ্ট হয়েছে। নেমে এসে আমাদের সঙ্গে খেতে বসুন!'

গজগজ আর বিড়বিড় করতে করতে বুড়ী স্টোভ থেকে নেমে টেবিলের কাছে এসে সসেজের উপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল; দেখা গেল যুদ্ধের আগে সসেজ বিশেষ প্রিয় ছিল তার।

চারজনে টেবিলে বসে মহাতৃপ্তিতে খেল, অন্যান্যদের নাকডাকা আর ঘুমন্ত বিড়বিড় সঙ্গত রাখল ওদের নৈশ খানার। স্বচ্ছন্দে গল্পস্বল্প করে চলেছে আলেক্সেই, বুড়ীকে জ্বালাচ্ছে আর মারিনাকে হাসাচ্ছে। অভ্যস্ত শিবির জীবনে অবশেষে ফিরে এসে স্বরূপ ফিরে পেয়েছে ও, সবকিছু ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে বিদেশ বিভুঁয়ে অনেকদিন ঘুরে বাড়িতে ফিরে এসেছে।

খানা শেষ হয়ে আসার আগে ওরা জানল যে একটি জার্মান দলের হেডকোয়ার্টারস ছিল বলে গ্রামটা টিঁকে আছে। সোভিয়েত বাহিনী আক্রমণ শুরু করাতে জার্মানরা এত তাড়াহুড়োয় পালায় যে গ্রামটি ধ্বংস করার সময় পায়নি। নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে চোখের সামনে ফ্যাশিস্টরা বলাৎকার করাতে বুড়ীর মাথা বিগড়ে যায়। পরে মেয়েটি পুকুরে ডুবে মরে। জার্মানরা যে আট মাস জেলায় ছিল সে কটা মাস মারিনা কাটায় উঠোনের পিছনে শূন্য মাড়াই ঘরে; খড় আর পুরোনো দড়ি, কাছি, রশারশির টুকরো দিয়ে প্রবেশপথটি চোখের আড়াল করে রাখা হয়েছিল। এ ক' মাস সূর্যের মুখ দেখেনি মারিনা।

রাত্রে ধোঁয়া বেরোবার পথ দিয়ে ওকে খাবার আর জল পোঁছিয়ে দিত মা। আলেক্সেই গল্পসল্প করছে মেয়েটির সঙ্গে, মেয়েটি ঘনঘন তাকাচ্ছে পেত্রভের দিকে, বেয়াড়া অথচ লাজুক চোখদুটোয় অনুরাগের ছাপটা বেশ স্পষ্ট।

হাসিখুসিতে গল্প করে খানা শেষ হল। মিতব্যয়ীর মত বাকি খাবারটা মারিনা মেরেসিয়েভের ন্যাপসাকে রাখল, বলল সবকিছুই সৈনিকের কাজে লাগে। তারপর মা'কে ফিসফিস করে কী একটা বলে, মুখ ফিরিয়ে বেশ জোর দিয়ে বলল:

'শুনুন, কোয়ার্টারমাস্টার আপনাদের এখানে পাঠিয়েছেন, আমি চাই আপনারা এখানে থেকে যান। স্টোভের ওপরে চাপুন, মা আর আমি নিচের ঘরটায় যাচ্ছি। যাত্রার পরে জিরোনো দরকার আপনাদের। কাল আপনাদের জন্যে জায়গা খুঁজে দেব।'

আবার লঘুপায়ে নিদ্রিতদের ডিঙিয়ে বাইরে গেল মারিনা, ফিরে যখন এল তখন হাতে খড়ের বোঝা, স্টোভে খড় বিছিয়ে, কিছু কাপড় গুটিয়ে বালিশের মত করল: সবকিছু করল চটপটে নিপুণ হাতে, বেড়ালের মত কৌশলে।

'খাসা মেয়েটা, কী বলো, ছোকরা?' খড়ের উপরে খুসিতে হাত পা ছড়িয়ে, গাঁটে গাঁটে শব্দ তুলে মন্তব্য করল মেরেসিয়েভ।

'মন্দ নয়,' কৃত্রিম উদাসীনতায় জবাব দিল পেত্রভ।

'কী ভাবে তোমার দিকে তাকাচ্ছিল লক্ষ্য করেছিলে?..'

'না, ও ত বরাবর আপনার সঙ্গেই গল্প করছিল!..'

পরের মুহূর্তে শোনা গেল ওর নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ। কিন্তু ঘুম এল না মেরেসিয়েভের। ঠাণ্ডা সুগন্ধি খড়ের উপরে শুয়ে দেখল কী একটা জিনিসের খোঁজে ঘরে এসেছে মারিনা, স্টোভের দিকে চোরা চাউনি হানছে প্রায়ই। টেবিলের উপরের বাতিটা কমিয়ে দিয়ে, আর একবার স্টোভের দিকে তাকিয়ে, নিদ্রিতদের মধ্য দিয়ে পথ করে গেল দরজার দিকে। কী কারণে যেন, এই ছিন্নবেশ, মিষ্টি চেহারার কমনীয় মেয়েটিকে দেখে বিষণ্ণ স্তব্ধতায় ভরে গেল আলেক্সেই'র অন্তর। থাকবার জায়গার সমস্যা মিটে গিয়েছে। কাল সকালে ওকে লড়াই'এর জন্য অনেক দিন পর এই প্রথম বিমান চালাতে হবে। পেত্রভ থাকবে সঙ্গে. মেরেসিয়েভ নেতা। ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াবে? পেত্রভকে খাসা ছোকরা মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতেই ওর প্রেমে পড়েছে মারিনা। যাই হোক, কিছু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার!

পাশ ফিরে শ্বল আলেক্সেই, খড়ে একটু খসখস আওয়াজ, তারপর অঘোর ঘ্বম।

সাংঘাতিক কিছ্ব একটা ঘটার অন্বভূতিতে তার ঘ্বম ভাঙল। ব্যাপারটি কী তৎক্ষণাৎ পারল না ব্বঝতে, কিন্তু সৈনিকের সহজাত বোধে লাফিয়ে উঠে পিস্তলটা চেপে ধরল। কোথায় আছে মনে পড়ছে না। রশ্বনের মত তীব্র কটুগন্ধ ধোঁয়ার মেঘে ঘর আচ্ছন্ন; হাওয়ায় ধোঁয়া কেটে গেলে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল মাথার উপরে জ্বলছে অদ্ভুত, বিরাট সব নক্ষত্র। দিনের বেলার মত পরিষ্কার আলো, চোখে পড়ল দেশলাই'এর কাঠির মত কুটিরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঠের কুঁদো, ছাতটা স্থানচ্যুত, কড়িবরগা বেরিয়ে পড়েছে, কিছ্বদ্বরে আকারহীন কী একটা প্বড়ছে। কানে এল কাতরানি, বিমান ইঞ্জিনের তরঙ্গিত গর্জন আর পড়ন্ত বোমার বিকট আর্তনাদ।

ধ্বংসাবশেষের উপরে উদ্যত স্টোভে হাঁটু গেড়ে বসে পেত্রভ হতচকিতভাবে চারিদিক দেখছে, মেরেসিয়েভ চেঁচিয়ে তাকে বলল:

'শ্বয়ে পড়ো!' ইটের উপরে ধড়াস করে পড়ে শরীর চিপটে শ্বয়ে রইল দ্বজন। ঠিক সেই ম্বহ্বর্তে বোমার বড়ো একটা টুকরো চিমনীতে লাগল আর লাল ধ্বলো আর শ্বকনো কাদা ঝুরঝুর করে ওদের উপরে পড়ল।

'নড়ো না! স্থির হয়ে শ্বয়ে থাকো!' আদেশ করল মেরেসিয়েভ, দমন করল লাফিয়ে উঠে ছ্বটে চলে যাবার সেই ইচ্ছেটা যেখানে হোক এসে যায় না, দৌড়তে পারলেই হল — নৈশ বিমান আক্রমণের সময়ে যে ইচ্ছেটা প্রত্যেকের হয়।

বোমার্ব বিমানগ্বলো দেখা যাচ্ছে না। নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত হাউই'এর অনেক উপরে অন্ধকারে ঘ্বরছে সেগ্বলো। কিন্তু দপদপে ধ্বসর আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ে বোমাগ্বলো কালো বিন্দ্বর মত আলোর এলাকার মধ্যে এসে পড়ছে, চোখের সামনে ক্রমশ আয়তনে বেড়ে সজোরে লাগছে মাটিতে, গ্রীষ্ম রাত্রির অন্ধকারে লাল অগ্নিশিখা ছিটকিয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে মাটি বিদীর্ণ হয়ে গর্জে উঠছে।

বৈমানিক দ্বজন স্টোভ আঁকড়ে আছে, প্রতিটি বিস্ফোরণে দ্বলে দ্বলে কেঁপে উঠছে সেটা। স্টোভে চেপে রেখেছে শরীর, গাল আর পা, চেষ্টা করছে নিজেদের মিশিয়ে দিতে, একাকার হয়ে যেতে ইটের সঙ্গে। ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আওয়াজ মিলিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল রাস্তার ওধারে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষে অগ্নিশিখার ক্রুদ্ধ হাঁক।

'বেশ একটা ধোলাই দিল বটে,' কাপড়চোপড় থেকে খড় আর মাটি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে কৃত্রিম অবিচলিত স্বরে বলল মেরেসিয়েভ।

'কিন্তু এখানে যারা ঘুমোচ্ছিল তাদের কী হল?' চোয়াল কাঁপছে, হেঁচকি জোর করে এসে পড়ছে সেটা, চাপার চেষ্টা করতে করতে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল পেত্রভ। 'আর মারিনা?'

স্টোভ থেকে নামল দুজনে। টর্চ ছিল মেরেসিয়েভের। মেঝেতে বিক্ষিপ্ত তক্তা আর কাঠের কুঁদোর নিচে খোঁজ করল অন্যদের। কেউ নেই। পরে শুনেছিল যে সাইরেন শুনে দৌড়িয়ে গর্তে চলে যেতে পেরেছিল ওরা। ধ্বংসাবশেষে অনেক খোঁজ করল মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ, কিন্তু মারিনা ও তার মা'র দেখা পেল না। হেঁকে ডাকল ওদের, কোন সাড়া নেই। কী হতে পারে ওদের? বিমান আক্রমণের পর ওরা কি বেঁচে আছে?

রাস্তায় ইতিমধ্যেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছে টহলদারেরা। স্যাপাররা আগুন নিভিয়ে দিল, ভূমিসাৎ করল ধ্বসে-পড়া বাড়িগুলোকে, হতাহতদের বের করল ভগ্নস্তূপ থেকে। আর্দালিরা রাস্তায় ছুটোছুটি করে বৈমানিকদের নাম ডেকে তলব করছে। বিমান বাহিনীর রেজিমেণ্টকে সত্বর অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হল। বৈমানিক দলকে জড়ো করা হল বিমানক্ষেতে, যাতে ভোর হলে বিমান নিয়ে চলে যেতে পারে তারা। প্রথম হিসেবে দেখা গেল হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী নয়। একজন বৈমানিক আহত, দুজন মিস্ত্রী আর কয়েকজন সান্ত্রী চৌকিতে নিহত হয়েছে। সকলের অনুমান গ্রামের অনেক লোক মারা গিয়েছে, কিন্তু কজন, সেটা অন্ধকার আর গণ্ডগোলের জন্য বলা কঠিন।

ভোরের ঠিক আগে বিমানক্ষেতে যাবার সময়ে মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ যে বাড়িতে ঘুমিয়েছিল সেখানে না থেমে পারল না। কাঠের কুঁদো আর তক্তার বিশৃঙ্খল স্তূপ থেকে একটি স্ট্রেচায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুজন স্যাপার, রক্ত-মাখা চাদরে ঢাকা কী একটা শোয়ানো স্ট্রেচারে।

'কে ও?' জিজ্ঞেস করল পেত্রভ, মুখ ওর ফ্যাকাশে, অমঙ্গলের পূর্ববোধে বুক ভারী হয়ে উঠেছে।

গালপাট্টাওয়ালা প্রবীণ স্যাপার একজন, তাকে দেখে মেরেসিয়েভের স্তেপান ইভানভিচের কথা মনে হল, ব্যাখ্যা করে বলল:

'একটি বুড়ী আর একটি মেয়ে। মাটির নিচের ঘরে ওদের পেলাম। পড়ন্ত ইটে চোট লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। কিশোর না বালিকা জানি না,

এত ছোটখাটো শরীর! চেহারা দেখে মনে হয় সুন্দর দেখতে ছিল। বুকে ইট লাগে। বেশ দেখতে, বাচ্চা মেয়ের মত।'

...সেই রাত্রে জার্মানরা তাদের শেষ বড়ো আক্রমণ শুরু করল; সোভিয়েত লাইন আক্রমণ করাতে কুস্‌র্ক স্যালিয়েণ্টের যুদ্ধ আরম্ভ হল, যে যুদ্ধটির পরিণামে সর্বনাশ হয় ওদের।

৩

সূর্য তখনো ওঠেনি; গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রির সবচেয়ে অন্ধকার সময়, কিন্তু বিমানক্ষেত্রে বিমানগুলোর ইঞ্জিন গরম করা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে, গর্জাচ্ছে সেগুলো। শিশিরে-ভেজা ঘাসে একটি মানচিত্র ছড়িয়ে ক্যাপ্টেন চেস্লোভ তার স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের নতুন বিমান-ঘাঁটি আর কোন দিক দিয়ে সেখানে যেতে হবে সেটা দেখাচ্ছে।

'চোখ খোলা রাখবেন, বুঝলেন,' সে বলছিল। 'পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ হারাবেন না। বিমান-ঘাঁটিটা একেবারে ফ্রণ্ট লাইনে।'

ঘাঁটিটা সত্যিই ফ্রণ্ট লাইনে, মানচিত্রে নীল পেন্সিলে চিহ্নিত লাইনটা জার্মান সৈন্যদলের অবস্থানের একটা জিভে ঢুকেছে। সেখানে যেতে হলে পিছনে উড়ে যেতে হবে না, যেতে হবে সামনে। বৈমানিকরা মহাখুসি। শত্রুপক্ষ আবার প্রথমে আক্রমণ করেছে, তা সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনী পিছু হটবার প্রস্তুতির বদলে প্রতিআক্রমণের ব্যবস্থা করছে।

সূর্যের প্রথম আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত, ক্ষেতের উপরে তখনো গোলাপী কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসছে; দ্বিতীয় স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারের বিমানের পিছনে পিছনে উপরে উঠে পরস্পরের কাছাকাছি থেকে চলল দক্ষিণ দিকে।

মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ আকাশপথে তাদের প্রথম একসঙ্গে যাত্রায় পরস্পরের খুব কাছাকাছি রইল; পথ হ্রস্ব হলেও যেরকম সহজে আর পাকা হাতে মেরেসিয়েভ বিমান চালাল তার তারিফ করল পেত্রভ। আর মেরেসিয়েভও ইচ্ছে করে কয়েকবার বিমানটা হঠাৎ বিশেষভাবে ঘোরাল, লক্ষ্য করল যে অনুসরণকারীর আছে উপস্থিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ন চোখ, বলিষ্ঠ স্নায়ু, আর যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে মনে করে, চালানোর কায়দাটা ওর ভালো, যদিও এখনো স্বচ্ছন্দ নয়।

একটি পদাতিক রেজিমেণ্টের পিছন দিকে নতুন বিমানক্ষেত্রটি। জার্মানদের কাছে ধরা পড়লে ওরা হালকা কামান, এমন কি ভারী ট্রেঞ্চ মর্টারের নাগালে আনতে পারে সেটাকে। কিন্তু ঠিক নাকের ডগায় হঠাৎ আবির্ভূত বিমানক্ষেত্রটিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ তাদের নেই। বসন্তে যত কামান জড়ো করেছিল ওরা, তাই দিয়ে ভোর হতে না হতে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর রক্ষাব্যূহাদির উপর গোলাবর্ষণ শুরু করেছে জার্মানরা। গড়বন্দী এলাকাটির অনেক উপরে উঠছে কম্পমান রক্তাভা। অবিরত বিস্ফোরণ প্রতি মুহূর্তে উত্থিত কালো গাছ-কীর্ণ ঘন জঙ্গলের মত সবকিছু ঢেকে দিচ্ছে। সূর্য উঠল, তখনো বেশ ফরসা হল না। ঘর্ঘরিত গর্জিত কম্পমান অন্ধকারে কিছু চেনা ভার, বীভৎস লাল চাকার মত সূর্য আকাশে স্থির।

মাসখানেক আগে জার্মান গড়খাইগুলির উপরে সোভিয়েত বিমানের সন্ধানী যাত্রা বিফলে যায়নি। জার্মান কমাণ্ডের অভিসন্ধি ধরা পড়ে; সৈন্য অবস্থান আর সমাবেশের জায়গাগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত, ইঞ্চি মেপে দেখা হয়েছে প্রত্যেকটিকে। অভ্যাসবশে জার্মানরা ভেবেছিল যে ঘুমন্ত অসন্দিগ্ধ শত্রুর পিঠে সর্বশক্তিতে হঠাৎ ছোরা বসাতে পারবে; কিন্তু শত্রু শুধু ঘুমের ভান করেছে। আক্রমণকারীর হাত ধরে ফেলে ইস্পাত-কঠিন বলিষ্ঠ মুষ্টিতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। বেশ কিছু কিলোমিটার জায়গা নিয়ে কামানের প্রাথমিক আক্রমণ গর্জিয়ে চলল, নিজেদের সেই কামান গর্জনে বধির আর বারুদের আচ্ছন্ন করা ধোঁয়ায় অন্ধ জার্মানরা, বজ্রনির্ঘোষ থেমে যাবার আগেই দেখল নিজেদের সব ট্রেঞ্চে লাল গোলার বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে। সোভিয়েত গোলন্দাজের নিশানা নিখুঁত, জার্মানদের মত তার লক্ষ্য বর্গবদ্ধ নয়, তার লক্ষ্যবস্তু হল নির্দিষ্ট সব কামান সমষ্টি, আক্রমণের জন্য ইতিমধ্যে তৈয়ার ট্যাঙ্ক আর পদাতিক বাহিনীর সংহতি, সেতু, ভূগর্ভস্থ গোলাবারুদের ঘাঁটি, সৈন্যদের ডাগ-আউট, পরিচালনা-ঘাঁটি।

জার্মান কামান আক্রমণ পরিণত হল ভীষণ গোলা যুদ্ধে, উভয় পক্ষে বিভিন্ন শক্তির হাজার হাজার কামান গর্জে চলেছে। ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রন যখন নতুন বিমানক্ষেত্রে নামল তখন সমস্ত মাটি কাঁপছে, বিস্ফোরণের আওয়াজ একাকার হয়ে একটানা গভীর গর্জনে পরিণত, যেন রেলওয়ে সেতুর উপর দিয়ে একটা লম্বা ট্রেন বাঁশী বাজিয়ে ঘরঘর ঝনঝন শব্দ করে চলেছে, কিন্তু সেতুর শেষ নেই। বিশালায়তন কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ায়

দিগন্ত বিলুপ্ত। ছোট বিমানক্ষেতের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে বোমারু বিমান, কয়েকটা বা সারসের মত দল বেঁধে, কয়েকটা বা ছেড়ে ছেড়ে। কামানের অবিরত গর্জনের মধ্যে আলাদা করে শোনা যায় তাদের বোমা বিস্ফোরণের ভারী শব্দ।

"দোসরা নম্বর প্রস্তুতির" আদেশ দেওয়া হল স্কোয়াড্রনগুলিকে। তার মানে ককপিটে বসে থাকতে হবে বৈমানিকদের, যাতে প্রথম হাউই ছোঁড়া হলেই সটান উড়তে পারে তারা। একটি বার্চ-বনের ধারে বিমানগুলোকে নিয়ে গিয়ে ডালপালা দিয়ে আড়াল করা হল। বনের ঠান্ডা কনকনে হাওয়ায় ব্যাঙের ছাতা গোছের গন্ধ, মশার গুঞ্জন যুদ্ধের গর্জনে শোনা যায় না, মশাগুলো বৈমানিকদের মুখে ঘাড়ে আর হাতে তীব্র আক্রমণ শুরু করেছে।

হেলমেট খুলে নিয়ে অলসভাবে মশা তাড়িয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছে মেরেসিয়েভ, বনের ঝাঁঝালো ভোরের গন্ধ বেশ লাগছে। পরের মাটির দেয়াল-ঘেরা জায়গাটাতে পেত্রভের বিমান। প্রায়ই ককপিট থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে পেত্রভ, মাঝেমাঝে এমন কি ককপিটের উপরে দাঁড়িয়ে যেদিকে যুদ্ধ চলেছে সেদিকে তাকাচ্ছে, কিম্বা চলে-যাওয়া বোমারুগুলোকে অনুসরণ করছে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য উপরে উঠতে ব্যগ্র সে, এবার আর ট্রেনিং বিমানে দড়িতে টানা হাওয়ায়-ফাঁপানো কোন বেলুনে গুলি করা নয়, ট্রেসার গুলিগুলো পাঠাতে হবে সত্যিকারের সচল, চটপটে কোনো শত্রুবিমানে, তাতে খোলসের মধ্যে শামুকের মত হয়ত বসে আছে সেই লোকটা যে মেরেছে দোহারা সুন্দর মেয়েটিকে, শুভস্বপ্নে যাকে দেখেছে বলে এখন মনে হয় পেত্রভের।

অস্থির পেত্রভকে দেখে দেখে মেরেসিয়েভ ভাবল, "আমরা প্রায় একবয়সী। ও উনিশ, আমি তেইশ। তিনচার বছরের তফাতে কি এসে যায় পুরুষের?" কিন্তু অনুসরণকারীর পাশে মেরেসিয়েভের নিজেকে পাকা, ধীরস্থির, ক্লান্ত বৃদ্ধের মত লাগে। এ মুহূর্তে ককপিটে বসে ছটফট করছে পেত্রভ, হাত ঘষছে, চলে-যাওয়া সোভিয়েত বিমানগুলোকে উদ্দেশ্য করে হাসছে আর চেঁচিয়ে কিছু বলছে, আর আলেক্সেই ত নিজে হাত পা ছড়িয়ে বেশ আরাম করে বসে আছে। ধীর সে, পায়ের পাতা নেই, যে কোন বৈমানিকের তুলনায় ওর পক্ষে বিমান চালানো অনেক বেশী কঠিন, কিন্তু এমন কি সেটাতে পর্যন্ত তার উত্তেজনা নেই। নিজের দক্ষতায় দৃঢ় বিশ্বাস তার, বিকলাঙ্গ পাদুটোয় আস্থা আছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত "দোসরা নম্বর প্রস্তুতিতে" রইল ওদের বিমানগুলো। কী কারণে যেন ওদের মজুত রাখা হল। বোঝা গেল অকালে ওদের অবস্থিতি জানিয়ে দেওয়াটা কর্তৃপক্ষেরা চান না।

ঘুমোবার জন্য যে ডাগ-আউটগুলো ওদের জন্য নির্দিষ্ট করা হল সেগুলো জার্মানরা এখানে থাকার সময় তৈরী করেছিল। আরো আরামে থাকার জন্য কাঠের দেয়ালে তারা কার্ডবোর্ড আর প্যাকিং কাগজ লাগিয়েছিল। দেয়ালে তখনো লোভে লালায়িত মুখ সিনেমা-তারকাদের অর্ধনগ্ন ছবি, আর নানা জার্মান সহরের মুদ্রিত তেল রঙা ছবি। কামান যুদ্ধের বিরাম নেই। মাটি কাঁপছে। শুকনো বালি দেয়াল-কাগজ হয়ে ঝুরঝুর করে পড়ছে গুঁড়িগুঁড়ি খসখসে শব্দে, যেন ডাগ-আউটটা পোকায় ভর্তি।

মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ ঠিক করল বর্ষাতি বিছিয়ে বাইরে শোবে। পোষাক পরেই ঘুমোনোর আদেশ। পায়ের পাতার পেটি শুধু ঢিলে করল মেরেসিয়েভ। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, বিস্ফোরণের লাল ঝলকে আকাশ কাঁপছে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে পেত্রভ, নাক ডাকছে তার, বিড়বিড় করছে সে, চোয়াল নড়ছে, ঠোঁট সশব্দে চেটে ঘুমন্ত শিশুর মত কুন্ডলী পাকিয়ে শুল সে। নিজের আর্মিকোট দিয়ে ওর গা ঢেকে দিল মেরেসিয়েভ। ঘুমোতে পারবে না জেনে উঠে পড়ল মেরেসিয়েভ, হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, গরম হবার জন্য বেশ জোরে কয়েক হাত ব্যায়াম করে নিয়ে বসল একটা গাছের গুঁড়িতে।

কামান যুদ্ধের ঝড় থেমে গিয়েছে। শুধু মাঝেমাঝে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণ করে উঠছে কয়েকটা কামান। কয়েকটা ইতস্তত গোলা মাথার উপর দিয়ে গিয়ে বিমানক্ষেতের কাছাকাছি কোথাও ফাটল। তথাকথিত এই হয়রানি গুলিবর্ষণে কেউ বিচলিত বোধ করে না। বিস্ফোরণের আওয়াজে মুখ পর্যন্ত ঘোরাল না আলেক্সেই, সে তাকিয়ে আছে লড়াই'এর লাইনের দিকে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় সেটা। অনেক রাত্রি এখন, তবু চলেছে তীব্র অবিরাম কঠিন যুদ্ধ, সমস্ত দিগন্তে বিরাট আগুন জ্বলে উঠেছে, তার রক্তাভায় যুদ্ধের ছায়া পড়েছে ঘুমন্ত পৃথিবীতে। তার উপরে ঝলকাচ্ছে হাউই'এর কম্পমান আলো — জার্মানদের হাউইগুলো নীলচে, ফসফরাসের — সোভিয়েত সৈন্যদের ছোঁড়া হাউইগুলো হলদেটে। এখানে সেখানে চকিতে উঠছে বিরাট অগ্নিজিহ্বা, নিমেষের জন্য কালো যবনিকা সরে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, তারপর কানে আসছে বিস্ফোরণের জমাট দীর্ঘশ্বাস।

শোনা গেল রাত্রিবেলাকার বোমারু বিমানের গর্জন, আর সমস্ত ফ্রন্ট ট্রেসার বুলেটের নানা রঙের গুটিতে অলংকৃত হয়ে উঠল। বিমান ধ্বংসী কামানের ক্ষিপ্র গোলা রক্তবিন্দুর মত উঠছে শূন্যে। আবার পৃথিবী কেঁপে উঠল, শুরু হল তার গোঙানি আর কাতরানি। বার্চগাছের মাথায় গুঞ্জনরত গুবরে পোকাগুলো কিন্তু বিচলিত নয় তাতে; বনের গভীরে মানুষের গলায় একটা পেঁচা ডেকে উঠল, অমঙ্গলের পূর্বসূচনায়; নিচু জায়গাটাতে একটা নাইটিংগেল দিনের ভয় কাটিয়ে প্রথমে দ্বিধায় গাইল, যেন নিজের গলা পরখ করছে, কিম্বা কোন যন্ত্রে সুর ঠিক করছে, তারপর গাইল ভরা কাঁপা গলায়, মনে হল যেন নিজের সঙ্গীতের শব্দে বুক ফেটে যাবে পাখিটার। সে গানে যোগ দিল অন্য নাইটিংগেলরা, কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিক থেকে আসা সুরেলা শব্দে মুখরিত হল সমস্ত বন। অবাক হবার কিছু নেই যে কুর্স্কের নাইটিংগেলের খ্যাতি আছে সারা পৃথিবীতে!

এখন তাদের গানে গানে আকাশ মুখরিত। পরীক্ষার জন্য হাজিরা দিতে হবে আলেক্সেইকে কাল, কমিশনের সামনে নয়, স্বয়ং যমের সামনে, নাইটিংগেলদের সমবেত সঙ্গীত আজ জাগিয়ে রেখেছে তাকে। আর কালকের কথা ভাবছে না সে, আসন্ন যুদ্ধের কথা, মৃত্যুর সম্ভাবনার কথাও নয়, আলেক্সেই ভাবছে কামিশিনের উপকণ্ঠে সেই দূরাগত নাইটিংগেলটির কথা, তাদের জন্য গাওয়া সেই "নিজেদের" নাইটিংগেলের কথা, ভাবছে ওলিয়ার আর প্রিয় সহরটির কথা।

ফরসা হয়ে এল পূর্বাকাশ। নাইটিংগেলের গান আস্তে আস্তে ছাপিয়ে এল কামানের ডাক। মন্থরভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে ভারী রক্তবর্ণ সূর্য উঠল, গুলিগোলার বিস্ফোরণের জমাট ধোঁয়া ভেদ করতে প্রায় অপারগ যে সূর্য।

৪

কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টের ভীষণ যুদ্ধ অবিরাম চলেছে। জার্মানদের মূল মতলব ছিল ট্যাঙ্কের সাহায্যে ক্ষিপ্র বলিষ্ঠ আঘাতে কুর্স্কের দক্ষিণে আর উত্তরে আমাদের রক্ষাব্যূহাদি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে, তারপর সাঁড়াশির মত দুভাগ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর কুর্স্ক দলকে একেবারে ঘেরাও করে স্তালিনগ্রাদের জার্মান সংস্করণ একটা দেখাবে। কিন্তু প্রতিরোধের দৃঢ়তায় বানচাল হয়ে গেল সে পরিকল্পনা। কয়েকদিন পরে জার্মান কমাণ্ডের হুঁশ

হল যে প্রতিরোধ ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে না, পারলেও এত লোকক্ষয় হবে যে সাঁড়াশি আক্রমণের জন্য যথেষ্ট লোক থাকবে না; কিন্তু তখন দেরী হয়ে গিয়েছে, আক্রমণ থামানো আর হল না। এই আক্রমণের উপরে বিশেষ আশা রেখেছিল হিটলার — রণনীতি ও কৌশল ঘটিত আশা, রাজনৈতিকও বটে। হিমানী-সম্প্রপাত শুরু, ক্রমশ বর্ধিষ্ণু ভরবেগে নেমে এসে বিরাট বরফ পুঞ্জ সামনে যা কিছু পড়ছে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর যারা শুরু করেছে সেটা রোধ করবার শক্তি নেই তাদের। জার্মানরা এগোচ্ছে মাত্র কয়েক কিলোমিটার, তাতে তাদের গোটা ডিভিশন ও বাহিনী, শত শত ট্যাঙ্ক, কামান আর হাজার হাজার গাড়ি নষ্ট হচ্ছে। রক্তক্ষয়ে এগিয়ে-যাওয়া বাহিনীগুলোর শক্তি কমে এল; কথাটা জার্মান হেডকোয়ার্টারসের অজানা নয়, কিন্তু অবস্থা প্রতিহত করার উপায় নেই তাদের, তাই যুদ্ধের আগুনে বেশী, আরো বেশী মজুত সৈন্য সমর্পণ করতে বাধ্য হল তারা।

এখানে প্রতিরোধরত বাহিনী দিয়ে জার্মান আক্রমণ কাটিয়ে উঠল সোভিয়েত কমান্ড। ওদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ক্রমশ বাড়ছে দেখে ফ্রন্টের একেবারে পিছনে মজুত সৈন্যদের হাতে রাখা হল, যতক্ষণ না শত্রুপক্ষের অগ্রগতির বেগ কমে আসে। পরে মেরেসিয়েভ শুনেছিল যে ওর দলের কাজ ছিল প্রতিঘাতের জন্য সংহত একটি বাহিনীকে সাহায্য করা। তাতে বোঝা গেল ঘোরযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কেন ট্যাঙ্কবাহিনী আর জঙ্গী বিমানগুলোর ভূমিকা ছিল শুধু দর্শকের; উদ্দেশ্য ছিল বাহিনী প্রতি-আক্রমণ শুরু করলে একসঙ্গে ওদের কাজে লাগানো হবে। শত্রুদলের সমস্তটাকে যখন যুদ্ধে নামানো হল, তখন প্রত্যাহার করা হল “দোসরা নম্বর প্রস্তুতির” আদেশ। ডাগ-আউটে ঘুমোতে, এমন কি জামাকাপড় ছাড়তে দেওয়া হল দলটিকে। থাকবার জায়গা অন্যভাবে গুছিয়ে নিল মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ। সিনেমা-তারকাদের ছবি আর বিদেশী দৃশ্য সব ফেলে দিল তারা, ছিঁড়ে ফেলল জার্মান কার্ডবোর্ড আর প্যাকিং কাগজ, দেয়ালটা সাজানো হল ফার আর বার্চের শাখা দিয়ে। তারপর গুঁড়ি গুঁড়ি পড়া বালির খসখস শিরশির আওয়াজ আর বিরক্ত করত না।

একদিন সকালে দেয়ালের খোঁড়লে বাঙ্কে শুয়ে আছে ওরা দুজন, সূর্যের দীপ্ত আলো ইতিমধ্যে ডাগ-আউটের খোলা প্রবেশপথ দিয়ে পড়েছে মেঝের পাইন-কাঁটার কার্পেটে, ওপরের পথে শোনা গেল দ্রুত পদধ্বনি আর কে যেন চেঁচিয়ে বলল, “ডাক হরকরা”। ফ্রন্টে শব্দটা ভেল্কির কাজ দিত। একসঙ্গে

দুজনে কম্বল ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসল, মেরেসিয়েভ পায়ের পেটি শক্ত করে বাঁধছে, পেত্রভ দৌড়িয়ে উপরে গিয়ে ডাক হরকরাকে ধরে ফেলল, ফিরে এল উল্লাসে, হাতে আলেক্সেই'র দুটো চিঠি, একটি মা'র আর অন্যটি ওলিয়ার। বন্ধুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে চিঠিদুটো মেরেসিয়েভ, এমন সময়ে ঢং করে ঘণ্টার শব্দ এল বিমানক্ষেত্র থেকে, বিমানে যেতে হবে তাদের।

টিউনিকে চিঠিদুটো রেখেই সেগুলোর কথা ভুলে গেল মেরেসিয়েভ, পেত্রভের পিছু পিছু তাড়াতাড়ি গেল বনের পথ ধরে বিমানগুলোর দিকে। বেশ তাড়াতাড়ি গেল সে, হাতে ছড়ি, শুধু একটু হেলে দুলে চলেছে। বিমানের কাছে পেঁৗছল যখন তখন ইঞ্জিনের ঢাকনা সরানো হয়ে গিয়েছে, আর মুখে ফুট ফুট দাগ, হাস্যপ্রিয় ছোকরা মিস্ত্রীটি অধৈর্যভাবে প্রতীক্ষা করছে তার জন্য।

ইঞ্জিনের গর্জন। স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারের বিমান "ছক্কা" — সেটির দিকে মেরেসিয়েভ তাকিয়ে রইল। বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় ক্যাপ্টেন চেস্লোভ তার বিমান নিয়ে এসে ককপিটে থেকেই হাত তুলল। তার মানে "এ্যাটেনশন!" গর্জে উঠল অন্যান্য সব ইঞ্জিন। ঘূর্ণিবায়ুতে ঘাসের মাথা নুয়ে পড়েছে, হাওয়ায় বার্চের বেণীর ঝটপট, যেন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

নিজের বিমানের দিকে দৌড়িয়ে যাচ্ছে আলেক্সেই, ওকে পেরিয়ে গেল আর একটি বৈমানিক, কোনক্রমে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল ট্যাঙ্ক আক্রমণ শুরু হয়েছে। তার মানে শত্রুপক্ষের বিধ্বস্ত লাইন ভেদ করে ট্যাঙ্কের পথ করে দেবার সাহায্য করতে হবে বৈমানিকদের, আক্রমণকারীদের রক্ষা করার জন্য পাহারা রাখতে হবে আকাশে। আকাশে পাহারা দেওয়া? কী এসে যায় তাতে? যে রকম তীব্র যুদ্ধ চলেছে তাতে পাহারা দেওয়াটা নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাপার হবে না মোটেই। এখন কিম্বা পরে আকাশে শত্রুপক্ষের সাক্ষাত মিলবেই। পরীক্ষা তাহলে আসন্ন। এবারে সে প্রমাণ করবে যে কোন বৈমানিকের চেয়ে ন্যূন নয়, সিদ্ধিলাভ করেছে সে!

আলেক্সেই'র অস্থির লাগছে। কিন্তু মৃত্যুর ভয় সেটা নয়। বিপদের যে বোধ সবচেয়ে সাহসী ও স্থিরচিত্ত লোকেরই হয়, সেটাও নয়। অন্য কিছু একটায় বিব্রত সে: শস্ত্রমিস্ত্রীরা কি মেসিনগান আর কামানগুলো পরীক্ষা করেছে; নতুন হেলমেটের ইয়ারফোনদুটো এর আগে যুদ্ধের সময়ে পরেনি, ঠিক আছে সেদুটো? শত্রুর সঙ্গে লড়াই লাগলে পেত্রভ কি পিছনে পড়ে থাকবে, কিম্বা তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাবে? ছড়িটা কোথায়? ভাসিলি

ভাসিলিয়েভিচের দেওয়া জিনিসটা হারাতে সে চায় না; এমন কি ডাগ-আউটে যে বইটা রেখে এসেছে সেটা যদি কেউ নিয়ে যায়, তাই নিয়ে চিন্তিত সে; আগের দিন উপন্যাসটির সবচেয়ে রোমাঞ্চকর জায়গার আগে পর্যন্ত পড়েছিল, তাড়াহুড়োয় টেবিলে ফেলে রেখে এসেছে বইটা। মনে পড়ে গেল পেত্রভকে বিদায় জানানো হয়নি, তাই ককপিট থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল। কিন্তু পেত্রভ দেখতে পেল না তাকে; অধৈর্যভাবে সে দেখছে কম্যাণ্ডারের উত্তোলিত হাত, চামড়ার হেলমেটের বেড়ে ঘেরা মুখে ছাপ ছাপ রক্তাভা। হাত নামাল কম্যাণ্ডার। ককপিটের ঢাকনা টানা হল।

স্টার্ট লাইনে গর্জাচ্ছে তিনটি বিমান, চমকে উঠে দৌড়িয়ে গেল সেগুলো। তাদের পিছনে অন্য দলের যাত্রা শুরু হল। প্রথম তিনটি বিমান আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেরেসিয়েভের দল রওনা হয়ে তাদের অনুসরণ করল, নিচে সমতল মাটি দুলছে। প্রথম তিনটিকে নজরে রেখে ঠিক তার পিছন নিল মেরেসিয়েভের দলটি। তার পিছনে এল তৃতীয় দল।

ফ্রণ্ট লাইন এসে পড়ল। গোলাগুলিতে মাটি কেটে ছিঁড়ে গিয়েছে, উপর থেকে দেখলে চেহারাটা জোর বৃষ্টির প্রথম কয়েক ফোঁটার পরে ধুলিধুসর রাস্তার মত মনে হয়। ট্রেঞ্চগুলো যেন লাঙল দিয়ে খুঁড়ে ফেলা, ফুস্কুরির মত রক্ষাব্যূহ আর কামান রাখবার জায়গাগুলো কাঠের টুকরো আর ইটের স্তূপে পরিণত। ছেঁড়াখোঁড়া উপত্যকার সর্বত্র হলদে স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি; বিরাট যুদ্ধের আগুন সেটা। উপর থেকে সবকিছু কেমন ছোট, খেলনার মত আর অদ্ভুত দেখাচ্ছে! বিশ্বাস করা কঠিন যে নিচে সবকিছু জবলছে. বিকারগ্রস্তের মত গর্জাচ্ছে, বিকলাঙ্গ পৃথিবীর ধোঁয়ায় আর ঝুলে গুঁড়ি মেরে ঘুরছে যম। বলির অভাব নেই!

যুদ্ধরেখার উপর দিয়ে ওরা গেল, শত্রুপক্ষের পিছনে অর্ধবৃত্তে ঘুরে আবার পেরোল যুদ্ধরেখা। ওদের লক্ষ্য করে কেউ গুলি ছুঁড়ল না। নিচে যারা তারা নিজেদের কঠিন সব পার্থিব ব্যাপার নিয়ে অতি ব্যস্ত, ন'টা ক্ষুদে বিমান মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, খেয়াল করার সময় নেই তাদের। কিন্তু ট্যাংকগুলো কোথায়? ওই ত, ওখানে! মেরেসিয়েভ দেখল একটার পর একটা আস্তে আস্তে বন থেকে বেরিয়ে আসছে, উপর থেকে মনে হয় ধুসর বেঢপ গুবরে-পোকা। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেক ট্যাংক বেরিয়ে এল, কিন্তু আরো আসছে, বনের সবুজ থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা আর নিচু জায়গা হয়ে আস্তে আস্তে চলেছে। প্রথম কয়েকটা দ্রুতগতিতে

উঠল ছোট পাহাড়ে, পেঁছিল গোলাবিধ্বস্ত মাটিতে। তাদের ধড় থেকে ঝলকাচ্ছে লাল স্ফুলিঙ্গ। এই বিপুল ট্যাঙ্ক আক্রমণ, জার্মান লাইনের অবশিষ্টাংশের দিকে দুর্বার গতিতে ধাবমান শত শত এই ট্যাঙ্কের হামলা মেরেসিয়েভের সঙ্গে আকাশ থেকে দেখলে কোন শিশুর, এমন কি কোন স্নায়বিক পীড়ায় কাতর মহিলারও ভয় হত না। হেলমেটের ইয়ারফোনে নানা শব্দের গুঞ্জন, ঠিক সেই মুহূর্তে মেরেসিয়েভের কানে এল ক্যাপ্টেন চেস্লোভের ভাঙ্গা গলা, এমন কি এখন পর্যন্ত সে গলা নিরুৎসাহ:

'এ্যাটেনশন! ৩ নং চিতেবাঘ আমি! ৩ নং চিতেবাঘ, ডানদিকে "ইয়ুনকারস"!'

আলেক্সেই সামনে দেখল খাটো একটি রেখা। কম্যান্ডারের বিমান ওটা। দুলছে সেটা, তার মানে "আমি যা করছি তাই করো!"

নিজের দলের জন্য আদেশটি পুনরাবৃত্তি করল মেরেসিয়েভ। ফিরে দেখল পেত্রভ ওর পাশে, প্রায় সমান্তরালভাবে চলেছে। খাসা ছোকরা!

'ওহে, হুঁশিয়ার!' চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ।

'তাই করছি,' বিশৃঙ্খল ফটফট, গুনগুন আওয়াজের মধ্যে জবাব এল। আবার মেরেসিয়েভের কানে এল:

'৩ নং চিতেবাঘ আমি, ৩ নং চিতেবাঘ!' তারপর আদেশ হল, 'অনুসরণ করো আমাকে!'

শত্রুরা কাছে এসে পড়েছে। ঠিক তাদের নিচে লম্বালম্বিভাবে, জার্মানদের প্রিয় কায়দায় এক দল "ইয়ুনকারস-৮৭" একক-ইঞ্জিন ডাইভ-বোমারু। কুখ্যাত এই ডাইভ-বোমারুগুলি পোল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম আর যুগোস্লাভিয়ায় বোম্বেটে খ্যাতি অর্জন করে, যুদ্ধের গোড়াতে সারা পৃথিবীর সংবাদপত্র এদের বিভীষিকার বর্ণনায় মুখর ছিল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট বিস্তৃতিতে অল্পদিনের মধ্যেই এরা পাত্তা পেল না। অনেক আকাশ-যুদ্ধে এদের খুঁত ধরে ফেলল সোভিয়েত বৈমানিকরা, আর আমাদের সেরা বৈমানিকরা "ইয়ুনকারসদের" নিকৃষ্ট শিকার বলে গণ্য করতে শুরু করল, যেন বিলমোরগ কিম্বা খরগোস, ওদের শিকার করতে সত্যিকার দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

নিজের স্কোয়াড্রনকে সোজাসুজি শত্রুপক্ষের দিকে নিয়ে গেল না ক্যাপ্টেন চেস্লোভ, ঘুরপথে গেল। মেরেসিয়েভ ভাবল সাবধানী ক্যাপ্টেন

চায় "সূর্যকে পিছনে রাখতে," আর তারপর চোখ-ঝলসানো আলোর আড়ালে থেকে শত্রুর অগোচরে কাছে গিয়ে পড়ে ওদের আক্রমণ করতে। মনে মনে হেসে আলেক্সেই ভাবল, "এই জটিল ফন্দিটা করে ও "ইয়ুনকারসগুলোকে" বড্ড বেশী সম্মান দেখাচ্ছে। যাই হোক, সাবধানের মার নেই।" ফিরে তাকিয়ে দেখল পেত্রভ পিছনে আছে। একটা শাদা মেঘের গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে।

ওদের ডানদিকে এখন জার্মান বিমানগুলো। সুন্দরভাবে সার বেঁধে এগোচ্ছে ওরা, নিখুঁত শৃঙ্খলায়, যেন অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা। ওপর থেকে সূর্যের আলো এসে পড়াতে জ্বলজ্বল করছে ডানাগুলো।

কম্যান্ডারের আদেশের শেষ কয়েকটি কথা কানে এল আলেক্সেই'র:

'... ৩ নং চিতেবাঘ! আক্রমণ চালাও!'

আলেক্সেই দেখল চেস্লোভ আর তার অনুসরণকারী বাজপাখির মত শত্রুপক্ষের পার্শদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবচেয়ে কাছের "ইয়ুনকারসটির" দিকে ছুটল ট্রেসার গুলির রেখা: পড়ে গেল সেটা, আর চেস্লোভ, তার অনুসরণকারী এবং তার দলের তৃতীয় ব্যক্তিটি ভাঙ্গা জার্মান লাইনের ফাঁক দিয়ে সবেগে ঢুকল। তক্ষুণি লাইন সামলে নিল জার্মানরা, সুশৃঙ্খলায় এগিয়ে চলল "ইয়ুনকারসগুলো"।

আলেক্সেই ডাকের সঙ্কেত করে চেঁচিয়ে বলতে চাইল: "আক্রমণ কর!" কিন্তু এত উত্তেজিত সে যে গলা থেকে শুধু বেরোল, "আ-আ-আ"। এরিমধ্যে তীরের মত নামতে শুরু করেছে সে, মসৃণভাবে অগ্রসর জার্মান লাইনটা ছাড়া চোখে আর কিছু পড়ছে না। চেস্লোভের নামানো বিমানটার জায়গা যে বিমানটি নিয়েছে, ওর লক্ষ্য হল সেটা। কান ভোঁ ভোঁ করছে, হৃৎস্পন্দন এত বেড়ে গিয়েছে যে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল। দৃষ্টিপথে এসে পড়ল শিকারটি, ঘোড়ার বোতামে বুড়ো আঙুলদুটো রেখে খরবেগে চলল সেদিকে। তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে গুলির ধোঁয়ার ধূসর, পশমের মত রেশ। বটে, তাহলে গুলি চালাচ্ছে! লাগেনি। আবার! এবার আগের চেয়ে কাছে! কোন ক্ষতি হয়নি। পেত্রভের কী হল? না, ওরও চোট লাগেনি। ও এখন বাঁয়ে আছে। এড়িয়ে গিয়েছে ওদের। খাসা ছোকরা! জার্মান বিমানটির ধূসর গা দৃষ্টিপথে বড়ো দেখাচ্ছে। বুড়ো আঙুলে এ্যালুমিনিয়াম বোতামদুটোর ঠাণ্ডা অনুভূতি। আর একটু কাছে এলে ...

সেই মুহূর্তে আলেক্সেই'র বোধ হল বিমানটির সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে সে। ইঞ্জিনের ধকধকানি যেন নিজের হৃৎপিণ্ডে বাজছে, ডানাদুটোর আর

রাডারের অনুভূতি সমস্ত সত্তায়, ওর মনে হল এমন কি বেঢপ, নকল পাদুটো পর্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে, বিমানের ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে একীভূত হতে যেতে বাধা দিচ্ছে না তাকে। ফ্যাশিস্ট বিমানটির ছিপছিপে মসৃণ দেহ চলে গেল চোখের আড়ালে, কিন্তু গোচরে সেটাকে আবার এনে ঘোড়া টিপল সে। গুলির আওয়াজ কানে এল না, ট্রেসার গুলির রেখা পর্যন্ত পড়ল না চোখে, কিন্তু আলেক্সেই জানে যে সফল হয়েছে সে, এগিয়ে গেল দ্রুতবেগে, স্থির বিশ্বাস জার্মান বিমানটা পড়ে যাবে, ধাক্কা লাগবে না তার সঙ্গে। মুখ ঘুরিয়ে অবাক হয়ে দেখল আর একটা বিমান, প্রথমটির পাশে ছিল সেটা, পড়ে যাচ্ছে। তাহলে কি দুটোকে মেরেছে সে? না। ওটা পেত্রভের কাজ। তার ডানদিকে পেত্রভ। অনভিজ্ঞের পক্ষে মন্দ নয়। তরুণ বন্ধুটির সৌভাগ্যে তার নিজের সাফল্যের চেয়ে বেশী খুসি হল আলেক্সেই।

দ্বিতীয় দলটি ফাঁক ধরে জার্মান লাইনে ঢুকল। তারপর শুরু হল মজাটা। বোঝা গেল জার্মান বিমানগুলির দ্বিতীয় দলটি অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ বৈমানিকদের হাতে, তারা লাইন ভাঙ্গল। ছত্রভঙ্গ "ইয়ুনকারসদের" মধ্যে গিয়ে পড়ল চেস্লোভের দলের বিমানগুলো, এত তাড়া দিল তাদের যে নিজেদের লাইনের উপরে তাড়াতাড়ি বোমার বোঝা ফেলে দিতে বাধ্য হল তারা। ঠিক এই অভিসন্ধি নিয়ে বিমানগুলোকে চালনা করেছিল ক্যাপ্টেন চেস্লোভ — ওরা যাতে বাধ্য হয়ে নিজেদের লাইনে বোমা ফেলে! সূর্যকে পিছনে রাখা মূল উদ্দেশ্য ছিল না ওর।

জার্মানদের প্রথম লাইন আবার সংঘবদ্ধ হল, আর যে জায়গায় ট্যাঙ্কগুলো ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে সেদিকে আবার চলল "ইয়ুনকারসগুলো"। তৃতীয় দলের আক্রমণ সফল হল না।

এবারে একটিও বিমান নষ্ট হল না জার্মানদের, বরঞ্চ একটি জঙ্গী বিমান জার্মানরা নামাল। ট্যাঙ্কের আক্রমণ যেখানে বিস্তৃতভাবে শুরু হবে, সে জায়গাটা কাছে এসে পড়েছে। উপরে ওঠবার সময় নেই। নিচে থেকে আক্রমণ করার ঝুঁকি নেবে ঠিক করল চেস্লোভ। মনে মনে সেটা অনুমোদন করল আলেক্সেই। খাড়া উঠে শত্রুর পেটে "খোঁচা" দেবার অদ্ভুত সামর্থ্য আছে "লাভচ্‌কিন-৫"গুলোর, সে সামর্থ্যের সুযোগ নিতে ব্যগ্র সে। প্রথম দলটি এরিমধ্যে তীরের মত উঠছে, ফোয়ারার মত ছুটেছে ট্রেসার গুলির রেখা। তৎক্ষণাৎ লাইন থেকে খসে পড়ল দুটো জার্মান বিমান। একটা আধ-

টুকরো হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই, কেন না ওটা হঠাৎ ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেল, লেজটা আর একটু হলে মেরেসিয়েভের বিমানে লাগত।

'হুঁশিয়ার!' চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ, পেত্রভের বিমানের কালো রেখার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে স্টিকটা টানল সে।

মাটি উল্টে গেল। টলে পড়ল আলেক্সেই, যেন ভীষণ জোরে কেউ তাকে সিটের কাছে চেপেছে। মুখে আর ঠোঁটে রক্তের স্বাদ, চোখে ঝাপসা লাল দেখছে। বিমানটি প্রায় খাড়া হয়ে তীরের মত উঠছে। সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে, দৃষ্টিপথে এক ঝলকে এল একটা "ইয়ুনকারসের" দাগ-দেওয়া পেট, ভোঁতা জুতোর মত মোটা চাকাগুলোর হাস্যকর আকৃতি, বিমানক্ষেতের এঁটেল মাটি লেগে আছে চাকায়, সেগুলো পর্যন্ত।

ঘোড়া টিপল আলেক্সেই। শত্রু বিমানটির কোথায় গুলি লাগল — পেট্রলের ট্যাংকে, ইঞ্জিনে না বোমা রাখবার জায়গায় — জানে না আলেক্সেই, কিন্তু বিস্ফোরণের বাদামি ধোঁয়ায় নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

ধাক্কায় একপেশে হয়ে গেল মেরেসিয়েভের বিমান, আগুনের গোলক ঝট করে পেরিয়ে গেল সেটা, বিমানটা অনুমুখ করে চারিদিক দেখল আলেক্সেই। ডানদিকে, সাবানের ফেনার মত দেখতে শাদা মেঘের উপরে অসীম নীল শূন্যে পেত্রভের বিমান। আকাশ পরিত্যক্ত; শুধু দিগন্তে সুদূর মেঘের পটভূমিকায় ছোট ছোট বিন্দু চোখে পড়ে — ইতস্তত বিক্ষিপ্ত "ইয়ুনকারস" ওগুলো। ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল আলেক্সেই। মনে হয়েছিল যে যুদ্ধটা অন্তত আধ-ঘণ্টা চলেছে, পেট্রল নিশ্চয়ই কমে আসছে; কিন্তু ঘড়িতে দেখল মাত্র সাড়ে তিন মিনিট কেটেছে।

'বেঁচে আছ তাহলে?' এখন পাশাপাশি ডানদিকে চলেছে পেত্রভ. সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই।

ইয়ারফোনে নানা শব্দের গণ্ডগোলে কানে এল দূর উল্লসিত কণ্ঠস্বব:

'বেঁচে আছি... নিচে, নিচে দেখুন!'

নিচে ক্ষতবিক্ষত বিকলাঙ্গ উপত্যকার কয়েকটা জায়গায় পেট্রলের ট্যাংক জ্বলছে, স্তব্ধ হাওয়ায় ঘন ধোঁয়ার মেঘ থামের মত উঠছে। কিন্তু শত্রু বিমানগুলোর জ্বলন্ত ভগ্নাবশেষের দিকে তাকাল না আলেক্সেই। মাঠ হয়ে বিস্তৃতভাবে দ্রুতগতিতে চলেছে ধূসর-সবুজ অনেক গুবরে-পোকা, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সেদিকে। দুটো নিচু জায়গা হয়ে গুঁড়ি মেরে শত্রুপক্ষের লাইনে পৌঁছিয়েছে ওরা, সামনের গুলো এরি মধ্যে ট্রেঞ্চ পার হচ্ছে। ধড় থেকে

লাল স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে শত্রুপক্ষের লাইনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছ তারা, এগিয়েই চলেছে, যদিও পিছনে জার্মান কামানের গোলাগুলির ঝলক আর ধোঁয়া।

শত্রুপক্ষের বিধ্বস্ত গড়খাইগুলির গভীরে শত শত গুবরে-পোকার উপস্থিতির মানেটা কী মেরেসিয়েভ বুঝল।

সোভিয়েত জনগণ, স্বাধীনতা-প্রিয় সমস্ত দেশের জনগণ পরদিন সংবাদপত্রে আনন্দে আর উল্লাসে যা পড়েছিল, তাই এখন দেখছে মেরেসিয়েভ। কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টের একটা খণ্ডে বাহিনীটি দু ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর শত্রুপক্ষের লাইন ভেদ করে সে ফাঁক দিয়ে ঢুকে পথ করে দেয় অন্যান্য সোভিয়েত সৈন্যদলের, যারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।

ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রনের ন'টি বিমানের মধ্যে দুটো ঘাঁটিতে ফিরল না। ন টি "ইয়ুনকারসকে" নামানো হয়েছে। বিমানের সংখ্যা গণনার সময় নয়-দুই হারটা নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু দুজন কমরেডের বিয়োগে জয়লাভের আনন্দটা কমে গেল। সফল আক্রমণের পরে সাধারণত বৈমানিকরা যা করে থাকে সেটা করল না তারা, বিমান থেকে নেমে উল্লাস, চীৎকার, অঙ্গভঙ্গী করে যুদ্ধের সাগ্রহ আলোচনা, অতিক্রান্ত বিপদের স্মরণ, কিছুই না। বিষণ্ণ মুখে চিফ অব স্টাফের কাছে গিয়ে সংক্ষিপ্ত নীরস কথায় যুদ্ধের ফলাফল জানিয়ে চলে গেল তারা পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে।

দলে আলেক্সেই নবাগত, যে দুজন মারা গিয়েছে তাদের চিনত না। কিন্তু অন্যদের মনোভাবের ছোঁয়া তার লাগল। ওর জীবনের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার জন্য শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এতদিন তৈরী হয়েছে, যেটা তার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা নির্ধারিত করল, সেটা ঘটেছে... সুস্থ সমর্থ লোকেদের দলে ফিরেছে সে। এটার কথা কতবার না স্বপ্ন দেখেছে, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে, হাঁটা আর নাচ শেখার সময়, বিমানচালনায় নিপুণতা ফিরে পাবার কঠিন শিক্ষার সময়ে! আর এখন বহুপ্রত্যাশিত দিনটি এসেছে, দুটো জার্মান বিমান সে নামিয়েছে, জঙ্গী বৈমানিকদের পরিবারে সমান অধিকারে প্রত্যাগত আবার, অন্যদের মত সেও চিফ অব স্টাফের কাছে গিয়ে ফলাফলের কথা বলল, জানাল খুঁটিনাটি কথা, পেত্রভের প্রশংসা করল, আর যারা সেদিন ফেরেনি তাদের কথা ভেবে বার্চগাছের ছায়ায় সরে গেল।

একমাত্র পেত্রভই বিমানক্ষেতে ছোটাছুটি করছে, খালি মাথা তার, হাওয়ায় চুল উড়ছে, যাকে পাচ্ছে তার আস্তিন আঁকড়ে ধরে শোনাচ্ছে:

'...একেবারে আমার পাশে ও ছিল, প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে... শোনো... সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট দেখলাম দলের নেতার দিকে নিশানা করছে... ওর পরেরটি আমার দৃষ্টিপথে এল, ব্যস, গুলি ছুঁড়লাম!'

মেরেসিয়েভের কাছে দৌড়িয়ে গিয়ে ওর পায়ের নিচে ঘাসওয়ালা নরম শেওলার উপরে শুয়ে গা হাতপা ছড়িয়ে দিল পেত্রভ। কিন্তু এরকম আরামে শুয়ে থাকতে না পেরে লাফিয়ে উঠে বসে বলল:

'চমৎকার কয়েকটা কসরৎ আজ আপনি দেখিয়েছেন! অদ্ভুত! দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম! কী করে ওটাকে ঘায়েল করলাম, জানেন? শুনুন... আপনার পিছু পিছু গিয়ে দেখলাম একেবারে পাশে এসে পড়েছে, আপনি এখন যেমন কাছে ঠিক সে রকম...'

'থাম ত, ছোকরা!' পকেট চাপড়ে বাধা দিয়ে বলল আলেক্সেই। 'চিঠিগুলো... চিঠিগুলোর কী হল?'

চিঠিগুলো সেদিন এসেছিল, পড়ার সময় হয়নি মনে পড়ে গেল। পকেট হাতড়ে না পাওয়াতে ভয়ে ঘেমে উঠল। টিউনিকের ভেতরে খোঁজাতে খসখসে খামগুলো হাতে লাগাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আলেক্সেই। উৎসাহী তরুণটি কী বলছে তাতে কান না দিয়ে ওলিয়ার চিঠিটা বের করে সাবধানে খামের একটা কোণ ছিঁড়ল।

ঠিক সে সময়ে হাউই'এর শব্দ। লাল জ্বলন্ত একটা সাপ উঠল আকাশে, বিমান-ঘাঁটির উপরে বৃত্ত রচনা করে মিলিয়ে গেল; ধূসর ধোঁয়ার রেশ আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছে। বৈমানিকরা এক লাফে উঠে পড়ল। টিউনিকে চিঠিটা রেখে দিল আলেক্সেই, একটিও কথা পড়তে পায়নি সে। খামটা খুলতে গিয়ে লেখার পাতাটা ছাড়াও শক্ত কী একটা হাতে ঠেকেছিল। নিজের দলের পুরোভাগে এখন-পরিচিত গতিপথে উড়তে উড়তে মাঝেমাঝে হাত দিয়ে খামটা দেখে ভিতরে কী আছে ভাবল।

ট্যাঙ্ক-বাহিনী যেদিন শত্রুপক্ষের লাইন ভেদ করে সেদিন থেকে আলেক্সেই'র জঙ্গী বিমান দলের যুদ্ধ কাজ শুরু। ভাঙ্গা লাইনের দিকে যাচ্ছে স্কোয়াড্রনের পর স্কোয়াড্রন। যুদ্ধের পর ফিরে এসে নামতে না নামতেই আর একটা স্কোয়াড্রন উঠছে, প্রত্যাগত বিমানগুলোর দিকে দৌড়িয়ে যাচ্ছে পেট্রলের ট্রাক। খালি ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালা হচ্ছে দিলদরাজ ধারায়। গনগনে ইঞ্জিনগুলোর উপরে কম্পমান ঝাপসা ভাপ, গরমিকালের বৃষ্টির পরে মাঠেঘাটে যেমনটা দেখা যায়। এমন কি মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যও ককপিট

ছেড়ে বৈমানিকরা যায় না; এ্যালুমিনিয়ামের টিনে খাবার তাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু খাবার মত মেজাজ কারোর নেই, গলায় আটকে যায় খাবার।

ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রন ফিরে এসে নামল; বিমানগুলোকে বনের কাছে নিয়ে গিয়ে আবার পেট্রল ভরা হচ্ছে, হাসিমুখে ককপিটে বসে আছে মেরেসিয়েভ; দবদপে ক্লান্তির প্রীতিকর অনুভূতি শরীরে, অধৈর্যভাবে সে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে, যারা পেট্রল ভরছে তাড়া দিচ্ছে তাদের। আবার হামলায় ফিরে যেতে চায় সে, চায় নিজেকে পরখ করতে। বারবার টিউনিকের ভিতরে হাত দিয়ে খসখসে খামগুলোকে স্পর্শ করছে, কিন্তু এই অবস্থায় পড়ার ইচ্ছে নেই তার।

প্রদোষ শুরু হল, শুধু তখন বৈমানিকদের ছাড়া মিলল। আস্তানার দিকে মেরেসিয়েভ গেল, সাধারণত বনের মধ্য দিয়ে যে সোজা পথে সে যায় সেটা ধরে নয়, আগাছায়-ভরা মাঠের ঘুরপথে। আপাত শেষহীন দিনটির দ্রুত পরিবর্তিত নানা ভাবের পরে, মুখর নানা শব্দের পরে বিশ্রাম করতে, গুছিয়ে ভাবতে চায় সে।

পরিষ্কার সুগন্ধি সন্ধ্যা, এত স্তব্ধ যে কামানের দূর গর্জনকে আর যুদ্ধের আওয়াজের মত ঠেকে না, মনে হয় গতপ্রায় ঝড়ের গুরুগুরু ধ্বনি। রাস্তাটা যে মাঠ দিয়ে গিয়েছে আগে সেটা ছিল গমের ক্ষেত। সাধারণত উঠোনের কোণে কিম্বা মাঠের ধারে পাথরের স্তূপের কাছে আগাছারা সন্তর্পণে পাতলা ডাঁটা মেলে দেয়, মালিকের নজর যায় না এমন সব জায়গায়, কিন্তু এখানে অখণ্ড প্রাকারের মত বিরাট উদ্ধত বলিষ্ঠভাবে উঠেছে আগাছার ঝাড়, পরাভূত করেছে জমিকে, বহু বংশপরম্পরায় চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে জমিকে উর্বরা করেছিল। শুধু এখানে সেখানে ঘন আগাছার মধ্যে ঘাসের ক্ষীণ ডগার মত গজিয়ে ওঠে গমের কয়েকটা পাতলা শিষ। জমির সমস্ত কিছু খেয়ে ফেলেছে আগাছা, শুষে নিয়েছে সূর্যালোক, গমকে বঞ্চিত করেছে সূর্যের আলো আর আহার্য থেকে, ফুল আর শস্য হবার আগেই তাই গমের শিষগুলো শুকিয়ে গিয়েছে।

মেরেসিয়েভ ভাবল: ঠিক এইভাবে ফ্যাশিস্টরা চায় আমাদের ক্ষেতে শেকড় গজাতে, জমির সার গিলে ফেলতে, কেড়ে নিতে চায় আমাদের সম্পদ, তারপর বিকট ঔদ্ধত্যে উঠে সূর্যকে আড়াল করে আমাদের পরিশ্রমপ্রিয়, বিরাট মহান জনগণকে তাড়িয়ে দিতে চায় ক্ষেত খামার থেকে। ফ্যাশিস্টরা চায় ওদের পরাভূত করে শুষে নিতে, ঠিক যেভাবে এই আগাছাগুলো

অল্পসংখ্যক গমের শিষগুলোকে সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত করেছে, সবল সুন্দর শস্যদানার সঙ্গে বাহ্য সাদৃশ্যটুকু পর্যন্ত এখন ওদের নেই। বালকসুলভ উদ্যমের প্রেরণায় আলেক্সেই আবলুস কাঠের ছড়িটা সজোরে ঘুরিয়ে লালচে, পালকের মত আগাছাগুলোকে ঘা দিল, গোছা গোছা উদ্ধত মাথা কেটে পড়ে যাওয়াতে খুসিতে ভরে উঠল তার মন। মুখ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, তবুও গমের টুঁটি-চাপা আগাছাগুলোকে কেটে চলল আলেক্সেই, ক্লান্ত শরীরে লড়াই আর আলোড়নের আমেজে উল্লসিত সে।

অপ্রত্যাশিতভাবে পিছনে হুঙ্কার দিয়ে একটা জিপ হঠাৎ কিঁচকিঁচিয়ে ব্রেক কষে থামল পথের উপরে। ফিরে না তাকিয়েই আঁচ করল আলেক্সেই যে উইং কম্যান্ডার কাছে এসে পড়েছেন, তার বালকসুলভ কার্যকলাপ দেখেছেন তিনি। কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল তার, গাড়িটা আসার শব্দ শুনতে পায়নি এমন ভান করে, ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। কিন্তু কানে এল কর্ণেল বলছেন:

'ওগুলো কাটা হচ্ছে বুঝি? কাজের মত কাজ বটে। আর আমি সারা বিমান-ঘাঁটিতে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমাদের বীর কোথায়? কোথায় গেল? আর তিনি এখন আগাছার সঙ্গে যুদ্ধ মত্ত।'

জিপ থেকে লাফিয়ে নামলেন কর্ণেল। গাড়ি চালাতে এবং অবসর সময়ে গাড়ি নিয়ে ঘুরঘুর করতে ভালোবাসতেন তিনি, ঠিক যেমন ভালোবাসতেন কঠিন মহড়ার সময়ে নিজের দলের পুরোভাগে থাকাটা আর সন্ধ্যেবেলায় মিস্ত্রীদের সঙ্গে তৈলাক্ত ইঞ্জিনগুলো নাড়াচাড়া করা। সাধারণত নীল ওভারঅল থাকত গায়ে, শুধু তাঁর শীর্ণ, প্রভুত্বব্যঞ্জক চেহারা আর বিমান বাহিনীর চোস্ত ক্যাপটি দেখে বোঝা যেত তেলঝুল-মাখা মিস্ত্রীদের থেকে তিনি আলাদা।

তখনো বিব্রতভাবে ছড়ি দিয়ে মাটি খুঁড়ছে মেরেসিয়েভ। তার কাঁধে হাত রেখে কর্ণেল বললেন:

'দেখি আপনার চেহারাটা একবার! হুঁ, গোল্লায় যান। আহা মরি এমন কিছু না! কথাটা এখন স্বীকার করি। যখন আমাদের এখানে এলেন তখন আপনার কথা বিশ্বাস করিনি, আর্মি হেডকোয়ার্টারসে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা সত্ত্বেও। বিশ্বাস করিনি যে আবার লড়তে পারবেন। তবুও আপনি পেরেছেন! আর তাও কেমন ভাবে... এই হল আমাদের জন্মভূমি রাশিয়া! অভিনন্দন জানাই আপনাকে! আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন নিন...

"পাতাল-সহরে" যাচ্ছেন বুঝি? চলুন, আপনাকে পেঁাছিয়ে দিই. ভেতরে আসুন।'

মেঠো পথ ধরে জিপ ছুটল, মোড় নেবার সময়ে পাগলের মত হেলে পড়ে।

'শুনুন, আপনার হয়ত কিছু চাই, হয়ত আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে? আমার কাছে সাহায্য চাইতে ইতস্তত করবেন না, সাহায্য পাবার যোগ্য আপনি,' পথহীন একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে নিপুণভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন কর্ণেল; দুধারে বৈমানিকদের থাকার জায়গা, ওরা সেটার নাম রেখেছে "পাতাল-সহর"।

'আমার কিছু চাই না, কমরেড কর্ণেল। অন্যদের সঙ্গে আমার কোন তফাৎ নেই।. আমার পা নেই, সেটা লোকে ভুলে গেলে ভালো,' বলল মেরেসিয়েভ।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন... কোন ঘরটা আপনার? এটা?'

ডাগ-আউটের প্রবেশপথের সামনে ঝট করে জিপ দাঁড় করালেন কর্ণেল, মেরেসিয়েভ গাড়ি থেকে নামতে না নামতে জিপটা ধকধক শব্দে চলল বনের মধ্য দিয়ে, বার্চ আর ওকগাছের মাঝে এঁকেবেঁকে পথ করে নিয়ে।

ডাগ-আউটে গেল না আলেক্সেই। বার্চগাছের নিচে ব্যাঙের ছাতার গন্ধে-ভরা পশমের মত নরম শেওলার উপরে শুয়ে সাবধানে খাম থেকে বের করল ওলিয়ার চিঠিটা। একটা ফটোগ্রাফ গড়িয়ে পড়ল ঘাসে। তাড়াতাড়ি তুলে নিল সেটা আলেক্সেই, ব্যথায় ওর বুক ঢিপঢিপ করছে।

ফটোগ্রাফ থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে পরিচিত অথচ প্রায় চেনা যায় না একটি মানুষ। সামরিক পোশাকে ওলিয়ার ছবি: টিউনিক, পেটি, "অর্ডার অব্ দি রেড স্টার," এমন কি গার্ডের তকমা — সেটা এত সুন্দর মানিয়েছে ওকে! দেখে মনে হয় অফিসারের পোশাকে পাতলা চেহারার সুদর্শন একটি ছেলে। শুধু ছেলেটির মুখে ক্লান্তির ছাপ, আর তার দীপ্ত বড়ো চোখজোড়ায় বয়সোনুচিত তীক্ষ্ম দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ চোখজোড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আলেক্সেই। সন্ধ্যেবেলায় দূর থেকে ভেসে আসা প্রিয় গানের সুরে মনে যে অকারণ ধীর বিষণ্ণ ভাব আসে, সে ভাবে ভরে গেল তার অন্তর। পকেটে ওলিয়ার পুরোনো ছবিটা পেল — শাদা তারার মত ডেইজির মধ্যে মাঠে বসে আছে ছাপা-ফ্রক পরনে। টিউনিক-পরা ক্লান্ত চোখ মেয়েটিকে আগে কখনো দেখেনি, আশ্চর্যের

বিষয়, চেনা মেয়েটির চেয়ে তাকে ভালো লাগল আলেক্সেই'র। নতুন ফটোগ্রাফটির পিছনে লেখা: "মনে রেখো।"

চিঠিটা ছোট, কিন্তু খুসিতে ভরা। স্যাপারদের একটি প্লেটুনের ভার এখন ওলিয়ার হাতে, যুদ্ধে নিযুক্ত নয় প্লেটুনটি, বেসামরিক কাজ, স্তালিনগ্রাদের পুনর্গঠনে সাহায্য করছে। নিজের কথা বিশেষ লেখেনি ওলিয়া, মহান সহরটির কথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছে: সহরটির ভগ্নাবশেষে প্রাণ ফিরে আসছে আবার, পুনর্গঠনের জন্য দেশের সব জায়গা থেকে এসেছে ছেলে মেয়ে আর প্রবীণারা, তাদের বাসা হল মাটির নিচে ঘর, কামান বসাবার জায়গা, বাংকার — লড়াই শেষ হবার পরে টিঁকে গিয়েছে সেগুলো — ট্রেঞ্চের কামরা, প্লাই-উডের ব্যারাক আর খোঁদল। লোকে বলছে যারা ভালো কাজ করবে তারা প্রত্যেকে পুনর্গঠিত সহরে ফ্ল্যাট পাবে। সেটা যদি সত্যি হয় তবে যুদ্ধ শেষ হলে বাসার অভাব আলেক্সেই'র হবে না।

গ্রীষ্মকালের গোধূলি নেমেছে তাড়াতাড়ি। টর্চের আলোয় চিঠির শেষ কয়েকটি ছত্র আলেক্সেই পড়ল। পড়া শেষ হয়ে গেলে ফটোগ্রাফটির উপরে আলো ফেলল। কঠিন অকপট চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ছেলে-সৈনিকটি। "প্রিয়তমা, তোমাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হচ্ছে... যুদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়ে যায়নি বটে, কিন্তু ভেঙ্গে ত পড়নি তুমি! তুমি কি প্রতীক্ষায় আছ? ধৈর্য ধর। আমি আসবই। আমাকে তুমি ভালোবাসো, বরাবর ভালোবেসো।" স্তালিনগ্রাদ যোদ্ধাটির কাছ থেকে আঠারো মাস নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চেপে রেখেছে বলে হঠাৎ লজ্জিত বোধ করল আলেক্সেই। প্রবল ইচ্ছে হল তক্ষুণি ভাগ-আউটে গিয়ে খোলাখুলিভাবে সবকিছু ওকে লেখে — যা ঠিক করবার ও যত শীগগির করে ততই ভালো। ব্যাপারটার ফয়সলা হয়ে গেলে দুজনের পক্ষেই মঙ্গল।

আজকের কীর্তিকলাপের পরে ওর সমকক্ষভাবে আলেক্সেই কথা বলতে পারে ওলিয়ার সঙ্গে: শুধু যে বিমান চালাচ্ছে নিজে তা নয়, লড়াইও করছে। নিজের কাছে ত শপথ করেছিল যে হয় সব আশা ভেঙ্গে গেলে নয় লড়াই'এ অন্যদের সমকক্ষ হলে সবকিছু জানাবে ওকে। সিদ্ধিলাভ করেছে সে। ওর নামানো বিমানদুটো সবায়ের চোখের সামনে ঝোপঝাড়ে পড়ে জ্বলেছে। উইঙের খাতায় ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছে সেদিনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, খবরটা গিয়েছে ডিভিশনাল ও আর্মি হেডকোয়ার্টারসে, মস্কোতেও।

এ সব সত্যি। নিজের অঙ্গীকার রেখেছে সে, এখন লিখতে পারে। কিন্তু একটা "স্তুকা" কি জঙ্গী বিমানের যোগ্য শিকার? ভাববার বিষয় সেটা। সত্যিকার শিকারী নিজের দক্ষতার কথা তুলে বলবে না যে সে, এই ধর না কেন, একটা খরগোস মেরেছে, বলবে কি?

বনে জোলো রাত্রি অন্ধকার হয়ে এল। যুদ্ধের বজ্রনির্ঘোষ দক্ষিণে চলে গিয়েছে, দূর অগ্নিকাণ্ডের রক্তাভা গাছের ডালপালার জাল ভেদ করে প্রায় দেখা যায় না, আর তাই স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে সুগন্ধি সতেজ গ্রীষ্মকালীন বনের সমস্ত শব্দ, ফাঁকা জায়গায় গঙ্গাফড়িঙের উন্মত্ত খসখস আওয়াজ, কাছের বিলে শত শত ব্যাঙের ডাক, একটি সারসের সুতীব্র চীৎকার, আর সবকিছু ছাপিয়ে ভিজে আধো-অন্ধকারে নাইটিংগেলের গান।

শিশিরে-ভেজা নরম শেওলার উপরে বার্চগাছের নিচে আলেক্সেই তখনো বসে, চাঁদের আলোর টুকরো কালো ছায়ায় মিশে পায়ের নিচে ঘাসে এসে পড়ছে। আবার পকেট থেকে ফটোটি বের করে হাঁটুর উপরে রেখে চাঁদের আলোয় সেদিকে তাকিয়ে থেকে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল আলেক্সেই। মাথার উপরে পরিষ্কার ঘন নীল আকাশে নৈশ বোমারু বিমানের ছোট কালো ছায়া একটার পর একটা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের শব্দ নিচু, খাদের সুরে বাঁধা, কিন্তু নাইটিংগেলের সঙ্গীতমুখর চন্দ্রালোকিত বনে যুদ্ধের এই শব্দটি পর্যন্ত শোনাচ্ছে গুবরে-পোকার শান্ত গুঞ্জনের মত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছবিটা টিউনিকের পকেটে রেখে আলেক্সেই সটান দাঁড়িয়ে উঠল, রাত্রির মোহ কাটাবার জন্য গা ঝাড়া দিল। পায়ের নিচে শুকনো ডালপালার খসখস, তাড়াতাড়ি সে নামল ডাগ-আউটে, সৈনিকের অপরিসর বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে দৈত্যের মত শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে পেত্রভ, নাক ডাকছে জোরে।

৫

ভোর হবার আগে বৈমানিক দলকে তুলে দেওয়া হল। আর্মি হেডকোয়ার্টারসে খবর এসেছে, যে-এলাকায় সোভিয়েত ট্যাঙ্ক লাইন ভেঙে এগিয়ে গিয়েছিল সেখানে তার আগের দিন জার্মান বিমানের একটা বড়ো দল এসেছে। কুর্স্ক স্যালিয়েন্টের একেবারে পীঠদেশের বূহ ভেদ করে সোভিয়েত ট্যাঙ্কের অগ্রগতি যে বিপজ্জনক ব্যাপার সেটা বোধগম্য হয়েছে জার্মান কমাণ্ডের, তাই তলব করা হয়েছে সেরা জার্মান বৈমানিকরা যে দলে

আছে সেই "রিখথোফেন" বিমান ডিভিশনকে; পর্যবেক্ষণ আর স্কাউটদের আনা খবর সোভিয়েত হেডকোয়ার্টারসের এই ধারণা সমর্থন করল। স্তালিনগ্রাদের কাছে ছত্রভঙ্গ এই ডিভিশনটিকে পরে ফ্রন্ট লাইনের অনেক পিছনে কোথাও পুনর্গঠিত করা হয়। বৈমানিকদের সতর্ক করা হল যে শত্রু সংখ্যায় অনেক, একেবারে হালের বিমান... "ফোক-উলফ-১৯০" আছে ওদের, আর বিশেষ অভিজ্ঞ বৈমানিক ওরা, লড়াই করেছে অনেক। সে রাত্রে ফাঁক দিয়ে ট্যাঙ্কের অনুসরণ করতে শুরু করেছে মোটর চালিত বাহিনীর দ্বিতীয় দল, বৈমানিকদের সজাগ থাকতে এবং দলটিকে নির্ভরযোগ্য রক্ষণের কাজ করতে আদেশ দেওয়া হল।

"রিখথোফেন!" অভিজ্ঞ বৈমানিকরা নামটির সঙ্গে ভালো করে পরিচিত, হেরমান হেরিঙের বিশেষ পেটোয়া দল এটি। জার্মান সৈন্যরা কোণঠেসা হলেই দলটিকে পাঠানো হয়। এটির বৈমানিকরা — তাদের কয়েকজন প্রজাতান্ত্রিক স্পেনে বোম্বেটে যুদ্ধ চালিয়েছিল — হিংস্র দক্ষ লড়ুয়ে, বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে খ্যাতি ছিল তাদের।

'ওরা বলছে "রিখথোফেন" গোছের কী সব পাঠিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে! কী মজা! আশা করি শীগগিরই মুলাকাৎ হবে! "রিখথোফেনদের" আমরা দেখিয়ে দেব!' খাবার ঘরে বসে ভারিক্কি চালে বলল পেত্রভ, তাড়াতাড়ি খাবার গিলতে গিলতে আর জানলার দিকে তাকিয়ে, সেখানে ওয়েট্রেস রায়া বড়ো একটা গোছা থেকে ফুল বেছে, খড়ি দিয়ে মাজা ঝকঝকে ফাঁকা গোলার খাপে রাখছে।

বলাই বাহুল্য "রিখথোফেনদের" বিষয়ে এই বেপরোয়া উক্তিটি কফি পানরত আলেক্সেইকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি, কথাটা বলা হয়েছিল মেয়েটির জন্য, ফুল নিয়ে ব্যস্ত সে, মাঝেমাঝে সুদর্শন ফুটফুটে পেত্রভের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। অনুগ্রহসূচক হাসিতে দুজনকে দেখছিল আলেক্সেই, কিন্তু কাজ নিয়ে হাসি তামাসা আর বাচালতা তার পছন্দ নয়।

'"রিখথোফেন" যা-তা নয়,' আলেক্সেই বলল। 'আর "রিখথোফেন" মানে: যদি বনবাদাড়ে আজ পুড়তে না চাও তাহলে চোখজোড়া হামেশা খোলা রাখবে। ওটার মানে: কান খাড়া করে রাখবে, অন্যদের সঙ্গ ছাড়বে না। "রিখথোফেনরা" ছোকরা, বুনো জন্তুর মত, কোথায় আছ খেয়াল করতে না করতে শরীরে দাঁত বসিয়ে দেয়...'

ভোরবেলায় স্বয়ং কর্ণেলের পরিচালনায় প্রথম স্কোয়াড্রনটি আকাশে

উঠল। বারোটি জঙ্গী বিমানের আর একটি দল তৈরী হল ওঠবার জন্য। সেটির ভার "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর," গার্ডস-মেজর ফেদোতভের হাতে, কম্যান্ডারকে বাদ দিয়ে তিনি দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ বৈমানিক। বিমানগুলো প্রস্তুত, ককপিটে বসেছে বৈমানিকরা, নিচু গিয়ারে ইঞ্জিনগুলো বনের ধার ঘেঁষে হাওয়ার ঝটকা পাঠাচ্ছে, ঝড়ের আগে মাটি-ঝাঁটানো গাছ-নাড়ানো হাওয়ার মত, যখন বৃষ্টির প্রথম বড়ো ভারী ভারী ফোঁটা তৃষ্ণার্ত পৃথিবীতে সশব্দে পড়তে শুরু করে।

ককপিটে বসে আলেক্সেই দেখল প্রথম দলের বিমানগুলো খাড়া হয়ে নিচে নামছে, যেন আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। অভ্যাসবশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিমানগুলো গুণল সে, দুটোর নামতে একটু দেরী হওয়াতে উৎকণ্ঠায় সচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ বিমানটি নেমে এল। সবাই ফিরেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আলেক্সেই।

শেষ বিমানটি এক পাশে সরে যেতে না যেতেই মেজর ফেদোতভের "পয়লা" সজোরে উপরে উঠল, পিছু পিছু জোড়ায় জোড়ায় উঠল অন্য জঙ্গী বিমানগুলো। বনের ওধারে সারি বাঁধল তারা। গতিপথ দেখিয়ে চলেছেন ফেদোতভ। নিচুতে থেকে, ব্যূহভঙ্গের এলাকার উপরে সতর্কভাবে উড়ে চলল সবাই। আলেক্সেই দেখল তার বিমানের নিচে মাটিটা দৌড়িয়ে চলেছে, খুব উঁচু থেকে দূর পরিপ্রেক্ষিতে এবারে নয়, সে পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু দেখায় খেলনার মত, দেখল খুব কাছে থেকে। আগের দিন উপর থেকে যেটাকে খেলার মত মনে হয়েছিল এখন সেটা চোখের সামনে উপস্থিত বিরাট সীমাহীন রণক্ষেত্রের মত। বিমানের ডানার নিচে উন্মত্তগতিতে ধেয়ে চলেছে গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত, ট্রেঞ্চে কাটা এবড়োখেবড়ো মাটঘাট ঝোপঝাড়। মাঠে পড়ে আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাশ; পরিত্যক্ত কামান এক একটা, মায় গোটা ব্যাটারি, ভাঙ্গা ট্যাঙ্ক; যেখানে সৈন্যদলের উপরে গোলাগুলি বর্ষিত হয়েছিল সেখানে বাঁকাচোরা লোহা আর কাঠের ভারী স্তূপ; ভূমিসাৎ একটি বড়ো বন, উপর থেকে মনে হয় জানোয়ারের বিরাট পাল পায়ে দলেছে সেটাকে — সিনেমায় নানা দৃশ্যের মত সবেগে ভেসে যাচ্ছে, মনে হয় সিনেমাটির শেষ নেই। কী ভীষণ রক্তাক্ত যুদ্ধ চলে এখানে, কী দারুণ লোকক্ষয় হয়েছে, জয়লাভের গুরুত্বটা কত বিরাট দৃশ্যগুলি তার সাক্ষী।

বিস্তীর্ণ জায়গাটির সমস্তটা জুড়ে শত্রুপক্ষের অবস্থানের অনেক দূর

পর্যন্ত, প্রায় আদিগন্ত গিয়েছে ট্যাঙ্কের চাকার জোড়া জোড়া আঁকাবাঁকা দাগ, যেন অদ্ভুত জানোয়ারের বিরাট একটা দল পথ না বেছে মাঠঘাট হয়ে দৌড়িয়ে, সমস্ত কিছু পায়ে দলে দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। মোটরচালিত কামান, পেট্রলের ট্যাঙ্ক, ট্রাক্টরে-টানা মেরামতের গাড়ি আর ঢাকা-দেওয়া লরি অন্তহীন সারিতে ট্যাঙ্কের পিছনে পিছনে চলেছে, ধুলোর গাঢ় পুচ্ছ অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। উপর থেকে মনে হয় এদের গতি শামুকের মত; আরো উঁচুতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এ সবকিছুকে দেখায় যেন বসন্তে বনের পথে অগ্রসর পিঁপড়ের বাহিনী।

অচঞ্চল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠছে ধুলোর রেখা, তাতে ঝাঁপিয়ে, যেন মেঘে ডুব মারছে এমনভাবে জঙ্গী বিমানগুলো সারির উপর দিয়ে গেল অগ্রগামী জিপগুলোর দিকে, ট্যাঙ্ক-বাহিনীর কম্যাণ্ডাররা বুঝি তাতে আছে। এদের উপরে আকাশে শত্রু বিমান নেই, দূরে ঝাপসা দিগন্তে যুদ্ধের ইতস্তত ধূম্ররেখা এরি মধ্যে চোখে পড়ে। বিমান দল পিছন ঘুরে সাপের মত এঁকেবেঁকে অগাধ আকাশে উড়ে চলল। ঠিক সেই মুহূর্তে আলেক্সেই দেখল দিগন্তে প্রথমে একটা, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে কালো দাগ খুব নিচুতে ভাসছে। জার্মানরা! ওরাও খুব নিচু দিয়ে প্রায় জমি ঘেঁষে আসছে, আগাছায়-ভরা লালচে মাঠের উপরে ধোঁয়ার রেখা যে ওদের লক্ষ্য বোঝা গেল। পিছন ফিরে স্বতই তাকাল আলেক্সেই। পেত্রভ ওর পিছনে, যতখানি কাছে থাকা যায় ততখানি কাছে।

কান পেতে আলেক্সেই শুনল দূর থেকে কে বলছে:

'আমি ২ নং গাঙচিল ফেদোতভ; আমি ২ নং গাঙচিল, ফেদোতভ। এ্যাটেনশন! আমার পিছনে চল!'

ওড়বার সময়ে জ্যাবদ্ধ থাকে বৈমানিকদের স্নায়ু, তখন আদেশ পালন করার ব্যাপারটা এমন যে অনেক সময় কমাণ্ডার হুকুম দিতে না দিতেই তার অভিপ্রায় মেনে চলে তারা। নানা আওয়াজ আর গুঞ্জনের মধ্যে নতুন আদেশটি শোনার আগেই সমস্ত দলটি জার্মানদের বাধা দেবার জন্য জোড়ায় জোড়ায় কিন্তু সার বেঁধে ঘুরল। দর্শন ও শ্রবণশক্তি আর মন একাগ্র। চোখের সামনে শত্রু বিমানগুলো দ্রুতবেগে বড়ো হচ্ছে. তা ছাড়া আর কিছু দেখছে না আলেক্সেই; দ্বিতীয় হুকুমটি কখন শুনবে তার প্রতীক্ষায় আছে, ইয়ারফোনে শুধু নানা চড়মড়, গুনগুন ধ্বনি। কিন্তু হুকুমটির জায়গায় স্পষ্টভাবে কানে এল জার্মান ভাষায় কার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর:

'আখটুং! আখটুং!.. "লা-ফিউন্ফ্!" আখটুং!* নিচের পরিদর্শক জার্মান বিমানগুলোকে বিপদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, তার কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই।

যথারীতি বিখ্যাত জার্মান বিমান ডিভিশনটি যেসব জায়গায় আকাশ যুদ্ধ হবে বলে মনে করেছে সেসব জায়গায় আগের দিন রাত্রে পারাস্যুটে লক্ষ্যকারী আর পরিদর্শক নামিয়েছে; রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে তারা কয়েকটি দলে সতর্কভাবে যুদ্ধভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

পরে অত স্পষ্টভাবে নয়, কানে এল আর একজন ভাঙ্গা গলায় ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে জার্মানে বলছে:

'দনের-ভেতের! লিঙ্ক্স "লা-ফিউন্ফ্!" লিঙ্ক্স "লা-ফিউন্ফ!"'**

বিরক্তি ছাড়াও সে কণ্ঠস্বরে ছিল আতঙ্কের আভাস।

'"রিখথোফেন," আমাদের "লাভচ্কিনদের" তোমরা ভয় পাও না নিশ্চয়ই,' মেরেসিয়েভ দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল, শত্রু বিমানগুলো সার বেঁধে আসছে, তাদের দেখতে দেখতে টান-টান শরীর উত্তেজনায় সচকিত হয়ে উঠল।

এবার শত্রু বিমানগুলো স্পষ্টভাবে গোচরে এসেছে। এরা হল "ফোক-উলফ-১৯০"। সবেমাত্র কাজে লাগানো হয়েছে সবল দ্রুতগতি বিমানগুলোকে।

সংখ্যায় তারা ফেদোতভের দলের চেয়ে দ্বিগুণ। যে ধরাবাঁধা কায়দা "রিখথোফেন" বাহিনীর বৈশিষ্ট্য সেই কায়দায় উড়ছে তারা, জোড়ায় জোড়ায়, মই'এর ধাপের মত, যাতে প্রত্যেকটি জোড়া সামনের বিমানদুটির পিছন দিকটা রক্ষা করতে পারে। উচ্চতার সুবিধে নিয়ে ফেদোতভ ওদের আক্রমণ করল। নিজের লক্ষ্য বাছাই করে নিয়েছে আলেক্সেই, অন্যদের নজরে রেখে সেদিকে চলেছে, চেষ্টা করছে যাতে সেটা দৃষ্টির বাইরে চলে না যায়। কিন্তু ফেদোতভের আগেই অন্য কে যেন কাজে নেমে পড়ল। অন্যদিক দিয়ে ঝড়ের মত এসে একদল "ইয়াক" উপর থেকে জার্মানদের দ্রুতবেগে আক্রমণ করল। আঘাতটা এত সফল যে তৎক্ষণাৎ শত্রুদের দল ভেঙ্গে গেল। আকাশে বিশৃঙ্খলা। দু পক্ষই দল ভেঙ্গে দুই'এ দুই'এ. চারে চারে লড়াই করছে। জঙ্গী বিমানগুলি ট্রেসার গুলির ফোয়ারা ছুটিয়ে চেষ্টা করছে শত্রুদের কেটে দিতে, পাশে এবং পিছনে গিয়ে পড়তে।

* এ্যাটেনশন! এ্যাটেনশন! "লাভচ্কিন-৫"! এ্যাটেনশন! (জার্মান ভাষায়)

** সর্বনাশ! বাঁয়ে! "লাভচ্কিন-৫"! বাঁয়ে! "লাভচ্কিন-৫"! (জার্মান ভাষায়)

জোড়া বিমানগুলি চক্রাকারে ঘুরছে, তাড়া করছে অন্যদের, জটিল নাগরদোলার মত তাদের সঞ্চরণ।

এই বিশৃঙ্খলায় ঠিক কী ঘটছে শুধু অভিজ্ঞ লোকেই বুঝতে পারে, ঠিক যেমন ইয়ারফোনে বিশৃঙ্খল হট্টগোলের অর্থ অভিজ্ঞ বৈমানিকের কানে ধরা পড়ে। সে সময়ে আকাশে কী না শোনা যায়! আক্রমণকারীরা ভাঙ্গা গলায় রসালো গালিগালাজ করছে, বিজয়ের উল্লসিত আর পরাজয়ের ভয়ার্ত চীৎকার, আহতদের আর্তনাদ, হঠাৎ মোড় নিতে নিতে দাঁতে দাঁত চাপছে কোন বৈমানিক, ভারী নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ... যুদ্ধের উন্মত্ততায় কে যেন গলা ফাটিয়ে জার্মান গান গাইছে, কে যেন রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল "মা"! কে যেন ঘোড়া টিপতে টিপতে বলল, "ঠেলা সামলাও এবার!"

মেরেসিয়েভের লক্ষ্য বিমানটি দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। তার পরিবর্তে উপরে দেখল একটি "ইয়াককে" পিছু ধাওয়া করেছে একটি চুরোটাকৃতি সোজা-পাখা "ফোক", দুপাশ থেকে ইতিমধ্যেই সমান্তরালভাবে ট্রেসার গুলির ফোয়ারা ছুটছে। "ইয়াকের" লেজে এসে পড়ছে গুলির ধারা। সেটিকে বাঁচাবার জন্য রকেটের মত উপরে উঠল মেরেসিয়েভ। মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য ঝট করে উপর দিয়ে একটি ছায়া গেল, আর সেই ছায়া লক্ষ্য করে সমস্ত কামান ছোটাল মেরেসিয়েভ। "ফোকটার" কী হল দেখতে পেল না মেরেসিয়েভ শুধু নজরে পড়ল "ইয়াকটা" এখন একলা, লেজটা জখম বটে। গন্ডগোলের মধ্যে পেত্রভ হারিয়ে গিয়েছে কি না দেখবার জন্য পিছন ফিরে তাকাল মেরেসিয়েভ। না, ও প্রায় তার বরাবর উড়ছে।

'পিছনে পড়ে থেক না, ছোকরা,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল আলেক্সেই।

চড়চড়, গুনগুন, গান, দুই ভাষায় উল্লসিত ও ভয়ার্ত চীৎকার, গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ, দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ, গালিগালাজ, গভীর নিশ্বাসপ্রশ্বাস — আলেক্সেই'র কানে তালা ধরে গিয়েছে। শব্দগুলো শুনে মনে হয় না আকাশ-যুদ্ধ চলেছে, মনে হয় মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে হাতাহাতি করে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণে লড়ছে লোকে।

শত্রু বিমান কোথায় দেখার জন্য ফিরে তাকাল মেরেসিয়েভ, আর হঠাৎ শরীর হিম হয়ে গেল। ঠিক নিচে, একটা "ফোক" একটি "লাভচ্কিন-৫"কে আক্রমণ করেছে। সোভিয়েত বিমানটির নম্বর দেখতে পেল না আলেক্সেই, কিন্তু বুঝতে পারল ওটা পেত্রভের। "ফোক-উলফটা" আক্রমণ করেছে, সমস্ত কামান থেকে একসঙ্গে ছুটেছে ট্রেসার গুলি। আর এক মুহূর্ত শুধু পেত্রভ

টি'কে থাকবে! ওরা দ্ৰজনে এত কাছাকাছি যে আকাশ-যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম মেনে বন্ধুকে ঝট করে সাহায্য করার উপায় নেই, না আছে সময়, না আছে ঘোরবাব জায়গা। কিন্তু বন্ধুর জীবন সংশয়, তাই অসাধারণ একটা চালের ঝুঁকি নেবে ঠিক করল আলেক্সেই। সটান নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, গ্যাস বাড়িয়ে দিল। বিমানটির ভার জাড্যে আর ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তির সঞ্চারে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে, পাথরের মত, না, পাথরের মত নয়, রকেটের মত বিমানটি হ্রস্ব-পাখা "ফোকটির" উপরে সটান পড়ল, ট্রেসার গুলির জালে সেটিকে আচ্ছন্ন করে। প্রচণ্ড গতিবেগ আর দ্রুত অধোগতির জন্য চেতনা লুপ্ত হবার অনুভূতি আলেক্সেই'র, সটান ঝাঁপিয়ে নিচে পড়ল সে, ঝাপসা চোখে কোনক্রমে দেখল যে নিজের প্রপেলারের ঠিক সামনে বিস্ফোরণের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল "ফোকটি"। কিন্তু পেত্রভ কোথায়? কোন পাত্তা নেই। বিমানটি নামিয়ে দিয়েছে কি ওরা? পারাস্যুট নামতে পেরেছে? এড়িয়ে যেতে পেরেছে?

আকাশ ফাঁকা। নিঃশব্দ হাওয়ায় অদৃশ্য বিমান থেকে সুদূর কণ্ঠস্বর কানে এল:

'আমি ২ নং গাঙচিল, ফেদোতভ। আমি ২ নং গাঙচিল, ফেদোতভ। আমার পিছনে সার বাঁধ। ফিরে চল! আমি ২ নং গাঙচিল...'

ফেদোতভ নিজের দলকে তাহলে অপসরণ করছে।

"ফোক-উলফটিকে" সারা করে, বেপরোয়া পতনের পরে বিমানটিকে সোজা করে আলেক্সেই বসে আছে, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে; আকাশ এখন প্রশান্ত, ভালো লাগছে সেটা, বিপদ অতিক্রান্ত, বিজয়ের সচেতনতা মনে। ফেরবার গতিপথ ঠিক করার জন্য তাকাল কম্পাসের দিকে, তারপর পেট্রলের কাঁটার দিকে। ভুরু কোঁচকাল। পেট্রল অনেক কমে গিয়েছে, কোনক্রমে ঘাঁটিতে পেঁছিন যেতে পারে। কিন্তু পর মুহূর্তে শূন্যের কাছাকাছি পেট্রলের কাঁটার চেয়েও ভয়াবহ আর একটি জিনিস আলেক্সেই দেখল — একটি তরঙ্গিত মেঘের পিছন থেকে, ভগবান জানেন কোথা থেকে, একটা "ফোক-উলফ-১৯০" সটান তার দিকে আসছে। ভাববার সময় নেই, এড়িয়ে যাবার সময় নেই।

শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য ক্ষিপ্রভাবে বিমান ঘোরাল আলেক্সেই।

যে রাস্তা ধরে আক্রমণকারী বাহিনীর পশ্চাদবর্তী সৈন্যদল একটানা চলেছে, তার উপরে আকাশ-যুদ্ধের নানা শব্দ শুধু যে যুদ্ধরত বিমানগুলির ককপিটে বৈমানিকদের কানে যাচ্ছে তা নয়।

গার্ডস ফাইটার উইঙ্গের কম্যাণ্ডার কর্ণেল ইভানভ বিমানভূমিতে বড়ো একটা পরিচালনা-রেডিও বসিয়েছেন, তা দিয়েও শব্দগুলি শোনা যাচ্ছে। তিনি নিজে অভিজ্ঞ বৈমানিক, যে সব শব্দ আসছে তা শুনে বুঝতে পারলেন যে কড়া যুদ্ধ চলেছে, শত্রুপক্ষ জোরালো আর একরোখা, আকাশ ছেড়ে চলে যেতে একেবারে রাজী নয়। ফেদোতভের লোকেরা দলেভারি শত্রুদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে, খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিমান-ঘাঁটিতে। যারাই পারল তারাই বন থেকে খালি জায়গাটায় এসে উৎকণ্ঠিতভাবে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রইল, বিমানগুলির ওদিক থেকে ফেরার কথা।

শাদা ওভারঅল পরনে সার্জনরা খাবার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, খাবার চিবোতে চিবোতে তারা দৌড়চ্ছে। ছাতে বড়ো বড়ো রেডক্রস চিহ্নিত এম্বুলান্সের গাড়িগুলো ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে, ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আওয়াজ, কাজে লাগার জন্য তৈয়ার গাড়িগুলো।

প্রথম বিমানজোড়াটি গাছের মাথার উপর দিয়ে এসে পড়ল, বিমানভূমির উপরে চক্রাকারে না ঘুরেই নেমে প্রশস্ত জায়গাটির উপর দিয়ে চলল। জোড়ার একটা হচ্ছে "পয়লা", সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ফেদোতভ তার চালক আর একটি হল "দোসরা", চালক হল তাঁর অনুসরণকারী। ঠিক পরেই এল দ্বিতীয় জোড়াটি। বনের উপরে আকাশ ফিরতি বিমানগুলির ইঞ্জিনের গর্জনে মুখর।

'সাত, আট, নয়, দশ,' আকাশের দিকে ক্রমশ বর্ধিষ্ণু উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে দর্শকেরা গুণছে।

ফিরে-আসা বিমানগুলি নেমে মাঠ ছেড়ে ঢাকা জায়গায় চলে গেল, থেমে গেল তাদের আওয়াজ। দুটো বিমান এখনো ফেরেনি।

প্রতীক্ষারত লোকেরা উদগ্রীব, চুপচাপ। মুহূর্তগুলি কাটছে যন্ত্রণাদায়ক মন্থরতায়।

'মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ,' একজন আস্তে আস্তে বলল।

হঠাৎ বিমানভূমিতে শোনা গেল উল্লসিত নারীকণ্ঠ:

'ওই একটা!'

কানে এল বিমান ইঞ্জিনের গর্জন। বার্চগাছের উপর দিয়ে প্রায় তাদের ঘেঁষে "দ্বাদশ" এল। জখম হয়েছে বিমানটি, লেজের একটা ভাগ নেই, বাঁদিকের ডানার গোড়াটা ছিন্ন, বাকিটা এক ফালি তারে ঝুলছে। নেমে বিচিত্রভাবে হেলে দুলে চলল সেটা; সজোরে উপর দিকে উঠল, নেমে আবার লাফাল, আর এইভাবে বিমানভূমির সীমা পর্যন্ত গিয়ে একেবারে থেমে পড়ল, লেজটা একটু উঁচু হয়ে আছে। পাদানিতে সার্জন বসা এম্বুলেন্সগুলো, কয়েকটা জিপ আর প্রতীক্ষারত লোকেদের সবাই দৌড়িয়ে গেল সে দিকে। ককপিট থেকে উঠল না কেউ।

ঢাকনা সরানো হল। ককপিটে জড়পুত্তলির মত পড়ে আছে রক্তাক্ত পেত্রভ। মাথাটা অসহায়ভাবে বুকে ঝুলে পড়েছে। ভিজে সোনালী চুলের গোছায় মুখ ঢাকা। পেটিগুলো সার্জন আর নার্সরা খুলে ফেলল, গুলির টুকরোয় পারাসুটে ব্যাগটা ছিঁড়ে গিয়েছে, সেটা সরিয়ে নিশ্চল দেহটি সাবধানে তুলে জমির উপরে রাখল। পেত্রভের পা আর হাত জখম হয়েছে। নীল ওভারঅলের উপরে কালো কালো দাগ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রাথমিক সাহায্যের পরে স্ট্রেচারে শোয়ানো হল পেত্রভকে। এম্বুলান্সে তোলা হচ্ছে, চোখ খুলল ও। ফিসফিসিয়ে কী যেন বলল, কিন্তু এত ক্ষীণ কণ্ঠে যে শোনা গেল না। মুখ কাছে নামালেন কর্ণেল।

'মেরেসিয়েভ কোথায়?' আহত পেত্রভ জিজ্ঞেস করল।

'এখনো ফেরেনি।'

স্ট্রেচারটা তোলা হল আবার, কিন্তু সজোরে মাথা নাড়ল আহত লোকটি, এমন কি নেমে পড়ার চেষ্টা পর্যন্ত করল।

'দাঁড়াও!' ও বলল। 'আমাকে নিয়ে যেও না। যেতে চাই না আমি। মেরেসিয়েভের অপেক্ষা করব। আমাকে বাঁচিয়েছে ও।'

বৈমানিক এত সজোরে আপত্তি জানাল আর ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলার ভয় দেখাল যে হাত নাড়লেন কর্ণেল, মুখ ঘুরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন:

'বেশ। থাকুক এখানে। মারা পড়বে না। মেরেসিয়েভের তেল যা আছে তাতে আর এক মিনিট মাত্র চলবে।'

স্টপ-ওয়াচ থেকে চোখ সরাতে পারলেন না কর্ণেল, লাল কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি এক একটি করে শেষ হচ্ছে। অন্য সবাই তাকিয়ে আছে ধূসর বনের দিকে, শেষ বিমানটির আসার কথা তার উপর দিয়ে। সবাই উৎকর্ণ,

কিন্তু কামানের দূর গুরুগুরু গর্জন আর কাছাকাছি একটি কাঠঠোকরার চাপা ঠকঠক শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

মাঝেমাঝে মিনিটের মেয়াদ কত না দীর্ঘ!

৭

শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য মেরেসিয়েভ ফিরল।

"লাভচ্‌কিন-৫" ও "ফোক-উলফ-১৯০" দুটোই ক্ষিপ্র বিমান। বিদ্যুৎবেগে দুটো পরস্পরের কাছে এল।

আলেক্সেই মেরেসিয়েভ আর বিখ্যাত "রিখথোফেন" ডিভিশনের অজানা পাকা বৈমানিকটি পরস্পরকে সরাসরি আক্রমণ করল। এ ধরনের আক্রমণ মুহূর্তের বেশী স্থায়ী হয় না, পাকা ধূমপায়ীর সিগারেট ধরাতে যত সময় লাগে এমন কি তার চেয়েও কম। কিন্তু মুহূর্তটি উদগ্র স্নায়বিক উত্তেজনায় সংহত, বৈমানিকের সমস্ত স্নায়ুর কঠোর পরীক্ষা চলে, ভূমিতে লড়াই করে যারা, সারাদিন যুদ্ধ করেও তাদের তেমন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় না।

যতখানি সম্ভব ক্ষিপ্র বেগে দুটি দ্রুতগতি জঙ্গী বিমান পরস্পরকে আক্রমণ করছে, তার একটি চালকের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করুন। চোখের সামনে প্রতিপক্ষের বিমানটির আকার বাড়ছে। হঠাৎ একেবারে সামনে দেখতে পেলেন খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু; ডানা, ঘুরন্ত প্রপেলারের ঝকঝকে বৃত্ত, কালো কালো বিন্দু, সেগুলো হল কামান। আর একটি মুহূর্ত, অমনি বিমানদুটির ধাক্কা লাগবে পরস্পরের সঙ্গে, ভেঙ্গেচুরে বিছিন্ন হয়ে যাবে এত অসংখ্য টুকরোয় যে কোনটি বৈমানিকের শরীরের অবশিষ্টাংশ আর কোনটিই বা বিমানের বের করা অসম্ভব হবে। শুধু ইচ্ছাশক্তি নয়, বৈমানিকের সমস্ত মনোবলের অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত সেটি। দুর্বলচিত্ত লোক সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না, জয়লাভের জন্য প্রাণ দিতে সে প্রস্তুত নয়। কিছু না ভেবেই স্টিকটা টানবে সে, ক্ষিপ্রবেগে আগুয়ান মারাত্মক প্রচণ্ড ঝড়টি লাফিয়ে পেরিয়ে যাবে। পর মুহূর্তে তার বিমানটি মাটিমুখো পড়বে, তলাটা কেটে গিয়েছে, হয়ত বা একটা ডানা খসে পড়েছে। তার পরিত্রাণ নেই। পাকা বৈমানিকদের এটা বিলক্ষণ জানা, সবচেয়ে সাহসী যারা শুধু তারাই সরাসরি আক্রমণের ঝুঁকি নেয়।

আকাশ ছিঁড়ে আসছে বিমানদুটো।

আলেক্সেই জানত, যে আসছে ওর দিকে সে আনাড়ি নয়. পূর্ব ফ্রন্টে বিষম লোকক্ষয়ের পরে জার্মান বিমান বাহিনীর ফাঁকা জায়গা ভরাবার জন্য হেরিঙের আদেশে তালিকাভুক্ত, সংক্ষিপ্ত কর্মসূচীতে তাড়াতাড়ি তালিম-দেওয়া লোক নয়। "রিখথোফেন" বাহিনীর ঝানু বৈমানিক সে. আকাশে অনেক জয়ের চিহ্ন হিসেবে নিশ্চয়ই বিমানটির পাশে পরাভূত নানা বিমানের কালো ছায়া আঁকা। সে দ্বিধা করবে না, গতিপথ থেকে যাবে না সরে, যুদ্ধ এড়াবে না।

'সামাল, "রিখথোফেন",' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল আলেক্সেই। এত জোরে ঠোঁটদুটি চাপা যে রক্ত গড়াতে লাগল, সমস্ত পেশী সঙ্কুচিত করে, লক্ষ্যপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ইচ্ছাশক্তি সংহত করে আছে সে, যাতে সরাসরি আক্রমণোদ্যত বিমানটি এসে পড়লে চোখ বুজে না ফেলে।

স্নায়ু এত বেশী সংহত করেছে আলেক্সেই যে ঘূর্ণ্যমান প্রপেলারের ঝাপসা ঝড় ভেদ করে মনে হল শত্রু বিমানটির ককপিটের স্বচ্ছ ঢাকনাটা চোখে পড়ছে, তার পিছন থেকে তার দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে আছে একজোড়া চোখ, চোখদুটো উন্মত্ত হিংসায় জ্বলছে। ছবিটি স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি, কিন্তু আলেক্সেই'র দৃঢ় ধারণা সে সত্যিই দেখেছে। "এবার তাহলে শেষ," সমস্ত পেশী আরো সঙ্কুচিত করে সে ভাবল, "এবার তাহলে শেষ।" সামনে তাকিয়ে দেখল দ্রুতগতিতে বাড়ন্ত বিমানটি ঝড়ের মত আসছে তার দিকে। না, জার্মানটাও গতিপথ থেকে বিচ্যুত হবে না। এবার তাহলে শেষ।

আকস্মিক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হল আলেক্সেই। শত্রু বিমানটি মনে হচ্ছে হাতের নাগালে, হঠাৎ জার্মান বৈমানিকটি ঘাবড়ে গেল, বিমানটি ঝট করে উঠল উপরে, চোখের সামনে বিদ্যুত ঝলকের মত এসে পড়ল ওটির নীল রৌদ্রালোকিত নিম্ন দেশ। সেই মুহূর্তে ঘোড়া টিপে বিমানটিকে তিনবার গুলির জ্বলন্ত সুতোয় সেলাই করল আলেক্সেই, তারপর বৃত্তাকারে নেমে উঠল উপরে; মাথার উপরে পাক খেয়ে গেল জমি, তার পটভূমিকায় চোখে পড়ল বিমানটি অসহায়ভাবে ধীরে ধীরে ঝটপট করছে।

"ওলিয়া!" বিজয়োল্লাসে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সেই, সবকিছু ভুলে গিয়ে, খাড়া চক্রে পাক খেয়ে নামতে নামতে জার্মান বিমানটির অন্তিম

যাত্রায় সঙ্গ দিল সে, লাল আগাছায়-ভরা মাটি পর্যন্ত একেবারে, মাটিতে লাগল বিমানটি, শূন্যে উঠল কালো ধোঁয়ার থাম।

শুধু তখনি শিথিল হল স্নায়বিক সংহতি আর সংকুচিত পেশী, অশেষ ক্লান্তির বোধ এল তার জায়গায়। পেট্রলের কাঁটার দিকে তাকাল আলেক্সেই। কাঁটাটি প্রায় শূন্যে পেঁৗছিয়েছে। যা পেট্রল আছে তাতে তিন, বড়ো জোর চার মিনিট ওড়া চলে। বিমান-ঘাঁটিতে ফিরতে অন্তত দশ মিনিট লাগবে ওঠবার সময় বাদ দিয়ে। আহত "ফোকটিকে" অনুসরণ করাটা বোকামী হয়েছে। "অবোধ শিশুর মত ব্যবহার," নিজেকে ভর্ৎসনা করল আলেক্সেই।

বিপদের মুহূর্তে সাহসী ধীরচিত্ত লোকেদের সব সময়ে যেমন হয়, আলেক্সেই'র মাথা পরিষ্কার, ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুলভাবে কাজ করছে। প্রথমে যেটা দরকার সেটা হল উপরে ওঠা, পাক খেয়ে নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিমান-ঘাঁটির দিকে আরোহণ। বেশ!

আবশ্যক গতিপথে বিমানটিকে আনল আলেক্সেই, নিচে মাটি নেমে গেল, দিগন্তে এল ঝাপসা ভাপ, সেটা দেখে আরো ধীরভাবে হিসেব করতে লাগল সে। পেট্রলের উপর নির্ভর করা বৃথা। মাপকাঠিতে সামান্য ভুল থাকলেও এ পেট্রলে অবশ্য কুলোবে না। বিমান-ঘাঁটিতে পেঁৗছবার আগেই নামবে? কিন্তু কোথায়? সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথটির সবটা আবার মনে মনে ভেবে নিল আলেক্সেই। বন, জলা, আর স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যূহের এলাকায় অসমান মাঠ, আড়াআড়িভাবে কাটা, এখানে সেখানে গোলার গর্ত, আর কাঁটাতারে কীর্ণ।

'না, নামলে মারা পড়ব।'

পারাস্যুটে নামবে? সেটা করা যায়। এখনি! ঢাকনাটা খুলে বিমানটি ঘোরাও, স্টিকটা টেপো — ব্যস, আর কিছুর দরকার নেই। কিন্তু বিমানটির এই অদ্ভুত, দ্রুত চটপটে পাখিটির কী হবে! এর জঙ্গী গুণ একদিন তিনবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। পরিত্যাগ করবে এটাকে, ভেঙ্গেচুরে বাঁকাচোরা ধাতুর স্তূপে পরিণত করবে? সেটা করলে অবশ্য তার দোষ দেবে না কেউ। সে ভয় তার নেই। সত্যি বলতে, এ অবস্থায় পারাস্যুটে নামার অধিকার আছে তার। কিন্তু ঠিক এ সময়ে বিমানটিকে তার মনে হচ্ছিল বলিষ্ঠ উদার অনুগত জীবন্ত সত্তার মত, একে পরিত্যাগ করাটা ডাহা বেইমানি হবে। তা ছাড়া প্রথম কয়েকটি জঙ্গী নভোবিচরণের পরে বিনা বিমানে ফিরে যাওয়াটা কেমন হবে, আর একটি বিমান না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে, ফ্রণ্টে শুরু

হয়েছে বিজয় যাত্রা, এরকম কর্মমুখর সময়ে অলসভাবে থাকা, হাত মুড়ে বসে থাকা!

"কিছুতেই না!" বেশ জোরে বলল আলেক্সেই যেন কারো প্রস্তাবের উত্তরে।

যতক্ষণ না ইঞ্জিন বন্ধ হয় ততক্ষণ উড়তে হবে। তারপর? দেখা যাবে।

আর উড়ে চলল আলেক্সেই, প্রথমে তিন হাজার, তারপর চার হাজার মিটার উপর দিয়ে মাটির দিকে চেয়ে দেখছে যদি কোন ছোট ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে। বিমান-ঘাঁটির সামনের বনটি এরিমধ্যে দেখা যাচ্ছে দিগন্তে, প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে। পেট্রলের কাঁটা আর নড়ছে না, শেষ পয়েণ্টে স্থিরভাবে আবদ্ধ সেটি। কিন্তু তখনো কাজ করে চলেছে ইঞ্জিন। কীসে চলছে ওটা? উঁচুতে আরো উঁচুতে... বেশ!

সুস্থ লোক যেমন নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা ভাবে না তেমন ইঞ্জিনের সমান ঘর্ঘর আওয়াজের হুঁশ থাকে না বৈমানিকের, সে আওয়াজে হঠাৎ এল অন্য সুর। পরিবর্তনটা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ল আলেক্সেই'র কাছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বনটিকে; প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে ওটা, চওড়ায় প্রায় তিন-চার কিলোমিটার। এমন কিছু দূর নয়। কিন্তু ইঞ্জিনের নিয়মিত আওয়াজে এসেছে অশুভ অন্য সুর। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করে এটা বৈমানিক, যেন নিজেরি শ্বাসরোধ হয়ে এসেছে। হঠাৎ আসে সেই অলক্ষুণে "চুক্ চুক্ চুক্" শব্দ, সেই শব্দে সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় ব্যথিয়ে ওঠে।

না, ঠিক আছে। আবার ঠিকভাবে চলছে ইঞ্জিনটা। কাজ করছে ঠিক! হুররে! আর এই ত বনটা এসে পড়েছে। রোদে সবুজ সমুদ্রের মত আন্দোলিত বার্চগাছের মাথাগুলো চোখে পড়ছে। বিমান ভূমি ছাড়া আর কোথাও নামা চলবে না এখন। এখন শুধু একটি জিনিস করা দরকার — এগিয়ে যাওয়া, আরো এগিয়ে যাওয়া!

চুক, চুক, চুক!..

আবার ইঞ্জিনের সমান ঘর্ঘর শব্দ। আর কতক্ষণ! বনের উপরে এসেছে আলেক্সেই। দেখতে পাচ্ছে মসৃণভাবে বন ভেদ করে সটান গিয়েছে বালি-ভরা পথ, উইং কম্যাণ্ডারের টেরির মত। আর তিন কিলোমিটার দূরে বিমানঘাঁটি, খাঁজ-খাঁজ প্রান্তটির ওপারে, আলেক্সেই'র মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই নজরে এসেছে সেটা।

চুক, চুক, চুক! তারপর হঠাৎ নেমে এল স্তব্ধতা, এত গভীর স্তব্ধতা যে

ডানায় আর লেজে লাগা হাওয়ার গুঞ্জন শোনা গেল। সব শেষ! মেরেসিয়েভের মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। পারাস্যুটে নামবে? না! আর একটু এগোনো যাক। ঢালুভাবে অবতরণের জন্য বিমানটিকে ঘুরিয়ে নামতে লাগল আলেক্সেই, বিমানটিকে যতদূর সম্ভব শয়ান রেখায় রাখার আর ঘুরপাকে না পড়ার চেষ্টা করছে সে।

কী ভয়াবহ আকাশের এই জমাট স্তব্ধতা! এত উদগ্র গভীর সে স্তব্ধতা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ইঞ্জিনের চড়চড় আওয়াজ, রগের দপদপানি আর ক্ষিপ্র অবতরণের দরুন নানা শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাকে মিলতে জমি ক্ষিপ্রভাবে উঠে আসছে, যেন বিরাট কোন চুম্বক বিমানের কাছে তাকে টানছে।

বনের প্রান্ত, তার ওধারে বিমানভূমির মরকত-সবুজ জমি দেখতে পেল আলেক্সেই। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে? অর্ধেক ঘুরে আটকিয়ে গেল প্রপেলার। আকাশে নিশ্চল প্রপেলারটাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছে। খুব কাছে এসে পড়েছে বনটি। সব শেষ তাহলে?.. ওলিয়া কখনো কি জানতে পারবে তার কী হয়েছিল, গত আঠারো মাস কী অমানুষিক প্রয়াস করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধি লাভ করে মানুষের মত মানুষ হয়েছে সে, আর হবার সঙ্গে সঙ্গে এরকম বিদঘুটেভাবে মাটিতে পড়ে মরতে হবে তাকে?

পারাস্যুটে নামবে? দেরী হয়ে গেছে! নিচে ছুটে চলেছে বনটি, বিমানটির ঝোড়ো বেগে গাছের মাথাগুলো ক্রমাগত সবুজ ফালিতে মিশে যাচ্ছে। এরকম কিছু একটা আগে সে দেখেছে। কখন? হ্যাঁ, তাইত! সেই বসন্তে, ভয়াবহ পতনের সময়ে। ঠিক এ ভাবে সবুজ ফালি সব বিমানের নিচে ছুটেছিল সে সময়ে। শেষ চেষ্টা করে আলেক্সেই স্টিকটা টানল...

৮

রক্তক্ষয়ের জন্য কান ঝিম ঝিম করছে পেত্রভের। বিমানভূমি, পরিচিত সব মুখ, বিকেলের সোনালী মেঘ -- সবকিছু হঠাৎ দুলতে শুরু করে আস্তে আস্তে উল্টিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আহত পাটা নাড়াতে তীব্র যন্ত্রণায় হুঁশ ফিরে এল।

'ও এখনো আসেনি?' জিজ্ঞেস করল পেত্রভ।

'এখনো আসেনি। কথা বলবেন না,' জবাব এল।

সেদিন যখন পেত্রভের মনে হয়েছিল অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত, তখন

হঠাৎ দেবদূতের মত জার্মান বিমানটির সামনে কোথা থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিল মেরেসিয়েভ; এটা কি সম্ভব যে সেই মেরেসিয়েভ এখন গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত বিকলাঙ্গ ভূমির কোথাও পোড়া মাংস পিন্ডের মত পড়ে আছে! সার্জেন্ট-মেজর পেত্রভ আর কখনো কি দেখবে না তার নেতার কালো, স্বল্প বন্য আর সহৃদয় পরিহাসচটুল চোখ? কখনো নয়?

উইং কম্যান্ডার আস্তিনটা নামালেন। ঘড়ির আর দরকার নেই। দুহাতে টের্চ ঠিক করতে করতে বিরস কণ্ঠে বললেন:

'ব্যস, সব শেষ!'

'কোন আশা নেই?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'না, পেট্রল খতম। কোথাও হয়ত বিমান নামিয়েছে, হয়ত পারাসুটে নেমেছে... স্ট্রেচারটা নিয়ে যাও!'

মুখ ফিরিয়ে শিস দিয়ে একটা সুর ভাঁজতে শুরু করলেন কর্ণেল, একেবারে বেসুরোভাবে। আবার শ্বাসরোধ হয়ে এল পেত্রভের, যেন ভীষণ গরম আর বেজায় বড়ো কিছু একটা গলায় আটকেছে। অদ্ভুত কাশির মত শব্দ শোনা গেল। বিমানভূমির মাঝখানে যারা তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল তারা একবার ফিরে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। স্ট্রেচারে আহত বৈমানিকটি কাঁদছে।

'ওকে নিয়ে যাও বলছি! যত সব!' রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্ণেল, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেলেন ভিড়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে যেন হাওয়ার জন্য চোখদুটো কুঁচকিয়ে।

লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে, ঠিক সে সময়ে ছায়ার মত নিঃশব্দে বনের ধার হয়ে এল একটি বিমান, চাকাগুলো গাছের চূড়োয় স্বল্প লেগেছে। প্রেতমূর্তির মত লোকেদের মাথার উপর দিয়ে, জমির উপর দিয়ে ভেসে এল সেটা, যেন জমি নিচের দিকে টানছে এমন ভাবে একসঙ্গে তিন চাকায় ঘাসে নামল। শোনা গেল ভারী একটা শব্দ, পাথরের নুড়ির আওয়াজ, আর ঘাসের খসখস, সেটা অস্বাভাবিক, কেননা নামার সময়ে ইঞ্জিনের গর্জনে এসব শব্দ বৈমানিকরা কখনো শোনে না। সবকিছু এত তাড়াতাড়ি হল যে কী ঘটেছে বুঝতে পারল না কেউ, যদিও সমস্তটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার: একটি বিমান নেমেছে, আর সেটা হল "একাদশ", যার জন্য সবাই এতক্ষণ এত উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ছিল।

'মেরেসিয়েভ!' কে একজন উদ্দাম অমানুষিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সবায়ের স্তম্ভিত ভাব গেল কেটে।

দৌড় শেষ করে বনের একেবারে ধারে, অস্তগামী সূর্যের কমলা আলোয় উজ্জ্বল নবীন কোঁকড়া শাদা-ছাল বার্চগাছগুলোর সামনে থামল বিমানটি।

এবারেও ককপিট থেকে বেরিয়ে এল না কেউ। হাঁপাতে হাঁপাতে বিমানটির কাছে ওরা দৌড়িয়ে গেল, প্রত্যেকের মনে অমঙ্গলের পূর্বাভাস। সবায়ের আগে দৌড়িয়ে গেলেন কর্ণেল, একলাফে ডানায় উঠে ঢাকনা সরিয়ে ককপিটের ভিতরটা দেখলেন। বসে আছে মেরেসিয়েভ, খালি মাথা, গ্রীষ্ম মেঘের মত ফ্যাকাশে মুখ, রক্তহীন সবজে ঠোঁটে হাসির রেশ। চাপা ঠোঁট থেকে রক্তের দুটি ধারা চিবুক হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

'বেঁচে আছ? চোট লেগেছে?'

দুর্বলভাবে হাসল মেরেসিয়েভ, নিষ্প্রাণ চোখে কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে বলল:

'কিছু হয়নি। শুধু ভয় পেয়েছিলাম... প্রায় ছয় কিলোমিটার এক ফোঁটা পেট্রল ছিল না।'

বিমানটির চারিদিকে ভিড় করে বৈমানিকরা উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দন করছে আলেক্সেইকে, করমর্দন করছে তার।

'ভায়ারা ডানাটা ভেঙ্গে ফেলবেন না! ওটা ভাঙ্গা চলবে না! আমাকে বেরোতে দিন দেখি!' হেসে বলল আলেক্সেই।

সেই মুহূর্তে ওর উপরে ঝুঁকে পড়া মাথার ভিড়ের নিচে থেকে কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর একটি, এত ক্ষীণ যে মনে হল অনেক দূর থেকে আসছে।

'আলিওশা, আলিওশা!'

নিমেষে শক্তি ফিরে পেল মেরেসিয়েভ। তাড়াতাড়ি উঠে, দুহাতে ভর দিয়ে ককপিটের উপর দিয়ে ভারী পাটা বের করে লাফিয়ে নামল নিচে, আর একটু হলে ডানার উপরের একজন ধাক্কা লেগে পড়ে যেত।

বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে পেত্রভ, মুখটা বালিশের মতই শাদা। চোখের তলায় গভীর কালি পড়েছে, বড়ো দুফোঁটা অশ্রুবিন্দু লেগে আছে সেখানে।

'কী হে ছোকরা, বেঁচে আছ তাহলে!.. ঘাগী শয়তান!'

স্ট্রেচারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সেই। বন্ধুর

অসহায় মাথা জড়িয়ে তার নীল ক্লিষ্ট, অথচ আনন্দোজ্জ্বল চোখে চোখ রাখল।

'বেঁচে আছ?'

'ধন্যবাদ, আলিওশা, আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ। তুমি... আলিওশা... তুমি...'

'ধ্যুত্তোর ছাই! আহত লোকটাকে নিয়ে যাও বলছি! হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেন?' কর্ণেলের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, ছোটখাটো চটপটে মানুষটি, শক্ত পায়ে ভর দিয়ে দুলছেন, মাপসই চকচকে বুটজোড়া নীল ওভারঅলের নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

'সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ, রিপোর্ট দিন। কোনো বিমান নামাতে পেরেছেন?' সরকারী সুরে জানতে চাইলেন কর্ণেল।

'হ্যাঁ, কমরেড কর্ণেল। দুটো "ফোক-উলফ"।'

'কী অবস্থায় নামিয়েছিলেন?'

'একটাকে ওপর থেকে আক্রমণে। পেত্রভের পিছু লেগেছিল সেটা। আর একটাকে সরাসরি আক্রমণে, সবাই যেখানে লড়ছিল সেখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে।'

'জানি। পরিদর্শক এইমাত্র খবর দিয়েছে... ধন্যবাদ।'

'সেবা...' বিধিসম্মত প্রথায় জবাব দেবার ইচ্ছায় শুরু করল আলেক্সেই। কিন্তু সাধারণত খুঁতখুঁতে কর্ণেলটি তাকে বাধা দিয়ে ঘরোয়াভাবে বললেন:

'বেশ, বেশ! কাল আপনি স্কোয়াড্রনের ভার নেবেন... তৃতীয় স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার ঘাঁটিতে ফিরে আসেনি।'

পরিচালনা-ঘাঁটিতে দুজনে একসঙ্গে গেল। জঙ্গী দিনের শেষ হল। সবাই পিছু পিছু চলেছে। পরিচালনা-ঘাঁটির সবুজ ঢিপিটা কাছে এসে পড়েছে, এমন সময় ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি দৌড়িয়ে কাছে এল। খালি মাথা তার, বেশ খুসি আর উত্তেজিত দেখাচ্ছে, কর্ণেলের সামনে দাঁড়িয়ে কী একটা বলার জন্য মুখ খুলেছে, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে নিরস কঠোর গলায় কর্ণেল বললেন:

'টুপি ছাড়া কেন? কী মনে হচ্ছে নিজেকে, টিফিনের সময়ে স্কুলের ছোকরার মত?'

সেলাম করে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত লেফ্‌টেনাণ্টটি প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কমরেড কর্ণেল, আমাকে রিপোর্ট করার অনুমতি দিন!'

'কী?'

'আমাদের প্রতিবেশী "ইয়াক" উইঙের কম্যাণ্ডার টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আমাদের প্রতিবেশী! কী চায় সে?..'

তাড়াতাড়ি ডাগ-আউটের দিকে গেলেন কর্ণেল।

'আপনার বিষয়ে বলছেন...' ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি মেরেসিয়েভকে বলতে শুরু করল, কিন্তু নিচে ডাগ-আউট থেকে কর্ণেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল:

'মেরেসিয়েভকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও!'

দুপাশে হাত রেখে সঠিক কায়দায় কর্ণেলের সামনে দাঁড়াতে তিনি টেলিফোনের রিসিভার হাতের তালুতে চেপে সক্রোধে গরগর করে উঠলেন:

'আমাকে ভুল খবর দিয়েছেন কেন? আমাদের প্রতিবেশী জানতে চাইল যে কে "একাদশ" চালিয়েছিল। আমি বললাম, মেরেসিয়েভ, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। তখন সে জিজ্ঞেস করল, "কটা বিমান ওর নামে লিখেছ?" জবাবে বললাম, "দুটো।" ও বলল, "আর একটা ওর নামে টুকে রেখো। আমার বিমানের পিছু লাগা একটা "ফোক-উলফকে" ও নামিয়েছে। আমি নিজে দেখেছি সেটা।" কী? চুপ করে আছেন কেন?' ভুরু কুঁচকিয়ে কর্ণেল তাকালেন ওর দিকে, ঠাট্টা করছেন না চটে উঠছেন বোঝা মুশকিল। 'কথাটা সত্যি? এই ত, আপনি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলুন... হ্যালো! তুমি আছ ত? ফোনে কথা বলছেন সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ। রিসিভারটা ওঁকে দিচ্ছে।'

টেলিফোনে এল অপরিচিত ভাঙ্গা গভীর কণ্ঠস্বর:

'ধন্যবাদ, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। চমৎকার! খুব তারিফ করছি আপনার। আমাকে আপনি বাঁচিয়েছেন। হ্যাঁ, মাটিতে ওটা না পড়া পর্যন্ত পিছু ছাড়িনি। আপনি কি ভদকা খান? আমার এখানে চলে আসুন। এক লিটার আপনাকে ধারি। বেশ, ধন্যবাদ। দেখা হলে করমর্দন করব। চালিয়ে যান!'

রিসিভার নামিয়ে রাখল মেরেসিয়েভ। আজ যে ধকল গিয়েছে তার পরে এত ক্লান্ত সে যে দাঁড়াতে পারছে না। ওর একমাত্র বাসনা যতো তাড়াতাড়ি পারে "পাতাল সহরে" ফিরে যাওয়া, নিজের ডাগ-আউটে পৌঁছিয়ে নকল পায়ের পাতাটি ছুঁড়ে ফেলে গা হাত ছড়িয়ে বাঙ্কে শুয়ে পড়া। মুহূর্তের



জন্য টেলিফোনের কাছে অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে গেল মেরেসিয়েভ।

বাধা দিয়ে কর্ণেল বললেন, 'কোথায় যাচ্ছেন?' মেরেসিয়েভের হাত নিজের ছোট শক্ত হাতে নিয়ে এত জোরে চাপ দিলেন যে ব্যথা করে উঠল। 'আপনাকে কী আর বলতে পারি? খাসা ছোকরা! আপনার মত লোক আমার অধীনে, সে জন্য আমি গর্বিত... বেশ, আর কী? ধন্যবাদ... হ্যাঁ, আর আপনার ওই বন্ধুটি, মানে পেত্রভ, ওটিও খাসা ছেলে। আর অন্যরা সত্যি বলছি, আপনাদের মত লোক আছে বলে যুদ্ধে আমরা হারতে পারি না!'

আবার মেরেসিয়েভের হাতে জোরে চাপ দিলেন তিনি।

ডাগ-আউটে মেরেসিয়েভ যখন গেল তখন রাত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঘুম এল না। ঘুম আনার চেষ্টা করল নানা রকম সুপরীক্ষিত উপায়ে — বালিশ উল্টিয়ে এক হাজার পর্যন্ত গুণে, তারপর হাজার থেকে এক পর্যন্ত, পরিচিত যাদের নাম "আ" দিয়ে শুরু তাদের নাম মনে করে, তারপর যাদের নাম "ব" দিয়ে শুরু তাদের, তারপর কেরোসিন-বাতির ঝাপসা আলোর দিকে চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে থেকে — কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিচিত মূর্তি সামনে এসে পড়ছে, কখনো স্পষ্টভাবে, কখনো বা যেন কুয়াশায় ঢাকা — রুপালী চুলের নিচে মিখাইল দাদুর বিব্রত চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে; "গরুর মত চোখের পাতা" পিটপিট করছে আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো; চটে উঠে পাক-ধরা কেশর ঝাঁকিয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কাকে যেন বকছেন; বুড়ো সেই স্নাইপারটি, সৈনিকসুলভ মুখ তার হাসিতে কুঞ্চিত; শাদা বালিশের পটভূমিতে কমিসার ভরোবিওভের মোমের মত ফ্যাকাশে মুখ, সেয়ানা তীক্ষ্ণ পরিহাসমুখর প্রাজ্ঞ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে; জিনচকার হাওয়ায় অস্থির লাল চুল এক ঝলকে সামনে দিয়ে ভেসে গেল; ছোটখাটো আর সজীব ইনস্ট্রাক্টর নাউমভ দরদে আর সব বোঝে এমনভাবে চোখ ঠারছে তাকে। অন্ধকার থেকে তার দিকে চেয়ে হাসছে অনেক চমৎকার মরমী মুখ, আর ইতিমধ্যেই প্লাবিত তার হৃদয়ে নানা স্মৃতি জাগিয়ে ভরে দিচ্ছে উষ্ণতায়। কিন্তু এই সব মরমী মুখের মধ্যে, সবাইকে তৎক্ষণাৎ মুছে দিয়ে এল ওলিয়ার মুখ, অফিসারের পোশাক-পরা একটি কিশোরের রোগা মুখ আর বড়ো, ক্লান্ত চোখ। পরিষ্কার স্পষ্ট তাকে দেখল, যেন সত্যি সত্যি সামনে আছে, এমনভাবে বাস্তব জীবনে

আগে কখনো দেখেনি তাকে। ছবিটা এত স্পষ্ট যে চমকে উঠল আলেক্সেই।

ঘুমের দেখা নেই! উচ্ছ্বাসিত উদ্যমের আহ্বানে সচকিত আলেক্সেই উঠে বসে "স্তালিনগ্রাদ্‌কাটি" জ্বালিয়ে খাতা থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে পেন্সিলটা কেটে লিখতে শুরু করল।

মনে নানা কথা এত ভিড় করে আসছে যে তাল রেখে চলা প্রায় অসম্ভব। আলেক্সেই দুষ্পাঠ্য হাতে লিখল: "আমার ওলিয়া, আজ তিনটে জার্মান বিমান নামিয়েছি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আমার বন্ধুদের কয়েকজন ত প্রায় রোজ এরকম করে। সেটা নিয়ে তোমার কাছে বড়াই করতে চাই না। আমার প্রিয়, আমার আপনার ওলিয়া! আঠারো মাস আগে আমার যা ঘটেছিল সেটা বলতে চাই আজ, বলার অধিকার এখন হয়েছে; সেটা এত দিন বলিনি বলে ক্ষমা কোরো, দোহাই তোমার, রাগ কোরো না। কিন্তু আজ, শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করেছি..."

চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল আলেক্সেই। ডাগ-আউটে মোটা তক্তার দেয়ালের ওদিকে ইঁদুরের কিঁচ কিঁচ, শুকনো বালু ঝরার শব্দ। খোলা দরজা দিয়ে আসছে বার্চ আর কুসুমিত ঘাসের তাজা সোঁদা গন্ধ, আর নাইটিংগেলের একটু চাপা, কিন্তু অবারিত গান। দূরে কোথাও, নালার ওধারে, খুব সম্ভব অফিসারদের খাবার ঘরের বাইরে পুরুষ ও নারীকণ্ঠ "এ্যাসগাছের" সেই বিষণ্ণ গানটি গাইছে। দূর বলে সুরটি নরম হয়ে রাত্রে বিশেষ কোমল একটি মোহে ভরে উঠেছে, মধুর বিষণ্ণতা জাগিয়ে তুলছে মনে — প্রত্যাশার, আশার বিষণ্ণতা...

বিমান-ঘাঁটিটি ইতিমধ্যে আমাদের অগ্রগামী সৈন্যদলের অনেক পিছনে, কামানের বহুদূর চাপা গুরু গুরু ডাক প্রায় শোনা যায় না; সে আওয়াজে চাপা পড়ছে না সুরটি, নাইটিংগেলের গান কিম্বা বনের ঘুমপাড়ানি গুন গুন ধ্বনি।

পুনশ্চ

ওরিওলের যুদ্ধ বিরাট জয়লাভে সমাপ্ত হতে চলেছে, উত্তর থেকে অগ্রসর সামনের রেজিমেণ্টরা জানিয়েছে যে ক্রাম্লগর্স্ক পাহাড় থেকে ইতিমধ্যেই জ্বলন্ত সহরটি চোখে পড়ে, তখন একদিন ব্রিয়ান্স্ক ফ্রণ্টের হেডকোয়ার্টারসে খবর এল যে গত ন দিনে ও এলাকায় কার্যরত গার্ডস ফাইটার উইঙের বৈমানিকেরা সাতচল্লিশটি শত্রু বিমান নামিয়েছে। নিজেদের খোয়া গিয়েছে পাঁচটি বিমান আর তিনটি লোক, কেননা দুটি বৈমানিক পারাস্যুটে নেমে হেঁটে ঘাঁটিতে পৌঁছয়। সোভিয়েত সেনার ক্ষিপ্র অগ্রগতির সেই সব দিনেও এ ধরনের জয়লাভ অসাধারণ। ওদের বিমান-ঘাঁটিতে একটি সংযোগী বিমান যাচ্ছিল, তাতে একটা জায়গা আমি পেলাম, আমার ইচ্ছে গার্ডস বৈমানিকদের কীর্তির বিষয়ে "প্রাভদায়" একটি প্রবন্ধের মালমশলা জোগাড় করা।

উইংটির বিমান-ঘাঁটি একটি যৌথ পশুচারণ ভূমিতে, ঢিবি সরিয়ে উঁচু নিচু জায়গাটা কোনক্রমে সমান করা হয়েছে। একটি নবীন বার্চ-বনের ধারে বিলমোরগের আণ্ডাবাচ্চার মত বিমানগুলো লুকোনো। সংক্ষেপে, যুদ্ধের সেই সব কর্মমুখর দিনে স্বাভাবিক মেঠো বিমান-ঘাঁটি একটা।

বিকেল প্রায় শেষ, উইঙের লোকেরা আর একটি কঠিন ব্যস্ত দিনের কাজ সমাপ্ত করে এনেছে, সে সময়ে আমরা নামলাম। জার্মানরা তখন ওরিওল এলাকার উপরে বিশেষভাবে সক্রিয়, সেদিন প্রত্যেকটি জঙ্গী বিমানকে সাতবার উঠতে হয়েছে লড়াই'এর জন্য। অষ্টম পালা শেষ করে সূর্যাস্তের সময়ে শেষ বিমান কটি ফিরে আসছে। কর্ণেলটি ছোটখাটো চটপটে মানুষ, রোদে তামাটে মুখ, সযত্নে টেরি কাটা, বেল্ট আঁটো করে আঁটা, পরনে নতুন নীল ওভারঅল। তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করলেন যে সেদিন কোন গল্প গুছিয়ে বলতে

পারবেন না, সকাল ছটা থেকে বিমান-ঘাঁটিতে আছেন, তিনবার উপরে উঠতে হয়েছে তাঁকে, আর এখন এত ক্লান্ত যে দাঁড়াতে পারছেন না। সে সন্ধ্যায় সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মেজাজ অন্যান্য অফিসারদেরও নেই। বুঝতে পারলাম কালকের জন্য আমাকে থাকতে হবে; তা ছাড়া ফেরাও যাবে না, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। বার্চগাছের মাথায় ইতিমধ্যেই সূর্যের আলো গলিত সোনার রং লাগাচ্ছে।

শেষ বিমানগুলি ফিরে এল, ইঞ্জিন চলছে, সটান বনে গেল তারা। মিস্ত্রীরা ঘুরিয়ে রাখল তাদের। নালের মত মাটির দেয়াল-ঘেরা ঘাসে-ঢাকা সবুজ জায়গায় বিমানগুলিকে রাখার পরে ককপিট থেকে আস্তে আস্তে নামল বিবর্ণ ক্লান্ত বৈমানিকরা, তার আগে নয়।

একেবারে শেষের বিমানে ফিরল তৃতীয় স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার। ককপিটের স্বচ্ছ ঢাকনা সরানো হল। প্রথমেই সোনালী মনোগ্রাম করা আবলুস কাঠের একটি বড়ো ছড়ি উড়ে বেরিয়ে এসে পড়ল ঘাসে। তারপর একটি রোদে তামাটে, চওড়া-মুখ কালো-চুল মানুষ বলিষ্ঠ হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াল, পাশ দিয়ে ক্ষিপ্রভাবে শরীরটাকে দুলিয়ে ডানার উপরে উঠে আস্তে আস্তে নামল মাটিতে। কে যেন আমাকে বলল উইঙের সেরা বৈমানিক। সন্ধ্যেটা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য ঠিক করলাম ওর সঙ্গে কথা বলব। বেশ মনে আছে আমার দিকে প্রফুল্ল প্রাণবন্ত কালো চোখে তাকাল ও, বালকসুলভ বেয়াড়া ভাব তখনো নিভে যায়নি সে চোখে, তার সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিশেছে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঝানু ক্লান্ত প্রজ্ঞা। হেসে আমাকে বলল:

'দোহাই আপনার! আমি ভয়ানক ক্লান্ত। পাদুটো টেনে চলার বেশী শক্তি নেই, মাথা ঘুরছে। আপনি খেয়েছেন কি? না? তাহলে আমার সঙ্গে খাবার ঘরে চলুন, একসঙ্গে খাওয়া যাবে। একটা বিমান নামালে ওরা রাত্রের শেষ খানার সময়ে দুশ গ্রাম ভদকা দেয়। আজ আমার প্রাপ্য ছ'শ গ্রাম। দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। চলি তাহলে? খেতে খেতে গল্প করা যাবে, আপনি ত গল্প বাগাবার জন্যে অধৈর্য দেখছি।'

রাজী হলাম আমি। এই খোলাখুলি গোছের, প্রফুল্ল অফিসারটিকে ভালো লাগল। বৈমানিকদের যাওয়া আসায় বনে যে পথটি হয়েছিল সেটি ধরে চললাম। নতুন পরিচিত ব্যক্তিটি চটপটভাবে যাচ্ছে, মাঝেমাঝে নিচু হয়ে বিলবেরি কুড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে টপটপ করে মুখে দিচ্ছে। অত্যন্ত ক্লান্ত নিশ্চয়ই, হাঁটছে ভারী পদক্ষেপে, কিন্তু অদ্ভুত ছড়িটায় ভর দিচ্ছে না। হাতে

ঝুলছে সেটা, ক্বচিৎ কখনো সেটা দিয়ে ব্যাঙের ছাতায় কিম্বা আগাছায় ঘা দিচ্ছে। কোনো নালা পেরিয়ে পিছল কাদাটে ঢালু গা বেয়ে ওঠার সময়ে চলতে কষ্ট হচ্ছে তার, ঝোপঝাড় ধরে উঠছে, কিন্তু ছড়িতে ভর দিচ্ছে না।

খাবার ঘরে পেঁছনো মাত্র ওর ক্লান্তির লেশমাত্র রইল না। জানলার কাছে একটি টেবিল বেছে নিল; সূর্যাস্তের হিম রক্তাভা দেখা যাচ্ছে, পরের দিন ঝোড়ো আবহাওয়ার পূর্বলক্ষণ সেটা বৈমানিকদের কাছে। বড়ো এক মগ জল সাগ্রহে ঢকঢক করে খেয়ে বৈমানিকটি ফুটফুটে কোঁকড়া-চুল ওয়েট্রেসটির পিছনে লাগল: হাসপাতালে মারেসিয়েভের একটি বন্ধুর কথা ভেবে সে নাকি অন্যদের খাবারে বড্ড বেশি নুন দিয়ে ফেলছে। বেশ তৃপ্তি করে খানা খেল বৈমানিক, মাটন চপের হাড়টা চিবোল শক্ত দাঁতে। পাশের টেবিলের বন্ধুদের সঙ্গে চলল হাসি তামাসা। আমাকে জিজ্ঞেস করল মস্কোর নতুন খবর কী, হালে কী কী বই আর নাটক বেরিয়েছে, মস্কোর কোনো থিয়েটারে কখনো যায়নি বলে দুঃখ করল। খানার তৃতীয় পদ — বিলবেরি জেলি, এখানকার বৈমানিকরা তার নাম দিয়েছে "বজ্রমেঘ" — খাবার পর আমাকে জিজ্ঞেস করল:

'রাত্রে কোথায় থাকবেন ঠিক করেছেন? জায়গা নেই? তাহলে আমার ডাগ-আউটে আসুন!' ও বলল। এক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকিয়ে নিচু গলায় যোগ করল, 'আমার সঙ্গে যে থাকে সে ফেরেনি আজ... একটা বাঙ্ক তাই খালি আছে। পরিষ্কার বিছানার চাদর খুঁজে বের করা যাবে। আসুন তাহলে।'

বোঝা গেল, নবাগতদের সঙ্গে আলাপ করতে ভালোবাসে যারা তাদের একজন সে। রাজী হয়ে গেলাম। নালায় নামলাম, নালার ঢালুদুটোয় বুনো রাস্‌পবেরি, লাংঅর্ট আর আগাছার ঘন ঝোপের মধ্যে ডাগ-আউটগুলো খোঁড়া, ঝোপঝাড়ে পচা পাতা আর ব্যাঙের ছাতার সোঁদা গন্ধ।

বাড়িতে তৈরী "স্তালিনগ্রাদ্‌কা" কেরোসিন-বাতির সরু ধোঁয়াটে শিখা বাড়িয়ে দেওয়াতে আলো হয়ে উঠল ডাগ-আউটের ভেতরটা, তখন দেখা গেল ডাগ-আউটটা বড়ো গোছের আর আরামী, মনে হল অনেক দিন ধরে এখানে লোক আছে। কাদাটে দেয়ালের তাকে দুটো পরিচ্ছন্ন বাঙ্ক, গদি পাতা, টাটকা সুগন্ধি খড় চাদরে ভরে তৈরী সেগুলো। কোণে বসানো কচিপাতা কয়েকটি বার্চগাছ, "গন্ধের জন্য," ব্যাখ্যা করে বলল বৈমানিকটি। দেয়ালে

বাঙ্কের উপরে সুষ্ঠুভাবে কাটা খবরের কাগজে ঢাকা নানা তাকে বই'এর গাদা, দাড়ি কামাবার টুকিটাকি, সাবান আর টুথব্রাশ। একটি বাঙ্কের উপরে ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে সুন্দরভাবে হাতে-গড়া প্লেক্সিগ্লাসের ফ্রেমে বাঁধানো দুটো ফটোগ্রাফ, যুদ্ধ বিরতির সময়ে আলস্যের একঘেয়েমী দূর করার জন্য শত্রু বিমানের ভগ্নাংশ থেকে কারিৎকর্মীরা এ ধরনের ফ্রেম অনেক বানিয়েছিল। টেবিলে বার্চের পাতায় ঢাকা বুনো সুরভি রাস্‌প্‌বেরিতে ভরা একটি বিলিক্যান। রাস্‌প্‌বেরি, নবীন বার্চগাছ, খড় আর মেঝেতে ছড়ানো ফারের ডালপালা থেকে এত মিষ্টি আর ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে, ডাগ-আউটটি এত ঠাণ্ডা, নালায় গঙ্গাফড়িঙের ডাক এত শ্রুতিমধুর যে প্রীতিকর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আমরা, ঠিক করলাম কথাবার্তা আর রাস্‌প্‌বেরি খাওয়া কাল সকাল পর্যন্ত স্থগিত থাক।

বাইরে গেল বৈমানিক। কানে এল সজোরে দাঁত মাজার আর ঠাণ্ডা জলে গা হাত পা ধোবার আওয়াজ, নানা শব্দের সাড়া উঠছে বনে। ফিরে এল, বেশ ঝরঝরে প্রফুল্ল ভাব, চুলে আর ভুরুজোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা জল, বাতির পলতেটা কমিয়ে দিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে লাগল। ভারী কী একটা সশব্দে মেঝেতে পড়াতে তাকালাম, যা দেখলাম নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না। লোকটার পাদুটো মেঝেতে পড়ে রয়েছে! পাহীন বৈমানিক! তার উপর আবার জঙ্গী বিমান চালক! সেদিন সাতবার উপরে উঠেছে বিমান-যুদ্ধের জন্য আর তিনটি শত্রু বিমান নামিয়েছে! অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কিন্তু সত্যিই ত, ওর দুটো পা, নকল অবশ্য, বেশ খাপসই সামরিক জুতোয় পড়ে রয়েছে মেঝেতে! মনে হল বাঙ্কের নিচে লুকিয়ে থাকা কোনো লোকের পাদুটো উঁকি মারছে। আমাকে দেখে নিশ্চয় বোঝা গেল যে বিস্মিত হয়েছি, কেননা বৈমানিক আমার দিকে তাকিয়ে সেয়ানা প্রফুল্ল হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল:

'আগে লক্ষ্য করেননি আপনি?'

'স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'শুনে খুসি হলাম! ধন্যবাদ! কিন্তু অবাক লাগছে যে আপনাকে কথাটা কেউ বলেনি। আমাদের উইঙে পাকা বৈমানিক যেমন অনেক আছে তেমন ব্যস্তবাগীশ লোকদেরও অভাব নেই। নতুন একটি ভদ্রলোক এসেছেন, "প্রাভদার" সাংবাদিক আবার তিনি, এমন সুযোগ পেয়ে তার কাছে তাদের অদ্ভুত চিজটিকে নিয়ে বড়াই করেনি, সেটা আশ্চর্য!'

'কিন্তু ব্যাপারটা অসাধারণ, সেটা ত আপনি মানবেন। পা নেই অথচ জঙ্গী বিমান চালাচ্ছেন! বীরের মত ব্যাপার! বিমান চালনের ইতিহাসে এরকম জিনিস ঘটেনি।'

ফুর্তিতে শিস দিয়ে বৈমানিক বলল:

'বিমান চালনের ইতিহাস!.. সে ইতিহাসে অনেক কিছুই অজানা ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে আমাদের বৈমানিকদের কাছে অনেক কথা ইতিহাস শুনেছে। কিন্তু খুসি হবার কী আছে? বিশ্বাস করুন, এদুটোর জায়গায় আসল পা থাকলে বিমান চালাতে আরো ভালো লাগত আমার। কিন্তু নিরুপায়।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বৈমানিক আরো বলল, 'ঠিক বলতে গেলে, বিমান চালনের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা অজানা নয়।'

মানচিত্রের খাপ হাতড়িয়ে পত্রিকার একটি পাতা খুঁজে বের করল সে, ভাঁজ পড়া ছেঁড়াখোঁড়া পাতাটা সযত্নে সেলোফেনের পাতে আঁটা। একটি পায়ের পাতা ছিল না একজন বৈমানিকের, তা সত্ত্বেও বিমান চালায় সে, গল্পটি তার বিষয়ে।

'কিন্তু ওর একটা পা ত ছিল। তা ছাড়া ও জঙ্গী বিমান নয়, একটা প্রাচীন "ফারমান" চালিয়েছিল,' আমি বললাম।

'কিন্তু আমি সোভিয়েত বৈমানিক,' জবাবে ও বলল। 'বড়াই করছি ভাববেন না দোহাই। আমার কথা নয়। একজন অত্যন্ত ভালো লোক, মানুষের মত মানুষ একজন কথাটা আমাকে বলেন।' "মানুষের মত মানুষ"এ বিশেষ জোর দিল সে। 'তিনি মারা গিয়েছেন।'

বৈমানিকের চওড়া বলিষ্ঠ মুখে এল মধুর কোমল বিষণ্ণ ভাব, চোখে পরিষ্কার মরমী আলোর দীপ্তি; চেহারা দেখে মনে হল বয়স প্রায় দশ বছর কমে গিয়েছে, প্রায় তরুণের মত দেখাচ্ছে; এক মুহূর্ত আগে ভেবেছিলাম যে বৈমানিকটি মধ্যবয়সী, এখন অবাক হয়ে বুঝলাম তার বয়স বড়ো জোর তেইশ।

'কী হয়েছিল, কখন এবং কী ভাবে হয়েছিল সেটা লোকে জিজ্ঞেস করলে আমার বিরক্ত লাগে... কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতে সবকিছু আমার মনে ফিরে আসছে... আপনাকে আমি চিনি না। কাল পরস্পরের কাছে বিদায় নেব, হয়ত আর কখনো দেখা হবে না... যদি চান ত আমার পায়ের গল্পটা আপনাকে বলি।'

বাঙ্কে উঠে বসে চিবুক পর্যন্ত কম্বল টেনে নিয়ে বলতে শুরু করল

বৈমানিক। দেখে মনে হল আমার উপস্থিতির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছে, নিজের মনে কথা বলে চলেছে। গল্পটা কিন্তু বলল খুব গুছিয়ে। টের পেলাম যে তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, স্মরণশক্তি ভালো, হৃদয় উদার। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে গুরুত্বপূর্ণ আর অভূতপূর্ব কিছু একটা এক্ষুণি শ্রুতিগোচর হবে, পরে আর কখনো হয়ত শোনার সুযোগ হবে না আমার, তাই তাড়াতাড়ি একটা স্কুলের খাতা টেনে নিলাম, মলাটে লেখা ছিল: "তৃতীয় স্কোয়াড্রনের রোজনামচা"। বৈমানিকের কাহিনীটি টুকে নিতে শুরু করলাম।

বনের উপর দিয়ে অলক্ষিতে রাত্রি কেটে যাচ্ছে। টেবিলের উপরে বাতিটার চড়চড় হিস হিস আওয়াজ, শিখায় দগ্ধ-ডানা অনেক অসাবধানী প্রজাপতি পড়ে আছে চারিদিকে। প্রথম প্রথম হাওয়ায় ভেসে এল এ্যাকর্ডিয়নে বাজানো একটি সুর। তারপর থেমে গেল এ্যাকর্ডিয়নের করুণ ধ্বনি, বৈমানিকের বিষণ্ণ, নিম্নকণ্ঠের ছন্দময় কথায় সঙ্গত দিল শুধু বনের নানা নৈশ শব্দ, বকের তীক্ষ্ণ চীৎকার, পেঁচার দূরাগত আর্তনাদ, কাছের জলায় ব্যাঙের ক্রোক ক্রোক আর গঙ্গাফড়িঙের কিচ কিচ।

শোনা গল্পটি এত রোমাঞ্চকর যে যতখানি সাধ্যে কুলোয় ততখানি লিখে রাখার চেষ্টা করি। খাতাটা ভরে গেল, তাকে আর একটা ছিল, সেটাও গেল ভরে। ডাগ-আউটের অপরিসর প্রবেশপথ দিয়ে আকাশ দেখা যায়, আকাশ পাতলা হয়ে এসেছে যে চোখে পড়ল না। আলেক্সেই মারেসিয়েভ তখন বলছে সেই দিনটির কথা যেদিন "রিখথোফেন" ডিভিশনের তিনটে বিমান নামিয়ে ও আবার টের পেল যে অন্য বৈমানিকদের সমান হয়ে উঠেছে।

'গল্প করতে করতে রাত কেটে গিয়েছে, আর সকাল হলেই আমাকে বিমান চালাতে হবে,' গল্প বন্ধ করে ও বলল। 'আপনাকে নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত করেছি। এখন একটুখানি ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।'

'কিন্তু ওলিয়া? কী উত্তর সে দিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, তারপর আত্মসংবরণ করে বললাম: 'মাফ করুন, প্রশ্নটি হয়ত অস্বস্তিকর। তাহলে জবাব দেবেন না।'

'কেন?' হেসে জিজ্ঞেস করল মারেসিয়েভ। 'আমরা দুজনেই মজার লোক। দেখা গেল যে আমার সবকিছুই ও জানত। আমার দোস্ত আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো ওকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে জানিয়েছিল, প্রথমে আমার বিমান পতনের, তারপর আমার পা কেটে ফেলার কথাটা। কিন্তু ও যখন দেখল যে

কথাটা আমি চেপে গিয়েছি তখন ধরে নিল যে ওকে বলতে আমার খারাপ লাগছে, আর কিছু না জানার ভান করল। দেখা গেল দুজন দুজনকে ঠকাচ্ছিলাম, ভগবান জানেন কেন! ওর চেহারাটা দেখবেন নাকি?'

পলতেটা বাড়িয়ে বাতিটা নিয়ে গেল বাঙ্কের উপরে দেয়ালে টাঙানো, সুষ্ঠু প্লেক্সিগ্লাসের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলোর কাছে। একটি ফটো আনাড়ির তোলা, সেটা প্রায় সবটাই ঝাপসা পুরোনো হয়ে গিয়েছে, কোনক্রমে দেখা যায় মাঠের ফুলের মধ্যে হাসিমুখে বসে আছে একটি ভাবনাচিন্তাহীন মেয়ে। অন্য ছবিটি তারই, জুনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট-টেকনিশ্যানের পোশাক পরনে, রোগা বুদ্ধিমন্ত মুখ, একাগ্র ভাব চোখে। এত ছোট মেয়েটি যে ইউনিফর্ম পরনে সুশ্রী কিশোরের মত চেহারা, শুধু চোখদুটো ক্লান্ত আর তীক্ষ্ণ, কিশোরসুলভ নয়।

'ওকে পছন্দ হয়?'

'অত্যন্ত,' আন্তরিকভাবে আমি বললাম।

'আমারও ভালো লাগে,' স্মিত হাসি হেসে সে বলল।

'আর স্ত্রুচকভ, সে এখন কোথায়?'

'জানি না। ওর শেষ চিঠি এসেছিল শীতকালে, ভেলিকিয়ে লুকি'র কাছাকাছি কী একটা জায়গা থেকে।'

'আর ট্যাঙ্ক-অফিসারটি, কী যেন তার নাম?'

'গ্রিশা গভজ্‌দেভের কথা বলছেন? সে এখন মেজর। প্রখরভ্‌কার বিখ্যাত যুদ্ধে ছিল, আর পরে কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টে ট্যাঙ্কের ব্যূহভেদে। একই এলাকায় আমরা দুজনেই কাজে ছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি। একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টের নেতা এখন। কিছু দিন হল ওর কোন চিঠি পাইনি, কেন জানি না। কিন্তু কিছু এসে যায় না। যুদ্ধে বেঁচে থাকলে আমাদের আবার দেখা হবে। আর বেঁচে থাকবই না কেন? কিছু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক?.. রাত কাবার হয়ে গিয়েছে!'

ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল সে, আধো-অন্ধকারে ভরে গেল ডাগ-আউটটা। ভ্রূকুটিকুটিল ভোরের আবছা ধূসর আলোয় কানে আসছে মশার গুনগুন, বনের মধ্যে এই চমৎকার আশ্রয়টিতে মশাগুলোই বোধ হয় একমাত্র আপদ।

'আপনার বিষয়ে "প্রাভদায়" লেখার খুব ইচ্ছে আমার,' আমি বললাম।

'আপনার খুসি,' বিশেষ কোন উৎসাহ না দেখিয়ে জবাব দিল বৈমানিক।

তারপর নিদ্রালস গলায় যোগ করল, 'না লিখলেই বোধ হয় ভালো। গল্পটার সুযোগ নিয়ে গেবেল্‌স সারা পৃথিবীতে ঢাক পিটিয়ে জানাবে যে পায়ের পাতা নেই এমন লোকেদেরও রুশরা জোর করে লড়াই'এ নামাচ্ছে, আরো কত কিছু... ফ্যাশিস্টরা কী ধরনের চিজ আপনি ত জানেন।'

পর মুহূর্তেই জোরে নাক ডাকতে শুরু করল তার। কিন্তু আমার ঘুম এল না। ওর সরল ও উদাত্ত গল্পটি রোমাঞ্চিত করেছিল আমাকে। সুন্দর উপকথার মত মনে হত গল্পটি যদি না নায়কটি চোখের সামনে ঘুমোত, যদি না স্পষ্ট দেখতে পেতাম মেঝেতে, ভোরের ধূসর আলোয় চিকচিক করছে শিশিরে ভেজা নকল পাদুটো।

...এরপরে অনেকদিন আলেক্সেই মারেসিয়েভের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি. কিন্তু যুদ্ধের স্রোতে যেখানেই ভেসে যাই না কেন, সঙ্গে থাকত স্কুল-খাতাদুটো, যে দুটোয় ওরিওলের কাছে বৈমানিকটির অনন্যসাধারণ ওডিসি আমি লিখে নিই। যুদ্ধের সময়ে, হয়ত সাময়িক বিরতি ঘটেছে, আর তারপর অবরোধমুক্ত ইউরোপের নানা দেশে ঘোরার সময়ে কত বার না ওর কাহিনীটি লিখতে শুরু করি আর ছেড়ে দিই, কেননা যা লিখি তা ওর আসল জীবনের ক্ষীণ ছায়ামাত্র মনে হয়!

নুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক সামরিক বিচারকমণ্ডলীর একটি অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিন হের্মান গেরিঙের জেরা শেষ হয়ে আসছিল। দলিলী সাক্ষ্যের চাপে বিচলিত আর সোভিয়েত অভিযোক্তার জেরায় কোণ ঠেসা হল "দুনম্বর জার্মান নাৎসি", অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চেপে আদালতকে জানাল কী করে ফ্যাশিস্টদের বিরাট আর তখন পর্যন্ত অজেয় বাহিনী আমাদের বিরাট দেশে নানা যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে ভেঙ্গেচুরে যায়, বিলুপ্ত হয়ে আসে। আত্মসমর্থন করে, আকাশের দিকে নিষ্প্রভ চোখ তুলে হেরিং বলল:

'ভগবদ্বিধানের জন্যই এটা হল।'

'জার্মানি পরাজিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের ফলে. এই বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ যে অতিঘৃণ্য অপরাধ সেটা কি আপনি স্বীকার করেন?' সোভিয়েত অভিযোক্তা হেরিংকে জিজ্ঞেস করলেন।

'অপরাধ নয়, মারাত্মক ভুল,' ভুরু কুঁচকিয়ে চোখ নামিয়ে নিচু গলায় জবাব দিল গেরিং। 'আমি শুধু স্বীকার করছি যে না ভেবেচিন্তে আমরা সেটা করি, যুদ্ধ চলার সময়ে এটা স্পষ্ট দেখা গেল যে আমরা অনেক বিষয়ে

অজ্ঞ ছিলাম, অনেক কিছুর অস্তিত্ব আমরা কল্পনাও করিনি। প্রধান যে জিনিসটা আমাদের অজানা ছিল, বুঝতে পারিনি যেটা, সেটা হল সোভিয়েত রুশদের চরিত্র। ওরা তখন এবং এখনো আমাদের কাছে হেঁয়ালির মত। দুনিয়ার সেরা গুপ্তচর বিভাগ ওদের সত্যিকার অন্তর্নিহিত সামরিক শক্তির হদিশ করতে পারবে না। কামান বিমান আর ট্যাঙ্কের সংখ্যার কথা বলছি না। সেটা মোটামুটি আমরা জানি। ওদের শিল্পের পরিসর আর সামর্থ্যের কথাও বলছি না। রুশ জনগণের কথা ভাবছি। বিদেশীর কাছে রুশরা বরাবরই হেঁয়ালির মত। নেপোলিয়নও ওদের বুঝে উঠতে পারেনি। আমরা শুধু নেপোলিয়নের ভুলের পুনরাবৃত্তি করি।'

"রুশ হেঁয়ালি" আর আমাদের "অন্তর্নিহিত সামরিক শক্তির" কথা যে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়েছে গেরিংকে তাতে গর্বিত বোধ করলাম। সোভিয়েত জনগণের সামর্থ্য, প্রতিভা, সাহস আর আত্মত্যাগ যুদ্ধের সময়ে সারা পৃথিবীকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল, সেগুলো যে তখন এবং এখনো গেরিংদের কাছে হেঁয়ালির মত, সেটা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি আমরা। "জার্মানরা ঈশ্বরের পেয়ারের লোক", এই হীন তত্ত্বের আবিষ্কর্তারা কী করে সমাজতান্ত্রিক দেশে লালিতপালিত জনগণের চরিত্রবল আর শক্তির কথা বুঝবে? আলেক্সেই মারেসিয়েভের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। ওকের চৌখুপী দেওয়া সেই নিরালঙ্কার হলে আমার চোখের সামনে স্পষ্টভাবে এল তার প্রায় ভুলে যাওয়া চেহারা। আর সেখানেই, ফ্যাশিজমের জন্মস্থান নুরেমবার্গে আমার ইচ্ছে হল একজনের কথা বলি, সে লক্ষ লক্ষ সাধারণ সোভিয়েত মানুষেরই একজন, তাদেরি একজন যারা কাইটেলের সেনাদল আর গেরিঙের বিমান বাহিনীকে চুরমার করে দেয়, র‍্যেদেরের জাহাজগুলোকে পাঠায় সমুদ্রের অতলে, বলিষ্ঠ আঘাতে ভেঙে দেয় হিটলারের লুঠেরা রাষ্ট্রকে।

নুরেমবার্গে আমার কাছে হলুদ মলাট-দেওয়া স্কুলের খাতাদুটো ছিল, তার একটাতে মারেসিয়েভের হাতে লেখা: "তৃতীয় স্কোয়াড্রনের রোজনামচা"।

বিচারকমণ্ডলীর অধিবেশন থেকে বাড়ি ফিরে পুরোনো নোটগুলি দেখে নিয়ে আবার কাজে নামলাম। আলেক্সেই মারেসিয়েভ আমাকে যা বলেছিল তা থেকে ওর সম্বন্ধে ঠিক মত সবকিছু বলার ইচ্ছে ছিল আমার।

আমাকে ও যা বলে তার অনেকটা লিখে নিতে পারিনি, তা ছাড়া চার বছরে অনেক কিছু মন থেকে মুছে যায়। বিনয়ী বলে নিজের সম্বন্ধে অনেক

কথা বাদ দিয়েছিল আলেক্সেই মারেসিয়েভ, কল্পনার সাহায্যে ফাঁকগুলো ভরাতে বাধ্য হলাম আমি। নিজের বন্ধুদের ছবি সে রাত্রে স্পষ্ট ও সহৃদয়ভাবে সে এ'কেছিল, সেগুলো মনে ছিল না আমার, আবার নতুন করে আঁকতে হল তাদের। তথ্যগুলি পুরোপুরি অনুসরণ করে বলতে পারিনি আমি, নায়কের নাম একটু বদলে দিয়েছি; ওর বন্ধুদের, আর ওর কঠোর বীরত্বপূর্ণ যাত্রার সময়ে যারা ওকে সাহায্য করেছিল, নতুন নাম দিয়েছি তাদের। এর জন্য আশা করি নিজেদের ছবি এই কাহিনীতে চিনতে পারলে আমাকে মাপ করবেন তাঁরা।

বই'এর নাম দিয়েছি "মানুষের মত মানুষ", কেননা আলেক্সেই মারেসিয়েভ সোভিয়েত মানুষের মত মানুষ, হীনতম মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার মত লোকদের চিনতে পারেনি হের্মান গেরিং; আর এখনো চিনতে পারেনি তারা যারা ইতিহাসের পাঠ ভুলতে ইচ্ছুক, যারা এখনো গোপনে নেপোলিয়ন ও হিটলারের পন্থা অনুসরণ করতে চায়।

এইভাবে "মানুষের মত মানুষ" লেখা হয়।

ছাপার জন্য পাণ্ডুলিপিটা তৈরী হলে আমি চেয়েছিলাম প্রকাশের আগে যাতে বইটির প্রধান নায়ক সেটি পড়ে। কিন্তু যুদ্ধের হট্টগোলে তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ হারিয়ে গিয়েছিল; যে সব বৈমানিকদের আমরা দুজনে চিনতাম কিম্বা যে সব সরকারী মহলে খোঁজ নিয়েছিলাম তারা কেউই বলতে পারল না আলেক্সেই পেত্রভিচ মারেসিয়েভ কোথায়।

গল্পটি একটি পত্রিকায় বেরোতে শুরু হয়েছে আর রেডিওতে বলা হচ্ছে, একদিন সকালে টেলিফোনটা বেজে উঠল, রিসিভারটা তোলাতে কানে এল একটু ভাঙ্গা, বলিষ্ঠ, অস্পষ্ট-চেনা কণ্ঠস্বর:

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনি কে?'

'গার্ডস মেজর আলেক্সেই মারেসিয়েভ।'

কয়েক ঘণ্টা পরে ভালুকের মত দুলে দুলে হাঁটার ভঙ্গীতে আমার ঘরে ঢুকল আলেক্সেই মারেসিয়েভ, ঠিক আগেকার মত তৎপর, প্রফুল্ল আর কর্মঠ দেখাচ্ছে তাকে। যুদ্ধের চার বছরে বলতে গেলে কোন পরিবর্তন হয়নি তার।

'বাড়িতে বসে পড়ছিলাম। রেডিও চলছিল, কিন্তু বইটিতে এত মগ্ন ছিলাম যে বেতারে কান দিইনি একেবারে। হঠাৎ মা বলে উঠলেন, "শোনো,

বাছা, ওরা তোমার কথা বলছে!" কান খাড়া করে বসলাম। সত্যিই তাই। আমার কথা বলছে। অবাক কাণ্ড, কে লিখতে পারে ওটা? কাউকে বলেছি বলে মনে পড়ল না। তারপর ওরিওলের কাছে ডাগ-আউটে আমাদের সাক্ষাৎকারের কথাটি মনে পড়ল, আমার অভিজ্ঞতার নানা গল্প করে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিলাম আপনাকে, মনে পড়ল... কিন্তু কী করে এটা সম্ভব... ভাবলাম। ওটা ঘটে অনেক দিন আগে, প্রায় পাঁচ বছর আগে। কিন্তু তাহলেও ত গল্পটি পড়া হচ্ছে। অধ্যায়টি শেষ করে লেখকের নাম করল কথক। তাই ঠিক করলাম আপনাকে খুঁজে বের করব।'

প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল, উদার একটু লাজুক হাসি হেসে; মারেসিয়েভের নিজস্ব হাসি, আগে দেখেছি সেটা।

অনেক দিন অসাক্ষাতের পরে দুজন সৈনিকের দেখা হলে বরাবর যা হয়, আমরা আবার আমাদের সব যুদ্ধ নতুন করে লড়লাম, দুজনের চেনা অফিসারদের কথা উঠল, যারা আমাদের জয়লাভ দেখে যেতে পারেনি তাদের সম্বন্ধে কথা বললাম। আগেকার মত আলেক্সেই নিজের বিষয়ে বলতে অনিচ্ছুক, তবুও জানলাম যে আমাদের সাক্ষাৎকারের পর যুদ্ধে আরো অনেক সাফল্য অর্জন করে সে। নিজের গার্ডস উইঙের সঙ্গে ১৯৪৩-১৯৪৫ সালের নানা অভিযানে ও লড়ে। আমাদের দেখা হবার পরে ওরিওলের কাছে তিনটে শত্রু বিমান নামায়, তারপর বল্টিক উপকূলে যুদ্ধের সময়ে আরো দুটো। সংক্ষেপে পায়ের পাতা হারানোর জন্য শত্রুকে অনেক মূল্য দিতে বাধ্য করে সে। সরকার ওকে "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" খেতাব দেন।

ব্যক্তিগত জীবনের কথাও বলল আলেক্সেই: এ সূত্রে আমার গল্পটির সুখী পরিসমাপ্তিতেও আমি খুসি।

যুদ্ধের পর আলেক্সেই যে মেয়েটিকে ভালোবাসত তাকে বিয়ে করে, এতটি ছেলে হয়েছে, তার নাম ভিক্তর। মারেসিয়েভের মা কামিশিন থেকে এসে ওদের সঙ্গে আছেন, ওদের সুখে সুখী তিনি, পৌত্রের দেখাশোনা করেন।

এখন আমার গল্পের প্রধান নায়কটির নাম খবরের কাগজে প্রায়ই বেরোয়। আমাদের পূত সোভিয়েত ভূমিতে হামলাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে সোভিয়েত অফিসারটি সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার এত দীপ্ত দৃষ্টান্ত স্থাপিত করে সে এখন বিশ্বশান্তির উৎসাহী সমর্থক। নানা সম্মেলনে ও

সমাবেশে তাকে একাধিকবার দেখেছে বুদাপেস্ত, প্রাগ, প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন ও ওয়ারস'র মেহনতী জনগণ। এই সোভিয়েত যোদ্ধাটির বিস্ময়কর কাহিনী নিজের দেশের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর গিয়েছে, যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা যে এমন অটলভাবে সহ্য করেছে তার মুখে শান্তির মহৎ দাবী বিশেষ করে জোরালো শোনায়।

স্বাধীনতাপ্রিয় পরাক্রান্ত জনগণের সন্তান আলেক্সেই মারেসিয়েভ, যুদ্ধের সময়ে যে দৃঢ় আগ্রহে জয়লাভে নিঃসংশয় হয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়ে তাদের হারায়, ঠিক সে ভাবে এখন শান্তির জন্য লড়াই করছে সে।

তাই মানুষের মত সোভিয়েত মানুষ, আলেক্সেই মারেসিয়েভের কাহিনীর উত্তরভাগ রচনা করছে জীবন নিজেই।

মানুষের মতো মানুষ

'রাদুগা' প্রকাশন

অনুবাদ: **সমর সেন**

তৃতীয় সংস্করণ

বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · 'রাদুগা' প্রকাশন · ১৯৬০

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

১

তীক্ষ্ন ঠাণ্ডা আলোয় তখনো তারারা ভাস্বর, কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্বাকাশ সকালের ক্ষীণ আভায় উদ্ভাসিত। ঝাপসা আলোয় গাছপালা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হঠাৎ দমকা তাজা হাওয়ায় গাছের মাথাগুলো নড়ে উঠল, সমস্ত বন ভরে গেল উচ্চকিত, প্রতিধ্বনিমুখর শব্দে। বহু প্রাচীন পাইনগাছগুলি উৎকণ্ঠিত মৃদুস্বরে ফিসফিস করে পরস্পরকে ডাকল, বিচলিত শাখা থেকে শুকনো গুঁড়োগুঁড়ো বরফ ঝরে পড়ল ঝরঝর করে।

হঠাৎ-আসা হাওয়া হঠাৎ থেমে গেল। গাছগুলো আবার ঘনীভূত জড়তায় আচ্ছন্ন। আর তারপরেই ভোরের সূচনা করে বনের নানা শব্দ ভেঙ্গে পড়ল: কাছের খোলা জায়গায় নেকড়ের ক্ষুধিত গর্জন, শেয়ালের সতর্ক ডাক, আর সদ্য-জাগ্রত কাঠঠোকরার প্রথম অনিশ্চিত ঠকঠক, নিস্তব্ধ বনে এত সুরেলা সে শব্দ যে মনে হয় পাখিটা বেহালায় টোকা দিচ্ছে, গাছের গুঁড়িতে নয়।

আবার ভারী ভারী পাইনের মাথায় দমকা হাওয়া। ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আকাশে শেষ তারা কটি আস্তে আস্তে নিভে গেল; মনে হল আকাশ ছোট আর ঘন হয়ে এসেছে। রাত্রের বিষণ্ণ অন্ধকারের রেশ ঝেড়ে ফেলে সজীব সবুজ মহিমায় সমস্ত বন জাগ্রত। পাইনের কোঁকড়া মাথায়, ফারের ঋজু পাতলা শাখায় গোলাপী রং থেকে বোঝা যায় সূর্য উঠেছে আর দিনটি হবে উজ্জ্বল, ঝরঝরে আর হিমশীতল।

বেশ আলো হয়ে এল। রাত্রের শিকার ধীরেসুস্থে হজম করার জন্য নেকড়েগুলো বনের গভীরে চলে গিয়েছে, খোলা জায়গায় শেয়ালগুলোও

আর নেই, বরফে তাদের পায়ের আঁকাবাঁকা ধূর্ত ছাপ। প্রাচীন বনটি সমান অবিরাম শব্দে মুখরিত। সেই বিষণ্ন, উৎকণ্ঠিত একটানা শব্দের পাতলা ঢেউ'এ কিছুটা বৈচিত্র্য আনছে শুধু পাখিদের অকারণ ব্যস্ততা, কাঠঠোকরার ঠকঠক, এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে যাওয়া হলুদ টমটিটগুলোর খুসির কিচির মিচির আর কাকগুলোর খরখরে লোভী ডাক।

অল্ডারগাছে বসে একটা হাঁড়িচাঁচা ছুঁচলো কালো ঠোঁট ডালে ঘষে সাফ করছিল, হঠাৎ মাথা খাড়া করে কী যেন শুনল, উড়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে ডালে বুক দিয়ে বসল। শুকনো ডালগুলো উৎকণ্ঠায় মড়মড় করে উঠল। নিচের ঝোপঝাপ ঠেলে যাচ্ছে লম্বা চওড়া কী একটা। সরসর করছে ঝোপগুলো, অস্থিরভাবে দুলছে বাচ্চা পাইনগুলির মাথা, শোনা গেল খরখরে বরফ ভাঙ্গার আওয়াজ। তীক্ষ্ম স্বরে ডেকে হাঁড়িচাঁচাটা উড়ে গেল, লেজটা ঠিকরে রইল তীরের মত।

বরফে-ঢাকা পাইনগুলো ভেদ করে বেরিয়ে এল একটা লম্বা বাদামী মুখ, ভারী প্যাঁচালো শিং জানোয়ারটার মাথায়। ভীত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল বিরাট ফাঁকা জায়গাটি। লাল, মখমলের মত ওর নাসারন্ধ্র কেঁপে কেঁপে উঠল আক্ষেপে, গরম ভাপের নিঃশ্বাস ফোঁস ফোঁস করে পড়তে লাগল।

পাইনের মধ্যে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল বুড়ো হরিণটা। শুধু পিঠের লোমশ চামড়া অস্থির থরথর করে কাঁপছে। কানদুটো ভয়ে খাড়া, প্রত্যেকটি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, এত প্রখর ওর শ্রবণশক্তি যে একটা বড়ো গুবরে পোকা পাইনগাছের গা ফুটো করছে, সে আওয়াজটা পর্যন্ত কানে এল। তবু এমন কি তার সূক্ষ্ম কানেও বনের কোন অস্বাভাবিক ধ্বনি ধরা পড়ল না, শুধু পাখির কিচির মিচির, কাঠঠোকরার ঠকঠক আর পাইনের মাথায় একটানা সরসর শব্দ।

শুনে আশ্বস্ত হল বটে হরিণটা, কিন্তু ওর ঘ্রাণশক্তি বিপদের কথা জানাল। গলন্ত বরফের তাজা গন্ধের সঙ্গে মিশছে এই গভীর বনের অনাত্মীয় নানা কটু অপ্রীতিকর অশুভ গন্ধ। হরিণটার কালো বিষণ্ন চোখে ধরা পড়ল চোখ-ঝলসানো শাদা বরফের শক্ত আবরণে কালো কী সব পড়ে আছে। হরিণটা নড়ল না বটে, তবে শরীরের সমস্ত পেশী সংকুচিত করে ঝোপঝাড়ে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু বরফের উপরে নিশ্চল পড়ে রইল মূর্তিগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি করে, তালগোল পাকিয়ে। সংখ্যায় অনেক তারা,

কিন্তু কেউ নড়ছে না, আদিম স্তব্ধতা ভাঙ্গছে না কেউ। ওদের কাছাকাছি বরফের পুঞ্জে উদ্যত অদ্ভুত নানা দৈত্য; ওইখান থেকেই আসছে কটু অশুভ সব গন্ধ।

ফাঁকা জায়গার প্রান্তে দাঁড়িয়ে হরিণটা সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে আছে, ভেবে পাচ্ছে না কী ঘটেছে এই নিশ্চল আপাত নিরীহ মানুষের দলটির।

হঠাৎ একটি শব্দে চমকে উঠল হরিণটা। পিঠের চামরা আবার কেঁপে উঠল থরথর করে, পিছনের পাদুটোর সমস্ত পেশী আরো সংকুচিত হয়ে এল।

কিন্তু দেখা গেল ভয়ের কোন কারণ নেই। অংকুরিত কোন বার্চগাছের পাতা ঘিরে উড়ছে গুবরে পোকা, তার অস্ফুট গুনগুনের মত আওয়াজটা। তার সঙ্গে মাঝেমাঝে মিশছে সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ন ঘনঘনে কর্কশ একটা শব্দ, সন্ধ্যাবেলায় জলায় সারসের ডাকের মত।

তারপর গুবরে পোকাগুলোকে দেখা গেল, জ্বলজ্বলে পাখায় নীল ঠাণ্ডা আকাশে নাচছে। উঁচুতে বারবার শোনা যাচ্ছে সারসটার ডাক। একটা গুবরে পোকা পাখা ছড়িয়ে ঠুকরে মাটিতে পড়ল, বাকিগুলো নেচেই চলল। হরিণটার পেশীর টান-টান ভাব চলে গেল, ফাঁকা জায়গায় এসে, আকাশের দিকে সতর্কভাবে তাকিয়ে মুড়মুড়ে বরফ চাটল একবার। হঠাৎ আর একটা গুবরে পোকা নাচিয়েদের দল ছেড়ে সটান নেমে এল খোলা জায়গাটায়, পিছনে রেখে এল লোমশ পুচ্ছ। যত নিচে আসছে তত বড়ো হচ্ছে পোকাটা, এত তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল যে হরিণটা লাফিয়ে বনে ঢোকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট, আর হেমন্ত-ঝড়ের হঠাৎ ফেটে পড়ার চেয়েও ভয়াবহ কিছু একটা লাগল গাছের মাথায়, তারপর ঠিকরে পড়ল মাটিতে, ঝনঝন শব্দে সমস্ত বন উচ্চকিত হয়ে উঠল। শব্দটা শোনাল গোঙানির মত, আর তার প্রতিধ্বনি গাছপালায় ধেয়ে চলল, বনের গভীরে দ্রুত ধাবমান হরিণটাকে পেরিয়ে গেল সে শব্দ।

বনের নীল গভীরে প্রতিধ্বনি থিতিয়ে এল। পড়ন্ত বিমানে বিক্ষিপ্ত গুঁড়োগুঁড়ো বরফ গাছের মাথা থেকে ঝিকঝিক করে পড়ছে। আবার সমস্ত কিছু চাপা দিয়ে ভারী স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতায় স্পষ্ট শোনা গেল একজন গোঙাচ্ছে, আর একটা ভালুকের থাবার চাপে বরফ মড়মড় করে উঠল, অস্বাভাবিক নানা আওয়াজ শুনে বনের গভীর থেকে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে জানোয়ারটা।

ভালুকটা বুড়ো, বিরাট আর লোমশ। ওর দুটো ঢুকে-যাওয়া পাঁজর থেকে এবড়োখেবড়ো লোম খোঁচা খোঁচা বাদামী গোছায় বেরিয়ে আছে, শীর্ণ পাছা থেকেও লোম গোছায় গোছায় ঝুলছে। হেমন্ত থেকে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে এ সব অঞ্চলে, পশ্চিমের এই ঘন বন যেখানে আগে শুধু বনরক্ষী আর শিকারীরা আসত, তাও বেশী নয়, যুদ্ধের হাত থেকে নিস্তার পায়নি। হেমন্তে যখন শীতের ঘুমের জন্য তৈরী হচ্ছিল ভালুকটা ঠিক সে সময় যুদ্ধের রোল কাছাকাছি এসে পড়ে তাকে আস্তানা ছাড়া করেছে, আর এখন পেটের জ্বালায় রাগে অস্থিরভাবে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

ফাঁকা জায়গার ধারে একটু আগেই হরিণটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে ভালুকটা থামল। মাটিতে নাক দিয়ে হরিণটার পায়ের ছাপের তাজা রসালো গন্ধ শুঁকে লোভে গভীর নিশ্বাসে ওর শীর্ণ পাঁজর কেঁপে উঠল, কান পেতে শুনতে লাগল। হরিণটা চলে গিয়েছে, কিন্তু তার জায়গায় জীবন্ত এবং খুব সম্ভব দুর্বল কিছু একটা থেকে আওয়াজ আসছে। ভালুকটার গলার লোম খাড়া হয়ে উঠল। নাক বাড়িয়ে দিল ও। আবার খোলা জায়গার প্রান্ত থেকে এল অনুচ্চ করুণ ধ্বনি।

আস্তে আস্তে নরম থাবা ফেলে এগিয়ে গেল ভালুকটা, বরফে আধো-ঢাকা মানুষটা যেখানে নিশ্চল পড়ে আছে সেই দিকে; সতর্ক থাবার চাপে শুকনো কঠিন বরফের কর্কশ বিলাপ।

২

পাইলট আলেক্সেই মেরেসিয়েভ দুজোড়া "সাঁড়াশীর" প্যাঁচে পড়ে গিয়েছিল। বিমানযুদ্ধে এর চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। গোলাগুলি সমস্ত ফুরিয়ে গিয়েছে, এমন সময় চারটি জার্মান বিমান তাকে ঘেরাও করে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে, এড়িয়ে যাবার কিম্বা দিক বদলাবার কোন সুযোগ তার ছিল না...

ব্যাপারটা ঘটে এভাবে। কয়েকটা "ইলিউশিন" শত্রুপক্ষের একটি বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ করতে যাচ্ছে, লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভের অধীনে একদল জঙ্গী বিমান রক্ষী হিসেবে সঙ্গে গেল। দুঃসাহসী আক্রমণ সফল হল। পদাতিকরা যাদের "উড়ন্ত ট্যাঙ্ক" বলত, সেই স্তরমোভিকগুলো প্রায় পাইনগাছের মাথা ছুঁয়ে অলক্ষিতে বিমান-ঘাঁটিতে পেঁছিল, সেখানে

যানবাহনের কয়েকটি বড়ো "ইয়ুনকারস" সারি সারি সাজানো, তারপর হঠাৎ ধূসর-নীল পাইন বনের পিছন থেকে ছোঁ মেরে গেল ঘাঁটিটায়, গম্ভীর শব্দে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে, ভারী "ইয়ুনকারস"গুলোর উপর মেসিনগান আর কামানের গুলি বর্ষণ করতে করতে। চারটে বিমান নিয়ে মেরেসিয়েভ আক্রমণ স্থলে পাহারা রাখছিল, পরিষ্কার দেখল ঘাঁটিতে কালো কালো নানা মূর্তির যত্রতত্র ছোটাছুটি, যানবাহনের বিমানগুলো কঠিন বরফের উপরে আস্তে আস্তে বুকে হেঁটে এগোচ্ছে, বারবার আক্রমণ চালাচ্ছে স্তরমোভিকগুলো, তারপর "ইয়ুনকারসের" লোকগুলো গোলাগুলির বৃষ্টির মধ্যে বিমানগুলোকে রানওয়েতে জোরে চালিয়ে উপরে তুলল।

ঠিক এই সময়ে আলেক্সেই মারাত্মক ভুল করে। আক্রমণ স্থলে কড়া নজর না রেখে সে, বৈমানিকদের ভাষায়, "সহজ শিকারের লোভে" ধরা দিল। একটা ভারী, মন্থর "ইয়ুনকারস" সবেমাত্র জমি ছেড়ে উঠেছে, মেরেসিয়েভ নিজের বিমানকে তীরের মত নামিয়ে একখণ্ড পাথরের মত টুপ করে এল তার উপরে, মহানন্দে ওটার বহুরঙী, সমকোণ কুঞ্চিত ডুরালুমিনে গড়া শরীর মেসিনগানের গুলির দীর্ঘ দমকে রেখাঙ্কিত করল। এত আত্মপ্রত্যয় তার যে শত্রুপক্ষের বিমানটা মাটিতে পড়ে গিয়েছে কি না সেটা দেখবার তোয়াক্কা পর্যন্ত করল না। ঘাঁটির ওদিকে আর একটা "ইয়ুনকারস" আকাশে উঠল। তার পিছন ধাওয়া করল আলেক্সেই। আক্রমণ করল, কিন্তু সফল হল না। আস্তে আস্তে উঠছে শত্রু বিমানটা, তার উপর দিয়ে ওর ট্রেসারগুলির ধারা চলে গেল। এক ঝটকায় ঘুরে আবার আক্রমণ করল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল দ্বিতীয় বার, আবার কাছে এসে পড়ে ওটার চওড়া সিগার-আকৃতি শরীরে অধীরভাবে দমকা গুলি বর্ষণ করে বনের ওধারে নামিয়ে দিল। "ইয়ুনকারস" নামিয়ে, সীমাহীন অরণ্যের আন্দোলিত সবুজ সমুদ্রে যেখানে কালো ধোঁয়ার থাম উঠছে তার উপরে বিজয়গর্বে দুবার চক্রাকারে ঘুরে বিমান-ঘাঁটির দিকে আবার চলল মেরেসিয়েভ।

কিন্তু সেখানে মেরেসিয়েভের আর পেঁছিন হল না। দলের আর তিনটি বিমানকে নটা "মেসার" আক্রমণ করছে ও দেখল, স্তরমোভিকদের হটিয়ে দেবার জন্য জার্মান বিমান-ঘাঁটির নায়ক সেগুলোকে তলব করেছে নিশ্চয়ই। জার্মান বিমানগুলো সংখ্যায় তিনগুণ হলেও অসম সাহসে তিনটি বিমান ওদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্তরমোভিকগুলো যাতে শত্রুদের হাত থেকে

বেঁচে যায় তার চেষ্টায়। দূরে, ক্রমশ দূরে শত্রু বিমানগুলোকে ওরা নিয়ে গেল, বিলমোরগেরা যেমন জখম হবার ভান করে নিজেদের বাচ্চার কাছ থেকে শিকারীদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

সহজ শিকারের লোভে ধরা দিয়েছে বলে আলেক্সেই এত লজ্জিত যে হেলমেটের নিচে গালদুটো গরম হয়ে উঠেছে টের পেল। একটা বিমান বেছে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। যেটাকে বাছল সেটা একটা "মেসার", নিজের দল থেকে একটু দূরে সরে সেটাও কোন শিকারের সন্ধানে আছে, বোঝা গেল। যতখানি বেগে সম্ভব ততখানি বেগে বিমান চালিয়ে আলেক্সেই শত্রুকে পাশ থেকে আক্রমণ করল। যুদ্ধ বিজ্ঞানের সমস্ত রীতি অনুসারেই আক্রমণ করল জার্মানটিকে। আড়কষির জালের মত দৃষ্টিপথে শত্রু বিমানটার ধূসর শরীর স্পষ্ট পড়েছে, ঘোড়া টিপল ও, কিন্তু অক্ষতদেহে ওটা চট করে পেরিয়ে গেল। আলেক্সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে না, কাছেই ছিল বিমানটি, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। "গোলাগুলি খতম!" আঁচ করে আলেক্সেই'র মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। কামানগুলো পরীক্ষা করার জন্য আবার ঘোড়া টিপল, কিন্তু পেল না সেই স্পন্দন, গুলি চালিয়ে সমস্ত শরীরে যে স্পন্দন বৈমানিকরা অনুভব করে। বারুদ খতম, "ইয়ুনকারসগুলোকে" তাড়াতে গিয়ে গোলাগুলি নিঃশেষ।

কিন্তু শত্রুরা জানে না সেটা! ওদের সংখ্যাধিক্য কমাবার জন্য অন্তত যুদ্ধে যোগ দিতে ঠিক করল আলেক্সেই। কিন্তু ভুল ভেবেছিল সে। যে জঙ্গী বিমানকে আক্রমণ করেও সে কিছু করতে পারেনি, তার চালক অভিজ্ঞ ও সেয়ানা। প্রতিযোগীর গোলাবারুদ ফুরিয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে সহকর্মীদের নির্দেশ দিল। চারটি "মেসার" দলছাড়া হয়ে ঘেরাও করল আলেক্সেইকে, উপরে একটি, নিচে একটি, আর দুটি দুপাশে। ট্রেসারগুলির দমকে পরিষ্কার নীল আকাশে স্পষ্ট রেখা কেটে তার গতিপথ নির্দেশ করে ওরা ওকে দুজোড়া "সাঁড়াশীর" প্যাঁচে ফেলল।

কিছুদিন আগে আলেক্সেই শুনেছিল যে জার্মানদের প্রখ্যাত "রিখথোফেন" বিমান ডিভিশন পশ্চিম থেকে ও অঞ্চলে, স্তারায়া রুসাতে এসেছে। এ দলের মুরুব্বী হেরিং নিজে, এতে আছে ফ্যাশিস্ট রাইখের সেরা বৈমানিকরা। আলেক্সেই বুঝতে পারল যে এইসব আকাশ নেকড়েদের খপ্পরে পড়েছে সে, আর ওকে নিজেদের বিমান-ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে বন্দী করতে ওরা চাইছে। এ ধরনের ঘটনা আগে ঘটেছে। ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু,

সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাবপ্রাপ্ত আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কোর চালনায় জঙ্গী বিমানের দল একটি জার্মান পর্যবেক্ষককে নিজেদের ঘাঁটিতে নামাতে কী করে বাধ্য করে তা ত আলেক্সেই নিজে দেখেছে।

ওর চোখের সামনে ভেসে এল বন্দী জার্মানটির লম্বাটে, ছাই'এর মত বিবর্ণ মুখ আর এলোমেলো পদক্ষেপ। "বন্দী করবে? কখনো নয়! ওসব চালাকি চলবে না!" দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল আলেক্সেই।

কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ওদের এড়িয়ে যাওয়া গেল না। যে দিকে ওকে জার্মানরা চালাচ্ছে সে দিক থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেই মেসিনগানের গুলিতে পথ আটকে যাচ্ছে। আবার ওর মানসপটে এল বন্দী জার্মানটির বিকৃত মুখ, থরথর করে চোয়াল কাঁপছে। হীন পশুসুলভ ভয়ের স্পষ্ট ছাপ সে মুখে।

আবার দাঁতে দাঁত চেপে আলেক্সেই যতখানি পারে ততখানি ইঞ্জিনের থ্রটল খুলল, আর যে জার্মান বিমানটা তাকে মাটির দিকে ঘেঁষে নিয়ে যাচ্ছে, লম্বালম্বিভাবে তার নিচে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করল। তার নিচে থেকে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু ঠিক সময়ে জার্মান বৈমানিক ঘোড়া টিপল। গতিছন্দ হারাল আলেক্সেই'র বিমান. তাল কাটতে লাগল একবার, দুবার. যেন মারাত্মক জ্বরের ঘোরে সমস্ত বিমানটি থরথর করে কাঁপছে।

বিমানটা জখম হয়েছে। ঘোলাটে শাদা একটি মেঘের পুঞ্জে বিমানটিকে ঝট করে নামিয়ে নিয়ে যেতে আলেক্সেই পারল, পিছু তাড়া যারা করছিল তারা খেই হারাল। কিন্তু অতঃ কিম? আহত বিমানটির স্পন্দনে ওর সমস্ত শরীর ধকধক করছে, যেন যন্ত্রটির মৃত্যু যন্ত্রণায় নয়, নিজের শরীরের জ্বরেই সে কম্পমান।

বিমানটির কোথায় চোট লেগেছে? কতক্ষণ উড়তে পারবে সেটা? তেলের ট্যাঙ্কগুলো কি ফাটবে? প্রশ্নগুলি আলেক্সেই ঠিক যে করল তা নয়, অনুভব করল। ঠাস ডিনামাইটের উপরে বসে আছে, পলতেতে ইতিমধ্যেই আগুন দেওয়া হয়েছে, এই মনোভাবে বিমানটিকে ঘুরিয়ে নিজের ঘাঁটির দিকে চলল। মরতেই যদি হয়, তাহলে যেন স্বজনেই কবর দেয়!

চরম মুহূর্তটি এল আচম্বিতে। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বিমানটা গড়িয়ে নামতে লাগল. যেন খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গড়াচ্ছে। নিচে বনটা আন্দোলিত,

অনন্ত সমুদ্রের ধূসর-সবুজ ঢেউ'এর মত... "যাই হোক, আমাকে ত ওরা বন্দী করতে পারবে না?" কথাটা ওর মনে ঝলকিয়ে উঠল, তখন সবচেয়ে কাছের গাছগুলো সমান সারিতে মিলে গিয়ে বিমানের পাখাদুটোর নিচে ধাবমান। বুনো জন্তুর মত বনটি যখন ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন কিছু না ভেবেই থ্রটল বন্ধ করে দিল আলেক্সেই। বিকট আওয়াজ একটা, মুহূর্তে সবকিছু মিলিয়ে গেল, মনে হল কালো, ঘন জলের বিস্তারে আলেক্সেই ও বিমানটা ঝপ করে পড়েছে।

পড়বার সময় পাইনের মাথায় ধাক্কা খাওয়াতে পতন বেগ কমে যায়। কয়েকটা গাছ ভেঙ্গে বিমানটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কিন্তু ঠিক তার আগে ককপিট থেকে ঝটকে আলেক্সেই পড়ল শাখা প্রশাখায় আচ্ছন্ন বহু পুরাতন একটা ফারগাছে, ডালপালায় গড়িয়ে নেমে এল হাওয়ায় গাছের নিচে জমাট বাঁধা বরফের স্তূপে। তাতে প্রাণে বেঁচে গেল...

কতক্ষণ যে নিসাড় অজ্ঞান অবস্থায় সেখানে পড়ে ছিল আলেক্সেই'র মনে নেই। ভাসা-ভাসা মানুষের ছায়া, বাড়িঘর দোরের রেখা আর অবিশ্বাস্য নানা যন্ত্র নিমেষে নিমেষে ওকে পেরিয়ে যাচ্ছে, এত উদ্দাম বেগে, ঘূর্ণীবায়ুর মত ভেসে যাচ্ছে যে সমস্ত শরীর চাপা ব্যথায় কনকন করছে। তারপর সে বিশৃঙ্খলা থেকে বেরিয়ে এল বৃহৎ উষ্ণ অনির্দিষ্ট আকারের কিছু একটা, ওর মুখে ফেলল গরম আবিল নিশ্বাস। ওটার কাছ থেকে গড়িয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু বরফে শরীর গেঁথে গিয়েছে মনে হল। আশেপাশে সঞ্চারিত সেই অজানা বিভীষিকার তাড়নায় হঠাৎ একটা চেষ্টা করল আলেক্সেই, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া বুকে ঢুকল, গালে লাগল ঠাণ্ডা বরফ, আর অনুভব করল তীব্র যন্ত্রণা, এবার সমস্ত শরীরে নয়, শুধু পায়ে।

"বেঁচে আছি তাহলে!" চকিতে মনে হল। ওঠবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু কানে এল কার পায়ের চাপে বরফ ভাঙ্গছে, সজোরে কর্কশ নিশ্বাস কে যেন ফেলছে কাছে। "জার্মানগুলো!" তক্ষুণি ভাবল সে, চোখ খুলে লাফিয়ে উঠে আত্মরক্ষা করার ঝোঁক দাবাল কোনক্রমে। "বন্দী তাহলে, শেষ পর্যন্ত তাহলে বন্দী করবে! কী করি?"

মনে পড়ল, পিস্তলের খাপের পটি ছিঁড়ে গিয়েছিল, আগের দিন ওর মিস্ত্রী সবজান্তা ইউরা সেটা ঠিক করে দেবে বলে, কিন্তু তা না করাতে বিমানি পোশাকের নিচের পকেটে পিস্তলটা নিতে হয়। ওটা বের করতে হলে পাশ ফিরতে হবে, কিন্তু শত্রুদের নজর এড়িয়ে সেটা করতে পারবে

না, এখন ত উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। উরুতে পিস্তলটার সূক্ষ্ম রেখা অনুভব করলেও নিশ্চল পড়ে রইল আলেক্সেই; মরে গিয়েছে ভেবে হয়ত শত্রুরা চলে যাবে।

জার্মানটা কাছে ঘুরল, অদ্ভুতভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কাছে এল, বরফ ভাঙ্গার শব্দ। মুখে আবার ওর দুর্গন্ধ নিশ্বাস অনুভব করল আলেক্সেই। এবারে বুঝতে পারল একটাই মাত্র জার্মান, পরিত্রাণের সুযোগ তাহলে আছে; নজর রেখে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে, ও বন্দুকে হাত দেবার আগেই যদি ওর টুঁটি চিপে ধরতে পারে... কিন্তু সেটা করতে হবে সাবধানে, একটুও ভুল না করে।

না নড়েচড়ে আস্তে আস্তে চোখ খুলল আলেক্সেই. আনত চোখের পাতায় নজরে যেটা এল সেটা জার্মান নয়, বাদামী লোমশ একটা কিছু। চোখ আরো খুলে তৎক্ষণাৎ বুজে ফেলল একেবারে: সামনে থাবা গেড়ে বসে আছে বড়ো, হ্যাংলা, লোমশ ভালুক একটা।

৩

নিঃশব্দে বসে আছে ভালুকটা, শুধু বুনো জন্তুরাই ওরকম চুপচাপ থাকতে পারে। কাছে অনড় মানুষের দেহ, সূর্যের আলোয় ঝকঝকে নীলচে বরফে তার প্রায় সমস্তটা ঢাকা।

জন্তুটার নোংরা নাসারন্ধ্র আস্তে আস্তে কুঁচকে গেল। মুখটা অর্ধেক খোলা, বুড়ো, হলদে কিন্তু ধারালো দাঁত দেখা যাচ্ছে. পুরু লালার সরু ফালি হাওয়ায় দুলছে।

শীতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে যুদ্ধ, ক্ষুধিত ও ক্রুদ্ধ ও। কিন্তু মড়ার মাংস ভালুকে খায় না। নিসাড় শরীরটা শুঁকেছে একবার, পেট্রলের তীব্র গন্ধ তাতে, তারপর আস্তে আস্তে ফাঁকা জায়গায় ঘুরেছে ভালুকটা, আরো অনেক মানুষের শরীর সেখানে খরখর বরফে জমে পড়ে আছে; কিন্তু একটা কাতরোক্তি আর খসখস আওয়াজ হওয়াতে ও আবার আলেক্সেই'র কাছে ফিরে এসেছে।

আর তাই আলেক্সেই'র পাশে থাবা পেতে বসে আছে ও। ক্ষুধার তাড়না মড়ার মাংসের প্রতি বিতৃষ্ণা দূর করার চেষ্টা করছে। ক্ষুধার জয় হতে চলেছে। নিশ্বাস ফেলে ভালুকটা উঠল, থাবা দিয়ে শরীরটাকে উল্টে ফেলে বিমানি পোশাকটায় নখ বসাল। পোশাকটা ছিঁড়ল না। নিচু গলায় গরগর করে

উঠল ভালুকটা। সেই মুহূর্তে আলেক্সেই'র ইচ্ছে হল চোখ খুলে পাশ ফিরে চেঁচিয়ে বুকের উপরে লাফিয়ে-পড়া ওই ভারী দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, কিন্তু অনেক কষ্টে ইচ্ছেটা সে দমন করল। প্রাণপণে, বেপরোয়াভাবে আত্মরক্ষা করার জন্য ওর সমস্ত সত্তা ওকে উত্তেজিত করছে, কিন্তু সে ইচ্ছে দাবিয়ে, আস্তে আস্তে, অলক্ষিতে পকেটে হাত চালিয়ে দিল, পিস্তলের বাঁটটা হাতড়ে খুঁজে সাবধানে ঘোড়াটা বসাল যাতে শব্দ না হয়, তারপর সেটা অলক্ষিতে বের করল।

বিমানি পোশাকটা ভালুকটা তখন আরো আক্রোশে ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে। শক্ত চামড়া ফেটে গেল বটে কিন্তু ছিঁড়ল না। উন্মত্ত ক্রোধে গর্জিয়ে উঠল ভালুকটা, মুখ দিয়ে পোশাকটা চেপে ফার আর ভিতরের তুলো ভেদ করে দাঁত চালাল। প্রাণপণ চেষ্টায় আর্তনাদ চাপল আলেক্সেই আর যে মুহূর্তে ভালুকটা এক ঝটকায় বরফের স্তূপ থেকে ওকে তুলল ঠিক সে মুহূর্তে পিস্তল তুলে ঘোড়া টিপল।

পিস্তলের তীক্ষ্ন আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল চারিদিকে।

পাখা ঝটপটিয়ে হাঁড়িচাঁচাটা দ্রুত উড়ে গেল। ডালপালা নড়ে ওঠাতে শুকনো বরফ আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ছে। আস্তে আস্তে শিকার ছেড়ে দিল ভালুকটা। বরফে পড়ে গেল আলেক্সেই — ভালুকটার উপরে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। থাবা গেড়ে বসে আছে জানোয়ারটা, কালো পুযে-ভরা চোখে হতচকিত ভাব। সূচীমুখ দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পুরু ফ্যাকাশে রক্ত চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বরফে পড়ছে। কর্কশ ভয়াবহ গর্জন করে পিছনের পাদুটোতে ভর দিয়ে কষ্টে দাঁড়িয়ে উঠল ওটা, আলেক্সেই আবার গুলি চালাবার আগেই পড়ে গেল। নীলচে বরফ আস্তে আস্তে ঘোর লাল হয়ে উঠল আর গলে যাবার সময়ে ওর মাথার কাছে দেখা গেল পাতলা বাস্পের রেশ। মরে গিয়েছে।

যে একাগ্র টান-টান ভাব এতক্ষণ আলেক্সেইকে আচ্ছন্ন করেছিল, হঠাৎ আলগা হয়ে গেল সেটা। পায়ের সেই তীক্ষ্ন দারুণ ব্যথা ফিরে এল আবার। বরফে পড়ে আবার অচেতন হয়ে গেল আলেক্সেই।

জ্ঞান যখন ফিরে এল সূর্য তখন অনেক উঁচুতে। ঘন পাইনগুলোর মাথা ভেদ করে সূর্যের আলো পড়েছে নিচে, সেই আলোয় বরফের ঝিলিক। ছায়ায় বরফের রং গভীর নীল, পাতলা নীল রং আর নেই।

জ্ঞান ফিরে আসাতে প্রথমে আলেক্সেই'র মনে হল, "ভালুকটা কী স্বপ্ন তাহলে?"

কাছে নীল বরফে পড়ে আছে বাদামী, লোমশ বিকৃতদর্শন লাশটা। বন থেকে নানা মুখর শব্দ উঠছে। কাঠঠোকরাটা সশব্দে গাছ ঠোকরাচ্ছে, এ ডাল থেকে ও ডালে লাফিয়ে যেতে যেতে হলুদ-বুক ক্ষিপ্র টমটিটগুলো খুসিতে কিচির মিচির করছে।

"বেঁচে আছি আমি, বেঁচে আছি, বেঁচে আছি!" বারবার আলেক্সেই নিজেকে বলল। মারাত্মক বিপদ কাটিয়ে ওঠার পর বেঁচে থাকার যে উদ্দাম রহস্যময় মাতাল-করা অনুভূতি প্রত্যেককে আচ্ছন্ন করে সেই ঘোরে ওর সমস্ত সত্তা, ওর সমস্ত শরীর উল্লসিত হয়ে উঠল।

সেই উদ্দাম অনুভূতির তাড়নায় লাফিয়ে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল আলেক্সেই, কিন্তু তক্ষুণি কাতরে উঠে পড়ে গেল ভালুকটার লাশের উপরে। পায়ের ব্যথায় সমস্ত শরীর টনটন করে উঠল। ভারী ঘরঘর শব্দে ওর মাথা ভরে গেল, যেন একজোড়া পুরোনো কর্কশ শান-পাথর ঘুরছে আর ঘষছে, ওর মাথা ভরিয়ে দিচ্ছে তাদের ঘরঘরে। চোখদুটো টাটাচ্ছে, যেন কার আঙুলের চাপ তাদের উপরে। একবার আশেপাশের সমস্ত কিছু সূর্যের ঠাণ্ডা হলুদ আলোয় প্লাবিত হয়ে স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখাচ্ছে; পর মুহূর্তে সমস্ত কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ধূসর চিকচিকে পর্দার আড়ালে।

'ব্যাপার বেগতিক মনে হচ্ছে। পড়বার সময় মাথায় চোট লেগেছিল নিশ্চয়ই। তাছাড়া পায়ে কিছু গড়বড় হয়েছে,' আলেক্সেই ভাবল।

কনুই'এ ভর দিয়ে উঠে আলেক্সেই বিস্ময়ে দেখল বনের প্রান্তের ওপারে চওড়া মাঠ, দূর বনের ধূসর অর্ধবৃত্ত দিগন্তে তার সীমারেখা রচনা করেছে।

স্পষ্টতই হেমন্তে, কিম্বা সম্ভবত শীতের প্রথম দিকে সোভিয়েত বাহিনীর কোন দল বনের প্রান্তে ঘাঁটি বাঁধে, বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনি হয়ত, কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ ছিল অদম্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। তুলোর পাঁজার মত বরফের স্তরে জায়গাটির ক্ষতচিহ্ন তুষার-ঝড়ে ঢাকা পড়েছে; কিন্তু সে স্তরের নিচেও চোখে পড়ে ট্রেঞ্চের সারির রেখা, মেসিনগান বসানোর ভাঙ্গা জায়গার সব অনুচ্চ ঢিবি, গোলায় কাটা অগণন ছোট বড়ো গর্ত গিয়েছে বনের ধারে বিকলাঙ্গ চূড়াহীন দগ্ধ গাছগুলো পর্যন্ত। ক্ষতবিক্ষত মাঠের এদিকে ওদিকে পড়ে আছে কয়েকটা ট্যাঙ্ক, পাইক-মাছের আঁশের নানা রঙে রঙ করা। বরফে জমে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো, অদ্ভুত জানোয়ারের লাশের মত চেহারা প্রত্যেকের, বিশেষ করে একেবারে শেষের দিকের ট্যাঙ্কটার, হাত-

বোমায় কিম্বা মাইনে একপাশে হেলে পড়ে গিয়েছে নিশ্চয় ওটা, বেরিয়ে-আসা জিভের মত ওর কামানের লম্বা নলটা মাটিতে ঠেকানো। আর সারা মাঠে, অপরিসর ট্রেঞ্চের ধারে ধারে, ট্যাঙ্কগুলোর কাছে, বনের ধারে পড়ে আছে সোভিয়েত ও জার্মান সৈনিকের মৃতদেহ, এত অসংখ্য যে জায়গায় জায়গায় একটির উপরে আর একটি গাদা করা; তারা জমে পড়ে আছে ঠিক সেই ভঙ্গীতে যে ভঙ্গীতে মাত্র কয়েকমাস আগে শীতের প্রান্তে যুদ্ধের সময় মারা যায়।

দেখে বুঝতে পারল আলেক্সেই কী ভীষণ অদম্য যুদ্ধ চলেছিল এখানে, বুঝল তার সহচরেরা এখানে লড়াই করেছে, শত্রুকে আটকাতে হবে, এগিয়ে যেতে দেবে না, এছাড়া আর কোন চিন্তা তাদের মাথায় ছিল না। আর একটু দূরে বনের ধারে একটা মোটা পাইন, গোলায় মাথাটা উড়ে গিয়েছে, দীর্ঘ বিক্ষত গুঁড়ি থেকে হলুদ স্বচ্ছ রস চুঁইয়ে পড়ছে, পাইনটার তলায় পড়ে আছে জার্মান সৈনিকদের মৃতদেহ, খুলি ফাটা, মুখ ক্ষতে বিকৃত। মাঝখানে একটি জার্মানের মৃতদেহের উপরে আড়াআড়িভাবে হুমড়ি খেয়ে আছে চওড়া-মাথা একটি যুবক, পরনে তার আর্মিকোট নেই, শুধু কোমরবন্ধ ছাড়া টিউনিক, কলার ছেঁড়া; পাশে রাইফেল একটা, সঙ্গীনটা ভাঙ্গা, ক্ষতবিক্ষত বাঁটে রক্তের দাগ।

আর একটু এগিয়ে, যে রাস্তাটা বনের দিকে গিয়েছে, সেখানে বালুতে আচ্ছন্ন একটি নবীন ফারগাছের নিচে গোলার গর্ত থেকে অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে ময়লা রঙের উজবেক একজন, লম্বাটে মুখটা মনে হয় পুরোনো হাতির দাঁত খুদে তৈরী করা। পিছনে ফারগাছের ডালপালার নিচে স্তূপ করে হাত-বোমা সাজানো; উজবেকটির মৃত, উত্তোলিত হাতে একটা হাত-বোমা, যেন ওটা ছোঁড়বার আগে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল একবার, আর সেই ভঙ্গীতেই পাথর হয়ে গিয়েছে।

আরো আগে, বনের রাস্তায় দাগওয়ালা ট্যাঙ্কের পাশে, বড়ো বড়ো গোলা-গর্তের ধারে, ছোট ছোট ট্রেঞ্চে পুরোনো গাছের গুঁড়ির কাছে ছড়ানো মৃতদেহ, পরনে তুলো-ভর্তি জ্যাকেট আর পাৎলুন, অন্যদের টিউনিকের রঙ ধূসর-সবুজ; শিঙওয়ালা টুপি কান পর্যন্ত টানা; দোমড়ানো হাঁটু, ওপরে তোলা চিবুক, শেয়ালে চেবানো, হাঁড়িচাঁচা আর দাঁড়কাকে ঠোকরানো মোমের মত শাদা সব মুখ বরফের স্তূপ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আছে।

ফাঁকা জায়গার উপরে কয়েকটা দাঁড়কাক মন্থরভাবে চক্কর দিয়ে ঘুরছিল,

হঠাৎ আলেক্সেই'র মনে পড়ল মহৎ রুশ শিল্পীর আঁকা "ইগরের যুদ্ধ" নামের বিষণ্ন উদাত্ত পরাক্রান্ত ছবিটির কথা. স্কুলের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে ছবিটা সে দেখেছিল।

"ওদের মত আমিও এখানে পড়ে থাকতাম হয়ত," মেরেসিয়েভ ভাবল, আবার বেঁচে থাকার অনুভূতি ওর সমস্ত সত্তাকে ভরিয়ে দিল। নিজেকে ঝাঁকুনি দিল আলেক্সেই। কর্কশ শান পাথরদুটো তখনো মন্থরভাবে ওর মাথায় ঘুরছে, পায়ের জ্বালা আর যন্ত্রণা আরো বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু ও উঠে ভালুকটার লাশের উপরে বসল, শুকনো বরফের গুঁড়োয় সেটা এখন ঠাণ্ডা আর রূপালী, ভাবতে শুরু করল কী করা উচিত, কোথায় যাবে, কী করে পোঁছবে নিজের লাইনে।

বিমান থেকে ঝটকে পড়ে যাবার সময় মানচিত্রের কেসটা হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন পথে যেতে হবে খুব স্পষ্টভাবে সেটা আলেক্সেই কল্পনা করতে পারল। যে জার্মান বিমান-ঘাঁটিটাকে স্তরমোভিকগুলো আক্রমণ করে সেটা ফ্রণ্ট লাইনের প্রায় ষাট কিলোমিটার পশ্চিমে। আকাশ-যুদ্ধের সময় ওর সহচরেরা শত্রুদের বিমান-ঘাঁটি থেকে পূব দিকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আর জোড়া "সাঁড়াশীর" খপ্পর থেকে বেরিয়ে ও নিজে পূবমুখো আর কিছু দূরে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। তাহলে ও যেখানে পড়েছে সেটা নিশ্চয়ই ফ্রণ্ট লাইন থেকে প্রায় পয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে হবে, এগিয়ে-যাওয়া জার্মান দলের অনেক পিছনে, "কৃষ্ণ অরণ্য" নামের বিরাট বিস্তৃত বনভূমির এলাকার কোন একটা জায়গায় সে এখন। ফ্রণ্ট লাইনের কাছাকাছি জার্মান ঘাঁটিতে সংক্ষিপ্ত হামলার সময়ে বোমারু আর স্তরমোভিকের রক্ষী হিসেবে একাধিক বার এই বনের উপরে দিয়ে সে গিয়েছে। উপর থেকে বনটাকে হামেশাই সীমাহীন সবুজ সমুদ্রের মত তার কাছে ঠেকেছে। পরিষ্কার দিনে পাইনগাছের দোদুল্যমান চূড়োয় বনটা বিক্ষুব্ধ হত; কিন্তু আবহাওয়া খারাপ হলে পাতলা ধূসর কুয়াশার আচ্ছাদনে ওটাকে দেখাতে ছোট ছোট ঢেউ-তোলা মসৃণ নিরানন্দ জলরাশির মত।

বিরাট বনের মাঝামাঝি জায়গায় যে সে পড়েছে তার ভালোমন্দ দুটো দিক আছে। ভালোর দিকটা হল এই — কোন জার্মানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা কম, কারণ জার্মানরা সাধারণত রাস্তা আর সহর ধরে চলে। খারাপ দিকটা -- ওর যাত্রাপথ দীর্ঘ না হলেও কঠিন হবে; ঘনগভীর ঝোপঝাড় ঠেলে যেতে হবে ওকে, মানুষের সাহায্য মিলবে না হয়ত, হয়ত মিলবে না

কোন আশ্রয়, রুটির টুকরো একটা, গরম পানীয় কিছু। আর পাদুটো... ওর বোঝা কি সইতে পারবে! হাঁটতে কি পারবে ও? ..

ভালুকটার লাশ ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠল আলেক্সেই। আবার পায়ের সেই তীব্র যন্ত্রণা, নিচে থেকে শুরু করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে আবার বসে পড়ল ও। ফারবুট খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু একটুও নড়ল না সেগুলো; এক একবার টানছে আর কাতরাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ একেবারে বন্ধ করে দুহাতে একটা বুট ধরে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল — আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল। জ্ঞান ফিরে এলে সাবধানে পায়ের কাপড়ের পট্টি খুলল। পাটা ফুলে গিয়েছে, সমস্তটা জুড়ে কালশিটের মত দেখাচ্ছে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা আর জ্বালা। বরফের উপরে পাটা কিছুক্ষণ রাখাতে যন্ত্রণার উপশম হল কিছুটা। আবার আগেকার মত মরীয়াভাবে, হ্যাঁচকা টানে, যেন নিজের দাঁত ওপড়াচ্ছে, অন্য বুটটাও খুলে ফেলল।

দুটো পা-ই গিয়েছে। বিমানের ককপিট থেকে যখন এক ঝটকায় পড়ে যায় তখন নিশ্চয়ই কিছু একটায় পাদুটো আটকে গিয়েছিল, তাতে পাতার ওপর দিকটা আর আঙুলের হাড় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। অন্য কোনো সময়ে পাদুটোর এই ভয়াবহ অবস্থায় উঠে দাঁড়াবার কল্পনা পর্যন্ত আলেক্সেই করত না। কিন্তু এখন আদিম অরণ্যের গভীরে সে একা শত্রুদের পিছনে পড়ে আছে, এখানে কোন লোকের সঙ্গে দেখা হবার মানে মৃত্যু, পরিত্রাণ নয়। তাই বনের মধ্য দিয়ে কোনক্রমে পূব বরাবর যাওয়া মনস্থ করল সে, সুবিধাজনক রাস্তা কিম্বা লোকের বসতি এড়িয়ে চলতে হবে; যে কোন প্রকারে এগিয়ে যেতে হবে।

ভালুকটার লাশ ছেড়ে দৃঢ়চিত্তে দাঁড়াল আলেক্সেই, দাঁড়াতেই দম বন্ধ হয়ে এল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রথম পা ফেলল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে অন্য পাটাও বরফ থেকে অতিকষ্টে তুলে আর এক পা বাড়াল। মাথায় নানা শব্দের ভিড়, বন আর খোলা জায়গাটা দুলে ভেসে যাচ্ছে।

প্রয়াসে আর যন্ত্রণায় নিজেকে আরো দুর্বল লাগছে। ঠোঁট কামড়ে এগিয়ে চলল ও, এল একটা বনের রাস্তায়, ভাঙ্গা ট্যাঙ্ক পেরিয়ে, হাত-বোমা যার হাতে সেই মৃত উজবেকটিকে পেরিয়ে বনের গভীরে পূবমুখো রাস্তাটা চলে গিয়েছে। নরম বরফে খুঁড়িয়ে হাঁটা অতটা খারাপ নয়, কিন্তু হাওয়ায় কঠিন, বরফে-ঢাকা এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পা পড়তেই যন্ত্রণাটা এত দুর্বিষহ হল যে আর পা বাড়াবার সাহস হল না আলেক্সেই'র, থামল সে। দাঁড়িয়ে

রইল, দুটো পা বিচ্ছিরিভাবে ফাঁক করে, শরীরটা দুলছে, যেন হাওয়ায় নড়ছে। হঠাৎ ঝাপসা কুয়াশা চোখের সামনে দেখল। রাস্তা, পাইন আর পাইনগুলোর ধূসর মাথা আর তাদের মাঝখানের আকাশের নীল আয়ত টুকরোটা মিলিয়ে গেল... নিজের বিমান-ঘাঁটিতে প্রত্যাগত সে, দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গী বিমানের পাশে, নিজের বিমানটার পাশে, তার পাশে ওর মিস্ত্রী ঢেঙ্গা ইউরা, ওর দাড়িগোঁফ না-কামানো, সদা-চটুল মুখে দাঁত আর চোখ আগেকার মতই চিকচিক করছে, ইসারা করে আলেক্সেইকে ডাকছে ককপিটে, যেন বলছে, "ওটা তৈয়ার, রওনা হও এবার!" বিমানটার দিকে এক পা বাড়াল আলেক্সেই, কিন্তু মাটি দুলে উঠল, পাদুটো জ্বলছে, যেন গনগনে গরম ধাতুর পাতে পা পড়েছে। জ্বলন্ত মাটির টুকরোটার উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি বিমানটার পাখার দিকে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ঠাণ্ডা কাঠামোটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। অবাক হয়ে দেখল কাঠামোর পাশটা মসৃণ ঝকঝকে নয়, কর্কশ, যেন পাইনের ছাল দিয়ে তৈরী... কিন্তু কোন জঙ্গী বিমান নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সে, হাতড়াচ্ছে একটা গাছের গুঁড়ি।

"বিকারের ঘোরের স্বপ্ন! মাথায় চোট লাগাতে পাগল হয়ে যাচ্ছি!" ভাবল আলেক্সেই। "এ রাস্তা ধরে গেলে দুর্দশার শেষ থাকবে না। রাস্তাটা ছেড়ে দেব না কি? কিন্তু তাহলে অনেক সময় লাগবে..." বরফের উপরে বসে পড়ে আগেকার মত সজোরে, হ্যাঁচকা টানে ফারবুটদুটো খুলে, দাঁত আর নখ দিয়ে ওপর দিকটা ছিঁড়ল, যাতে ভাঙ্গা পায়ে চলা সহজ হয়, আঙ্গোরা পশমের বড়ো নরম গলাবন্ধটা খুলে ছিঁড়ে ফালি করে পায়ে জড়িয়ে আবার বুট পরল।

আগেকার চেয়ে সহজে হাঁটা যায় এখন। সেটাকে হাঁটা বলা কিন্তু ঠিক হবে না: হাঁটা নয়, সামনে এগিয়ে যাওয়া, সাবধানে এগিয়ে যাওয়া, গোড়ালির উপরে ভর দিয়ে, পায়ের পাতা অনেকখানি তুলে, কাদার উপরে লোকে যেমন করে হাঁটে। দুএক পা ফেললেই যন্ত্রণায় আর পরিশ্রমে মাথা ঘুরছে। থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছে আলেক্সেই, চোখ বুজে কোন গাছের গুঁড়িতে হেলান দিচ্ছে কিম্বা কোন বরফের ঢিবিতে বসে পড়ছে, শিরায় শিরায় রক্তের দপদপানির অনুভূতি।

কয়েক ঘণ্টা এইভাবে চলল আলেক্সেই। কিন্তু ফিরে তাকাতে চোখে পড়ল বনের ধারে সেই রোদে-ভরা রাস্তাটি, সেখানে মৃত উজবেকটি বরফে ছোট একটা কালো দাগের মত পড়ে আছে। ভয়ানক হতাশ লাগল ওর। হতাশ, কিন্তু ভীত নয়। ঠিক করল গতি আরো বাড়াতে হবে। বরফের ঢিবি

থেকে উঠে পড়ে, দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে চলল, কাছাকাছি সব জিনিস ওর লক্ষ্যবস্তু, সমস্ত মন তাতে নিবদ্ধ—একটা পাইন থেকে অন্য পাইনে, গাছের গুঁড়ি থেকে অন্য গুঁড়িতে, একটা বরফের ঢিবি থেকে অন্য ঢিবিতে। এগিয়ে যাচ্ছে ও, পিছনে জনহীন বনের রাস্তায় বরফের উপরে পড়ছে আঁকাবাঁকা অসমান পদচিহ্ন, আহত জন্তুর খুরের দাগের মত।

৪

সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলল। পিছনে কোথাও সূর্য অস্ত গেল, ঠাণ্ডা লাল আভা গাছের মাথায়, বনে ধূসর ছায়া ক্রমশ ঘন হচ্ছে, আলেক্সেই এসে পড়ল একটা জুনিপারকীর্ণ জায়গায়, সেখানে যা দেখল তাতে মনে হল শিরদাঁড়ায় কেউ ঠাণ্ডা ভিজে তোয়ালে বোলাচ্ছে, হেলমেটের নিচে চুল খাড়া হয়ে উঠল।

বোঝা গেল বনের ফাঁকা জায়গায় যখন যুদ্ধ চলেছিল তখন চিকিৎসা কর্মীদের একটা দলকে এখানে মোতায়েন করা হয়। আহতদের এখানে এনে শোয়ানো হয় পাইন-কাঁটার বিছানায়। ঝোপঝাড়ের আড়ালে তারা এখনো পড়ে আছে, বরফে কয়েক জনের শরীর অর্ধেক ঢাকা, আর অন্যরা একেবারে বরফের নিচে। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায় জখম হয়ে ওরা মারা যায়নি। কেউ সুকৌশলে ছুরির ঘায়ে ওদের গলা কেটেছে, ওরা একইভাবে পড়ে আছে, মাথাগুলো পিছনে হেলিয়ে, যেন পিছনে কী হচ্ছে দেখবার চেষ্টা করছে। আর ভয়াবহ ঘটনাটির টীকাও সেখানে। পাইনগাছের নিচে, বরফাবৃত একটি সোভিয়েত সৈনিকের দেহের পাশে, সৈন্যটির মাথা কোলে নিয়ে, কোমর পর্যন্ত বরফে ঢাকা বসে আছে একটি নার্স, ছোট পাতলা চেহারা, মাথায় ফারের টুপি, টুপির কানদুটো ফিতে দিয়ে চিবুকের নিচে বাঁধা। কাঁধের হাড় থেকে বেরিয়ে আছে ছোরার চকচকে বাঁট। কাছে পড়ে আছে ঝঞ্ঝা বাহিনীর কালো পোশাক-পরা একটা ফ্যাশিস্ট আর মাথায় রক্তাক্ত পট্টি জড়ানো একটি সোভিয়েত সৈনিকের মৃতদেহ। মরণ আলিঙ্গনে দুজনে দুজনের টুঁটি চেপে ধরেছে। আলেক্সেই তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল যে কালো পোশাক-পরা সৈনিকটি আহতদের হত্যা করে, নার্সকে ছুরিকাঘাত করার সময় তখনো জীবিত সোভিয়েত সৈনিকটি ছুটে এসে নিভন্ত জীবনে যতটুকু শক্তি আছে তাতে হত্যাকারীর টুঁটি চেপে ধরে।

আর তুষার-ঝড়ে সবাই আবৃত — মাথায় ফারের টুপি ক্ষীণদেহ মেয়েটি শরীর দিয়ে আহত সৈনিকটিকে বাঁচাচ্ছে, যে হত্যা করেছে আর যে প্রতিহিংসা নিয়েছে দুজনে পরস্পরের টুঁটি চেপে মেয়েটির পায়ের নিচে পড়ে আছে মেয়েটির পায়ে বাহিনীর চওড়া পুরোনো বড়ো বুট।

পাথরের মত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল আলেক্সেই, তারপর খুঁড়িয়ে নার্সটির কাছে গিয়ে পিঠ থেকে ছোরাটা টেনে বের করল। ঝঞ্ঝা বাহিনীর ছোরা, প্রাচীন জার্মান তলোয়ারের ধাঁচে গড়া, মেহগনির বাঁটে ঝঞ্ঝা বাহিনীর রূপালী প্রতিচিহ্ন। মরচে-পড়া ফলকে "Alles für Deutschland" তখনো পড়া যায়। জার্মান সৈনিকের দেহ থেকে ছোরার চামড়ার খাপটা আলেক্সেই সরিয়ে নিল, যাত্রায় কাজে লাগবে ওটা। বরফের নিচে থেকে জমে-যাওয়া কঠিন বর্ষাতিটা বের করে সযত্নে নার্সকে চাপা দিল, উপরে রসাল পাইনের কয়েকটা ডাল...

তখন প্রদোষ হয়ে এসেছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা মিলিয়ে গেল। নিচু জায়গাটিতে নেমে এসেছে কনকনে ঘন অন্ধকার। জায়গাটি স্তব্ধ, শুধু পাইনের মাথায় সন্ধ্যার হাওয়ার ঝাপটা আর বনের গান। কখনো কোমল ঘুম-পাড়ানো গান, কখনো বা উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের সুর। পাতলা শুকনো বরফ আর চোখে পড়ছে না বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে ঝরছে, মুখে চিমটি কাটছে, উড়ে এসে পড়ছে নিচু জায়গাটিতে।

ভলগা স্তেপের কামিশিনে আলেক্সেই'র জন্ম, সহরবাসী ও, বন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাই বনে রাত কাটাবার কিম্বা আগুন জ্বালাবার কোন বন্দোবস্ত করেনি। সূচীভেদ্য অন্ধকারে অভিভূত আলেক্সেই, ক্লান্ত ভাঙ্গা পায়ে দুর্বিষহ যন্ত্রণা, জ্বালানী কাঠ জোগাড় করার শক্তি নেই; একটি নবীন পাইনের গভীর ঝোপঝাড়ে গুড়ি মেরে গিয়ে গুটিগুটি হয়ে গাছটার তলায় বসল সে, হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুতে মাথা রাখল, নিজের নিশ্বাসের উত্তাপে নিজেকে গরম করে চুপ করে বসে রইল, স্তব্ধতা আর বিরতি ভালো লাগছে।

পিস্তলের ঘোড়া ঠিক করে রাখল আলেক্সেই, কিন্তু বনে প্রথম রাত্রে সেটা ব্যবহার করতে পারত কি না সন্দেহ। এক ঘুমে রাত কেটে গেল, ওকে ঘনিষ্ঠভাবে ঘিরেছে গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার, সে অন্ধকার বনের নানা শব্দে চঞ্চল — পাইনের অবিরাম মর্মর, রাস্তার কাছে কোথাও পেঁচার ডাক, দূরে নেকড়ের চীৎকার — কিছুই কানে গেল না।

ভোরের প্রথম আলোয় হিম বিষণ্ণতায় গাছগুলোর ঝাপসা কালো কালো চেহারার আভাস দেখা যাচ্ছে, ধড়মড় করে জেগে উঠল আলেক্সেই, যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিয়েছে। জেগে উঠেই মনে পড়ল তার কী হয়েছিল, আর এখন কোথায় আছে, আর এত অনবধানতায় বনে রাত কাটিয়েছে ভেবে ভয় পেল। অসহ্য ঠাণ্ডা, ফার-দেওয়া বিমানি পোশাক ফুঁড়ে ঢুকছে, হাড় পর্যন্ত বিঁধছে। ঠকঠক করে কেঁপে উঠল আলেক্সেই, যেন কাঁপুনি দিয়ে পালাজ্বর এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছে পাদুটো; নড়াচড়া না করলেও আগের চেয়ে যন্ত্রণা অনেক বেড়ে গিয়েছে। দাঁড়াতে হবে ভাবলেই আতঙ্ক। তবু দৃঢ়চিত্তে উঠল আলেক্সেই, এক ঝটকায়, যেমন করে আগের দিন পা থেকে বুটদুটো খুলে নিয়েছিল। সময় নষ্ট করা চলবে না।

আর সমস্ত যন্ত্রণার সঙ্গে শুরু হল ক্ষুধার যাতনা। আগের দিন নার্সের দেহটি বর্ষাতিতে ঢাকার সময় পাশে রেড ক্রশের একটা ছোট ক্যাম্বিশের থলি আলেক্সেই দেখে। কোন ছোট জন্তুর নজরে সেটা ইতিমধ্যেই পড়াতে দাঁত দিয়ে ফুটো করেছিল সেটা, খাবারের টুকরো ইতস্তত ছড়ানো। তখন বলতে গেলে নজরই দেয়নি আলেক্সেই, কিন্তু এখন থলিটা তুলে দেখল ভিতরে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ কয়েকটা, মাংসের বড়ো টিন, একগোছা চিঠি, ছোট্ট আয়না আর আয়নাটার পিছনে একটি শীর্ণমুখ বয়স্কা স্ত্রীলোকের ছবি। থলিতে কিছু রুটিও ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু পাখিতে কিম্বা কোন জন্তুতে সেগুলো সাবাড় করেছে। টিনটা আর ব্যাণ্ডেজগুলো বিমানি পোশাকের পকেটে রাখতে রাখতে আলেক্সেই বলল, "অনেক অনেক ধন্যবাদ," হাওয়ায় মেয়েটির পায়ের উপর থেকে বর্ষাতিটা সরে গিয়েছিল, সেটা ঠিক করে দিয়ে আস্তে আস্তে চলল পূব দিকে, ডালপালার পিছনে যেখানে আকাশ ইতিমধ্যেই কমলা রঙের আগুনে উদ্ভাসিত।

হাতে এখন এক কিলোগ্রাম মাংস মজুত, আলেক্সেই ঠিক করল দিনে একবার, দুপুরবেলায় খাবে।

৫

প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণা, তাই অন্যদিকে মন ঘোরাবার জন্য আলেক্সেই রাস্তা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। হিসেব করে দেখল যে দিনে দশ থেকে বারো কিলোমিটার গেলে তিন দিনে, বড়োজোর চার দিনে গন্তব্যে পৌঁছবে।

"ঠিক আছে! দশ-বারো কিলোমিটার যাওয়ার মানেটা কী? এক কিলোমিটার মানে দুহাজার বার পা ফেলতে হবে; তাহলে দশ কিলোমিটার মানে কুড়ি হাজার পা, কিন্তু সেটা ত বেশ খানিকটা, বিশেষ করে পাঁচ-ছশ পা অন্তর আমাকে থেমে বিশ্রাম করতে হবে..."

আগের দিন হাঁটার কষ্ট লাঘব করার জন্য আলেক্সেই কয়েকটা জিনিস নির্দিষ্ট করে: পাইনগাছ একটা, গাছের গুঁড়ি, কিম্বা রাস্তায় ওই গর্তটা, আর প্রত্যেকটায় যাবার চেষ্টা করে, পৌঁছিয়ে থামতে পারে যেন। এখন সমস্ত কিছু সংখ্যা হিসেবে দেখল — ক'বার পা ফেলতে হবে তার হিসেবে। একবারে এক হাজার পা হাঁটবে ঠিক করল, তার মানে আধ কিলোমিটার, আর ঘড়ি ধরে জিরোবে, পাঁচ মিনিটের বেশী নয়। হিসেব করে দেখল কষ্ট করে সারা দিনে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দশ কিলোমিটার যেতে পারবে।

কিন্তু প্রথম এক হাজার পা কী দুঃসাধ্যই না ছিল! যন্ত্রণাটা ভুলতে পারার জন্য প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গুণে চলার চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু পাঁচশ পর্যন্ত গুণে খেই হারিয়ে গেল, তারপর শুধু দপ্‌দপে যন্ত্রণার জ্বালা, আর কিছু ভাবার নেই। তবু প্রথম এক হাজার পা সে গেল। বসবার শক্তি নেই, হুমড়ি খেয়ে সটান বরফের উপরে পড়ে গেল, দারুণ তৃষ্ণায় বরফ চাটল, কপাল আর দপ্‌দপে রগ বরফে চেপে ধরল, বরফের হিম স্পর্শে পেল অবর্ণনীয় পরিতৃপ্তি।

শিউরে উঠে আলেক্সেই ঘড়ি দেখল। সেকেণ্ডের কাঁটাটি বরাদ্দ পাঁচ মিনিটের শেষ মুহূর্তকটি টিকটিক করে কমিয়ে দিচ্ছে। চলন্ত কাঁটাটির দিকে আতঙ্কে তাকিয়ে রইল আলেক্সেই, যেন ঘুরে আসার শেষে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটবে; কিন্তু কাঁটাটা ষাটে পৌঁছল যেই, কাতরে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে, এগিয়ে চলল।

বারোটা বাজল, সূর্যের আলোর পাতলা রেখা পাইনের ঘন ডালপালা ভেদ করে পড়াতে আধো-অন্ধকার বন চিকচিক করছে, সমস্ত বন ভরে গিয়েছে আলকাতরা আর গলন্ত বরফের তীব্র গন্ধে, তখন পর্যন্ত মাত্র চার হাজার পা এগিয়েছে আলেক্সেই। শেষ এক হাজার পা চলার পর বরফের উপরে পড়ে গেল, প্রায় হাতের নাগালে একটা বড়ো বার্চগাছের গুঁড়িতে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। অনেকক্ষণ বসে রইল সে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, কিছু ভাবছে না, কিছু দেখছে না, শুনছে না, এমন কি ক্ষিধের জ্বালার সাড়াও নেই।

গভীর নিশ্বাস নিয়ে কয়েক চিমটি বরফ মুখে দিল আলেক্সেই, শরীরের ঘোর অবসাদ কাটিয়ে পকেট থেকে মাংসের টিনটা বের করে জার্মান ছোরাটা দিয়ে খুলল। এক টুকরো জমা স্বাদহীন চর্বি মুখে দিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করল, কিন্তু চর্বিটা গলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এমন দারুণ ক্ষিধেয় অভিভূত হল আলেক্সেই যে অতি কষ্টে মাংসের টিনটা সরিয়ে রাখতে পারল, বরফ খেতে লাগল ও, যা হোক কিছু একটা গিলতে হবে।

চলা শুরু করার আগে একটা জুনিপারগাছ থেকে একজোড়া হাঁটবার ছড়ি তৈরী করে নিল। সেদুটোয় ভর দিয়ে আলেক্সেই চলল বটে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়তে লাগল।

৬

...গভীর অরণ্যে ক্লিষ্ট যাত্রার তৃতীয় দিনে--তখন পর্যন্ত কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন চোখে পড়েনি — অপ্রত্যাশিত একটি জিনিস ঘটল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সেই জেগে উঠল, শীতে ও জ্বরে শরীর কাঁপছে। বিমানি পোশাকের একটা পকেটে সিগারেট ধরাবার একটা লাইটার পেল, রাইফেলের ফাঁকা টোটা দিয়ে বানিয়ে স্মারক-চিহ্ন হিসেবে ওটা আলেক্সেইকে তার মিস্ত্রী দিয়েছিল। ওটার কথা, আর আগুন জ্বালাতে যে পারে এবং জ্বালানো যে উচিত সমস্ত ভুলে গিয়েছিল ও। যে ফারগাছের নিচে ঘুমিয়েছিল সেটার কয়েকটা শুকনো নরম ডাল ভেঙ্গে পাইনের কাঁটার গোছায় ঢেকে আলেক্সেই আগুন লাগাল। ধূসর ধোঁয়া থেকে আচম্বিত উঠল চড়চড়ে হলুদ অগ্নিশিখা: শুকনো রজনাক্ত কাঠ চটপট জ্বলছে। আগুনের শিখা পাইনের কাঁটায় পৌঁছতে হাওয়া লেগে হিসহিস চড়চড় শব্দে ঝলসে উঠল সেগুলো।

হিসহিস চড়চড় করে আগুন জ্বলছে, ছড়াচ্ছে শুকনো, আরামী উত্তাপ। আরামের মৌতাতে আচ্ছন্ন হয়ে এল আলেক্সেই। বিমানি পোশাকের জিপার টেনে টিউনিকের পকেট থেকে কয়েকটা ছেঁড়াখোঁড়া চিঠি বের করল. একই হাতে সব কটি লেখা। তার একটাতে পেল সেলোফেনে মোড়া পাতলা একটি মেয়ের ছবি, পরনে ফুল-তোলা ফ্রক, পা গুটিয়ে ঘাসে বসে আছে। কিছুক্ষণ

ছবিটার দিকে তাকিয়ে তারপর সেলোফেনে আবার মুড়ে খামে পুরল আর এক মুহূর্ত ভেবে সেটাকে ধরে রেখে পকেটে রাখল।

"কিছু ভেবো না, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে আবার," নিজেকে না মেয়েটিকে বলল, সেটা বলা কঠিন। চিন্তান্বিতভাবে আবার বলল, "কিছু না..."

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে এবারে ফারবুটদুটো ঝট করে খুলে ফেলে, পশমের গলাবন্ধের ফালি সরিয়ে, পাদুটো ভালো করে দেখল সে। আরো ফুলে গিয়েছে, আঙুলগুলো ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে: রবারের ফাঁপানো থলির মত দেখাচ্ছে পাদুটোকে, আগের দিনের চেয়ে কালো তাদের রং।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, নিভে-আসা আগুনের দিকে বিদায়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আলেক্সেই আবার কোনক্রমে চলল। ছড়ির চাপে শক্ত বরফের শব্দ। ঠোঁট কামড়ে এগিয়ে চলল সে, মাঝেমাঝে প্রায় বেঘোরের মত। বনের নানা সাধারণ শব্দে সে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে বলতে গেলে প্রায় শুনতেই পেত না, সে সব শব্দ হঠাৎ ভেদ করে এল মোটর ইঞ্জিনের দূর ধকধক আওয়াজ। প্রথমে মনে হল সেটা ক্লান্তিজনিত বিকার মাত্র, কিন্তু বেড়েই চলল শব্দটা, প্রথম গিয়ারে দেওয়াতে কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে। নিশ্চয়ই ওরা জার্মান, আর ও যে দিকে যাচ্ছে সেই দিকেই ওরা অগ্রসর। পেটের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এল আলেক্সেই'র।

ভয় ওকে জোগাল শক্তি। ক্লান্তি আর পায়ের যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে একটা ফারের ঝোপের দিকে গেল সে। একেবারে ভিতরে ঢুকে ধপ করে শুয়ে পড়ল বরফের উপরে। রাস্তা থেকে ওকে দেখা কঠিন অবশ্য, কিন্তু রাস্তাটা স্পষ্টভাবে ও দেখতে পারছে দুপুরের আলোয়, মধ্যাদিনের সূর্য তখন ফারগাছের মাথার দাঁতওয়ালা বেড়ার অনেক উঁচুতে।

শব্দ আরো কাছে এল। আলেক্সেই'র মনে পড়ে গেল যে রাস্তা ছেড়ে চলে এসেছে তাতে ওর পায়ের একলা দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ে, কিন্তু এখন আরো সরে যাবার চেষ্টা করার সময় নেই, সামনের গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ খুব কাছে এসে পড়েছে। বরফে আরো ঘেঁষে শুল ও। ডালপালার মধ্যে দিয়ে দেখল একটা চেপটা, গোঁজের আকারের শাদা রঙের সাঁজোয়া গাড়ি। আলেক্সেই'র পায়ের দাগ যেখানে রাস্তা ছেড়ে এসেছে তার খুব কাছে দুলতে দুলতে শেকল ঝনঝনিয়ে গাড়িটা এল। নিশ্বাস চেপে রইল আলেক্সেই। সাঁজোয়া গাড়িটা এগিয়ে গেল। পিছনে এল একটা মোটরগাড়ি। চালকের

পাশে বসে আছে একজন, উ'চু টুপি মাথায়, বাদামী ফারের কলারে নাকের সবটা ঢাকা, আর তার পিছনে কয়েকজন সাব-মেসিনগানার, পরনে শীতকালীন সবজে ধূসর বড়ো ফৌজী কোট, মাথায় ইস্পাতের হেলমেট, উ'চু বেঞ্চিতে বসে আছে সবাই, গাড়ির গতির তালে এপাশ ওপাশ দুলছে। আরো বড়ো একটা সাঁজোয়া গাড়ি সবচেয়ে পিছনে, ইঞ্জিনটা গর্জাচ্ছে, শেকলগুলো ঝনঝন করে উঠছে। প্রায় পনেরো জন জার্মান তাতে সার বে'ধে বসে।

বরফে আরো চিপটে শুল আলেক্সেই। গাড়িগুলো এত কাছে এল যে চোঙের গ্যাসের ধোঁয়া মুখে চোখে লাগছে। আলেক্সেই'র ঘাড়ের লোম সব খাড়া হয়ে উঠল, পেশীগুলো সঙ্কুচিত হয়ে যেন আঁটোসাঁটো বলের মত হয়ে গেল। কিন্তু গাড়িগুলো সবেগে চলে গেল, গ্যাসের ধোঁয়াও গেল মিলিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিনের শব্দ প্রায় আর শোনা যায় না।

সব শব্দ মিলিয়ে গেলে আবার রাস্তায় গেল আলেক্সেই, গাড়ির চাকার দাগ স্পষ্টভাবে পড়েছে সেখানে, সেই দাগ ধরে চলল পূবমুখো। আগেকার মত মেপে জুকে এগোচ্ছে, বিশ্রাম করছে, আগেকার মতই খাচ্ছে, বরাদ্দ যাত্রার অর্ধেকটা কেটে গেল। কিন্তু এবারে চলেছে বুনো জানোয়ারের মত, অতি সন্তর্পণে। সতর্ক কানে আসছে সামান্য খসখস শব্দটুকু, এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে, যেন সে হুঁশিয়ার যে কোন বড়ো হিংস্র জন্তু কাছাকাছি কোথাও ওঁৎ পেতে বসে আছে।

আলেক্সেই বৈমানিক, আকাশ-যুদ্ধেই অভ্যস্ত, এই প্রথম অক্ষত জীবিত শত্রুকে দেখল জমির উপরে। এখন ওদের চিহ্নরেখা ধরে চলতে চলতে আক্রোশের হাসি হাসল আলেক্সেই। সময় ওদের ভালো কাটছে না, যে জায়গা ওরা দখল করেছে সেখানে কোন আরাম, আতিথেয়তা মিলছে না। এমন কি এই গভীর বনেও, যেখানে তিন দিনের মধ্যে কোন মানুষের চিহ্ন ও দেখেনি, ওদের অফিসারকে এত পাহারাদার নিয়ে যেতে হয়।

"ভেবো না কিছু, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে!" নিজেকে খোশ করার জন্য আলেক্সেই বলে এগিয়ে চলল পায়ে পায়ে, ভোলবার চেষ্টা করল যে পায়ের যন্ত্রণাটা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে, নিজের শক্তিও স্পষ্ট কমে আসছে। নবীন ফারগাছের ছাল সে চিবিয়ে চিবিয়ে গিলছে, বার্চের তেতো কুঁড়ি আর নবীন লিণ্ডেনের নরম চটচটে ছাল চিয়ুং-গামের মত মুখে রয়েছে, কিন্তু ক্ষিধে তাতে আর বশ মানছে না।

অন্ধকার যখন হয়ে এল তখন কোনক্রমে যাত্রার পাঁচটি পর্যায় কেটেছে; রাত্রে পাইনের অনেক ডাল আর শুকনো জ্বালানী কাঠ জড়ো করে একটা মাটিতে-পড়া বড়ো আধো-পচা বার্চের গুঁড়ির চারিধারে বড়ো করে আগুন জ্বালাল আলেক্সেই। লাল আভায় গুঁড়িটা পুড়ছে. উত্তাপটা বেশ আরামের. গা ছড়িয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমল সে সঞ্জীবনী উত্তাপ অনুভব করে। মাঝেমাঝে এপাশ ওপাশ ফিরে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে গুঁড়ির পাশে অলসভাবে জ্বলন্ত আগুনে জ্বালানী কাঠ দিল কয়েকবার।

মাঝরাতে তুষার-ঝড় শুরু হল। মাথার উপরে পাইনগুলো দুলে দুলে উঠে সরসর আর কিচকিচ নানা আওয়াজে উৎকণ্ঠায় গোঙাতে লাগল। ক্ষুরধার বরফের কুচি সব মাটি ঘেঁষে ছুটে চলেছে। চড়চড়ে চকচকে আগুনের চারিধারে ঘুরছে শব্দমুখর অন্ধকার। তুষার-ঝড়ে কিন্তু আলেক্সেই'র বিশ্রাম ব্যাহত হল না, আগুনের উত্তাপে গভীর নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন।

বনের পশুরাও কাছে এল না আগুনের ভয়ে। আর জার্মানরা — এরকম রাত্রে ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। তুষার-ঝড়ে বনের গভীরে আসার সাহস ওদের নেই। যাই হোক না কেন, ধুমন্ত উত্তাপে ক্লান্ত শরীর আরামে এলিয়ে দিলেও আলেক্সেই'র কানে সবকিছু শব্দ আসছে, সে কান বনের জীবজন্তুর সতর্কতা এরিমধ্যে আয়ত্ত করেছে। ভোরের ঠিক আগে তুষার-ঝড়ের প্রকোপ তখন কমে গিয়েছে, ঘন শাদা কুয়াশা নিস্তব্ধ বনে নামল, আলেক্সেই'র মনে হল যে দোদুল্যমান পাইনের সরসর আওয়াজ আর পড়ন্ত বরফের নরম ঝুরঝুর শব্দ ভেদ করে সে শুনতে পারছে যুদ্ধের দূরাগত নানা শব্দ, বিস্ফোরণের আওয়াজ, মেসিনগানের দমক আর রাইফেলের ডাক।

"যুদ্ধের লাইন এত কাছে হতে পারে? এত শীগগির?"

৭

কিন্তু সকালে কুয়াশা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল; রাত্রে বনে এসেছিল রূপালী রঙ, এখন সূর্যের আলোয় বনটি বরফে চিকচিক করে উঠছে, আর যেন এই হঠাৎ রূপান্তরে খুসি হয়ে পাখিরা কিচকিচ কিচির মিচির শুরু করল, গান গেয়ে উঠল আসন্ন বসন্তের আগমনীতে। একাগ্রে কান পেতেও

যুদ্ধের কোন আওয়াজ আলেক্সেই আর শুনতে পেল না, না রাইফেলের ডাক না কামানের গুরু গুরু গর্জন।

আলোয় বরফের কণা স্ফটিকের মত উজ্জ্বল, গাছ থেকে শাদা ধোঁয়াটে স্রোতে গড়িয়ে পড়ছে। এখানে সেখানে ভারী ফোঁটা বরফে পড়ছে পাতলা টপটপ শব্দে। বসন্ত! এই প্রথম এত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বসন্ত তার আগমন বার্তা ঘোষণা করল।

টিনের মাংসের সামান্য বাকিটুকু সকালে খাবে ঠিক করল আলেক্সেই — সুস্বাদু চর্বিতে ঢাকা মাংসের ফেঁসো মাত্র — না খেলে ওঠবার শক্তি হবে না বলে ওর মনে হল। তর্জনী দিয়ে সারা টিনটা চেঁচে পুঁছে সাফ করল, টিনটার এবড়োখেবড়ো ধারে লেগে হাতটা কয়েক জায়গায় কেটে গেল বটে, কিন্তু ওর মনে হল এখনো চর্বির কিছু টুকরো বাকি আছে। বরফে টিনটা ভরে, নিভন্ত আগুন থেকে পাঁশুটে ছাই চেঁচে সরিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে ওটাকে বসাল সে। পরে পরম তৃপ্তিতে গরম জলটা খেল, তাতে মাংসের অল্প আস্বাদ। তারপরে পকেটে রাখল টিনটা, চা বানাতে কাজ দেবে। গরম চা! আবিষ্কারটা প্রীতিকর, ওটার কথা ভেবে আবার যাত্রা শুরু করার সময় মেজাজটা একটু ভালো হল।

কিন্তু পথে নেমেই বিরাট হতাশার মুখোমুখি হল আলেক্সেই। তুষার-ঝড়ে রাস্তাটা একেবারে মুছে গিয়েছে, ঢালু ধারালো মাথার মত দেখতে বরফের স্তূপে পথ বন্ধ। একঘেয়ে নীলচে তীব্র আলোয় চোখে ধাঁধা লাগে। নরম বরফে পা বসে যাচ্ছে, বহু কষ্টে টেনে তুলতে পারছে আলেক্সেই। ছড়িদুটোয় বলতে গেলে কোন কাজই দিচ্ছে না, বরফে অনেকখানি ডুবে যাচ্ছে।

দুপুর হল, গাছের নিচের ছায়া কালো হয়ে এল, গাছের উপর থেকে সূর্যের আলো পড়েছে বনের মধ্যে, ততক্ষণে মাত্র পনেরো শ পা এগিয়েছে আলেক্সেই, এত ক্লান্ত যে প্রত্যেকটি পা ফেলার জন্য সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করতে হচ্ছে। মাথা ঘুরছে। পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে। প্রায়ই পড়ে যাচ্ছে সে, কোন বরফের স্তূপের উপরে এক মুহূর্ত নিশ্চল শুয়ে থেকে খরখরে বরফে মাথা গুঁজে, আবার উঠে কয়েক পা যাচ্ছে। অদম্য আগ্রহ হচ্ছে ঘুমোবার, শুয়ে পড়ার, সবকিছু ভুলে যাবার, একেবারে নড়াচড়া না করার। যা ঘটবার ঘটুক! থেমে গেল আলেক্সেই, দাঁড়িয়ে রইল অসাড় হয়ে, এপাশ ওপাশ দুলছে, তারপরই এত জোরে ঠোঁট কামড়াল যে ব্যথা

হল, আবার নিজেকে সামলে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল, কোনক্রমে পাদুটো ঘষড়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত তার মনে হল আর হাঁটতে পারবে না, কোন কিছুতে তাকে একচুল নড়াতে পারবে না এখান থেকে, একবার যদি বসে পড়ে তাহলে উঠতে পারবে না আর। চারিদিকে ব্যগ্রভাবে তাকাল আলেক্সেই। রাস্তার ধারে একটা নবীন বাঁকা পাইনগাছ। শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে একটু এগিয়ে গাছের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলেক্সেই। ডালের সন্ধিস্থানে চিবুকের ভর রাখল। তাতে ভাঙ্গা পায়ের ভার কিছুটা কমে যাওয়াতে একটু আরাম লাগল। টান-টান ডালে ভর দিয়ে বিশ্রাম করতে বেশ লাগছে। আরো যাতে আরাম পায় তার জন্য প্রথমে এক পা টেনে নিল, তারপরে অন্য পাটা, ডালের সন্ধিস্থানে তখনো চিবুক লাগানো, শরীরের ভারমুক্ত পাদুটো সহজেই বরফের স্তূপ থেকে উঠে এল। আলেক্সেই'র মাথায় হঠাৎ চমৎকার একটি ফন্দি জাগল।

"সত্যি ত! গাছটাকে সহজেই কেটে, সব ছেঁটে ডালের শুধু ফেঁকড়াটা রেখে তাতে চিবুক দিয়ে শরীরের ভার রেখে পা ফেলা যাবে, ঠিক এখন যা করছি। তাহলে সহজে হাঁটা যাবে। তাড়াতাড়ি যেতে পারব না বটে, কিন্তু এত ক্লান্ত লাগবে না, আর বরফের স্তূপ কখন বসে যাবে আর শক্ত হবে তার অপেক্ষা না করেই এগিয়ে যেতে পারব।"

হাঁটু গেড়ে বসে সে ছোরা দিয়ে নবীন গাছটাকে কাটল, ডালপালা ছিঁড়ে ফেলে পকেটের রুমাল আর ব্যান্ডেজ দিয়ে ঠেকনোটাকে জড়িয়ে তক্ষুণি রওনা দিল। ঠেকনোটাকে এগিয়ে দিয়ে ডালের ফেঁকড়ায় চিবুক আর হাতদুটোর ভর দিয়ে এক পা ফেলছে, তারপর অন্যটা, আবার ঠেকনোটা এগিয়ে দিচ্ছে, দু পা এগোচ্ছে। এইভাবে চলল সে, পা গুণে গুণে, যাবার গতির নতুন একটা মাত্রা ঠিক করে।

গভীর বনে একজন এরকম অদ্ভুতভাবে চলেছে, ঘন বরফ স্তূপের উপরে মন্থর গতিতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হেঁটে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এগোল, কেউ দেখলে নিশ্চয় অবাক হত। কিন্তু এই বিচিত্র যাত্রা শুধু দেখল হাঁড়িচাঁচাগুলো; আর এই অদ্ভুত, তিনঠেঙ্গো বেঢপ জীবটি যে তাদের কোন ক্ষতি করবে না সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তারা ও কাছে এলে উড়ে গেল না মোটেই, শুধু লাফিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পথ ছেড়ে

দিল, মাথা হেলিয়ে কালো কৌতূহলী গুটি গুটি চোখ মেলে ঠাট্টার ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

৮

দুদিন ধরে বরফ-ঢাকা রাস্তায় এইভাবে নেংচিয়ে চলল আলেক্সেই, ঠেকনোটা এগিয়ে দিয়ে, তাতে ভর করে, পাদুটো টেনে নিয়ে। এতক্ষণে পাতাদুটো একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছে, কোন বোধ নেই, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে শরীরটা যন্ত্রণায় শিঁটিয়ে উঠছে। ক্ষিধের জ্বালা আর নেই। পেটের খিঁচুনি আর তীক্ষ্ন যন্ত্রণা একটানা ভারী একটা ব্যথার অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে, যেন খালি পেটটা থার্মাচি দিয়ে দুপাশে চাপ দিচ্ছে।

আলেক্সেই'র আহার্য শুধু বিশ্রামের সময়ে ছোরা দিয়ে গাছ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া কচি পাইনের ছাল, বার্চ আর লাইমের কুঁড়ি, আর নরম সবুজ শ্যাওলা, বরফের নিচ থেকে খুঁড়ে বের করে গরম জলে ফুটিয়ে সেটা সে খায় রাত্রে। মাঝেমাঝে বরফ যেখানে গলে গিয়েছে সেখান থেকে বিলবেরির চকচকে পাতা জড়ো করে তা থেকে "চা" বানিয়ে খাওয়াটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার ওর কাছে। উষ্ণ পানীয়তে সমস্ত শরীর গরম হয়ে যায়, এমন কি চরম পরিতৃপ্তির মত একটা অনুভূতি হয়। উষ্ণ পানীয়তে পাতা আর ধোঁয়ার গন্ধ, আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে আরাম লাগে ওর, যাত্রাটা আর এত দীর্ঘ ও ভয়াবহ মনে হয় না।

যাত্রার ষষ্ঠ রাত্রিতে বিশ্রামের সময় আলেক্সেই আবার একটি বড়ো ফারগাছের সবুজ তাঁবুর নিচে শুল, একটা বুড়ো রজনাক্ত গাছের গুঁড়ি ঘিরে আগুন জ্বালাল, ওর হিসেবে ওটা সারা রাত জ্বলবে আর তাপ দেবে। তখনো অন্ধকার হয়নি। উপরে গাছের মাথায় অদৃশ্য একটি কাঠবিড়ালী খুব ব্যস্ত, ফারের মোচা কুড়ে কুড়ে খোসাগুলো মাটিতে ফেলছে। আলেক্সেই'র মাথায় তখন খালি খাবারের চিন্তা, ভাবল ফারের মোচায় কাঠবিড়ালীটা কী পাচ্ছে। একটা দানা তুলে আঁশ ছাড়িয়ে দেখল যোয়ারের দানার মত ছোট একটা বীজ। দেখতে দেবদাবুর ছোট্ট বাদামের মত। বীজটা মুখে দিয়ে দাঁত দিয়ে ভাঙ্গল, তাতে দেবদারু তেলের সুগন্ধ।

এদিক এদিকে ছড়ানো কয়েকটা ফার ফল তুলে আলেক্সেই আগুনের কাছে সেগুলোকে রাখল, একমুঠো জ্বালানী কাঠ দেওয়াতে উত্তাপে

মোচাগুলোর মুখ ফাঁক হয়ে গেল, সেগুলোকে ঝেড়ে বীজগুলো হাতে ঘসে খোসাগুলো ফু' দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বাদামগুলো মুখে দিল।

বনের চাপা গুনগুনানি। রজনাক্ত গাছের গুঁড়িটা আস্তে আস্তে জ্বলছে, তার নরম সুগন্ধি ধোঁয়া আলেক্সেইকে ধূপের কথা মনে করিয়ে দিল। ক্ষীণ শিখাগুলো কাঁপছে, দপ করে জ্বলে উঠে ঢিমিয়ে যাচ্ছে, তাতে আলোর বৃত্তে সোনালী পাইন আর রূপালী বার্চগুলোর গুঁড়ি স্পষ্ট হয়ে উঠে আবার গুঞ্জরিত অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আগুনে আরো কিছু জ্বালানী কাঠ ফেলে, আরো কয়েকটা ফার-ফল আলেক্সেই ভাঙ্গল। দেবদারু তেলের গন্ধে শৈশবের বহুদিন-বিস্মৃত একটি দৃশ্য মনে পড়ল... ছোট একটা ঘর, পরিচিত জিনিসে ঠাসা। ছাত থেকে ঝুলছে আলো, তার নিচে টেবিল। উৎসবের পোশাক পরনে ওর মা সন্ধ্যার প্রার্থনা থেকে সবেমাত্র ফিরে সিন্দুক থেকে গম্ভীরভাবে কাগজের থলে বের করে দেবদারুর বাদাম বাটিতে ঢালছেন। টেবিল ঘিরে বসেছে বাড়ির সবাই — মা, ঠাকুমা, ওর দুজন ভাই, ও নিজে, সবচেয়ে ছোট ও — খুব আড়ম্বরে শুরু হচ্ছে দেবদারুর বাদাম ভাঙ্গা — উৎসবের অঙ্গ সেটা। কথা বলছে না কেউ। ঠাকুমা চুলের কাঁটা দিয়ে শাঁস দেখছেন, মাও তাই করছেন একটা কাঁটা দিয়ে। দাঁত দিয়ে সুকৌশলে মা খোলাগুলো ভেঙ্গে শাঁস বের করে টেবিলে জড়ো করছেন; যখন বেশ একটা স্তূপ হল তখন এক নিমেষে হাতের মুঠোয় সেটাকে নিয়ে সবটা একটি ছেলের খোলা মুখে দিয়ে দিলেন, কপাল ভালো সে ছেলেটির, মা'র হাতের ছোঁয়াচ ঠোঁটে লাগল; হাতটা কর্কশ, পরিশ্রমে জীর্ণ, কিন্তু উৎসবের দিন বলে সুগন্ধী সাবানের সুরভি তাতে।

কামিশিন!.. ছেলেবেলা! সহরের উপকণ্ঠে ছোট্ট বাড়িটাতে দিন কাটত আরামে!

কিন্তু এখানে, বনের গুনগুনানির মধ্যে মুখ জ্বলছে, পিঠে লাগছে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা। অন্ধকারে পেঁচার ডাক; শেয়ালের আওয়াজ কানে এল। আগুনের কাছে জড়োসড়ো হয়ে বসে, নিভন্ত কম্পমান শিখার দিকে চিন্তান্বিতভাবে তাকিয়ে আছে ক্ষুধার্ত, আহত, চরম ক্লান্ত একটি মানুষ, গভীর বিরাট এই বনে একাকী, সামনে অন্ধকারে পড়ে আছে অপ্রত্যাশিত বিপদ বিঘ্নসংকুল অজানা পথ।

"ভেবো না কিছু, সব ঠিক হয়ে যাবে!" হঠাৎ বলল মানুষটি, আর

আগুনের শেষ, লাল কম্পমান শিখার আলোয় ওর ফাটা ঠোঁট কী একটা সুদূর ভাবনার হাসিতে ফাঁক হয়ে গেল।

৯

তুষার-ঝড়ের রাত্রে কোন খান থেকে দূরের যুদ্ধের আওয়াজ এসেছিল, সপ্তম দিনে আলেক্সেই সেটা বুঝতে পারল।

শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, প্রতি মুহূর্তে বিশ্রামের জন্য থেমে আলেক্সেই বনের রাস্তা ধরে কায়ক্লেশে চলেছে, বরফ গলতে শুরু করেছে রাস্তায়। বসন্তের দূরের হাতছানি আর নয়, আদিম অরণ্যে বসন্ত এখন অভ্যাগত। উষ্ণ দমকা হাওয়া বইছে, সূর্যের উজ্জ্বল আলো ডালপালা ভেদ করে ছোট পাহাড় আর ঢিপি থেকে বরফ ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিচ্ছে, সন্ধ্যাবেলায় বড়ো বড়ো কাকের বিষণ্ণ ডাক, রাস্তার বুক এখন বাদামী, তার উপরে মন্থর ধীর দাঁড়কাকেরা বসে, মৌমাছির চাকের মত সচ্ছিদ্র ভিজে বরফ এখন, গলন্ত বরফের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট চিকচিকে ডোবা, আর সেই বলিষ্ঠ মাদক গন্ধ, যে গন্ধ সমস্ত জীবকে আনন্দে অধীর করে দেয়।

বছরের এই সময়টা আশৈশব আলেক্সেই'র প্রিয়, আর এখনো ভিজে থলথলে ফারবুট-পরা ক্লিষ্ট পায়ে জল ঠেলে যেতে যেতে যদিও ক্ষিধেয় আর যন্ত্রণায় আর ক্লান্তিতে চেতনা লোপ পাচ্ছে, জলের ডোবা, তলতলে বরফ আর কাদাকে শাপান্ত করছে, তবুও এই সোঁদা, মাতাল-করা সুগন্ধি হাওয়া প্রাণ ভরে ঘ্রাণ করছে ও। জলের ডোবায় পথ বেছে আর চলছে না আলেক্সেই, হোঁচট খেয়ে পড়ছে, উঠে ঠেকনোতে জোরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে আর শক্তি সঞ্চয় করে ঠেকনোটা আবার যতখানি পারে এগিয়ে দিয়ে পুবমুখো চলেছে মন্থরভাবে।

বনের রাস্তাটা একটা জায়গায় হঠাৎ বামে ঘুরেছে, সেখানে গিয়ে আচম্বিতে আলেক্সেই থেমে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। একটু এগিয়ে পথটা ভয়ানক অপরিসর, দুধার থেকে পাইনের ঘন নবীন ঝাড় যেন চেপে ধরেছে, সেখানে ও দেখল জার্মান গাড়িগুলো, যেগুলো কিছুদিন আগে ওকে পেরিয়ে চলে এসেছিল। ওদের রাস্তা আটকেছে দুটো প্রকাণ্ড পাইন। গাছদুটোর সামনে দাঁড়িয়ে গোঁজের মত চেহারার সাঁজোয়া গাড়িটা, রেডিয়েটরটা দুটো গাছের মধ্যে আটকানো, রংটা আর যেমন-তেমন গোছের শাদা দাগওয়ালা নয়, মরচে লাল; টায়ার-বিহীন চাকার উপরে নিচু হয়ে



গাড়িটা দাঁড়িয়ে, টায়ারগুলো পুড়ে গিয়েছে। বরফের উপরে গাছের নিচে গাড়ির বুরুজটা পড়ে আছে অতিকায় ব্যাঙের ছাতার মত। কাছে তিনটি লাশ -- গাড়ির চালকরা – খাটো কালো তৈলাক্ত টিউনিক পরনে, মাথায় কাপড়ের হেলমেট।

মোটর গাড়িদুটো, তাদের রংও মরচে লাল আর পোড়াটে, সাঁজোয়া গাড়ির পিছনে গলন্ত বরফের উপরে দাঁড়িয়ে: ধোঁয়ায়, ছাই'এ আর পোড়া কাঠে বরফ কালো হয়ে গিয়েছে। চারিধারে, রাস্তার পাশে, ঝোপঝাড়ের নিচে, গর্তে গর্তে জার্মান সৈনিকদের মৃতদেহ। বোঝা গেল দারুণ আতঙ্কে ছুটোছুটি করেছিল ওরা, প্রত্যেকটি গাছ, প্রত্যেকটি ঝোপ তখন তুষার-ঝড়ের বরফে আচ্ছাদিত, তার পিছন থেকে মৃত্যু হানা দিয়েছে, কী ঘটছে ঠিক বোঝার আগেই ওরা নিহত হয়েছে। অফিসারটির পাৎলুনবিহীন দেহ গাছের সঙ্গে বাঁধা। ওর কালো কলারওয়ালা সবুজ টিউনিকে এক টুকরো কাগজ পিন দিয়ে লাগানো, তাতে লেখা: "যা চেয়েছিলে তাই মিলেছে", আর তার নিচে অন্য হাতে পাকা পেন্সিলে লেখা -- "কুত্তা"।

কিছু খাবার মেলে কিনা এই যুদ্ধভূমিতে আলেক্সেই তার খোঁজ করল। পেল শুধু এক টুকরো ছাতা-পড়া বাসি রুটি, বরফে পায়ের চাপে পেষা, পাখিতে ঠুকরে খেয়েছে। তৎক্ষণাৎ মুখে দিল সেটা আলেক্সেই, আর দারুণ লোভে গমের রুটির টকটক গন্ধ শুঁকল। ইচ্ছে করছিল সবটা মুখে পুরে সুগন্ধি তলতলে রুটিটা চিবিয়েই চলে, কিন্তু ইচ্ছেটা দাবিয়ে রুটিটাকে তিন টুকরো করল, নিচের পকেটে দু টুকরো গুঁজে রেখে তৃতীয়টি গুঁড়ো করে প্রতিটি গুঁড়ো চুষতে শুরু করল, যেন মিঠাই একটা, চুষে যতক্ষণ আনন্দ পাওয়া যায় তাই ভালো।

আর একবার যুদ্ধদৃশ্যটি দেখল আলেক্সেই, আর হঠাৎ মনে হল: "কাছাকাছি নিশ্চয়ই পার্টিজানেরা আছে! ওদের পায়ের চাপেই ঝোপঝাড়ে আর গাছের চারিদিকে বরফ তলতলে হয়ে গিয়েছে! হয়ত ইতিমধ্যেই ওকে মৃতদেহের মধ্যে ঘুরতে দেখেছে ওরা, আর ফারগাছের মাথায় বসে কিম্বা কোন ঝোপের পিছন থেকে কোন পার্টিজান চর হয়ত ওকে লক্ষ্য করছে?" মুখের কাছে দুটো হাত জোড় করে প্রাণপণে চেঁচাল আলেক্সেই, 'হো, পার্টিজান, পার্টিজান!'

নিজের ক্ষীণ আর দুর্বল কণ্ঠস্বরে আলেক্সেই বিস্মিত হল। বনের

গভীর থেকে প্রতিধ্বনি এল, গাছের গুঁড়িতে লেগে আবার প্রতিধ্বনি উঠল, এমন কি সেটাও তার কণ্ঠস্বরের চেয়ে জোরালো।

'পার্টিজান, হো, পার্টিজান!' শত্রুদের মূক মৃতদেহের মধ্যে কালো চটচটে বরফে বসে বারবার চেঁচাল সে।

কান পেতে রইল উত্তরের প্রত্যাশায়। ওর গলা কর্কশ, ভেঙ্গে গিয়েছে, ও বুঝতে পারল যে নিজেদের কাজ সেরে, যা নেবার তা নিয়ে পার্টিজানেরা অনেক দিন চলে গিয়েছে — সত্যি ত এই পরিত্যক্ত শূন্য জায়গায় থেকে যাবার কোন অর্থ নেই — কিন্তু ডেকেই চলল আলেক্সেই, অলৌকিক কিছু ঘটবে সেই প্রত্যাশায়, ওর আশা এই যে, দাড়িওয়ালা যে লোকদের এত গল্প সে শুনেছে তারা হঠাৎ ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসে ওকে তুলে এমন কোথাও নিয়ে যাবে যেখানে সারাদিন না হোক অন্তত একঘণ্টা কিছু না ভেবে, কোথাও যাবার চেষ্টা না করে জিরোতে পারবে ও।

বন থেকে কেঁপে কেঁপে ফিরে এল প্রতিধ্বনি। কিন্তু হঠাৎ পাইনের গভীর সুরেলা গুনগুন ছাপিয়ে ও শুনল, অন্তত মনে হল যে শুনেছে — এমন একাগ্রভাবে কান পেতে ছিল ও — ভারী দ্রুত ধপ ধপ শব্দ, কখনো বেশ স্পষ্ট, কখনো বা ক্ষীণ, তালগোল পাকানো। চমকে উঠল আলেক্সেই, যেন দূর থেকে কোন বন্ধুর ডাক এই শূন্যতায় তার কাছে পেঁৗছিয়েছে। নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, গলা বাড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ একাগ্রভাবে শুনল।

না, ভুল হয়নি ওর। পূব থেকে বওয়া আর্দ্র হাওয়া তার কাছে আনল কামানের দূর গর্জন; আর শব্দটা অন্যরকম, দুটো বিপক্ষ দল ট্রেঞ্চ বানিয়ে আত্মরক্ষার দৃঢ় ব্যূহ রচনা করে পরস্পরকে উত্ত্যক্ত করার জন্য একটানা গুলির বিনিময় করছে, গত কয়েক মাস ধরে শোনা সে রকম শব্দের মত ঢিমে আর খাপছাড়া নয়। শব্দটা দ্রুত আর সুতীব্র, মনে হচ্ছে কে যেন ভারী পাথর গড়িয়ে ফেলছে, কিম্বা উল্টোনো ওকের পিপের তলায় ঘুষি মারছে।

সত্যিই ত! ঘোর কামান যুদ্ধ চলেছে। শব্দের ধরনে মনে হয় যুদ্ধের সীমান্ত দশ কিলোমিটারের মধ্যেই হবে, গুরুতর কিছু একটা ঘটছে ওখানে, কারা আক্রমণ চালিয়েছে আর কারা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করছে। আনন্দে আলেক্সেই'র গাল বেয়ে নামল চোখের জল।

পূব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল আলেক্সেই। এটা সত্যি যে ও যেখানে এখন দাঁড়িয়ে সেখানে পথটা হঠাৎ ঘুরে উল্টো দিকে গিয়েছে, সামনে

বরফের আস্তরণ; কিন্তু পূব দিক থেকেই শব্দের আমন্ত্রণ আসছে; ওই দিকেই গিয়েছে পার্টিজানদের পায়ের কালো কালো দাগ: ওখানেই কোথাও থাকে বনের বীরেরা।

আর আলেক্সেই বিড়বিড় করে বলল, "ভেবো না কিছু, সব ঠিক, দোস্ত, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" সজোরে ঠেকনোটা ফেলে চিবুক রেখে শরীরের সমস্ত ভার তাতে দিয়ে, বরফের উপরে একটা পা রাখল, তারপর আর একটা, আর রাস্তা ছেড়ে বেশ কষ্টে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলল।

১০

সে দিন বরফের উপরে এমন কি দেড় শ পাও এগোতে পারল না আলেক্সেই। অন্ধকার হওয়াতে থেমে যেতে হল। আবার পুরোনো একটা গাছের গুঁড়ি বেছে, চারদিকে জ্বালানী কাঠ বসিয়ে, টোটায় তৈরী সিগারেট লাইটারটা বের করে ছোট ইস্পাতের চাকাটা ঘোরাল, আর একবার ঘোরাল — তারপর হাত পা ঠান্ডা হয়ে এল; তেল নেই লাইটারে। ওটাকে ঝাঁকিয়ে ভিতরে ফুঁ দিল যাতে বাকি গ্যাসটুকু জ্বলে ওঠে, কিন্তু কিছু হল না। রাত্রি এল। বিদ্যুতের ক্ষণচ্ছটার মত চকমকির পাথর থেকে ছিটকে বেরিয়ে-আসা ফুলকিতে নিমেষের জন্য মুখের কাছের অন্ধকার হটে গেল। বারবার চাকাটায় ঝটকা দিচ্ছে আলেক্সেই, অবশেষে চকমকির পাথরটা একেবারে ক্ষয়ে গেল, আগুন জ্বালানো গেল না।

হাতড়ে কচি পাইনগাছের একটা ঝাড়ে গেল ও, সেখানে গুটিগুটি হয়ে বসে, হাঁটুতে চিবুক রেখে হাঁটুদুটো জড়িয়ে চুপচাপ বসে রইল, বনের শনশন শব্দ কানে আসছে। সে রাত্রে হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারত আলেক্সেই, কিন্তু ঘুমন্ত বনে কামানের ডাক আরো স্পষ্টভাবে কানে এল, আর ওর মনে হল যে গোলা ফাটার গুমগুম আওয়াজের মধ্যে রাইফেলের খরখর শব্দ আলাদা করে শোনা যাচ্ছে।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল উৎকণ্ঠা আর বিষাদের একটা অজানিত অনুভূতিতে। তক্ষুণি সে জিজ্ঞেস করল নিজেকে, "কারণটা কী? কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছি?" মনে পড়ল — সিগারেট লাইটারটা। কিন্তু সূর্যের দয়ালু তাপে গরম লাগছে, চারিদিকে সমস্ত কিছু — গলা বরফ, গাছের গুঁড়ি, এমন কি পাইনের কাঁটাগুলো পর্যন্ত — উজ্জ্বল, চিকচিকে, সবকিছু

মিলে দুর্ভাগ্যের গুরুত্বটা কমিয়ে দিল। কিন্তু আরো খারাপ একটা জিনিস ঘটল। অসাড় হাত হাঁটু থেকে খুলে দেখল উঠতে পারছে না। কয়েকবার ওঠার চেষ্টা করাতে ঠেকনোটা ভেঙ্গে গেল, আর ও মাটিতে পড়ে গেল গড়িয়ে বোরার মত। গড়িয়ে চিৎ হয়ে শুল, যাতে ফুলে-ওঠা শরীরটা জিরোতে পারে। পাইনের ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে অসীম নীল আকাশ, সোনালী আর বাঁকা পাড় শাদা পালকের মত মেঘ তড়তড় করে চলেছে, তাকিয়ে রইল সে দিকে। ওর শরীর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে এল, কিন্তু পাদুটোয় কিছু একটা ঘটেছে। সে দুটোতে এক মুহূর্তও ভর দিতে পারছে না। পাইনগাছ ধরে আর একবার ওঠবার চেষ্টা করল আলেক্সেই, এবারে সফল হল, কিন্তু গাছের কাছে পাদুটো আনার চেষ্টা করাতেই দুর্বলতায় আর পায়ের পাতায় নতুন শিরশিরে অসম্ভব একটা ব্যথার জন্য পড়ে গেল।

শেষ তা হলে? এখানেই মরতে হবে, পাইনগাছের নিচে, হয়ত কেউ দেখতে পাবে না ওকে, হাড়গুলো মাটি চাপা দেবে না, বনের জন্তু সব সেগুলো চেঁচে পুঁছে ঝকঝকে করবে? নিদারুণ দুর্বলতা মাটিতে চিপটে রেখেছে ওকে। কিন্তু দূরে তখনো কামানের গুমগুম আওয়াজ। যুদ্ধ চলেছে ওখানে, আপন জন সবাই ওখানে। শেষের আট-দশ কিলোমিটার যাবার শক্তিটুকু কি সঞ্চয় করতে পারবে না?

কামানের গর্জন নতুন সাহস যোগাল আলেক্সেইকে, ওকে ডাকছে সে আওয়াজ, সে ডাকে সাড়া দিল ও। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে জন্তুর মত চলল, প্রথমে কিছু না ভেবে, দূর যুদ্ধের আওয়াজে মন্ত্রমুগ্ধের মত, কিন্তু পরে সচেতনভাবে, মন ঠিক করে, কেননা ও বুঝতে পারল যে ঠেকনো না থাকলে এই ভাবেই বন ধরে যাওয়া আরো সহজ। পায়ে কোন চাপ না পড়াতে ব্যথাটা কম, হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারল আলেক্সেই। আবার তীব্র আনন্দে তার কণ্ঠরোধ হয়ে এল। এরকম অবিশ্বাস্য অদ্ভুতভাবে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় আস্থা হারিয়ে কেউ হতাশ হয়ে পড়েছে, তাকে উৎসাহ দিচ্ছে যেন এমনভাবে উচ্চকণ্ঠে ও বলল:

"ভেবো না কিছু, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে!"

যাত্রার এক কদমের শেষে আলেক্সেই ঠান্ডায় জমে-যাওয়া হাতদুটো বগলের নিচে রেখে গরম করল, তারপর একটা নবীন ফারগাছে গেল গুড়ি মেরে, চৌকো করে দু টুকরো ছাল কাটতে গিয়ে নখ ভেঙে গেল, তারপর বার্চের গুঁড়ি থেকে ছালের কয়েকটা লম্বা ফালি ছিঁড়ে নিল। ফারবুট থেকে

পশমের গলাবন্ধের ফালিগুলো খুলে দুহাতে জড়াল; আঙুলের গাঁটে ছালের টুকরোগুলো রেখে বার্চের ছালের ফালি দিয়ে আটকিয়ে সমস্তটা একটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে ফেলল। ডান হাতে এভাবে হল বড়ো আর বেশ সুবিধাজনক একটা দস্তানা। কিন্তু দাঁত দিয়ে বাঁধতে হয়েছিল বলে বাঁ হাতের জন্য এরকম সুবিধে করে উঠতে পারল না; যাই হোক, হাত জোড়ায় "জুতো" পরানো হয়েছে ত, আলেক্সেই এগিয়ে চলল, আগের চেয়ে সহজ মনে হল চলনটা। পরে যেখানে থামল সেখানে হাঁটুতেও পাইনের ছাল লাগিয়ে নিল।

দুপুর হল, বেশ গরম হয়ে এসেছে, ততক্ষণে আলেক্সেই হাতে ভর দিয়ে বেশ কয়েক "পা" এগিয়েছে। যেখান থেকে কামানের আওয়াজ আসছে তার কাছাকাছি এসে পড়েছে বলেই হোক, কিম্বা কোন শব্দবিভ্রমের জন্যই হোক, আওয়াজগুলো প্রখর লাগছে। এত গরম লাগছে যে আলেক্সেই বিমানি পোশাকের জিপার খুলে ফেলল।

শ্যাওলায়-ভরা তলতলে এক টুকরো জলা, সেখানে গলন্ত বরফ থেকে উঁকি মারছে সবুজ পাতা, জলাটায় হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে আলেক্সেই, হঠাৎ ওর প্রতি অদৃষ্ট সদয় হল: পাঁশুটে নরম স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলায় ও দেখল একটা গাছের সূক্ষ্ম ডাঁটা, পাতাগুলো বিরল সূচীমুখ চকচকে, তার মধ্যে ঢিবির ঠিক উপরে পড়ে আছে টকটকে লাল, অল্প থেঁতলানো, কিন্তু রসে টইটুম্বুর ক্র্যানবেরি। উষ্ণ, মখমলের মত শ্যাওলা, জলার স্যাঁতসেঁতে গন্ধ তাতে, মাথা নিচু করে আলেক্সেই ঠোঁট দিয়ে একটার পর একটা বেরি ছিঁড়ে নিতে লাগল।

গত কয়েক দিনের মধ্যে এই প্রথম সত্যিকার খাবার পেল আলেক্সেই, কিন্তু খাসা টকটক-মিষ্টি ক্র্যানবেরিগুলোর সুস্বাদে ওর পেট মোচড় দিয়ে উঠল। সেটা কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার মানসিক শক্তি ছিল না ওর, এক গোছা থেকে অন্য গোছায় গেল শরীর মুচড়িয়ে, আর ভালুকের মত জিভ আর ঠোঁট দিয়ে টকটক-মিষ্টি বেরিগুলো ছিঁড়ে নিতে লাগল। এইভাবে কয়েক গোছা সাবাড় করল, থলথলে বুটে বসন্তের জল ঢুকছে, ব্যথায় পা জ্বলছে, আর ক্লান্তি, কিছুরই হুঁশ নেই ওর, শুধু মুখে মিষ্টি ঝাঁঝালো স্বাদ, আর পেটে প্রীতিকর ভারী একটা অনুভূতি।

বমি করল আলেক্সেই, কিন্তু তবুও লোভ চাপতে না পেরে আবার বেরিগুলো ছিঁড়ে যেতে লাগল। নিজের তৈরী "জুতো" হাত থেকে খুলে মাংসের পুরোনো টিনটা বেরিতে ভরে নিল; হেলমেটটাও ভরে নিল, বেল্টে

সেটা ফিতে দিয়ে বেঁধে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল, সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করা অবসাদ অতিকষ্টে চেপে।

সেই রাত্রে পুরোনো একটা ফারগাছের নিচে আশ্রয় নিয়ে বেরিগুলো খেল আলেক্সেই, আর গাছের ছাল আর ফার ফলের বীচি চিবোল। তারপর পাশ ফিরে শুল। ঘুমটা কিন্তু হল উৎকণ্ঠিত পাহারাদারের মত। কয়েকবার মনে হল অন্ধকারে কে যেন গুড়ি মেরে নিঃশব্দে ওর দিকে আসছে, চোখ খুলে আলেক্সেই এত একাগ্রভাবে শুনতে লাগল যে কানদুটো ঝিম ঝিম করে উঠল, পিস্তলটা বের করে নিঃসাড় বসে রইল; ফারের ফল পড়ছে, রাত্রে জমে-যাওয়া বরফের কড়কড়, বরফের নিচে ক্ষুদে ক্ষুদে জলের স্রোতের অস্ফুট কুলকুল, প্রত্যেকটি শব্দে সে চমকে উঠল।

ভোরের আগে ঘুম এল। ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বেশ আলো হয়ে গিয়েছে, যে গাছের নিচে ঘুমিয়েছে তার চারদিকে ও দেখল শেয়ালের পায়ের আঁকাবাঁকা দাগ, আর তার মধ্যিখানে টেনে নিয়ে যাওয়া লেজের লম্বা ছাপ।

"এই জন্যই তাহলে ভালো ঘুম হয়নি!" পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল যে শেয়ালটা চারিদিকে ঘুরেছে, থাবা গেড়ে বসেছে, আবার ঘুরেছে। হঠাৎ আলেক্সেই'র দুশ্চিন্তা হল। শিকারীদের মতে ধূর্ত শেয়াল মানুষ মরছে আঁচ পেয়ে অনুসরণ করে তাকে। তারি পূর্ব আভাসেই কি ভীরু জানোয়ারটা ওর কাছে এসেছিল।

"বাজে কথা! একেবারে বাজে কথা! সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে," নিজেকে সান্ত্বনা দিল আলেক্সেই, আর হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে গুড়ি মেরে এগিয়েই চলল, এই ভয়াবহ জায়গাটা যত সম্ভব তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবার চেষ্টা তার।

সেদিন আবার কপাল খুলল আলেক্সেই'র। একটা সুগন্ধি জুনিপারের ঝোপ থেকে ফ্যাকাশে ধূসর বেরি ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ছে, ঝরা পাতার অদ্ভুত একটা স্তূপ চোখে পড়ল। হাত দিয়ে স্তূপটা ছুঁল, কিন্তু ভেঙ্গে গেল না সেটা। পাতাগুলো টেনে সরিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ আঙুলে কীসের খোঁচা লাগল। শজারু একটা, তৎক্ষণাৎ আঁচ করল আলেক্সেই। বড়ো বুড়োটে একটা শজারু শীত কাটাবার জন্য ঝোপে ঢুকেছিল, নিজেকে গরম রাখার জন্য হেমন্তের ঝরা পাতায় শরীরটা জড়িয়েছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে গেল আলেক্সেই। ক্লিষ্ট যাত্রার সময়ে জন্তু কি পাখি একটা মারার স্বপ্ন ও দেখেছে। কতবার না পিস্তল বের করে হাঁড়িচাঁচা একটা, বড়ো কাক কিম্বা কোন

খরগোসের দিকে নিশানা করেছে, আর প্রত্যেক বার অতিকষ্টে গুলি ছোঁড়ার ইচ্ছে দমন করেছে; মাত্র তিনটে গুলি বাকি আছে — দরকার হলে দুটো শত্রুর জন্য আর একটা নিজের জন্য। জোর করে পিস্তল সরিয়ে রেখেছে ও; ঝুঁকি নিলে চলবে না।

আর এখানে এক টুকরো মাংস সটান ওর হাতে এসে পড়েছে। সাধারণের মতে শজারু নোংরা জীব, সেটা ভেবেচিন্তে না দেখেই তাড়াতাড়ি শেষের পাতাকটি সরিয়ে ফেলল। শজারুটার ঘুম ভাঙ্গল না, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, কাঁটাওয়ালা বড়ো মটরের মত হাস্যকর চেহারা। ছোরা দিয়ে ওটাকে মেরে সোজা করল আলেক্সেই, আনাড়িভাবে ওর কাঁটার বর্মটা আর পেটের নিচের হলদে চামড়াটা টেনে ছিঁড়ে, শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে, দারুণ লোভে হাড়ে শক্ত করে লাগা গরম ধূসর পেশল মাংস দাঁতে ছিঁড়তে লাগল। কিছু বাকি পড়ে রইল না জানোয়ারটার। ছোট ছোট হাড়গুলো চিবিয়ে গিলল আলেক্সেই, আর শুধু তখনি মাংসটার কটু, কুকুরের মত আস্বাদটা টের পেল। কিন্তু কী এসে যায় গন্ধতে? পেট ত ভরেছে, সমস্ত শরীরে জাগছে পরিতৃপ্তির, উষ্ণতার আর অবসাদের একটা অনুভূতি!

আবার দেখে শুনে প্রত্যেকটি হাড় চুষল আলেক্সেই, তারপর বরফে শুয়ে পড়ল, বেশ গরম আর আরাম লাগছে। হয়ত ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে একটা শেয়াল সতর্কভাবে ডাকাতে ঘোর কেটে গেল। কান খাড়া করে শুনল আলেক্সেই, পূব থেকে বরাবর আসা দূরাগত কামানের গর্জনের মধ্যে হঠাৎ মেসিনগানের খরখরে আওয়াজ।

সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে, শেয়ালটার আর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে গিয়ে, আবার বনের গভীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল আলেক্সেই।

১১

যে জলাটা পেরিয়ে এসেছে তার ওধারে খোলা জায়গা একটা, রোদেবৃষ্টিতে জীর্ণ খোঁটার দুটো সারির একটা বেড়া সেখান হয়ে চলে গিয়েছে, খোঁটাগুলো গাছের ছাল আর উইলো ডাল দিয়ে খুঁটিতে বাঁধা, খুঁটিগুলো মাটিতে পোঁতা।

খোঁটাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, এখানে সেখানে বরফের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত অচলা পথের রেখা উঁকি মারছে। কাছাকাছি নিশ্চয়ই বসতি আছে তাহলে! আলেক্সেই'র হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে এল। এত দূর জায়গায় জার্মানদের আসার কোনই সম্ভাবনা নেই বলতে গেলে; আর যদিও ওরা এসে থাকে, আশেপাশে আপনার লোকজনও থাকবে, আর তারা অবশ্যই আহত আলেক্সেইকে আশ্রয় দেবে, সমস্ত রকম সাহায্য করবে।

যাত্রা শেষ হয়ে এসেছে আঁচ করে প্রাণপণ শক্তিতে এগিয়ে চলল আলেক্সেই, বিশ্রামের জন্য থামল না। হামাগুড়ি দিয়ে চলল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বরফে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে, পরিশ্রমে জ্ঞান হারাচ্ছে; একটা ঢিবির উপরে পেঁছবার জন্য তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিচ্ছে আলেক্সেই, ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওটাতে উঠলেই যে গ্রামটা ওকে আশ্রয়ের স্বর্গ জোটাবে সেটা নজরে আসবে। বসতিতে পেঁছবার একাগ্র চেষ্টায় ও দেখতে পেল না যে, বেড়াটা আর গলন্ত বরফে ক্রমশ স্পষ্টতর রাস্তার চিহ্নটা ছাড়া আর কিছু নেই যেটা কাছাকাছি লোকালয়ের ইঙ্গিতসূচক।

অবশেষে ঢিবির উপরে পেঁছল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আলেক্সেই চোখ তুলে তাকাল -- আর তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিল -- সামনের দৃশ্যটি এত ভয়াবহ।

সন্দেহ নেই যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এখানে বনের মধ্যে ছোট্ট একটা গ্রাম ছিল। পোড়া বাড়িগুলোর বরফে-ঢাকা ভগ্নস্তূপের উপরে চিমনীর দুটো উদ্যত অসমান সারিতে গ্রামটার রেখা সহজে ধরা যায়। এখন শুধু চোখে পড়ছে কয়েকটা ফুল-বাগান, কঞ্চির বেড়া আর জায়গায় জায়গায় জানলার পাশে রোয়ানগাছের ঝাড়। আর এখন বরফের মধ্য থেকে খুঁচিয়ে বেরিয়ে আছে ওগুলো, মরা, আগুনে-ঝলসানো। বরফে-ঢাকা ফাঁকা ক্ষেতের উপরে চিমনীগুলো বেরিয়ে আছে, বনের ফাঁকা জায়গায় গাছের গুঁড়ির মত, আর মাঝখানে উঠেছে কুয়োর জল তোলার যন্ত্র, একেবারে বেমানান দেখাচ্ছে সেটাকে, তা থেকে ঝুলছে পুরোনো, লোহায় বাঁধানো কাঠের বালতি একটা, মরচে-পড়া শেকলে আস্তে আস্তে হাওয়ায় দুলছে সেটা। গ্রামের প্রবেশপথে, সবুজ বেড়ায় ঘেরা বাগানের কাছে সুন্দর একটা ছাতওয়ালা খিলান, তার নিচে মরচে-পড়া কব্জায় কিঁচকিঁচ করে দরজাটা আস্তে আস্তে নড়ছে।

জনপ্রাণী নেই, শব্দ নেই, ধোঁয়ার রেশ মাত্র নেই... মরুভূমি। জন মানুষের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। আলেক্সেই আসাতে ভয় পেয়ে একটা

খরগোস ছুটে সোজা গ্রামটির দিকে গেল, পিছনের পাদুটো হাস্যকরভাবে ছুঁড়ে। কণ্ঠির গেটে থেমে গিয়ে বসল ওটা, সামনের পাদুটো তুলে, কানটা একটু হেলিয়ে; বড়ো অদ্ভুত জীবটা তখনো হামাগুড়ি দিয়ে আসছে দেখে ওটা ঝলসে-যাওয়া পরিত্যক্ত বাগানের ধার ঘেঁষে আবার লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

যন্ত্রবৎ এগিয়ে চলল আলেক্সেই। দাড়ি-না-কামানো গাল বেয়ে চোখের জলের বড়ো বড়ো ফোঁটা টপটপ করে বরফে পড়ছে। কণ্ঠির গেটটায় থামল ও, এক মুহূর্ত আগে খরগোসটা সেখানে ছিল। গেটের উপরে ভাঙ্গাচোরা বোর্ডে লেখা: "কিন্ডা..." সহজেই আঁচ করা যায় যে এই সবুজ বেড়ার পিছনে ছিল একটি কিন্ডারগার্টেনের পরিচ্ছন্ন বাড়িঘরদোর। এমন কি নিচু কয়েকটা বেঞ্চও পড়ে আছে, গ্রামের ছুতোর সেগুলো বানিয়েছিল, আর বাচ্চাদের ভালোবাসত বলে কাচ দিয়ে চেঁচে সেগুলোকে সমান আর মসৃণ করেছিল। গেট ঠেলে ঢুকে একটা বেঞ্চের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে গেল আলেক্সেই, বসার ইচ্ছে তার, কিন্তু ওর শরীরটা আড়াআড়ি অবস্থায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না। শেষে যখন বসল তখন সমস্ত শিরদাঁড়াটা কনকন করতে লাগল। জিরিয়ে নেবার জন্য বরফের উপরে শুয়ে পড়ল ও, কুন্ডলী পাকিয়ে ক্লান্ত জানোয়ারেরা যেমন করে শোয়।

ওর বুক বিষাদে ভারী।

বেঞ্চের চারিধারে বরফ গলছে, দেখা যাচ্ছে কালো মাটি, সেখান থেকে উষ্ণ ভাপ উঠে চোখের সামনে বেঁকে যাচ্ছে আর কাঁপছে। উষ্ণ গলন্ত মাটি এক মুঠো খুঁড়ে নিল আলেক্সেই: চর্বির মত আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চুঁইয়ে পড়ল সেটা, ভিজে ভিজে গোবরের গন্ধ তাতে, গোয়ালের আর বাড়ির গন্ধ।

বসতি ছিল এখানে... অনেক, অনেক দিন আগে কোন সময় লোকেরা "কৃষ্ণ অরণ্যের" কাছ থেকে জমির এই টুকরোটা জয় করে, লাঙল চালায় এর উপরে, কাঠের বিদেমই দেয়, সার দেয়, দেখাশুনো করে। কঠিন জীবন সেটা, বনের আর জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রামের জীবন, পরের ফসল তোলার আগে কী করে সংসার চলবে তার অবিরাম দুশ্চিন্তার জীবন। সোভিয়েত শাসনে একটা যৌথখামার গড়া হয়, আর সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে লোকেরা; কৃষির জন্য যন্ত্রপাতি এল, তাদের সঙ্গে এল প্রাচুর্য। কিন্ডারগার্টেন বানাল গ্রামের ছুতোররা, আর সন্ধ্যাবেলায় টুকটুকে বাচ্চারা এই বাগানে হুড়োহুড়ি করছে দেখতে দেখতে গ্রামের লোকেরা

নিশ্চয়ই ভাবত যে এবারে একটা ক্লাব আর পড়বার ঘর তৈরী করার সময় হয়েছে, বাইরে যখন তুষার-ঝড় তখন ক্লাবের ঘরে উষ্ণ আরামে শীতের সন্ধ্যা কাটানো যাবে; বনের গভীরে বৈদ্যুতিক আলোর স্বপ্নও তারা নিশ্চয়ই দেখেছিল। আর এখন শুধু মরুভূমি, বনের অনন্ত অটল স্তব্ধতা...

যত ভাবছে গ্রামটির কথা আলেক্সেই তত ওর মন নাড়া দিয়ে উঠছে। চোখের সামনে এল কামিশিনের ছবি, সমতল শুকনো স্তেপে ভলগাপারের ধুলো-ভরা একটা ছোট সহর। গ্রীষ্মে আর হেমন্তে স্তেপের ধারালো হাওয়া সহরে বইত, ধুলো আর বালি চোখে মুখে ছুঁচের মত লাগত, জোরে ঢুকত বাড়িঘরদোরে, বন্ধ জানলা দিয়ে চোরাভাবে আসত, চোখ অন্ধ করে দিয়ে দাঁতে লাগত। স্তেপের এই কিড়কিড়ে বালির মেঘকে "কামিশিন বৃষ্টি" বলা হত, অনেক অনেক বছর ধরে এই বালি আটকাবার, পরিষ্কার টাটকা হাওয়া প্রাণভরে নেবার স্বপ্ন লোকে দেখেছিল। কিন্তু স্বপ্নটা সত্য হল শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশে। সলাপরামর্শ করে লোকেরা হাওয়া আর বালির বিরুদ্ধে লড়াই চালাল। প্রতি শনিবার গাঁতি শাবল আর কুঠার নিয়ে সমস্ত লোক বেরিয়ে আসত, আর কালক্রমে সহরটির আগেকার ফাঁকা চকে একটা বাগান হল, অপরিসর রাস্তার দুধারে উঠল নবীন পাতলা পপলারগাছ। গাছে সযত্নে জল দিত লোকে, সময়ে ছাঁটত, যেন নিজেদের জানলার কার্নিশের ফুল। আলেক্সেই'র মনে পড়ল বসন্তে যখন গাছগুলোর পাতলা নগ্ন শাখা অঙ্কুরিত হয়ে সবুজ রং ধরত তখন ছেলে বুড়ো সবাই কী ভাবে আনন্দিত হত... হঠাৎ ও কল্পনা করল ওর নিজের কামিশিনের রাস্তায় ফ্যাশিস্টরা ঘুরছে। অসীম যত্নে লালিত গাছগুলো ওরা কেটে ফেলছে আগুন জ্বালাবার জন্য। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে ওর নিজের সহর। ওর বাড়ি যেখানে ছিল, যেখানে ও বড়ো হয়েছে, ওর মা যেখানে ছিলেন, সেখানে উঠেছে একটা নগ্ন, ঝুল-মাখা বিকট চিমনী, এখানকার চিমনীর মত।

ব্যথায় আর যন্ত্রণায় ওর বুক চিরে গেল।

"ওদের আর এক চুল এগোনো চলবে না! রুখতেই হবে ওদের, শরীরে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ, যেমন করে রুখেছিল ওই রুশ সৈনিকটি, শত্রুদের দেহের গাদার ওপরে বনের ফাঁকা জায়গায় যে পড়ে আছে।"

গাছের ধূসর মাথায় সূর্যের আলো ইতিমধ্যেই পড়েছে।

এক কালে যেটা গ্রামের রাস্তা ছিল সেটা ধরে আলেক্সেই হামাগুড়ি দিয়ে চলল। ছাই'এর গাদা থেকে মড়ার গন্ধ আসছে। গ্রামের চেহারাটা বনের

চেয়েও পরিত্যক্ত। হঠাৎ একটি বিচিত্র শব্দে ও হুঁশিয়ার হল। রাস্তার একেবারে শেষে ছাই'এর গাদার পাশে একটা কুকুর। ঝোলা-কান লোমশ পোষা কুকুর একটা, সাধারণ "ববিক" কিম্বা "ঝুচকা"। নিচু গলায় গরগর করে, থাবাতে এক টুকরো মেদল মাংস ধরে নাড়াচাড়া করছে। আলেক্সেইকে দেখে কুকুরটা হঠাৎ ফুঁসে উঠে দাঁত দেখাল — লোকে বলে কুকুরের মত নরম মেজাজের জীব আর নেই, গিন্নীদের যত বকুনীর লক্ষ্যবস্তু ওরা, আর বাচ্চাদের প্রিয়। কুকুরটার চোখদুটো এত হিংস্রভাবে জ্বলছে যে আলেক্সেই'র শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। "দস্তানা" জোড়া চট করে খুলে পিস্তলটা নিল সে। কয়েক মুহূর্ত মানুষ আর কুকুর — সেটা এখন বুনো জন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে — পরস্পরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ কুকুরটার পুরোনো স্মৃতি ফিরে এল নিশ্চয়ই, কেননা মুখ নিচু করে, যেন দোষ করে ফেলেছে এমন ভাবে লেজ নাড়িয়ে মাংসের টুকরোটা চট করে তুলে নিয়ে ছাই'এর গাদার পিছনে দৌড়িয়ে চলে গেল লেজ গুটিয়ে।

চলে যেতে হবে, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে! আলোর শেষ কটি রেখার সুযোগ নিয়ে, কোন রাস্তা না বেছে, বরফের উপর আড়াআড়িভাবে আলেক্সেই হামাগুড়ি দিয়ে বনে ঢুকল, কিছু না ভেবেই যেদিক থেকে কামানের শব্দ এখন স্পষ্টভাবে আসছে সে দিকে চলল। শব্দটা ওকে টানছে চুম্বকের মত, যত কাছে যাচ্ছে তত বাড়ছে ওটার আকর্ষণী শক্তি।

১২

আর এইভাবে আরো দুতিন দিন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল আলেক্সেই... সময়ের হিসেব ওর নেই, সমস্ত কিছু যন্ত্রচালিত প্রয়াসের একটানা পরম্পরায় পরিণত। কখনো কখনো ঘুম, বিস্মরণ হয়ত বা ওকে আচ্ছন্ন করছে। হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ছে সে, কিন্তু যে শক্তি তাকে পূবদিকে নিয়ে যাচ্ছে এত প্রখর তার আকর্ষণ যে বিস্মরণের অবস্থাতেও আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে কোন গাছ কিম্বা ঝোপের সঙ্গে ধাক্কা লাগা বা হাত পিছলে মুখ থুবড়ে গলন্ত বরফের উপরে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি, ভাসা-ভাসা সব চিন্তা একটি কেন্দ্রে, আলোর বিন্দুর মত একটি কেন্দ্রে আবদ্ধ: হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, যেমন করে পারো এগিয়ে চলো।

যেতে যেতে প্রত্যেকটা ঝোপ খুঁজে দেখছে সে, যদি আর একটা শজারু মেলে। বরফের নিচে পাওয়া বেরি আর শ্যাওলা ওর আহার্য এখন। একবার একটা বিরাট পিঁপড়ের ঢিবির কাছে এল, বৃষ্টিতে ভেজা মসৃণ খড়ের গাদার মত ঢিবিটা খাড়া। পিঁপড়েগুলো তখনো ঘুমোচ্ছে, মনে হচ্ছে ঢিবিতে কিছু নেই। নরম ঢিবির ভিতরে ঝপ করে হাত ঢুকিয়ে আলেক্সেই বের করে নিল, পিঁপড়েগুলো চামড়ায় নাছোড়বান্দার মত লেপটে আছে। অসীম তৃপ্তিতে পিঁপড়েগুলো খেতে শুরু করল সে, শুকনো ফাটা জিভে লাগছে পিঁপড়ের ঝাঁঝালো টক রস। বারবার ঢিবির মধ্যে হাত ঢোকাল, শেষ পর্যন্ত এই অপ্রত্যাশিত হামলায় সমস্ত পিঁপড়ে জেগে উঠল।

হিংস্রভাবে আত্মরক্ষা শুরু করল ক্ষুদে পোকাগুলো; আলেক্সেই'র হাত, ঠোঁট, জিভ কামড়াচ্ছে, বিমানি পোশাকের ভিতরে ঢুকে শরীর পর্যন্ত পেঁছিল ওরা। কিন্তু আর কিছু না হোক, ওদের কামড়ের জ্বালা ভালোই লাগছে, ওদের ঝাঁঝালো রস যেন বলকারক ওষুধ। তেষ্টা পেল আলেক্সেই'র। ঝোপঝাড়ের মধ্যে বনের ঘোলাটে জলের একটা ডোবা, ও মুখ বাড়াল পানের জন্য, কিন্তু তক্ষুণি পিছিয়ে এল — ঘোলাটে জল, আকাশের নীল ছায়া তাতে পড়েছে, তার পটভূমিতে একটা অদ্ভুত ভয়াবহ মুখ ওর দিকে উঁকি মারছে। কঙ্কালের মুখ সেটা, চামড়াটা কালো, অপরিচ্ছন্ন খোঁচা খোঁচা শক্ত লোমে ইতিমধ্যেই কণ্টকিত। গভীর কোটর থেকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বড়ো, গোলগোল, বন্য উজ্জ্বল একজোড়া চোখ, আলুথালু চুল কপালে নেমেছে এলোমেলো গোছায়।

"আমার ছায়া ওটা?" ভাবল আলেক্সেই, আর তাকাবার সাহস হল না ওর, জল না খেয়ে মুখে কিছু বরফ গুঁজে পূবমুখো হামাগুড়ি দিয়ে চলল সেই জোরালো চুম্বকটার আকর্ষণে।

সে রাত্রে বিশ্রামের জন্য একটা বড়ো বোমা-গর্ত বেছে নিল আলেক্সেই. গর্তটার চারিধারে হলুদ বালিতে ঘেরা, বিস্ফোরণের চাপে উপরে ছিটকে এসেছে। গর্তের ভিতরটায় শুয়ে বেশ আরাম লাগছে। হাওয়া আসছে না সেখানে, শুধু উপরের বালি ঝুরঝুর করে পড়ছে হাওয়ার চাপে। উপরে তাকাল আলেক্সেই, তারাগুলোকে বেজায় বড়ো ঠেকছে, মনে হচ্ছে ওরা খুব নিচে নেমে এসেছে। পাইনগাছের একটা মোটা ডাল তারার নিচে এদিক ওদিক দুলছে, মনে হচ্ছে ছেঁড়া নেকড়ার টুকরো হাতে সেটা জ্বলজ্বলে আলোগুলোকে মুছে চকচকে করছে। ভোরের আগে ঠাণ্ডা পড়ল। বনের

উপরে কনকনে কুয়াশা। হাওয়ার গতি বদলে গেল। উত্তর থেকে বইছে সেটা, কুয়াশাটা জমে যাচ্ছে। ধূসর, বিলম্বিত আলো যখন ডালপালা ভেদ করে এল তখন ঘন কুয়াশা নেমে আস্তে আস্তে গলে গেল, পেছল গুঁড়ো গুঁড়ো বরফে সবকিছু ঢাকা পড়েছে। উপরের ডালটাকে আর নেকড়াওয়ালা হাতের মত দেখাচ্ছে না, মনে হচ্ছে অদ্ভুত, স্ফটিক ঝালর একটা, তা থেকে ঝোলানো ছোট ছোট ত্রিশির কাচের কলম হাওয়ায় আস্তে আস্তে ঠুনঠুন করছে।

আলেক্সেই জেগে উঠল, এত দুর্বল তার আগে কখনো লাগেনি। বিমানি পোশাকের বুকপকেটে মজুত রাখা পাইনগাছের ছাল পর্যন্ত চিবল না ও। অনেক কষ্টে মাটি ছেড়ে উঠল, যেন রাত্রে শরীরটা মাটির সঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে গিয়েছে। পোশাক আর দাড়ি গোঁফ থেকে বরফ ঝেড়ে না ফেলে, গর্তটার গা ধরে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু রাত্রে জমে-যাওয়া বালিতে হাত গেল পিছলে। বারবার বেরোবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবার পিছলে পড়ে গেল। ওঠবার উদ্যম ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে এল। শেষে গভীর আতঙ্কে আলেক্সেই বুঝতে পারল যে কেউ সাহায্য না করলে সে বেরোতে পারবে না। সেটা ভেবে আর একবার গর্তটার পেছল গা বেয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে পারল না, কিন্তু অল্প একটু ওঠাব পরেই আবার পিছলে পড়ে গেল, একেবারে ক্লান্ত আর অসহায়।

"শেষ তাহলে! কিছুই আর করার নেই!"

গর্তে কুঁকড়িয়ে শুল আলেক্সেই, বিশ্রামের একটা ভয়াবহ ঘোর সমস্ত শরীরে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে ইচ্ছাশক্তিকে চুম্বকের টান থেকে মুক্ত করে অসাড় করে দিচ্ছে, বুঝতে পারল ও। ছিন্ন পত্রগুলো অস্থিরভাবে টিউনিকের পকেট থেকে বের করে নিল, কিন্তু পড়বার শক্তি আর নেই। সেলোফেনের মোড়ক থেকে মেয়েটির ছবি বের করল, মাঠের ঘাসে ছাপা ফ্রক পরে বসে আছে। বিষণ্ণভাবে হেসে জিজ্ঞেস করল তাকে:

"সত্যিই তাহলে বিদায়?" আর হঠাৎ চমকে উঠল আলেক্সেই, ছবি হাতে পাথরের মত বসে রইল। বনের অনেক উপরে ঠান্ডা হিম হাওয়ায় পরিচিত একটা শব্দ শুনেছে মনে হল।

অবসাদ তক্ষুণি ঝেড়ে ফেলল আলেক্সেই। শব্দটা অসাধারণ কিছু নয়। এত ক্ষীণ যে বনের কোন জন্তুর সূক্ষ্ম কানেও বরফে-ঢাকা গাছের মাথার একঘেয়ে খসখস শব্দের মধ্যে ওটা আলাদাভাবে ধরা পড়বে না। কিন্তু

বিশেষ একটা শিসের মত ধ্বনিতে আলেক্সেই নির্ভুলভাবে আঁচ করল যে ওটা আসছে "ই-১৬" থেকে, যে ধরনের বিমান ও চালাত সে ধরনের বিমান থেকে।

ইঞ্জিনের গম্ভীর শব্দ আরো কাছে এল, মাত্রায় বাড়ল, কখনো বা শিসের মত বাজছে, আর বিমানটি ঘোরার সময় গোঙানোর শব্দ। শেষে, ধূসর আকাশে অনেক উঁচুতে ছোট মন্থরগতি একটা ক্রুশ আলেক্সেই দেখল, কুয়াশাচ্ছন্ন ধূসর মেঘে কখনো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সেটা, আবার বেরিয়ে আসছে। পাখাদুটোয় লাল তারার চিহ্ন আলেক্সেই'র চোখে পড়ল, ওর ঠিক মাথার উপরে বিমানটি তীরবেগে নেমে আবার বৃত্তাকারে উপরে উঠে গেল সূর্যের আলোয় ঝকঝকিয়ে, তারপর একটা পাশ উঁচু করে উড়ে চলে গেল। ইঞ্জিনের শব্দ গেল থেমে, সে শব্দ ছাপিয়ে এল হাওয়ায় দোলা, বরফে-ঢাকা ডালপালার মৃদুকর্কশ ধ্বনি, কিন্তু পরে অনেকক্ষণ ধরে আলেক্সেই'র মনে হল সেই সূক্ষ্ম শিসের ধ্বনি তখনো কানে আসছে।

ককপিটে বসে আছে নিজে, ও কল্পনা করল। এক নিমেষে, এমন কি একটা সিগারেটে টান দিতে না দিতে, বনে নিজের বিমান-ঘাঁটিতে ফিরে যেতে পারে ও। বৈমানিকটি কে? হয়ত আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো, সকালের টহলে বেরিয়েছে। ও টহল দেবার সময় অনেক উঁচুতে উঠত, শত্রু বিমানের দেখা পাবার গোপন আশায়... দেগতিয়ারেঙ্কো... বিমানটা... বন্ধু বৈমানিকেরা...

নতুন উদ্যমের আবেগে গর্তটার জমে-যাওয়া গায়ের দিকে তাকাল আলেক্সেই। "এভাবে কখনোই বেরোতে পারব না," মনে মনে বলল। "কিন্তু এখানে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা চলবে না।" খাপ থেকে ছোরা বের করে অস্থির, দুর্বল খোঁচায় গর্তটার গায়ে পা রাখবার জায়গা তৈরী করতে লাগল আলেক্সেই, নখ দিয়ে আঁচড়ে জমে-যাওয়া বালি সরাল। আঁচড়াতে আঁচড়াতে নখ ফেটে গেল, আঙুল থেকে রক্ত গড়িয়ে এল, কিন্তু একটুও ঢিলে না দিয়ে কুপিয়ে চলল ও। তারপর খাঁজগুলোর উপরে হাত রেখে, হাঁটুতে ভর করে গর্তটার গা বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে পাঁচিলটার কাছে পেঁছল। ওটাতে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়া, তারপর গড়িয়ে যাওয়া — ব্যস, তাহলেই বেঁচে যাবে, কিন্তু পা পিছলে সে আবার পড়ে গেল, বরফে মুখটা জোরে ঠুকে গেল। খুব চোট লেগেছে, কিন্তু তখনো কানে বিমানটির গম্ভীর শব্দ বেজে চলেছে। আবার গর্তটার গা বেয়ে উপরে উঠল, পিছলে পড়ে গেল আবার। তারপর নিজের হাতে-কাটা

খাঁজগুলো খুঁটিয়ে দেখে সেগুলোকে আরো গভীর করতে শুরু করল, উপরের খাঁজগুলোর পাশ আরো ধারালো করল: সেটা করা শেষ হলে উপরে উঠতে লাগল আবার, খুব সাবধানে, ক্ষীণ শক্তি যাতে নিঃশেষ না হয়ে যায়।

বালির পাঁচিলে অসহ্য কষ্টে আড়াআড়িভাবে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে অসহায়ভাবে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল আলেক্সেই। বিমানটি যে দিকে উড়ে গিয়েছে সেদিকে হামাগুড়ি দিয়ে চলল, সেদিকে বনের উপরে সূর্য উঠেছে, বরফ-খেগো কুয়াশা মিলিয়ে যেতে সূর্যের আলোয় গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ স্ফটিকের মত চকচক করছে।

১৩

কিন্তু হামাগুড়ি দিতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে আলেক্সেই'র। হাতদুটো কেঁপে অবশ হয়ে আসছে, শরীরের ভার রাখতে পারছে না। কয়েকবার গলন্ত বরফে মুখ ঠুকে গেল। মনে হচ্ছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে, সেটার টান রোখা অসম্ভব। ভয়ানক ইচ্ছে করছে শুয়ে অন্তত আধ-ঘণ্টা জিরিয়ে নিতে, কিন্তু এগিয়ে চলার সংকল্প আজ ক্ষিপ্ততায় পরিণত, আর তাই অবসাদ কাটিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েই চলল আলেক্সেই, পড়ে যাচ্ছে, উঠছে, আবার হামাগুড়ি দিচ্ছে, ব্যথা কিম্বা ক্ষিধের কোন হুঁশ নেই, কিছু দেখতে পারছে না, কামান আর মেসিনগানের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না।

যখন শরীরের ভার হাত আর নিতে পারছে না তখন কনুই'এ ভর দিয়ে এগোবার চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু সেটা বিশেষ অসুবিধাজনক, তাই শুয়ে পড়ে কনুই'এর সাহায্যে গড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। দেখল সেরকম ভাবে এগোতে পারবে। হামাগুড়ি দেবার চেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া সহজতর, খুব পরিশ্রম করতে হয় না তাতে। কিন্তু গড়িয়ে যাওয়াতে মাথা ঘুরছে, মাঝেমাঝে চেতনা লোপ পাচ্ছে। প্রায়ই থেমে উঠে বসে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ওকে, যতক্ষণ পৃথিবী, বন আর আকাশের চর্কিপাক বন্ধ না হয়।

গাছের সারি পাতলা হয়ে এল, এখানে সেখানে ফাঁকা জায়গা, গাছ কাটা হয়েছে সেখানে। শীতের রাস্তার ফালি দেখা যাচ্ছে। নিজের লোকজনদের কাছে পেঁৗছতে পারবে কিনা, সেটা আর ভাবছে না আলেক্সেই, যতক্ষণ নড়বার শক্তি আছে ততক্ষণ গড়িয়ে গড়িয়ে যাবে, এই তার দৃঢ় সংকল্প।

দুর্বল পেশীতে নিদারুণ শ্রমের চাপে জ্ঞান হারাচ্ছে যখন, তখনো হাতদুটো আর সারা শরীর আপনা থেকেই জটিল ক্রিয়া করে চলেছে, আর বরফের উপরে গড়িয়ে চলেছে ও পূর্বদিকে, কামানের শব্দের দিকে।

সে রাত্রি কী ভাবে কাটল, পরের দিন সকালে খুব বেশী এগোতে পেরেছে কি না, কিছু মনে নেই আলেক্সেই'র। আধো-বিস্মরণের অন্ধকারে সমস্ত কিছু চাপা পড়েছে। রাস্তায় নানা বাধার শুধু অস্পষ্ট স্মৃতি: একটা কেটে-ফেলা পাইনের সোনালী গুঁড়ি, হলুদ রঙের রজন চুঁইয়ে পড়ছে তা থেকে, কাঠের কুঁদোর একটা স্তূপ, করাতের গুঁড়ো আর কুচি চারিদিকে ইতস্তত ছড়ানো, একটা গাছের গুঁড়ি, আড়াআড়িভাবে যেখানে কাটা হয়েছে সেখানে বাৎসরিক আংটাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে...

একটা অস্বাভাবিক শব্দে ওর আধো-বিস্মরণের ঘোর কেটে গেল, জ্ঞান ফিরে আসাতে উঠে বসে চারিদিকে তাকাল সে। বনের একটা বড়ো পরিষ্কার জায়গায় এসে পড়েছে, সূর্যালোকে প্লাবিত জায়গাটা, কাটা গাছে আর কাঠের কুঁদোতে ভর্তি, সেগুলো তখনো ছাঁটা হয়নি। জ্বালানী কাঠের সাজানো স্তূপ ছাড়া ছাড়া দাঁড়িয়ে। দুপুরের সূর্য অনেক উঁচুতে, রজনের, তপ্ত সূচীমুখ ফারের আর স্যাঁতসেঁতে বরফের তীব্র গন্ধ হাওয়ায়, মাটি এখনো গলেনি, অনেক উঁচুতে একটা লার্ক গাইছে সহজ সুরে প্রাণ ঢেলে দিয়ে।

অজানা বিপদের অনুভূতিতে চকিত হয়ে আলেক্সেই ফাঁকা জায়গাটা ভালো করে দেখল। পরিষ্কার জায়গাটা, পরিত্যক্ত গোছের চেহারা নয়। গাছগুলো হালে কাটা হয়েছে, ছাল-না-ছাড়ানো গাছের ডালপালা তখনো টাটকা আর সবুজ, মধুর মত রজন চুঁইয়ে পড়ছে, আর চারিদিকে ছড়ানো গাছের কুচি আর কাঁচা ছাল থেকে তাজা গন্ধ আসছে। তাই ফাঁকা জায়গাটাতে জীবনের সাড়া। হয়ত পরিখা আর ডাগ-আউটের জন্য জার্মানরা এখানে কাঠের কুঁদো ঠিক করছে? তা যদি হয়, পত্রপাঠ এখান থেকে সরে পড়া ভালো, কেননা যে কোন মুহূর্তে কাঠুরিয়ারা এসে পড়তে পারে। কিন্তু শরীরটা তীব্র যন্ত্রণায় বিবশ হয়ে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে, নড়বার শক্তি নেই আলেক্সেই'র।

হামাগুড়ি দিয়ে কি এগিয়ে যাবে? বনে কয়েক দিন কাটিয়ে যে সহজাত বোধ গড়ে উঠেছে সেটা ওকে হুঁশিয়ার করল। নজরে পড়ছে না বটে, কিন্তু বোধ হচ্ছে কে যেন ওকে জানোয়ারের মত একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছে। কে?



বনটা শান্ত, ফাঁকা জায়গার উপরে লার্কের গান, একটা কাঠঠোকরার ফাঁপা ঠকঠক আওয়াজ, কাটা গাছের আনত ডালপালায় লাফিয়ে লাফিয়ে টমটিটগুলো রাগে কিচির মিচির করে পরস্পরকে ডাকছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কে যেন ওকে দেখছে, সমস্ত শরীর দিয়ে আলেক্সেই বুঝতে পারল।

গাছের ডাল ভাঙ্গার শব্দ। চারিদিকে তাকাল আলেক্সেই, নবীন পাইনগাছের ধূসর ঝাড়, ওদের কোঁকড়ান মাথাগুলো হাওয়ায় দুলছে, তার মধ্যে ও দেখল কয়েকটা ডালপালা যেন আলাদাভাবে নড়ছে, অন্যদের সঙ্গে তাল রাখছে না। আর মনে হল ওখান থেকে উত্তেজিত ফিসফিসানি ওর কানে আসছে, মানুষের গলার শব্দ। আবার ওর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল, কুকুরটাকে দেখে যেমন হয়েছিল।

বিমানি পোশাকের বুকপকেট থেকে তাড়াতাড়ি পিস্তলটা বের করে নিল আলেক্সেই। পিস্তলটায় ইতিমধ্যেই মরচে ধরেছে, দুহাতে ঘোড়া ঠিক করতে হল। ঘোড়া বসাবার শব্দে পাইনগুলোর পিছনে লুকনো কে যেন চমকে উঠল। গাছের কয়েকটা মাথা জোরে নড়ে উঠল, যেন কেউ তাদের ধাক্কা দিয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার সবকিছু চুপচাপ।

"কী ওটা, মানুষ না জন্তু?" নিজেকে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই, আর মনে হল গাছের ঝাড়েও কেউ যেন জিজ্ঞেস করছে: "ওটা মানুষ না কি?" কল্পনা, না সত্যিসত্যি গাছের ঝাড়ে রুশ ভাষায় কারো কথা কানে এল? হ্যাঁ, সত্যিই ত রুশ ভাষায়। আর রুশ ভাষা বলেই আলেক্সেই হঠাৎ আনন্দে এত অধীর হয়ে পড়ল যে শত্রু মিত্র কিছু না ভেবেই বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে যেখানে কণ্ঠস্বর শুনেছে সেদিকে দৌড়িয়ে ধপাস করে পড়ে গেল যেন কার ধাক্কায়, বরফে ছিটকে পড়ল পিস্তলটা।

১৪

ওঠবার নিষ্ফল চেষ্টা করে আবার পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল আলেক্সেই, কিন্তু আসন্ন বিপদের বোধে তৎক্ষণাৎ হুঁশ ফিরে এল। পাইনগুলোর পিছনে লুকিয়ে আছে লোকে, কোন সন্দেহ নেই তাতে, ওকে দেখছে তারা, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে।

হাতে ভর দিয়ে উঠে, বরফ থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে মাটি ঘেঁষে দৃষ্টির বাইরে রাখল সেটাকে আলেক্সেই, আবার দেখতে লাগল চারিদিকে। বিপদের

আশঙ্কায় বিস্মরণের ঘোর একেবারে কেটে গিয়েছে। সঠিকভাবে কাজ করছে ওর বিচারশক্তি। কারা ওরা? কাঠুরিয়াগুলো হয়ত, জ্বালানী কাঠ ঠিক করার জন্য এখানে আসতে ওদের জার্মানরা বাধ্য করেছে? হয়ত রুশ ওরা, ঘেরাও হয়েছে ওর মত, আর জার্মান লাইন ভেঙ্গে নিজেদের লোকজনের কাছে যাবার চেষ্টা করছে? কিম্বা আশেপাশের চাষীরা হয়ত? যাই হোক না, ও ত স্পষ্ট শুনেছে কে একজন বলল, "মানুষ একটা!"

হামাগুড়ি দিয়ে হাত অসাড়, পিস্তলটা কাঁপছে; কিন্তু লড়তে প্রস্তুত ও, গুলি তিনটের সদ্ব্যবহার করবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের ঝাড় থেকে উত্তেজিত শিশুসুলভ গলায় কে একজন হাঁকল:

'কে তুমি? জার্মান? ফ্রিটজ্?'

অচেনা কথায় আলেক্সেই হুঁশিয়ার হল, কিন্তু যে ডাকছে সে রুশ কোন সন্দেহ নেই তাতে, আর ওটা যে শিশু সেটাও নিঃসন্দেহ।

শিশুর গলায় আর একজন জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কী করছ এখানে?'

'আর তোমরা কারা?' জানতে চাইল আলেক্সেই, কথা বলেই থেমে গেল, নিজের ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে।

ওর প্রশ্নে গাছগুলোর মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল নিশ্চয়ই, ওখানে যারাই থাকুক না তারা চুপিচুপি অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করল, উত্তেজিতভাবে হাত পা নেড়ে, কেননা ডালপালাগুলো অধীরভাবে নড়ে নড়ে উঠল।

'ধোঁকা আর মেরো না, আমাদের ধাপ্পা দেওয়া অত সহজ নয়! মাইল খানেক দূর থেকে জার্মান দেখলেও চিনতে পারি। তুমি জার্মান?'

'তোমরা কারা?'

'সেটা জানার কী দরকার তোমার? নিখত্ ফেরস্টেইন..'*

'আমি রুশ।'

'মিথ্যে কথা... সত্যি হলে চোখজোড়া উপড়ে ফেলব। ফ্যাশিস্ট তুমি!'

'রুশ আমি, রুশ! আমি বৈমানিক। জার্মানরা আমার বিমানটা পেড়ে ফেলে।'

* বুঝতে পারছি না। (জার্মান ভাষায়)

সাবধানতার কোন বালাই আর রাখল না আলেক্সেই। ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে নিজেদের লোকজনই গাছগুলোর পিছনে, রুশ, সোভিয়েত লোকজন। ওকে বিশ্বাস করছে না ওরা। সেটা স্বাভাবিক। যুদ্ধে লোককে সাবধান করে। আর যাত্রা শুরু করার পর এই প্রথম ওর মনে হল যে শরীরে শক্তির লেশমাত্র নেই, হাতে পায়ে, হাঁটতে পারবে না আর, নড়ার ক্ষমতা নেই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নেই। গালের গভীর খাঁজ বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

'দেখো, ও কাঁদছে!' গাছের পিছন থেকে একজন বলল। 'এই, কাঁদছ কেন?'

'আমি রুশ, তোমাদের মতই একজন, আমি বৈমানিক...'

'কোন বিমান-ঘাঁটির লোক?'

'কিন্তু তোমরা কারা?'

'সেটা জানতে চাইছ কেন? আমাদের কথার জবাব দাও!'

'মনচালভ বিমান-ঘাঁটির লোক। আমাকে সাহায্য করছ না কেন তোমরা? বেরিয়ে এসো! ওখানে কী ছাই...'

গাছগুলোর পিছনে আবার আরো উত্তেজিত চুপিচুপি পরামর্শ চলল। কথাগুলো আলেক্সেই'র কানে স্পষ্ট এল:

'শুনছিস কী বলছে? বলছে মনচালভ বিমান-ঘাঁটি থেকে এসেছে... হয়ত সত্যি কথা বলছে... আর ও কাঁদছে...' তারপর একজন হাঁকল, 'শোনো, বৈমানিক, পিস্তলটা ফেলে দাও ত! ফেলে দাও বলছি, নইলে আমরা এখান থেকে বেরোব না, পালিয়ে যাব!'

পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল আলেক্সেই। ডালপালাগুলো ফাঁক হয়ে গেল, আর দুটি ছেলে, খুব হুঁশিয়ার, একজোড়া কৌতূহলী টমটিটের মত ঝট করে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, হাত ধরাধরি করে সাবধানে ওর দিকে এল। ওদের মধ্যে যে বড়ো সে ক্ষীণদেহ, চোখ তার নীল, হলদেটে চুল, হাতে একটা কুঠার। অন্যটি ক্ষুদে, লাল চুল, মুখে ফুট ফুট দাগ, চোখজোড়া অদম্য কৌতূহলে জ্বলছে, প্রথমটির পিছনে পায়ে পায়ে আসতে আসতে ফিসফিস করে বলল:

'ও কাঁদছে, সত্যি কাঁদছে! আর হাড় জিরজির করছে। কী অসম্ভব রোগা দেখো!'

তখনো হাতে কুঠার, বড়োটি কাছে এসে প্রকাণ্ড ফেল্টের বুট দিয়ে পিস্তলটাকে আরো সরিয়ে দিল, বুটজোড়া খুব সম্ভব ওর বাবার, তারপর বলল:

'তুমি বলছ তুমি বৈমানিক। কোন দলিলপত্র আছে? দেখাও ত সেগুলো!'

'এখানে কারা, আমাদের লোক না জার্মানরা?' অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই, আর হাসি চাপতে পারল না ও।

'বনের মধ্যে থাকি, কী করে বলব? আমাদের ত কেউ খবর দেয় না,' বড়োটি কূটনীতিজ্ঞের মত জবাব দিল।

গত্যন্তর নেই, টিউনিকের পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ড বের করতে হল আলেক্সেইকে। অফিসারের লাল কার্ড, উপরে তারার চিহ্ন, সেটা ছোকরাদের উপরে মন্ত্রের মত কাজ করল। ওদের শৈশব জার্মান অধিকারের সময় বিলুপ্ত হয়েছে, আপনার জন এই সোভিয়েত বৈমানিকের আবির্ভাবে হঠাৎ যেন ফিরে এল সেটা।

'হ্যাঁ, আমাদের লোকেরা এখানে। তিন দিন ধরে এখানে আছে!'

'তোমার এরকম হাড় বেরিয়ে গেছে কেন?'

'... আমাদের লোকে ওদের কী শিক্ষাটাই না দিয়েছে! দারুণ পিটিয়েছে ওদের, পিটোয়নি আর! ভয়ঙ্কর লড়াই চলে এখানে, জব্বর লড়াই! ওদের অনেক লোক মারা গিয়েছে, বিস্তর লোক! সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

'আর লেজ গুটিয়ে পালাল ওরা! ওদের দেখে হাসি পাচ্ছিল। ওদের একজন কাপড়-কাচার একটা টবে ঘোড়া যুতে কেটে পড়ল। আর জখম দুজন একটা ঘোড়ার লেজ আঁকড়ে ধরল, ঘোড়াটার পিঠে আর একজন চাপল, যেন নবাব। যদি দেখতে ওদের!... কোথায় তোমাকে ওরা নামাল?'

কিছুক্ষণ বকবক করে ছোকরারা কাজে লাগল। বসতি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ওরা থাকে, সেটা জানাল আলেক্সেইকে। আলেক্সেই এত দুর্বল যে ফিরে চিৎ হয়ে আর একটু ভালো করে শোবার ক্ষমতাও নেই। ছোকরাদের সঙ্গে একটা শ্লেজ, "জার্মান কাঠের গুদাম" থেকে — ফাঁকা জায়গাটাকে ওরা এই বলে ডাকে — জ্বালানী কাঠ নেবার জন্য ওরা ওটা এনেছিল, কিন্তু সেটা এত ছোট যে আলেক্সেইকে তাতে নেওয়া চলে না। আর তাছাড়া গভীর বরফের উপর দিয়ে ওর ভার টেনে নিয়ে যেতেও ওরা পারত না। বড়ো ছেলেটির নাম সেরিওন্‌কা, ছোট ভাই ফেদকাকে সে বলল যত শীগগির পারে গ্রামে গিয়ে লোক ডেকে আনতে, আর ও নিজে রয়ে গেল, জার্মানদের হাতে আলেক্সেই যাতে না পড়ে, উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে সেরিওন্‌কা বলল বটে, কিন্তু আসলে আলেক্সেইকে তখনো ও ঠিক বিশ্বাস করেনি। মনে মনে ভাবল, "কিছুই বলা যায় না। ফ্যাশিস্টগুলো ভয়ানক

সেয়ানা, মরবার ভান ওরা করতে পারে, আর সোভিয়েত বাহিনীর কাগজপত্তরও জোগাড় করতে পারে..." ক্রমশ কিন্তু তার সন্দেহ ঘুচে গেল, তখন সহজভাবে কথা বলতে শুরু করল সে।

পাইন-কাঁটার বিছানায় শুয়ে আলেক্সেই ঝিমোচ্ছে, চোখদুটো আধো-বোজা, অন্যমনস্কভাবে সেরিওন্‌কার বকবকানি শুনছে। বিশ্রামের অবসাদে সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন, তার ঘোরে টুকরো টুকরো কয়েকটা মাত্র কথা তার মনে পৌঁছচ্ছে; আর যদিও কথাগুলোর অর্থ সে ধরতে পারছে না, তবুও মাতৃভাষার শব্দ পরম প্রীতি জোগাচ্ছে ওকে। প্লাভনি গ্রামের লোকেদের উপরে যে দুর্যোগ হঠাৎ ফেটে পড়ে তার কথা পরে সে শোনে।

অক্টোবরের মধ্যেই জার্মানরা এই বনে আর হ্রদ অঞ্চলে এসে পড়ে, তখন বার্চগুলোর পাতায় পাতায় হলদে আভা আর এ্যাসপেনগুলোতে যেন ভয়াবহ লাল আগুন লেগেছে। প্লাভনির ঠিক কাছাকাছি লড়াই চলেনি। গ্রাম থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পশ্চিমে কয়েকটি জার্মান বাহিনী আসে, সবায়ের আগে ট্যাঙ্কের অগ্রগামী মজবুত একটা দল, সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর ছোট একটা দল তাড়াতাড়িতে প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করেছিল, সে দলটিকে নিঃশেষ করে জার্মানরা প্লাভনিতে না ঢুকে পূবদিকে এগিয়ে যায়, রাস্তা ছাড়িয়ে একটা বন-হ্রদের আড়ালে গ্রামটা ঢাকা ছিল। বলগয়ে নামের বড়ো রেলওয়ে কেন্দ্রে পৌঁছিয়ে সেটা দখলে আনার তাড়া ছিল জার্মানদের, যাতে পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখানে, সহর থেকে অনেক দূরে, সারা গ্রীষ্ম আর হেমন্ত ধরে কালিনিন এলাকার লোকেরা, আবালবৃদ্ধবনিতা, নানা বৃত্তি ও পেশার লোকেরা, সহরবাসী আর চাষীরা, দিনরাত কাজ করে যায়, বৃষ্টিতে আর গরমে, মশার কামড়ে, জলার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়, পানীয় জলের অভাব সয়ে, মাটি খুঁড়ে পরিখা আর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে। কয়েকশ কিলোমিটার ধরে চলে পরিখার সারি, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, বন আর জলাভূমি হয়ে, হ্রদের পাশ ঘুরে, ছোট ছোট নদী আর স্রোতস্বিনীর তীর ঘেঁষে।

অনেক কষ্ট পেয়েছিল নির্মাতারা, কিন্তু তাদের পরিশ্রম সফল হল। গতির বেগে জার্মানরা কয়েকটা লাইন ভাঙ্গল বটে, কিন্তু শেষটায় এসে তাদের থেমে যেতে হল। এক জায়গায় আবদ্ধ থেকে যুদ্ধ চলল। ব্যূহ ভেঙ্গে জার্মানরা বলগয়েতে পৌঁছতে পারল না; আক্রমণের চাপে আরো দক্ষিণে সরে যেতে হল তাদের, এ এলাকায় তাদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাতে হল।

প্লাভনির বালুকাময় চটচটে জমিতে সাধারণত বেশী ফসল ফলত না, যা ফলত সেটা আর বনের হ্রদে ধরা মাছ দিয়ে চাষীরা চালিয়ে নিত। গ্রামে লড়াই হয়নি বলে ওরা খুসি। জার্মানদের হুকুম মেনে ওরা ওদের যৌথখামারের সভাপতির নাম বদলে গ্রামের মোড়ল করল, কিন্তু যৌথখামার হিসেবেই কাজ করে চলল, ওদের আশা, ফ্যাশিস্টরা চিরকাল ত সোভিয়েত ভূমিতে গেড়ে বসে থাকবে না, ঝড়ঝঞ্ঝা কেটে যাওয়া না পর্যন্ত নিজেদের দূর নিরাপদ স্থানে শান্তিতে ওরা থাকতে পারবে। কিন্তু সৈনিকদের ধূসর পোশাক-পরা জার্মানদের পিছু পিছু এল অন্যরা, কালো পোশাক গায়ে, টুপিতে খুলি আর হাড়ের আড়াআড়ি চিহ্ন। প্লাভনির অধিবাসীদের হুকুম করা হল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জার্মানীতে স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য পনেরো জন স্বেচ্ছাকর্মী যোগাতে হবে, আদেশ অমান্য করলে দারুণ সাজা মিলবে। স্বেচ্ছাকর্মীদের জমায়েৎ হতে হবে গ্রামের প্রান্তে একটি বাড়িতে, সেটা যৌথখামারের অফিস আর মাছের গুদামও বটে, প্রত্যেককে অন্তর্বাস, একটা করে চামচ, ছুরি আর কাঁটা আর দশ দিনের খাবার নিয়ে হাজির হতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে কেউ হাজির হল না। এটা বলা অবশ্য দরকার যে ঠেকে-শেখা কৃষ্ণবাস জার্মানরা খুব আশা করেনি যে কেউ হাজির হবে। গ্রামবাসীদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য জার্মানরা যৌথখামারের সভাপতি, অর্থাৎ গ্রামের মোড়ল, আর কিণ্ডারগার্টেনের প্রৌঢ়া তত্ত্বাবধায়িকা ভেরনিকা গ্রিগরিয়েভনা, যৌথখামার দলের দুটি পাণ্ডা আর হাতের কাছে-পাওয়া আরো দশজন চাষীকে ধরে গুলি করে মারল। হুকুম করল, ওরা পড়ে থাকবে, কবর দেওয়া হবে না, আর বলল যে পরের দিন নির্দিষ্ট জায়গায় স্বেচ্ছাকর্মীরা না এলে গ্রামের সমস্ত লোকেরই একই দশা হবে।

কেউ এল না। পরের দিন সকালে ঝঞ্ঝা বাহিনীর সণ্ডারকমাণ্ডোর হিটলারীরা গ্রামে ঘুরল, কিন্তু কোন বাড়িতে লোক নেই। জনপ্রাণী নেই, বুড়ো কিম্বা জোয়ান, কেউ নয়। ভিটেমাটি, বহু বছরের পরিশ্রমে সঞ্চিত জিনিসপত্র সব আর গরুবাছুরের অধিকাংশ ছেড়ে দিয়ে লোকেরা এই অঞ্চল-সুলভ রাত্রির ঘন কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, চিহ্নমাত্র রেখে যায়নি। গ্রামের সবাই, কেউ বাদ পড়েনি, আঠারো কিলোমিটার দূরে বনের গভীরে একটি খোলা জায়গায় গেল। থাকবার জন্য পরিখার মত খোঁদল খুঁড়ে, পুরুষেরা পার্টিজানদের দলে যোগ দিতে চলে গেল, মেয়েরা আর শিশুরা বসন্ত পর্যন্ত কোনক্রমে কাটানোর জন্য রয়ে গেল। সণ্ডারকমাণ্ডো

বিদ্রোহী গ্রামটিকে পর্ড়িয়ে দিল, এ জেলার অধিকাংশ গ্রামেরই একই দশা হয়েছিল, জার্মানরা জেলাটাকে মরা এলাকা বলে ডাকত।

'...আমার বাবা ছিলেন যৌথখামারের সভাপতি, ওরা ওকে গ্রামের মোড়ল বলে ডাকত,' বলল সেরিওন্‌কা, কথাগুলো আলেক্সেই'র কাছে পেঁছিল যেন দেয়ালের ওপাশ থেকে। 'বাবাকে মেরে ফেলল ওরা। আমার বড়ো ভাইকেও মেরে ফেলল। সে পঙ্গু ছিল, একটা মাত্র হাত ছিল। হাতটা খামারের ঢেঁকিতে ভেঙ্গে যাওয়াতে কেটে ফেলতে হয়। ষোলোজনকে ওরা খুন করে... নিজের চোখে দেখেছি। জার্মানরা আমাদের সবাইকে বেরিয়ে এসে দেখতে বাধ্য করে। বাবা চেঁচিয়ে ওদের গালাগালি দেন, "এর সাজা তোদের মিলবে, বদমায়েস কোথাকার! মুখে রক্ত উঠে মরবি তোরা!"

বিষণ্ন শ্রান্ত বড়ো বড়ো চোখ আর সোনালী চুল ছেলেটির কথা শুনতে শুনতে আলেক্সেই'র মন অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ভরে গেল। মনে হল জমাট কুয়াশায় ভেসে চলেছে। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে কয়েক দিন, অসীম ক্লান্তিতে শরীর আচ্ছন্ন। একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারছে না আলেক্সেই, আর নিজেরি বিশ্বাস হচ্ছে না যে মাত্র দুঘণ্টা আগে পর্যন্ত সে চলেছিল।

'তাহলে তোমরা বনে থাক?' প্রায় শোনা যায় না এমন ক্ষীণকণ্ঠে ও বলল, ঘুমের ঘোর কষ্টে কাটিয়ে উঠে।

'থাকিই ত! আমরা তিনজন এখন — ফেদকা, মা আর আমি। আমার একটি বোন ছিল, নিউশ্‌কা নাম। শীতকালে মারা যায়। সমস্ত শরীর ফুলে ওঠে, তারপর মারা যায়। আমার ছোট্ট ভাইটা, সেও মারা যায়। আর এখন আমরা তিনজন... জার্মানরা আর ফিরে আসছে না, কী বলো? কী মনে হয় তোমার? দাদামশাই, তিনি এখন আমাদের সভাপতি, তিনি বলেন যে ওরা আর ফিরবে না; তিনি বলেন, "কবর থেকে মড়ারা আর ফিরে আসবে না।" কিন্তু মা, বড্ড ভয় মা'র। পালিয়ে যেতে চান তিনি। বলেন, ওরা ফিরে আসতে পারে... ওই দেখো! দাদু আর ফেদকা আসছে।'

ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তে লাল-চুল ফেদকা দাঁড়িয়ে আলেক্সেইকে দেখাচ্ছে; ওর সঙ্গে একজন কাঁধ-বসা দীর্ঘাকৃতি চওড়া বুড়ো, পরনে বাড়িতে-বোনা ছেঁড়াখোঁড়া, পাতলা বাদামী রঙের কোট, দড়ি দিয়ে সেটা কোমরে বাঁধা, মাথায় জার্মান অফিসারের উঁচু টুপি।

মিখাইল দাদু, ছেলেরা এই নামেই তাঁকে ডাকে। গ্রামের অনাড়ম্বর

আইকনে আঁকা সেণ্ট নিকলাসের মত দয়ালু মুখ, চোখদুটো স্বচ্ছ উজ্জ্বল, শিশুর মত, নরম পাতলা লম্বা দাড়ি শাদা হয়ে গিয়েছে। আলেক্সেইকে নানা রঙের তাপ্পি দেওয়া ভেড়ার চামড়ার একটা পুরোনো কোটে তিনি জড়ালেন, তার হালকা ক্ষীণ দেহ তুলতে তুলতে সরল বিস্ময়ে বারবার বললেন:

'আহা বেচারা! তুমি ত শুকিয়ে প্রায় হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছ! একেবারে কঙ্কালসার! যুদ্ধে লোকের কী না হচ্ছে! দুঃসময় পড়েছে।'

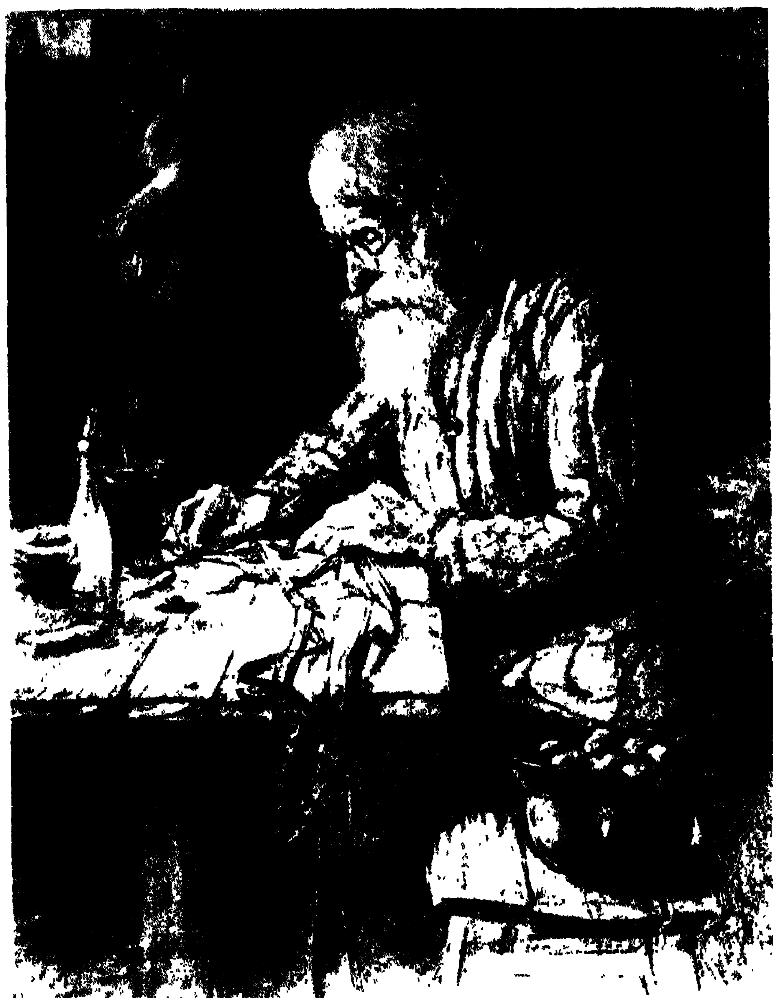
যেন সদ্যজাত শিশুকে নাড়াচাড়া করছেন এমন ভাবে সাবধানে স্লেজে শোয়ালেন আলেক্সেইকে, দড়ি দিয়ে বাঁধলেন তাকে, এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিজের কোট খুলে পাট করে ওর মাথার নিচে রাখলেন। তারপর স্লেজের সামনে গিয়ে মোটা কাপড়ে তৈরী ছোট একটা কলারে নিজেকে যুতে, দুটো দড়ি দুটো ছেলেকে দিয়ে তিনি বললেন, 'ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!' তিনজনে গলন্ত বরফের উপর দিয়ে স্লেজটাকে টেনে নিয়ে চলল, বরফ আটকে ধরছে পা, কিরকির করছে, পায়ের চাপে বসে যাচ্ছে।

১৫

পরের দু তিনদিন আলেক্সেই'র মনে হল যেন জমাট উষ্ণ কুয়াশায় আবৃত সে, সেটা ভেদ করে চারিদিকে কী হচ্ছে তার শুধু ভাসা-ভাসা ছবি তার সামনে আসছে। বাস্তব মিশে গেল বিকারগ্রস্ত কল্পনায়, বেশ কিছু দিন না কাটার আগে প্রকৃত ঘটনাগুলোকে পূর্বাপরভাবে সাজাতে সে পারল না।

বনের গভীরে ফেরারীরা থাকে। মাটিতে খোঁড়া থাকবার জায়গাগুলো পাইনের ডালপালা দিয়ে ছাওয়া, বরফে এখনো ঢাকা, প্রায় চোখে পড়ে না। ধোঁয়া যখন ওঠে তখন মনে হয় সটান মাটি থেকে উঠছে। যেদিন ওখানে পৌঁছল আলেক্সেই সেদিন হাওয়া বন্ধ, কনকনে ঠাণ্ডা, শ্যাওলায় ধোঁয়া লেগে আছে, গাছে গাছে এঁকেবেঁকে চলেছে ধোঁয়া, তাতে ওর মনে হল যে নিভন্ত দাবাগ্নিতে সমস্ত জায়গাটা ঘেরা।

যখন খবর গেল যে একজন সোভিয়েত বৈমানিক কেমন করে কেউ জানে না এখানে এসে পড়েছে, মিখাইল তাকে নিয়ে আসছে, আর ফেদকার ভাষায়, তাকে দেখতে ঠিক কঙ্কালের মত, তখন ওখানকার বাসিন্দারা সবাই দলে দলে বেরিয়ে এল; বেশীর ভাগই মেয়ে আর বাচ্চা, কয়েকজন মাত্র বুড়ো। গাছের মাঝখান দিয়ে দেখা গেল "ত্রয়কা"টা আসছে, মেয়েরা দৌড়িয়ে



গেল সেদিকে, দঙ্গল-করা বাচ্চাদের হটিয়ে দিয়ে চারদিক থেকে শ্লেজটাকে ঘিরে ফেলল, কাঁদতে কাঁদতে সেটাকে নিয়ে চলল নিজেদের খোঁদলে। সবায়ের জামাকাপড় ছেঁড়াখোঁড়া, সবাই সমানভাবে বুড়িয়ে গিয়েছে মনে হয়। খোঁদলের চুল্লীর ধোঁয়া আর ঝুলে মুখগুলো সব কালো, কালো চামড়ায় কারো কারো চোখ আর দাঁত ঝকঝকে শাদা দেখাচ্ছে, শুধু তাই থেকে আঁচ করা সম্ভব যে তাদের বয়স কম।

'মেয়েদের নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল! তোমরা এখানে ভিড় করছ কেন? তামাশা পেয়েছ না কি?' কলারটা জোরে টেনে মিখাইল দাদু রেগে বললেন। 'দয়া করে পথ ছেড়ে দাও ত! হায় ভগবান, এরা সবাই একেবারে ভেড়ার মত! বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে!'

আলেক্সেই'র কানে গেল মেয়েদের ভিড়ে কারা যেন বলছে:

'কী অসম্ভব রোগা! সত্যি সত্যি কংকালের মত দেখতে! নড়াচড়া করছে না একেবারে। বেঁচে আছে ত?'

'ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে... কী হয়েছে ওর? কী রোগা, কী অসম্ভব রোগা!'

তারপর বিস্ময়সূচক উক্তি সব থেমে গেল। অজানা কিন্তু ভয়াবহ কত অভিজ্ঞতা বৈমানিকটিকে নিশ্চয়ই ভুগতে হয়েছে, তার কথা ভেবে মেয়েরা বিশেষভাবে বিচলিত হল। বনের ধার দিয়ে শ্লেজটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পাতাল গ্রামটি কাছে এসে পড়েছে যখন তখন কোন খোঁদলে আলেক্সেইকে রাখা হবে সেই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হল।

'আমার খোঁদলটা খটখটে, বালিতে ভরা, বেশ হাওয়া আসে... তাছাড়া একটা চুল্লীও আছে,' ছোটখাটো, গোলমুখ একটি মেয়ে বলল, চোখদুটো চটুল, চোখের শাদা ভাগটা তরুণ নিগ্রোর চোখের মত চিকচিকে।

'চুল্লী ত আছে কিন্তু তোমরা কজন একসঙ্গে থাক, বলো ত! গন্ধে ভূত পালায়!.. মিখাইল, ওকে আমার ঘরে নিয়ে চলো। আমার তিনটি ছেলে সোভিয়েত ফৌজে, আর আমার কিছু ময়দাও আছে। ওকে চাপাটি বানিয়ে দেব!'

'না, না, ওকে আমার ঘরে রাখো! অনেক জায়গা আছে। আমরা মাত্র দুজন, অনেক জায়গা আছে। চাপাটিগুলো পাঠিয়ে দিও, যেখানে হোক খেলেই হল। কুসিউশা আর আমি ওকে দেখাশোনা করব, তুমি নিশ্চিত

থাকতে পার। আমাদের কিছু জমা নোনা মাছ আর ব্যাঙের ছাতা আছে... ওকে মাছ রান্না করে দেব আর ব্যাঙের ছাতার ঝোল...'

'ও ত মরতে বসেছে, মাছ খেয়ে কী লাভ হবে? ওকে আমাদের আস্তানায় রাখো, দাদু, আমাদের একটা গরু আছে, দুধ খেতে পারবে ও!'

কিন্তু মিখাইল শ্লেজ টেনে নিজের আস্তানায় নিয়ে গেল, পাতাল গ্রামটির মাঝামাঝি জায়গায় সেটা।

...আলেক্সেই'র মনে আছে মাটির নিচে ছোট, ময়লা একটি খোঁদলে তক্তার পাটাতনে সে শুয়েছিল, দেয়ালে-লাগানো ধোঁয়ায় মলিন কাঠির আগুন ফটফট করে জ্বলছে আর আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরিয়ে আসছে। তার আলোয় দেখা যাচ্ছে পোঁতা খুঁটিতে ভর দিয়ে বসানো জার্মান মাইনের বাক্স দিয়ে তৈরী একটা টেবিল, তার চারধারে কাঠের কুঁদো কয়েকটা টুলের কাজ দিচ্ছে; কালো রুমাল মাথায়, পরনে পুরোনো জামাকাপড়, পাতলা চেহারার একটি মেয়ে টেবিলের উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে — মেয়েটি হল ভারভারা, মিখাইল দাদুর কনিষ্ঠা পুত্রবধু – আর স্বয়ং দাদুটির পাতলা পক্ককেশ মাথা।

খড়ের ডোরা-কাটা তোষকে আলেক্সেই শুয়ে, ওর গায়ে তখনো তাপ্পি-মারা ভেড়ার চামড়ার কোটটা জড়ানো, তা থেকে টক টক, প্রীতিকর ঘরোয়া গন্ধ বেরোচ্ছে। আর যদিও সমস্ত শরীরে লাঠিপেটার মত ব্যথা, আর পাদুটো এমন জ্বলছে যেন গনগনে ইটের উপরে রাখা হয়েছে, তবুও এভাবে নড়াচড়া না করে শুয়ে থাকতে বেশ লাগছে; ও জানে ভয়ের আর কোন কারণ নেই, চলতে কি ভাবতে হবে না, হামেশা হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে না।

খোঁদলের কোণায় চুল্লী, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে ধূসর সজীব পাকে পাকে; আলেক্সেই'র মনে হল শুধু ধোঁয়া নয়, টেবিলটা, সব সময় কিছু না কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত মিখাইল দাদুর পাকা মাথাটি আর ভারভারার পাতলা শরীরও ভাসছে, দুলছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজল আলেক্সেই। চট-দেওয়া দরজা থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আসাতে জেগে উঠে আবার চোখ খুলল। টেবিলের কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। টেবিলে একটি ব্যাগ রেখে তার উপরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, যেন ভাবছে ওটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কিনা। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটি ভারভারাকে বলল:

'যুদ্ধের আগে থেকেই কিছু ফোরিনা আমার কাছে আছে। কসতিউন্‌কার জন্যে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু ওর ত আর কিছুরই দরকার নেই

এখন। এটা নাও, তোমার অতিথিকে রান্না করে দিও। বাচ্চাদের খাবার এটা, ঠিক এরকম জিনিস ওর এখন খাওয়া উচিত।'

ফিরে চলে গেল মেয়েটি, খোঁদলের সবাই ওর শোকে শোকার্ত। আর একজন কিছু জমা নোনা মাছ নিয়ে এল, আর কেউ আনল চুল্লীতে সেঁকা চাপাটি, সদ্য-সেঁকা রুটির উষ্ণ টক গন্ধে খোঁদল ভরে গেল।

সেরিওন্‌কা আর ফেদকা এল। চাষীসুলভ গাম্ভীর্যে ফৌজী টুপি সরিয়ে সেরিওন্‌কা বলল, 'সুপ্রভাত,' টেবিলে তামাকের গুঁড়ো আর ভূষি-লাগা চিনির দুটো ডেলা রাখল।

'চিনিটা মা পাঠিয়েছেন। আপনার পক্ষে চিনি ভালো, এটা খাবেন,' সেরিওন্‌কা বলল। তারপর মিখাইলের দিকে ঘুরে কাজের কথা বলার সুরে জানাল, 'সে-জায়গাটায় আবার গিয়েছিলাম। একটা লোহার ঘটি, প্রায় আস্ত দুটো শাবল, আর কুঠারের গোড়া একটা পেয়েছি। ওগুলো কাজে লাগতে পারে।'

ভাইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে ফেদকা লোভী দৃষ্টিতে চিনির দিকে তাকিয়ে আছে, বেশ শব্দ করেই জিভ চাটল সে, নাল গড়িয়ে পড়ছে।

পরে এসব কথা ভাবার সময় আলেক্সেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিল গ্রামে তার জন্য আনা টুকিটাকি জিনিসগুলোর মূল্য কতখানি, গ্রামের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী সেই শীতে অনাহারে মারা যায়, এমন কোন ঘর ছিল না যেটি একটি, এমন কি দুটি প্রিয়জনের জন্য শোকার্ত নয়।

'সত্যি, মেয়েদের মত লোক হয় না! কী বলছি শুনছ আলিওশা, আমি বলছি যে রুশী মেয়েদের তুলনা হয় না। ওদের হৃদয় নাড়া দিলেই সর্বস্ব দিয়ে দেবে, দরকার হলে জানও দেবে। আমাদের মেয়েরা এইরকম। ঠিক বলছি না?' মেয়েরা আলেক্সেইর জন্য জিনিস আনলে সেগুলো নিতে নিতে মিখাইল দাদু বলতেন, তারপর হাতের কাজে আবার মন দিতেন, কাজ সব সময় লেগে আছে — ঘোড়ার সাজ কিম্বা একজোড়া ক্ষয়ে-যাওয়া ফেল্টের জুতো সারাচ্ছেন। 'তাছাড়া কাজেও আমাদের মেয়েরা ছেলেদের সমান! সত্যি কথা বলতে ওরা দুএকটা জিনিসে তালিম দিতে পারে আমাদের! শুধু ওদের উগ্র বচন আমার ভালো লাগে না, ওরা আমাকে নাজেহাল করে ছাড়বে, এই মেয়েগুলো আমাকে নাজেহাল করে মারবে, সত্যি বলছি! যখন আমার আনিসিয়া মারা গেল তখন, আমি পাপী, মনে মনে ভাবলাম, "ভগবানকে ধন্যবাদ, একটু শান্তিতে থাকতে পারব এখন!"

কিন্তু জানো, সেটা ভাবার জন্য ভগবান আমাকে সাজা দিলেন। আমাদের সব মরদ, ফৌজে যাদের নেওয়া হয়নি, জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য পার্টিজানদের দলে গেল তারা, আর আমি কৃতকর্মের জন্য পড়ে রইলাম মেয়েদের পাণ্ডা হিসেবে, ভেড়ার দলে ছাগ-সর্দারের মত!.. আমার কপাল খারাপ, সত্যি বলছি!'

এই বনের বসতিতে অনেক কিছু দেখে আলেক্সেই অত্যন্ত অবাক হল। প্লাভনির অধিবাসীদের সবকিছু, বহু পুরুষের শ্রমে অর্জিত সবকিছু জার্মানরা কেড়ে নিয়েছে — বাড়িঘরদোর, জিনিসপত্র, চাষের সরঞ্জাম, গরুবাছুর, হাঁড়িকুঁড়ি, জামাকাপড়, আর এখন তারা বহুকষ্টে বনে সময় কাটাচ্ছে, ফ্যাশিস্টরা ওদের দেখে ফেলবে তার ভয় হামেশা রয়েছে। অনাহারে ওরা দিন কাটাচ্ছে, শীতে কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু যৌথখামার ভেঙ্গেচুরে যায়নি; বরঞ্চ যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা ওদের আরো সংহত করেছে। এমন কি খোঁদলগুলো পর্যন্ত ওরা যেমন-তেমন ভাবে করেনি, খামারের দল অনুযায়ী যৌথভাবে তৈরী করে সেগুলোতে প্রবেশ করে। জামাইকে জার্মানরা হত্যা করার পর যৌথখামারের সভাপতির কাজের ভার নেবার পর মিখাইল দাদু বনেও যৌথখামারের সমস্ত রীতিনীতি পুরোপুরি মেনে চলেন। এখন তাঁর পরিচালনায় আদিম অরণ্যের গভীরে এই গুহা-গ্রামের অধিবাসীরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে বসন্তের জন্য তৈরী হচ্ছে।

গ্রাম থেকে পালিয়ে আসার সময় যতটুকু শস্য বাঁচাতে পেরেছিল সবটুকু, খুদকুঁড়ো পর্যন্ত কিষাণীরা অনাহার সত্ত্বেও সাধারণ খোঁদলে জমা করে। জার্মানদের হাত থেকে কয়েকটি গরু বাঁচানো গিয়েছিল, তাদের বাছুর হলে অতি যত্নে তাদের রাখা হয়। উপবাস করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু যৌথ সম্পত্তি এই গরুবাছুরগুলোকে ওরা হত্যা করেনি। মৃত্যুর পরোয়া না করে ছেলেরা পুরোনো, ভস্মীভূত গ্রামে গিয়ে ছাই'এর গাদায় হাতড়ে খুঁজে আগুনের আঁচে নীল কয়েকটা লাঙলের ফলা পায়। পাতাল গ্রামে নিয়ে এসে যেগুলো ব্যবহারযোগ্য সেগুলোতে কাঠের বাঁট লাগিয়ে নেয়। বসন্তে গরু যুতে লাঙল দেবার জন্য মেয়েরা চট থেকে জোয়াল বানায়। পালা করে হ্রদে মেয়েরা মাছ ধরে, এইভাবে শীতকালে সারা গ্রামের আহার্য জোগাড় করে তারা।

মেয়েদের উদ্দেশ্যে মিখাইল দাদু গজগজ, গরগর করতেন; যৌথখামারের কোন বিষয় নিয়ে ওরা ওঁর খোঁদলে অনেকক্ষণ ধরে রেগেমেগে ঝগড়া করছে,

বিষয়টির তাৎপর্য কি সেটা আলেক্সেই'র অজানা; কানে আঙ্ল দিতেন মিখাইল দাদ্, ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করলে তীক্ষ্ন জিল গলায় চীৎকার করে মেয়েদের বকতেন বটে, কিন্তু ওদের গ্ণের তারিফ করতে ছাড়তেন না, নির্বাক শ্রোতাটির নিরীহতার স্যোগ নিয়ে "নারীজাতিকে" প্রশংসা করে আকাশে তুলতেন তিনি।

'কিন্তু ব্যাপারটি কী বলো ত, আলিওশা ভায়া,' বলতেন মিখাইল। 'মেয়েরা সব সময়ে যে-কোন জিনিস দ্টো হাত দিয়ে আঁকড়ে থাকে। ঠিক বলছি না? কেন ওরকম করে? কিপটে বলে? একেবারেই নয়। জিনিসটা তাদের দরকার বলে ওরকম করে। বাচ্চাদের ওরাই ত খাওয়ায়, যাই বলো না কেন, সংসার ত ওরাই চালায়। এখানে কী ঘটেছিল শোনো এবার। কেমন ভাবে আমরা থাকি দেখছ ত, প্রত্যেকটি খ্দ হিসেব করে চলি। আমরা না খেয়ে সময় কাটাচ্ছি, সত্যি কথা। ব্যাপারটা জান্য়ারী মাসে ঘটে। একদল পার্টিজান হঠাৎ হাজির। আমাদের গ্রামের লোক নয়, তারা ত ওলেনিনের কাছে কোথায় লড়ছে শ্নেছিলাম। এরা আমাদের অজানা, রেলওয়ে থেকে এসেছিল। হঠাৎ এসে পড়ে আমাদের বলে, "ক্ষিধেয় আমরা মরে যাচ্ছি।" কী হল বলো ত? পরের দিন মেয়েরা ওদের ঝোলা খাবারে বোঝাই করে দিল, যদিও নিজেদের বাচ্চারা না খেতে পেয়ে ফুলে উঠেছে, হাঁটবার ক্ষমতাও তাদের নেই। কী মনে হয়? ঠিক বলছি?.. মনে ত হয় ঠিক বলছি। যদি বড়ো গোছের জেনারেল হতাম, জার্মানদের ভাগিয়ে দেবার পর আমাদের সেরা সৈনিকদের জড়ো করে, সার বেঁধে মেয়েদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতাম ওদের সেলাম করে মার্চ করে যাও। ঠিক তাই করতাম!..'

ব্ড়োর বকবকানি ঘ্ম-পাড়ানো ছড়ার মত কাজ করত, তিনি কথা বলে চলেছেন, আলেক্সেই মাঝেমাঝে ঘ্মিয়ে নিত। মাঝেমাঝে অবশ্য ওর আগ্রহ হত পকেট থেকে চিঠিপত্তর আর মেয়েটির ছবি বের করে মিখাইলকে দেখায়, কিন্তু নড়বার শক্তি ছিল না ওর। কিন্তু মিখাইল দাদ্ মেয়েদের প্রশংসা শ্র্ করলে আলেক্সেই'র মনে হত টিউনিকের কাপড় ভেদ করে চিঠিগ্লোর উত্তাপ অন্ভব করতে পারছে।

টেবিলের ধারে বসে থাকত মিখাইল দাদ্র নির্বাক প্ত্রবধ্, সব সময়ে কিছ্ না কিছ্ সে করছে। প্রথম প্রথম ওকে ব্দ্ধা ভেবেছিল আলেক্সেই, দাদ্র স্ত্রী ব্ঝি, কিন্তু পরে দেখল যে ওর বয়স বিশ-বাইশের বেশী হতে পারে না। মেয়েটি লঘ্গতি, স্ঠাম স্ন্দর; আলেক্সেই লক্ষ্য করল যে যখনি

মেয়েটি তার দিকে তাকায় তখনি ভীত উৎকণ্ঠিত একটা দীর্ঘনিশ্বাসে ওর বুক কেঁপে ওঠে, ঢোক গেলার মত। রাত্রে মাঝেমাঝে, ঘাসের পলতেটা নিভে গিয়েছে, আর খোঁদলের ধোঁয়াটে অন্ধকারে ডাকছে ঝিঁঝিঁপোকাটা — ভস্মীভূত গ্রামে ওটাকে পেয়ে মিখাইল দাদু আস্তিনে করে নিয়ে আসেন, সঙ্গে আনেন কয়েকটা পোড়া বাসন যাতে জায়গাটা আপনার মনে হয় ওটার — তখন আলেক্সেই'র মনে হত অন্য কাঠের পাটাতনে কে যেন চাপা গলায় কাঁদছে আর বালিশ কামড়ে কান্নার শব্দ চাপার চেষ্টা করছে।

১৬

মিখাইল দাদুর ওখানে থাকার তৃতীয় দিন সকালে বৃদ্ধ বেশ জোর দিয়ে আলেক্সেইকে বললেন:

'উকুনে ভরে গিয়েছ তুমি, আলিওশা, সত্যি বলছি! গোবর-পোকার মত। আর গা চুলকানো ত তোমার পক্ষে মুশকিল। কী করব শোনো, তোমাকে স্নান করিয়ে দেব। কী বলো?.. ভাপে নাইয়ে দেব। তাহলে চমৎকার লাগবে। তোমাকে ধুয়ে হাড়গুলোতে একটু সেঁক দিতে হবে। যা ভোগান্তি তোমার গিয়েছে, স্নান করলে ভালোই হবে। কী বলো? ঠিক বলছি না?'

স্নানের বন্দোবস্ত করতে শুরু করলেন মিখাইল দাদু। কোণের চুল্লীর আগুন এত গনগনে করে তুললেন যে চুল্লীর পাথরগুলো চড়চড় করতে লাগল। খোঁদলের বাইরে বড়ো করে আগুন জ্বালানো হল, আলেক্সেই শুনল সেখানে একটা বড়ো গোছের পাথর গরম করা হচ্ছে। পুরোনো একটা কাঠের টব জলে ভর্তি করল ভারিয়া। মেঝেতে বিছোনো হল সোনালী খড়। তারপর মিখাইল দাদু খালি গায়ে, শুধু আণ্ডারউইয়ার পরে, কিছু ক্ষারের জিনিস একটা ছোট কাঠের বালতিতে তাড়াতাড়ি গুলে নিলেন, গাছের ভিতরের ছাল দিয়ে তৈরী তোষকের এক টুকরো কেটে স্নানের সাজ বানানো হল। খোঁদলটা এত তেতে উঠল যে ছাত থেকে টপটপ করে ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা পড়তে লাগল, তখন বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে লোহার পাতে করে গনগনে লাল পাথরটা নিয়ে এলেন। টবে ফেললেন পাথরটা। ছাত পর্যন্ত ঝট করে উঠল বাষ্পের পুঞ্জ, ছড়িয়ে পড়ল তার নিচে, তারপর

বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেড়ার কুণ্ডিত লোমের মত হয়ে গেল। কিছু দেখা যাচ্ছে না বাষ্পের কুয়াশায়, কিন্তু আলেক্সেই বুঝল যে সুদক্ষ হাতে বৃদ্ধ তার জামাকাপড় খুলে নিচ্ছেন।

শ্বশুরকে সাহায্য করছে ভারিয়া। এত গরম যে সে তুলো-ভরা কোট আর মাথার রুমাল খুলে ফেলল। ছেঁড়াখোঁড়া রুমালের নিচে যার অস্তিত্বের কথা প্রায় ভাবা যেত না সেই চুলের ভারী গোছা ছড়িয়ে পড়ল তার পিঠে: পাতলা চেহারা, লঘু পা, বড়ো বড়ো চোখ তার, হঠাৎ ধর্মভীরু একটি বৃদ্ধা থেকে যুবতীতে রূপান্তরিত হল ভারিয়া। এত অপ্রত্যাশিত এই রূপান্তর যে আলেক্সেই নিজের নগ্নতায় লজ্জিত বোধ করল, এতদিন সে ভালো করে ভারিয়াকে দেখেনি একবার।

'কিছু ভেবো না, আলিওশা! কিছু ভেবো না,' মিখাইল দাদু আশ্বাস দিয়ে বললেন। 'নিরুপায়, তোমার এ কাজটা করতেই হবে আমাদের! শুনেছি ফিনল্যাণ্ডে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে স্নান করে। কী? সত্যি নয় সেটা? হয়ত আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু ভারিয়া, এখন ত ও হাসপাতালের নার্সের মত একজন, আহতকে দেখাশোনা করছে, লজ্জা পাবার কিছু নেই। ওকে ধর ত ভারিয়া, সার্টটা খুলে নিই। হায় ভগবান, সার্টটা যে একেবারে পচে গিয়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে!'

তরুণীটির বড়ো কালো চোখে বিভীষিকার ছাপ আলেক্সেই দেখল। ভাপের নড়ন্ত পর্দা ভেদ করে নজরে পড়ল নিজের শরীর, তার বিপর্যয়ের পর এই প্রথম। সোনালী খড়ে শোয়া একটা মানুষ, চর্মসার কঙ্কাল, হাঁটুর গোছ বেরিয়ে আছে, সংকীর্ণ কুক্ষি, পেট একেবারে বসে গিয়েছে, পাঁজরার হাড় ফুটে উঠেছে।

বৃদ্ধ বালতিতে ক্ষারের জল ঘুলিয়ে, গাছের ছালের স্পঞ্জ পাঁশুটে তেলা জলে ডুবিয়ে আলেক্সেই'র শরীরের উপরে সেটা তুলে ধরলেন। উষ্ণ বাষ্পের মধ্যে চোখে পড়ল খড়ের উপরে শায়িত তার ক্ষীণদেহ, আর স্পঞ্জশুদ্ধ হাত আর নামাতে পারলেন না।

'হায় ভগবান,' তিনি বলে উঠলেন। 'তোমার দারুণ দুর্দশা দেখছি, আলিওশা! তোমার অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়! কী? জার্মানদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছ বটে, কিন্তু তুমি কি...' ভারিয়া পিছন থেকে আলেক্সেইকে ধরে রেখেছিল, হঠাৎ তার দিকে সক্রোধে ঘুরে বৃদ্ধ বললেন, 'উলঙ্গ একটা মানুষের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছো কেন, সরম নেই

নাকি! ঠোঁট কামড়াচ্ছ কেন? তোমরা মেয়েরা সবাই সমান! আর আলেক্সেই, কিছু ভেবো না তুমি, মাথা ঘামাবার কিছু নেই! যমকে কাছ ঘেঁষতেই দেব না আমরা, কিছুতেই দেব না! তোমাকে সারিয়ে তুলবই, একেবারে চাঙ্গা করে দেব, বিশ্বাস করো আমার কথা!'

সযত্নে, বেশ দক্ষভাবে, যেন শিশুকে স্নান করাচ্ছেন এমন ভাবে আলেক্সেইকে ক্ষারজল দিয়ে ধোয়ালেন তিনি, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে জল ঢেলে দিলেন, এত জোরে গা দলাই-মলাই করলেন যে খোঁচা খোঁচা পাঁজরার হাড়ের উপরে পিছলিয়ে হাতদুটো সত্যি সত্যি মড়মড় করে উঠল।

নিঃশব্দে ভারিয়া তাঁকে সাহায্য করে গেল।

ওকে বকবার কোন কারণ ছিল না বৃদ্ধের। হাতে ভর-দেওয়া অসহায়, ভয়াবহ জীর্ণ দেহটির দিকে তাকায়নি সে। চেষ্টা করছিল না তাকাতে, কিন্তু বাষ্পের মধ্য দিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখনি আলেক্সেই'র পা কিম্বা হাত চোখে পড়ছিল তখনি দৃষ্টিতে আসছিল বিভীষিকার আভাস। ভারিয়া কল্পনা করতে শুরু করল যে বৈমানিকটি হঠাৎ এসে-পড়া আগন্তুক নয়, ওর মিশা সে; ফ্যাশিস্ট পশুরা যাকে এই অবস্থায় পরিণত করেছে সে অপ্রত্যাশিত কোন অতিথি নয়, তার নিজের স্বামী সে, একটি বসন্ত যার সঙ্গে কাটিয়েছিল, চওড়া-পিঠ জোয়ান একজন, মুখে চকচকে ফুটফুট দাগ, এত পাতলা ভুরু যে মনে হত ভুরু নেই, হাতদুটো বিরাট আর বলিষ্ঠ। হাতে ধরে আছে নিজের মিশার মৃতপ্রায় দেহ, কল্পনা করল ভারিয়া। আর বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে, মাথা ঘুরতে লাগল, শুধু ঠোঁট কামড়ে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল।

...পরে পাতলা, ডোরা-কাটা তোষকে শোয়ানো হল আলেক্সেইকে, গায়ে দেওয়া হল মিখাইল দাদুর লম্বা, অনেক জোড়াতালি-দেওয়া কিন্তু পরিষ্কার আর নরম সার্ট একটা; সমস্ত শরীরে এল বেশ তাজা আর বলিষ্ঠ একটা অনুভূতি। স্নানের পর চুল্লীর উপরে ছাতের ফুটো দিয়ে বাষ্প সব বেরিয়ে গিয়েছে, ভারিয়া ওকে বিলবেরির গরম ধোঁয়াটে চা দিল। চিনির ছোট ছোট টুকরোর সঙ্গে আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে চা খেল আলেক্সেই, চিনির ডেলাদুটো ছেলেরা এনেছিল, ডেলাদুটো ভেঙ্গে বার্চের শাদা ছালের ফালিতে রেখে ভারিয়া ওকে দিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল আলেক্সেই, বিপর্যয়ের পর এই প্রথম নিটোল স্বপ্নহীন ঘুম।

উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তার শব্দে ওর ঘুম ভাঙ্গল। খোঁদলে প্রায় ঘুটঘুটে অন্ধকার, কাঠির আগুনটা কোনোক্রমে টিমটিম করে জ্বলছে। ধোঁয়াটে অন্ধকারে মিখাইল দাদুর তীক্ষ্ম ভাঙ্গা গলা শুনতে পেল আলেক্সেই:

'মেয়েলী বুদ্ধি আর কাকে বলে! তোমার কোন কান্ডজ্ঞান নেই! লোকটা এগারো দিন জোয়ারের বীচি পর্যন্ত মুখে দিতে পারেনি. আর তুমি ওগুলোকে সেদ্ধ করে শক্ত করে ফেলেছ... এই শক্ত সেদ্ধ ডিমগুলো খেলে আর ওকে বাঁচতে হবে না!'.. তারপর অনুনয়ের সুরে মিখাইল দাদু বললেন, 'ওর ডিমের দরকার এখন নেই। কীসে ওর ভালো হবে জানো. ভাসিলিসা? মুরগীর খাসা সুরুয়া! ব্যস, আর কিছু নয়! তাতে ও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। যদি "পার্টিজান্কা" কিছু আনতে পার -- বুঝলে...'

একটি বৃদ্ধার আতঙ্কিত খরখরে কণ্ঠস্বর মিখাইল দাদুকে বাধা দিল:

'পারব না আনতে! কিছুতেই আনব না! বুড়ো শয়তান কোথাকার, আমার কাছে চেয়ে কোন লাভ হবে না! "পার্টিজানকা"... মুরগীর সুরুয়া!.. দেখো দিকি, ওরা কত কিছু এরি মধ্যে এনেছে। একটা বিয়ের ভোজ ওতে চলে! এর পরে আর কি চাইবে তুমি শুনি।'

বৃদ্ধের ভাঙ্গা কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'এভাবে মেয়েলী কথা বলার জন্যে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, ভাসিলিসা। তোমার দুটো ছেলে রণাঙ্গনে লড়ছে, আর তুমি কিনা বোকার মত বকবক করছ! এই লোকটা, বলা যায়, আমাদের জন্যে নিজেকে পঙ্গু করেছে, নিজের রক্ত দিয়েছে...'

'ওর রক্ত চাই না আমি। আমার ছেলেরা আমার জন্যে নিজেদের রক্তপাত করছে। আমার কাছে চেয়ে কোন লাভ হবে না। বলেছি ত দেব না, ব্যস, দেব না আমি!'

দরজার কাছে দ্রুতবেগে চলে গেল প্রাচীনার ছায়া, দরজাটা খোলাতে বসন্তের আলোর রেখা খোঁদলে এক ঝলকে এল, এত উজ্জ্বল সে আলো যে চোখ একেবারে বুজে কাতরে উঠল আলেক্সেই। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি কাছে এলেন:

'তুমি জেগেছিলে না কি, আলিওশা? আমাদের কথাবার্তা কানে গিয়েছে? গিয়েছে বুঝি? কিন্তু ওকে খারাপ ভেবো না, আলিওশা, যা বলেছে তার জন্যে নিন্দে কোরো না। কথা ত শুধু খোসা, ওর শাঁসটা কিন্তু ভালো। মুরগী দিতে নারাজ মনে হচ্ছে? একেবারেই না, আলিওশা! জার্মানরা ওর পরিবারের সমস্ত লোককে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, আর পরিবারটা

নেহাৎ ছোট ছিল না, দশজন লোক ছিল। ওর সবচেয়ে বড়ো ছেলে কর্ণেল। জার্মানরা সেটা জানতে পেরে কর্ণেলের পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে গুলি করে মারে, শুধু ভাসিলিসাকে ছেড়ে দেয়। ওদের বাড়িঘরদোর পুড়িয়ে দেয়। আত্মীয় বলতে ওর কেউ নেই। বুঝতেই পারছ ওর মত বয়সে পরিবারবর্গহীন হয়ে থাকার মানে কী! থাকবার মধ্যে আছে একটা মুরগী। আর মুরগীটা বেশ সেয়ানা, সত্যি বলছি, আলিওশা! প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই জার্মানরা সবকটা মুরগী আর হাঁস সাবাড় করে দেয়। বেটারা মুরগী আর হাঁসের যম, সব সময় মুখে লেগে আছে — "মুরগী আর মুরগী"। কিন্তু এই মুরগীটা ওদের হাত এড়িয়ে যায়। যেমন-তেমন মুরগী নয়, সত্যি বলছি! সার্কাসের যুগ্যি ওটা। উঠোনে কোন ফ্যাশিস্ট এলে চিলেকুঠিতে চেপে চুপচাপ বসে থাকে, যেন কেউ নেই ওখানে। কিন্তু আমাদের লোক উঠোনে এলে মোটেই বিচলিত হয় না। ভগবান জানেন তফাৎটা কী করে বোঝে! আর তাই সারা গ্রামে এখন একটা মাত্র মুরগী রয়ে গিয়েছে। ওর সেয়ানা বুদ্ধির জন্যে আমরা ওকে পার্টিজান্‌কা নাম দিয়েছি।'

মেরেসিয়েভ চোখ খুলে ঝিমোচ্ছে; বনে থাকবার সময় ওটা ওর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। ওর স্তব্ধতায় মিখাইল দাদু নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। খোঁদলের এদিকে ওদিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে, টেবিলে কী একটা করতে করতে, যে কথাটি বলছিলেন সেটা আবার শুরু করলেন:

'বুড়ীটাকে খারাপ ভেবো না, আলিওশা! ওকে বুঝতে চেষ্টা করো, দোস্ত! আগে ও ছিল বিরাট বনে প্রাচীন বার্চগাছের মত, হাওয়ার উৎপাত সহ্য করতে হত না। আর এখন খোলা জায়গায় পচা গাছের গুঁড়ির মত ও, মুরগীটা একমাত্র সান্ত্বনা। কিছু বলছ না কেন? ঘুমিয়ে পড়েছ না কি? আচ্ছা, ঘুমোও, ঘুমোও।'

ঘুমিয়ে পড়লেও ঠিক ঘুমোয়নি আলেক্সেই। ভেড়ার চামড়ার কোটের নিচে শুয়ে আছে, তাতে রুটির টকটক গন্ধ, প্রাচীন কোন কৃষাণ বসতির গন্ধ; কানে আসছে ঝিঁঝিঁটার মিঠে ডাক, আঙুল নড়াতেও ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে শরীরে কোন হাড় নেই, গরম তুলোতে শরীরটা ভরা, আর তার মধ্যে ধুকধুক করে ধমনীতে রক্ত বয়ে চলেছে। ভাঙ্গা ফোলা পাদুটো দুর্বিষহ যন্ত্রণায় জ্বলছে, দপদপ করছে, কিন্তু পাশ ফিরে শোবার, এমন কি নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই।

আধো-বেহুঁশ সেই অবস্থায় চারিদিকের জীবন টুকরো টুকরো ভাবে তার

চেতনায় পেঁছচ্ছে, যেন আসল জীবন নয়, সিনেমার পর্দায় অস্থির প্রভায় দেখা অদ্ভুত বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলী।

বসন্ত এসেছে। ফেরারী গ্রামের আর কষ্টের সীমা নেই। মাটিতে যেসব খাবার-দাবার কোনক্রমে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, আর পরে ভস্মীভূত গ্রামে রাত্রে গিয়ে গোপনে যা উদ্ধার করে বনে আনা হয়, তা প্রায় শেষ হতে চলেছে। বরফ গলছে। তাড়াতাড়িতে তৈরী করা খোঁদলগুলো "কাঁদছে", দেয়াল আর ছাত থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। পাতাল গ্রামের পশ্চিমে, ওলেনিন অরণ্যে যারা পার্টিজান যুদ্ধ চালাচ্ছিল তারা আগে এক একজন করে রাত্রে আসত, কিন্তু এখন রণাঙ্গনের লাইনের ওপারে তারা রয়ে গেছে। তাদের কোন খবর আর আসে না। তাতে মেয়েদের দুর্ভোগ আরো বেড়েছে। আর বসন্ত এসে পড়েছে, বরফ গলছে, শস্য বোনার আর সব্জিক্ষেত তৈরী করবার কথা ত ভাবতে হবে।

মেয়েরা কাজ করে চলেছে, দুশ্চিন্তায় শ্রান্ত তারা, মেজাজ খিটখিটে। মিখাইল দাদুর খোঁদলে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি শুরু হত, চলত পরস্পরের প্রতি দোষারোপ, সে সময় মেয়েরা তাদের পুরোনো আর নতুন, বাস্তব আর কল্পিত, যত কিছু অভাব অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি দিত। মাঝেমাঝে হট্টগোল ছাড়া আর কিছু শোনা যেত না, কিন্তু নারীকণ্ঠের এই ক্রুদ্ধ সোরগোলের মধ্যে ধূর্ত বৃদ্ধটি যৌথখামারের ব্যাপার নিয়ে কোন কার্যকরী প্রস্তাব করলেই বাগবিতণ্ডা এক মুহূর্তে থেমে যেত — যেমন "পুরোনো গ্রামে গিয়ে বরফ গলে গিয়েছে কিনা সেটা দেখার সময় হয়নি কি?" কিম্বা "বেশ হাওয়া দিচ্ছে। বীজগুলোকে এখন বাইরে রাখা হয়ত উচিত। মাটির নিচে গোলাঘরের ভেজা জমিতে ওগুলো স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে।"

একদিন মিখাইল দাদু খোঁদলে ঢুকলেন, মুখে খুসির ছাপ, তবুও চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। হাতে ঘাসের সবুজ শীষ। জামড়ো-পড়া তেলোয় সেটা আস্তে রেখে আলেক্সেইকে দেখালেন তিনি। বললেন:

'দেখছ? খেত দেখে এইমাত্র এলাম। বরফ গলছে, আর ভগবানকে ধন্যবাদ, শীতের ফসল দেখা দিয়েছে। অনেক বরফ পড়েছিল এবার। বসন্তের ফসল না পেলেও শীতের ফসলে রুটি জুটবে আমাদের। মেয়েদের ডেকে আনি, শুনলে ওরা খুসি হবে, আহা বেচারারা!'

খোঁদলের বাইরে মেয়েরা এক ঝাঁক দাঁড়কাকের মত কিচির মিচির করছে;

মাঠ থেকে আনা ঘাসের সবুজ শীষটা নতুন আশা জুগিয়েছে ওদের। সন্ধ্যাবেলায় হাত ঘষতে ঘষতে মিখাইল দাদু এসে বললেন:

'আমার দীর্ঘকেশী মন্ত্রীরা কী ঠিক করেছে জানো, আলিওশা? সিদ্ধান্তটা খারাপ নয়, সত্যি বলছি। একটা দল নিচের জায়গায় জমির ফালিটা চাষ করবে, ওখানে চাষ করা শক্ত। গরুগুলোকে হালে জুতবে ওরা। অবশ্য গরুগুলোকে দিয়ে বিশেষ কিছু করা যাবে না, গোটা পালের মাত্র ছটা এখন রয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দলটা ওপরের জমিটার ভার নেবে, ওটা বেশী শুকনো। ওরা শাবল আর খন্তা দিয়ে কাজ চালাবে। সব্জিক্ষেত ত আমরা এইভাবে খুঁড়ি, তাই না? তৃতীয় দলটা যাবে উঁচু ক্ষেতে। ওখানকার জমি বালুতে ভরা; আলুর চাষ করা হবে ওখানে। সেটা করা শক্ত নয়, বাচ্চাদের আর কমজোরি মেয়েদের লাগিয়ে দেব। আর হয়ত সরকারের সাহায্য এসে পড়বে। সেটা না এলেও চালিয়ে নেব আমরা। নিজেরাই সব করব, জমির সিকিটুকু পড়ে থাকতে দেব না। ফ্যাশিস্টদের ঝাঁটা মেরে দূর করে দিয়েছিল যারা তাদের ধন্যবাদ; বেঁচে থাকতে এখন পারব। শক্তহাড় জাত আমরা, সবকিছু সইতে পারি, যতই কঠিন হোক না কেন!'

অনেকক্ষণ ঘুম এল না দাদুর। খড়ের বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করলেন তিনি, বেঁকে শুলেন, চুলকালেন নিজেকে আর গোঙালেন, "ভগবান, হে ভগবান!" কয়েকবার উঠে জলের বালতির হাতায় খটখট শব্দ করে, ঢকঢক করে বড়ো বড়ো ঢোকে আকণ্ঠ জল খেলেন, ক্লান্ত ঘোড়ার মত। শেষে আর থাকতে পারলেন না। উঠে কাঠির আগুনটা ধরিয়ে আলেক্সেই'র গায়ে হাত দিলেন, আলেক্সেই চোখ খুলে আধো-অচেতন অবস্থায় শুয়ে ছিল, বললেন তাকে:

'ঘুমিয়ে পড়েছ না কি, আলিওশা? আমি শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবছি, শুয়ে আছি আর ভাবছি! ওখানের পুরোনো গ্রামটার চকে একটা ওকগাছ এখনো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে... প্রায় তিরিশ বছর আগে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে, নিকলাস তখন সিংহাসনে, বাজ পড়ে ওটার মাথাটা পুড়ে যায়। কিন্তু গাছটা বেশ শক্ত ছিল, জোরালো শেকড় আর অনেক রস। ওপরে যাবার উপায় ছিল না রসের, তাই পাশ থেকে নতুন নতুন ছোট একটা পল্লব গজাল, কী সুন্দর সেটার কোঁকড়ানো নতুন মাথাটা, যদি দেখতে... আমাদের প্লাভনিও ঠিক সে রকম... যদি রোদ থাকে আর জমিতে ফসল ফলে, তাহলে আমাদের সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে পাঁচ বছরের মধ্যে সবকিছু আমরা

ঠিক করে ফেলব, ভাই আলিওশা। আমরা যে টি'কে থাকতে পারি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শুধু লড়াইটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়! ওদের ছারখার করে দিয়ে আবার কাজে লাগব, সবাই মিলে! কী মনে হয় তোমার?'

সে রাত্রে আলেক্সেই'র অবস্থা আরো খারাপ হল।

মিখাইল দাদুর স্নান করিয়ে দেওয়াটা ওর উপরে তেজী ওষুধের কাজ করে, জড়তার ঘোর কেটে গেল। অসীম অবসাদ, অমানুষিক ক্লান্তি আর পায়ের যন্ত্রণার বোধ এর আগে এত প্রখর কখনো হয়নি। জ্বরের ঘোরে বিছানায় গড়াচ্ছে সে, কাতরাচ্ছে, দাঁতে দাঁত ঘষছে, কাকে ডাকছে, কাউকে বা বকছে আর কিছু না কিছু দিতে বলছে।

সমস্ত রাত ওর সঙ্গে জেগে রইল ভারভারা, পা মুড়ে হাঁটুতে চিবুক রেখে, বিষণ্ণ বড়ো চোখ এক ভাবে সামনের দিকে মেলে। প্রায়ই আলেক্সেই'র মাথায় কিম্বা বুকে একটুকরো ঠাণ্ডা ভিজে ন্যাকড়া চাপা দিচ্ছে, অথবা ভেড়ার চামড়াটা ঠিক করে দিচ্ছে, চামড়াটা বারবার আলেক্সেই সরিয়ে দিচ্ছিল, আর সব সময়ে নিজের স্বামীর কথা ভাবছে, সে এখন বহুদূরে, যুদ্ধের হাওয়ায় তাকে এদিকে ওদিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

ভোরের প্রথম আলোয় বৃদ্ধ জেগে উঠে আলেক্সেই'র দিকে তাকালেন, ও তখন চুপচাপ ঝিমোচ্ছে। ভারিয়াকে চুপিচুপি কী একটা বলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। ফেল্ট বুট-পরা পাদুটো ঢোকালেন গালোশে, গাড়ির টায়ার থেকে যেটা বানিয়েছিলেন তিনি, কোটটা গাছের ছালের একটা ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন আর হাতে নিলেন জুনিপারের ছড়ি, ঘষেমেজে চকচকে করেছিলেন সেটাকে, দূর যাত্রার সময় ছড়িটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

আলেক্সেইকে একটি কথা না বলে রওনা হলেন মিখাইল দাদু।

১৭

মেরেসিয়েভের যা অবস্থা তাতে গৃহকর্তার যাওয়াটা চোখে পড়ল না। পরের সারাটা দিন তার চেতনা ছিল না, তৃতীয় দিনে যখন জ্ঞান হল সূর্য তখন অনেক উঁচুতে, আলোর ঝকঝকে বলিষ্ঠ একটা রেখা চুল্লীর ধূসর জমাট ধোঁয়া ভেদ করে সমস্ত খোঁদলে ছড়িয়ে পড়েছে, স্কাইলাইট থেকে আলেক্সেই'র পা পর্যন্ত, তাতে অন্ধকার ঘোচার চেয়ে ঘন হয়েছে বেশী।

খোঁদলে কেউ নেই। দরজা দিয়ে আসছে ভারিয়ার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলা।

বোঝা গেল কাজ করতে করতে এই বনের অঞ্চলে প্রিয় পুরোনো একটা গান গাইছে। নিঃসঙ্গ একটি অ্যাসগাছের গান, কিছু দূরে তারি মত নিঃসঙ্গ একটি ওকের কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ অ্যাসগাছটি।

এর আগে একাধিকবার গানটি শুনেছে আলেক্সেই; বিমান-ঘাঁটির জমি পিটিয়ে সমান আর সাফ করার জন্য আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা ফুর্তিতে উচ্ছল মেয়েদের দল গানটি গাইত, মন্থর বিষণ্ণ সুরটি ভালো লাগত আলেক্সেই'র। এর আগে কিন্তু কথাগুলোতে মন দেয়নি ও, সৈন্যবাহিনী জীবনের ব্যস্ততায় কথাগুলো মিলিয়ে যেত, মনে কোন ছাপ রাখেনি। কিন্তু এখন কথাগুলো আসছে অল্পবয়স্কা, বিশালাক্ষী, কোমল অনুভূতিতে ভরাট এই মেয়েটির মুখ থেকে, আর তাতে শুধু কাব্যিক নয়, নারীসুলভ আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার ছাপ এত স্পষ্ট যে সুরটির গভীরতা সম্পূর্ণভাবে আলেক্সেই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করল, বুঝতে পারল নিজের ওকের জন্য অ্যাসগাছের মত ভারিয়ার ব্যাকুলতা কতো তীব্র।

...নিঃসঙ্গ ওকের পাশে যাওয়া
অ্যাসগাছটির কপালে নেই।
বেচারীকে বুঝি চিরকাল
দুলতে হবে একা একা...

গাইল ভারিয়া, সত্যিকার চোখের জলের তিক্ত স্বাদ ওর গলায়। গান থেমে গেল, আলেক্সেই কল্পনা করল বসন্তের আলোয় প্লাবিত গাছগুলোর নিচে বসে আছে ও, ওর বড়ো বড়ো ব্যাকুল চোখ জলে ভরে গিয়েছে। নিজের গলা কেমন ধরে এল আলেক্সেই'র, অদম্য ইচ্ছে হল টিউনিকের পকেটের পুরোনো চিঠিগুলো দেখে, পড়বে না, দেখবে শুধু, চিঠিতে কী লেখা সেটা ত ওর মুখস্থ, দেখবে খোলা মাঠে বসা পাতলা মেয়েটির ফটো। টিউনিকে হাত দেবার চেষ্টা করাতে তোষকে অসহায়ভাবে হাতটা ঢলে পড়ল। আবার সবকিছু সেই রামধনু রঙের চাকা-কাটা ধূসর অন্ধকারে ভাসছে। পরে অন্ধকারে ধারালো অদ্ভুত নানা শব্দের খসখসানিতে দুজনের গলা আলেক্সেই'র কানে এল, ভারিয়ার আর একটি বৃদ্ধার পরিচিত গলা। চুপিচুপি কথা বলছে তারা:

'কিছু খায় না ও?'

'না, কিছু খেতে পারে না!.. কাল এক টুকরো চাপাটি চিবিয়েছিল,

ছোট্ট একটা টুকরো কিন্তু বমি হয়ে গেল। চাপাটি ওর খাওয়া উচিত নয়। অল্প দুধ খেতে পারে, তাই আমরা দিই।'

'শোনো, আমি কিছু সুরুয়া এনেছি। বেচারার হয়ত ভালো লাগবে।'

'ভাসিলিসা দিদিমা!' ভারিয়া বলে উঠল। 'সত্যি সত্যি আপনি ...'

'হ্যাঁ, মুরগীর সুরুয়া। তাতে অবাক হবার কী আছে? অসাধারণ কিছু নয় এটা। ওকে জাগিয়ে দাও, হয়ত অল্প খাবে।'

ওদের কথাবার্তা আলেক্সেই'র কানে গিয়েছে, কিন্তু ও চোখ খোলার আগেই ভারিয়া খুব জোরে, শিষ্টাচারের বালাই না রেখে, ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে বলল:

'আলেক্সেই পেত্রভিচ, আলেক্সেই পেত্রভিচ! উঠে পড়ুন!.. ভাসিলিসা দিদিমা আপনার জন্য কিছু মুরগীর সুরুয়া এনেছেন, উঠে পড়ুন বলছি!'

দরজার কাছের দেয়ালে ঘাসের পলতেটা চড়চড় করে সজোরে জ্বলে উঠল। ধোঁয়াটে কম্পমান আলোয় একটি ছোটখাটো বক্রদেহ বৃদ্ধাকে আলেক্সেই দেখল, নাক বাঁকা, কুঁদুলে মুখ বলিকুঞ্চিত। টেবিলে মোড়ক থেকে বড়ো কিছু একটা খুলতে ব্যস্ত বৃদ্ধাটি; প্রথমে একটুকরো চট সরাল, তারপর মেয়েদের পুরোনো একটা কোট, তারপর এক খণ্ড কাগজ, অবশেষে দেখা গেল লোহার ছোট একটি বাটি, মুরগীর ঘন সুরুয়ার গন্ধে খোঁদলটা গেল ভরে, গন্ধটা এত খাসা যে আলেক্সেই'র পেট মোচড় দিয়ে উঠল।

ভাসিলিসা দিদিমার কুঞ্চিত মুখ থেকে তখনো কঠোর রাগী ভাবটা মুছে যায়নি।

'দেখো, তোমার জন্যে এনেছি এটা,' বৃদ্ধা বলল। 'খেতে নারাজ হোয়ো না, যেন খেয়ে ভালো হয়ে ওঠ। এটা খেলে ভগবানের কৃপায় হয়ত তোমার ভালো হবে।'

আর আলেক্সেই'র মনে পড়ল বৃদ্ধাটির পরিবারের করুণ কাহিনী, পার্টিজান্‌কা নামের সেই মুরগীটির কথা, আর সবকিছু — বৃদ্ধাটি, ভারিয়া, টেবিলের উপরে রাখা খাসা গন্ধ ছড়ানো লোহার ধূমায়িত পাত্রটি — সবকিছু চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল, সেই ঝাপসা পর্দা ভেদ করে চোখে পড়ছে শুধু বৃদ্ধাটির কঠোর চোখজোড়া, অসীম করুণায় তার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

বৃদ্ধাটি চলে যাচ্ছে, 'ধন্যবাদ, দিদিমা,' এর বেশী আর কিছু বলতে পারল না আলেক্সেই।

দরজায় পৌঁছিয়ে বৃদ্ধা বলল.

'ধন্যবাদ আর দিও না! ধন্যবাদ দেবার কী আছে? আমার ছেলেরাও ত লড়াই করছে। ওদেরও হয়ত কেউ সুরুয়া দেবে। তুমি এটা খাও, তোমার ভালো হোক। সেরে ওঠ।'

'দিদিমা!' আলেক্সেই উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারিয়া বাধা দিয়ে আস্তে আস্তে ওকে বিছানায় ঠেলে শুইয়ে দিল।

'শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন ত! কিছুটা সুরুয়া খান!' জার্মান সৈনিকের এ্যালুমিনিয়ামের কৌটোর ঢাকনা ওকে দিল ভারিয়া, সুগন্ধি ভাপ থেকে মাথা ঘুরিয়ে নিল, চোখে জল এসে পড়েছে কখন, সেটা ঢাকবার জন্য 'কিছুটা খান!' বলল আবার।

'মিখাইল দাদু কোথায়?'

'তিনি বেরিয়ে গেছেন, কাজে গিয়েছেন। জেলা কমিটি কোথায় খোঁজ করতে গিয়েছেন। ফিরতে অনেক দিন লাগবে। কিন্তু সুরুয়াটা খান, খেয়ে নিন।'

মুখের কাছে আলেক্সেই দেখল কাঠের একটা চামচে, এত পুরোনো যে কালো হয়ে গিয়েছে, রজন রঙের সুরুয়াতে ভরা।

প্রথম কয়েক চামচ সুরুয়া পেটে যেতেই নেকড়ের মত ক্ষিধে পেল আলেক্সেই'র, এত ক্ষুধার্ত লাগল যে ব্যথায় পেট মোচড় দিয়ে উঠল; কিন্তু দশ চামচের বেশী সুরুয়া আর মুরগীর নরম শাদা মাংসের কয়েকটা ফেঁসো ছাড়া খেল না ও। যদিও পেট প্রবলভাবে আরো, আরো বেশী চাইছে, তবুও দৃঢ়ভাবে খাবারটা সরিয়ে রাখল আলেক্সেই, ও জানে যে ওর বর্তমান অবস্থায় আর এক চামচ খেলে বিষের মত হতে পারে।

দিদিমার সুরুয়া আশ্চর্য কাজ দিল। ঘুমিয়ে পড়ল আলেক্সেই, মূর্চ্ছার ঘোর সেটা নয়, সত্যিকারের নিটোল স্বাস্থ্যকর ঘুম। একেকবার জেগে উঠে অল্পকিছু খেয়ে আবার ঘুম, চুল্লীর ধোঁয়ায়, মেয়েদের কথাবার্তায় কিম্বা ভারিয়ার স্পর্শে সে-ঘুম ভাঙ্গল না; ভারিয়ার ভয় হচ্ছিল ও মরে গিয়েছে, তাই প্রায়ই ঝুঁকে পড়ে ওর বুকে হাত দিয়ে দেখছিল বেঁচে আছে কিনা।

বেঁচে আছে, সমানে, গভীরভাবে বুক ওঠাপড়া করছে। বাকি দিনটা আলেক্সেই ঘুমল, সারা রাতটাও, এমন ভাবে ঘুমিয়ে রইল যেন পৃথিবীর কোন কিছু ওকে জাগাতে পারবে না।



পরের দিন প্রত্যুষে বনের নানা শব্দের মত অস্পষ্টভাবে কানে এল দূরে, একটানা, ঘরঘর আওয়াজ। চমকে উঠে আলেক্সেই বালিশ থেকে মাথা তুলল, কান পেতে রইল।

অদম্য উদ্দাম আনন্দে ওর সমস্ত শরীর ভরে গেল। না নড়েচড়ে শুয়ে রইল ও, উত্তেজনায় চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। কানে আসছে চুল্লীর উপরে ঠাণ্ডা হয়ে আসা পাথরের জোরালো চড়চড় শব্দ, রাত্রির ডাকের পর ক্লান্ত ঝিঁঝিঁটার ক্ষীণ আওয়াজ, খোঁদলের উপরে দোদুল্যমান পাইন-গাছগুলোর প্রশান্ত সমান মর্মরধ্বনি, এমন কি বসন্তের গলন্ত বরফের বড়ো বড়ো ফোঁটা দরজার বাইরে টপটপ করে পড়ছে, তারো শব্দ। কিন্তু সমস্ত শব্দ ভেদ করে স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে সেই সমান ঘরঘর আওয়াজটা। আলেক্সেই আঁচ করল ওটা কোন "পলিকার্পভ-২" বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ। শব্দটা কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে, কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে না। নিশ্বাস চেপে রইল আলেক্সেই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বিমানটা কাছাকাছি কোথাও কোনো লক্ষ্য নিয়ে বনের উপরে চক্কর দিচ্ছে, কিম্বা নামার জায়গা খুঁজছে।

'ভারিয়া, ভারিয়া!' কনুই'এ ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে আলেক্সেই ডাকল।

কিন্তু ভারিয়া খোঁদলে নেই। বাইরে মেয়েদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আর দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। কিছু একটা ঘটছে ওখানে।

মুহূর্তের জন্য খোঁদলের দরজাটা খুলে গেল, দেখা গেল ফুটফুট দাগওয়ালা ফেদকার মুখ।

'ভারিয়া পিসী, ভারিয়া পিসী!' হাঁকল ফেদকা, তারপর উত্তেজিতভাবে বলল, 'বিমানটা, আমাদের বনের ওপরে চক্কর খাচ্ছে বিমানটা!' আর আলেক্সেই কিছু বলার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

চেষ্টা করে আলেক্সেই উঠে বসল। বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠল, রগ দপদপ করছে, আহত পাদুটোর ব্যথায় সমস্ত শরীর কাঁপছে। বিমানটি বৃত্তাকারে ঘুরছে ক'বার গুণল — এক, দুই, তিন — তারপর উত্তেজনায় বিবশ হয়ে বিছানায় পড়ে গেল, আবার সেই অদম্য, নিটোল স্বাস্থ্যকর ঘুমের ঘোর সত্বর আচ্ছন্ন করে দিল তাকে।

কার গমগমে ভারী তাজা কণ্ঠস্বরে আলেক্সেই'র ঘুম ভাঙল। দল বেঁধে অনেকে গান গাইলেও সে-গলা চিনতে পারত আলেক্সেই। জঙ্গী বিমানের

দলে মাত্র একজনের ওরকম গলা ছিল — সে হচ্ছে স্কোয়াড্রন কম্যান্ডার আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো।

চোখ খুলল আলেক্সেই কিন্তু মনে হল এখনো ঘুমিয়ে আছে। স্বপ্নে দেখছে বন্ধুটিকে, চওড়া, চোয়াল-উঁচু, কর্কশভাবে-গড়া সহৃদয় মুখ তার, কপালে কালশিটের দাগ, চোখদুটো হালকা রঙের, ভোমাও তেমনি হালকা, আন্দ্রেই'র শত্রুদের ভাষায়, "শুয়োরের ভোমার" মত বর্ণহীন। ধোঁয়াটে আধো-অন্ধকারে খোঁজার ভঙ্গীতে উঁকি দিচ্ছে একজোড়া হালকা-নীল চোখ।

'আচ্ছা দাদু, এবার তোমার যুদ্ধে-জেতা চিজটিকে দেখাও ত!' গমগম করে উঠল দেগতিয়ারেঙ্কোর গলা, উক্রেনীয় উচ্চারণের স্পষ্ট ছাপ তার কথায়।

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল না। লোকটি সত্যিই তাহলে দেগতিয়ারেঙ্কো, যদিও এই বনের গভীরে পাতাল গ্রামে সে হাজির হয়েছে সেটা বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব মনে হয়। ও দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, লম্বা-চওড়া লোক, টিউনিকের কলার যথারীতি খোলা। হাতে হেলমেট, তা থেকে রেডিওফোনের তারগুলো ঝুলছে, আর কয়েকটা মোড়ক আর পুঁটলি। কাঠির আগুনটা পিছনে জ্বলছে, ওর ছোট করে ছাঁটা খোঁচা খোঁচা সোনালী চুলে আলোর প্রভা।

দেগতিয়ারেঙ্কোর পিছন থেকে মিখাইল দাদুর পাণ্ডুর ক্লান্ত মুখ উঁকি মারছে, উত্তেজনায় ওঁর চোখদুটো বিস্ফারিত; তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তারণী। ওটি হল খাঁদা-নাক, বেহায়া লেনচ্কা, অত্যন্ত কৌতূহলে অন্ধকারে চেয়ে আছে সে। ওর বগলের নিচে রেডক্রসের ক্যাম্বিসের একটা থলে, কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার ফুল বুকে চেপে রয়েছে ও।

সবাই কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। বিব্রতভাবে দেগতিয়ারেঙ্কো চারিদিকে তাকাচ্ছে, অন্ধকারে কিছু দেখতে পারছে না বোঝা গেল। দুএকবার আলেক্সেই'র মুখে ওর দৃষ্টি অনবধানে পড়ল; আর আলেক্সেই'রও বিশ্বাস হচ্ছে না যে ওর বন্ধু হঠাৎ এখানে এসে পড়েছে, হয়ত শেষ পর্যন্ত সমস্তটা জ্বরবিকারের স্বপ্নে দাঁড়াবে এই ভয়ে সে কাঁপছে।

'এই ত উনি শুয়ে আছেন,' ভেড়ার চামড়াটা সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে ভারিয়া বলল।

আলেক্সেই'র মুখের দিকে আবার হতবুদ্ধিভাবে দেগতিয়ারেঙ্কো তাকাল।

'আন্দ্রেই!' কনুই'এ ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে করতে ক্ষীণকণ্ঠে আলেক্সেই ডাকল।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল আন্দ্রেই, ভয় পেয়েছে যে সেটা বোঝা গেল।

'আন্দ্রেই! আমাকে চিনতে পারছ না?' ক্ষীণকণ্ঠে বলল মেরেসিয়েভ, সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে মনে হল।

আর এক মুহূর্ত জীবন্ত কঙ্কালটির দিকে তাকিয়ে রইল আন্দ্রেই, কালো, প্রায় ঝলসানো চামড়ায় কঙ্কালটি ঢাকা, ওর বন্ধুর হাসিখুসি চেহারার তলাশ করার চেষ্টা করল আন্দ্রেই, আর শুধু বিশাল, প্রায় গোল চোখদুটোতে খোলাখুলি, বলিষ্ঠ সেই চেনা ছাপ দেখল যেটি বিশেষ করে মেরেসিয়েভের। মাটিতে পড়ে গেল আন্দ্রেই'র হেলমেট, মোড়ক আর পুঁটলিও, সেগুলো খুলে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল আপেল কমলালেবু আর বিস্কুট।

'লিওশ্‌কা! তুমি!' আবেগে ওর গলা ভেঙ্গে গেল, ওর দীর্ঘ বর্ণহীন ভোমা এল নেমে। 'লিওশ্‌কা, লিওশ্‌কা!' আবার ডাকল ও। বিছানা থেকে হালকাভাবে ক্ষীণ দেহটি তুলে নিল, যেন শিশুর দেহ, আর বুকে চেপে বারবার বলতে লাগল, 'লিওশ্‌কা, লিওশ্‌কা!'

হাতে এক মুহূর্ত আলেক্সেইকে রেখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে আন্দ্রেই, যেন নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছে যে ও সত্যিই তার সেই বন্ধুটি, তারপর আবার বুকে চেপে ধরল:

'হ্যাঁ, তুমিই! লিওশ্‌কা! লিওশ্‌কা বেটা!'

ওর বলিষ্ঠ, ভালুকের মত মুঠি থেকে আলেক্সেই'র ক্ষীণ দেহ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল ভারিয়া আর ডাক্তারণী।

'ভগবানের দোহাই, ওঁকে ছেড়ে দিন, ওঁর দেহে বলতে গেলে প্রাণ নেই!' ক্রুদ্ধভাবে ভারিয়া বলল।

'কোন উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ভালো নয়! শুইয়ে দিন ওঁকে!' ডাক্তারণী তাড়াতাড়ি বলল।

এতক্ষণে আন্দ্রেই'র বিশ্বাস হয়েছে যে এই কালো, শুকিয়ে-যাওয়া, পালকের মত হালকা শরীরটা সত্যি সত্যি ওর সহচর, ওর বন্ধু, আলেক্সেই মেরেসিয়েভের, যার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল; আলেক্সেইকে শুইয়ে দিয়ে, নিজের মাথা আঁকড়ে, দুর্বার বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আন্দ্রেই,

তারপর আলেক্সেই'র কাঁধদুটো চেপে ধরে ওর কোটরগ্রস্ত, আনন্দোজ্জ্বল চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'বেঁচে আছে! কুমারী মেরি! বেঁচে আছে! গোল্লায় যাও তুমি, এতদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে? কী হয়েছিল?'

ডাক্তারণীটি বেঁটেখাটো, গোলগাল, নাক খাঁদা, ওর লেফ্‌টেনাণ্ট পদ অগ্রাহ্য করে বিমানদলের সবাই ওকে হয় লেনচ্‌কা নয় "চিকিৎসাশাস্ত্র পরিষেবিকা" বলে ডাকত, কেননা ওই নামেই উপরওয়ালার কাছে, পরে কী ঘটবে না ভেবে, নিজের পরিচয় ও দিয়েছিল; হামেশাই হাস্যমুখর আর সঙ্গীতপ্রিয় লেনচ্‌কা সবকটি লেফ্‌টেনাণ্টের সঙ্গে একই সময়ে প্রেমে পড়ত। কিন্তু এবারে সেই লেনচ্‌কাই দৃঢ়ভাবে উত্তেজিত আন্দ্রেইকে বিছানার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে কঠোরস্বরে বলল:

'কমরেড ক্যাপ্টেন! রোগীর কাছ থেকে সরে আসুন!'

আগের দিন যে ফুলগুলোর জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রে লেনচ্‌কা গিয়েছিল বিমানে এখন কোন কাজে লাগল না সেগুলো, ফুলের গোছাটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে, রেডক্রসের ক্যাম্বিসের থলে খুলে কাজের লোকের মত রোগীকে পরীক্ষা করতে শুরু করল। খাটো আঙুলে দক্ষভাবে পাদুটোতে টোকা মেরে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেইকে:

'লাগছে? এখানে? আর এখানটায়?'

এই প্রথম ভালো করে নিজের পাদুটো দেখল আলেক্সেই। সাংঘাতিক ফুলে গিয়েছে পায়ের পাতাদুটোই, প্রায় কালো দেখাচ্ছে। একটু ছুঁলেই সমস্ত শরীর ব্যথিয়ে ওঠে। বিজলীতে হাত লাগলে যেমন হয়। আঙুলের ডগাগুলোর চেহারা দেখে লেনচ্‌কা সবচেয়ে চিন্তিত হল। একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে সেগুলো, বোধশক্তি আর নেই।

টেবিলের পাশে রইলেন মিখাইল দাদু আর দেগতিয়ারেঙ্কো। এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করার জন্য বৈমানিকের বোতলটিতে চুপিচুপি এক চুমুক দেবার পর উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা চলল। ভাঙ্গা খনখনে বুড়োটে গলায় মিখাইল দাদু বলতে শুরু করলেন স্পষ্টতই প্রথম বার নয় কী করে আলেক্সেইকে পাওয়া যায়।

'বনের ফাঁকা জায়গাটাতে ছোকরারা ওকে দেখে। নিজেদের ডাগ-আউটের জন্যে জার্মানরা গাছ কেটেছিল ওখানে, আর ছোকরাদুটোর মা, মানে আমার মেয়ে, কাঠের জন্যে ওদের ওখানে পাঠিয়েছিল। তাইতে ওকে দেখতে পায়!

"ওখানে অদ্ভুত গোছের ওটা কী?" প্রথম ওরা ভাবল কোন ভালুক চোট খেয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর চম্পট দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহলের বশে ওরা গেল ফিরে। "কী রকম ভালুক ওটা? গড়াগড়ি দিচ্ছে কেন? ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে!" ওরা ফিরে গিয়ে দেখল ও গড়াচ্ছে আর গোঙাচ্ছে...'

'গড়াচ্ছিল, তার মানে কী?' দাদুকে সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিয়ে দেগতিয়ারেঙ্কো খটকার সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ধূমপান করেন?'

কেস থেকে একটা সিগারেট নিলেন দাদু, পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা কাগজের টুকরো বের করে এক ফালি ছিঁড়ে ফেলে সিগারেটের তামাক তাতে ঢেলে, জড়িয়ে ধরালেন সেটা, খুব আমেজে টান দিলেন।

'ধূমপান? নিশ্চয়ই,' আর একটা টান দিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু জার্মানরা আসার পর তামাকের নামগন্ধ পাইনি। শেওলা আর স্পাঞ্জের শুকনো পাতা টানি!.. আর কী করে ও গড়াচ্ছিল, সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করো। আমি ত দেখিনি। ছোকরারা বলল চিৎ-উপুড়, উপুড়-চিৎ হয়ে ও গড়াচ্ছিল। হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতা ওর ছিল না, বুঝলে না! এই ধরনের লোক ও!'

প্রায়ই তড়াক করে উঠে দেগতিয়ারেঙ্কো বন্ধুর দিকে তাকাচ্ছে, ডাক্তারণীর আনা ছাই রঙের ফৌজী কম্বলে মেয়েরা ওকে তখন জড়াচ্ছিল।

'স্থির হয়ে বোসো, বাপু, স্থির হয়ে বসে থাকো। কাপড়-চোপড় পরানো বেটাছেলের কাজ নয়,' বললেন দাদু। 'কী বলছি শোনো। আর কথাটা তোমাদের উপরওয়ালাদের বলতে ভুলো না খুব বড়ো কাজ করেছে আলেক্সেই! ওর এখনকার অবস্থাটা দেখছই ত। আমরা সবাই, যৌথখামারের সবাই এক হপ্তা ধরে ওকে দেখাশোনা করেছি, কিন্তু তবুও নড়াচড়া করতে পারছে না ও। কিন্তু বন আর জলায় হামাগুড়ি দিয়ে আসার শক্তি ও ধরেছিল। খুব বেশী লোকে সেটা পারে না! এমন কি আমাদের পুণ্যাত্মা ঋষিরা পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের সময়ে এরকম কিছু করেননি। খুঁটির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকাটা এমন কী আর? ঠিক বলছি না? মনে হচ্ছে ঠিক বলছি। কিন্তু শোনো, বাছা, শোনো!..'

দেগতিয়ারেঙ্কোর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ, ওঁর নরম, পেঁজা তুলোর মত দাড়ির সুড়সুড়ি দিয়ে দেগতিয়ারেঙ্কোকে প্রায় ফিসফিস করে বললেন:

'আমার মনে হয় ও বাঁচবে না। তোমার কী মনে হয়? জার্মানদের এড়াতে পেরেছে ও, কিন্তু যমের হাত থেকে কী রেহাই পাবে? একেবারে হাড্ডিসার, কী করে হামাগুড়ি দিয়েছিল ভাবতেই পারি না। নিজের লোকেদের কাছে আসার ইচ্ছেটা খুব প্রবল হয়েছিল, কী বলো? যতক্ষণ অজ্ঞান ছিল ততক্ষণ শুধু বলেছে, "বিমান-ঘাঁটি, বিমান-ঘাঁটি।" আরো অন্য সব কথা, তাছাড়া ওলগার নাম করেছে। ও নামের কোন মেয়ে তোমাদের ওখানে আছে না কি? হয়ত ওর বউ। শুনছ, কী বলছি শুনছ? ওহে বৈমানিক!'

কিন্তু দেগতিয়ারেঙ্কো ওঁর কথা শুনছিল না। এই মানুষটি, ওর দোস্ত যে, যাকে মনে হত নেহাৎ সাধারণ লোক, ভাঙ্গা, হয়ত জমে-যাওয়া অসাড় পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে গলন্ত বরফের উপর দিয়ে, বন আর জলা ভেদ করে হামাগুড়ি দিচ্ছে, গড়িয়ে এগোচ্ছে, শত্রুকে এড়িয়ে যাবার জন্য, স্বজনের কাছে আসার জন্য, সে-ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে দেগতিয়ারেঙ্কো। জঙ্গী বিমান চালিয়ে বিপদ সম্বন্ধে তার খেয়াল আর নেই। লড়াই'এ যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন মৃত্যুর কথা মনে হয় না দেগতিয়ারেঙ্কোর, বরঞ্চ আনন্দের রোমাঞ্চ বোধ করে। কিন্তু বনে একেবারে একা কোন মানুষে যে এমন করতে পারে...

'কখন ওকে দেখতে পায়?'

'কখন?' বৃদ্ধ ঠোঁট নাড়ালেন, খোলা কেস থেকে আর একটা সিগারেট নিলেন। 'কখন, ঠিক কখন? তাই ত, ঠিক এক হপ্তা আগে।'

তারিখগুলোর কথা তাড়াতাড়ি ভেবে দেগতিয়ারেঙ্কো হিসেব করল যে মেরেসিয়েভ আঠারো দিন হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরেছে। একে আহত, তার উপর বিনা আহারে এতদিন হামাগুড়ি দেওয়াটা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, দাদু!' বৃদ্ধকে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন করে বুকে চেপে ধরে বৈমানিক বলল। 'ধন্যবাদ আপনাকে, দোস্ত!'

'ধন্যবাদ আর দিও না। ধন্যবাদ দেবার কী আছে? আমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ, আমি কী? আমি কি কোন আগন্তুক না বিদেশী?' পুত্রবধূ হাতে চিবুক রেখে অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে কী ভাবছিল, ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে তাকে বৃদ্ধ বললেন, 'খাবারগুলো মেঝে থেকে কুড়িয়ে নাও না! দামী জিনিসগুলো ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে, ভাবো ত একবার! আবার বলছে "ধন্যবাদ!"'

ইতিমধ্যে মেরেসিয়েভকে যাত্রার জন্য ঠিকঠাক করে ফেলেছে লেনচ্‌কা।

'সব ঠিক, সব ঠিক, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' তড়বড় করে বলল লেনচ্‌কা, কথাগুলো থলে থেকে পড়ন্ত মটরের মত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছে। 'মস্কোতে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আপনাকে ওরা সারিয়ে দেবে। মস্কো বিরাট সহর, নয় কি? আপনার চেয়ে খারাপ কেস ওখানে সারিয়ে দেয়!'

ওর অতি-উৎসাহ, আর মেরেসিয়েভ একনিমেষে সেরে উঠবে সেটা বারবার বলার ধরন থেকে দেগতিয়ারেঙ্কো আঁচ করল রোগী দেখার পর লেনচ্‌কা বুঝতে পেরেছে যে খারাপ কেস এটা, মেরেসিয়েভের অবস্থা সঙ্কটজনক। "হাঁড়িচাঁচার মত কিচির মিচির করছে," গরগর করে নিজেকে বলল দেগতিয়ারেঙ্কো, "চিকিৎসাশাস্ত্র পরিষেবিকাটির" দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাল। হঠাৎ ওর মনে হল বিমানদলের কেউ লেনচ্‌কাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না, ঠাট্টা করে সবাই বলে যে একমাত্র জিনিস যেটা ও সারাতে পারে সেটা হল প্রেম — কথাটা ভেবে দেগতিয়ারেঙ্কো কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করল।

কম্বলে জড়ানো হয়েছে আলেক্সেইকে। শুধু মাথাটা দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ইতিহাসের বইতে স্কুলে-দেখা ফারাও'র মামির কথা দেগতিয়ারেঙ্কোর মনে পড়ল। বন্ধুর গালে চওড়া হাতটা একবার বোলাল, খোঁচা খোঁচা শক্ত লাল দাড়িতে সেটা ভরা।

'সব ঠিক, লিওশকা! সেরে উঠবে ঠিক! মস্কোতে তোমাকে আজই ভালো হাসপাতালে পাঠাবার আদেশ এসেছে, সেখানে সবাই নামকরা চিকিৎসক! আর নার্সের কথা ছেড়ে দাও,' একবার চুকচুক শব্দ করে, লেনচ্‌কার দিকে চোখ ঠেরে দেগতিয়ারেঙ্কো বলল, 'ওদের সেবায় মড়ারা পর্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে। তুমি আর আমি আবার আকাশে উড়ব!' হঠাৎ ও বুঝতে পারল ঠিক লেনচ্‌কার মত জোর-করা, প্রাণহীন আমোদের সুরে কথা বলছে। বন্ধুর গালে টোকা দিতে দিতে হঠাৎ হাতের তলাটা ভিজে লাগল। 'স্ট্রেচারটা কোথায়?' চটে উঠে জানতে চাইল দেগতিয়ারেঙ্কো। 'ওকে নিয়ে যাওয়া যাক এবার! মিছিমিছি সময় নষ্ট করে কী হবে?'

কম্বলে-জড়ানো আলেক্সেইকে ওরা আস্তে আস্তে স্ট্রেচারে শোয়াল, বৃদ্ধ সাহায্য করলেন। আলেক্সেই'র জিনিসপত্র জড়ো করে একটা পোঁটলায় বাঁধল ভারিয়া।

ঝঞ্ঝা বাহিনীর ছোরাটা পোঁটলাতে ঢোকাচ্ছে ভারিয়া, তাকে থামিয়ে আলেক্সেই বলল, 'দাদু! এটা আপনি রাখুন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।' মিতব্যয়ী

মিখাইল দাদু প্রায়ই সকৌতূহলে ছোরাটা দেখতেন, সেটাকে পরিষ্কার আর ধারালো করে বুড়ো-আঙুলের উপরে রেখে পরখ করতেন।

'ধন্যবাদ, আলিওশা, ধন্যবাদ! খাসা ইস্পাতের জিনিস এটা। আর দেখো, এটার ওপরে কী একটা লেখা আছে, বিদেশী ভাষায়,' দেগতিয়ারেঙ্কোকে ছোরাটা দেখাতে দেখাতে বৃদ্ধ বললেন।

দেগতিয়ারেঙ্কো লেখাটা পড়ে অনুবাদ করে দিল:

'Alles für Deutschland — সবকিছু জার্মানির জন্য।'

'সবকিছু জার্মানির জন্য,' পুনরুক্তি করল আলেক্সেই, কী করে ছোরাটা পেয়েছিল সেটা মনে করে।

'আচ্ছা, এবার ওকে তুলুন ত,' স্ট্রেচারের একটা দিক ধরে দেগতিয়ারেঙ্কো তাড়া দিল।

দোলন্ত স্ট্রেচারটা খোঁদলের অপরিসর দরজা দিয়ে কষ্টে বের করা হল। ধাক্কা লেগে দেয়ালের মাটি খসে পড়ল।

খোঁদলে ভিড়-করে-দাঁড়ানো সবাই ছুটে বেরিয়ে এল কুড়িয়ে-পাওয়া লোকটিকে বিদায় জানাবার জন্য। শুধু ভারিয়া রয়ে গেল। তাড়াহুড়ো না করে ঘাসের পলতেটা সে ঠিক করল, তারপর ডোরা-কাটা গদিটার কাছে গেল, সেখানে এতদিন শোয়া মানুষটির ছাপ এখনো আছে, গদিটাতে হাত দিল ভারিয়া। তাড়াহুড়োয় ফুলের গোছাটার কথা কারো মনে ছিল না, সেটা নজরে পড়ল ভারিয়ার। কাঁচের ঘর থেকে আনা কয়েকটা লাইলাক, রং-ঝরা, শুকনো, এই ফেরারী গ্রামটির অধিবাসীদের মত, যারা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে খোঁদলে শীতটা কাটিয়েছে। ফুলগুলো তুলে নিল মেয়েটি, ঘ্রাণ করল বসন্তের নরম আভাস, এত ক্ষীণ সে-গন্ধ যে ধোঁয়া আর ঝুলের মধ্যে প্রায় পাওয়া যায় না, তারপর কাঠের পাটাতনে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিক্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ভারিয়া।

১৮

অপ্রত্যাশিত অতিথিকে বিদায় জানাবার জন্য প্লাভনি গ্রামে উপস্থিত সবাই বেরিয়ে এল। বনের পিছনে একটি লম্বাগোছের ছোট হ্রদে বিমানটি নেমেছিল, ধারে ধারে বরফ গলতে শুরু করলেও এখনো জমাট আর শক্ত হ্রদটি। ওখানে যাবার কোন রাস্তা নেই। পায়ে চলা একটা পথ আছে, এক ঘণ্টা আগে পায়ের চাপে বসে-যাওয়া নরম বরফের উপর দিয়ে এসেছিলেন

মিখাইল দাদু, দেগাতিয়ারেঙ্কো আর লেনচ্‌কা। পথ ধরে ভিড় করে হ্রদের দিকে লোকেরা যাচ্ছে, গ্রামের ছেলেরা সামনে, ধীরস্থির সেরিওন্‌কা আর ফেদকা একেবারে আগে আগে, উৎসাহে টগবগ করছে ফেদকা। বৈমানিককে বনে প্রথম দেখেছিল সেরিওন্‌কা, ওর পুরোনো দোস্ত সে, সেই অধিকারে স্ট্রেচারের সামনে গম্ভীরভাবে যাচ্ছে সেরিওন্‌কা, ওর মরা বাপের বিরাট ফেল্টবুট পরা পা অনেক কষ্টে বরফ থেকে টেনে তুলছে, আর শাদা দাঁত, ক্লিষ্টমুখ, ছেঁড়াখোঁড়া নানা অদ্ভুত জামাকাপড়-পরা অন্যান্য ছেলেদের কঠোরভাবে ধমকাচ্ছে। দেগাতিয়ারেঙ্কো আর মিখাইল দাদু স্ট্রেচারটা পা মিলিয়ে বহন করছেন, পাশে নরম পলকা বরফের উপরে হাঁটতে হাঁটতে লেনচ্‌কা কখনো আলেক্সেই'র কম্বল ঠিক করে দিচ্ছে কখনো বা নিজের রুমাল ওর মাথায় জড়িয়ে দিচ্ছে। ওর পিছনে বকবক করতে করতে আসছে প্রবীণা, নবীনা আর বুড়োরা।

প্রথম প্রথম বরফে ঠিকরনো উজ্জ্বল আলোয় চোখ ঝলসে গেল আলেক্সেই'র। বসন্তের সুন্দর দিনটি এত জোরে চোখে লাগছে যে চোখ বন্ধ করতে হল ওকে, প্রায় বেহুঁশ হয়ে গেল। চোখের পাতা অল্প খুলে আলোটা সইয়ে নিয়ে চারিদিকে তাকাল সে। পাতাল গ্রামটির ছবি চোখের সামনে এল ভেসে।

যেদিকে তাকাও না কেন, পুরোনো বনটি পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে। গাছের মাথাগুলো প্রায় এক জোট, নিচেটা তাই আধো-অন্ধকারে ভরা। নানা রকমের গাছ বনটিতে। বার্চগুলো এখনো পত্রহীন, চুড়োগুলো হাওয়ায় জমে-যাওয়া ধোঁয়ার মত দেখাচ্ছে, শাদা গুঁড়িগুলো পাইনগাছের সোনালী গুঁড়িগুলোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, আর তাদের মধ্যে এখানে সেখানে ফারগাছের ধারালো কালো মাথা দেখা যাচ্ছে।

গাছের নিচে একটা জায়গায় বরফ বহু লোকের পায়ে অনেক দিন দলিত, সেখানে খোঁদলগুলো, গাছের আড়ালে বলে উপর কিম্বা নিচ থেকে শত্রুদের চোখে পড়ে না। বহু প্রাচীন ফারগাছের শাখায় শাখায় বাচ্চাদের জামাকাপড় শুকোচ্ছে, আলো হাওয়া লাগাবার জন্য হাঁড়িকুঁড়ি বসানো পাইনের ডালপালায়, একটা পুরোনো ফারগাছের গুঁড়ি থেকে ঝুলছে শেওলার সরু সরু ফালি আর তার মোটা শেকড়ের মাঝখানেতে পেন্সিল দিয়ে আঁকা সরল, চেপটা মুখ একটা চটচটে ন্যাকড়ার পুতুল পড়ে আছে; সেখানটায় কোন হিংস্র জানোয়ার শুয়ে থাকলেই স্বাভাবিক লাগত।

স্ট্রেচারটি চলেছে আগে আগে, আর দলিত শেওলার আস্তরণে ঢাকা "রাস্তা" ধরে পিছু পিছু ভিড় করে আসছে লোকেরা।

খোলা হাওয়ায় এসে প্রথমে সহজাত বন্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে আলেক্সেই ভরে গেল, কিন্তু তারপরে এল মধুর নিঃশব্দ বিষণ্ণতার অনুভূতি।

ছোট একটা পকেট-রুমালে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল লেনচ্‌কা, চোখের জলের কারণ নিজের মত করে বুঝে স্ট্রেচার-বাহকদের আরো আস্তে আস্তে যেতে বলল।

'না, না, আরো জোরে, আরো জোরে চলুন!' তাগাদা দিয়ে মেরেসিয়েভ বলল।

ওর মনে হচ্ছিল ওরা ভয়ানক ধীরেসুস্থে চলেছে। ভয় করছে যে এখান থেকে চলে যেতে পারবে না ও, মস্কো থেকে আসা বিমানটি তার জন্য অপেক্ষা না করেই চলে যাবে, ক্লিনিকে পেঁছতে ও আর পারবে না। স্ট্রেচার-বাহকেরা কদম বাড়িয়ে দেওয়াতে কষ্ট হচ্ছে, আস্তে আস্তে গোঙাচ্ছে ও, কিন্তু তবু বারবার বলতে লাগল, "তাড়াতাড়ি, দয়া করে, আরো তাড়াতাড়ি চলুন!" মিখাইল দাদু হাঁপাচ্ছেন শুনল, দেখল যে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন তিনি, তবু আরো তাড়াতাড়ি যেতে ওদের বলল। বৃদ্ধের জায়গায় স্ট্রেচারে দুজন স্ত্রীলোক হাত লাগাল; লেনচ্‌কার উল্টোদিকে স্ট্রেচারের পাশাপাশি বৃদ্ধ চললেন কষ্ট করে। নিজের ফৌজী টুপিতে ঘর্মাক্ত টেকো মাথা, লাল-হয়ে-ওঠা মুখ আর কুঞ্চিত ঘাড় মুছতে মুছতে প্রশান্তভাবে বিড়বিড় করে বৃদ্ধ বললেন:

'আমাদের ছোটাচ্ছ, বুঝি! খুব তাড়া দেখছি!.. ঠিক করেছ, আলিওশা, একদম ঠিক করছ, খুব তাড়া দাও ওদের! মানুষের তাড়া থাকলে বোঝা যায় শরীরে প্রাণ আছে, বেশ জোরে ধকধক করছে সেটা। ঠিক বলছি না, কুড়িয়ে পাওয়া আমাদের পেয়ারের ছেলে?.. হাসপাতাল থেকে চিঠি দিও আমাদের। ঠিকানাটা মনে রেখো: কালিনিন অঞ্চল, বলগয়ে জেলা, ভাবী প্লাভনি গ্রাম। কী? ভাবী গ্রাম বলছি। ভাববার কিছু নেই, চিঠিটা ঠিক পেঁছবে। ভুলো না যেন। ঠিকানায় কোনো গড়বড় নেই!'

স্ট্রেচারটি যখন বিমানে তোলা হল আর বিমান পেট্রলের ঝাঁঝালো গন্ধ ঝট করে নাকে এল, তখন আবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল আলেক্সেই। সেলুলয়েডের ঢাকনাটা মাথার উপর দেওয়া হয়েছে। ওকে বিদায় জানাতে এসে যারা হাত নাড়ছে তাদের আর দেখা যাচ্ছে না; ছাই রঙের রুমাল মাথায় রুষ্ট দাঁড়কাকের মত চেহারা ছোটখাটো সেই বক্রনাসা বৃদ্ধাটি বিমানের

প্রপেলারের ঝাপটা হাওয়া আর ভয় কাটিয়ে দেগতিয়ারেঙ্কোর কাছে ঠেলে এসে মুরগীর বাকি অংশটুকুর মোড়কটা দিল তার হাতে, সেটা দেখতে পেল না আলেক্সেই; তার চোখে পড়ল না মিখাইল দাদু বিমানটির চারপাশে কেমন ব্যস্তসমস্তভাবে ঘুরছেন, মেয়েদের বকছেন আর বাচ্চাদের ভাগিয়ে দিচ্ছেন; চোখে পড়ল না, হাওয়ায় ওঁর টুপিটা উড়ে গিয়ে বরফে গড়িয়ে চলেছে, খোলা মাথায় উনি দাঁড়িয়ে, টাকটা চকচক করছে, পাতলা রুপালী চুল, গ্রামের অনাড়ম্বর আইকনে আঁকা সেণ্ট নিকলাসের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। বিদায়োন্মুখ বিমানটির দিকে হাত নাড়ছেন মিখাইল দাদু, মেয়েদের দঙ্গলে একমাত্র পুরুষ।

হ্রদের জমাট বরফ থেকে এক চাকায় উঠিয়ে বিমানটিকে লোকজনের মাথার উপর দিয়ে নিয়ে গেল দেগতিয়ারেঙ্কো, রানারগুলো বরফে প্রায় লাগে লাগে, উঁচু, খাড়া তীরের নিচে হ্রদ ঘেঁষে সাবধানে চলে একটি বনাকীর্ণ দ্বীপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল বিমানটি। জঙ্গী বিমান বাহিনীর এই অসমসাহসিক লোকটি একাধিকবার ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে বেপরোয়াভাবে বিমান চালানোর জন্য বকুনি খেয়েছে, কিন্তু এখন খুব সাবধানে চলেছে সে, উড়ছে না, গুঁড়ি মেরে, প্রায় মাটি ঘেঁষে, ছোট ছোট নদীর রেখায় পথ চিনে, নানা হ্রদের তীরের আড়ালে থেকে এগোচ্ছে। আলেক্সেই দেখল না কিছু, কিছু এল না তার কানে। পেট্রল আর অন্য তেলের চেনা গন্ধে, ওড়বার অনুভূতির উল্লাসে জ্ঞান হারাল সে। জ্ঞান হল যখন বিমান-ঘাঁটিতে পেঁাছিয়ে স্ট্রেচারটা নামানো হচ্ছে, মস্কো থেকে ইতিমধ্যে আগত রেডক্রসের একটি জরুরী বিমানে তাকে তোলা হবে।

১৯

নিজের বিমান-ঘাঁটিতে যখন পেঁাছল তখন কাজের চাপ সবচেয়ে বেশী। পুরোদমে কাজ চলেছে, সেই কর্মমুখর বসন্তে কোনদিন নিশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকত না।

ইঞ্জিনের গর্জন ক্রমাগত কানে আসছে। পেট্রল ভরার জন্য কোন স্কোয়াড্রন নামলেই তার জায়গায় অন্য একটা স্কোয়াড্রন উড়ছে, আবার একটা আসছে। বৈমানিক থেকে আরম্ভ করে পেট্রলট্যাঙ্কের চালক আর পেট্রলগুদাম-রক্ষক পর্যন্ত আপ্রাণ কাজ করে চলেছে। চিফ অব স্টাফের গলা ভেঙ্গে গিয়েছে, কোন রকমে ফিসফিস করে কথা বলছেন তিনি।

কিন্তু নিদারুণ কর্মব্যস্ততা আর সাধারণ উত্তেজনা সত্ত্বেও সবাই সাগ্রহে মেরেসিয়েভের পেঁাছনোর অপেক্ষায় ছিল।

নেমে ঢাকা জায়গায় বিমানগুলোকে নিয়ে যাবার আগেই বৈমানিকেরা ইঞ্জিনের গর্জনের মধ্যে চেঁচিয়ে মিস্ত্রীদের জিজ্ঞেস করছে, 'এখনো আসেনি ও?'

'ওর কোন খবর এসেছে?' গুদামে পেট্রল-ট্যাঙ্কগুলোকে নিয়ে আসতে না আসতেই সেখানকার "পেট্রল-চাঁই"রা খোঁজ করছে।

বনের উপর থেকে পরিচিত রেডক্রস বিমানটি কখন আসবে তার শব্দ শোনার জন্য প্রত্যেকে কান পেতে আছে...

জ্ঞান হয়ে আলেক্সেই দেখল একটি দুলন্ত স্ট্রেচারে শুয়ে আছে, চারিদিকে চেনাশোনা মুখের ঘনিষ্ঠ ভিড়। চোখ খুলল ও। আনন্দের ধ্বনি উঠল ভিড় থেকে। স্ট্রেচারের ঠিক পাশে আলেক্সেই দেখল উইং কম্যান্ডারের নবীন, অনড় মুখ আর সংযত হাসি। তার পাশে চিফ অব স্টাফের লাল, ঘর্মাক্ত মুখ, আর বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়ন যার অধীনে তার গোল ভরাট পাণ্ডুর মুখ, লোকটিকে তার কিপ্‌টেমি আর আমলাতান্ত্রিকতার জন্য আলেক্সেই দুচক্ষে দেখতে পারত না। কত চেনা মুখ! স্ট্রেচার-বাহকদের সামনেরটি হল ঢেঙ্গা ইউরা, ফিরে ফিরে আলেক্সেইকে দেখছে আর হোঁচট খাচ্ছে। ওর পাশে তাড়াতাড়ি হাঁটছে লাল-চুল, ছোটখাটো একটি মেয়ে, আবহাওয়া কেন্দ্রের সার্জেণ্ট। আগে আলেক্সেই'র মনে হত কোন কারণে মেয়েটি তাকে পছন্দ করে না, তার চোখের আড়ালে থাকার চেষ্টা করত মেয়েটি, লুকিয়ে তাকাত ওর দিকে, সে দৃষ্টিতে বিচিত্র কী একটা ভাব। ঠাট্টা করে আলেক্সেই ওকে "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" বলে ডাকত। মেয়েটির কাছাকাছি কুকুশকিন তাড়াতাড়ি হাঁটছে, ছোটখাটো মানুষ, মুখে কেমন যেন অপ্রীতিকর হলদে ভাব, ওর খিটখিটে মেজাজের জন্য স্কোয়াড্রনের লোকেরা ওকে পছন্দ করত না। কুকুশকিনও হাসছে, চেষ্টা করছে ইউরার বিরাট পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে। মেরেসিয়েভের মনে পড়ল শেষবার ওড়বার আগে, ধার শোধ করেনি বলে অনেকের সামনে ওকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল আর ভেবেছিল এই প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকটি সে-কথা কখনো ভুলবে না। কিন্তু এখন স্ট্রেচারের পাশে দৌড়চ্ছে সে, সাবধানে ওটাকে ধরছে আর যাতে কেউ ধাক্কা না দেয় তার জন্য কনুই দিয়ে হটাচ্ছে লোকজনকে।

এত বন্ধু যে তার আলেক্সেই কখনো ভাবেনি। লোকেদের সত্যিকারের

চেহারা তাহলে এরকম! যে "আবহাওয়া সার্জেণ্টটি" কোন কারণে তাকে ভয় করে তার জন্য দঃখ হল আলেক্সেই'র; বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডারকে দেখে লজ্জা হল তার, ওর কিপটেমি নিয়ে কত না ইয়ার্কি আর টিপ্পনী বিমান ডিভিশনে ছড়িয়েছে! আর কুকুশকিনের কাছে মাপ চাইতে ইচ্ছে হল, ইচ্ছে হল অন্যদের বলে যে লোকটা শেষ পর্যন্ত সত্যিই অতটা অপ্রীতিকর আর একরোখা নয়। আলেক্সেই'র মনে হল অনেক যন্ত্রণা আর দুর্ভোগের পর অবশেষে আপন ঘরে ফিরেছে, ওর প্রত্যাবর্তনে সবাই আনন্দিত।

মাঠ হয়ে সাবধানে ওকে রুপালী রেডক্রস বিমানটির কাছে নিয়ে যাওয়া হল, পত্রহীন একটি বার্চবনের ধারে প্রচ্ছন্নভাবে রাখা হয়েছিল বিমানটিকে। মিস্ত্রীরা ইতিমধ্যেই এঞ্জিন চালাতে শুরু করেছে।

'কমরেড মেজর...' উইং কম্যাণ্ডারকে মেরেসিয়েভ হঠাৎ ডাকল, যতখানি সম্ভব জোরে আর দৃঢ়ভাবে কথা বলার চেষ্টা করল ও।

স্বভাবসিদ্ধ শান্ত, হেঁয়ালি-ভরা হাসি মুখে, কম্যাণ্ডার আলেক্সেই'র কাছে ঝুঁকলেন।

'কমরেড মেজর... মস্কোতে আমাকে পাঠাবেন না, আমাকে এখানে, আপনাদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দিন...'

কম্যাণ্ডার শুনতে পেলেন না বলে হেলমেটটি খুলে ফেললেন।

'মস্কোতে যেতে আমি চাই না। এখানে, চিকিৎসা-কর্মীদের দলে থাকতে চাই!'

ফারের দস্তানা খুলে, কম্বলের নিচে হাতড়ে আলেক্সেই'র হাতে চাপ দিয়ে মেজর বললেন:

'মজার লোক আপনি! আপনার বিশেষ চিকিৎসার দরকার।'

মাথা নাড়ল আলেক্সেই। এখানে এত ভালো আর আরাম লাগছে। যে-সব দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে সেগুলো আর ভয়াবহ মনে হচ্ছে না এখন, পায়ের ব্যথাটাও নয়।

'ও কী বলছে?' চিফ অব স্টাফ ভাঙ্গা গলায় জানতে চাইলেন। 'আমাদের সঙ্গে এখানে থাকতে চায়,' হেসে উত্তর দিলেন কম্যাণ্ডার। আর এখন, এই মুহূর্তে হাসিটা অন্য সময়ের মত হেঁয়ালি-ভরা নয়, বন্ধুত্বসূচক আর বিষণ্ণ হাসি।

'বোকা, রোমাণ্টিক! "পিওনেরস্কায়া প্রাভদার" জন্য দৃষ্টান্ত একটা,'

বললেন চিফ অব স্টাফ। 'স্বয়ং সেনানায়কের আদেশে মস্কো থেকে ওর জন্য বিমান পাঠিয়ে দিয়ে ওকে সম্মান দেখিয়েছে ওরা, আর ও, কেমন লোক বলো ত?..'

মেরেসিয়েভ জবাবে বলতে চাইল যে সে রোমাণ্টিক নয়, শুধু ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে এখানে চিকিৎসা-ঘাঁটির তাঁবুতে চেনা পরিবেশে আরো অনেক তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে, এখানে একবার ত কয়েকদিন কাটিয়েছিল, বিমান জখম হবার পরে অসফল অবতরণের ফলে হাঁটুর গাঁট মচকে যায় তখন; মস্কো ক্লিনিকের অজানা সুযোগ-সুবিধের মধ্যে অত তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারবে না। চিফ অব স্টাফকে মুখের মত জবাব কী ভাষায় দেবে সেটা ঠিক করে ফেলেছে, কিন্তু মুখ খোলার আগেই সাইরেনের বিষণ্ন আওয়াজ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের মুখে এল গম্ভীর কর্মব্যস্ততার ভাব। মেজর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আদেশ দিলেন আর পিঁপড়ের মত ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই; বনের প্রান্তে গোপনে দাঁড়ানো বিমানটির কাছে কয়েকজন দৌড়িয়ে গেল, কয়েকজন গেল পরিচালনা-ঘাঁটিতে, মাঠের ধারে একটা ছোট ঢিবি থেকে পরিচালনা-ঘাঁটিটা চেনা যায়, আর বনের মধ্যে লুকোনো গাড়িগুলোর দিকে গেল কয়েকজনে। আকাশে ধোঁয়ার একটা স্পষ্ট দীর্ঘ রেশ আলেক্সেই দেখল, একটা বহু-পুচ্ছ হাউইর রেখা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী সে বুঝতে পারল: "হুঁশিয়ারির" সংকেত।

ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করল, নাসারন্ধ্র কাঁপছে, মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল, বিপদের মুহূর্তে হামেশাই তার এরকম হত।

বিপৎসূচক ধ্বনি যখন বাজল তখন বিমান-ঘাঁটির অস্বাভাবিক কর্মব্যস্ততায় লেনচ্‌কা, মিস্ত্রী ইউরা আর "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" বিশেষ কিছু করার ছিল না, তারা স্ট্রেচারটা চট করে তুলে নিয়ে বনের ধারের সবচেয়ে কাছাকাছি জায়গায় দৌড়ল, তিনজনেই দৌড়চ্ছে, মিলিয়ে পা ফেলার চেষ্টা সবাই করছে, কিন্তু উত্তেজনায় সেটা হয়ে উঠছে না।

আলেক্সেই কাতরে ওঠাতে হাঁটবার কদমে তারা চলল। দূরে ইতিমধ্যেই স্বয়ংক্রিয় বিমানধ্বংসী কামানের অস্থির খরখর আওয়াজ শুরু হয়েছে। একটার পর একটা বিমান গুঁড়ি মেরে রানওয়েতে পেঁছিয়ে ঝট করে উপরে উঠছে। ইঞ্জিনের চেনা শব্দ ছাপিয়ে একটু পরেই বন থেকে আলেক্সেই'র কানে এল অসমান, মৃদু মুখর ঘড় ঘড় আওয়াজ, আর তাতে তার পেশীগুলো

সংকুচিত হয়ে এল, টান-টান তারের মত: স্ট্রেচারে বাঁধা মানুষটি কল্পনা করল জঙ্গী বিমানের ককপিটে বসে আছে সে, শত্রুর সঙ্গে মোলাকাতে দ্রুতগতিতে যাচ্ছে।

অপরিসর লম্বা গর্তে স্ট্রেচারটা ঢোকান গেল না। ইউরা আর মেয়েরা ওকে কোলে করে নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু বাধা দিয়ে আলেক্সেই বলল যে বনের ধারে একটা বড়ো, বলিষ্ঠ বার্চগাছের নিচে স্ট্রেচারটাকে রাখা হোক। সেখানে শুয়ে যা সব ঘটল তা দেখল আলেক্সেই, দুঃস্বপ্নে যেমন তেমন দ্রুত ঘটনাগুলির পরম্পরা। মাটি থেকে আকাশ-যুদ্ধ দেখার সুযোগ বৈমানিকদের কালেভদ্রে হয়। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই মেরেসিয়েভ বিমান বাহিনীতে, কিন্তু এ পর্যন্ত মাটি থেকে আকাশ-যুদ্ধ কখনো দেখেনি। আকাশ-যুদ্ধের বিদ্যুৎগতিতে অভ্যস্ত সে, আর এখন অবাক হয়ে দেখল মাটি থেকে আকাশ-যুদ্ধটা কত নিরীহ মনে হয়, খাঁদা-নাক পুরোনো জঙ্গী বিমানগুলোর চলাফেরা কী রকম শ্লথ, আকাশে ওদের মেসিনগানগুলোর খরখর আওয়াজও কেমন সাদাসিধে — ঘরোয়া নানা শব্দের কথা মনে হয় - সেলাই কলের ঘড়ঘড় কিম্বা সুতী সাদা কাপড় ছেঁড়ার শব্দ।

বারোটা জার্মান বোমারু বিমান, ইংরাজী ভি-র আকারে দল বেঁধে বিমান-ঘাঁটিটাকে এড়িয়ে উজ্জ্বল আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেল, সূর্য এখন অনেক উঁচুতে। মেঘের ধারে ধারে এত ঝকঝকে আলো যে সেদিকে তাকাতে কষ্ট হয়, মেঘের আড়াল থেকে এল ওদের ইঞ্জিনের নিচু ঘড়ঘড় আওয়াজ, গুবরে পোকার ডাকের মত।

বনের বিমানধ্বংসী কামানগুলোর গর্জন আর গরগর চরমে পৌঁছল। ওদের ফাটন্ত গোলার ধোঁয়া ডানডেলিয়নের রোঁয়াওয়ালা বীচির মত আকাশে ভাসছে। জঙ্গী বিমানের ডানার ক্কচিৎ ঝলক, আর কিছু চোখে পড়ে না।

ক্রমশ গুবরে পোকারা গুনগুনে বাধা দিচ্ছে সুতী কাপড় ছেঁড়ার খ্যাস খ্যাস শব্দ। চোখ-ঝলসানো আলোয় যুদ্ধ চলেছে, কিন্তু আকাশ-যুদ্ধ করার সময় বৈমানিকেরা যা দেখে সেটা আর নিচে থেকে দেখা এটার চেহারা এত আলাদা, এটা এত অর্থহীন আর সাধারণ মনে হচ্ছে যে আলেক্সেই দেখে চলল বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র উত্তেজনা হল না।

ক্রমশ বেড়ে-ওঠা তীক্ষ্ম কর্ণভেদী আওয়াজে এক সারি বোমা ঝড়ের গতিতে আয়তনে বড়ো হয়ে উঠে নিচে সবেগে নেমে আসছে, ঝোপ থেকে

ঝাড়া কালো জলের ফোঁটার মত; এমন কি তখনো ভয় হল না আলেক্সেই'র, মাথা একটু তুলে দেখল বোমাগুলো কোথায় পড়বে।

ঠিক সেই মুহূর্তে "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" ব্যবহারে আলেক্সেই অবাক হয়ে গেল। কোমর পর্যন্ত গর্তে মেয়েটি দাঁড়িয়ে যথারীতি আড়চোখে তাকে দেখছিল; বোমাগুলোর কর্ণভেদী চীৎকার চরমে পেঁছিয়েছে, হঠাৎ এক লাফে বেরিয়ে ছুটে স্ট্রেচারটার কাছে গেল মেয়েটি, সটান শুয়ে পড়ে নিজের শরীর দিয়ে আলেক্সেইকে ঢাকল, ভয়ে আর উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে।

নিমেষের জন্য নিজের চোখের খুব কাছে আলেক্সেই দেখল রোদে-পোড়া, শিশুসুলভ একটি মুখ, ভরাট ঠোঁট, খাঁদা নাক। বনের কোথা থেকে এল বিস্ফোরণের গভীর আওয়াজ. পরমুহূর্তেই আর একটি, সেটি অনেক কাছে, তারপর আরো দুটি বিস্ফোরণ। পঞ্চম বিস্ফোরণটি এত প্রচণ্ড যে মাটি কেঁপে দুলে উঠল। যে গাছটির নিচে আলেক্সেই শুয়ে তার মাথাটা বিস্ফোরণের একটা টুকরোয় ভেঙ্গে গিয়ে সশব্দে মাটিতে পড়ল। আবার আলেক্সেই দেখল মেয়েটির বিবর্ণ ভয়ার্ত মুখ, নিজের গালে ওর গালের ঠাণ্ডা ছোঁয়াচ লাগল। দুটো বিস্ফোরণের মাঝের মুহূর্তটিতে ভয়ার্ত মেয়েটি ফিসফিস করে বলল:

'লক্ষ্মী আমার!.. সোনা আমার!'

বিকট আওয়াজে আর এক সারি বোমা ফেটে পড়ল, মাটি উঠল কেঁপে, মনে হল গাছগুলো আমূল বিমান-ঘাঁটির উপরে আকাশে ছিটকে গিয়েছে, ওদের মাথা খুলে গেল, আর জমাট মাটির বিরাট ডেলা বাজের গুরুগুরু ধ্বনিতে মাটিতে পড়ল, আকাশে রেখে গেল তামাটে ঝাঁঝালো ধোঁয়ার রেশ, রসুনের মত গন্ধ তাতে।

ধোঁয়া মিলিয়ে গেল, চারিদিক চুপচাপ। বনের পিছনে আকাশ-যুদ্ধের আওয়াজ প্রায় শোনা যাচ্ছে না। মেয়েটি ইতিমধ্যে ঝট করে দাঁড়িয়ে উঠেছে, ওর গালদুটো আর পাণ্ডুর নেই, লাল হয়ে উঠেছে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ, প্রায় কেঁদে ফেলার মত অবস্থা, আলেক্সেই'র দিকে না তাকিয়ে অপরাধীর মত গলায় বলল:

'আপনার লাগেনি ত! কী বোকা, হে ভগবান, কী দারুণ বোকা আমি! বিশেষ দুঃখিত আমি!'

'এখন মাপ চেয়ে আর কী হবে,' গরগর করে ইউরা বলল, ও লজ্জিত যে আবহাওয়া কেন্দ্রের মেয়েটি তার বন্ধুকে বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিল. ও নিজে যায়নি।

গরগর করতে করতে ওভারঅল থেকে বালি ঝাড়ল ইউরা, মাথার পেছনটা চুলকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কবন্ধ বার্চগাছটির এবড়োখেবড়ো গোড়ার দিকে, সেটির গুঁড়ি থেকে স্বচ্ছ রস অঝোর ধারায় চুঁইয়ে পড়ছে। আহত গাছটির রস আলোয় ঝিকঝিক করে শেওলাচ্ছন্ন ছাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে পড়ছে, পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখের জলের মত।

'দেখো, গাছটা কাঁদছে!' বলল লেনচ্কা, বিপদের মধ্যেও ওর বেহায়া কৌতূহলের ভাবটা যায়নি।

'তুমিও কাঁদতে ওরকম করে!' বিষণ্নভাবে ইউরা বলল। 'যাক, তামাশা শেষ। এবার যাওয়া যাক! আশা করি এ্যামবুলান্স-বিমানটি জখম হয়নি।'

'বসন্ত শুরু হয়েছে এখানে!' বিকলাঙ্গ গাছের গুঁড়ি, চিকচিকে স্বচ্ছ রস টপটপ করে মাটিতে পড়ছে, খাঁদা-নাক "আবহাওয়া সার্জেণ্ট", যার আর্মিকোটটা বেজায় বড়ো, যার নামটা পর্যন্ত অজানা, সবকিছুর দিকে তাকিয়ে আলেক্সেই বলল।

ওরা তিনজন — ইউরা সামনে, মেয়েদুটি পিছনে, ওকে নিয়ে চলল বিমানটির দিকে; বোমার বিস্ফোরণে কয়েক জায়গায় হাঁ হয়ে যাওয়া মাটি থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে, গলন্ত বরফের জল তাতে চুঁইয়ে পড়ছে, গর্তগুলো এড়িয়ে আঁকাবাঁকা পথে ওরা চলল; আর্মিকোটের মোটা আস্তিন থেকে যে ছোট বলিষ্ঠ হাতটা দৃঢ়ভাবে স্ট্রেচারের একটা বাঁট চেপে আছে তার দিকে সকৌতূহলে আড়চোখে তাকাল আলেক্সেই। কী হয়েছে মেয়েটির! কিম্বা হয়ত ভয়ের মুহূর্তে কথাগুলো শুনেছে কল্পনা করেছিল নিজে?

তার পক্ষে ভাবিতব্যতায় ভারী সেই দিনটিতে আর একটি ঘটনা দেখল মেরেসিয়েভ। রুপালী রেডক্রস বিমানটি আর ফ্লাইট মিস্ত্রীটি ইতিমধ্যেই দৃষ্টিপথে এসেছে, মিস্ত্রীটি মাথা নেড়ে বিমানটির চারিদিকে ঘুরে দেখছে বিস্ফোরণের ঝটকায় কিম্বা কোন টুকরোয় ওটা জখম হয়েছে কিনা, এমন সময় জঙ্গী বিমানগুলো ফিরে এসে নামতে শুরু করল। বনের উপর দিয়ে সোঁ করে এসে যথারীতি বৃত্তাকারে না ঘুরেই নামল আর বেগ না কমিয়ে গেল বনের ধারে মাটির দেয়াল-ঘেরা জায়গায়।

আকাশে আর কোন হৈচৈ নেই। বিমান-ঘাঁটি সাফ করা হয়েছে, বনে ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ থেমে গেল। কিন্তু পরিচালনা-ঘাঁটিতে লোকজন তখনো দাঁড়িয়ে, রোদ বাঁচাবার জন্য চোখের সামনে হাতের আড়াল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ন নম্বর ফেরেনি! কুকুশকিন কোথাও আটকা পড়েছে,' ইউরা বলল।

কুকুশকিনের ছোট গোমড়া মুখের কথা আলেক্সেই ভাবল, তাতে হামেশাই অসন্তোষের ছাপ লেগে থাকত, মনে পড়ল সকালে কী যত্নে ওর স্ট্রেচারে হাত রেখে কুকুশকিন চলেছিল। ও কী তাহলে... ভাবনাটা কর্মমুখর দিনে অন্য কোন বৈমানিকের পক্ষে অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু আলেক্সেই ত এখন বিমান-ঘাঁটির জীবনের বাইরে, ও শিউড়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ।

আনন্দে লাফিয়ে ইউরা চেঁচিয়ে উঠল:

'ওই আসছে কুকুশকিন!'

পরিচালনা-ঘাঁটির লোকজনের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কিছু একটা ঘটেছে। "ন নম্বর" নামল না, বিমান-ঘাঁটির চারিদিকে বড়ো বৃত্তে ঘুরছে, আলেক্সেই'র উপর দিয়ে যখন গেল তখন ও দেখল যে ডানাটার একটা অংশ গুলিতে উড়ে গিয়েছে, আর, আরো অনেক খারাপ ব্যাপার সেটা, কাঠামোর নিচে একটা মাত্র "পা" দেখা যাচ্ছে। দুটো লাল হাউই একটার পর একটা আকাশে ছোঁড়া হল। বিমান-ঘাঁটির উপরে আবার উড়ে এল কুকুশকিন। ওর বিমানটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা পাখি নষ্ট নীড়ের উপরে ঘুরছে, কোথায় নামবে জানে না। তৃতীয় বার বৃত্তাকারে বিমানটি চলল।

'ও এক্ষুণি পারাস্যুটে নামবে, পেট্রল শেষ হতে চলেছে, শেষ কয়েকটা ফোঁটায় ওটা উড়ছে,' ফিসফিস করে বলল ইউরা, ওর চোখ ঘড়ির কাঁটায় আটকিয়ে গিয়েছে।

এরকম অবস্থায়, নামা যখন অসম্ভব, তখন বৈমানিকেরা কিছু উঁচুতে উঠে পারাস্যুট করে নামতে পারে। খুব সম্ভব এ মর্মের নির্দেশ "ন নম্বর"কে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একগুঁয়ের মত বিমানটি বৃত্তাকারে ঘুরেই চলল।

ইউরা একবার বিমানটির দিকে তাকাচ্ছে আর একবার ঘড়ির দিকে। বিমানের গতিবেগ মন্থর হয়ে আসছে যখন মনে হচ্ছে তখন উবু হয়ে বসে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে ও। "ও কি বিমানটাকে বাঁচাবার কথা ভাবছে?" উপস্থিত সবায়ের মনে এক চিন্তা: "লাফাও, লাফাও এবার!"

লেজে "৯" আঁকা একটি জঙ্গী বিমান তীরের মত আকাশে উড়ে প্রথম চক্কর নিয়েই সুকৌশলে আহত "ন নম্বরের" পাশে এসে পড়ল। যে রকম

কৌশলে আর অবিচলিতভাবে বিমানটি চালানো হচ্ছে তা থেকে আলেক্সেই আঁচ করল যে চালক উইং কম্যান্ডার স্বয়ং। তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন যে কুকুশকিনের রেডিও বেকার; কিম্বা তার মাথা গুলিয়ে গিয়েছে, তাই তাকে সাহায্য করতে অচিরাৎ এসেছেন। বিমানের ডানা দুলিয়ে সংকেত করলেন, "আমি যা করছি, ঠিক সেইরকম করো," আর একপাশে হেলে উপরে উঠলেন। কুকুশকিনকে তিনি আদেশ দিলেন পাশে উড়ে গিয়ে বিমান ছেড়ে লাফাতে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গ্যাস কমিয়ে দিয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হল কুকুশকিন। ডানা-ভাঙ্গা বিমানটি আলেক্সেই'র ঠিক মাথার উপর দিয়ে সবেগে উড়ে মাটির কাছাকাছি এসে পড়ল। হঠাৎ বাঁ দিকে হেলে, যে "পাটি" অক্ষত তাতে ভর করে নামল, এক চাকায় কিছুটা এগিয়ে গতিবেগ কমিয়ে বিমানটি ডান দিকে হেলে পড়ল, অক্ষত ডানাটি মাটিতে লাগাতে বরফের ঝড় তুলে সবেগে ঘুরপাক খেল।

বরফের ঘূর্ণি কমে গেলে দেখা গেল কালো কী একটা পঙ্গু বিমানটার কাছে পড়ে আছে। কালো জিনিসটির দিকে লোকজনেরা দৌড়িয়ে গেল, সাইরেন বাজিয়ে এ্যাম্বুলান্সের গাড়ি ছুটল সেদিকে।

"বিমানটিকে বাঁচিয়েছে ও! কুকুশকিন তাহলে এ ধরনের মানুষ! এরকম কাজ করতে কবে শিখল ও?" স্ট্রেচারে শুয়ে মেরেসিয়েভ ভাবছে, কুকুশকিনের উপর হিংসে হচ্ছে তার।

ওর আগ্রহ হল প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে যায় সেখানে যেখানে শুয়ে আছে ছোটখাটো, সবায়ের অপ্রিয় মানুষটি, যে মানুষটি নিজেকে সাহসী আর সুদক্ষ বৈমানিক বলে প্রমাণ করেছে। কিন্তু স্ট্রেচারে বাঁধা আলেক্সেই, তাকে ঘিরেছে যন্ত্রণার নাগপাশ, স্নায়বিক উত্তেজনা থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে যন্ত্রণায় আবার সে অভিভূত।

সবকিছু ঘটতে এক ঘণ্টারও বেশী লাগেনি, কিন্তু ঘটনাগুলি সংখ্যায় এত বেশী, এত তাড়াতাড়ি ঘটে যে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে আলেক্সেই তৎক্ষণাৎ পারেনি। রেডক্রস বিমানের বিশেষ খোলে স্ট্রেচারটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে; আবার তার চোখে পড়ল "আবহাওয়া সার্জেণ্টটি" একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে, শুধু তখনি বোমাবৃষ্টির সময়ে মেয়েটির বিবর্ণ মুখ দিয়ে যে কথাগুলো ফসকে বেরিয়ে এসেছিল তাদের আসল অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারল আলেক্সেই। এই চমৎকার, আত্মত্যাগী মেয়েটির নাম পর্যন্ত জানে না বলে ওর লজ্জা হল।

'কমরেড সার্জেণ্ট,' নিচু গলায় ও ডাকল, কৃতজ্ঞভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে।

ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়ের মধ্যে মেয়েটি শুনল কিনা সন্দেহ, কিন্তু এগিয়ে একটা প্যাকেট ওর সামনে ধরে সে বলল:

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, এগুলো আপনার চিঠি। চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিলাম, কেননা আমি জানতাম আপনি বেঁচে আছেন, আবার ফিরে আসবেন। জানতাম সেটা, মনে প্রাণে জানতাম...'

চিঠির ছোট গোছাটা আলেক্সেই'র বুকের উপরে রাখল মেয়েটি। ও দেখল কয়েকটি চিঠি এসেছে মায়ের কাছ থেকে, তিনকোণা করে ভাঁজ করা, ঠিকানাগুলো বয়স্কার টেরাবাঁকা হাতে লেখা। আর কয়েকটার খাম পরিচিত, সেরকম খাম ও সব সময়ে টিউনিকের পকেটে রাখত। সেগুলো দেখে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কম্বলের নিচে থেকে হাত বের করার চেষ্টা করল আলেক্সেই।

'কোন মেয়ে লিখেছে বুঝি?' "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" বিষণ্নভাবে জিজ্ঞেস করল, আবার ওর মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখে জল আসাতে ওর দীর্ঘ তামাটে চোখের পাতা ভিজে জুড়ে গেল।

আলেক্সেই বুঝতে পারল যে বিস্ফোরণের সময়ের সে কথাগুলো তাহলে কল্পিত নয়; বুঝতে পেরে সত্যি কথা বলার সাহস হল না তার।

'আমার বোনের চিঠি, সে বিবাহিত। ওর পদবী অন্য এখন,' বলে আলেক্সেই আত্মগ্লানি বোধ করল।

ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে অন্যদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। পাশের দরজা খুলে গেল, একজন অচেনা চিকিৎসক বিমানে উঠলেন, তাঁর আর্মিকোটের উপরে শাদা ওভারঅল চাপানো।

'রোগীদের একজন তাহলে ইতিমধ্যেই এখানে? বেশ, বেশ,' মেরেসিয়েভের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন। 'অন্যটিকেও নিয়ে এসো। আমরা এক্ষুণি ছাড়ব। আর আপনি এখানে কী করছেন, মহাশয়া?' বাষ্পে-ঝাপসা চশমার মধ্যে দিয়ে "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, মেয়েটি ইউরার আড়ালে থাকার চেষ্টা করছিল। 'আপনি যান, দয়া করে, আমরা এক্ষুণি ছাড়ব। ওহে, স্ট্রেচারটি ঢোকাও!'

'চিঠি দেবেন, ভগবানের দোহাই, চিঠি দেবেন, আমি অপেক্ষায় থাকব!' আলেক্সেই শুনল মেয়েটি ফিসফিস করে বলছে।

ইউরার সহায়তায় চিকিৎসকটি একটি স্ট্রেচার বিমানের মধ্যে তুলে নিলেন, তার উপরে শুয়ে কে যেন গোঙাচ্ছে। খোলে বসানোর সময় ঢাকা-দেওয়া চাদরটা স্ট্রেচার থেকে খসে পড়াতে আলেক্সেই'র চোখে পড়ল যন্ত্রণায় বিকৃত কুকুশকিনের মুখ। ডাক্তার হাতে হাত ঘষে কামরার চারিদিকে তাকিয়ে মেরেসিয়েভের পেট চাপড়িয়ে বললেন:

'খাসা, চমৎকার! একজন সহযাত্রী আপনার সঙ্গে দেব। কী বলুন? আর এখন অন্য সবাই বেরিয়ে যাও। সার্জেণ্টের চিহ্নওয়ালা লরেলি তাহলে চলে গিয়েছে? বেশ! এবার রওনা হওয়া যাক!'

ইউরার চলে যেতে দেরী হল। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক তাকে ঠেলে বের করে দিলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বিমানটি কেঁপে উঠল, চলতে শুরু করল, তারপর উপরে উঠে ধীর মসৃণভাবে তার নিজের জগতে ভেসে গেল, ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় সমানে বেজে চলেছে। দেয়াল ধরে ধরে চিকিৎসক মেরেসিয়েভের কাছে গেলেন।

'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'নাড়ীটা দেখি।' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেরেসিয়েভের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বিড় বিড় করে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আচ্ছা। মনের জোর আছে!' তারপর মেরেসিয়েভকে বললেন, 'আপনার বন্ধুদের কাছে আপনার দুঃসাহসিক কাজের কথা শুনেছি, প্রায় অবিশ্বাস্য গল্পগুলো, অনেকটা জ্যাক লণ্ডনের গল্পের মত।'

ধপাস করে বসে আরামে গা ছড়ালেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে পড়ে ঝিমোতে শুরু করলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল এই বিগতযৌবন, বিবর্ণমুখ লোকটি অসীম ক্লান্ত।

"জ্যাক লণ্ডনের গল্পের মত।" ভাবল মেরেসিয়েভ, আর সুন্দর শৈশবের স্মৃতি আবার ফিরে এল: একটি লোক, ঠাণ্ডায় তার পা অসাড় হয়ে গিয়েছে, মরুভূমিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে, পিছু পিছু আসছে রুগ্ন ক্ষুধিত একটি নেকড়ে, তার গল্প। ইঞ্জিনের সমান ঘড়ঘড় আওয়াজে ঘুম পাচ্ছে, সবকিছু ভাসছে, অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে ধূসর অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে যে অদ্ভুত কথাটি তার মনে হল সেটি হচ্ছে যে যুদ্ধ থেমে গেছে, বোমা আর পড়ছে না, পায়ের সেই অবিরত দবদবে যন্ত্রণা আর নেই, মস্কো অভিমুখে খরবেগে চলছে না বিমানটা, এসব কিছু কামিশিন সহরে তার ছেলেবেলায় পড়া কোন আশ্চর্য বই থেকে নেওয়া।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

রাজধানীর যে হাসপাতালে মেরেসিয়েভ ও লেফ্‌টেনাণ্ট কনস্তান্তিন কুকুশকিনকে রাখা হল সেটি সত্যিই চমৎকার, বন্ধুর কাছে সেটির বর্ণনা করার সময় আন্দ্রেই দেগতিয়ারেংকো আর লেনচ্‌কা মোটেই অত্যুক্তি করেনি।

যুদ্ধের আগে একটি ইনস্টিটিউটের ক্লিনিক ছিল সেটি, ব্যাধি কিম্বা আঘাতের পরে লোকেরা কী করে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারে তার নতুন নানা উপায় নিয়ে একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সোভিয়েত বিজ্ঞানী গবেষণা করতেন সেখানে। ইনস্টিটিউটটি নানা ঐতিহ্যে গরীয়ান, পৃথিবী জুড়ে তার খ্যাতি।

যুদ্ধ বাধার পর ক্লিনিকটিকে বাহিনীর আহত অফিসারদের হাসপাতালে পরিণত করেন বিজ্ঞানীটি। আধুনিক বিজ্ঞানের জানা যত কিছু পদ্ধতিতে রোগীদের চিকিৎসা চলে। মস্কোর অনতিদূরে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে, ফলে আহতদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে আগেকার তুলনায় খাটের সংখ্যা চারগুণ বাড়াতে হল। অন্যান্য সমস্ত ঘর — আগন্তুকদের বসবার ঘর, পড়ার আর বিশ্রামের ঘর, কর্মচারীবৃন্দের ঘর আর খাবার ঘর — ওয়ার্ডে পরিণত করা হল। এমন কি গবেষণাগারের পাশে নিজের পড়বার ঘরটি পর্যন্ত বিজ্ঞানী ছেড়ে দিয়ে বইটই নিয়ে ছোট্ট একটি ঘরে গেলেন, সেটিতে আগে কাজের সময় নার্সরা থাকত। তা সত্ত্বেও করিডরে মাঝেমাঝে খাট পাততে হত।

ঝকঝকে শাদা দেয়ালগুলো দেখে মনে হত চিকিৎসা মন্দিরের উপযুক্ত গম্ভীর স্তব্ধতার জন্যই বিশেষ করে ওদের বানানো হয়েছে, দেয়ালের ওধার থেকে আসছে ঘুমন্ত রোগীদের গোঙানি আর নাক ডাকার শব্দ, বিকারগ্রস্তদের প্রলাপ। যুদ্ধের নানা গুমোট ভারী গন্ধে জায়গাটি আচ্ছন্ন, রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ,

দগদগে ঘা আর জীবন্ত মানুষের পচা মাংসের গন্ধ, সে গন্ধ কিছুতেই তাড়ানো যায় না। বিজ্ঞানীর নিজের নকসায় তৈরী আরামি খাটগুলোর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর ভাঁজ-করা খাট। বাসনপত্র কম পড়ে গিয়েছিল। ক্লিনিকের সুন্দর সুন্দর চীনামাটির বাসন ছাড়াও এ্যালুমিনিয়ামের টোল-খাওয়া বাটি ব্যবহার করা হত। কাছাকাছি ফাটা বোমার ঝটকায় বিরাট ইতালীয় জানলাগুলোর কাচ ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, জানলাগুলো পিজবোর্ড দিয়ে ঢাকা। এমন কি জলের অভাবও ছিল, প্রায়ই গ্যাস বন্ধ করে দেওয়া হত, পুরোনো অপ্রচলিত স্পিরিট-স্টোভে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ করে নেওয়া হত। কিন্তু আহতদের ভিড় কমছে না। ক্রমাগত তাদের আনা হচ্ছে — বিমানে, গাড়িতে আর ট্রেনে — সংখ্যা তাদের বেড়েই চলেছে। আমাদের আক্রমণের জোর যত বাড়ছে সেই অনুপাতে বাড়ছে আহতদের সংখ্যাও।

কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও হাসপাতালের সবাই — সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্য, মাননীয় বিজ্ঞানী যিনি সেই অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে, ওয়ার্ডের মেয়েরা, ক্লোকরুমের পরিচারিকা আর মেয়ে পোর্টাররা পর্যন্ত সবাই ইনস্টিটিউটটির প্রচলিত সমস্ত প্রথার একচুল এদিক ওদিক হতে দেয় না, যদিও তারা ক্লান্ত, মাঝেমাঝে আধ-পেটা থাকতে হয়, পুরো রাত্রির বিশ্রাম কাকে বলে ভুলে গিয়েছে তারা। ওয়ার্ডের মেয়েরা মাঝেমাঝে বিশ্রাম না করে একটানা দু'তিন পালা কাজ করে যায়, এতটুকু অবসর মিললেই ধোয়ামোছা শুরু করে, এক মুহূর্ত নষ্ট হতে দেয় না। নার্সরা শীর্ণ, বুড়িয়ে গিয়েছে তারা, অবসাদে ঠিকমত পা পড়ে না, আগেকার মতই ধবধবে শাদা ওভারঅলে কাজে আসে, ডাক্তারদের সব নির্দেশ আগেকার মতই একচুল এদিক ওদিক না করে কার্যকরী করে। হাউস সার্জনরা রোগীদের বিছানায় দাগটুকু দেখলেই যথারীতি কঠোর মন্তব্য করে, রুমাল দিয়ে দেয়াল, সিঁড়ির থাম্বার রেল আর দরজার হাতল ঘষে দেখে যে কোন ময়লা আছে কিনা। দিনে দুবার, নির্ধারিত সময়ে অধ্যক্ষ নিজে যুদ্ধের আগে যেমন তেমন ওয়ার্ডে রোঁদ দিতে আসেন, পিছু পিছু শাদা ওভারঅল পরনে হাউস সার্জন আর সহকারীর রীতিমত একটা দল: দীর্ঘাকৃতি, টকটকে লাল মুখ বৃদ্ধ অধ্যক্ষটি দারুণ নিয়ম মেনে চলেন, তাঁর প্রশস্ত কপালের উপরে ঘন চুলে পাক ধরেছে, গোঁফজোড়া কালো, জমকালো দাড়িতে শাদার ছিট, নতুন রোগীদের কার্ড পর্যবেক্ষণ করে, অবস্থা যাদের খারাপ তাদের বিষয়ে নির্দেশ দেন।

বিক্ষুব্ধ সেই সব দিনগুলোতে হাসপাতালের বাইরেও তাঁকে অসম্ভব কাজ করতে হত, কিন্তু ঘুম আর অবসরের বালাই না করে নিজের গড়া ইনস্টিটিউটটির দেখাশোনা করার সময় তিনি করে নিতেন। হাসপাতালের কর্মচারীকে কোন ত্রুটির জন্য যখন বকতেন — আর "অকুস্থলেই" বরাবর বকাবকিটা তিনি উচ্চকণ্ঠে গভীর আবেগের সঙ্গে করতেন -- তখন হামেশাই জোর দিয়ে বলতেন যে এমনি কি যুদ্ধকালীন, নিষ্প্রদীপ, হুঁশিয়ারি মস্কো সহরেও ইনস্টিটিউটটিকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করে যেতে হবে, সেটাই হবে হিটলার আর হেরিং গুষ্ঠির মুখের মত জবাব। যুদ্ধকালীন অসুবিধার কোন ছুতোয় তিনি কান দিতেন না, বলতেন কুঁড়ে আর অলস যারা তারা এখান থেকে বিদায় নিয়ে জাহান্নমে যেতে পারে, সময় এখন বেগতিক বলেই ইনস্টিটিউটের সব নিয়ম বিশেষ কড়াভাবে চালু রাখতে হবে। তিনি নিজে রোঁদে আসতেন ঘড়ির কাঁটা ধরে, ওয়ার্ডের মেয়েরা আগেকার মতই তাঁকে দেখে দেয়াল-ঘড়ি মেলাত। বিমান আক্রমণের সময়েও মানুষটির সময়ের কোন নড়চড় হত না। তাঁর প্রেরণায় অবিশ্বাস্য নানা অসুবিধা সত্ত্বেও হাসপাতালের কর্মচারীরা কামাল করত, যুদ্ধের আগেকার সব বন্দোবস্ত চালু রাখতে পেরেছিল তারা।

সকালের রোঁদে ঘোরার সময় একদিন অধ্যক্ষটি — আমরা ওঁকে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বলে ডাকব — দোতলার সিঁড়ির সামনে পাশাপাশি পাতা দুটো খাটের কাছে এলেন।

'এই তামাসার মানে কী?' গরগর করে উঠে তিনি ঝাঁকড়া ভুরুজোড়া কুঁচকিয়ে হাউস সার্জনের দিকে এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করলেন যে সেই চওড়া-কাঁধ, মধ্যবয়স্ক, গম্ভীর চেহারার লোকটি পাঠশালার ছাত্রের মত সম্মানে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল:

'মাত্র কাল রাত্রে এসেছে... বৈমানিক ওরা। এটির উরু আর ডান হাত ভেঙ্গে গিয়েছে। অবস্থা স্বাভাবিক। কিন্তু ওটির,' চোখ বুজে, অনড়ভাবে শুয়ে আছে অতিশীর্ণ লোকটি, বয়স কত বোঝা যাচ্ছে না, তার দিকে দেখিয়ে হাউস সার্জন বলল, 'অবস্থা খুব খারাপ। পায়ের পাতার ওপরদিকটা ভেঙ্গে গেছে, দুটো পায়ে গাংগ্রীন, কিন্তু প্রধানত, শরীরে আর শক্তি নেই। ওদের যে চিকিৎসক এখানে আনেন তিনি বলেন, কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি অবশ্য, যে যার পা ভাঙ্গা সে জার্মান লাইনের ওদিক থেকে আঠারো দিন হামাগুড়ি দিয়ে এসেছে। এটা, অবশ্যই, অতিরঞ্জিত...'

হাউস সার্জনের কথায় কান না দিয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কম্বলটা তুললেন। বুকের উপরে হাত জোড় করে মেরেসিয়েভ শুয়ে আছে। নতুন ফরসা সার্ট আর চাদরগুলোর পটভূমিতে কালো চামড়ায় মোড়া হাতদুটো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তা থেকে মানুষের অস্থি সংস্থানের বিষয়ে লোকে জেনে নিতে পারে। আস্তে আস্তে কম্বলটা নামিয়ে রেখে, হাউস সার্জনকে বাধা দিয়ে অধ্যাপক গরগর করে বললেন:

'ওদের এখানে রাখা হয়েছে কেন!'

'করিডরে আর জায়গা নেই। আপনি নিজেই ত...'

'আমি নিজে! আমি নিজে! ৪২ নং ঘরটার কী হল?'

'ওটা কর্ণেলের ওয়ার্ড।'

'বটে!' চেঁচিয়ে উঠলেন অধ্যাপক। 'কর্ণেলের ওয়ার্ড। কোন নির্বোধের আবিষ্কার এটা!'

'আমাদের কিন্তু বলা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরদের জন্যে একটা কামরা আলাদা করে রাখতে!'

'বীর, বীর বটে! এই যুদ্ধে সবাই বীর! কিন্তু আমাকে কী শেখাবার চেষ্টা করছ? হাসপাতালটার ভার কার হাতে? এদের দুজনকে এক্ষুণি ৪২ নং ঘরে নিয়ে যাও। "কর্ণেলের ওয়ার্ড!" যতো সব বাজে কথা!'

এগিয়ে গেলেন অধ্যাপক, পিছু পিছু এখন বিনীতভাবে যাচ্ছে অনুচরবর্গ, কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে মেরেসিয়েভের বিছানায় ঝুঁকে পড়ে ওর কাঁধে নিজের ফোলা-ফোলা হাত রাখলেন তিনি, নানা রকমের ডিস্‌ইনফেকটাণ্টের ঝাঁঝে হাতের চামড়া উঠে যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করলেন:

'জার্মান লাইনের ওধারে দু হপ্তার বেশী তুমি হামাগুড়ি দিয়েছিলে, কথাটা কী সত্যি?'

প্রত্যুত্তরে ক্ষীণকণ্ঠে মেরেসিয়েভ জিজ্ঞেস করল, 'আমার কী গাংগ্রীন হয়েছে?'

দরজার কাছে অনুচরবর্গ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে অধ্যাপক বৈমানিকের দুঃখ আর উৎকণ্ঠায় ভরা বড়ো কালো চোখে চোখ রেখে কোন ভণিতা না করে বললেন:

'তোমার মত লোককে ধাপ্পা দেওয়া পাপ। হ্যাঁ, গাংগ্রীন হয়েছে। কিন্তু মুষড়ে পড়ো না। এমন কোন রোগ নেই যা সারানো যায় না, ঠিক যেমন এমন কোন অবস্থা নেই যা বদলানো যায় না। মনে রেখো! ব্যস।'

আর লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন দীর্ঘাকৃতি চটপটে মানুষটি। একটু পরেই করিডরের কাচের দরজা দিয়ে তাঁর গরগরানির দূর আওয়াজ এল।

'মজার লোক বটে!' ভারী চোখে পশ্চাদপসারণী মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে মেরেসিয়েভ বলল।

'লোকটার মাথা খারাপ। কী বলল শুনলে ত? আমাদের দেখিয়ে রোয়াব নিচ্ছে। এ সব ভিজে বেড়ালদের খুব চিনি,' নিজের বিছানা থেকে বাঁকা হাসি হেসে কুকুশকিন সাড়া দিল, 'তাহলে কর্ণেলের ওয়ার্ডে আমাদের রেখে কৃতার্থ করে দেবে!'

'গাংগ্রীন,' অস্ফুট স্বরে বলল মেরেসিয়েভ, বিষণ্ণভাবে পুনরুক্তি করল, 'গাংগ্রীন ...'

২

তথাকথিত "কর্ণেলের ওয়ার্ডটি" দোতলার করিডরের এক প্রান্তে। দক্ষিণ আর পূবমুখো জানলাগুলো, ফলে সব সময়ে সূর্যের আলো পাওয়া যায়, এক বিছানা থেকে অন্য বিছানায় আস্তে আস্তে আলোর রেখা সরে সরে যায়। ওয়ার্ডটা বড় নয়। কাঠের মেঝেতে কালো কালো দাগ থেকে বোঝা যায় আগে দুটি মাত্র খাট, খাটের ধারে দুটো আলমারি আর মাঝখানে একটা গোল টেবিল ছিল। সে জায়গায় এখন চারটে খাট। একটাতে শুয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা একটি আহত লোক, কাপড়ে-জড়ানো নবজাত শিশুর মত দেখাচ্ছে তাকে। চিৎ হয়ে শুয়ে ব্যান্ডেজের ফাঁকে শূন্য অনড় দৃষ্টিতে ঘরের ছাতের দিকে তাকিয়ে আছে। আলেক্সেই'র পাশের বিছানায় শুয়ে আর একজন, কুঞ্চিত দাগদুষ্ট সৈনিকসুলভ মুখ, পাতলা বিবর্ণ গোঁফ, লোকটি খুব উপকারপরায়ণ, গপ্পে আর চটপটে।

হাসপাতালে তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সন্ধ্যা হতে না হতে আলেক্সেই জানতে পারল গুটি-মুখ লোকটি সাইবেরিয়ান, যৌথখামারের সভাপতি সে আর শিকারী, সৈন্যবাহিনীতে স্নাইপার ছিল, কাজটা বেশ ভালোই করত। ইয়েল্‌নিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধগুলির সময়ে ও, ওর দুই ছেলে আর জামাই সাইবেরিয়ান বাহিনীতে লড়াই'এ নামে, সে-সময় থেকে শুরু করে সত্তরটি ফ্যাশিস্টকে, ওর ভাষায়, "একে একে সাবাড় করেছে" সে। সোভিয়েত

ইউনিয়নের বীর খেতাব পেয়েছে, নিজের নাম বলাতে সকৌতূহলে আলেক্সেই এই ঘরোয়া চেহারার মানুষটির দিকে তাকাল। সৈন্যবাহিনীতে নামটা বেশ চেনা সে-সময়ে, বড়ো বড়ো খবরের কাগজগুলো ওর বিষয়ে এমন কি সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখেছিল। হাসপাতালের সবাই -- নার্সরা, হাউস সার্জনটি, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ নিজে সম্মান দেখিয়ে ওকে স্তেপান ইভানভিচ বলে ডাকত।

ওয়ার্ডের চতুর্থ বাসিন্দেটি, যার আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজে ঢাকা, সারা দিন নিজের সম্বন্ধে একটি কথা বলেনি; সত্যি বলতে, কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরোয়নি। কিন্তু পৃথিবীর সবকিছু বিষয়ে স্তেপান ইভানভিচ ওয়াকিবহাল, সে মেরেসিয়েভকে আস্তে আস্তে ওর কাহিনীটা শোনায়। ওর নাম গ্রিগরি গভজদেভ, ট্যাঙ্ক-বাহিনীর লেফটেনাণ্ট, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব ও-ও পেয়েছে। ট্যাঙ্ক স্কুল থেকে পাস করে শুরু থেকেই লড়াই'এ ছিল। ব্রেস্ত-লিতভস্কের দুর্গের কাছাকাছি কোথায়, সীমান্তে যুদ্ধের প্রথম স্বাদ ও পায়। বেলস্তকের কাছে বিখ্যাত ট্যাঙ্ক-যুদ্ধে ওর ট্যাঙ্কটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু অন্য একটা ট্যাঙ্কে, যার কম্যাণ্ডার নিহত হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ চেপে ট্যাঙ্ক ডিভিশনের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে মিনস্কের দিকে যে-সব সৈন্যরা হটে যাচ্ছিল তাদের আগলে ও নিয়ে যায়। বুগের যুদ্ধে ও আহত হয়, দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটিও নষ্ট হয়। আবার অন্য একটা ট্যাঙ্কে, তারো কম্যাণ্ডার মারা গিয়েছিল, ও চলে যায়, আর একটি ট্যাঙ্ক কম্পানির ভার নেয়। পরে ও দেখল শত্রুপক্ষের একেবারে পিছনে পড়ে আছে, তখন তিনটে ট্যাঙ্ক নিয়ে একটা ভ্রাম্যমাণ দল গড়ে প্রায় এক মাস জার্মান লাইনের অনেক পিছনে থাকে, যানবাহন আর জার্মান সৈন্যদের খুব ভোগায়। যুদ্ধ যেখানে হয়ে গিয়েছে সেই সব জায়গা থেকে পেট্রল, গোলাগুলি আর যন্ত্রপাতি জোগাড় করে ওরা চালায়। রাস্তার ধারে ধারে সবুজ নিচু জায়গায়, বনে আর জলায় সব রকমের ভাঙ্গা যন্ত্রের কোন অভাব ছিল না।

দরগবুজের কাছাকাছি একটা জায়গায় তার জন্ম। ট্যাঙ্কের লোকেরা নিয়মিতভাবে রেডিও-সেটে সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহার পেত, তা থেকে গ্রিগরি যখন জানতে পেল যে যুদ্ধের গতি ওর জন্মস্থানের কাছে এসে পড়েছে তখন আর নিজেকে সামলাতে পারেনি, তিনটে ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়ে ও নিজে আর আটজন উত্তরজীবী বনের মধ্যে দিয়ে চলল নিজেদের বাহিনীতে আবার যোগ দেবার জন্য।

যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে, বিস্তৃত মাঠে এঁকেবেঁকে প্রবহমান ছোট একটি নদীর ধারে তার ছোট গ্রামটিতে এসে গভজ্‌দেভ ছিল ছুটির সময়। ওর মা, গ্রামের স্কুলে পড়াতেন তিনি, বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়াতে বাড়ি আসার জন্য ওর বাবা ওকে তার করেন। ওর বাবা পুরোনো কৃষিবিদ আর শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের আঞ্চলিক সোভিয়েতের সদস্য।

গভজ্‌দেভের মনে পড়ে গেল স্কুলের কাছে কাঠের নিচু ঘরটা, ছোটখাটো শীর্ণদেহ ওর মা অসহায়ভাবে পুরোনো সোফায় শুয়ে আছেন, পুরোনো ধরনের সানটুঙ্গ কোট পরনে ওর বাবা মাব শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে কাশছেন আর পাকা ছোট দাড়িতে উৎকণ্ঠায় টান দিচ্ছেন; ওর ছোট্ট তিনটি বোন, কালো চুল তাদের, মায়ের চেহারার সঙ্গে তাদের খুব আদল আছে। আর মনে পড়ল পাতলা, নীল-চোখ জেনিয়ার কথা, গ্রামের ডাক্তার সে, ঘোড়ার গাড়িতে রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ওর সঙ্গে এসেছিল বিদায় জানাতে। প্রত্যেক দিন ওকে চিঠি দেবে কথা দিয়েছিল গভজ্‌দেভ। বেলরুশিয়ার পদদলিত মাঠেঘাটে আর পোড়া জনহীন গ্রামে বন্য জন্তুর মত লুকিয়ে, সহর আর বড়ো রাস্তা এড়িয়ে যাচ্ছে সে, ব্যথায় বুক টনটন করে উঠছে, চেষ্টা করছে আঁচ করতে নিজের গ্রামে ফিরে কী দেখবে, ভাবছে নিজের লোকজন চলে যেতে পেরেছে কিনা, না পেরে থাকলে তাদের কপালে কী জুটেছে।

গ্রামে পৌঁছিয়ে যা দেখল তা তার অশুভতম ধারণারও বাইরে। ভিটে নেই, আত্মীয়স্বজন নেই, জেনিয়া নেই, গ্রামটি পর্যন্ত নেই। আধো-পাগলী একটা বুড়ী নাচার ভঙ্গীতে পা দুলিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করে ঝলসানো জিনিসের মধ্যে স্টোভে কী একটা রান্না করছিল, তার কাছে গভজ্‌দেভ শুনল যে ফ্যাশিস্টরা যখন কাছাকাছি এসে পড়ে তখন ওর মা এত অসুস্থ যে কৃষিবিদ আর মেয়েরা ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বা ছেড়ে চলে যেতে সাহস করেনি। ফ্যাশিস্টরা জানতে পারল যে শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের আঞ্চলিক সোভিয়েতের একজন সদস্য আর তার পরিবার গ্রামে থেকে গিয়েছে। তারা সবাইকে ধরে সেই রাত্রেই বাড়ির সামনের বার্চগাছটিতে লটকে দেয়, বাড়িটা দেয় পুড়িয়ে। বুড়ীর কাছে এও শুনল যে গভজ্‌দেভ পরিবারের হয়ে মিনতি জানাতে জেনিয়া গিয়েছিল ঊর্ধ্বস্তন অফিসারের কাছে, অফিসারটি নাকি ওকে ভোগ করতে চায়, ওকে নাকি অনেকক্ষণ উৎপীড়ন করে তারা। ঠিক কী হয়েছিল বুড়ী সেটা জানে না, কিন্তু যে বাড়িতে অফিসারটি আস্তানা গেড়েছিল তার পরের দিন সে বাড়ি থেকে

জেনিয়ার মৃতদেহ বের করে আনা হয়, নদীর ধারে দুদিন দেহটি পড়ে ছিল। পরে যৌথখামারের আস্তাবলে রাখা তাদের পেট্রলের ট্যাংকে কেউ আগুন লাগিয়ে দেওয়াতে জার্মানরা সমস্ত গ্রামটা পুড়িয়ে দেয়। এটা ঘটে মাত্র পাঁচ দিন আগে।

গভজ্‌দেভকে বুড়ী নিয়ে গেল ওর বাড়ির ভস্মাবশেষের কাছে, বার্চগাছটা দেখাল। শৈশবে গাছটার একটা মোটা ডালে ওর দোলনাটা ঝুলত। ডালটা শুকিয়ে গেছে, পোড়া ডাল থেকে ঝুলে হাওয়ায় দুলছে পাঁচটা দড়ির গোড়ার দিকটা। হেলেদুলে, বিড়বিড় করে কী একটা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে বুড়ী নদীতে নিয়ে গেল গভজ্‌দেভকে, রোজ যাকে চিঠি লেখার কথা দিয়ে লেখবার সময় পায়নি সেই মেয়েটির দেহ কোথায় পড়ে ছিল দেখাল বুড়ী। নলখাগড়ার খসখস শব্দ। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে গভজ্‌দেভ বনে ফিরে গেল, ওর লোকেরা সেখানে তার অপেক্ষায় ছিল। একটিও কথা বলেনি সে, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি।

জুনের শেষে, জেনারেল কনেভ তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালিয়েছেন, গ্রিগরি গভজ্‌দেভ আর ওর লোকেরা জার্মান লাইন ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে। অগস্টে ওকে নতুন একটা ট্যাংক, "টি-৩৪" দেওয়া হল আর শীতের আগেই ব্যাটেলিয়নের সবাই ওকে "কোন কিছুর পরোয়া করে না" বলে চিনল। ওর সম্বন্ধে নানা গল্প মুখে মুখে চলত, ছাপাও হত, গল্পগুলো অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। একটি রাত্রে পর্যবেক্ষণে গিয়ে ও জার্মান লাইন তীব্র গতিতে ভেঙ্গে ওদের বসানো মাইন এড়িয়ে ট্যাংকের কামান চালায়, ভয়ে বিহ্বল শত্রুদের পেরিয়ে একটি ছোট সহরে পৌছয়, সেই সহরটির অর্ধেক সোভিয়েত বাহিনী ঘেরাও করেছিল, ওধারে গিয়ে নিজেদের দলে আবার যোগ দেয় গভজ্‌দেভ, শত্রুপক্ষের বিড়ম্বনা নেহাৎ কম হয়নি। আর একবার জার্মান লাইনের পিছনে একটি সচল দলের সঙ্গে থাকার সময়ে গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে একটি জার্মান পরিবহন দলকে হঠাৎ আক্রমণ করে ওদের ঘোড়া আর গাড়ি গুঁড়িয়ে দেয় ট্যাংকের চাকায়।

শীতকালে ট্যাংকের একটি ছোট দলের পুরোভাগে থেকে ও রুজেভের কাছে গড়বন্দী একটি গ্রামের রক্ষী সেনাদলকে আক্রমণ করে, গ্রামটিতে যুদ্ধ চালনার জন্য শত্রুপক্ষের ছোট একটি হেডকোয়ার্টার ছিল। গ্রামের উপকণ্ঠে ট্যাংকগুলো প্রতিরোধ এলাকা পার হচ্ছে, এমন সময়ে দাহ্য তরল জিনিসের একটা বোতল ওর ট্যাংকে লাগে। ধোঁয়াটে, দমবন্ধ করা অগ্নিশিখায় ট্যাংকটি

আচ্ছন্ন কিন্তু ভেতরের লোকেরা কাজ চালিয়ে গেল। বিরাট একটা মশালের মত গ্রামটির মধ্য দিয়ে ছুটে চলল ট্যাঙ্কটা, সব কটা কামান চালিয়ে এদিকে বেঁকছে, ওদিকে ঘুরছে, পলাতক জার্মান সৈন্যদের ধাওয়া করে পিষে দিচ্ছে। যারা একদা ওর সঙ্গে শত্রুপক্ষের পিছনে ছিল তাদের থেকে বাছাই করে লোক নিয়েছিল গভজ্‌দেভ, ওরা সবাই জানে যে কোন মুহূর্তে তেল কিম্বা গোলাবারুদের বিস্ফোরণে ট্যাঙ্কটা উড়ে যেতে পারে। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে ওদের, গনগনে লাল লৌহাবরণে শরীর পুড়ে যাচ্ছে, কাপড়-চোপড়ে ইতিমধ্যেই আগুন লেগে ধিক ধিক করছে, কিন্তু লড়াই করে চলল ওরা। ভারী একটা গোলা চাকার নিচে ফাটল, উল্টে গেল ট্যাঙ্কটা, বিস্ফোরণের ঝটকায়, কিম্বা তার ফলে ধুলো আর বরফের ঘূর্ণিতে, যে কারণেই হোক আগুন গেল নিভে। গভজ্‌দেভকে ট্যাঙ্ক থেকে বের করা হল, ভয়াবহভাবে পুড়ে গিয়েছে ওর শরীর। বুরুজে মৃত কামানচালকের পাশে বসে ও কামান চালাচ্ছিল…

জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দুমাস পড়ে আছে গভজ্‌দেভ, সেরে ওঠার ব্যাপারে বীতস্পৃহ, কোন কিছুতে আগ্রহ নেই, মাঝেমাঝে বেশ কিছুদিন একেবারে কথা বলে না।

সাঙ্ঘাতিক চোট লাগে যাদের তাদের পৃথিবী হাসপাতাল ওয়ার্ডের চারটে দেয়ালের মধ্যে সাধারণত সীমাবদ্ধ। দেয়ালগুলোর বাইরের পৃথিবীতে কোথাও যুদ্ধ চলেছে, অনেক কিছু ঘটছে যার গুরুত্ব বেশী কিম্বা কম, আবেগ চরমে পৌঁছচ্ছে, আর প্রতিটি দিন প্রত্যেক মানুষের অন্তরে নতুন ছাপ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু যে ওয়ার্ডে ভীষণ আহত লোকেরা থাকে সে ওয়ার্ডে বাইরের জীবনের প্রবেশ নিষেধ, হাসপাতালের বাইরে যে ঝড় অবিরত বইছে তার টুকরো টুকরো চাপা শব্দ মাত্র সেখানে পৌঁছয়। ওয়ার্ডের জীবন নিজস্ব ছোটখাটো ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। রোদে তপ্ত জানলার শার্সিতে অলস, ধুলো-ভরা কোন মাছি বসল, সেটা একটা ঘটনা। ওয়ার্ডের ভার যার হাতে সেই ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা সন্ধ্যেবেলায় হাসপাতাল থেকে সোজা থিয়েটারে যাবে ঠিক করেছে বলে নতুন উঁচু-গোড়ালি জুতো পরেছে, সেটা একটা খবর। খোবানীর টকে সবায়ের ঘেন্না ধরে গিয়েছে. মধ্যাহ্ন-ভোজনের তৃতীয় পদে তার বদলে বদরীর সরবৎ পরিবেশন করা হল, আলাপ আলোচনার বিষয় সেটা।

কিন্তু ভীষণ আহত লোকের উৎকণ্ঠ দীর্ঘ, হাসপাতাল দিনগুলি যেটা

ভরিয়ে রাখে, তার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্র যেটা সেটা হল তার নিজের ক্ষতস্থান, এই ক্ষতই ত সৈন্যদের সারি থেকে, যুদ্ধের কঠোর জীবন থেকে তাকে ছিটকে বের করে মোলায়েম আর আয়েসী বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে, শোওয়াবার মুহূর্ত থেকে বিছানাটার প্রতি তার বিদ্বেষ। ক্ষতস্থানের কথা, স্ফীতি কিম্বা হাড় ভাঙার কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘুমোয়, স্বপ্ন দেখে সে বিষয়ে, ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায় স্ফীতিটা কম কিনা, আঙ্গিক প্রদাহ মিলিয়ে গিয়েছে কিনা, জ্বর বেড়েছে কি কমেছে। রাত্রে জাগ্রত কানে সামান্য খসখস শব্দটুকু যেমন মাত্রাতিরক্তভাবে বেশী শোনায়, তেমন এখানেও নিজের ব্যাধির বিষয়ে অবিরত একাগ্র চিন্তা ক্ষতের যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তোলে, অধ্যাপকের গলায় সামান্য স্বরবিভেদটুকু ধরার আর তাঁর মুখের ভাব থেকে ব্যাধির গতি আঁচ করার জন্য সভয়ে, কম্পিত হৃদয়ে ব্যগ্র হয়ে থাকে এমন কি তারাও যাদের চারিত্র্যবল আর সহিষ্ণুতা অসামান্য, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা মৃত্যুর পরোয়া করেনি।

হামেশাই অভিযোগ করে কুকুশকিন, গজগজ করে। ওর মনে হয় যেখানে চোট লেগেছে সেখানটা ভালো করে বাঁধা হয়নি, বন্ধফলক খুব কষে বাঁধা হয়েছে, ফলে হাড়গুলো ঠিকমত জোড়া লাগবে না, আবার তাদের নতুন করে বসাতে হবে। গ্রিশা গভজ্‌দেভ বিষণ্ণ আধো-ঘোরে আচ্ছন্ন, কোন কথা বলে না সে। কিন্তু ব্যাণ্ডেজ বদলাবার সময়ে ক্লাভদিয়া মিখাইলভ্না যখন ওর ক্ষতস্থানে প্রচুর পরিমাণে ভ্যাসেলিন ছড়াত তখন কী ব্যগ্র অসহিষ্ণুভাবে ও নিজের স্ফীত শরীর আর ছিন্নভিন্ন চামড়ার দিকে তাকিয়ে দেখত, ডাক্তারদের সলাপরামর্শ কী আগ্রহে শুনত, সেটা কারো নজর এড়াত না। ওয়ার্ডে একমাত্র স্তেপান ইভানভিচই চলাফেরা করতে পারে, অবশ্য প্রায় একেবারে কুঁজো হয়ে; খাটের শিক আঁকড়ে যেতে যেতে শাপান্ত করত তার সর্বনাশের কারণ সেই "নচ্ছার বোমাটাকে" আর চোট লাগার ফলে আসা "ঘৃণ্য সায়োটকাকে"।

নিজের ভাব গোপন করার চেষ্টা করত মেরেসিয়েভ, এমন ভাব দেখাত যে ডাক্তাররা পরস্পরকে কী বলছে তা শোনার কোন আগ্রহ তার নেই। কিন্তু যতবার তড়িৎ চিকিৎসার জন্য পায়ের ব্যাণ্ডেজ খোলা হত আর ওর নজরে আসত যে ভয়াবহ স্ফীতিটা আস্তে আস্তে, কিন্তু সমানে, পায়ের পাতার উপর হয়ে আসছে ততবার আতঙ্কে বিস্ফারিত হত ওর চোখ।

অস্থির বিষণ্ণ হয়ে পড়ল মেরেসিয়েভ। ঘরে কোন রোগী বেফাঁস ঠাট্টা

করল হয়ত, বিছানার চাদরে একটা ভাঁজ পড়েছে, ওয়ার্ডের বৃদ্ধা পরিচারিকার হাত থেকে ঝাঁটা খসে পড়েছে, রাগে অধীর হয়ে পড়ত সে, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করত। এটা সত্যি অবশ্য যে হাসপাতালের বাঁধাধরা আর ক্রমশ বাড়ানো খাবারে ওর শক্তি ফিরে এল, ব্যাণ্ডেজ বদলাবার কিম্বা তড়িৎ চিকিৎসার সময়ে ওর উৎকট দেহ দেখে ডাক্তারী ছাত্রীরা আর ভয়ে চমকে উঠত না। কিন্তু শরীরে শক্তি যত বাড়ছে তত খারাপ হচ্ছে পাদুটো। পায়ের পাতার উপর দিকটা ফুলে আর দেখা যায় না, পায়ের গাঁট বেয়ে প্রদাহটা ছড়াচ্ছে। পায়ের আঙুলগুলো একেবারে অসাড়, ডাক্তার ছুঁচ দিয়ে খোঁচা দিতেন, অনেকখানি ফুঁড়তেন, কিন্তু আলেক্সেই'র একেবারে লাগত না। নতুন একটা পদ্ধতিতে — বিচিত্র তার নাম "অবরোধ" — স্ফীতিটা আটকাতে ডাক্তারেরা সমর্থ হল, কিন্তু পায়ের যন্ত্রণা বেড়েই গেল। প্রায় অসহ্য সে যন্ত্রণা। দিনের বেলায় বালিশে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকত আলেক্সেই। রাত্রে ওকে মরফিয়া দিত ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা।

ডাক্তারদের সলাপরামর্শের সময় "অঙ্গচ্ছেদ" — এই ভয়াবহ শব্দটি ক্রমশ বেশী শোনা যেতে লাগল। মাঝেমাঝে আলেক্সেই'র বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ জিজ্ঞেস করতেন:

'হামাগুড়িতে ওস্তাদ লোকটি আজ কেমন আছে? পাদুটো হয়ত কেটে ফেলব, কী বলো? কচাৎ করে একটা টান, ব্যস, ওদুটো আর থাকবে না!'

আলেক্সেই শিরশির করে উঠত। দাঁতে দাঁত চেপে ধরত যাতে চেঁচিয়ে না ওঠে, মাথা নাড়াত শুধু, আর অধ্যাপক গরগর করে বলতেন:

'তাহলে সয়ে যাও, সয়ে যাও, তোমার ব্যাপার এটা। দেখা যাক এতে কী হয়।' চিকিৎসার নতুন একটা নির্দেশ দিতেন তিনি।

অধ্যাপক চলে যেতেন, দরজা বন্ধ হয়ে গেল, করিডরে ওঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। তখনো চোখ বুজে শুয়ে থাকত মেরেসিয়েভ। "পাদুটো, আমার পাদুটো!" ওদুটো কি বাদ দিতে হবে, নিজের কামিশিনের খেয়াঘাটের পঙ্গু মাঝি বুড়ো আর্কাশার মত কাঠের পা লাগিয়ে চলতে হবে? ওই বুড়োটার মত স্নান করার সময় পাদুটো খুলে ঘাটে রেখে, হামাগুড়ি দিয়ে বাঁদরের মত জলে নামতে হবে?

আরো একটি ঘটনায় ওর তিক্ত দুর্ভাবনা সব বেড়ে গেল। হাসপাতালে পৌঁছিয়ে প্রথম দিনেই কামিশিন থেকে আসা চিঠিগুলো ও পড়েছিল। তিনকোণায় ভাঁজ-করা মায়ের ছোট চিঠিগুলো যথারীতি সংক্ষিপ্ত, তাদের



অর্ধেকটা আত্মীয়দের সাদর সম্ভাষণে ভরা, ঈশ্বরের কৃপায় সবাই ভালো আছে জানানো হয়েছে, মা'র বিষয়ে ওর ভাবার কোন কারণ নেই, আর অর্ধেকটায় অনুনয় করা হয়েছে যেন নিজের যত্ন ও নেয়, ঠান্ডা না লাগায়, পা না ভেজায়, ঝট করে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে যেন না পড়ে, ধূর্ত জার্মানদের বিষয়ে যেন সাবধান থাকে, ওদের ধূর্ততার কথা প্রতিবেশীদের কাছে অনেক শুনেছেন তিনি। চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু সব সমান, তফাৎটা শুধু এই একটাতে তিনি জানিয়েছেন যে একজন প্রতিবেশিনীকে তিনি আলেক্সেই'র জন্য গির্জায় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তিনি নিজে ধর্মবিশ্বাসী নন বটে, কিন্তু যদি আমাদের মাথার উপরে সত্যি সত্যি কেউ থেকে থাকেন? আর একটি চিঠিতে বলেছেন যে তাঁর বড়ো ছেলেদের জন্য তিনি দুশ্চিন্তায় আছেন, ওরা দক্ষিণে কোথাও যুদ্ধ করছে, অনেক দিন ওদের চিঠি আসেনি; আর শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছেন একটি স্বপ্নের কথা—ভলগায় বসন্ত প্লাবনের সময় তাঁর সব ছেলে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে; মাছ ধরার সফল অভিযান থেকে তারা ফিরে এসেছে, সঙ্গে ওদের বিগত বাবাও ফিরেছেন। আর ওদের জন্য ওদের প্রিয় পিঠে — ভিয়াজিগা পিঠে* — বানিয়েছেন তিনি। প্রতিবেশীরা ব্যাখ্যা করে বলেছে স্বপ্নটির মানে হল এই যে ওঁর একটি ছেলে রণাঙ্গন থেকে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। সেজন্য তিনি আলেক্সেইকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন যেন উপরওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে যে অন্তত একদিনের জন্য বাড়ি ফিরতে পারে কিনা।

নীল খামগুলো, স্কুলের মেয়ের বড়ো বড়ো স্পষ্ট হাতে ঠিকানা লেখা, চিঠিগুলো লিখেছে কারখানার শিক্ষানবিশি স্কুলে ওর সহপাঠী একটি মেয়ে। নাম তার ওলগা। কামিশিন করাত-কারখানায় সে এখন টেকনিশিয়ান, একই কারখানায় আলেক্সেই টার্নারের কাজ আগে করত। বাল্যবন্ধু ছাড়াও মেয়েটি আরো কিছু, ওর চিঠিগুলো গতানুগতিক নয়। অবাক হবার কিছু নেই যে এক একটা চিঠি আলেক্সেই কয়েক বার পড়েছে, বারবার তুলে নিয়ে সামান্য কথাগুলো মন দিয়ে দেখেছে, যাতে তাদের মধ্যে অন্য কোন আনন্দমুখর, গোপন অর্থ উদ্ধার করতে পারে, যদিও চিঠিগুলোতে ঠিক কী যে চায় ও সেটা ওর নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

মেয়েটি লিখেছে যে কাজে ডুবে আছে, এমন কি রাত্রেও বাড়ি ফেরে

* স্টার্জন মাছের শিরদাঁড়ার পুর দিয়ে তৈরী পিঠে।

না, অফিসেই ঘুমোয়, যাতে যাতায়াতে সময় নষ্ট না হয়; করাত-কারখানাটা এখন দেখলে হয়ত আলেক্সেই চিনতেই পারবে না, অবাক হয়ে যাবে, আনন্দে অধীর হয়ে যাবে যদি কারখানায় এখন কী তৈরী হচ্ছে সেটা জানতে পারে। প্রসঙ্গত লিখেছে, ছুটির বিরল দিনে, মাসে একদিনের বেশী ছুটি নেই, ও আলেক্সেই'র মা'কে দেখতে যায়, বৃদ্ধা ছেলেদের কোন খবর না পাওয়াতে দুশ্চিন্তায় আছেন, ওঁর সময় খারাপ যাচ্ছে, হালে শরীর খারাপ হয়েছে। মেয়েটি বিশেষ অনুরোধ করেছে যেন আলেক্সেই আরো বেশী, আর আরো বড়ো করে চিঠি দেয় ওঁকে, নিজের বিষয়ে কোন দুঃসংবাদ দিয়ে ওঁকে যেন বিচলিত না করে, কারণ, খুব সম্ভব, আলেক্সেই'ই ওঁর একমাত্র ভরসা এখন।

ওলগার চিঠি বারবার পড়ে আলেক্সেই ধরতে পারল ওকে স্বপ্নের কথাটি বলার পিছনে মায়ের সরল ফন্দিটি কী। বুঝতে পারল ওকে দেখার জন্য মা ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, ওঁর ভরসা এখন সে; এটাও বুঝতে পারল যে ওঁকে আর ওলগাকে নিজের পায়ের কথা লিখলে কী ভীষণ আঘাত পাবে তারা। কী করা উচিত অনেকক্ষণ ভাবল আলেক্সেই, কিন্তু সত্যি কথা লেখার সাহস হল না। ঠিক করল কথাটা কিছু দিন চেপে যাবে, ওদের দুজনকেই লিখবে ও ভালো আছে, যুদ্ধ চলছে না এমন একটা জায়গায় ওকে বদলি করা হয়েছে; ঠিকানা বদল হয়েছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য লিখল যে পিছনের একটি দলের সঙ্গে বিশেষ কাজ করতে দেওয়া হয়েছে ওকে, সেখানে অনেক দিন থাকতে হবে।

আর এখন বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে পরামর্শের সময়ে ডাক্তাররা যখন "অঙ্গচ্ছেদের" কথা প্রায়ই বলতে আরম্ভ করল তখন বিভীষিকায় অভিভূত হয়ে যেত আলেক্সেই। পঙ্গু হয়ে কী করে বাড়ি ফিরবে কামিশিনে? কাঠের পাদুটো কী করে দেখাবে ওলগাকে? কী সাঙ্ঘাতিক আঘাতই না মা পাবেন, অন্য ছেলেদের কোনও খবর নেই, তার জন্য, একমাত্র ছেলের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তিনি। ওয়ার্ডের গুমোট বিষণ্ণ স্তব্ধতায় শুয়ে শুয়ে এই সব কথা ভাবত আলেক্সেই, কানে আসত কুকুশকিনের ছটফটে শরীরের চাপে ওর গদির স্প্রিংগুলোর ক্রুদ্ধ কিঁচ কিঁচ আওয়াজ, নির্বাক ট্যাঙ্ক-অফিসারের দীর্ঘশ্বাস; আর জানলায় দাঁড়িয়ে শার্সিতে আঙুল দিয়ে শব্দ করছে প্রায় নুয়ে-পড়া স্তেপান ইভানভিচ, দিনের বেশীর ভাগ জানলার কাছে কাটায় সে।

"পাদুটো কাটা হবে? না, সেটা ছাড়া আর যাকিছু হোক! তার চেয়ে মরা অনেক ভালো... "অঙ্গচ্ছেদ" -- কী ভয়াবহ, অমানুষিক শব্দটা। যেন

কেউ ছোরা মারছে, তার মত। অঙ্গচ্ছেদ? কখনোই নয়, কখনোই হতে দেব না সেটা!" আলেক্সেই ভাবত। স্বপ্নে এই ভয়াবহ কথাটি এল প্রকাণ্ড একটা ধাতব মাকড়সার আকারে, ধারালো বাঁকা নখরে তার মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে সেটা।

৩

৪২ নং ঘরে মাত্র চারজন রোগী, একসপ্তাহ কাটল। কিন্তু তারপরে একদিন ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা এল, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে, সঙ্গে দুজন আর্দালী, রোগীদের বলল একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে জায়গা করে দিতে হবে। স্তেপান ইভানভিচের খাটটা একেবারে জানলার কাছে নিয়ে যাওয়া হল, বেজায় খুসি তাতে সে। তার খাটের পাশে একটা কোণে রাখা হল কুকুশকিনের খাট, খালি জায়গাটায় বসানো হল একটি সুন্দর, নিচু, স্প্রিং-দেওয়া নরম গদির খাট।

ভয়ানক চটে উঠল কুকুশকিন। মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, বিছানার পাশের তাকে ঘুঁষি মেরে, তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে নার্সকে, হাসপাতালকে, এমন কি ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে গালিগালাজ করল, ভয় দেখাল যে কাউকে না কাউকে নালিশ করবে, আর রাগে এমন দিশে হারাল যে আলেক্সেই বেদে চোখে অগ্নিবান হেনে এক ঝটকায় ওকে বাধা না দিলে আর একটু হলে বেচারী ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে বাটি ছুঁড়ে মেরে বসত।

ঠিক সেই মুহূর্তে পঞ্চম রোগীটিকে ঘরে আনা হল।

খুব ভারী লোক নিশ্চয়ই, কেননা স্ট্রেচার-বাহকদের পা ফেলার তালে তালে স্ট্রেচারটা নুয়ে পড়ে কিঁচ কিঁচ করছে। বালিশে অসহায়ভাবে এদিকে ওদিকে হেলে পড়ছে একটা গোল, কামানো মাথা। চওড়া, হলদে, মোমের মত মুখটা প্রাণহীন মনে হচ্ছে। ভরাট, বিবর্ণ ঠোঁটে যন্ত্রণার অনড় ছাপ আঁকা।

মনে হল নতুন রোগীটির জ্ঞান নেই। কিন্তু স্ট্রেচারটা মেঝেতে রাখার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলল সে, কনুই'এ ভর দিয়ে উঠে সকৌতূহলে ওয়ার্ডের চারিদিকে তাকিয়ে কেন জানি না স্তেপান ইভানভিচকে চোখ ঠারল, যেন বলতে চায়: "কেমন সময় কাটছে, খুব খারাপ নয় মনে হচ্ছে?" তারপর জোরে কেশে উঠল সে। বোঝা গেল ওর ভারী শরীরটা ভয়ানক বিপর্যস্ত হয়েছে, দারুণ যন্ত্রণা পাচ্ছে সে। প্রথম দৃষ্টিতে ওর বিরাট স্ফীত দেহটার চেহারা ভালো লাগল না আলেক্সেই'র কী কারণে যেন, বেজারভাবে দেখল

দুজন আর্দালী, দুজন ওয়ার্ডের পরিচারিকা আর নার্সটি, সবাই মিলে স্ট্রেচার থেকে তাকে তুলে বিছানায় শোয়াল। দেখল ওর শক্ত, কাঠের কুঁদোর মত একটা পা'কে বেকায়দায় ওরা ঝটকা দেওয়াতে ও হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে ঘেমে উঠল, ঠোঁটদুটো যে যন্ত্রণায় থর থর করে কেঁপে উঠল সেটাও চোখে পড়ল। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ বেরোল না রোগীটির, শুধু দাঁতে দাঁত চেপে রইল।

বিছানায় শুয়েই কম্বলের চাদরটার পাড় ঠিক করে নিল সে, সঙ্গে-আনা বই আর খাতাপত্র বিছানার পাশের তাকটাতে ঠিক করে গুছিয়ে রাখল, টুথ-পেস্ট আর বুরুশ, ও-ডি-কলোন, দাড়ি কামাবার জিনিস আর সাবানের বাক্স নিচের তাকটাতে সাজিয়ে রেখে বিচক্ষণ দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে হাতের কাজ সব দেখল একবার, তারপর, চটপট যেন ঘরোয়া লাগছে এমন ভাবে, গভীর গমগমে গলায় বলল:

'বেশ, এবার আমাদের আলাপ পরিচয় হোক। রেজিমেণ্টাল কমিসার সেমিওন ভরোবিওভ। চুপচাপ লোক। ধূমপান করি না। অনুগ্রহ করে আপনাদের দলে আমাকে যোগ দিতে দিন।'

ওয়ার্ডের অন্যান্যদের দিকে ধীরে আগ্রহে তাকাল সে, তার তীক্ষ্ম সংকীর্ণ সোনালী চোখের ধারালো বিচক্ষণ দৃষ্টি মেরেসিয়েভের নজরে পড়ল।

'বেশী দিন আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আপনারা কী করবেন জানি না, কিন্তু এখানে বেশী দিন শুয়ে থাকার সময় আমার নেই। ঘোড়সওয়াররা আমার অপেক্ষায় আছে। বরফ চলে গেলে, রাস্তাঘাট শুকিয়ে গেলেই কেটে পড়ব। "আমরা হচ্ছি লাল ফৌজের অশ্বারোহী দল, আর আমাদের কথা নিয়ে..." ' বকবক করে চলল ও, ওর প্রফুল্ল, গভীর খাদের কণ্ঠস্বরে ওয়ার্ড গেল ভরে।

'আমাদের কেউই বেশী দিন এখানে নেই। বরফ গলতে শুরু করলেই সবাই আমরা কেটে পড়ব, পা বাড়িয়ে একেবারে ৫০ নং ওয়ার্ডে চলে যাব, খিটখিটিয়ে বলে উঠে কুকুশকিন, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল।

হাসপাতালে ৫০ নং ওয়ার্ড ছিল না। লাশঘরের নাম ওটা, রোগীদের দেওয়া। এর মধ্যে কমিসার সেটা জেনেছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু ইয়ার্কিটার অশুভ অর্থ তৎক্ষণাৎ তার কাছে ধরা পড়ল। যাই হোক, কিছু মনে সে করল না, শুধু বিস্ময়ে কুকুশকিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আর আপনার বয়স কত, বন্ধু? ওহে দাড়িওয়ালা! অকালে বুড়িয়ে গেছেন মনে হচ্ছে!'

৪

৪২ নং'এ নতুন রোগীটির আবির্ভাবে — ওকে ওরা নিজেদের মধ্যে কমিসার বলে ডাকত — ওয়ার্ডের জীবনযাত্রা আমূল বদলে গেল। আসবার দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই এই বিশেষ আহত, ভারী লোকটি সবায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিল, স্তেপান ইভানভিচের ভাষায়, প্রত্যেকেরই মনে নাড়া দেবার মত কলকাঠি ও জোগাড় করে ফেলেছে।

স্তেপান ইভানভিচের সঙ্গে ও প্রাণ খুলে ঘোড়া আর শিকারের গল্প করত, বিষয়দুটি দুজনেরই প্রিয়, দুজনেই ওয়াকিবহাল। মেরেসিয়েভ যুদ্ধের বিষয়ে তত্ত্বমূলক আলোচনা চালাতে ভালোবাসে, তার সঙ্গে বিমান, ট্যাঙ্ক আর অশ্বারোহী বাহিনী প্রয়োগের হালের সমস্ত পদ্ধতি নিয়ে তুমুল তর্ক চলত। কমিসার একটু উত্তেজিতভাবেই প্রমাণ করার চেষ্টা করত যে বিমান আর ট্যাঙ্ক অত্যন্ত কাজের জিনিস হলেও ঘোড়া একেবারে সেকেলে হয়ে যায়নি, ওর মূল্য সবাই আবার টের পাবে। অশ্বারোহী বাহিনীকে যদি ভালো ঘোড়া আবার জোগানো হয়, যদি ট্যাঙ্ক আর কামানের সাহায্য পায়, আর যদি বহুসংখ্যক সাহসী আর বুদ্ধিমান যুবক অফিসারকে ঘোড়েল সেনানায়কদের সাহায্য করতে শেখানো হয়, তাহলে আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী আবার সারা দুনিয়াকে চমক লাগিয়ে দেবে। এমন কি নির্বাক ট্যাঙ্ক-অফিসারের সঙ্গেও কথাবার্তা চালাবার বিষয় কমিসার বের করল। জানা গেল যে বাহিনীতে সে কমিসার হিসেবে ছিল সেটা ইয়াৎসেভোতে লড়াই করে, পরে দুখোভশ্চিনায় জেনারেল কনেভের প্রতি-আক্রমণেও যোগ দেয়, দুখোভশ্চিনাতেই ট্যাঙ্ক-অফিসার ও তার দল জার্মান লাইন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। অসীম আগ্রহে কমিসার দুজনের চেনা গ্রামগুলির নাম করে, কী করে এবং কোথায় জার্মানদের অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছিল তার গল্প করে। ট্যাঙ্ক-অফিসার যথারীতি চুপ করে থাকত বটে, কিন্তু কেউ কথা বললে আগেকার মত আর মুখ ঘুরিয়ে নিত না। ব্যাণ্ডেজে-ঢাকা মুখ দেখা যেত না, কিন্তু মাথা নেড়ে কথায় সায় দিত। কমিসার দাবা খেলার আমন্ত্রণ করাতেই কুকুশকিনের রাগ পড়ে গিয়ে মেজাজ খোশ হয়ে উঠল। দাবার ছক কুকুশকিনের বিছানায় রাখা হল আর নিজের বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে কমিসার "চোখ বেঁধে" খেলল। গজগজে লেফ্‌টেনাণ্ট খেলায় বেকসুর হেরে গেল, তাতে কমিসারের মূল্য ওর কাছে গেল অনেক বেড়ে।

ওয়ার্ডে কমিসারের আবির্ভাবটা মস্কোর প্রথম বসন্তের তাজা জোলো হাওয়ার মত কাজ করল, সকালে পরিচারিকারা জানলাগুলো খুললে যে হাওয়া ঝটকায় ঘরে আসে, রাস্তার উচ্ছল কোলাহলে রোগীর ঘরের গুমোট স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। সজীবতা আনতে কমিসারকে মোটেই বেগ পেতে হত না। সে শুধু বাঁচত, টগবগে জীবনের স্বাদ সতৃষ্ণভাবে গ্রহণ করে যন্ত্রণার জ্বালা ভুলে যেত, কিম্বা ভুলে যেতে বাধ্য করত নিজেকে।

সকালে জেগে উঠে বিছানায় বসে "ব্যায়াম" চলত — হাতদুটো মাথার উপরে তুলে, আর পাশে নামিয়ে শরীরটা একবার এদিকে, একবার অন্যদিকে ঝুঁকিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামাত আর ঘোরাত সমান তালে। মুখ ধোবার জল আনলে বলত যতটা সম্ভব ততটা ঠাণ্ডা জল ওকে দেওয়া হোক; অনেকক্ষণ ধরে চলত হাতমুখ ধোওয়া আর নানারকম আওয়াজ বের করা, তারপর তোয়ালে দিয়ে এত জোর রগড়ানো যে ফুলে-ওঠা শরীরটা লাল হয়ে উঠত; আর ওকে দেখে সেরকম করার দারুণ ইচ্ছে হত অন্যান্য রোগীদের। খবরের কাগজ এলেই নার্সের হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিত কমিসার, সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহার তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলে ধীরেসুস্থে পড়ত যুদ্ধক্ষেত্রের নানা ফ্রণ্ট থেকে পাঠানো যুদ্ধ সংবাদদাতাদের বিবরণ। পড়বার একটা নিজস্ব ভঙ্গী ছিল ওর, সেটাকে "সক্রিয় পঠন" বলা যায়। কোন বিবরণের একটা অংশ মনের মত হয়েছে, কখনো সেটা ফিসফিস করে আবার পড়ে বিড়বিড় করে উঠত, "ঠিক কথা," আর সে-অংশটায় দাগ দিয়ে রাখত; কিম্বা হঠাৎ বলে উঠত, "মিথ্যে কথা বলছে বেটা, জায়গাটার কাছে কক্ষণো ও ছিল না, বিয়ারের বোতলের বদলে জান কবুল করে বলতে পারি! বেটা বদমায়েস! তবুও লেখা চাই!" অতিশয় কল্পনাপ্রবণ একটি যুদ্ধ সংবাদদাতার কী একটা বিবরণীতে একদিন ও এতো চটে গেল যে তৎক্ষণাৎ খবরের কাগজটিতে পোস্ট-কার্ড লেখা হয়ে গেল, বেশ রুষ্টভাবে তাতে জানাল যে এ ধরনের ব্যাপার যুদ্ধে ঘটে না, ঘটতে পারে না, এই "নির্লজ্জ মিথ্যাবাদীর" কলমে রাশ দেওয়া উচিত। অন্য সময়ে কোন বিবরণী পড়ে ভাবতে শুরু করত, বালিশে হেলান দিয়ে খোলা চোখে চিন্তায় ডুবে যেত, কিম্বা অশ্বারোহী বাহিনীর নিজের দলটার কোন গল্প করত, ওর কথা মত দলটার প্রত্যেকেই বীরপুরুষ, প্রত্যেকেই "অসমসাহসী ছোকরা"। তারপর আবার খবরের কাগজ পড়া চলত। আর, বিচিত্র সেটা, ওর এইসব মন্তব্যে, ভাবমুখর নানা অপ্রাসঙ্গিক কথায় শ্রোতাদের মনোযোগে

কোন ছেদ পড়ত না, বরঞ্চ যা ও পড়ছে সেটা আরো ভালো করে বুঝতে তাদের সাহায্য হত।

মধ্যাহ্ন-ভোজন আর চিকিৎসাপর্বের মধ্যে প্রতিদিন দু'ঘণ্টা জার্মান পড়ত ও, কথাগুলো মুখস্থ করত, রচনা করত পূর্ণ বাক্য, আর কখনো কখনো বিজাতীয় কথাগুলোর শব্দে হঠাৎ বিস্মিত হয়ে বলে উঠত:

'ওহে ছোকরারা "মুরগীছানার" জার্মান কী জানেন? "কুহেলহেন"। শুনতে খাসা কথাটা! শুনলেই পালক-ভরা নরম ক্ষুদে কিছু একটা জিনিসের কথা মনে হয়। "ছোট ঘণ্টার" জার্মান কী জানেন? "গ্লকলিং"। ঠুনঠুন একটা ভাব আছে কথাটাতে, তাই না?'

একদিন আর চুপ করে থাকতে না পেরে স্তেপান ইভানভিচ জিজ্ঞেস করল:

'কমরেড কমিসার, কেন আপনি জার্মান শিখতে চান? মিছিমিছি ধকল সহ্য করছেন, তার চেয়ে শরীরের শক্তি বাঁচিয়ে রাখলে কাজ দেবে ...'

বৃদ্ধ সৈনিকের দিকে সেয়ানাভাবে তাকিয়ে কমিসার বলল:

'তাই নাকি? ওহে দাড়িওয়ালা! রুশদের জন্যে এটা কী জীবনের মত জীবন? বার্লিনে যখন হাজির হব তখন কী ভাষায় জার্মান ছুঁড়িদের সঙ্গে কথা বলব, ভাঙ্গা রুশে?'

কমিসারের বিছানার ধারে বসে যেটা স্তেপান ইভানভিচ বলতে চাইল সেটা যুক্তিসঙ্গত; মনে মনে ভাবল এখন অবধি ত যুদ্ধের সীমান্ত মস্কো থেকে খুব বেশী দূরে নয়, জার্মান ছুঁড়িদের কাছে পৌঁছতে এখনো অনেক দিন, কিন্তু কমিসারের গলায় দৃঢ় বিশ্বাসের এমন স্বচ্ছন্দ ছাপ যে স্তেপান ইভানভিচ গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল:

'না, ভাঙ্গা রুশে নয় অবশ্য। কিন্তু তবু, কমরেড কমিসার, নিজের যত্ন নেওয়া আপনার উচিত, যা ভোগান্তি গিয়েছে আপনার!'

'যে ঘোড়াকে তোয়াজে রাখা হয় সেই আগেভাগে ধপাস করে পড়ে। এ কথাটা আগে শোনেননি? আপনার উপদেশ মোটেই সুবিধের নয়, দাড়িওয়ালা!'

ওয়ার্ডে কারো দাড়ি ছিল না, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, কমিসার সবাইকে "দাড়িওয়ালা" বলে ডাকত, আর তার বলার ভঙ্গীতে অসন্তোষজনক কিছু ছিল না, বরঞ্চ ছিল সহৃদয় ঠাট্টার একটা ছাপ, রোগীদের মন তাতে জুড়িয়ে যেত।

দিনের পর দিন কমিসারকে দেখল আলেক্সেই, ওর অফুরন্ত ফুর্তির উৎসটা কী তা বের করার চেষ্টা করত। ও যে ভয়াবহ যন্ত্রণায় ভুগছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘুমিয়ে পড়লে নিজের উপরে আর দখল থাকত না, তখন শুরু হত গোঙানি আর ছটফটানি, দাঁতে দাঁত চেপে ধরা, মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যেত। অবস্থাটার কথা নিজেও জানত সে, তাই দিনের বেলায় জেগে থাকার চেষ্টা করত, কিছু না কিছু একটা করার অভাব হত না। জাগ্রত অবস্থায় সে শান্ত, ভাববিকার হয় না, যেন কোন যন্ত্রণা নেই। ডাক্তারদের সঙ্গে ধীরেসুস্থে আলাপ চালাত, শরীরের আহত স্থানগুলো ওরা ঠুকে ঠুকে দেখার সময়ে ইয়ার্কি করতে ছাড়ত না, শুধু বিছানার চাদর যেভাবে মুচড়ে ধরত আর নাকের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম থেকে আঁচ করা যেত নিজেকে সামলে রাখা ওর পক্ষে কী কঠিন ব্যাপার। অসম্ভব যন্ত্রণা চেপে লোকটা কী করে এরকম উদ্যম, প্রফুল্লতা আর সজীবতা দখলে আনতে পারে বৈমানিক বুঝতে পারত না। হেঁয়ালিটার সমাধানের জন্য আলেক্সেই খুব উদগ্রীব, কারণ ঘুমের ওষুধের মাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও রাত্রে তার ঘুম আসত না, কখনো কখনো সারা রাত চোখ না বুজে শুয়ে থাকে, কম্বল কামড়ে চেষ্টা করত যাতে গোঙানির আওয়াজ কেউ না শোনে।

শরীর পরীক্ষার সময় ডাক্তারদের মুখে ক্রমশ বেশী করে সেই ভয়াবহ কথাটা — "অঙ্গচ্ছেদ" — আসতে লাগল। ভয়াবহ দিনটা এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে আলেক্সেই ঠিক করল পা বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই।

৫

আর সেই দিনটা এসে পড়ল। রোঁদে এসে একদিন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ অনেকক্ষণ ধরে আলেক্সেই'র কালশিটে-নীল আর সম্পূর্ণ অসাড় পায়ে টোকা দিলেন, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওর চোখে চোখ রেখে বললেন. 'দুটোকে কাটতেই হবে!' মড়ার মত শাদা হয়ে গেল বৈমানিকের মুখ, কিন্তু ও একটি কথা বলার আগেই অধ্যাপক কঠোরভাবে আবার বললেন, 'কাটতেই হবে। আর কোন কথা শুনব না, বুঝলে? না কাটলে জাহান্নমে যাবে! বুঝতে পারছ?'

নিজের অনুচরবর্গের দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ওয়ার্ডে গুমোট স্তব্ধতা। পাথরের মত মুখে

মেরেসিয়েভ খোলা চোখে শুয়ে আছে। যেন কুয়াশায় ওর চোখের সামনে ভাসছে বুড়ো মাঝির কালো কদাকার কাঠের পাদুটো, আবার ও দেখল বুড়োটা ভেজা বালুর উপরে হামাগুড়ি দিয়ে বাঁদরের মত জলে নামছে।

'আলিওশা,' কমিসার আস্তে আস্তে ডাকল।

'কী?' সুদূর, অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দিল আলেক্সেই।

'এটা দরকার, ভায়া!'

ঠিক সেই মুহূর্তে আলেক্সেই'র মনে হল মাঝিটা নয়, ও নিজেই কাঠের পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে, আর ওর বান্ধবী, ওর ওলিয়া, বালুময় নদীতীরে দাঁড়িয়ে আছে, পরনের উজ্জ্বল রঙীন ফ্রক হাওয়ায় উড়ছে, পাতলা দীপ্ত সুন্দর মেয়েটি একাগ্রভাবে ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াবে এরকম! নিঃশব্দ কান্নার দমকে ভেঙ্গে পড়ে সে মুখ গুঁজল বালিশে। ওয়ার্ডের সবাই অত্যন্ত বিচলিত। স্তেপান ইভানভিচ বিছানা ছেড়ে উঠে গোঙাতে গোঙাতে পোষাক চড়িয়ে, চটি-পরা পা টেনে টেনে, খাটের শিক ধরে খুঁড়িয়ে চলল আলেক্সেই'র খাটের দিকে, কিন্তু কমিসার ওকে অঙ্গুলি নির্দেশে বারণ করল, যেন বলতে চায়: "বাধা দিও না, প্রাণভরে কাঁদতে দাও ওকে।"

আর সত্যিই, কেঁদে হালকা লাগল আলেক্সেই'র। অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে এল, এমন কি মনে সেই স্বস্তির ভাব এল, বহুদিন বিড়ম্বনা-দেওয়া কোন সমস্যার হেস্তনেস্ত অবশেষে হয়ে গেলে যে স্বস্তি মানুষের মনে আসে। অস্ত্রোপচারাগারে নিয়ে যাবার জন্য সন্ধ্যেবেলায় আর্দালিরা এল, ততক্ষণ একটিও কথা বলল না সে। ঝকঝকে শাদা ঘরটায় গিয়েও একটিও কথা বেরোল না ওর মুখ থেকে। এমন কি যখন বলা হল যে ওর হৃৎপিণ্ডের যা অবস্থা তাতে ওকে অজ্ঞান করা চলবে না, স্থানীয় এ্যানেস্থেটিক দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হবে, তখনো শুধু মাথা নাড়ল আলেক্সেই। অস্ত্রোপচারের সময়ে গোঙাল না, কাতরোক্তি পর্যন্ত করল না। সহজ অস্ত্রোপচারটি করলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ স্বয়ং; যথারীতি নার্স আর সহকারীদের উদ্দেশ্যে তাঁর ক্রুদ্ধ গরগরানি চলছে, যে সহকারীটি আলেক্সেই'র নাড়ী দেখছে তার দিকে কয়েকবার উৎকণ্ঠিতভাবে তাকালেন তিনি।

হাড়গুলো কাটা হল, তখনকার যন্ত্রণা ভয়াবহ; কিন্তু যন্ত্রণায় আলেক্সেই এখন অভ্যস্ত, শাদা পোষাক, গজের মুখোস-পরা লোকগুলো ওর পায়ের কাছে কী করছে বুঝতেও পারল না সেটা।

ওয়ার্ডে পৌঁছিয়ে জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমেই দেখল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার দরদে-ভরা মুখ। আশ্চর্যের বিষয়, কিছু মনে ছিল না ওর, এমন কি অবাক হয়ে ভাবল কেন এই সোনালী-চুল, সহৃদয় সুশ্রী মেয়েটি উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ খুলেছে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ, কম্বলের নিচে ওর হাতে আস্তে চাপ দিল।

'অবাক করে দিয়েছেন আপনি!' বলে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা তক্ষুণি ওর হাত ধরে নাড়ী দেখতে লাগল।

"কী বলছে ও?" ভাবল আলেক্সেই। আর তখনি পায়ে যন্ত্রণার বোধ ফিরে এল, আগেকার মত নিচুতে নয়, উপরে, আর যন্ত্রণাটা আগেকার মত তীক্ষ্ম তীব্র দবদবে নয়, চাপা ব্যথা, যেন হাঁটুর নিচে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ বিছানার ভাঁজ দেখে ও উপলব্ধি করল যে আগেকার তুলনায় শরীরটা ছোট হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু মনে ফিরে এল: চোখ-ঝলসানো শাদা ঘরটা, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের ক্রুদ্ধ গরগরানি, এনামেলের বাটিতে জিনিস রাখার ভারী শব্দ। "হয়ে গিয়েছে তা হলে?" স্বল্প অস্থিরতায় ভেবে আলেক্সেই জোর করে হেসে বলল নার্সকে:

'মনে হচ্ছে ছোট হয়ে গিয়েছি।'

অশুভ হাসি সেটা, মুখবিকৃতির মত। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা বলল:

'ঠিক আছে, এবার আপনার সহজ লাগবে।'

'হ্যাঁ। দেহের বোঝাটা কমে গিয়েছে।'

'ওটা বলবেন না! কিন্তু সত্যি আপনি অবাক করে দিয়েছেন! অনেকে চেঁচায়, অনেককে এমন কি বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু আপনি টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেননি... ওঃ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ!'

গোধূলির আলোয় কমিসারের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'এবার প্যানপ্যানানি থামান! এই চিঠিগুলো দিন, নার্স। কয়েকজনের কপাল ভালো, হিংসে হয় আমার। ভেবে দেখো ত, এতগুলো চিঠি একসঙ্গে পাচ্ছে!'

একগোছা চিঠি কমিসার মেরেসিয়েভকে দিল। আলেক্সেই'র বিমান-রেজিমেণ্ট থেকে এসেছে, ভিন্ন ভিন্ন তারিখে, কিন্তু যেমন করেই হোক একসঙ্গে এসেছে। আর এখন, পাদুটো নেই, শুয়ে শুয়ে দোস্তির চিঠিগুলো

পড়ল আলেক্সেই, কঠিন পরিশ্রমে ভরা বিপদবাধাসঙ্কুল সুদূর জীবনের কথা সেগুলোতে, সেই জীবন ওকে টানছে চুম্বকের মত, কিন্তু সেখানে ফেরার আর কোন উপায় নেই তার। ওর দল থেকে আসা নানা বড়ো আর ছোট খবর সাগ্রহে পড়ল ও: কোর হেডকোয়ার্টার্সের রাজনৈতিক অফিসার আভাস দিয়েছে যে বিমান-রেজিমেন্টটাকে লাল পতাকা খেতাব দেবার সুপারিশ করা হয়েছে; ইভানচুক দুটো পুরস্কার পেয়েছে একসঙ্গে; ইয়াশিন শিকারে গিয়ে একটা শেয়াল মেরেছে, যে কোন কারণেই হোক সেটা লেজবিহীন; আর স্তিওপা রস্তভের দাঁতের কড়া হয়েছে, সেজন্য লেনচ্‌কার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারটা ভেস্তে গিয়েছে — সব খবরে আলেক্সেই'র সমান আগ্রহ। মুহূর্তের জন্য তার মন চলে গেল বনে গুপ্ত সেই বিমান-ঘাঁটিটাতে, চোরা মাটির জন্য যেটিকে বৈমানিকেরা বাপান্ত করত; এখন তার মনে হল পৃথিবীতে ওরকম জায়গা আর নেই।

চিঠিগুলোতে বর্ণিত সব ঘটনা এত মনোযোগ দিয়ে পড়ছে যে বিভিন্ন তারিখগুলো ওর চোখে পড়ল না, দেখল না যে নার্সকে চোখ ঠেরে কমিসার ওর দিকে দেখিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলছে, 'আমার দাওয়াইটা তোমাদের সমস্ত ঘুমের ওষুধের চেয়ে ভালো।' এরকম অবস্থার উদ্ভব হতে পারে ভেবে কমিসার কয়েকটা চিঠি চেপে রেখেছিল, যাতে ওর প্রিয় বিমান-ঘাঁটির খবর আর সাদর সম্ভাষণে ওর সাঙ্ঘাতিক ক্লেশের কিছুটা লাঘব হয়, সে কথাটা আলেক্সেই কখনো জানতে পারেনি। ঝানু সৈনিক কমিসার। তাড়াতাড়ি, যেমন-তেমনভাবে লেখা কাগজের টুকরোগুলোর মূল্য কতটা, যুদ্ধক্ষেত্রে ওষুধ কিম্বা খাবারের চেয়ে অনেক সময় ওদের দাম যে বেশী, সেটা জানা ছিল তার।

আন্দ্রেই দেগর্তিয়ারেঙ্কোর চিঠিটা তার মতই সহজ আর অনাড়ম্বর, সঙ্গে একটা চিরকুট, ছোট, বাঁকা হাতের লেখা, বিস্ময়ের চিহ্নে কণ্টকিত। চিঠিটা হল:

"কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট! কথা রাখেননি, এটা ভালো নয়!!! এখানের বাহিনীতে আপনার কথা প্রায়ই হয়; মিথ্যে বলছি না, ওরা হামেশাই আপনার কথা বলে। কিছুক্ষণ আগে উইং কম্যাণ্ডার খাবার ঘরে বললেন: 'আলেক্সেই মেরেসিয়েভ, মানুষের মত মানুষ ও !!!' আপনি ত জানেন যে শুধু সেরা লোকদের বিষয়েই উনি এভাবে কথা বলেন। শীগগির ফিরে আসুন, সবাই আপনার প্রতীক্ষায় আছে!!! খাবার ঘরের মোটা

লিওলিয়া লিখতে বলছে যে আপনার সঙ্গে আর তর্কাতর্কি করবে না, মধ্যাহ্ন-ভোজনের দ্বিতীয় পদ আপনাকে বারবার তিনবার দেবে, তাতে যদি চাকরীও যায় তাও সই, কিন্তু আপনি কথা রাখেন না, খুব খারাপ কিন্তু সেটা!!! অন্যদের চিঠি দিয়েছেন, আমাকে লেখেননি কিন্তু। তাতে আমার ভয়ানক খারাপ লাগছে, আর সেইজন্যই আলাদা করে চিঠি আপনাকে লিখছি না। কিন্তু দয়া করে আমাকে চিঠি দেবেন — আলাদা খামে — কেমন আছেন, কী করছেন, সবকিছু জানাবেন!..”

মজার চিরকুটটির তলায় সই করা হয়েছে: “আবহাওয়া সার্জেণ্ট”। হাসল মেরেসিয়েভ, কিন্তু ওর চোখে আবার পড়ল নিচে দাগ-দেওয়া সেই কথাগুলো “শীগগির ফিরে আসুন, সবাই আপনার প্রতীক্ষায় আছে!!!” বিছানায় উঠে বসে, পাদুটো যেখানে ছিল সেখানটায় অস্থিরভাবে হাতড়াল, পকেট খুঁজে দেখা গেল জরুরী দলিল একটা হারিয়ে গেছে এমন ভাবে। জায়গাটা ফাঁকা।

শুধু তখনি ওর লোকসানের গুরুত্বটা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করল আলেক্সেই। আর কখনো নিজের রেজিমেণ্টে, বিমান বাহিনীতে, লড়াই'এ ফিরে যেতে পারবে না ও। বিমানে উঠে আকাশ-যুদ্ধে আর কখনো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না, কখনো নয়! পঙ্গু এখন, প্রিয় কাজে আর হাত দিতে পারবে না, এক জায়গায় জড়ের মত থাকতে হবে, বাড়িতে বোঝার মত, পৃথিবী আর ওকে চায় না। আর এরকম চলবে আমরণ।

৬

অস্ত্রোপচারের পরে এ অবস্থায় সবচেয়ে খারাপ যেটা হতে পারে মেরেসিয়েভের তাই হল। ও নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিল। কোন অভিযোগ নেই, কাঁদল না, কখনো খিটখিটে হল না, শুধু নির্বাক হয়ে রইল।

দিনের পর দিন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে মেরেসিয়েভ, ঘরের ছাতের টেরাবাঁকা চিড়ে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

ওয়ার্ডের সাথীরা কথা বললে শুধু “হ্যাঁ” কিম্বা “না” বলে, ঠিক জবাব সেটা হত না প্রায়ই, আবার চুপ করে পলস্তারার কালো একটা চিড়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, দুর্বোধ্য সঙ্কেতচিহ্ন যেন ওটা, ওটার পাঠোদ্ধার যেন ওর মোক্ষ। ডাক্তারের সমস্ত নির্দেশ ও বিনা বাধায় মেনে

চলত, যা ওষুধ খেতে বলা হত তাই খেত, খাবারে রুচি নেই, অবসন্নভাবে ভোজন সেরে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ত।

'ওহে দাড়িওয়ালা!' কমিসার ডাকত। 'কী ভাবা হচ্ছে?'

মুখ ঘুরিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে কমিসারের দিকে তাকাত আলেক্সেই, যেন ওকে দেখতে পায়নি।

'জিজ্ঞেস করছি, কী ভাবছ?'

'কিছু না।'

একদিন ওয়ার্ডে এসে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ তাঁর স্বভাবসুলভ কর্কশ খোলাখুলিভাবে ওকে জিজ্ঞেস করলেন:

'কী হে, হামাগুড়ি-ওস্তাদ, বেঁচে আছ তাহলে? কেমন সময় কাটছে? বীরপুঙ্গব তুমি, সত্যি বলছি! মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয়নি তোমার। এখন বিশ্বাস করি যে জার্মানদের ওখানে থেকে চলে আসার জন্য আঠারো দিন স্রেফ হামাগুড়ি দিয়েছিলে। তোমার বয়সে যত আলু খেয়েছ তার চেয়ে বেশী লোককে কাটাছেঁড়া আমি করেছি কিন্তু তোমার মত আদমী আজ পর্যন্ত আমার হাতে আসেনি।' হাতে হাত ঘষলেন অধ্যাপক, হাতদুটো লাল, চামড়া উঠে আসছে, নখগুলো কালচে হয়ে গিয়েছে। 'মুখ বেঁকাচ্ছ কেন? প্রশংসা করছি আর লোকটা মুখ বেঁকাচ্ছে! চিকিৎসা-বাহিনীতে লেফ্‌টেনান্ট-জেনারেল আমি, তোমাকে হাসতে হুকুম করছি!'

কষ্টে ঠোঁট ফাঁক করে ফাঁপা রবারের মত হাসি মুখে আনল আলেক্সেই, আর ভাবল, "পরিণতিটা এরকম হবে জানলে কষ্ট করে আর হামাগুড়ি দিতাম না। পিস্তলে তিনটে গুলি ত পড়ে ছিল।"

খবরের কাগজে কোন সংবাদদাতা একটি চিত্তাকর্ষক যুদ্ধের বর্ণনা করেছে, সেটা পড়ে শোনাল কমিসার। আমাদের ছ'টা জঙ্গী বিমান বাইশটা জার্মান বিমানের সঙ্গে লড়াই চালায়, ওদের আটটা প্লেন নামায়, আমাদের মাত্র একটা নষ্ট হয়। এত উৎসাহে গল্পটি পড়ে শোনাল কমিসার যে মনে হল ওর অপরিচিত বৈমানিকেরা নয়, নিজের দলের ঘোড়সওয়াররাই এরকমভাবে নাম কিনেছে। পরে যে আলোচনা শুরু হল তাতে এমন কি কুকুশকিনও খুব উৎসাহ দেখাল, কী করে যুদ্ধটা চলেছিল সেই নিয়ে মতভেদ আর আলোচনা। শুধু শুয়ে শুয়ে আলেক্সেই ভাবল, "কপাল ভালো ওদের, আকাশে উড়ছে আর লড়াই করছে ওরা, কিন্তু আমি ত আর কখনো উড়তে পারব না।"

সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহারগুলো ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে এল।

লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে জার্মানদের আবার ঘা দেবার জন্য সোভিয়েত বাহিনীর পিছনে কোথাও বিরাট শক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। কোথায় ঘাটা দেওয়া হবে, জার্মানদের উপরে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, তাই নিয়ে গম্ভীর আলাপ আলোচনা চালাত কমিসার আর স্তেপান ইভানভিচ। কিছু দিন আগে পর্যন্ত এ ধরনের আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে আলেক্সেই, কিন্তু এখন তাতে কান না দেবার চেষ্টা করত সে। বিরাট কিছু একটা, প্রচণ্ড এবং হয়ত, চূড়ান্ত যুদ্ধ আসন্ন, সেটা আলেক্সেই'ও আঁচ করেছে। কিন্তু ওর বন্ধুরা, এমন কি হয়ত কুকুশকিন পর্যন্ত, তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে সে, এই সব যুদ্ধে যোগ দেবে, আর ও পিছনে পড়ে থেকে পচবে, কিছু করার উপায় নেই তার, ব্যাপারটা ওর কাছে মর্মান্তিক; তাই কমিসার খবরের কাগজ পড়ে শোনালে কিম্বা যুদ্ধের বিষয়ে কোন আলোচনা শুরু হলে ও কম্বলে মাথা চেপে বালিশে গাল ঘষত, যাতে চোখে কিছু না পড়ে, কানে কিছু না আসে। আর কোন কারণে মাক্সিম গোর্কির সেই পরিচিত "বাজপাখির গান" এর লাইনটা বারবার মনে আসত: "গুড়ি মেরে যেতে জন্মেছে যারা উড়তে পারে না তারা"।

কয়েকটা নরম উইলো ডাল নিয়ে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা— যুদ্ধকালীন, অবরোধ প্রাচীরে কীর্ণ, কঠোর মস্কো সহরে কী করে সেগুলো এল ভগবান জানেন — প্রত্যেকের বিছানার পাশে গেলাসে এক একটা শাখা রাখল। লালচে শাখায় আর তুলোর পেঁজার মত নরম শুঁটিতে তাজা গন্ধ, মনে হল ৪২ নং ওয়ার্ডে মূর্তিমান বসন্ত এসেছে। সেদিন প্রত্যেকের মনে আনন্দ আর চঞ্চলতা। এমন কি নির্বাক ট্যাঙ্ক-অফিসারটি পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজের মধ্য দিয়ে বিড়বিড় করে কী একটা বলল।

শুয়ে শুয়ে আলেক্সেই ভাবছে: কামিশিনে, ছোট ছোট ঘোলাটে জলের ধারা কর্দমাক্ত অলিগলি বেয়ে চিকচিকে বড়ো। পাথর দিয়ে তৈরী রাস্তায় এসে পড়ছে, তপ্ত মাটির আর গোবরের গন্ধ, তাজা স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ। এমন একটি দিনে ভলগার খাড়া পাড়ে দাঁড়িয়েছিল ওলগা আর সে, নদীর সীমাহীন বিস্তারে মসৃণ গতিতে বরফ ভেসে গিয়েছে ওদের পেরিয়ে, চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা, শুধু লার্কগুলোর ঘণ্টার মত রূপালী ডাকে সে স্তব্ধতা ভাঙ্গছে। আর মনে হয়েছিল যে স্রোতে বরফ নয়, সে আর ওলগা নিঃশব্দে ভেসে চলেছে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কোন নদীর দিকে। কোন কথা না বলে দাঁড়িয়েছিল দুজনে, আগামী সুখের দিনের রঙীন স্বপ্নে এত বিভোর যে

বিশাল বিস্তৃত ভলগার উপরের সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে, বসন্তের চঞ্চল এলোমেলো হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে এসেছিল ওদের। সে-সব স্বপ্ন আর সত্যি হবে না এখন। ওর কাছে ওলগা আর আসবে না। আর আসেও যদি, ওর আত্মত্যাগ কী করে মেনে নেবে ও? নিজে ত কাঠের পায়ে নেংচিয়ে চলবে, কী করে দীপ্ত সুঠাম সুন্দর ওলগাকে নিজের পাশে হাঁটতে দেবে?.. বসন্তের সেই সাদাসিধে অগ্রদূতটিকে বিছানার পাশ থেকে সরিয়ে নিতে আলেক্সেই মিনতি করল নার্সকে।

উইলোর শাখাটি সরানো হল বটে, কিন্তু মন থেকে তিক্ত ভাবনা সব সহজে সরিয়ে দিতে পারল না আলেক্সেই। পাদুটো গিয়েছে শুনলে কী বলবে ওলগা ? ওকে ছেড়ে চলে যাবে, নিজের জীবন থেকে একেবারে মুছে দেবে? আলেক্সেই'র সমস্ত সত্তা এটাতে আপত্তি জানাল। না, এরকম লোক ওলগা নয়! ওকে ছেড়ে চলে যাবে না, মুখ ঘুরিয়ে নেবে না সে। কিন্তু সেটা যদি না করে তাহলে আরো খারাপ। মহৎ অন্তরের আবেগের ঝোঁকে সে ওকে বিয়ে করছে কল্পনা করল আলেক্সেই, বিয়ে করল পঙ্গুকে, তার খাতিরে ইঞ্জিনিয়ারিঙ শিক্ষার স্বপ্ন ছেড়ে দিল, অফিসের গতানুগতিক কাজ নিল যাতে নিজের, পঙ্গু স্বামীর, আর কে বলতে পারে, হয়ত ছেলেপুলের সংসার চলে।

এ ধরনের আত্মত্যাগ ওকে করতে দেওয়ার কী অধিকার আছে তার? দুজনের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোন বন্ধন নেই, বাগদান মাত্র হয়েছে, এখনো স্বামী স্ত্রী হয়নি। ওলগাকে ভালোবাসে, অসম্ভব ভালোবাসে, আর তাই ও ঠিক করল ও ধরনের কোন অধিকার নেই ওর, দুজনের যোগসূত্র নিজেকেই ছিন্ন করতে হবে, বিনা বিলম্বে, এক কথায়, তাতে ভবিষ্যতের দুরূহ বোঝা ওলগাকে বইতে হবে না, আর বর্তমান সমস্যার যন্ত্রণা থেকেও রেহাই পাবে ও।

কিন্তু কামিশিনের ডাকঘরের ছাপ দেওয়া কয়েকটি চিঠি আসাতে আলেক্সেই'র সমস্ত সিদ্ধান্ত ওলটপালট হয়ে গেল। ওলিয়ার চিঠির প্রতি লাইনে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোচ্ছে। সর্বনাশের পূর্বাভাসে যেন পীড়িত এমনভাবে সে লিখেছে যে আলেক্সেই'র যা কিছু ঘটুক না কেন, চিরকাল ওর সঙ্গে থাকবে ও, ওর জন্যই সে বেঁচে আছে, সময় পেলেই ওর কথা ভাবে, আর ওর চিন্তাই যুদ্ধকালীন সমস্ত কষ্ট, কারখানায় বিনিদ্র রাত্রি, পরিখা, ট্যাঙ্ক-প্রতিরোধী নালা খোঁড়া, আর লুকিয়ে কী হবে, আধ-পেটা খেয়ে থাকা, সমস্ত কিছু সওয়াতে সাহায্য করে ওকে। "তোমার সেই শেষ

ছবিটা, গাছের গুঁড়িতে একটা কুকুর নিয়ে বসে আছ, মুখে হাসি লেগে আছে, সেটা কখনো হাতছাড়া করি না। মা'র লকেটে সেটা রেখে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। মন খারাপ লাগলে সেটা খুলে ছবিটা দেখি... আমার বিশ্বাস, আমাদের ভালোবাসা যতদিন অটুট থাকবে ততদিন ভয় করার কিছু নেই।" আরো লিখেছে যে হালে আলেক্সেই'র মা ছেলের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত, তাঁকে আরো বেশী চিঠি লেখা ওর উচিত, কিন্তু কোন দুঃসংবাদ দিয়ে যেন তাঁকে উদ্বিগ্ন না করা হয়। বাড়ির চিঠি পেলে আগে সব সময়েই বিশেষ ভালো লাগত, যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্বিপাক-ভরা জীবনে সেগুলো ছিল আনন্দের উৎস। কিন্তু এখন, চিঠি পেয়ে এই প্রথম তার কোন আনন্দ হল না। চিঠিগুলোতে তার মন আরো ভারী হয়ে উঠল, আর একটা ভুল সে করল, যে ভুলের জন্য পরে অনেক ভুগতে হয়েছিল: পাদুটো কাটা হয়েছে—এ খবরটা বাড়িতে জানাবার সাহস তার হল না।

নিজের দুর্ভাগ্যের আর নিরানন্দ ভাবনাচিন্তার কথা খুঁটিয়ে লিখল শুধু একজনকে, আবহাওয়া কেন্দ্রের সেই মেয়েটিকে। দুজনের আলাপ পরিচয় নেই বললেও চলে, সেজন্য এসব ব্যাপার তাকে জানানো আরো সহজ। মেয়েটির নাম অজানা, ওর ঠিকানা তাই লিখল: "ফিল্ড পোস্ট অফিস, অমুক-অমুক আবহাওয়া কেন্দ্র "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" জন্য।" যুদ্ধক্ষেত্রে চিঠিপত্রের উপরে বিশেষ মূল্যারোপ করা হয় সেটা জানত আলেক্সেই, তাই ওর আশা যে ঠিকানাটা অদ্ভুত হলেও কোন না কোন সময়ে ঠিক জায়গায় পেঁীছবে। আর না পেঁীছলেও কিছু এসে যাবে না, নিজের মনের ভাবকে ভাষায় রূপ দিতে ও শুধু চেয়েছিল।

তিক্ত ভাবনা চিন্তায় হাসপাতালে একঘেয়ে দিনগুলো কাটছে আলেক্সেই মেরেসিয়েভের। অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল সুপটুভাবে, ওর লোহার মত শক্ত শরীর সেটা সইয়ে নিল: ক্ষতগুলো তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু *দিনে দিনে ও দুর্বল হয়ে যেতে লাগল, সেটা রোধ করার নানা চেষ্টা সত্ত্বেও ও দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে সবায়ের চোখের সামনে।*

৭

বাইরে ইতিমধ্যেই বসন্তের উদ্দাম জোয়ার।

দুর্বার বসন্ত ঢুকল ৪২ নং ওয়ার্ডে, আইওডোফর্মের গন্ধে ঝাঁঝালো ঘরটায়। জানলা দিয়ে এল সেটা, সঙ্গে আনল গলন্ত বরফের ঠাণ্ডা ভিজে

গন্ধ, চড়ুই'এর অস্থির কিচির মিচির, মোড়-ঘোরা ট্রামগুলোর প্রফুল্ল মুখর ঝনঝনানি, বরফ-মুক্ত এ্যাসফল্টের রাস্তায় পায়ের জোরালো শব্দ আর সন্ধ্যেবেলায় একটা একর্ডিয়নের নিচু একটানা সুর। পাশের জানলা দিয়ে বসন্ত উঁকি মারল, জানলাটা দিয়ে চোখে পড়ে পপলারগাছের রৌদ্রোজ্জ্বল একটা শাখা, তার উপরে হলদে রসে-ভরা বড়ো গোছের কুঁড়ি ফেঁপে উঠছে। ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার পাণ্ডুর মমতাময় মুখের সোনালী ফুট ফুট দাগের আকারে বসন্ত এল ওয়ার্ডে, নানা রকমের পাউডার মেখেও দাগগুলো যায়নি বলে নার্সটির বিরক্তির সীমা নেই। জানলার বাইরের টিনে-ঢাকা কার্নিশে বড়ো বড়ো বিন্দু ফুর্তিতে টপটপ করে পড়ছে, তাতে বসন্তের কথা খালি মনে পড়ে।

আগেকার মত এবারেও মানুষের অন্তরে কোমলতা আনল বসন্ত, জাগাল নানা স্বপ্ন।

প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষায় কমিসার বলল: 'বনের ফাঁকা জায়গায় বন্দুক হাতে এ সময়ে থাকাটা খাসা ব্যাপার, তাই না, স্তেপান ইভানভিচ? চালায় ওৎ পেতে শিকারের জন্য ভোরবেলায় বসে থাকা... চমৎকার কিন্তু!.. গোলাপী ভোর, ঝরঝরে বরফের একটু ঘন আমেজ তাতে, আর চালায় চুপ করে বসে থাকা। হঠাৎ পাখির ডাক, ডানার ঝটপট, উড়ে মাথার ওপরে বসল পাখিটা — পাখার মত লেজ ছড়িয়ে, তারপর আর একটা এল, আরো একটা...'

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্তেপান ইভানভিচ চকাৎ আওয়াজ একটা করল, যেন মুখে জল এসে গিয়েছে, কিন্তু কমিসার তার স্বপ্নবিলাস থামাল না:

'তারপর আগুন জ্বালানো হল, বর্ষাতি বিছোনো হল, সুগন্ধি খাসা চা বানানো হল, ধোঁয়ার আস্বাদ তাতে, আর এক চুমুক ভদকা, ব্যস, সমস্ত শরীর গরম হয়ে উঠল, তাই না? খাটুনির পরে...'

'এবার থামুন, কমরেড কমিসার, আমাদের অঞ্চলে বছরের এ সময়ে কী ধরনের শিকার পাওয়া যায়, জানেন? পাইক-মাছ! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, কিন্তু কথাটা সত্যি। আগে শোনেননি কথাটা? বেশ মজার ব্যাপার এটা, আর কিছু রোজগারও করা যায় অবশ্য। হ্রদে বরফ গলতে আর নদীর জল ছাপিয়ে উঠতে শুরু করলেই মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে যায় পাড়ে, ঘাসে আর বসন্তের জলে ঢাকা শেওলায় গিয়ে ওঠে। ঘাসে গিয়ে ডিম পাড়ে। নদীর

তীর ঘেঁষে যাচ্ছে, জলে-ডোবা কাঠের কেঁদোর মত জিনিস চোখে পড়বে, কিন্তু আসলে ওগুলো মাছ! বন্দুক চালান, মাঝেমাঝে এতগুলো একসঙ্গে পাবেন যে থলেতে আঁটতে পারবে না। সত্যি কথা বলছি!..'

তারপর শিকারীদের স্মৃতিবিনিময় চলে। সকলের অজান্তে যুদ্ধের কথা এসে পড়ে, ডিভিশনে কিম্বা দলে এখন কী হচ্ছে ভাবে ওরা, ভাবে শীতকালে খোঁড়া ডাগ-আউটগুলিতে জল চুঁইয়ে পড়ছে কি না, গড়খাইগুলোর অবস্থাই বা কী, ফ্যাশিস্টদের হাল কেমন, পশ্চিমে ওরা ত এ্যাসফল্টের রাস্তায় অভ্যস্ত।

মধ্যাহ্ন-ভোজন হয়ে গেলে চড়ুইগুলোকে খাওয়ায় ওরা। বেশ মজার ব্যাপার এটা, স্তেপান ইভানভিচের আবিষ্কার। চুপ করে বসে থাকতে সে কখনো পারে না, ক্ষীণ অস্থির হাতে কিছু না কিছু সব সময়ে করছে। একদিন ও বলল যে খাবারের পর গুঁড়োগুলো জানলার বাইরের কার্নিশে ছড়িয়ে দেওয়া হোক পাখিগুলোর জন্য। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল এটা, শুধু উচ্ছিষ্ট গুঁড়ো নয়, রুটির টুকরো ইচ্ছে করে ফেলে রাখত ওরা, সেগুলো গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হত, ফলে এক ঝাঁক চড়ুইকে, স্তেপান ইভানভিচের ভাষায়, "রসদের বরাদ্দ তালিকায় রাখা হল," ক্ষুদে, সরব প্রাণীগুলো বড়ো একটা টুকরো ঠোকরাচ্ছে, কিচির মিচির ঝগড়া চলেছে, ঝনকাঠে খুদটুকু আর পড়ে নেই, পপলারের ডালে বসে ঠোঁট দিয়ে নিজেদের গা সাফ করা চলল, তারপর ফরফর করে নিজেদের বিশেষ বিশেষ কাজে উড়ে চলে গেল, দৃশ্যটা দেখে ওয়ার্ডের লোকেদের আনন্দের অন্ত থাকত না। চড়ুইদের খাওয়ানো ওদের বিশেষ প্রিয় আমোদে দাঁড়াল। কয়েকটা চড়ুইকে আলাদা করে চিনল রোগীরা, নামকরণও হল তাদের। ওদের বিশেষ প্রিয় ছিল একটা বেঁড়ে বেয়াড়া খুরখুরে ক্ষুদে চড়ুই, ঝগড়ুটে স্বভাবের জন্যই লেজটা সে হারিয়েছিল খুব সম্ভব। স্তেপান ইভানভিচ ওর নাম রাখল "সাব-মেসিনগানার"।

এটা মজার ব্যাপার যে ক্ষুদে সরব চড়ুইগুলোকে নিয়ে আমোদ প্রমোদের ফলেই ট্যাঙ্ক-অফিসারের বিমর্ষ ভাবটা কেটে গেল। প্রায় একেবারে কুঁজো স্তেপান ইভানভিচ লাঠিতে ভর দিয়ে রেডিয়েটরে ওঠবার চেষ্টা করছে, যাতে হাওয়া চলাচলের খোলা জানলাটা হাতের নাগালে আসে, দৃশ্যটা অবসন্ন নিরুৎসাহ ট্যাঙ্ক-অফিসার দেখল। কিন্তু পরের দিন চড়ুইগুলো উড়ে এল জানলাটায়, আর ব্যস্তসমস্ত ক্ষুদে প্রাণীগুলোকে ভালো করে দেখবার জন্য

ব্যথায় শিঁটিয়ে ওঠা সত্ত্বেও এমন কি বিছানায় উঠে বসল সে। তার পরের দিন মধ্যাহ্নের খাবার থেকে পিঠের বড়ো একটা টুকরো বাঁচিয়ে রাখল, তার বিশ্বাস হাসপাতালের এই উপাদেয় খাবারের টুকরোটা উচ্চকণ্ঠ ভিখিরীগুলোর বিশেষ পছন্দ হবে। একদিন "সাব-মেসিনগানারের" কোন পাত্তা নেই, কুকুশকিনের অনুমান যে ওটাকে বেড়ালে খেয়েছে, সে বলল উচিত শাস্তি পেয়েছে ওটা। বিরস ট্যাঙ্ক-অফিসারের মেজাজ গেল চড়ে, বলল কুকুশকিন বেজায় "বদমেজাজী" লোক! তার পরের দিন বেঁড়ে চড়ুইটা যখন আবার এসে জানলার ঝনকাঠে বসে, মাথা একদিকে হেলিয়ে, গোলগোল বেয়াড়া জ্বলজ্বলে চোখে কিচির মিচির করে ঝগড়া শুরু করল তখন সশব্দে হেসে উঠল ট্যাঙ্ক-অফিসার, অনেক মাস পরে এই প্রথম হাসল সে।

কিছুদিনের মধ্যেই গভজ্‌দেভের মেজাজ একেবারে হালকা হয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে দেখল যে ও বেশ ফুর্তিবাজ, গপ্পে লোক, ওর সঙ্গে সহজেই মেশা যায়। পরিবর্তনের জন্য দায়ী কমিসার অবশ্যই, স্তেপান ইভানভিচের ভাষায়, কাকে কী ভাবে নাড়া দিতে হয় তার চাবিকাঠি ওর ওস্তাদ হাতে। আর সেটা সে করল এই ভাবে।

৪২ নং ওয়ার্ডের সবচেয়ে সুখের সময় হল যখন রহস্যময় হাসিমুখে, হাত পেছন করে দরজায় এসে দাঁড়ায় ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, সবায়ের দিকে দীপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে:

'কে কে নাচবেন আজ?

তার অর্থ হল ডাক এসেছে। যাদের চিঠি এসেছে, চিঠি হাতে পাবার আগে সেই সব সৌভাগ্যবানদের ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার কথামত অন্তত অল্পক্ষণের জন্য বিছানায় নাচের অনুকরণে নড়াচড়া করতে হত। বেশীর ভাগ সেটা করতে হত কমিসারকে, কেননা মাঝেমাঝে এক সঙ্গে দশ-বারোটা চিঠি তার কাছে আসে। চিঠিগুলো আসে ডিভিশন থেকে, যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক পিছন থেকেও, সেগুলো লিখত ওর বন্ধু অফিসাররা, সাধারণ সৈনিকেরা আর বন্ধু অফিসারদের স্ত্রীরা; পুরোনো দিনের খাতিরে হয়ত তারা লিখত, কিম্বা অনুরোধ জানাত যেন বিগড়ে-যাওয়া স্বামীদের সে কড়কে দেয়; যুদ্ধে নিহত বন্ধু অফিসারদের স্ত্রীরাও নিজেদের ব্যাপার কী করে গুছিয়ে নিতে হবে তার পরামর্শ কিম্বা সাহায্য চেয়ে লিখত। যুদ্ধে নিহত রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের একটি মেয়ে, কাজাখস্তানের পাইওনিয়র দলের সদস্যা, তার নামটা পর্যন্ত মনে নেই, এমন কি সে-ও চিঠি লেখে।

প্রত্যেকটি চিঠি অসীম আগ্রহে পড়ত কমিসার, নিয়ম করে জবাব দিত; অমুক কম্যান্ডারের স্ত্রীকে সাহায্য করতে অনুরোধ জানাত সেখানকার কর্তৃপক্ষকে, বিগড়ে-যাওয়া স্বামীটিকে চিঠিতে ধমকাল, কোন গৃহ-ব্যবস্থাপককে ভয় দেখাল যে যদি অমুক কম্যান্ডারের পরিবারের ঘরে সে স্টোভ না বসায় তাহলে নিজে গিয়ে তার "মুন্ডুটা ছিঁড়ে নেবে"। চিঠি লিখল কাজাখস্তানের সেই মেয়েটিকে যার বিদঘুটে নামটা কিছুতেই মনে থাকে না, শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় ভাগে রুশ ভাষায় খারাপ নম্বর পাওয়ার জন্য ধমকাল তাকে।

যুদ্ধক্ষেত্র আর যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনের জায়গার সঙ্গে স্তেপান ইভানভিচেরও বেশ পত্রালাপ চলত। চিঠি লিখত ওর ছেলেরা, তারাও বাহিনীতে, স্নাইপার তারা, কাজে বেশ দক্ষ, লিখত ওর মেয়ে, যৌথখামারের একটি দলের নেতা সে, চিঠিগুলোতে থাকত অসংখ্য আত্মীয়স্বজন আর জানাশোনাদের কুশলকামনা, খবর থাকত যে যদিও যৌথখামারের আরো বেশী লোককে নির্মাণের কাজে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে তবুও অমুক-অমুক পরিকল্পনার অতিপূরণ হয়েছে কয়েকভাগ। চিঠিগুলো পাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো পড়ে শোনাত স্তেপান ইভানভিচ, ওর ঘরোয়া ব্যাপারের বিষয়ে নিয়মিতভাবে ওয়াকিবহাল থাকত সারা ওয়ার্ড, ওয়ার্ডের সমস্ত মেয়েরা, নার্সরা, এমন কি নিরস বদমেজাজী হাউস সার্জনটি পর্যন্ত।

এমন কি কুকুশকিন, মোটেই মিশুকে যে নয়, সারা দুনিয়ার সঙ্গে যার ঝগড়া লেগে আছে মনে হয়, তারো কাছে মায়ের চিঠি আসে, তিনি বার্নাউলের কোথায় একটা জায়গায় থাকেন। নার্সের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিত কুকুশকিন, ওয়ার্ডের সবাই ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর সেটা পড়ত, কথাগুলো চুপিচুপি উচ্চারণ করে। তখন ওর উগ্র চেহারা নরম দেখাত, মুখে আসত কোমল গম্ভীর একটি ভাব, যেটা একেবারে ওর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বুড়ী মা গ্রামের চিকিৎসক, তাঁকে ভয়ানক ভালোবাসে কুকুশকিন, কিন্তু কোন কারণে ভালোবাসাটার বিষয়ে লজ্জিত সে, সেটা ঢাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

খুসিতে ওয়ার্ডে খবরের বিনিময় চলছে, একমাত্র ট্যাঙ্ক-অফিসার এসব আনন্দের অংশীদার হত না, আরো বিষণ্ণ মুখে দেয়ালের দিকে ফিরে কম্বলে মাথা ঢাকা দিত। ওকে চিঠি লেখবার কেউ নেই। যত চিঠি ওয়ার্ডে আসে তত তীব্র ঠেকে নিজের নিঃসঙ্গতা। কিন্তু একদিন দোরগোড়ায় দেখা গেল

ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে, অন্য দিনের তুলনায় ওর মুখ আরো বেশী উত্তেজিত দেখাচ্ছে। কমিসারের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বলল ও:

'আজকে নাচের পালা কার?'

ট্যাঙ্ক-অফিসারের খাটের দিকে তাকিয়ে ওর মুখ সহৃদয় হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সবাই বুঝল অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে। প্রত্যাশায় সচকিত হয়ে উঠল ওয়ার্ডটি।

'লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভ, আজ আপনার নাচবার পালা। নাচুন তাহলে।'

মেরেসিয়েভ দেখল চমকে উঠে গভজ্‌দেভ হঠাৎ ঘুরে তাকাল, ব্যাণ্ডেজের ফাঁকে ওর চোখ ঝলসে উঠল, সেটাও নজরে পড়ল। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিল কিন্তু গভজ্‌দেভ, গলা কেঁপে উঠলেও নির্লিপ্ত ভাব আনার চেষ্টা করে বলল:

'ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। পাশের ওয়ার্ডে অন্য কোন গভজ্‌দেভ নিশ্চয়ই হাজির।' কিন্তু ওর ব্যগ্র চোখদুটো লোভীর মত তিনটি চিঠিতে নিবদ্ধ, উঁচুতে ধরে আছে সেগুলো নার্স, যেন পতাকা।

'না, কোন ভুল হয়নি,' বলল নার্স। 'কী লেখা আছে দেখুন! লেফ্‌টেনাণ্ট গ. ম. গভজ্‌দেভ, আর ওয়ার্ডের নম্বরটা পর্যন্ত আছে — ৪২। তাহলে?'

কম্বলের নিচে থেকে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটা হাত ঝট করে বেরিয়ে এল। লেফ্‌টেনাণ্ট দাঁত দিয়ে অস্থিরভাবে একটা খাম খুলে ফেলল, হাতটা থরথর করে কাঁপছে, চোখ জ্বলছে উত্তেজনায়, আশ্চর্য ব্যাপার! একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাটি তিনটি মেয়ে, বান্ধবী তিনজন, ভিন্ন হাতের লেখায় ভিন্ন ভাষায় প্রায় একই কথা লিখেছে। বীর ট্যাঙ্ক-অফিসার লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভ আহত অবস্থায় মস্কোতে আছে খবর পেয়ে তার সঙ্গে পত্রবিনিময় করবে ঠিক করেছে তারা। যদি ওদের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিরক্ত না হয় তাহলে কেমন আছে সেটা কি লিখে জানাবে? ওদের মধ্যে একজন, আনিউতা বলে সে সই করেছে, জিজ্ঞেস করেছে কোনভাবে ওকে সাহায্য করতে পারে কিনা, ওর ভালো বই চাই কিনা, যদি কিছুর দরকার থাকে তাহলে ইতস্তত না করে যেন জানায়।

সারা দিন লেফ্‌টেনাণ্ট চিঠিগুলো নাড়ল চাড়ল, ঠিকানাগুলো ভালো করে দেখল, হাতের লেখাও খুঁটিয়ে দেখা হল। এ ধরনের পত্রবিনিময় চলে, সেটা ওর জানা ছিল অবশ্য, একজন অজানা পত্রলেখিকার সঙ্গে তার

এরকমের পত্রবিনিময় চলেছিল একবার, উৎসবে উপহার হিসেবে পাওয়া একজোড়া পশমের দস্তানায় ছোট্ট একটি চিঠি পাবার পর বিনিময়টা শুরু হয়। পত্রলেখিকা একবার ঠাট্টা করে লেখার সঙ্গে নিজের ফটো পাঠায়, চার ছেলের মা একটি প্রবীণার ছবি — তারপর আপনা থেকেই চিঠি লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আজকের চিঠিগুলো অনেকটা আলাদা। অবাক আর খটকা লাগছে, অপ্রত্যাশিত চিঠিগুলো একসঙ্গে এসে পড়ল কী করে শুধু সেটা ভেবে। আর একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না: যুদ্ধে ও কী করেছে সেটার খবর এই ডাক্তারী ছাত্রীদের কাছে পৌঁছল কী করে? সমস্ত ওয়ার্ড এ-বিষয়ে মাথা ঘামাল, বিশেষ করে কমিসার। কিন্তু স্তেপান ইভানভিচের সঙ্গে ওর ইসারায় দৃষ্টিবিনিময় মেরেসিয়েভের চোখে পড়াতে বুঝতে পারল যে ব্যাপারটার মূলে আছে কমিসার।

যাই হোক না কেন, পরের দিন সকালে গভজ্‌দেভ চিঠির কাগজ কমিসারের কাছে চেয়ে নিল, আর কারোর অনুমতির অপেক্ষা না করে ডান হাতের ব্যাণ্ডেজটা খুলে সন্ধ্যা পর্যন্ত লিখে চলল, কাটাকুটি অনেক হল, একটা চিঠি দুমড়ে মুচড়ে আবার নতুন করে লিখল, অবশেষে অপরিচিত পত্রলেখিকাদের চিঠির জবাব তৈরী হল।

দুটি মেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই আপনা থেকে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিল, কিন্তু সহৃদয়া আনিউতা তিনজনের হয়ে লিখত। গভজ্‌দেভ আলাপপ্রিয় লোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগের তৃতীয় কোর্সে কী হচ্ছে না হচ্ছে সারা ওয়ার্ডটি এখন সে খবর রাখে; জীববিদ্যা রোমাঞ্চকর বিষয়, জৈব রসায়নশাস্ত্র বড়ো নীরস জিনিস, অধ্যাপকটির গলা খাসা, চমৎকার পড়ান তিনি, অমুক উপাধ্যায়টি বড়োই বিরক্তিকর, স্বেচ্ছামূলক-সাহায্য করে আগের রবিবারে ছাত্রেরা কতটা জ্বালানী কাঠ মালের ট্রলিতে বোঝাই করেছে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের কাজ করা কত কঠিন, ও মেয়েটা কেমন তোতাপাখির মত, মোটেই সুবিধের লোক নয় সে -- সমস্ত খবর ওয়ার্ডের জানতে বাকি রইল না।

শুধু যে কথা বলতে শুরু করল গভজ্‌দেভ তা নয়, মনে হল ও নতুন জীবন পেয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগল।

কুকুশকিনের বক্ষফলকগুলো খুলে ফেলা হল। লাঠিতে ভর না দিয়ে চলতে শিখছে স্তেপান ইভানভিচ, ইতিমধ্যেই অনেকটা সোজা হয়ে হাঁটতে পারে। এখন সারা দিন জানলার ধারে কাটায় সে, "বিরাট পৃথিবীতে" কী

ঘটছে দেখে। দিনে দিনে শুধু কমিসার আর মেরেসিয়েভের অবস্থা সমানে খারাপের দিকে চলেছে, বিশেষ করে কমিসারের। সকালের ব্যায়াম করা ছেড়ে দিয়েছে সে। শরীরে এসেছে ভীতিকর, হলদেটে, প্রায় স্বচ্ছ একটা ফাঁপা ভাব। হাতদুটো মুড়তে কষ্ট হয়, পেন্সিল কি চামচ আর ধরতে পারে না কমিসার।

সকালে ওয়ার্ডের পরিচারিকা তাকে ধুইয়ে খাইয়ে দেয়। এটা বোঝা যায় যে যন্ত্রণার জন্য নয়, নিজের অসহায়তায় বিষণ্ণ ও ব্যথিত বোধ করছে সে। কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল না কমিসার। ওর ভারী গলা আগেকার মতই ফূর্তিতে গমগম করে ওঠে, সমান আগ্রহে খবরের কাগজ পড়া চলে, জার্মান শেখাটাও বাদ পড়েনি; কিন্তু পড়বার সময় বইগুলো ধরতে পারে না আর, তাই তার দিয়ে বই ঠেস দিয়ে রাখবার একটা স্ট্যান্ড বানিয়েছে স্তেপান ইভানভিচ, ওর বিছানার পাশে বসে বইগুলোর পাতা উল্টিয়ে দেয় সে। সকালে, খবরের কাগজ তখনো আসেনি, কমিসার ব্যগ্রভাবে নার্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষ ইস্তাহারে কী বলেছে, রেডিওর খবর কী, আবহাওয়া কেমন, মস্কোতে কী গুজব।

মনে হয় শরীর যতই দুর্বল হচ্ছে ততই বাড়ছে ওর মনোবল। আগেকার মত সমান আগ্রহে অগুন্তি চিঠিপত্র পড়ে কমিসার, উত্তর দেয়, কুকুশকিন আর গভজ্‌দেভ পালা করে ওর কথামত চিঠি লেখে। একদিন চিকিৎসার পর মেরেসিয়েভ ঝিমোচ্ছে, কমিসারের বজ্রকঠোর গলায় জেগে উঠল।

বিছানার উপরে তারের তৈরী বই-স্ট্যান্ডে ডিভিশনের একটা খবরের কাগজের ছাই-রঙা পাতা পড়ে আছে। তার উপরে ছাপ দেওয়া: "স্থানান্তর নিষিদ্ধ", কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়মিতভাবে কাগজটা কমিসারের কাছে এক বন্ধু পাঠায়।

'প্রতিরোধ ব্যূহে বসে বসে ওদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে না কি?' কমিসার হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল। 'ক্রাভৎসভ আমলাতান্ত্রিক লোক, তাই বুঝি? বাহিনীর সেরা পশু-চিকিৎসক ও, আর ও কিনা আমলাতান্ত্রিক লোক। এক্ষুণি যা বলছি লেখো ত!'

কমিসার বলে গেল, লিখল গভজ্‌দেভ। বাহিনীর সামরিক পরিষদের একটি সভ্যকে কড়া চিঠি লেখা হল, তাকে অনুরোধ করা হল যে "কলমবাজদের" যেন রাশ টেনে রাখা হয়, একটি খাঁটি সৎকর্মীর উপরে অন্যায় দোষারোপ করেছে তারা। ডাকে দেবার জন্য চিঠিটা নার্সের হাতে দেওয়া হল, তখনো "কলমবাজগুলো" বকুনির হাত থেকে রেহাই পেল না;

যে মানুষটি বালিশে মাথা পর্যন্ত নড়াতে পারে না, কী আবেগে সে কথা বলছে শুনলে অবাক লাগে।

আরো উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা সে-দিন সন্ধ্যাবেলায় ঘটল। সব চুপচাপ, তখনো আলো জ্বালা হয়নি, ঘরের আনাচে-কানাচে ছায়া ঘন হচ্ছে, জানলার ধারে বসে স্তেপান ইভানভিচ চিন্তাকুলভাবে বাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্যাম্বিসের এপ্রন গায়ে নদীতে বরফ ভাঙছে কয়েকটি মেয়ে। গাঢ় চৌকো একটা বরফগর্তের ধার থেকে লম্বা লম্বা চাঁই শাবল দিয়ে ভেঙে, শাবলের দু-এক ঘায়ে সেগুলোকে সরু টুকরো করে নৌকোর আঁকড়া দিয়ে জল থেকে টেনে তুলছে কাঠের পাটাতন বেয়ে। সারি সারি বরফের চাঁই পড়ে আছে, নিচের দিকটা সবুজ আর স্বচ্ছ, উপর দিকটা হলদে। বরফ যেখানে কাটা হচ্ছে সেদিকে নদীর ধার হয়ে আস্তে আস্তে আসছে শ্লেজের দীর্ঘ সারি, একটার সঙ্গে অন্যটা আটকানো। বরফ পড়ে আছে যেখানে সেখানে একটার পর একটা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে একটি বুড়ো, কান-ঢাকা টুপি মাথায়, পরনে তুলো-ভরা প্যাণ্ট আর কোট, কটিবন্ধে কুঠার গোঁজা, আর মেয়েরা বরফের চাঁইগুলো শ্লেজে চাপাচ্ছে।

স্তেপান ইভানভিচের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল যৌথখামারের কোন দল কাজটা করছে, কিন্তু বন্দোবস্তটা মোটেই সুবিধের নয়। কাজে লাগানো হয়েছে বড্ড বেশী লোককে, ফলে এ-ওর বাধার সৃষ্টি করছে। পরিচালনার একটি পরিকল্পনা ওর ঝানু মাথায় এল। মনে মনে তিনজনের এক একটা দলে ওদের ভাগ করে ফেলল — জল থেকে বিনা ক্লেশে বরফ তোলার জন্য তিন জনের দলই যথেষ্ট। বিভিন্ন জায়গার জন্য নির্দিষ্ট করল দলগুলোকে, মোটমাট টাকা দেওয়া হবে উপস্থিত সমস্ত লোক হিসেবে নয়, চাঁই কটা তোলা হল হিসেব করে দলগুলোকে আলাদা করে। ওদেব মধ্যে একজনকে, গোলগাল মুখ, গোলাপী গাল বেশ সমর্থ একটি মেয়েকে নিজেদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা শুরু করতে বলার কথা ভাবল স্তেপান ইভানভিচ... চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছে, একটা ঘোড়া এসে পড়ল বরফের গর্তের ধারে, পিছনের পাদুটো পিছলে জলে পড়ে গেল, সেটার হুঁশ নেই। শ্লেজের ভার ঘোড়াটাকে ভাসিয়ে রেখেছে বটে, কিন্তু খরস্রোতে ক্রমাগত নিচে টানছে। কুঠার হাতে বুড়োটা অসহায়ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, একবার শ্লেজের শিকে টান মারছে, একবার টানছে লাগামটা।

স্তেপান ইভানভিচের হাঁফ ধরে এল, তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে:

'ঘোড়াটা ডুবে যাচ্ছে যে!'

অনেক কষ্টে কনুই'এর ভর দিয়ে উঠল কমিসার. যন্ত্রণায় মুখ নীল হয়ে গিয়েছে. জানলার ঝনকাঠে বুকের ভর দিয়ে বাইরে তাকাল, তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠল:

'বেটা গবেট! মাথায় ঢুকছে না কিছু? গলার দড়িগুলো... দড়িগুলো কেটে ফেল... ঘোড়াটা তাহলে নিজেই বেরিয়ে আসবে! না. ঘোড়াটাকে মেরে ফেলবে দেখছি!'

জানলার ঝনকাঠে কোনক্রমে উঠল স্তেপান ইভানভিচ। ঘোড়াটা ডুবে যাচ্ছে। ঘোলা জলে প্রায় পিঠ পর্যন্ত আমগ্ন, উঠে আসার চেষ্টা প্রাণপণে করছে. পারের বরফে লোহার নাল-দেওয়া সামনের পাদুটো মাঝেমাঝে জোরে বসাচ্ছে।

'দড়িগুলো কেটে ফেল!' চেঁচাল কমিসার. যেন নদীর ওখানে বুড়োটা ওর গলা শুনতে পারবে।

হাতদুটো মুখের সামনে মেগাফোনের মত করে ধরে স্তেপান ইভানভিচ কমিসারের নির্দেশটা চেঁচিয়ে জানাল:

'ওহে বুড়ো, শুনছ! লাগামের দড়িগুলো কেটে ফেল! বেল্টের কুঠারটা দিয়ে ওগুলো কেটে ফেলো. জলদি কেটে ফেল!'

বুড়োর কানে গেল কথাটা, মনে হল নির্দেশটা আকাশ-বাণীর মত। এক ঝটকায় বেল্ট থেকে কুঠারটা খুলে নিয়ে দুএক ঘায়ে দড়িগুলো কেটে ফেলল। লাগাম থেকে ছাড়া পেয়ে. ধড়মড় করে বরফের উপরে উঠল ঘোড়াটা. গর্তের পাড় এড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গা ঝাড়তে লাগল কুকুরের মত।

'কী হচ্ছে এখানে?' ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন জানতে চাইল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, ওভারঅলের বোতামগুলো খোলা, সাধারণত যে শাদা টুপিটা পরেন মাথায় নেই সেটা। দারুণ রেগে গিয়ে মেঝেতে পা ঠুকে তিনি জানালেন কারো কোন কথায় কান দেবেন না। সমস্ত ওয়ার্ডটা বিলকুল পাগল হয়ে গিয়েছে, সবাইকে এখান থেকে জাহান্নমে বিদায় করবেন তিনি, ঠিক কী হয়েছে সেটা জানবার চেষ্টা না করেই প্রত্যেককে ধমকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। তারপরেই এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, চোখের জলের দাগ মুখে, অত্যন্ত বিচলিত দেখাচ্ছে তাকে। এক্ষুণি তাকে ভীষণ বকেছেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। কমিসারের

দিকে তাকিয়ে দেখল ওর মুখ ছাই'এর মত শাদা আর প্রাণহীন হয়ে গিয়েছে, চোখ বুজে অনড়ভাবে পড়ে আছে সে, তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল তার দিকে।

সন্ধ্যার দিকে কমিসারের অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়াল। কর্পূরের ইনজেকশন দেওয়া হল, তারপরে অক্সিজেন, কিন্তু অনেকক্ষণ জ্ঞান ফিরে এল না। জ্ঞান ফিরে এলেই কিন্তু ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল কমিসার, অক্সিজেন ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে।

'কিচ্ছু ভেবো না, নার্স। নরক থেকেও আলবৎ ফিরে আসব আমি, শয়তানের বাচ্চারা যে জিনিসে মুখের ফুট-ফুট দাগ তাড়ায় তোমার জন্যে নিয়ে আসব সেটা।'

দুর্বলতার সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে যুঝে দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে বিরাট বলিষ্ঠ লোকটা, দেখলে দারুণ খারাপ লাগে।

৮

প্রতিদিন মেরেসিয়েভও দুর্বল হয়ে পড়ছে। একমাত্র "আবহাওয়া সার্জেণ্টকেই" সে এখন নিজের দুঃখের কথা জানায়, পরের চিঠিতে তাকে এমন কি এটা পর্যন্ত লিখল যে হাসপাতাল থেকে খুব সম্ভব আর বেঁচে ফিরবে না, আর না বাঁচাই ভালো: পাবিহীন বৈমানিক ডানাবিহীন পাখির মত, খুদকুড়ো ঠুকরে খেয়ে বেঁচে থাকে পাখি কিন্তু উড়তে পারে না কখনো। ডানাবিহীন পাখি হতে চায় না সে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, যত শীগগির মরে তত ভালো। এরকমভাবে লেখাটা নিষ্ঠুর, কেননা চিঠিপত্রের বিনিময়ে এক সময়ে মেয়েটি স্বীকার করেছিল যে "কমরেড সিনিয়র লেফ্টেনান্টের" প্রতি অনুরাগ তার অনেক দিনের, মেরেসিয়েভ ভীষণ আঘাত না পেলে গোপন কথাটা সে প্রকাশ করত না কখনো।

'বিয়ে করতে চায় মেয়েটা। ছেলেদের দাম এখন বেশ চড়া। লোকটার পা আছে কি না আছে তাতে কী এসে যায় ওর, মোটা ভাতা পেলেই হল,' মন্তব্য করল কুকুশকিন, ওর বদমেজাজ বদলায়নি।

মাথার উপরে মৃত্যু গজরাচ্ছে, সেই মুহূর্তে নিজের মুখে রাখা মেয়েটির ফ্যাকাশে মুখটির কথা মনে পড়ল মেরেসিয়েভের, কুকুশকিন যা বলছে সেটা ঠিক নয়, সে জানে। ওর বিষণ্ন নানা স্বীকারোক্তিতে মেয়েটির বুক যে

ব্যথায় মুচড়িয়ে ওঠে, সেটাও জানে। "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" নামটি পর্যন্ত জানা নেই, তবু তাকে নিজের নিরানন্দ ভাবনা চিন্তার কথা লিখে চলল মেরেসিয়েভ।

প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করার চাবিকাঠি বের করতে কমিসার পারে, কিন্তু এখন পর্যন্ত মেরেসিয়েভকে সাড়া দেওয়াতে পারেনি সে। ওর অস্ত্রোপচারের পরের দিন ওস্ত্রভস্কির "ইস্পাত" বইটা ওয়ার্ডে এল। চেঁচিয়ে পড়া হল বইটা। পড়াটা ওকে উদ্দেশ্য করে বুঝতে পারল আলেক্সেই, কিন্তু গল্পটি বিশেষ কোন সান্ত্বনা জোগাল না। পাভেল করচাগিন ওর ছেলেবেলার বীরেদের একজন। "কিন্তু করচাগিন ত বৈমানিক ছিল না, 'আকাশের জন্য আকুলিবিকুলির' মানে কি সে জানত?" ভাবল আলেক্সেই। "দেশের সমস্ত পুরুষ আর মেয়েদের অনেকে লড়াই করছে, এমন কি শিকনী-নাকে বাচ্চারা পর্যন্ত কুঁদযন্ত্র নাগালে আনবার জন্য বাক্সের উপরে চেপে গুলিগোলা তৈরী করছে, এমন একটা সময়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওস্ত্রভস্কি ত নিজের বইগুলো লেখেননি।"

সংক্ষেপে, এবারে বইটা কাজ দিল না। পাশ থেকে এগোতে হবে এবার, ঠিক করল কমিসার। প্রসঙ্গত, একটি লোকের বিষয়ে গল্প শুরু করল, লোকটির দুটো পা পক্ষাঘাতে অসাড়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বড়ো একটা চাকরী সে করত। পৃথিবীর সবকিছুতে স্তেপান ইভানভিচের আগ্রহ, বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সে। তারপর মনে পড়ে গেল যে তার এলাকায় একজন ডাক্তার ছিল, একটা মাত্র হাত থাকা সত্ত্বেও জেলার সেরা ডাক্তার সে, ঘোড়ায় চাপত, ভালোবাসত শিকারে যেতে আর বন্দুক চালাত এমন যে টিপ করে কাঠবিড়ালীর চোখে গুলি করতে পারত; এরপর কমিসার বিগত আকাদেমিশ্যান ভিলিয়ামসের কথা স্মরণ করল, ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল তাঁর সঙ্গে। শরীরের অর্ধেকটা তাঁর পক্ষাঘাতে অসাড়, একটা মাত্র হাত চালু ছিল, তবুও কৃষি ইন্সটিটিউটের পরিচালনা তিনি করতেন, ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজ চালাতেন।

শুনতে শুনতে মেরেসিয়েভ হাসল। ভাবা, কথা বলা, লেখা, আদেশ দেওয়া, লোকজনকে সারানো, এমন কি শিকারে যাওয়া বিনা পায়ে সম্ভব, কিন্তু ও বৈমানিক, জন্ম থেকে বৈমানিক; ফাটল-ধরা জমিতে, পাতার মধ্যে পড়ে আছে সারা ভলগা এলাকায় বিখ্যাত বিরাট, ডোরা-কাটা সব তরমুজ, ছেলেবেলায় একদিন তরমুজক্ষেত পাহারা দিচ্ছে সে, হঠাৎ কানে এল

আওয়াজ, তারপর দেখল ছোট রূপালী একটা “ড্রাগন-ফ্লাই”, ডানাজোড়া সূর্যের আলোয় ঝলকিয়ে ধূলিধূসর স্তেপের উপর দিয়ে স্তালিনগ্রাদের দিকে কোথাও উড়ে চলেছে মন্থরভাবে।

সেই মুহূর্ত থেকে বৈমানিক হবার স্বপ্ন ওকে কখনো রেহাই দেয়নি। স্কুলে পড়ছে, পরে কুঁদযন্ত্র চালাচ্ছে কারখানায়, সব সময়ে মন ভরিয়ে রাখত সেই স্বপ্ন। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, ও আর বিখ্যাত বৈমানিক লিয়াপিদেভ্স্কি “চেলিউস্কিন” অভিযাত্রীদের হদিশ পেয়ে উদ্ধার করল তাদের, ভদোপিয়ানভের সঙ্গে ভারী বিমান নামাল উত্তর মেরুর বরফে আর চ্কালভের সঙ্গে মেরু হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার অনাবিষ্কৃত আকাশ-পথের সূচনা করল।

কমিউনিস্ট যুব সংঘ সুদূর প্রাচ্যে পাঠায় আলেক্সেইকে, তাইগায় তরুণদের সেই সহর — আমুরতীরের কমসমলস্ক — গঠন করতে সাহায্য করে সে, কিন্তু সেই সুদূর স্থানেও বৈমানিক হবার স্বপ্নটা রয়ে গেল। নির্মাতাদের মধ্যে তার মত তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে আলাপ হল, বৈমানিক হবার স্বপ্ন দেখে তারাও, আর বিশ্বাস করা কঠিন যে নিজেদের হাতে সত্যি সত্যি তারা সেই সহরে নিজেদের জন্য একটা বিমান-ক্লাব তৈরী করল, তখন পর্যন্ত সহরটা শুধু ত নক্সার আকারে বেঁচে ছিল। সন্ধ্যায় বিরাট নির্মাণস্থানটি কুয়াশায় ভরে যেত। ব্যারাকে ফিরে যেত নির্মাতারা, জানলা বন্ধ করে দিত, ঝাঁক ঝাঁক মশা আর ডাঁশের তীক্ষ্ম বিকট গুনগুনানি হাওয়ায়, ওগুলো তাড়াবার জন্য ভিজে ডালের ধূমায়িত আগুন জ্বালানো হত দরজার বাইরে। সারা দিনের খাটুনির পরে আর সবাই বিশ্রাম করছে, বিমান-ক্লাবের সদস্যরা আলেক্সেই'র পরিচালনায় যেত তাইগাতে। ওদের গায়ে কেরসিন মাখানো, তাতে নাকি মশা আর ডাঁশেরা পালায়, হাতে কুঠার, গাঁতি, করাত, শাবল আর ডিনামাইট। সেখানে গাছ কাটত ওরা, বিস্ফোরণে গাছের গুঁড়ি-শিকড় উড়িয়ে জমি সমান করা হত — তাইগাতে একটা বিমান-ঘাঁটি তৈরী হবে, জায়গা করা হচ্ছে তারই। আর নিজের হাতে আদিম অরণ্যের কয়েক কিলোমিটার জমি ছিনিয়ে নিয়ে জায়গাটি করে নিল ওরা।

সেই বিমান-ঘাঁটি থেকেই তালিমি বিমানে চেপে প্রথম আকাশে ওঠে আলেক্সেই, ছেলেবেলার স্বপ্ন সত্যি হয় অবশেষে।

পরে বাহিনীর একটি বিমান স্কুলে পড়ে নিজে শিক্ষাদাতা হল আলেক্সেই। যুদ্ধ যখন লাগল তখন স্কুলে ছিল সে। স্কুলের কর্তৃপক্ষরা

আপত্তি করলেও চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে বিমান বাহিনীতে সে যোগ দিল। বিমান চালানোর সঙ্গে জড়িত ছিল ওর সমস্ত উৎকণ্ঠা আর আনন্দ, ভবিষ্যৎ চিন্তা, ওর সমস্ত সাফল্য।

তবুও উইলিয়াম্‌সের কথা ওরা ওকে শোনাচ্ছে!

'উইলিয়াম্‌স ত আর বৈমানিক ছিল না,' বলে আলেক্সেই দেয়ালের দিকে ফিরে শুল।

কিন্তু ওকে সাড়া দেওয়াবার চেষ্টা ছাড়ল না কমিসার। একদিন ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আলেক্সেই শুয়ে আছে, সাধারণত যেমন ও থাকত, কমিসারের ভারি গলা কানে এল:

'লিওশা, এটা পড়ো ত। তোমাকে নিয়ে লেখা।'

ইতিমধ্যেই মেরেসিয়েভের কাছে পত্রিকাটি নিয়ে আসছিল স্তেপান ইভানভিচ। ছোট একটি প্রবন্ধ, পেন্সিলে দাগ দেওয়া। তাড়াতাড়ি পাতাটাতে চোখ বোলাল আলেক্সেই কিন্তু নিজের নাম দেখতে পেল না। প্রথম মহা যুদ্ধের সময়কার রুশ বৈমানিকদের নিয়ে প্রবন্ধটি লেখা। পত্রিকার পাতা থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে নবীন একটি অফিসারের অপরিচিত মুখ, ছুঁচলো ছোট গোঁফ, মাথায় ফৌজী টুপি, তাতে শাদা একটা ব্যাজ, টুপিটা একপাশে কান পর্যন্ত নেমেছে।

'পড়ো, পড়ো, তোমার জন্য ওটা লেখা হয়েছে,' তাড়া দিয়ে বলল কমিসার।

প্রবন্ধটি পড়ল মেরেসিয়েভ। রুশ বিমান বাহিনীর একজন লেফটেনাণ্টকে নিয়ে লেখা, নাম তার ভালেরিয়ান কারপভিচ, শত্রুপক্ষের লাইনের উপরে ওড়বার সময়ে জার্মানদের দমদম গুলি পায়ে লাগে। পা ভেঙ্গে যাওয়া সত্ত্বেও "ফার্মানটিকে" ওদের লাইন পেরিয়ে এনে নিজের ঘাঁটিতে নামায়। একটা পায়ের পাতা কেটে ফেলতে হল, কিন্তু নবীন অফিসারটি চাইল বাহিনীতে থেকে যেতে। নিজে নক্‌সা বানিয়ে তার অনুযায়ী কৃত্রিম একটা পা তৈরী করাল সে। অনেক দিন ধরে অসীম ধৈর্যে ব্যায়াম করে সেটা ব্যবহার করতে শিখল, ফলে যুদ্ধের শেষের দিকে আবার ফিরে গেল বাহিনীতে। বাহিনীর একটি বিমান স্কুলের ইনস্পেক্টর করা হয় তাকে; প্রবন্ধটিতে লেখা হয়েছে: "মাঝেমাঝে নিজের বিমানে চেপে ওড়বার ঝুঁকিও সে নিত।" অফিসারদের সেণ্ট জর্জ ক্রুশ তাকে দেওয়া হয়, সফলভাবে বিমান বাহিনীতে কাজ চালিয়ে সে গেল, পরে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়।

একবার, দুবার, তিনবার প্রবন্ধটি পড়ল মেরেসিয়েভ। ক্ষীণদেহ নবীন লেফ্‌টেনাণ্টটি ক্লান্ত অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, মুখে মোটামুটি নির্ভীক হাসি, ক্লেশের স্বল্প আভাস তাতে। এদিকে সারা ওয়ার্ড একাগ্র দৃষ্টিতে মেরেসিয়েভকে লক্ষ্য করছে। চুলে তাড়াতাড়ি একবার হাত বোলাল ও; পত্রিকা থেকে চোখ নড়ছে না, বিছানার পাশের তাকে হাতড়ে একটা পেন্সিল নিয়ে প্রবন্ধটির চারিদিকে চৌকো করে বলিষ্ঠ কয়েকটা টান দিল।

'পড়েছ?' জানতে চাইল কমিসার, চোখে সেয়ানা দৃষ্টি। চুপ করে রইল আলেক্সেই, তখনো প্রবন্ধের লাইনগুলোতে চোখ বোলাচ্ছে। 'কী মনে হয় তোমার?'

'ওর কিন্তু একটা মাত্র পায়ের পাতা গিয়েছিল।'

'কিন্তু তুমি ত সোভিয়েত মানুষ।'

'ও "ফার্মান" চালাত। ওটা আবার বিমান না কি? বই'এর তাক বলা চলে। ওটা চালানো আর কি। কোন কৌশল বা দ্রুততা দরকার হত না।'

'কিন্তু সোভিয়েত মানুষ তুমি!' জোর দিয়ে আবার কমিসার বলল।

'সোভিয়েত মানুষ,' যন্ত্রের মত পুনরুক্তি করল আলেক্সেই, তখনো প্রবন্ধে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তারপর অন্তরের কী একটা আলোয় মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, একে একে সহচর রোগীদের প্রত্যেকের দিকে আনন্দ আর বিস্ময়ে ভরা চোখে ও তাকাল।

সে রাত্রে পত্রিকাটি বালিশের নিচে রেখে শুল আলেক্সেই; মনে পড়ল শৈশবে পুরোনো নরম কাপড় দিয়ে ওর জন্য একটা কুৎসিৎ ছোট ভালুক পুতুল তৈরী করে দিয়েছিলেন মা, রাত্রে ভাইদের সঙ্গে শুতে গিয়ে ও ঠিক এমনি করেই লুকিয়ে রাখত সেটাকে। কথাটা মনে পড়াতে বেশ জোরে হেসে উঠল আলেক্সেই।

সে রাত্রে এক ফোঁটা ঘুম এল না চোখে। গভীর ঘুমে মগ্ন ওয়ার্ডটি। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে গভজ্‌দেভ, গদির স্প্রিংগুলো ঝনঝন করে উঠছে। শিসের মত আওয়াজ করে স্তেপান ইভানভিচের নাক ডাকছে, যেন ওর নাড়িভুঁড়ি ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এক একবার পাশ ফিরছে কমিসার, দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কাতরোক্তি করছে। কিন্তু আলেক্সেই কিছুই শুনছে না। কিছুক্ষণ পর পর বালিশের নিচে থেকে পত্রিকাটি বের করে, প্রদীপের আলোয় লেফ্‌টেনাণ্টটির স্মিত মুখ দেখছে ও। "কঠিন কাজ ছিল তোমার,

কিন্তু করেছিলে সেটা," আলেক্সেই ভাবল। "আমার কাজ দশগুণ দুরূহ, কিন্তু আমিও পারব, দেখো তুমি!"

মধ্যরাত্রে কমিসারের নড়নচড়ন হঠাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কনুই'এ ভর দিয়ে উঠে আলেক্সেই দেখল ও বিবর্ণ ও প্রশান্তভাবে শুয়ে আছে, মনে হচ্ছে নিশ্বাস পড়ছে না। পাগলের মত ঘণ্টা বাজাল আলেক্সেই। খালি মাথায়, ঘুমন্ত চোখে, চুলের গোছা পিঠে ঝুলে পড়েছে, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা দৌড়িয়ে এল ওয়ার্ডে। কয়েক মুহূর্ত পরে হাউস সার্জনকে ডাকা হল। কমিসারের নাড়ী দেখে সে কর্পূরের ইনজেকশন দিল, অক্সিজেন ব্যাগের নল লাগাল মুখে। সার্জন আর নার্স ঘণ্টাখানেক ধরে কমিসারকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল, মনে হল কোন ফল পাচ্ছে না। অবশেষে চোখ খুলল কমিসার, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার দিকে চেয়ে ক্ষীণ হেসে, হাসিটা প্রায় দেখাই যায় না, আস্তে আস্তে বলল:

'মিছিমিছি তোমাদের এত কষ্ট দিলাম, সেজন্য দুঃখিত। নরক পর্যন্ত যেতে পারিনি, তাই তোমার মুখের দাগের ওষুধটাও আর আনা গেল না। আরো কিছুদিন তোমাকে দাগগুলো বইতে হবে দেখছি। কী করব, নিরুপায়।'

ঠাট্টাটি শুনে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওকের মত শক্ত মানুষটি, হয়ত তার মত প্রবল ঝড়ও সইতে পারবে। হাউস সার্জন বিদায় নিল, বারান্দায় তার জুতোর কিচকিচ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল; ওয়ার্ডের পরিচারিকারাও চলে গেল, শুধু থেকে গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা। কমিসারের খাটের ধারে একপাশ হয়ে বসল সে। রোগীরা ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, শুধু মেরেসিয়েভ চোখ বুজে পড়ে আছে; বিমানের পা-দানে, ফেট্টি দিয়েও হোক, নকল পাদুটো লাগানো যেতে পারবে, সে দুটোর কথা ভাবছে ও। মনে পড়ল বিমান-ক্লাবের ইনস্পেক্টরের কাছে শোনা গৃহযুদ্ধের সময়কার একটি বৈমানিকের গল্প, পাদুটো ছোট বলে বিমানের পা-দানিতে ছোট ছোট কাঠের খণ্ড লাগিয়ে নিয়েছিল সে, যাতে পায়ের নাগাল পায়।

"তোমার মতই খাসা কাজ চালাব, বৎস," কারপভিচকে ভরসা দিল আলেক্সেই। আবার উড়তে পারার কথাটায় আনন্দে বিভোর হয়ে যাচ্ছে মন, ঘুম আসছে না চোখে। চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে আছে। দেখলে মনে হয় গভীর ঘুমে মগ্ন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে একটি বাক্যালাপ কানে এল, পরে দুরূহ মুহূর্তগুলিতে একাধিকবার সেটির কথা তার মনে পড়েছে।

'কিন্তু আপনি এরকম ব্যবহার করেন কেন? যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছেন, সে সময়ে হাসি ঠাট্টা করাটা ভয়াবহ ব্যাপার মনে হয় আমার। যে কষ্টটা পাচ্ছেন সেটার কথা ভাবলে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। আলাদা ওয়ার্ডে যেতে আপনার কী আপত্তি?'

বলার ধরনে মনে হয় সুশ্রী সহৃদয় কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আবেগহীন ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা কথা বলছে না, বলছে অন্য কোন মেয়ে, আবেগে প্রতিবাদ করে, গলায় বিষাদের ছাপ, হয়ত অন্য কিছুরও। চোখ খুলল মেরেসিয়েভ। রুমাল দিয়ে ঢাকা বালবের আলোয় দেখল কমিসারের বালিশে-রাখা বিবর্ণ স্ফীত মুখ, স্নিগ্ধ দীপ্ত চোখ আর নার্সটির নরম মেয়েলী মুখের রেখা। ওর মাথার পিছনে আলো পড়াতে কোমল সোনালী চুল জ্বলছে; ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না মেরেসিয়েভ, তাকিয়ে থাকাটা ঠিক নয় সেটা জানা সত্ত্বেও।

'আহা, কেঁদো না, লক্ষ্মীটি... কিছু ব্রোমাইড দেব নাকি তোমাকে?' কমিসার বলল, যেন কোন বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কথা চলেছে।

'আবার ঠাট্টা করছেন! কী অদ্ভুত লোক আপনি! যে সময় কাঁদা উচিত সে সময়ে হাসাটা ভয়ঙ্কর, যন্ত্রণায় নিজের শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে, সে সময়ে অন্যদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ভয়ঙ্কর সেটা। আপনাকে এত ভালো লাগে! এরকম ভাবে ব্যবহার আর কক্ষণো করবেন না বলছি...'

মাথা নিচু করে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল নার্স। তার ক্ষীণ, শাদা কাপড়-ঢাকা কাঁধ কান্নায় থরথর করে কাঁপছে, বিষণ্ণ মমতায় সেদিকে তাকিয়ে রইল কমিসার।

'অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে,' কমিসার বলল। 'নিজের ব্যাপারে বরাবরই আমি লজ্জাকর ভাবে পিছিয়ে থাকি। অন্য সব জিনিস নিয়ে বরাবর বড্ড বেশী মাথা ঘামিয়েছি। আর এখন, মনে হয়, একেবারে দেরী হয়ে গেছে আমার।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কমিসার। মাথা তুলে নার্স তাকাল তার দিকে, চোখে জল আর ব্যাকুল প্রত্যাশা। কমিসার হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আবার, স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয় ঠাট্টার ভঙ্গীতে বলে চলল:

'গল্পটা শুনুন, লক্ষ্মী মেয়ে! গল্পটা এক্ষুণি মনে পড়ল। ওটা ঘটেছিল অনেক দিন আগে, গৃহযুদ্ধের সময়ে, তুর্কিস্তানে। অশ্বারোহী বাহিনীর একটি স্কোয়াড্রন বাসমাচের পিছু এমন তাড়া করেছিল যে হঠাৎ মরুভূমিতে



এসে পড়ল, এমন সে মরুভূমি যে ঘোড়াগুলো একে একে মরতে শুরু করল। রুশ ঘোড়া সেগুলো, মরুভূমির বালিতে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং অশ্বারোহী বাহিনী থেকে আমরা পরিণত হলাম পদাতিক বাহিনীতে। স্কোয়াড্রনের নেতা ঠিক করল যে মালপত্তর সমস্ত ফেলে, শুধু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সবচেয়ে কাছের বড়ো সহরের দিকে যাব আমরা। সহরটা একশ ষাট কিলোমিটার দূরে, বন্ধ্যা বালুর উপর দিয়ে যেতে হবে আমাদের। ভাবতে পারেন, লক্ষ্মীটি! একদিন, দুদিন, তিনদিন আমাদের যাত্রা চলল। রোদে গা পুড়ে যাচ্ছে। জল নেই। মুখ এত শুকিয়ে গিয়েছে যে চামড়া ফাটছে। হাওয়ায় শুধু বালি, পায়ের নিচে কচকচে বালি, দাঁতে লাগছে বালি, খোঁচা দিচ্ছে চোখে, মুখের মধ্যে ঢুকছে। ভয়াবহ অবস্থা, সত্যি বলছি! হোঁচট খেয়ে কেউ পড়ে গেলে বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, ওঠবার ক্ষমতা নেই। আমাদের সঙ্গে ছিল একটি কমিসার, তার নাম ইয়াকভ পাভলভিচ ভলদিন, থসথসে বুদ্ধিজীবীর মত চেহারা, লোকটা ইতিহাসবিদ... কিন্তু পাকা বলশেভিক ছিল সে। দেখে মনে হত প্রথমেই ও পড়ে যাবে, কিন্তু চলতেই লাগল, অন্যদের উৎসাহ দিত। 'বেশী দূর আর যেতে হবে না, শীগগিরই ওখানে পৌঁছব,' বারবার বলত। আর কেউ শুয়ে পড়লে তার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বলত, 'উঠে পড়ো, নইলে গুলি করব...'

'চতুর্থ দিনে, সহর থেকে তখন আমরা প্রায় পোনেরো কিলোমিটার মাত্র দূরে, আমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। টলতে টলতে মাতালের মত এগোচ্ছি, আহত জন্তুর মত আঁকাবাঁকা পায়ের দাগ পিছনে রেখে। হঠাৎ কমিসার একটা গান ধরল। ক্ষীণ কুৎসিত গলা, গানটাও এমন কিছু নয়, পুরোনো বাহিনীতে মার্চ করে যাবার সময়ে ওটা গাইত লোকে, কিন্তু আমরা সবাই সুর মিলিয়ে গাইতে শুরু করলাম। হুকুম করলাম আমি, 'সার বেঁধে চল,' আর সেভাবে চলল ওরা। তুমি বিশ্বাস করবে না হয়ত, কিন্তু চলাটা আগের চেয়ে সহজ হল।

'ও গানটার পরে আরো একটা, তারপর আর একটা গান গাইলাম আমরা। ব্যাপারটা ভেবে দেখো! শুকনো চড়চড়ে মুখে আমরা গাইলাম, রোদের সে কী অসম্ভব ঝাঁজ। যতগুলো গান জানা ছিল সব কটা গাইলাম, শেষে সহরে পৌঁছলাম আমরা, মরুভূমিতে একটিও লোক পড়ে রইল না... কী মনে নয়?'

'কমিসারের কী হল?'

'কী হল? বেঁচে আছে এখনো, বেশ ভালোই আছে। প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক ও। প্রাগৈতিহাসিক বসতি সব খুঁড়ে বের করে। সত্যি, মরুভূমিতে যাত্রার ফলে গলাটি গিয়েছে ওর। ভাঙ্গা গলায় কথা বলে। কিন্তু গলার কী দরকার ওর? আচ্ছা, আর গল্প নয়। এবার আপনি যান, অশ্বারোহী বাহিনীর লোক আমি, কথা দিচ্ছি আজ রাত্রে আর মারা যাব না।'

শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল আলেক্সেই, আর স্বপ্নে দেখল একটি অদ্ভুত মরুভূমি, রক্তাক্ত ফেটে-যাওয়া মুখে গানের খেই, আর কমিসার ভলোদিন, স্বপ্নে কোন কারণে তাকে কমিসার ভরোবিওভের মত দেখাচ্ছে।

আলেক্সেই'র ঘুম ভাঙ্গল বেলায়। ওয়ার্ডের মাঝখানে রোদ এসে পড়েছে, তার মানে মধ্যাহ্ন, অন্তরে আনন্দের একটি অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভাঙ্গল ওর। স্বপ্ন দেখেছে? কী স্বপ্ন?.. চোখে পড়ল পত্রিকাটি, ঘুমের সময়ে শক্ত করে হাতে ধরে রেখেছিল সেটাকে। দোমড়ানো পাতায় লেফ্‌টেনাণ্ট কারপভিচের মুখে তখনো সেই ঈষৎ ক্লিষ্ট, নির্ভীক হাসি। পত্রিকাটি সযত্নে মসৃণ করে লেফ্‌টেনাণ্টকে চোখ ঠারল মেরেসিয়েভ।

কমিসারের হাতমুখ ধোওয়া আর চুল আঁচড়ানো হয়ে গিয়েছে, হাসিমুখে মেরেসিয়েভকে লক্ষ্য করছে সে।

'ওকে চোখ ঠারছ কেন?' খুসিতে জিজ্ঞেস করল কমিসার।

'আবার বিমান চালাব আমি,' জবাবে বলল আলেক্সেই।

'কেমন করে? ওর ত একটা পা ছিল, তোমার ত দুটোই গিয়েছে।'

'আমি যে সোভিয়েত, রুশ!' সাড়া দিল আলেক্সেই।

কথা বলার ঢঙে একটা দৃঢ় আস্থার ভাব ছিল যে লেফ্‌টেনাণ্ট কারপভিচকেও ছাড়িয়ে যাবে সে, আবার উড়বে।

সেদিন প্রাতরাশের সময়ে পরিচারিকার আনা সবকিছু খাবার খেল আলেক্সেই, খালি প্লেটগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আরো খেতে চাইল। ছটফটে উত্তেজিত ভাব ওর, গান গাইছে, চেষ্টা করছে শিস দেবার, নিজের সঙ্গে জোরে তর্ক চলছে। অধ্যাপক রোঁদে এলেন, ওর প্রতি তাঁর বিশেষ নেকনজরের সুযোগ নিয়ে আলেক্সেই নানা প্রশ্নে তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তুলল, তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে গেলে কী কী অবশ্য কর্তব্য, প্রশ্নগুলো সে বিষয়ে। অধ্যাপক বললেন আরো বেশী খাওয়া আর ঘুমোনো দরকার তার। তারপরে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে দ্বিতীয় পদের খাবার দুবার চেয়ে নিল আলেক্সেই,

জোর করে চারটে কাটলেট খেল। খাবার পর প্রায় দেড় ঘণ্টা চোখ বুজে রইল শুয়ে, কিন্তু চট করে ঘুম এল না।

সুখে লোকের আত্মানুরাগ বাড়ে। অধ্যাপককে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার সময়ে সারা ওয়ার্ডের দৃষ্টি কীসে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল সেটা লক্ষ্য করেনি আলেক্সেই। মেঝের পার্কেটের একটা টুকরো উধাও, সূর্যের আলো ওয়ার্ডের সারা মেঝে আস্তে আস্তে অতিক্রম করে ঠিক সে জায়গাটাতে এসে পড়েছে, অধ্যাপক ঘরে এলেন, যথারীতি সঠিক সময়ে। আগেকার মতই অবাহিত তিনি, কিন্তু সবাই লক্ষ্য করল ওঁর মুখে একটা অভূতপূর্ব অন্যমনস্কতার ছাপ। অন্য দিনের মত বকাবকি করলেন না তিনি, ফোলা চোখের কোণে শিরগুলো দবদব করছে ক্রমাগত। সন্ধ্যাবেলায় রোঁদে যখন এলেন তখন মনে হল শুকনো দেখাল তাঁকে, মনে হল বেশ বুড়িয়ে গিয়েছেন। দরজার হাতলে ঝাড়ন ফেলে রাখার জন্য পরিচারিকাকে নিচু গলায় ধমকালেন, দেখলেন কমিসারের জ্বরের চার্ট, তার জন্য কী একটা ওষুধের নির্দেশ করে নিঃশব্দে গেলেন বেরিয়ে, পিছু পিছু অনুচরবর্গ, তারাও চুপচাপ, বিচলিত দেখাচ্ছে তাদের। দোরগোড়ায় হোঁচট খেয়ে অধ্যাপক আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিলেন, একজন ওঁর কনুই ধরে সামলাল। লম্বা-চওড়া, ভগ্নকণ্ঠ, দুর্দান্ত, নিয়মনিষ্ঠ এই মানুষটিকে চুপচাপ আর অমায়িক হওয়াটা মানাত না। বেরিয়ে যাচ্ছেন তিনি, ৪২ নং ওয়ার্ডের রোগীরা বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। চওড়া, দিলদরাজ মানুষটিকে সবাই তারা ভালোবাসত, ওঁর পরিবর্তনে সবাই উদ্বিগ্ন।

পরিবর্তনের কারণটি কী পরদিন সকালে জানা গেল। পশ্চিম রণাঙ্গনে মারা গিয়েছে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের একমাত্র সন্তান, তারো নাম ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, সেও ছিল ডাক্তার, উদীয়মান বিজ্ঞানী, বাপের গর্ব আর আনন্দের উৎস। নির্দিষ্ট সময়ে সারা হাসপাতাল রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে, অধ্যাপক তাঁর নিয়মিত রোঁদে আসবেন কিনা। ৪২ নং ওয়ার্ডে সবাই একাগ্রভাবে তাকিয়ে আছে মেঝের উপরে আলোর টুকরোটার মন্থর, প্রায় অগোচর গতির দিকে। অবশেষে সেটা এসে পড়ল সেই জায়গাটিতে যেখানে পার্কেটের টুকরোটা নেই, আর সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, ভাবটা এই যে অধ্যাপক তাহলে আর আসছেন না। কিন্তু সেই মুহূর্তে শোনা গেল করিডরে পরিচিত ভারী পায়ের শব্দ, সঙ্গে আসছে বহুসংখ্যক অনুচরবর্গ। অধ্যাপককে এমন কি আগের চেয়ে একটু ভালো দেখাচ্ছে। অবশ্য চোখগুলো লাল,

চোখের পাতা আর নাক ফোলা ফোলা, খুব সর্দি হলে যেমন হয়; টেবিল থেকে কমিসারের জ্বরের চার্ট তুলে নেবার সময়ে ওঁর মোটা খসখসে হাতটা বেশ কেঁপে উঠল, কিন্তু আগেকার মতই কর্মতৎপর আর উদ্যমী তিনি। গোলমেলে ভাব আর ধমকানির ঝোঁকটা, যা হোক, আর নেই।

সর্বসম্মতিক্রমে যেন সেদিন আহতরা এবং অন্যান্য রোগীরা অধ্যাপককে খুসি করার জন্য পাল্লা দিয়ে যথাসাধ্য করল। প্রত্যেকে তাঁকে বলল যে ভালো আছে, এমন কি যাদের অবস্থা বেশ খারাপ তাদেরো অভিযোগ নেই কোন, বরঞ্চ তারা জানাল যে আরোগ্যের পথে তারা। হাসপাতালের ব্যবস্থার গুণগান সমস্বরে করল সবাই, নানা চিকিৎসা প্রথা যে অলৌকিক ফলাফল দিচ্ছে সেটা ত স্পষ্ট। হাসপাতালটি সেদিন বিপুল ও সমান শোকে ব্যথিত ঘনিষ্ঠ একটি পরিবার।

আজকের সকালের এই অসামান্য সাফল্যের কারণ কী, ওয়ার্ড ঘুরতে ঘুরতে অবাক হয়ে ভাবছিলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

সত্যি কি অবাক হয়েছিলেন? নিঃশব্দ, অকপট ষড়যন্ত্রটি হয়ত তাঁর কাছে ধরা পড়ে, ধরা পড়াতে হয়ত নিজের গভীর অনারোগ্য ব্যথা বহন করা সহজতর হয় তাঁর।

৯

পুবমুখো জানলাটার বাইরে পপলারগাছের শাখাটায় ইতিমধ্যেই কচি কচি পাতলা-হলুদ চটচটে পাতা গজিয়েছে, পাতার নিচে লাল, পেঁজা তুলোর মত নরম ফুলের ছড়ি, দেখতে মোটা শুঁয়াপোকার মত। সকালে সূর্যের আলোয় পাতাগুলো চিক চিক করে, মনে হয় অয়েল-পেপারে তৈরী। নোনতা তাজা ভাবের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বায়ুচলাচলের খোলা ছোট জানলাটা ভেদ করে আসে, ওয়ার্ড থেকে হাসপাতালের সব গন্ধ দেয় ছাপিয়ে।

স্তেপান ইভানভিচের বদান্যতায় হৃষ্টপুষ্ট চড়ুইগুলোর বেয়াড়াপনা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে আজকাল। "সাব-মেসিনগানারের" নতুন লেজ গজিয়েছে একটা, তার হৈহৈ আর কোঁদলপ্রিয়তা আরো বেড়ে গিয়েছে। সকালে জানলার বাইরের ঝনকাঠে ওদের সভা বসে, এত কিচির মিচির চলে যে ওয়ার্ড পরিষ্কার করতে এসে পরিচারিকা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, গজগজ করতে করতে জানলায় উঠে ঝাড়ুন দিয়ে তাড়ায় ওদের।

মস্কো নদীতে বরফ নেই আর। উন্দামতায় কাটল কয়েকদিন, তারপর শান্ত হয়ে এল নদীটি, ফিরে এল পাড়ে, চওড়া বুক বাধ্যভাবে মেলে দিল জাহাজ, বজরা আর স্টীমারের চলাচলের জন্য; মোটরযানের সংখ্যা দুর্দিনে মহানগরীতে অনেক কমে গিয়েছিল, নদীর যানবাহন সে অভাব মেটাতে সাহায্য করত। কুকুশকিনের ভয়াল ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও, ৪২ নং ওয়ার্ডের কেউই বসন্তের বন্যায় "ভেসে গেল" না। কমিসার ছাড়া প্রত্যেকেরই অবস্থা ভালোর দিকে, কখন হাসপাতাল ছাড়বে, বেশীর ভাগ সময়েই কথাবার্তা চলত তা নিয়ে।

ওয়ার্ড ছেড়ে প্রথমে গেল স্তেপান ইভানভিচ। যাবার আগের দিন উৎকণ্ঠায়, আনন্দে আর উত্তেজনায় হাসপাতালে ঘুরে বেড়াল সে। একদণ্ড স্থির হয়ে আর থাকতে পারছে না। করিডরে কয়েকজন রোগীর সঙ্গে কথা বলে ওয়ার্ডে ফিরে আসতে আসতে জানলার ধারে বসে ছুরি দিয়ে কিছু একটা বানাতে শুরু করে, তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে বাইরে চলে গেল। সন্ধ্যেবেলায় শুধু, প্রদোষ হয়ে এসেছে, জানলার ঝনকাঠে উঠে বসে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল স্তেপান ইভানভিচ। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। রোগীদের নানা চিকিৎসার সময় এটা, ওয়ার্ডে মাত্র দুজন অন্য রোগী তখন— কমিসার, স্তেপান ইভানভিচকে নিঃশব্দে দেখছে সে, আর মেরেসিয়েভ, প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করছে সে।

সব চুপচাপ। হঠাৎ কমিসার স্তেপান ইভানভিচের দিকে মুখ ঘোরাল, সূর্যাস্তের শেষ আলোয় ওর ছায়া স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে — অনুচ্চকণ্ঠে বলল,

'গাঁয়ে গোধূলি এখন, সব শান্ত, কী শান্ত আহা! গলন্ত মাটি, স্যাঁতসেঁতে সার আর ধোঁয়ার গন্ধ। গোয়ালে গরুটা খড়ের গাদায় পা ঠুকছে, ছটফট করছে, বাছুর হবার সময় এসে পড়েছে। বসন্ত... ক্ষেতে মেয়েরা সার দিতে পেরেছে কিনা কে জানে! আর বীজ আর ঘোড়ার সাজ? তোমার কি মনে হয় সব ঠিক চলছে?'

মেরেসিয়েভের মনে হল কমিসারের স্মিত মুখের দিকে বিস্ময়ে নয়, সভয়ে তাকিয়ে স্তেপান ইভানভিচ জবাব দিল:

'অন্যেরা কী ভাবছে সেটা যাদুকরের মত আপনি ধরে ফেলেন দেখছি, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার!.. হ্যাঁ, মেয়েদের ব্যবহারিক বুদ্ধি বেশ প্রখর, সেটা সত্যি বটে, কিন্তু আমাদের ছাড়া ওরা কী করে চালাচ্ছে সেটা শুধু শয়তান জানে... সত্যি এটা।'

আবার সবাই চুপচাপ। নদীতে একটি জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল, তার ধ্বনি প্রতিধ্বনি জলের উপরে গড়িয়ে গ্রানিটের পাড়ে পাড়ে মুখর হয়ে উঠল।

'যুদ্ধটা তাড়াতাড়ি থেমে যাবে তোমার মনে হয়?' কী কারণে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল স্তেপান ইভানভিচ। 'শরৎকালের আগেই কী থেমে যাবে?'

জবাবে কমিসার বলল:

'তাতে তোমার কী? তোমার বয়সের লোকদের বাহিনীতে ডাকা হয়নি। তুমি ত স্বেচ্ছাসৈনিক। যুদ্ধে তোমার যা করবার ছিল তা করেছ। দরখাস্ত করলেই তোমাকে ওরা ছেড়ে দেবে, তখন মেয়েদের পরিচালনার ভার নিতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনেও অভিজ্ঞ লোকেদের দরকার, নয় কি? কী বল তুমি, দাড়িওয়ালা?'

কথাগুলো বলবার সময়ে এমন সহৃদয়ভাবে তাকাল কমিসার যে বুড়ো সৈনিকটি জানলার ঝনকাঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল অস্থির উত্তেজনায়।

'বাহিনী ছেড়ে দিতে বলছ, বটে!' বলে উঠল সে। 'আমিও ভাবছিলাম তাই। মনে মনে বলছিলাম: কমিশনে দরখাস্ত করলে কী হয়? তিনটে যুদ্ধে ত এপর্যন্ত যোগ দিয়েছি — সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, আর এই যুদ্ধের কিছুটা। হয়ত সেটাই যথেষ্ট, কী বলো? আমার কী করা উচিত বলো ত, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার?'

'দরখাস্তে বলো যে যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে মেয়েদের সঙ্গে কাজ কবার জন্যে বাহিনী থেকে ছাড়া পেতে তুমি চাও। জার্মানদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে অন্য লোক ত আছে!' নিজেকে সামলাতে না পেরে বিছানা থেকে চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ।

অপরাধীর মত তার দিকে তাকাল স্তেপান ইভানভিচ। রাগতভাবে ভুরু কুঁচকিয়ে কমিসার বলল:

'তোমাকে কী বাতলাব জানি না, স্তেপান ইভানভিচ। তোমার অন্তর কী চায় ভেবে দেখো। রুশ অন্তর ত তোমার। উচিত পরামর্শ দেবে সেটা।'

পরের দিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল স্তেপান ইভানভিচ। সামরিক পোশাকে সবাইকে বিদায় জানাতে ওয়ার্ডে এল সে। বেঁটেখাটো মানুষ, ধুয়ে ধুয়ে পুরোনো টিউনিকের রং চটে শাদা হয়ে গিয়েছে, কোমরে আঁটো করে বেল্ট জড়ানো, এত টেনে সেটা পরেছে যে সামনে টিউনিকে একটুও ভাঁজ পড়েনি, বয়সের তুলনায় অন্তত পোনেরো বছর কম দেখাচ্ছে ওকে। বুকে

ঝকঝকে পালিশ-করা "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" স্বর্ণপদক, "অর্ডার অব লেনিন" আর "সাহসের জন্য" প্রাপ্ত পদক। হাসপাতালের ওভারঅল বর্ষাতির মত কাঁধে ঝোলানো। ওর আপাদমস্তক, বাহিনীর পুরোনো উঁচু বুটের কোণ থেকে শুরু করে বিশেষ কায়দায় ছুঁচলো-করা গোঁফজোড়ার কোণগুলো পর্যন্ত মনে করিয়ে দেয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার ক্রিসমাস কার্ডে ছাপানো চটপটে রুশ সৈনিকদের কথা।

ওয়ার্ডের সহচরদের প্রত্যেকের কাছে এগিয়ে এসে বিদায় নিল সে, সামরিক পদ হিসেবে প্রত্যেককে সম্বোধন করে এত সুষ্ঠুভাবে পা ঠুকে বিদায় নিল যে ওকে দেখলে খুসিতে মন ভরে যায়।

'বিদায় নিতে দিন, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার।' কোণের বিছানাটার কাছে এসে বিশেষ খুসির সুরে বলল স্তেপান ইভানভিচ।

'বিদায়, স্তিওপা, শুভ যাত্রা কামনা করি,' উত্তর দিল কমিসার, কষ্ট হলেও পাশ ফিরে সৈনিকটির দিকে তাকাল সে।

হাঁটু গেড়ে বসে কমিসারের বড়ো বড়ো হাত নিজের হাতে নিল সে; আর প্রাচীন রুশ কায়দায় ওরা পরস্পরকে চুম্বন করল তিনবার।

'সেরে ওঠ, সেমিওন ভাসিলিয়েভিচ। ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ আর দীর্ঘজীবী করুন। সোনার মত খাঁটি তোমার অন্তঃকরণ! আমাদের সবায়ের কাছে বাপের চেয়েও বেশী তুমি ছিলে। আমরণ তোমাকে মনে থাকবে...' গভীর আবেগে অনুচ্চকণ্ঠে বলল সৈনিকটি।

'এবারে আপনি যান, স্তেপান ইভানভিচ! উত্তেজনা ওঁর পক্ষে ভালো নয়,' সৈনিকের আস্তিনে টান দিয়ে বলল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা।

'আর আপনাকে আদরযত্নের জন্যে ধন্যবাদ জানাই, নার্স,' গভীর আন্তরিকতায় বলল স্তেপান ইভানভিচ, বিশেষ শ্রদ্ধায় অভিবাদন জানাল তাকে। 'সোভিয়েত দেবী আপনি, সত্যি বলছি...'

আর কী বলবে ভেবে না পেয়ে এবারে বিব্রতভাবে দরজার দিকে হটে গেল স্তেপান ইভানভিচ।

'কী ঠিকানায় তোমাকে চিঠি লিখব, সাইবেরিয়ায়?' হেসে জিজ্ঞেস করল কমিসার।

'কী বলব, কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার? কর্মরত সৈনিককে কোন ঠিকানায় লিখতে হয়ে সেটা ত জানেন,' বিব্রতভাবে জবাব দিল স্তেপান

ইভানভিচ, আবার সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে দরজার ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওয়ার্ডে স্তব্ধতা নেমে এল, মনে হল সেখানে কেউ নেই। কিছুক্ষণ পরে আবার নিজেদের রেজিমেণ্ট, বন্ধুবান্ধব আর যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব বড়ো অভিযানের সম্মুখীন ওরা হবে, সে বিষয়ে কথাবার্তা চলল। সবাই ত এখন সেরে উঠছে, সুতরাং ওগুলো আর স্বপ্ন নয়, কাজের আলোচনা। ইতিমধ্যেই কুকুশকিন করিডরে হেঁটে বেড়াতে পারে, সেখানে গিয়ে নার্সদের খুঁত ধরে, অন্য রোগীদের জ্বালায়, তাদের মধ্যে অনেকেরই সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। ট্যাঙ্ক-অফিসারও আর শয্যাশায়ী নয়, করিডরের আয়নাটার সামনে প্রায়ই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মুখ, গলা আর ঘাড় খুঁটিয়ে দেখে, ব্যাণ্ডেজ আর নেই, ঘাগুলো শুকিয়ে আসছে। আনিউতার সঙ্গে পত্রবিনিময় যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছে, ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ব্যাপারের বিষয়ে জ্ঞান যত বাড়ছে ততই বেড়ে যাচ্ছে নিজের ঝলসে-যাওয়া বিকৃত মুখটাকে খুঁটিয়ে দেখাটা। গোধূলির সময়ে বা স্বল্পালোকিত ওয়ার্ডে নেহাৎ মন্দ দেখায় না মুখটা, বরঞ্চ ভালোই লাগে: পরিষ্কার গড়ন, প্রশস্ত কপাল, নাকটা ছোট আর একটু বাঁকা, ছোট, কালো গোঁফ, হাসপাতালে থাকার সময়ে রেখেছে সেটা, আর তাজা তেজী যোয়ান ঠোঁট। কিন্তু উজ্জ্বল আলোয় চোখে পড়ে ওর মুখ ক্ষতচিহ্নে কীর্ণ, সেগুলোর চারপাশে চামড়া কুঁচকিয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। উত্তেজিত হলে, অথবা স্নান-চিকিৎসার পরে মুখে রক্তাভা নিয়ে ফিরে আসার সময় ক্ষতচিহ্নগুলোয় এত বীভৎস দেখায় ওকে যে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে কান্না পেয়ে আসে ওর। ওকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়াসে মেরেসিয়েভ বলল:

'মুখ গোমড়া করে আছ কেন? সিনেমায় অভিনয় করার মৎলব ত নেই তোমার, আছে কি? তোমার সেই মেয়েটি সাঁচ্চা হলে এতে তার কিছু এসে যাবে না। আর যদি এসে যায় তাহলে বুঝতে হবে ও গবেট। তখন ওকে বোলো গোল্লায় যেতে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে তুমি। খাঁটি আর কাউকে পাবে।'

'সব মেয়েই সমান,' বলে উঠল কুকুশকিন।

'আর আপনার মা?' জিজ্ঞেস করল কমিসার, ওয়ার্ডে একমাত্র কুকুশকিনকেই "আপনি" বলে সম্বোধন করে সে।

শান্ত প্রশ্নটিতে লেফ্‌টেনাণ্টের যে প্রতিক্রিয়া হল সেটা বর্ণনা করা



কঠিন। বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসল সে, চোখ দারুণ জ্বলে উঠল, মুখ কাগজের চেয়ে শাদা।

'এই দেখুন, এই দেখুন! তাহলে দেখছেন ত দুনিয়াতে ভালো মেয়েও আছে,' আপোস করার সুরে বলল কমিসার। 'গ্রিশাব কপাল খুলবে না, কেন সেটা আপনার মনে হয়? জীবনে সব সময়েই ঘটে এটা: যারা চায় তারা পায়।'

সংক্ষেপে, সমস্ত ওয়ার্ডে আবার প্রাণচঞ্চলতা ফিরে এল। একমাত্র কমিসারের অবস্থা সমানে খারাপের দিকে চলেছে। মরফিয়া আর কপূর দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তার ফলে মাঝেমাঝে দিনের পর দিন ওষুধের ঘোরে আধো-আচ্ছন্ন অবস্থায় বিছানায় ছটফট করে সে। স্তেপান ইভানভিচ চলে যাবার পর আরো তাড়াতাড়ি কাহিল হয়ে পড়ছে কমিসার। মেরেসিয়েভ অনুরোধ করল ওর খাটটা যেন কমিসারের খাটের আরো কাছে রাখা হয়, দরকার হলে যাতে সাহায্য করতে পারে। যত দিন যাচ্ছে কমিসারের প্রতি তত আকৃষ্ট হচ্ছে মেরেসিয়েভ।

আলেক্সেই জানত যে পা নেই বলে অন্যদের তুলনায় ওর জীবনযাত্রা অনেক কঠিন আর জটিল হবে, সেজন্য টান তার কমিসারের দিকে; কী করে সত্যি সত্যি বাঁচতে হয় সেটি জানে মানুষটি, নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যদের টানে চুম্বকের মত। আজকাল কমিসারের আধো-আচ্ছন্ন অবস্থা কদাচিৎ কাটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এলে ঠিক আগেকার মতই ব্যবহার করে সে।

একদিন, সন্ধ্যা ঘন হয়েছে, হাসপাতালের সাড়াশব্দ গিয়েছে মিলিয়ে, স্তব্ধতা ভাঙছে শুধু ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রোগীদের অস্ফুট ক্ষীণ নাকডাকার শব্দ, কাতরোক্তি আর বিকারের প্রলাপে, এমন সময়ে করিডরে শোনা গেল পরিচিত পায়ের ভারী জোরালো শব্দ। দরজার কাচ দিয়ে মেরেসিয়েভের চোখে পড়ে স্বল্পালোকিত করিডরের সবটা, একেবারে ওধারে টেবিলের কাছে বসে একটি নার্স সোয়েটার বুনে চলেছে বিনা ছেদে। করিডরের শেষে দেখা গেল ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের দীর্ঘ দেহ, হাতদুটো পিছনে মুড়ে আস্তে আস্তে হাঁটছেন। লাফিয়ে উঠল নার্সটি, কিন্তু বিরক্তির ভঙ্গীতে হাতের ইশারায় তাকে সরিয়ে দিলেন তিনি। ঢিলে কোটটা খোলা, খালিমাথা, কপালে নেমে এসেছে ভারী পাকা চুলের গোছা।

'ভাসিয়া আসছে,' ফিসফিসিয়ে মেরেসিয়েভ বলল কমিসারকে,

তাকে এতক্ষণ বিশেষ ধরনের কৃত্রিম পায়ের নিজস্ব নক্‌সা একটা বোঝাচ্ছিল সে।

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ থমকে দাঁড়ালেন, যেন কোন বাধা পেয়েছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে সামলালেন নিজেকে, কী যেন বললেন বিড়বিড় করে, তারপর দেয়াল ছেড়ে দিয়ে ৪২ নং ওয়ার্ডে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কপালটা রগড়াতে লাগলেন, যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন। মুখে মদের গন্ধ।

'একটু বসুন, ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, গল্পগুজব করা যাক,' বলল কমিসার।

পা টেনে টেনে খাটের কাছে গিয়ে অধ্যাপক খাটে ধপাস করে বসলেন, স্প্রিংগুলো কিঁচকিঁচ করে উঠল, তারপর রগ ঘষতে লাগলেন তিনি। এর আগে রোঁদের সময়ে কমিসারের খাটের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি প্রায় যুদ্ধ কী ভাবে চলছে সে বিষয়ে কথা বলতেন। এটা সবাই জানত যে রোগীদের মধ্যে কমিসারকে বেছে নিয়েছিলেন তিনি, তাই সন্ধ্যা ঘন হয়ে গেলে তাঁর আসাটা বিচিত্র ছিল না মোটেই। কিন্তু মেরেসিয়েভের মনে হল এদের দুজনের কোন গোপন কথা আছে, তাই সে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল।

'আজ ২৯শে এপ্রিল... ওর জন্মদিন। ওর বয়স এখন — না, বেঁচে থাকলে ওর বয়স হত... ছত্রিশ,' অনুচ্চকণ্ঠে বললেন অধ্যাপক।

অনেক কষ্টে নিজের বড়ো ফোলা হাত কম্বলের নিচ থেকে বের করে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের হাতে রাখল কমিসার। অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার ঘটল: কেঁদে ফেললেন অধ্যাপক। লম্বা-চওড়া মানুষটি কাঁদছে, সেটা দেখাটাও কষ্টকর। স্বতই ঘাড় গুঁজে, কম্বলে মাথা চাপা দিল আলেক্সেই।

'ফ্রন্টে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল,' অধ্যাপক বলে চললেন। 'আমাকে বলল যে জনগণের স্বেচ্ছা সেনাদলে যোগ দিয়েছে, ওর কাজের ভার অন্য কাউকে দেবার অনুরোধ করল আমাকে। এখানে আমার সঙ্গে ও কাজ করত। এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে চেঁচামেচি করেছিলাম। কিছুতেই মাথায় ঢোকেনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্ডিডেট পদবী প্রাপ্ত একজন, প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী একজন, কেন রাইফেল ঘাড়ে নেবে। কিন্তু ও বলল — প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে — ও বলল, "বাবা, মাঝেমাঝে এমন সময় আসে যখন চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্যান্ডিডেটও রাইফেল না ধরে পারে না।" কথাটা বলে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, "আমার জায়গায় কে আসবে?"

আমি যদি একবার শুধু টেলিফোন করতাম তাহলে কিছুই ঘটত না, বুঝতে পারছেন, কিছুই ঘটত না? সামরিক হাসপাতালের একটা বিভাগের ভার ত ওর ওপরে ছিল... ঠিক বলছি না?'

ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ থামলেন, নিশ্বাস পড়ছে কষ্টে, গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন:

'...ওটা করবেন না। হাতটা সরিয়ে নিন। নড়াচড়া করলে আপনার কষ্ট যে কী রকম বাড়ে জানি... হ্যাঁ, সারা রাত বসে রইলাম, কী করা উচিত ভাবলাম। আর একজনের কথা আমার জানা ছিল — কার কথা বলছি আপনি জানেন ত — তার একটি ছেলে ছিল, ছেলেটি অফিসার, যুদ্ধের প্রথমেই মারা যায়। ওর বাবা কী করল জানেন? দ্বিতীয় ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাল, জঙ্গী বিমানচালক হিসেবে পাঠাল, যুদ্ধের সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল পেশা এটা... সেই লোকটির কথা তখন মনে পড়ে গেল, আর যা ভাবছিলাম তার জন্যে লজ্জিত লাগল, তাই টেলিফোন আর করা হল না...'

'সেজন্যে আপনি কি এখন দুঃখিত?'

'না। এটাকে কি দুঃখিত হওয়া বলা চলে? আমি নিজেকে খালি জিজ্ঞেস করি: আমার একমাত্র সন্তানকে তাহলে কি আমিই খুন করেছি? আমার সঙ্গে এখানে এখনো থাকতে পারত ও. আমরা দুজনে দেশের জন্যে বিশেষ জরুরী কাজ করতে পারতাম। সত্যিকারের প্রতিভা ছিল ওর — বলিষ্ঠ, দুঃসাহসী, উজ্জ্বল প্রতিভা। সোভিয়েত চিকিৎসা বিভাগের গর্ব করবার মত লোক হতে পারত ও — যদি সে সময়ে একবার শুধু টেলিফোন করতাম!'

'টেলিফোন করেননি বলে আপনি কি দুঃখিত?'

'কী বলতে চাইছেন?... আমি জানি না। জানি না আমি।'

'আচ্ছা ধরুন, সে-রকম সময় ফিরে এলে কি টেলিফোন করবেন?'

কোন কথাবার্তা নেই। রোগীদের নিয়মিত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। সমানভাবে খাটটা কিঁচকিঁচ করছে, বোঝা গেল গভীর চিন্তায় আমগ্ন অধ্যাপক এপাশ ওপাশ দুলছেন, আর ঘর গরম রাখার নলগুলোর মধ্যেকার আওয়াজ।

'কী মনে হয়?' বোধে ও সমবেদনায় গভীর সুরে আবার জিজ্ঞেস করল কমিসার।

'জানি না... কী জবাব দেব জানি না। জানি না আমি। কিন্তু মনে হয় সবকিছু যদি আবার একই ভাবে ঘটে তাহলে আগে যা করেছিলাম তাই

করব। অন্যান্য বাপেদের মতই ত আমি, দোষেগুণে তাদেরি মত... যুদ্ধ কী ভয়াবহ ব্যাপার...'

'আর বিশ্বাস করুন, দারুণ দুঃসংবাদ সহ্য করাটা অন্যান্য বাপেদের পক্ষে আপনার চেয়ে সহজ নয়। মোটেই সহজ নয়।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। কী ভাবছেন তিনি, মন্থর মুহূর্তগুলিতে তাঁর প্রশস্ত বলিকীর্ণ কপালের পিছনে জোট পাকাচ্ছে কী সব ভাবনা?

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন,' অবশেষে বললেন তিনি। 'ওর পক্ষে সহজতর ছিল না, তবু মেজ ছেলেকে ত যুদ্ধে পাঠিয়েছিল... ধন্যবাদ, আপনাকে ধন্যবাদ, বন্ধু! সত্যি ত, করবার কিছু নেই এ ব্যাপারে...'

খাট থেকে উঠে, আস্তে আস্তে কমিসারের হাত কম্বলের নিচে রেখে, কম্বলটা ভালো করে গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ।

গভীর রাত্রে কমিসারের অবস্থা আবার বিশেষ খারাপ হল। জ্ঞান নেই, দাঁতে দাঁত চেপে বিছানায় ছটফটানি, বেশ জোরে গোঙানি। তারপর চুপ করে গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে টান হয়ে শুয়ে থাকাতে সবাই ভাবল সব শেষ। ছেলের মৃত্যুর পরে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ নিজের ফাঁকা বড়ো ফ্ল্যাট ছেড়ে হাসপাতালে তাঁর ছোট অফিস-ঘরে চলে এসেছিলেন, সেখানে অয়েলক্লথ-দেওয়া একটা সোফায় শুতেন; কমিসারের অবস্থা এত খারাপ হল যে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ ওর বিছানাকে পর্দা দিয়ে ঘিরে দিতে আদেশ করলেন, সবাই জানে সেটার মানে হল রোগীকে হয়ত "৫০ নং ওয়ার্ডে" নিয়ে যাওয়া হবে।

কর্পূর আর অক্সিজেন দেওয়ার ফলে কমিসারের নাড়ী ফিরে এল আবার; রাত্রের সার্জন ও ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ চলে গেলেন যতটুকু পারেন ঘুমোতে, ভোর হতে বিশেষ আর দেরী নেই। পর্দার আড়ালে রোগীর বিছানার পাশে বসে রইল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, অশ্রুসিক্ত উৎকণ্ঠিত মুখে। ঘুম এল না মেরেসিয়েভের। আতঙ্কে খালি ভাবল সে, "তাহলে সত্যিই কি ও মারা যাবে?" স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কমিসার তখনো পর্যন্ত ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর। বিকারের ঘোরে সে বকছে, বারবার বলছে একটি কথা, মেরেসিয়েভের মনে হল ও বলছে:

'জল দাও, আমাকে জল দাও...'

ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার মনে হল কমিসার জল খেতে চাইছে, পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে কম্পিত হাতে গেলাসে জল ঢেলে নিল সে।

কিন্তু জল খেতে রোগী চায়নি। দাঁতে লেগে গেলাসটা শব্দ করে উঠল আর জল ছপাৎ করে বালিশে পড়ল। তখনো ও বলে চলল "দাও" গোছের কথাটা, কখনো আদেশের, কখনো অনুনয়ের সুরে। হঠাৎ মেরেসিয়েভ বুঝতে পারল কথাটা "দাও" নয়, "বাঁচতে দাও", বুঝতে পারল শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বিরাট মানুষটি লড়াই করছে মৃত্যুর সঙ্গে।

একটু পরে শান্ত হয়ে এল কমিসার, চোখ খুলল।

'ভগবানকে ধন্যবাদ,' অনুচ্চকণ্ঠে বলে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা স্বস্তিতে পর্দাটা ভাঁজ করতে শুরু করল।

'ওটা থাক, দোহাই তোমার!' বাধা দিয়ে কমিসার বলে উঠল। 'ওটা নিয়ে যেও না, লক্ষ্মীটি। ওটা থাকলে বেশী আরাম লাগে। আর কাঁদবেন না, এমনিতে পৃথিবীতে অনেক যন্ত্রণা আছে... কেন কাঁদছেন, সোভিয়েত দেবী!.. শুধু শুধু ওই জায়গাটার দোরগোড়ায় দেবীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, কী আফসোসের ব্যাপার সেটা।'

১০

নতুন একটি অনুভূতি আলেক্সেই'র মনে, এরকম অনুভূতি আগে তার কখনো হয়নি।

যে মুহূর্ত থেকে সে বিশ্বাস করতে শুরু করল যে পায়ের পাতা না থাকলেও চেষ্টা করে আবার বিমান চালানো সম্ভব, আবার বৈমানিক হতে পারে সে, সে মুহূর্ত থেকে সক্রিয় জীবনের অদম্য স্পৃহায় ও আচ্ছন্ন।

জীবনে ওর একমাত্র লক্ষ্য এখন জঙ্গীবিমান আবার চালানো। পার্টিজানদের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছবার সময়ে যে অসম্ভব দৃঢ়তা সে দেখিয়েছিল, ঠিক সেরকম দৃঢ়তায় এখন লক্ষ্যবস্তুর দিকে আবার এগোচ্ছে সে। কৈশোর থেকে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে চলা ওর অভ্যাস, এখন প্রথমেই সুনিশ্চিতভাবে ঠিক করে নিল যে সিদ্ধির জন্য কী সাধনা করা তার অবশ্যকর্তব্য, সময় নষ্ট না করে। আর তাই ঠিক করল যে প্রথমে দরকার তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা, অনাহারের জন্য শক্তিহ্রাস হয়েছিল, দরকার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়া, আর সেজন্য বেশী খেতে হবে, ঘুমোতে হবে বেশী। দ্বিতীয়ত,

বৈমানিকের জঙ্গী গুণ ফিরে পেতে হবে, শয্যাশায়ী রোগীর পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা ব্যায়াম করতে হবে তাকে, যাতে শরীর গড়ে ওঠে আবার। তৃতীয়ত, সবচেয়ে জরুরী আর দুঃসাধ্য এটা, পাদুটোর যতটুকু আছে ততটুকু দিয়ে তালিম নিতে হবে, যাতে তাদের শক্তি আর সক্রিয়তা বজায় থাকে; পরে নকল পা পেলে সেদুটো পরে বিমান চালানো শিখতে হবে।

পায়ের পাতা না থাকলে এমন কি হাঁটাও সহজ নয়। মেরেসিয়েভ কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে বিমান চালাবে, যেমন-তেমন বিমান নয়, জঙ্গী বিমান। আকাশ-যুদ্ধে বিশেষ করে সবকিছুর হিসেব মুহূর্তের ভগ্নাংশে মাপাজোকা, স্বভাবসিদ্ধ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতই স্বতঃস্ফূর্ত হতে হয় প্রতিটি নড়নচড়ন, হাতে যেমন কাজ করা যায় তেমন পাদুটোকেও নির্ভুল নিপুণভাবে. আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ঠিক তেমন দ্রুতবেগে চালাতে হয়। এমন ভাবে নিজেকে তৈরী করতে হবে যাতে পায়ে লাগানো চামড়া আর কাঠের টুকরোগুলো শরীরের জীবন্ত অংশগুলির মতই জটিল কাজ সব করতে পারে।

যারা বিমানচালনা প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত তাদের কাছে অসম্ভব মনে হবে এটা, কিন্তু আলেক্সেই'র দৃঢ় বিশ্বাস এটা সম্ভব, আর তাই সিদ্ধিলাভ করবেই সে। সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করার জন্য কাজ করে চলল সে। চিকিৎসা-পদ্ধতি ও ওষুধ যা কিছু নির্দেশ করা হত, প্রত্যেকটি এত কঠোর নিষ্ঠায় মেনে চলত যে নিজেরই অবাক লাগত তার। প্রচুর খেত ও, ক্ষিধে বিশেষ না থাকলেও হামেশাই দ্বিতীয়বার চেয়ে খেত। অবস্থা যাই হোক না কেন. যতক্ষণ ঘুমোনো উচিত বলা হয়েছে জোর করে ততক্ষণ ঘুমোত. এমন কি মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে অল্প একটু ঘুমিয়ে নেওয়াও অভ্যাস করে নিল ও, যদিও সেটা ওর সক্রিয় সজীব প্রকৃতির বিরোধী।

জোর করে খাওয়া, ঘুমোনো, ওষুধ খাওয়া কঠিন ছিল না ওর পক্ষে। ব্যায়ামটা কিন্তু আলাদা ব্যাপার। আগে সাধারণ যে সব ব্যায়াম নিয়মিতভাবে ও করত সেগুলো শয্যাশায়ী, পায়ের পাতাবিহীন লোকের করা সম্ভব নয়। তাই নতুন কয়েকটি ব্যায়াম রীতির উদ্ভাবন করল আলেক্সেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমরে হাত রেখে শরীরটা সামনে পিছনে পাশে, ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে নোয়াত, এত উৎসাহে আর জোরে এদিক ওদিক মাথা ঘোরাত যে শিরদাঁড়া চড়চড় করে উঠত। ওয়ার্ডের সহবাসীরা ব্যায়াম নিয়ে ওকে হালকা ঠাট্টা করত, সপরিহাসে অভিনন্দন জানিয়ে কুকুশকিন ওকে

জ্নামেনস্কি ভাইদের একজন, কিম্বা লাদ্মেগ অথবা অন্য কোন বিখ্যাত দৌড়িয়েদের নাম ধরে ডাকত। এ ধরনের ব্যায়াম দ্চক্ষে দেখতে পারত না কুকুশকিন, ব্যায়ামের ব্যাপারটা হাসপাতালের আর একটা আজগ্বী খেয়াল মাত্র ওর কাছে। আলেক্সেই ব্যায়াম শ্র্ করলেই গজগজ করতে করতে তাড়াতাড়ি করিডরে চলে যেত সে।

পা থেকে ব্যাণ্ডেজ খোলা হল, বিছানায় আরো স্বচ্ছন্দভাবে নড়াচড়া করতে পারে আলেক্সেই, তখন আর একটি ব্যায়াম রীতি চাল্ করল। পাদ্টোকে বিছানার নিচের শিকের মধ্যে দিয়ে কোমরে হাত রেখে যতখানি পারে শরীরটাকে আস্তে আস্তে নোয়াত, তারপর আবার পিছন দিকে হেলত। নোয়ানোর বেগ প্রতিদিন কমিয়ে আনছে, বাড়াচ্ছে সটান হবার সংখ্যা। তারপর পাদ্টোকে খাটাবার জন্য কয়েকটি কায়দা চাল্ করল সে। চিৎ হয়ে শ্রয়ে পালা করে দ্টো পা'কে নোয়াত, হাঁটু ব্কের দিকে টেনে এনে তারপর দিত পাদ্টো ছড়িয়ে। প্রথম এটা করার সময়ে ও উপলব্ধি করল কী ভীষণ এবং হয়ত অনতিক্রম্য বাধার ম্খোম্খি হতে হবে ওকে। গোছ থেকে পাদ্টো কাটা, সে দ্টো ছড়াতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। গতি হয় ইতস্তত অনিয়মিত। ঠিকমত পা ছড়ানো, ডানা কিম্বা পিছনের অংশ গিয়েছে এমন একটি বিমান চালানোর মত কঠিন ব্যাপার। মনে মনে বিমানের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে আলেক্সেই ব্ঝল যে মান্ষের শরীরের আদর্শ স্সমঞ্জস গঠনের যতিপাত ঘটেছে তার ক্ষেত্রে, ওর শরীর যদিও সবল ও বলিষ্ঠ তব্ আশৈশব অভ্যস্ত বিভিন্ন অঙ্গের ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়া আর কখনো ফিরে পাবে না সে।

পায়ের ব্যায়ামে অসম্ভব কষ্ট পেত মেরেসিয়েভ, কিন্তু প্রতিদিন সময়ের মাত্রা এক মিনিট করে বাড়িয়ে চলল। কখনো কখনো ভয়াবহ যন্ত্রণায় চোখ জলে ভরে যেত, কাতরোক্তি চাপার জন্য এত জোরে ঠোঁট কামড়াত যে রক্ত পড়ত। কিন্তু তব্ জোর করে ব্যায়াম চালিয়ে গেল সে, প্রথমে দিনে একবার করে, পরে দ্বার। প্রতিদিন ব্যায়ামের সময় বেড়ে চলল। ব্যায়াম করার পর প্রতিবার অসহায়ভাবে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ভাবত আর করতে পারবে কি না। কিন্তু সময় এলে আবার ব্যায়াম শ্র্ হত। সন্ধ্যেবেলায় উর্ আর পায়ের ডিম টিপে দেখত আর আনন্দে লক্ষ্য করত ব্যায়াম শ্র্ করার গোড়াকার দিকের সেই থলথলে মাংস আর চর্বির জায়গায় এসেছে আগেকার দ্ঢ় পেশীবদ্ধতা।

পাদুটোর কথায় মেরেসিয়েভের সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন। মাঝেমাঝে চিন্তায় মগ্ন সে, পায়ের নিচের দিকটা ব্যথিয়ে উঠল, তখন অন্যভাবে পাদুটো রাখার সময়েই শুধু মনে পড়ত পায়ের পাতা তার নেই। অনেক দিন কোন স্নায়বিক অসঙ্গতির জন্য কাটা পায়ের পাতাদুটো শরীরের সঙ্গে সক্রিয় হয়ে রইল। হঠাৎ শিরশির করে উঠত সেদুটো, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় উঠত ব্যথিয়ে, মাঝেমাঝে এমনকি যন্ত্রণাও হত। পাদুটোর কথায় এত বিভোর আলেক্সেই যে মাঝেমাঝে স্বপ্ন দেখত যে সবেগে ও চলাফেরা করছে। হুঁশিয়ারি বাঁশি বেজেছে, দৌড়িয়ে গেল বিমানে, ডানায় লাফিয়ে উঠে ককপিটে বসল, পা দিয়ে পা-দানিটা দেখছে, ওদিকে ইঞ্জিন থেকে ঢাকনা সরিয়ে নিচ্ছে ইউরা। আবার কখনো ও আর ওলিয়া খালি পায়ে, হাত ধরাধরি করে ফুল ফোটা স্তেপে দৌড়চ্ছে, উষ্ণ ভিজে মাটির নরম স্পর্শ বেশ লাগছে দুজনের। ভারী ভালো লাগছে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে যখন দেখত পায়ের পাতা নেই তখন কী হতাশ না লাগত আলেক্সেই'র!

এ ধরনের স্বপ্ন দেখার পরে মাঝেমাঝে হতাশ্বাস হয়ে যেত আলেক্সেই। মনে হত বৃথায় নিজের শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে, আর কখনো বিমান চালাতে পারবে না সে, যেমন আর কখনো খালি পায়ে স্তেপে আর দৌড়তে পারবে না সেই কমনীয় মেয়েটির সঙ্গে। ওর কাছ থেকে দূরে যত দিন কাটছে ততই চাইছে ওকে, ততই প্রিয় হয়ে উঠছে মেয়েটি।

ওলিয়ার সঙ্গে নিজের সম্পর্কে আনন্দ পায় না আলেক্সেই। প্রায় প্রতি সপ্তাহে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা ওকে "নাচায়," অর্থাৎ বিছানায় ঝটকা দিতে হয়, দিতে হয় হাততালি, তার পরে মেলে চিঠি, স্কুলের মেয়ের গোলগোল পরিচ্ছন্ন হাতে লেখা ঠিকানাটা। ক্রমশ দীর্ঘতর আর অন্তরঙ্গ হচ্ছে চিঠিগুলো, যেন যুদ্ধে ব্যাহত মেয়েটির নবীন প্রেম দিনে দিনে দানা বাঁধছে। চিঠিগুলো আলেক্সেই পড়ে আকাঙ্ক্ষায় আর উৎকণ্ঠায়, জানে যে প্রতিদান দেবার কোন অধিকার নেই তার।

স্কুলে সহপাঠী ছিল তারা, করাত-কলের শিক্ষানবিশি স্কুলে একসঙ্গে পড়েছে, দুজনের মনের ভরাট রোমাণ্টিক আবেগকে বড়োদের অনুকরণে প্রেম বলে ডেকেছিল তারা। পরে ছ-সাত বছরের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়। প্রথমে মেয়েটি-কারিগরি স্কুলে পড়তে চলে যায়। মেকানিক হয়ে যখন করাত-কলে ফিরল তখন সহরে ছিল না আলেক্সেই, সে তখন বিমান স্কুলে। যুদ্ধের ঠিক আগে আবার দুজনের দেখা হয়। দেখাসাক্ষাৎ করতে তারা চায়নি, হয়ত

পরস্পরকে ভুলে গিয়েছিল ওরা — বিচ্ছেদের পরে অনেক জল ত গড়িয়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মায়ের সঙ্গে আলেক্সেই কোথায় যাচ্ছে, একটি মেয়ে ওদের পেরিয়ে গেল। মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকায়নি পর্যন্ত আলেক্সেই, শুধু লক্ষ্য করেছিল ওর পাদুটোর গড়ন বেশ।

'ওকে ডাকলে না কেন? ও ত ওলিয়া!' মেয়েটির পদবীটি উল্লেখ করে বকে উঠলেন মা।

পিছনে তাকাল আলেক্সেই। মেয়েটিও দেখার জন্য ফিরে তাকিয়েছে। দৃষ্টিবিনিময় হল ওদের, আর আলেক্সেই'র হৃৎস্পন্দন হল দ্রুততর। মাকে ছেড়ে ও দৌড়িয়ে গেল মেয়েটির কাছে, ফুটপাথে পত্রহীন একটি পপলার গাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল ও।

'তুমি?' বিস্ময়ে বলে উঠল আলেক্সেই, এমন ভাবে ওর দিকে চাইল যেন কোন সুন্দরী, অসামান্য বিদেশিনী এই বসন্ত সন্ধ্যায় কর্দমাক্ত প্রশান্ত রাস্তায় দৈবক্রমে এসে পড়েছে।

'আলিওশা?' ঠিক ওর মত বিস্মিত অবিশ্বাসী সুরে বলল মেয়েটি।

ছ-সাত বছর বিচ্ছেদের পর এই প্রথম দেখা। আলেক্সেই'র সামনে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো একটি মেয়ে, পেলব নরম গঠন, সুন্দর গোলগাল কিশোরের মত মুখ, নাকের ডগায় কয়েকটি সোনালী ফুট ফুট দাগ। পাতলা, কোণের দিকে একটু ঘন ভুরুজোড়া অল্প তুলে বড়ো বড়ো কটা চকচকে চোখে মেয়েটি তাকাল ওর দিকে। শিক্ষানবিশি স্কুলে শেষ দেখা যখন ওদের হয়েছিল তখন ওর চেহারাটা ছিল শক্তসমর্থ — গোলগাল মুখ, গোলাপী গাল, কর্কশ গোছের একটি কিশোরী, বাপের তেল-চটচটে কোট আস্তিন গুটিয়ে পরে বেশ গর্বিতভাবে চলাফেরা করত — তার সঙ্গে আজকের এই সজীব কমনীয় মেয়েটির আদল খুব কম।

মা'র কথা ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে তারিফ করল আলেক্সেই। মনে হল এ ক' বছরে কখনো ভোলেনি ওকে, আজকের সাক্ষাতের স্বপ্ন দেখেছে বরাবর।

'তাহলে এরকম দেখতে হয়েছ তুমি!' অবশেষে বলল আলেক্সেই।

'কী রকম?' ভরাট মুখর গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটি, স্কুলে একসঙ্গে পড়ার সময়কার মত গলাটা নয় মোটেই।

রাস্তার কোণ থেকে দমকা হাওয়া এসে পত্রহীন পপলারগাছের শাখাগুলোর মধ্য দিয়ে শিস দিয়ে গেল। সুঠাম পাদুটোর উপরে মেয়েটির

ফ্রক ফরফর করে উঠল। খিলখিল করে হেসে, হেঁট হয়ে ফ্রকটা চেপে ধরল ও সহজ সুন্দরভাবে।

'এরকম!' উত্তর দিল আলেক্সেই, সে যে মুগ্ধ সেটা চাপতে পারল না আর।

'কেমন বলো ত?' হেসে উঠে আবার জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

এক মুহূর্ত তরুণ তরুণীর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে হেসে চলে গেলেন আলেক্সেই'র মা। ওরা রয়ে গেল, পরস্পরকে তারিফ করলে, উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা চলল, কথার মধ্যিখানে বাধা দিলে পরস্পরকে, নানারকম বিস্ময়ের উক্তি করলে, যেমন "তোমার মনে পড়ে?" "জানো এটা?" "কোথায়?.." "ওর কী হল?.."

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প চলল, অবশেষে ওলিয়া আঙুল দিয়ে কাছের বাড়িগুলোর জানলাগুলো দেখাল। ফারের শাখা আর জেরানিয়ামের ফুলদানির আড়ালে সেখানে কৌতূহলী মুখ সব দেখা যাচ্ছে।

'তোমার সময় থাকলে চলো নদীর ধারে যাই,' প্রস্তাব করল ওলিয়া। হাত ধরাধরি করে, এমন কি শৈশবে সেটা কখনো করেনি তারা, সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ওরা গেল নদীর উঁচু পাড়ে, খাড়াভাবে নদীতে নেমেছে সেটা, সেখান থেকে অদ্ভুত ভালোভাবে দেখা যায় ভলগার চওড়া বিস্তার আর বন্যার জলে বরফের চাঁই'এর গম্ভীর শোভাযাত্রা।

সে সময় থেকে আদরের ছেলেকে কদাচিৎ বাড়িতে দেখতে পেতেন মা। জামাকাপড়ের বিষয়ে সাধারণত ও মাথা ঘামাত না, কিন্তু এখন রোজ প্যাণ্ট ইস্ত্রি করা হয়, ইউনিফর্মের বোতামগুলো খড়ি দিয়ে পালিশ করে, বিমান বাহিনীর ব্যাজ দেওয়া শাদা-চুড়ো টুপিটা চড়ায় মাথায়, খরখরে চিবুক কামানো হয় প্রত্যহ, আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখে ও যায় করাত-কলের গেটে ওলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। দিনের বেলাতেও প্রায় উধাও হয়ে যায় আলেক্সেই, একটা অন্যমনস্ক ভাব, প্রশ্নের সঠিক জবাব পারে না দিতে। মায়ের সহজাত বোধে ধরা পড়ল ওর কী হয়েছে; সেটা বুঝে ওকে মাপ করলেন তিনি, সেই প্রবাদবাক্যটি সান্ত্বনা যোগাল তাঁকে: বুড়োরা দিনে দিনে বুড়ো হয়, নবীনদের বাড়া অবশ্যকর্তব্য।

ভালোবাসার কথা একবারও বলেনি দুজনে। বিকেলের সূর্যের আলোয় ঝিক ঝিক করে মন্থর স্রোতে বইছে ভলগা, তার খাড়া পাড়ে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরেছে, কিম্বা হয়ত সহরের বাইরে তরমুজ ক্ষেত ধরে গিয়েছে, সেখানে

ঘন আর আলকাতরার মত কালো আঙ্গুরের গোছা ইতিমধ্যেই ঘন সবুজ আর জলচর পাখির পায়ের মত পাতায় দেখা দিয়েছে। সেখান দিয়ে যেতে যেতে ভাবত ছুটির দিন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে ত আসছে, ওলিয়াকে এবার হৃদয়ের কথা সব খুলে বলা যাক। সন্ধ্যা আসত আবার। কলের গেটে দেখা হত ওলিয়ার সঙ্গে, যেত ছোট দোতলা কাঠের বাড়িটিতে, সেখানে বিমানের কামরার মত ঝকঝকে, তকতকে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে ওলিয়া। আলমারীর খোলা পাটের আড়ালে সে জামাকাপড় বদলাত আর ধৈর্য ধরে বসে থাকত আলেক্সেই, পাটের আড়াল থেকে নগ্ন কনুই, ঘাড় আর পা উঁকি মারছে, চেষ্টা করত সেদিকে না তাকাতে। হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসত ও, বেশ ঝরঝরে চেহারা, গাল গোলাপী, ভিজে চুল, পরনে সাদা সিল্কের ব্লাউজ, শনি রবিবার বাদ দিয়ে যেটা সব সময়ে পরত ও।

তারপর দুজনে যেত সিনেমায়, সার্কাসে কিম্বা পার্কে। কোথায় যাওয়া হল তাতে কিছু এসে যেত না আলেক্সেই'র। সিনেমার পর্দা, সার্কাসের মঞ্চ, পার্কের ভিড় কিছুই দেখত না সে; ওর চোখ ভরে থাকত শুধু ওলিয়া, ওকে দেখতে দেখতে ভাবত, "আজ রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়ে পথে বিয়ের কথা বলব, নিশ্চয়ই বলব!" কিন্তু পথ যেত ফুরিয়ে, বলায় সাহস হত না ওর।

রবিবার সকালে একদিন ভলগার ওপারের মাঠে বেড়াতে গেল দুজন। ওলিয়ার খাতিরে সবচেয়ে ভালো সাদা ট্রাউজার চাপিয়েছে আলেক্সেই, খোলা-কলার একটা সার্ট গায়ে, মা বলতেন ওটা ওর তামাটে চওড়া মুখের পক্ষে চমৎকার মানানসই। ওলিয়া তৈরী হয়েই ছিল। ন্যাপকিনে জড়ানো একটা পার্সেল ওর হাতে দিল ওলিয়া, তারপর দুজনে নদীতে গেল। বুড়ো খেয়ামাঝিটা প্রথম মহাযুদ্ধে পঙ্গু হয়, আশেপাশের বাচ্চাদের বিশেষ প্রিয় সে, চড়ার কাছে গাজন-মাছ ধরতে আলেক্সেইকে শিখিয়েছিল ছেলেবেলায়। কাঠের পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে ভারী নৌকোটাকে জলে ঠেলে দাঁড়ের ছোট ছোট ঘায়ে চালাতে শুরু করল। স্রোতে কোণাকুণিভাবে এগিয়ে, দাঁড়ের সংক্ষিপ্ত ঘায়ে নদী পার হয়ে নৌকোটা ওপারের নিচু উজ্জ্বল সবুজ তীরে পৌঁছল। মেয়েটি পিছনের গলুইতে বসে আছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন, হাতটা নিচে নামানো নৌকোর গায়ে, আঙুলের মধ্য দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে।

'আরকাশা খুড়ো, আমাদের চিনতে পারছ না?' আলেক্সেই জিজ্ঞেস করল।

দুজনের নবীন মুখের দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে মাঝি বলল, 'না।'

'কেন, আমার নাম আলিওশ্‌কা মেরেসিয়েভ। কাঁটা দিয়ে চড়ায় গাজন ধরতে তুমিই ত আমাকে শিখিয়েছিলে।'

'শিখিয়েছিলাম হয়ত। তোমার মত নাছোরবান্দা অনেকেই ত খেলত এখানে। সবাইকে মনে নেই।'

একটা পোত পেরিয়ে গেল নৌকোটা, নোঙর ফেলেছে একটা চওড়া-গলুই ছোট স্টীমার, গলুইটা জায়গায় জায়গায় রঙচটা, তার উপরে বিখ্যাত নাম "অরোরা" লেখা, সেটা ছাড়িয়ে নৌকোটা বালুময় তীরে খরখর শব্দ করে ঢুকল।

'আমার কাজ আজকাল এখানে, মিউনিসিপ্যালিটির জন্যে আর খাটি না। নিজের কাজ করি, মানেটা বুঝলে ত—ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর কি,' জলে নেমে নৌকোটাকে তীরে আরো উঁচুতে ঠেলতে ঠেলতে বুঝিয়ে বলল আরকাশা। কিন্তু কাঠের পাদুটো বালিতে গেল ডুবে, নৌকোটা ভারী বলে সরাতে পারল না সেটাকে। "লাফিয়ে নামতে হবে তোমাদের," উদাসীনভাবে বলল আরকাশা।

'কতো দিতে হবে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই।

'তোমার যা খুসি; বেশ খুসি দেখাচ্ছে তোমাদের, সেজন্য একটু বেশী দেওয়া উচিত। কিন্তু তোমাকে চিনতে পারছি না, সত্যি পারছি না।'

লাফিয়ে নামতে গিয়ে ওদের পা ভিজে গেল, জুতো খুলে নিতে বলল ওলিয়া। জুতো খুলে ফেলল দুজনে, নদীর ভিজে তপ্ত বালিতে খোলা পা লাগাতে এত ভালো আর স্বচ্ছন্দ লাগল ওদের যে ঘাসে বাচ্ছাদের মত দৌড়ঝাঁপ করার ইচ্ছে হল।

'ধরো দিকি আমাকে!' চড়া দিয়ে নিচু মরকত-সবুজ মাঠের দিকে তীরের মত ছুটো যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল ওলিয়া, তার বলিষ্ঠ তামাটে পাদুটো ঝলসিয়ে উঠল।

পিছনে দৌড়োল আলেক্সেই, ওর পাতলা উজ্জ্বল ফ্রকটার বহুরঙা ছোপ ছাড়া চোখে আর কিছু পড়ছে না। দৌড়চ্ছে, আর মেঠো ফুল আর সরেলের শিষ খালি পায়ে বেশ বিঁধে যাচ্ছে, পায়ের নিচে বসে যাচ্ছে নরম ভিজেভিজে রৌদ্রতপ্ত মাটি। ওলিয়াকে ধরে ফেলাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে হল তার কাছে, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করছে সেটার উপরে; মনে হল এখানে, ফুল-ভরা মাঠে, মাতাল-করা গন্ধে এত দিন ওকে যা বলার সাহস হয়নি সেটা বলা সহজ হবে। কিন্তু যতবার ওর কাছে এসে

পড়ে ধরতে হাত বাড়ায় আলেক্সেই ততবার হঠাৎ ঘুরে ওর নাগাল পেরিয়ে বেড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে অন্যদিকে পালিয়ে যায় ওলিয়া. আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠে।

ধরা দেবে না দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওলিয়া, ওকে ধরতে পারল না আলেক্সেই। ওলিয়া নিজেই মাঠ ছেড়ে নদীতীরে গিয়ে তপ্ত সোনালী বালিতে ছুঁড়ে দিল নিজেকে, টকটকে লাল মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছে, স্পন্দমান বুকে গভীর আগ্রহে নিশ্বাস নিচ্ছে সে আর হাসছে। পরে ফুল-ভরা মাঠে, শাদা চুমকি-বসানো ডেইজির মধ্যে দাঁড় করিয়ে ওর ছবি তুলল আলেক্সেই। নদীতে স্নান করল দুজনে তারপর; নাইবার পোশাক নিঙড়ে জামাকাপড় যখন পরল ওলিয়া, ও বাধ্য ছেলের মত ঝোপের আড়ালে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

ওলিয়া ডাকতে কাছে গেল। রোদে-পোড়া পাদুটো মুড়ে বালিতে বসে আছে ও, পরনে হালকা পাতলা ফ্রক, মাথায় তোয়ালে। পরিষ্কার শাদা ন্যাপকিনটা ঘাসের উপরে বিছিয়ে কোণে কোণে পাথরের টুকরো দিয়ে চাপা দিল ওলিয়া, পার্সেল থেকে খাবারগুলো বের করে রাখল, তাতে স্যালাড, অয়েল-পেপারে সযত্নে মোড়া ঠাণ্ডা মাছ, বাড়িতে তৈরী বিস্কুট; লাঞ্চ খাওয়া হল। এমন কি নুন আর সরষে আনতে ভোলেনি ওলিয়া, প্রসাধনের কৌটোয় সেগুলো এনেছে। গৃহকর্ত্রীর মত গম্ভীর আর নিপুণভাবে কাজ করেছে একরত্তি মেয়েটি, ওর ধরনে মধুর আর মর্মস্পর্শী কিছু একটা আছে। নিজেকে বলল আলেক্সেই, "গয়ং-গচ্ছ আর নয়। সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় বিয়ের প্রস্তাব করব। ওকে বোঝাব, বুঝিয়ে বলব যে আমাকে বিয়ে করতেই হবে।"

বালির উপরে বসে রোদ পোয়াল দুজন, আর একবার স্নান করা হল; ঠিক হল যে ওলিয়ার ঘরে সন্ধ্যেবেলায় আবার দেখা হবে। তারপরে মন্থরভাবে খেয়া-ঘাটে গেল ওরা, ক্লান্ত এবং সুখী। কী একটা কারণে স্টীমার কিম্বা খেয়া-নৌকো কোনটাই সেখানে নেই। অনেকক্ষণ ধরে আরকাশা খুড়োকে চেঁচিয়ে ডাকল ওরা, ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙ্গে গেল। স্তেপে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের দীপ্ত আলোহিত রেখা নদীর উঁচু ওপার ছুঁয়ে নামছে, সহরের আপাতত নিশ্চল ধূলিধূসর গাছগুলোর মাথা আর বাড়ির ছাত সোনালী হয়ে উঠছে সে আভায়। জানলাগুলো টকটকে লাল। গ্রীষ্মের তপ্ত শান্ত সন্ধ্যা। কিন্তু সহরে কিছু একটা ঘটেছে নির্ঘাত। এ সময়ে রাস্তায়

সাধারণত লোকজন থাকে না, আজ কিন্তু অসংখ্য লোক। লোকবোঝাই দুটো লরি চলে গেল; ছোট একটা দল সামরিক কায়দায় মার্চ করে চলেছে।

'আরকাশা খুড়ো নিশ্চয়ই খুব নেশা করেছে,' বলল আলেক্সেই। 'এখানে যদি রাত কাটাতে হয়?'

'তুমি সঙ্গে থাকলে আমার কোন ভয় হয় না,' বড়ো বড়ো চকচকে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল ওলিয়া।

ওলিয়াকে জড়িয়ে আলেক্সেই চুম্বন করল, প্রথম ও শেষ চুম্বন। দাঁড়ের আওয়াজ এল নদী থেকে; ওধার থেকে লোকবোঝাই খেয়া-নৌকোটা আসছে। নৌকোটাকে দেখে এবার ভয়ানক বিরক্ত লাগল দুজনের, তবু বাধ্যভাবে এগিয়ে গেল সেদিকে, যেন ওটা যা বয়ে আনছিল তার পূর্বসূচনা টেনে নিয়ে গেল তাদের।

কোন কথা না বলে নৌকো থেকে লাফিয়ে নামল যাত্রীরা। সবাই ছুটির পোশাকে, সবাইকে বিচলিত বিষণ্ন দেখাচ্ছে কিন্তু। পুরুষেরা গম্ভীর, বিশেষ তাড়া আছে যেন, আর কেঁদে কেঁদে মেয়েদের চোখ লাল হয়ে গিয়েছে; একটি কথা না বলে তারা ওদের পেরিয়ে গেল। কী ঘটেছে দুজনে জানে না, নৌকোয় লাফিয়ে উঠল। ওদের সুখোজ্জ্বল মুখের দিকে না তাকিয়েই আরকাশা খুড়ো বলল:

'যুদ্ধ বেধেছে... আজ সকালে পররাষ্ট্র জন কমিসার রেডিওতে বলেছেন।'

'যুদ্ধ?.. কার সঙ্গে?' প্রায় লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই।

'ওই নচ্ছার ফ্যাশিস্টগুলোর সঙ্গে, আর কার সঙ্গে আবার?' সক্রোধে দাঁড় টানতে টানতে গরগর করে বলল আরকাশা খুড়ো। 'ছেলেরা ত এরি মধ্যে জেলা সামরিক কমিসারিয়াতে চলে গিয়েছে... সৈন্যদলে ঢোকা শুরু হয়েছে।'

বাড়ি না ফিরে আলেক্সেই সটান গেল সামরিক কমিসারিয়াতে; সে রাত্রেই বারোটা চল্লিশের ট্রেনে চেপে রওনা হল যে বিমান দলে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সেদিকে। সুটকেসটা আনার জন্য কোনক্রমে বাড়িতে যেতে পেরেছিল একবার, ওলিয়াকে বিদায় পর্যন্ত জানাতে পারেনি।

চিঠিপত্র খুব কম লেখে ওরা; তার কারণ এই নয় যে পরস্পরের প্রতি দুজনের মনের ভাব মিইয়ে গিয়েছে কিম্বা পরস্পরকে ভুলে যাচ্ছে ওরা। কারণটা তা নয়। গোলগোল স্কুলের মেয়ের হাতে লেখা চিঠিগুলোর জন্য অধৈর্যভাবে প্রতীক্ষা করে থাকত আলেক্সেই, পকেটে রাখত সেগুলো যখন

একলা তখন বারবার পড়ত। বনে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে এই চিঠিগুলোই বুকে চেপে ধরত ও, চেয়ে থাকত তাদের দিকে। কিন্তু দুজনের বয়স কম, ওদের সম্পর্ক আচমকা ব্যাহত ও ছিন্ন হয়ে যায় যখন তখনো সম্পর্কটা পাকাপাকি হয়নি। তাই পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত পত্রালাপ করত ওরা। শেষ পর্যন্ত অনুচ্চারিত সেই বৃহত্তর জিনিসটির বিষয়ে লিখতে সাহস হত না ওদের।

আর এখন হাসপাতালে শুয়ে, ওলিয়ার চিঠি পেয়ে বিব্রত লাগে আলেক্সেই'র, বিব্রত ভাবটা বেড়ে যায় প্রতি চিঠিতে, কেননা ও দেখছে ওলিয়া নিজে হঠাৎ যেন এগিয়ে এসেছে তার দিকে। এখনকার চিঠিগুলোতে একেবারে খোলাখুলিভাবে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা লেখে ও; সেই সন্ধ্যায় বিশেষ সেই মুহূর্তটিতে ওদের নিতে আরকাশা খুড়ো এসে পড়েছিল বলে তার দুঃখ। আলেক্সেইকে আশ্বাস জানায় যা কিছু ঘটুক না তার, পৃথিবীতে একজনের উপরে সে সব সময়ে নির্ভর করতে পারে; অনুরোধ জানায় যে ঘর ছেড়ে বিভুঁইয়ে ঘোরাব সময়ে আলেক্সেই যেন মনে রাখে আপন বলতে পারে এমন একটা ঠাঁই আছে তার, যুদ্ধশেষে যেখানে ফিরে সে আসতে পারে। আলেক্সেই'র মনে হত যে চিঠিগুলো অন্য কোন ওলিয়ার লেখা। ওর ফটোটা দেখলেই আলেক্সেই'র মনে হয় হাওয়া বইলেই ফুল-তোলা ফ্রক পরনে মেয়েটি ভেসে যাবে, পাকা ডানডেলিওয়নের উড়ন্ত বীজের মত। কিন্তু চিঠিগুলো আসছে একটি নারীর কাছ থেকে — অন্তঃকরণ যার ভালো, ভালোবাসে যে, প্রিয়র ফিরে আসার অপেক্ষায়, আকাঙ্ক্ষায় দিন কাটছে যার। তাতে একসঙ্গে খুসি আর বিষণ্ণ লাগে আলেক্সেই'র; অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুসি লাগে, বিষণ্ণ লাগে কেননা ওর ধারণা ওলিয়ার প্রেমে তার কোন অধিকার নেই। সত্যি, এখন ত ওলিয়ার চেনা সেই রোদে-তামাটে বলিষ্ঠ যুবক আর সে নয়, আরকাশা খুড়োর মত পঙ্গু সে, সেটা ওকে লিখে জানাবার সাহস পর্যন্ত তার নেই। সত্যি কথা লিখলে রুগ্না মা মারা যাবেন সেই ভয়ে লেখেনি, তাই ওলিয়াকেও ঠকাতে বাধ্য হচ্ছে সে, আর যত দিন যাচ্ছে ততই প্রতি চিঠিতে মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়ছে।

তাই কামিশিন থেকে চিঠি এলে পরস্পরবিরোধী অনুভূতি জাগে তার মনে — আনন্দ আর বিষাদ, আশা আর উৎকণ্ঠা — চিঠিগুলো তাকে একই সঙ্গে খুসি করে আর যন্ত্রণা দেয়। মিথ্যে কথা বলেছে একবার, এখন নতুন নতুন মিথ্যে কথা তাই বানাতে হয়, কিন্তু এ ধরনের উদ্ভাবনে

পারদর্শিতা নেই তার। সেইজন্য ওলিয়াকে লেখা তার চিঠিগুলো হয় সংক্ষিপ্ত নীরস।

"আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" লেখা আরো সহজ মনে হয় আলেক্সেই'র। মেয়েটি সহজ সরল আর আত্মত্যাগী। অস্ত্রোপচারের পরে হতাশাচ্ছন্ন একটি মুহূর্তে কাউকে নিজের দুঃখ জানাবার তাগিদ বোধ করে আলেক্সেই, মেয়েটিকে লেখে একটি দীর্ঘ বিষণ্ণ চিঠি। বেশী দিন যেতে না যেতেই উত্তর এল, লেখার খাতা থেকে ছেঁড়া একটা পাতা, তাড়াতাড়িতে লেখা চিঠি, পঙক্তিগুলো বিস্ময়ের চিহ্নে কীর্ণ, যেন বিস্কুটের উপরে যোয়ানের বীজ ছড়ানো, তার উপর সমস্ত চিঠিটা অশ্রু জলের দাগে অলংকৃত। মেয়েটি লিখেছে সামরিক আইনকানুনের বাধা না থাকলে সমস্ত কিছু এক্ষুণি ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে চলে আসত, দেখাশুনো করত ওকে, ওর দুঃখের ভাগীদার হত। বেশী করে চিঠি লিখতে অনুনয় করেছে। এলোমেলো চিঠিটাতে সরল শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসের আতিশয্য, পড়ে বিষণ্ণ লাগল আলেক্সেই'র; ওলিয়ার চিঠিগুলো মেয়েটি ওকে দেবার সময় ওলিয়া তার বিবাহিতা বোন বলেছিল বলে নিজেকে গালি দিল সে। ওরকম মেয়েকে ঠকানো কখনো উচিত নয়। তাই খুলে লিখল যে কামিশিনে একটি মেয়ে আছে, তাকে ও ভালোবাসে, তাকে কিম্বা মা'কে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা জানাবার সাহস তার হয়নি।

"আবহাওয়া সার্জেণ্টের" উত্তর এল খুব তাড়াতাড়ি, যুদ্ধের সময়ে এত তাড়াতাড়ি চিঠি আসাটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সে লিখেছে যে চিঠিটা পাঠাচ্ছে একটি মেজরের হাতে, যুদ্ধ-সাংবাদিক সে, ওদের বিমান-ঘাঁটিতে গিয়েছিল। মেজরটি চেষ্টা করে ওর মন পাবার, লোকটি হাসিখুসি খাসা, কিন্তু তাকে পাত্তা দেয়নি সে। চিঠির সুরে বোঝা যায় মেয়েটি হতাশ হয়েছে, চটেছেও, নিজের মনোভাব ঢাকার চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য করেনি, চেষ্টাটা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। সেবার সত্যি কথা না জানানোর জন্য ধমকে বলেছে যে ওকে যেন এবার বন্ধুভাবে গণ্য করে আলেক্সেই। চিঠিতে পুনশ্চ একটি, কালিতে নয়, পেন্সিলে, তাতে আশ্বাস দিয়েছে যে সে "কমরেড সিনিয়র লেফ্টেনাণ্টের" বিশ্বস্ত বন্ধু; যদি "কামিশিনের সেই মেয়েটি" ওকে ছেড়ে দেয় (যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনের জায়গায় মেয়েদের হালচাল কী সেটা জানতে ওর বাকি নেই), কিম্বা ওকে আর না ভালোবাসে, অথবা ওর পঙ্গুতায় বিরূপ হয়, তাহলে আলেক্সেই যেন "আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" না ভোলে; যে হোক সব সময়ে ওকে সত্যি কথা জানানো চাই। পত্রবাহকটির সঙ্গে গুছিয়ে মোড়া একটি পার্সেল, তাতে

রয়েছে পারাস্যুট সিল্কের তৈরী, আলেক্সেই'র নামের আদ্যাক্ষর দেওয়া কয়েকটি কাজ-করা রুমাল, বিমানের ছবি আঁকা তামাকের থলে একটা, একটা চিরুণী, এক বোতল "ম্যাগনোলিয়া" ও-ডি-কলোন, একটুকরো স্নানের সাবান। এই দুঃসময়ে বাহিনীতে কার্যরত মেয়েদের কাছে জিনিসগুলোর দাম যে কত আলেক্সেই'র জানা। ও জানত যে উপহার হিসেবে পাওয়া এক টুকরো সাবান কিম্বা ও-ডি-কলোনের একটা বোতল ওরা মহাযত্নে রাখে রক্ষাকবচের মত, যুদ্ধের আগেকার দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় জিনিসগুলো। জিনিসগুলোর মূল্য সে জানে বলে বিছানার ধারের তাকে সেগুলো সাজিয়ে রাখার সময়ে যুগপৎ আনন্দিত ও লজ্জিত বোধ করল আলেক্সেই।

এখন স্বভাবসিদ্ধ উদ্যমে নিজের পঙ্গু পাদুটোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে আলেক্সেই, আবার আকাশে উড়ে লড়াই করার স্বপ্ন দেখছে বলে পরস্পরবিরোধী মনোভাবে সে পীড়িত। ওলিয়ার প্রতি ওর অনুরাগ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে কিন্তু চিঠিতে সত্যি কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে অর্ধ-সত্য, আর এদিকে খোলাখুলি সব কথা জানাচ্ছে প্রায় অচেনা একটি মেয়েকে। ব্যাপারটায় তার বিবেক ভারাক্রান্ত।

কিন্তু দৃঢ় শপথ করেছে আলেক্সেই যে স্বপ্ন বাস্তব হবার আগে, লড়বার ক্ষমতা ফিরে পেয়ে আবার বাহিনীতে যোগ দেওয়া না পর্যন্ত প্রেমের কথা লিখবে না ওলিয়াকে। এটা তার লক্ষ্যে পেঁছিবার দুর্মর উৎসাহকে আরো শক্তি জোগাল।

১১

মে মাসের প্রথম দিনে মারা গেল কমিসার।

কী ভাবে অন্তিম মুহূর্তটি এল কেউ জানে না। সকালে মুখহাত ধোওয়া আর চুল আঁচড়ানোর পর যে মেয়েটি তার দাড়ি কামাচ্ছিল তাকে কমিসার জিজ্ঞেস করল আবহাওয়া কেমন, উৎসবের এই দিনে কেমন চেহারা মস্কোর। রাস্তা থেকে ব্যারিকেড সরানো হচ্ছে শুনে খুসি হল কমিসার, বসন্তের এই অদ্ভুত দিনটিতে কোন সমাবেশ বা শোভাযাত্রা হবে না বলে দুঃখ করল, উৎসবের দিনে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা মুখের ফুটফুট দাগগুলো ঢাকার দারুণ একটা চেষ্টা করেছে বলে তার পেছনে লাগল। আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে কমিসারকে, সবায়ের আশা যে সঙ্কট কাটিয়ে উঠে হয়ত এখন আরোগ্যের পথে চলেছে সে।

খবরের কাগজ আর পড়তে পারত না বলে কয়েক দিন হল কমিসারের বিছানার পাশে একটি ইয়ার-ফোন লাগানো বেতার যন্ত্র রাখা হয়েছিল। বেতার টেকনিকের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল গভজ্‌দেভ কিছু একটা করাতে এখন সারা ওয়ার্ডটাই বেতারে গান আর কথাবার্তা শুনতে পায়! নটা বাজল, ঘোষণাকারীটি — সে-সব দিনে সারা পৃথিবী তার গলা চিনত আর তার বার্তা শুনত — দেশরক্ষামন্ত্রীর অর্ডার পড়তে শুরু করল। দেয়ালে ঝোলানো কালো ডিস্কদুটোর দিকে গলা বাড়িয়ে সবাই নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে, পাছে কোন কথা হারিয়ে যায়। এমন কি "মহান লেনিনের অজেয় পতাকার তলে সবাই অগ্রসর হও জয়লাভের দিকে" — কথাগুলি উচ্চারিত হবার পরেও ওয়ার্ডে গভীর স্তব্ধতা।

'কমরেড রেজিমেণ্টাল কমিসার, এটা দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে দিন ত...' কুকুশকিন বলল; তারপর হঠাৎ বিভীষিকায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কমরেড কমিসার!'

ফিরে তাকাল সবাই। আড়ষ্ট কঠিন টান হয়ে শুয়ে আছে কমিসার, ঘরের ছাতের একটি জায়গাতে অনড় চোখদুটো নিবদ্ধ। বিবর্ণ শীর্ণ মুখে প্রশান্ত গম্ভীর মহিমাময় ছাপ।

'মরে গিয়েছে!' তার বিছানার ধারে হাঁটু গেড়ে বসে চেঁচিয়ে বলল কুকুশকিন। 'মরে গিয়েছে!'

ওয়ার্ডের ভীতিবিহ্বল পরিচারিকাদের দৌড়োদৌড়ি, নার্সের এদিক ওদিক ছুটোছুটি। ঝড়ের মতন এলেন হাউস সার্জন, ওভারঅলটার বোতাম তখনো আঁটা হয়নি। বদরাগী অমিশুক লেফ্‌টেনাণ্ট কনস্তান্তিন কুকুশকিন মৃত কমিসারের দেহের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, কারো কথায় কান দিচ্ছে না, কম্বলে মুখ গোঁজা শিশুর মত ফোঁপানি আর কান্নার প্রবল আক্ষেপে তার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে...

সেই দিন সন্ধ্যায় নতুন একটি রোগীকে আনা হল প্রায় অর্ধেক-খালি ৪২নং ওয়ার্ডে। সে হল মেজর পাভেল ইভানভিচ স্ত্রুচকভ, মস্কো রক্ষা-বাহিনীর জঙ্গী বিমান ডিভিশনের লোক। উৎসবের দিনে ফ্যাশিস্টরা মস্কোতে বড়ো গোছের বিমান হামলা চালানোর সংকল্প করে, কিন্তু সমান্তরাল কয়েকটি দলে অগ্রসর ওদের বোমারু বিমানগুলোকে বাধা দিয়ে ভীষণ যুদ্ধের পর পদসল্‌নেচ্‌নায়া অঞ্চলের কোথাও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। শুধু একটা "ইয়ুনকারস" বেরিয়ে এসে অনেক উঁচুতে থেকে মস্কোর দিকে

এগোয়। যে কাজ দেওয়া হয়েছে সেটাকে যে কোন প্রকারে করতে স্পষ্টত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিমানের লোকগুলো, ওদের উদ্দেশ্য উৎসব আনন্দে বাদ সাধা। যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে হঠাৎ স্ত্রুচকভ দেখল বিমানটা সরে পড়ছে, তৎক্ষণাৎ সেটাকে ধাওয়া করে সে। স্ত্রুচকভের হাতে চমৎকার একটি সোভিয়েত বিমান, সে সময়ে জঙ্গী বিমানবাহিনীতে ওধরনের বিমান দেওয়া হচ্ছিল। অনেক উঁচুতে, মাটি থেকে প্রায় ছ কিলোমিটার উপরে, মস্কোর উপকণ্ঠ যখন এসে পড়েছে, জার্মান বিমানটির কাছে এসে পড়ে সে। নিপুণ ফিকিরে বিমানটির পিছনে গিয়ে দৃষ্টিপথে ওটা পরিষ্কার আসাতে কামানের ঘোড়া টিপল। টিপল বটে, কিন্তু সেই পরিচিত খরখর আওয়াজ কানে না আসাতে অবাক হয়ে গেল। ঘোড়াটা কাজ করছে না।

জার্মান বিমানটি একটু আগে। পিছনে লেগে রইল সে, এমন ভাবে যাতে বিমানটার পিছনদিককার জোড়া মেসিনগানের গুলি নিজের বিমানে না লাগে। মে'র দীপ্ত সকালের পরিষ্কার আলোয় দিগন্তে মস্কোর আভাস, কুয়াশায় আচ্ছন্ন ধূসর পুঞ্জ। দুঃসাহসী একটি জিনিস করার সংকল্প করল স্ত্রুচকভ। বুকপেটি খুলে ফেলে, ককপিটের ছাদটা তুলে দিয়ে, যেন লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন ভাবে টান করল নিজের শরীরকে। বোমারুটার সঙ্গে সমান লাইনে নিয়ে এল নিজের বিমানকে; নিমেষের জন্য একটার পিছনে একটা এমন ভাবে উড়ল যে মনে হল দুটো কোন অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা। "ইয়ুনকারসটার" ককপিটের স্বচ্ছ ছাদ দিয়ে স্পষ্টভাবে নজরে পড়ছে বুরুজের জার্মান মেশিনগানারের চোখদুটো ওর প্রতিটি ফিকির লক্ষ্য করছে, নিরাপদ জায়গা থেকে ওর বিমানের ডানাটা একটু বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় আছে সে। স্ত্রুচকভ দেখল উত্তেজনায় নিজের হেলমেট খুলে ফেলল জার্মানটা, এমন কি কপালের উপরে গোছায় ঝুলে পড়া তার লম্বা কটা চুল পর্যন্ত তার চোখে পড়ল। ওর দিকে ঘোরানো, বড়ো মেসিনগানের কালো নাকদুটো জীবন্ত জিনিসের মত নড়ছে; সুযোগের অপেক্ষায় নিরস্ত্র লোকের দিকে পিস্তলের নিশানা করেছে কোন ডাকাত, হঠাৎ সেরকম লোকের মত নিজেকে মনে হল স্ত্রুচকভের, আর এই অবস্থায় নিরস্ত্র সাহসী লোকে যা করে ঠিক তাই করল সে — ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর উপরে। জমিতে হাতাহাতি লড়াই চলে, সেরকম ভাবে নয় অবশ্য; শত্রু বিমানটির পিছনের দিকে নিজের বিমানের ঝকঝকে প্রপেলারের বৃত্তটি লাগাবার জন্য ঝটকায় এগিয়ে গেল সে।

সংঘাতের শব্দ তার কানে আসেনি। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ধাক্কায় উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মনে হল আকাশ ডিগবাজি খাচ্ছে। মাথার উপরে ঝলকে চলে গেল মাটি, গেল থেমে, তারপর তীরবেগে এগিয়ে এল ওর দিকে, উজ্জ্বল সবুজ আর ঝকঝকে মাটি। পারাস্যুট খুলে ফেলল স্ত্রুচকভ, দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে জ্ঞান হারাবার আগে চোখের কোণে পড়ল "ইয়ুনকারসটার" চুরোট-আকৃতি দেহ, লেজটা নেই, হেমন্ত হাওয়ায় ছিন্ন ম্যাপেল পাতার মত ঘুরতে ঘুরতে সেটা সবেগে পেরিয়ে গেল তাকে। পারাস্যুটের দড়িতে অসহায়ভাবে ঝুলতে ঝুলতে, বাড়ির ছাতে জোর ধাক্কা লেগে, মস্কোর উপকণ্ঠে উৎসবমুখর একটি রাস্তায় অচেতন অবস্থায় পড়ল স্ত্রুচকভ। ওখানকার লোকেরা নিচে থেকে দেখেছিল কী অদ্ভুতভাবে জার্মান বিমানটিকে ধাক্কা দিয়ে সে ফেলে দেয়। ওকে তুলে নিয়ে সবচেয়ে কাছের বাড়িতে নিয়ে যায় ওরা। আশেপাশের রাস্তা ভিড়ে ভিড়াক্রান্ত হয়ে গেল, যে ডাক্তারকে ডাকা হয় তিনি অতিকষ্টে গন্তব্যস্থানে পৌছলেন। ছাতের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ফলে ওর হাঁটুর হাড়ে চোট লেগেছে।

"শেষ খবর" এর বিশেষ ঘোষণায় মেজর স্ত্রুচকভের অসমসাহসিকতার কথা বলা হল বেতারে। সহরের সেরা হাসপাতালে ওকে নিয়ে যেতে মস্কো সোভিয়েতের সভাপতি নিজে এলেন। যখন স্ত্রুচকভ ওয়ার্ডে পৌছল তখন ওর পিছনে পিছনে আর্দালিরা নিয়ে এল ফুল ফল আর চকোলেট — মস্কোর কৃতজ্ঞ অধিবাসীদের উপহার।

দেখা গেল স্ত্রুচকভ বেশ হাসিখুসি মিশুকে লোক। ওয়ার্ডের দোরগোড়া পেরোতে না পেরোতে রোগীদের কাছে খোঁজখবর নেওয়া হয়ে গেল, এখানকার ভক্ষণ কী রকম, বিধিগুলো কড়া কিনা, ফুটফুটে চেহারার নার্স আছে কিনা। আর যখন হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছে তখন বাহিনীর ক্যানটিন সম্বন্ধে একটি মজার গল্প বলল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে, ভালো চেহারার জন্য তাকে অসঙ্কোচে তারিফ করল। নার্স চলে গেলে তার দিকে চোখ ঠেরে স্ত্রুচকভ বলল:

'খাসা মেয়েটি! কড়া বুঝি? ধর্মভয় জাগিয়ে দেয়? কুছ পরোয়া নেই। যুদ্ধ কৌশলের কথা কিছু ত জানা আছে তোমাদের? যে কোন দুর্গ জয় করা যায়, মেয়েরা ত কোন ছার!' কথাটা বলে বেশ জোরে হেসে উঠল স্ত্রুচকভ।

পুরোনো রোগীর মত ওর হাবভাব, যেন হাসপাতালে বছর খানেক কাটিয়েছে। প্রত্যেককে প্রথম থেকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করল সে। নাক

ঝাড়বার ইচ্ছে হওয়াতে বিনা লৌকিকতায় মেরেসিয়েভের পারাস্যুট সিল্কের রুমালের একটা তুলে নিল, যে রুমালগুলো সযত্নে বানিয়েছিল "আবহাওয়া সার্জেণ্ট"।

'প্রেয়সীর পাঠানো বুঝি?' চোখ ঠেরে আলেক্সেইকে জিজ্ঞেস করে বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখল রুমালটা। 'অনেক রুমাল তোমার, যদি অনেক নাও হয়, তোমার প্রেয়সী খুব খুসির সঙ্গে আর একটা বানিয়ে দেবে তোমার জন্য।'

রোদে-তামাটে গালে গোলাপী আভাস ফেটে বেরোচ্ছে, তবুও আর নবীন মনে হয় না তাকে। চোখের কোণ থেকে শুরু করে গভীর বলিরেখা রগ পর্যন্ত আগাছার মত বিস্তৃত, ওকে দেখলেই মনে হয় ঝানু সৈনিকের কথা — যেখানেই কিট-ব্যাগ, মুখ ধোবার জায়গার উপরের তাকে যেখানটায় সাবানের বাক্স আর টুথব্রাস রাখা হয় সেখানটাই নিজের বাড়িঘরদোর ভাবতে অভ্যস্ত সে। ওয়ার্ডে সে আনল বেশ হৈচৈ আর ফুর্তির ভাব, আর যে-ভাবে আনল তাতে চটল না কেউ, বরঞ্চ সবায়ের মনে হল ও যেন কতকালের চেনা লোক। নবাগতকে সবায়ের বেশ পছন্দ, শুধু মেয়েদের প্রতি ওর স্পষ্ট দুর্বলতা মেরেসিয়েভের কেমন যেন খারাপ লাগল। প্রসঙ্গত, সে-দুর্বলতা গোপন করার কোন চেষ্টা স্ত্রুচকভ করেনি, যে কোন ছুতো পেলেই মেয়েদের আলোচনা শুরু করত সে।

পরের দিন কমিসারের সমাধি।

জানলার তাকে বসে মেরেসিয়েভ, কুকুশকিন আর গভজ্‌দেভ প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে আছে। গোলন্দাজ বাহিনীর এক দল ঘোড়া কামান-গাড়িটাকে টেনে নিয়ে এল, বাদকেরা দাঁড়াল সার বেঁধে, রোদে চকচক করছে বাদ্যযন্ত্রগুলি, একদল সৈনিক মার্চ করে এল। ওয়ার্ডে এসে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা জানলা থেকে সরে আসতে রোগীদের আদেশ দিল। যথারীতি শান্ত আর তৎপর দেখাচ্ছে ওকে, কিন্তু কথা বলার সময়ে ওর গলা যে কেঁপে উঠল সেটা মেরেসিয়েভের কাছে গোপন রইল না। নতুন রোগীটির জ্বর দেখতে এসেছে ও, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে শবযাত্রার একটি সুর বাজাতে শুরু করল বাদকেরা। ফ্যাকাশে হয়ে গেল নার্সের মুখ, হাত থেকে পড়ে গেল থার্মোমিটার, পারার ছোট ছোট চকচকে বিন্দু পার্কেটের মেঝেতে পড়ল ছড়িয়ে। দুহাতে মুখ ঢেকে ওয়ার্ড ছেড়ে ছুটে চলে গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা।

'কী ব্যাপার? ওর মনের মানুষ ছিল বুঝি লোকটা?' বিষণ্ণ সঙ্গীতের সুর জানলা থেকে ভেসে আসছে সে দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল স্ত্রুচকভ।

উত্তর দিল না কেউ।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওরা, কামান-গাড়ির উপরে খোলা লাল শবাধার গেট পেরিয়ে রাস্তায় পেণছল। ফুল আর ফুলের মালার স্তূপের মাঝখানে শোয়ানো কমিসারের দেহ। কুশনে আঁটা তার সম্মান-চিহ্নগুলো কামান-গাড়ির পিছনে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে লোকজন — একটা, দুটো, পাঁচটা, আটটা সম্মান-চিহ্ন। মাথা নিচু করে পিছু পিছু যাচ্ছে জেনারেলরা। তাদের মধ্যে আছেন জেনারেলের আর্মিকোট পরনে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ, কিন্তু কেন জানি খোলা মাথায়। তারপর, অন্যদের থেকে একটু দূরে, মন্থরগতি সৈনিকদের সামনে খোলা মাথায় ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, পরনে শাদা ওভারঅল, প্রায়ই হোঁচট খাচ্ছে, বোঝা গেল সামনের কিছু তার চোখে পড়ছে না। গেটে কে যেন তার কাঁধে একটা কোট চাপিয়ে দিয়েছিল কিন্তু হাঁটবার সময়ে কোটটা মাটিতে পড়ে গেল, কোটটা যাতে পদদলিত না হয় সে জন্য ওর পিছনে অগ্রসর সৈনিকরা সারি ভাঙ্গল।

'কে ও, দোস্ত?' মেজর জানতে চাইল।

উঠে জানলা দিয়ে দেখতে সে-ও চায়, কিন্তু পাদুটো বক্ষফলক দিয়ে বাঁধা।

চোখের বাইরে চলে গেল দলটা। নদীর কাছ থেকে আসছে গম্ভীর সঙ্গীতের বিষণ্ণ কলি, চাপা আর দূর ধ্বনি, বাড়ির দেয়ালে লেগে অস্ফুট প্রতিধ্বনি উঠছে। খোঁড়া দৌবারিকা লোহার গেট বন্ধ করে দিতে ইতিমধ্যেই এসেছে, কিন্তু ৪২ নং ওয়ার্ডের সহবাসীরা তখনো জানলায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানাচ্ছে কমিসারকে তার অন্তিম যাত্রায়।

'লোকটা কে বলছ না কেন? তোমরা সবাই পাথর বনে গিয়েছ মনে হচ্ছে!' অধৈর্যভাবে মেজর বলল, তখনো উঠে জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সে।

অবশেষে শুকনো চিড়-খাওয়া গলায় জবাব দিল কুকুশকিন:

'মানুষের মত একজন মানুষের... একজনের বলশেভিকের অন্ত্যেষ্টি।'

"মানুষের মত মানুষ" উক্তিটা গভীর দাগ কাটল মেরেসিয়েভের মনে।

এর চেয়ে ভালো বর্ণনা কল্পনা করা যায় না। ওরও প্রবল বাসনা হল মানুষের মত মানুষ হবার, অন্তিম যাত্রায় যাকে এইমাত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মত হবার।

১২

কমিসারের মৃত্যুর পরে ৪২ নং ওয়ার্ডের আবহাওয়া একেবারে বদলে গেল।

হাসপাতাল ওয়ার্ডে মাঝেমাঝে বিষণ্ণ স্তব্ধতা নামে, বিরস চিন্তায় সবাই হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, বুক ভারী হয়ে ওঠে; ছোট্ট দরদী কথায় সে স্তব্ধতা দূর করার লোক আর নেই। গভজ্‌দেভের নৈরাশ্য হালকা ঠাট্টায় ভাঙ্গার কেউ নেই, মেরেসিয়েভ উপদেষ্টাহীন, কুকুশকিন গজগজ করেই চলে, না চটিয়ে হালকা কথায় তাকে দাবাবার কেউ নেই। যে চুম্বক এতদিন বিভিন্ন স্বভাবের লোককে আকর্ষণ করে একত্র করত সে চুম্বক অদৃশ্য।

কিন্তু সেটার প্রয়োজনও এখন ততটা নেই। চিকিৎসা আর সময় কাজ দিয়েছে। সবাই তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে, হাসপাতাল ছাড়ার সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই কমে যাচ্ছে রোগ নিয়ে আলোচনা। হাসপাতালের বাইরে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে, নিজের নিজের সামরিক দল কী ভাবে তাদের অভ্যর্থনা করবে, কী কাজ করতে হবে, সেই ভাবনায় সবাই বিভোর। অভ্যস্ত সামরিক জীবনে ফিরে যেতে সবায়ের আকাঙ্ক্ষা, হাসপাতাল ছেড়ে গিয়ে সময়মত নতুন আক্রমণে যোগ দেবার ব্যাকুল আগ্রহে প্রত্যেকের হাত যেন সুড়সুড় করছে। আক্রমণ যে শুরু হবে, আকাশে আসন্ন ঝড়ের মত তার আভাস, রণাঙ্গনে হঠাৎ নামা স্তব্ধতা থেকেও আঁচ করা যায় সেটা।

হাসপাতাল থেকে বাহিনীতে কাজে ফিরে যাওয়া সৈনিকের পক্ষে অসাধারণ কিছু ব্যাপার নয়। মেরেসিয়েভের পক্ষে কিন্তু সেটা একটা সমস্যা। পায়ের পাতা নেই, দক্ষতা আর শিক্ষা তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে কি? জঙ্গী বিমানের ককপিটে সে কি আবার চড়তে পারবে? লক্ষ্যে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ আগ্রহে আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কাজ করে যাচ্ছে সে। ব্যায়ামের সময় আস্তে আস্তে বাড়িয়েছে, পাদুটোকে খাটায়, তালিমি ব্যায়াম, সাধারণ সব ব্যায়াম রীতির চর্চা করে সে সকাল আর সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা ধরে। তবুও যথেষ্ট মনে হয় না তার। বিকেলেও ব্যায়াম শুরু করল আলেক্সেই। ওর দিকে অপাঙ্গে তাকাত স্ত্রুচকভ, চোখে চটুল ইয়ার্কির ঝিলিক, আর ঘোষণা করত অধিকারীর মত:

'আর এখন, সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই প্রহেলিকাটি, ওঝা-পণ্ডিত, সাইবেরিয়ার জঙ্গলে অতুলনীয় আলেক্সেই মেরেসিয়েভ নানা খেলা এখন দেখাবেন!'

দারুণ উৎসাহে ব্যায়াম চালাত আলেক্সেই, তার ব্যায়াম রীতিতে সত্যি সত্যি এমন কিছু ছিল যাতে ওকে দেখাত ওঝার মত। শরীরটা যেভাবে অবিরাম নোয়াত আর সোজা করত, ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাত, ঘাড় আর হাতের ব্যায়াম পেণ্ডুলামের মত নিয়মিতভাবে আর দৃঢ়চিত্তে করে যেত সেটা দেখলে কষ্ট হত, সে সময়ে ওয়ার্ডের সহবাসীরা যারা হাঁটাচলা করতে পারে বেরিয়ে যেত করিডরে; আর শয্যাশায়ী স্ত্রুচকভ কম্বলে মাথা ঢেকে চেষ্টা করত ঘুমোবার। ওয়ার্ডের কেউ অবশ্য বিশ্বাস করত না যে পায়ের পাতা নেই যার তার পক্ষে ওড়া কখনো সম্ভব, কিন্তু অধ্যবসায়ের জন্য সহবাসীকে খাতির করত তারা, ভক্তিও হয়ত, আর সেটা ইয়ার্কি-তামাশায় গোপন রাখত।

প্রথমে যা মনে হয়েছিল তার চেয়ে গুরুতর দাঁড়াল স্ত্রুচকভের হাঁটুর গাঁট ভাঙ্গা। খুব আস্তে আস্তে সারছে সে, পাদুটো বন্ধফলকে আটকানো, আর যদিও ওর সেরে ওঠায় কোন সন্দেহ নেই তবুও "হতচ্ছাড়া গাঁটের হাড়গুলোকে" বাপান্ত করার বিরাম নেই, ওগুলো ভয়ানক জ্বালাচ্ছে ওকে। মেজরের গজগজানি গরগরানি বেড়ে পরিণত হত ক্রোধে। তুচ্ছ কোন বিষয় নিয়ে রাগে প্রায় পাগল হয়ে যেত সে, গালিগালাজ করত সবাইকে, সমস্ত কিছুকে। তখন মনে হত কেউ বোঝাবার চেষ্টা করলেই ওর হাতে মার খাবে। সর্বসম্মতিক্রমে এরকম আক্ষেপের সময়ে ওয়ার্ডের রোগীরা ওকে একলা ছেড়ে দিত, ওদের ভাষায়, "গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিক গে লোকটা"। যুদ্ধে স্নায়বিক বৈকল্য ঘটেছে তার, সেটা কাটিয়ে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরে না আসা পর্যন্ত চুপচাপ থাকত সহবাসীরা।

অধৈর্য ভাবটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে তার কারণ, স্ত্রুচকভের নিজের মতে, ও বাইরে গিয়ে শৌচাগারে সিগারেট খেতে পারে না; করিডরে গিয়ে দেখতে পায় না অস্ত্রোপচারাগারের সেই লাল-চুল নার্সকে, পায়ে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ পরাবার সময়ে মেয়েটির সঙ্গে নাকি তার আড়চোখের বিনিময় হয়েছিল। কথাটা কিছু সত্যি হয়ত। কিন্তু মেরেসিয়েভ লক্ষ্য করল যে ওর খিটখিট ভাবটা ফিরে আসে তখনি যখন হাসপাতালের উপর দিয়ে কোন বিমান উড়ে যায়, কিম্বা কোন অভিনব আকাশ-যুদ্ধের কথা অথবা পরিচিত কোন বৈমানিকের বিক্রমের বর্ণনা রেডিও ও খবরের কাগজে প্রচারিত হয়।

মেরেসিয়েভেরও এরকম সময়ে খিটখিটে অধৈর্য লাগে, কিন্তু সে প্রকাশ করে না সেটা, আর স্ত্রুচকভের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে অন্তরে জয়োল্লাসের একটা অনুভূতি হয় তার। মনে হয়, "মানুষের মত মানুষ"এর যে আদর্শ সে খাড়া করেছে তার একটু কাছে অন্তত আসতে পেরেছে।

নিজের স্বভাব মত আছে মেজর স্ত্রুচকভ। প্রচুর খায়, দিলভরা হাসি, মেয়েদের গল্প করতে ভালোবাসে, মনে হয় যে সে একই সঙ্গে ভালোবাসে আর ঘৃণা করে মেয়েদের। ফ্রন্টের পশ্চাদ্ভাগে যে সব মেয়েরা, কোন কারণে বিশেষ তীব্র নিন্দে করে তাদের।

স্ত্রুচকভের গালগল্প অত্যন্ত ঘৃণা করে মেরেসিয়েভ। ওর কথা শোনার সময়ে মেরেসিয়েভের চোখের সামনে সর্বদাই আসে ওলিয়ার কিম্বা আবহাওয়া কেন্দ্রের সেই মেয়েটির ছবি যার সম্বন্ধে রেজিমেণ্টে একটি গল্প চালু ছিল: ব্যাটেলিয়নের একটি অতি-উৎসাহী সার্জেণ্ট-মেজরকে সে একবার তার গুমটি থেকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে খুঁচিয়ে ভাগায়, উত্তেজনায় আর একটু হলে তাকে গুলি করে বসত। আলেক্সেই'র মনে হত এ ধরনের মেয়েদেরই নিন্দে করছে স্ত্রুচকভ। একদিন মেজর স্ত্রুচকভ একটি গল্প বলে এইভাবে শেষ করল সেটা — "ওরা সবাই সমান," "চক্ষের নিমেষে" ওদের যে কোন কাউকে বাগানো যায়। সক্রোধে গল্পটা শুনল মেরেসিয়েভ, নিজেকে সামলাতে না পেরে, দাঁতে দাঁত চেপে পাণ্ডুর মুখে জিজ্ঞেস করল:

'যে কোন কাউকে?'

'হ্যাঁ, যে কোন কেউ,' নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল মেজর।

ঠিক সে সময়ে ওয়ার্ডে ঢুকল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, রোগীদের মুখে উত্তেজনার ভাব দেখে বিস্মিত বোধ করল।

'ব্যাপার কী?' মাথার রুমালের নিচে এক গোছা চুল কিছু না ভেবে ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করল সে।

'জীবন নিয়ে আলোচনা চলেছে, নার্স! আমাদের ব্যাপার ত এখন বুড়োদের মত কথা বলা ছাড়া আর কিছু করার নেই,' মধুর হেসে জবাব দিল মেজর।

'আর এই মেয়েটি?' নার্স চলে গেলে ক্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ।

'তোমার কি মনে হয় ও আলাদা মালমশলায় তৈরী?'

'ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার কথা তুলো না!' কঠোর স্বরে বলল গভজ্‌দেভ। 'আমাদের সঙ্গে থাকত একজন, সে ওকে সোভিয়েত দেবী বলে ডাকত।'

'বাজী রাখবে কেউ?'

'বাজী?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ, ওর কালো চোখ ঝলসে উঠল। 'কী বাজী রাখবে?'

'ধরো পিস্তলের গুলি একটা, আগেকার দিনে অফিসাররা যা করত: তুমি জিতলে আমাকে নিশানা করে ছুঁড়তে পারো, যদি আমি জিতি তাহলে তুমি আমার চাঁদমারি হবে,' হাসতে হাসতে বলল স্ত্রুচকভ, সমস্ত ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চায় ও।

'বাজী? ও রকম বাজী? মনে হচ্ছে ভুলে যাচ্ছ সোভিয়েত অফিসার তুমি। তোমার কথা ঠিক হলে আমার মুখে থুথু দিতে পার,' মেরেসিয়েভের দৃষ্টি ভ্রূকুটিকুটিল। 'কিন্তু দেখো যেন, তোমার মুখে আমাকে থুথু না দিতে হয়।'

'না চাইলে বাজী রাখার কোন দরকার নেই। তোমাদের সবাইকে আমি এমনিতেই দেখিয়ে দেব যে ওকে নিয়ে ঝগড়া করার কোন কারণ নেই।'

সেদিন থেকে স্ত্রুচকভ অত্যন্ত আগ্রহে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার মন কাড়ার চেষ্টা শুরু করল। মজার মজার গল্প বলে হাসাত ওকে, এধরনের গল্প বলায় সে ওস্তাদ। যুদ্ধে অভিজ্ঞতার কথা কোন অচেনা লোককে অসংযতভাবে বলা বৈমানিকের পক্ষে নিয়মবিরুদ্ধ, অলিখিত এই নিয়মটি না মেনে স্ত্রুচকভ নার্সটিকে নিজের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলল, ঘটনাবলী সত্যি সত্যিই বিরাট আর চমৎকার। এমন কি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজের পারিবারিক জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা ইঙ্গিতে জানাত, নিজের তিক্ত নিঃসঙ্গতা নিয়ে হা-হুতাশ করত। ওয়ার্ডের সবায়ের অবশ্য জানা ছিল যে ও অবিবাহিত, বিশেষ কোন পারিবারিক দুর্ভোগ ওর নেই।

এটা ঠিক যে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা অন্যদের তুলনায় একটু বেশী মনোযোগ দিত ওকে। মাঝেমাঝে খাটের ধারে বসে শুনত ওর নানা অসমসাহসিকতার কথা। আর স্ত্রুচকভ, নিজের অজ্ঞাতসারে যেন, হাত ধরলে সরিয়ে নিত না সেটা। রাগ জমে উঠছে মেরেসিয়েভের মনে, সমস্ত ওয়ার্ড স্ত্রুচকভের প্রতি ক্ষিপ্ত, ও এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সহবাসীদের কাছে প্রমাণ করবেই যে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা অন্য মেয়েদের মতন। অনুচিৎ কাজটা থামাতে ওকে বিশেষভাবে সাবধান করা হল, হস্তক্ষেপ করাতে ওয়ার্ডের

লোকেরা দৃঢ় সংকল্প হয়েছে, এমন সময় সমস্ত ব্যাপারটি একেবারে অভাবনীয় মোড় নিল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় কাজের সময়ের ফাঁকে ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, কোন রোগীকে দেখতে নয়, এমনি গল্প করতে — এর জন্যই রোগীরা ওকে বিশেষ পছন্দ করত। গল্প বলতে শুরু করল মেজর, ওর বিছানার পাশে বসল নার্স। কী করে ঘটল সেটা কারো নজরে পড়েনি, কিন্তু হঠাৎ ও এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে উঠল। ফিরে তাকাল সবাই। ভ্রূকুটিকুটিল মুখে, গাল টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, সক্রোধে মেজর স্ত্রুচকভের দিকে তাকিয়ে -- মেজরকে লজ্জিত এমন কি সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে — নার্স বলল:

'কমরেড মেজর, আপনি রোগী আর আমি নার্স, তা না হলে আপনার গালে চড় মারতাম!'

'শুনুন, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, শপথ করে বলছি কিছু মনে না করেই আমি ওটা করেছি... তাছাড়া, কী এসে যায় ওতে!..'

'তাই নাকি? কী এসে যায় ওতে?' এবারে সক্রোধে নয়, অবজ্ঞায় ওর দিকে তাকাল নার্স। 'বেশ। আর কিছু বলার নেই। শুনতে পাচ্ছেন কথাটা? আর আপনাকে আমি বলছি, আপনার বন্ধুদের সামনেই বলছি, চিকিৎসার দরকার না হলে আমার সঙ্গে আর কখনো কথা বলবেন না। শুভ রাত্রি কমরেডরা!'

ঘর ছেড়ে চলে গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, ভারী পদক্ষেপে, ওর পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক; বোঝা গেল নিজেকে অবিচলিত দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করছে।

মুহূর্তের জন্য সবাই চুপচাপ। তারপর শোনা গেল মেরেসিয়েভের ক্রুদ্ধ উল্লসিত হাসি, আর সবাই একজোটে মেজরকে নিয়ে পড়ল:

'উচিত শিক্ষা মিলেছে তা হলে!'

দীপ্ত চোখে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ: 'আপনার মুখে এখন থুথু দেব না পরে, কী চান আপনি?'

স্ত্রুচকভকে অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করল না সে। সে বলল, দৃঢ় প্রত্যয়ে যে নয়, তা ঠিক:

'হ্যাঁ। আক্রমণ করে হটে আসতে হয়েছে। কিছু এসে যায় না, আবার চেষ্টা করা যাবে।'

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চুপ করে শুয়ে রইল সে, শিস দিচ্ছে কখনো আর যেন নিজের নানা ভাবনার জবাবে মাঝেমাঝে বলে উঠছে "হ্যাঁ"।

ঘটনাটির কয়েকদিন পরে কনস্তান্তিন কুকুশকিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। যাবার সময়ে কোন আবেগ দেখাল না সে, ওয়ার্ডের সহবাসীদের কাছে বিদায় নিতে নিতে শুধু বলল যে হাসপাতালের জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে তার। একটু হেলায় সবাইকে বিদায় জানাল, শুধু মেরেসিয়েভ আর নার্সটিকে অনুরোধ করল যে ওর মায়ের কোন চিঠি এলে সেটা নিয়ে তার রেজিমেণ্টে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

'ওখানে কেমন চলেছে, তোমার বন্ধুরাই বা কী ভাবে তোমাকে অভ্যর্থনা করল, চিঠি লিখে জানিও আমাদের,' বিদায়ের সময়ে বলল মেরেসিয়েভ।

'তোমাকে চিঠি লিখব কেন! আমার কী পরোয়া কর তুমি? লিখব না আমি, মিছিমিছি কাগজ নষ্ট করে কী হবে, আর লিখলেও তুমি ত জবাব দেবে না।'

'যা খুসি তোমার।'

বোঝা গেল শেষ উক্তিটি কানে যায়নি কুকুশকিনের। ফিরে না তাকিয়ে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল সে। হাসপাতালের গেট ছেড়ে বেরিয়ে গেল, বাঁধ ধরে এগিয়ে মোড় ঘুরল, পিছনে একবারও না তাকিয়ে, যদিও ও ভালো করেই জানত যে প্রথা মত ওয়ার্ডে ওর সহবাসীরা সবাই জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে।

যা হোক, আলেক্সেইকে চিঠি লিখল কুকুশকিন, একটু শীগগিরই বলতে হবে। কোন আবেগ নেই, নীরস ঢঙে লেখা। নিজের কথা শুধু লিখেছে যে উইঙের লোকেরা ওকে ফিরে পেয়ে খুসি মনে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটা জানিয়ে দিয়েছে যে হালের যুদ্ধে অনেক লোক হতাহত হয়েছে, সেজন্য অভিজ্ঞ যে কোন কাউকে ফিরে পেলে ওরা অবশ্যই খুসি হয়। হতাহতের একটি ফিরিস্তি দিয়েছে কুকুশকিন, লিখেছে যে বিমান-ঘাঁটিতে এখনো মেরেসিয়েভের কথা বলে। আর উইং-কম্যাণ্ডার, পদোন্নতির ফলে যিনি এখন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল, মেরেসিয়েভের ব্যায়াম বিদ্যা আর বিমান বাহিনীতে ফিরে আসার সংকল্পের কথা শুনে বলেছেন, "মেরেসিয়েভ ফিরে আসবে নিশ্চয়ই। কোন গোঁ ধরলে সেটা ছাড়ে না, ও এধরনের লোক।" সেটা শুনে চিফ অব্‌ স্টাফ বলেন, অসম্ভব যেটা সেটা কেউ করতে পারে না। জবাব দেন উইং-কম্যাণ্ডার যে মেরেসিয়েভের মত লোকের কাছে অসম্ভব বলে কিছু

নেই। বিস্মিত হয়ে আলেক্সেই দেখল যে এমন কি "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" বিষয়েও কুকুশকিন কয়েক ছত্র লিখেছে। লিখেছে যে প্রশ্নবাণে সার্জেণ্টটি তাকে এমন জর্জরিত করে যে বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হয়, "এবাউট টার্ণ, মার্চ!" উপসংহারে কুকুশকিন লিখেছে যে ইউনিটে ফিরে গিয়ে প্রথম দিনেই দুবার বিমান চালায় ও, পাদুটো একেবারে সেরে গিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা নতুন বিমান পাবে– 'লাভচ্‌কিন-৫,' শীগগিরই এসে পড়বে সেগুলো। সেগুলোকে চালিয়ে দেখেছিল আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো, ওর মতে এগুলোর তুলনায় জার্মানদের সব বিমান বস্তাপচা মাল।

১৩

তাড়াতাড়ি গ্রীষ্ম শুরু হল। সেই পপলারগাছটার শাখা থেকেই উঁকি মারল ৪২ নং ওয়ার্ডে, গাছের পাতাগুলো এখন কঠিন আর উজ্জ্বল। যেন ফিসফিসানি চলেছে নিজেদের মধ্যে এমন অধীরভাবে পাতাগুলো নড়ে। সন্ধ্যার দিকে রাস্তার ধুলোর দরুন তাদের জৌলুষ মিলিয়ে যায়। লাল ফুলের ছড়িগুলো অনেকদিন হল ঝকঝকে সবুজ ঝাড়ে পরিণত হয়েছে, ফেটে গিয়েছে ঝাড়গুলো, হালকা ফেঁসো রোঁয়া পড়ছে তা থেকে। মধ্যাহ্নে, দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে উষ্ণ পপলার রোঁয়া মস্কোব চারিদিকে উড়ে বেড়ায়, খোলা জানলা দিয়ে ঢোকে হাসপাতালে, গরম হাওয়ায় উড়ে দরজায় আর কোণে কোণে লালচে গোছায় জমা হয়।

গ্রীষ্মের একটি শীতল উজ্জ্বল সোনালী সকালে খুব গম্ভীর মুখে ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা; সঙ্গে প্রবীণ ব্যক্তি একজন, স্টিলের চশমা তার দিয়ে বাঁধা, পরনে নতুন, শক্ত করে মাড়-দেওয়া শাদা ওভারঅল, তা সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছে যে ও পুরোনো কারিগর। শাদা কাপড়ে-মোড়া কী একটা জিনিস ওর হাতে। মেরেসিয়েভের বিছানার পাশে মেঝেতে বাণ্ডিলটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে গম্ভীরভাবে যাদুকরের মত ওটাকে খুলতে শুরু করল লোকটি। চামড়ার মচমচ আওয়াজ শোনা গেল, চামড়ার প্রীতিকর তীক্ষ্ম ঝাঁঝালো গন্ধে ওয়ার্ড ভরপুর।

বাণ্ডিলটা খোলা হল, দেখা গেল একজোড়া নতুন হলদে কচকচে কৃত্রিম অঙ্গ, নিপুণভাবে মাপসই তৈরী করা। কৃত্রিম অঙ্গদুটোর উপরে রয়েছে

বাহিনীর নতুন বাদামী একজোড়া বুট; বুটজোড়া এত মাপসই যে দেখলে মনে হয় অঙ্গদুটো বুট-পরা জীবন্ত দুটো পা।

'আর একজোড়া গ্যালশ শুধু আপনার দরকার, সেটা পেলেই, ব্যস, আপনি পরে বিয়ে করতে যেতে পারবেন,' চশমার মধ্য দিয়ে নিজের হাতের কাজের তারিফ করতে করতে বলল কারিগর। 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ নিজে ফরমায়েস করেছিলেন। তিনি বলেন, "জুয়েভ, আসল পায়ের চেয়েও ভালো একজোড়া পা বানাও ত," আর দেখুন, জোড়াটা সামনেই রয়েছে! জুয়েভের তৈরী জিনিস। রাজার যুগ্যি!'

নকল পাদুটো দেখে মেরেসিয়েভের অন্তর সংকুচিত হয়ে গেল, কুঁকড়ে জমে গেল; কিন্তু সে ভাবটা বেশীক্ষণ রইল না; ও-দুটো পরে দেখার আর হাঁটার, নিজে নিজে হাঁটার আগ্রহ জয়লাভ করল। কম্বলের তলা থেকে পাদুটো ঝট করে বের করে কৃত্রিম অঙ্গদুটোকে তাড়াতাড়ি পরিয়ে দিতে বলল কারিগরকে। কিন্তু বুড়ো তাড়াহুড়ো পছন্দ করে না; ও যে-সে লোক নয়, জানাল যে বিপ্লবের অনেক আগে "বড়ো একজন ডিউক" এর জন্য কৃত্রিম পা বানিয়ে দিয়েছিল, ঘোড়দৌড়ের মাঠে ডিউকের পা'টি ভেঙ্গে যায়। নিজের কাজে বিশেষ জাঁক তার, ক্রেতাকে জিনিসটা রসিয়ে দিতে চায়।

আস্তিন দিয়ে অঙ্গদুটোকে মুছে ছোট একটা দাগ নখ দিয়ে ঘষে তুলে ফুঁ দিল সে জায়গাটায়, ধবধবে শাদা ওভারঅলে ঝকঝকে করা হল জায়গাটা, তারপর অঙ্গদুটোকে মেঝেতে রেখে নেকড়াটা ধীরেসুস্থে ভাঁজ করে পকেটে রাখল কারিগর।

'চটপট করো, দাদু, পরে দেখা যাক ওদুটোকে,' বিছানার ধারে বসে অধৈর্যভাবে বলল মেরেসিয়েভ।

কাটা, খোলা পাদুটোর দিকে এবার অপরিচিত দৃষ্টিতে তাকাল মেরেসিয়েভ, ভালোই লাগল দেখে। শক্ত আর পেশল দেখাচ্ছে পাদুটোকে, বাধ্য হয়ে নড়াচড়া বন্ধ করলে যে ধরনের চর্বি সাধারণত জমে ওঠে, সেরকম নয়, কালো চামড়ার নিচে শক্ত পেশী উচ্ছল, কাটা অঙ্গের পেশী যেন নয়, খুব তাড়াতাড়ি চলায় অভ্যস্ত কারোর সুস্থ অঙ্গের পেশীর মত!

'"চটপট করো, চটপট করো," বলার মানেটা কী? বলাটা যত সহজ করাটা তত নয়,' গজগজ করল বুড়ো। 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আমাকে বলেন, "জুয়েভ, তোমার সারা জীবনের সেরা একটা জোড়া বানাও ত। লেফ্‌টেনাণ্টটি," তিনি বলেন, "পায়ের পাতা না থাকা সত্ত্বেও বিমান চালাতে

চায়।" আর তাই বানিয়েছি আমি! দেখো দুটোকে! ওদুটো পরে শুধু হাঁটা নয়, এমন কি বাইক চড়তে আর মেয়েদের সঙ্গে পোলকা নাচতেও পারবে... খাসা জিনিস, সত্যি বলছি!'

কৃত্রিম অঙ্গটির নরম পশমী খাপে আলেক্সেই'র ডান পাটা ঢুকিয়ে দিল সে, ফিতে দিয়ে শক্ত করে সেটাকে বেঁধে, এক পা হটে, তারিফ করে চুকচুক শব্দ করল।

'খাসা বুট! পায়ে ঠিক হয়েছে ত? কোন জায়গায় বিঁধছে না, বিঁধছে কি? মনে ত হয় বিঁধছে না! সারা মস্কোতে জুয়েভের চেয়ে ভালো কারিগর কোথাও পাবে না!'

নিপুণ হাতে কারিগর অন্যটি পরিয়ে দিল মেরেসিয়েভের পায়ে, কিন্তু ফেট্রি বেঁধে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ ঝটকায় বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে মেঝেতে পা রাখল মেরেসিয়েভ। ভারী, ধপাস একটা শব্দ। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠে মেরেসিয়েভ বিছানার ধারে মেঝেতে সটান পড়ে গেল।

এত অবাক হয়ে গেল বুড়ো কারিগর যে চশমাজোড়া কপালে উঠল। ওর খরিদ্দার যে এত চপল হবে আশা করেনি সে। মেঝেতে অসহায় অসাড়ভাবে শুয়ে আছে মেরেসিয়েভ, বুট-পরা কৃত্রিম পাদুটো ফাঁক করে ছড়ানো। হতবুদ্ধি ব্যথিত ভীত ভাব মুখে। সত্যিই কি নিজেকে ঠকাতে চেয়েছিল সে?

বিস্ময়ে দুটো হাত জুড়ে ছুটে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, ধরাধরি করে কারিগর আর সে আলেক্সেইকে তুলে বসিয়ে দিল বিছানায়। আলেক্সেই বসে রইল অবশ বিরসভাবে, মূর্তিমান হতাশার মত।

'ওহে বাপু, এরকম কক্ষণো কোরো না আর!' সমঝিয়ে বলল কারিগর। 'লাফের মত লাফ বটে, যেন পাদুটো সত্যিকারের! তাহলেও বাপু, মুষড়ে পড়া তোমার চলবে না। কী করে হাঁটতে হয় আবার শিখতে হবে, গোড়া থেকে শুরু করে। তুমি যে সৈনিক সেটা বেমালুম ভুলে যাও। নেহাৎ বাচ্চা তুমি, হাঁটাচলা শিখতে হবে, ধীরে ধীরে প্রথমে ক্রাচ ধরে, তারপর দেয়াল ধরে, আর শেষে লাঠি। ঝট করে সব একসঙ্গে করা চলবে না, আস্তে আস্তে করতে হবে। পাদুটো ভালো, কিন্তু তোমার আসল পা ত নয়। তোমার মা-বাপ যে দুটো ঠ্যাং তোমাকে দিয়েছিল তার জোড়া আর কোথায় মিলবে!'

বেয়াড়া লাফটার পরে পাদুটোয় বেশ ব্যথা, তাহলেও তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম অঙ্গদুটো আবার পরে দেখবার আগ্রহ আলেক্সেই'র। ওরা এ্যালুমিনিয়ামের দুটো হালকা ক্রাচ নিয়ে এল। ডগাটা মেঝেতে চেপে, প্যাডদুটো বগলের

নিচে দিয়ে ধীরে ধীরে আর সাবধানে বিছানা থেকে নেমে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল আলেক্সেই। আর বাস্তবিকই সে পা ফেলল শিশুর মত, যে সবেমাত্র হাঁটতে শিখছে, সহজাতভাবে জানে যে হাঁটতে পারে, কিন্তু দেয়ালটা ছেড়ে দেবার ভরসা নেই। শিশুর বুকে তোয়ালে জড়িয়ে মা কিম্বা ঠাকুমা প্রথম পা ফেলতে শেখাচ্ছে, ঠিক সেরকমভাবে আলেক্সেইকে দুধার থেকে সাবধানে ধরল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা আর বুড়ো কারিগর। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে, কৃত্রিম অঙ্গদুটো আর পায়ের সন্ধিস্থলে অসম্ভব ব্যথা। তারপর ইতস্তত করে একটা ক্রাচ এগিয়ে দিল, তারপর পরেরটা, শরীরের ভার তাদের উপরে দিয়ে, একটার পর একটা পা ফেলল! চামড়ার মচমচ আওয়াজ, মেঝেতে দুটো জোর ঠকঠক শব্দ।

'শুভ যাত্রা, শুভ যাত্রা!' নিশ্বাস চেপে বলল বুড়ো কারিগর।

সাবধানে আরো কয়েক পা এগুল মেরেসিয়েভ। কিন্তু কৃত্রিম পায়ের পাতায় প্রথম কয়েক পা হেঁটে ভয়ানক পরিশ্রম হল, দরজা পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে বিছানায় ফিরে এসে মনে হল যেন এক বস্তা চাল ঘাড়ে করে সিঁড়ি ভেঙ্গে চারতলায় নিয়ে গিয়েছে। হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, দরদর ঘাম, চিৎ হয়ে শোবার ক্ষমতা নেই।

'কেমন লাগল ওদুটো, বলো ত? জুয়েভের মত আদমী দুনিয়ায় আছে, সেজন্য ভগবানকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত,' ফিতে খুলে আলেক্সেই'র পাদুটো ছাড়াতে ছাড়াতে দেমাকে বকবক করে চলল বুড়ো। অনভ্যস্ত চাপে পাদুটো একটু ফুলে গিয়েছে। 'মামুলি ওড়া কেন, ওদুটো পরে একদম ভগবানের কাছে উড়ে চলে যেতে পারবে। খাসা হয়েছে, সত্যি বলছি!'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দাদু! খাসা হয়েছে, সত্যি। সেটা ত চোখেই দেখতে পাচ্ছি,' কোনক্রমে বলল আলেক্সেই।

কিছুক্ষণ বুড়ো দাঁড়িয়ে রইল, যেন কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য অস্থির, কিন্তু সাহস হচ্ছে না, অথবা ওকে কিছু জিজ্ঞেস করা হবে, তার প্রতীক্ষায় আছে। অবশেষে হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আস্তে আস্তে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল:

'বিদায় তাহলে। আশা করি ওদুটো তোমার পছন্দসই।' দরজার কাছে তখনো পেঁছয়নি, স্ত্রুচকভ ওকে ডেকে বলল:

'ওহে, বুড়ো! এটা নাও, রাজার যোগ্য পা বানিয়েছ, তার জন্যে ফুর্তি করে পান করা ত চাই!' বুড়োকে কয়েকটা নোট দিল স্ত্রুচকভ।



'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে! পান করার মত ব্যাপার এটা নিশ্চয়ই!' বলল বুড়ো, ওভারঅলের পাড়টা তুলে, যেন কারিগরের এপ্রণ ওটা, টাকাটা পিছনের পকেটে রাখল উচিত গাম্ভীর্যে। 'ধন্যবাদ। এক পাত্র খাব নিশ্চয়ই। আর পাদুটো, সত্যি বলছি, ওদুটো বানাতে প্রাণ দিয়ে খেটেছি। ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ বলেছিলেন, "জুয়েভ, এটা মামুলি ফরমায়েস নয়। সবচেয়ে ভালো করে করা চাই," কিন্তু জুয়েভ কি কখনো গা ঢিলে দিয়ে কাজ করেছে? ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন আমার কাজে আপনারা খুসি হয়েছেন।'

সেলাম জানিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বুড়ো চলে গেল। খাটের পাশে নতুন পাদুটো, যত তাদের দেখছে মেরেসিয়েভের তত ভালো লাগছে ওদুটোর নিপুণ নক্সা, চমৎকার পালিশ আর লঘুভার। "বাইক চড়ো, পোলকা নাচো, বিমানে ওড়ো, স্বয়ং ভগবানের কাছে উড়ে চলে যাও! করব তাই, সবকিছু করব!" ভাবল আলেক্সেই।

সেদিন ওলিয়াকে একটা লম্বা আর খোশমেজাজী চিঠি লিখল সে। জানাল যে নতুন বিমান নেবার কাজ শেষ হয়ে আসছে, আশা করছে যে হেমন্তে, বড়ো জোর শীতে, বড়ো কর্তারা ফ্রন্টের পিছনে এই বিরস কাজ থেকে মুক্তি দেবে ওকে, কাজটা মোটেই ভালো লাগছে না; তারপর ওরা ওকে ফ্রন্টে, নিজের রেজিমেন্টে পাঠাবে, সেখানে বন্ধুরা এখনো ওকে মনে রেখেছে, ওর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় আছে। বিপর্যয়ের পর এই প্রথম খোশমেজাজী চিঠি আলেক্সেইর, এই প্রথম সে প্রেয়সীকে জানাল যে সব সময় তার কথা ভাবে, বিরহে কাতর সে: আর একটু সঙ্কোচে জানাল তার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষার কথা, যুদ্ধের শেষে দেখা হবে আবার, তখন দুজনে ঘর বাঁধবে, অবশ্য ওর মন যদি বদলে না যায়। চিঠিটা কয়েকবার পড়ল আলেক্সেই, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেষের কটা লাইন সাবধানে কেটে দিল।

সেদিন "আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" লেখা তার চিঠিটাতে ফূর্তি আর আমোদের ভাব যেন উপচিয়ে পড়ছে, অতি-উল্লেখযোগ্য দিনটির সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করা হল। কৃত্রিম পাদুটো— ওরকম জোড়া কোন লাট কখনো পরেনি — তাদের একটা বর্ণনা দিল আলেক্সেই, কী করে প্রথম কয়েক পা হেঁটেছে বলল, জানাল বকবকে বুড়ো কারিগরটা কেমন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছে সে যে আলেক্সেই বাইক চড়তে পারবে, পোলকা নাচবে আর সটান বেহেস্ত পর্যন্ত উড়ে যেতে পারবে। তাহলে রেজিমেণ্টে আমি যাচ্ছি, আমাকে ভুলে যেও

না, কম্যাণ্ডাণ্টকে বলে নতুন ঘাঁটিতে আমার জন্য একটা ঘর ঠিক করে রাখতে লিখল আলেক্সেই, মেঝের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে। খাটের নিচে থেকে বেরিয়ে আছে পায়ের চেটোদুটো, যেন কেউ লুকিয়ে রয়েছে। চারদিক চেয়ে আলেক্সেই দেখে নিল কেউ তাকে দেখছে কিনা, তারপর ঝুঁকে ঠাণ্ডা চকচকে চামড়াটায় আদর করে টোকা মারল।

আর একটা জায়গায় ৪২ নং ওয়ার্ডে "রাজার যুগ্যি" একজোড়া কৃত্রিম পাএর আবির্ভাবের কথা নিয়ে ব্যগ্র আলোচনা চলল: জায়গাটা হল সেখানে যেখানে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠক্রমের তৃতীয় কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে। সেখানকার সমস্ত মেয়েরা—সে সময়ে তারাই সবচেয়ে দলে ভারী ৪২ নং ওয়ার্ডের সমস্ত কিছু বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিল পাকাপোক্তভাবে। পত্রলেখককে নিয়ে আনিউতার গর্বের সীমা ছিল না; লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভের চিঠিপত্র সবাইয়ের জন্য লেখা না হলেও সবটা কিম্বা খানিকটা চেঁচিয়ে পড়ে শোনাত আনিউতা, অন্তরঙ্গ কথাগুলো অবশ্য বাদ দিয়ে। প্রসঙ্গত, চিঠিপত্র চলতে চলতে অন্তরঙ্গ অংশগুলোর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

পাঠক্রমের তৃতীয় কোর্সের সবাই বীর গ্রিশা গভজ্‌দেভকে ভালোবাসে, বদমেজাজী কুকুশকিনকে পছন্দ নয় তাদের, অদম্য সংকল্পের জন্য সম্ভ্রম করে তারা মেরেসিয়েভকে। কমিসারের মৃত্যু স্বজনবিয়োগের মত লেগেছিল তাদের, গভজ্‌দেভের উচ্ছ্বসিত বর্ণনার ফলে সবাই কমিসারকে বুঝতে পেরেছিল আর ভালোবেসেছিল। যখন খবর এল যে বিরাট প্রাণমুখর মানুষটি আর নেই, তখন চোখের জল সামলাতে পারেনি অনেকে।

হাসপাতাল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় ক্রমশ বেড়ে চলল। সাধারণ ডাকে সন্তুষ্ট নয় ওরা, সে সময়ে সাধারণ ডাকে চিঠিপত্র আসতে বেশ দেরী হত। একটা চিঠিতে গভজ্‌দেভ লিখল, কমিসার বলেছে যে আজকাল চিঠিপত্র গন্তব্যে পৌঁছয় সুদূর তারার আলোর মত। মানুষের জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার চিঠিপত্র ঢিমে তালে চলে অবশেষে যাকে লেখা তার কাছে পৌঁছিয়ে বহুদিন মৃত পত্রলেখকের কথা জানাবে তাকে। বেশ উদ্যোগী আর চটপটে মেয়ে আনিউতা, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান আরো তাড়াতাড়ি কী করে হতে পারে খোঁজখবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত বের করল একটি বয়স্কা নার্সকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক আর ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের হাসপাতাল, দুটো জায়গাতেই কাজ করে সে।

সেদিন থেকে ৪২ নং ওয়ার্ডে কী ঘটছে তার খবর দ্বিতীয়, বড়ো জোর, তৃতীয় দিনেই পৌঁছত বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাড়াও পড়ে যেত চটপট। "রাজার যুগ্যি" কৃত্রিম পাদুটো নিয়ে তর্কাতর্কি শুরু হল, প্রতিপাদ্য বিষয়টা হল মেরেসিয়েভ বিমান চালাতে পারবে কি না। যৌবনসুলভ আগ্রহে চলল তর্ক; দুপক্ষেরই সহানুভূতি মেরেসিয়েভের দিকে। জঙ্গী বিমান চালানো জটিল কাজ, সেটা ভেবে নৈরাশ্যবাদীরা বলল মেরেসিয়েভ পারবে না। আর আশাবাদীরা জবাবে বলল যে মানুষ শত্রুকে এড়াবার জন্য গভীর বনে দুসপ্তাহ হামাগুড়ি দেয়, ভগবান জানেন ক কিলোমিটার, তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। নিজেদের যুক্তির সমর্থনে তারা ইতিহাস এবং উপন্যাস থেকে অনেক নজির বের করল।

তর্কে যোগ দিল না আনিউতা। অজানা বৈমানিকের কৃত্রিম পায়ে বিশেষ উৎসাহ নেই তার। বিরল অবসর মুহূর্তগুলিতে ও ভাবত গভজ্‌দেভের বিষয়ে নিজের মনোভাবের কথা, ওর মনে হচ্ছে যে সম্পর্কটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। বিশেষ মর্মান্তিক এই বীর অফিসারটির জীবন, প্রথমে তার কথা শুনে ওর দুঃখ কিছুটা লাঘব করার নিঃস্বার্থ আবেগে চিঠি লেখে আনিউতা। কিন্তু চিঠিপত্রের মারফৎ পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল, তখন দেশপ্রেমিক যুদ্ধের এই বিমূর্ত বীরটির জায়গায় ওর মনে এল আসল জীবন্ত একটি যুবকের ছবি, আর তার বিষয়ে আগ্রহ বেড়ে চলল ক্রমশ। দেখল চিঠিপত্র না এলে উৎকণ্ঠিত বিষণ্ণ লাগে। অনুভূতিটা নতুন কিছু, তাতে খুসি হল আর ভয় পেল। এটা কি ভালোবাসা? যাকে কখনো দেখেনি, যার গলা পর্যন্ত শোনেনি, যার সঙ্গে চেনা শুধু চিঠির মাধ্যমে, তাকে ভালোবাসা কি সম্ভব? ট্যাঙ্ক-অফিসারের চিঠিপত্রে ক্রমশ এমন সব কথা এসে পড়ত যেগুলো বন্ধুবান্ধবকে শোনাতে পারত না আনিউতা। একটা চিঠিতে গভজ্‌দেভ স্বীকার করল "চিঠিপত্রের আদানপ্রদানে প্রেমে পড়েছে" সে, সেটা পড়ে আনিউতা উপলব্ধি করল সে নিজেও প্রেমে পড়েছে, স্কুলের মেয়ের সে-প্রেম নয়, সত্যিকারের ভালোবাসা। চিঠির প্রতীক্ষায় অধৈর্যভাবে থাকত সে, বুঝতে পারল যে চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেলে জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে যাবে।

দেখাসাক্ষাৎ না হলেও নিজেদের প্রেমের কথা এইভাবে স্বীকার করল দুজনে, কিন্তু তার পরেই গভজ্‌দেভের অদ্ভুত কিছু একটা ঘটল নিশ্চয়ই। অস্থির অস্বস্তিতে ভরা অস্পষ্ট ওর চিঠিগুলো। পরে সাহসে বুক বেঁধে

আনিউতাকে লিখে পাঠাল যে দেখাসাক্ষাৎ হবার আগেই প্রেমের কথা বলা দুজনেরই ভুল হয়েছে: ওর নিজের মুখ কি ভয়াবহভাবে বিকৃত সেটা ধারণা করতে পারবে না আনিউতা, যে পুরোনো ফটোটা পাঠিয়েছে তার সঙ্গে এখনকার চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই। আনিউতাকে ঠকাতে চায় না সে, যাকে ভালোবাসে তাকে চোখে না দেখা পর্যন্ত আনিউতা যেন আর নিজের মনোভাবের কথা না লেখে, অনুরোধ করল গভজ্‌দেভ।

চিঠিটা পড়ে প্রথমে রাগ হল আনিউতার, তারপর ভয়। পকেট থেকে ফটোটা বের করল। রোগাটে যুবাসুলভ মুখাবয়ব, দৃঢ় গঠন, সোজা খাড়া নাক, ছোট গোঁফ, আর সুগঠিত মুখ চেয়ে আছে তার দিকে। "আর এখন? কেমন চেহারা হয়েছে তোমার, লক্ষ্মী বেচারি" ফটোটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল আনিউতা। ডাক্তারি ছাত্রী হিসেবে ও জানত যে পোড়ার ঘা সহজে সারে না, গভীর চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়। কোন কারণে মনে পড়ল অ্যানাটমিক্যাল মিউজিয়ামে দেখা লুপুস রোগীর মুখের প্রতিকৃতির কথা: নীলচে বলিরেখায় আর ছোট ছোট ফুস্কুড়িতে মুখটা ক্ষতবিক্ষত, ক্ষয়ে-যাওয়া, এবড়োখেবড়ো ঠোঁট, গোছা গোছা ভুরু, চোখের পাতা লাল, ভোমা নেই। ওর চেহারাও যদি এরকম হয়? কথাটা মনে আসাতেই আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গেল আনিউতা কিন্তু তক্ষুণি মনে মনে নিজেকে বকল ও... বেশ, যদি তাই হয়? জ্বলন্ত ট্যাঙ্কে বসে আমাদের শত্রুর সঙ্গে লড়েছে ও, আনিউতার স্বাধীনতা, শিক্ষাধিকার, সম্মান আর জীবন রক্ষা করেছে। গভজ্‌দেভ বীর। কতবার না নিজের জীবন সংশয় করেছে, এখনো যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে প্রাণের পরোয়া না করে আবার লড়াই করার জন্য উন্মুখ ও। আর যুদ্ধে সে নিজে কী করেছে? পরিখা খুঁড়েছে, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছে, আর এখন বেজ-হাসপাতালে কাজ করছে। কিই বা ও করেছে তার তুলনায় এদের মূল্য কতখানি? "সন্দেহ করা মানে ওর যোগ্য আমি নই," নিজেকে ধমকাল আনিউতা, চোখের সামনে আসা সেই বিকৃত মুখটির ভয়াবহ ছবিটাকে দূর করে দেবার চেষ্টা করল। গভজ্‌দেভকে চিঠি লিখল একটা আনিউতা, পত্র বিনিময় শুরু হবার পর দীর্ঘতম আর কোমলতম চিঠি। ওর নানা সন্দেহের কথা স্বভাবতই গভজ্‌দেভ কিছু জানতে পারল না। নিজের উৎকণ্ঠিত চিঠির জবাবে পাওয়া চমৎকার চিঠিটা বারবার পড়ল সে। এমন কি স্ত্রুচকভকেও জানানো হল ওটার কথা; সে একটু অনুকম্পার ভাবে গল্পটা শুনে বলল:

'কুছ পরোয়া নেই, বন্ধু। কথাটা শুনেছ ত: "সুন্দর মুখ, পাষাণ হৃদয়; সাদাসিধে মুখ, সোনার বুক।" এখন আরো বেশী করে সত্যি এটা, বেটাছেলে এত বিরল আজকাল।'

স্বভাবতই খোলাখুলি কথায় আশ্বাস পেল না গভজ্‌দেভ। হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবার দিন এগিয়ে আসছে যত তত ঘন ঘন আয়নায় নিজের মুখ দেখে, কখনো দূর থেকে, তাড়াতাড়ি করে, চকিত দৃষ্টিতে, আবার কখনো বা প্রায় আয়নার কাচে লাগিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজের ক্ষতবিক্ষত, ঝলসে-যাওয়া মুখে হাত বোলায়।

তার অনুরোধে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা কিছু পাউডার আর ক্রিম এনে দিল, কিন্তু শীগগিরই সে বুঝতে পারল দাগগুলো কোন প্রসাধনেই ঢাকবে না। রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ও চুপিচুপি বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাগগুলো ঘষত, পাউডার লাগিয়ে আবার ঘষত, তারপর প্রত্যাশায় তাকাত আয়নার দিকে। দূর থেকে দারুণ ভালো দেখায় ওকে: শক্ত চেহারা, চওড়া কাঁধ, অপ্রশস্ত কোমর পেশল পায়ের উপরে সুন্দর বসানো। কিন্তু কাছে থেকে! গালে আর চিবুকে লাল লাল ক্ষতচিহ্ন, টানা কোঁচকানো চামড়া, দেখে হতাশায় তার মন ভরে যায়। "চেহারাটা দেখে কী ভাববে ও?" মনে মনে জিজ্ঞেস করত গভজ্‌দেভ। আতঙ্কিত হবে আনিউতা। একবার তাকিয়ে ঘুরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে যাবে ও। কিম্বা সেটা আরো বিশ্রী হবে — ভদ্রতার খাতিরে হয়ত ঘণ্টাখানেক গভজ্‌দেভের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবে, তারপর সৌজন্য করে কিছু একটা বলে বিদায় জানাবে। রাগে ফ্যাকাশে হয়ে গেল গভজ্‌দেভ, যেন ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছে।

তারপর গাউনের পকেট থেকে একটা ফটো বের করে গভজ্‌দেভ চেহারাটি দেখত খুঁটিয়ে: গোলগাল মুখ, হালকা পাতলা কিন্তু ফাঁপানো চুল প্রশস্ত কপালের উপরে টান করে আঁচড়ানো, বোঁচা, উপর দিকে তোলা খাস রুশ নাক, আর নরম শিশুসুলভ ঠোঁট। উপরের ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা তিল। সরল মিষ্টি মুখ থেকে একজোড়া কটা, কিম্বা নীল আর একটু বেরিয়ে-আসা চোখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে সহজ ও খোলাখুলিভাবে।

"কেমন ধরনের লোক তুমি, বলো ত? ভয়ে কি আঁতকে উঠবে তুমি? ছুটে পালাবে? তোমার মন কি এত দরাজ যে রাক্ষসের চেহারাটা চোখ এড়িয়ে যাবে?" একাগ্রভাবে ফটোটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে গভজ্‌দেভ।

আর এদিকে ক্রাচের ঠকঠক শব্দে, চামড়ার মচমচ আওয়াজে সিনিয়র

লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ করিডরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অক্লান্তভাবে ওকে পেরিয়ে যায় আর আসে একবার, দুবার, দশবার, বিশবার। নিজের জন্য কর্মসূচী একটা ঠিক করেছে মেরেসিয়েভ, প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে হাঁটে, প্রতিদিন ব্যায়ামের মাত্রা বাড়াচ্ছে।

"খাসা লোক!" মনে মনে ওর সাধুবাদ করল গভজ্‌দেভ। "লেগে থাকতে পারে বটে। লোকটার মনোবলের সীমা নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে শিখে ফেলল! অনেকের ত কয়েক মাস লেগে যায়। কাল স্ট্রেচারে যেতে রাজী হল না, চিকিৎসার জন্য হেঁটে সিঁড়ি ভেঙ্গে গেল নিচে, হেঁটে ফিরে এল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু হাল ছেড়ে দিল না, এমন কি সাহায্য করতে চেয়েছিল বলে আর্দালিটাকে কী ধমকই না লাগাল! আর নিজে নিজে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে পেঁছবার পর ওর হাসিটা যদি দেখতে! মাউণ্ট এলব্রুজের চূড়োয় পেঁছেছে যেন!'

আয়না থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গভজ্‌দেভ দেখল মেরেসিয়েভ ক্রাচের সাহায্যে বেশ তাড়াতাড়ি চলেছে। "দেখো একবার! সত্যি সত্যি দৌড়চ্ছে। আর লোকটার কি মিষ্টি সুন্দর চেহারা! ভুরুর ওপরে ছোট্ট একটা কাটার দাগ, কিন্তু তাতে একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না, বরঞ্চ ভালোই দেখাচ্ছে।" যদি গভজ্‌দেভের মুখটা ওর মত হত! পা'তে কী এসে যায়? পা ত আর দেখার জিনিস নয়। আর ও ত হাঁটতে শিখবে নিশ্চয়ই, বিমানও চালাবে। কিন্তু তোমার নিজের মুখটা? এ প্রেতমূর্তি ত আর গোপন করার মত নয়, দেখে মনে হয় মাতাল ভূতেরা রাত্রে ওটার উপরে মটর ভেঙ্গেছে।

...করিডরে বৈকালিক ব্যায়ামের ত্রয়োবিংশ চক্করে পেঁছিয়েছে আলেক্সেই তখন। স্ফীত উরুর জ্বালা আর ক্রাচের প্যাডের ঠেলায় কাঁধের যন্ত্রণার বোধ তার সমস্ত ক্লান্ত শরীরে। খুঁড়িয়ে যেতে যেতে আয়নার সামনে দণ্ডায়মান ট্যাঙ্ক-অফিসারের দিকে একবার অপাঙ্গে তাকাল আলেক্সেই। "মজার লোক বটে!" মনে মনে বলল সে। "মুখ নিয়ে এত চিন্তা করার কী আছে। অবশ্য সিনেমার তারকা হতে পারবে না আর, সেটা সত্যি। কিন্তু ট্যাঙ্কচালক হতে পারে ত। কে আটকাচ্ছে ওকে। মুখে কী এসে যায় ওর, যতক্ষণ ওর মগজ আছে, হাত আর পা আছে? হ্যাঁ, পা, সত্যিকারের পা আছে, আমার মত চামড়ার টুকরো নয়, টনটন করছে আর জ্বলছে যেগুলো, যেন চামড়ার নয়, গনগনে গরম লোহার জিনিস।"

ঠক, ঠক, মচ, মচ। ঠক, ঠক, মচ, মচ...

অসহ্য যন্ত্রণায় চোখে জল এসে পড়ছে, ঠোঁট কামড়ে সেটা চাপার চেষ্টা করতে করতে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ কষ্টে করিডরে তার উনত্রিংশ চক্কর শেষ করল, সমাপ্ত হল সে দিনের ব্যায়াম।

১৪

জুনের মাঝামাঝি গ্রিগরি গভজ্‌দেভ হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেল।

যাবার দু একদিন আগে আলেক্সেই'র সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। সমব্যথী দুজনে, দুজনের ব্যক্তিগত জীবন সমান জটিল, সেজন্য ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল; আর এরকম ক্ষেত্রে যা হয়, পরস্পরের কাছে নিজেদের সব ব্যাপার ওরা খোলাখুলিভাবে বলল, গোপন করল না আগামী দিনের বিষয়ে নিজেদের নানা উৎকণ্ঠার কথা; নিজেদের সমস্যা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করা গর্বে বাধত বলে অনেক কিছু দ্বিগুণ দুর্বহ হয়ে উঠেছিল ওদের, সেগুলোর বিষয়ে কথাবার্তা হল। পরস্পরকে দেখাল মেয়ে দুটির ছবি।

ওলিয়ার ছবিটা পুরোনো, ঝাপসা হয়ে এসেছে। জুনের সেই পরিষ্কার দীপ্ত দিনে ভলগার ওপারে ফুলে-ভরা স্তেপে খালি পায়ে দৌড়াবার সময়ে ছবিটা তোলে আলেক্সেই। খাসা ছাপা-ফ্রক পরনে দোহারা চেহারার একটি মেয়ে পা মুড়ে বসে আছে, কোলে ফুল। ডেইজির মধ্যে ওলিয়াকেও দেখাচ্ছে শাদা আর নিষ্কলঙ্ক, সকালের শিশিরে ভেজা ডেইজির মত। ফুলগুলো স্যাজাবার সময়ে চিন্তান্বিতভাবে মাথা একটু হেলানো, চোখদুটি বিস্ফারিত আর বিহ্বল, যেন পৃথিবীটার সৌজন্য জীবনে এই প্রথম নজরে পড়েছে তার।

ফটোটা দেখে ট্যাঙ্ক-অফিসার বলল এ ধরনের মেয়ে বিপদের সময়ে বন্ধুকে ছেড়ে কখনো চলে যায় না; আর যায় যদি   তাহলে গোল্লায় যাক ও, তাতে শুধু প্রমাণ হয় চেহারা খোলস মাত্র, আর সে ক্ষেত্রে ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো, কেননা মেয়েটা অপদার্থ, ওধরনের অপদার্থ লোকের সঙ্গে বরাবর থাকার কোন মানে হয় না, হয় কি?

আনিউতার চেহারা ভালো লাগল আলেক্সেই'র, আর নিজের অলক্ষিতে, ঠিক গভজ্‌দেভ যা বলেছে ওকে এইমাত্র, তাই বলল নিজের মত করে। আলোচনাটায় গভীর কিছু ছিল না, ওদের নানা সমস্যা মেটাতে সেটা সাহায্য

করল না একবিন্দু, কিন্তু কথাবার্তার পরে দুজনেরই আগের চেয়ে ভালো লাগল, যেন অনেক দিনের একটা বিষফোঁড়া ফেটে গিয়েছে!

ওরা ঠিক করল যে হাসপাতাল থেকে চলে যাবার পরে গভজ্‌দেভ আর আনিউতা -- আনিউতা টেলিফোন করে কথা দিয়েছিল যে এসে ওর সঙ্গে দেখা করবে -- ওয়ার্ডের জানলার পাশ দিয়ে যাবে; পরে আলেক্সেই লিখে জানাবে মেয়েটিকে দেখে তার কী মনে হয়েছে। আর গভজদেভ কথা দিল যে আলেক্সেইকে চিঠিতে জানাবে আনিউতা কী ভাবে ওর সঙ্গে দেখা করল, ওর বিকৃত মুখ দেখে তার প্রতিক্রিয়া কী রকম, কেমন চলছে তাদের। আলেক্সেই স্থির করল যে গ্রিশার ব্যাপার যদি ভালোয় ভালোয় চলে তাহলে অবিলম্বে ওলিয়াকে চিঠি লিখে নিজের সমস্ত কথা জানাবে, কিন্তু বলে দেবে যেন মা'কে না বলা হয়, মা এখনো অসুস্থ, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না প্রায়।

অস্থিরভাবে দুজনেই সেজন্য গভজ্‌দেভের হাসপাতাল ছাড়ার প্রতীক্ষায় ছিল। এত উদ্বিগ্ন দুজন যে ঘুম এল না, রাত্রে চুপিচুপি তারা গেল করিডরে — গভজ্‌দেভের উদ্দেশ্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষতচিহ্নগুলো আর একবার রগড়াবে, আর মেরেসিয়েভ চায় বরাদ্দের বেশী হাঁটবে, শব্দ যাতে না হয় সেজন্য ক্রাচের পায়ে নেকড়া লাগিয়ে নিল।

দশটার সময়ে ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, চতুর হাসি মুখে, জানাল গভজ্‌দেভের সঙ্গে কে যেন দেখা করতে এসেছে। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠল গভজ্‌দেভ, যেন দমকা হাওয়ায় তাকে উৎক্ষিপ্ত করেছে। মুখ টকটকে লাল, তাতে ক্ষতচিহ্নগুলো আরো প্রকট হয়ে উঠল, তাড়াহুড়ো করে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দিল সে।

'খাসা মেয়েটি, চেহারাটা গম্ভীর প্রকৃতির,' ব্যস্তসমস্তভাবে বিদায়ের আয়োজনরত গভজ্‌দেভের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল নার্স।

খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ।

'সত্যি বলছ? ভালো লেগেছে ওকে? মেয়েটি বেশ, নয়?' জিজ্ঞেস করল গভজ্‌দেভ, আর উত্তেজনায় বিদায়সম্ভাষণ জানাতে ভুলে গিয়ে দৌড়িয়ে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে।

'রামপাঁঠা! চট করে ফাঁদে পা দেয় সেই গোছের লোক!' গরগর করে বলল মেজর স্ত্রুচকভ।

গত কয়েক দিনে এই উচ্ছৃঙ্খল লোকটির মন্দ কিছু একটা ঘটেছে। বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে, বিনা কারণে ভয়ানক চটে ওঠে মাঝেমাঝে, বিছানায় উঠে



বসতে পারে বলে বসে বসে সারাদিন জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে হাতে চিবুক রেখে, কেউ কথা বললে জবাব দেয় না।

ওয়ার্ডের সবাই — বিমর্ষ মেজর, মেরেসিয়েভ আর নতুন দুটি রোগী জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে, কখন তাদের পূর্বতন সহবাসীকে রাস্তায় দেখা যাবে। দিনটা গরম। নরম, ঢেউ-খেলানো মেঘ দীপ্ত সোনালী পাড়ে দ্রুতগতিতে ভেসে যাচ্ছে, চেহারা তাদের বদলাচ্ছে। ঠিক সে মুহূর্তে ছোট ধূসর ফাঁপা বৃষ্টি-ঝরা মেঘ একটা তড়তড় করে গেল নদীর উপর দিয়ে, বড়ো বড়ো জলের ফোঁটা সূর্যের আলোয় চিকচিক করে ছড়িয়ে পড়ল। বাঁধের গ্রানিট দেয়ালগুলো ঝকঝকে, যেন পালিশ করা হয়েছে; এ্যাসফল্টের রাস্তাটা কালো কালো গোল দাগে ভরে গেল, এমন সূক্ষ্ম, ভেজা ভাপ তা থেকে উঠল যে ইচ্ছে করে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে সুন্দর বৃষ্টিবিন্দুলোকে ধরে ফেলি।

'ও আসছে!' ফিসফিস করে বলল মেরেসিয়েভ।

প্রবেশদ্বারের ভারী ওকের পাল্লাদুটো আস্তে আস্তে খুলে গেল, দেখা গেল দুজনকে: মোটাসোটা গোছের একটি তরুণী, খালি মাথা, কপাল থেকে টান করে পিছনে চুল আঁচড়ানো, পরনে শাদা ব্লাউজ, কালো স্কার্ট; আর তরুণ সৈনিক একজন, সে যে ট্যাঙ্ক-অফিসার সেটা এমন কি আলেক্সেই-ও চট করে ঠাহর করতে পারল না। এক হাতে সুটকেশ, অন্য হাতে আর্মিকোট; এমন বলিষ্ঠ তার হাঁটার কায়দা যে দেখলেও ভালো লাগে। বোঝা গেল নিজের শক্তি পরীক্ষা করছে ও, স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটাচলা করতে পারে দেখে এত খুসি যে মনে হয় সিঁড়ি দিয়ে দৌড়িয়ে নামছে না, ভেসে নামছে। সঙ্গিনীর হাত ধরে বাঁধের পাশ দিয়ে ও চলল ওয়ার্ডের জানলার দিকে — ভারী সোনালী বৃষ্টিবিন্দু লেগে আছে ওদের শরীরে।

ওদের দেখে দেখে আনন্দে বুক ভরে গেল আলেক্সেই'র। তাহলে নির্বিঘ্নে সবকিছু হয়েছে! মেয়েটির মুখ যে এত অকপট, মিষ্টি আর সরল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওর মত মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে না। না, ওর মত মেয়েরা বিপাকগ্রস্ত মানুষকে ফেলে চলে যায় না।

জানলার কাছে এসে ওরা থামল, তাকাল উপরের দিকে। বাঁধের বৃষ্টি-ধোওয়া পারাপেটের কাছে তরুণ-তরুণীটি দাঁড়িয়ে, তাদের পিছনে শ্লথ বৃষ্টি ঝকঝকে আড়াআড়ি রেখায় পটভূমি এঁকে চলেছে। আর আলেক্সেই লক্ষ্য করল যে ট্যাঙ্ক-অফিসারকে বিব্রত উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে, আর

আনিউতা — ফটোতে যেমন সত্যি তেমন মিষ্টি চেহারা তার — তাকেও বিব্রত উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছে। হাতটা ট্যাঙ্ক-অফিসারের হাতে শিথিলভাবে পড়ে আছে, সব মিলিয়ে তাকে দেখাচ্ছে অস্থিরচিত্ত আর উত্তেজিত, যেন হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে এক্ষুণি পালিয়ে যাবে।

হাত নাড়ল দুজনে, কষ্টকৃত হাসি হেসে, বাঁধ হয়ে আরো এগিয়ে মোড়ের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। কোন কথা না বলে রোগীরা যে যার বিছানায় ফিরল।

'বেচারা গভজ্‌দেভ সফল হয়নি,' মন্তব্য করল মেজর। করিডরে শোনা গেল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার জুতোর শব্দ, চমকে উঠে মেজর হঠাৎ জানলার দিকে মুখ ফেরাল।

সারাটা দিন অস্বস্তিতে কাটল আলেক্সেই'র। এমন কি সন্ধ্যাকালীন হাঁটার ব্যায়ামটাও বাদ পড়ল সেদিন, সবায়ের আগে শুয়ে পড়ল সে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর খাটের স্প্রিঙের কিঁচকিঁচ আওয়াজ বন্ধ হল না।

পরদিন সকালে নার্স ঘরে আসতে না আসতে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করল তার কোন চিঠি এসেছে কিনা। কোন চিঠি আসেনি। হাতমুখ ধুয়ে ও প্রাতরাশ খেল বিনা আগ্রহে, কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় হাঁটবার ব্যায়ামটা বাড়িয়ে দিল সেদিন। আগের সন্ধ্যায় যে দুর্বলতা দেখিয়েছে তার জন্য নিজেকে সাজা দেবার জন্য আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে পোনেরো চক্কর বেশী ঘুরল আলেক্সেই। নিজের এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গেল মন থেকে। ও দেখিয়েছে যে ক্রাচ নিয়ে সহজে চলাফেরা করতে পারে, খুব ক্লান্ত না হয়ে। করিডরের দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ মিটার। পঁয়তাল্লিশ বার করিডরটা ঘুরেছে সে, পঁয়তাল্লিশ দিয়ে পঞ্চাশকে গুণ করলে হয় দু হাজার দুশ পঞ্চাশ মিটার, অর্থাৎ সওয়া দুই কিলোমিটার, অফিসারদের মেস থেকে বিমান-ঘাঁটি যতটা, ততটা। মনে মনে পরিচিত সেই পথ ধরে আবার গেল আলেক্সেই, পথটা গিয়েছে গ্রামের পুরোনো গির্জার ধ্বংসাবশেষ আর দগ্ধ স্কুলের ইঁটের স্তূপ ছাড়িয়ে; শার্সিহীন জানলার ফাঁকা কোটর থেকে রাস্তার দিকে বিষণ্ণভাবে তাকিয়ে আছে স্কুলটি; বনের মধ্য দিয়ে, সেখানে ফারের শাখায় পেট্রলের ট্রাকগুলো ঢাকা, আর — কম্যাণ্ডারের ডাগ-আউট পেরিয়ে গিয়েছে পথটি, পেরিয়ে গিয়েছে সেই ছোট কাঠের কুটিরটি যেখানে মানচিত্র

আর চার্টে ঝুঁকে পড়ে "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" তার নানা অনুষ্ঠান চালায়। অনেকখানি পথ, অনেকখানি পথ সত্যি!

মেরেসিয়েভ ঠিক করল যে দৈনন্দিন চক্কর বাড়িয়ে ছেচল্লিশ করবে, সকালে তেইশ আর বিকেলে তেইশ, আর পরের দিন সকালে, রাত্রির বিশ্রামের পর শরীর যখন ঝরঝর থাকে, বিনা ক্রাচে হাঁটবার চেষ্টা করবে। সিদ্ধান্তটা তৎক্ষণাৎ ওর মন ঘুরিয়ে দিল বিষণ্ণ দুর্ভাবনা থেকে, উৎসাহিত আর কাজের মানুষের মত লাগল নিজেকে। সন্ধ্যেবেলায় এত আগ্রহে ব্যায়াম শুরু করল যে দেখতে না দেখতে তিরিশের বেশী চক্কর করে ফেলল। আর ঠিক তখনি ব্যায়ামে বাধা পড়ল, ক্লোকরুমের পরিচারিকা এসে হাজির, হাতে একটি চিঠি। চিঠিটা তার নামে। ছোট খামের উপরে লেখা: "সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ। ব্যক্তিগত।" "ব্যক্তিগতটার" নিচে দাগ দেওয়া, সেটা মোটেই ভালো লাগল না আলেক্সেই'র। চিঠিটার কোণেও লেখা "ব্যক্তিগত", দাগ দেওয়া তাতেও।

জানলার তাকে হেলান দিয়ে চিঠিটা খুলল আলেক্সেই। গত রাত্রে রেলওয়ে স্টেশন থেকে লিখেছে গভজ্‌দেভ, দীর্ঘ চিঠিটা যত পড়ছে তত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আলেক্সেই'র মুখ। গভজ্‌দেভ লিখেছে আনিউতার চেহারা যেরকম তারা কল্পনা করেছিল ঠিক সেরকম, খুব সম্ভব মস্কোর সবচেয়ে মিষ্টি-চেহারার মেয়ে সে, বোনের মত তার সঙ্গে দেখা করে আনিউতা, আগের চেয়ে অনেক ভালো লেগেছে তাকে গভজ্‌দেভের।

"...কিন্তু যা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা দাঁড়াল ঠিক আমরা যেরকম ভেবেছিলাম সেভাবে। মেয়েটি ভালো। কোন কথা বলল না আমাকে, কোন কিছুর ইঙ্গিত পর্যন্ত করল না। সবকিছু ভালো। কিন্তু অন্ধ নই আমি। দেখলাম আমার ঝলসানো কুৎসিৎ মুখ দেখে ও ভয় পেয়েছে। সবকিছু ঠিক মনে হচ্ছে, হঠাৎ আবার দেখছি ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ও লজ্জিত ভীত কিম্বা দুঃখিত আমার জন্য — ঠিক কি জানি না .. বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেল আমাকে। না গেলেই ভালো হত। মেয়েরা ভিড় করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে... বিশ্বাস করবে কি? আমাদের সবাইকে ওরা চেনে! আনিউতা আমাদের সব কথা ওদের বলেছে... বুঝতে পারলাম একটু লজ্জিতভাবে ও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন ভয়াবহ জিনিসটা ওখানে নিয়ে যাবার জন্য মাপ চাইছে। কিন্তু আসল কথাটা শোনো আলিওশা, নিজের মনোভাব গোপন করার চেষ্টা করছিল ও:

আমার সঙ্গে বেশ ভালো আর সহৃদয় ব্যবহার করল, কথা বলছে ত বলছেই, যেন কথা থামাতে ওর ভয়। তারপর ওর বাড়িতে গেলাম। একলা থাকে আনিউতা। উদ্বাস্তুদের সঙ্গে চলে গিয়েছে ওর বাপ-মা। স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওরা ভালো ঘরের লোক। চা খাওয়াল আমাকে, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে নিকেলের কেটলিতে আমার ছায়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গল্প বাড়িয়ে লাভ নেই। সংক্ষেপে, মনে মনে ভাবলাম যে এরকম করে চলবে না। সোজাসুজি ওকে বললাম, 'বুঝতে পারছি আমার চেহারাটা আপনার পছন্দ হয়নি। তাতে আপনার দোষ নেই, সেটা আমি বুঝি। অপমানিত লাগছে না নিজেকে।' কেঁদে ফেলল ও. কিন্তু আমি বললাম, 'কাঁদবেন না। লক্ষ্মী মেয়ে আপনি। আপনার সঙ্গে যে কেউ প্রেমে পড়তে পারে। নিজের জীবন নষ্ট করবেন কেন!' আবার বললাম, 'দেখছেন ত, কী অপরূপ চেহারা আমার! ভেবে দেখুন। বাহিনীতে ফিরে যাচ্ছি, সেখানকার ঠিকানা জানাব আপনাকে। যদি আপনার সংকল্প ঠিক থাকে, তাহলে আমাকে জানাবেন।' আরো বললাম, 'যা করতে চান না তা জোর করে করবেন না। আজ আমি এখানে ,কাল সেখানে — যুদ্ধ চলেছে।' ও অবশ্য বলল, 'না, না, না!' কান্না থামছে না। আর ঠিক সে সময়ে হতভাগা সাইরেনটা চেঁচাতে শুরু করল। বাইরে গেল ও, আর হৈচৈ'এর সুযোগ নিয়ে চলে এলাম আমি, সোজা গেলাম অফিসারদের রেজিমেণ্টে, তক্ষুণি ওরা কাজ দিল আমাকে। এখন সব ঠিক। রেলের টিকিট পেয়েছি, রওনা হলাম। কিন্তু এটা তোমাকে বলা দরকার, আলিওশা, ওকে আগের চেয়ে ঢের বেশী ভালোবাসি এখন, ওকে ছেড়ে কী করে থাকব জানি না।"

বন্ধুর চিঠি পড়তে পড়তে আলেক্সেই'র মনে হল নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কোন সন্দেহ নেই, তারো কপালে ঠিক এরকম ঘটবে। চলে যেতে বলবে না তাকে ওলিয়া, নেবে না মুখ ঘুরিয়ে, তার জন্য ঠিক এরকম মহৎ আত্মত্যাগ করতে চাইবে সে, মমতায় কথা বলবে, চোখের জলে হাসবে আর চেষ্টা করবে বিতৃষ্ণা চাপার।

'না, না, সেটা চাই না!' বলে উঠল আলেক্সেই।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে গেল ওয়ার্ডে, টেবিলের পাশে বসে ওলিয়াকে চিঠি লিখল, ছোট নিষ্প্রাণ নীরস চিঠি। সত্যি কথা বলার সাহস হল না। বলবেই বা কেন? মা অসুস্থ, তাঁর দুঃখ বাড়াবে কেন? লিখল যে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে তার জন্য প্রতীক্ষায় বসে থাকাটা

ওলিয়ার পক্ষে নিশ্চয়ই কষ্টকর। কেউ জানে না কতদিন যুদ্ধ চলবে কিন্তু সময় আর যৌবন ত বসে থাকে না। যুদ্ধ এমন একটা জিনিস যে প্রতীক্ষা করার কোন মানে হয় না। মারা যেতে পারে আলেক্সেই, তাহলে স্ত্রী না হয়েও বিধবা হবে ওলিয়া; কিম্বা, সেটা আরো খারাপ ব্যাপার, তার অঙ্গহানি হতে পারে, তাহলে পঙ্গুকে বিয়ে করতে হবে ওলিয়াকে। তাতে কী ভালোটা হবে? নিজের যৌবন নষ্ট করা উচিত নয় ওর, যত শীগগির পারে আলেক্সেইকে ভুলে যাক। চিঠিটার জবাব না দিলেও চলবে, না দিলে কিছু মনে করবে না সে। ওর অবস্থা বুঝতে পারে আলেক্সেই, যদিও সেটা স্বীকার করা তার পক্ষে কঠিন। কিন্তু যা বলছে সেটা করাই ভালো।

মনে হল চিঠিটায় হাত পুড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বার না পড়ে, খামে চিঠিটা ভরে, তাড়াতাড়ি খোঁড়াতে খোঁড়াতে জল গরম করার যন্ত্রটির পিছনে করিডরে টাঙানো নীল ডাক বাক্সটার কাছে গেল আলেক্সেই।

ওয়ার্ডে ফিরে এল, আবার বসল টেবিলের পাশে। কার সঙ্গে মনের কথা বলবে? মা'র সঙ্গে নয়। গভজ্‌দেভ? সে বুঝবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন কোথায় সে? কত রাস্তার গোলক-ধাঁধা গিয়েছে ফ্রণ্টে, কোথায় খুঁজে পাবে তাকে? ওর রেজিমেণ্টে লিখবে? কিন্তু যুদ্ধকালীন নানা কাজে ব্যস্ত থাকার সৌভাগ্য যাদের, তারা কি মাথা ঘামাবে আলেক্সেইকে নিয়ে? "আবহাওয়া সার্জেণ্টকে" লিখবে? হ্যাঁ, ওকেই লেখা যায়। তক্ষুণি লিখতে শুরু করল আলেক্সেই, কথাগুলো আসছে অবলীলাক্রমে, বন্ধুর আলিঙ্গনে বদ্ধ হলে চোখের জল যেমন অঝোরে পড়ে। একটি পঙ্‌ক্তি শেষ হয়নি, হঠাৎ লেখা বন্ধ করল আলেক্সেই, এক মুহূর্ত কী ভেবে চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলল।

"লেখকের যন্ত্রণার চেয়ে গভীরতর যন্ত্রণা আর কিছু নেই," স্বভাবসুলভ ঠাট্টার সুরে আবৃত্তি করল স্ত্রুচকভ।

বিছানায় বসে সে গভজ্‌দেভের চিঠিটা পড়ছে, আলেক্সেই'র বিছানার পাশের তাক থেকে তুলে নিয়েছিল সেটা।

'আজ কী হল সবায়ের?.. গভজ্‌দেভও! রামপাঁঠা বটে। একটা মেয়ে নাক শিঁটকিয়েছে, তাই চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। মনের রোগের বিশ্লেষণ শুরু হল। চিঠিটা পড়ার জন্য চটনি ত? আমরা সবাই সৈনিক, আমাদের মধ্যে গোপন কথা কী থাকতে পারে?'

চটেনি আলেক্সেই। সে ভাবছিল, "হয়ত পিওন কাল আসা না পর্যন্ত

অপেক্ষা করা আমার উচিত, বাক্স থেকে চিঠি নেবার সময়ে চিঠিটা ফেরৎ নিয়ে নেব?"

সে রাত্রে ভালো ঘুম হল না আলেক্সেই'র। প্রথমে স্বপ্ন দেখল বরফে-ঢাকা বিমান-ঘাঁটিতে গিয়েছে সে, সেখানে অদ্ভুত চেহারার একটা বিমান "লাভচ্‌কিন-৫" নামবার গিয়ারের জায়গায় পাখির পা লাগানো। ইউরা মিস্ত্রী ককপিটে ঢুকে বলল আলেক্সেই'র বিমান চালানোর দিন আর নেই, এবার ওর চালানোর পালা। তারপর স্বপ্ন দেখল খড়ের উপর নিজে শুয়ে আছে, আর মিখাইল দাদু, তাঁর পরনে সাদা সার্ট আর ভিজে প্যাণ্ট, বাষ্পস্নান করাচ্ছেন তাকে, হাসতে হাসতে বলছেন, "বিয়ের আগে ঠিক এটাই তোমার দরকার।" ঠিক ভোরের আগে ওলিয়াকে স্বপ্নে দেখল আলেক্সেই, একটা উল্টে-যাওয়া নৌকোর উপরে বসে আছে ওলিয়া, পাতলা দোহারা দীপ্ত চেহারা, রোদে-তামাটে বলিষ্ঠ পাদুটো জলে দিয়ে এক হাতে চোখ ঢেকে রোদের আড়াল করছে, আর হাসি মুখে অন্য হাতের ইসারায় ডাকছে তাকে। সাঁতরে যাচ্ছে তার দিকে আলেক্সেই, কিন্তু খর উদ্দাম স্রোত তীর আর মেয়েটির কাছ থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। হাত পা, শরীরের সমস্ত পেশীর জোর ক্রমাগত খাটিয়ে ক্রমশ ওলিয়ার কাছে এসে পড়ল, আরো কাছে, চোখে পড়ছে হাওয়ায় ঝটপটে ওর চুল, রোদে-তামাটে পায়ের উপরে চিকচিকে জলের ফোঁটা...

ঘুম ভেঙ্গে গেল আলেক্সেই'র, বেশ ফুর্তি আর খুসি লাগছে। চোখ বুজে অনেকক্ষণ শুয়ে রইল, যাতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, যাতে মধুর স্বপ্নটা ফিরে আসে আবার, তার আশায়। কিন্তু এরকম ঘটে শুধু শৈশবে। স্বপ্নে দেখা মেয়েটির সেই পাতলা, রোদে-তামাটে প্রতিচ্ছবিতে সমস্ত কিছু দীপ্ত হয়ে উঠেছে মনে হল। উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই আলেক্সেই'র, মন খারাপ করার দরকার নেই, শুধু সাঁতরাতে হবে ওলিয়ার দিকে, সাঁতরাতে হবে উজানে, যা কিছু ঘটুক না, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সাঁতরাতে হবে, পৌঁছতে হবে তার কাছে। কিন্তু চিঠিটার কী হবে? ডাক বাক্সের কাছে গিয়ে পিওনের জন্য অপেক্ষা করার ইচ্ছে হল তার, কিন্তু মত বদলাল আলেক্সেই; হাত নাড়িয়ে বলল নিজেকে: "যাক ওটা। ওটাতে সত্যিকারের প্রেম ত আর কেটে যাবে না।" আর ওর এখন বিশ্বাস হল যে সত্যিকারের প্রেম, দুঃখে সুখে, সুস্থ কিম্বা অসুস্থ যে অবস্থায়ই থাকুক না সে নিজে, প্রেম তার প্রতীক্ষায় আছে। বিশ্বাসটা নতুন শক্তি যোগাল তাকে।

সেদিন সকালে বিনা ক্রাচে হাঁটবার চেষ্টা করল আলেক্সেই। সাবধানে খাট ছেড়ে উঠে পা ফাঁক করে দাঁড়াল, হাত সামনে এগিয়ে দিয়ে অসহায়ভাবে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করল। দেয়াল ধরে পা ফেলল আলেক্সেই। কৃত্রিম পায়ের চামড়া মচমচ করছে। দুলে উঠল শরীরটা, কিন্তু হাত দিয়ে ভারসাম্য রাখল ও। দেয়াল ধরে আবার পা ফেলল। কখনো কল্পনা করেনি হাঁটাটা এত কঠিন ব্যাপার। বাল্যকালে রণপা দিয়ে হাঁটতে শিখেছিল আলেক্সেই। দেয়ালে হেলান দিয়ে রণপায়ে ভর দিয়ে উঠে দেয়াল ছেড়ে এক পা ফেলত, তারপর আর একটা পা, আবার একটা... কিন্তু দুলে উঠত শরীরটা, লাফিয়ে নেমে পড়ত ও, উপকণ্ঠের রাস্তার ঘাসে পড়ে থাকত রণপাদুটো। রণপায়ে হাঁটতে শেখাটা, যাই হোক, অতটা খারাপ ছিল না, কেননা তা থেকে লাফিয়ে নামা যায়, কিন্তু কৃত্রিম পা ছেড়ে দিয়ে লাফান ত চলে না। আর তৃতীয় বার পা ফেলার চেষ্টা করাতে ওর শরীর দুলে উঠল, পায়ে শক্তি নেই, উপুড় হয়ে পড়ল মেঝেতে।

অন্যান্য রোগীরা নানা চিকিৎসা নিতে চলে গিয়েছে. ওয়ার্ডে কেউ নেই, ব্যায়ামের জন্য সে সময়টা বেছে নিয়েছিল আলেক্সেই। সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকল না। হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে দেয়ালে ভর দিয়ে আস্তে উঠে দাঁড়াল, পড়ে যাওয়াতে পাশে চোট লেগেছে, ঘষল সে জায়গাটা, কনুইটা ছড়ে কালসিটে পড়তে শুরু করেছে, সেটা দেখে দাঁতে দাঁত চেপে আবার পা ফেলল, দেয়াল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে! মনে হল কারসাজিটা এবার আয়ত্তে এসেছে। আসল আর নকল পায়ের পাতার তফাৎটা হল শেষোক্তটির স্থিতিস্থাপকতার অভাব। তাদের স্বকীয় ধর্ম এখনো তার জানা নেই, কয়েকটি অভ্যেস, প্রায় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত, আয়ত্তে আনতে হবে তাকে, যেমন হাঁটবার সময়ে পায়ের পাতার স্থান সঙ্গে সঙ্গে বদলানো, পা ফেলার সময়ে শরীরের ভার গোড়ালি থেকে পদাঙ্গুলিতে দেওয়া, আবার পা ফেলার সময়ে ভারটা গোড়ালি থেকে পদাঙ্গুলিতে আনা। সমান্তরালভাবে পা ফেললে চলবে না, ফেলতে হবে আড়ভাবে, পায়ের ডগা ছাড়াছাড়া রেখে, তাতে হাঁটবার সময়ে শরীরে আরো বেশী স্থিতি আসে।

মায়ের তদারকে ছোটখাটো পায়ে প্রথম বিসদৃশ পা ফেলার সময়ে এসব সবাই শেখে শৈশবে। অভ্যেসগুলো সারা জীবন টিঁকে থাকে, পরিণত হয় সহজাত ঝোঁকে। কিন্তু কৃত্রিম অঙ্গ পরতে বাধ্য হলে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক সঙ্গতির বিচ্যুতি ঘটে, শৈশবে অধিকৃত ঝোঁক সাহায্য করা দূরের

কথা, বাধা দেয় তার গতিকে। নতুন অভ্যেস সব আয়ত্তে আনার সময়ে পুরোনো ঝোঁকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। এমন অনেকে আছে যারা অঙ্গহানির পরে মনোবলের অভাবে হাঁটার বিদ্যা আর আয়ত্তে আনতে পারে না, যে বিদ্যাটা অত সহজে শৈশবে আমরা শিখে ফেলি।

নিজের জন্য লক্ষ্যবস্তু ঠিক করেছে মেরেসিয়েভ, গন্তব্যে পেঁছবে ও, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার। প্রথম উদ্যমে যে ভুল করেছিল, সেটা হৃদয়ঙ্গম করে আবার চেষ্টা করল ও। এবারে কৃত্রিম পায়ের ডগা এগিয়ে গোড়ালিতে ভর দিয়ে শরীরের ভার ছাড়ল ডগাগুলোর উপরে। জোরে মচমচ করে উঠল চামড়াটা। শরীরের ভার পদাঙ্গুলিতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আলেক্সেই অন্য পাটি তুলে এগিয়ে দিল। মেঝেতে লাগল গোড়ালিটা। দেয়াল ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইল ও, হাত বাড়িয়ে শরীরের ভারসাম্য রাখছে, আবার পা ফেলার সাহস হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে রইল ও, শরীরটা দুলছে, পড়ে না যায় চেষ্টা করছে তার, অনুভব করছে নাকের ডগা ঘেমে উঠছে।

এরকম একটা অবস্থায় ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ আবিষ্কার করলেন ওকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন, তারপরে এগিয়ে এসে বগলের নিচে হাত দিয়ে ভার রক্ষা করে বললেন:

'বেশ চলেছে! একেবারে একলা যে, কোন নার্স আর আর্দালি দেখছি না ত: দেমাকের ব্যাপার মনে হচ্ছে... যা হোক, কিছু এসে যায় না। যে কোন কাজে যেমন, প্রথম পদক্ষেপটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর সবচেয়ে কঠিন অংশটা ত তুমি কাটিয়ে উঠেছ।'

এর অল্প কিছুদিন আগে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। কাজটি খুব বড়ো, অনেক সময় লাগত সেটা করতে। হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন তিনি, কিন্তু ঝানু যোদ্ধাটি এখনো পরামর্শদাতার কাজ করতেন; অন্য লোকের হাতে হাসপাতালের পরিচালনার ভার থাকলেও প্রত্যহ এখানে আসতেন, সময় থাকলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সন্তানের মৃত্যুর পরে বদলে গিয়েছে মানুষটি। পুরোনো প্রখর ফূর্তির ভাব আর নেই; আর চেঁচিয়ে বকাবকি করেন না; যারা তাকে ভালোভাবে চেনে তারা এটাকে আসন্ন বার্ধক্যের লক্ষণ বলে ধরে নিয়েছে।

'আচ্ছা, মেরেসিয়েভ, একসঙ্গে শেখার চেষ্টা করি আমরা...' প্রস্তাব করলেন ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। অনুচরবর্গের দিকে ঘুরে বললেন, 'তোমরা



কেটে পড়ো ত বাপু, সার্কাস নয় এটা, হাঁ করে দেখার কিছু নেই। আমাকে বাদ দিয়ে রোঁদ শেষ করো।' তারপর বললেন মেরেসিয়েভকে:

'তাহলে, বাপু... এক! ধরে থাকো, আমাকে ধরে থাকো, লজ্জা পাবার কিছু নেই! আমি জেনারেল, আমার কথা শুনতে বাধ্য তুমি। আচ্ছা, দুই! ঠিক হয়েছে ওটা। এবার ডান পাটা। বেশ, বেশ! বাঁয়ে! চমৎকার!'

মহানন্দে বিখ্যাত সার্জন হাতে হাত ঘষলেন, যেন একটি লোককে হাঁটতে শিখিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান, ভগবান জানেন কত মূল্যবান, কোন পরীক্ষামূলক গবেষণা করছেন। কিন্তু ওঁর স্বভাবই এ ধরনের, যা কিছু করেন সোৎসাহে করেন, বিরাট উদ্যমী প্রাণের সবটা ঢেলে দিয়ে। সারা ওয়ার্ডটা হাঁটতে মেরেসিয়েভকে বাধ্য করলেন তিনি, আর যখন আলেক্সেই ক্লান্তিতে সারা হয়ে ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারে, তখন আর একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসে বললেন:

'তাহলে বিমানে চড়ব নাকি আমরা? মনে ত হয় চড়ব। এই যুদ্ধে, বাপু, একটা হাত উড়ে গেছে এমন লোকে দলকে এগিয়ে নিয়ে আক্রমণ চালায়, চরম আহতেরা চালায় মেসিনগান, নিজের শরীর দিয়ে ঠেকায় শত্রুপক্ষের মেসিনগান... যারা মৃত শুধু তারা লড়াই করে না...' বৃদ্ধের মুখে ছায়ার রেশ, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'না, এমন কি মৃতেরা পর্যন্ত লড়ছে... ওদের যশ দিয়ে। হ্যাঁ... আর, ছোকরা, আবার হাঁটতে শুরু করা যাক!'

ওয়ার্ডটা দ্বিতীয় বার ঘুরে বিশ্রাম করার জন্য আলেক্সেই থামল, অধ্যাপক তখন গভজ্‌দেভের বিছানাটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'ট্যাঙ্ক-অফিসারের কী হল? ও কি ছাড়া পেয়েছে?'

মেরেসিয়েভ জানাল যে ট্যাঙ্ক-অফিসার সেরে উঠে নিজের দলে আবার যোগ দিয়েছে। ওর একমাত্র গণ্ডগোল হল পোড়ার দাগে মুখটা ভয়াবহভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে নিচের অংশটা।

'তাহলে এরি মধ্যে তোমাকে চিঠি লিখেছে? মেয়েরা ভালোবাসে না বলে ওর হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছে মনে হচ্ছে। ওকে বোলো যেন দাড়ি-গোঁফ রাখে। ঠাট্টা করছি না। ওকে তাহলে বেশ স্বতন্ত্র দেখাবে, মেয়েরা পছন্দ করবে।'

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে একটি নার্স ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচকে জানাল জন কমিসার পরিষদ থেকে ওঁকে টেলিফোন করছে। কষ্ট করে উঠলেন অধ্যাপক, যে ভাবে ফোলা চামড়া-খসা হাতদুটো হাঁটুতে রাখলেন আর সেটা

করতে গিয়ে নুয়ে পড়লেন তাতে বোঝা গেল গত কয়েক সপ্তাহে কতটা বুড়িয়ে গেছেন তিনি। দরজায় পৌঁছিয়ে মেরেসিয়েভের দিকে ঘুরে প্রফুল্লভাবে বললেন:

'তাহলে ওকে... ওর নাম কী... মানে আপনার বন্ধুকে, চিঠি লিখতে ভুলবেন না... ওকে বলুন যে দাড়ি রাখতে বলেছি আমি। দাওয়াইটা পরখ করা... মেয়েরা দাড়ি খুব ভালোবাসে!'

সেদিন সন্ধ্যায় ক্লিনিকের একজন পুরোনো পরিচারক মেরেসিয়েভের জন্য একটা ছড়ি নিয়ে এল, আবলুস কাঠের তৈরী, পুরোনো সুন্দর ছড়িটা, হাতির দাঁতের বাঁট, সংক্ষিপ্ত নামাক্ষর চিত্র আঁকা তাতে।

'অধ্যাপক এটা আপনাকে পাঠিয়েছেন,' বলল সে। 'ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ। ওঁর নিজের ছড়ি। উপহার হিসেবে আপনাকে দিয়েছেন। বলেছেন যে ছড়ি নিয়ে আপনাকে হাঁটতে হবে।'

গ্রীষ্মের সেই সন্ধ্যায় হাসপাতালের লোকেদের বিরস লাগছিল, আর তাই ডাইনের, বাঁয়ের, এমন কি ওপরতলার ওয়ার্ড থেকে পর্যন্ত রোগীরা ৪২ নং ওয়ার্ডে এল বেড়াতে, অধ্যাপকের উপহারটি দেখার জন্য। হাঁটার ছড়িটা সত্যিই চমৎকার।

১৫

ফ্রন্টে তখনো ঝড়ের আগের গুমোট ভাব। ইস্তাহারে থাকে স্থানীয় লড়াই'এর আর স্কাউট দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের কথা। হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা কমে গিয়েছে, তাই ৪২ নং ওয়ার্ডের খালি খাটগুলো সরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন অধ্যক্ষ। ওয়ার্ডে রয়ে গেল শুধু মেরেসিয়েভ আর স্ত্রুচকভ; ডানদিকে মেরেসিয়েভের আর বাঁদিকে বাঁধমুখো জানলার কাছে মেজরের খাট।

স্কাউট দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ! মেরেসিয়েভ ও স্ত্রুচকভ দুজনেই অভিজ্ঞ সৈনিক, ওরা জানে যে সাময়িক বিরতি আর কণ্টকৃত প্রশান্তি যত বিলম্বিত হয় তত তীব্র হয় অবশ্যম্ভাবী ঝড়।

একদিনের ইস্তাহার উল্লেখ করল সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর, স্নাইপার স্তেপান ইভুশকিনের কথা, দক্ষিণ ফ্রন্টের কোথায় পঁচিশটা জার্মান মেরেছে সে, এই নিয়ে তার মোট সংখ্যা হল দু'শ। গভজ্‌দেভের চিঠি এল। কোথায় আছে, কী করছে সেটা লেখেনি অবশ্য। লিখেছে তার প্রাক্তন সেনানায়ক,

পাভেল আলেক্সেয়েভিচ রতমিস্ত্রভের দলে ফিরেছে সে, জীবনযাত্রা ভালোই চলেছে, প্রচুর চোরি পাওয়া যায় আর সবাই পেট পুরে তাই খায়। আলেক্সেইকে অনুরোধ করেছে যেন চিঠিটা পাবার পর আনিউতাকে এক ছত্র লিখে খবর দেয়। সে-ও লিখেছে আনিউতাকে, কিন্তু চিঠিগুলো পেশীছিয়েছে কিনা জানে না।

এই দুটো বার্তাতেই যে কোন সৈনিক বুঝতে পারে যে দক্ষিণের কোথাও ঝড় ভেঙ্গে পড়বে। বলাই বাহুল্য, আনিউতাকে চিঠি লিখল আলেক্সেই। অধ্যাপক দাড়ি রাখতে বলেছে, সে উপদেশটাও জানাল গভজ্‌দেভকে আর আনিউতাকে। কিন্তু আলেক্সেই জানত আসন্ন যুদ্ধের সেই অস্থির প্রতীক্ষায় আছে গভজ্‌দেভ যে অবস্থায় প্রত্যেক সৈনিকেরই মন উৎকণ্ঠায়, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেও আচ্ছন্ন থাকে, আর সেজন্য দাড়ির, এমন কি হয়ত আনিউতার কথাও ভাবার সময় পাবে না গভজ্‌দেভ।

৪২ নং ওয়ার্ডে প্রীতিকর আর একটি জিনিস ঘটল। একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল যে মেজর পাভেল ইভানভিচ স্ত্রুচকভকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সুখবরেও মেজরের উৎফুল্লতা বেশী দিন জিইয়ে রইল না। আবার বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন সে, ভাঙ্গা হাঁটুদুটোকে বাপান্ত করে, ওদুটোর জন্যই ত এই কর্মমুখর সময়ে বিছানায় বন্দী হয়ে আছে। তার বিরস মেজাজের আর একটি কারণ ছিল, লুকোবার চেষ্টা করলেও অপ্রত্যাশিতভাবে সেটা ধরা পড়ল আলেক্সেই'র কাছে।

হাঁটতে-শেখা মেরেসিয়েভের সমস্ত মন নিবদ্ধ একটিমাত্র বিষয়ে, আশেপাশে কী হচ্ছে প্রায় চোখে পড়ে না তার। প্রতিদিন কী করবে তার একটা তালিকা বানিয়ে কড়াভাবে পালন করে যাচ্ছে: সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এক একটা ঘণ্টা করে, রোজ তিন ঘণ্টা করিডরে কৃত্রিম অঙ্গে হাঁটা অভ্যেস করে সে। নীল গাউন পরে খোলা দরজার সামনে দিয়ে একটা লোক পেণ্ডুলামের মত নিয়মিতভাবে যাচ্ছে আর আসছে, চামড়ার পায়ের মচমচ আওয়াজে করিডরটা মুখর, প্রথম প্রথম অন্যান্য ওয়ার্ডের রোগীরা তাতে বিরক্ত হত; কিন্তু শেষে এটা তাদের এত সয়ে গেল যে দরজা ছাড়িয়ে লোকটি না গেলে দিনের কয়েকটি বিশেষ অংশের কথা কল্পনা করা কঠিন হত তাদের। জিনিসটা এমন দাঁড়িয়েছিল সত্যি যে একদিন মেরেসিয়েভ ফ্লু হওয়াতে শুয়ে আছে; অন্যান্য ওয়ার্ডের রোগীরা লোক পাঠিয়ে খবর নিল পদহীন লেফ্‌টেনাণ্টের কী হয়েছে।

সকালে দৈহিক ব্যায়ামের পরে চেয়ারে বসে আলেক্সেই বিমান চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গচালনায় অভ্যস্ত করাত পাদুটোকে। মাঝেমাঝে অনেকক্ষণ এটা করার জন্য মাথা ঘুরে উঠত, কানে ঝিঁঝিঁ ধরে যেত, চোখের সামনে দেখত উজ্জ্বল সবুজ বৃত্ত, সব ঘুরছে, পায়ের নিচে মেঝেটা দুলে উঠছে। তখন মুখ ধোবার জায়গায় গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকত, যাতে তাড়াতাড়ি সে ভাবটা কেটে যায় আর হাঁটা আর ব্যায়ামের মহড়াটা বাদ না পড়ে।

সে দিন হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘুরে উঠল, হাতড়ে মেরেসিয়েভ ফিরে এল ওয়ার্ডে, চোখে কিছু দেখতে পারছে না, এলিয়ে পড়ল বিছানায়। একটু ধাতস্থ হবার পর হুঁশ হল ওয়ার্ডে কারা কথা বলছে: ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার শান্ত কণ্ঠস্বর, একটু শ্লেষের ভাব তাতে, আর স্ত্রুচকভের। উত্তেজিত অনুনয়-ভরা গলা। কথাবার্তায় এত একাগ্র দুজন যে মেরেসিয়েভের ওয়ার্ডে আসাটা চোখে পড়েনি।

'বিশ্বাস করুন, আমি ঠাট্টা করছি না! বোঝেন না কেন? আপনি ত মেয়েমানুষ না আর কিছু?'

'মেয়েমানুষ ত বটে, কিন্তু কথাটা আমার মাথায় ঢুকছে না, আর এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে কথা বলতে পারেন না আপনি। আপনার আন্তরিকতা চাই না আমি!'

চটে উঠে স্ত্রুচকভ চেঁচিয়ে বলল:

'আপনায় আমি ভালোবাসি, দিব্যি করে বলছি! সেটা যদি না বোঝেন তাহলে মেয়েমানুষ নন আপনি, এক টুকরো পাথর। বুঝেছেন?' মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জানলার শার্সিতে আঙুল দিয়ে টোকা দিতে লাগল স্ত্রুচকভ।

দক্ষ নার্সের স্বভাবসিদ্ধ লঘু সতর্ক পদক্ষেপে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা গেল দরজার দিকে।

'কোথায় যাচ্ছেন? আমার কথার উত্তর দেবেন না?'

'আমার কাজের সময় এটা, এই নিয়ে কথা বলার স্থান আর কাল এটা নয়।'

'সরাসরি জবাব দিচ্ছেন না কেন? কেন আমাকে জ্বালাচ্ছেন? বলুন!' মেজরের কণ্ঠস্বরে এখন ক্লেশের ভাব।

দোরগোড়ায় থামল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা। অন্ধকার করিডরের পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার পাতলা সুঠাম দেহ। মেরেসিয়েভের ঘুণাক্ষরে কখনো মনে হয়নি এই শান্ত নার্সটি, যৌবন যার অতিক্রান্ত, নারীসুলভভাবে এত

দৃঢ়বদ্ধ আর কমনীয় হতে পারে। মাথা পিছনে হেলিয়ে দোরগোড়ায় থেমে মেজরের দিকে তাকাল সে, যেন অনেক উ'চু থেকে দেখছে।

'বেশ,' সে বলল 'জবাব দিচ্ছি। আমি আপনাকে ভালোবাসি না, হয়ত কখনো ভালোবাসতে পারব না।'

চলে গেল ও। মেজর বিছানায় আছড়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। এবারে মেরেসিয়েভ বুঝতে পারল মেজরের গত কয়েকদিনের বিচিত্র ব্যবহারের কারণটা কী, নার্স ঘরে এলে কেন খিটখিটে আর অস্থির হয়ে যেত ও, কেনই বা ফুর্তির ভাব সহসা পরিণত হত বিকট রাগের উচ্ছ্বাসে।

সত্যিকারের যন্ত্রণায় নিশ্চয়ই ও ভুগছে। মেজরের জন্য দুঃখিত বোধ করল আলেক্সেই, সঙ্গে সঙ্গে খুসিও হল। বিছানা ছেড়ে মেজর উঠছে, ওকে ক্ষেপাবার লোভ সামলাতে পারল না আলেক্সেই।

'কী, কমরেড মেজর, মুখে থুতু দিতে পারি কি?'

কথাটায় মেজরের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে জানলে ঠাট্টা করেও বলত না ওটা আলেক্সেই। আলেক্সেই'র খাটে ছুটে এসে হতাশা গভীর কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে উঠল স্ত্রুচকভ.

'থুতু ফেলো, হ্যাঁ, থুতু ফেলো! ফেললে ঠিকই করবে। আমার উচিত শাস্তি হবে। কিন্তু কী করব এখন বাতলাও ত? বলো বলো, কী করব? আমাদের কথাবার্তা শুনেছ ত?'

মাথা টিপে খাটে বসে পড়ল স্ত্রুচকভ, দেহটা এদিক ওদিক দুলছে।

'তোমার হয়ত মনে হচ্ছে যে ঠাট্টা করছিলাম? ঠাট্টা করছিলাম না। সত্যি কথা বলছিলাম। নির্বোধ মেয়েটাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম!'

সন্ধ্যেবেলায় রোঁদে যথারীতি ওয়ার্ডে এল ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা। শান্ত সহিষ্ণু আর সহৃদয় মনোভাবে কোন পরিবর্তন নেই। স্থিরতার প্রতিমূর্তি যেন। মেরেসিয়েভ আর মেজরের দিকে তাকিয়ে হাসল। মেজরের দিকে কিন্তু তাকাল উৎকণ্ঠায় এমন কি সভয়ে।

জানলার ধারে বসে মেজর নখ কামড়াচ্ছিল, করিডরে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাকাল, চাউনিতে সশ্রদ্ধ ক্রোধের ছাপ।

'সোভিয়েত দেবীই বটে!' গরগর করে উঠল মেজর। 'নামটা দিয়েছিল কোন বোকা? নার্সের পোশাকে শয়তানী!'

অফিসের নার্স, জীর্ণশীর্ণ মধ্যবয়স্কা মহিলা ওয়ার্ডে এসে জিজ্ঞেস করল:

'মেরেসিয়েভ আলেক্সেই, হাঁটতে পারার মত রোগী কি সে?'

'না, দৌড়ঝাঁপ করা রোগী,' খেঁকিয়ে উঠল স্ত্রুচকভ।

'ইয়ার্কি করার জন্যে এখানে আসিনি,' কঠোর সুরে নার্স বলল। 'মেরেসিয়েভ আলেক্সেই, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, টেলিফোনে ডাকছে তাকে।'

'কোন কমবয়সী মেয়ে ডাকছে?' চাঙিয়ে উঠে চোখ ঠেরে ক্রুদ্ধ নার্সকে স্ত্রুচকভ জিজ্ঞেস করল।

'ওর বিয়ের নথিপত্র দেখিনি আমি,' হিসহিস করে উঠল নার্স, সগাম্ভীর্যে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ড থেকে।

একলাফে বিছানা থেকে নামল মেরেসিয়েভ। মহাফুর্তিতে ছড়ি নিয়ে ঠকঠক করে হেঁটে নার্সটিকে ধরে ফেলল আর সত্যি সত্যি দৌড়িয়ে নামল সিঁড়ি দিয়ে। প্রায় মাস খানেক ওলিয়ার জবাবের আশায় আছে মেরেসিয়েভ, চকিতে মনে হল, তাহলে ওলিয়াই কি ফোন করছে? কিন্তু সেটা হতে পারে না। এ সময়ে স্তালিনগ্রাদের কাছাকাছি জায়গাটা থেকে মস্কো আসা ওর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাছাড়া হাসপাতালেও মেরেসিয়েভকে খুঁজে বের করবে কেমন করে? মেরেসিয়েভ ত ওকে জানিয়েছে যে সে ফ্রণ্টের পিছনে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে, মস্কোতে নয়, উপকণ্ঠে।

কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে অলৌকিকে আস্থাবান আলেক্সেই, নিজের অলক্ষিতে দৌড়ল ও, কৃত্রিম পায়ে এই প্রথম দৌড়নো তার; কেমন দুলে দুলে এগোচ্ছে, মাঝেমাঝে শুধু ভর দিচ্ছে ছড়িতে, বুটদুটো মচমচ, মচমচ করে চলেছে...

রিসিভারটা তুলে নেওয়াতে কানে এল প্রীতিকর গভীর কিন্তু একেবারে অচেনা কণ্ঠস্বর। ব্যক্তিটি জানতে চাইল সে ৪২ নং ওয়ার্ডের সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আলেক্সেই পেত্রভিচ মেরেসিয়েভ কি না।

প্রশ্নটাতে যেন অবমাননাসূচক কিছু আছে, তীক্ষ্ন ক্রুদ্ধ গলায় খেঁকিয়ে উঠল মেরেসিয়েভ:

'হ্যাঁ!'

এক মুহূর্ত কোন সাড়া নেই, তারপর ব্যক্তিটি ওকে বিরক্ত করার জন্য মাপ চাইল, কণ্ঠস্বর এখন উদাসীন আর আড়ষ্ট, স্পষ্টতই মেরেসিয়েভের সংক্ষিপ্ত উত্তরে চটেছে, বেশ চেষ্টা করে বলে চলল:

'আমি আন্না গ্রিবভা, লেফ্‌টেনাণ্ট গভজ্‌দেভের বন্ধু। আমাকে চেনেন না আপনি,' উদাসীন উত্তরে ব্যথিত হয়ে করুণভাবে বলল মেয়েটি।

দুহাতে রিসিভারটা আঁকড়ে ধরে মেরেসিয়েভ প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলল:

'আপনি আনিউতা? আনিউতা? বিলক্ষণ চিনি আপনাকে: গ্রিশা আমাকে বলেছে...'

'ও এখন কোথায়? কী হয়েছে ওর? এমন ঝট করে চলে গেল! সাইরেন বাজতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, প্রাথমিক সাহায্যকারীদের সঙ্গে কাজ করি আমি, জানেন ত, ফিরে যখন এলাম তখন ও চলে গিয়েছে, কোন চিঠি কিম্বা ঠিকানা রেখে যায়নি... ভাই আলিওশা! এরকম করে ডাকার জন্যে মাপ করবেন, আপনাকেও চিনি আমি, ওর জন্যে ভয়ানক উদ্বিগ্ন লাগছে। কোথায় আছে, কেন ওরকম ঝট করে চলে গেল, জানতে মন চাইছে আমার...'

মরমী অনুভূতিতে আলেক্সেই'র বুক ভরে উঠল। বন্ধুর জন্য খুসি লাগল নিজেকে। লোকটা মজার, ভুল করেছিল ও, নিতান্ত অভিমানী লোক। তাহলে সৈনিকের বিকলাঙ্গতায় সত্যিকারের মেয়েরা ভয় পায় না। তার মানে, ও নিজেও ধরে নিতে পারে যে তার জন্য একজন কেউ উদ্বিগ্ন, ঠিক এরকম ভাবেই খুঁজছে তাকে। বিদ্যুৎ ঝলকের মত কথাগুলো তার মনে এল, রিসিভারে মুখ রেখে উত্তেজনায় প্রায় থুতু ছিটিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'আনিউতা! সবকিছু ঠিক আছে! দুজনের বুঝতে ভুল হয়েছিল, সেটা দুঃখের কথা। ও খুব ভালো আছে, আবার কাজ করছে। সত্যি! ফীল্ড পোস্ট ওর ৪২৫৩১-বি। দাড়ি রাখছে গ্রিশা, সত্যি বলছি, আনিউতা! খাসা দাড়ি একটা... এই যেমন পার্টিজানরা রাখে! বেশ মানায় ওকে!'

দাড়ি রাখাটার তারিফ করল না আনিউতা। ওর মতে কোন দরকার নেই সেটার। কথাটা শুনে আরো খুসি হয়ে মেরেসিয়েভ বলল সত্যিই যদি তাই হয় তাহলে গ্রিশা ত এক নিমেষে দাড়ি ত্যাগ করবে, যদিও সবাই বলছে দাড়ি রাখাতে ওকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে।

শেষে রিসিভার নামিয়ে যখন রাখা হল দুজনেই তখন পরম বন্ধু, ঠিক হল যে হাসপাতাল ছাড়ার আগে মেরেসিয়েভ ওকে ফোন করবে।

ওয়ার্ডে ফিরে যেতে যেতে আলেক্সেই'র মনে পড়ল যে টেলিফোন ধরার সময়ে ছুটে গিয়েছিল ও। আবার দৌড়তে চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু সুবিধে হল না। কৃত্রিম পায়ের চাপে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর ব্যথিয়ে

উঠছে। যাক গে, ভাববার কিছু নেই! আজ দৌড়তে পারছে না বটে, কাল পারবে, কাল যদি না পারে তাহলে পরশু, আর চুলোয় যাক, দৌড়বেই সে! সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে! আবার দৌড়তে, বিমান চালাতে আর লড়তে পারবে সে। শপথ করতে ভালোবাসে আলেক্সেই, তাই শপথ করল যে প্রথম আকাশ-যুদ্ধের পরে, প্রথম জার্মান বিমান নামাবার পরে ওলিয়াকে সবকিছু লিখে জানাবে। যা ঘটে ঘটুক!

তৃতীয় খণ্ড

১

১৯৪২-এর ভরা গ্রীষ্মে একটি বলিষ্ঠ যুবক আবলুস কাঠের মোটা ছড়িতে ভর দিয়ে মস্কোর আর্মি হাসপাতালের ওকের ভারী দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। বিমান বাহিনীর শক্ত-কলার কোট আর ট্রাউজার পরনে, কলারে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের পরিচয়-চিহ্ন। সঙ্গে শাদা ওভারঅল গায়ে একটি মেয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে নার্সরা যেরকম রেডক্রস মার্কা রুমাল মাথায় দিত সেরকম রুমাল মাথায় তার, কোমল সুন্দর মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ এনেছে সেটা। প্রবেশদ্বারের বারান্দায় দাঁড়াল দুজনে। তোবড়ানো রঙচটা বাহিনীর টুপিটা খুলে বৈমানিক নার্সের হাতে চুম্বন করার জন্য ঝুঁকল আনাড়িভাবে। দুহাতে তার মাথা ধরে নার্স কপালে চুম্বন করল। তারপর বৈমানিক, একটু দুলে দুলে হাঁটার ভঙ্গী তার, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামল, পিছন ফিরে আর না তাকিয়ে এ্যাসফল্টের বাঁধ হয়ে হাসপাতাল ছাড়িয়ে চলে গেল।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নীল হলদে আর খয়েরী রঙের পাজামা-পরা রোগীরা, কেউ হাত, কেউ হাঁটবার ছড়ি আর কেউবা ক্রাচ নেড়ে চেঁচিয়ে বিদায়কালীন উপদেশ দিচ্ছে বৈমানিককে। উত্তরে হাত নাড়ল সে, কিন্তু বোঝা গেল এই বড়ো ধূসর বাড়িটা যত শীগগির সম্ভব পেরিয়ে যেতে চায় সে, নিজের উত্তেজনা গোপন করার জন্য তাড়াতাড়ি জানলার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তাড়াতাড়ি হাঁটছে, ছড়িতে অল্প ভর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে। প্রতি পদক্ষেপে অস্পষ্ট মচমচ আওয়াজ না হলে কারো মনে হত না যে এই সুগঠিত বলিষ্ঠ চেহারার কর্মঠ লোকটির পায়ের পাতা নেই।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে তাড়াতাড়ি যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে সেজন্য আলেক্সেইকে পাঠানো হয় মস্কোর কাছে বিমান বাহিনীর স্বাস্থ্যাগারে। মেজর স্ত্রুচকভকেও পাঠানো হয় সেখানে। ওদের স্বাস্থ্যাগারে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি এসেছিল, কিন্তু মেরেসিয়েভ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে বলল যে মস্কোতে ওর আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবে না। কিট-ব্যাগটা স্ত্রুচকভের কাছে রেখে হেঁটে রওনা হল সে, কথা দিল বৈদ্যুতিক ট্রেনে সন্ধ্যেবেলায় স্বাস্থ্যাগারে পেঁছিবে।

মস্কোতে কোন আত্মীয় ছিল না আলেক্সেই'র, কিন্তু রাজধানী ঘুরে দেখবার খুব সখ তার, বিনা সাহায্যে হাঁটতে কতটা পারে পরীক্ষা করতে চায়, ওর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই এমন সরব জনতার মধ্যে যেতে চায়। টেলিফোনে আনিউতাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে বারোটা নাগাদ সে দেখা করতে পারে কি না। কোথায়? এই ধরো, পুশকিন স্মৃতিস্তম্ভের কাছে... আর তাই গ্রানিট-বদ্ধ মহিমান্বিত নদীটির বাঁধ ঘেঁষে চলেছে সে, নদীর ছোট ছোট ঢেউ রোদে চিকচিক করছে। হাঁটতে হাঁটতে মিষ্টি চেনা গন্ধে ভরপুর গ্রীষ্মের উষ্ণ হাওয়া প্রাণভরে নিচ্ছে সে।

চারিদিকে সবকিছু কী সুন্দর!

মেয়েরা হেঁটে চলে যাচ্ছে। সবাইকে সুন্দর লাগছে তার; সবুজ গাছগুলো কী অসম্ভব উজ্জ্বল! হাওয়া এত সুগন্ধি যে মাতালের মত ওর মাথা ঘুরছে, এত পরিষ্কার যে পরিপ্রেক্ষিত বোধ থাকছে না, মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই এর আগে শুধু ছবিতে দেখা ক্রেমলিনের প্রাকারগুলো স্পর্শ কবতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে মহান ইভানের ঘণ্টাঘরের গম্বুজ আর নদীর উপরে ভারীভাবে আনত সেতুর বিরাট নিচু খিলানটা। মিষ্টি মাতাল-করা গন্ধে সহর আচ্ছন্ন, নিজের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। গন্ধটা আসছে কোথা থেকে? হৃৎস্পন্দন এত দ্রুত কেন, কেন মায়ের কথা মনে পড়ছে, আজকের শীর্ণা বৃদ্ধাটি নয়, আগেকার সেই নবীনা দীর্ঘাকৃতি মানুষটির কথা, চুল যাঁর অসম্ভব সুন্দর ছিল? মায়ের সঙ্গে কখনো ত সে মস্কোয় আসেনি।

এর আগে মস্কোর সঙ্গে মেরেসিয়েভের পরিচয় হয় শুধু পত্রিকা আর সংবাদপত্রে ছবির মাধ্যমে, বই পড়ে, যারা সহরটা দেখেছে তাদের কাছে শোনা কথায়, রেডিওতে শোনা সহরের উপরে মধ্যরাত্রে মুখরিত প্রাচীন ঘড়িটির ঘণ্টায় আর উৎসবের দিনে শোভাযাত্রা আর সমাবেশের নানা

বিশৃঙ্খল ধ্বনিতে। আর আজ গ্রীষ্মের তপ্ত আলোয় বিচ্ছুরিত সহরটি চোখের সামনে বিস্তৃত!

ক্রেমলিনের প্রাকারের ধার ঘেঁষে জনহীন বাঁধ দিয়ে এগল মেরেসিয়েভ, জিরিয়ে নেবার জন্য ঠান্ডা গ্রানিট পারাপেটে ভর দিয়ে দাঁড়াল, নিচে চেয়ে দেখল ধূসর তৈলাক্ত জল গ্রানিট দেয়ালের গায়ে ঝুপঝুপ করে লাগছে. তারপর আস্তে আস্তে চড়াই ভেঙ্গে উঠল সেই পথে যেটা গিয়েছে রেড স্কোয়ারের দিকে। এ্যাসফল্টের রাস্তায় আর স্কোয়ারে লাইমগাছগুলোতে ফুল ফুটেছে, ছাঁটা চূড়োয় চূড়োয় সহজ মিষ্টি গন্ধে ভরা ফুলে মৌমাছির ব্যস্ত গুঞ্জন, চলন্ত মোটরগাড়ির হর্ণের আওয়াজ, ট্রামের ঢংঢং শব্দ, তপ্ত এ্যাসফল্ট থেকে ওঠা তেলের ধোঁয়াচ্ছন্ন ঝিকমিকে ঝাপসা চাদর কিছুরই পরোয়া করছে না মৌমাছিগুলো।

এই তাহলে মস্কো!

হাসপাতালে চার মাস কাটাবার পর গ্রীষ্মের এই মহিমায় এত অবাক আলেক্সেই যে প্রথমে তার চোখে পড়ল না যে রাজধানীর শরীরে এখন যুদ্ধের সজ্জা, অবস্থাটা এখন, বিমান বাহিনীতে যাকে বলা হয় "পয়লা নম্বরের প্রস্তুতি," অর্থাৎ যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তৈয়ার। সেতুর কাছে চওড়া রাস্তাটা প্রকান্ড কুৎসিৎ একটা ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো, বালিতে-ভরা কাঠের বাক্স দিয়ে তৈরী সেটা। সেতুর কোণে কোণে উদ্যত চতুশ্ছিদ্র মুখ, কামান বসানোর কংক্রিট জায়গা, যেন কোন বাচ্চা টেবিলে খেলনার ছক ফেলে গিয়েছে। বেড স্কোয়ারের ধূসর বুকে বাড়িঘরদোর, বীথি আর বড়ো রাস্তা নানা রঙে আঁকা হয়েছে। গোর্কি স্ট্রীটে দোকানগুলোর জানলা তক্তা আর বালির থলেয় ঢাকা: গলিগুলোতে রেল কণ্টকিত "সজারু", বাচ্চাদের পরিত্যক্ত খেলনার মত দেখাচ্ছে তাদেরো। ফ্রন্ট থেকে আসা কোন সৈনিকের চোখে কিছু অস্বাভাবিক লাগবে না এসব. বিশেষ করে সে যদি আগে মস্কো দেখে না থাকে। দোকানের জানলা আর দেয়ালে লাগানো "তাস"এর গবাক্ষগুলো পথচারীদের দিকে তাকিয়ে আছে, কয়েকটা বাড়ির সামনের দিকে বিচিত্রভাবে রং দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকিমাকার ফিউচরিষ্ট ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় সেটা, শুধু এগুলো দেখতে অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক।

মেরেসিয়েভ বেশ ক্লান্ত এখন; বুটদুটো মচমচ করছে. ছড়িতে আগের চেয়ে বেশী করে ভর দিয়ে গোর্কি স্ট্রীট হয়ে চলল সে; চারিদিকে তাকিয়ে

অবাক হয়ে যাচ্ছে সে — বোমার ছোট বড়ো গর্ত, বিধ্বস্ত বাড়ি, হাঁ-করা ফাঁকা জায়গা, ভাঙ্গা জানলা, কিছুই চোখে পড়ছে না ত। খুব পশ্চিমের দিকে বিমান-ঘাঁটিতে কাজ করেছে সে, প্রায় প্রতি রাত্রে ডাগ-আউটের উপর দিয়ে ঢেউ'এর পর ঢেউ'এ জার্মান বোমারু বিমানের পূবমুখো যাত্রার শব্দ শোনা তার অভ্যেস। এক দল চলে যেত, শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে না যেতে আসত আর একটা ঝাঁক, আর মাঝেমাঝে সারা রাত ধরে চলত বিমানগর্জন। বৈমানিকেরা জানত ফ্যাশিস্টরা যাচ্ছে মস্কোর দিকে, কী নরকের আগুন জ্বলেছে সেখানে কল্পনা করত।

আর আজ যুদ্ধকালীন মস্কোতে ঘুরতে ঘুরতে বিমান আক্রমণের চিহ্ন খুঁজে কিছু দেখতে পেল না মেরেসিয়েভ। এ্যাসফল্টের রাস্তাগুলো মসৃণ, বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ঠ সার বেঁধে। এমন কি কাগজ-আঁটা জানলাগুলো পর্যন্ত অক্ষত, মাত্র কয়েকটা বাদ দিয়ে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র বেশী দূরে নয়, সেটা বোঝা যায় বাসিন্দেদের ক্লান্ত শ্রান্ত মুখ থেকে। বাসিন্দেদের অর্ধেক সৈনিক, ধূলিধূসর তাদের উঁচু বুটগুলো, ঘামে পিঠে লেপটে আছে টিউনিক, পিঠে ন্যাপসাক। গলি থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল বড়ো রাস্তায় হঠাৎ এসে পড়ল লম্বা সারি বেঁধে একদল লরি, ধূলোয় আচ্ছন্ন, মাডগার্ড তোবড়ানো, উইন্ড-স্ক্রিণ ভেঙ্গে গিয়েছে। নড়বড়ে লরিগুলোতে যাত্রী সৈনিকেরা সকৌতূহলে চারিদিকে তাকাচ্ছে, হাওয়ায় উড়ছে কেপগুলো। লরির সারিটা ট্রলিবাস মোটরগাড়ি আর ট্রাম পেরিয়ে এগিয়ে গেল; শত্রুপক্ষ যে বেশী দূরে নয় তার জাজ্বল্য প্রমাণ সেটা। লরিগুলোর দিকে আকাঙ্ক্ষায় তাকিয়ে রইল মেরেসিয়েভ, ভাবল, যদি ধূলিধূসর লরিগুলোর একটায় লাফিয়ে উঠতে পারে তাহলে সন্ধ্যার মধ্যে ফ্রন্টে, নিজের বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছিয়ে যাবে! দেগতিয়ারেঙ্কোর সঙ্গে যে ডাগ-আউটে থাকত তার কথা ভাবল, ফার কাঠের খাট, আলকাতরা ও ফারগাছের গন্ধ, চ্যাপটা কার্তুজ থেকে তৈরী সেই আদিম প্রদীপটা থেকে পেট্রলের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরোচ্ছে, সকালে ইঞ্জিনের গর্জন, তাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে সেগুলো, আর মাথার উপরে কখনো থামে না দোদুল্যমান পাইনগাছের মর্মরধ্বনি। ডাগ-আউটটা তার নিজের বাড়ির মত মনে হল, চুপচাপ আরামে-ভরা বাড়ি। সেই জলাভূমিটায়, স্যাঁতসেঁতে বলে বৈমানিকদের চক্ষুশূল ছিল যেটা, সেই ভেজা মাটি আর মশার অবিরাম গুঞ্জনে-ভরা জায়গাটাতে যদি তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়তে পারে!

বেশ কষ্টে পা ফেলে পুশকিন স্মৃতিস্তম্ভের দিকে চলল মেরেসিয়েভ।

পথে জিরোবার জন্য কয়েকবার থামল. ছড়িতে দুহাতে ভর দিয়ে এমন ভাব দেখাল যেন দোকানের জানলায় টুকিটাকি জিনিস খুঁটিয়ে দেখছে। স্মৃতিস্তম্ভে পৌঁছিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটি গরম সবুজ বেঞ্চে বসে পড়ল, পড়ে গেল বলা চলে। কৃত্রিম চেটোর ফিতের চাপে পাদুটো যন্ত্রণায় জ্বলছে, পা ছড়িয়ে বসল মেরেসিয়েভ। ক্লান্ত লাগছে. কিন্তু আনন্দের ভাবটা কেটে যায়নি একেবারে। অদ্ভুত সুন্দর রোদে-ভরা এই উজ্জ্বল দিনটি! রাস্তার মোড়ে বাড়িটার কোণের মিনারে পাথরের একটা স্ত্রীমূর্তি, তার উপরে আকাশটাকে অসীম মনে হচ্ছে। প্রশস্ত বীথি হয়ে হালকা হাওয়ায় আসছে লাইমগাছের তাজা মিষ্টি গন্ধ। ঢংঢং আওয়াজে ফূর্তিতে চলেছে ট্রামগুলো, স্মৃতিস্তম্ভের তলায় বাচ্চারা তাড়াহুড়ো করে শুকনো গরম বালি খুঁড়ছে, পাণ্ডুর আর রোগা তারা, কিন্তু হাসিটা খুসিতে উজ্জ্বল। বড়ো রাস্তায় আরো এগিয়ে, দড়ির বেড়ার আড়ালে চোখে পড়ে বিমান-রোধক বেলুন-বাঁধের রুপালী, চুরোট-আকৃতি দেহ, খরখরে ফৌজী টিউনিক-পরা গোলাপী-গাল দুটি মেয়ে সেটা পাহারা দিচ্ছে। যুদ্ধের এই অস্ত্রটিকে মস্কো আকাশের নিশা-প্রহরীর মত ঠেকল না মেরেসিয়েভের কাছে, বরঞ্চ মনে হল চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে এসে কোন বিপুলকায় নিরীহ জন্তু গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় ঝিমোচ্ছে।

চোখ বুজে আকাশের দিকে হাসি-মুখ ফেরাল মেরেসিয়েভ।

প্রথম প্রথম বাচ্চারা বৈমানিককে মনোযোগ দিয়ে দেখেনি। তাদের দেখে ৪২ নং ওয়ার্ডের জানলার কাঠে বসা চড়ুইগুলোর কথা মনে হল মেরেসিয়েভের, ওরা কিচির মিচির করে চলেছে, আর ও সমস্ত শরীর দিয়ে সূর্যের উত্তাপ আর রাস্তার নানা শব্দ গ্রহণ করছে। কিন্তু খেলার সাথীদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে গিয়ে একটা ক্ষুদে মেরেসিয়েভের ছড়ানো পায়ে হোঁচট খেয়ে ধড়াস করে বালির উপরে পড়ল।

মুহূর্তের জন্য বাচ্চাটির মুখ কান্নায় বিকৃত হয়ে উঠল, তারপরে এল হতবুদ্ধি ভাব, তারপর বিভীষিকা। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে তড়তড় করে ছুটে পালাল সে। বাচ্চার ঝাঁক তাকে ঘিরে দাঁড়াল, কিছুক্ষণ চলল ভয়ের কিচির মিচির, আড়চোখে বৈমানিককে দেখা। তারপর আস্তে আস্তে চোরের মত ওরা মেরেসিয়েভের কাছে এগিয়ে এল।

চিন্তায় একাগ্র মেরেসিয়েভ কিছুই লক্ষ্য করেনি। চোখ খুলে দেখল বাচ্চাগুলো ভয়ে আর বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে, আর শুধু তখনি ওরা কী বলছে হুঁশ হল তার।

'মিথ্যে কথা বলছিস তুই, ভিতামিন! আসল বৈমানিক ও। সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' বছর দশেকের একটি ফ্যাকাশে ক্ষীণ ছেলে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল।

'মিথ্যে বলছি না। সাঁচ্চা পাইওনিয়রের কথা দিচ্ছি, মিথ্যে বললে যেন জিভ খসে যায়! সত্যি ওগুলো কাঠের! আসল নয়, কাঠের।'

বুক মুচড়িয়ে উঠল মেরেসিয়েভের, তৎক্ষণাৎ দীপ্ত দিনটা অন্ধকার হয়ে এল তার কাছে। চোখ তুলে তাকাল, তা দেখে পিছু হটে গেল বাচ্চারা, তখনো ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। বন্ধুর সন্দিগ্ধচিত্ততায় বিরক্ত হয়ে ভিতামিন যুদ্ধং দেহি ভঙ্গীতে বলল:

'যদি বলিস ত ওকে জিজ্ঞেস করি। ভেবেছিস ভয় পেয়েছি? বাজী রাখবি নাকি?'

দল ছেড়ে আস্তে আস্তে সাবধানে আড়ভাবে ও এল মেরেসিয়েভের কাছে, এক ছুটে পালাতে প্রস্তুত, হাসপাতালের জানলায় বসা "সাব-মেসিনগানার"এর মত। অবশেষে স্টার্ট লাইনের কাছে দৌড়িয়ের মত কুঁজো আর টান-টানভাবে দাঁড়িয়ে সাহস করে জিজ্ঞেস করল:

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, আপনার পাদুটো কী ধরনের, আসল না কাঠের? আপনি কি পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন?'

বাচ্চাটি দেখল বৈমানিকের চোখ জলে ভরে গেল। যদি লাফিয়ে উঠে মেরেসিয়েভ চেঁচাত আর সোনালী অক্ষর বসানো মজার ছড়িটা দিয়ে তাড়া করত ওকে, তাহলে ততটা আশ্চর্য হত না বাচ্চাটি যতটা হল বিমান বাহিনীর একজন লেফ্‌টেনাণ্টকে কাঁদতে দেখে। "পঙ্গু" শব্দটি উচ্চারণ করে বৈমানিককে যে ব্যথা দিয়েছে সেটা বুঝল না, অনুভব করল সে তার ছোট্ট বুকে। কোন কথা না বলে বাচ্চাদের ভিড়ে ফিরে গেল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল দলটা, যেন গরম হাওয়ায় উবে গিয়েছে, সে হাওয়ায় মধুর আর তপ্ত এ্যাসফল্টের গন্ধ।

আলেক্সেই'র নাম ধরে কে ডাকল। তক্ষুণি উঠে পড়ল সে। সামনে দাঁড়িয়ে আনিউতা। তৎক্ষণাৎ চিনল তাকে, যদিও ফটোতে যেমন তেমন সুন্দর নয়। ওর মুখ বিবর্ণ আর শ্রান্ত, গায়ে টিউনিক, পায়ে উঁচু বুট, মাথায় বসানো বাহিনীর পুরোনো মলিন টুপি। কিন্তু সবজে, একটু বেরিয়ে-আসা চোখে এমন সহজ ও দীপ্তভাবে ও তাকাল মেরেসিয়েভের দিকে, সে

দৃষ্টিতে প্রীতির এমন বিকিরণ যে অচেনা মেয়েটিকে অনেক দিনের চেনা লোক মনে হল, যেন শৈশবে একই উঠোনে দুজনে খেলেছে।

এক মুহূর্ত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, কোন কথা না বলে। অবশেষে মেয়েটি বলল:

'আপনার একেবারে অন্য রকম চেহারা ভেবেছিলাম!'

'কী রকম চেহারা?' জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ. মুখের হাসিটা ঠিক মানানসই নয়, তবে সেটাকে তাড়াতে পারল না সে।

'কী করে বোঝাই, ভাবছি! এই ধরুন, বীরের মত চেহারা, লম্বা আর চওড়া। হ্যাঁ, ঠিক সে রকম, আর চোয়ালটা ভারী, এরকম, মুখে একটা পাইপ... গ্রিশা আপনার কথা এত লিখত!'

'আপনার গ্রিশা, সে কিন্তু সত্যিকারের বীর!' বাধা দিয়ে বলল আলেক্সেই। আর মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দেখে একই ঢঙে বলে চলল "আপনার" কথাটায় জোর দিয়ে, 'মানুষের মত মানুষ আপনার গ্রিশা! আমি আর এমন কী? কিন্তু আপনার গ্রিশা... মনে হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে ও আপনাকে কিছু বলেনি...'

'কী জানেন, আলিওশা... আপনাকে আলিওশা বলে ডাকতে পারি ত?..ওর চিঠিপত্রে এই নামটিই আমার খুব চেনা... মস্কোতে আপনার অন্য কাজ নেই ত? তাহলে আমার বাড়িতে চলুন। আমার কাজ শেষ, সারা দিন আর কাজ নেই। চলুন! বাড়িতে কিছু ভদকা আছে। ভদকা আপনার ভালো লাগে? কিছু খাওয়াব চলুন।'

সে নিমেষে আলেক্সেই'র স্মৃতির গভীর থেকে এক ঝলকে চোখের সামনে এল মেজর স্ত্রুচকভের সেয়ানা মুখ, দ্বেষ-কলুষ কণ্ঠে যেন বলছে: "দেখছ ত? কী ধরনের মেয়ে বোঝো এবার! একলা থাকে! ভদকা! বেশ, বেশ!" কিন্তু স্ত্রুচকভ এত লজ্জাকরভাবে নাজেহাল হয়েছে যে ওর কোন কথায় কান দেবে না আলেক্সেই। সন্ধ্যা হতে অনেক দেরী, তাই প্রশস্ত বীথি ধরে বেড়াল তারা, পুরোনো বন্ধুর মত গল্প করে চলেছে উৎফুল্লভাবে। যুদ্ধের শুরুতে কী বিপর্যয় ঘটেছিল গভজ্‌দেভের সেটা আলেক্সেই বলার সময়ে চোখের জল চাপার জন্য আনিউতা ঠোঁট কামড়াল, দেখে খুসি হল ও। ফ্রণ্টে ওর কীর্তিকলাপের কথা শোনার সময়ে মেয়েটির সবজে চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। গভজ্‌দেভের সম্বন্ধে কী গর্বিত মেয়েটি! খুঁটিনাটি খবর, আরো খবর জানবার জন্য প্রশ্ন করছে, আর গালদুটো কেমন টকটকে

লাল হয়ে উঠেছে! কী কারণে জানি না, নিজের মাইনের সার্টিফিকেট গভজ্‌দেভ ওকে পাঠিয়েছে শুনে কী চটেই না উঠল আনিউতা! আর ওরকম ভাবে পালিয়ে গিয়েছিল কেন সে, কোন কথা না বলে, চিঠি না লিখে, ঠিকানা না জানিয়ে! সামরিক গুপ্ত কথা গোছের ব্যাপার না কি? কিছু না বলে, কিছু না লিখে চলে যাওয়াটা বুঝি সামরিক গুপ্ত কথার রেওয়াজ?

'ভালো কথা, ও দাড়ি রাখছে সেটা এত জোর দিয়ে কেন বলছিলেন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইল আনিউতা।

'এমনি বলে ফেলেছিলাম, কিছু নয় ওটা,' এড়িয়ে যাবার মত করে বলল আলেক্সেই।

'না, ঠিক বলুন ত! না বললে আপনাকে ছাড়ছি না। ওটাও কি সামরিক গুপ্ত কথা?'

'তা নয় নিশ্চয়। আমাদের অধ্যাপক ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ... মানে... বলেছিলেন দাড়ি রাখতে এই আর কি... যাতে মেয়েরা মানে বিশেষ একটি মেয়ে, ওকে বেশী পছন্দ করে।'

'ও, তাই বুঝি! এখন ব্যাপারটা সাফ হল!'

আনিউতার সবজে চোখের জ্যোতি হঠাৎ মিলিয়ে গেল, মনে হল বয়স বেড়ে গিয়েছে। মুখের পাণ্ডুর ভাব হল স্পষ্টতর, পাতলা বলিরেখা — এত সূক্ষ্ম যে মনে হয় ছুঁচ দিয়ে আঁকা — দেখা গেল কপালে, চোখের কোণে; জীর্ণ পুরোনো টিউনিক, গাঢ় কটা চুলের উপরে বাহিনীর মলিন টুপি, সব মিলিয়ে ওকে দেখাল ক্লান্ত শ্রান্ত। শুধু ছোট ভরাট উজ্জ্বল লাল ঠোঁটজোড়া, গোঁফের অতি সূক্ষ্ম আভাস, আর উপরের ঠোঁটে ছোট্ট তিলটি দেখে বোঝা যায় তার বয়স এখনো কম, খুব বেশী হলে বিশ।

জমকালো নানা বাড়ি, তাদের ছায়ার নিচে প্রশস্ত রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে যেতে রাস্তা ছেড়ে কয়েক পা এগোল, সামনে দেখা গেল ছোটখাটো একটা বাড়ি, ছোট জানলাগুলো জরায় জীর্ণ; এরকম মস্কোতে দেখা যায়। এমন একটা বাড়িতে আনিউতা থাকে। সংকীর্ণ সিঁড়ি হয়ে ওরা গেল উপর তলায়, সিঁড়িতে বেড়াল আর কেরোসিনের গন্ধ। চাবি দিয়ে দরজা খুলল আনিউতা। অপরিসর প্রবেশপথে ঠাণ্ডায় রাখা খাবারদাবারের থলে, টিনের পাত্র কয়েকটা আর কৌটো, সেগুলো পেরিয়ে ওরা ঢুকল একটা বড়ো, শূন্য

রান্নাঘরে, ছোট বারান্দা হয়ে থামল একটা নিচু দরজার সামনে। অন্য দিকের দরজা দিয়ে মাথা বের করল ছোটখাটো শীর্ণা একটি বৃদ্ধা।

'আন্না দানিলভনা তোমার একটা চিঠি আছে,' বলল সে। ঘরে ঢোকা না পর্যন্ত সকৌতূহল ওদের দেখে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আনিউতার বাবা একটা ইনস্টিটিউটে পড়ান। ইনস্টিটিউটের লোকজন সরাবার সময়ে ওর বাবা-মাও চলে যান। দুটো ঘর লিনেন দিয়ে ঢাকা আসবাবপত্রে বোঝাই, আসবাবের দোকানের মত, রয়ে গেল মেয়ের তদারকে। আসবাবপত্রে, দরজা আর জানলায় ভারী পুরোনো পর্দায়, দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোতে, ছোট ছোট প্রতিমূর্তিতে আর পিয়ানোর উপরে রাখা ফুল-দানিতে ছাতা-ধরা বিষণ্ণ গন্ধ একটা।

'সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, কিছু মনে করবেন না। আমি হাসপাতালে থাকি আর সেখান থেকে সোজা যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে মাঝেমাঝে শুধু আসি,' লজ্জায় লাল হয়ে উঠে আনিউতা বলল, টেবিলের উপরে ছড়ানো জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি সরাতে গিয়ে টেবিল-ঢাকনাটাও তুলে নিয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল, টেবিল-ঢাকনাটা পেতে পাড়গুলো সযত্নে ঠিক করল।

'এখানে আসার সুযোগ পেলেও এত ক্লান্ত থাকি যে কোনক্রমে সোফার কাছে শরীরটাকে টেনে গিয়ে জামাকাপড় না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়ি। তাই গোছাবার সময় বিশেষ পাই না!'

কয়েক মিনিট পরে বৈদ্যুতিক কেটলির গান শুরু হল; টেবিলে ঝকঝক করছে রঙ-চটা পুরোনো চীনে মাটির কাপ, চীনে মাটির তৈরী রুটির প্লেটে গমের পাঁউরুটির পাতলা ফালি কয়েকটা, আর চিনি-দানির একেবারে তলায় চিনির ছোট ছোট টুকরো। পশমের থোপনার ঢাকনির নিচে কেটলিতে চা ভিজছে, গত শতাব্দীর জিনিস সেটাও। চায়ের সুগন্ধে ঘরটা ভরে গিয়েছে, যুদ্ধের আগের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় সে গন্ধ। টেবিলের মাঝখানে একটা না-খোলা নীলচে বোতল, পাতলা হাতলহীন দুটো পানপাত্র দুদিক থেকে পাহারা দিচ্ছে সেটাকে।

মখমলে-মোড়া বড়ো একটা কেদারায় মেরেসিয়েভ বসেছে। সবুজ মখমলের আস্তরণ ভেদ করে উঁকি মারছে এত বেশী তুলো যে চেয়ারের পিছনে আর সিটে সযত্নে লাগানো কাজ-করা পশমের মোটা কম্বলগুলোও

সেগ‌ুলো ঢাকতে অক্ষম। কিন্তু চেয়ারটা এত আরামদায়ক, এত যত্নে আর মোলায়েমভাবে লোকজনকে গ্রহণ করে যে আলেক্সেই গা এলিয়ে দিল তাতে তৎক্ষণাৎ, ক্লান্ত টনটনে পাদ‌ুটো দিল ছড়িয়ে।

তার পাশে ছোট একটা টুলে বসে, ছোট মেয়ের মত ওর ম‌ুখের দিকে তাকিয়ে আনিউতা গভজ্‌দেভের বিষয়ে আবার ওকে জিজ্ঞাসাবাদ শ‌ুর‌ু করল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে গ‌ৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব তার, তাড়াতাড়ি উঠে নিজেকে বকে আলেক্সেইকে টেনে নিয়ে গেল টেবিলে।

'এক গেলাস ভদকা খাবেন? গ্রিশা বলেছিল যে ট্যাংক-বাহিনীর লোকেরা, বৈমানিকেরাও, অবশ্য ...'

আলেক্সেইকে একটা গেলাস ঠেলে দিল আনিউতা। আড়াআড়িভাবে ঘরে এসেছে স‌ূর্যের উজ্জ্বল আলো, ঝিকঝিক করে উঠল ভদকার নীলচে আভা। মদের গন্ধে আলেক্সেই'র মনে পড়ল দ‌ূর বনে বিমান-ঘাঁটিটির কথা, অফিসারের মেস, নৈশভোজনের সময়ে "বরাদ্দ ইন্ধন" দেওয়া হয়েছে আর সবাই খ‌ুসিতে গ‌ুনগ‌ুন করছে। অন্য গেলাসটা শ‌ূন্য রয়ে গেল দেখে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করল:

'আপনি খাবেন না?'

'আমি মদ খাই না,' সরলভাবে জবাব দিল আনিউতা।

'কিন্তু ধর‌ুন, যদি গ্রিশার স্বাস্থ্যকামনা করে খাই?'

আনিউতা হাসল, কোন কথা না বলে গেলাসটি ভরে নিয়ে, পাতলা ডাঁটিটি ধরে আলেক্সেই'র গেলাসের সঙ্গে ঠেকাল, কী যেন ভেবে বলল:

'ওর কুশল কামনা করি!' বেশ কায়দায় গেলাসটা তুলে এক ঢোঁকে শেষ করল সেটা, সঙ্গে সঙ্গে শ‌ুর‌ু হল কাশি, বিষম লেগেছে। ম‌ুখ রক্তিম, দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

অনেকদিন ভদকা খায়নি মেরেসিয়েভ, মদটা মনে হল সটান মাথায় চড়েছে, সমস্ত শরীর গরম হয়ে উঠল। গেলাসদ‌ুটো আবার ভর্তি করল সে, কিন্তু দ‌ৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল আনিউতা।

'না না, মদ আমি খাই না। কী হল দেখলেন ত!'

'কিন্তু আমার সৌভাগ্য কামনা করে খাবেন না?' জোর দিয়ে বলল আলেক্সেই। 'যদি আপনি জানতেন, আনিউতা, কত দরকার আমার শ‌ুভেচ্ছার!'

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ওর দিকে তাকিয়ে গেলাস তুলল আনিউতা, হেসে

ওর দিকে মাথা নেড়ে, কনুই'এ ওকে আলগা চাপ দিয়ে শূন্য করল গেলাসটা: কিন্তু এবারেও বিষম লেগে কেশে উঠল সে।

'কী করছি, বলুন ত?' দম ফিরে এলে বলে উঠল আনিউতা। 'আর টানা চব্বিশ ঘণ্টা খাটার পর খাচ্ছি! শুধু আপনার জন্যে এটা করলাম, আলিওশা... আপনি... আপনার কথা গ্রিশা অনেক লিখত... আপনার সৌভাগ্য কামনা করি, বিশেষভাবে কামনা করি! আর আপনার যে ভালো হবে, আমার কোন সন্দেহ নেই তাতে। শুনছেন কী বললাম? আমার কোন সন্দেহ নেই!' আর খুসির হাসিতে উচ্চকিত হয়ে উঠল আনিউতা। 'কিন্তু আপনি ত খাচ্ছেন না! কিছু রুটি নিন। লজ্জা করবেন না। আরো আছে আমার। এটা কালকের রুটি। আজকের বরাদ্দ এখনো পাইনি।' চীনেমাটির রুটির প্লেটটা এগিয়ে দিল সে, পনীরের মত পাতলা করে কাটা রুটির ফালিগুলো। 'খান, নইলে মাতাল হয়ে যাবেন, তখন আপনাকে নিয়ে কী করব?'

রুটির প্লেটটা সরিয়ে দিয়ে সোজাসুজি আনিউতার সবজে চোখ আর ছোট ভরাট টুকটুকে ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় আলেক্সেই বলল:

'আপনাকে চুমু খেলে কী করবেন?'

ভীত দৃষ্টিতে তাকাল আনিউতা, তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। মুখে তার রাগের ভাব নেই, শুধু জিজ্ঞাসা আর হতাশা; এক মুহূর্ত আগে দামী জহরতের মত দূরে চিকচিক করছিল যে জিনিসটা এখন দেখা গেল সাধারণ কাচের টুকরো, এমনভাবে তাকিয়ে রইল আলেক্সেই'র দিকে।

'খুব সম্ভব আপনাকে তাড়িয়ে দেব আর গ্রিশাকে লিখব যে লোক চেনে না সে,' কঠোর সুরে বলল আনিউতা। আবার ওর দিকে রুটির প্লেটটা ঠেলে দিয়ে জোর দিয়ে বলল, 'কিছু খান, আপনার নেশা হয়েছে!'

মেরেসিয়েভের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আর সেটা করাই ত আপনার উচিত! ধন্যবাদ সেজন্যে! সারা সোভিয়েত বাহিনীর হয়ে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে! গ্রিশাকে লিখে জানাব যে সে লোক চেনে!'

প্রায় তিনটে পর্যন্ত ওদের গল্প চলল, ধূলিজালে আড়াআড়িভাবে আসা সূর্যের রেখা তখন গুঁড়ি দিয়ে দেয়ালে উঠছে। ট্রেন ধরবার সময় এসে পড়েছে আলেক্সেই'র। বিষণ্ণভাবে অনিচ্ছায় সবুজ মখমলের কেদারা ছেড়ে উঠল সে, কোটে লেগে রইল কিছুটা ছোবড়া। স্টেশন পর্যন্ত গেল আনিউতা।

হাত ধরাধরি করে দুজনে যাচ্ছে, আর জিরোবার পর এত স্বচ্ছন্দে হাঁটছে আলেক্সেই যে আনিউতা মনে মনে বলল, "বন্ধুর পায়ের পাতা নেই সেটা কি গ্রিশা ঠাট্টা করে লিখেছিল?" যে বেজ হাসপাতালে সে আর অন্যান্য ডাক্তারী ছাত্রছাত্রীরা কাজ করে, আহতদের বাছাই করার কাজ, তার কথা বলল আলেক্সেইকে। কাজের চাপ বেশ, কেননা প্রতিদিন দক্ষিণ থেকে ট্রেন বোঝাই আহত আসছে। আর তারা কী অদ্ভুত লোক, বীরের মত কেমন নিজেদের যন্ত্রণা সহ্য করে! হঠাৎ নিজেকে বাধা দিয়ে বলল আনিউতা:

'গ্রিশা দাড়ি রাখছে, সেটা ঠাট্টা করে বলেননি ত?' চুপ করে কী যেন ভেবে, তারপর বলল, 'সব বুঝতে পারছি এখন। আপনাকে সত্যি করে বলছি, যেমন বাবার কাছে বলি — প্রথম প্রথম ওর ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকালেই অসহ্য লাগত। অসহ্য নয়, কথাটা ঠিক হল না। মানে, ভয় করত। না সেটাও ঠিক নয়... কী করে বোঝাই জানি না। আপনি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? ওরকম করাটা হয়ত আমার উচিত হয়নি, কিন্তু কী করব বলুন! কিন্তু তাই বলে আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল! বোকার মত! সত্যি, কী বোকা লোক! ওকে চিঠি লিখলে জানিয়ে দেবেন ত যে আমার খুব খারাপ লেগেছে, ওর ব্যবহারে অত্যন্ত আহত আমি।'

বিরাট রেলওয়ে স্টেশনটির সবটাই প্রায় সৈন্যে বোঝাই। কেউ তাড়াহুড়ো করে ভারার্পিত কাজে যাচ্ছে, অন্যরা নিঃশব্দে দেয়ালের পাশে রাখা বেঞ্চিতে কিম্বা কিট-ব্যাগের উপরে বসে আছে, কেউ বা মেঝেতে, ভ্রূকুটিকুটিল চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, মনে হচ্ছে সবায়ের মাথায় একটি মাত্র কথা। এক সময়ে এই লাইনটি ছিল পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে প্রধান যোগসূত্র। এখন মস্কো থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম-মুখো রাস্তাটি শত্রুপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে। লাইনটির সংক্ষিপ্ত বাকি অংশে এখন শুধু সৈন্যবোঝাই ট্রেন যাতায়াত করে, দুঘণ্টার মধ্যেই রাজধানী থেকে সৈন্যরা তাদের নিজ নিজ ডিভিশনের দ্বিতীয় পঙক্তিতে পৌঁছয়, ডিভিশনগুলো সেখানকার প্রতিরোধ ঘাঁটি রক্ষা করছে। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর বৈদ্যুতিক ট্রেনে উপকণ্ঠ থেকে এসে প্ল্যাটফর্মে ভিড় করে নামে শ্রমিকেরা আর কৃষাণীরা, শেষোক্তেরা আনে দুধ, ফল, ব্যাঙের ছাতা আর শাকসব্জি। কিছুক্ষণ তাদের ভিড়ে আর হৈচৈতে ভরে যায় রেলওয়ে স্টেশনটি, তারপর তারা ছড়িয়ে পড়ে স্কোয়ারে: তখন স্টেশনটি থাকে শুধু বাহিনীর লোকেদের হাতে।

স্টেশনের প্রধান হলটিতে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের একটি বিরাট

মানচিত্র দেয়াল জুড়ে টাঙ্গানো। সামরিক পোশাক গায়ে টুকটুকে গাল মোটাসোটা একটি মেয়ে মইতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে, পিনে আটকানো একটা তার দিয়ে কোথায় যুদ্ধ চলেছে দেখাচ্ছে। তার হাতের খবরের কাগজে সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের সর্বশেষ ইস্তাহার।

মানচিত্রের নিম্নাংশে তারটা হঠাৎ মোড় নিয়েছে ডানদিকে। দক্ষিণে জার্মানরা এগোচ্ছে। ইজিউম-বারভেন্‌কভো এলাকায় তারা প্রতিরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। ওদের ষষ্ঠ, বাহিনী দেশের বুকে মোটা গোঁজ বিঁধে দনের নীল শিরার দিকে অগ্রসর। দনের লাইনের কাছাকাছি তারটি বাঁধল মেয়েটি। বেশ কাছে বঙ্কিম রেখায় চলেছে ভলগার মোটা ধমনী, স্তালিনগ্রাদ বড়ো বৃত্ত দিয়ে ঘেরা, তার উপরে একটা বিন্দু, কামিশিন সেটা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দনকে আঘাত করেছে শত্রুপক্ষের যে গোঁজ সেটা এগিয়েছে প্রধান ধমনীটির দিকে, ইতিমধ্যে খুব কাছে এসে পড়েছে। গভীর স্তব্ধতা, অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে, মই'এ আরোহী মেয়েটি উদ্যত তাদের উপরে, মোটাসোটা হাতে পিনগুলোর জায়গা বদলাচ্ছে, সবাই দেখছে তাকে। নবীন সৈনিক একজন, মুখ তার ঘর্মাক্ত, ভাঁজ না পড়া নতুন বড়ো আর্মিকোট কাঁধ থেকে আড়ষ্টভাবে ঝুলছে, বিষণ্ণভাবে আপন মনে বলে উঠল:

'হারামীরা বেশ জোরে এগোচ্ছে... কেমন এগোচ্ছে দেখো।' দীর্ঘাকৃতি রোগা পাকা গোঁফ রেলকর্মী একজন, মাথায় রেলকর্মীর চটচটে টুপি, ভ্রূকুটি করে তাকাল সৈনিকটির দিকে, গরগর করে বলল:

'এগোচ্ছে, বটে! কিন্তু ওদের এগোতে দিচ্ছ কেন? তোমরা পিছু হটে এলে ওরা ত এগোবেই! খাসা লড়ুয়ে তোমরা! কোথায় এসে পড়েছে দেখো ত! প্রায় ভলগা পর্যন্ত!' কণ্ঠস্বরে ব্যথা আর বিষাদ, কোন সাঙ্ঘাতিক অমার্জনীয় ভুল করে ফেললে বাপ ছেলেকে যেমন করে ধমকায় তেমন তার কণ্ঠস্বর।

অপরাধীর মত ফিরে তাকাল সৈনিকটি, ডাহা নতুন আর্মিকোটটা ঠিক করে বসানোর জন্য ঘাড় নিচু করে, ভিড় ঠেলে বেরিয়ে চলল সে।

'ঠিক বলছে! আমরা অনেকটা জায়গা ছেড়ে এসেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আর একজন, তিক্তভাবে মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'আঃ!'

ক্যাম্বিসের ধূসর কোট পরনে একটি বৃদ্ধ এবার — হয়ত গ্রামের স্কুলে পড়ায়, গ্রামের ডাক্তার হয়ত বা — সৈনিকটির পক্ষ নিল:

'ওকে দোষ দিচ্ছ কেন?.. ওর দোষ কী? এরি মধ্যে ওদের কতজনে না মারা গিয়েছে! যেটা আমাদের ঠেলে নিয়ে আসছে সেটার চেহারাটা

একবার দেখো ত! সারা ইউরোপ, তাও আবার ট্যাংক চেপে! ঝট করে সেটাকে আটকাবে কী করে? সত্যি বলছি, হাঁটু গেড়ে বসে ওই ছোকরাটিকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে আমরা এখনো বেঁচে আছি, স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করছি মস্কোতে। ভেবে দেখো না একবার, ফ্যাশিস্টরা এক হপ্তার মধ্যে কটা দেশকে ট্যাংক দিয়ে দলাইমলাই করে দিয়েছে! আর আমরা এক বছরের বেশী লড়াই করে চলেছি, পাল্টা আক্রমণও চালাচ্ছি, শুইয়ে দিয়েছি ওদের কত লোককে! সারা পৃথিবীর উচিত ছোকরাটির কাছে হাঁটু গেড়ে বসা। আর তুমি বলছ হটে এসেছে।'

'জানি, জানি, ভগবানের দোহাই, আমার কাছে প্রচার বাণী চালাতে হবে না! বুদ্ধি দিয়ে বুঝি সব কিন্তু আমার বুক ফেটে পড়ছে প্রায়!' রেল-কর্মীটি জবাবে বলল বিষাদভারী সুরে। 'জার্মানরা আমাদের দেশকেই ত পদদলিত করছে, ধ্বংস করছে আমাদেরই বাড়িঘরদোর!'

'ও কি ওখানে?' মানচিত্রের দক্ষিণাংশের দিকে আঙুল দেখিয়ে আনিউতা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। আর ওলিয়াও ওখানে,' জবাবে বলল আলেক্সেই।

ঠিক ভলগার নীল ফাঁসে, স্তালিনগ্রাদের উপরে চোখে পড়ল একটি ফুটদাগ, লেখা আছে "কামিশিন," মানচিত্রে ফুটদাগ শুধু নয়, তার কাছে সেটা আরো কিছু। চোখের সামনে এল ছোট সবুজ সহরটার ছবি, ঘাসে-ভরা সহরতলির রাস্তা, চকচকে ধুলো-মাখা পাতায় নড়ছে পপলারগাছগুলো, কঞ্চির বেড়া দেওয়া সব্জীর বাগান থেকে আসছে ধুলো, শাক আর পার্সলির গন্ধ, গোল গোল, ডোরা-কাটা তরমুজ, মনে হচ্ছে শুকনো পাতায় শুকনো মাটিতে কেউ ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের, সোমরাজের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরপুর স্তেপের হাওয়া, নদীর ঝকঝকে প্রসার, ছিপছিপে, ধূসর-চোখ রোদে-তামাটে একটি মেয়ে, আর ওর মা, চুল পেকে গিয়েছে তাঁর, অসহায়ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন...

'ওরা দুজনেই ওখানে.' আবার বলল আলেক্সেই।

২

মস্কোর উপকণ্ঠ হয়ে ছুটেছে বৈদ্যুতিক ট্রেন, চাকাগুলো ফুর্তিতে খটখট সুর ভাঁজছে, রাগের সুরে বাজছে ইঞ্জিনের বাঁশী। জানলার ধারে বসে মেরেসিয়েভ, একটি বৃদ্ধ তাকে দেয়াল ঠেসা করেছে; বৃদ্ধটির দাড়ি-

গোঁফ কামানো, মাথায় চওড়া মাক্সিম গোর্কি টুপি, কালো সুতোয় বাঁধা সোনার রিমের প্যাঁস্‌নে চোখে। হাঁটুর মধ্যে বসানো কোদাল, শাবল আর উকনঠেঙ্গো, খবরের কাগজে সযত্নে মোড়া আর সুতো দিয়ে বাঁধা সেগুলো।

কঠিন দিনগুলোতে সবাই যুদ্ধের কথা ভাবছে, বৃদ্ধও ব্যতিক্রম নয়। মেরেসিয়েভের নাকের সামনে নিজের শীর্ণ হাত সজোরে নেড়ে, গুরুত্বপূর্ণ-ভাবে তার কানে ফিসফিসিয়ে সে বলল:

'অসামরিক লোক বলে আমাদের পরিকল্পনা বুঝি না, সেটা মনে কোরো না যেন। সব বুঝি আমি। মতলবটা হল শত্রুদের ভুলিয়ে ভলগার স্তেপে এনে ফেলা। হ্যাঁ' ওদের যোগাযোগের পথ যাতে আরো লম্বা হয়, যাতে, আজকালকার ভাষায়, পিছনের ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়, আর তারপর ওখান থেকে, পশ্চিম আর উত্তর থেকে ওদের যোগাযোগ ছিন্ন করে একেবারে ধূলিসাৎ করে দেওয়া। হ্যাঁ। আর পরিকল্পনাটি খাসা। শুধু হিটলার আমাদের বিরুদ্ধে নয়। ও সারা ইউরোপকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে। ছটি দেশের সঙ্গে আমরা একলা লড়ছি। একলা! অন্তত জায়গা ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে ওদের আঘাতের শক্তি ভোঁতা করে দিতে হবে আমাদের। হ্যাঁ। একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি সেটা। তাছাড়া আমাদের মিত্রেরা ত চুপচাপ বসে আছে, তাই না? কী মনে হয় আপনার?'

'মনে হয় যা-তা বকছেন আপনি। আমাদের দেশটা ফেলনা নয় যে ধাক্কা সামলাবার গদি হিসেবে ব্যবহার করব সেটাকে,' বিরস সুরে জবাব দিল মেরেসিয়েভ; শীতকালে জনশূন্য দগ্ধ পোড়া যে গ্রামটি হামাগুড়ি দিয়ে পেরিয়ে এসেছিল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেটার কথা।

কিন্তু বুড়ো কানের কাছে বকবক করেই চলল, তামাকের আর বার্লি কফির গন্ধ লাগছে মুখে।

জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে রইল আলেক্সেই, ধুলো-ভরা গরম হাওয়ার ঝটকা মুখে লাগছে, ব্যগ্র চোখে দেখছে, রংচটা সবুজ বেড়ায় ঘেরা আর তক্তা আঁটা রঙীন দোকান সুদ্ধ স্টেশনগুলো একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবুজ বন থেকে উঁকি মারছে কুটিরগুলো, শুষ্ক ছোট ছোট স্রোতধারার মরকত-নীল পাড়, সূর্যাস্তের আলোয় রজনের মত জ্বলছে পাইনগাছের মোমবাতির মত গুঁড়ি আর বনের ওপারে প্রদোষে জমির নীল প্রসার।

'...আপনি ত বাহিনীর লোক, বলুন ত ঠিক বলছি কি না! এক বছরেরও বেশী আমরা একলা ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে লড়ছি। কেমন ধরনের ব্যাপার সেটা,

বলুন ত? আমাদের মিত্রেরা কই, কই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট? একবার ভাবুন ত: একজন লোক নিশ্চিন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, হঠাৎ তাকে ডাকাতে চড়াও করল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিল না লোকটা। ডাকাতগুলোর সঙ্গে লড়াই চালাল। সমস্ত শরীর দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝড়ছে, কিন্তু হাতের কাছে যা অস্ত্র পেল তাই দিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। অনেকের বিরুদ্ধে একজন, ওরা সশস্ত্র, অনেক দিন ধরে ওঁৎ পেতে বসেছিল ওর জন্য। হ্যাঁ। আর প্রতিবেশীরা দেখল ব্যাপারটা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তারা সহানুভূতি জানাচ্ছে, উৎসাহ দিয়ে বলছে: "সাবাস লেড়কা, ঠেঙ্গাও ওদের, কষে ঠেঙ্গাও!" কোথায় এগিয়ে এসে সাহায্য করবে তা না, লোহা আর পাথরের টুকরো দিতে চায় আর বলে এই যে, দেখো! এই দিয়ে মারো ওদের, আরো জোরে মারো! কিন্তু নিজেরা লড়াই করছে না। হ্যাঁ। আমাদের মিত্রদের ব্যবহার ঠিক এরকম। দর্শক শুধু সবাই ওরা...'

ঘুরে সাগ্রহে বৃদ্ধের দিকে তাকাল মেরেসিয়েভ। ভিড়ে ঠেসা কামরাটায় অন্যান্য অনেক যাত্রীও ওদের দিকে তাকিয়ে আছে: চারদিক থেকে শোনা গেল:

'হ্যাঁ, ঠিক কথা! আমরা একলা লড়ছি! দ্বিতীয় ফ্রণ্টের কী হল?'

'যাক গে! এই কাজ আমরা একলাই করব। সবকিছু শেষ হয়ে গেলে ওরা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!'

কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন থামল। কামরায় ঢুকল পায়জামা-পরা কয়েকটি আহত লোক, ক্রাচে ভর দিয়ে কেউ, কেউ বা ছড়িতে, প্রত্যেকের হাতে কাগজের ঠোঙায় সূর্যমুখীর বীজ কিম্বা বেরি। ওরা নিশ্চয়ই কোন স্বাস্থ্যাগার থেকে এসেছে এখানকার বাজারে।

প্যাঁসনে-পরা বৃদ্ধটি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে লাল-চুল, এক পায়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, ক্রাচ-হাতে একটি ছেলেকে প্রায় জোর করে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিল।

'বোসো এখানে, বাছা, এখানে বোসো!' বলল সে। 'আমার জন্যে ভেবো না। আমি শীগগিরই নেমে যাব।'

আর সত্যি যে নেমে যাবে সেটা প্রমাণ করার জন্য বৃদ্ধ দরজার কাছে গেল। গয়লানীরা নিজেরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আহতদের জন্য জায়গা করে দিল। আলেক্সেই'র কানে এল পিছনে নারীকণ্ঠে নিন্দে করে কে যেন বলছে:

'ওর লজ্জা হওয়া উচিত, আহত লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, জায়গা

দিচ্ছে না তাকে! বেচারার পাটা ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না লোকটা! বসে আছে গ্যাঁট হয়ে, নিজের কিছু হয়নি, গুলি যেন কখনো লাগবে না গায়ে! বিমান বাহিনীর অফিসার আবার!'

অকারণ ভর্ৎসনায় লাল হয়ে উঠল আলেক্সেই। রাগে নাসারন্ধ্র কাঁপছে। কিন্তু হঠাৎ স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে উঠে বলল:

'ওহে ছোকরা, বোসো এখানে।'

আহত লোকটি থতমত খেয়ে হটে গেল।

'না, ধন্যবাদ, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, ঠিক আছে, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। বেশী দূর যাচ্ছি না। মাত্র দুটো স্টেশন।'

'বসে পড়ো বলছি!' কৃত্রিম কঠোর সুরে বলল আলেক্সেই, পরিস্থিতিটা একটু মজার মালুম হল।

কামরার পাশে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দুহাতে ছড়িটায় ভর দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল আলেক্সেই। চৌখুপী রুমাল মাথায় বুড়ীটি স্পষ্টত বুঝতে পারল যে মিছিমিছি ওকে বকেছে, ওর বকুনি শোনা গেল আবার:

'ওদের দেখ একবার! শুনছ, ওহে, টুপিওয়ালা শ্রীমতি! রাজকুমারীর মত বসে আছে দেখছি! ছড়ি-হাতে অফিসারটিকে বসার জায়গা দাও না! আপনি এখানে চলে আসুন, কমরেড অফিসার, আমার জায়গায় বসতে পারেন। দোহাই তোমাদের, ওকে পথ ছেড়ে দাও!'

কথাটা যেন কানে যায়নি ভান করল আলেক্সেই। একটু আগে মজা লাগছিল, সে ভাবটা আর নেই। ঠিক সে সময়ে মেয়ে-কণ্ডাকটরটি যে স্টেশনে ওকে নামতে হবে তার নামটা হাঁকল, ট্রেন আস্তে আস্তে থামল। ভিড় ঠেলে আলেক্সেই প্যাঁসনে-চোখে বৃদ্ধটির কাছে এসে পড়ল। ওর দিকে মাথা নেড়ে, যেন অনেক দিনের আলাপী লোক, বৃদ্ধ ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'কী মনে হয় আপনার শেষ পর্যন্ত, ওরা কি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলবে?'

'না খোলে আমরাই চালিয়ে নেব,' কাঠের প্ল্যাটফর্মে নামতে নামতে জবাব দিল আলেক্সেই।

চাকার ঘড় ঘড়, ইঞ্জিনের বাঁশীর তীক্ষ্ণ ডাক, মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রেনটা, পিছনে রেখে গেল ধুলোর পাতলা রেশ। কয়েকজন মাত্র যাত্রী; প্ল্যাটফর্মে অল্পক্ষণের মধ্যে নামল সন্ধ্যার সুগন্ধি স্তব্ধতা। যুদ্ধের আগে জায়গাটি নিশ্চয়ই খাসা আর আরামী ছিল। পাইনের বন স্টেশন ঘেঁষে এসেছে, গাছের চূড়োগুলো মোলায়েম ছন্দে দুলছে। দু'বছর আগে এরকম

মনোরম সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই লোকেরা দলে দলে স্টেশন ছেড়ে অলিগলি হয়ে ছায়াচ্ছন্ন বনের পথ ধরে যেত বাগান-বাড়িতে — গ্রীষ্মের পাতলা ফ্রকে সাজগোজ করা মেয়েরা, মুখর বাচ্চার দল আর উৎফুল্ল রোদে-তামাটে পুরুষ সহর থেকে ফিরছে, সঙ্গে খাবারদাবারের পার্সেল আর মদের বোতল। কোদাল, শাবল, উকনঠেঙ্গো আর বাগানের অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে অল্প কয়েকজন যারা ট্রেন থেকে আজ নামল তারা তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বনে ঢুকল, প্রত্যেকে নিজের ভাবনাচিন্তায় মগ্ন। মেরেসিয়েভকে দেখে মনে হচ্ছে ছুটিতে এসেছে, শুধু সেই ছড়ি হাতে সুন্দর গ্রীষ্ম সন্ধ্যাটি উপভোগ করার জন্য রয়ে গেল; সুগন্ধি হাওয়া বুক ভরে নিচ্ছে, পাইনগাছ ভেদ করে সূর্যের উষ্ণ আলো মুখে পড়াতে চোখ কোঁচকাচ্ছে।

স্বাস্থ্যাবাসে কী পথে যেতে হয় মস্কোতে মেরেসিয়েভকে বলা হয়েছিল, ওদের দেওয়া কয়েকটি পথ নির্দেশ চিহ্ন ধরে জায়গাটিতে পেঁছিতে পারল সে, খাস সৈনিক ত বটে।

বিপ্লবের আগে এখানে অভূতপূর্ব একটা গ্রীষ্ম প্রাসাদ বানাবার সংকল্প করেছিল রুশ কোটিপতি একজন। স্থপতিকে সে জানায় যে খরচাই লাগুক কিছু এসে যায় না, জিনিসটা অসামান্য হওয়া চাই। আর তাই পৃষ্ঠপোষকের খেয়াল মেটাবার জন্য স্থপতি হ্রদের ধারে ইঁটের বিরাট একটা বাড়ি বানায়, জাফরি-বসানো জানলা, গম্বুজ আর মিনার, দেয়ালের পোস্তা আর দরদালান! খাস রুশ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে, এখন আগাছায় আচ্ছন্ন হ্রদের তীরে আজব বাড়িটা কুৎসিৎ কলঙ্ক চিহ্নের মত। আর প্রাকৃতিক দৃশ্যটা সত্যিই সুন্দর। হ্রদের জল আবহাওয়া ভালো থাকলে কাচের মত মসৃণ, ধারে এক ঝাড় নবীন এ্যাসপেনগাছ, পাতাগুলো কাঁপছে। এখানে সেখানে আগাছা ভেদ করে সটান উঠেছে বার্চগাছের ফুটফুট দাগওয়ালা গুঁড়ি, হ্রদটি ঘিরেছে প্রাচীন বনের বিস্তৃত, নীলচে, মাঝেমাঝে করাতের মুখের মত কাটা-কাটা বৃত্ত। জলের ঠাণ্ডা স্তব্ধ নীলচে বুকে উল্টোভাবে প্রতিবিম্ব পড়েছে সবকিছুর।

বহু বিখ্যাত চিত্রকর অনেক দিন কাটিয়েছেন এ জায়গায়; আতিথেয়তার জন্য সারা রাশিয়ায় নাম ছিল মালিকটির। আর এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, সবটা কিম্বা আংশিকভাবে, উত্তর কালের জন্য এঁকেছেন অনেকে, রুশ দৃশ্যপটের বিরাট স্নিগ্ধ মহিমার উদাহরণ হিসেবে।

প্রাসাদটি এখন সোভিয়েত বিমান বাহিনীর স্বাস্থ্যাবাস। যুদ্ধের আগে পরিবার নিয়ে এখানে আসত বৈমানিকরা। এখন আহত বৈমানিকদের

হাসপাতাল থেকে এখানে পাঠানো হয় ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য। এ্যাসফল্টের যে চওড়া রাস্তাটা বার্চের সারির মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরে স্বাস্থ্যাবাসে পৌঁছিয়েছে সেটা ধরল না আলেক্সেই, স্টেশন থেকে বনের মধ্যে দিয়ে যে পথটা সটান হ্রদে গিয়েছে সেটা ধরে এল। বলা যায়, পিছন থেকে এল: প্রবেশপথের সামনে দুটো বোঝাই বাস দাঁড়িয়ে, ভিড় করে চেঁচামেচি করছে অনেকে, তাদের মধ্যে ভিড়ে গেল সে।

কথাবার্তা, বিদায় সম্ভাষণ আর মঙ্গল কামনা চলেছে। বুঝতে পারল আলেক্সেই যেসব বৈমানিকরা স্বাস্থ্যাবাস ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে, বিদায় জানানো হচ্ছে তাদের। বিদায়োদ্যত বৈমানিকরা বেশ উত্তেজিত আর উৎফুল্ল, মেঘের পিছনে মৃত্যু ওঁৎ পেতে বসে আছে এমন জায়গায় যাচ্ছে না যেন, যেন শান্তিকালীন ঘাঁটিতে ফিরছে। যারা বিদায় জানাচ্ছে তাদের মুখে বিষণ্ণ, অসহিষ্ণু ভাব। অনুভূতিটা আলেক্সেই'র চেনা। দক্ষিণে বিরাট যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে সেই অদম্য আকর্ষণ সমানে তাকেও টানছে; যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এখন গুরুতর, সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণটাও তীব্রতর হয়েছে। সামরিক মহলে স্তালিনগ্রাদের কথা যখন উল্লেখ করা হয়, যদিচ সাবধানে আর ধীরে ধীরে, তখন অনুভূতিটা অদম্য আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, হাসপাতালে এই জোর করে চুপ করে বসে থাকাটা অসহ্য ঠেকে।

চকচকে বাসগুলোর জানলায় জানলায় রোদে-তামাটে উত্তেজিত মুখ। ছোটখাটো খোঁড়া একটি আরমেনিয়ান, মাথায় টাক, ডোরা-কাটা পায়জামা পরে বাসের চারিদিকে ব্যস্তসমস্তভাবে নেংচিয়ে নেংচিয়ে ঘুরছে। স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীদের দলে হামেশাই একজন করে রসিক আর হাস্যাভিনেতা থাকে, সবাই তাকে চেনেশোনে; আরমেনিয়ানটিও তাই। ছড়ি দুলিয়ে সে বিদায় সম্ভাষণ হাঁকছে:

'ফেদিয়া! আকাশে উড়ে ফ্যাশিস্টদের আমার সেলাম দিও! চান্দ্র স্নান চিকিৎসা শেষ করতে দেয়নি তোমাকে, সেজন্য উচিত শিক্ষা দিও ওদের! ফেদিয়া! ফেদিয়া! ওদের বুঝিয়ে দিও যে সোভিয়েত বৈমানিকদের চাঁদ-স্নান শেষ করতে না দেওয়াটা মোটেই ভদ্রজনোচিত নয়!'

গোলমাথা ফেদিয়া, বয়স কম, মুখটা রোদে-তামাটে, প্রশস্ত কপালে দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে জানাল যে সে তার কর্তব্য করবে, স্বাস্থ্যাবাসের চন্দ্র সমিতি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

ভিড়ের সবাই জোর গলায় হেসে উঠল, হাসির শব্দের মধ্যে বাসগুলো রওনা হল, আস্তে আস্তে গেটের দিকে যাচ্ছে ওরা।

'ভালো শিকার মিলুক! শুভ যাত্রা!' ভিড়ের সবাই চেঁচিয়ে বলল।

'ফেদিয়া, ফেদিয়া! যত শীগগির পারো তোমার ডাক-ঘরের ঠিকানাটা জানিও। জিনচ্‌কা রেজিস্ট্রি করে তোমার হৃদয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে!'

মোড়ের ওদিকে বাসগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। সূর্যাস্তের আলোয় সোনালী ধুলো নামল মাটিতে। ওভারঅল কিম্বা ডোরা-কাটা পায়জামা পরা স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীরা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে বাগানে ঘুরছে। দালানে গেল মেরেসিয়েভ, ক্লোক-রুমের আঁকড়ায় বৈমানিকদের নীল ফিতে দেওয়া ক্যাপ, দালানের কোণে মেঝেতে পড়ে রয়েছে স্কিটলস, বল, ক্রোকের হাতুড়ি আর টেনিস র‍্যাকেট। খোঁড়া আরমেনিয়ানটি তাকে নিয়ে গেল অফিস ঘরে। ওর মুখ বেশ চালাকচতুর; গম্ভীর সুন্দর বড়ো আর বিষণ্ণ চোখদুটো কাছ থেকে ভালো করে দেখল আলেক্সেই। যেতে যেতে আরমেনিয়ানটি ঠাট্টা করে জানাল যে চন্দ্র সমিতির সভাপতি সে নিজে; তার দৃঢ় মত, যে কোন রকমের ঘা শুকিয়ে যাবার প্রকৃষ্ট উপায় হল চন্দ্র স্নান, সেই চিকিৎসার জন্য চাই কড়া নিয়মানুবর্তিতা, চাঁদের আলোয় বেড়ানোর বন্দোবস্ত সে নিজে করে। মনে হয়, আরমেনিয়ানটি স্বতই ঠাট্টা করে চলে, মুখের গম্ভীরভাবের কোন পরিবর্তন হয় না, শ্রোতার মুখে দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে সাগ্রহে, জিজ্ঞাসুভাবে।

অফিস-ঘরে মেরেসিয়েভকে অভ্যর্থনা করল শাদা ওভারঅল গায়ে একটি মেয়ে, তার চুল এত লাল যে মনে হয় মাথায় আগুন লেগেছে।

'মেরেসিয়েভ?' যে বইটা পড়ছিল সেটা সরিয়ে রেখে কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি। 'মেরেসিয়েভ, আলেক্সেই পেত্রভিচ?' বৈমানিকের দিকে কঠিন দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল:

'আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না! এখানে লেখা আছে "মেরেসিয়েভ, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, ন-নম্বর হাসপাতাল, পায়ের পাতা কাটা..." আর আপনি...'

শুধু তখনি আলেক্সেই'র চোখে পড়ল আগুনের মত লাল চুলে প্রায় ঢাকা ওর গোলগাল শাদা মুখ — লাল-চুল মেয়েদের হামেশাই ওরকম মুখ হয়। নরম চামড়া রক্তাভ হয়ে উঠেছে। দীপ্ত বেয়াড়া চোখে সবিস্ময়ে মেয়েটি তাকিয়ে আছে আলেক্সেই'র দিকে।

'তবুও, আমিই আলেক্সেই মেরেসিয়েভ। এই দেখুন আমার কাগজপত্র... আপনার নাম কি লিওলিয়া?'

'না, কেন? আমার নাম জিনা।' সন্দিগ্ধভাবে আলেক্সেই'র পায়ের দিকে

তাকিয়ে মেয়েটি যোগ করল, 'আপনার নকল পাদুটো সত্যি সত্যি এত ভালো ... না ... ?'

'হ্যাঁ। তাহলে আপনিই সেই জিনচ্কা যার জন্যে ফেদিয়া পাগল!'

'ও, তাহলে মেজর বুর্নাজিয়ান এরিমধ্যে নানা বাজে গল্প করেছেন? লোকটাকে দুচক্ষে দেখতে পারি না। সবাইকে নিয়ে উনি মস্করা করেন। ফেদিয়াকে নাচতে শিখিয়েছিলাম আমি। তাতে এমন কি এসে যায়?'

'এখন তাহলে আমাকে নাচ শেখাবেন, কী বলুন? চন্দ্র-স্নানের জন্য বুর্নাজিয়ান আমার নাম লিখে নেবে কথা দিয়েছে।'

আরো অবাক হয়ে মেয়েটি আলেক্সেই'র দিকে তাকাল।

'কী বলছেন আপনি, নাচবেন? পা নেই, তবুও? বাজে কথা: মনে হচ্ছে আপনিও সবাইকে নিয়ে ঠাট্টা করতে চান।'

ঠিক সে সময়ে ঘরে দৌড়িয়ে এল মেজর স্ত্রুচকভ, গলা জড়িয়ে ধরল আলেক্সেই'র।

'জিনচ্কা! সব ঠিক তাহলে? সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট আমার ঘরে থাকবে।'

হাসপাতালে অনেকদিন একসঙ্গে কাটানোর পর আবার দেখা হলে লোকেরা ভাই'এর মত মেলে। মেজরকে দেখে বেজায় খুসি আলেক্সেই, যেন কতদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। স্বাস্থ্যাবাসে কিট-ব্যাগ রাখা হয়ে গিয়েছে স্ত্রুচকভের, ইতিমধ্যেই বেশ ঘরোয়া লাগছে তার। সবাইকে সে চেনে, সবাই তাকে চেনে, একদিনের মধ্যেই কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে, ঝগড়া করেছে কয়েকজনের সঙ্গে।

দুজনের ছোট ঘরটির জানলাগুলো বাগানের উপরে, একেবারে বাড়ি ঘেঁষে এসেছে দীর্ঘ ঋজু পাইনগাছগুলো, সবুজ বিলবেরির ঝোপ, একটা পাতলা পাহাড়ে এ্যাসগাছ, তা থেকে ঝুলছে সুন্দর নক্সা-করা কয়েকটি পাতা আর একটি মাত্র ভারী বেরির গোছা। রাত্রির স্বল্পাহারের পর শুয়ে পড়ল আলেক্সেই, নরম চাদরে গা এলিয়ে তক্ষুণি পড়ল ঘুমিয়ে।

সে-রাত্রে অদ্ভুত, গোলমেলে নানা স্বপ্ন দেখল আলেক্সেই। নীলচে বরফ। চাঁদের আলো। পাতলা লোমের জালের মত বন ঘিরেছে তাকে। জাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু বরফে পা আটকে গিয়েছে। দারুণ চেষ্টা করছে বেরিয়ে আসার, জানে কোন ভয়াবহ বিপদ উদ্যত, কিন্তু বরফে পাদুটো জমে গিয়েছে, ছাড়িয়ে নেবার শক্তি নেই। কাতরে উঠল ও, ছটফট করছে — এখন বনে আর নেই, বিমান-ঘাঁটিতে। ইউরা, সেই ঢেঙ্গা মিস্ত্রীটা,

অদ্ভুত নরম ডানাবিহীন একটি বিমানের ককপিটে বসে। হাত নাড়িয়ে হাসল সে, তীরের মত উঠল আকাশে। মিখাইল দাদু জড়িয়ে ধরলেন আলেক্সেইকে, যেন ও শিশু এমনভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কিছু ভেবো না· আমরা খাসা বাস্প-স্নান করব। বেড়ে হবে, তাই না?" কিন্তু গরম জলের বদলে ঠাণ্ডা বরফে শুইয়ে দিলেন তাকে। উঠবার চেষ্টা করল আলেক্সেই, কিন্তু আটকে গিয়েছে বরফে। না, বরফ নয়, ওর উপরে চেপে আছে উষ্ণদেহ ভালুক একটা, ঘোঁৎঘোঁৎ করছে, তার চাপে শরীর যাচ্ছে গুঁড়িয়ে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। জানলা দিয়ে খোশমেজাজে তাকিয়ে বাস বোঝাই বৈমানিক সব পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না তাকে। সাহায্যের জন্য আলেক্সেই চাইছে ওদের ডাকতে, চাইছে দৌড়িয়ে যেতে ওদের কাছে, অন্তত হাত দিয়ে ইসারা করতে, কিন্তু পারছে না। মুখ খুলল ও, শুধু ঘড়ঘড় আর ফিস্‌ফিস শব্দ। দম বন্ধ হয়ে এল, হৃৎস্পন্দন থেমে গিয়েছে মনে হচ্ছে, শেষ চেষ্টা করল আলেক্সেই, কী কারণে যেন ওর চোখের সামনে চকিতে এল আগুনের মত লাল চুলে ঘেরা জিনচ্‌কার হাসিমুখ, ওর বেয়াড়া, কৌতূহলী দুটো চোখ।

অদ্ভুত উৎকণ্ঠায় ঘুম ভেঙ্গে গেল আলেক্সেই'র। চারিদিক নিঝুম। মেজর ঘুমিয়ে আছে, নাক অল্প অল্প ডাকছে। ছায়ামূর্তির মত এক টুকরো চাঁদের আলো পড়েছে মেঝেতে। সেই সব ভয়াবহ দিন কেন ফিরে এসেছিল আবার? সে ত তাদের কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছে প্রায়, ভাবলেও অবাস্তব ঠেকে। ঠাণ্ডা সুরভি রাত্রির হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খোলা, চন্দ্রালোকিত জানলা দিয়ে আসছে নরম ঘুমন্ত ছন্দময় শব্দ, অস্থিরভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে কখনো, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনো আবার উচ্চগ্রামে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে, উৎকণ্ঠায় যেন গলা চেপে ধরেছে! বনের শব্দ।

বিছানায় উঠে বসে আলেক্সেই অনেকক্ষণ শুনল পাইনের রহস্যময় মর্মরধ্বনি। জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিল তারপর, ঘোর কাটাবার চেষ্টায় যেন, বলিষ্ঠ উৎফুল্ল ভাব ফিরে এল আবার। আটাশ দিন থাকতে হবে স্বাস্থ্যাবাসে, এ-কদিনে ঠিক হবে সে আবার বিমান চালাতে পারবে কিনা, পারবে কিনা লড়াই করতে আর বাঁচতে, আর তা না হলে অনুকম্পার দৃষ্টি সহ্য করে আজীবন কাটাতে হবে তাকে, ট্রামে বাসে উঠলে জায়গা ছেড়ে দেবে লোকে। সুতরাং এই দীর্ঘ অথচ সংক্ষিপ্ত আটাশ দিনের প্রতিটি মুহূর্ত লাগাতে হবে মানুষের মত মানুষ হবার সাধনায়।

মেজরের নাক ডাকছে, চাঁদের ভৌতিক আলো ঘরে; বিছানায় বসে

আলেক্সেই ব্যায়ামের একটা ছক মনে মনে বানাল। তাতে রইল সকাল আর সন্ধ্যার নানা ব্যায়াম কৌশল, হাঁটা, দৌড়, পায়ের জন্য বিশেষ ব্যায়াম, আর সবচেয়ে যেটা তার মনে লেগেছে, পায়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতিশ্রুতি যেটাতে আছে, জিনচ্কার সঙ্গে আলাপের সময়ে যে কথাটা তার মনে হয়েছিল সেটা।

আলেক্সেই ঠিক করল নাচ শিখবে।

৩

অগস্টের একটি পরিষ্কার প্রশান্ত অপরাহ্ন, চিকচিকে ঝকঝকে সবকিছু, হেমন্তের বিষণ্ন ছোঁয়াচ ইতিমধ্যেই অলক্ষিতে এসেছে উষ্ণ হাওয়ায়। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কুলকুল শব্দে এঁকেবেঁকে চলেছে একটি ছোট্ট নদী, বালুতীরে বসে রোদ পোয়াচ্ছে কয়েকজন বৈমানিক।

রোদের ঝাঁঝে ঝিমোচ্ছে তারা, এমন কি অক্লান্ত বুর্নাজিয়ান পর্যন্ত চুপচাপ বসে উষ্ণ বালি জড়ো করে ভাঙ্গা পায়ে রাখছে, ভালো করে সারেনি পাটা। হেজেলের ঝোপের ধূসর পাতার আড়ালে অলক্ষ্য তারা, কিন্তু নদীর তীরে সবুজ ঘাসে একটি পায়ে-চলা পথ তাদের চোখে পড়ে। পা নিয়ে ব্যস্ত বুর্নাজিয়ান উপর দিকে তাকাতে অদ্ভুত একটি দৃশ্য চোখে পড়ল।

পায়জামা প্যাণ্ট আর বুট পবে বন থেকে বেরিয়ে এল নবাগতটি, গতকাল এসেছে সে। চারিদিক তাকিয়ে দেখল কেউ নেই, তখন শরীরের পাশে কনুই চেপে বিচিত্রভাবে দৌড়তে শুরু করল সে। প্রায় দুশ মিটার দৌড়িয়ে হাঁটতে লাগল, ঘেমে নেয়ে উঠেছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। দম ফিরে এলে আবার দৌড়। ক্লান্ত ঘোড়ার গায়ের পাশের মত চকচক করছে তার শরীর। নিঃশব্দে বুর্নাজিয়ান সঙ্গীদের দৃশ্যটি দেখাল, ঝোপের আড়াল থেকে সবাই চেয়ে রইল দৌড়িয়েটির দিকে। সহজ ব্যায়ামে নবাগতটি হাঁপাচ্ছে, প্রায়ই যন্ত্রণায় শিঁটকে উঠছে মুখ, কাতরিয়ে উঠছে, কিন্তু দৌড়িয়ে চলেছে।

আর চুপ করে থাকতে না পেরে বুর্নাজিয়ান হাঁকল:

'ওহে, দোস্ত! জ্নামেন্স্কিরা শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না বুঝি!'

থমকে দাঁড়াল নবাগতটি। ক্লান্তি আর যন্ত্রণার ভাব মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। ঝোপের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে, কোন কথা না বলে চলে গেল বনে, একটু দুলে দুলে বিচিত্র হাঁটার ভঙ্গী ওর।

'লোকটা সার্কাসের খেলুড়ে না আধা-পাগল?' হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করল বুরুনাজিয়ান।

তন্দ্রা কেটে গিয়েছে মেজর স্ত্রুচকভের। বুঝিয়ে বলল সে:

'পায়ের পাতা নেই ওর। নকল পায়ে তালিম নিচ্ছে। জঙ্গী বিমান বাহিনীতে ফিরে যেতে চায়।'

ঝিমন্ত লোকগুলির মুখে যেন ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগল। তড়বড় করে উঠে বসে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল সবাই। যে লোকটিকে দেখে বিশেষ কিছু মনে হয়নি, হাঁটার বিচিত্র ভঙ্গীটি ছাড়া, তার পায়ের পাতা নেই শুনে সবাই এখন অবাক হয়ে গেল। জঙ্গী বিমান আবার চালাবার মতলবটা উদ্ভট, অবিশ্বাস্য, এমন কি কালাপাহাড়ী মনে হল। দুটো আঙুল নেই, কিম্বা স্নায়বিক ক্রিয়া বিকল, এমন কি পায়ের পাতা বিকৃত হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, এ সব ছোটখাটো কারণে বিমান বাহিনী থেকে লোক ছাড়িয়ে দেবার কথা বলাবলি করল ওরা। হামেশাই এমন কি যুদ্ধের সময়েও, বাহিনীর অন্যান্য শাখার তুলনায় বৈমানিকদের শারীরিক সুষ্ঠুতার মান সবচেয়ে বেশী। শেষ পর্যন্ত সবাই ওরা একমত হল যে পায়ের পাতা যার কৃত্রিম জঙ্গী বিমানের মত জটিল সূক্ষ্ম যন্ত্র চালানো তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

সবাই একমত যে মেরেসিয়েভের মতলবটা বিদঘুটে; তবুও বেপরোয়া স্বপ্নটা মন আকর্ষণ করল প্রত্যেকের।

'তোমার বন্ধুটি হয় নিরেট মূর্খ নয় মহাপুরুষ, মাঝামাঝি কিছু নয়, উপসংহারে বলল বুরুনাজিয়ান।

স্বাস্থ্যাবাসে একজন এসেছে যার পায়ের পাতা নেই, অথচ জঙ্গী বিমান চালাবার স্বপ্ন দেখে, খবরটা নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল সব ওয়ার্ডে। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় এসে পড়বার আগেই সবায়ের লক্ষ্যকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল আলেক্সেই, যদিও সেটা তার চোখে পড়েছে বলে মনে হল না। সবাই দেখে, খাবার টেবিলে পাশে যারা বসেছে তাদের সঙ্গে প্রাণখুলে হাসছে ও, বেশ আগ্রহে খাচ্ছে, ফুটফুটে ওয়েট্রেসদের প্রথামত প্রশংসা করছে, সঙ্গীদের সঙ্গে ঘুরছে বাগানে, ক্রোকে খেলতে শিখছে, এমন কি ভলিবলেও অংশ নিচ্ছে, ওর মধ্যে অসাধারণ কিছু চোখে পড়ে না, শুধু হাঁটার মন্থর ভঙ্গীটি ছাড়া। অতি সাধারণ লোক, বাস্তবিক। বেশী দিন যেতে না যেতে সবায়ের অভ্যেস হয়ে গেল ওকে, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কেউ আর দেখে না।



স্বাস্থ্যাবাসে পেঁছবার পরের দিন সন্ধ্যায় জিনচ্কার সঙ্গে দেখা করতে ঘরে গেল আলেক্সেই। হাতে বার্চকের পাতায় মোড়া একটা পেস্ট্রি, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে খায়নি সেটা। সৌখীন উদারভাবে পেস্ট্রিটা দিয়ে, অনুমতির অপেক্ষা না করে ডেস্কের পাশে বসে পড়ল আলেক্সেই, জিজ্ঞেস করল জিনচ্কাকে কবে সে নিজের প্রতিশ্রুতি রাখবে।

'কীসের প্রতিশ্রুতি?' পেন্সিলে আঁকা উঁচু ভুরুজোড়া তুলে জানতে চাইল জিনচকা।

'আমাকে নাচ শেখাবে কথা দিয়েছিলেন, জিনচ্কা।'

'কিন্তু...' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল মেয়েটি।

'শুনেছি যে আপনি এত ভালো মাস্টারনী যে খোঁড়ারা পর্যন্ত নাচতে শেখে, আর যারা সুস্থ সবল লোক তারা শুধু যে পা খোয়ায় তা নয়, মাথাটিও হারায়, যেমন ফেদিয়ার হয়েছিল। কবে শুরু করব আমরা? মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না।'

নবাগতকে বেশ ভালো লাগল জিনচ্কার। পায়ের পাতা নেই, তবু নাচ শেখাতে বলছে! আর শেখাবেই না কেন? খাসা দেখতে, রংটা তামাটে, তামাটে গালে রক্তাভা, চুল ঢেউ খেলানো, মসৃণ। সুস্থ লোকের মত হাঁটে, চোখদুটো চঞ্চল, পরিহাসচপল, একটু বিষণ্ণ ভাব লেগে আছে। নাচটা জিনচ্কার জীবনে সামান্য একটা জিনিস নয়, নাচতে ভালোবাসে সে, সত্যি সত্যি ভালোই নাচে... আর মেরেসিয়েভকে খাসা সুন্দর দেখতে!

সংক্ষেপে, রাজী হল জিনচ্কা। আলেক্সেইকে জানানো হল সারা সকোল্নিকিতে বিখ্যাত বোব গরোখভ নাচ শেখায় তাকে, বোব গরোখভ আবার সারা মস্কোয় বিখ্যাত পল সুদাকভ্স্কির শ্রেষ্ঠ ছাত্র আর অনুগামী, সুদাকভ্স্কি সামরিক আকাদেমিগুলোতে আর পররাষ্ট্র বিভাগের ক্লাবে নৃত্যশিক্ষক ছিল। বলরুম নাচের সেরা ঐতিহ্য জিনচ্কা পেয়েছে এই সব খ্যাতনামা শিল্পীদের কাছ থেকে, এমন কি আলেক্সেইকেও নাচ শেখাতে চেষ্টা করবে সে, যদিও সে জানে না পায়ের পাতা ছাড়া নাচা সম্ভব কিনা। যে সব সর্তে শেখাতে রাজী হল সেগুলো বেশ কঠিন: খুব বাধ্য আর অধ্যবসায়ী হতে হবে আলেক্সেইকে, জিনচ্কার প্রেমে যাতে না পড়ে তার চেষ্টা করতে হবে, কেননা প্রেমে পড়লে শিক্ষায় বাধা পড়বে, আর মোদ্দা কথা, অন্য লোক জিনচকাকে নাচতে ডাকলে হিংসে করা মোটেই চলবে না,

কেননা শুধু একজনের সঙ্গে নাচলে ওর নাচের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে, একজনের সঙ্গে লেগে থাকায় কোন মজা নেই।

বিনা দ্বিধায় সর্তগুলো মেনে নিল মেরেসিয়েভ। আগুনের মত লাল-চুল মাথা ঝাঁকিয়ে জিনচ্‌কা সেখানেই সুঠাম পা ফেলে নাচের প্রথম পদক্ষেপগুলো কেমন তা দেখাল। এক কালে রুশকায়া নাচে আর কামিশিনের পার্কে ফায়ারব্রিগেড দলের বাজানো পুরোনো নাচগুলোয় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল আলেক্সেই'র। ছন্দজ্ঞান ছিল ওর, তাই ফুর্তি-ভরা এই কলাটি তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছিল সে। এখন মুশকিল যে জীবন্ত সচল পায়ে নয়, পায়ের ডিমে বাঁধা চামড়ার জিনিসে পদক্ষেপ শিখতে হবে তাকে। ভারী বেঢপ কৃত্রিম পায়ের পাতায় ছন্দ আর গতি আনার জন্য চাই অমানুষিক উদ্যম, ইচ্ছাশক্তির একাগ্র প্রচেষ্টা।

কিন্তু সেগুলোকে মানিয়ে চলতে বাধ্য করল আলেক্সেই। প্রতিটি নতুন পদক্ষেপ শিখছে — গ্লিসেড, প্যারেড, সার্পেন্ট, — বলরুম নাচের সুচতুর কৌশল, বিখ্যাত পল সুদাকভ্‌স্কি সেগুলো তত্ত্বে বেঁধেছেন, জাঁকালো শ্রুতিমুখর তাদের নাম, বাচ্চার মত আনন্দে অধীর করে তুলছে তাকে। পদক্ষেপ শিখে শিক্ষয়িত্রীকে তুলে ধরে বনবন করে ঘুরিয়ে দেয় নিজের সাফল্যের উল্লাসে। আর কেউ, বিশেষ করে তার শিক্ষয়িত্রী জানতে পেত না এই সব নানামুখী জটিল পদক্ষেপ আয়ত্ত করতে গিয়ে কী যন্ত্রণা হত তার, নাচ শেখার কী মূল্য দিতে হয় তাকে। যেন কিছু হয়নি এমনভাবে স্মিত মুখ থেকে ঘাম মুছত যখন তখন আপনা থেকে এসে-পড়া চোখের জলও মুছতে হত আলেক্সেইকে, সেটা কারো নজরে পড়ত না।

একদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিজের ঘরে ফিরল আলেক্সেই, একেবারে ক্লান্ত কিন্তু খুসি।

'নাচতে শিখছি!' সগর্বে জানাল মেজর স্ত্রুচকভকে। জানলার ধারে চিন্তাকুলভাবে দাঁড়িয়ে মেজর; বাইরে গ্রীষ্মের দিনটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, সূর্যাস্তের শেষ আলো গাছের চূড়োয় সোনার মত ঝকঝক করছে।

কোন সাড়া দিল না মেজর।

'ঠিক শিখে ফেলব!' বলল মেরেসিয়েভ, কৃত্রিম পায়ের পাতা স্বস্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আড়ষ্ট পায়ে নখ দিয়ে সজোরে আঁচড়াতে লাগল।

জানলার দিকে মুখ করে রইল স্ত্রুচকভ; কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর, অদ্ভুত শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে, ফোঁপাচ্ছে যেন। কোন কথা না বলে

আলেক্সেই কম্বলের নিচে ঢুকল। বিচিত্র কিছু একটা ঘটছে মেজরের। বিগত যৌবন এই মানুষটির নারীবিদ্বেষ আর অবিশ্বাসী ইয়ার্কি কিছু দিন আগে পর্যন্ত হাসপাতাল ওয়ার্ডের সবায়ের হাসি আর ঘৃণার খোরাক জোগায়, তারপরে চ্যাংড়ার মত প্রেমে হাবুডুবু খায় লোকটা, হতাশ প্রেমিক মনে হয়েছিল। প্রতিদিন কয়েকবার অফিস-ঘরে যায় ও, মস্কোতে ক্লাভদিয়া মিখাইলভনাকে ফোন করার জন্য। হাসপাতাল ছেড়ে কেউ গেলে ও ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার জন্য পাঠায় ফুলফল, চকোলেট আর চিঠিপত্র। লম্বা চিঠি লেখে তাকে, পরিচিত লেফাফায় জবাব এলে ঠাট্টা তামাশা শুরু করত, খুসিই হত মেজর।

কিন্তু তার প্রেমে সাড়া দেয় না ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা, দেয় না কোন উৎসাহ, এমন কি সহানুভূতি পর্যন্ত জানায় না। লিখত যে সে আর একজনকে ভালোবাসে, তারি বিয়োগে শোকাতুর সে, মেজরকে বন্ধুর মত করে উপদেশ দিত সে যেন ওকে ভুলে যায়, ওর জন্য খরচ করা কিম্বা সময় নষ্ট করার মানে হয় না কোন। প্রেমের ব্যাপারে এই বন্ধুত্বপূর্ণ অথচ কাজের মানুষের ভঙ্গীটাই সবচেয়ে চটিয়ে দেয় মেজরকে।

আলেক্সেই কম্বলের নিচে বুদ্ধিমানের মত চুপচাপ পড়ে আছে, জানলার পাশ থেকে এক ঝটকায় ওর খাটের কাছে এসে মেজর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে নুয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল:

'কী চায় ও? আমাকে কী ভাবে বলো ত? একেবারে ফেলনা! আমি কি কুৎসিৎ, বুড়ো, কুষ্ঠরোগী একটা! ওর জায়গায় যদি অন্য কেউ হত... কিন্তু কথা বলে কোন লাভ নেই!'

একটা কেদারায় ধপাস করে বসে পড়ল মেজর, দুহাতে মাথা টিপে এত জোরে এদিক ওদিক নড়তে লাগল যে কেদারাটা আর্তনাদ করে উঠল।

'ও ত মেয়েমানুষ, তাই না? আমার সম্বন্ধে অন্তত একটু আগ্রহ থাকা ত উচিত! শয়তানী! ওকে আমি ভালোবাসি আর কত না ভালোবাসি!.. যদি তুমি জানতে! অন্য লোকটিকে তুমি ত চিনতে?.. আমার চেয়ে কোন অংশে ভালো ছিল সে বলতে পারো? কীসে ওর মন ভুলিয়েছিল? আমার চেয়ে বুদ্ধি বেশী ছিল? দেখতে আরো ভালো ছিল? কী ধরনের বীরপুরুষ ছিল সে?'

আলেক্সেই'র মনে পড়ল কমিসার ভরোবিওভের কথা, প্রকাণ্ড ফাঁপা শরীর, বালিশে রাখা মোমের মত ফ্যাকাশে মুখ; নারীসুলভ চিরন্তন বিষাদে

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে মহিলাটি; মনে পড়ল মরুভূমিতে মার্চ করে যাওয়া লাল ফৌজের অদ্ভুত গল্পটি।

'মেজর, মানুষের মত মানুষ ছিল সে, বলশেভিক একজন। প্রার্থনা করি যেন আমরা সবাই তার মত হতে পারি।'

৪

খবরটা বিদঘুটে শোনালেও ছড়িয়ে পড়ল ওয়ার্ডে: পায়ের চেটোবিহীন বৈমানিকটি নাচ শিখছে।

অফিস-ঘরে কাজ শেষ হয়ে গেলেই জিনচ্‌কা দেখত ছাত্রটি বারান্দায় অপেক্ষা করছে। এক গোছা বুনো ফুল, কিম্বা চকোলেট, মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে না-খাওয়া একটা কমলালেবু হয়ত এনেছে তার জন্য। গম্ভীরভাবে তার হাত ধরে জিনচ্‌কা যেত অবসর বিনোদনের ঘরে। গ্রীষ্মকালে ঘরটায় লোকজন নেই, এরি মধ্যে অধ্যবসায়ী ছাত্রটি তাস খেলার আর পিঙ-পঙের টেবিল দেয়ালের কাছে সরিয়ে রেখেছে। নতুন একটা নাচের ভঙ্গী সুন্দরভাবে দেখাত জিনচ্‌কা। ছোট্ট সুন্দর পায়ে মেঝেতে জটিল নানা নক্‌সা করে চলেছে সে, ভুরু কুঁচকে দেখছে বৈমানিক। তারপর গম্ভীরমুখে হাতে তাল রেখে জিনচ্‌কা গুণতে শুরু করত:

'এক, দুই, তিন... এক, দুই, তিন... ডানদিকে গ্লিসেড!.. এক, দুই, তিন... এক, দুই, তিন... বাঁদিকে গ্লিসেড... ফিরুন এবার। ঠিক। এক, দুই, তিন... এক, দুই, তিন... এবার সার্পেণ্ট! একসঙ্গে করা যাক এটা।'

পায়ের পাতা নেই এমন একজনকে নাচ শেখানো, এধরনের কাজ বোধ গরোখভ কিম্বা পল সুদাকভ্‌স্কি কখনো করেনি, হয়ত সেজন্য, হয়ত তামাটে পরিহাসপ্রিয় চোখ, কালো চুল, রোদে-পোড়া ছাত্রটিকে মনে লেগেছিল বলে, যে কারণেই হোক, অবসর পেলেই প্রাণ দিয়ে ওকে নাচ শেখাত জিনচ্‌কা।

সন্ধ্যেবেলায় বালি-ভরা নদীতীর, ভলিবলের মাঠ, স্কিটল খেলার জায়গা খালি হয়ে যেত, রোগীরা অবসর বিনোদনের জন্য নাচে মন দিত, তখন আলেক্সেই উৎসবে যোগ দিতে কখনো দ্বিধা করত না। ভালোই নাচত সে, কোন নাচ বাদ পড়ত না, আর কড়া সর্তে ওকে বেঁধেছে বলে একাধিকবার শিক্ষয়িত্রীর মনে আসত অনুশোচনা।

এ্যাকর্ডিয়নের তালে তালে জোড়ায় জোড়ায় সবাই ঘুরপাক খাচ্ছে, জ্বলজ্বলে মুখে, উত্তেজনায় দীপ্ত চোখে আলেক্সেই করে চলেছে সব কটা গ্লিসেড, সার্পেণ্ট, আর বক্রপাক; যেন অবলীলাক্রমে আগুনরঙা চুল লঘুপদ সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘুরত। মাঝেমাঝে এই বেপরোয়া নর্তকটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে কী করত, সেটা আঁচ পর্যন্ত করতে পারত না কোন দর্শক।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেত আলেক্সেই, রক্তিম মুখে হাসি, রুমাল দিয়ে হাওয়া খাচ্ছে হেলায়; কিন্তু দোরগোড়া ছাড়িয়ে যেতে না যেতেই হাসির জায়গায় মুখে আসত যন্ত্রণার বিকৃতি। বারান্দার সিঁড়ির রেলিং ধরে টলতে টলতে নেমে কাতরে উঠে শুয়ে পড়ত শিশিরে-ভেজা ঘাসে, স্যাঁতসেঁতে তখনো উষ্ণ মাটিতে সমস্ত শরীর চেপে কৃত্রিম পায়ের পাতার আঁটো চামড়ার ফেট্টির চাপে যন্ত্রণায় কেঁদে উঠত।

ফিতেগুলো খুলে ফেলত যাতে আরাম হয় পাদুটোর। কিছুক্ষণ জিরোবার পর ফিতেগুলো আবার লাগিয়ে ঝট করে উঠে ফিরে যেত বাড়িটাতে। অলক্ষিতে হলে আসত আবার। ঘর্মাক্ত এ্যাকর্ডিয়নবাদক অক্লান্তভাবে বাজিয়ে চলেছে, আলেক্সেই জিনচ্‌কার কাছে যেত, এরি মধ্যে ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁজছিল মেয়েটি। হাসত আলেক্সেই, চীনেমাটির মত শাদা সার-বাঁধা দাঁত উঠত ঝলসে, আবার দুজনে ফিরে যেত নাচের বৃত্তে, ক্ষিপ্র কমনীয় জোড়ায়। ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে ধমকাত জিনচ্‌কা, ঠাট্টা করে জবাব দিত আলেক্সেই, দুজনে ঘুরপাক খেত আবার, অন্যান্য সবায়ের মত, কোন পার্থক্য নেই।

নাচের কঠিন পরিশ্রম সত্বর কাজ দিল। কৃত্রিম পায়ের পাতার নিগড় ক্রমশ হালকা হয়ে এল, মনে হল পায়ের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেগুলো।

বেশ খুসি আলেক্সেই। শুধু একটা ব্যাপারে সে উদ্বিগ্ন — ওলিয়ার চিঠিপত্র আসছে না। আনিউতার সঙ্গে গভজ্‌দেভের দুর্ভাগ্য অভিজ্ঞতার পরে লেখা সেই চিঠিটার কোন উত্তর আসেনি, একমাসেরও বেশী হয়ে গিয়েছে। এখন তার মনে হয় চিঠিটা মারাত্মক, কোন মাথামুণ্ডু ছিল না সেটার। রোজ সকালে ব্যায়াম আর দৌড়ুবার পরে — দৌড়নোটা একশ পা করে বাড়িয়ে চলেছে প্রতিদিন — বসবার ঘরে চিঠিপত্রের বাক্স খোঁজ করে সে, যদি কিছু এসে থাকে। "ম" মার্কা খোপে চিঠির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হামেশাই, কিন্তু চিঠিপত্রগুলো বৃথায় ঘাঁটত সে।

একদিন নাচ শিখছে, শিক্ষার ঘরের জানলায় দেখা গেল বুরুনাজিয়ানের কালো মাথা। হাতে ছড়ি আর চিঠি একটা। কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বড়ো গোলগোল স্কুলের মেয়েসুলভ হাতে ঠিকানা লেখা খামটা ছিনিয়ে নিল আলেক্সেই আর দৌড়িয়ে চলে গেল ঘর থেকে, জানলায় দাঁড়িয়ে রইল বিমূঢ় বুরুনাজিয়ান আর ঘরের মধ্যখানে ক্রুদ্ধ শিক্ষয়িত্রী।

বকবকে পিসীর মত গলায় বলল বুরুনাজিয়ান:

'জিনচ্‌কা, আজকাল কাকে বাছবেন, সবাই এক ছাঁচে ঢালা... জোচ্চোর সবাই। কাউকে বিশ্বেস করবেন না। দেখলেই পালাবেন গঙ্গাজল দেখলে ভূতে যেমন পালায়। বরঞ্চ আমাকে আপনার ছাত্র করে নিন!' কথাটা বলে ছড়িটা ঘরে ছুঁড়ে ফেলে, ঘোঁৎঘোঁৎ করে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকল। জানলার ধারে বিষণ্ণ হতবুদ্ধিভাবে দাঁড়িয়ে রইল জিনচ্‌কা।

ইতিমধ্যে দৌড়িয়ে হ্রদের ধারে পেঁাছিয়েছে আলেক্সেই, চিঠিটা হাতের মুঠিতে, যেন কেউ তাড়া করে এসে ছিনিয়ে নেবে বহুমূল্য জিনিসটি। নলখাগড়া ঠেলে সরিয়ে শ্যাওলাচ্ছন্ন একটা বড়ো পাথরের উপরে সে বসল; লম্বা ঘাসের আড়ালে ওকে দেখা যাচ্ছে না একেবারে। মূল্যবান খামটি খুঁটিয়ে দেখল, আঙুলগুলো কাঁপছে। কী আছে চিঠিটাতে, কী দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হবে এখনি? খামটা ধারে ধারে ছেঁড়া, জীর্ণ; নিশ্চয়ই অনেক অনেক জায়গা ঘুরে গন্তব্যে এসেছে। খামের একদিক সন্তর্পণে ছেঁড়াতে শেষ ছত্রটি চোখে পড়ল: "আমরণ তোমার, ওলিয়া।" স্বস্তির অনুভূতিতে তক্ষুণি অভিভূত হয়ে গেল আলেক্সেই। লেখবার খাতার পাতাগুলো হাঁটুতে রেখে শান্তভাবে সমান করল সে — কী কারণে যেন পাতাগুলোয় এঁটেল মাটির ছাপ আর মোমবাতির তেলের দাগ। ওলিয়া ত বরাবর খুব গোছালো, কী হয়েছিল ওর? তারপর যে সব খবর পড়ল তাতে যুগপৎ গর্বে আর উৎকণ্ঠায় মন ভরে গেল তার। মনে হচ্ছে মাসখানেক আগে কারখানা ছেড়ে দিয়েছে ওলিয়া। কার্মিশিনের অন্যান্য প্রবীণা আর তরুণীর সঙ্গে স্তেপের কোথাও ট্যাঙ্কবিরোধী-গর্ত আর গড়খাই বানানোর কাজে ব্যস্ত, কাজটা চলেছে "একটা বড়ো সহর ঘিরে, যার নাম" ওর কথায় "আমাদের সবায়ের কাছেই পূত"। স্তালিনগ্রাদ কথাটা চিঠির কোথাও নেই, কিন্তু যেরকম অনুরাগে উৎকণ্ঠায় আর আশায় "বড়ো সহরটির" বিষয়ে ও লিখেছে তাতে বোঝা যায় সহরটি স্তালিনগ্রাদই।

লিখেছে ওর মত হাজার হাজার স্বেচ্ছাকর্মী দিনরাত স্তেপে কাজ করে

চলেছে, মাটি খংড়ে গাড়ি বোঝাই করে আনছে. কংক্রিট বসাচ্ছে. গড় বানাচ্ছে। চিঠিটায় খংসির ছাপ, কিন্তু কয়েকটি উক্তি থেকে বোঝা যায় যে স্তেপে ওদের সময় কষ্টে কাটছে। যে সব কাজে ও একাগ্রভাবে আচ্ছন্ন সে সবের কথা লেখার পরে শংধং আলেক্সেই'র প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। কড়া কথায় জানিয়েছে যে ওর শেষ চিঠিটায় বেশ ক্ষংব্ধ সে, চিঠিটা যখন পায় তখন ও "এখানে, ট্রেঞ্চে" আর আলেক্সেই ফ্রন্টে, সেখানে মনের উপরে সাংঘাতিক চাপ পড়ে সেটা জানে বলেই মাপ করেছে এবারে, নইলে কখনো করত না।

"প্রিয়তম, আত্মত্যাগ করতে পারে না সেটা কী ধরনের প্রেম? ও ধরনের প্রেমের অস্তিত্ব নেই। থাকলেও আমার মতে সেটাকে প্রেম বলা যায় না মোটেই। এক হপ্তা মংখ-হাত-পা ধংইনি, পাৎলংন পরি আজকাল আর বংট, আঙংলগংলো বেরিয়ে পড়েছে তা থেকে। রোদে মংখটা এমন পোড়া যে চামড়া খসে উঠে আসছে, তার নিচে নীলচে কড়া। ক্লান্ত নোংরা হাড় জিরজিরে আর কুৎসিৎ চেহারায় যদি তোমার কাছে হাজির হই, তাহলে কি তাড়িয়ে দেবে না দোষ দেবে আমাকে? কী বোকা তুমি! যা কিছং ঘটুক না তোমার, জানিয়ে দিচ্ছি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব, যে অবস্থাতেই তুমি থাক না কেন... প্রায়ই তোমার কথা ভাবি, ট্রেঞ্চে ঢুকে বাঙ্কে শংলেই সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মত ঘংমিয়ে পড়ি সবাই, ট্রেঞ্চে আসার আগে প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম তোমাকে। জানাতে চাই তোমাকে যে যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তোমার প্রতীক্ষায় থাকবে একজন, সর্বদাই প্রতীক্ষা করে থাকবে, তোমার যাই হোক না কেন... লিখেছ যে ফ্রন্টে কিছং ঘটতে পারে তোমার: ট্রেঞ্চে আমার যদি কিছং ঘটে, দংর্ঘটনায় পঙ্গং হয়ে যাই, তাহলে কি তুমি মংখ ঘংরিয়ে চলে যাবে? মনে আছে, শিক্ষানবিশি স্কুলে পড়ার সময় বীজগণিতের সম্পাদ্যগংলো অনংকল্পাবিধিতে করতাম আমরা? তোমার জায়গায় আমার কথা ভাবো, তা যদি কর তাহলে যা লিখেছ তাতে লজ্জা হবে তোমার..."

বসে বসে অনেকক্ষণ চিঠিটা নিয়ে ভাবল মেরেসিয়েভ। অন্ধকার জলে সংর্যের চোখ-ঝলসানো প্রতিবিম্ব, কাটফাটা রোদ, খাগড়ার সরসর শব্দ, নীল ড্র্যাগন-ফ্লাইগংলো এ ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে উড়ে যাচ্ছে। ক্ষিপ্রগতি জলের পোকাগংলো লম্বা সরং পা ফেলে খাগড়ার মধ্যে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, জলের মসংণ বংক জরির ফিতের মত কুঁচকিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ঢেউ নিঃশব্দে লাগছে বালংতীরে।

"এটা কী?" ভাবছে আলেক্সেই। "পূর্ববোধ, দিব্য দৃষ্টি?" ওর মা বলতেন, "মানুষের অন্তরই দৈবজ্ঞ," কিম্বা হয়ত ট্রেঞ্চ জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা ওকে প্রাজ্ঞ করেছে; আলেক্সেই বলতে সাহস করেনি যেটা সেটা বুঝেছে প্রজ্ঞায়? চিঠিটা আর একবার পড়ল আলেক্সেই, না, সে রকম কিছু নয়! পূর্ববোধ নয়। যা লিখেছিল তার জবাব মাত্র। আর জবাবটা কেমন!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে জামাকাপড় খুলে পাথরটার উপরে রাখল আলেক্সেই। খাগড়ার দেয়ালের আড়ালে শিকের মত লম্বা বালুকাময় ছোট নিরালা জায়গাটিতে বরাবর স্নান করত সে, জায়গাটি শুধু তার কাছেই জানা। কৃত্রিম পায়ের পাতার ফেট্টি খুলে পাথর থেকে আস্তে আস্তে গড়িয়ে নামল, কাটা পায়ে নুড়ির উপরে হাঁটা অত্যন্ত কষ্টকর হলেও হামাগুড়ি দিল না আলেক্সেই। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত, হেঁটে গেল হ্রদে, ঝাঁপ দিল ঠাণ্ডা ঘন জলে। কিছু দূর সাঁতরে গিয়ে চিৎ হয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। উপরে নীল অসীম আকাশ। ছোট ছোট মেঘ খরখর করে চলেছে, এ ওর গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আলেক্সেই দেখল তীরের ছায়া পড়েছে ঠাণ্ডা নীল মসৃণ জলের বুকে, গোল পাতার মধ্যে ভাসমান হলদে আর শাদা কুমুদ। হঠাৎ দেখল ওলিয়ার প্রতিবিম্ব, শেওলা-ভরা পাথরটার উপরে বসে আছে সে। ছাপা ফ্রক পরনে, স্বপ্নে-দেখা ওলিয়া। পাদুটো মুড়ে নয়, ঝুলিয়ে বসেছে, জল পর্যন্ত আসেনি — কুৎসিৎ দুটো ঠুঁটো পা জলের উপরে ঝুলছে। ছবিটা ভাগিয়ে দেবার জন্য জলে চড় মারল আলেক্সেই। না, ওলিয়ার প্রস্তাবিত অনুকল্প বিধিটা তার কাজে লাগবে না!

৫

দক্ষিণের অবস্থিতি আগেকার চেয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক। দন-যুদ্ধের কথা খবরের কাগজগুলো অনেকদিন হল বন্ধ করেছে। দনের অন্য পারে ভলগার দিকে স্তালিনগ্রাদের পথে কয়েকটি কসাক গ্রামের নাম সোভিয়েত সংবাদ বিভাগ একদিন উল্লেখ করল। যারা এ সব অঞ্চলের সঙ্গে অপরিচিত তাদের কাছে নামগুলোর বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু আলেক্সেই ত ওখানে জন্মেছে আর মানুষ হয়েছে, সে বুঝতে পারল দনের প্রতিরোধ রেখা



ভেঙ্গে গিয়েছে, স্তালিনগ্রাদের দেয়াল পর্যন্ত যুদ্ধ চলে এসেছে প্রখর গতিতে।

স্তালিনগ্রাদ! ইস্তাহারে নামটা এখন পর্যন্ত করা হয়নি বটে, কিন্তু নামটা প্রত্যেকের মুখে। ১৯৪২-এর হেমন্তে উৎকণ্ঠায় আর ব্যথায় নামটি উচ্চারণ করত লোকে, সহরের নাম নয়, চরম বিপদগ্রস্ত কোন নিকটজনের নাম যেন ওটা। ওলিয়া আছে সহরটির কাছে, বাইরের স্তেপে কোথাও, সাধারণ উৎকণ্ঠা সেজন্য তীব্রতর আলেক্সেই'র কাছে। কে বলতে পারে ওলিয়াকে কত কিছু সহ্য করতে হবে? রোজ চিঠি লেখে ওলিয়াকে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ডাকঘরের ঠিকানা দেওয়া চিঠিগুলোর মূল্য কতটুকু? ভলগা স্তেপে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলেছে, সেই ঝঞ্ঝায় আর অপসারণেব গণ্ডগোলের মধ্যে চিঠিগুলো কি পেঁাছবে ওর কাছে?

বৈমানিকদের স্বাস্থ্যাবাস অস্থির মুখর, মৌচাকে যেন ঢিল পড়েছে। অবসর বিনোদনের জন্য প্রচলিত সব খেলা — ড্রাফট, দাবা, ভলিবল, স্কিটল, আর সেই "একুশ" — জুয়া প্রিয় তাসুড়েরা হ্রদেব কাছে ঝোপঝাড়ে খেলত যেটা — সব ছেড়ে দিল বৈমানিকরা। কারো মন নেই খেলাতে। প্রত্যেকে, এমন কি যারা দারুণ কুঁড়ে, তারাও সকালে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে উঠে পড়ত, রেডিওতে সাতটার সময় যুদ্ধের সর্বপ্রথম খবর শোনা চাই। বৈমানিকদের কীর্তিকলাপের কথা ইস্তাহারে উল্লেখ করলে সবাই বিরস মুখে ঘোরাফেরা করত, নার্সদের খুঁত ধরা শুরু হত, খাবারদাবার আর নিয়মকানুন নিয়ে চলত গজগজানি; ওরা যে রোদে ঘুরছে কিছু না করে, কাচের মত স্বচ্ছ হ্রদের কাছে নিঝুম বনে পড়ে আছে, স্তালিনগ্রাদের কাছে স্তেপে লড়তে পারছে না, তার জন্য যেন দায়ী স্বাস্থ্যাবাসের কর্মীবৃন্দেরা। অবশেষে স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীরা ঘোষণা করল স্বাস্থ্যাবাসে থাকাতে অরুচি, ছেড়ে দেওয়া হোক তাদের, যাতে নিজের নিজের দলে ফিরে যেতে পারে।

একদিন বিকেলে বিমান বাহিনীর কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ থেকে একটি কমিশন স্বাস্থ্যাবাসে এল। চিকিৎসা সার্ভিসের পরিচয়-চিহ্ন পোশাকে কয়েকটি অফিসার ধূলিধূসর গাড়ি থেকে নামলেন। সামনের সিট থেকে, সিটের পিঠে অনেকটা ভর দিয়ে নামলেন মজবুত চেহারার একটি অফিসার। ইনি হলেন কর্ণেল পদস্থ আর্মি সার্জন মিরভল্স্কি, বিমান বাহিনীতে বিশেষ পরিচিত, সস্নেহে চিকিৎসা করেন বলে ইনি বৈমানিকদের প্রিয়।

রাত্রের আহারের সময়ে ঘোষণা করা হল যে সব স্বাস্থ্যসঞ্চয়ী অসুখের ছুটির মেয়াদ স্বেচ্ছায় কমিয়ে নিজেদের দলে এক্ষুণি ফিরে যেতে চায়, তাদের মধ্য থেকে পরের দিন সকালে লোক বাছাই করবে কমিশন।

পরের দিন ভোর বেলায় উঠে মেরেসিয়েভ রীতি অনুযায়ী ব্যায়াম না করেই চলে গেল বনে, প্রাতরাশের সময় না হওয়া পর্যন্ত ফিরল না। কিছু খেল না। খাবারে হাত দেয়নি বলে ওয়েট্রেস বকাতে তার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করল মেরেসিয়েভ, আর যখন স্ত্রুচকভ বলল যে মেয়েটি তার ভালোর জন্যই বকেছিল, ওর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই তার, তখন এক ঝটকায় উঠে পড়ে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আলেক্সেই। করিডরে দেয়ালে আটকানো সোভিয়েত সংবাদ বিভাগের ইস্তাহার পড়ছিল জিনা। তার সঙ্গে একটিও কথা বলল না আলেক্সেই, জিনা ভাণ করল দেখতে পায়নি ওকে, শুধু মেয়েলিভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। কিন্তু সত্যি সত্যি ওকে না দেখেই যখন আলেক্সেই চলে যাচ্ছে তখন খুব ব্যথিত লাগল জিনার, প্রায় কেঁদে ফেলে ডাকল তাকে। মুখ ঘুরিয়ে রেগে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই·

'কী চান আপনি?'

'কমরেড সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট ... কেন আপনি ...' নরম সুরে জবাব দিল জিনা, গালদুটো এত লাল হয়ে উঠেছে যে চুলের রঙের সঙ্গে প্রায় খাপ খেল।

রাগ তক্ষুণি সামলে নিল আলেক্সেই, সারা শরীর হঠাৎ অবশ হয়ে গিয়েছে মনে হল।

'আজ বুঝব আমার কপালে কী আছে,' নিচু গলায় সে বলল। 'হাত হাত দিয়ে শুভ কামনা করুন ...'

অন্য দিনের চেয়ে বেশী খোঁড়াচ্ছে আজ, নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তালা বন্ধ করে দিল।

কমিশন বসেছে হলে, সমস্ত যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে সেখানে - শক্তি ও নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষার মিটার, চক্ষুপরীক্ষার কার্ড ইত্যাদি। ঘরের বাইরে জমায়েৎ স্বাস্থ্যাবাসের সবাই, যারা ছুটির মেয়াদ কমাতে চায় তারা, অর্থাৎ স্বাস্থ্যসঞ্চয়ীদের প্রায় সবাই, দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে। জিনচ্কা এসে প্রত্যেককে এক টুকরো কাগজ দিল, কোন সময়ে তলব পড়বে জানানো হয়েছে তাতে, বলল ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। প্রথম কয়েকজন কমিশনের কাছে যাবার পর গুজব রটে গেল যে পরীক্ষাটা বিশেষ কিছু নয়, কমিশন খুব কড়াভাবে দেখছে না। সত্যিই ত ভলগায় দারুণ যুদ্ধ চলেছে,

মহৎ প্রয়াসের প্রয়োজন এখন, কড়াভাবে দেখবে কী করে কমিশন? বারান্দার সামনে ইঁটের নিচু দেয়ালে পা রেখে বসে আছে আলেক্সেই, কেউ বাইরে এলেই, যেন তার বিশেষ কোন উৎসাহ নেই, এমন নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞেস করছে:

'কী হল?'

'পাশ করেছি!' টিউনিকের বোতাম আঁটতে আঁটতে কিম্বা বেল্ট কষে বাঁধতে বাঁধতে উৎফুল্লভাবে জবাব দিল হয়ত লোকটি।

* মেরেসিয়েভের আগে বুরুনাজিয়ানের ডাক পড়ল। ছড়িটা দরজার বাইরে রেখে গেল সে, চেষ্টা করছে যাতে শরীরটা না দোলে আর ছোট পায়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে না হয়। অনেকক্ষণ ভিতরে রইল সে। অবশেষে খোলা জানলা দিয়ে রাগী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল আলেক্সেই, দৌড়িয়ে বেরিয়ে এল বুরুনাজিয়ান, ভয়ানক ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে তাকে। আলেক্সেই'র দিকে সক্রোধে একবার চেয়ে নেংচাতে নেংচাতে পার্কে চলে গেল বুরুনাজিয়ান, সোজাসুজি সামনের দিকে তাকিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে:

'আমলাতান্ত্রিক যত সব! খুঁত ধরতে ওস্তাদ! বিমান চালানোর বিষয়ে কী জানে ওরা? বিমান চালানোটা ওদের কাছে ব্যালের মত যেন! খাটো পা! পিচকারি আর সিরিঞ্জের দল বেটারা, আর কিছু নয়!'

হাতপা সেঁধিয়ে গিয়েছে মনে হল আলেক্সেই'র, কিন্তু হাসিমুখে উৎফুল্লভাবে ক্ষিপ্রপদে ঘরে ঢুকল ও। লম্বা টেবিল ঘিরে বসে আছে কমিশন। মধ্যের জায়গাটিতে বিরাট মাংসপিণ্ডের মত খাড়া হয়ে বসে আছেন আর্মি সার্জন মিরভল্স্কি। পাশের একটা টেবিলের ধারে এক গাদা কেস-কার্ডের সামনে রয়েছে জিনচ্কা, শাদা খরখরে স্মক পরনে, ছোট্ট সুন্দর একটা পুতুলের মত দেখাচ্ছে ওকে; এক গাছি লাল চুল গজের রুমালের নিচ থেকে মন-ভোলানো ভাবে উঁকি মারছে। আলেক্সেইকে ওর কার্ডটা দেবার সময়ে কোমলভাবে হাতে চাপ দিল জিনচ্কা।

চোখ কুঁচকিয়ে সার্জন বললেন:

'কোমর পর্যন্ত জামাটা খুলে ফেলুন ত!'

মেরেসিয়েভের ব্যায়াম বৃথায় যায়নি। খাসা সুগঠিত দেহ, তামাটে চামড়ার নিচে প্রত্যেকটি পেশী ফুটে বেরিয়ে আছে, দেখে তারিফ না করে পারলেন না সার্জন।

'ডোভিডের মূর্তির প্রতিকৃতি আপনি অনায়াসে হতে পারবেন,' নিজের বিদ্যেবুদ্ধি জাহির করে কমিশনের একজন সদস্য বললেন।

সবকিছু পরীক্ষা অনায়াসে উত্তীর্ণ হল মেরেসিয়েভ। মুষ্টির চাপ সাধারণ মানের তুলনায় দেড় গুণ বেশী, আর নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষার সময়ে এক ফুঁয়ে ইনডিকেটরটাকে একেবারে ডগায় পাঠাল সে। রক্তপ্রেষ স্বাভাবিক, স্নায়ুর অবস্থা চমৎকার। শেষে শক্তি পরীক্ষার যন্ত্রটির ইস্পাতের বাঁট এতো জোরে টানল ও যে স্প্রিংটা কেটে গেল।

'বৈমানিক বুঝি?' জিজ্ঞেস করলেন সার্জন, বেশ খুসি দেখাচ্ছে তাঁকে। আরো আরাম করে চেয়ারে বসে নিজের রায় লিখতে শুরু করলেন কেস-কার্ডটার উপরের কোণে। "সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট মেরেসিয়েভ আ. প."

'হ্যাঁ!'

'জঙ্গী বিমান চালক?'

'হ্যাঁ!'

'বেশ বেশ, আবার লড়াই চালান! আপনার মত লোক চায় ওরা, বিশেষভাবে চায়!. আচ্ছা, কী হয়েছিল আপনার?'

বিবর্ণ হয়ে গেল আলেক্সেই'র মুখ। মনে হল সবকিছু ছারখার হয়ে যাবে। খুঁটিয়ে কেস-কার্ডটি দেখলেন সার্জন, মুখে এল বিস্ময়ের ভাব।

'পায়ের পাতা কাটা... তার মানে? বাজে কথা! নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে, কী বলুন? জবাব দিচ্ছেন না কেন?'

'না, ভুল নয়,' নিচু গলায় আস্তে আস্তে বলল আলেক্সেই, যেন ফাঁসির মঞ্চে উঠছে।

বলিষ্ঠ সুগঠিত প্রাণচঞ্চল যুবকটির দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে সার্জন আর কমিশনের অন্যান্য সদস্যেরা, ব্যাপারটা কী মাথায় ঢুকল না তাদের।

'প্যাণ্টটা গুটিয়ে তুলুন ত!' অধীরভাবে আদেশ করলেন সার্জন। বিবর্ণমুখে, জিনচকার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে প্যাণ্ট তুলে ধরে বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে রইল আলেক্সেই, চামড়ার পাদুটো সবায়ের চোখে পড়ল।

'আপনি কি এতক্ষণ আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছিলেন? কতো সময় নষ্ট করেছেন, দেখুন ত! পায়ের পাতা নেই, নিশ্চয়ই আপনি বিমান বাহিনীতে ফেরবার কথা ভাবছেন না?' অবশেষে বললেন সার্জন।

'ভাবার কিছু নেই, ফিরে যাচ্ছি আমি!' নিচু গলায় জবাব দিল আলেক্সেই, একগুঁয়ে জেদে ঝলসে উঠল তার চোখ।

'পায়ের পাতা নেই, তবু? পাগল হয়ে গিয়েছেন না কি?'

'পায়ের পাতা নেই সত্যি, কিন্তু আবার বিমান চালাব আমি,' জবাবে বলল আলেক্সেই, এবারে উদ্ধতভাবে নয়, শান্ত কণ্ঠে। বৈমানিকের পুরোনো ধরনের টিউনিকের পকেট থেকে সেই পত্রিকাটার একটি ভাঁজ-করা পাতা বের করল সে। পাতাটা সার্জনকে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন, ও এক পায়ে বিমান চালাত। দুটো পায়ের পাতা না থাকলেও চালাতে পারব না কেন আমি?'

পাতাটি পড়ে সার্জন সবিস্ময়ে সশ্রদ্ধভাবে আলেক্সেই'র দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা করবার আগে আপনাকে অনেক কিছু করতে হবে। ও লোকটি দশ বছর চেষ্টা করেছিল। নকল পায়ের পাতাদুটো ঠিক যেন আসল, এমন ভাবে তালিম নিতে হবে আপনাকে,' আগের চেয়ে নরম সুরে তিনি বললেন।

সে সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আলেক্সেইকে শক্তি যোগাল একজন। টেবিলের পিছনে অস্থিরভাবে নড়ে উঠল জিনচ্‌কা: টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ, বিন্দু বিন্দু ঘাম রগে, হাতদুটো জুড়ে, যেন প্রার্থনা করছে, তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'কমরেড আর্মি সার্জন! ওর নাচ দেখা উচিত আপনার! সুস্থদের চেয়ে ভালো নাচতে পারে। সত্যি কথা!'

'নাচ? তার মানে...' কমিশনের সদস্যদের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলে উঠলেন সার্জন।

জিনচ্‌কার কথাটার জের সানন্দে টেনে আলেক্সেই বলল:

'এখন কিছু ঠিক করবেন না। আজ রাত্রে আমাদের নাচে এসে দেখুন আমি কী করতে পারি।'

দরজার দিকে যেতে যেতে আয়নায় আলেক্সেই দেখল কমিশনের সদস্যরা উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছে।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের আগে পরিত্যক্ত পার্কের একটা ঝোপের মধ্যে আলেক্সেইকে খুঁজে পেল জিনচ্‌কা। বলল যে ঘর ছেড়ে চলে আসার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে নিয়ে আলোচনা চলে; সার্জন বলেন অদ্ভুত ছোকরা এই মেরেসিয়েভ, আর কে জানে, ও হয়ত সত্যি সত্যি বিমান চালাতে পারবে।

রুশ লোকে কী না পারে? কমিশনের একটি সদস্য বলে বিমান চালানোর ইতিহাসে এ রকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। তার জবাবে সার্জন বলে ওঠেন বিমান চালানোর ইতিহাসে অনেক কিছুই ত আগে ঘটেনি, আর এ যুদ্ধে সোভিয়েত মানুষ অনেক কিছু নতুন জিনিস দেখিয়েছে।

প্রায় দুশ লোক দেখা গেল স্বেচ্ছায় সামরিক কাজে ফিরে যাচ্ছে; তাদের বিদায়ের উপলক্ষ্যে নাচের বন্দোবস্ত করা হল, জমকালো অনুষ্ঠান একটা। মস্কো থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হল সামরিক বাজিয়েদের একটা দলকে; প্রাসাদের সব হল আর বারান্দা সঙ্গীতের বজ্রনির্ঘোষে গেল ভরে, জাফরি-দেওয়া জানলাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ঘর্মাক্ত মুখে অবিরাম নেচে চলেছে বৈমানিকরা, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ফুর্তিবাজ, ক্ষিপ্র আর প্রাণচঞ্চল হল মেরেসিয়েভ, তার সঙ্গে নাচছে লালচে চুল সেই মেয়েটি; ওদের জোড়া মেলা ভার!

খোলা জানলার পাশে বসে আছেন আর্মি সার্জন মিরভলস্কি, ঠাণ্ডা বিয়রের গেলাস সামনে, মেরেসিয়েভ আর তার আগুনের মত লাল-চুল সঙ্গিনীটির দিক থেকে চোখ ফেরাতে তিনি পারছেন না। সার্জন তিনি, বাহিনীর সার্জন তাছাড়া, আসল আর নকল পায়ের তফাৎ জানা আছে তাঁর।

আর এখন তামাটে, সুগঠিত বৈমানিকটি ও ছোটখাটো কমনীয় মেয়েটির নাচ দেখে বারবার তাঁর মনে হতে লাগল এর পিছনে কিছু একটা চালাকি আছে। অবশেষে "বারিনিয়া" নাচল আলেক্সেই, তাকে ঘিরে তারিফ করছে সবাই; উরু আর গাল বেপরোয়াভাবে চাপড়ে লাফাল আলেক্সেই আরো নানা কসরৎ দেখাল, তারপর ঘর্মাক্ত কলেবরে উত্তেজিতভাবে গেল মিরভলস্কির কাছে। নির্বাক সম্ভ্রমে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন সার্জন। কিছু কথা বলল না আলেক্সেই, শুধু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সার্জনের মুখের দিকে, জবাব দাবী করে সে, জবাব ভিক্ষা করে সে।

সার্জন অবশেষে বললেন:

'আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন আপনাকে কোন দলে নিযুক্ত করার অধিকার নেই আমার, কিন্তু কর্মচারীবৃন্দ বিভাগের জন্যে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দেব। লিখে দেব যে উপযুক্ত শিক্ষা পেলে বিমান চালাতে পারবেন আপনি। যাই হোক, আপনাকে সমর্থন করব, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

স্বাস্থ্যাবাসের অধিকর্তাও বেশ অভিজ্ঞ সার্জন, হাত ধরাধরি করে তিনি আর মিরভলস্কি হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায় দুজনেই

অভিভূত। শুতে যাবার আগে অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন তাঁরা, সিগারেট খেতে খেতে আলোচনা চলল যে সত্যি সত্যি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে সোভিয়েত মানুষ কী না করতে পারে...

বাজনার গুরুগুরু ধ্বনি থামেনি তখনো, খোলা জানলার আলোয় বাইরে ঠিকরে পড়ছে নাচিয়েদের চলমান ছায়া। উপরের স্নানের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে মেরেসিয়েভ, পাদুটো ঠান্ডা জলে ডোবানো, এত জোরে ঠোঁট কামড়াচ্ছে যে রক্ত বেরিয়ে এল। যন্ত্রণায় প্রায় বেহুঁশ সে, নকল পায়ের পাতার ঘষড়ানিতে দাগা দাগা ঘা আর কালশিটে-পড়া কড়াগুলো ধুচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক পরে মেজর স্ত্রুচকভ ঘরে এল; আয়নার সামনে বসে তখনো ভিজে, ঢেউ-খেলানো চুল আঁচড়াচ্ছে মেরেসিয়েভ, স্নানের পর বেশ ঝরঝরে লাগছে ওকে।

'জিনচ্‌কা তোমার খোঁজ করছে। যাবার আগে ওকে নিয়ে বেড়িয়ে আসা উচিত তোমার। মেয়েটার জন্যে আমার খারাপ লাগছে।'

'দুজনে যাই চলো,' ব্যগ্রভাবে বলল মেরেসিয়েভ। 'পাভেল ইভানভিচ, এসো না আমার সঙ্গে,' অনুনয় করল ও।

ফুটফুটে মেয়েটি তাকে নাচ শেখাবার জন্য কত না করেছে, একা তার সঙ্গে ঘোরার কথা ভাবতে অস্বস্তি লাগছে মেরেসিয়েভের। ওলিয়ার চিঠি পাবার পর জিনচ্‌কার সান্নিধ্যে খাপছাড়া লাগত তার। স্ত্রুচকভকে বারবার অনুরোধ করল সঙ্গে যেতে, শেষে গজগজ করতে করতে টুপিটা তুলে নিল স্ত্রুচকভ।

ঘেরা বারান্দায় অপেক্ষা করছিল জিনচ্‌কা, হাতে এক গোছা ফুলের শেষ কয়েকটা। ফুলের বৃন্ত আর পাপড়িতে পায়ের নিচে মেঝেটা ভরে গিয়েছে। আলেক্সেই'র পায়ের শব্দ কানে আসাতে ব্যগ্রভাবে এগিয়ে এল ও, আলেক্সেই একা নয় দেখে হঠাৎ যেন মিইয়ে গেল জিনচ্‌কা।

'চলুন, বনকে বিদায় জানিয়ে আসি,' নির্লিপ্ত সুরে প্রস্তাব করল আলেক্সেই।

হাতে হাত রেখে, নিঃশব্দে ওরা লাইমগাছের বীথি হয়ে চলল। পায়ের সামনে, চন্দ্রালোকিত মাটিতে কয়লার মত কালো কালো ছায়া অনুসরণ করছে ওদের, এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত মুদ্রার মত হেমন্তের চিকচিকে প্রথম পাতা। বীথি ছাড়িয়ে গেট হয়ে ভিজে ধূসর ঘাসে পা ফেলে ওরা গেল হ্রদে। ফাঁকা জায়গাটা পাতলা কুয়াশার চাদরে ঢাকা, ভেড়ার লোমের মত শাদা

কুয়াশা। মাটিতে লেপটে আছে সে কুয়াশা, কোমর অবধি এসে যেন নিশ্বাস ফেলছে, চাঁদের হিম আলোয় ঝকঝক করছে হেঁয়ালি ভরে। আর্দ্র হাওয়া হেমন্তের পরিতৃপ্ত গন্ধে ভরা। এক একবার ঠাণ্ডা কনকনে লাগছে, পর মুহূর্তেই আবার গুমোট গরম, যেন কুয়াশার এই হ্রদটায় নিজস্ব ঠাণ্ডা আর উষ্ণ স্রোত আছে...

'মনে হচ্ছে দৈত্যের মত মেঘের ওপর দিয়ে চলেছি আমরা, তাই না?' কী যেন ভাবতে ভাবতে আলেক্সেই বলল; মেয়েটির ছোট বলিষ্ঠ হাত বেশ শক্ত করে তার কনুইতে ঠেকানো, অস্বস্তি হচ্ছে তার।

'দৈত্য নয়, বোকার মত, পা ভিজে ঠাণ্ডা লেগে যাবে,' গরগর করে উঠল স্ত্রুচকভ, মনে হল নিজের বিষণ্ন নানা ভাবনায় সে আচ্ছন্ন।

'সেদিক থেকে আমার সুবিধে। পায়ের পাতার বালাই নেই, ঠাণ্ডা লাগবে না তাই,' হেসে বলল আলেক্সেই।

'চলুন, শীগগির চলুন, ওখানটা এখন ভারী সুন্দর হবে নিশ্চয়ই,' কুয়াশায় ঢাকা হ্রদের দিকে ওদের টেনে নিয়ে যেতে যেতে তাড়া দিয়ে বলল জিনচ্‌কা।

আর একটু হলে সটান জলে পড়ত ওরা, একেবারে পায়ের নিচে কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে জলের কালো রেখাটা চোখে পড়াতে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল তিনজনে। কাছে ছোট একটা জেটি, অন্ধকারে দাঁড়-নৌকোর অস্পষ্ট রেখা। কুয়াশায় ঝটপট ঢুকল জিনচ্‌কা, ফিরে এল জোড়া দাঁড় হাতে। দাঁড়ের আঙটা বাঁধা হল, দাঁড়দুটো নিল আলেক্সেই; জিনচ্‌কা আর মেজর হালের কাছে বসল। নিস্তরঙ্গ জল বেয়ে আস্তে আস্তে চলল নৌকো। কুয়াশার মধ্যে গিয়ে পড়ছে কখনো, কখনো আসছে খোলা জায়গায়। জলের কালো মসৃণ বুকে দরাজভাবে পড়েছে চাঁদের রুপালী আলো। কথা বলছে না কেউ, সবাই নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন। শান্ত রাত্রি; পারার ফোঁটার মত আর ঠিক সে রকম ভারীভাবে দাঁড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। দাঁড়ের আঙটার অস্পষ্ট শব্দ, কোথায় যেন একটা সারস ডাকল, অনেক দূর থেকে এল পেঁচার বিষণ্ন চীৎকার, প্রায় শোনা যায় না ডাকটা।

'কাছাকাছি প্রচণ্ড লড়াই চলেছে, প্রায় বিশ্বাস হয় না সেটা...' মৃদুকণ্ঠে বলল জিনচ্‌কা। 'আমাকে চিঠি দেবেন ত আপনারা? আলেক্সেই পেত্রভিচ, আপনি নিশ্চয়ই লিখবেন, ঠিক ত? কয়েক ছত্র লিখলেই চলবে, ঠিকানা-লেখা কয়েকটা পোস্টকার্ড আপনার সঙ্গে দিয়ে দেব, কী বলেন? আপনি

লিখবেন: "বেঁচে আছি, ভালো আছি, নমস্কার," আর কোন ডাক-বাক্সে ফেলে দেবেন, কী বলুন?..'

'যাচ্ছি বলে আমি কত খুসি, ভাবতেই পারবেন না আপনারা। বাপ! বসে বসে ঘেন্না ধরে গিয়েছে! কাজের জন্যে হাত সুড়সুড় করছে!' স্ত্রুচকভ বলে উঠল।

আবার সবাই চুপচাপ। নৌকোর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ করে লাগছে ছোট ছোট ঢেউ, নৌকোর নিচে ঘুমন্ত ঘড়ঘড় শব্দে জলধারা ঝকঝকিয়ে কোণাকুণিভাবে গলুই'এর কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে, নীলচে বিক্ষুব্ধ চাঁদের আলোর রেখা তীর থেকে জলের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে, কুমুদ ফুলের পাতার গোছাগুলো জ্বলছে এদিকে ওদিকে।

'গান গাওয়া যাক,' প্রস্তাব করল জিনচকা, উত্তরের অপেক্ষা না করেই অ্যাসগাছের বিষয়ে সেই গানটি ধরল।

প্রথম দুটো পঙ্‌ক্তি একলা গাইল সে, পরেরটা ধরল মেজর স্ত্রুচকভ, সুন্দর গভীর ব্যারিটোনে। এর আগে সবায়ের সামনে সে গায়নি কখনো, ওর যে এমন সুন্দর, সুরেলা গলা আলেক্সেই ভাবতেও পারেনি। মসৃণ জলের উপর দিয়ে ভেসে চলল গানের বিষণ্ণ, আবেগমুখর সুর: সতেজ দুটো কণ্ঠস্বর, একটি ছেলের, অন্যটি মেয়ের, আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরকে দোহাই দিচ্ছে। আলেক্সেই'র মনে পড়ে গেল জানলার বাইরে সেই পাতলা এ্যাসগাছটার কথা, বেরির একটি মাত্র গোছা তাতে, মনে পড়ে গেল পাতাল সেই গ্রামটিতে ভারিয়ার কথা। তারপর সবকিছু -- হ্রদ, অদ্ভুত চাঁদের আলো, নৌকো আর গায়কেরা, সবকিছু মিলিয়ে গেল আর রুপালী কুয়াশায় ও দেখল কামিশিনের সেই মেয়েটিকে, ফুলে-ভরা মাঠে ডেইজির মধ্যে বসেছিল যে ওলিয়া, সে ওলিয়া নয় কিন্তু, আলাদা ধরনের, অপরিচিত একটি মেয়ে, ক্লান্ত সে, গাল জায়গায় জায়গায় রোদে তামাটে হয়ে গিয়েছে, ঠোঁটদুটো ফাটা, ঘর্মমলিন টিউনিক পরনে, স্তালিনগ্রাদের কাছে স্তেপে কোথাও শাবল চালাচ্ছে সে।

দাঁড়দুটো ফেলে দিয়ে গানের শেষ দুটো কলি গাইতে যোগ দিল আলেক্সেই।

৬

পরের দিন ভোরে স্বাস্থ্যাবাসের গেট থেকে বেরোল সারি সারি অনেক বাস। প্রবেশদ্বারের অলিন্দ তখনো ছাড়িয়ে যায়নি সেগুলো, এরিমধ্যে একটা বাসের পাদানিতে বসে মেজর স্ত্রুচকভ এ্যাসগাছের বিষয়ে তার প্রিয়

গানটি ধরেছে। অন্যান্য বাসেও সবাই গানটা ধরল। আর বিদায় সম্ভাষণ, শুভেচ্ছা, বুর্নাজিয়ানের রসিকতা, বাসের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিনচ্কা কী বিদায়কালীন উপদেশ চেঁচিয়ে দিচ্ছে আলেক্সেইকে, সবকিছু ছাপিয়ে উঠল গানটির সহজ কিন্তু অর্থঘন কথাগুলো; পুরোনো গানটি ভুলে গিয়েছিল লোকে, কিন্তু মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময়ে আবার নতুন প্রাণ পেয়ে জনপ্রিয় হয় ওটি।

গেট পেরিয়ে চলেছে বাসগুলো, সঙ্গে নিয়ে চলেছে গানটির গভীর সুরেলা ধ্বনি। শেষ হয়ে গেল গান, সবাই চুপচাপ; সহরের উপকণ্ঠে কারখানা আর শ্রমিকদের বসতি যখন বাস থেকে চোখে পড়ছে, স্তব্ধতা ভাঙ্গল শুধু তখন।

টিউনিকের বোতামগুলো খোলা, মেজর স্ত্রুচকভ তখনো বাসের পাদানিতে বসে হাসি মুখে প্রাকৃতিক দৃশ্যের তারিফ করছে। অতিশয় খোশমেজাজে তখন মেজর; ভবঘুরে সৈনিকটি আবার বেরিয়েছে রাস্তায়, চলেছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, তাই নিজের প্রকৃত স্বভাব ফিরে এসেছে। কোন একটা সামরিক দলে যাচ্ছে, কোনটা সেটা এখনো জানা নেই, কিন্তু যে দলই হোক, নিজের বাড়ির সামিল করবে সেটাকে। মেরেসিয়েভ বসে আছে, নির্বাক, উৎকণ্ঠিত। ওর মনে হচ্ছে, আসল বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি হওয়া এখনো বাকি, আর কে জানে সেগুলোকে ও অতিক্রম করতে পারবে কি না?

বাস থেকে নেমেই, এমন কি রাত্রিযাপনের কোন ব্যবস্থা না করেই মেরেসিয়েভ সটান গেল মিরভলস্কির কাছে। মন্দভাগ্যের প্রথম ঝাপটা: যে হিতাকাঙ্ক্ষীকে এত কষ্টে হাত করেছিল মেরেসিয়েভ তিনি সহরে নেই, চিকিৎসা বিষয়ে কোন জরুরী কাজে বিমানে করে কোথায় গিয়েছেন, ফিরতে কিছুদিন লাগবে। যে অফিসারটির সঙ্গে আলেক্সেই'র কথাবার্তা হল, সে বলল নিয়মানুযায়ী একটা দরখাস্ত করতে। জানলার ধারে তক্ষুণি বসে মেরেসিয়েভ দরখাস্তটা লিখে ফেলে ক্ষীণদেহ ছোটখাটো ক্লান্ত-চোখ অফিসারটির হাতে দিল। যথাসাধ্য চেষ্টা করার কথা দিল অফিসার, দুদিনের মধ্যে দেখা করতে বলল আলেক্সেইকে। অনুনয়-বিনয় করল আলেক্সেই, এমন কি ভয় দেখাল পর্যন্ত, কিন্তু কিছু সুবিধে হল না। হাড্ডিসার, ছোট হাতদুটো বুকে রেখে জবাব দিল অফিসার, যা নিয়ম তা মেনে চলতে হবে, নিয়মভঙ্গ করার কোন ক্ষমতা নেই তার। সত্যি সত্যি হয়ত ব্যাপারটি তাড়াতাড়ি

সম্পন্ন করার কোন ক্ষমতা ছিল না তার। হাত নেড়ে চলে এল মেরেসিয়েভ।

এই ভাবে শুরু হল সামরিক অফিসের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে তার হন্যের মত ঘোরা। হাসপাতালে তাকে আনা হয়েছিল ভীষণ তাড়ায়, ফলে জামাকাপড়, খাবারদাবার আর ভাতার সার্টিফিকেট মেলেনি, এ পর্যন্ত সেগুলো জোগাড় করার কোন চেষ্টা সে করেনি. এতে তার অসুবিধে অনেক বেড়ে গেল। ছুটির সার্টিফিকেট পর্যন্ত আলেক্সেই'র নেই। এ সব ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি সহৃদয় আর উপকারী লোক, রেজিমেণ্টের সদর দপ্তরে তার করে দরকারী কাগজপত্রগুলো বিনা বিলম্বে পাঠিয়ে দিতে বলবে কথা দিল, কিন্তু মেরেসিয়েভ জানত এ সব ব্যাপারে কত সময় লাগে। বুঝতে পারল যুদ্ধকালীন কড়াকড়ির মধ্যে মস্কো সহরে, যেখানে রুটির প্রতিটি কিলোগ্রাম আর চিনির প্রতি গ্রাম অমূল্য, তাকে কিছু দিন কাটাতে হবে বিনা টাকায়, বিনা বাসায়, বিনা রেশনে।

হাসপাতালে আনিউতাকে ফোন করল মেরেসিয়েভ। গলা শুনে মনে হল কিছু একটা নিয়ে ও হয় উদ্বিগ্ন নয় ব্যস্ত আছে নিশ্চয়, কিন্তু মেরেসিয়েভ এসেছে শুনে খুব খুসি হয়ে জোর করে বলল এ-কদিন ওর বাড়িতে থাকতে হবে মেরেসিয়েভকে, বিশেষ করে এই জন্য যে ও নিজে এখন হাসপাতালে থাকছে, বাড়িতে একাধিপত্য হবে মেরেসিয়েভের।

চলে-আসা রোগীদের প্রত্যেককে স্বাস্থ্যাবাস থেকে পাঁচদিনের শুকনো রেশন দেওয়া হয়েছিল যাত্রার জন্য। তাই, বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে আলেক্সেই গেল নতুন, উঁচু সব বাড়ির পিছনের প্রাঙ্গণে বসানো সেই পরিচিত জীর্ণ ছোট বাসাটিতে।

মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলল, সঙ্গে কিছু খাবার আছে, তাই সবুর করতে পারে সে। চেনা, অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি ধরে উঠল, বেড়াল আর কেরোসিন আর ভিজে কাপড়ের গন্ধ তখনো রয়েছে; হাতড়ে দরজাটা বের করে সশব্দে টোকা দিল তাতে আলেক্সেই।

দরজাটা খুলে গেল বটে, কিন্তু দুটো শক্ত চেনে বাঁধা বলে আধখোলা অবস্থায় রইল। ছোটখাটো বৃদ্ধাটি স্বল্পপরিসর ফাঁকটি থেকে শীর্ণ মুখ বাড়িয়ে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসুভাবে তাকাল আলেক্সেই'র দিকে, জিজ্ঞেস করল কাকে চায়, কী নাম তার। জবাব পাবার পর চেনটার ঝনঝন আওয়াজ শোনা গেল, হাট করে খোলা হল দরজাটা।

'আন্না দানিলভনা বাড়িতে নেই, কিন্তু আপনার কথা টেলিফোন করে জানিয়েছে। ভেতরে আসুন, ওর ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে দিই,' বিরস বিবর্ণ চোখে আলেক্সেই'র মুখ, টিউনিক, বিশেষ করে ওর কিট-ব্যাগটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বৃদ্ধাটি বলল।

'গরম জল হয়ত লাগবে? রান্নাঘরে আনিচ্কার কেরোসিন স্টোভ আছে, কিছু জল ফুটিয়ে দেব...'

অসঙ্কোচে চেনা ঘরটায় প্রবেশ করল আলেক্সেই। যে কোন জায়গাকে নিজের বাড়ি মনে করার ক্ষমতাটা মেজর স্ট্রুচকভের অতিমাত্রায় ছিল, তার ছোঁয়াচ হয়ত লেগেছে আলেক্সেইকে। পুরোনো কাঠ, ধুলো আর ন্যাপথলিন, বহু বছর ধরে বিশ্বস্ত, ভালো কাজ দিয়েছে যে সব জিনিস, তাদের চেনা গন্ধ, এমন কি আবেগে ভরে দিল আলেক্সেই'র মন, যেন অনেক দিন ছন্নছাড়াভাবে ঘোরার পর নিজের বাড়িতে ফিরেছে সে।

পিছু পিছু এল বৃদ্ধা, বকবক করেই চলেছে, বক্তব্য হল: একটা রুটির দোকানে সার বাঁধে লোক, কপাল ভালো হলে সেখানে রেশন কার্ডে পাঁউরুটি পাওয়া যায়, গমের রুটি নয়; সেদিন হোমরাচোমরা একজন আর্মি অফিসার বাসে বলছিলেন যে স্তালিনগ্রাদে ফাঁপরে পড়েছে জার্মানরা, তাতে হিটলার এত ক্ষেপে যায় যে পাগলাগারদে আটক রাখতে হয়েছে তাকে, আর এখন নকল হিটলার জার্মানিতে রাজত্ব করছে; পড়শী আলেভতিনা আরকাদিয়েভনার সত্যি কোন অধিকার নেই শ্রমিকদের রেশন-কার্ড পাবার, এনামেলের সুন্দর একটা দুধের বাটি ধার করে আর ফেরৎ দেয়নি সে: আন্না দানিলভনার মা-বাবা, খাসা লোক তাঁরা, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে চলে গিয়েছেন; আর আন্না দানিলভনা নিজে বেশ মেয়ে, শান্ত শিষ্ট, অন্য ছুঁড়িদের মত যার তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায় না সে, বেটাছেলেদের নিজের ঘরে আনে না। শেষে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল:

'আপনি কি ওর সেই ট্যাঙ্ক-অফিসার ছোকরা, যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব পেয়েছে?'

'না, আমি বৈমানিক,' জবাব দিল মেরেসিয়েভ; বৃদ্ধার সজীব মুখে যুগপৎ এল বিস্ময়, বিতৃষ্ণা, অবিশ্বাস আর ক্রোধের ভাব, সেটা দেখে অনেক কষ্টে হাসি চাপল আলেক্সেই।

ঠোঁট চেটে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল বুড়ী, করিডর থেকে বলল, আগেকার মত আর মিঠে গলায় নয়:

'গরম জল দরকার হলে নীল কেরোসিন স্টোভটায় নিজেই ফুটিয়ে নিও বাপু।'

বেজ-হাসপাতালে আনিউতা নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত, কেননা হেমন্তের এই বিরস দিনে ঘরটাকে ভয়ানক পরিত্যক্ত দেখাচ্ছে। সবকিছুর উপরে ধুলোর পুরু স্তর, জানলায় আর ফুলদানিতে বসানো ফুলগুলো হলদে হয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। অনেক দিন জল দেওয়া হয়নি মনে হচ্ছে। টেবিলে ছাতা-পড়া খাবারের টুকরো, কেটলিটা সরানো হয়নি তখনো। পিয়ানোটাও নরম ধূসর ধুলোয় আচ্ছন্ন; একটা বড়ো মাছি, দেখে মনে হয় চাপা হাওয়ায় হাঁফ ধরে গেছে ওটার, বিমর্ষভাবে গুনগুন করে ঝাপসা হলদেটে জানলার শার্সিতে বারবার গিয়ে পড়ছে।

জানলাগুলো একেবারে খুলে দিল মেরেসিয়েভ। নিচের ঢালু বাগানটাকে সব্‌জিক্ষেতে পরিণত করা হয়েছে।

তাজা হাওয়ার ঝটকায় পুঞ্জীভূত ধুলো এত জোরে আলোড়িত হল যে ঘন কুয়াশার মত দেখাল। চট করে একটা কথা মনে হল আলেক্সেই'র... ঘরটা গুছিয়ে ফেললে হয় তাহলে আনিউতা অবাক আর খুসি হয়ে যাবে, যদি অবশ্য হাসপাতাল থেকে সময় করে সন্ধ্যেবেলায় আসতে পারে। বালতি আর ন্যাতা বুড়ীর কাছে চেয়ে নিয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে কাজে লাগল আলেক্সেই, যে কাজ বহু যুগ ধরে হেয় মনে করত বেটাছেলেরা। প্রায় দেড় ঘণ্টা ঘর সাফ করা চলল, মেঝে ঘষছে, ধুলো ঝাড়ছে, বেশ ভালো লাগছে কাজটা আলেক্সেই'র।

বাড়িতে আসার সময়ে দেখেছিল সেতুতে দাঁড়িয়ে মেয়েরা বড়ো বড়ো রঙীন হেমন্তের ফুল বিক্রী করছে, সন্ধ্যেবেলায় সেখানে গেল সে। এক গোছা কিনে পিয়ানো আর টেবিলের উপরে ফুলদানিতে রেখে সবুজ কেদারায় আরাম করে গা ছড়িয়ে দিল; সারা শরীরে প্রীতিকর ক্লান্তির আমেজ, তার আনা খাবার রান্নাঘরে রাঁধছে বুড়ীটা, তার গন্ধ প্রাণভরে নিল আলেক্সেই।

কিন্তু আনিউতা যখন এল তখন এত ক্লান্ত সে যে কোনক্রমে ওকে সম্ভাষণ করেই শুয়ে পড়ল কোচে, ঘরটা কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নজরে পড়ল না। কিছুক্ষণ জিরিয়ে জল খেল, তখনি শুধু অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাল। ক্লান্তভাবে হেসে কৃতজ্ঞভাবে মেরেসিয়েভের কনুই'এ চাপ দিয়ে বলল:

'সত্যি, অবাক হবার কিছু নেই যে গ্রিশা আপনাকে এত ভালোবাসে,

একটু হিংসে হয় আমার তাতে। এটা আপনি নিজে করেছেন, আলিওশা! কী খাসা লোক! গ্রিশার কোন চিঠি পেয়েছেন? ও ওখানে আছে। সেদিন ওর একটা চিঠি পেয়েছি, ছোট্ট চিঠি, দুএক ছত্র মাত্র। ও এখন স্তালিনগ্রাদে, আর বোকারাম কী করছে জানেন? দাড়ি রাখছে! এই সময়ে!.. ওখানে বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশী, তাই না? সত্যি কিনা বলুন ত, আলিওশা! স্তালিনগ্রাদ সম্বন্ধে লোকেরা নানা মারাত্মক কথা বলছে!'

'লড়াই চলেছে ওখানে।'

ভ্রূকুটি করে আলেক্সেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। দারুণ লড়াই চলেছে ওখানে, ভলগায়, সবায়ের মুখে তার কথা, যারা ওখানে তাদের প্রত্যেককে হিংসে করে আলেক্সেই।

সারা সন্ধ্যা ওদের গল্প চলল, টিনের মাংসের খানা খাসা। অন্য ঘরটা তক্তা দিয়ে বন্ধ বলে এ ঘরটায় দুজনেই শুল বন্ধুর মত, আনিউতা বিছানায় আর আলেক্সেই কোচে, সঙ্গে সঙ্গে যৌবনসুলভ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেল দুজন।

ঘুম ভেঙ্গে যখন কোচে উঠে বসল আলেক্সেই তখন ধুলোর জালে সূর্যের আলো তেরছাভাবে ইতিমধ্যেই ঘরে পড়েছে। আনিউতা নেই। কোচের পিঠে পিন দিয়ে আটকানো এক টুকরো কাগজ: "হাসপাতালে তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছি। টেবিলে চা, খাবার-আলমারিতে রুটি আছে, চিনি নেই। শনিবারের আগে আসতে পারব না। আ.।"

এ ক'দিন ক্বচিৎ বাইরে গেল আলেক্সেই। কিছু করবার নেই, তাই বুড়ীর প্রাইমাস আর কেরোসিন স্টোভ, সস্‌প্যান আর ইলেকট্রিক সুইচগুলো মেরামত করল, এমন কি তার অনুরোধে সেই ঠোঁটকাটা মহিলা, আলেভতিনা আরকাদিয়েভ্‌নার কফি গুঁড়ো করার কলটি পর্যন্ত সারাল; প্রসঙ্গত দুধের সেই এনামেলের পাত্রটি এখনো সে ফিরিয়ে দেয়নি। এইভাবে বুড়ীর মন পেল আলেক্সেই, বুড়ীর স্বামীরও, সে নির্মাণ সংস্থার কর্মী, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক, অনেক সময়ে দিনের পর দিন তাকে বাইরে কাটাতে হয়। বুড়োবুড়ী শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এল যে ট্যাঙ্ক-বাহিনীর লোক অবশ্যই চমৎকার কিন্তু বৈমানিকরাও কোন অংশে ন্যূন নয়; ভালো করে চিনলে বোঝা যায় হাওয়াই পেশা সত্ত্বেও ওরা বেশ গম্ভীর প্রকৃতির সংসারী ঘরোয়া লোক।

অবশেষে কর্মচারিবৃন্দ বিভাগে গিয়ে তাদের রায় শোনবার দিন এসে

পড়ল। কোচে শুয়ে সারা রাত চোখ খুলে কাটাল আলেক্সেই। সকালে উঠে দাড়ি কামিয়ে মুখ ধুয়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় অফিসে পেঁছিল, প্রশাসন বিভাগের যে মেজরের উপরে তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তার ডেস্কে ওই প্রথম হাজির হল। মেজরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভালো লাগল না ওর। চোখ তুলে আলেক্সেইকে দেখল না পর্যন্ত মেজর, ভাবখানা যেন ওকে আসতে দেখেনি; কাজকর্মে বড়োই ব্যস্ত, ফাইল নিচ্ছে, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে, নানা লোককে টেলিফোন করা হল, বিশদভাবে মেয়ে কেরানীটিকে বোঝানো হল ফাইল কী করে রাখতে হয়, তারপর বেরিয়ে গেল ভদ্রলোক, অনেকক্ষণ টিকিটি দেখা গেল না। ততক্ষণে ভীষণ ঘেন্না ধরে গেছে আলেক্সেই'র, ওর লম্বা মুখ, লম্বা নাক, কামানো গাল, উজ্জ্বল ঠোঁট আর ঢালু কপাল, যেটা অলক্ষিতে মিলেছে চকচকে টেকো মাথায়, সবকিছু দুচক্ষের বিষ। অবশেষে ফিরে এল মেজর, বসে ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে শুধু তখনি আলেক্সেই'র দিকে দৃষ্টিপাত করল ব্যক্তিটি।

'আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট?' ভারিক্কি মোটা গলায় প্রশ্ন করা হল।

কী কাজে এসেছে মেরেসিয়েভ বলল। আলেক্সেই'র কাগজপত্র কেরানীটিকে আনতে বলে, পা ফাঁক করে বসে গভীর মনোযোগে দাঁত খুঁটতে লাগল মেজর, ভদ্রতার খাতিরে হাতের আড়াল করে রাখল দাঁত খোঁটার কাঠিটাকে। কাগজপত্র এল, শুরু হল মেরেসিয়েভের ফাইল পর্যবেক্ষণ করা। হঠাৎ হাত নাড়িয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে আলেক্সেইকে বসতে বলল মেজর: বোঝা গেল পায়ের পাতা কাটার কথায় পেঁছেছে সে। পড়ে চলল মেজর, ফাইল পড়া শেষ হলে আলেক্সেই'র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন?'

'ফাইটার কম্যান্ডের কোন দলে নিযুক্ত হতে চাই আমি।'

চেয়ারে ধড়াস করে হেলান দিয়ে অবাক হয়ে মেজর তাকাল বৈমানিকটির দিকে, সামনে সে তখনো দাঁড়িয়ে, নিজের হাতে তার জন্য একটা চেয়ার টেনে দিল মেজর। মেদল চকচকে কপালে পুরু ভুরুজোড়া তুলে জিজ্ঞেস করল:

'কিন্তু আপনি ত বিমান চালাতে পারবেন না!'

'পারি, পারবই! পরীক্ষা করার জন্যে কোন বিমান স্কুলে আমাকে পাঠিয়ে দিন!' প্রায় চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ। ওর বলার ঢঙে এত অদম্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

ভাব যে অন্যান্য ডেস্কের অফিসাররা কৌতূহলী দৃষ্টিতে এদিকে তাকাল; তামাটে সুদর্শন লেফ্টেনাণ্টটি এত জোর দিয়ে কী চাইছে ভাবল তারা।

মেজরের দৃঢ় ধারণা হল সামনের লোকটি হয় একগুঁয়ে নয় বদ্ধ পাগল। আলেক্সেই'র ক্রুদ্ধ মুখ আর "বন্য", জ্বলজ্বলে চোখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে সুরটা যথাসম্ভব নরম করার চেষ্টা করে বলল:

'কিন্তু শুনুন! পায়ের পাতা না থাকলে বিমান চালানো কী করে সম্ভব? আর সেটা আপনাকে করতে দেবে কে? ব্যাপারটা হাস্যকর। এ রকম ব্যাপার এর আগে কখনো হয়নি।'

'এর আগে কখনো হয়নি কিন্তু এখন হবে!' জেদ দিয়ে বলল মেরেসিয়েভ। নোটবুক থেকে সেলোফেনে মোড়া পত্রিকার পাতাটি বের করে ডেস্কে মেজরের সামনে রাখল সেটা।

অন্যান্য অফিসারেরা কাজ ছেড়ে ওদের কথাবার্তা একাগ্রভাবে শুনছে। ওদের মধ্যে একজন ডেস্ক থেকে উঠে মেজরের কাছে এল যেন কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চায়, দেশলাই চেয়ে নিয়ে তাকাল মেরেসিয়েভের দিকে। পত্রিকার পাতাটিতে চোখ বুলিয়ে মেজর জিজ্ঞেস করল:

'এটার ওপরে আমরা নির্ভর করতে পারি না। সরকারী দলিল নয় এটা। বিমান বাহিনীতে কর্মক্ষমতার নানা নির্দিষ্ট কড়া মানদণ্ড আছে, সে সব নির্দেশ মেনে চলতে হয় আমাদের। আপনার হাতের দুটো আঙুল না থাকলে বিমান চালাতে দিতাম না আপনাকে, পায়ের পাতার কথা ছেড়ে দিন। এই নিন আপনার কাগজ, কিছুই প্রমাণ করে না এটা। আপনার আকাঙ্ক্ষার প্রশংসা করি, কিন্তু...'

রাগে টগবগ করে ফুটছে মেরেসিয়েভ, মনে হল ডেস্ক থেকে দোয়াতদানিটা তুলে মেজরের চকচকে টেকো মাথায় ছুঁড়ে মারে। দম বন্ধ হয়ে আসা গলায় বলল:

'আর এটা?'

টেবিলের উপরে শেষ তাসটি রাখল মেরেসিয়েভ - কর্ণেলপদস্থ আর্মি সার্জন মিরভলস্কির সই-করা সার্টিফিকেট। দ্বিধান্বিতভাবে সেটা তুলে নিল মেজর। সার্টিফিকেটটি সরকারী কায়দায় লেখা, চিকিৎসা বাহিনী বিভাগের ছাপ মারা, সই করেছেন যে সার্জন বিমান বাহিনীতে বিশেষ খাতির তাঁর। পড়ে মেজরের কথা বলার ঢং বেশ নরম হয়ে এল। সামনের মানুষটি তাহলে উন্মাদ নয়। পায়ের পাতা নেই, তবু এই অনন্যসাধারণ যুবকটি সত্যি সত্যি

বিমান চালাতে ইচ্ছুক। চালাতে পারবে, সেটা বোঝাতে পেরেছে এমন কি প্রাজ্ঞ একজন আর্মি সার্জনকে, যাঁর কথার বিশেষ মূল্য আছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেরেসিয়েভের ফাইলটা সরিয়ে রেখে মেজর বলল:

'ইচ্ছে থাকলেও আপনার জন্যে আমি কিছু করতে পারি না। কর্ণেল পদস্থ আর্মি সার্জন যা খুসি লিখতে পারেন, কিন্তু আমাদের সুস্পষ্ট বাঁধা-ধরা নির্দেশ আছে, সেগুলো মানতেই হবে। যদি না মানি, তাহলে জবাবদিহি করবে কে... আর্মি সার্জন?'

গভীর ঘৃণায় হৃষ্টপুষ্ট আত্মবিশ্বাসী শান্ত আর সৌজন্যশীল অফিসারটির দিকে তাকাল মেরেসিয়েভ, দেখল তার সুষ্ঠু টিউনিকের পরিষ্কার কলার, লোমশ হাতদুটো, ছোট করে কাটা কুৎসিত বড়ো নখ। কী করে বোঝাবে একে? ওর মাথায় কিছু কি ঢুকবে? আকাশ-যুদ্ধ জিনিসটা কী ও কি জানে? হয়ত জীবনে কখনো গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শোনেনি। প্রাণপণে নিজেকে সামলে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ:

'কী করতে পারি তাহলে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল মেজর:

'আপনি যদি গোঁ ধরেন তাহলে কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের কমিশনে আপনাকে পাঠাতে পারি। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখি আপনাকে, তাতে কোন ফল হবে না।'

'জাহান্নমে যাক সব, কমিশনে পাঠিয়ে দিন আমাকে!' ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে মেরেসিয়েভ বলল।

তারপর শুরু হল অফিসে অফিসে ঘোরাঘুরি। ক্লান্ত সব অফিসার, কাজের অন্ত নেই তাদের, শুনল তার বক্তব্য, বিস্ময় ও সহানুভূতি জানাল আর অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। বাস্তবিক, কী করতে পারে তারা? নির্দেশ আছে ওদের, বেশ ভালো নির্দেশ, বাহিনীর কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠাঙ্কিত নির্দেশ, তাছাড়া আছে বাহিনীর বহু কালের ঐতিহ্য -- কী করে অমান্য করে সেগুলো? আর মেরেসিয়েভের ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট! অদম্য কিন্তু পঙ্গু লোকটি ফ্রন্টে ফিরে যেতে চাইছে গভীর আগ্রহে, তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত সবাই, সোজাসুজি "না" বলার মত নিষ্ঠুর কেউ নয়: তাই ওরা ওকে কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ থেকে পাঠাল ফরমেসন্স্ বিভাগে, ডেস্ক থেকে ডেস্কে, প্রত্যেকে দয়া করে ওকে পাঠাত নানা কমিশনের কাছে।

প্রত্যাখ্যান কিম্বা তিরস্কার, অপমানজনক সহানুভূতি আর অনুগ্রহ করার ভাব, যেটাতে তার গর্বিত মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়, কিছুই আর দমাতে পারে না মেরেসিয়েভকে। রাগ সামলে চলতে শিখল সে, উমেদারের মত কথা বলার ঢং আয়ত্ত করে ফেলল। এক এক দিন দুতিন জায়গায় হয়ত ওকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু নিরাশ হল না সে। বারবার পকেট থেকে বের করতে হচ্ছে পত্রিকার সেই পাতা আর আর্মি সার্জনের সার্টিফিকেট, জীর্ণ হয়ে গেল দুটো, ভাঁজে ভাঁজে গেল ছিঁড়ে, অয়েল-পেপারে সেদুটো জুড়ে নিতে বাধ্য হল আলেক্সেই।

ঘোরাঘুরি করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকছে বিনা ভাতায়, তাতে দুর্ভোগ বেড়ে গেল। এ পর্যন্ত রেজিমেন্ট থেকে ভাতার সার্টিফিকেট আসেনি, স্বাস্থ্যাবাসের দেওয়া খাবারদাবার শেষ হয়ে গিয়েছে। এটা সত্যি অবশ্য যে আনিউতার বাসায় বুড়োবুড়ীর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব এখন, তারা দেখে যে নিজের জন্য আর কিছু রাঁধে না আলেক্সেই, বারবার খেতে বলে ওকে: কিন্তু ওর জানা আছে জানলার নিচে ছোট্ট সব্জির ক্ষেতে কী পরিশ্রম করতে হয় বুড়োবুড়ীকে, ওদের কাছে প্রত্যেকটি পেঁয়াজ আর গাজরের মূল্য কতটা, কী করে রোজ সকালে রুটির খোরাক ওরা দুজনে ভাগ করে খায় ভাইবোনের মত। আর তাই বেশ উৎফুল্লভাবেই ওদের জানিয়ে দিল যে রান্নার হাঙ্গামা এড়াবার জন্য ও আজকাল অফিসারদের মেসে খায়।

শনিবার এল, আনিউতার ছুটির দিন – রোজ সন্ধ্যায় আলেক্সেই নিজের অসন্তোষজনক অবস্থার কথাটা ফোনে ওকে জানাত। মরীয়া গোছের কিছু একটা করবে ঠিক করল আলেক্সেই। কিট-ব্যাগে তখনো ছিল ওর বাবার রূপোর পুরোনো সিগারেট-কেসটা, কালো এনামেলে তার কোণে আঁকা তিনটে তুরন্ত ঘোড়ায় টানা একটা শ্লেজের নক্সা। ভিতরে লেখা: "পঞ্চবিংশ বিবাহ বার্ষিকীর দিনে। বন্ধুদের উপহার।" ধূমপান করে না আলেক্সেই, কিন্তু যুদ্ধে যাবার সময়ে মা বহুমূল্যবান পারিবারিক অভিজ্ঞানটি তার পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন, তারপর ওর সঙ্গে সঙ্গে হামেশা ঘুরেছে ভারী বেঢপ জিনিসটা, বিমান চালাবার সময়ে "কপাল ভালো করার" জন্য পকেটে রাখত ওটা। কিট-ব্যাগ থেকে হাতড়ে সেটা বের করে সেকেণ্ড-হাণ্ড জিনিসের দোকানে গেল আলেক্সেই।

রোগা একটি মহিলা -- ন্যাপথলিনের গন্ধ গায়ে — ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

সিগারেট-কেসটি দেখল, হাড়-বের করা আঙুলে লিপিটা দেখিয়ে জানাল যে লিপি চিহ্নিত জিনিসপত্র বিক্রীর জন্য নেওয়া হয় না।

'কিন্তু বেশী দাম ত আমি চাইছি না। দামটা আপনিই বলুন না।'

'না, না! তাছাড়া কমরেড অফিসার, পঞ্চবিংশ বিবাহ বার্ষিকীতে উপহার নেওয়ার সময় আপনার এখনো আসেনি মনে হচ্ছে,' বিদ্রূপ করে বলল ন্যাপথলিন মহিলাটি, অসূয়াপরবশ বিবর্ণ চোখে আলেক্সেই'র দিকে তাকিয়ে। টকটকে লাল হয়ে উঠল আলেক্সেই'র মুখ, টেবিল থেকে সিগারেট-কেসটা ঝট করে তুলে বেরিয়ে যাবার দরজার দিকে গেল। কে যেন হাত ধরে থামাল তাকে, মুখে লাগল মদের ঝাঁঝালো গন্ধ, কানে কানে বলল:

'জিনিসটা খাসা দেখতে। সস্তা বলছ?' জিজ্ঞেস করল যে ব্যক্তিটি তার মুখটি কুৎসিৎ, দাড়িগোঁফ কামায়নি, নাকটা বড়ো আর নীল। সিগারেট-কেসের দিকে বাড়িয়ে দিল পেশল কম্পমান একটি হাত। 'বেজায় ভারী। স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের একটি বীরের খাতিরে তোমাকে পাঁচশ রুবল দেব আমি।'

দর কষাকষি করল না আলেক্সেই। পাঁচশ রুবলের নোটগুলো নিয়ে পুরোনো দুর্গন্ধ জিনিসপত্রের রাজত্ব থেকে এক দৌড়ে বেরোল খোলা হাওয়ায়। সবচেয়ে কাছের বাজারে গিয়ে কিছু মাংস, কিছু চর্বি, রুটি, আলু আর পেঁয়াজ কিনল, কয়েক গাছা পার্সলি সওদা করতেও ভুলল না। মোট বয়ে চলল বাসাতে, এই নামেই আজকাল ঘরটিকে ডাকে সে, চর্বির একটা টুকরো চিবোতে চিবোতে।

'নিজের রেশন নিয়ে আবার রান্না করে নেব নিজে, ঠিক করেছি। মেসে যা জঘন্য খাবার দেয়!' রান্নাঘরের টেবিলে কেনা জিনিসগুলো একটার পর একটা রাখতে রাখতে আলেক্সেই মিথ্যে কথা বলল বুড়ীকে।

সেদিন সন্ধ্যায় খাসা খানা তৈয়ার হল আনিউতার জন্য: মাংস দিয়ে তৈরী আলুর সুপ, রজন রঙের ঝোলে ভাসছে পার্সলির পাতা, পেঁয়াজে ভাজা মাংস, এমন কি ক্র্যানবেরির জেলি পর্যন্ত, আলুর খোসার শ্বেতসার থেকে সেটা বানিয়েছে বৃদ্ধা। আনিউতা এল, ফ্যাকাশে আর ক্লান্ত। জোর করে মুখ হাত ধুয়ে জামাকাপড় বদলাল। তাড়াহুড়ো করে খেল খানার প্রথম পদটি, তারপর দ্বিতীয়টি, আর গা ছড়িয়ে দিল পুরোনো কুহকী কেদারাটায়, দরদে-ভরা সিল্কের বাহুতে পুরোনো বন্ধুর মত জড়িয়ে ধরে লোককে সেটা, কানে কানে মধুর স্বপ্নের কথা বলে। ঘুমিয়ে পড়ল আনিউতা, পাকা রাঁধুনীর

হাতে তৈরী জেলিটা, খোলা কলের নিচে একটা টিনের কৌটোয় ঠাণ্ডা করা হচ্ছিল সেটাকে, তার জন্য অপেক্ষা করল না সে।

অল্প ঘুমিয়ে চোখ খুলল আনিউতা; এরিমধ্যে পুরোনো আরামী আসবাবপত্রে ভরা ছোট গোছালো ঘরটিতে প্রদোষের ধূসর ছায়া জড়ো হয়েছে। খাবার টেবিলের পাশে, পুরোনো বাতিদানিটার নিচে দুহাতে মাথা টিপে বসে আছে আলেক্সেই, এত জোরে টিপে আছে যে মনে হচ্ছে মাথাটা ভেঙ্গেচুরে ফেলতে চাইছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বসার ধরনে এমন গভীর হতাশা যে বলিষ্ঠ জেদী মানুষটির জন্য করুণায় আনিউতার বুক ভরে গেল। উঠে লঘু পায়ে ওর কাছে গিয়ে প্রকাণ্ড মাথাটি জড়িয়ে চুলে আঙুল বুলিয়ে দিল। আনিউতার হাত ধরে করতলে চুম্বন করল আলেক্সেই, তারপর হেসে উৎফুল্লভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বলল:

'ক্র্যানবেরি জেলিটার কী হল? বেড়ে লোক আপনি! আমি প্রাণপাত করে দেখছিলাম ওটা যাতে জলের তোড়ে ঠিক উত্তাপে আসে, আর আপনি কিনা ঘুমিয়ে পড়লেন! এতে যে কোন রাঁধুনী বিষাদসাগরে ডুবে যেত!'

ভিনিগারের মত টক "উৎকৃষ্ট" জেলি এক প্লেট করে দুজনে খেল; নানা বিষয়ে ফুর্তিতে গল্প চলেছে, দুটি বিষয় ছাড়া, যেন দুজনের সম্মতিক্রমে — সেদুটো হল গভজ্‌দেভ আর মেরেসিয়েভ। পরে যে যার কোচে শোবার ব্যবস্থা করা হল। করিডরে গিয়ে আনিউতা দাঁড়িয়ে রইল, ঠক করে আলেক্সেই'র নকল পায়ের পাতাদুটো মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনে ফিরে এল ঘরে, আলো নিভিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। অন্ধকার ঘর, কথা বলছে না কেউ, কিন্তু চাদরের খসখস আর খাটের স্প্রিঙের শব্দে আনিউতা বুঝতে পারল আলেক্সেই জেগে আছে। অবশেষে সে জিজ্ঞেস করল:

'ঘুমিয়েছেন না কি, আলিওশা?'

'না।'

'ভাবছেন?'

'হ্যাঁ। আর আপনি?'

'আমিও ভাবছি।'

আবার চুপ করে গেল দুজনে। রাস্তায় মোড় নিতে নিতে ট্রামের ঝনঝনানি। মুহূর্তের জন্য বিজলী তার থেকে আগুনের নীল স্ফুলিঙ্গে আলো হয়ে উঠল ঘরটা, দুজনের মুখ নিমেষের জন্য দুজনের চোখে পড়ল। চোখ খুলে জেগে আছে দুজনেই।

ওর নিষ্ফল ঘোরাফেরার বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেনি আলেক্সেই, কিন্তু আনিউতা আঁচ করল যে ওর ব্যাপার খুব সুবিধের নয়, হয়ত হতাশায় ওর অদম্য মন আস্তে আস্তে ভেঙ্গে পড়ছে। নারীসুলভ সহজাত বোধে বুঝতে পারল কী যন্ত্রণাই না পাচ্ছে মানুষটি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝল যে এখন যতই কষ্ট পাক না কেন ও, দরদ দেখালে যন্ত্রণাটা বেড়ে যাবে, সহানুভূতি খারাপ লাগবে শুধু।

আলেক্সেই চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, হাতে মাথা রেখে কয়েক পা দূরে বিছানায় শায়িত সুন্দরী মেয়েটির কথা ভাবছে, বন্ধুর মনের মানুষ মেয়েটি, নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু। অন্ধকার ঘরে কয়েক পা ফেললেই পেঁছিতে পারে তার কাছে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার বিনিময়ে সেটা ও করবে। খুব বেশী চেনে না মেয়েটিকে, আশ্রয় দিয়েছে ওকে, সহোদরার মত। মেজর স্ত্রুচকভ হয়ত আলেক্সেইকে বিদ্রূপ করবে, হয়ত এ কথাটা বললে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কিছু বলা যায় না... হয়ত এখন সবচেয়ে ভালো করে তাকে বুঝতে পারবে মেজর... আনিউতা চমৎকার মেয়ে সত্যি! কী রকম ক্লান্ত হয়ে যায় বেচারা, অথচ কী আগ্রহে না কাজ করে বেজ-হাসপাতালে!

'আলিওশা!' নরম গলায় ডাকল আনিউতা।

নিশ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মিত শব্দ এল মেরেসিয়েভের কোচ থেকে। ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠে লঘু পায়ে ওর কোচের কাছে গিয়ে বালিশটা ঠিক করে দিল আনিউতা, কম্বলটা গুঁজে দিল, যেন ও শিশু।

৭

প্রথমেই মেরেসিয়েভকে ডাকল কমিশন। বিরাট থলথলে কর্ণেল পদস্থ আর্মি সার্জন বিশেষ কাজ সেরে ফিরে এসেছেন শেষ পর্যন্ত, তিনিই সভাপতির চেয়ারে। আলেক্সেইকে দেখেই চিনতে পারলেন তিনি, এমন কি ওকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'আপনাকে ওরা নিচ্ছে না বুঝি?' সহানুভূতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সার্জন। 'হ্যাঁ, আপনার কেসটা সত্যিই কঠিন। আইন এড়িয়ে যেতে হবে, সেটা করা সহজ নয়।'

আলেক্সেইকে পরীক্ষা করার ঝামেলা নিল না কমিশন। লাল পেন্সিলে আর্মি সার্জন ওর দরখাস্তের উপরে লিখলেন: "কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ।

পরীক্ষার জন্য বিমানি স্কুলে দরখাস্তকারীকে পাঠানো সম্ভব মনে করি।' লেখাটি নিয়ে আলেক্সেই সোজা গেল কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের প্রধানের কাছে। জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে তাকে দেওয়া হল না। দারুণ রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল আলেক্সেই, কিন্তু জেনারেলের এ্যাডজুটান্টটি, চটপটে তরুণ ক্যাপ্টেন একজন, ছোট কালো গোঁফ, আর এত হাসিখুসি দরদী মুখ তার যে আলেক্সেই নিজেই অবাক হয়ে গিয়ে ওর ডেস্কের পাশে বসে পড়ল। যদিও এ্যাডজুটান্টদের ভালো লাগত না তার, "চিত্রগুপ্ত" বলে ডাকত তাদের আলেক্সেই, তবু নিজের কাহিনীটি খুঁটিয়ে বলল তাকে। মাঝেমাঝে টেলিফোন বেজে ওঠাতে বাধা পড়ছে কাহিনীতে, প্রায়ই ক্যাপ্টেনটি উঠে চলে যাচ্ছে প্রধানের ঘরে, কিন্তু প্রতিবার ফিরে এসেই আলেক্সেই'র দিকে মুখ করে বসছে, অকপট শিশুসুলভ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টিতে কৌতূহল আর শ্রদ্ধা এবং কিছুটা অবিশ্বাসও নিয়ে, তাড়া দিয়ে বলছে:

'হ্যাঁ, বলুন, তারপর কী হল?' কিম্বা হয়ত হঠাৎ বাধা দিয়ে বিস্ময়োক্তি করে উঠছে, 'সত্যি না কি? সত্যি বলছেন? আচ্ছা, বেশ!'

এ-অফিসে ও-অফিসে ঘোরাঘুরির কথা জানাল আলেক্সেই। সরকারী কলকব্জার ব্যাপারটা যে কী জটিল সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে ক্যাপ্টেনটির মনে হল, দেখতে কমবয়সী হলেও। রাগতভাবে সে বলল:

'শয়তান বেটারা! ওরকম ভাবে আপনাকে এদিক ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে যাবার কোন দরকার ছিল না। আপনি অসাধারণ... ঠিক কী করে ভাষায় প্রকাশ করি জানি না... অনন্যসাধারণ লোক আপনি... কিন্তু জানেন, শেষ পর্যন্ত ওরাই ঠিক বলেছে: পায়ের পাতা না থাকলে বিমান চালানো যায় না।'

'চালানো যায়... দেখুন এটা...' পত্রিকার সেই পাতাটি, আর্মি সার্জনের মতামত আর কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের উদ্দেশ্যে লেখা পড়চাটা দেখাল মেরেসিয়েভ।

'কিন্তু পায়ের পাতা নেই, বিমান চালাবেন কী করে? মজার লোক আপনি! ও প্রবচনটা জানেন ত: পায়ের পাতা নেই যার, কখনো নাচিয়ে হবার ক্ষমতা নেই তার।'

আর কেউ বললে অপমানিত বোধ করত মেরেসিয়েভ নিশ্চয়ই, চটে উঠে কড়া কথা শুনিয়ে দিত হয়ত, কিন্তু ক্যাপ্টেনটির মুখে সদাশয়তার এমন একটা দীপ্তি যে মেরেসিয়েভ লাফিয়ে উঠে বাচ্চাদের মত বাচালভাবে

'কখনো নয়, বলছেন? দেখুন তাহলে!' বসবার ঘরের মধ্যে মেরেসিয়েভ শুরু করল উদ্দাম নৃত্য।

তারিফ করে কিছুক্ষণ দেখল ক্যাপ্টেন, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে আলেক্সেই'র কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রধানের ঘরে।

বেশ কিছুক্ষণ সে ঘরে রইল ক্যাপ্টেন। ঘর থেকে কথাবার্তার চাপা শব্দ আসছে, আলেক্সেই'র সমস্ত শরীর টান হয়ে গেল, বুক ধুক ধুক করছে ব্যথায় আর প্রতীক্ষায়, কোন ক্ষিপ্রগতি বিমানে সটান নিচে নেমে আসার সময়কার মত।

অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন, বেশ হাসিখুসি উত্তেজিত।

'বেশ,' বলল সে। 'বৈমানিকদের দলে আপনার যোগ দেবার কথায় জেনারেল অবশ্য কান দিলেন না, কিন্তু উনি লিখে দিয়েছেন: "বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে নিযুক্ত করা হোক দরখাস্তকারীকে, মাইনে আর রেশন কমবে না।" বুঝলেন ত... ওটা কমবে না...'

অবাক হয়ে দেখল ক্যাপ্টেন, খুসি হওয়া দূরের কথা, রাগে ঝলসে উঠল আলেক্সেই'র চোখ।

'বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়ন! কক্ষণো নয়!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'কথাটা মাথায় ঢুকছে না কেন আপনাদের? মাইনে আর রেশন নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না: বৈমানিক আমি! বিমান চালাতে, লড়তে চাই আমি!.. কেন সেটা বুঝছে না লোকে? অতি সহজ কথা এটা...'

বিব্রত লাগল ক্যাপ্টেনের। বাস্তবিক আজব দরখাস্তকারীটি। অন্য কেউ হলে আনন্দে নেচে উঠত... কিন্তু ইনি! একেবারে উন্মাদ! কিন্তু উন্মাদটিকে ক্রমশ বেশী ভালো লাগছে ক্যাপ্টেনের। আন্তরিক সহানুভূতি বোধ করছে সে, ওর বিচিত্র দায়ে সাহায্য করতে চায়। হঠাৎ একটা ফন্দি এল ওর মাথায়। চোখ টিপে, আঙুলের ইসারায় মেরেসিয়েভকে ডেকে একবার প্রধানের ঘরের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন বলল:

'যথাসাধ্য করেছেন জেনারেল। আর কিছু করার ক্ষমতা নেই ওঁর। শপথ করে বলছি। বৈমানিকদের দলে আপনাকে পাঠালে লোকে ভাববে ওঁর মাথার ঠিক নেই। কী করতে হবে বলি। বড়োকর্তার কাছে সোজা চলে যান। একমাত্র তিনিই আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।'

আলেক্সেই'র নতুন বন্ধু একটা পাস জোগাড় করে দিল। আধ-ঘণ্টা পরে বড়োকর্তার অফিসের বসবার ঘরের কার্পেট-ঢাকা মেঝেতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল মেরেসিয়েভ। কথাটা আগে তার মনে হয়নি কেন? সত্যি ত! সময় নষ্ট না করে উচিত ছিল সটান এখানে চলে আসা। হার কিম্বা জিৎ... এখন... লোকে বলে বড়োকর্তা নিজের কালে ওস্তাদ বৈমানিক ছিলেন। তাঁর ত বোঝা উচিত! জঙ্গী বিমানচালককে নিশ্চয়ই উনি বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে পাঠাবেন না!

কয়েকজন গম্ভীর জেনারেল আর কর্ণেল সেখানে বসে নিচু গলায় আলাপ করছিলেন। কয়েকজন স্পষ্টতই অস্থির, ক্রমাগত ধূমপান করছেন। বিচিত্রভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পায়চারি করছে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। অভ্যাগতরা সবাই চলে গেল, মেরেসিয়েভের পালা এবার, ক্ষিপ্রগতিতে ও গেল ডেস্কের কাছে, গোলগাল সাদাসিধে মুখ একটি নবীন মেজর সেখানে বসে ছিল।

'আপনি স্বয়ং বড়োকর্তার সঙ্গে দেখা করতে চান, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট?' জিজ্ঞেস করল মেজর।

'হ্যাঁ। আমার বিশেষ জরুরী একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলতে চাই ওঁকে।'

'আগে সে বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন কি? চেয়ার একটা টেনে বসুন। সিগারেট খান?' সিগারেট-কেসটা এগিয়ে দিল মেরেসিয়েভকে।

সিগারেট খায় না আলেক্সেই, কিন্তু কেন জানি একটা সিগারেট নিয়ে আঙুলের মধ্যে সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে রাখল ডেস্কে, তারপর হঠাৎ নিজের কাহিনীর সবটা শোনাল মেজরকে, যেমন করে বলেছিল ক্যাপ্টেনকে ঠিক তেমন ভাবে। কাহিনীটি শুনল মেজর, ভদ্রতা করে ঠিক নয়, বন্ধুভাবে সহানুভূতির সঙ্গে আর মনোযোগ দিয়ে। পত্রিকার পাতাটি আর আর্মি সার্জনের মতামত পড়ল মেজর। মেজর এত সহানুভূতি দেখাচ্ছে, যে তাতে ভরসা পেয়ে আর স্থানকালপাত্র ভুলে মেরেসিয়েভ দেখাতে চাইল যে সে নাচতে পারে... সমস্ত ব্যাপারটা আর একটু হলে ভণ্ডুল হয়ে যেত, কেননা ঠিক সে সময়ে সজোরে খুলে গেল অফিস-ঘরের দরজাটা, বেরিয়ে এলেন একটি লম্বা রোগা অফিসার চুল তাঁর কাকের মত কালো। ফটোগ্রাফে দেখা চেহারা, তৎক্ষণাৎ লোকটিকে চিনতে পারল আলেক্সেই। আর্মিকোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে পিছু পিছু আসা একটি জেনারেলকে কী যেন বলছিলেন

তিনি। অত্যন্ত চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে, মেরেসিয়েভকে দেখতে পর্যন্ত পেলেন না।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মেজরকে তিনি বললেন, 'আমি ক্রেমলিনে যাচ্ছি। ছ'টার সময়ে বিমানে স্তালিনগ্রাদে রওনা হতে হবে, তার বন্দোবস্ত করুন। আমরা নামব ভেরখনিয়া পগ্রোমনায়াতে।' তারপর যেমন তাড়াহুড়ো করে ঢুকেছিলেন তেমনি তাড়াহুড়ো করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তক্ষুণি বিমান পাঠাতে বলল মেজর, মেরেসিয়েভ ঘরে আছে মনে পড়াতে ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল:

'আপনার কপাল খারাপ। আমরা চলে যাচ্ছি। আবার আসতে হবে আপনাকে। থাকার জায়গা আছে আপনার?'

এক মুহূর্ত আগে অসাধারণ এই অভ্যাগতটিকে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর শক্ত দেখাচ্ছিল, আর এখন তার তামাটে মুখে এত গভীর হতাশা আর ক্লান্তির ছাপ পড়ল যে মেজর মত পরিবর্তন করল।

'আচ্ছা, বেশ ...' বলল সে। 'জানি প্রধানও ঠিক এটাই করতেন।'

সরকারী কাগজে কয়েক লাইন লিখে কাগজটা খামে পুরে উপরে ঠিকানা লিখল: "কর্মচারিবৃন্দ বিভাগের প্রধানকে।" খামটা মেরেসিয়েভকে দিয়ে করমর্দন করে মেজর বলল:

'সর্বান্তঃকরণে আপনার সাফল্য কামনা করি!'

চিঠিতে লেখা: "কম্যাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করেছেন সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আ. মেরেসিয়েভ। বিশেষভাবে সাহায্য করা উচিত ওঁকে। যাতে জঙ্গী বিমান বাহিনীর কাজে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য যা করা সম্ভব তা করতে হবে।"

এক ঘণ্টা পরে ছোট গোঁফওয়ালা ক্যাপ্টেনটি তার প্রধানের অফিস-ঘরে নিয়ে গেল মেরেসিয়েভকে। বৃদ্ধ জেনারেল, বলিষ্ঠ লোক তিনি, ভুরুজোড়া লোমশ আর খোঁচা খোঁচা, নোটটি পড়ে নীল প্রসন্ন চোখে বৈমানিকের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন:

'এরি মধ্যে তাহলে ওখানে যাওয়া হয়ে গিয়েছে? বেশ চটপটে বলতেই হবে। বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে পাঠাচ্ছিলাম বলে রাগে প্রায় ফেটে পড়েছিলে, তুমিই সেই ছোকরা তাহলে!' খোশমেজাজে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। 'খাসা ছোকরা! মালুম হচ্ছে ঘোড়েল বৈমানিক তুমি! বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নে যেতে চাও না! চটে উঠেছিলে, তাই না?.. কিন্তু তোমার মত তুখোড় নাচিয়েকে নিয়ে কী করি বলো ত? ঘাড় মুচড়ে পড়বে তুমি, আর

বোকা বুড়োর মত তোমাকে কাজে পাঠিয়েছি বলে ওরা আমার টুঁটি চেপে ধরবে! কিন্তু তুমি কী করতে পার সেটা কে বলতে পারে? এই যুদ্ধে আমাদের ছেলেরা এর চেয়েও বড়ো অনেক কিছু করে সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে... তোমার কাগজপত্র কোথায়?'

তারপর জেনারেল মেরেসিয়েভের দরখাস্তটার উপরে নীল পেন্সিলে হিজিবিজি করে, দুষ্পাঠ্য ভাবে, কোনক্রমে কথাগুলো সমাপ্ত করে লিখলেন: "দরখাস্তকারীকে ট্রেনিং-স্কুলে পাঠানো হোক।" কম্পিত হাতে কাগজটা ছিনিয়ে নিল মেরেসিয়েভ, কী লেখা হয়েছে তক্ষুণি সেটা পড়ে ফেলল ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার পড়ল সেটা; নিচে সান্ত্রী যেখানে পাস দেখে সেখানে এসে, তারপর বাসে, তারপর বাইরে বৃষ্টি-পড়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবার পড়ল। সারা দুনিয়ায় একমাত্র ওই শুধু জানে তাড়াতাড়ি আর হিজিবিজি করে লেখা সেই পাঁচটি শব্দের মানে আর মূল্য কী।

সেদিন ডিভিশনাল কম্যান্ডারের কাছে উপহার হিসেবে পাওয়া ঘড়িটা বেচে দিল আলেক্সেই মেরেসিয়েভ। বাজারে গিয়ে সেই টাকায় নানারকমের খাবার আর মদ কেনা হল, আনিউতাকে টেলিফোনে অনুনয় বিনয় করে বলল যেন ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি নিয়ে আসে, আনিউতার বাসার বুড়োবুড়ীকে নিমন্ত্রণ করল। নিজের বিরাট জয়লাভে আনন্দ করার জন্য ভোজের বন্দোবস্ত করল আলেক্সেই।

৮

মস্কোর কাছে, ছোট একটি বিমান-ঘাঁটির খুব কাছাকাছি ট্রেনিং-স্কুলটা। সেই সব উৎকণ্ঠায় ভরা দিনগুলিতে খুব কাজের তাড়া পড়েছে সেখানে।

স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে বড়ো একটা অংশ নিয়েছে বিমান বাহিনী। ভলগার এই গড়বন্দী জায়গাটির উপরে আকাশ হামেশাই আগুন আর বিস্ফোরণের ধোঁয়ায় রক্তাভ আর আচ্ছন্ন, অবিরত বিমান-হামলা রীতিমত বিরাট আকাশ-যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে সেখানে। দুপক্ষেই দারুণ লোকক্ষয় হচ্ছে। জঙ্গী স্তালিনগ্রাদ চায় বৈমানিক, আরো বেশী বৈমানিক, আরো বৈমানিক... লড়াই'এর তালিম দেবার ট্রেনিং-স্কুলটি শেখায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া বৈমানিকদের আর এতদিন বেসামরিক বিমান চালিয়েছে যারা তাদের, তাই

হাঁফ ছাড়ার সময় নেই এখন। ট্রেনিং দেবার বিমানগুলো দেখতে ড্র্যাগনফ্লাই'এর মত, ছোট ভিড়াক্রান্ত বিমান-ঘাঁটিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়িয়ে পড়েছে, রান্নাঘরে অপরিষ্কার টেবিলে মাছির মত, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শোনা যায় ওদের গুঞ্জন। চাকায় আড়াআড়িভাবে রেখাঙ্কিত মাটি, যখনি সেদিকে তাকানো যায় তখনি চোখে পড়ে একটা বিমান উঠছে, নামছে আর একটা।

স্কুলের চিফ অব স্টাফ লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলটি ছোটখাটো শক্তসমর্থ মানুষ, মুখটি লাল, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ লাল হয়ে গিয়েছে, মেরেসিয়েভের দিকে রাগতভাবে তাকালেন তিনি, যেন বলতে চান, "কোন শয়তান তোমাকে এনেছে? আমার হাতে যেন আর কাজ নেই।" বাড়িয়ে দেওয়া কাগজপত্রগুলি ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন তিনি।

"পায়ের পাতা নেই বলে আপত্তি তুলবে আর বলবে কেটে পড়তে," লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলের কালো দাড়ির গোড়ার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাবল মেরেসিয়েভ। কিন্তু ঠিক সময়ে একসঙ্গে দুবার টেলিফোনে ডাক পড়ল ওঁর। একটা রিসিভার কাঁধ দিয়ে কানে চেপে ধরে, অন্যটায় খিটখিট করে ভারী গলায় কী একটা বললেন, মেরেসিয়েভের কাগজপত্রে তারি সঙ্গে চোখ বুলিয়ে গেলেন। বোঝা গেল হিজিবিজি করে লেখা জেনারেলের নির্দেশটি শুধু তিনি পড়লেন, কেননা তক্ষুণি, রিসিভার তখনো হাতে, তার নিচে লিখে দিলেন: "লেফ্‌টেনাণ্ট নাউমভ, তৃতীয় ট্রেনিং ইউনিট। ভর্তি করে নেওয়া হোক।" দুটো রিসিভার একসঙ্গে নামিয়ে রেখে ক্লান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন তিনি:

"পোষাকের সার্টিফিকেট আছে? টাকার আর খাবারের সার্টিফিকেট? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি কী বলবেন। হাসপাতাল! সময় ছিল না হাতে। কিন্তু কী করে আপনাকে খাওয়াব? ওসবের জন্যে এক্ষুণি দরখাস্ত করে দিন। ভাতার সার্টিফিকেট না থাকলে আপনার নাম পাঠাব না!'

'বেশ, জো হুকুম!' কায়দায় সেলাম করে সানন্দে বলল মেরেসিয়েভ। 'যেতে পারি?'

'হ্যাঁ,' অবসন্নভাবে হাত নেড়ে বললেন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল। তারপর হঠাৎ ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের দেওয়া সোনালী নামাক্ষর আঁকা ভারী ছড়িটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলেন তারস্বরে, 'দাঁড়ান, কী ওটা?' অফিস থেকে চলে আসার সময়ে উত্তেজনায় ভুলে একটা কোণে রেখে এসেছিল ওটা মেরেসিয়েভ। 'ওটা কী? ফেলে দিন ওটা! দেখে মনে হচ্ছে

যেন এ জায়গাটা বেদেদের তাঁবু, সামরিক ইউনিট নয় — কিম্বা একটা বাগান: ছড়ি, বেত, ঘোড়ার চাবুক... শীগগিরই গলায় কবচ ঝোলাবেন মনে হচ্ছে আর ককপিটে নেবেন কালো বেড়াল! হতভাগা জিনিসটা যেন আর না দেখি! ফুলবাবু!'

'আচ্ছা, কমরেড লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেল!'

আলেক্সেই জানে এখনো অনেক বাধাবিপত্তি সামনে: নতুন সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করতে হবে, পুরোনো কাগজপত্র কেন হারিয়ে গিয়েছে সেটা বোঝাতে হবে খিটখিটে লেফ্টেনাণ্ট-কর্ণেলকে। স্কুলে ক্রমাগত লোক আসছে আর যাচ্ছে, বিশৃঙ্খলায় খাবারটা পর্যাপ্ত নয়, মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হতে না হতে রাত্রির শেষ খাবারের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে লোকেরা; বৈমানিকদের জন্য ৩ নং মেস যেখানে আস্তানা গেড়েছে, সেই স্কুলের ভিড়ঠেসা বাড়িটায় বাষ্পের নল ফেটে গিয়েছে, দারুণ ঠাণ্ডা, প্রথম দিন সারা রাত কম্বল আর চামড়ার কোটের নিচে শুয়ে ঠকঠক করে কেঁপেছে আলেক্সেই -- কিন্তু সব মিলিয়ে সোরগোল আর অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও ভালো লাগল তার; বালুতীরে খাবি-খাওয়া মাছকে ঢেউ'এ আবার সমুদ্রে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে ঠিক এ-রকম লাগে। এখানকার সবকিছু ভালো লাগল তার, এমন কি শিবির-জীবনের নানা অসুবিধা মনে করিয়ে দিল যে লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি এসে পড়েছে সে।

অভ্যস্ত সেই পরিবেশ; রঙচটা চামড়ার কোট গায়ে, কুকুরের লোমের বিমানি বুট পায়ে, তামাটে মুখ, ভাঙ্গা গলা, সব হাসিখুসি লোক ওর বেশ জানা; বিমান পেট্রলের মিঠেকড়া গন্ধে ভরপুর সেই অভ্যস্ত হাওয়া ইঞ্জিন গরম করার গর্জনে আর উড়ন্ত বিমানের সমান মন-জিরোনো ঘর্ঘর আওয়াজে মুখর; চটচটে ওভারঅল পরনে, ক্লান্তিতে মুহ্যমান মিস্ত্রীদের কালিঝুল-মাখা মুখ; খিটখিটে ইনস্ট্রাকটর সব, রোদে পুড়ে মুখ কাংস্যবর্ণ; আবহাওয়া কেন্দ্রে টুকটুকে গাল মেয়েরা; পরিচালনা-ঘাঁটির স্টোভ থেকে স্তরে স্তরে নীলচে ধোঁয়া উঠছে, সঙ্কেত-যন্ত্রটির মৃদু গুঞ্জন আর টেলিফোন বেজে ওঠার আকস্মিক শব্দ; যাত্রোদ্যত বৈমানিকরা "স্মৃতির জন্য" চামচে নিয়ে যাওয়াতে খাবার ঘরে ঘাটতি; রঙীন পেন্সিলে লেখা দেয়াল-সংবাদপত্র, তাতে আকাশে উঠেও মেয়েদের স্বপ্নবিভোর তরুণ বৈমানিকদের বিষয়ে কার্টুন ত থাকবেই। বিমান-ঘাঁটির নরম হলদে মাটি চাকায় আর কীলকে কেটে কেটে গিয়েছে, খোশমেজাজে গল্প চলছে, রসালো নানা খিস্তি আর বিমানচালনা শাস্ত্রের বুলি — এ সব ত পরিচিত আর স্বীকৃত।

ধড়ে যেন প্রাণ এল মেরেসিয়েভের। জঙ্গী বিমান বাহিনীর লোকেদের সেই বিশেষ খোশমেজাজ আর বেপরোয়া ভাব ফিরে পেল সে, যে ভাব চিরকালের জন্য হারিয়েছে বলে মনে হয়েছিল। টান হয়ে দাঁড়িয়ে অধস্তন লোকেদের সেলাম কায়দায় ফিরিয়ে দেয় সে, ঊর্ধ্বতনদের দেখলে প্রথামত সম্মান জানায়। নতুন ইউনিফর্মটা হাতে এলে তক্ষুণি সেটা "মাপসই" করে বদলে নেওয়া হল, বদলাল যে সে হচ্ছে বিমান-ঘাঁটির ব্যাটেলিয়নের একজন প্রবীণ কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেণ্ট, বেসামরিক জীবনে সে ছিল দর্জি; অবসর সময়ে চটপটে খুঁতখুঁতে লেফ্‌টেনাণ্টদের একমাপে তৈরী সামরিক ইউনিফর্মগুলো বদলে সে একেবারে প্রমাণসই করে দিত।

প্রথম দিনেই বিমান-ঘাঁটিতে গেল মেরেসিয়েভ ৩ নং ইউনিটের ইনস্ট্রাকটর লেফ্‌টেনাণ্ট নাউমভের খোঁজে, যার অধীনে তাকে রাখা হয়েছে। খর্বদেহ, অত্যন্ত তৎপর লোক নাউমভ, মাথাটি বড়ো, হাতদুটো লম্বা, "টি" চিহ্নটির কাছে ছুটোছুটি করছে উপরের দিকে তাকিয়ে, ছোট একটা বিমান সে "খণ্ডে" উড়ছে। বৈমানিককে চেঁচিয়ে তিরস্কার করে সে বলল:

'বেটা চটের থলে... আহাম্মক... বলে কিনা জঙ্গী বিমান বাহিনীতে ছিল! আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না বাপু!'

নিজের পরিচয় দেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে প্রথাসম্মতভাবে সেলাম করল মেরেসিয়েভ, কিন্তু নাউমভ শুধু হাত নেড়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল:

'দেখেছেন? জঙ্গী! আকাশের বীরপুঙ্গব! ফৎফৎ করছে ঘুড়ির মত...'

দেখামাত্র ইনস্ট্রাকটরকে পছন্দ হল আলেক্সেই'র। এ ধরনের অল্প ছিটগ্রস্ত লোকেরা নিজেদের কাজের প্রেমে হাবুডুবু খায়, ভালো লাগে এদের আলেক্সেই'র; এদের সঙ্গে সহজে মানিয়ে চলতে পারে দক্ষ উৎসাহী বৈমানিকরা। বৈমানিকটি যে ভাবে বিমান চালাচ্ছে তার বিষয়ে কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য করল আলেক্সেই। খর্বদেহ লেফ্‌টেনাণ্ট বিচক্ষণভাবে তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আমার ইউনিটে আসছেন? কী নাম আপনার? কী ধরনের বিমান চালিয়েছেন? লড়াই করেছেন কখনো? কবে শেষবার বিমানে চড়েছেন?'

সবকটি জবাব ও শুনল কিনা আলেক্সেই ঠিক জানে না, কেননা আবার উপরে তাকিয়ে রোদ বাঁচাবার জন্য এক হাতের আড়াল করে অন্য হাত ঝাঁকিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট চেঁচাল তারস্বরে:

'শালা ঠেলাগাড়ি!.. কী ভাবে ঘুরছে দেখুন! ড্রয়িং-রুমে জলহস্তী যেন।'

পরের দিন সকালেই আলেক্সেই যেন দেখা করে আদেশ দিল লেফ্‌টেনাণ্ট, কথা দিল বিনা বিলম্বে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবে তাকে।

'এখন গিয়ে জিরিয়ে নিন, যাত্রার পরে বিশ্রাম দরকার। কিছু খেয়েছেন? এখানে বেজায় গণ্ডগোল, খাবার দিতে হয়ত ভুলে যাবে বুঝলেন? রামপাঁঠা বেটা! একবার নেমে এস, মজাটা দেখাচ্ছি তোমায়!'

জিরোতে গেল না আলেক্সেই, কেননা যেখানে শোবার ব্যবস্থা, "৯ক" নম্বর সেই ক্লাসরুমের চেয়ে বাইরে ঠাণ্ডা কম মনে হল: হাওয়ায় শুকনো, খরখরে বালি বিমান-ঘাঁটিতে সবেগে উড়ছে। ব্যাটেলিয়নে একটা মুচি খুঁজে বের করে, এক হপ্তার তামাক রেশন তাকে দিয়ে বলল তার অফিসারের পুরোনো বেল্ট কেটে যেন একজোড়া পেটি বানায়, বকলস আর ফাঁস থাকা চাই: সেদুটো দিয়ে যে বিমান চালাবে তার পাদানিতে নকল পায়ের পাতা বেঁধে নেবার মতলব আলেক্সেই'র। ফরমায়েসটা জরুরী আর একটু অদ্ভুত, মুচি তাই তামাক ছাড়াও আধ-লিটর ভদকা দাবী করল, কথা দিল যে বেশ ভালো করে বানিয়ে দেবে জিনিসটা। বিমান-ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে মেরেসিয়েভ বিমান চালনা অভিনিবেশ সহকারে দেখতে লাগল, যেন জিনিসটা সাধারণ শিক্ষানবিশি নয়, সেরা বৈমানিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছে; যতক্ষণ না শেষ বিমানটি মাটিতে নামল আর সেটাকে তার জায়গায় নিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল ততক্ষণ সেখানে সে রইল। বিমান চালনা যতটা না দেখল তার চেয়ে বেশী অনুভব করল বিমান-ঘাঁটির আবহাওয়া, আপন করে নিল ওখানকার কর্মব্যস্ততা, ইঞ্জিনের অবিশ্রান্ত গর্জন, হাউই'এর ভারী শব্দ, পেট্রল আর তেলের গন্ধ। সমস্ত সত্তা তার আনন্দমুখর; কাল বিমানটা অবাধ্যতায় বেসামাল হয়ে পড়ে যেতে পারে, দুর্ঘটনা হতে পারে সে কথাটা একবারও মনে হল না।

পরদিন সকালে যখন ওখানে গেল তখনো জায়গাটা ফাঁকা। ওদিকের লাইনে ইঞ্জিন গরম করা হচ্ছে, গর্জন উঠছে, বিশেষ স্টোভ থেকে বেরোচ্ছে আগুনের শিখা, প্রপেলারগুলো চালিয়ে দিয়ে মিস্ত্রীরা লাফিয়ে সরিয়ে আসছে, যেন সাপ ওগুলো। কানে আসছে সকালের পরিচিত নানা হাঁকডাক:

'তৈয়ার!'

'কনট্যাক্ট!'

'কনট্যাক্ট!'

কে যেন ধমকে উঠে আলেক্সেইকে জিজ্ঞেস করল এত ভোরে

বিমানগুলোর কাছে ঘোরাঘুরি করার মানেটা কী। ঠাট্টা করে জবাব দিল আলেক্সেই, আর চটুল ধুয়োর মত বার বার বলে চলল, "তৈয়ার, কনট্যাক্ট, কনট্যাক্ট!" কথাগুলো কী কারণে যেন মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছে না। অবশেষে আস্তে আস্তে রওনা হবার লাইনে বিমানগুলো এল, বেঢপভাবে হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে, পাখাগুলো কাঁপছে, মিস্ত্রীরা ধরে আছে সেগুলো। নাউমভ ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে, সিগারেটের টুকরো মুখে, টুকরোটা এত ছোট যে মনে হয় যে বাদামী আঙুলের ডগা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

'এসে পড়েছ দেখছি!' আলেক্সেই'র কায়দাসম্মত সেলামের প্রত্যুত্তরে বলল লেফ্‌টেনাণ্ট। 'বেশ, বেশ। প্রথমাগত, প্রথমে পরিবেষিত। ৯ নং বিমানের পিছনের ককপিটে বসো। আমি এক্ষুণি আসছি। দেখা যাক, কী ধরনের চিড়িয়া তুমি।'

সিগারেটের টুকরোটায় তাড়াতাড়ি কয়েকটা টান দিচ্ছে সে, আলেক্সেই সটান গেল বিমানটায়। ইনস্ট্রাকটর এসে পড়ার আগেই পায়ের পাতাদুটো পাদানিতে বেঁধে নেওয়া মতলব তার। লোকটি ত খাসা মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছু বলা যায় না! মাথায় হয়ত ঝট করে কিছু একটা ঢুকবে আর হট্টগোল বাঁধিয়ে বিমান চালাতে দেবে না ওকে। পিছল ডানা বেয়ে তাড়াহুড়ো করে উঠল মেরেসিয়েভ, ককপিটের পাশটা অস্থিরভাবে ধরে, উত্তেজনার দরুণ, আর অভ্যেস নেই বলে পাটা তুলে পৌঁছতে পারছিল না ও ধারটায় কিছুতেই; প্রৌঢ় মিস্ত্রীটি লম্বাটে বিষণ্ণ মুখে সবিস্ময়ে তাকাল তার দিকে আর ভাবল, "বেটা নেশায় চুর দেখছি!"

শেষ পর্যন্ত একটা টান-টান পা ককপিটে ঢোকাতে পারল আলেক্সেই, অসম্ভব চেষ্টা করে অন্য পাটাও, আর ধপ করে বসে পড়ল সিটে। পেটি দিয়ে নকল পায়ের পাতাদুটো পাদানিতে বাঁধল। বেশ ভালোভাবে বানানো হয়েছে পেটিদুটো, বিমান চালাবার পাদানির সঙ্গে নকল পাদুটো ফাঁস দিয়ে শক্ত আর স্বচ্ছন্দভাবে জড়িত। ছেলেবেলায় ব্যবহৃত খাসা স্কেটজোড়াটার মত।

ককপিটে মাথা ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল ইনস্ট্রাকটর:

'কী হে, নেশা করেছ নাকি? একবার শুঁকে দেখি ত!'

নিশ্বাস ফেলল আলেক্সেই। মদের গন্ধ নেই, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মিস্ত্রীর দিকে চটেমটে হাত নাড়ল ইনস্ট্রাকটর।

'তৈয়ার!'

'কনট্যাক্ট!'

'কনট্যাক্ট!'

কয়েকবার গুর গুর করে উঠল ইঞ্জিনটা, তারপর নিয়মিত তালে শোনা গেল পিস্টনগুলোর স্পন্দন। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠে স্বতই গ্যাসের লেভার টানল আলেক্সেই. কানে এল গরগর করে ইনস্ট্রাকটর কথা বলার যন্ত্রে বলছে:

'ষাড়ের মত তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই।'

থ্রটল নিজে খুলল ইনস্ট্রাকটর। গর্জিয়ে আর্তনাদ করে উঠল ইঞ্জিন, লাফিয়ে ডিঙিয়ে কিছুটা গিয়ে শুরু করল টানাদৌড়। ইনস্ট্রাকটর কল টিপল আর ড্র্যাগনফ্লাই'এর মত দেখতে ছোট বিমানটা খাড়াভাবে উঠল আকাশে। উত্তর ফ্রণ্টে ওর আদরের নাম "বনবাসী", কেন্দ্রীয় ফ্রণ্টে "কপিওয়ালা" আর দক্ষিণ ফ্রণ্টে "ভুট্টাওয়ালা।" সৈন্যরা সবাই বিমানটিকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি চালাত, পুরোনো কিঁচকিঁচে হলেও জিনিসটা বিশ্বস্ত আর অনুগত, সবাই খাতির করে সেটিকে, সব বৈমানিকই উড়তে শিখেছে সেটায়।

কোণাকুণি বসানো আয়নায় নতুন শিক্ষার্থীর মুখ দেখতে পাচ্ছে ইনস্ট্রাকটর। বেশ কিছুদিন ছেদের পর প্রথম বিমান চালাচ্ছে. এমন কত লোকের মুখ না সে দেখেছে! দেখেছে সেরা বৈমানিকদের অনুগ্রহসূচক হাসি; হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ক্লান্ত শ্রান্ত যাত্রার পরে আবার ধাতস্থ উৎসাহী লোকেদের উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ; বিমানপতনের দরুন সাঙ্ঘাতিক চোট পেয়েছে যারা, আকাশে ওঠবার পরে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে তাদের মুখ. দেখা দিয়েছে ভীতির লক্ষণ, ঠোঁট কামড়েছে তারা; দেখেছে প্রথম ওড়বার সময়ে শিক্ষানবীশদের বেয়াড়া কৌতূহলী মুখ। এতদিন ইনস্ট্রাকটরের কাজ করেছে সে, কিন্তু আয়নায় কখনো ছায়া পড়েনি এমন অদ্ভুত মুখভাবের, যে ভাব এই তামাটে, সুদর্শন সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টটির মুখে এসেছে, ওকে দেখে ত স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিমান চালনায় আনাড়ি নয় মোটেই।

নতুন শিক্ষার্থীর মুখের তামাটে চামড়া যেন জ্বরের প্রকোপে রক্তাভ হয়ে উঠেছে। ঠোঁটদুটো ফ্যাকাশে, ভয়ে নয়, উচ্চ একটা আবেগে, সেটা কী বুঝতে পারল না নাউমভ। লোকটি কে? কী ঘটছে ওর? কেনই বা মিস্ত্রীটি ওকে মাতাল ভেবেছিল?

বিমানটি আকাশে উঠেছে, ইনস্ট্রাকটর দেখল শিক্ষার্থীটার গগল্‌সহীন

কালো জেদী বেদে চোখ জলে ভরে উঠল, ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে গালে চোখের জল; বিমানটা মোড় ঘুরতে হাওয়ার ঝাপটায় উড়িয়ে নিয়ে গেল অশ্রু বিন্দু।

"মাথাটা একটু খারাপ মনে হচ্ছে। সাবধান হতে হবে আমাকে। কিছুই ত বলা যায় না..." ভাবল নাউমভ। আয়নায় ছায়া পড়ছে, উত্তেজিত মুখটির ভাবে এমন কিছু একটা ছিল যেটা চিত্ত আকর্ষণ করল ইনস্ট্রাকটরের। অবাক হয়ে দেখল আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে নিজের, সামনের সব যন্ত্রপাতি ঝাপসা হয়ে গেল।

'এবার তুমি ভার নাও,' কথা বলার যন্ত্রে মুখ দিয়ে বলল সে, কিন্তু পাদানি আর কল সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিল না; অদ্ভুত শিক্ষার্থীটি দুর্বলতার কোন লক্ষণ দেখালেই যাতে নিজে সামলে নিতে পারে তার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। ডুপ্লিকেট গিয়ারে হাত দিয়ে বুঝতে পারছে যে নতুন শিক্ষার্থীটি স্বচ্ছন্দে, অভিজ্ঞভাবে বিমান চালাচ্ছে, যেন "জাত বৈমানিক"; কথাটা বলতে ভালোবাসতেন স্কুলের চিফ অব স্টাফ, তিনি নিজে ঘাগী বৈমানিক, গৃহযুদ্ধের সময় থেকে বিমান চালিয়েছেন।

প্রথম কিস্তির পরে নতুন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে কোন সংশয় রইল না নাউমভের।

"নিয়মানুযায়ী" মসৃণভাবে চলেছে বিমানটা। অদ্ভুত যেটা লাগছে সেটা হল যে সোজাসুজি চালানোর সময়ে শিক্ষার্থীটি প্রায়ই একটু ডাইনে কিম্বা বাঁয়ে মুড়ছে, কিম্বা উপরনিচ করছে। মনে হল নিজের দক্ষতা যাচাই করে নিচ্ছে। নাউমভ ঠিক করল পরের দিনই ওকে একলা উড়তে দেবে, দুতিন বার ওড়ার পর ট্রেনিং বিমানে ওকে বসাবে; প্লাইউডের তৈরী সেটা, জঙ্গী বিমানের ক্ষুদ্র অনুকৃতি।

বেশ ঠাণ্ডা। ডানায় বসানো থার্মোমিটারে শূন্যের নিচে বারো সেণ্টিগ্রেড। ককপিটে কনকনে হাওয়া এসে ইনস্ট্রাকটরের কুকুরের লোমের বিমানি বুট ভেদ করে ঢুকছে, পা জমে যাচ্ছে। নামবার সময় হয়েছে।

কিন্তু যতবার ইনস্ট্রাকটর নামতে আদেশ করে ততবার আয়নাতে দেখে একজোড়া কালো জ্বলজ্বলে অনুনয়-ভরা চোখ। না, অনুনয়বিনয় করছে না, দাবী করছে, আর প্রত্যাখ্যান করার মত নির্দয় হতে পারছে না সে। দশ মিনিটের জায়গায় আধ-ঘণ্টা উড়ল তারা।

ককপিট থেকে লাফিয়ে নেমে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল নাউমভ আর

দস্তানা সুদ্ধ হাতদুটো সজোরে ঘষতে লাগল: সকালের অকাল ঠাণ্ডা কনকনে সত্যিই! শিক্ষার্থীটি কিন্তু ককপিটে কী একটা নিয়ে অস্থিরভাবে কাটাল কিছুক্ষণ, তারপর নামল মন্থরভাবে, মনে হল অনিচ্ছা সত্ত্বে। মাটিতে পা ঠেকার পর ডানার পাশে উবু হয়ে বসে পড়ল, মুখে আনন্দের মাতাল-করা ভাব, ঠাণ্ডায় আর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে গাল।

'ঠাণ্ডা, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ইনস্ট্রাকটর। "বিমানি বুটে সটান ঢুকছিল হাওয়াটা, কিন্তু তুমি ত সাধারণ জুতো পরে আছো? পা জমে যায়নি?'

'পায়ের পাতা নেই আমার,' জবাবে বলল শিক্ষার্থী, নিজের চিন্তায় তখনো হাসছে ও।

'কী?' বলে উঠল নাউমভ, বিস্ময়ে ওর মুখ ঝুলে পড়েছে।

'পায়ের পাতা নেই আমার,' স্পষ্টভাবে আবার বলল মেরেসিয়েভ।

'পায়ের পাতা নেই, তার মানে? দুটোর কিছু গড়বড় আছে, তাই বলছো?'

'না। আমার পায়ের পাতা একেবারেই নেই। এদুটো নকল।'

এক মুহূর্ত বিস্ময়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল নাউমভ। আজব লোকটা যা বলছে অবিশ্বাস্য সেটা। পায়ের পাতা নেই! কিন্তু এইমাত্র ত বিমান চালিয়েছে, আর ভালোই চালিয়েছে...

'দেখি ত,' বলল নাউমভ, গলায় উৎকণ্ঠার আভাস।

তার কৌতূহলে বিরক্তি কিম্বা অপমান বোধ করল না আলেক্সেই। বরঞ্চ ওস্তাদের মার দেখিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিতে চায় এই ফুর্তিবাজ লোকটিকে। যাদুকর যেন খেল দেখাচ্ছে এমন ভঙ্গীতে, ট্রাউজারের পা উপরে তুলে ধরল আলেক্সেই।

চামড়া আর এ্যালুমিনিয়ামে বানানো নকল পায়ে ভর করে শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে আছে, ইনস্ট্রাকটর মিস্ত্রী আর প্রতীক্ষারত বৈমানিকদের সারির দিকে ফুর্তিতে চেয়ে।

এক ঝলকে নাউমভ বুঝতে পারল লোকটি উত্তেজিত হয়েছিল কেন, ওর অস্বাভাবিক মুখভাবের কারণ কী, ওর কালো চোখে কেন জল এসেছিল, কেন বিমান চালাবার রোমাঞ্চ এত ব্যগ্রভাবে বিলম্বিত করতে চেয়েছিল সে। শিক্ষার্থীটি অবাক করে দিল তাকে। ছুটে কাছে গিয়ে পাগলের মত তার করমর্দন করে বলে উঠল ইনস্ট্রাকটর:

'কী করে এটা করলে, ছোকরা? তুমি জানো না, সত্যি তুমি জানো না, কী ধরনের মানুষ তুমি নিজে!..'

প্রধান ব্যাপারটি তাহলে সম্পন্ন এখন। ইনস্ট্রাকটরের চিত্তজয় করেছে সে। সন্ধ্যেবেলায় আবার দুজনের দেখা হল, শেখবার একটা কর্মসূচী তৈরী করা হল। দুজনেই মানল যে আলেক্সেই'র ব্যাপারটা সহজ নয়। বিন্দুমাত্র ভুল করলেই ওকে আর কখনো উড়তে না দেবার সম্ভাবনা আছে। আর যদিও এখন ওর একমাত্র বাসনা জঙ্গী বিমান চেপে যায় ভলগার বুকে বিখ্যাত সেই সহরটিতে যেখানে দেশের সেরা যোদ্ধারা দলে দলে যাচ্ছে, তবু ধৈর্য ধরে সে সর্বাঙ্গীন ট্রেনিং নিতে রাজী হল। আলেক্সেই বুঝতে পারল তার যে অবস্থা তাতে পয়লা নম্বরের সার্টিফিকেট না পেলে চলবে না।

৯

ট্রেনিং-স্কুলে মাস পাঁচেকের বেশী রইল মেরেসিয়েভ। বিমানক্ষেত্র বরফে-ঢাকা, বিমানগুলোকে রাখা হয়েছে রানারে। হেমন্তের নানা উজ্জ্বল রং আর ছড়িয়ে নেই, "আকাশ-খণ্ডে" উঠলে শুধু দুটো রং চোখে পড়ে আলেক্সেই'র: শাদা আর কালো। স্তালিনগ্রাদে জার্মানদের চরম পরাজয়ের উত্তেজনামূলক খবর, জার্মান ষষ্ঠ বাহিনীর সর্বনাশ আর পওলাসের আত্মসমর্পণ অতীতের ব্যাপার এখন। দক্ষিণে ক্রমশ শক্তিলাভ করছে অভূতপূর্ব অদম্য আক্রমণাত্মক প্রতিঘাত। জার্মানদের লাইন ভেঙ্গেচুরে জেনারেল রতমিস্ত্রভের ট্যাংক-বাহিনী শত্রুপক্ষের পিছনে পৌঁছিয়ে ওদের বিধ্বস্ত করছে। ফ্রণ্টে চলেছে এ ধরনের ব্যাপার, প্রচণ্ড আকাশ-যুদ্ধ চলেছে ফ্রণ্টের উপর, এ সময়ে ছোট তালিমি বিমানে ধৈর্য ধরে কিঁচ কিঁচ করে ওড়া আরো কঠিন মনে হয় আলেক্সেই'র; এর চেয়ে সহজ ছিল হাসপাতালের করিডর ধরে দিনের পর দিন বিরামহীন পায়চারি, কিম্বা স্ফীত, ব্যথায় জর্জর নুলো পায়ে মাজুরকা কিম্বা ফক্সট্রট নাচা।

কিন্তু হাসপাতালে থাকার সময়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল ও যে বিমান বাহিনীতে আবার কার্যক্ষম অবস্থায় ফিরে যাবে। লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছিল নিজের, আর দুঃখ কষ্ট শ্রান্তি ও হতাশা সত্ত্বেও চলেছে সে লক্ষ্যের দিকে। নতুন ঠিকানায় একদিন একটা মোটা খাম এল, ক্লাভদিয়া মিখাইলভনা পাঠিয়েছে সেটা। কয়েকটা চিঠি খামে, একটা ক্লাভদিয়া মিখাইলভনার

নিজের, সে জিজ্ঞেস করেছে যে তার কী রকম চলেছে, কী সাফল্য অর্জন করেছে, তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে কি না।

"হয়েছে কি?" নিজেকে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই, কিন্তু উত্তর না দিয়ে চিঠিগুলো বাছাই করতে লাগল। কয়েকটা চিঠি; একটি মা'র, ওলিয়ার একটি, একটি লিখেছে গভজদেভ; আর একটা তাকে বিশেষভাবে বিস্মিত করল, ঠিকানাটা "আবহাওয়া সার্জেণ্টের" লেখা, নিচে লেখা "ক্যাপ্টেন ক. কুকুশকিনের কাছ থেকে।" প্রথমে এই চিঠিটা পড়ল আলেক্সেই।

কুকুশকিন লিখেছে, তার বিমানকে শত্রুপক্ষ নামায়, গুলি লেগে আগুন ধরে যায় ওটাতে, পারাসুটে করে নিজের লাইনে কোনক্রমে নামে, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে হাত মচকে গিয়েছে। চিকিৎসা বিভাগে পড়ে আছে এখন, ওর ভাষায় "ডুস্‌দাতাদের ভব্য দলের সঙ্গে থেকে থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে"। যাই হোক, মাথা ঘামাচ্ছে না সে, তার দৃঢ় বিশ্বাস যে শীগগিরই আবার বিমান চালাতে পারবে। আরো লিখেছে যে চিঠিটা ডিক্টেট করছে আলেক্সেই'র অতি-পরিচিত পত্রদাতা ভেরা গাভ্রিলভা, আলেক্সেই'র কৃপায় বাহিনীতে তার "আবহাওয়া সার্জেণ্ট" নামটা এখনো চালু। চিঠিতে এ কথাও জানিয়েছে যে ভেরা বেশ ভালো দোসর, তার দুরবস্থায় সেই প্রধান অবলম্বন। এখানটায় নিজের হয়ে লিখেছে ভেরা, লঘুবন্ধনীতে অবশ্যই, যে কস্তিয়া বাড়াবাড়ি করছে। চিঠিটা থেকে আলেক্সেই জানল যে বাহিনীর লোক এখনো তাকে মনে রেখেছে, মেসরুমে টাঙ্গানো বাহিনীর বীরেদের ছবির মধ্যে তার ছবিও রাখা হয়েছে, ওর প্রত্যাবর্তনের আশা এখনো ছেড়ে দেয়নি রক্ষীরা। রক্ষীরা! হেসে মাথা নাড়ল মেরেসিয়েভ। বাহিনীকে রক্ষীর পতাকা দানের মত উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা তাকে জানাতে ভুলে গিয়েছে, কুকুশকিন আর তার বিনাবেতনের সেক্রেটারী তাহলে অন্য কিছু একটা নিয়ে নিশ্চয়ই খুব বিভোর।

মায়ের চিঠিটা আলেক্সেই খুলল। বুড়ী মায়েরা গল্পচ্ছলে যেমন সাধারণত লেখে ঠিক সে রকম, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আর উৎকণ্ঠায় ভরা: কেমন চলেছে ওর, ঠাণ্ডা লাগছে না ত, যথেষ্ট খাবার পাচ্ছে কিনা, শীতের জামাকাপড় পেয়েছে কি, একজোড়া দস্তানা বুনে পাঠাবেন কি তিনি? ইতিমধ্যেই পাঁচজোড়া বুনেছেন তিনি, সোভিয়েত বাহিনীর লোকেদের উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকটি দস্তানার বুড়ো আঙুলের উপরে দিয়েছেন একটি নোট... "আশা করি এটাতে তোমার কুশল হবে।" একজোড়া

আলেক্সেই'র কাছে পৌঁছিয়েছে তিনি আশা করেন। নিজের খরগোসের লোম থেকে তৈরী ওগুলো, বেশ সুন্দর আর গরম। হ্যাঁ, তিনি বলতে ভুলে গিয়েছেন যে একটি খরগোস পরিবার এখন তাঁর হয়েছে, মন্দা আর মাদীর জোড়া, আর সাতটা বাচ্চা। শুধু উপসংহারে, বুড়িমা-সুলভ স্নেহময় বকবকানির পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে:

জার্মানদের স্তালিনগ্রাদ থেকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওদের অনেক অনেক লোক মারা গিয়েছে, আর লোকে এমন কি বলছে ওদের একজন চাঁই জেনারেল পর্যন্ত ধরা পড়েছে। জার্মানদের ভাগানোর পর পাঁচ দিনের ছুটিতে ওলিয়া কামিশিনে এসেছিল। তাঁর কাছে ছিল ওলিয়া, কেননা ওলিয়ার বাড়িটা বোমায় ভেঙ্গে যায়। ও এখন স্যাপারস্ বাহিনীতে লেফ্‌টেনান্ট। ঘাড়ে চোট লেগেছিল ওলিয়ার, ওকে সম্মান-চিহ্ন দেওয়া হয়: ঠিক কী সম্মান-চিহ্ন সেটা অবশ্য জানানো প্রয়োজন মনে করেননি বৃদ্ধা। যোগ করেছেন যে তাঁর কাছে থাকার সময়ে প্রায় সব সময়েই ওলিয়া ঘুমোত, আর না ঘুমোলে আলেক্সেই'র কথা বলত; তাস খেলে ভাগ্যপরীক্ষা করত দুজনে, প্রতিবার চিড়িতনের রাজার উপরে আসত রুইতনের রাণী। তার অর্থটা আলেক্সেই'র নিশ্চয়ই জানা আছে! নিজের কথা বলতে গেলে, লিখেছেন তিনি, ওই রুইতনের রাণীটির চেয়ে শ্রেয় পুত্রবধূ তিনি কামনা করেন না।

বৃদ্ধার সরল কূটবুদ্ধিতে হাসল আলেক্সেই, "রুইতনের রাণীর" চিঠির ছাই রঙের খামটা খুলল সযত্নে। চিঠিটা দীর্ঘ নয়। ওলিয়া লিখেছে "ট্রেঞ্চ" খোঁড়ার পর, তার শ্রম বাহিনীর সবচেয়ে ভালো কর্মীদের খাস বাহিনীর একটি স্যাপারস্ দলে নেওয়া হয়। ও এখন লেফ্‌টেনান্ট-টেকনিশ্যানের পদে। ওর দলই শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণের মধ্যে মামায়েভ কুরগানের সেই বিখ্যাত রক্ষাব্যূহ গড়ে। ট্র্যাক্টর কারখানার চারিদিকে রক্ষাব্যূহও তাদের কাজ, এর জন্য দলটিকে অর্ডার অব দি রেড ব্যানার দেওয়া হয়। ওলিয়া লিখেছে যে ওদের কঠিন সময় যাচ্ছে, সমস্ত কিছু, টিনের মাংস থেকে শাবল পর্যন্ত ভলগার ওপার থেকে আনতে হচ্ছে, ক্রমাগত মেসিনগানের গুলি পড়ছে সেখানে। আরো লিখেছে যে সহরে একটিও বাড়ি অটুট নেই, বড়ো বড়ো গর্তে মাটি ভরা, দেখে মনে হয় চাঁদের বড়ো-করা ফটোগ্রাফ।

ওলিয়া লিখেছে যে হাসপাতাল ছাড়ার পর ওকে আর অন্যদের একটা গাড়ি করে স্তালিনগ্রাদের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ও দেখে রাশি রাশি

ফ্যাশিস্টদের মৃতদেহ কবর দেবার জন্য জড়ো করা হয়েছে। তখনো অনেকে রাস্তায় পড়ে আছে! "তোমার বন্ধু ট্যাঙ্ক-অফিসারটি, কী নাম তার ভুলে গিয়েছি, ওই যে সে যার সমস্ত পরিবারকে ওরা খুন করে, যদি সে একবার এখানে এসে স্বচক্ষে দৃশ্যটা দেখত; সত্যি বলছি, এ সবকিছুর সিনেমা তুলে ওর মত লোকদের দেখানো উচিত! কী প্রতিশোধ আমরা নিয়েছি দেখুক ওরা!" শেষে লিখেছে — দুর্বোধ্য ছত্রটি কয়েকবার পড়ল আলেক্সেই — এখন স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধশেষে সে নিজেকে বীরের মত বীর আলেক্সেই'র উপযুক্ত মনে করে। চিঠিটা লেখা তাড়ায়, ট্রেন থামা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। কোথায় যাচ্ছে ও জানে না, তাই ডাকঘরের ঠিকানাটা ওকে জানাতে পারছে না। ফলে ওর পরের চিঠিটা না পাওয়া পর্যন্ত আলেক্সেই আর জানাতে পারবে না যে সত্যিকারের বীরাঙ্গনা হল ওলিয়া নিজেই, যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যিখানে যে ছোট পাতলা মেয়েটি অক্লান্তভাবে কাজ করে গিয়েছে, সে। আবার খামটা ঘুরিয়ে দেখল পত্রলেখিকার নামটা স্পষ্টভাবে লেখা: গার্ডস জুনিয়র-লেফ্‌টেনাণ্ট ওলগা ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুহূর্তখানেকের অবসর মিললেই চিঠিটা বের করে আবার পড়ত আলেক্সেই, বিমানক্ষেতের কনকনে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়ায়, আর জমে-যাওয়া ক্লাসরুম "৯ক" ঘরে, যেটা এখনো তার আস্তানা, চিঠিটা অনেক দিন ধরে উষ্ণ রাখে তাকে।

শেষ পর্যন্ত ওর বিমান চালনার পরীক্ষার দিন ঠিক করল ইনস্ট্রাকটর নাউমভ। জঙ্গী-ট্রেনার বিমান চালাতে হবে তাকে, পরীক্ষাটা নেবে ইনস্ট্রাকটর নয়, স্কুলের চিফ অব স্টাফ স্বয়ং, বলিষ্ঠ শক্তসমর্থ লাল-মুখ সেই লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলটি, যিনি পেঁছবার দিনে তাকে খুব সাদর সম্ভাষণ জানাননি।

নিচে থেকে তাকে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে, অদৃষ্ট নির্ণয়ের সময় এসেছে, সেটা জেনে আলেক্সেই সেদিন নিজেকেও ছাড়িয়ে গেল। ছোট হালকা বিমানটিকে এত দক্ষতায় চালাল যে মুখর প্রশংসার ধ্বনি না করে পারলেন না লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল। বিমান থেকে নেমে যখন গেল ওঁর কাছে তখন নাউমভের মুখের খাঁজে খাঁজে আনন্দ আর উত্তেজনার দীপ্তি দেখে বুঝতে বাকি রইল না যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে।

'চমৎকার! হ্যাঁ, যাকে আমি বলি জাত বৈমানিক, তুমি তাই,'

গরগরিয়ে উঠলেন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল। 'শোনো, ইনস্ট্রাকটর হিসেবে এখানে থাকতে চাও? তোমার মত লোক আমাদের দরকার।'

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়াল মেরেসিয়েভ।

'তুমি দেখছি নেহাৎ বোকা! লড়তে যে-কেউ পারে. কিন্তু এখানে উড়তে শেখাতে তুমি!'

হঠাৎ লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলের চোখে পড়ল ছড়িটা. সেটাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেরেসিয়েভ, আর রাগে কালো হয়ে গেল তাঁর মুখ।

'আবার!' গর্জে উঠলেন তিনি। 'দাও আমাকে! ছড়ি হাতে পিকনিকে যাওয়া হচ্ছে নাকি! কোথায় আছ -- বুলভারে?.. আদেশ অমান্য করার জন্যে আটকঘরে আটচল্লিশ ঘণ্টা... সেরা বৈমানিক বটে! কবচ নিয়ে ঘোরা হচ্ছে! এর পরে বিমানের গায়ে রুইতনের টেক্কা আঁকবে দেখছি! আটচল্লিশ ঘণ্টা! কী বলছি কানে গিয়েছে?'

ছড়িটা মেরেসিয়েভের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল ক্রুদ্ধভাবে চারিদিকে তাকালেন, কিছুতে ঠুকে যদি ভাঙ্গা যায়।

'কমরেড লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল, যদি আমাকে বলার অনুমতি দেন... ওর পায়ের পাতা নেই,' মাঝে পড়ে বলল ইনস্ট্রাকটর নাউমভ।

আরো কালো হয়ে গেল অধিকর্তার মুখ; চোখদুটো যেন ফেটে পড়ছে, শ্বাস পড়ছে ঘনঘন।

'তার মানে? আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছ না কি? যা শুনলাম তা সত্যি?'

মাথা নেড়ে মেরেসিয়েভ মূল্যবান ছড়িটির দিকে আড়চোখে তাকাল, ওটার মরণকাল এসে পড়েছে। ভার্সিলি ভার্সিলিয়েভিচের উপহারটি বাস্তবিকই ইদানীং কখনো সঙ্গছাড়া করত না মেরেসিয়েভ।

বন্ধুদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল টেনে টেনে বললেন:

'আচ্ছা, সত্যিই যদি হয়... তাহলে, অবশ্য... দেখি তোমার পাদুটো... হুঁ!'

প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দিয়ে ট্রেনিং-স্কুল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল আলেক্সেইকে। তার অদ্ভুত সাফল্যের সবচেয়ে বেশী তারিফ করলেন, মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করলেন বদমেজাজী ঘাগী বৈমানিক সেই লেফ্‌টেনাণ্ট-

কর্ণেলটি। তিনি লিখলেন যে মেরেসিয়েভ "দক্ষ অভিজ্ঞ আর দৃঢ়চিত্ত বৈমানিক, বিমান বাহিনীর যে কোন শাখার উপযুক্ত।"

১০

উৎকর্ষ বাড়াবার একটি স্কুলে মেরেসিয়েভ বাকি শীত আর বসন্তের প্রথম ভাগটা কাটাল। স্থায়ী সামরিক বিমান স্কুল এটি, বিমানক্ষেত্রটি চমৎকার, খাসা থাকবার জায়গা, ক্লাব-ঘরটি উৎকৃষ্ট, সেখানে মস্কোর নানা থিয়েটার দল মাঝেমাঝে এসে অভিনয় করে। এই স্কুলেও বেশ ভিড়, কিন্তু প্রাক-যুদ্ধ সব আইনকানুন কড়াভাবে পালন করা হয়, এমন কি পোশাকের খুঁটিনাটির বিষয়েও সাবধানে থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের: বুট চকচকে নেই, কোট থেকে বোতাম একটা পড়ে গেছে, বেল্টের উপরে হয়ত তাড়াহুড়ো করে লাগানো হয়েছে মানচিত্রের কেস, দোষীকে কম্যাণ্ডাণ্টের হুকুমে দু ঘণ্টা কাওয়াজ করতে হত।

আলেক্সেই মেরেসিয়েভ একটি বড়ো দলে আছে, দলটি নতুন ধরনের একটি সোভিয়েত জঙ্গী বিমান — "লাভচ্কিন-৫" — চালানো শিখছে। শিক্ষা প্রণালীটি নিখুঁত, ইঞ্জিন এবং বিমানের অন্যান্য অংশের বিষয়েও জানতে হয়। বক্তৃতা শোনার সময়ে বাহিনী থেকে তার সংক্ষিপ্ত অনুপস্থিতির মধ্যে সোভিয়েত বিমান বিদ্যা কত দূর এগিয়ে গিয়েছে দেখে বিস্মিত হত আলেক্সেই। যুদ্ধের আগে যেটা মনে হত চমকপ্রদ আবিষ্কার সেটা এখন একেবারে সেকেলে। ক্ষিপ্র "সোয়ালো" আর হালকা, খুব উঁচুতে ওড়া "মিগ", যুদ্ধের শুরুতে যাদের একেবারে শেষ কথা মনে হত, তাদের এখন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের জায়গা নিচ্ছে নতুন ধরনের সব বিমান; অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে সোভিয়েত বিমান কারখানা এদের ব্যাপক নির্মাণ শুরু করে দেয়: একেবারে হালের নক্সার অত্যুৎকৃষ্ট "ইয়াক," চল হয়েছে "লাভচ্কিন-৫"এর, আর দুই-সিট "ইল" -- উড়ন্ত ট্যাঙ্ক যেন, প্রায় মাটি ছুঁয়ে জার্মানদের উপরে গোলাগুলি বর্ষণ করে, আতঙ্কিত জার্মানরা ইতিমধ্যেই এর নাম দিয়েছে "কালো যম"। সংগ্রামী জনগণের প্রতিভা সৃষ্টি করছে নতুন সব বিমান, আকাশ-যুদ্ধের কায়দা জটিল হয়ে উঠেছে গুরুতরভাবে; যে বিমানটি চালানো হচ্ছে তার বিষয়ে জানাটাই এখন যথেষ্ট নয়, অদম্য সাহস ছাড়াও দরকার হাওয়ায় নিমেষে ঠিক ভারসাম্যে ফিরে



আসার, আকাশ-যুদ্ধকে খণ্ড খণ্ড ভাগে দেখার, আর নির্দেশের অপেক্ষা না করে, লড়ার সময়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেগুলোকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা।

এ সব অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু ফ্রণ্টে কোন ছাড়ান না দিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চলেছে; উজ্জ্বল উঁচু ক্লাসরুমে কালো খাসা ডেস্কের সামনে বসে বক্তৃতা শুনতে শুনতে ফ্রণ্টে যাবার, ওখানকার আবহাওয়ায় গিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষায় আলেক্সেই'র বুক ভরে যেত। শারীরিক যন্ত্রণা কী করে জয় করতে হয় শিখেছে সে, অসাধ্যসাধন করতে বাধ্য করেছে নিজেকে, কিন্তু এই যে জোর করে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা, তার অবসাদ জয় করার মত মনোবল নেই তার। মাঝেমাঝে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিরসমুখে অন্যমনস্কভাবে বদমেজাজে স্কুলে ঘুরে বেড়াত আলেক্সেই।

আলেক্সেই'র সৌভাগ্যবশত, স্কুলে একই সময়ে ছিল মেজর স্ত্রুচকভ। পুরোনো বন্ধুর মত দুজনে মেলে। আলেক্সেই'র দু সপ্তাহ পরে স্ত্রুচকভ আসে, কিন্তু কালবিলম্ব না করে স্কুলের জীবন গ্রহণ করল সে, যুদ্ধের সময়ে যে সব কড়া রীতিনীতি এত বেমানান মনে হত সবগুলোকে সাবধানে মানিয়ে চলল, প্রত্যেকের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ ভাব। আলেক্সেই'র মন খারাপের কারণটা চট করে সে আঁচ করল; রাত্রে বাথরুম থেকে শোবার ঘরে যাবার সময়ে আলেক্সেই'র পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে বলত:

'ও হে, আর শোক কোরো না! লড়াই ত আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না! দেখো না, বার্লিন এখনো কত দূরে! অনেক অনেক মাইল বাকি। আমাদের দিন আসবেই, ভাববার কিছু নেই। প্রাণভরে লড়াই করতে পারব আমরা।'

দু-তিন মাস ওদের সাক্ষাৎ হয়নি, এরি মধ্যে মেজর রোগা আর বুড়িয়ে গিয়েছে, বাহিনীর ভাষায়, মনে হচ্ছে ও "ভেঙ্গেচুরে" গিয়েছে।

শীতের মাঝামাঝি যে দলে মেরেসিয়েভ আর স্ত্রুচকভ ছিল সে দলটি বিমান চালানোয় তালিম নিতে শুরু করল। এতদিনে "লাভচ্কিন-৫"এর সবকিছু জানা হয়ে গিয়েছে আলেক্সেই'র, ছোট খাটো-ডানা বিমানটি, চেহারাটা উড়ন্ত মাছের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রায়ই, বিরতির সময়ে বিমানক্ষেত্রে গিয়ে আলেক্সেই দেখত মাটিতে সংক্ষিপ্ত দৌড়ের পর খাড়া হয়ে আকাশে উঠছে বিমানগুলো, ঘোরার সময় সূর্যের আলোয় ঝিক ঝিক করে ওঠে ওদের নীলচে পেটগুলো। একটা বিমানের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করত সেটাকে, ডানাতে আর পাশে টোকা মারত, যেন জিনিসটা যন্ত্র নয়, সুন্দর ফিটফাট জাতঘোড়া একটা। অবশেষে সার বেঁধে দলটি দাঁড়াত, রওনা হতে

হবে এবার। প্রত্যেকেই ব্যগ্র নিজের দক্ষতা পরখ করতে, প্রথমে কে উঠবে তাই নিয়ে অল্প বাগবিতণ্ডা শুরু হত। স্মুচকভকে প্রথমে ডাকল ইনস্ট্রাকটর। দীপ্ত হয়ে উঠল তার মুখ, চতুরভাবে হাসল, উত্তেজনায় শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পারাস্যুট এ'টে ককপিটের ঢাকনাটা টেনে দিল সে।

গর্জিয়ে উঠল ইঞ্জিন, বিমানক্ষেত হয়ে তীরের মত গেল বিমানটা, সূর্যালোকে রামধনুর মত ঝিকঝিকে গ‍ুঁড়ো গ‍ুঁড়ো বরফের রেশ পিছনে রেখে এক নিমেষে আকাশে উঠল, আলোয় ঝকঝক করছে ডানাদুটো। বিমানক্ষেতের উপরে অপরিসর বক্র রেখা আঁকল স্মুচকভ, সুন্দরভাবে হেলল কয়েকবার, উল্টে গেল তারপর, আর নির্দিষ্ট সংখ্যা কসরৎ দেখিয়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে, হঠাৎ স্কুলের ছাতের উপর থেকে তীরের মত বেরিয়ে এসে, ইঞ্জিনের গর্জনে, বিমানক্ষেতের উপর দিয়ে এক ঝটকায় আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, প্রতীক্ষারত শিক্ষার্থীদের টুপি আর একটু হলে উড়ে যেত। যাই হোক, শীগগিরই ফিরে এল সে, ধীরেসুস্থে নিচের দিকে এসে সুকৌশলে নামল। ককপিট থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল সে, উত্তেজিত উচ্চকিত আনন্দে অধীর, দুষ্টুমিতে সফল খুসি ছোকরার মত।

'যন্ত্র নয় এটা, নিছক ভায়োলিন, সত্যি বলছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে চে'চিয়ে বলল স্মুচকভ, বেপরোয়াভাবে চালানোর জন্য ইনস্ট্রাকটরের বকবকানির বাধা দিয়ে। 'ওটাতে চাইকভস্কির সুর বাজানো যায়, সত্যি বলছি!' বলিষ্ঠ হাতে মেরেসিয়েভকে জড়িয়ে বলে উঠল, 'বে'চে থাকা ভালো, আলিওশা!'

সত্যি অদ্ভুত ভালো বিমানটি। সে বিষয়ে সবাই একমত। মেরেসিয়েভের পালা এল। পাদানিতে পা বে'ধে শূন্যে উঠল সে, আর হঠাৎ মনে হল এই ঘোড়াটি ওর পক্ষে বড়ো বেশী তেজী, পা নেই তার, অতি সাবধানে চালাতে হবে। উপরে ওঠবার সময়ে যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগের সেই পরিপূর্ণ চমৎকার অনুভূতিটি, যেটা বিমান চালানোর আনন্দের উৎস, অনুভব করেনি সে। বিমানটি চমৎকারভাবে গঠিত। প্রতিটি সঞ্চালনে স্টিয়ারিং গিয়ারে হাতের স্বল্প স্পন্দনে সাড়া দিয়েই তক্ষুণি যথাযথভাবে যায়। সুরে-বাঁধা ভায়োলিনের মতই ওটার সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। আর এটাতেই তার চরম লোকসানের কথাটা তীব্রভাবে অনুভব করল আলেক্সেই, নকল পায়ের পাতায় সাড়া দেবার ক্ষমতা নেই; ও বুঝতে পারল যে এ-রকম একটা বিমানে নকল পায়ের পাতা, তা যতই ভালোভাবে বানানো হোক না কেন, যতই না অভ্যেস করা হোক, কখনোই আসল জীবন্ত নমনীয় পায়ের অভাব পূর্ণ করতে পারে না।

সহজে অবলীলাক্রমে হাওয়া কেটে চলেছে বিমানটি, স্টিয়ারিং-গিয়ারের প্রতিটি নড়নে সাড়া দিচ্ছে, কিন্তু বিমানটিকে ভয় হচ্ছে আলেক্সেই'র। লক্ষ্য করল যে ঘোরার সময়ে পায়ের পাতা ঠিক সময়ে পড়ছে না, যে সুষম সমন্বয় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত বৈমানিকদের আয়ত্তাধীন হয়, সে ভাবটা আসছে না। দেরীর জন্য হঠাৎ ঘুরপাকে পড়তে পারে বিমানটা, সেটা হতে পারে মারাত্মক। নিজেকে পা বাঁধা ঘোড়ার মত মনে হল আলেক্সেই'র। ভীরু সে নয়, মৃত্যুর ভয় করে না, ওঠবার সময়ে পারাসুটটা ঠিক আছে কিনা সেটা পর্যন্ত দেখেনি; কিন্তু ওর আশঙ্কা যে সামান্য ভুল করলেও বিমান বাহিনী থেকে হয়ত সরিয়ে দেবে, তার প্রিয় কাজ আর কখনো করতে পারবে না। তাই অত্যন্ত সাবধানে চালাল সে, আর বিমানটি নামাবার সময়ে মুষড়ে পড়ল; সাড়াবিহীন পায়ের পাতার জন্য এত অপটুভাবে নামাল যে বিমানটি বরফের উপরে কয়েকবার বেঢপভাবে লাফাল।

ভ্রূকুটিকুটিল মুখে নিঃশব্দে ককপিট থেকে নামল আলেক্সেই। অস্বস্তি গোপন করে ওর বন্ধুরা, ইনস্ট্রাকটরটি পর্যন্ত, ওকে প্রশংসা করল আর অভিনন্দন জানাল, কিন্তু ওদের অনুগ্রহের ভাবে অপমান বোধ করল আলেক্সেই। হাত অধীরভাবে নেড়ে পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে বরফের উপর দিয়ে চলল ধূসর স্কুল বাড়িটার দিকে। জঙ্গী বিমান এতদিন পরে চেপে বিফল হওয়া! মার্চের সেই সকালে চোট-খাওয়া বিমানটি পাইনগাছের মাথায় পড়ার সেই সর্বনেশে দুর্ঘটনার পর সবচেয়ে খারাপ মুহূর্ত এটা। মধ্যাহ্ন-ভোজনে গেল না সেদিন, রাত্রের শেষ খানায় অনুপস্থিত রইল। স্কুলের বিধিতে দিনের বেলায় শয়নাগারে থাকা শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে বারণ, সে বিধির খেলাপ করে বুটশুদ্ধ ও বিছানায় শুয়ে রইল, হাতে মাথা রেখে। ওর ব্যথার কথা জানত যারা, কি ভারপ্রাপ্ত অফিসার কি কর্তারা পাশ দিয়ে যাবার সময়ে কিছু বলল না ওকে। স্ত্রুচকভ একবার এসে কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু সাড়া না পেয়ে সমব্যথায় মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

ঘর ছেড়ে স্ত্রুচকভ চলে যাবার প্রায় পরমুহূর্তেই এলেন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল কাপুস্তিন, স্কুলের রাজনৈতিক অফিসার তিনি। খর্বদেহ কুৎসিৎ চেহারার লোক, চোখে মোটা চশমা, বেমানান ইউনিফর্ম থলের মত শরীর থেকে ঝুলে পড়েছে। আন্তর্জাতিক নানা সমস্যা নিয়ে ওঁর বক্তৃতা শুনতে শিক্ষার্থীরা ভালোবাসে, সে সময়ে এই বেঢপ চেহারার মানুষটি ওদের মনে গর্ব জাগাত যে এই মহাযুদ্ধের অংশীদার তারা। কিন্তু অফিসার হিসেবে

তাঁর সম্বন্ধে উঁচু ধারণা ছিল না ওদের, মনে করত বেসামরিক লোক একটি, বিমানবিদ্যা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, দৈবক্রমে ঢুকে পড়েছেন বিমান বাহিনীতে। মেরেসিয়েভকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাপুস্তিন ঘরের চারিদিকে একবার তাকালেন, জোরে ঘ্রাণ নিয়ে চটে উঠে হঠাৎ বলে উঠলেন:

'কোন বেটা সিগারেট খেয়েছে এখানে? ধূমপানের জন্যে ত আলাদা ঘর আছে। এটার মানে কী, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট?'

'আমি সিগারেট খাই না,' বিছানা থেকে না উঠে নিস্পৃহভাবে জবাব দিল আলেক্সেই।

'আপনি এখানে শুয়ে আছেন কেন? স্কুলের নিয়ম কি জানেন না? ঊর্ধ্বতন কেউ এলে উঠে দাঁড়ান না কেন?.. উঠে দাঁড়ান।'

আদেশ করেননি তিনি। বরঞ্চ, বেসামরিক লোকের মত শিষ্টভাবে কথাটা বলা হয়েছিল। মেরেসিয়েভ অবসন্নভাবে কথাটা মেনে উঠে খাটের পাশে দাঁড়াল।

'বেশ, বেশ, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' উৎসাহ দিয়ে বললেন কাপুস্তিন। 'এবারে বসুন, কথা আছে।'

'কী বিষয়ে?'

'আপনার বিষয়ে। চলুন বাইরে যাই। পাইপ খেতে চাই, এখানে সেটা বারণ।'

স্বল্পালোকিত করিডরে গিয়ে জানলার কাছে দুজনে দাঁড়াল, ব্ল্যাক-আউটের জন্য ইলেকট্রিক বালবগুলোয় নীল রং-দেওয়া। পাইপে টান দিচ্ছেন কাপুস্তিন, প্রতিটি টানে চওড়া চিন্তাকুল মুখ আলো হয়ে উঠছে।

'আপনার ইনস্ট্রাকটরকে বকতে চাই আমি,' তিনি বললেন।

'কেন?'

'উপরওয়ালাদের অনুমতি বিনা আপনাকে উড়তে দেওয়ার জন্যে... ওরকমভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? সত্যি কথা বলতে, আপনার সঙ্গে আগে কথা না বলার জন্যে আমাকেই বকা উচিত। আমার সময় হয় না, সব সময়ে ব্যস্ত থাকি। আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু... যা থেকে, ও কথাটা ছেড়ে দেওয়া যাক। শুনুন, মেরেসিয়েভ, আপনার পক্ষে বিমান চালানো খুব সহজ ব্যাপার নয়, আর তাই ঠিক করেছি ইনস্ট্রাকটরকে উচিত শাস্তি দেব।'

কিছু বলল না আলেক্সেই। কী ধরনের লোক পাইপ টানছে ভাবল। স্কুলের জীবনে অসাধারণ কিছু একটা ঘটেছে, সেটা তাঁকে না বলায় ওঁর

আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে বিরক্ত একটি আমলাতান্ত্রিক জীব? বৈমানিকদের বাছাই করা হয় যে সব নিয়মাবলী অনুসরণ করে, শারীরিক অক্ষমতার জন্য বিমান চালানো নিষিদ্ধ করা একটি বিধি তাতে আছে, সেটা কি আবিষ্কার করেছেন এই ক্ষুদে অফিসারটি? কিম্বা নিজের আধিপত্য দেখাবার সুযোগ পেয়ে উল্লসিত কোন খামখেয়ালী লোক? কী চান উনি? মেরেসিয়েভ এমনিতেই দারুণ মুষড়ে গিয়েছে, নিজের গলায় দড়ি দেবার মত অবস্থা, এ সময়ে ঝট করে কেন এসেছেন?..

মনটা তার একেবারে বিষিয়ে উঠেছে, কিন্তু অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করল আলেক্সেই। অনেক দিনের দুর্ভোগ তাড়াতাড়ি কোন অনুমানে না আসতে তাকে শিখিয়েছে। তা ছাড়া এই কুৎসিৎ মানুষটির মধ্যে একটা কিছু আছে যেটা তাকে ক্ষণিকের জন্য মনে করিয়ে দিল কমিসার ভরোবিওভের কথা, যাকে মেরেসিয়েভ বলত মানুষের মত মানুষ। কাপুস্তিনের পাইপের আগুন জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে, নীলচে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে তার চওড়া মুখ, মেদল নাক, আর প্রাজ্ঞ তীক্ষ্ন চোখ। তিনি বলে চললেন:

'শুনুন, মেরেসিয়েভ। আপনাকে সাধুবাদ করছি না কিন্তু যাই বলুন না কেন, সারা দুনিয়াতে আপনিই একমাত্র লোক যে বিনা পায়ে জঙ্গী বিমান চালাতে পারে। একমাত্র লোক!' পাইপের নলটা ঘুরিয়ে বের করে ফুটো দিয়ে একটা বালবের ক্ষীণ আলোর দিকে তাকালেন তিনি, মাথা নাড়লেন বিব্রতভাবে। "লড়াই"এর দলে আপনার ফিরে যাবার ইচ্ছের কথা বলছি না। ওটা বীরের মত কাজ নিশ্চয়ই, কিন্তু এমন বিশেষ কিছু নয়। যা সময় পড়েছে, সবাই জয়লাভের জন্যে যথাসাধ্য করতে চায়... হতচ্ছাড়া পাইপটার কী হল?'

পাইপের নলটি আবার পরিষ্কার করা শুরু হল, মনে হল কাজটায় একেবারে মগ্ন তিনি; কিন্তু ভাবী অমঙ্গলের অস্পষ্ট বোধে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আলেক্সেই কাপুস্তিনের বক্তব্য শোনার জন্য উদগ্রীব। পাইপ নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি বলে চললেন, কথাগুলোয় কী প্রতিক্রিয়া হবে সে বিষয়ে উদাসীন যেন:

'এটা শুধু সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট আলেক্সেই মেরেসিয়েভের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। কথাটা হল এই, আপনার পায়ের পাতা নেই, আপনি যে জিনিসটা আয়ত্ত করেছেন সেটা এত কাল সারা পৃথিবী ভাবত শুধু সম্পূর্ণ

সুস্থ মানুষই পারে, তাও এক শ'র মধ্যে একজন। আপনি শুধু নাগরিক মেরেসিয়েভ নন, বিরাট পরীক্ষা চালিয়েছেন আপনি... যা হোক, এতক্ষণে এটা আবার ঠিক হয়েছে দেখছি, নিশ্চয় কিছু একটা নলটাতে আটকিয়েছিল... আর তাই বলছি, আপনাকে সাধারণ বৈমানিক হিসেবে নিতে আমরা পারিনি, নেবার কোন অধিকার নেই আমাদের, বুঝেছেন? গুরুত্বপূর্ণ একটি পরীক্ষার অবতারণা করেছেন আপনি, যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু কী ভাবে? সেটা আপনাকেই বলতে হবে। আপনাকে কী ভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি?'

পাইপে আবার তামাক ভরিয়ে ধরানো হল, আবার কখনো দীপ্ত, কখনো অদৃশ্য লাল আভায় ওঁর চওড়া মুখ আর মেদল নাক অন্ধকার ভেদ করে দেখা যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

তিনি কথা দিলেন যে স্কুলের অধিকর্তার সঙ্গে কথা বলে মেরেসিয়েভের জন্য অতিরিক্ত ওড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন, আর বললেন নিজের জন্য একটি তালিমি কর্মসূচী আলেক্সেই ঠিক করে নিলে ভালো হয়।

'কিন্তু তাতে ত অনেক বেশী পেট্রল লাগবে!' অনুশোচনার সুরে বলল আলেক্সেই; কী সহজভাবে এই খর্বদেহ কুৎসিৎ চেহারার লোকটি তার সমস্ত সন্দেহের অবসান করে দিয়েছেন তাতে অবাক হয়ে গিয়েছে ও।

'পেট্রল খুব দামী জিনিস অবশ্য, বিশেষ করে এ সময়ে। আমরা ত টিপে টিপে পেট্রল দিই। কিন্তু পেট্রলের চেয়েও দামী জিনিস আছে,' উত্তর দিলেন কাপুস্তিন, আর পাইপের ছাই জুতোর গোড়ালিতে সযত্নে ঠুকে বের করলেন।

পরের দিন আলাদাভাবে শিখতে শুরু করল মেরেসিয়েভ। আর সেটা করল হাঁটা, দৌড়, আর নাচ যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অভ্যেস করেছিল শুধু সেভাবে নয়, অনুপ্রাণিতের মত। বিমান চালানোর কৌশল, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল সে, ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করে দেখল রীতিটাকে, প্রত্যেকটি আলাদা করে আয়ত্তে আনার প্রয়াস করল। যৌবনে যেটা সহজাতভাবে শিখেছিল, সেটার অধ্যয়ন, হ্যাঁ অধ্যয়ন শুরু হল। আগে যেটা অনুশীলন আর অভ্যাস দ্বারা শিখেছিল সেটা বুদ্ধির সাহায্যে আয়ত্তে আনল এবার। বিমান চালানোর পদ্ধতিকে মনে মনে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে, প্রত্যেকটির কসরৎ বিশেষভাবে শিখে নিল, আর পায়ের পাতার সব অনুভূতি চালান করল গাঁটে।

অত্যন্ত কঠিন আর ধৈর্যসাপেক্ষ কাজটা, ফলাফল এত সূক্ষ্ম যে নজরে প্রায় পড়ে না। যাই হোক, প্রতিবার ওড়ার সময়ে ওর অনুভূতি হতে লাগল যে বিমানটি শরীরের অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আরো শুনছে ওর কথা।

'কেমন চলেছে, ওস্তাদ?' দেখা হলেই জিজ্ঞেস করত কাপুস্তিন।

উত্তরে বুড়ো আঙুল তুলে দেখাত মেরেসিয়েভ। অত্যুক্তি নয় সেটা। কাজ এগোচ্ছে, মন্থরভাবে হয়ত, কিন্তু এগোচ্ছে যে সেটা নিশ্চিত। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, বিমানে উঠে তেজী ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ায় চাপা দুর্বল সওয়ারের মত আর মনে হয় না নিজেকে। নিজের দক্ষতায় বিশ্বাস আবার ফিরে এল, সে বিশ্বাসটা যেন সংক্রামিত হল বিমানেও, আর সেটা জীবন্ত সত্তার মত, দক্ষ সওয়ারের হাতে ঘোড়ার মত আরো বাধ্য হল, আস্তে আস্তে নিজের সমস্ত গুণ উন্মুক্ত করে দিল আলেক্সেই'র কাছে।

১১

অনেক দিন আগে বাল্যকালে ভলগার খাঁড়িতে প্রথম মসৃণ স্বচ্ছ বরফের উপরে স্কেট করা শিখতে বেরিয়েছিল আলেক্সেই। প্রকৃতপক্ষে স্কেট ছিল না ওর; একজোড়া কিনে দেবার সামর্থ্য ছিল না মায়ের। একজন কামারের জামাকাপড় ধুয়ে দিতেন তিনি, তাঁর অনুরোধে একজোড়া ছোট কাঠের কুঁদো বানিয়ে দিয়েছিল সে, নিচে ধাতুর ফালি, পাশে ছেঁদা।

দড়ি আর কাঠের টুকরোর সাহায্যে কুঁদোদুটো তালি-দেওয়া পুরোনো ফেল্টের বুটে লাগায় আলেক্সেই। তারপরে গেল নদীতীরে। পাতলা নরম বরফে মিঠে মচমচ শব্দ। কামিশিনের কাছাকাছি যে সব বাচ্চারা থাকত সবাই আনন্দে হট্টগোল করে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে, ক্ষুদে শয়তানের মত তীরের মত চলেছে, এ-ওকে ধাওয়া করছে, স্কেটে ভর দিয়ে লাফাচ্ছে আর নাচছে। ওদের কসরৎ আপাতসহজ, কিন্তু বরফে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল বরফটা পিছলে গেল আর চিৎ হয়ে পড়ে গেল আলেক্সেই।

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল, খেলার সঙ্গীরা যদি দেখে ফেলে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে সেই ভয় তার। আবার চেষ্টা করল স্কেট করতে, যাতে চিৎ হয়ে না পড়ে তার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে, কিন্তু এবার পড়ল নাক বরাবর। আবার তাড়াতাড়ি উঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, পাদুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, কেন পড়ে যাচ্ছে ভাববার চেষ্টা করে অন্য ছেলেরা কী ভাবে স্কেট করছে

চেয়ে চেয়ে দেখল। এবারে বুঝল যে সামনে কিম্বা পিছনে বেশী ঝুঁকলে চলবে না। খাড়া হয়ে থাকার চেষ্টা করে, পাশাপাশি পা ফেলল কয়েকবার, এবার একপাশে পড়ল সে। আর চলল পড়া, আবার ওঠা, আবার পড়া, আবার ওঠা, সূর্যাস্ত পর্যন্ত; বাড়ি যখন ফিরল তখন বিরক্তিতে মা দেখলেন ছেলের সারা গায়ে বরফ, ক্লান্তিতে পা তার কাঁপছে।

পরের দিন সকালে আবার আলেক্সেই গেল রিঙ্কে। এবারে তার গতি আরো সহজ, আগেকার মত বারবার পড়ছে না, এক দৌড়ে কয়েক মিটার পর্যন্ত যেতে পারছে; কিন্তু ওই পর্যন্ত, প্রদোষ হয়ে এল, তখনো তার বেশী অগ্রসর হতে পারল না।

কিন্তু একদিন — দিনটার কথা সে কখনো ভোলেনি, কনকনে দিন, ঝোড়ো হাওয়া চকচকে তুষারের উপরে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে -- দৌড় শুরু করল সে, আর অবাক হয়ে দেখল যে বেশ এগিয়ে যাচ্ছে, যত মোড় নিচ্ছে তত দ্রুতগতিতে স্বচ্ছন্দে। আগে পড়েছে, চোট খেয়েছে, উঠে আবার চেষ্টা করেছে, সে সময়ে অলক্ষিতে অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতা, ছোটখাটো যত অভ্যাস আর চাল মনে হল হঠাৎ এক হয়ে গিয়েছে, পা আর পায়ের পাতা ভালোভাবে পড়ছে, মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর আর বালকসুলভ, কৌতুকপ্রিয় একগুঁয়ে সত্তা তার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, প্রীতিকর আত্মবিশ্বাসে ভরে যাচ্ছে।

ঠিক এরকমটি তার ঘটল এখন। দৃঢ় অধ্যবসায়ে বিমান চালাল অনেক বার, বিমানটার সঙ্গে মিশে একাকার হবার প্রচেষ্টায়, নকল পায়ের পাতার ধাতু আর চামড়া ভেদ করে ওটিকে অনুভব করার ইচ্ছায়। মাঝেমাঝে মনে হত চেষ্টাটা সফল হচ্ছে, দারুণ খুসি হয়ে উঠত ও। একটা কসরৎ করার চেষ্টা করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোধ হল চালটায় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটেছে, মনে হল বিমানটা ভীত, হাতছাড়া হবার চেষ্টা করছে। আর আশাভঙ্গের বিস্বাদ মুখে আলেক্সেই আবার রুটিন মাফিক বিরস চর্চা শুরু করত।

মার্চের একটি বরফ-গলা দিনে একটি সকালের মধ্যেই বিমানক্ষেতের তুষার কালো হয়ে বসে গেল, ফুঁয়ো ফুঁয়ো বরফে বিমানের চাকায় গভীর দাগ পড়ছিল; আলেক্সেই তার জঙ্গী বিমানে আকাশে উঠল। ওঠবার সময় পাশ থেকে হাওয়া গতিপথ থেকে হটিয়ে দিচ্ছে বিমানটাকে, বাধ্য হয়ে আলেক্সেই চেষ্টা করল সেটা যাতে না হয়। গতিপথে বিমানটাকে ফিরিয়ে আনবার সময়ে হঠাৎ বোধ হল ওটা তার বশ মেনেছে, সমস্ত সত্তা দিয়ে সে অনুভব

করতে পারে ওটাকে। অনুভূতিটা বিদ্যুৎ ঝলকের মত, প্রথমে বিশ্বাস হল না। এতবার নিরাশ হয়েছে যে বিশ্বাস করা শক্ত যে এখন তার কপাল খুলেছে। এক ঝটকায় ডাইনে ঘোরালো বিমানটাকে আলেক্সেই, নিখুঁত ও বাধ্যভাবে ওটা মোড় নিল। ভলগার সেই ছোট্ট খাড়িতে কালো খরখরে বরফের উপরে বাল্যকালের ঠিক সেই অনুভূতিটা ফিরে এল। মনে হল ধূসর দিন আলো হয়ে উঠেছে। আনন্দে বুক ঢিপঢিপ করছে, ভাবাবেগে গলা প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

তালিম নেবার অক্লান্ত প্রচেষ্টার সমস্ত ফলাফলের পরখ হল অলক্ষ্য একটি লাইনে। অতিক্রম করেছে সে লাইনটা, আর সেই সব কঠিন পরিশ্রমের দিনগুলোর ফলাফল আজ অনায়াসে বিনা ক্লেশে ভোগ করছে সে। যে মূল জিনিসটি অনেক দিন নিষ্ফলভাবে পেতে চেয়েছিল সেটা আজ হাতের মুঠোয়: বিমানটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিবোধ এসেছে, মনে হচ্ছে ওটা নিজের শরীরেরই বিস্তৃতি। এমন কি অসাড় কঠিন নকল পায়ের পাতাদুটো পর্যন্ত বাধা দিচ্ছে না সে অনুভূতিতে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে সচকিত আলেক্সেই কয়েকবার ক্ষিপ্রভাবে মোড় নিল, তারপর বৃত্তাকারে নেমে উপরে ওঠা, সেটা সম্পূর্ণ হতে না হতেই বিমানটিকে ঘুরপাকে ফেলল। শিস দিয়ে সজোরে পাক দিচ্ছে জমি। অবিরত বৃত্তে একাকার হয়ে গিয়েছে বিমানক্ষেত স্কুলের বাড়ি আর আবহাওয়া কেন্দ্রটির পাশে ডোরাকাটা ফেঁপে ওঠা উড়ন্ত থলিটা। পাকা হাতে ঘুরপাক ক্ষান্ত করে আলেক্সেই সংকীর্ণ বৃত্তে নেমে আবার উপরে উঠল। আর শুধু এখনি ওর কাছে ধরা পড়ল বিখ্যাত "লাভচ্কিন-৫"এর সমস্ত জানা এবং অজানা গুণাবলী। অভিজ্ঞ হাতে কী চমৎকার চলে বিমানটি! স্টিয়ারিং-গিয়ারের প্রতিটি সঞ্চালনে দ্রুত সাড়া দেয়, জটিল সব কসরৎ অবলীলাক্রমে করে, উপরে ওঠে রকেটের মত, সংহত চটপটে ক্ষিপ্র।

টলতে টলতে মাতালের মত ককপিট থেকে নামল আলেক্সেই, বোকার হাসিতে বদন বিস্তৃত। চোখে পড়ল না ক্রুদ্ধ ইনস্ট্রাকটরটিকে, কানে গেল না তার বকুনি। বকতে দাও ওকে! আটক ঘর? বহুৎ আচ্ছা, আটক ঘরে এক প্রস্ত থেকে আসতে সে তৈয়ার। কী এসে যায় তাতে? একটা জিনিস জলের মত স্পষ্ট এখন: বৈমানিক সে, সুদক্ষ একজন বৈমানিক। শিক্ষার জন্য যে অতিরিক্ত পেট্রল খরচ করা হয়েছে বৃথায় যায়নি সেটা। সে ঋণ শোধ করবে সে অনেক মোটা সুদে যদি ওরা শুধু লড়াই'এ ফিরে যেতে দেয় তাকে!

আস্তানায় ওর জন্য অপেক্ষা করছিল আর একটি সুখের ব্যাপার: বালিশের উপরে দেখল গভজ্‌দেভের চিঠি। গন্তব্যে আসার আগে কোথায় কত দিন আর কার পকেটে ঘোরাফেরা করে ওটা বলা কঠিন, খামটা কুঁচকে গিয়েছে, তেলের দাগ মাখা। তাই খাসা নতুন খামে পুরে চিঠিটা আনিউতা পাঠিয়েছে।

ট্যাঙ্ক-অফিসার জানিয়েছে বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার তার ঘটেছে। একটা জার্মান বিমানের ডানায় তার মাথায় চোট লাগে! বাহিনীর হাসপাতালে এখন সে, যদিও দু-একদিনের মধ্যে ছাড়া পাবে নিশ্চয়। অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে এইভাবে। জার্মান ষষ্ঠ বাহিনী স্তালিনগ্রাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ঘেরাও হবার পরে পিছু-হটা জার্মানদের লাইন ভেদ করে গভজ্‌দেভের ট্যাঙ্ক-বাহিনী স্তেপ হয়ে ওদের পিছনে গিয়ে পড়ে; সে হামলায় একটি ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়নের ভার ছিল তার হাতে।

হামলাটি দারুণ! বিনামেঘে বজ্রপাতের মত সেই ইস্পাত বাহিনী জার্মানদের পিছনে, গড়বন্দী গ্রামে আর রেলওয়ে জংসনে ফেটে পড়ে। রাস্তায় আক্রমণ করে ট্যাঙ্কগুলো সামনে এসে-পড়া সৈন্যদের গুলি করে, পিষে দেয়, আর রক্ষী জার্মানদলের অবশিষ্টাংশ পালিয়ে গেলে ট্যাঙ্ক আর মোটরচালিত পদাতিক বাহিনী - - তারা ট্যাঙ্ক চেপে যাচ্ছিল - গোলাবারুদের ঘাঁটি, সেতু, টানা রেল আর জংসন উড়িয়ে দেয়, ফলে পিছু-হটা জার্মানদের ট্রেনগুলো আটকা পড়ে। শত্রুপক্ষের রসদ থেকে পেট্রল আর খাবার নিয়ে আবার তারা এগিয়ে গেল, যাতে জার্মানরা সামলে নেবার সময় না পায়, কিম্বা অন্তত হদিশ না পায় ট্যাঙ্কগুলো এর পরে কোন দিকে যাবে।

"বুদিওনির অশ্বারোহী বাহিনীর মত খরগতিতে স্তেপ হয়ে আমরা এগোলাম, আলিওশা! আর ফ্যাশিস্টদের কী নাজেহালটাই না হল! বিশ্বেস করবে না, মাঝেমাঝে তিনটে ট্যাঙ্ক আর জার্মানদের সাঁজোয়া গাড়ি একটা নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আর রসদ-ঘাঁটি দখল করলাম। যুদ্ধে, আলিওশা, আতঙ্কিত হয়ে যাওয়াটা বড়ো একটা ব্যাপার। শত্রুপক্ষের ঘাবড়ে যাওয়াটা আক্রমণকারীদের কাছে দুটো পুরো ডিভিশনের সামিল। শুধু কৌশলে জিইয়ে রাখতে হয় সে আতঙ্ক, অনেকটা তাঁবুর আগুনের মত: ইন্ধন — অপ্রত্যাশিত নানা আঘাত, অবিরত যোগাতে হয়, যাতে ওটা মিইয়ে না যায়। জার্মানদের লোহার খোলস ভেদ করে আমরা দেখলাম ভিতরটা অসার নাড়িভুঁড়িতে ঠাসা, আর কিছু নেই। ছুরিতে মাখন কাটার মত অনায়াসে আমরা ওদের ভেদ করে এগিয়ে গেলাম...

"...আর বোকার মত যেটা আমার হল সেটা ঘটল এই ভাবে। আমাদের প্রধান আমাদের এক সঙ্গে ডেকে জানালেন যে খবর-নেওয়া একটা বিমান থেকে বার্তা এসেছে যে অমুক জায়গায় বেশ বড়ো একটি বিমান-ঘাঁটি আছে, প্রায় তিনশ বিমান, তেল আর রসদ। খুসিতে গোঁফ মুচড়ে বললেন, 'গভজ্‌দেভ আজ রাত্রে ওখানে চলে যাও। চুপিচুপি যেও, গুলি ছুঁড়ো না যেন, এমন ভাবে যেও যেন জার্মান তোমরা, আর বেশ কাছে এসে পড়লে ঝট করে ওদের উপরে গিয়ে পড়বে, সমস্ত কামান এক সঙ্গে ছেড়ো, ওরা কিছু জানার আগে সব লণ্ডভণ্ড করে দিও; আর দেখো একটাও হারামজাদা পালাতে না পারে যেন।' আমার ব্যাটেলিয়নের উপরে ভারটা পড়ল, আর একটা ব্যাটেলিয়নের ভারও আমাকে দেওয়া হল। বাকি সবাই গেল রস্তোভের দিকে।

"মুরগীর খাঁচায় শেয়ালের মত আমরা বিমান-ঘাঁটিতে পেঁছিলাম। বিশ্বেস করবে না, আলিওশা, ঘাঁটির কাছে ট্র্যাফিক যারা নিয়ন্ত্রণ করছে একেবারে তাদের কাছে পর্যন্ত সটান গেলাম। কেউ থামাল না আমাদের — কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, কিছু দেখতে পায়নি ওরা, শুধু ইঞ্জিনের শব্দ আর চাকার ঘর্ঘর কানে গিয়েছে। ভেবেছিল আমরা জার্মান। তারপর আমরা লণ্ডভণ্ড শুরু করলাম! মজার ব্যাপার, আলিওশা! সারি সারি দাঁড়ানো বিমানগুলো। লৌহাবরণ ভেদকারী গোলা ছুঁড়লাম আমরা, আর প্রত্যেকটা গোলা অন্তত ছটা বিমান ভেদ করে গেল। কিন্তু বুঝলাম কাজটা ঠিক এ ভাবে সম্পন্ন হবে না; বৈমানিকদের কয়েকজন, সাহসী তারা, ইঞ্জিন চালাতে শুরু করল। ট্যাঙ্কের ঢাকনা বন্ধ করে বিমানগুলোর পিছন দিকে আমরা ধাক্কা দিতে লাগলাম। যানবাহনের বিমান সব, প্রকাণ্ড জিনিস, ইঞ্জিনগুলো নাগালের বাইরে, তাই পিছনে আক্রমণ করা হল, লেজ বাদ দিয়ে ত ওগুলো উঠতে পারবে না, যেমন ইঞ্জিন বাদ দিয়ে ওড়া চলে না। আর তাই করতে গিয়ে কাত হলাম। ঢাকনা খুলে মাথা বের করে উঁকি মেরে দেখছি, ঠিক সে সময়ে ট্যাঙ্কটা একটা বিমানের উপরে গিয়ে পড়ল। ডানার এক টুকরোয় ঘা লাগল মাথায়। ভাগ্যিস, হেলমেটটার জন্য আঘাতটার তীব্রতা কমে যায়, নইলে ত পটল তুলতাম। এখন সবকিছু ঠিক, শীগগিরই হাসপাতাল ছেড়ে নিজের দলে আবার ফিরে যাব। আসল গণ্ডগোল হল এই যে হাসপাতালে ওরা আমার দাড়িটা কেটে দিয়েছে। অনেক কষ্টে গজিয়েছিলাম ওটা — খাসা চওড়া দাড়ি — কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে ওরা কেটে দিল। যাক গে, গোল্লায় যাক দাড়ি! মনে হয়, যুদ্ধ শেষ হবার আগে আর একটা গজাতে পারব, কুৎসিত

চেহারাটা ঢাকা পড়বে। তোমাকে কিন্তু বলা দরকার, আলিওশা, কী কারণে জানি না দাড়িটা আনিউতার পছন্দ নয়, প্রতি চিঠিতে এই নিয়ে আমাকে ও বকে।”

দীর্ঘ চিঠি। পড়ে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হাসপাতাল জীবনের একঘেয়েমী কমাবার জন্য গভজ্‌দেভ লিখেছে। প্রসঙ্গত, শেষের দিকে লিখেছে যে স্তালিনগ্রাদের কাছে ওরা পদাতিকের মত লড়াই চালিয়েছিল — ট্যাংকগুলো হাতছাড়া হয়, নতুন ট্যাংকের জন্য ওরা অপেক্ষা করছে সে সময়ে বিখ্যাত মামায়েভ কুর্গান এলাকায় স্তেপান ইভানভিচের সঙ্গে ওর দেখা হয়। একটি কোর্সের পাঠ শেষ করে বৃদ্ধ এখন নন-কমিশন্‌ড অফিসার — সার্জেণ্ট-মেজর — ট্যাংক-বিরোধী রাইফেল দলের একটি পল্টনের ভার তার হাতে। কিন্তু স্নাইপারের অভ্যাস এখনো ছাড়েনি। গভজ্‌দেভকে বলেছে যে তফাৎটা হল এই — এখন বড়ো শিকারের খোঁজে থাকে সে — ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে রোদ পোয়াচ্ছে এমন সব অনবহিত ফ্যাশিস্ট নয়, জার্মান ট্যাংকের সন্ধানে থাকে, বলিষ্ঠ ধূর্ত জানোয়ার ওগুলো। কিন্তু এমন কি সেগুলোর শিকারেও বৃদ্ধ পরিচয় দেয় সাইবেরিয়ান শিকারীর সমস্ত কৌশল, পাথরের মত অনড় ধৈর্য, সহনশীলতা আর অদ্ভুত, লক্ষ্যভেদী নিশানা। যুদ্ধে পাওয়া এক বোতল পচা মদ এতদিন সযত্নে সরিয়ে রেখেছিল মিতব্যয়ী স্তেপান ইভানভিচ, দেখা হওয়াতে দুজনে শেষ করে সেটাকে, পুরোনো বন্ধুদের খবর নেয় বৃদ্ধ। মেরেসিয়েভকে নিজের কথা মনে করিয়ে দিতে বলে, দুজনকে নিমন্ত্রণ জানায় যে বেঁচে থাকলে যুদ্ধের পর যেন ওর যৌথখামারে আসে, কাঠবেড়ালী আর হাঁস শিকার করা হবে তখন।

চিঠিটা আশ্বস্ত করল আলেক্সেইকে বটে, কিন্তু বিষণ্ন লাগল ওর। ৪২ নং ওয়ার্ডের সব বন্ধুরাই অনেক দিন ধরে আবার লড়াই করছে। গ্রিশা গভজ্‌দেভ আর বুড়ো স্তেপান ইভানভিচ এখন কোথায়? কেমন চলছে ওদের? যুদ্ধের হাওয়ায় কোথায় গিয়ে পড়েছে ওরা? এখনো বেঁচে আছে কি? ওলিয়া কোথায়?..

মনে পড়ল কমিসার ভরোবিওভের সেই কথাটা — সৈন্যদের চিঠি তারার আলোর মত, পেঁছতে অনেক সময় নেয়, হয়ত তারাটা নিভে গেছে অনেক দিন আগে, কিন্তু তার দীপ্ত প্রসন্ন আলো কাল ভেদ করে আসতে থাকে, যে জ্যোতিষ্কের আর অস্তিত্ব নেই তার স্নিগ্ধ বর্ণচ্ছটা আনে আমাদের কাছে।

চতুর্থ খণ্ড

১

১৯৪৩। গ্রীষ্মের একটি উত্তপ্ত দিনে পুরোনো ট্রাক একটা দ্রুতগতিতে চলেছে পথ বেয়ে: অগ্রগামী সোভিয়েত বাহিনীর মালগাড়িতে দলিত পরিত্যক্ত মাঠের পথ, লালচে আগাছায় কীর্ণ। চোরা গর্তে ঠোক্কর খেয়ে, নড়বড়ে শরীরে আওয়াজ তুলে ট্রাকটা চলেছে ফ্রণ্ট লাইনের দিকে। গাড়ির দুপাশটা ধুলোয় ভরা, ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে, শাদা অক্ষরে লেখা কথাগুলো কোনক্রমে চোখে পড়ে: "ফিল্ড পোস্টাল সার্ভিস।" গাড়িটা ছুটে চলেছে, পিছনে রেখে যাচ্ছে ধূসর-ধুলোর বৃহৎ রেখা, গুমোট স্তব্ধ হাওয়ায় সে রেখা মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ডাকের থলে আর হালের খবরের কাগজের বাণ্ডিলে ট্রাকটা বোঝাই, গাড়িতে বসে আছে দুজন সৈনিক, টিউনিক পরনে, মাথায় নীল ফিতে-দেওয়া খাড়া ক্যাপ, দুজনে ট্রাকের গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে দুলছে আর ধাক্কা খাচ্ছে। দুজনের মধ্যে যার বয়স কম তাকে আনকোরা নতুন কাঁধ পেটি থেকে বোঝা যায় বিমান বাহিনীর সার্জেণ্ট-মেজর, পাতলা সুগঠিত দেহ, সোনালী চুল। মুখ এমন সুকুমার আর পেলব যে মনে হয় সোনালী চামড়া দিয়ে রক্তের ছটা ফুটে বেরোচ্ছে। দেখে মনে হয় উনিশ বছর বয়স। পাকা সৈনিকের মত হাবভাব দেখাবার চেষ্টা করছে সে, দাঁত চেপে থুথু ফেলছে, ভাঙ্গা গলায় গালিগালাজ করছে, চেষ্টা করছে দেখাতে কিছুতে তার আগ্রহ নেই। কিন্তু তবু এটা স্পষ্ট যে এই প্রথম সে যাচ্ছে ফ্রণ্ট লাইনে, এবং স্থিরচিত্ত মোটেই নয় সে। চারিদিকে যা চোখে পড়ছে তা কোন অভিজ্ঞ সৈনিকের দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করত না, কিন্তু দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে সে, তার কাছে মনে হচ্ছে

গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, গূঢ় অর্থ আছে সবকিছুর – রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটা বিধ্বস্ত কামান, মাটির দিকে নলের মুখ; ভাঙ্গা সোভিয়েত ট্যাঙ্ক, বুরুজ পর্যন্ত আগাছা গজিয়েছে; জার্মান ট্যাঙ্কের ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, স্পষ্টতই বোমা সটান লেগেছিল ওটাতে; গোলার নানা গর্ত, ইতিমধ্যেই ঘাসে ঢেকে গিয়েছে; নতুন সাঁকোর কাছে গাদা-করা, রাস্তা থেকে স্যাপারদের সরানো মাইনের চাকতি, আর দূরে দেখা যাচ্ছে বার্চের ক্রুশচিহ্ন দেওয়া জার্মানদের গোরস্থান হালের যুদ্ধের নানা চিহ্ন।

ওদিকে, সহজে বোঝা যায় ওর সঙ্গী সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টটি বাস্তবিকই পাকা সৈনিক। প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হবে তার বয়স তেইশ কিম্বা চব্বিশ; কিন্তু তামাটে, রোদে জলে পোড়া মুখের দিকে ভালোভাবে তাকালে নজরে পড়বে চোখ মুখ আর কপালে সূক্ষ্ম বলিরেখা, চোখজোড়া কালো, চিন্তাগ্রস্ত আর ক্লান্ত, তখন বয়সটা আরো দশ বছর বেশী মনে হবে। চারিপাশের দৃশ্য কোন ছাপ ফেলছে না ওর মনে। ওর বিস্ময় উদ্রেক করছে না ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যুদ্ধযন্ত্রের মরচে-পড়া, বিস্ফোরণে এবড়োখেবড়ো নানা ভগ্নাবশেষ, দগ্ধ অনেক গ্রামের পরিত্যক্ত পথ ঘাট, এমন কি একটি সোভিয়েত বিমানের ধ্বংসাবশেষ — বাঁকাচোরা এ্যালুমিনিয়ামের ছোট একটা স্তূপ; কিছু দূরে পড়ে আছে ভাঙ্গা ইঞ্জিনটা, লাল তারার চিহ্ন আর নম্বর আঁকা বিমানের লেজটা, যেটা দেখে লাল হয়ে শিউড়ে উঠল নবীন সৈনিকটি।

খবরের কাগজের বাণ্ডিলে আরামকেদারা বানিয়ে, অদ্ভুত চেহারার, সোনালী মনোগ্রাম করা একটা ভারী আবলুস কাঠের ছড়ির বাঁটে চিবুক রেখে ঝিমোচ্ছে অফিসারটি। মাঝেমাঝে চমকে উঠে চোখ খুলছে, ঝিমন্ত ভাব কাটাবার চেষ্টায় যেন, হাসিখুসি মুখে চারিদিকে তাকিয়ে উষ্ণ সুগন্ধি হাওয়া গভীর নিশ্বাসে নিচ্ছে। রাস্তা ছাড়িয়ে দূরে, লালচে আগাছার আন্দোলিত জঙ্গলের উপরে চোখে পড়ল দুটো দাগ, ভালো করে দেখে সে আঁচ করল ওদুটো বিমান, একটার পিছনে অন্যটা মন্থরভাবে চলেছে। তক্ষুণি তন্দ্রার ভাবটা কেটে গেল একেবারে, দীপ্ত হয়ে উঠল চোখদুটো, নাসারন্ধ্র কেঁপে উঠল, অগোচর দুটো দাগে চক্ষু নিবদ্ধ রেখে ড্রাইভারের কামরার ছাতে ঘা দিয়ে চেঁচিয়ে বললো:

'আড়ালে চল! রাস্তা ছেড়ে চল!'

দাঁড়িয়ে উঠে অভিজ্ঞ চোখে ভূমির চেহারাটা দেখে নিয়ে ড্রাইভারকে

দেখাল একটি ছোট নদীর কাদাটে নিচু জায়গা, তার দুটো তীর ধূসর কোল্টস্‌ফুট আর সেলানডাইনের সোনালী ঝাড়ে আচ্ছন্ন।

অবজ্ঞা ভরে হাসল তরুণ সৈনিকটি। বিমানদুটো ত অনেক দূরে নিরীহভাবে ঘুরছে, একটা ট্রাক বিরস পরিত্যক্ত মাঠে ধুলোর ঝড় তুলে চলেছে, তার সম্বন্ধে বিমানদুটোর যে বিন্দু মাত্র আগ্রহ আছে দেখে ত মনে হয় না। কিন্তু বাধা দিয়ে কিছু বলার আগেই রাস্তা ছাড়ল ড্রাইভার, নিচু জায়গাটার দিকে খরশব্দে দ্রুতগতিতে চলল ট্রাকটা।

জায়গাটায় পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট ট্রাক থেকে নেমে পড়ল, ঘাসে উবু হয়ে বসে সতর্কভাবে চেয়ে রইল রাস্তার দিকে।

'কেন আপনারা এ সব...' ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে অফিসারটির দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেছে তরুণ সৈনিকটি, কিন্তু কথাটা শেষ করার আগেই ধপ করে শুয়ে পড়ে অফিসার চেঁচিয়ে উঠল:

'শুয়ে পড়!'

ঠিক সে মুহূর্তে দুটো বিরাট ছায়া ইঞ্জিন গর্জন করে একেবারে মাথার উপর দিয়ে সবেগে চলে গেল, বিচিত্র খটখট আওয়াজ, হাওয়া কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু এটাতেও বিশেষ ভয় পেল না তরুণ সৈনিকটি: বিমানদুটো সাধারণ, নিশ্চয় আমাদের। ঘুরে তাকাল সে, হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার ধারে উল্টিয়ে পড়ে আছে একটা মরচে-ধরা ট্রাক, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আগুন উঠেছে জ্বলে।

'আগুনে-বোমা ফেলছে ওরা,' গোলায় বিধ্বস্ত ইতিমধ্যেই জ্বলন্ত ট্রাকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল ড্রাইভার। 'ট্রাকের পিছনে লেগেছে দেখি।'

'শিকার খুঁজছে,' ঘাসে আরো আরাম করে শুয়ে শান্তকণ্ঠে বলল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। 'আমাদের সবুর করতে হবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে ওরা। রাস্তায় নজর রেখেছে। তোমার ট্রাকটা আর একটু পেছনে, ওই বার্চগাছটার নিচে রাখলে ভালো করতে তুমি।'

শান্তভাবে, বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল কথাটা, যেন এইমাত্র জার্মান বৈমানিকরা নিজেদের অভিসন্ধি জানিয়েছে তাকে। ডাকগাড়ির সঙ্গে ছিল বাহিনীর একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে-ডাকহরকরা, ড্রাইভারের পাশে বসেছিল সে। এখন ঘাসের উপরে শুয়ে আছে মেয়েটি, মুখটা ফ্যাকাশে, ধুলো-মাখা ঠোঁটে ক্ষীণ বিব্রত হাসি, চোরাভাবে তাকাচ্ছে প্রশান্ত আকাশের দিকে, সেখানে

ঢেউ'এর পর ঢেউ'এ চলেছে গ্রীষ্মের মেঘ। সার্জেণ্ট-মেজরের বিশেষ বিব্রত লাগলেও মেয়েটির উপকার করার জন্য নিস্পৃহভাবে বলল:

'এবার রওনা হলে হয়। সময় নষ্ট করে কী হবে? যার অদৃষ্টে লেখা ফাঁসির দড়ি সে ডুবে মরবে না কখনো।'

এক ফালি ঘাস ধীরেসুস্থে চিবোতে চিবোতে যুবকটির দিকে তাকাল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, কঠোর কালো চোখে প্রসন্ন হাসির প্রায় অলক্ষিত ঝিকিমিকি, বলল:

'শোনো হে, ছোকরা! সময় থাকতে ওই নির্বোধ প্রবাদটি ভুলে যাও। আর একটা কথা, কমরেড সার্জেণ্ট-মেজর। ফ্রণ্টে উপরওয়ালাদের মেনে চলার নিয়ম একটা আছে। যদি হুকুম করা হয় শুয়ে পড়, তাহলে শুয়ে পড়া অবশ্য উচিত।'

একটা সরস সরেল ডাঁটা পেয়ে নখ দিয়ে ছালটা ছিঁড়ে, খরখরে ডাঁটাটা মহাতৃপ্তিতে চিবুতে লাগল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। আবার শোনা গেল বিমান-ইঞ্জিনের আওয়াজ, আবার সেই দুটো বিমান, একটু কাৎ হয়ে উড়ে গেল পথটির উপর দিয়ে; এত কাছ দিয়ে যে তাদের ডানার গভীর-হলদে রং, শাদা আর কালো ক্রুশগুলো, এমন কি সবচেয়ে কাছ দিয়ে যেটা গেল সেটার শরীরে আঁকা ইস্কাপনের টেক্কাটা পর্যন্ত দেখা গেল স্পষ্ট। আরো কয়েকটা ডাঁটা অলসভাবে ছিঁড়ে নিয়ে, ঘড়ির দিকে চেয়ে আদেশ করল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট:

'সব সাফ এখন! যাওয়া যাক এবার! আর তাড়াতাড়ি চালিও! এ জায়গাটা ছেড়ে যতদূর যাওয়া যায় ততই ভালো।'

গাড়ির হর্ণ ড্রাইভার বাজাল, নিচু জায়গাটা থেকে দৌড়িয়ে এল মেয়ে-ডাক হরকরাটি। সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের দিকে ডাঁটায় ঝোলা কয়েকটা লাল বুনো স্ট্রবেরি এগিয়ে দিল সে।

'এরি মধ্যে পাকতে শুরু করেছে... গ্রীষ্ম যে আসছে খেয়ালই হয়নি আমাদের,' বেরিগুলো শুঁকে টিউনিকের পকেটের বাটনহোলে ফুলের মত করে রাখতে রাখতে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট বলল।

'কী করে বুঝলেন যে ওরা আর ফিরে আসবে না, এখন যাওয়াটা নিরাপদ?' তরুণটি জিজ্ঞেস করল; চোরাগর্তের উপর দিয়ে ঝাঁকুনি খেয়ে ট্রাকটা চলেছে, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট চুপ করে বসে দোলানিতে ঝাঁকুনি



৯

'ওটা সহজে বোঝা যায়। ওগুলো "মেসার", "মেসারস্মিদ-১০৯"। মাত্র পঁয়তালিশ মিনিট মত ওড়বার পেট্রল ওদের থাকে। পেট্রলটা ইতিমধ্যেই শেষ, আবার ভর্তি করতে গিয়েছে।'

উত্তর দেবার ঢংটা এমন যে মনে হল এরকম সহজ জিনিস লোকের জানা নেই কেন সেটা সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের মাথায় ঢোকে না। এবারে তরুণটি আরো সজাগভাবে আকাশের দিকে নজর রাখতে শুরু করল: "মেসারগুলো" ফিরে আসার হুঁশিয়ারি সেই প্রথমে দেবে, এই তার ইচ্ছে। কিন্তু পরিষ্কার হাওয়ায় সতেজে বাড়ন্ত ঘাস, ধুলো আর তেতে-ওঠা মাটির তীব্র গন্ধ, গঙ্গাফড়িঙগুলো ডাকছে সজোরে প্রফুল্লভাবে, আগাছায়-ভবা নিরানন্দ ভূমির উপরে লার্কগুলোর উচ্চকণ্ঠ গান, এ সবের জন্য তরুণটি জার্মান বিমান আর বিপদের কথা ভুলে গিয়ে পরিষ্কার মিঠে গলায় গান ধরল; গানটা সে সময়ে ফ্রণ্টে খুব প্রিয়, ডাগ-আউটে তরুণ সৈনিক প্রিয়তমার জন্য আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তার গান।

'"এ্যাসগাছ"এর গানটা জানো?' বাধা দিয়ে সঙ্গী জিজ্ঞেস করল। মাথা নেড়ে তরুণ পুরোনো গানটি ধরল। সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টের ক্লান্ত ধূলিধূসর মুখে বিষণ্ণ ভাব দেখা দিল।

'ঠিক ভাবে ওটা গাইছ না, ওহে,' সে বলল। 'ঠাট্টার গান নয় ওটা, প্রাণ দিয়ে গাওয়া চাই।' নরম নিচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় সুরটি ধরল সে।

মুহূর্তের জন্য ড্রাইভার গাড়ি থামাল, মেয়ে ডাকহরকরাটি বসবার জায়গা থেকে বেরিয়ে, লঘুভাবে লাফিয়ে গাড়িটার পিছন দিকে উঠছে, বলিষ্ঠ দরদী দুটো হাত তাকে ধরে ফেলল।

'শুনলাম আপনারা গাইছেন, তাই ভাবলাম আমিও যোগ দিই...'

তিনজনে গাইতে লাগল, সঙ্গত দিচ্ছে গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ আর গঙ্গাফড়িঙের ব্যগ্র ডাক।

তরুণটি সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে কিটব্যাগ থেকে একটি মাউথ-অর্গান বের করল। কখনো বাজাচ্ছে সেটা, কখনো বা বেটনের মত সেটা নাড়িয়ে গানে যোগ দিচ্ছে, যেন অর্কেস্ট্রা-চালক। সেই বিমর্ষ পরিত্যক্ত রাস্তায়, ধূলিধূসর বাড়ন্ত সর্বভুক আগাছার ঝাড়ের মধ্যে বেজে উঠল গানটির বলিষ্ঠ বিষণ্ণ সুর, গ্রীষ্মের তাপে ঝিমন্ত এই সব ক্ষেতের মত, উষ্ণ সুগন্ধি ঘাসে গঙ্গাফড়িঙগুলোর উচ্চকিত ডাকের মত, পরিষ্কার গ্রীষ্মের আকাশে লার্কের গানের মত উদার, অসীম আকাশের মত চিরপুরাতন ও চিরনবীন গানটি।

হঠাৎ ব্রেক কষল ড্রাইভার, গানে ওরা এত বিভোর যে আর একটু হলে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যেত। রাস্তার মাঝখানে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তার ধারের খাতে উল্টিয়ে পড়ে আছে তিন টনের একটা ট্রাক, ময়লা চাকাগুলো শূন্যমুখী। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তরুণটি, কিন্তু তার সঙ্গী গাড়ির পাশ বেয়ে নেমে তাড়াতাড়ি ওদিকে গেল। হাঁটার ভঙ্গীটি বিচিত্র, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেলে দুলে চলা। ডাক-গাড়ির ড্রাইভার উল্টে-যাওয়া ট্রাকটার কামরা থেকে একটি কোয়ার্টারমাস্টার ক্যাপ্টেনের রক্তাক্ত শরীর টেনে বের করল। মুখটা কাটা, ছড়া কাচের টুকরোয় নিশ্চয়, আব ছাই'এর মত শাদা। চোখের পাতা তুলে দেখল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট।

'মারা গিয়েছে,' মাথা থেকে টুপি সরিয়ে বলল। 'ভেতরে আর কেউ আছে?'

'হ্যাঁ, ড্রাইভার আছে,' জবাব দিল ডাক-গাড়ির চালক।

'ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছো? এখানে এসে হাত লাগাও!' ভীতিবিহ্বল তরুণকে ধমকে ডাকল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। 'এর আগে রক্ত কি দেখোনি? অভ্যেস করে নাও, অনেক দেখতে হবে। এই যে এখানে, শিকারীর লক্ষ্যবস্তু।'

ড্রাইভার বেঁচে আছে। নিচু গলায় কাতরে উঠল সে, চোখদুটো তখনো বোজা। চোটের কোন চিহ্ন নেই। বোঝা গেল গোলা লাগাতে গাড়িটা যখন খাতে গিয়ে পড়ে তখন স্টিয়ারিং-হুইলে হুমড়ি খেয়ে পড়াতে বুকে বেশ লাগে আর আটকা পড়ে কামরাটির ধ্বংসাবশেষে। ওকে তুলে ডাক-গাড়িতে রাখার আদেশ দিল সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। লেফ্‌টেনাণ্টের সঙ্গে ছিল কাপড়ে সযত্নে মোড়া ডাহা নতুন আর্মিকোট একটা। আহতকে শোয়াবার জন্য সেটি বিছিয়ে দিল লেফ্‌টেনাণ্ট, গাড়ির মেঝেতে বসে ওর মাথা রাখল নিজের কোলে।

'প্রাণপণে চালাও!' আদেশ দিল লেফ্‌টেনাণ্ট।

আহতের মাথা ধীরে ধরে রেখে, কী একটা সুদূর কথা ভেবে হাসল লেফ্‌টেনাণ্ট।

ছোট একটি গ্রামের রাস্তায় যখন দ্রুতগতিতে ট্রাকটা পেঁৗছল তখন প্রদোষ। অভিজ্ঞ লোকে দেখলেই বুঝতে পারে যে গ্রামটি বিমানের ছোট একটা ইউনিটের পরিচালনা-ঘাঁটি। বাড়িগুলোর সামনের বাগানে, চেরি আর কর্কশ আপেলগাছের ধূলিধূসর শাখায়, কুয়োর কাঠে আর বেড়ার খুঁটিতে লাগানো তারের সারি ঝুলছে। বাড়িগুলোর কাছাকাছি খড়ের গোয়ালে,

যেখানে সাধারণত চাষীরা ঘোড়ার গাড়ি আর চাষের যন্ত্রপাতি রাখে, দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গাচোরা "এমকা" আর জিপ। এখানে সেখানে কুঁড়েগুলোর জানলার আবছা শার্সি দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল ফিতে দেওয়া টুপি মাথায় সৈনিকদের টাইপরাইটারের খটখট আওয়াজ কানে আসছে। একটা বাড়িতে তারের জাল গিয়ে জড়ো হয়েছে, সেখানে শোনা যাচ্ছে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের সমান টিক টিক শব্দ।

গ্রামটি বড়ো কিম্বা মাঝারি রাস্তা থেকে দূরে, হিটলার আক্রমণের আগে এরকম জায়গায় থাকাটা কতো সুখের ব্যাপার ছিল তার চিহ্ন হিসেবে যেন অধুনা নির্জন আর আগাছায়-ভরা জায়গাটি টিঁকে আছে। হলদে আগাছায় সমাচ্ছন্ন ছোট পুকুরটা পর্যন্ত জলে ভরা। পুরোনো উইলোর ছায়ায় চকচক করছে ঠান্ডা পুকুরটা, আগাছার ঝাড় ভেদ করে ভাসছে এক জোড়া ধবধবে শাদা, লাল-ঠোঁট হাঁস, জল ছড়িয়ে ঠোঁট দিয়ে নিজেদের গা সাফ করছে।

রেডক্রসের পতাকা লাগানো একটি কুটিরে আহত লোকটিকে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর ট্রাকটা গ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়ে গ্রামের স্কুলের ছোট সুন্দর বাড়িটার সামনে থামল। অনেক তার ঢুকেছে ভাঙ্গা জানলা দিয়ে, প্রবেশপথে সাব-মেসিনগান হাতে শান্ত্রী, বোঝা যায় যে এটা স্টাফ হেডকোয়ার্টারস।

খোলা জানলার কাছে বসে ভারপ্রাপ্ত অফিসার "লাল ফৌজী" পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রসওয়ার্ড হেঁয়ালির সমাধানে ব্যস্ত, তাকে সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট বলল: 'উইং কম্যান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।'

পিছু পিছু এসেছে তরুণটি, সে লক্ষ্য করল যে বাড়িতে ঢুকেই অভ্যাসবশে টিউনিকের সামনের দিকটায় হাত বুলিয়ে নিল লেফ্‌টেনাণ্ট, বুড়ো আঙুল দিয়ে বেল্টের নিচে ভাঁজগুলো ঠিক করা হল, গলার বোতামটা লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণটিও তাই করল। স্বল্পভাষী সঙ্গীটিকে তার বিশেষ পছন্দ, সব বিষয়ে তাকে অনুকরণের চেষ্টা করে সে।

'কর্ণেল ব্যস্ত আছেন,' বলল ভারপ্রাপ্ত-অফিসার।

'ওঁকে বলুন যে বিমান বাহিনীর স্টাফ হেডকোয়ার্টারসের কর্মচারিবৃন্দ বিভাগ থেকে জরুরী চিঠি নিয়ে আমি এসেছি।'

'আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। আকাশ পরিদর্শন দলের সঙ্গে উনি কথা বলছেন। বলেছেন যেন এ সময়ে বিরক্ত করা না হয়। আপনারা বাইরে গিয়ে বাগানে একটু বসুন।'

ক্রসওয়ার্ড সমাধানে আবার মন দিল ভারপ্রাপ্ত অফিসার। নবাগতরা বাগানে গিয়ে কেয়ারির পাশে পুরোনো একটা বেঞ্চে বসল, এক কালে সাবধানে ইঁট দিয়ে ঘেরা হয়েছিল কেয়ারিটাকে কিন্তু এখন আর কেউ যত্ন নেয় না, আগাছায় ভরে গিয়েছে। যুদ্ধের আগে গ্রীষ্মের এরকম শান্ত বিকেলে গ্রামের স্কুলের বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী নিশ্চয়ই দিনের কাজের শেষে এখানে বিশ্রাম করতেন। খোলা জানলা দিয়ে দুজনের কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে শোনা গেল। একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় উত্তেজিতভাবে বলছে:

'এই রাস্তাটা আর ওইটা ধরে বলসয়ে গরোখভো আর ক্রেস্তোভজ্‌দ্ভিজেন্‌স্কির গোরস্থান পর্যন্ত খুব যাতায়াত চলেছে, ক্রমাগত ট্রাকের সারি, সব যাচ্ছে একদিকে, ফ্রণ্টে। এখানে গোরস্থানের একেবারে কাছে, একটা নিচু জায়গায় ট্রাক কিম্বা ট্যাঙ্ক আছে... মনে হচ্ছে একটা বড়ো দলকে জড়ো করা হচ্ছে...'

'কেন মনে হচ্ছে?' বাধা দিয়ে জিল সুরে একজন বলল।

'আমাদের আজ প্রচুর গুলিগোলা ছুঁড়েছে। কোনক্রমে এড়িয়ে আসতে পেরেছি। ওখানে কাল কিছুই ছিল না, শুধু কয়েকটা সৈন্যদের ধূমন্ত ফিল্ড-কিচেন। ওদের একেবারে উপরে গিয়ে কষে গুলি চালাই, যাতে একটু চৈতন্য হয়। কিন্তু আজ! দারুণ গুলি ছুঁড়েছে আজ... নিশ্চয়ই ফ্রণ্টের দিকে যাচ্ছে ওরা।'

'৩ নং স্কোয়ারে কী দেখলেন?'

'ওখানেও নড়াচড়া দেখলাম, কিন্তু খুব বেশী নয়। এখানে বনের কাছে ট্যাঙ্কের একটা বড়ো দল এগোচ্ছে। প্রায় একশ'টা। প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ধরে বিস্তৃত, সার বেঁধে এগোচ্ছে দিনের আলোয়, লুকিয়ে চলার কোন চেষ্টা নেই। হয়ত চোখে ধুলো দেবার চাল... এখানে, এখানে ওখানে আমরা কামান দেখলাম, ফ্রণ্ট লাইনের একেবারে কাছে। আর গুলিবারুদের ঘাঁটি। কাঠের গাদাতে গোপন করার চেষ্টা করেছে। কাল ওগুলো ওখানে ছিল না... বেশ বড়ো বড়ো ঘাঁটি।'

'আর কিছু?'

'না, আর কিছু নয়, কমরেড কর্ণেল। রিপোর্ট লিখব একটা?'

'রিপোর্ট? না, রিপোর্ট লেখার সময় নেই! আর্মি হেডকোয়ার্টারসে এক্ষুণি চলে যান? এটার মানে কী জানেন... ভারপ্রাপ্ত অফিসার, আমার গাড়িটা! বাহিনীর হেডকোয়ার্টারসে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে যান।'

২

বড়ো একটা ক্লাসঘরে কর্ণেলের অফিস। কাঠের কুঁদো দিয়ে তৈরী অনাড়ম্বর দেয়াল, আসবাবপত্রের মধ্যে শুধু একটা টেবিল, তার উপরে রাখা ফিল্ড টেলিফোনের চামড়ার খাপ, বিমান মানচিত্রের সঙ্গে বড়ো কেস একটা, আর একটা লাল পেন্সিল। কর্ণেলটি ছোটখাটো কর্মঠ সুগঠিত মানুষ, পিছনে হাত রেখে ঘরে পায়চারি করছেন। চিন্তায় এত মগ্ন যে সামরিক কায়দায় দণ্ডায়মান বৈমানিকদের পেরিয়ে গেলেন। হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন তাদের দিকে।

তামাটে রঙের অফিসারটি গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে সেলাম করে বলল:

'সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট আলেক্সেই মেরেসিয়েভ।'

আরো জোরে আর্মি বুটের গোড়ালি ঠুকে, আরো কায়দায় সেলাম করার চেষ্টা করতে করতে তরুণটি বলল:

'সার্জেণ্ট-মেজর আলেক্সান্দ্র্ পেত্রভ।'

'উইং কম্যাণ্ডার কর্ণেল ইভানভ,' উত্তরে কর্কশস্বরে বললেন কর্ণেল। 'সরকারী চিঠি আছে?'

ম্যাপ-কেস থেকে নিখুঁতভাবে চিঠিটা বের করে মেরেসিয়েভ কর্ণেলকে দিল। সংক্ষিপ্ত বার্তাটি তাড়াতাড়ি পড়ে কর্ণেল নবাগতদের দিকে দ্রুত অন্তর্ভেদী দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন:

'ভালো! ঠিক সময়ে আপনারা এসেছেন। কিন্তু এত কম লোক কেন ওরা পাঠিয়েছে?' হঠাৎ বিস্ময়ের একটি ভাব মুখে এল, যেন কিছু একটা মনে পড়েছে। 'এক মিনিট সবুর করুন! আপনি কি সেই মেরেসিয়েভ? বাহিনীর চিফ অব স্টাফ আপনার বিষয়ে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন...'

'ওটা এমন কিছু নয়, কমরেড কর্ণেল,' বাধা দিয়ে বলল আলেক্সেই, খুব যে শিষ্টভাবে তা নয়। 'আমাকে কাজে যাবার অনুমতি দিন।'

সকৌতুহলে সিনিয়র লেফ্টেনাণ্টটিকে দেখলেন কর্ণেল, তারপর মাথা নেড়ে প্রশংসাসূচক হাসি হেসে বললেন:

'বেশ!.. অফিসার! এঁদের চিফ অব স্টাফের কাছে নিয়ে যান, আর আমার নাম করে বলুন এঁদের খাবার আর থাকার জায়গা দিতে। বলুন যে গার্ডস ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রনে এঁদের ভর্তি করতে হবে।'

পেত্রভের মনে হল উইং কম্যাণ্ডারটি একটু বেশী ব্যস্তবাগীশ। লোকটিকে মেরেসিয়েভের ভালো লাগল। ঠিক ওর মনের মত লোক -- চটপটে, এক

নিমেষে যে কোন জিনিস বুঝতে পারে, স্পষ্টভাবে চিন্তা করে আর দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসতে পারে। বাগানে বসে থাকার সময়ে আকাশ পরিদর্শক দলের লোকটি যে রিপোর্ট দিয়েছে সেটা তাঁর মনে গেঁথে বসেছে। আর্মি হেডকোয়ার্টারস ছাড়ার পর যে সব রাস্তা ধরে তারা নানা পথচলতি গাড়ি করে এসেছে সেই সব রাস্তায় অতিরিক্ত সমাবেশ, রাত্রে রাস্তায় সান্ত্রীরা জোর দিয়ে বলেছে সব আলো নিভিয়ে চলতে হবে, আদেশ খেলাপ করলে টায়ারে গুলি করার ভয় দেখিয়েছে, বড়ো রাস্তার ধারে বার্চ-বনে ট্যাংক, ট্রাক আর কামান জড়ো করায় ভিড় আর হৈচৈ, আর পরিত্যক্ত মেঠো রাস্তাটাতেও জার্মান "শিকারীরা" সেদিন তাদের আক্রমণ করেছিল, এসব লক্ষণ সৈন্যদের চেনা; মেরেসিয়েভ আঁচ করল যে ফ্রণ্টের স্তব্ধভাব শেষ হয়ে এসেছে, এই এলাকায় নতুন আক্রমণ শুরু করার মতলব জার্মানদের, শীগগিরই শুরু হবে সেটা; এও আঁচ করল মেরেসিয়েভ যে কথাটা সোভিয়েত আর্মি কমাণ্ডের জানা এবং প্রত্যুত্তরের সঠিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২

পেত্রভকে অস্থির সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মধ্যাহ্ন-ভোজনের তৃতীয় পদটির অপেক্ষা করতে দিল না, ওকে নিয়ে বিমান-ঘাঁটিতে যাওয়া একটি পেট্রলের ট্রাকে লাফিয়ে উঠল; বিমান-ঘাঁটিটা গ্রামের বাইরে একটি মাঠে। নবাগতরা সেখানে নিজেদের পরিচয় দিল গার্ডস ক্যাপ্টেন চেস্লোভের কাছে; স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারটি ভ্রূকুটিকুটিল, স্বল্পভাষী, কিন্তু সব মিলিয়ে খাসা প্রকৃতির মানুষ। বহ্বাড়ম্বর না করে সে ওদের ঘাসে-ঢাকা, মাটির দেয়াল-ঘেরা জায়গায় নিয়ে গেল. সেখানে দাঁড়িয়ে দুটো ডাহা নতুন, ঝকঝকে পালিশ দেওয়া, নীল "লাভচ্‌কিন", লেজে আঁকা দুটো নম্বর, "১১" আর "১২"। বিমানদুটি চালাতে হবে নবাগতদের। বাকি বিকেলটা তারা সুগন্ধি বার্চ-বনে কাটাল — সেখানে পাখির গান এমন কি বিমান ইঞ্জিনের গর্জনে পর্যন্ত চাপা পড়ছে না — বিমানগুলো খুঁটিয়ে ওরা দেখল, নতুন মিস্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ চলল, আর ওখানকার জীবনের সঙ্গে পরিচিত করে নিল নিজেদের।

এসব নিয়ে তারা এত বিভোর যে শেষ ট্রাকে ফিরল গ্রামে; ইতিমধ্যেই অন্ধকার হয়ে এসেছে, রাত্রের শেষ খাবার আর জুটল না। কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না ওদের। যাত্রার জন্য দেওয়া শুকনো রেশনের বাকিটুকু তখনো

ন্যাপসাকে ছিল। থাকবার জায়গা নিয়ে বরঞ্চ তারা ফ্যাসাদে পড়ল। পরিত্যক্ত, আগাছা-ভরা পতিত জায়গায় এই ছোট্ট মরূদ্যানটি বিমান বাহিনীর দুটো রেজিমেণ্টের লোকজনে বড়ো বেশী ভিড়াক্রান্ত। লোকঠেসা একটা বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাচ্ছে কোয়ার্টারমাস্টার, নবাগতদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে গররাজী বাসিন্দেদের সঙ্গে রেগে বচসা চলেছে; এটা আফসোসের কথা যে বাড়িগুলো রবারের তৈরী নয়, টেনে লম্বা করা যাবে না ওগুলোকে, এই সব দার্শনিকসুলভ চিন্তার পর অবশেষে যে বাড়িটা হাতের কাছে পেল তাতে ঠেলে ওদের দুজনকে ঢুকিয়ে দিয়ে কোয়ার্টারমাস্টার বলল:

'আজ রাতটা এখানে কাটান। কাল সকালে আপনাদের জন্যে অন্য কিছু বন্দোবস্ত করব।'

ছোট কুটিরে ইতিমধ্যেই ন'জন লোক, সবাই শুয়ে পড়েছে। ধূমায়িত একটি কেরোসিনের বাতির অস্পষ্ট আলো পড়েছে ঘুমন্ত লোকগুলির উপরে -- বাতিটা চ্যাপটা গোলার খাপ থেকে তৈরী, যুদ্ধের প্রথম দিকে এধরনের বাতিকে "কাতিউশা" বলা হত, পরে নামকরা হয় "স্তালিনগ্রাদকা"। কয়েকজন ঘুমোচ্ছে বিছানায় বা বাঙ্কে, কেউবা মেঝের উপরে খড়ে বর্ষাতি বিছিয়ে শুয়ে আছে। ন'জন বাসাড়িয়া ছাড়াও আছে কুটির মালিকেরা, একটি বৃদ্ধা আর তার বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা; জায়গার অভাবে তারা বিরাট রুশ স্টোভের উপর ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত লোকদের কী করে ডিঙিয়ে যাবে ভেবে দোরগোড়ায় নবাগতরা থমকে দাঁড়াল। স্টোভের উপর থেকে বৃদ্ধা সক্রোধে ওদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলল:

'জায়গা নেই, একেবারে জায়গা নেই! দেখছ না তিল ধারণের জায়গা নেই? কোথায় তোমাদের শোয়াব, ঘরের ছাতে?'

এত বিরত লাগল পেত্রভের যে সরে পড়ার জন্য পা বাড়াল, কিন্তু এরি মধ্যে মেরেসিয়েভ টেবিলের দিকে পথ করে নেয়, সাবধানে, যাতে ঘুমন্ত লোকগুলির উপরে পা না পড়ে।

'যে কোন একটা কোণে বসে রাত্রের খানাটা খেয়ে নিতে চাই, দিদিমা। সারা দিন পেটে কিছু পড়েনি,' বলল মেরেসিয়েভ। 'আমাদের একটা প্লেট আর গোটা দুই কাপ দিতে পারেন? এখানে ঘুমিয়ে আপনাদের জ্বালাব না। বেশ গরম, বাগানে শুতে পারি আমরা।'

ক্রুদ্ধা বৃদ্ধাটির পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এল দুটি ছোট্ট খালি পা;

স্টোভের কাছ থেকে নিঃশব্দে সরে গেল একটি দোহারা চেহারার মানুষ, নিদ্রিতদের গা নিপুণভাবে বাঁচিয়ে দরজার ওদিকে গেল চলে; প্লেট হাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল সে; পাতলা আঙুলে ধরা দুটো রঙীন কাপ। প্রথম পেত্রভের মনে হয়েছিল বাচ্চা বুঝি, কিন্তু যখন টেবিলের কাছে ও এল আর অন্ধকারে ঝাপসা, হলদে আলো পড়ল মেয়েটির মুখে, তখন দেখল মানুষটি নবীনা, চেহারাটা মিষ্টিও বটে; শুধু বাদামি ব্লাউজ, চটের কাপড়ের স্কার্ট আর বুকে জড়িয়ে পিছনে বুড়ীদের মত করে বাঁধা ছেঁড়াখোঁড়া শালটির জন্য সৌন্দর্যটি খোলেনি।

'মারিনা, এই মারিনা, এদিকে আয়, মেথরানি কোথাকার,' স্টোভের উপরে বুড়ীটি হিসহিসিয়ে উঠল।

কথাটা যে কানে গিয়েছে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নিপুণ হাতে টেবিলে একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপরে মেয়েটি প্লেট, কাপ আর কাঁটা রাখল, সঙ্গে সঙ্গে চলল পেত্রভের দিকে আড়চোখে তাকানো।

'স্বাস্থ্যের জন্যে খান!' বলল মেয়েটি। 'কিছু কাটতে কিম্বা গরম করতে চান? এখখুনি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিন্তু কোয়ার্টারমাস্টার বলেছেন যে বাইরে আগুন জ্বালানো চলবে না।'

'মারিনা, এদিকে আয় বলছি,' বুড়ী ডাকল।

'ওকে পরোয়া করবেন না, মাথাটা ওর একটু বিগড়ে গিয়েছে। জার্মানরা ওকে ভয়ে আধমরা করে দেয়,' তরুণী বলল। 'রাত্তিরে সৈন্য দেখলেই আমার জন্যে দুশ্চিন্তায় ভরে যায়। ওর ওপরে চটবেন না, শুধু রাত্তির বেলায় এরকম করে, দিনের বেলায় ঠিক হয়ে যায়।'

নিজের ন্যাপসাকে মেরেসিয়েভ পেল কিছু সসেজ, এক টিন মাংস, এমন কি পাতলা গায়ে চিকচিকে নুন দুটো শুকনো হেরিং আর আর্মির রুটি। দেখা গেল পেত্রভ অত মিতব্যয়ী নয়: ওর থাকার মধ্যে শুধু কিছুটা মাংস আর খড়খড়ে বিস্কুট। খাবারগুলো গোছালো হাতে কেটে টেবিলের উপরে বেশ লোভনীয় ভাবে সাজাল মারিনা। দীর্ঘ চক্ষুপল্লবে ঢাকা চোখজোড়া ক্রমশ বেশী করে পড়ছে পেত্রভের মুখে, পেত্রভও ওর দিকে চোরা চাউনি হানছে। চোখাচোখি হলেই দুজনেই লাল হয়ে উঠে, ভুরু কুঁচকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। কথাবার্তা চলছে মেরেসিয়েভের মাধ্যমে, সরাসরি না। ওদের রকমসকম দেখতে বেশ মজা লাগছে আলেক্সেই'র আর একটু বিষণ্ণও; দুজনেরই বয়স

কত কম! ওদের তুলনায় নিজেকে বুড়ো লাগছে, মনে হচ্ছে জীবনের বেশী ভাগটা পিছনে ফেলে এসেছে।

'মারিনা, তোমার কাছে বোধহয় শশা নেই?' জিজ্ঞেস করল মেরেসিয়েভ।

'কপাল গুণে আছে,' মৃদু হেসে তরুণীটি বলল।

'দুটো সেদ্ধ আলু জোগাড় করতে পারবে বোধ হয়।'

'হ্যাঁ — চাইলে পাবেন।'

কোন শব্দ না করে, লঘুপদে নিদ্রিতদের ডিঙিয়ে, আলোর পোকার মত আবার ঘর ছেড়ে চলে গেল মেয়েটি।

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট,' আপত্তি জানিয়ে পেত্রভ বলল, 'কী করে ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন? অচেনা মেয়েটিকে "তুমি" বলে ডাকছেন? শশা চাইছেন আর...'

প্রফুল্লভাবে হেসে উঠল মেরেসিয়েভ।

'শোনো হে ছোকরা, কোথায় আছি মনে হচ্ছে বলো ত? ফ্রণ্টে, না অন্য কোথাও?.. আর দিদিমা, গজগজানি যথেষ্ট হয়েছে। নেমে এসে আমাদের সঙ্গে খেতে বসুন!'

গজগজ আর বিড়বিড় করতে করতে বুড়ী স্টোভ থেকে নেমে টেবিলের কাছে এসে সসেজের উপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল; দেখা গেল যুদ্ধের আগে সসেজ বিশেষ প্রিয় ছিল তার।

চারজনে টেবিলে বসে মহাতৃপ্তিতে খেল, অন্যান্যদের নাকডাকা আর ঘুমন্ত বিড়বিড় সঙ্গত রাখল ওদের নৈশ খানার। স্বচ্ছন্দে গল্পস্বল্প করে চলেছে আলেক্সেই, বুড়ীকে জ্বালাচ্ছে আর মারিনাকে হাসাচ্ছে। অভ্যস্ত শিবির জীবনে অবশেষে ফিরে এসে স্বরূপ ফিরে পেয়েছে ও, সবকিছু ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে বিদেশ বিভুঁয়ে অনেকদিন ঘুরে বাড়িতে ফিরে এসেছে।

খানা শেষ হয়ে আসার আগে ওরা জানল যে একটি জার্মান দলের হেডকোয়ার্টারস ছিল বলে গ্রামটা টিঁকে আছে। সোভিয়েত বাহিনী আক্রমণ শুরু করাতে জার্মানরা এত তাড়াহুড়োয় পালায় যে গ্রামটি ধ্বংস করার সময় পায়নি। নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে চোখের সামনে ফ্যাশিস্টরা বলাৎকার করাতে বুড়ীর মাথা বিগড়ে যায়। পরে মেয়েটি পুকুরে ডুবে মরে। জার্মানরা যে আট মাস জেলায় ছিল সে কটা মাস মারিনা কাটায় উঠোনের পিছনে শূন্য মাড়াই ঘরে; খড় আর পুরোনো দড়ি, কাছি, রশারশির টুকরো দিয়ে প্রবেশপথটি চোখের আড়াল করে রাখা হয়েছিল। এ ক' মাস সূর্যের মুখ দেখেনি মারিনা।

রাত্রে ধোঁয়া বেরোবার পথ দিয়ে ওকে খাবার আর জল পৌঁছিয়ে দিত মা। আলেক্সেই গল্পসল্প করছে মেয়েটির সঙ্গে, মেয়েটি ঘনঘন তাকাচ্ছে পেত্রভের দিকে, বেয়াড়া অথচ লাজুক চোখদুটোয় অনুরাগের ছাপটা বেশ স্পষ্ট।

হাসিখুসিতে গল্প করে খানা শেষ হল। মিতব্যয়ীর মত বাকি খাবারটা মারিনা মেরেসিয়েভের ন্যাপসাকে রাখল, বলল সর্বকিছুই সৈনিকের কাজে লাগে। তারপর মা'কে ফিসফিস করে কী একটা বলে, মুখ ফিরিয়ে বেশ জোর দিয়ে বলল:

'শুনুন, কোয়ার্টারমাস্টার আপনাদের এখানে পাঠিয়েছেন, আমি চাই আপনারা এখানে থেকে যান। স্টোভের ওপরে চাপুন, মা আর আমি নিচের ঘরটায় যাচ্ছি। যাত্রার পরে জিরোনো দরকার আপনাদের। কাল আপনাদের জন্যে জায়গা খুঁজে দেব।'

আবার লঘুপায়ে নিদ্রিতদের ডিঙিয়ে বাইরে গেল মারিনা, ফিরে যখন এল তখন হাতে খড়ের বোঝা, স্টোভে খড় বিছিয়ে, কিছু কাপড় গুটিয়ে বালিশের মত করল: সর্বকিছু করল চটপটে নিপুণ হাতে, বেড়ালের মত কৌশলে।

'খাসা মেয়েটা, কী বলো, ছোকরা?' খড়ের উপরে খুসিতে হাত পা ছড়িয়ে, গাঁটে গাঁটে শব্দ তুলে মন্তব্য করল মেরেসিয়েভ।

'মন্দ নয়,' কৃত্রিম উদাসীনতায় জবাব দিল পেত্রভ।

'কী ভাবে তোমার দিকে তাকাচ্ছিল লক্ষ্য করেছিলে?..'

'না, ও ত বরাবর আপনার সঙ্গেই গল্প করছিল!..'

পরের মুহূর্তে শোনা গেল ওর নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ। কিন্তু ঘুম এল না মেরেসিয়েভের। ঠান্ডা সুগন্ধি খড়ের উপরে শুয়ে দেখল কী একটা জিনিসের খোঁজে ঘরে এসেছে মারিনা, স্টোভের দিকে চোরা চাউনি হানছে প্রায়ই। টেবিলের উপরের বাতিটা কমিয়ে দিয়ে, আর একবার স্টোভের দিকে তাকিয়ে, নিদ্রিতদের মধ্য দিয়ে পথ করে গেল দরজার দিকে। কী কারণে যেন, এই ছিন্নবেশ, মিষ্টি চেহারার কমনীয় মেয়েটিকে দেখে বিষণ্ণ স্তব্ধতায় ভরে গেল আলেক্সেই'র অন্তর। থাকবার জায়গার সমস্যা মিটে গিয়েছে। কাল সকালে ওকে লড়াই'এর জন্য অনেক দিন পর এই প্রথম বিমান চালাতে হবে। পেত্রভ থাকবে সঙ্গে. মেরেসিয়েভ নেতা। ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াবে? পেত্রভকে খাসা ছোকরা মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতেই ওর প্রেমে পড়েছে মারিনা। যাই হোক, কিছু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার!

পাশ ফিরে শুল আলেক্সেই, খড়ে একটু খসখস আওয়াজ, তারপর অঘোর ঘুম।

সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটার অনুভূতিতে তার ঘুম ভাঙ্গল। ব্যাপারটি কী তৎক্ষণাৎ পারল না বুঝতে, কিন্তু সৈনিকের সহজাত বোধে লাফিয়ে উঠে পিস্তলটা চেপে ধরল। কোথায় আছে মনে পড়ছে না। রশুনের মত তীব্র কটুগন্ধ ধোঁয়ার মেঘে ঘর আচ্ছন্ন; হাওয়ায় ধোঁয়া কেটে গেলে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল মাথার উপরে জ্বলছে অদ্ভুত, বিরাট সব নক্ষত্র। দিনের বেলার মত পরিষ্কার আলো, চোখে পড়ল দেশলাই'এর কাঠির মত কুটিরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঠের কুঁদো, ছাতটা স্থানচ্যুত, কড়িবরগা বেরিয়ে পড়েছে, কিছুদূরে আকারহীন কী একটা পুড়ছে। কানে এল কাতরানি, বিমান ইঞ্জিনের তরঙ্গিত গর্জন আর পড়ন্ত বোমার বিকট আর্তনাদ।

ধ্বংসাবশেষের উপরে উদ্যত স্টোভে হাঁটু গেড়ে বসে পেত্রভ হতচকিতভাবে চারিদিক দেখছে, মেরেসিয়েভ চেঁচিয়ে তাকে বলল:

'শুয়ে পড়ো!' ইটের উপরে ধড়াস করে পড়ে শরীর চিপটে শুয়ে রইল দুজন। ঠিক সেই মুহূর্তে বোমার বড়ো একটা টুকরো চিমনীতে লাগল আর লাল ধুলো আর শুকনো কাদা ঝুরঝুর করে ওদের উপরে পড়ল।

'নড়ো না! স্থির হয়ে শুয়ে থাকো!' আদেশ করল মেরেসিয়েভ, দমন করল লাফিয়ে উঠে ছুটে চলে যাবার সেই ইচ্ছেটা যেখানে হোক এসে যায় না, দৌড়তে পারলেই হল — নৈশ বিমান আক্রমণের সময়ে যে ইচ্ছেটা প্রত্যেকের হয়।

বোমারু বিমানগুলো দেখা যাচ্ছে না। নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত হাউই'এর অনেক উপরে অন্ধকারে ঘুরছে সেগুলো। কিন্তু দপদপে ধূসর আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ে বোমাগুলো কালো বিন্দুর মত আলোর এলাকার মধ্যে এসে পড়ছে, চোখের সামনে ক্রমশ আয়তনে বেড়ে সজোরে লাগছে মাটিতে, গ্রীষ্ম রাত্রির অন্ধকারে লাল অগ্নিশিখা ছিটকিয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে মাটি বিদীর্ণ হয়ে গর্জে উঠছে।

বৈমানিক দুজন স্টোভ আঁকড়ে আছে, প্রতিটি বিস্ফোরণে দুলে দুলে কেঁপে উঠছে সেটা। স্টোভে চেপে রেখেছে শরীর, গাল আর পা, চেষ্টা করছে নিজেদের মিশিয়ে দিতে, একাকার হয়ে যেতে ইটের সঙ্গে। ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আওয়াজ মিলিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল রাস্তার ওধারে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষে অগ্নিশিখার ক্রুদ্ধ হাঁক।

'বেশ একটা ধোলাই দিল বটে,' কাপড়চোপড় থেকে খড় আর মাটি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে কৃত্রিম অবিচলিত স্বরে বলল মেরেসিয়েভ।

'কিন্তু এখানে যারা ঘুমোচ্ছিল তাদের কী হল?' চোয়াল কাঁপছে, হেঁচকি জোর করে এসে পড়ছে সেটা, চাপার চেষ্টা করতে করতে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল পেত্রভ। 'আর মারিনা?'

স্টোভ থেকে নামল দুজনে। টর্চ ছিল মেরেসিয়েভের। মেঝেতে বিক্ষিপ্ত তক্তা আর কাঠের কুঁদোর নিচে খোঁজ করল অন্যদের। কেউ নেই। পরে শুনেছিল যে সাইরেন শুনে দৌড়িয়ে গর্তে চলে যেতে পেরেছিল ওরা। ধ্বংসাবশেষে অনেক খোঁজ করল মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ, কিন্তু মারিনা ও তার মা'র দেখা পেল না। হেঁকে ডাকল ওদের, কোন সাড়া নেই। কী হতে পারে ওদের? বিমান আক্রমণের পর ওরা কি বেঁচে আছে?

রাস্তায় ইতিমধ্যেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছে টহলদারেরা। স্যাপাররা আগুন নিভিয়ে দিল, ভূমিসাৎ করল ধ্বসে-পড়া বাড়িগুলোকে, হতাহতদের বের করল ভগ্নস্তূপ থেকে। আর্দালিরা রাস্তায় ছুটোছুটি করে বৈমানিকদের নাম ডেকে তলব করছে। বিমান বাহিনীর রেজিমেণ্টকে সত্বর অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হল। বৈমানিক দলকে জড়ো করা হল বিমানক্ষেতে, যাতে ভোর হলে বিমান নিয়ে চলে যেতে পারে তারা। প্রথম হিসেবে দেখা গেল হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী নয়। একজন বৈমানিক আহত, দুজন মিস্ত্রী আর কয়েকজন সান্ত্রী চৌকিতে নিহত হয়েছে। সকলের অনুমান গ্রামের অনেক লোক মারা গিয়েছে, কিন্তু কজন, সেটা অন্ধকার আর গণ্ডগোলের জন্য বলা কঠিন।

ভোরের ঠিক আগে বিমানক্ষেতে যাবার সময়ে মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ যে বাড়িতে ঘুমিয়েছিল সেখানে না থেমে পারল না। কাঠের কুঁদো আর তক্তার বিশৃঙ্খল স্তূপ থেকে একটি স্ট্রেচায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুজন স্যাপার, রক্ত-মাখা চাদরে ঢাকা কী একটা শোয়ানো স্ট্রেচারে।

'কে ও?' জিজ্ঞেস করল পেত্রভ, মুখ ওর ফ্যাকাশে, অমঙ্গলের পূর্ববোধে বুক ভারী হয়ে উঠেছে।

গালপাট্টাওয়ালা প্রবীণ স্যাপার একজন, তাকে দেখে মেরেসিয়েভের স্তেপান ইভানভিচের কথা মনে হল, ব্যাখ্যা করে বলল:

'একটি বুড়ী আর একটি মেয়ে। মাটির নিচের ঘরে ওদের পেলাম। পড়ন্ত ইটে চোট লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। কিশোর না বালিকা জানি না,

এত ছোটখাটো শরীর! চেহারা দেখে মনে হয় সুন্দর দেখতে ছিল। বুকে ইট লাগে। বেশ দেখতে, বাচ্চা মেয়ের মত।'

...সেই রাত্রে জার্মানরা তাদের শেষ বড়ো আক্রমণ শুরু করল; সোভিয়েত লাইন আক্রমণ করাতে কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টের যুদ্ধ আরম্ভ হল, যে যুদ্ধটির পরিণামে সর্বনাশ হয় ওদের।

৩

সূর্য তখনো ওঠেনি; গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রির সবচেয়ে অন্ধকার সময়, কিন্তু বিমানক্ষেত্রে বিমানগুলোর ইঞ্জিন গরম করা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে, গর্জাচ্ছে সেগুলো। শিশিরে-ভেজা ঘাসে একটি মানচিত্র ছড়িয়ে ক্যাপ্টেন চেস্লোভ তার স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের নতুন বিমান-ঘাঁটি আর কোন দিক দিয়ে সেখানে যেতে হবে সেটা দেখাচ্ছে।

'চোখ খোলা রাখবেন, বুঝলেন,' সে বলছিল। 'পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ হারাবেন না। বিমান-ঘাঁটিটা একেবারে ফ্রণ্ট লাইনে।'

ঘাঁটিটা সত্যিই ফ্রণ্ট লাইনে, মানচিত্রে নীল পেন্সিলে চিহ্নিত লাইনটা জার্মান সৈন্যদলের অবস্থানের একটা জিভে ঢুকেছে। সেখানে যেতে হলে পিছনে উড়ে যেতে হবে না, যেতে হবে সামনে। বৈমানিকরা মহাখুসি। শত্রুপক্ষ আবার প্রথমে আক্রমণ করেছে, তা সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনী পিছু হটবার প্রস্তুতির বদলে প্রতিআক্রমণের ব্যবস্থা করছে।

সূর্যের প্রথম আলোয় আকাশ উদ্ভাসিত, ক্ষেতের উপরে তখনো গোলাপী কুয়াশা কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসছে; দ্বিতীয় স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডারের বিমানের পিছনে পিছনে উপরে উঠে পরস্পরের কাছাকাছি থেকে চলল দক্ষিণ দিকে।

মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ আকাশপথে তাদের প্রথম একসঙ্গে যাত্রায় পরস্পরের খুব কাছাকাছি রইল; পথ হ্রস্ব হলেও যেরকম সহজে আর পাকা হাতে মেরেসিয়েভ বিমান চালাল তার তারিফ করল পেত্রভ। আর মেরেসিয়েভও ইচ্ছে করে কয়েকবার বিমানটা হঠাৎ বিশেষভাবে ঘোরাল, লক্ষ্য করল যে অনুসরণকারীর আছে উপস্থিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ন চোখ, বলিষ্ঠ স্নায়ু, আর যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে মনে করে, চালানোর কায়দাটা ওর ভালো, যদিও এখনো স্বচ্ছন্দ নয়।

একটি পদাতিক রেজিমেণ্টের পিছন দিকে নতুন বিমানক্ষেত্রটি। জার্মানদের কাছে ধরা পড়লে ওরা হালকা কামান, এমন কি ভারী ট্রেঞ্চ মর্টারের নাগালে আনতে পারে সেটাকে। কিন্তু ঠিক নাকের ডগায় হঠাৎ আবির্ভূত বিমানক্ষেত্রটিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ তাদের নেই। বসন্তে যত কামান জড়ো করেছিল ওরা, তাই দিয়ে ভোর হতে না হতে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর রক্ষাব্যূহাদির উপর গোলাবর্ষণ শুরু করেছে জার্মানরা। গড়বন্দী এলাকাটির অনেক উপরে উঠছে কম্পমান রক্তাভা। অবিরত বিস্ফোরণ প্রতি মুহূর্তে উত্থিত কালো গাছ-কীর্ণ ঘন জঙ্গলের মত সবকিছু ঢেকে দিচ্ছে। সূর্য উঠল, তখনো বেশ ফরসা হল না। ঘর্ঘরিত গর্জিত কম্পমান অন্ধকারে কিছু চেনা ভার, বীভৎস লাল চাকার মত সূর্য আকাশে স্থির।

মাসখানেক আগে জার্মান গড়খাইগুলির উপরে সোভিয়েত বিমানের সন্ধানী যাত্রা বিফলে যায়নি। জার্মান কমাণ্ডের অভিসন্ধি ধরা পড়ে; সৈন্য অবস্থান আর সমাবেশের জায়গাগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত, ইঞ্চি মেপে দেখা হয়েছে প্রত্যেকটিকে। অভ্যাসবশে জার্মানরা ভেবেছিল যে ঘুমন্ত অসন্দিগ্ধ শত্রুর পিঠে সর্বশক্তিতে হঠাৎ ছোরা বসাতে পারবে; কিন্তু শত্রু শুধু ঘুমের ভান করেছে। আক্রমণকারীর হাত ধরে ফেলে ইস্পাত-কঠিন বলিষ্ঠ মুষ্টিতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। বেশ কিছু কিলোমিটার জায়গা নিয়ে কামানের প্রাথমিক আক্রমণ গর্জিয়ে চলল, নিজেদের সেই কামান গর্জনে বধির আর বারুদের আচ্ছন্ন করা ধোঁয়ায় অন্ধ জার্মানরা, বজ্রনির্ঘোষ থেমে যাবার আগেই দেখল নিজেদের সব ট্রেঞ্চে লাল গোলার বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে। সোভিয়েত গোলন্দাজের নিশানা নিখুঁত, জার্মানদের মত তার লক্ষ্য বর্গবদ্ধ নয়, তার লক্ষ্যবস্তু হল নির্দিষ্ট সব কামান সমষ্টি, আক্রমণের জন্য ইতিমধ্যে তৈয়ার ট্যাঙ্ক আর পদাতিক বাহিনীর সংহতি, সেতু, ভূগর্ভস্থ গোলাবারুদের ঘাঁটি, সৈন্যদের ডাগ-আউট, পরিচালনা-ঘাঁটি।

জার্মান কামান আক্রমণ পরিণত হল ভীষণ গোলা যুদ্ধে, উভয় পক্ষে বিভিন্ন শক্তির হাজার হাজার কামান গর্জে চলেছে। ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রন যখন নতুন বিমানক্ষেত্রে নামল তখন সমস্ত মাটি কাঁপছে, বিস্ফোরণের আওয়াজ একাকার হয়ে একটানা গভীর গর্জনে পরিণত, যেন রেলওয়ে সেতুর উপর দিয়ে একটা লম্বা ট্রেন বাঁশী বাজিয়ে ঘরঘর ঝনঝন শব্দ করে চলেছে, কিন্তু সেতুর শেষ নেই। বিশালায়তন কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ায়

দিগন্ত বিলুপ্ত। ছোট বিমানক্ষেতের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে বোমারু বিমান, কয়েকটা বা সারসের মত দল বেঁধে, কয়েকটা বা ছেড়ে ছেড়ে। কামানের অবিরত গর্জনের মধ্যে আলাদা করে শোনা যায় তাদের বোমা বিস্ফোরণের ভারী শব্দ।

"দোসরা নম্বর প্রস্তুতির" আদেশ দেওয়া হল স্কোয়াড্রনগুলিকে। তার মানে ককপিটে বসে থাকতে হবে বৈমানিকদের, যাতে প্রথম হাউই ছোঁড়া হলেই সটান উড়তে পারে তারা। একটি বার্চ-বনের ধারে বিমানগুলোকে নিয়ে গিয়ে ডালপালা দিয়ে আড়াল করা হল। বনের ঠান্ডা কনকনে হাওয়ায় ব্যাঙের ছাতা গোছের গন্ধ, মশার গুঞ্জন যুদ্ধের গর্জনে শোনা যায় না, মশাগুলো বৈমানিকদের মুখে ঘাড়ে আর হাতে তীব্র আক্রমণ শুরু করেছে।

হেলমেট খুলে নিয়ে অলসভাবে মশা তাড়িয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে আছে মেরেসিয়েভ, বনের ঝাঁঝালো ভোরের গন্ধ বেশ লাগছে। পরের মাটির দেয়াল-ঘেরা জায়গাটাতে পেত্রভের বিমান। প্রায়ই ককপিট থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে পেত্রভ, মাঝেমাঝে এমন কি ককপিটের উপরে দাঁড়িয়ে যেদিকে যুদ্ধ চলেছে সেদিকে তাকাচ্ছে, কিম্বা চলে-যাওয়া বোমারুগুলোকে অনুসরণ করছে। জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য উপরে উঠতে ব্যগ্র সে, এবার আর ট্রেনিং বিমানে দড়িতে টানা হাওয়ায়-ফাঁপানো কোন বেলুনে গুলি করা নয়, ট্রেসার গুলিগুলো পাঠাতে হবে সত্যিকারের সচল, চটপটে কোনো শত্রুবিমানে, তাতে খোলসের মধ্যে শামুকের মত হয়ত বসে আছে সেই লোকটা যে মেরেছে দোহারা সুন্দর মেয়েটিকে, শুভস্বপ্নে যাকে দেখেছে বলে এখন মনে হয় পেত্রভের।

অস্থির পেত্রভকে দেখে দেখে মেরেসিয়েভ ভাবল, "আমরা প্রায় একবয়সী। ও উনিশ, আমি তেইশ। তিনচার বছরের তফাতে কি এসে যায় পুরুষের?" কিন্তু অনুসরণকারীর পাশে মেরেসিয়েভের নিজেকে পাকা, ধীরস্থির, ক্লান্ত বৃদ্ধের মত লাগে। এ মুহূর্তে ককপিটে বসে ছটফট করছে পেত্রভ, হাত ঘষছে, চলে-যাওয়া সোভিয়েত বিমানগুলোকে উদ্দেশ্য করে হাসছে আর চেঁচিয়ে কিছু বলছে, আর আলেক্সেই ত নিজে হাত পা ছড়িয়ে বেশ আরাম করে বসে আছে। ধীর সে, পায়ের পাতা নেই, যে কোন বৈমানিকের তুলনায় ওর পক্ষে বিমান চালানো অনেক বেশী কঠিন, কিন্তু এমন কি সেটাতে পর্যন্ত তার উত্তেজনা নেই। নিজের দক্ষতায় দৃঢ় বিশ্বাস তার, বিকলাঙ্গ পাদুটোয় আস্থা আছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত "দোসরা নম্বর প্রস্তুতিতে" রইল ওদের বিমানগুলো। কী কারণে যেন ওদের মজুত রাখা হল। বোঝা গেল অকালে ওদের অবস্থিতি জানিয়ে দেওয়াটা কর্তৃপক্ষেরা চান না।

ঘুমোবার জন্য যে ডাগ-আউটগুলো ওদের জন্য নির্দিষ্ট করা হল সেগুলো জার্মানরা এখানে থাকার সময় তৈরী করেছিল। আরো আরামে থাকার জন্য কাঠের দেয়ালে তারা কার্ডবোর্ড আর প্যাকিং কাগজ লাগিয়েছিল। দেয়ালে তখনো লোভে লালায়িত মুখ সিনেমা-তারকাদের অর্ধনগ্ন ছবি, আর নানা জার্মান সহরের মুদ্রিত তেল রঙা ছবি। কামান যুদ্ধের বিরাম নেই। মাটি কাঁপছে। শুকনো বালি দেয়াল-কাগজ হয়ে ঝুরঝুর করে পড়ছে গুঁড়িগুঁড়ি খসখসে শব্দে, যেন ডাগ-আউটটা পোকায় ভর্তি।

মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ ঠিক করল বর্ষাতি বিছিয়ে বাইরে শোবে। পোষাক পরেই ঘুমোনোর আদেশ। পায়ের পাতার পেটি শুধু ঢিলে করল মেরেসিয়েভ। চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, বিস্ফোরণের লাল ঝলকে আকাশ কাঁপছে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে পেত্রভ, নাক ডাকছে তার, বিড়বিড় করছে সে, চোয়াল নড়ছে, ঠোঁট সশব্দে চেটে ঘুমন্ত শিশুর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুল সে। নিজের আর্মিকোট দিয়ে ওর গা ঢেকে দিল মেরেসিয়েভ। ঘুমোতে পারবে না জেনে উঠে পড়ল মেরেসিয়েভ, হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, গরম হবার জন্য বেশ জোরে কয়েক হাত ব্যায়াম করে নিয়ে বসল একটা গাছের গুঁড়িতে।

কামান যুদ্ধের ঝড় থেমে গিয়েছে। শুধু মাঝেমাঝে এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণ করে উঠছে কয়েকটা কামান। কয়েকটা ইতস্তত গোলা মাথার উপর দিয়ে গিয়ে বিমানক্ষেতের কাছাকাছি কোথাও ফাটল। তথাকথিত এই হয়রানি গুলিবর্ষণে কেউ বিচলিত বোধ করে না। বিস্ফোরণের আওয়াজে মুখ পর্যন্ত ঘোরাল না আলেক্সেই, সে তাকিয়ে আছে লড়াই'এর লাইনের দিকে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় সেটা। অনেক রাত্রি এখন, তবু চলেছে তীব্র অবিরাম কঠিন যুদ্ধ, সমস্ত দিগন্তে বিরাট আগুন জ্বলে উঠেছে, তার রক্তাভায় যুদ্ধের ছায়া পড়েছে ঘুমন্ত পৃথিবীতে। তার উপরে ঝলকাচ্ছে হাউই'এর কম্পমান আলো — জার্মানদের হাউইগুলো নীলচে, ফসফরাসের — সোভিয়েত সৈন্যদের ছোঁড়া হাউইগুলো হলদেটে। এখানে সেখানে চকিতে উঠছে বিরাট অগ্নিজিহবা, নিমেষের জন্য কালো যবনিকা সরে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে, তারপর কানে আসছে বিস্ফোরণের জমাট দীর্ঘশ্বাস।

শোনা গেল রাত্রিবেলাকার বোমারু বিমানের গর্জন, আর সমস্ত ফ্রন্ট ট্রেসার বুলেটের নানা রঙের গুটিতে অলংকৃত হয়ে উঠল। বিমান ধ্বংসী কামানের ক্ষিপ্র গোলা রক্তবিন্দুর মত উঠছে শূন্যে। আবার পৃথিবী কেঁপে উঠল, শুরু হল তার গোঙানি আর কাতরানি। বার্চগাছের মাথায় গুঞ্জনরত গুবরে পোকাগুলো কিন্তু বিচলিত নয় তাতে; বনের গভীরে মানুষের গলায় একটা পেঁচা ডেকে উঠল, অমঙ্গলের পূর্বসূচনায়; নিচু জায়গাটাতে একটা নাইটিংগেল দিনের ভয় কাটিয়ে প্রথমে দ্বিধায় গাইল, যেন নিজের গলা পরখ করছে, কিম্বা কোন যন্ত্রে সুর ঠিক করছে, তারপর গাইল ভরা কাঁপা গলায়, মনে হল যেন নিজের সঙ্গীতের শব্দে বুক ফেটে যাবে পাখিটার। সে গানে যোগ দিল অন্য নাইটিংগেলরা, কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিক থেকে আসা সুরেলা শব্দে মুখরিত হল সমস্ত বন। অবাক হবার কিছু নেই যে কুর্স্কের নাইটিংগেলের খ্যাতি আছে সারা পৃথিবীতে!

এখন তাদের গানে গানে আকাশ মুখরিত। পরীক্ষার জন্য হাজিরা দিতে হবে আলেক্সেইকে কাল, কমিশনের সামনে নয়, স্বয়ং যমের সামনে, নাইটিংগেলদের সমবেত সঙ্গীত আজ জাগিয়ে রেখেছে তাকে। আর কালকের কথা ভাবছে না সে, আসন্ন যুদ্ধের কথা, মৃত্যুর সম্ভাবনার কথাও নয়, আলেক্সেই ভাবছে কামিশিনের উপকণ্ঠে সেই দূরাগত নাইটিংগেলটির কথা, তাদের জন্য গাওয়া সেই "নিজেদের" নাইটিংগেলের কথা, ভাবছে ওলিয়ার আর প্রিয় সহরটির কথা।

ফরসা হয়ে এল পূর্বাকাশ। নাইটিংগেলের গান আস্তে আস্তে ছাপিয়ে এল কামানের ডাক। মন্থরভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে ভারী রক্তবর্ণ সূর্য উঠল, গুলিগোলার বিস্ফোরণের জমাট ধোঁয়া ভেদ করতে প্রায় অপারগ যে সূর্য।

৪

কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টের ভীষণ যুদ্ধ অবিরাম চলেছে। জার্মানদের মূল মতলব ছিল ট্যাঙ্কের সাহায্যে ক্ষিপ্র বলিষ্ঠ আঘাতে কুর্স্কের দক্ষিণে আর উত্তরে আমাদের রক্ষাব্যূহাদি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে, তারপর সাঁড়াশির মত দুভাগ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর কুর্স্ক দলকে একেবারে ঘেরাও করে স্তালিনগ্রাদের জার্মান সংস্করণ একটা দেখাবে। কিন্তু প্রতিরোধের দৃঢ়তায় বানচাল হয়ে গেল সে পরিকল্পনা। কয়েকদিন পরে জার্মান কমাণ্ডের হুঁশ

হল যে প্রতিরোধ ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে না, পারলেও এত লোকক্ষয় হবে যে সাঁড়াশি আক্রমণের জন্য যথেষ্ট লোক থাকবে না; কিন্তু তখন দেরী হয়ে গিয়েছে, আক্রমণ থামানো আর হল না। এই আক্রমণের উপরে বিশেষ আশা রেখেছিল হিটলার — রণনীতি ও কৌশল ঘটিত আশা, রাজনৈতিকও বটে। হিমানী-সম্প্রপাত শুরু, ক্রমশ বর্ধিষ্ণু ভরবেগে নেমে এসে বিরাট বরফ পুঞ্জ সামনে যা কিছু পড়ছে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর যারা শুরু করেছে সেটা রোধ করবার শক্তি নেই তাদের। জার্মানরা এগোচ্ছে মাত্র কয়েক কিলোমিটার, তাতে তাদের গোটা ডিভিশন ও বাহিনী, শত শত ট্যাঙ্ক, কামান আর হাজার হাজার গাড়ি নষ্ট হচ্ছে। রক্তক্ষয়ে এগিয়ে-যাওয়া বাহিনীগুলোর শক্তি কমে এল; কথাটা জার্মান হেডকোয়ার্টারসের অজানা নয়, কিন্তু অবস্থা প্রতিহত করার উপায় নেই তাদের, তাই যুদ্ধের আগুনে বেশী, আরো বেশী মজুত সৈন্য সমর্পণ করতে বাধ্য হল তারা।

এখানে প্রতিরোধরত বাহিনী দিয়ে জার্মান আক্রমণ কাটিয়ে উঠল সোভিয়েত কমাণ্ড। ওদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা ক্রমশ বাড়ছে দেখে ফ্রণ্টের একেবারে পিছনে মজুত সৈন্যদের হাতে রাখা হল, যতক্ষণ না শত্রুপক্ষের অগ্রগতির বেগ কমে আসে। পরে মেরেসিয়েভ শুনেছিল যে ওর দলের কাজ ছিল প্রতিঘাতের জন্য সংহত একটি বাহিনীকে সাহায্য করা। তাতে বোঝা গেল ঘোরযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কেন ট্যাঙ্কবাহিনী আর জঙ্গী বিমানগুলোর ভূমিকা ছিল শুধু দর্শকের; উদ্দেশ্য ছিল বাহিনী প্রতি-আক্রমণ শুরু করলে একসঙ্গে ওদের কাজে লাগানো হবে। শত্রুদলের সমস্তটাকে যখন যুদ্ধে নামানো হল, তখন প্রত্যাহার করা হল "দোসরা নম্বর প্রস্তুতির" আদেশ। ডাগ-আউটে ঘুমোতে, এমন কি জামাকাপড় ছাড়তে দেওয়া হল দলটিকে। থাকবার জায়গা অন্যভাবে গুছিয়ে নিল মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ। সিনেমা-তারকাদের ছবি আর বিদেশী দৃশ্য সব ফেলে দিল তারা, ছিঁড়ে ফেলল জার্মান কার্ডবোর্ড আর প্যাকিং কাগজ, দেয়ালটা সাজানো হল ফার আর বার্চের শাখা দিয়ে। তারপর গুঁড়ি গুঁড়ি পড়া বালির খসখস শিরশির আওয়াজ আর বিরক্ত করত না।

একদিন সকালে দেয়ালের খোঁড়লে বাঙ্কে শুয়ে আছে ওরা দুজন, সূর্যের দীপ্ত আলো ইতিমধ্যে ডাগ-আউটের খোলা প্রবেশপথ দিয়ে পড়েছে মেঝের পাইন-কাঁটার কার্পেটে, ওপরের পথে শোনা গেল দ্রুত পদধ্বনি আর কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "ডাক হরকরা"। ফ্রণ্টে শব্দটা ভেল্কির কাজ দিত। একসঙ্গে

দ্বজনে কম্বল ছ্বঁড়ে ফেলে উঠে বসল, মেরেসিয়েভ পায়ের পেটি শক্ত করে বাঁধছে, পেত্রভ দৌড়িয়ে উপরে গিয়ে ডাক হরকরাকে ধরে ফেলল, ফিরে এল উল্লাসে, হাতে আলেক্সেই'র দ্বটো চিঠি, একটি মা'র আর অন্যটি ওলিয়ার। বন্ধ্বর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে চিঠিদ্বটো মেরেসিয়েভ, এমন সময়ে ঢং করে ঘণ্টার শব্দ এল বিমানক্ষেত্র থেকে, বিমানে যেতে হবে তাদের।

টিউনিকে চিঠিদ্বটো রেখেই সেগ্বলোর কথা ভুলে গেল মেরেসিয়েভ, পেত্রভের পিছ্ব পিছ্ব তাড়াতাড়ি গেল বনের পথ ধরে বিমানগ্বলোর দিকে। বেশ তাড়াতাড়ি গেল সে, হাতে ছড়ি, শ্বধ্ব একটু হেলে দ্বলে চলেছে। বিমানের কাছে পেঁাছল যখন তখন ইঞ্জিনের ঢাকনা সরানো হয়ে গিয়েছে, আর ম্বখে ফুট ফুট দাগ, হাস্যপ্রিয় ছোকরা মিস্ত্রীটি অধৈর্যভাবে প্রতীক্ষা করছে তার জন্য।

ইঞ্জিনের গর্জন। স্কোয়াড্রন কম্যান্ডারের বিমান "ছক্কা" — সেটির দিকে মেরেসিয়েভ তাকিয়ে রইল। বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় ক্যাপ্টেন চেস্লোভ তার বিমান নিয়ে এসে ককর্পিটে থেকেই হাত তুলল। তার মানে "এ্যাটেনশন!" গর্জে উঠল অন্যান্য সব ইঞ্জিন। ঘ্বর্ণিবায়্বতে ঘাসের মাথা ন্বয়ে পড়েছে, হাওয়ায় বার্চের বেণীর ঝটপট, যেন ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

নিজের বিমানের দিকে দৌড়িয়ে যাচ্ছে আলেক্সেই, ওকে পেরিয়ে গেল আর একটি বৈমানিক, কোনক্রমে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল ট্যাঙ্ক আক্রমণ শ্বর্ব হয়েছে। তার মানে শত্র্বপক্ষের বিধ্বস্ত লাইন ভেদ করে ট্যাঙ্কের পথ করে দেবার সাহায্য করতে হবে বৈমানিকদের, আক্রমণকারীদের রক্ষা করার জন্য পাহারা রাখতে হবে আকাশে। আকাশে পাহারা দেওয়া? কী এসে যায় তাতে? যে রকম তীব্র য্বদ্ধ চলেছে তাতে পাহারা দেওয়াটা নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাপার হবে না মোটেই। এখন কিম্বা পরে আকাশে শত্র্বপক্ষের সাক্ষাত মিলবেই। পরীক্ষা তাহলে আসন্ন। এবারে সে প্রমাণ করবে যে কোন বৈমানিকের চেয়ে ন্যূন নয়, সিদ্ধিলাভ করেছে সে!

আলেক্সেই'র অস্থির লাগছে। কিন্তু ম্ত্যুর ভয় সেটা নয়। বিপদের যে বোধ সবচেয়ে সাহসী ও স্থিরচিত্ত লোকেরই হয়, সেটাও নয়। অন্য কিছ্ব একটায় বিব্রত সে: শস্ত্রমিস্ত্রীরা কি মেসিনগান আর কামানগ্বলো পরীক্ষা করেছে; নতুন হেলমেটের ইয়ারফোনদ্বটো এর আগে য্বদ্ধের সময়ে পরেনি, ঠিক আছে সেদ্বটো? শত্র্বর সঙ্গে লড়াই লাগলে পেত্রভ কি পিছনে পড়ে থাকবে, কিম্বা তাড়াহ্বড়ো করে এগিয়ে যাবে? ছড়িটা কোথায়? ভাসিলি

ভাসিলিয়েভিচের দেওয়া জিনিসটা হারাতে সে চায় না; এমন কি ডাগ-আউটে যে বইটা রেখে এসেছে সেটা যদি কেউ নিয়ে যায়, তাই নিয়ে চিন্তিত সে; আগের দিন উপন্যাসটির সবচেয়ে রোমাঞ্চকর জায়গার আগে পর্যন্ত পড়েছিল, তাড়াহুড়োয় টেবিলে ফেলে রেখে এসেছে বইটা। মনে পড়ে গেল পেত্রভকে বিদায় জানানো হয়নি, তাই ককপিট থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল। কিন্তু পেত্রভ দেখতে পেল না তাকে; অধৈর্যভাবে সে দেখছে কম্যাণ্ডারের উত্তোলিত হাত, চামড়ার হেলমেটের বেড়ে ঘেরা মুখে ছাপ ছাপ রক্তাভা। হাত নামাল কম্যাণ্ডার। ককপিটের ঢাকনা টানা হল।

স্টার্ট লাইনে গর্জাচ্ছে তিনটি বিমান, চমকে উঠে দৌড়িয়ে গেল সেগুলো। তাদের পিছনে অন্য দলের যাত্রা শুরু হল। প্রথম তিনটি বিমান আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেরেসিয়েভের দল রওনা হয়ে তাদের অনুসরণ করল, নিচে সমতল মাটি দুলছে। প্রথম তিনটিকে নজরে রেখে ঠিক তার পিছন নিল মেরেসিয়েভের দলটি। তার পিছনে এল তৃতীয় দল।

ফ্রণ্ট লাইন এসে পড়ল। গোলাগুলিতে মাটি কেটে ছিঁড়ে গিয়েছে, উপর থেকে দেখলে চেহারাটা জোর বৃষ্টির প্রথম কয়েক ফোঁটার পরে ধুলিধূসর রাস্তার মত মনে হয়। ট্রেঞ্চগুলো যেন লাঙল দিয়ে খুঁড়ে ফেলা, ফুস্কুরির মত রক্ষাব্যূহ আর কামান রাখবার জায়গাগুলো কাঠের টুকরো আর ইটের স্তূপে পরিণত। ছেঁড়াখোঁড়া উপত্যকার সর্বত্র হলদে স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি; বিরাট যুদ্ধের আগুন সেটা। উপর থেকে সবকিছু কেমন ছোট, খেলনার মত আর অদ্ভুত দেখাচ্ছে! বিশ্বাস করা কঠিন যে নিচে সবকিছু জ্বলছে. বিকারগ্রস্তের মত গর্জাচ্ছে, বিকলাঙ্গ পৃথিবীর ধোঁয়ায় আর ঝুলে গুঁড়ি মেরে ঘুরছে যম। বলির অভাব নেই!

যুদ্ধরেখার উপর দিয়ে ওরা গেল, শত্রুপক্ষের পিছনে অর্ধবৃত্তে ঘুরে আবার পেরোল যুদ্ধরেখা। ওদের লক্ষ্য করে কেউ গুলি ছুঁড়ল না। নিচে যারা তারা নিজেদের কঠিন সব পার্থিব ব্যাপার নিয়ে অতি ব্যস্ত, ন'টা ক্ষুদে বিমান মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, খেয়াল করার সময় নেই তাদের। কিন্তু ট্যাংকগুলো কোথায়? ওই ত, ওখানে! মেরেসিয়েভ দেখল একটার পর একটা আস্তে আস্তে বন থেকে বেরিয়ে আসছে, উপর থেকে মনে হয় ধূসর বেঢপ গুবরে-পোকা। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেক ট্যাংক বেরিয়ে এল, কিন্তু আরো আসছে, বনের সবুজ থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা আর নিচু জায়গা হয়ে আস্তে আস্তে চলেছে। প্রথম কয়েকটা দ্রুতগতিতে

উঠল ছোট পাহাড়ে, পেঁছল গোলাবিধ্বস্ত মাটিতে। তাদের ধড় থেকে ঝলকাচ্ছে লাল স্ফুলিঙ্গ। এই বিপুল ট্যাঙ্ক আক্রমণ, জার্মান লাইনের অবশিষ্টাংশের দিকে দুর্বার গতিতে ধাবমান শত শত এই ট্যাঙ্কের হামলা মেরেসিয়েভের সঙ্গে আকাশ থেকে দেখলে কোন শিশুর, এমন কি কোন স্নায়বিক পীড়ায় কাতর মহিলারও ভয় হত না। হেলমেটের ইয়ারফোনে নানা শব্দের গুঞ্জন, ঠিক সেই মুহূর্তে মেরেসিয়েভের কানে এল ক্যাপ্টেন চেস্লোভের ভাঙ্গা গলা, এমন কি এখন পর্যন্ত সে গলা নিরুৎসাহ:

'এ্যাটেনশন! ৩ নং চিতেবাঘ আমি! ৩ নং চিতেবাঘ, ডানদিকে "ইয়ুনকারস"!'

আলেক্সেই সামনে দেখল খাটো একটি রেখা। কম্যান্ডারের বিমান ওটা। দুলছে সেটা, তার মানে "আমি যা করছি তাই করো!"

নিজের দলের জন্য আদেশটি পুনরাবৃত্তি করল মেরেসিয়েভ। ফিরে দেখল পেত্রভ ওর পাশে, প্রায় সমান্তরালভাবে চলেছে। খাসা ছোকরা!

'ওহে, হুঁশিয়ার!' চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ।

'তাই করছি,' বিশৃঙ্খল ফটফট, গুনগুন আওয়াজের মধ্যে জবাব এল। আবার মেরেসিয়েভের কানে এল:

'৩ নং চিতেবাঘ আমি, ৩ নং চিতেবাঘ!' তারপর আদেশ হল, 'অনুসরণ করো আমাকে!'

শত্রুরা কাছে এসে পড়েছে। ঠিক তাদের নিচে লম্বালম্বিভাবে, জার্মানদের প্রিয় কায়দায় এক দল "ইয়ুনকারস-৮৭" একক-ইঞ্জিন ডাইভ-বোমারু। কুখ্যাত এই ডাইভ-বোমারুগুলি পোল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম আর যুগোস্লাভিয়ায় বোম্বেটে খ্যাতি অর্জন করে, যুদ্ধের গোড়াতে সারা পৃথিবীর সংবাদপত্র এদের বিভীষিকার বর্ণনায় মুখর ছিল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট বিস্তৃতিতে অল্পদিনের মধ্যেই এরা পাত্তা পেল না। অনেক আকাশ-যুদ্ধে এদের খুঁত ধরে ফেলল সোভিয়েত বৈমানিকরা, আর আমাদের সেরা বৈমানিকরা "ইয়ুনকারসদের" নিকৃষ্ট শিকার বলে গণ্য করতে শুরু করল, যেন বিলমোরগ কিম্বা খরগোস, ওদের শিকার করতে সত্যিকার দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

নিজের স্কোয়াড্রনকে সোজাসুজি শত্রুপক্ষের দিকে নিয়ে গেল না ক্যাপ্টেন চেস্লোভ, ঘুরপথে গেল। মেরেসিয়েভ ভাবল সাবধানী ক্যাপ্টেন

চায় "সূর্যকে পিছনে রাখতে," আর তারপর চোখ-ঝলসানো আলোর আড়ালে থেকে শত্রুর অগোচরে কাছে গিয়ে পড়ে ওদের আক্রমণ করতে। মনে মনে হেসে আলেক্সেই ভাবল, "এই জটিল ফন্দিটা করে ও "ইয়ুনকারসগুলোকে" বড্ড বেশী সম্মান দেখাচ্ছে। যাই হোক, সাবধানের মার নেই।" ফিরে তাকিয়ে দেখল পেত্রভ পিছনে আছে। একটা শাদা মেঘের গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে।

ওদের ডানদিকে এখন জার্মান বিমানগুলো। সুন্দরভাবে সার বেঁধে এগোচ্ছে ওরা, নিখুঁত শৃঙ্খলায়, যেন অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা। ওপর থেকে সূর্যের আলো এসে পড়াতে জ্বলজ্বল করছে ডানাগুলো।

কম্যান্ডারের আদেশের শেষ কয়েকটি কথা কানে এল আলেক্সেই'র:

'... ৩ নং চিতেবাঘ! আক্রমণ চালাও!'

আলেক্সেই দেখল চেস্লোভ আর তার অনুসরণকারী বাজপাখির মত শত্রুপক্ষের পার্শদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবচেয়ে কাছের "ইয়ুনকারসটির" দিকে ছুটল ট্রেসার গুলির রেখা: পড়ে গেল সেটা, আর চেস্লোভ, তার অনুসরণকারী এবং তার দলের তৃতীয় ব্যক্তিটি ভাঙ্গা জার্মান লাইনের ফাঁক দিয়ে সবেগে ঢুকল। তক্ষুণি লাইন সামলে নিল জার্মানরা, সুশৃঙ্খলায় এগিয়ে চলল "ইয়ুনকারসগুলো"।

আলেক্সেই ডাকের সঙ্কেত করে চেঁচিয়ে বলতে চাইল: "আক্রমণ কর!" কিন্তু এত উত্তেজিত সে যে গলা থেকে শুধু বেরোল, "আ-আ-আ"। এরিমধ্যে তীরের মত নামতে শুরু করেছে সে, মসৃণভাবে অগ্রসর জার্মান লাইনটা ছাড়া চোখে আর কিছু পড়ছে না। চেস্লোভের নামানো বিমানটার জায়গা যে বিমানটি নিয়েছে, ওর লক্ষ্য হল সেটা। কান ভোঁ ভোঁ করছে, হৃৎস্পন্দন এত বেড়ে গিয়েছে যে প্রায় দম বন্ধ হয়ে এল। দৃষ্টিপথে এসে পড়ল শিকারটি, ঘোড়ার বোতামে বুড়ো আঙুলদুটো রেখে খরবেগে চলল সেদিকে। তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে গুলির ধোঁয়ার ধূসর, পশমের মত রেশ। বটে, তাহলে গুলি চালাচ্ছে! লাগেনি। আবার! এবার আগের চেয়ে কাছে! কোন ক্ষতি হয়নি। পেত্রভের কী হল? না, ওরও চোট লাগেনি। ও এখন বাঁয়ে আছে। এড়িয়ে গিয়েছে ওদের। খাসা ছোকরা! জার্মান বিমানটির ধূসর গা দৃষ্টিপথে বড়ো দেখাচ্ছে। বুড়ো আঙুলে এ্যালুমিনিয়াম বোতামদুটোর ঠাণ্ডা অনুভূতি। আর একটু কাছে এলে ...

সেই মুহূর্তে আলেক্সেই'র বোধ হল বিমানটির সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে সে। ইঞ্জিনের ধকধকানি যেন নিজের হৃৎপিণ্ডে বাজছে, ডানাদুটোর আর

রাডারের অনুভূতি সমস্ত সত্তায়, ওর মনে হল এমন কি বেঢপ, নকল পাদুটো পর্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে, বিমানের ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে একীভূত হতে যেতে বাধা দিচ্ছে না তাকে। ফ্যাশিস্ট বিমানটির ছিপছিপে মসৃণ দেহ চলে গেল চোখের আড়ালে, কিন্তু গোচরে সেটাকে আবার এনে ঘোড়া টিপল সে। গুলির আওয়াজ কানে এল না, ট্রেসার গুলির রেখা পর্যন্ত পড়ল না চোখে, কিন্তু আলেক্সেই জানে যে সফল হয়েছে সে, এগিয়ে গেল দ্রুতবেগে, স্থির বিশ্বাস জার্মান বিমানটা পড়ে যাবে, ধাক্কা লাগবে না তার সঙ্গে। মুখ ঘুরিয়ে অবাক হয়ে দেখল আর একটা বিমান, প্রথমটির পাশে ছিল সেটা, পড়ে যাচ্ছে। তাহলে কি দুটোকে মেরেছে সে? না। ওটা পেত্রভের কাজ। তার ডানদিকে পেত্রভ। অনভিজ্ঞের পক্ষে মন্দ নয়। তরুণ বন্ধুটির সৌভাগ্যে তার নিজের সাফল্যের চেয়ে বেশী খুসি হল আলেক্সেই।

দ্বিতীয় দলটি ফাঁক ধরে জার্মান লাইনে ঢুকল। তারপর শুরু হল মজাটা। বোঝা গেল জার্মান বিমানগুলির দ্বিতীয় দলটি অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞ বৈমানিকদের হাতে, তারা লাইন ভাঙ্গল। ছত্রভঙ্গ "ইয়ুনকারসদের" মধ্যে গিয়ে পড়ল চেস্লোভের দলের বিমানগুলো, এত তাড়া দিল তাদের যে নিজেদের লাইনের উপরে তাড়াতাড়ি বোমার বোঝা ফেলে দিতে বাধ্য হল তারা। ঠিক এই অভিসন্ধি নিয়ে বিমানগুলোকে চালনা করেছিল ক্যাপ্টেন চেস্লোভ — ওরা যাতে বাধ্য হয়ে নিজেদের লাইনে বোমা ফেলে! সূর্যকে পিছনে রাখা মূল উদ্দেশ্য ছিল না ওর।

জার্মানদের প্রথম লাইন আবার সংঘবদ্ধ হল, আর যে জায়গায় ট্যাঙ্কগুলো ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসেছে সেদিকে আবার চলল "ইয়ুনকারসগুলো"। তৃতীয় দলের আক্রমণ সফল হল না।

এবারে একটিও বিমান নষ্ট হল না জার্মানদের, বরঞ্চ একটি জঙ্গী বিমান জার্মানরা নামাল। ট্যাঙ্কের আক্রমণ যেখানে বিস্তৃতভাবে শুরু হবে, সে জায়গাটা কাছে এসে পড়েছে। উপরে ওঠবার সময় নেই। নিচে থেকে আক্রমণ করার ঝুঁকি নেবে ঠিক করল চেস্লোভ। মনে মনে সেটা অনুমোদন করল আলেক্সেই। খাড়া উঠে শত্রুর পেটে "খোঁচা" দেবার অদ্ভুত সামর্থ্য আছে "লাভচ্কিন-৫"গুলোর, সে সামর্থ্যের সুযোগ নিতে ব্যগ্র সে। প্রথম দলটি এরিমধ্যে তীরের মত উঠছে, ফোয়ারার মত ছুটেছে ট্রেসার গুলির রেখা। তৎক্ষণাৎ লাইন থেকে খসে পড়ল দুটো জার্মান বিমান। একটা আধ-

টুকরো হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই, কেন না ওটা হঠাৎ ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেল, লেজটা আর একটু হলে মেরেসিয়েভের বিমানে লাগত।

'হুঁশিয়ার!' চেঁচিয়ে বলল মেরেসিয়েভ, পেত্রভের বিমানের কালো রেখার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে স্টিকটা টানল সে।

মাটি উল্টে গেল। টলে পড়ল আলেক্সেই, যেন ভীষণ জোরে কেউ তাকে সিটের কাছে চেপেছে। মুখে আর ঠোঁটে রক্তের স্বাদ, চোখে ঝাপসা লাল দেখছে। বিমানটি প্রায় খাড়া হয়ে তীরের মত উঠছে। সিটে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে, দৃষ্টিপথে এক ঝলকে এল একটা "ইয়ুনকারসের" দাগ-দেওয়া পেট, ভোঁতা জুতোর মত মোটা চাকাগুলোর হাস্যকর আকৃতি, বিমানক্ষেতের এঁটেল মাটি লেগে আছে চাকায়, সেগুলো পর্যন্ত।

ঘোড়া টিপল আলেক্সেই। শত্রু বিমানটির কোথায় গুলি লাগল — পেট্রলের ট্যাঙ্কে, ইঞ্জিনে না বোমা রাখবার জায়গায় — জানে না আলেক্সেই, কিন্তু বিস্ফোরণের বাদামি ধোঁয়ায় নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

ধাক্কায় একপেশে হয়ে গেল মেরেসিয়েভের বিমান, আগুনের গোলক ঝট করে পেরিয়ে গেল সেটা, বিমানটা অনুমুখ করে চারিদিক দেখল আলেক্সেই। ডানদিকে, সাবানের ফেনার মত দেখতে শাদা মেঘের উপরে অসীম নীল শূন্যে পেত্রভের বিমান। আকাশ পরিত্যক্ত; শুধু দিগন্তে সুদূর মেঘের পটভূমিকায় ছোট ছোট বিন্দু চোখে পড়ে — ইতস্তত বিক্ষিপ্ত "ইয়ুনকারস" ওগুলো। ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল আলেক্সেই। মনে হয়েছিল যে যুদ্ধটা অন্তত আধ-ঘণ্টা চলেছে, পেট্রল নিশ্চয়ই কমে আসছে; কিন্তু ঘড়িতে দেখল মাত্র সাড়ে তিন মিনিট কেটেছে।

'বেঁচে আছ তাহলে?' এখন পাশাপাশি ডানদিকে চলেছে পেত্রভ. সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আলেক্সেই।

ইয়ারফোনে নানা শব্দের গণ্ডগোলে কানে এল দূর উল্লসিত কণ্ঠস্বব:

'বেঁচে আছি... নিচে, নিচে দেখুন!'

নিচে ক্ষতবিক্ষত বিকলাঙ্গ উপত্যকার কয়েকটা জায়গায় পেট্রলের ট্যাঙ্ক জ্বলছে, স্তব্ধ হাওয়ায় ঘন ধোঁয়ার মেঘ থামের মত উঠছে। কিন্তু শত্রু বিমানগুলোর জ্বলন্ত ভগ্নাবশেষের দিকে তাকাল না আলেক্সেই। মাঠ হয়ে বিস্তৃতভাবে দ্রুতগতিতে চলেছে ধূসর-সবুজ অনেক গুবরে-পোকা, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সেদিকে। দুটো নিচু জায়গা হয়ে গুঁড়ি মেরে শত্রুপক্ষের লাইনে পৌঁছিয়েছে ওরা, সামনের গুলো এরি মধ্যে ট্রেঞ্চ পার হচ্ছে। ধড় থেকে

লাল স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে শত্রুপক্ষের লাইনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছ তারা, এগিয়েই চলেছে, যদিও পিছনে জার্মান কামানের গোলাগুলির ঝলক আর ধোঁয়া।

শত্রুপক্ষের বিধ্বস্ত গড়খাইগুলির গভীরে শত শত গুবরে-পোকার উপস্থিতির মানেটা কী মেরেসিয়েভ বুঝল।

সোভিয়েত জনগণ, স্বাধীনতা-প্রিয় সমস্ত দেশের জনগণ পরদিন সংবাদপত্রে আনন্দে আর উল্লাসে যা পড়েছিল, তাই এখন দেখছে মেরেসিয়েভ। কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টের একটা খণ্ডে বাহিনীটি দু ঘণ্টাব্যাপী প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের পর শত্রুপক্ষের লাইন ভেদ করে সে ফাঁক দিয়ে ঢুকে পথ করে দেয় অন্যান্য সোভিয়েত সৈন্যদলের, যারা পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।

ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রনের ন'টি বিমানের মধ্যে দুটো ঘাঁটিতে ফিরল না। ন টি "ইয়ুনকারসকে" নামানো হয়েছে। বিমানের সংখ্যা গণনার সময় নয়-দুই হারটা নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু দুজন কমরেডের বিয়োগে জয়লাভের আনন্দটা কমে গেল। সফল আক্রমণের পরে সাধারণত বৈমানিকরা যা করে থাকে সেটা করল না তারা, বিমান থেকে নেমে উল্লাস, চীৎকার, অঙ্গভঙ্গী করে যুদ্ধের সাগ্রহ আলোচনা, অতিক্রান্ত বিপদের স্মরণ, কিছুই না। বিষণ্ণ মুখে চিফ অব স্টাফের কাছে গিয়ে সংক্ষিপ্ত নীরস কথায় যুদ্ধের ফলাফল জানিয়ে চলে গেল তারা পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে।

দলে আলেক্সেই নবাগত, যে দুজন মারা গিয়েছে তাদের চিনত না। কিন্তু অন্যদের মনোভাবের ছোঁয়া তার লাগল। ওর জীবনের সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার জন্য শরীর আর মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এতদিন তৈরী হয়েছে, যেটা তার ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা নির্ধারিত করল, সেটা ঘটেছে... সুস্থ সমর্থ লোকেদের দলে ফিরেছে সে। এটার কথা কতবার না স্বপ্ন দেখেছে, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে, হাঁটা আর নাচ শেখার সময়, বিমানচালনায় নিপুণতা ফিরে পাবার কঠিন শিক্ষার সময়ে! আর এখন বহুপ্রত্যাশিত দিনটি এসেছে, দুটো জার্মান বিমান সে নামিয়েছে, জঙ্গী বৈমানিকদের পরিবারে সমান অধিকারে প্রত্যাগত আবার, অন্যদের মত সেও চিফ অব স্টাফের কাছে গিয়ে ফলাফলের কথা বলল, জানাল খুঁটিনাটি কথা, পেত্রভের প্রশংসা করল, আর যারা সেদিন ফেরেনি তাদের কথা ভেবে বার্চগাছের ছায়ায় সরে গেল।

একমাত্র পেত্রভই বিমানক্ষেতে ছোটাছুটি করছে, খালি মাথা তার, হাওয়ায় চুল উড়ছে, যাকে পাচ্ছে তার আস্তিন আঁকড়ে ধরে শোনাচ্ছে:

'...একেবারে আমার পাশে ও ছিল, প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে... শোনো... সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট দেখলাম দলের নেতার দিকে নিশানা করছে... ওর পরেরটি আমার দৃষ্টিপথে এল, ব্যস, গুলি ছুঁড়লাম!'

মেরেসিয়েভের কাছে দৌড়িয়ে গিয়ে ওর পায়ের নিচে ঘাসওয়ালা নরম শেওলার উপরে শুয়ে গা হাতপা ছড়িয়ে দিল পেত্রভ। কিন্তু এরকম আরামে শুয়ে থাকতে না পেরে লাফিয়ে উঠে বসে বলল:

'চমৎকার কয়েকটা কসরৎ আজ আপনি দেখিয়েছেন! অদ্ভুত! দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম! কী করে ওটাকে ঘায়েল করলাম, জানেন? শুনুন... আপনার পিছু পিছু গিয়ে দেখলাম একেবারে পাশে এসে পড়েছে, আপনি এখন যেমন কাছে ঠিক সে রকম...'

'থাম ত, ছোকরা!' পকেট চাপড়ে বাধা দিয়ে বলল আলেক্সেই। 'চিঠিগুলো... চিঠিগুলোর কী হল?'

চিঠিগুলো সেদিন এসেছিল, পড়ার সময় হয়নি মনে পড়ে গেল। পকেট হাতড়ে না পাওয়াতে ভয়ে ঘেমে উঠল। টিউনিকের ভেতরে খোঁজাতে খসখসে খামগুলো হাতে লাগাতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আলেক্সেই। উৎসাহী তরুণটি কী বলছে তাতে কান না দিয়ে ওলিয়ার চিঠিটা বের করে সাবধানে খামের একটা কোণ ছিঁড়ল।

ঠিক সে সময়ে হাউই'এর শব্দ। লাল জ্বলন্ত একটা সাপ উঠল আকাশে, বিমান-ঘাঁটির উপরে বৃত্ত রচনা করে মিলিয়ে গেল; ধূসর ধোঁয়ার রেশ আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছে। বৈমানিকরা এক লাফে উঠে পড়ল। টিউনিকে চিঠিটা রেখে দিল আলেক্সেই, একটিও কথা পড়তে পায়নি সে। খামটা খুলতে গিয়ে লেখার পাতাটা ছাড়াও শক্ত কী একটা হাতে ঠেকেছিল। নিজের দলের পুরোভাগে এখন-পরিচিত গতিপথে উড়তে উড়তে মাঝেমাঝে হাত দিয়ে খামটা দেখে ভিতরে কী আছে ভাবল।

ট্যাঙ্ক-বাহিনী যেদিন শত্রুপক্ষের লাইন ভেদ করে সেদিন থেকে আলেক্সেই'র জঙ্গী বিমান দলের যুদ্ধ কাজ শুরু। ভাঙ্গা লাইনের দিকে যাচ্ছে স্কোয়াড্রনের পর স্কোয়াড্রন। যুদ্ধের পর ফিরে এসে নামতে না নামতেই আর একটা স্কোয়াড্রন উঠছে, প্রত্যাগত বিমানগুলোর দিকে দৌড়িয়ে যাচ্ছে পেট্রলের ট্রাক। খালি ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালা হচ্ছে দিলদরাজ ধারায়। গনগনে ইঞ্জিনগুলোর উপরে কম্পমান ঝাপসা ভাপ, গরমিকালের বৃষ্টির পরে মাঠেঘাটে যেমনটা দেখা যায়। এমন কি মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যও ককপিট

ছেড়ে বৈমানিকরা যায় না; এ্যালুমিনিয়ামের টিনে খাবার তাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু খাবার মত মেজাজ কারোর নেই, গলায় আটকে যায় খাবার।

ক্যাপ্টেন চেস্লোভের স্কোয়াড্রন ফিরে এসে নামল; বিমানগুলোকে বনের কাছে নিয়ে গিয়ে আবার পেট্রল ভরা হচ্ছে, হাসিমুখে ককপিটে বসে আছে মেরেসিয়েভ; দবদপে ক্লান্তির প্রীতিকর অনুভূতি শরীরে, অধৈর্যভাবে সে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে, যারা পেট্রল ভরছে তাড়া দিচ্ছে তাদের। আবার হামলায় ফিরে যেতে চায় সে, চায় নিজেকে পরখ করতে। বারবার টিউনিকের ভিতরে হাত দিয়ে খসখসে খামগুলোকে স্পর্শ করছে, কিন্তু এই অবস্থায় পড়ার ইচ্ছে নেই তার।

প্রদোষ শুরু হল, শুধু তখন বৈমানিকদের ছাড়া মিলল। আস্তানার দিকে মেরেসিয়েভ গেল, সাধারণত বনের মধ্য দিয়ে যে সোজা পথে সে যায় সেটা ধরে নয়, আগাছায়-ভরা মাঠের ঘুরপথে। আপাত শেষহীন দিনটির দ্রুত পরিবর্তিত নানা ভাবের পরে, মুখর নানা শব্দের পরে বিশ্রাম করতে, গুছিয়ে ভাবতে চায় সে।

পরিষ্কার সুগন্ধি সন্ধ্যা, এত স্তব্ধ যে কামানের দূর গর্জনকে আর যুদ্ধের আওয়াজের মত ঠেকে না, মনে হয় গতপ্রায় ঝড়ের গুরুগুরু ধ্বনি। রাস্তাটা যে মাঠ দিয়ে গিয়েছে আগে সেটা ছিল গমের ক্ষেত। সাধারণত উঠোনের কোণে কিম্বা মাঠের ধারে পাথরের স্তূপের কাছে আগাছারা সন্তর্পণে পাতলা ডাঁটা মেলে দেয়, মালিকের নজর যায় না এমন সব জায়গায়, কিন্তু এখানে অখণ্ড প্রাকারের মত বিরাট উদ্ধত বলিষ্ঠভাবে উঠেছে আগাছার ঝাড়, পরাভূত করেছে জমিকে, বহু বংশপরম্পরায় চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে জমিকে উর্বরা করেছিল। শুধু এখানে সেখানে ঘন আগাছার মধ্যে ঘাসের ক্ষীণ ডগার মত গজিয়ে ওঠে গমের কয়েকটা পাতলা শিষ। জমির সমস্ত কিছু খেয়ে ফেলেছে আগাছা, শুষে নিয়েছে সূর্যালোক, গমকে বঞ্চিত করেছে সূর্যের আলো আর আহার্য থেকে, ফুল আর শস্য হবার আগেই তাই গমের শিষগুলো শুকিয়ে গিয়েছে।

মেরেসিয়েভ ভাবল: ঠিক এইভাবে ফ্যাশিস্টরা চায় আমাদের ক্ষেতে শেকড় গজাতে, জমির সার গিলে ফেলতে, কেড়ে নিতে চায় আমাদের সম্পদ, তারপর বিকট ঔদ্ধত্যে উঠে সূর্যকে আড়াল করে আমাদের পরিশ্রমপ্রিয়, বিরাট মহান জনগণকে তাড়িয়ে দিতে চায় ক্ষেত খামার থেকে। ফ্যাশিস্টরা চায় ওদের পরাভূত করে শুষে নিতে, ঠিক যেভাবে এই আগাছাগুলো

অল্পসংখ্যক গমের শিষগ্নলোকে স্নর্যালোক থেকে বঞ্চিত করেছে, সবল স্নন্দর শস্যদানার সঙ্গে বাহ্য সাদৃশ্যটুকু পর্যন্ত এখন ওদের নেই। বালকস্নলভ উদ্যমের প্রেরণায় আলেক্সেই আবল্নস কাঠের ছড়িটা সজোরে ঘ্নরিয়ে লালচে, পালকের মত আগাছাগ্নলোকে ঘা দিল, গোছা গোছা উদ্ধত মাথা কেটে পড়ে যাওয়াতে খ্নসিতে ভরে উঠল তার মন। ম্নখ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, তব্নও গমের টুঁটি-চাপা আগাছাগ্নলোকে কেটে চলল আলেক্সেই, ক্লান্ত শরীরে লড়াই আর আলোড়নের আমেজে উল্লসিত সে।

অপ্রত্যাশিতভাবে পিছনে হ্নঙ্কার দিয়ে একটা জিপ হঠাৎ কিঁচকিঁচিয়ে ব্রেক কষে থামল পথের উপরে। ফিরে না তাকিয়েই আঁচ করল আলেক্সেই যে উইং কম্যান্ডার কাছে এসে পড়েছেন, তার বালকস্নলভ কার্যকলাপ দেখেছেন তিনি। কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল তার, গাড়িটা আসার শব্দ শ্ননতে পায়নি এমন ভান করে, ছড়ি দিয়ে মাটি খ্ঁড়তে লাগল। কিন্তু কানে এল কর্ণেল বলছেন:

'ওগ্নলো কাটা হচ্ছে ব্নঝি? কাজের মত কাজ বটে। আর আমি সারা বিমান-ঘাঁটিতে আপনাকে খ্ঁজে বেড়াচ্ছি। আমাদের বীর কোথায়? কোথায় গেল? আর তিনি এখন আগাছার সঙ্গে য্নদ্ধ মত্ত।'

জিপ থেকে লাফিয়ে নামলেন কর্ণেল। গাড়ি চালাতে এবং অবসর সময়ে গাড়ি নিয়ে ঘ্নরঘ্নর করতে ভালোবাসতেন তিনি, ঠিক যেমন ভালোবাসতেন কঠিন মহড়ার সময়ে নিজের দলের প্নরোভাগে থাকাটা আর সন্ধ্যেবেলায় মিস্ত্রীদের সঙ্গে তৈলাক্ত ইঞ্জিনগ্নলো নাড়াচাড়া করা। সাধারণত নীল ওভারঅল থাকত গায়ে, শ্নধ্ন তাঁর শীর্ণ, প্রভুত্বব্যঞ্জক চেহারা আর বিমান বাহিনীর চোস্ত ক্যাপটি দেখে বোঝা যেত তেলঝুল-মাখা মিস্ত্রীদের থেকে তিনি আলাদা।

তখনো বিব্রতভাবে ছড়ি দিয়ে মাটি খ্ঁড়ছে মেরেসিয়েভ। তার কাঁধে হাত রেখে কর্ণেল বললেন:

'দেখি আপনার চেহারাটা একবার! হ্ঁ, গোল্লায় যান। আহা মরি এমন কিছ্ন না! কথাটা এখন স্বীকার করি। যখন আমাদের এখানে এলেন তখন আপনার কথা বিশ্বাস করিনি, আর্মি হেডকোয়ার্টারসে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছ্ন বলা সত্ত্বেও। বিশ্বাস করিনি যে আবার লড়তে পারবেন। তব্নও আপনি পেরেছেন! আর তাও কেমন ভাবে... এই হল আমাদের জন্মভূমি রাশিয়া! অভিনন্দন জানাই আপনাকে! আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন নিন...

"পাতাল-সহরে" যাচ্ছেন বুঝি? চলুন, আপনাকে পেঁৗছিয়ে দিই. ভেতরে আসুন।'

মেঠো পথ ধরে জিপ ছুটল, মোড় নেবার সময়ে পাগলের মত হেলে পড়ে।

'শুনুন, আপনার হয়ত কিছু চাই, হয়ত আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে? আমার কাছে সাহায্য চাইতে ইতস্তত করবেন না, সাহায্য পাবার যোগ্য আপনি,' পথহীন একটা ঝোপের মধ্য দিয়ে নিপুণভাবে গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন কর্ণেল; দুধারে বৈমানিকদের থাকার জায়গা, ওরা সেটার নাম রেখেছে "পাতাল-সহর"।

'আমার কিছু চাই না, কমরেড কর্ণেল। অন্যদের সঙ্গে আমার কোন তফাৎ নেই।. আমার পা নেই, সেটা লোকে ভুলে গেলে ভালো,' বলল মেরেসিয়েভ।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন... কোন ঘরটা আপনার? এটা?'

ডাগ-আউটের প্রবেশপথের সামনে ঝট করে জিপ দাঁড় করালেন কর্ণেল, মেরেসিয়েভ গাড়ি থেকে নামতে না নামতে জিপটা ধকধক শব্দে চলল বনের মধ্য দিয়ে, বার্চ আর ওকগাছের মাঝে এঁকেবেঁকে পথ করে নিয়ে।

ডাগ-আউটে গেল না আলেক্সেই। বার্চগাছের নিচে ব্যাঙের ছাতার গন্ধে-ভরা পশমের মত নরম শেওলার উপরে শুয়ে সাবধানে খাম থেকে বের করল ওলিয়ার চিঠিটা। একটা ফটোগ্রাফ গড়িয়ে পড়ল ঘাসে। তাড়াতাড়ি তুলে নিল সেটা আলেক্সেই, ব্যথায় ওর বুক ঢিপঢিপ করছে।

ফটোগ্রাফ থেকে ওর দিকে চেয়ে আছে পরিচিত অথচ প্রায় চেনা যায় না একটি মানুষ। সামরিক পোশাকে ওলিয়ার ছবি: টিউনিক, পেটি, "অর্ডার অব্ দি রেড স্টার," এমন কি গার্ডের তকমা — সেটা এত সুন্দর মানিয়েছে ওকে! দেখে মনে হয় অফিসারের পোশাকে পাতলা চেহারার সুদর্শন একটি ছেলে। শুধু ছেলেটির মুখে ক্লান্তির ছাপ, আর তার দীপ্ত বড়ো চোখজোড়ায় বয়সোনুচিত তীক্ষ্ম দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ চোখজোড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আলেক্সেই। সন্ধ্যেবেলায় দূর থেকে ভেসে আসা প্রিয় গানের সুরে মনে যে অকারণ ধীর বিষণ্ণ ভাব আসে, সে ভাবে ভরে গেল তার অন্তর। পকেটে ওলিয়ার পুরোনো ছবিটা পেল — শাদা তারার মত ডেইজির মধ্যে মাঠে বসে আছে ছাপা-ফ্রক পরনে। টিউনিক-পরা ক্লান্ত চোখ মেয়েটিকে আগে কখনো দেখেনি, আশ্চর্যের

বিষয়, চেনা মেয়েটির চেয়ে তাকে ভালো লাগল আলেক্সেই'র। নতুন ফটোগ্রাফটির পিছনে লেখা: "মনে রেখো।"

চিঠিটা ছোট, কিন্তু খুসিতে ভরা। স্যাপারদের একটি প্লেটুনের ভার এখন ওলিয়ার হাতে, যুদ্ধে নিযুক্ত নয় প্লেটুনটি, বেসামরিক কাজ, স্তালিনগ্রাদের পুনর্গঠনে সাহায্য করছে। নিজের কথা বিশেষ লেখেনি ওলিয়া, মহান সহরটির কথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জানিয়েছে: সহরটির ভগ্নাবশেষে প্রাণ ফিরে আসছে আবার, পুনর্গঠনের জন্য দেশের সব জায়গা থেকে এসেছে ছেলে মেয়ে আর প্রবীণারা, তাদের বাসা হল মাটির নিচে ঘর, কামান বসাবার জায়গা, বাঙ্কার — লড়াই শেষ হবার পরে টিঁকে গিয়েছে সেগুলো — ট্রেঞ্চের কামরা, প্লাই-উডের ব্যারাক আর খোঁদল। লোকে বলছে যারা ভালো কাজ করবে তারা প্রত্যেকে পুনর্গঠিত সহরে ফ্ল্যাট পাবে। সেটা যদি সত্যি হয় তবে যুদ্ধ শেষ হলে বাসার অভাব আলেক্সেই'র হবে না।

গ্রীষ্মকালের গোধূলি নেমেছে তাড়াতাড়ি। টর্চের আলোয় চিঠির শেষ কয়েকটি ছত্র আলেক্সেই পড়ল। পড়া শেষ হয়ে গেলে ফটোগ্রাফটির উপরে আলো ফেলল। কঠিন অকপট চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ছেলে-সৈনিকটি। "প্রিয়তমা, তোমাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হচ্ছে... যুদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়ে যায়নি বটে, কিন্তু ভেঙ্গে ত পড়নি তুমি! তুমি কি প্রতীক্ষায় আছ? ধৈর্য ধর। আমি আসবই। আমাকে তুমি ভালোবাসো, বরাবর ভালোবেসো।" স্তালিনগ্রাদ যোদ্ধাটির কাছ থেকে আঠারো মাস নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চেপে রেখেছে বলে হঠাৎ লজ্জিত বোধ করল আলেক্সেই। প্রবল ইচ্ছে হল তক্ষুণি ভাগ-আউটে গিয়ে খোলাখুলিভাবে সবকিছু ওকে লেখে — যা ঠিক করবার ও যত শীগগির করে ততই ভালো। ব্যাপারটার ফয়সলা হয়ে গেলে দুজনের পক্ষেই মঙ্গল।

আজকের কীর্তিকলাপের পরে ওর সমকক্ষভাবে আলেক্সেই কথা বলতে পারে ওলিয়ার সঙ্গে: শুধু যে বিমান চালাচ্ছে নিজে তা নয়, লড়াইও করছে। নিজের কাছে ত শপথ করেছিল যে হয় সব আশা ভেঙ্গে গেলে নয় লড়াই'এ অন্যদের সমকক্ষ হলে সবকিছু জানাবে ওকে। সিদ্ধিলাভ করেছে সে। ওর নামানো বিমানদুটো সবায়ের চোখের সামনে ঝোপঝাড়ে পড়ে জ্বলেছে। উইঙের খাতায় ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছে সেদিনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, খবরটা গিয়েছে ডিভিশনাল ও আর্মি হেডকোয়ার্টারসে, মস্কোতেও।

এ সব সত্যি। নিজের অঙ্গীকার রেখেছে সে, এখন লিখতে পারে। কিন্তু একটা "স্তুকা" কি জঙ্গী বিমানের যোগ্য শিকার? ভাববার বিষয় সেটা। সত্যিকার শিকারী নিজের দক্ষতার কথা তুলে বলবে না যে সে, এই ধর না কেন, একটা খরগোস মেরেছে, বলবে কি?

বনে জোলো রাত্রি অন্ধকার হয়ে এল। যুদ্ধের বজ্রনির্ঘোষ দক্ষিণে চলে গিয়েছে, দূর অগ্নিকাণ্ডের রক্তাভা গাছের ডালপালার জাল ভেদ করে প্রায় দেখা যায় না, আর তাই স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে সুগন্ধি সতেজ গ্রীষ্মকালীন বনের সমস্ত শব্দ, ফাঁকা জায়গায় গঙ্গাফড়িঙের উন্মত্ত খসখস আওয়াজ, কাছের বিলে শত শত ব্যাঙের ডাক, একটি সারসের সুতীব্র চীৎকার, আর সবকিছু ছাপিয়ে ভিজে আধো-অন্ধকারে নাইটিংগেলের গান।

শিশিরে-ভেজা নরম শেওলার উপরে বার্চগাছের নিচে আলেক্সেই তখনো বসে, চাঁদের আলোর টুকরো কালো ছায়ায় মিশে পায়ের নিচে ঘাসে এসে পড়ছে। আবার পকেট থেকে ফটোটি বের করে হাঁটুর উপরে রেখে চাঁদের আলোয় সেদিকে তাকিয়ে থেকে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল আলেক্সেই। মাথার উপরে পরিষ্কার ঘন নীল আকাশে নৈশ বোমারু বিমানের ছোট কালো ছায়া একটার পর একটা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের শব্দ নিচু, খাদের সুরে বাঁধা, কিন্তু নাইটিংগেলের সঙ্গীতমুখর চন্দ্রালোকিত বনে যুদ্ধের এই শব্দটি পর্যন্ত শোনাচ্ছে গুবরে-পোকার শান্ত গুঞ্জনের মত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছবিটা টিউনিকের পকেটে রেখে আলেক্সেই সটান দাঁড়িয়ে উঠল, রাত্রির মোহ কাটাবার জন্য গা ঝাড়া দিল। পায়ের নিচে শুকনো ডালপালার খসখস, তাড়াতাড়ি সে নামল ডাগ-আউটে, সৈনিকের অপরিসর বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে দৈত্যের মত শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে পেত্রভ, নাক ডাকছে জোরে।

৫

ভোর হবার আগে বৈমানিক দলকে তুলে দেওয়া হল। আর্মি হেডকোয়ার্টারসে খবর এসেছে, যে-এলাকায় সোভিয়েত ট্যাঙ্ক লাইন ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল সেখানে তার আগের দিন জার্মান বিমানের একটা বড়ো দল এসেছে। কুর্স্ক স্যালিয়েন্টের একেবারে পীঠদেশের ব্যূহ ভেদ করে সোভিয়েত ট্যাঙ্কের অগ্রগতি যে বিপজ্জনক ব্যাপার সেটা বোধগম্য হয়েছে জার্মান কমাণ্ডের, তাই তলব করা হয়েছে সেরা জার্মান বৈমানিকরা যে দলে

আছে সেই "রিখথোফেন" বিমান ডিভিশনকে; পর্যবেক্ষণ আর স্কাউটদের আনা খবর সোভিয়েত হেডকোয়ার্টারসের এই ধারণা সমর্থন করল। স্তালিনগ্রাদের কাছে ছত্রভঙ্গ এই ডিভিশনটিকে পরে ফ্রন্ট লাইনের অনেক পিছনে কোথাও পুনর্গঠিত করা হয়। বৈমানিকদের সতর্ক করা হল যে শত্রু সংখ্যায় অনেক, একেবারে হালের বিমান... "ফোক-উলফ-১৯০" আছে ওদের, আর বিশেষ অভিজ্ঞ বৈমানিক ওরা, লড়াই করেছে অনেক। সে রাত্রে ফাঁক দিয়ে ট্যাঙ্কের অনুসরণ করতে শুরু করেছে মোটর চালিত বাহিনীর দ্বিতীয় দল, বৈমানিকদের সজাগ থাকতে এবং দলটিকে নির্ভরযোগ্য রক্ষণের কাজ করতে আদেশ দেওয়া হল।

"রিখথোফেন!" অভিজ্ঞ বৈমানিকরা নামটির সঙ্গে ভালো করে পরিচিত, হেরমান হেরিঙের বিশেষ পেটোয়া দল এটি। জার্মান সৈন্যরা কোণঠেসা হলেই দলটিকে পাঠানো হয়। এটির বৈমানিকরা — তাদের কয়েকজন প্রজাতান্ত্রিক স্পেনে বোম্বেটে যুদ্ধ চালিয়েছিল — হিংস্র দক্ষ লড়ুয়ে, বিপজ্জনক শত্রু হিসেবে খ্যাতি ছিল তাদের।

'ওরা বলছে "রিখথোফেন" গোছের কী সব পাঠিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে! কী মজা! আশা করি শীগগিরই মুলাকাৎ হবে! "রিখথোফেনদের" আমরা দেখিয়ে দেব!' খাবার ঘরে বসে ভারিক্কি চালে বলল পেত্রভ, তাড়াতাড়ি খাবার গিলতে গিলতে আর জানলার দিকে তাকিয়ে, সেখানে ওয়েট্রেস রায়া বড়ো একটা গোছা থেকে ফুল বেছে, খড়ি দিয়ে মাজা ঝকঝকে ফাঁকা গোলার খাপে রাখছে।

বলাই বাহুল্য "রিখথোফেনদের" বিষয়ে এই বেপরোয়া উক্তিটি কফি পানরত আলেক্সেইকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি, কথাটা বলা হয়েছিল মেয়েটির জন্য, ফুল নিয়ে ব্যস্ত সে, মাঝেমাঝে সুদর্শন ফুটফুটে পেত্রভের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। অনুগ্রহসূচক হাসিতে দুজনকে দেখছিল আলেক্সেই, কিন্তু কাজ নিয়ে হাসি তামাসা আর বাচালতা তার পছন্দ নয়।

'"রিখথোফেন" যা-তা নয়,' আলেক্সেই বলল। 'আর "রিখথোফেন" মানে: যদি বনবাদাড়ে আজ পুড়তে না চাও তাহলে চোখজোড়া হামেশা খোলা রাখবে। ওটার মানে: কান খাড়া করে রাখবে, অন্যদের সঙ্গ ছাড়বে না। "রিখথোফেনরা" ছোকরা, বুনো জন্তুর মত, কোথায় আছ খেয়াল করতে না করতে শরীরে দাঁত বসিয়ে দেয়...'

ভোরবেলায় স্বয়ং কর্ণেলের পরিচালনায় প্রথম স্কোয়াড্রনটি আকাশে

উঠল। বারোটি জঙ্গী বিমানের আর একটি দল তৈরী হল ওঠবার জন্য। সেটির ভার "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর," গার্ডস-মেজর ফেদোতভের হাতে, কম্যান্ডারকে বাদ দিয়ে তিনি দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ বৈমানিক। বিমানগুলো প্রস্তুত, ককপিটে বসেছে বৈমানিকরা, নিচু গিয়ারে ইঞ্জিনগুলো বনের ধার ঘেঁষে হাওয়ার ঝটকা পাঠাচ্ছে, ঝড়ের আগে মাটি-ঝাঁটানো গাছ-নাড়ানো হাওয়ার মত, যখন বৃষ্টির প্রথম বড়ো ভারী ভারী ফোঁটা তৃষ্ণার্ত পৃথিবীতে সশব্দে পড়তে শুরু করে।

ককপিটে বসে আলেক্সেই দেখল প্রথম দলের বিমানগুলো খাড়া হয়ে নিচে নামছে, যেন আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। অভ্যাসবশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিমানগুলো গুণল সে, দুটোর নামতে একটু দেরী হওয়াতে উৎকণ্ঠায় সচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু শেষ বিমানটি নেমে এল। সবাই ফিরেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আলেক্সেই।

শেষ বিমানটি এক পাশে সরে যেতে না যেতেই মেজর ফেদোতভের "পয়লা" সজোরে উপরে উঠল, পিছু পিছু জোড়ায় জোড়ায় উঠল অন্য জঙ্গী বিমানগুলো। বনের ওধারে সারি বাঁধল তারা। গতিপথ দেখিয়ে চলেছেন ফেদোতভ। নিচুতে থেকে, ব্যূহভঙ্গের এলাকার উপরে সতর্কভাবে উড়ে চলল সবাই। আলেক্সেই দেখল তার বিমানের নিচে মাটিটা দৌড়িয়ে চলেছে, খুব উঁচু থেকে দূর পরিপ্রেক্ষিতে এবারে নয়, সে পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু দেখায় খেলনার মত, দেখল খুব কাছে থেকে। আগের দিন উপর থেকে যেটাকে খেলার মত মনে হয়েছিল এখন সেটা চোখের সামনে উপস্থিত বিরাট সীমাহীন রণক্ষেত্রের মত। বিমানের ডানার নিচে উন্মত্তগতিতে ধেয়ে চলেছে গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত, ট্রেঞ্চে কাটা এবড়োখেবড়ো মাটঘাট ঝোপঝাড়। মাঠে পড়ে আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাশ; পরিত্যক্ত কামান এক একটা, মায় গোটা ব্যাটারি, ভাঙ্গা ট্যাঙ্ক; যেখানে সৈন্যদলের উপরে গোলাগুলি বর্ষিত হয়েছিল সেখানে বাঁকাচোরা লোহা আর কাঠের ভারী স্তূপ; ভূমিসাৎ একটি বড়ো বন, উপর থেকে মনে হয় জানোয়ারের বিরাট পাল পায়ে দলেছে সেটাকে — সিনেমায় নানা দৃশ্যের মত সবেগে ভেসে যাচ্ছে, মনে হয় সিনেমাটির শেষ নেই। কী ভীষণ রক্তাক্ত যুদ্ধ চলে এখানে, কী দারুণ লোকক্ষয় হয়েছে, জয়লাভের গুরুত্বটা কত বিরাট দৃশ্যগুলি তার সাক্ষী।

বিস্তীর্ণ জায়গাটির সমস্তটা জুড়ে শত্রুপক্ষের অবস্থানের অনেক দূর

পর্যন্ত, প্রায় আদিগন্ত গিয়েছে ট্যাঙ্কের চাকার জোড়া জোড়া আঁকাবাঁকা দাগ, যেন অদ্ভুত জানোয়ারের বিরাট একটা দল পথ না বেছে মাঠঘাট হয়ে দৌড়িয়ে, সমস্ত কিছু পায়ে দলে দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। মোটরচালিত কামান, পেট্রলের ট্যাঙ্ক, ট্রাক্টরে-টানা মেরামতের গাড়ি আর ঢাকা-দেওয়া লরি অন্তহীন সারিতে ট্যাঙ্কের পিছনে পিছনে চলেছে, ধুলোর গাঢ় পুচ্ছ অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। উপর থেকে মনে হয় এদের গতি শামুকের মত; আরো উঁচুতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এ সবকিছুকে দেখায় যেন বসন্তে বনের পথে অগ্রসর পিঁপড়ের বাহিনী।

অচঞ্চল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠছে ধুলোর রেখা, তাতে ঝাঁপিয়ে, যেন মেঘে ডুব মারছে এমনভাবে জঙ্গী বিমানগুলো সারির উপর দিয়ে গেল অগ্রগামী জিপগুলোর দিকে, ট্যাঙ্ক-বাহিনীর কম্যাণ্ডাররা বুঝি তাতে আছে। এদের উপরে আকাশে শত্রু বিমান নেই, দূরে ঝাপসা দিগন্তে যুদ্ধের ইতস্তত ধূম্ররেখা এরি মধ্যে চোখে পড়ে। বিমান দল পিছন ঘুরে সাপের মত এঁকেবেঁকে অগাধ আকাশে উড়ে চলল। ঠিক সেই মুহূর্তে আলেক্সেই দেখল দিগন্তে প্রথমে একটা, তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে কালো দাগ খুব নিচুতে ভাসছে। জার্মানরা! ওরাও খুব নিচু দিয়ে প্রায় জমি ঘেঁষে আসছে, আগাছায়-ভরা লালচে মাঠের উপরে ধোঁয়ার রেখা যে ওদের লক্ষ্য বোঝা গেল। পিছন ফিরে স্বতই তাকাল আলেক্সেই। পেত্রভ ওর পিছনে, যতখানি কাছে থাকা যায় ততখানি কাছে।

কান পেতে আলেক্সেই শুনল দূর থেকে কে বলছে:

'আমি ২ নং গাঙচিল ফেদোতভ; আমি ২ নং গাঙচিল, ফেদোতভ। এ্যাটেনশন! আমার পিছনে চল!'

ওড়বার সময়ে জ্যাবদ্ধ থাকে বৈমানিকদের স্নায়ু, তখন আদেশ পালন করার ব্যাপারটা এমন যে অনেক সময় কমাণ্ডার হুকুম দিতে না দিতেই তার অভিপ্রায় মেনে চলে তারা। নানা আওয়াজ আর গুঞ্জনের মধ্যে নতুন আদেশটি শোনার আগেই সমস্ত দলটি জার্মানদের বাধা দেবার জন্য জোড়ায় জোড়ায় কিন্তু সার বেঁধে ঘুরল। দর্শন ও শ্রবণশক্তি আর মন একাগ্র। চোখের সামনে শত্রু বিমানগুলো দ্রুতবেগে বড়ো হচ্ছে, তা ছাড়া আর কিছু দেখছে না আলেক্সেই; দ্বিতীয় হুকুমটি কখন শুনবে তার প্রতীক্ষায় আছে, ইয়ারফোনে শুধু নানা চড়মড়, গুনগুন ধ্বনি। কিন্তু হুকুমটির জায়গায় স্পষ্টভাবে কানে এল জার্মান ভাষায় কার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর:

'আখটুং! আখটুং!.. "লা-ফিউন্‌ফ্‌!" আখটুং!* নিচের পরিদর্শক জার্মান বিমানগুলোকে বিপদের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, তার কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই।

যথারীতি বিখ্যাত জার্মান বিমান ডিভিশনটি যেসব জায়গায় আকাশ যুদ্ধ হবে বলে মনে করেছে সেসব জায়গায় আগের দিন রাত্রে পারাস্যুটে লক্ষ্যকারী আর পরিদর্শক নামিয়েছে; রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে তারা কয়েকটি দলে সতর্কভাবে যুদ্ধভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

পরে অত স্পষ্টভাবে নয়, কানে এল আর একজন ভাঙ্গা গলায় ক্রুদ্ধভাবে চেঁচিয়ে জার্মানে বলছে:

'দনের-ভেতের! লিঙ্ক্‌স "লা-ফিউন্‌ফ্‌!" লিঙ্ক্‌স "লা-ফিউন্‌ফ!"'**

বিরক্তি ছাড়াও সে কণ্ঠস্বরে ছিল আতঙ্কের আভাস।

'"রিখথোফেন," আমাদের "লাভচ্‌কিনদের" তোমরা ভয় পাও না নিশ্চয়ই,' মেরেসিয়েভ দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল, শত্রু বিমানগুলো সার বেঁধে আসছে, তাদের দেখতে দেখতে টান-টান শরীর উত্তেজনায় সচকিত হয়ে উঠল।

এবার শত্রু বিমানগুলো স্পষ্টভাবে গোচরে এসেছে। এরা হল "ফোক-উলফ-১৯০"। সবেমাত্র কাজে লাগানো হয়েছে সবল দ্রুতগতি বিমানগুলোকে।

সংখ্যায় তারা ফেদোতভের দলের চেয়ে দ্বিগুণ। যে ধরাবাঁধা কায়দা "রিখথোফেন" বাহিনীর বৈশিষ্ট্য সেই কায়দায় উড়ছে তারা, জোড়ায় জোড়ায়, মই'এর ধাপের মত, যাতে প্রত্যেকটি জোড়া সামনের বিমানদুটির পিছন দিকটা রক্ষা করতে পারে। উচ্চতার সুবিধে নিয়ে ফেদোতভ ওদের আক্রমণ করল। নিজের লক্ষ্য বাছাই করে নিয়েছে আলেক্সেই, অন্যদের নজরে রেখে সেদিকে চলেছে, চেষ্টা করছে যাতে সেটা দৃষ্টির বাইরে চলে না যায়। কিন্তু ফেদোতভের আগেই অন্য কে যেন কাজে নেমে পড়ল। অন্যদিক দিয়ে ঝড়ের মত এসে একদল "ইয়াক" উপর থেকে জার্মানদের দ্রুতবেগে আক্রমণ করল। আঘাতটা এত সফল যে তৎক্ষণাৎ শত্রুদের দল ভেঙ্গে গেল। আকাশে বিশৃঙ্খলা। দু পক্ষই দল ভেঙ্গে দুই'এ দুই'এ. চারে চারে লড়াই করছে। জঙ্গী বিমানগুলি ট্রেসার গুলির ফোয়ারা ছুটিয়ে চেষ্টা করছে শত্রুদের কেটে দিতে, পাশে এবং পিছনে গিয়ে পড়তে।

* এ্যাটেনশন! এ্যাটেনশন! "লাভচ্‌কিন-৫"! এ্যাটেনশন! (জার্মান ভাষায়)

** সর্বনাশ! বাঁয়ে! "লাভচ্‌কিন-৫"! বাঁয়ে! "লাভচ্‌কিন-৫"! (জার্মান ভাষায়)

জোড়া বিমানগুলি চক্রাকারে ঘুরছে, তাড়া করছে অন্যদের, জটিল নাগরদোলার মত তাদের সঞ্চরণ।

এই বিশৃঙ্খলায় ঠিক কী ঘটছে শুধু অভিজ্ঞ লোকেই বুঝতে পারে, ঠিক যেমন ইয়ারফোনে বিশৃঙ্খল হট্টগোলের অর্থ অভিজ্ঞ বৈমানিকের কানে ধরা পড়ে। সে সময়ে আকাশে কী না শোনা যায়! আক্রমণকারীরা ভাঙ্গা গলায় রসালো গালিগালাজ করছে, বিজয়ের উল্লসিত আর পরাজয়ের ভয়ার্ত চীৎকার, আহতদের আর্তনাদ, হঠাৎ মোড় নিতে নিতে দাঁতে দাঁত চাপছে কোন বৈমানিক, ভারী নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ... যুদ্ধের উন্মত্ততায় কে যেন গলা ফাটিয়ে জার্মান গান গাইছে, কে যেন রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল "মা"! কে যেন ঘোড়া টিপতে টিপতে বলল, "ঠেলা সামলাও এবার!"

মেরেসিয়েভের লক্ষ্য বিমানটি দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। তার পরিবর্তে উপরে দেখল একটি "ইয়াককে" পিছু ধাওয়া করেছে একটি চুরোটাকৃতি সোজা-পাখা "ফোক", দুপাশ থেকে ইতিমধ্যেই সমান্তরালভাবে ট্রেসার গুলির ফোয়ারা ছুটছে। "ইয়াকের" লেজে এসে পড়ছে গুলির ধারা। সেটিকে বাঁচাবার জন্য রকেটের মত উপরে উঠল মেরেসিয়েভ। মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য ঝট করে উপর দিয়ে একটি ছায়া গেল, আর সেই ছায়া লক্ষ্য করে সমস্ত কামান ছোটাল মেরেসিয়েভ। "ফোকটার" কী হল দেখতে পেল না মেরেসিয়েভ শুধু নজরে পড়ল "ইয়াকটা" এখন একলা, লেজটা জখম বটে। গণ্ডগোলের মধ্যে পেত্রভ হারিয়ে গিয়েছে কি না দেখবার জন্য পিছন ফিরে তাকাল মেরেসিয়েভ। না, ও প্রায় তার বরাবর উড়ছে।

'পিছনে পড়ে থেক না, ছোকরা,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল আলেক্সেই।

চড়চড়, গুনগুন, গান, দুই ভাষায় উল্লসিত ও ভয়ার্ত চীৎকার, গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ, দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ, গালিগালাজ, গভীর নিশ্বাসপ্রশ্বাস — আলেক্সেই'র কানে তালা ধরে গিয়েছে। শব্দগুলো শুনে মনে হয় না আকাশ-যুদ্ধ চলেছে, মনে হয় মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে হাতাহাতি করে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণে লড়ছে লোকে।

শত্রু বিমান কোথায় দেখার জন্য ফিরে তাকাল মেরেসিয়েভ, আর হঠাৎ শরীর হিম হয়ে গেল। ঠিক নিচে, একটা "ফোক" একটি "লাভচ্কিন-৫"কে আক্রমণ করেছে। সোভিয়েত বিমানটির নম্বর দেখতে পেল না আলেক্সেই, কিন্তু বুঝতে পারল ওটা পেত্রভের। "ফোক-উলফটা" আক্রমণ করেছে, সমস্ত কামান থেকে একসঙ্গে ছুটেছে ট্রেসার গুলি। আর এক মুহূর্ত শুধু পেত্রভ

টি'কে থাকবে! ওরা দুজনে এত কাছাকাছি যে আকাশ-যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম মেনে বন্ধুকে ঝট করে সাহায্য করার উপায় নেই, না আছে সময়, না আছে ঘোরবাব জায়গা। কিন্তু বন্ধুর জীবন সংশয়, তাই অসাধারণ একটা চালের ঝুঁকি নেবে ঠিক করল আলেক্সেই। সটান নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, গ্যাস বাড়িয়ে দিল। বিমানটির ভার জাড্যে আর ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তির সঞ্চারে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে, পাথরের মত, না, পাথরের মত নয়, রকেটের মত বিমানটি হ্রস্ব-পাখা "ফোকটির" উপরে সটান পড়ল, ট্রেসার গুলির জালে সেটিকে আচ্ছন্ন করে। প্রচণ্ড গতিবেগ আর দ্রুত অধোগতির জন্য চেতনা লুপ্ত হবার অনুভূতি আলেক্সেই'র, সটান ঝাঁপিয়ে নিচে পড়ল সে, ঝাপসা চোখে কোনক্রমে দেখল যে নিজের প্রপেলারের ঠিক সামনে বিস্ফোরণের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল "ফোকটি"। কিন্তু পেত্রভ কোথায়? কোন পাত্তা নেই। বিমানটি নামিয়ে দিয়েছে কি ওরা? পারাস্যুট নামতে পেরেছে? এড়িয়ে যেতে পেরেছে?

আকাশ ফাঁকা। নিঃশব্দ হাওয়ায় অদৃশ্য বিমান থেকে সুদূর কণ্ঠস্বর কানে এল:

'আমি ২ নং গাঙচিল, ফেদোতভ। আমি ২ নং গাঙচিল, ফেদোতভ। আমার পিছনে সার বাঁধ। ফিরে চল! আমি ২ নং গাঙচিল...'

ফেদোতভ নিজের দলকে তাহলে অপসরণ করছে।

"ফোক-উলফটিকে" সারা করে, বেপরোয়া পতনের পরে বিমানটিকে সোজা করে আলেক্সেই বসে আছে, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে; আকাশ এখন প্রশান্ত, ভালো লাগছে সেটা, বিপদ অতিক্রান্ত, বিজয়ের সচেতনতা মনে। ফেরবার গতিপথ ঠিক করার জন্য তাকাল কম্পাসের দিকে, তারপর পেট্রলের কাঁটার দিকে। ভুরু কোঁচকাল। পেট্রল অনেক কমে গিয়েছে, কোনক্রমে ঘাঁটিতে পৌঁছন যেতে পারে। কিন্তু পর মুহূর্তে শূন্যের কাছাকাছি পেট্রলের কাঁটার চেয়েও ভয়াবহ আর একটি জিনিস আলেক্সেই দেখল — একটি তরঙ্গিত মেঘের পিছন থেকে, ভগবান জানেন কোথা থেকে, একটা "ফোক-উলফ-১৯০" সটান তার দিকে আসছে। ভাববার সময় নেই, এড়িয়ে যাবার সময় নেই।

শত্রুর মুখোমুখি হবার জন্য ক্ষিপ্রভাবে বিমান ঘোরাল আলেক্সেই।

৬

যে রাস্তা ধরে আক্রমণকারী বাহিনীর পশ্চাদবর্তী সৈন্যদল একটানা চলেছে, তার উপরে আকাশ-যুদ্ধের নানা শব্দ শুধু যে যুদ্ধরত বিমানগুলির ককপিটে বৈমানিকদের কানে যাচ্ছে তা নয়।

গার্ডস ফাইটার উইঙ্গের কম্যাণ্ডার কর্ণেল ইভানভ বিমানভূমিতে বড়ো একটা পরিচালনা-রেডিও বসিয়েছেন, তা দিয়েও শব্দগুলি শোনা যাচ্ছে। তিনি নিজে অভিজ্ঞ বৈমানিক, যে সব শব্দ আসছে তা শুনে বুঝতে পারলেন যে কড়া যুদ্ধ চলেছে, শত্রুপক্ষ জোরালো আর একরোখা, আকাশ ছেড়ে চলে যেতে একেবারে রাজী নয়। ফেদোতভের লোকেরা দলেভারি শত্রুদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছে, খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা বিমান-ঘাঁটিতে। যারাই পারল তারাই বন থেকে খালি জায়গাটায় এসে উৎকণ্ঠিতভাবে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রইল, বিমানগুলির ওদিক থেকে ফেরার কথা।

শাদা ওভারঅল পরনে সার্জনরা খাবার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল, খাবার চিবোতে চিবোতে তারা দৌড়চ্ছে। ছাতে বড়ো বড়ো রেডক্রস চিহ্নিত এম্বুলান্সের গাড়িগুলো ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে, ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আওয়াজ, কাজে লাগার জন্য তৈয়ার গাড়িগুলো।

প্রথম বিমানজোড়াটি গাছের মাথার উপর দিয়ে এসে পড়ল, বিমানভূমির উপরে চক্রাকারে না ঘুরেই নেমে প্রশস্ত জায়গাটির উপর দিয়ে চলল। জোড়ার একটা হচ্ছে "পয়লা", সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ফেদোতভ তার চালক আর একটি হল "দোসরা", চালক হল তাঁর অনুসরণকারী। ঠিক পরেই এল দ্বিতীয় জোড়াটি। বনের উপরে আকাশ ফিরতি বিমানগুলির ইঞ্জিনের গর্জনে মুখর।

'সাত, আট, নয়, দশ,' আকাশের দিকে ক্রমশ বর্ধিষ্ণু উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে দর্শকেরা গুণছে।

ফিরে-আসা বিমানগুলি নেমে মাঠ ছেড়ে ঢাকা জায়গায় চলে গেল, থেমে গেল তাদের আওয়াজ। দুটো বিমান এখনো ফেরেনি।

প্রতীক্ষারত লোকেরা উদগ্রীব, চুপচাপ। মুহূর্তগুলি কাটছে যন্ত্রণাদায়ক মন্থরতায়।

'মেরেসিয়েভ আর পেত্রভ,' একজন আস্তে আস্তে বলল।

হঠাৎ বিমানভূমিতে শোনা গেল উল্লসিত নারীকণ্ঠ:

'ওই একটা!'

কানে এল বিমান ইঞ্জিনের গর্জন। বার্চগাছের উপর দিয়ে প্রায় তাদের ঘেঁষে "দ্বাদশ" এল। জখম হয়েছে বিমানটি, লেজের একটা ভাগ নেই, বাঁদিকের ডানার গোড়াটা ছিন্ন, বাকিটা এক ফালি তারে ঝুলছে। নেমে বিচিত্রভাবে হেলে দুলে চলল সেটা; সজোরে উপর দিকে উঠল, নেমে আবার লাফাল, আর এইভাবে বিমানভূমির সীমা পর্যন্ত গিয়ে একেবারে থেমে পড়ল, লেজটা একটু উঁচু হয়ে আছে। পাদানিতে সার্জন বসা এম্বুলেন্সগুলো, কয়েকটা জিপ আর প্রতীক্ষারত লোকেদের সবাই দৌড়িয়ে গেল সে দিকে। ককপিট থেকে উঠল না কেউ।

ঢাকনা সরানো হল। ককপিটে জড়পুত্তলির মত পড়ে আছে রক্তাক্ত পেত্রভ। মাথাটা অসহায়ভাবে বুকে ঝুলে পড়েছে। ভিজে সোনালী চুলের গোছায় মুখ ঢাকা। পেটিগুলো সার্জন আর নার্সরা খুলে ফেলল, গুলির টুকরোয় পারাস্যুট ব্যাগটা ছিঁড়ে গিয়েছে, সেটা সরিয়ে নিশ্চল দেহটি সাবধানে তুলে জমির উপরে রাখল। পেত্রভের পা আর হাত জখম হয়েছে। নীল ওভারঅলের উপরে কালো কালো দাগ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রাথমিক সাহায্যের পরে স্ট্রেচারে শোয়ানো হল পেত্রভকে। এম্বুলান্সে তোলা হচ্ছে, চোখ খুলল ও। ফিসফিসিয়ে কী যেন বলল, কিন্তু এত ক্ষীণ কণ্ঠে যে শোনা গেল না। মুখ কাছে নামালেন কর্ণেল।

'মেরেসিয়েভ কোথায়?' আহত পেত্রভ জিজ্ঞেস করল।

'এখনো ফেরেনি।'

স্ট্রেচারটা তোলা হল আবার, কিন্তু সজোরে মাথা নাড়ল আহত লোকটি, এমন কি নেমে পড়ার চেষ্টা পর্যন্ত করল।

'দাঁড়াও!' ও বলল। 'আমাকে নিয়ে যেও না। যেতে চাই না আমি। মেরেসিয়েভের অপেক্ষা করব। আমাকে বাঁচিয়েছে ও।'

বৈমানিক এত সজোরে আপত্তি জানাল আর ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলার ভয় দেখাল যে হাত নাড়লেন কর্ণেল, মুখ ঘুরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন:

'বেশ। থাকুক এখানে। মারা পড়বে না। মেরেসিয়েভের তেল যা আছে তাতে আর এক মিনিট মাত্র চলবে।'

স্টপ-ওয়াচ থেকে চোখ সরাতে পারলেন না কর্ণেল, লাল কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি এক একটি করে শেষ হচ্ছে। অন্য সবাই তাকিয়ে আছে ধূসর বনের দিকে, শেষ বিমানটির আসার কথা তার উপর দিয়ে। সবাই উৎকর্ণ,

কিন্তু কামানের দূর গুরুগুরু গর্জন আর কাছাকাছি একটি কাঠঠোকরার চাপা ঠকঠক শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

মাঝেমাঝে মিনিটের মেয়াদ কত না দীর্ঘ!

৭

শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হবার জন্য মেরেসিয়েভ ফিরল।

"লাভচ্‌কিন-৫" ও "ফোক-উলফ-১৯০" দুটোই ক্ষিপ্র বিমান। বিদ্যুৎবেগে দুটো পরস্পরের কাছে এল।

আলেক্সেই মেরেসিয়েভ আর বিখ্যাত "রিখথোফেন" ডিভিশনের অজানা পাকা বৈমানিকটি পরস্পরকে সরাসরি আক্রমণ করল। এ ধরনের আক্রমণ মুহূর্তের বেশী স্থায়ী হয় না, পাকা ধূমপায়ীর সিগারেট ধরাতে যত সময় লাগে এমন কি তার চেয়েও কম। কিন্তু মুহূর্তটি উদগ্র স্নায়বিক উত্তেজনায় সংহত, বৈমানিকের সমস্ত স্নায়ুর কঠোর পরীক্ষা চলে, ভূমিতে লড়াই করে যারা, সারাদিন যুদ্ধ করেও তাদের তেমন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় না।

যতখানি সম্ভব ক্ষিপ্র বেগে দুটি দ্রুতগতি জঙ্গী বিমান পরস্পরকে আক্রমণ করছে, তার একটি চালকের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করুন। চোখের সামনে প্রতিপক্ষের বিমানটির আকার বাড়ছে। হঠাৎ একেবারে সামনে দেখতে পেলেন খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু; ডানা, ঘুরন্ত প্রপেলারের ঝকঝকে বৃত্ত, কালো কালো বিন্দু, সেগুলো হল কামান। আর একটি মুহূর্ত, অমনি বিমানদুটির ধাক্কা লাগবে পরস্পরের সঙ্গে, ভেঙ্গেচুরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এত অসংখ্য টুকরোয় যে কোনটি বৈমানিকের শরীরের অবশিষ্টাংশ আর কোনটিই বা বিমানের বের করা অসম্ভব হবে। শুধু ইচ্ছাশক্তি নয়, বৈমানিকের সমস্ত মনোবলের অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত সেটি। দুর্বলচিত্ত লোক সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না, জয়লাভের জন্য প্রাণ দিতে সে প্রস্তুত নয়। কিছু না ভেবেই স্টিকটা টানবে সে, ক্ষিপ্রবেগে আগুয়ান মারাত্মক প্রচণ্ড ঝড়টি লাফিয়ে পেরিয়ে যাবে। পর মুহূর্তে তার বিমানটি মাটিমুখো পড়বে, তলাটা কেটে গিয়েছে, হয়ত বা একটা ডানা খসে পড়েছে। তার পরিত্রাণ নেই। পাকা বৈমানিকদের এটা বিলক্ষণ জানা, সবচেয়ে সাহসী যারা শুধু তারাই সরাসরি আক্রমণের ঝুঁকি নেয়।

আকাশ ছিঁড়ে আসছে বিমানদুটো।

আলেক্সেই জানত, যে আসছে ওর দিকে সে আনাড়ি নয়, পূর্ব ফ্রণ্টে বিষম লোকক্ষয়ের পরে জার্মান বিমান বাহিনীর ফাঁকা জায়গা ভরাবার জন্য হেরিঙের আদেশে তালিকাভুক্ত, সংক্ষিপ্ত কর্মসূচীতে তাড়াতাড়ি তালিম-দেওয়া লোক নয়। "রিখথোফেন" বাহিনীর ঝানু বৈমানিক সে, আকাশে অনেক জয়ের চিহ্ন হিসেবে নিশ্চয়ই বিমানটির পাশে পরাভূত নানা বিমানের কালো ছায়া আঁকা। সে দ্বিধা করবে না, গতিপথ থেকে যাবে না সরে, যুদ্ধ এড়াবে না।

'সামাল, "রিখথোফেন",' দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলল আলেক্সেই। এত জোরে ঠোঁটদুটি চাপা যে রক্ত গড়াতে লাগল, সমস্ত পেশী সঙ্কুচিত করে, লক্ষ্যপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ইচ্ছাশক্তি সংহত করে আছে সে, যাতে সরাসরি আক্রমণোদ্যত বিমানটি এসে পড়লে চোখ বুজে না ফেলে।

স্নায়ু এত বেশী সংহত করেছে আলেক্সেই যে ঘূর্ণ্যমান প্রপেলারের ঝাপসা ঝড় ভেদ করে মনে হল শত্রু বিমানটির ককপিটের স্বচ্ছ ঢাকনাটা চোখে পড়ছে, তার পিছন থেকে তার দিকে একাগ্রভাবে তাকিয়ে আছে একজোড়া চোখ, চোখদুটো উন্মত্ত হিংসায় জ্বলছে। ছবিটি স্নায়বিক উত্তেজনার সৃষ্টি, কিন্তু আলেক্সেই'র দৃঢ় ধারণা সে সত্যিই দেখেছে। "এবার তাহলে শেষ," সমস্ত পেশী আরো সঙ্কুচিত করে সে ভাবল, "এবার তাহলে শেষ।" সামনে তাকিয়ে দেখল দ্রুতগতিতে বাড়ন্ত বিমানটি ঝড়ের মত আসছে তার দিকে। না, জার্মানটাও গতিপথ থেকে বিচ্যুত হবে না। এবার তাহলে শেষ।

আকস্মিক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হল আলেক্সেই। শত্রু বিমানটি মনে হচ্ছে হাতের নাগালে, হঠাৎ জার্মান বৈমানিকটি ঘাবড়ে গেল, বিমানটি ঝট করে উঠল উপরে, চোখের সামনে বিদ্যুত ঝলকের মত এসে পড়ল ওটির নীল রৌদ্রালোকিত নিম্ন দেশ। সেই মুহূর্তে ঘোড়া টিপে বিমানটিকে তিনবার গুলির জ্বলন্ত সুতোয় সেলাই করল আলেক্সেই, তারপর বৃত্তাকারে নেমে উঠল উপরে; মাথার উপরে পাক খেয়ে গেল জমি, তার পটভূমিকায় চোখে পড়ল বিমানটি অসহায়ভাবে ধীরে ধীরে ঝটপট করছে।

"ওলিয়া!" বিজয়োল্লাসে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সেই, সবকিছু ভুলে গিয়ে, খাড়া চক্রে পাক খেয়ে নামতে নামতে জার্মান বিমানটির অন্তিম

যাত্রায় সঙ্গ দিল সে, লাল আগাছায়-ভরা মাটি পর্যন্ত একেবারে, মাটিতে লাগল বিমানটি, শূন্যে উঠল কালো ধোঁয়ার থাম।

শুধু তখনি শিথিল হল স্নায়বিক সংহতি আর সঙ্কুচিত পেশী, অশেষ ক্লান্তির বোধ এল তার জায়গায়। পেট্রলের কাঁটার দিকে তাকাল আলেক্সেই। কাঁটাটি প্রায় শূন্যে পেঁাছিয়েছে। যা পেট্রল আছে তাতে তিন, বড়ো জোর চার মিনিট ওড়া চলে। বিমান-ঘাঁটিতে ফিরতে অন্তত দশ মিনিট লাগবে ওঠবার সময় বাদ দিয়ে। আহত "ফোকটিকে" অনুসরণ করাটা বোকামী হয়েছে। "অবোধ শিশুর মত ব্যবহার," নিজেকে ভর্ৎসনা করল আলেক্সেই।

বিপদের মুহূর্তে সাহসী ধীরচিত্ত লোকেদের সব সময়ে যেমন হয়, আলেক্সেই'র মাথা পরিষ্কার, ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুলভাবে কাজ করছে। প্রথমে যেটা দরকার সেটা হল উপরে ওঠা, পাক খেয়ে নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিমান-ঘাঁটির দিকে আরোহণ। বেশ!

আবশ্যক গতিপথে বিমানটিকে আনল আলেক্সেই, নিচে মাটি নেমে গেল, দিগন্তে এল ঝাপসা ভাপ, সেটা দেখে আরো ধীরভাবে হিসেব করতে লাগল সে। পেট্রলের উপর নির্ভর করা বৃথা। মাপকাঠিতে সামান্য ভুল থাকলেও এ পেট্রলে অবশ্য কুলোবে না। বিমান-ঘাঁটিতে পেঁাছবার আগেই নামবে? কিন্তু কোথায়? সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথটির সবটা আবার মনে মনে ভেবে নিল আলেক্সেই। বন, জলা, আর স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যূহের এলাকায় অসমান মাঠ, আড়াআড়িভাবে কাটা, এখানে সেখানে গোলার গর্ত, আর কাঁটাতারে কীর্ণ।

'না, নামলে মারা পড়ব।'

পারাস্যুটে নামবে? সেটা করা যায়। এখনি! ঢাকনাটা খুলে বিমানটি ঘোরাও, স্টিকটা টেপো — ব্যস, আর কিছুর দরকার নেই। কিন্তু বিমানটির এই অদ্ভুত, দ্রুত চটপটে পাখিটির কী হবে! এর জঙ্গী গুণ একদিন তিনবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। পরিত্যাগ করবে এটাকে, ভেঙ্গেচুরে বাঁকাচোরা ধাতুর স্তূপে পরিণত করবে? সেটা করলে অবশ্য তার দোষ দেবে না কেউ। সে ভয় তার নেই। সত্যি বলতে, এ অবস্থায় পারাস্যুটে নামার অধিকার আছে তার। কিন্তু ঠিক এ সময়ে বিমানটিকে তার মনে হচ্ছিল বলিষ্ঠ উদার অনুগত জীবন্ত সত্তার মত, একে পরিত্যাগ করাটা ডাহা বেইমানি হবে। তা ছাড়া প্রথম কয়েকটি জঙ্গী নভোবিচরণের পরে বিনা বিমানে ফিরে যাওয়াটা কেমন হবে, আর একটি বিমান না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাকে, ফ্রণ্টে শুরু

হয়েছে বিজয় যাত্রা, এরকম কর্মমুখর সময়ে অলসভাবে থাকা, হাত মুড়ে বসে থাকা!

"কিছুতেই না!" বেশ জোরে বলল আলেক্সেই যেন কারো প্রস্তাবের উত্তরে।

যতক্ষণ না ইঞ্জিন বন্ধ হয় ততক্ষণ উড়তে হবে। তারপর? দেখা যাবে।

আর উড়ে চলল আলেক্সেই, প্রথমে তিন হাজার, তারপর চার হাজার মিটার উপর দিয়ে মাটির দিকে চেয়ে দেখছে যদি কোন ছোট ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ে। বিমান-ঘাঁটির সামনের বনটি এরিমধ্যে দেখা যাচ্ছে দিগন্তে, প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে। পেট্রলের কাঁটা আর নড়ছে না, শেষ পয়েণ্টে স্থিরভাবে আবদ্ধ সেটি। কিন্তু তখনো কাজ করে চলেছে ইঞ্জিন। কীসে চলছে ওটা? উঁচুতে আরো উঁচুতে... বেশ!

সুস্থ লোক যেমন নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা ভাবে না তেমন ইঞ্জিনের সমান ঘর্ঘর আওয়াজের হুঁশ থাকে না বৈমানিকের, সে আওয়াজে হঠাৎ এল অন্য সুর। পরিবর্তনটা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ল আলেক্সেই'র কাছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বনটিকে; প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে ওটা, চওড়ায় প্রায় তিন-চার কিলোমিটার। এমন কিছু দূর নয়। কিন্তু ইঞ্জিনের নিয়মিত আওয়াজে এসেছে অশুভ অন্য সুর। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করে এটা বৈমানিক, যেন নিজেরি শ্বাসরোধ হয়ে এসেছে। হঠাৎ আসে সেই অলক্ষুণে "চুক্ চুক্ চুক্" শব্দ, সেই শব্দে সমস্ত শরীর যন্ত্রণায় ব্যথিয়ে ওঠে।

না, ঠিক আছে। আবার ঠিকভাবে চলছে ইঞ্জিনটা। কাজ করছে ঠিক! হুররে! আর এই ত বনটা এসে পড়েছে। রোদে সবুজ সমুদ্রের মত আন্দোলিত বার্চগাছের মাথাগুলো চোখে পড়ছে। বিমান ভূমি ছাড়া আর কোথাও নামা চলবে না এখন। এখন শুধু একটি জিনিস করা দরকার — এগিয়ে যাওয়া, আরো এগিয়ে যাওয়া!

চুক, চুক, চুক!..

আবার ইঞ্জিনের সমান ঘর্ঘর শব্দ। আর কতক্ষণ! বনের উপরে এসেছে আলেক্সেই। দেখতে পাচ্ছে মসৃণভাবে বন ভেদ করে সটান গিয়েছে বালি-ভরা পথ, উইং কম্যাণ্ডারের টেরির মত। আর তিন কিলোমিটার দূরে বিমানঘাঁটি, খাঁজ-খাঁজ প্রান্তটির ওপারে, আলেক্সেই'র মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই নজরে এসেছে সেটা।

চুক, চুক, চুক! তারপর হঠাৎ নেমে এল স্তব্ধতা, এত গভীর স্তব্ধতা যে

ডানায় আর লেজে লাগা হাওয়ার গুঞ্জন শোনা গেল। সব শেষ! মেরেসিয়েভের মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। পারাস্যুটে নামবে? না! আর একটু এগোনো যাক। ঢালুভাবে অবতরণের জন্য বিমানটিকে ঘুরিয়ে নামতে লাগল আলেক্সেই, বিমানটিকে যতদূর সম্ভব শয়ান রেখায় রাখার আর ঘুরপাকে না পড়ার চেষ্টা করছে সে।

কী ভয়াবহ আকাশের এই জমাট স্তব্ধতা! এত উদগ্র গভীর সে স্তব্ধতা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ইঞ্জিনের চড়চড় আওয়াজ, রগের দপদপানি আর ক্ষিপ্র অবতরণের দরুন নানা শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাকে মিলতে জমি ক্ষিপ্রভাবে উঠে আসছে, যেন বিরাট কোন চুম্বক বিমানের কাছে তাকে টানছে।

বনের প্রান্ত, তার ওধারে বিমানভূমির মরকত-সবুজ জমি দেখতে পেল আলেক্সেই। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে? অর্ধেক ঘুরে আটকিয়ে গেল প্রপেলার। আকাশে নিশ্চল প্রপেলারটাকে ভয়াবহ দেখাচ্ছে। খুব কাছে এসে পড়েছে বনটি। সব শেষ তাহলে?.. ওলিয়া কখনো কি জানতে পারবে তার কী হয়েছিল, গত আঠারো মাস কী অমানুষিক প্রয়াস করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধি লাভ করে মানুষের মত মানুষ হয়েছে সে, আর হবার সঙ্গে সঙ্গে এরকম বিদঘুটেভাবে মাটিতে পড়ে মরতে হবে তাকে?

পারাস্যুটে নামবে? দেরী হয়ে গেছে! নিচে ছুটে চলেছে বনটি, বিমানটির ঝোড়ো বেগে গাছের মাথাগুলো ক্রমাগত সবুজ ফালিতে মিশে যাচ্ছে। এরকম কিছু একটা আগে সে দেখেছে। কখন? হ্যাঁ, তাইত! সেই বসন্তে, ভয়াবহ পতনের সময়ে। ঠিক এ ভাবে সবুজ ফালি সব বিমানের নিচে ছুটেছিল সে সময়ে। শেষ চেষ্টা করে আলেক্সেই স্টিকটা টানল...

৮

রক্তক্ষয়ের জন্য কান ঝিম ঝিম করছে পেত্রভের। বিমানভূমি, পরিচিত সব মুখ, বিকেলের সোনালী মেঘ -- সবকিছু হঠাৎ দুলতে শুরু করে আস্তে আস্তে উল্টিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আহত পাটা নাড়াতে তীব্র যন্ত্রণায় হুঁশ ফিরে এল।

'ও এখনো আসেনি?' জিজ্ঞেস করল পেত্রভ।

'এখনো আসেনি। কথা বলবেন না,' জবাব এল।

সেদিন যখন পেত্রভের মনে হয়েছিল অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত, তখন

হঠাৎ দেবদূতের মত জার্মান বিমানটির সামনে কোথা থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিল মেরেসিয়েভ; এটা কি সম্ভব যে সেই মেরেসিয়েভ এখন গোলাগুলিতে বিধ্বস্ত বিকলাঙ্গ ভূমির কোথাও পোড়া মাংস পিণ্ডের মত পড়ে আছে! সার্জেণ্ট-মেজর পেত্রভ আর কখনো কি দেখবে না তার নেতার কালো, স্বল্প বন্য আর সহৃদয় পরিহাসচটুল চোখ? কখনো নয়?

উইং কম্যাণ্ডার আস্তিনটা নামালেন। ঘড়ির আর দরকার নেই। দুহাতে টৌরি ঠিক করতে করতে বিরস কণ্ঠে বললেন:

'ব্যস, সব শেষ!'

'কোন আশা নেই?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'না, পেট্রল খতম। কোথাও হয়ত বিমান নামিয়েছে, হয়ত পারাস্যুটে নেমেছে... স্ট্রেচারটা নিয়ে যাও!'

মুখ ফিরিয়ে শিস দিয়ে একটা সুর ভাঁজতে শুরু করলেন কর্ণেল, একেবারে বেসুরোভাবে। আবার শ্বাসরোধ হয়ে এল পেত্রভের, যেন ভীষণ গরম আর বেজায় বড়ো কিছু একটা গলায় আটকেছে। অদ্ভুত কাশির মত শব্দ শোনা গেল। বিমানভূমির মাঝখানে যারা তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল তারা একবার ফিরে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। স্ট্রেচারে আহত বৈমানিকটি কাঁদছে।

'ওকে নিয়ে যাও বলছি! যত সব!' রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্ণেল, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেলেন ভিড়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে যেন হাওয়ার জন্য চোখদুটো কুঁচকিয়ে।

লোকজন চলে যেতে শুরু করেছে, ঠিক সে সময়ে ছায়ার মত নিঃশব্দে বনের ধার হয়ে এল একটি বিমান, চাকাগুলো গাছের চূড়োয় স্বল্প লেগেছে। প্রেতমূর্তির মত লোকেদের মাথার উপর দিয়ে, জমির উপর দিয়ে ভেসে এল সেটা, যেন জমি নিচের দিকে টানছে এমন ভাবে একসঙ্গে তিন চাকায় ঘাসে নামল। শোনা গেল ভারী একটা শব্দ, পাথরের নুড়ির আওয়াজ, আর ঘাসের খসখস, সেটা অস্বাভাবিক, কেননা নামার সময়ে ইঞ্জিনের গর্জনে এসব শব্দ বৈমানিকরা কখনো শোনে না। সবকিছু এত তাড়াতাড়ি হল যে কী ঘটেছে বুঝতে পারল না কেউ, যদিও সমস্তটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার: একটি বিমান নেমেছে, আর সেটা হল "একাদশ", যার জন্য সবাই এতক্ষণ এত উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ছিল।

'মেরেসিয়েভ!' কে একজন উদ্দাম অমানুষিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সবায়ের স্তম্ভিত ভাব গেল কেটে।

দৌড় শেষ করে বনের একেবারে ধারে, অস্তগামী সূর্যের কমলা আলোয় উজ্জ্বল নবীন কোঁকড়া শাদা-ছাল বার্চগাছগুলোর সামনে থামল বিমানটি।

এবারেও ককপিট থেকে বেরিয়ে এল না কেউ। হাঁপাতে হাঁপাতে বিমানটির কাছে ওরা দৌড়িয়ে গেল, প্রত্যেকের মনে অমঙ্গলের পূর্বাভাস। সবায়ের আগে দৌড়িয়ে গেলেন কর্ণেল, একলাফে ডানায় উঠে ঢাকনা সরিয়ে ককপিটের ভিতরটা দেখলেন। বসে আছে মেরেসিয়েভ, খালি মাথা, গ্রীষ্ম মেঘের মত ফ্যাকাশে মুখ, রক্তহীন সবজে ঠোঁটে হাসির রেশ। চাপা ঠোঁট থেকে রক্তের দুটি ধারা চিবুক হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

'বেঁচে আছ? চোট লেগেছে?'

দুর্বলভাবে হাসল মেরেসিয়েভ, নিষ্প্রাণ চোখে কর্ণেলের দিকে তাকিয়ে বলল:

'কিছু হয়নি। শুধু ভয় পেয়েছিলাম... প্রায় ছয় কিলোমিটার এক ফোঁটা পেট্রল ছিল না।'

বিমানটির চারিদিকে ভিড় করে বৈমানিকরা উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দন করছে আলেক্সেইকে, করমর্দন করছে তার।

'ভায়ারা ডানাটা ভেঙ্গে ফেলবেন না! ওটা ভাঙ্গা চলবে না! আমাকে বেরোতে দিন দেখি!' হেসে বলল আলেক্সেই।

সেই মুহূর্তে ওর উপরে ঝুঁকে পড়া মাথার ভিড়ের নিচে থেকে কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর একটি, এত ক্ষীণ যে মনে হল অনেক দূর থেকে আসছে।

'আলিওশা, আলিওশা!'

নিমেষে শক্তি ফিরে পেল মেরেসিয়েভ। তাড়াতাড়ি উঠে, দুহাতে ভর দিয়ে ককপিটের উপর দিয়ে ভারী পাটা বের করে লাফিয়ে নামল নিচে, আর একটু হলে ডানার উপরের একজন ধাক্কা লেগে পড়ে যেত।

বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে পেত্রভ, মুখটা বালিশের মতই শাদা। চোখের তলায় গভীর কালি পড়েছে, বড়ো দুফোঁটা অশ্রুবিন্দু লেগে আছে সেখানে।

'কী হে ছোকরা, বেঁচে আছ তাহলে!.. ঘাগী শয়তান!'

স্ট্রেচারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সেই। বন্ধুর

অসহায় মাথা জড়িয়ে তার নীল ক্লিষ্ট, অথচ আনন্দোজ্জ্বল চোখে চোখ রাখল।

'বেঁচে আছ?'

'ধন্যবাদ, আলিওশা, আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ। তুমি... আলিওশা... তুমি...'

'ধুত্তোর ছাই! আহত লোকটাকে নিয়ে যাও বলছি! হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে কেন?' কর্ণেলের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কাছে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, ছোটখাটো চটপটে মানুষটি, শক্ত পায়ে ভর দিয়ে দুলছেন, মাপসই চকচকে বুটজোড়া নীল ওভারঅলের নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

'সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ, রিপোর্ট দিন। কোনো বিমান নামাতে পেরেছেন?' সরকারী সুরে জানতে চাইলেন কর্ণেল।

'হ্যাঁ, কমরেড কর্ণেল। দুটো "ফোক-উলফ"।'

'কী অবস্থায় নামিয়েছিলেন?'

'একটাকে ওপর থেকে আক্রমণে। পেত্রভের পিছু লেগেছিল সেটা। আর একটাকে সরাসরি আক্রমণে, সবাই যেখানে লড়ছিল সেখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে।'

'জানি। পরিদর্শক এইমাত্র খবর দিয়েছে... ধন্যবাদ।'

'সেবা...' বিধিসম্মত প্রথায় জবাব দেবার ইচ্ছায় শুরু করল আলেক্সেই। কিন্তু সাধারণত খুঁতখুঁতে কর্ণেলটি তাকে বাধা দিয়ে ঘরোয়াভাবে বললেন:

'বেশ, বেশ! কাল আপনি স্কোয়াড্রনের ভার নেবেন... তৃতীয় স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার ঘাঁটিতে ফিরে আসেনি।'

পরিচালনা-ঘাঁটিতে দুজনে একসঙ্গে গেল। জঙ্গী দিনের শেষ হল। সবাই পিছু পিছু চলেছে। পরিচালনা-ঘাঁটির সবুজ ঢিপিটা কাছে এসে পড়েছে, এমন সময় ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি দৌড়িয়ে কাছে এল। খালি মাথা তার, বেশ খুসি আর উত্তেজিত দেখাচ্ছে, কর্ণেলের সামনে দাঁড়িয়ে কী একটা বলার জন্য মুখ খুলেছে, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে নিরস কঠোর গলায় কর্ণেল বললেন:

'টুপি ছাড়া কেন? কী মনে হচ্ছে নিজেকে, টিফিনের সময়ে স্কুলের ছোকরার মত?'

সেলাম করে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত লেফ্‌টেনাণ্টটি প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কমরেড কর্ণেল, আমাকে রিপোর্ট করার অনুমতি দিন!'

'কী?'

'আমাদের প্রতিবেশী "ইয়াক" উইঙের কম্যাণ্ডার টেলিফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আমাদের প্রতিবেশী! কী চায় সে?..'

তাড়াতাড়ি ডাগ-আউটের দিকে গেলেন কর্ণেল।

'আপনার বিষয়ে বলছেন...' ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি মেরেসিয়েভকে বলতে শুরু করল, কিন্তু নিচে ডাগ-আউট থেকে কর্ণেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল:

'মেরেসিয়েভকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও!'

দুপাশে হাত রেখে সঠিক কায়দায় কর্ণেলের সামনে দাঁড়াতে তিনি টেলিফোনের রিসিভার হাতের তালুতে চেপে সক্রোধে গরগর করে উঠলেন:

'আমাকে ভুল খবর দিয়েছেন কেন? আমাদের প্রতিবেশী জানতে চাইল যে কে "একাদশ" চালিয়েছিল। আমি বললাম, মেরেসিয়েভ, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। তখন সে জিজ্ঞেস করল, "কটা বিমান ওর নামে লিখেছ?" জবাবে বললাম, "দুটো।" ও বলল, "আর একটা ওর নামে টুকে রেখো। আমার বিমানের পিছু লাগা একটা "ফোক-উলফকে" ও নামিয়েছে। আমি নিজে দেখেছি সেটা।" কী? চুপ করে আছেন কেন?' ভুরু কুঁচকিয়ে কর্ণেল তাকালেন ওর দিকে, ঠাট্টা করছেন না চটে উঠছেন বোঝা মুশকিল। 'কথাটা সত্যি? এই ত, আপনি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলুন... হ্যালো! তুমি আছ ত? ফোনে কথা বলছেন সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মেরেসিয়েভ। রিসিভারটা ওঁকে দিচ্ছে।'

টেলিফোনে এল অপরিচিত ভাঙ্গা গভীর কণ্ঠস্বর:

'ধন্যবাদ, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট। চমৎকার! খুব তারিফ করছি আপনার। আমাকে আপনি বাঁচিয়েছেন। হ্যাঁ, মাটিতে ওটা না পড়া পর্যন্ত পিছু ছাড়িনি। আপনি কি ভদকা খান? আমার এখানে চলে আসুন। এক লিটার আপনাকে ধারি। বেশ, ধন্যবাদ। দেখা হলে করমর্দন করব। চালিয়ে যান!'

রিসিভার নামিয়ে রাখল মেরেসিয়েভ। আজ যে ধকল গিয়েছে তার পরে এত ক্লান্ত সে যে দাঁড়াতে পারছে না। ওর একমাত্র বাসনা যতো তাড়াতাড়ি পারে "পাতাল সহরে" ফিরে যাওয়া, নিজের ডাগ-আউটে পৌঁছিয়ে নকল পায়ের পাতাটি ছুঁড়ে ফেলে গা হাত ছড়িয়ে বাঙ্কে শুয়ে পড়া। মুহূর্তের



জন্য টেলিফোনের কাছে অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে গেল মেরেসিয়েভ।

বাধা দিয়ে কর্ণেল বললেন, 'কোথায় যাচ্ছেন?' মেরেসিয়েভের হাত নিজের ছোট শক্ত হাতে নিয়ে এত জোরে চাপ দিলেন যে ব্যথা করে উঠল। 'আপনাকে কী আর বলতে পারি? খাসা ছোকরা! আপনার মত লোক আমার অধীনে, সে জন্য আমি গর্বিত... বেশ, আর কী? ধন্যবাদ... হ্যাঁ, আর আপনার ওই বন্ধুটি, মানে পেত্রভ, ওটিও খাসা ছেলে। আর অন্যরা সত্যি বলছি, আপনাদের মত লোক আছে বলে যুদ্ধে আমরা হারতে পারি না!'

আবার মেরেসিয়েভের হাতে জোরে চাপ দিলেন তিনি।

ডাগ-আউটে মেরেসিয়েভ যখন গেল তখন রাত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঘুম এল না। ঘুম আনার চেষ্টা করল নানা রকম সুপরীক্ষিত উপায়ে — বালিশ উল্টিয়ে এক হাজার পর্যন্ত গুণে, তারপর হাজার থেকে এক পর্যন্ত, পরিচিত যাদের নাম "আ" দিয়ে শুরু তাদের নাম মনে করে, তারপর যাদের নাম "ব" দিয়ে শুরু তাদের, তারপর কেরোসিন-বাতির ঝাপসা আলোর দিকে চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে থেকে — কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিচিত মূর্তি সামনে এসে পড়ছে, কখনো স্পষ্টভাবে, কখনো বা যেন কুয়াশায় ঢাকা — রুপালী চুলের নিচে মিখাইল দাদুর বিব্রত চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে; "গরুর মত চোখের পাতা" পিটপিট করছে আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো; চটে উঠে পাক-ধরা কেশর ঝাঁকিয়ে ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচ কাকে যেন বকছেন; বুড়ো সেই স্নাইপারটি, সৈনিকসুলভ মুখ তার হাসিতে কুঞ্চিত; শাদা বালিশের পটভূমিতে কমিসার ভরোবিওভের মোমের মত ফ্যাকাশে মুখ, সেয়ানা তীক্ষ্ণ পরিহাসমুখর প্রাজ্ঞ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে; জিনচকার হাওয়ায় অস্থির লাল চুল এক ঝলকে সামনে দিয়ে ভেসে গেল; ছোটখাটো আর সজীব ইনস্ট্রাক্টর নাউমভ দরদে আর সব বোঝে এমনভাবে চোখ ঠারছে তাকে। অন্ধকার থেকে তার দিকে চেয়ে হাসছে অনেক চমৎকার মরমী মুখ, আর ইতিমধ্যেই প্লাবিত তার হৃদয়ে নানা স্মৃতি জাগিয়ে ভরে দিচ্ছে উষ্ণতায়। কিন্তু এই সব মরমী মুখের মধ্যে, সবাইকে তৎক্ষণাৎ মুছে দিয়ে এল ওলিয়ার মুখ, অফিসারের পোশাক-পরা একটি কিশোরের রোগা মুখ আর বড়ো, ক্লান্ত চোখ। পরিষ্কার স্পষ্ট তাকে দেখল, যেন সত্যি সত্যি সামনে আছে, এমনভাবে বাস্তব জীবনে

আগে কখনো দেখেনি তাকে। ছবিটা এত স্পষ্ট যে চমকে উঠল আলেক্সেই।

ঘুমের দেখা নেই! উচ্ছ্বাসিত উদ্যমের আহ্বানে সচকিত আলেক্সেই উঠে বসে "স্তালিনগ্রাদ্ কাটি" জ্বালিয়ে খাতা থেকে একটি পাতা ছিঁড়ে পেন্সিলটা কেটে লিখতে শুরু করল।

মনে নানা কথা এত ভিড় করে আসছে যে তাল রেখে চলা প্রায় অসম্ভব। আলেক্সেই দুষ্পাঠ্য হাতে লিখল: "আমার ওলিয়া, আজ তিনটে জার্মান বিমান নামিয়েছি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আমার বন্ধুদের কয়েকজন ত প্রায় রোজ এরকম করে। সেটা নিয়ে তোমার কাছে বড়াই করতে চাই না। আমার প্রিয়, আমার আপনার ওলিয়া! আঠারো মাস আগে আমার যা ঘটেছিল সেটা বলতে চাই আজ, বলার অধিকার এখন হয়েছে; সেটা এত দিন বলিনি বলে ক্ষমা কোরো, দোহাই তোমার, রাগ কোরো না। কিন্তু আজ, শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করেছি..."

চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল আলেক্সেই। ডাগ-আউটে মোটা তক্তার দেয়ালের ওদিকে ইঁদুরের কিঁচ কিঁচ, শুকনো বালু ঝরার শব্দ। খোলা দরজা দিয়ে আসছে বার্চ আর কুসুমিত ঘাসের তাজা সোঁদা গন্ধ, আর নাইটিংগেলের একটু চাপা, কিন্তু অবারিত গান। দূরে কোথাও, নালার ওধারে, খুব সম্ভব অফিসারদের খাবার ঘরের বাইরে পুরুষ ও নারীকণ্ঠ "এ্যাসগাছের" সেই বিষণ্ণ গানটি গাইছে। দূর বলে সুরটি নরম হয়ে রাত্রে বিশেষ কোমল একটি মোহে ভরে উঠেছে, মধুর বিষণ্ণতা জাগিয়ে তুলছে মনে — প্রত্যাশার, আশার বিষণ্ণতা...

বিমান-ঘাঁটিটি ইতিমধ্যে আমাদের অগ্রগামী সৈন্যদলের অনেক পিছনে, কামানের বহুদূর চাপা গুরু গুরু ডাক প্রায় শোনা যায় না; সে আওয়াজে চাপা পড়ছে না সুরটি, নাইটিংগেলের গান কিম্বা বনের ঘুমপাড়ানি গুন গুন ধ্বনি।

পুনশ্চ

ওরিওলের যুদ্ধ বিরাট জয়লাভে সমাপ্ত হতে চলেছে, উত্তর থেকে অগ্রসর সামনের রেজিমেণ্টরা জানিয়েছে যে ক্রাস্নগর্স্ক পাহাড় থেকে ইতিমধ্যেই জ্বলন্ত সহরটি চোখে পড়ে, তখন একদিন ব্রিয়ান্‌স্ক ফ্রণ্টের হেডকোয়ার্টারসে খবর এল যে গত ন দিনে ও এলাকায় কার্যরত গার্ডস ফাইটার উইঙের বৈমানিকেরা সাতচল্লিশটি শত্রু বিমান নামিয়েছে। নিজেদের খোয়া গিয়েছে পাঁচটি বিমান আর তিনটি লোক, কেননা দুটি বৈমানিক প্যারাসুটে নেমে হেঁটে ঘাঁটিতে পৌঁছয়। সোভিয়েত সেনার ক্ষিপ্র অগ্রগতির সেই সব দিনেও এ ধরনের জয়লাভ অসাধারণ। ওদের বিমান-ঘাঁটিতে একটি সংযোগী বিমান যাচ্ছিল, তাতে একটা জায়গা আমি পেলাম, আমার ইচ্ছে গার্ডস বৈমানিকদের কীর্তির বিষয়ে "প্রাভদায়" একটি প্রবন্ধের মালমশলা জোগাড় করা।

উইংটির বিমান-ঘাঁটি একটি যৌথ পশুচারণ ভূমিতে, ঢিবি সরিয়ে উঁচু নিচু জায়গাটা কোনক্রমে সমান করা হয়েছে। একটি নবীন বার্চ-বনের ধারে বিলমোরগের আণ্ডাবাচ্চার মত বিমানগুলো লুকোনো। সংক্ষেপে, যুদ্ধের সেই সব কর্মমুখর দিনে স্বাভাবিক মেঠো বিমান-ঘাঁটি একটা।

বিকেল প্রায় শেষ, উইঙের লোকেরা আর একটি কঠিন ব্যস্ত দিনের কাজ সমাপ্ত করে এনেছে, সে সময়ে আমরা নামলাম। জার্মানরা তখন ওরিওল এলাকার উপরে বিশেষভাবে সক্রিয়, সেদিন প্রত্যেকটি জঙ্গী বিমানকে সাতবার উঠতে হয়েছে লড়াই'এর জন্য। অষ্টম পালা শেষ করে সূর্যাস্তের সময়ে শেষ বিমান কটি ফিরে আসছে। কর্ণেলটি ছোটখাটো চটপটে মানুষ, রোদে তামাটে মুখ, সযত্নে টেরি কাটা, বেল্ট আঁটো করে আঁটা, পরনে নতুন নীল ওভারঅল। তিনি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করলেন যে সেদিন কোন গল্প গুছিয়ে বলতে

পারবেন না, সকাল ছটা থেকে বিমান-ঘাঁটিতে আছেন, তিনবার উপরে উঠতে হয়েছে তাঁকে, আর এখন এত ক্লান্ত যে দাঁড়াতে পারছেন না। সে সন্ধ্যায় সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মেজাজ অন্যান্য অফিসারদেরও নেই। বুঝতে পারলাম কালকের জন্য আমাকে থাকতে হবে; তা ছাড়া ফেরাও যাবে না, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। বার্চগাছের মাথায় ইতিমধ্যেই সূর্যের আলো গলিত সোনার রং লাগাচ্ছে।

শেষ বিমানগুলি ফিরে এল, ইঞ্জিন চলছে, সটান বনে গেল তারা। মিস্ত্রীরা ঘুরিয়ে রাখল তাদের। নালের মত মাটির দেয়াল-ঘেরা ঘাসে-ঢাকা সবুজ জায়গায় বিমানগুলিকে রাখার পরে ককপিট থেকে আস্তে আস্তে নামল বিবর্ণ ক্লান্ত বৈমানিকরা, তার আগে নয়।

একেবারে শেষের বিমানে ফিরল তৃতীয় স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডার। ককপিটের স্বচ্ছ ঢাকনা সরানো হল। প্রথমেই সোনালী মনোগ্রাম করা আবলুস কাঠের একটি বড়ো ছড়ি উড়ে বেরিয়ে এসে পড়ল ঘাসে। তারপর একটি রোদে তামাটে, চওড়া-মুখ কালো-চুল মানুষ বলিষ্ঠ হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াল, পাশ দিয়ে ক্ষিপ্রভাবে শরীরটাকে দুলিয়ে ডানার উপরে উঠে আস্তে আস্তে নামল মাটিতে। কে যেন আমাকে বলল উইঙের সেরা বৈমানিক। সন্ধ্যেটা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য ঠিক করলাম ওর সঙ্গে কথা বলব। বেশ মনে আছে আমার দিকে প্রফুল্ল প্রাণবন্ত কালো চোখে তাকাল ও, বালকসুলভ বেয়াড়া ভাব তখনো নিভে যায়নি সে চোখে, তার সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিশেছে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঝানু ক্লান্ত প্রজ্ঞা। হেসে আমাকে বলল:

'দোহাই আপনার! আমি ভয়ানক ক্লান্ত। পাদুটো টেনে চলার বেশী শক্তি নেই, মাথা ঘুরছে। আপনি খেয়েছেন কি? না? তাহলে আমার সঙ্গে খাবার ঘরে চলুন, একসঙ্গে খাওয়া যাবে। একটা বিমান নামালে ওরা রাত্রের শেষ খানার সময়ে দুশ গ্রাম ভদকা দেয়। আজ আমার প্রাপ্য ছ'শ গ্রাম। দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। চলি তাহলে? খেতে খেতে গল্প করা যাবে, আপনি ত গল্প বাগাবার জন্যে অধৈর্য দেখছি।'

রাজী হলাম আমি। এই খোলাখুলি গোছের, প্রফুল্ল অফিসারটিকে ভালো লাগল। বৈমানিকদের যাওয়া আসায় বনে যে পথটি হয়েছিল সেটি ধরে চললাম। নতুন পরিচিত ব্যক্তিটি চটপটভাবে যাচ্ছে, মাঝেমাঝে নিচু হয়ে বিলবেরি কুড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে টপটপ করে মুখে দিচ্ছে। অত্যন্ত ক্লান্ত নিশ্চয়ই, হাঁটছে ভারী পদক্ষেপে, কিন্তু অদ্ভুত ছড়িটায় ভর দিচ্ছে না। হাতে

ঝুলছে সেটা, ক্বচিৎ কখনো সেটা দিয়ে ব্যাঙের ছাতায় কিম্বা আগাছায় ঘা দিচ্ছে। কোনো নালা পেরিয়ে পিছল কাদাটে ঢাল, গা বেয়ে ওঠার সময়ে চলতে কষ্ট হচ্ছে তার, ঝোপঝাড় ধরে উঠছে, কিন্তু ছড়িতে ভর দিচ্ছে না।

খাবার ঘরে পেঁছনো মাত্র ওর ক্লান্তির লেশমাত্র রইল না। জানলার কাছে একটি টেবিল বেছে নিল; সূর্যাস্তের হিম রক্তাভা দেখা যাচ্ছে, পরের দিন ঝোড়ো আবহাওয়ার পূর্বলক্ষণ সেটা বৈমানিকদের কাছে। বড়ো এক মগ জল সাগ্রহে ঢকঢক করে খেয়ে বৈমানিকটি ফুটফুটে কোঁকড়া-চুল ওয়েট্রেসটির পিছনে লাগল: হাসপাতালে মারেসিয়েভের একটি বন্ধুর কথা ভেবে সে নাকি অন্যদের খাবারে বড্ড বেশি নুন দিয়ে ফেলছে। বেশ তৃপ্তি করে খানা খেল বৈমানিক, মাটন চপের হাড়টা চিবোল শক্ত দাঁতে। পাশের টেবিলের বন্ধুদের সঙ্গে চলল হাসি তামাসা। আমাকে জিজ্ঞেস করল মস্কোর নতুন খবর কী, হালে কী কী বই আর নাটক বেরিয়েছে, মস্কোর কোনো থিয়েটারে কখনো যায়নি বলে দুঃখ করল। খানার তৃতীয় পদ — বিলবেরি জেলি, এখানকার বৈমানিকরা তার নাম দিয়েছে "বজ্রমেঘ" — খাবার পর আমাকে জিজ্ঞেস করল:

'রাত্রে কোথায় থাকবেন ঠিক করেছেন? জায়গা নেই? তাহলে আমার ডাগ-আউটে আসুন!' ও বলল। এক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকিয়ে নিচু গলায় যোগ করল, 'আমার সঙ্গে যে থাকে সে ফেরেনি আজ... একটা বাংক তাই খালি আছে। পরিষ্কার বিছানার চাদর খুঁজে বের করা যাবে। আসুন তাহলে।'

বোঝা গেল, নবাগতদের সঙ্গে আলাপ করতে ভালোবাসে যারা তাদের একজন সে। রাজী হয়ে গেলাম। নালায় নামলাম, নালার ঢালু দুটোয় বুনো রাস্‌পবেরি, লাংঅর্ট আর আগাছার ঘন ঝোপের মধ্যে ডাগ-আউটগুলো খোঁড়া, ঝোপঝাড়ে পচা পাতা আর ব্যাঙের ছাতার সোঁদা গন্ধ।

বাড়িতে তৈরী "স্তালিনগ্রাদ্‌কা" কেরোসিন-বাতির সরু ধোঁয়াটে শিখা বাড়িয়ে দেওয়াতে আলো হয়ে উঠল ডাগ-আউটের ভেতরটা, তখন দেখা গেল ডাগ-আউটটা বড়ো গোছের আর আরামী, মনে হল অনেক দিন ধরে এখানে লোক আছে। কাদাটে দেয়ালের তাকে দুটো পরিচ্ছন্ন বাংক, গদি পাতা, টাটকা সুগন্ধি খড় চাদরে ভরে তৈরী সেগুলো। কোণে বসানো কচিপাতা কয়েকটি বার্চগাছ, "গন্ধের জন্য," ব্যাখ্যা করে বলল বৈমানিকটি। দেয়ালে

বাঙ্কের উপরে সুষ্ঠুভাবে কাটা খবরের কাগজে ঢাকা নানা তাকে বই'এর গাদা, দাড়ি কামাবার টুকিটাকি, সাবান আর টুথব্রাশ। একটি বাঙ্কের উপরে ঝাপসাভাবে দেখা যাচ্ছে সুন্দরভাবে হাতে-গড়া প্লেক্সিগ্লাসের ফ্রেমে বাঁধানো দুটো ফটোগ্রাফ, যুদ্ধ বিরতির সময়ে আলস্যের একঘেয়েমী দূর করার জন্য শত্রু বিমানের ভগ্নাংশ থেকে কারিৎকর্মীরা এ ধরনের ফ্রেম অনেক বানিয়েছিল। টেবিলে বার্চ্ক পাতায় ঢাকা বুনো সুরভি রাস্‌প্‌বেরিতে ভরা একটি বিলিক্যান। রাস্‌প্‌বেরি, নবীন বার্চগাছ, খড় আর মেঝেতে ছড়ানো ফারের ডালপালা থেকে এত মিষ্টি আর ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে, ডাগ-আউটটি এত ঠান্ডা, নালায় গঙ্গাফড়িঙের ডাক এত শ্রুতিমধুর যে প্রীতিকর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম আমরা, ঠিক করলাম কথাবার্তা আর রাস্‌প্‌বেরি খাওয়া কাল সকাল পর্যন্ত স্থগিত থাক।

বাইরে গেল বৈমানিক। কানে এল সজোরে দাঁত মাজার আর ঠান্ডা জলে গা হাত পা ধোবার আওয়াজ, নানা শব্দের সাড়া উঠছে বনে। ফিরে এল, বেশ ঝরঝরে প্রফুল্ল ভাব, চুলে আর ভুরুজোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা জল, বাতির পলতেটা কমিয়ে দিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে লাগল। ভারী কী একটা সশব্দে মেঝেতে পড়াতে তাকালাম, যা দেখলাম নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না। লোকটার পাদুটো মেঝেতে পড়ে রয়েছে! পাহীন বৈমানিক! তার উপর আবার জঙ্গী বিমান চালক! সেদিন সাতবার উপরে উঠেছে বিমান-যুদ্ধের জন্য আর তিনটি শত্রু বিমান নামিয়েছে! অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কিন্তু সত্যিই ত, ওর দুটো পা, নকল অবশ্য, বেশ খাপসই সামরিক জুতোয় পড়ে রয়েছে মেঝেতে! মনে হল বাঙ্কের নিচে লুকিয়ে থাকা কোনো লোকের পাদুটো উঁকি মারছে। আমাকে দেখে নিশ্চয় বোঝা গেল যে বিস্মিত হয়েছি, কেননা বৈমানিক আমার দিকে তাকিয়ে সেয়ানা প্রফুল্ল হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল:

'আগে লক্ষ্য করেননি আপনি?'

'স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'শুনে খুসি হলাম! ধন্যবাদ! কিন্তু অবাক লাগছে যে আপনাকে কথাটা কেউ বলেনি। আমাদের উইঙে পাকা বৈমানিক যেমন অনেক আছে তেমন ব্যস্তবাগীশ লোকদেরও অভাব নেই। নতুন একটি ভদ্রলোক এসেছেন, "প্রাভদার" সাংবাদিক আবার তিনি, এমন সুযোগ পেয়ে তার কাছে তাদের অদ্ভুত চিজটিকে নিয়ে বড়াই করেনি, সেটা আশ্চর্য!'

'কিন্তু ব্যাপারটা অসাধারণ, সেটা ত আপনি মানবেন। পা নেই অথচ জঙ্গী বিমান চালাচ্ছেন! বীরের মত ব্যাপার! বিমান চালনের ইতিহাসে এরকম জিনিস ঘটেনি।'

ফুর্তিতে শিস দিয়ে বৈমানিক বলল:

'বিমান চালনের ইতিহাস!.. সে ইতিহাসে অনেক কিছুই অজানা ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে আমাদের বৈমানিকদের কাছে অনেক কথা ইতিহাস শুনেছে। কিন্তু খুসি হবার কী আছে? বিশ্বাস করুন, এদুটোর জায়গায় আসল পা থাকলে বিমান চালাতে আরো ভালো লাগত আমার। কিন্তু নিরুপায়।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বৈমানিক আরো বলল, 'ঠিক বলতে গেলে, বিমান চালনের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা অজানা নয়।'

মানচিত্রের খাপ হাতড়িয়ে পত্রিকার একটি পাতা খুঁজে বের করল সে, ভাঁজ পড়া ছেঁড়াখোঁড়া পাতাটা সযত্নে সেলোফেনের পাতে আঁটা। একটি পায়ের পাতা ছিল না একজন বৈমানিকের, তা সত্ত্বেও বিমান চালায় সে, গল্পটি তার বিষয়ে।

'কিন্তু ওর একটা পা ত ছিল। তা ছাড়া ও জঙ্গী বিমান নয়, একটা প্রাচীন "ফারমান" চালিয়েছিল,' আমি বললাম।

'কিন্তু আমি সোভিয়েত বৈমানিক,' জবাবে ও বলল। 'বড়াই করছি ভাববেন না দোহাই। আমার কথা নয়। একজন অত্যন্ত ভালো লোক, মানুষের মত মানুষ একজন কথাটা আমাকে বলেন।' "মানুষের মত মানুষ"এ বিশেষ জোর দিল সে। 'তিনি মারা গিয়েছেন।'

বৈমানিকের চওড়া বলিষ্ঠ মুখে এল মধুর কোমল বিষণ্ণ ভাব, চোখে পরিষ্কার মরমী আলোর দীপ্তি; চেহারা দেখে মনে হল বয়স প্রায় দশ বছর কমে গিয়েছে, প্রায় তরুণের মত দেখাচ্ছে; এক মুহূর্ত আগে ভেবেছিলাম যে বৈমানিকটি মধ্যবয়সী, এখন অবাক হয়ে বুঝলাম তার বয়স বড়ো জোর তেইশ।

'কী হয়েছিল, কখন এবং কী ভাবে হয়েছিল সেটা লোকে জিজ্ঞেস করলে আমার বিরক্ত লাগে... কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতে সবকিছু আমার মনে ফিরে আসছে... আপনাকে আমি চিনি না। কাল পরস্পরের কাছে বিদায় নেব, হয়ত আর কখনো দেখা হবে না... যদি চান ত আমার পায়ের গল্পটা আপনাকে বলি।'

বাঙ্কে উঠে বসে চিবুক পর্যন্ত কম্বল টেনে নিয়ে বলতে শুরু করল

বৈমানিক। দেখে মনে হল আমার উপস্থিতির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছে, নিজের মনে কথা বলে চলেছে। গল্পটা কিন্তু বলল খুব গুছিয়ে। টের পেলাম যে তার বুদ্ধি তীক্ষ্ম, স্মরণশক্তি ভালো, হৃদয় উদার। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে গুরুত্বপূর্ণ আর অভূতপূর্ব কিছু একটা এক্ষুণি শ্রুতিগোচর হবে, পরে আর কখনো হয়ত শোনার সুযোগ হবে না আমার, তাই তাড়াতাড়ি একটা স্কুলের খাতা টেনে নিলাম, মলাটে লেখা ছিল: "তৃতীয় স্কোয়াড্রনের রোজনামচা"। বৈমানিকের কাহিনীটি টুকে নিতে শুরু করলাম।

বনের উপর দিয়ে অলক্ষিতে রাত্রি কেটে যাচ্ছে। টেবিলের উপরে বাতিটার চড়চড় হিস হিস আওয়াজ, শিখায় দগ্ধ-ডানা অনেক অসাবধানী প্রজাপতি পড়ে আছে চারিদিকে। প্রথম প্রথম হাওয়ায় ভেসে এল এ্যাকর্ডিয়নে বাজানো একটি সুর। তারপর থেমে গেল এ্যাকর্ডিয়নের করুণ ধ্বনি, বৈমানিকের বিষণ্ণ, নিম্নকণ্ঠের ছন্দময় কথায় সঙ্গত দিল শুধু বনের নানা নৈশ শব্দ, বকের তীক্ষ্ম চীৎকার, পেঁচার দূরাগত আর্তনাদ, কাছের জলায় ব্যাঙের ক্রোক ক্রোক আর গঙ্গাফড়িঙের কিচ কিচ।

শোনা গল্পটি এত রোমাঞ্চকর যে যতখানি সাধ্যে কুলোয় ততখানি লিখে রাখার চেষ্টা করি। খাতাটা ভরে গেল, তাকে আর একটা ছিল, সেটাও গেল ভরে। ডাগ-আউটের অপরিসর প্রবেশপথ দিয়ে আকাশ দেখা যায়, আকাশ পাতলা হয়ে এসেছে যে চোখে পড়ল না। আলেক্সেই মারেসিয়েভ তখন বলছে সেই দিনটির কথা যেদিন "রিখথোফেন" ডিভিশনের তিনটে বিমান নামিয়ে ও আবার টের পেল যে অন্য বৈমানিকদের সমান হয়ে উঠেছে।

'গল্প করতে করতে রাত কেটে গিয়েছে, আর সকাল হলেই আমাকে বিমান চালাতে হবে,' গল্প বন্ধ করে ও বলল। 'আপনাকে নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত করেছি। এখন একটুখানি ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।'

'কিন্তু ওলিয়া? কী উত্তর সে দিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, তারপর আত্মসংবরণ করে বললাম: 'মাফ করুন, প্রশ্নটি হয়ত অস্বস্তিকর। তাহলে জবাব দেবেন না।'

'কেন?' হেসে জিজ্ঞেস করল মারেসিয়েভ। 'আমরা দুজনেই মজার লোক। দেখা গেল যে আমার সবকিছুই ও জানত। আমার দোস্ত আন্দ্রেই দেগতিয়ারেঙ্কো ওকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে জানিয়েছিল, প্রথমে আমার বিমান পতনের, তারপর আমার পা কেটে ফেলার কথাটা। কিন্তু ও যখন দেখল যে

কথাটা আমি চেপে গিয়েছি তখন ধরে নিল যে ওকে বলতে আমার খারাপ লাগছে, আর কিছু না জানার ভান করল। দেখা গেল দুজন দুজনকে ঠকাচ্ছিলাম, ভগবান জানেন কেন! ওর চেহারাটা দেখবেন নাকি?'

পলতেটা বাড়িয়ে বাতিটা নিয়ে গেল বাঙ্কের উপরে দেয়ালে টাঙানো, সুষ্ঠু প্লেক্সিগ্লাসের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলোর কাছে। একটি ফটো আনাড়ির তোলা, সেটা প্রায় সবটাই ঝাপসা পুরোনো হয়ে গিয়েছে, কোনক্রমে দেখা যায় মাঠের ফুলের মধ্যে হাসিমুখে বসে আছে একটি ভাবনাচিন্তাহীন মেয়ে। অন্য ছবিটি তারই, জুনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট-টেকনিশ্যানের পোশাক পরনে, রোগা বুদ্ধিমন্ত মুখ, একাগ্র ভাব চোখে। এত ছোট মেয়েটি যে ইউনিফর্ম পরনে সুশ্রী কিশোরের মত চেহারা, শুধু চোখদুটো ক্লান্ত আর তীক্ষ্ণ, কিশোরসুলভ নয়।

'ওকে পছন্দ হয়?'

'অত্যন্ত,' আন্তরিকভাবে আমি বললাম।

'আমারও ভালো লাগে,' স্মিত হাসি হেসে সে বলল।

'আর স্ত্রুচকভ, সে এখন কোথায়?'

'জানি না। ওর শেষ চিঠি এসেছিল শীতকালে, ভেলিকিয়ে লুকি'র কাছাকাছি কী একটা জায়গা থেকে।'

'আর ট্যাঙ্ক-অফিসারটি, কী যেন তার নাম?'

'গ্রিশা গভজ্‌দেভের কথা বলছেন? সে এখন মেজর। প্রখরভ্‌কার বিখ্যাত যুদ্ধে ছিল, আর পরে কুর্স্ক স্যালিয়েণ্টে ট্যাঙ্কের ব্যূহভেদে। একই এলাকায় আমরা দুজনেই কাজে ছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি। একটি ট্যাঙ্ক রেজিমেণ্টের নেতা এখন। কিছু দিন হল ওর কোন চিঠি পাইনি, কেন জানি না। কিন্তু কিছু এসে যায় না। যুদ্ধে বেঁচে থাকলে আমাদের আবার দেখা হবে। আর বেঁচে থাকবই না কেন? কিছু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক?.. রাত কাবার হয়ে গিয়েছে!'

ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল সে, আধো-অন্ধকারে ভরে গেল ডাগ-আউটটা। ভ্রূকুটিকুটিল ভোরের আবছা ধূসর আলোয় কানে আসছে মশার গুনগুন, বনের মধ্যে এই চমৎকার আশ্রয়টিতে মশাগুলোই বোধ হয় একমাত্র আপদ।

'আপনার বিষয়ে "প্রাভদায়" লেখার খুব ইচ্ছে আমার,' আমি বললাম।

'আপনার খুসি,' বিশেষ কোন উৎসাহ না দেখিয়ে জবাব দিল বৈমানিক।

তারপর নিদ্রালস গলায় যোগ করল, 'না লিখলেই বোধ হয় ভালো। গল্পটার সুযোগ নিয়ে গেবেল্‌স সারা পৃথিবীতে ঢাক পিটিয়ে জানাবে যে পায়ের পাতা নেই এমন লোকেদেরও রুশরা জোর করে লড়াই'এ নামাচ্ছে, আরো কত কিছু... ফ্যাশিস্টরা কী ধরনের চিজ আপনি ত জানেন।'

পর মুহূর্তেই জোরে নাক ডাকতে শুরু করল তার। কিন্তু আমার ঘুম এল না। ওর সরল ও উদাত্ত গল্পটি রোমাঞ্চিত করেছিল আমাকে। সুন্দর উপকথার মত মনে হত গল্পটি যদি না নায়কটি চোখের সামনে ঘুমোত, যদি না স্পষ্ট দেখতে পেতাম মেঝেতে, ভোরের ধূসর আলোয় চিকচিক করছে শিশিরে ভেজা নকল পাদুটো।

...এরপরে অনেকদিন আলেক্সেই মারেসিয়েভের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি. কিন্তু যুদ্ধের স্রোতে যেখানেই ভেসে যাই না কেন, সঙ্গে থাকত স্কুল-খাতাদুটো, যে দুটোয় ওরিওলের কাছে বৈমানিকটির অনন্যসাধারণ ওডিসি আমি লিখে নিই। যুদ্ধের সময়ে, হয়ত সাময়িক বিরতি ঘটেছে, আর তারপর অবরোধমুক্ত ইউরোপের নানা দেশে ঘোরার সময়ে কত বার না ওর কাহিনীটি লিখতে শুরু করি আর ছেড়ে দিই, কেননা যা লিখি তা ওর আসল জীবনের ক্ষীণ ছায়ামাত্র মনে হয়!

নুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক সামরিক বিচারকমণ্ডলীর একটি অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেদিন হের্মান গেরিঙের জেরা শেষ হয়ে আসছিল। দলিলী সাক্ষ্যের চাপে বিচলিত আর সোভিয়েত অভিযোক্তার জেরায় কোণ ঠেসা হল "দুনম্বর জার্মান নাৎসি", অনিচ্ছা সত্ত্বেও দাঁতে দাঁত চেপে আদালতকে জানাল কী করে ফ্যাশিস্টদের বিরাট আর তখন পর্যন্ত অজেয় বাহিনী আমাদের বিরাট দেশে নানা যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে ভেঙ্গেচুরে যায়, বিলুপ্ত হয়ে আসে। আত্মসমর্থন করে, আকাশের দিকে নিষ্প্রভ চোখ তুলে হেরিং বলল:

'ভগবদ্বিধানের জন্যই এটা হল।'

'জার্মানি পরাজিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের ফলে. এই বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ যে অতিঘৃণ্য অপরাধ সেটা কি আপনি স্বীকার করেন?' সোভিয়েত অভিযোক্তা হেরিংকে জিজ্ঞেস করলেন।

'অপরাধ নয়, মারাত্মক ভুল,' ভুরু কুঁচকিয়ে চোখ নামিয়ে নিচু গলায় জবাব দিল গেরিং। 'আমি শুধু স্বীকার করছি যে না ভেবেচিন্তে আমরা সেটা করি, যুদ্ধ চলার সময়ে এটা স্পষ্ট দেখা গেল যে আমরা অনেক বিষয়ে

অজ্ঞ ছিলাম, অনেক কিছুর অস্তিত্ব আমরা কল্পনাও করিনি। প্রধান যে জিনিসটা আমাদের অজানা ছিল, বুঝতে পারিনি যেটা, সেটা হল সোভিয়েত রুশদের চরিত্র। ওরা তখন এবং এখনো আমাদের কাছে হেঁয়ালির মত। দুনিয়ার সেরা গুপ্তচর বিভাগ ওদের সত্যিকার অন্তর্নিহিত সামরিক শক্তির হদিশ করতে পারবে না। কামান বিমান আর ট্যাঙ্কের সংখ্যার কথা বলছি না। সেটা মোটামুটি আমরা জানি। ওদের শিল্পের পরিসর আর সামর্থ্যের কথাও বলছি না। রুশ জনগণের কথা ভাবছি। বিদেশীর কাছে রুশরা বরাবরই হেঁয়ালির মত। নেপোলিয়নও ওদের বুঝে উঠতে পারেনি। আমরা শুধু নেপোলিয়নের ভুলের পুনরাবৃত্তি করি।'

"রুশ হেঁয়ালি" আর আমাদের "অন্তর্নিহিত সামরিক শক্তির" কথা যে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়েছে গেরিংকে তাতে গর্বিত বোধ করলাম। সোভিয়েত জনগণের সামর্থ্য, প্রতিভা, সাহস আর আত্মত্যাগ যুদ্ধের সময়ে সারা পৃথিবীকে অত্যন্ত বিস্মিত করেছিল, সেগুলো যে তখন এবং এখনো গেরিংদের কাছে হেঁয়ালির মত, সেটা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি আমরা। "জার্মানরা ঈশ্বরের পেয়ারের লোক", এই হীন তত্ত্বের আবিষ্কর্তারা কী করে সমাজতান্ত্রিক দেশে লালিতপালিত জনগণের চরিত্রবল আর শক্তির কথা বুঝবে? আলেক্সেই মারেসিয়েভের কথা হঠাৎ মনে পড়ল। ওকের চৌখুপী দেওয়া সেই নিরালঙ্কার হলে আমার চোখের সামনে স্পষ্টভাবে এল তার প্রায় ভুলে যাওয়া চেহারা। আর সেখানেই, ফ্যাশিজমের জন্মস্থান নুরেমবার্গে আমার ইচ্ছে হল একজনের কথা বলি, সে লক্ষ লক্ষ সাধারণ সোভিয়েত মানুষেরই একজন, তাদেরি একজন যারা কাইটেলের সেনাদল আর গেরিঙের বিমান বাহিনীকে চুরমার করে দেয়, র‍্যেদেরের জাহাজগুলোকে পাঠায় সমুদ্রের অতলে, বলিষ্ঠ আঘাতে ভেঙে দেয় হিটলারের লুঠেরা রাষ্ট্রকে।

নুরেমবার্গে আমার কাছে হলুদ মলাট-দেওয়া স্কুলের খাতাদুটো ছিল, তার একটাতে মারেসিয়েভের হাতে লেখা: "তৃতীয় স্কোয়াড্রনের রোজনামচা"।

বিচারকমণ্ডলীর অধিবেশন থেকে বাড়ি ফিরে পুরোনো নোটগুলি দেখে নিয়ে আবার কাজে নামলাম। আলেক্সেই মারেসিয়েভ আমাকে যা বলেছিল তা থেকে ওর সম্বন্ধে ঠিক মত সবকিছু বলার ইচ্ছে ছিল আমার।

আমাকে ও যা বলে তার অনেকটা লিখে নিতে পারিনি, তা ছাড়া চার বছরে অনেক কিছু মন থেকে মুছে যায়। বিনয়ী বলে নিজের সম্বন্ধে অনেক

কথা বাদ দিয়েছিল আলেক্সেই মারেসিয়েভ, কল্পনার সাহায্যে ফাঁকগুলো ভরাতে বাধ্য হলাম আমি। নিজের বন্ধুদের ছবি সে রাত্রে স্পষ্ট ও সহৃদয়ভাবে সে এ'কেছিল, সেগুলো মনে ছিল না আমার, আবার নতুন করে আঁকতে হল তাদের। তথ্যগুলি পুরোপুরি অনুসরণ করে বলতে পারিনি আমি, নায়কের নাম একটু বদলে দিয়েছি; ওর বন্ধুদের, আর ওর কঠোর বীরত্বপূর্ণ যাত্রার সময়ে যারা ওকে সাহায্য করেছিল, নতুন নাম দিয়েছি তাদের। এর জন্য আশা করি নিজেদের ছবি এই কাহিনীতে চিনতে পারলে আমাকে মাপ করবেন তাঁরা।

বই'এর নাম দিয়েছি "মানুষের মত মানুষ", কেননা আলেক্সেই মারেসিয়েভ সোভিয়েত মানুষের মত মানুষ, হীনতম মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তার মত লোকদের চিনতে পারেনি হের্মান গেরিং; আর এখনো চিনতে পারেনি তারা যারা ইতিহাসের পাঠ ভুলতে ইচ্ছুক, যারা এখনো গোপনে নেপোলিয়ন ও হিটলারের পন্থা অনুসরণ করতে চায়।

এইভাবে "মানুষের মত মানুষ" লেখা হয়।

ছাপার জন্য পাণ্ডুলিপিটা তৈরী হলে আমি চেয়েছিলাম প্রকাশের আগে যাতে বইটির প্রধান নায়ক সেটি পড়ে। কিন্তু যুদ্ধের হট্টগোলে তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ হারিয়ে গিয়েছিল; যে সব বৈমানিকদের আমরা দুজনে চিনতাম কিম্বা যে সব সরকারী মহলে খোঁজ নিয়েছিলাম তারা কেউই বলতে পারল না আলেক্সেই পেত্রোভিচ মারেসিয়েভ কোথায়।

গল্পটি একটি পত্রিকায় বেরোতে শুরু হয়েছে আর রেডিওতে বলা হচ্ছে, একদিন সকালে টেলিফোনটা বেজে উঠল, রিসিভারটা তোলাতে কানে এল একটু ভাঙ্গা, বলিষ্ঠ, অস্পষ্ট-চেনা কণ্ঠস্বর:

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনি কে?'

'গার্ডস মেজর আলেক্সেই মারেসিয়েভ।'

কয়েক ঘণ্টা পরে ভালুকের মত দুলে দুলে হাঁটার ভঙ্গীতে আমার ঘরে ঢুকল আলেক্সেই মারেসিয়েভ, ঠিক আগেকার মত তৎপর, প্রফুল্ল আর কর্মঠ দেখাচ্ছে তাকে। যুদ্ধের চার বছরে বলতে গেলে কোন পরিবর্তন হয়নি তার।

'বাড়িতে বসে পড়ছিলাম। রেডিও চলছিল, কিন্তু বইটিতে এত মগ্ন ছিলাম যে বেতারে কান দিইনি একেবারে। হঠাৎ মা বলে উঠলেন, "শোনো,

বাছা, ওরা তোমার কথা বলছে!" কান খাড়া করে বসলাম। সত্যিই তাই। আমার কথা বলছে। অবাক কাণ্ড, কে লিখতে পারে ওটা? কাউকে বলেছি বলে মনে পড়ল না। তারপর ওরিওলের কাছে ডাগ-আউটে আমাদের সাক্ষাৎকারের কথাটি মনে পড়ল, আমার অভিজ্ঞতার নানা গল্প করে সারারাত জাগিয়ে রেখেছিলাম আপনাকে, মনে পড়ল... কিন্তু কী করে এটা সম্ভব... ভাবলাম। ওটা ঘটে অনেক দিন আগে, প্রায় পাঁচ বছর আগে। কিন্তু তাহলেও ত গল্পটি পড়া হচ্ছে। অধ্যায়টি শেষ করে লেখকের নাম করল কথক। তাই ঠিক করলাম আপনাকে খুঁজে বের করব।'

প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল, উদার একটু লাজুক হাসি হেসে; মারেসিয়েভের নিজস্ব হাসি, আগে দেখেছি সেটা।

অনেক দিন অসাক্ষাতের পরে দুজন সৈনিকের দেখা হলে বরাবর যা হয়, আমরা আবার আমাদের সব যুদ্ধ নতুন করে লড়লাম, দুজনের চেনা অফিসারদের কথা উঠল, যারা আমাদের জয়লাভ দেখে যেতে পারেনি তাদের সম্বন্ধে কথা বললাম। আগেকার মত আলেক্সেই নিজের বিষয়ে বলতে অনিচ্ছুক, তবুও জানলাম যে আমাদের সাক্ষাৎকারের পর যুদ্ধে আরো অনেক সাফল্য অর্জন করে সে। নিজের গার্ডস উইঙের সঙ্গে ১৯৪৩-১৯৪৫ সালের নানা অভিযানে ও লড়ে। আমাদের দেখা হবার পরে ওরিওলের কাছে তিনটে শত্রু বিমান নামায়, তারপর বল্টিক উপকূলে যুদ্ধের সময়ে আরো দুটো। সংক্ষেপে পায়ের পাতা হারানোর জন্য শত্রুকে অনেক মূল্য দিতে বাধ্য করে সে। সরকার ওকে "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" খেতাব দেন।

ব্যক্তিগত জীবনের কথাও বলল আলেক্সেই: এ সূত্রে আমার গল্পটির সুখী পরিসমাপ্তিতেও আমি খুসি।

যুদ্ধের পর আলেক্সেই যে মেয়েটিকে ভালোবাসত তাকে বিয়ে করে, এতটি ছেলে হয়েছে, তার নাম ভিক্তর। মারেসিয়েভের মা কামিশিন থেকে এসে ওদের সঙ্গে আছেন, ওদের সুখে সুখী তিনি, পৌত্রের দেখাশোনা করেন।

এখন আমার গল্পের প্রধান নায়কটির নাম খবরের কাগজে প্রায়ই বেরোয়। আমাদের পূত সোভিয়েত ভূমিতে হামলাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে সোভিয়েত অফিসারটি সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার এত দীপ্ত দৃষ্টান্ত স্থাপিত করে সে এখন বিশ্বশান্তির উৎসাহী সমর্থক। নানা সম্মেলনে ও

সমাবেশে তাকে একাধিকবার দেখেছে বুদাপেস্ত, প্রাগ, প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন ও ওয়ারস'র মেহনতী জনগণ। এই সোভিয়েত যোদ্ধাটির বিস্ময়কর কাহিনী নিজের দেশের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর গিয়েছে, যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষা যে এমন অটলভাবে সহ্য করেছে তার মুখে শান্তির মহৎ দাবী বিশেষ করে জোরালো শোনায়।

স্বাধীনতাপ্রিয় পরাক্রান্ত জনগণের সন্তান আলেক্সেই মারেসিয়েভ, যুদ্ধের সময়ে যে দৃঢ় আগ্রহে জয়লাভে নিঃসংশয় হয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়ে তাদের হারায়, ঠিক সে ভাবে এখন শান্তির জন্য লড়াই করছে সে।

তাই মানুষের মত সোভিয়েত মানুষ, আলেক্সেই মারেসিয়েভের কাহিনীর উত্তরভাগ রচনা করছে জীবন নিজেই।